প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩৭৬

সূচীপত্র

অগ্রহায়
১৩৭৫

প্রবাসী—অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬

সূচীপত্র

প্রবাসী—মাঘ, ১৩৭৬

সূচীপত্র

প্রবাসী—ফাল্গুন ১৩৭৬

সূচীপত্র

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৯শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

কার্ত্তিক, ১৩৭৬

১ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহাত্মা গান্ধী

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী একশত বৎসর পূর্বে পোরবন্দরে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথম জীবনের উল্লেখযোগ্য নার মধ্যে বলা যায় তিনি ইংলণ্ডে ব্যারিষ্টার হইবার জন্য আইন পাঠ করিতে গিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া গিয়া ১৮৯৩ খৃঃ অব্দে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকা গমন করেন ও সেইখানে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দমন ও পাশবিক ভিব্যক্তি দেখিয়া তিনি তদ্দেশীয় শাসক সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অহিংস ও নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন আরম্ভ রেন। এই বিরোধে তিনি বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতবাসীগণ তাঁহাকে জেদের নেতা বলিয়া গ্রহণ করেন এবং তাঁহার নির্দ্দেশে বুয়র যুদ্ধ ও প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধে ভারতবাসীদের সেবার য় শুশ্রূষাকারীদল গঠন করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাইবার ব্যবস্থা করেন। ১৯১৫ খৃঃ অব্দে মহাত্মা গান্ধী আফ্রিকা তে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও ভারতে স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা আহরণের জন্য অভিনব আদর্শে অহিংস অসহযোগ সত্যাগ্রহ আন্দোলনের আয়োজন করেন। ১৯২০ খৃঃ হইতে প্রায় ২৫ বৎসর কাল তিনি এই আন্দোলন তত্বে চালনা করেন এবং ইহার সঙ্গেই তিনি ভারতের জনসাধারণকে নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন ক, সবল ও নিষ্পাপ করিবার জন্য বিস্তৃতভাবে শিক্ষা দিতে থাকেন। তাঁহার নেতৃত্বে স্বাধীনতা সংগ্রামে রতীয় কংগ্রেসদল অগ্রগামী হইয়া অহিংসার পথে ঐ "যুদ্ধ" চালাইয়া চলে ও শেষে ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে ভারত-ভাগ করিয়া একদেশকে দুই দেশে পরিণত করিয়া স্বাধীনতা লাভ করে। এই দেশ বিভাগে মহাত্মা গান্ধীর ত ছিল না। তিনি সেই জন্য স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় হইতে কংগ্রেস হইতে সরিয়া যান এবং নিজের মতবাদ

আশ্রম জীবন অবলম্বন করিয়া একনিষ্ঠভাবে প্রচার করিতে থাকেন। ১৯৩০—৪০, এই দশ বৎসরে তিনি বহুবার অনশন পালন করিয়া দেশের ও নিজের আত্মা ও চরিত্রের উন্নতি ও শোধন চেষ্টা করেন। ইহার পরেও তিনি কয়েকবার দীর্ঘ উপবাস করিয়া ভারতের হিন্দু ও মুসলমান দিগের কলহ নিবারণ চেষ্টা করেন। এই চেষ্টা বহু নির্ব্বোধ ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তিদিগেরমতে মহাত্মার মুসলমান প্রীতির পরিচায়ক বলিয়া প্রচারিত হয় ও ৩০শে জানুয়ারী ১৯৪৮ খৃঃ তে তাঁহাকে এক ব্যক্তি গুলি করিয়া হত্যা করে।

মহাত্মা গান্ধী যদিও রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রেই অধিক যশ আহরণ করিয়া গিয়াছেন তাহা হইলেও কার্য্যে, সমাজ সংস্কার চেষ্টায় ও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি যে কোন প্রসিদ্ধ স্বধর্ম্মপ্রবর্ত্তকের সহিত তুলনীয়। জাতির যেখানে যা দোষ তাঁহার চক্ষে পড়িত তিনি তাহারই সংস্কার চেষ্টায় অক্লান্তভাবে ও অসীম সাহসের সহিত আত্মনিয়োগ করিতেন। রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁহার সংগ্রাম ও আন্দোলন পদ্ধতি নীতি ও ধর্ম্মের অস্ত্র ব্যবহারেই চালিত হইত। ভারতের মানুষের কর্ম্মবিমুখতা ও আলস্য একটা মহা দোষ ও ভারতের সকল অবনতির উহাই একটা প্রধান কারণ। এই দোষ দূর করিবার জন্য এবং দরিদ্র লোকেদের কর্ম্মের দ্বারা যথা সম্ভব দারিদ্র্যলাঘব করা আবশ্যক বোধে মহাত্মা গান্ধী চরখা ও তকলি দিয়া সূতা কাটা ও সেই সূতায় বোনা বস্ত্র খদ্দর ব্যবহার কংগ্রেস-দলের সকল সভ্যের ও সমর্থকের জন্য বাধ্যতামূলক করিয়াছিলেন। এই উপায়ে তিনি একাধারে বিদেশী বস্ত্র ব্যবহারও বন্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। মহাত্মা গান্ধী মদ্যপান নিবারণ করিবার জন্যও বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। অপরাপর সংস্কার কার্য্যের মধ্যে মহাত্মা যে সকল বিষয়ের জন্য সদা সর্ব্বদা প্রচার করিয়া চলিতেন তাহার তালিকা অতি দীর্ঘ হইবে। কিন্তু কিছু কিছু উল্লেখ না করিলে তাঁহার বহু প্রসারিত প্রতিভা ও মাহাত্ম্যের পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হয় না।

তিনি বলিতেন মানুষের অভাব মূলতঃ দুরাকাঙ্খা জাত। মানুষ যদি আকাঙ্খা কামনা ও বাসনা দমন করিতে শেখে তাহা হইলে তাহার অভাব ক্রমশঃ আপনা হইতেই হ্রাস পাইতে থাকিবে। ইহা চাই, উহা চাই বলিয়া মানুষ অকারণে নিজের অভাব বৃদ্ধি করে। চাই চাই না করিয়া চাহিনা চাহিনা বলিতে শেখা প্রয়োজন। দ্রব্যের মূল্য বিচার চাহিদা দিয়া না করিয়া যদি দ্রব্যের যথার্থ অভাব দূরীকরণ ক্ষমতা দিয়া করা হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে অধিক ক্ষেত্রেই চাহিদা কাল্পনিক অভাবে জন্মলাভ করে ও বহু বস্তুরই কোন সত্যকার কোনও মূল্য নাই। মানুষের সত্যকার অভাব অল্পই ও নিজপরিশ্রমেই তাহার নিবৃত্তি সম্ভব।

মহাত্মা গান্ধী সর্ব্বমানবের শিক্ষার ব্যবস্থা অতি আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেন এবং সেই শিক্ষা কি প্রকার হইবে তাহা লইয়া বহু আলোচনা করিতেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় পরবর্ত্তীকালে কংগ্রেসের নেতাগণ জাতীয় শিক্ষার আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়া নিজেদের ইচ্ছামত জাতীয় অর্থের অপব্যয় করিয়া গিয়াছেন। স্ত্রীশিক্ষা, বাল্যবিবাহ নিবারণ, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সকল জাতির মন্দির প্রবেশ অধিকার, বিলাসিতাবর্জ্জন, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সুযোগ প্রাপ্তিতে সকল মানবের সমান অধিকার, ব্যক্তিগত জীবনে ভোগস্পৃহা দমন ও সংযমকে উচ্চতম স্থান দান প্রভৃতি বহু বিষয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রচারকার্য্য তিনি অবাধগতিতে আজীবন চালাইয়া গিয়াছিলেন। শ্রমিক ও কৃষকের ন্যায্য অধিকার লাভের বিষয়ে গান্ধী দ্ব্যর্থবর্জ্জিত ভাবে নিজমত প্রকাশ করিতেন। যন্ত্রব্যবহার তিনি অন্যায় মনে করিতেন না; কিন্তু যন্ত্রের নিকট মানুষ আত্মসমর্পণ করিয়া যন্ত্রের দাসত্ব করিবে ইহাও তিনি সত্য পথ বলিয়া মনে করিতেন না। বৃহৎ বৃহৎ সহর ও কারখানা গঠনের তিনি পক্ষপাতি ছিলেন না। গ্রামের সভ্যতা ও সহজ সরল জীবন যাত্রাই তাঁহার মতে আদর্শ পথ। কোথাও কোথাও বিশেষ কারণে ও উদ্দেশ্যে সহর ও কারখানা গঠিত হইয়া উঠিবে; কিন্তু চেষ্টা করিয়া কারখানার সংখ্যাবৃদ্ধি কিম্বা সহরগুলিকে বৃহত্তর করিবার আয়োজন নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার মতে অপেক্ষাকৃত নির্জ্জনতা ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশই সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধির সহায়তা করে।

জীবন যাপন পদ্ধতি ও তাহার বাস্তব অঙ্গে মহাত্মা গান্ধী সকালের সমান অধিকারে বিশ্বাস করিতেন। কেউ বেশী কেউ কম পাইবার অধিকারী একথা সত্য বলিয়া মনে করিতেন না। কিন্তু তাঁহার প্রগাঢ় আধ্যাত্মিকতা তাঁহাকে নিছক বস্তুবাদের অনেক উর্দ্ধে উঠাইয়া রাখিয়াছিল ও সেই কারণে তিনি নিরীশ্বরবাদী বস্তু-তান্ত্রিক গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বাহিরে ও তাহাদিগের একান্ত বিপরীত মনোজগতের মানুষ ছিলেন। বাস্তব সম্পদের ভাগবাটের উপর নির্ভরশীল অর্থ নৈতিক কোন সাম্যনীতির প্রচার তিনি করিতেন না। মূলধনের সাহায্যে যাহারা অপর মানবদের শোষণ করে মহাত্মা সেই সকল ধনিকদিগকে ঐপথ ছাড়িয়া দিতে বলিতেন, এবং শোষণ না করিয়া ঐশ্বর্য সৃষ্টি করিয়া ধনবান হইতে উপদেশ দিতেন। তিনি কোন মতবাদকেই ঘৃণা করিতেন না; কিন্তু দেখিতে চাহিতেন কার্যাক্ষেত্রে কোন মতবাদী কতটা জনসেবা ও মানবজাতির উন্নতির চেষ্টা করিতেছেন। শুধু কথায় মতাবাদের কোন দোষগুণ থাকেনা। কথার আড়ালে যে কাজ চলে তাহাই বিচারের বিষয়।

মহাত্মা গান্ধী নাম জপে বিশ্বাস করিতেন কিন্তু কোন অন্ধ সংস্কারের তাড়নায় নহে। তাঁহার মতে মনের পাপকে দমন করিতে হইলে রাম নাম জপ উৎকৃষ্ট উপায়। যাহাদের মনে পাপচিন্তা সদাজাগ্রত হইতে থাকে তাহারা যদি একাগ্রভাবে রাম নাম জপ করে তাহা হইলে সে সকল কুভাব ক্রমশঃ হাওয়ায় মিলাইয়া যায়। তিনি বহু সংস্কারের যাথার্থ্যে বিশ্বাস করিতেন না, কিন্তু যদি কেহ শ্রাদ্ধ করিয়া মনে শান্তি লাভ করে অথবা সাগর সঙ্গমে ডুব দিয়া মোক্ষের আভাসও বোধ করিতে পারে তাহা হইলে ঐ সংস্কার অনুসরণে লাভই হইবে। মহাত্মা গান্ধী ন্যায়, ধর্ম্ম, নীতি, তর্ক, বিচার, মতবাদ; সকল কিছুতেই সত্যের অনুসন্ধান করিতেন। পূর্ব্বে ছিল সুতরাং রাখিতে হইবে, অথবা অভিনব কিম্বা নূতন বলিয়াই গ্রাহ্য, এই জাতীয় কথার তাঁহার নিকটে কোন মূল্য ছিল না। তাঁহার জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল সত্য ও সত্যের উপলব্ধি। তিনি কখনও কথার জাল বুনিয়া তাহার মধ্যে জড়াইয়া পড়িতেন না। সকল কথা সকল মতের ভিতরের সত্যটিকে তিনি সুবিচারের সাহায্যে টানিয়া বাহির করিয়া আনিতেন; এবং সেই সত্যের ফলাফল দিয়া বিচার করিতেন তাহা অবলম্বনে কোথায় পৌঁছান সম্ভব হইবে অথবা হইবে না।

সত্যের অনুসন্ধানের দীর্ঘপথে তিনি একেলাই বাহির হইয়া ছিলেন। কখন কখন সঙ্গী পাইয়া ছিলেন কিছু দূর একত্রে গমনের। কিন্তু কাহাকেও ডাকিয়া না পাইলেও তাঁহার চলা বন্ধ হইত না। তিনি একেলাই চলিতে থাকিতেন। কবির গান,

> "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলরে
> ... ...
> যদি কেউ কথা না কয়, যদিসবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়
> তবে পরাণ খুলে' ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ॥
> ... ...
> যদি আলো না ধরে—···যদি ঝড় বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে,—
> তবে বজ্রানলে
> আপন বুকের পাঁজর জালিয়ে নিয়ে, একবার জলোরে—···

মহাত্মা গান্ধীর অতি প্রিয় সঙ্গীত ছিল। তিনি অসীমশক্তির অধিকারী ও অসংখ্য লোকের নেতৃত্ব লাভ করিয়াও কখন নিজের সত্যের পথ ছাড়িয়া সফল কামনার পথে চলিতে চাহেন নাই। তাই তিনি সেই নিঃসঙ্গ ও নির্জ্জন পথ অতিক্রম করিয়া আজ অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।

মাথাপিছু মাসিক পঁচিশ টাকা

জাতীয় ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি করিতে অক্ষম রাষ্ট্র-নেতাগণ ক্রমাগত এক চেষ্টাই করিয়া চলিয়াছেন: কেমন করিয়া অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থার লোকেদের অর্থ গ্রাস করিয়া আর্থিক সাম্যের সৃষ্টি হইতে পারে। এই কারণে

ভারতে যাহারা মাসিক ৪০০শত টাকা উপার্জন করে তাহাদিগকেও আয়কর দিতে হয়। উহা ব্যতীত তাহারা সকল দ্রব্য ক্রয় করিবার সময় সুদূর বিস্তৃত আবগারী শুল্কের জালে আটকাইয়া বস্তুমূল্যের শতকরা ২৫ টাকা সরকারী খাজনা দিতে বাধ্য হয়। এই সকল কারণে আমাদের দেশের মানুষ শিশুর দুগ্ধ কম করিয়া, ট্যাক্স দেয়। এবং যাহারা উৎকোচ ইত্যাদির ব্যবহার উত্তমরূপে বোঝে তাহারা মাসে সহস্র সহস্র টাকা উপায় করিয়াও কোন ট্যাক্স না দিয়া পার পাইয়া যায়। অনেকের মতে ভারতবর্ষে প্রায় ৭৫ লক্ষ ব্যক্তি মাসিক সহস্রাধিক টাকা আয় থাকা সত্ত্বেও কোন ট্যাক্স না দিয়া ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া থাকে। আমেরিকার মানুষ খুবই ঐশ্বর্য্যশালী কিন্তু তাহারা বাৎসরিক ২২৫০০ টাকা আয় না হইলে আয়কর দেয় না। অর্থাৎ আমেরিকায় যাহার মাসিক আয় ১৮৭৫ টাকা সে শুধু আয়কর দিবার প্রথম ধাপে পৌঁছায়। উচ্চতম হারে যে আয়কর দেয়, আমেরিকায় তাহার বাৎসরিক আয় ৩৭৫০০০ টাকা বা ততোধিক। উচ্চতম ধাপের ট্যাক্স শতকরা ৬৫ টাকা মাত্র। ভারতে কাহারও বাৎসরিক আয় যদি ৫০০০০ টাকা হয় তাহা হইলেই তাহার শেষ ধাপের আয়কর প্রায় শতকরা ঐ রকম দাঁড়ায়। কাহারও যদি একলক্ষ টাকার অধিক আয় হয় তাহাহইলে তাহার শীর্ষতম ট্যাক্সের হার শতকরা ৮০।৯০ টাকার কোঠায় পৌঁছায়। আমেরিকার মানুষ বৃদ্ধ বয়সে বার্দ্ধক্য-ভাতা পায়, বিনামূল্যে চিকিৎসা ও শিক্ষা লাভ করে, বৈধব্য-ভাতা, অসুস্থতা-ভাতা, বেকারী ভাতা, মাতৃত্ব-ভাতা, আরও কতকিছু পায়। আমরা শুধু খাজনা গুনিয়া নিঃস্ব হই এবং সোসিয়ালিজমের বক্তৃতা শুনি। সাধারণ শান্তিরক্ষাও আমাদের জন্য হয় না; চোর ডাকাতের হাত হইতে রক্ষাও আমরা পাই ই না। আমেরিকায় সরকারী খরচে ব্যক্তির সুখ সাচ্ছন্দ্যের জন্য যাহা করা হয় তাহা আমাদের পক্ষে না শোনাই ভালো। অল্পভাড়ায় উৎকৃষ্ট আবাসস্থল, অল্পমূল্যে ভেজালহীন খাদ্য বস্ত্র ও জল না মেশান দুধ; যে সকল বস্তু এদেশে তিনগুণ মূল্যেও কাহারও কপালে কখনও জুটিবে না। সর্ব্বাপেক্ষা বড় কথা হইল যে সে দেশে এবং আরও অনেক দেশে সকল দেশবাসীকে সমান দারিদ্র্যে ডুবাইয়া তাহাকে কেহ সমাজতন্ত্র নাম দেবার চেষ্টা করে না। সকলকে সমান অথবা কাছাকাছি ভাবে সম্পদশালী করাকেই তাহারা সামাজিক অর্থনীতির আদর্শ বলিয়া মনে করে। আমাদের দেশের গড়পড়তা মাথাপিছু মোট মসিক আয় প্রায় ২৫ টাকা। আমাদের অক্ষমতার প্রতীক সমাজতন্ত্র অর্থে বুঝিতে হইবে যে সকল ব্যক্তিকেই এই অল্প পরিমাণ অর্থে জীবন যাপন করিতে বাধ্য করা হইবে। কালো টেরিলিন পাতলুন ও সাদা হাওয়াই সার্ট পরা আর চলিবে না। গামছা পরিধানে লজ্জা নিবারণই বাধ্যতামূলক হইবে। পরিবার পিছু একখানা কাঁচাপাকা ঘর ও দশ পরিবারের একটি স্নানাগার। স্কুল কলেজ চলিবে না কারণ যখন সকলের জন্য যথেষ্ট স্কুল কলেজ বা পাঠ্য পুস্তক নাই তখন কাহারও জন্য তাহা রাখা চলিবে না। সকলকে যে খাদ্য, বস্ত্র, গৃহ, ঔষধ সিনেমার টিকিট প্রভৃতি দেওয়া যাইবে না তাহা কেহই পাইবে না। সুতরাং বাস, ট্রাম ট্যাক্সি প্রভৃতিও তুলিয়া দেওয়া প্রয়োজন হইবে। শিল্পকলা, কাব্য সাহিত্য ইত্যাদি চলা অসম্ভব হইবে। মানুষে সপ্তাহে একবার দাড়ি চাঁছিতে বা সাবান মাখিয়া স্নান করিতে পারিবে। সকলের জুতা থাকিবে না। চার ব্যক্তিকে এক জোড়া জুতা শেয়ারে পরিতে হইবে। ব্যক্তিগত সুখ সুবিধা কিছু থাকিবে না কারণ মাথা পিছু মাসিক ২৫ টাকাতে যাহা খাওয়া পরা সম্ভব তাহার অধিক কিছুই আসিবে কেমন করিয়া? দিনে ছয় ছটাক চাউল আটার মূল্য ও তাহার উপর ডাল, নুন, তেল, রন্ধনের কাঠ বা কয়লা, মাথার উপর চাল ও মেঝেতে মাদুর ইহাতেই মাথাপিছু ২০ টাকা পার হইয়া যাইবে। তারপর আছে ঔষধ, চা, গুড় বা চিনি, দুইচার ফোঁটা দুধ, তামাক দোক্তা পান; জন্ম, বিবাহ, মৃত্যুর আনুসঙ্গিক; যাতায়াতের খরচ। যে ভাবেই দেখাযায় কাহারও মাসিক খরচ ২৫ টাকায় মেটেনা। বর্ত্তমান সাম্যহীন সমাজে কতলোকের মাসিক আয়

হয়ত ১৫।২০ টাকাও আছে। তাহারা কি খায় ও কেমন করিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করে তাহা আমরা জানি না। যাহারা উচ্চস্তরে আছে শিক্ষা পায়. গায়ে জামা পায়ে জুতা পরে, আহারে বিহারে সখ মিটাইয়া চলিতে পারে তাহাদের মাথাপিছু মাসিক ব্যয় শতাধিক টাকা। অর্থাৎ মাথাপিছু আয় অন্তত যদি একশত টাকাও না হয় তাহা হইলে দেশের সভ্যতা লোপপাইয়া দেশবাসী বর্ব্বরতায় ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইবে মাথাপিছু বাৎসরিক বারশত টাকা; অর্থাৎ পারিবারিক আয় বাৎসরিক অন্তত ৪০০০।৫০০০ হাজার টাকা না হইলে সাম্যের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় রাষ্ট্র কোথায় যাইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না। এই টাকা উপার্জ্জন করিতে হইলে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি করিয়া বর্ত্তমানের বাৎসরিক ২০০০০ কোটি হইতে তাহা ৬০০০০ কোটিতে লইয়া যাইতে হইবে। ইহা কোন অসম্ভব প্রস্তাব নহে। একজন মানুষ যে কোন কার্য্য করিলে তাহার দৈনিক কমপক্ষে ৪।৫ টাকা পরিমান মূল্য সৃষ্টি করা উচিত। অনেক ব্যক্তি তাহা অপেক্ষা বহু অধিক মূল্য উৎপাদন করেন। ভারতে যদি ২৫ কোটি লোক অল্পবিস্তর উৎপাদন কার্য্য করিতে সক্ষম হয় ও তাহাদিগের গড়পড়তা দৈনিক উৎপাদন যদি ১০ টাকা প্রমাণ হয় তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম্মীর মিলিত উৎপাদন দৈনিক ২৫০ কোটি টাকা হয়। বৎসরে ৩০০ শত দিবস কাজ করিলে ঐ উৎপাদনের ফলে জাতীয় বার্ষিক মোট উৎপাদন ৭৫০০০ কোটি টাকা হওয়া উচিত। ভারতের বর্ত্তমানের দারিদ্র্যের কারণ উৎপাদন কার্য্য না করা ও না করিতে পারা। ভোগে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য উল্লাম্ফন না করিয়া যদি সকল কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে কাজ দিয়া, কর্ম্মে ও উৎপাদনে সাম্যপ্রতিষ্ঠা করা হয় তাহা হইলে দারিদ্র্য শীঘ্রই দূর হইবে। নিষ্কর্ম্মাতন্ত্রের নিষ্কর্ম্মা শ্রেষ্ঠ বিকল কল্পনা প্রবণ ব্যক্তিদের প্রভুত্বে জাতি ক্রমশঃ অধঃপাতে যাইতেছে। এখনও চেষ্টা করিলে উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক মানুষকে উৎপাদনে নিযুক্ত করা সম্ভব হইতে পারে। ইহা ব্যতীত দারিদ্র্য দূর করিবার অন্য উপায় নাই। যাহারা উৎপাদনে লাগিয়া আছে ও বেকারদিগের তুলনায় অধিক উপার্জ্জন করিতেছে, তাহাদের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ যদি সাম্যের নামে ছিনাইয়া লওয়া হয়, উপার্জ্জন তাহা হইলে ক্রমশঃ বন্ধ হইয়া গিয়া দেশ রসাতলে যাইবে। পরিশ্রম করিলে সুখ স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধি হইবে জানিলে মানুষ পরিশ্রম করিয়া অধিক উৎপাদনে মনোনিবেশ করিবে। যে যাহাই করুক তাহার ভোগের ব্যবস্থা অন্য সকলের সহিত সমানই হইবে জানিলে মানুষ কাজ না করিয়া অথবা যথাসম্ভব কম করিয়া যাহা পাইবে তাহাই লইয়া আরাম করিবার চেষ্টা করিবে। সকল মানুষ সমান উৎপাদনক্ষম নহে। পরিমাণেও উৎকৃষ্টতায় বিভিন্ন ব্যক্তির উৎপাদিত বস্তুনিচয় সর্ব্বদাই ভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে। যে সকল অবাস্তব জাতীয় উপভোগ্য উৎপাদন করিয়া ক্রয় বিক্রয় করা হয়; যথা শিক্ষা দেওয়া, গান শুনান, অভিনয়, নৃত্য প্রভৃতি; তাহারও উৎকৃষ্টতার বিভেদের জন্য মূল্যের উচ্চতা ও লাঘব সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। বাস্তবের ক্ষেত্রে চিত্রে, বয়নে, কারুশিল্পে এমন কি কলম করিয়া বৃক্ষ রোপনে অথবা অপরাপর কার্যেও সর্ব্বদাই আকারে প্রকারে ইতরবিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। সাম্য কোথাওই প্রায় দেখা যায় না। সুতরাং গলার বা গায়ের জোরে যাহা নাই তাহা থাকিতেই হইবে বলিয়া সকল মানুষকে এক ছাঁচে ঢালিতে যাওয়া মূর্খতার লক্ষণ, ইহাতে ফল কখন মঙ্গলপ্রসূ হইবে না তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। যাহারা পারেন না তাঁহাদিগকে জোর করিয়া নিকৃষ্ট গায়কের গান শুনাইয়া, নিকৃষ্ট পাচকের রন্ধন খাওয়াইয়া, নির্ব্বোধ চিকিৎসকের দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া ও অকর্ম্মালোকের উৎপাদিত দ্রব্য উচ্চমূল্যে ক্রয় করিতে বাধ্য করিয়া সহজেই শিখান যাইবে যে সাম্যের আদর্শের প্রকৃত অর্থ কি? প্রকৃত অর্থ হইল সকল মানুষকে সমানভাবে শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতির ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া ও নানা ক্ষেত্রে উন্নতি লাভের সমান সুযোগ সকলে যাহাতে পায় সেইরূপ আয়োজন করা। স্বভাবতঃ যাহা অসমান তাহাকে জোর করিয়া সমান করিবার চেষ্টার কোন সামাজিক মূল্য থাকিতে পারে না।

গুজরাটে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

আহমেদাবাদে কোন এক স্থানে মুসলমানগণ, সাধুসন্ন্যাসীগণ ও একপাল গরুর একত্র সমাবেশ হয়। এইরূপ পরিস্থিতিতে উক্ত তিন শ্রেণীর প্রাণীদিগের মধ্যেই পরস্পরবিরোধের সম্ভাবনা থাকে। ঐ স্থলেও সাধুসন্ন্যাসী ও গরুর, বিরোধ মুসলমান ও মুসলমানদিগের গরু ও সাধুসন্ন্যাসী বিরোধের ফলে একটা দাঙ্গার সূত্রপাত হয়। ইহার পরে আহমেদাবাদে যেখানে যে যাহাকে ইচ্ছা অস্ত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করে এবং ফলে হতাহতের সংখ্যা ক্রমে হাজারে হিসাব হইতে থাকে। দিল্লীর রাষ্ট্রনেতাগণ মহাত্মা গান্ধীর জন্ম শতবার্ষিকীতে এইরূপ হত্যাকাণ্ড মহাত্মারই স্বদেশে (গুজরাটে) ঘটিতে দেখিয়া দেশবাসীর আদর্শবাদ সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া বক্তৃতামঞ্চের বহুব্যবহৃত স্তোকবাক্য উচ্চারণ করিয়া শান্তি স্থাপন চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেন। কারফিউ, ১৪৪ ধারা, কাঁদুনে বাষ্প, মধ্যে মধ্যে গুলি চালনা, কোন কিছুতেই এই তাণ্ডবের উপশম হইল না। মানুষ যখন হিংস্রতার আশ্রয়ে গিয়া নিজের মনুষ্যত্ব ভুলিয়া যায় তাহাকে তখন নীতি ও সুসভ্যতার পথে ফিরাইয়া আনা একান্তই অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়। ভারতের মানুষ শান্তিপ্রিয় এবং সহজে উত্তেজিত হইয়া নরহত্যায় আত্মনিয়োগ করিতে চায় না। কিন্তু ভারতে বহু-জাতি ও সম্প্রদায় থাকাতে এবং সেই সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এক মহাজাতীয়তা সৃষ্টি না করার ফলে ভারতের মানুষ এখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। নানা প্রদেশের কৃষ্টি ও ভাষাভিত্তিক পার্থক্যগুলিকে প্রবলতর করিয়া তোলার ফলে জাতীয়তা আরও ঢিলা হইয়া পড়িয়াছে। তাহা ছাড়া রহিয়াছে মালিক-শ্রমিক, ছাত্র-শিক্ষক, সরকারী-বেসরকারী এবং রাষ্ট্রীয় দলগত পার্থক্যের বিরাট স্তূপ। অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের পরে যত প্রকারে সম্ভব এই মহাজাতিকে সবলে খণ্ডখণ্ড করিয়া অনৈক্যের গহ্বরে নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। হিন্দু-মুসলমান কলহ ইহার মধ্যে একটি। ইহার নিবৃত্তি কিছু অসম্ভব নহে। হিন্দুকে মারিয়া মুসলমানের অথবা মুসলমানকে মারিয়া হিন্দুর কোন বিশেষ আর্থিক লাভের সম্ভাবনা থাকে না। সুতরাং ঐ কলহের স্বভাবজাত কোন প্রবল প্রেরণা নাই। ভারতে অন্য অনেক বিদ্বেষ আছে যাহা সহজেই জ্বলিয়া উঠিয়া দাবানলে পরিণত হয়। জমি দখল দেশ দখল টাকা ও অন্য সম্পদ কাড়িয়া লওয়ার আগ্রহ ধর্মবিরোধের আগ্রহের তুলনায় প্রবলতর। সেইজন্য মনে হয় ধর্ম লইয়া দাঙ্গা এত প্রবল হইতে পারে না যদি না তাহার ভিতরে কোথাও টাকার কথা লুকান থাকে। আহমেদাবাদে যে রক্তপাত হইল তাহার মূলে কেহ কোথাও টাকা ঢালিয়াছে কিনা তাহা খোঁজ করিয়া দেখা আবশ্যক। হিন্দুদিগের মুসলমান কারিগর লাগাইয়া কাজ করাইয়া লাভ হয়। তাহারা শুধু শুধু মুসলমানদিগকে মারিবার জন্য অগ্রসর হইবে কেন? মুসলমানগণও হিন্দুর সাহায্যে অর্থোপার্জন করে ও জীবন যাপনে সক্ষম হয়। তাহারাই বা হিন্দুকে মারিতে যাইবে কেন? তাহা হইলে আগুনে ঘৃত কে ঢালিয়াছে যাহার ফলে সামান্য স্ফুলিঙ্গ দাবানল পরিণত হইয়াছে? আমাদের মনে হয় এই ব্যাপারের মূলে আছে কোন আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। এখন একটা বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে যাহাতে জগতের সকল মুসলমান-প্রধান দেশগুলি মিলিত হইয়া এক ইসলামীয় জাতি সংঘ গঠন করিতে পারে। এই প্যান-ইসলাম পরিকল্পনা বহুকাল কেহ নাড়াচাড়া করে নাই। এখন ইসরায়েলের সহিত আরবদিগের যুদ্ধের ফলে ইহা আবার জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভারত যদি মুসলমান জাতি মহলে প্রভাবশালী হইয়া বসে তাহা হইলে ইহাতে বাধা পড়ে। তাই ভারতকে মুসলমান বিদ্বেষের কেন্দ্র বলিয়া সাব্যস্ত করিতে পারিলে প্যান-ইসলামবাদী জাতিগুলির সুবিধা। আহমেদাবাদে দাঙ্গা হওয়ায় ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার সহজ ও প্রবল হইয়াছে। সুতরাং যদি এই অপকর্মে কেহ অর্থ ঢালিয়া থাকে তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু থাকে না।

ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন

রাবাতে ইসলামী "শীর্ষ সম্মেলন" হইবে শুনিয়া ভারতের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নিয়ন্ত্রক মন্ত্রীর মনে হয় যে ভারতের মুসলমানদিগের সংখ্যা যখন কয়েক কোটি তখন ভারত সরকারেরও ঐ "শীর্ষ সম্মেলনে" যোগদান করা আবশ্যক। কারণ তাহা না করিলে ভারতীয় মুসলমানদিগের ইসলামী প্রতিভা অব্যবহৃত থাকিয়া যাইবে এবং জগতের মুসলমানগণ সেই প্রতিভা ও প্রেরণার আস্বাদ লাভ না করিয়া একটা "কুদরতি" ঐশ্বরিক উপলব্ধি হইতে বঞ্চিত হইবে। সুতরাং প্রাণপন চেষ্টা চলিতে লাগিল যাহাতে ভারত নিমন্ত্রিত হয় ঐ রাবাতের সম্মেলনে। এবং চেষ্টা সফল হইল ও ভারতকে নিমন্ত্রণ করা হইল। ভারত সরকার মন্ত্রী ফখরুদ্দিন আলি আহমেদকে নিমন্ত্রিত ভারত সরকারী দলের নেতা হইয়া রাবাত প্রেরণ করিলেন। তাঁহার কোন সময়েই কুটনৈতিক জ্ঞানের জন্য খ্যাতি ছিল না। তিনি ও দিনেশ সিংহ কেহই দেখিলেন না যে রাবাত "শীর্ষ সম্মেলন" শুধু যে সকল দেশ মুসলমান প্রধান বা অন্তত যে দেশের এক তৃতীয়াংশ লোক মুসলমান শুধু সেই দেশগুলিই সম্মেলনে সমাগত হইবে। ভারত মুসলমান প্রধান দেশও নয় এবং ভারতের একের তিন অংশ লোকের অর্ধেকও মুসলমান নহে। ভারতের রাবাতে যাওয়ার কোন কারণ ছিল না। সুতরাং নিমন্ত্রিত হইবার পরে পাকিস্তান ভারতের রাবাত সম্মেলনে অংশ গ্রহণে আপত্তি জানায় ও বলে যে ভারত রাবাত সম্মেলনে আসিলে পাকিস্তান সম্মেলন পরিত্যাগ করিবে। তখন অন্য মুসলমান জাতিরা ভারতকে সম্মেলনে না আসিতে বলে। ভারত এই অপমান ভোগ করিয়া রাবাত হইতে চলিয়া আসে এবং বিশ্ববাসী ভারতের অবস্থা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া হাস্য করিতে থাকে। এই ব্যাপারে ভারতের কি লাভ লোকসান হইল তাহা বিচার না করিয়া বলা যায় যে ভারতের রাষ্ট্রীয় দপ্তরে যে সকল ব্যক্তি আজকাল উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়া থাকেন তাঁহারা প্রথমত বুদ্ধিমান নহেন, দ্বিতীয়ত কূটনীতিজ্ঞ নহেন, তৃতীয়ত তাঁহারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন ও দেশের সম্মান রক্ষায় অসমর্থ। এই সকল লোককে উঠাইয়া উচ্চপদে বসাইলেই তাঁহারা মহাপুরুষ হইয়া যান না। প্রধান মন্ত্রীর উচিত এই সকল ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রী সভা হইতে বরখাস্ত করা।

চীন ও রুশের কলহ লাঘব

কিছুদিন পূর্ব্বে চীন ও রুশের মধ্যে বিবাদ ক্রমাগত বাড়িয়া চলিতেছিল। সুদূর মঙ্গোলীয়ায় কিম্বা এশিয়ার অপরপ্রান্তে সিংকিয়াংএ রুশীয় সৈন্যগণ চীনের সেনাদিগের উপর আক্রমণ আরম্ভ করে শুনা যায়। পরে আত্মরক্ষার্থে চীনা সৈন্যগণও প্রত্যাক্রমন করে। উভয় পক্ষের অভিযোগের সারার্থ পরস্পরকে দোষ দেওয়া। চীনা বলিতেছে রুশের দোষেই যত গোলযোগের সৃষ্টি এবং রুশ বলে চীনেরই সব দোষ। তাহারাই সর্ব্বাগ্রে রুশরাজত্বে প্রবেশ করিয়া জমি দখল করিবার জন্য রুশরক্ষক সেনাদিগকে আক্রমণ করে ও পরে রুশ-সৈন্যগণ শুধু আত্মরক্ষার্থেই তাহাদের প্রত্যাক্রমণ করিয়া বিতাড়িত করে। জাতিগত অভ্যাসের দিক দিয়া দেখিলে মনে হয় যে চীনাদিগের চিরপুরাতন ও ঐতিহ্যভারাক্রান্ত দোষ হইল অপর দেশের উপর নিজেদের জোর করিয়া প্রভুত্ব স্থাপন চেষ্টা করা। সাম্রাজ্যবাদ যখন মানবীয় অপরাধ বলিয়া প্রচারিত হইত না সেই শত শত বৎসর পূর্ব্বের হান, টাং বা মিং যুগেও চীনাগণ এশিয়ার প্রায় সকল দেশকেই চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া দাবি করিত ও মধ্যে মধ্যে সৈন্য পাঠাইয়া প্রভুত্বের বাহ্য অভিব্যক্তি করিত। সবলে বিতাড়িত হইলে কোন বাড়াবাড়ি না করিয়া অপর সুযোগের অপেক্ষায় বসিয়া থাকিত। চীন সম্রাটগণ অনেক সময় তাঁহাদিগের তথাকথিত সাম্রাজ্যের করদ রাজাদিগকে উপঢৌকন পাঠাইতেন ও তাহা গ্রহণ করিলে, চীনা দূতগণ স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া প্রচার করিত যে তাহাদিগকে সম্রাটের দত্ত বলিয়া রাজারা মান

সম্বন্ধ দেখান হইয়াছে। পরে যদি উক্ত রাজাগণ চীন সম্রাটকে কোন উপঢৌকন পাঠাইতেন তাহাতে প্রচার হইত যে ঐ সকল বস্তু সম্রাটের বশ্যতা স্বীকারের প্রমাণ। এই ভাবে চীনাগণ মনে মনে মঙ্গোলীয়া, জাপান, মলয়, ব্রহ্ম, শ্যাম, আনাম, টংকিং, সুমাত্রা, জাভা, উত্তর পশ্চিম এশিয়ার বহুদেশ ও ভারতের হিমালয়ের পার্ব্বত্য সকল অংশই তাহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া রাখিত। এই অভ্যাস, সুন য়ৎ সেন, চাঙ্গকাই সেক বা মাওৎসেতুঙ্গের মানবীয় স্বাধীনতার চরম উন্নতির যুগেও সমান তেজে চলিতে থাকে। চীন যখনই শক্তি বৃদ্ধি করিয়া অপর দেশ দখল করিতে সক্ষম হইয়াছে তখনই সেই কার্য ন্যায় অন্যায় ভুলিয়া নির্লজ্জভাবে করিয়াছে। চীনের তিব্বত ধর্ষণ ইহার অতি বিরাট প্রমাণ। এবং চীন পাকিস্তানের সহিত ষড়যন্ত্রে ভারতেরও বহু অংশ গ্রাস করিয়া বসিয়া আছে। এই কারণে রুশ যদিও পররাজ্য গ্রাস করিতে অপারগ নহে, তাহা হইলেও মনে হয় রুশের অপেক্ষা চীনের পক্ষেই এই কার্য অধিক সম্ভব।

সম্প্রতি যে মনোমালিন্য আরম্ভ হইয়াছিল এখন তাহা কিছুটা কম বলিয়া মনে হইতেছে। পিকিং এখন ততটা রুশের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ প্রচার করিতেছে না। ইহার কারণ কি তাহা বলা কঠিন। হয়ত ভিতরে ভিতরে মিলন হইয়া গিয়াছে। হয়ত বা নতুন পথে আক্রমণ চালান হইবে বলিয়া পুরাতন পথ এখনকার মত ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যাহাই হউক শান্তি থাকিলেই পৃথিবীর পক্ষে মঙ্গল। কারণ আমেরিকা, বৃটেন, রুশিয়া প্রভৃতি সকল দেশেরই আকাঙ্খা যেন এইবার বিশ্ব মহাযুদ্ধটা উত্তর পশ্চিম এশিয়াতে অনুষ্ঠিত হয়। রুশ ও চীনের সৌহার্দ্য অটুট থাকিলে ইহা সহজে হইবে না। কিন্তু রুশ ও চীন যদি ঐ অঞ্চলে শান্তিভঙ্গ করে তাহা হইলে অপরাপর জাতিগুলি সহজেই যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িবে। ইসরায়েল মিশর কতোয়া জারি হইয়াই রহিয়াছে। উহার সহিত কিছু কিছু অন্যান্য আন্দোলন বিক্ষোভ ও বিপ্লব জুড়িয়া দিলেই বিষয়টা আকারে বড় হইয়া দেখা দিবে। তারপর ভারত পাকিস্তান ত আছেই।

রাষ্ট্রীয় দলের খোরাক

মানুষের যেমন খোরাক না হইলে চলে না, কোন ব্যক্তিগোষ্ঠীরও সেইরূপ খোরাক জোগাড়ের প্রয়োজন হয়। যাঁহারা মহাত্মা গান্ধীর যুগে অল্পেই সন্তুষ্ট থাকিতেন তাঁহাদিগের আর্থিক প্রয়োজন সহজেই মিটান যাইত এবং মহাত্মার ভক্তদিগের দেওয়া অর্থে সেকাজ হইয়া যাইত। পণ্ডিত জহরলালের রাজত্বে রাষ্ট্রীয় দলের খরচ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলে এবং আয়ও নানাভাবে ক্রমবর্দ্ধন-শীল হইতে থাকে। সুতরাং সর্ব্বত্র কংগ্রেসের যে দলগঠন ও প্রচার কার্য্য চালান হইত তাহার ব্যয় প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় নেতাগণ সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতেন। সেই কার্য্য ভাল করিয়াই হইত শুধু কোন কোন প্রদেশে সম্প্রতি কংগ্রেস পরাজিত হওয়াতে সেই সকল স্থানের কংগ্রেসী আমদানী কিছু কিছু কমিয়া গিয়াছিল। কংগ্রেসের পরাজয় কিন্তু অর্থাভাবের জন্য হয় নাই; হইয়াছিল রাজশক্তির অপব্যবহারের জন্য। এখন যে পরিস্থিতি হইয়াছে তাহাতে কংগ্রেসের রাষ্ট্রীয় প্রচার ও সংগঠনে একটা নূতন বাধা আসিয়া পড়িয়াছে। ইহা হইল মোরারজি দেশাইএর সমর্থক ও শ্রীমতী ইন্দিরার সমর্থকদিগের বিবাদ। এখন বহু অর্থ ও কর্মী শ্রীমতী ইন্দিরাকে ছাড়িয়া মোরারজির দিকে চলিয়া গিয়াছে এবং সেই কারণে ইন্দিরার কর্ম্ম প্রচেষ্টাকে নবকলেবর দান করিবার আবশ্যক হইয়াছে এই নব অভিযান চালাইতে হইলে বহুস্থলে নূতন নূতন ব্যক্তিকে বসাইবার প্রয়োজন হইবে। তাহাদের কি উপায়ে নিজ নিজ কেন্দ্রে থাকিয়া প্রচার ও সংগঠণ কার্য্য চালাইতে সাহায্য করা হইবে তাহা একটা কঠিণ সমস্যা। ভারতবর্ষে এখন বহু রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়াছে এবং সকল দলের কর্মীদিগের খোরাক সংগ্রহ প্রায় ভারতের দেশরক্ষার (ডিফেন্স) খরচের মতই একটা বহুঅর্থ

(গল্প)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

রেবতীবাবু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বরদা সান্যাল কোন দিন এ ঘরে ঢোকেন না। আজ চার বছরের ওপর রেবতীবাবু এ বাড়ীতে গৃহশিক্ষকতা করছেন, তিনি কোনদিন বরদা সান্যালকে ছেলের পড়ার ঘরে ঢুকতে দেখেন নি।

যেতে আসতে অবশ্য দেখেছেন।

বিরাট বাইশ হাজারী বুইক থেকে বরদাবাবু নামছেন, কিংবা উঠছেন গাড়ীতে। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে ওঠবার সময় হাওয়ায় সরে যাওয়া পর্দার ফাঁকে মক্কেলপরিবৃত বরদাবাবুকে দেখেছেন।

মাসান্তে পড়ানোর টাকাটা ছেলেই দেয়।

তাঁর সঙ্গে বরদা সান্যালের রোজ দেখার কথাবার্তা, এমন অহেতুক আশা রেবতীবাবু করেন না। তিনি জানেন তাঁদের দুজনের মধ্যে দুস্তর সাগরের ব্যবধান।

দেড়শো টাকা মাইনের হপকিন্স কোম্পানীর লেজার কীপার আর শহরের বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের সঙ্গে যোগাযোগ সম্ভব নয়।

কিন্তু আজ পড়ার টেবিলে বসামাত্র ছাত্র ঘোষণা করল।

মাষ্টারমশাই আজ বাবা কথা বলবে আপনার সঙ্গে।

আমার সঙ্গে?

রেবতীবাবু বুঝতে পারলেন তাঁর কণ্ঠস্বর আর্তনাদের রূপ নিল।

দ্রুত একবার চিন্তা করে নিলেন। ইতিমধ্যে পড়ানোর ব্যাপারে কোনরকম অবহেলা করেছেন কিনা।

যখন মনে করতে পারলেন না, তখন ছাত্রের শরণ নিলেন।

কি ব্যাপার বল তো দীপু? তোমার বাবা দেখা করবেন কেন?

ব্যারিষ্টারের ছেলে দীপু আইনজ্ঞ না হলেও কথার মারপ্যাঁচে যথেষ্ট পারদর্শী।

সে বলল, কি জানি। আমাকে কিছু বলে নি।

একটা কারণ রেবতীবাবু আন্দাজ করলেন।

গত বছর পরীক্ষায় দীপু পাশ করতে পারে নি, স্কুল ফাইনালে। এ বছর পরীক্ষা এসে গেল, তাই হয়তো ছেলে কেমন পড়াশোনা করছে সেই বিষয়েই খোঁজ নেবেন।

কারণ যাই হোক, রেবতীবাবু সেদিন পড়াশোনায় বিশেষ মনঃসংযোগ করতে পারলেন না। একটু শব্দ হতেই চমকে উঠে দরজার দিকে চোখ ফেরালেন।

বরদা সান্যাল এলেন প্রায় নটা নাগাদ।

এই সময়ে রেবতীবাবু উঠে পড়েন, কিন্তু সেদিন আর উঠতে পারলেন না।

বরদাবাবু কখন আসেন ঠিক নেই।

সিঁড়িতে ভারি জুতার শব্দ হতেই দীপু বলল, ওই বাবা আসছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে রেবতীবাবুর মেরুদণ্ড বেয়ে শীতল একটা শিহরণ। হাত পা ঘর্মাক্ত হতে সুরু করল।

বরদা সান্যাল ঢুকলেন। পরনে গরদের পাঞ্জাবি আর পাজামা। দশ আঙুলে গোটাসাতেক আংটি। এক একটি গ্রহকে তুষ্ট করার জন্য। মোটা ফ্রেমের চশমা। তপ্তকাঞ্চন বর্ণ।

সওয়ালের চোটে সাক্ষীরা নাম ধাম ভুলে যায়।

বসুন, মাস্টার মশাই, বসুন।

বরদাবাবু অভয় দেবার ভঙ্গীতে হাত নাড়লেন।

তারপর দীপুর দিকে চেয়ে বললেন, যাও।

দীপু অন্তর্হিত হতে তার চেয়ারটা টেনে নিয়ে যখন বসলেন, তখনও রেবতীবাবু দাঁড়িয়ে। দুটো হাত টেবিলের ওপর। শরীর এত কাঁপছে যে ভর দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

কি হল, বসুন।

সঙ্গে সঙ্গে রেবতীবাবু সশব্দে চেয়ারের ওপর বসে পড়লেন।

তারপর, দীপুর পড়াশোনা কেমন হচ্ছে?

প্রথমে রেবতীবাবু কথা বলতে পারলেন না। অনেক দিনের জমে থাকা সর্দি কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ করে ছিল। তারপর প্রাণপণ চেষ্টায় শুধু বললেন, বলতে পারলেন।

আমার সাবজেক্টগুলো মন্দ তৈরী হয় নি।

বরদাবাবু স্বীকার করলেন।

বাংলা আর ইতিহাসে দীপু তো গত বছরও পাশ-মার্কা পেয়েছিল। মুস্কিল হচ্ছে ওর ইংরাজী আর অঙ্ক। এবার তো ওদুটো সাবজেক্টের জন্যই নতুন টিচার রেখেছি। কিন্তু আপনার সঙ্গে একটু দরকারি কথা আছে।

কয়েকটা কথা বলে রেবতীবাবু একটু সহজ হচ্ছিলেন। কিন্তু ভয়ের ছায়া আবার তাঁর চারপাশে পক্ষবিস্তার করল। বুকের স্পন্দন দ্রুততর, শরীরে আবার ঘামের প্যাচপেচে ভাব।

বলুন।

উটপাখীর মতন রেবতীবাবু গলাটা বাড়িয়ে দিলেন।

আপনার এক আত্মীয় আছেন না ইউনিভার্সিটিতে প্রফেসর?

ইংরাজীতে।

রেবতীবাবু একটু বিস্মিত হলেন। ক্ষণেকের জন্য, তারপরই মনে পড়ে গেল, কথাটা তিনিই একদিন ছাত্রকে বলেছিলেন।

আজ্ঞে হাঁ। আমার ভায়রাভাইয়ের ছেলে পরাশর। পরাশর সেন।

এবার বরদাবাবু ঝুঁকে পড়লেন রেবতীবাবুর দিকে।

তাহলে একবার দেখুন না।

রেবতীবাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না। বরদাসান্যালের একটি মেয়ে আছে এবং সে মেয়ে বিবাহযোগ্যা এটুকু খবর তিনি রাখতেন। কিন্তু বরদাবাবু ব্রাহ্মণ কাজেই পাত্র হিসাবে নিশ্চয় তিনি পরাশরের কথা বলবেন না। বলতে পারেন না।

অবশেষে রেবতীবাবুকে বলতেই হল।

কি দেখব বলুন তো?

খুব একটা গোপন কথা বলছেন, এইভাবে ফিস ফিস করে বরদাবাবু বললেন।

ওই ইংরাজী কোয়েশ্চেন পেপারের ব্যাপার।

কোয়েশ্চেন পেপার!

হ্যাঁ, ওরা ইচ্ছা করলেই জানতে পারেন। অবশ্য আমি বিনামূল্যে খবর সংগ্রহ করতে বলছি না। এক হাজার টাকা আমি খরচ করব।

প্রথমে অন্ধকারের প্রলেপ, তারপর ধীরে ধীরে বরদাসান্যালের মুখটা একটা কিম্ভূতকিমাকার লোভী হায়নার মুখে রূপান্তরিত হল। জ্বল জ্বল করছে দুটি চোখ। লোলিহান রসনা।

বিবেকবান বলে রেবতীবাবুর খ্যাতি আছে। অফিসে, অফিসের বাইরে। কোন রকম মালিন্য, অসততা তাঁর ঋজু পথকে কোনদিন কলঙ্কিত করে নি।

বরদাবাবু বললেন, দীপুর অঙ্কের মাষ্টারকেও বলেছি অঙ্কের কোয়েশ্চেন যোগাড় করতে। ভদ্রলোক করিতকর্ম্মা লোক, ঠিক আনতে পারবেন। মানে, আসল কথাটা কি জানেন। ছেলেটা কোন রকমে মেট্রিকের বেড়াটা পার হতে পারলেই ওকে বাইরে পাঠিয়ে দেব। কাজেই বুঝতেই তো পারছেন।

খুব যে বুঝতে পেরেছেন রেবতীবাবুর মুখের ভাব দেখে তা মনে হল না।

তিনি মনে মনে হিসাব করে চলেছেন।

অফিসে মাইনে দেড়শো। আর বরদাবাবুর কল্যাণে পুরো একশো। রোজগার সব মিলিয়ে আড়াইশো। সংসারে উপার্জনের হাত এই একজনের। কিন্তু খাবার মুখ অনেক। দুই মেয়ে দুই ছেলে। চিররুগ্না স্ত্রী। তার ওপর অকালে পরলোকগত ছোট ভাইয়ের একটি ছেলেও তার সংসারে। ভাইয়ের স্ত্রীও ছিল, বছর কয়েক আগে মারা গেছে।

কুড়িয়ে বাড়িয়ে যে টাকা কটা বাড়ী নিয়ে যান, তার পরমায়ু দিন পনেরো। বাকি পনেরো দিন সহকর্মীদের কাছে হাত পাততে হয়।

কিন্তু হাত পাতা যতটা সোজা, ইচ্ছার পূরণ হওয়া ততটা শক্ত। সহকর্মীদের সকলের অবস্থাই রেবতীবাবুর মতন।

কাজেই রেবতীবাবুকে দরওয়ানদের কাছে গিয়েও দাঁড়াতে হয়। প্রয়োজনে কাবলীওয়ালার সান্নিধ্যে।

শিক্ষকতার চাকরিও তাঁর পাবার কথা নয়। গৃহ-শিক্ষকতা। সবাই আজকাল স্কুলের শিক্ষক কিংবা কলেজের অধ্যাপক খোঁজে। কারণ শিক্ষাদানের পদ্ধতির সঙ্গে তারা নাকি পরিচিত।

বরদাবাবুর বাড়ীতে তিনি অনেকদিন আছেন বলেই এ প্রশ্ন ওঠে নি।

কিন্তু মনে হচ্ছে এ চাকরির সুতোও এবার আলগা হয়ে আসছে।

রেবতীবাবু উঠে দাঁড়ালেন।

বরদাবাবুও উঠলেন।

তাহলে আমাকে জানাবেন কি করতে পারলেন, নয়তো আমাকে আবার অন্য ব্যবস্থা করতে হবে।

অন্য ব্যবস্থা! অন্য ব্যবস্থার স্বরূপ সম্বন্ধে রেবতীবাবুর কোন সন্দেহ রইল না।

একদিন বরদাবাবুই হাতে মাইনের টাকাটা ধরিয়ে দিয়ে বলবেন।

কাল থেকে আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না রেবতীবাবু। দীপুর জন্য আমি অন্য মাষ্টার রাখব।

রেবতীবাবুর সংসার থেকে একশোটা টাকা কমে যাওয়া যে কতখানি তা বরদাবাবুর পক্ষে বোঝা হয়তো সম্ভব নয়।

আর একটা বাড়তি চাকরি যোগাড় করাও অসম্ভবের সগোত্র।

বাড়ীর দরজাতেই বড় মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

সে বোধ হয় বাপেরই প্রতীক্ষা করছিল।

মেয়ে বলল।

বাবা, আজ তোমার এত দেরী?

ছাতা আর টিফিনের বাক্সটা মেয়ের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললেন; পড়াতে পড়াতে একটু দেরী হয়ে গেল মা।

তারপর কোঁচার খুঁটে নিজের কপালের ঘাম মুছে প্রশ্ন করলেন।

তোর মা কেমন আছে?

একই রকম।

রোজই রেবতীবাবু এই প্রশ্ন করেন, আর একই উত্তর পান।

মানুষের শরীর নদীর মতন। তারও জোয়ার ভাঁটা আছে। সপদ বিপদ, কিন্তু রেবতীবাবুর স্ত্রী তার ব্যতিক্রম।

পেল টি বি। এর আর কম বেশী নেই। অনেক আগে কিছুদিন হাসপাতালে রেখেছিলেন, বিশেষ উপকার পান নি।

হাড়ের মধ্যে অদৃশ্য বীজানুরা কাজ করে চলেছে, ধ্বংসের কাজ। সবার অলক্ষ্যে।

একদিন মানুষটাকে নিঃশেষ করে ফেলবে।

রেবতীবাবু ভাবেন।

শুধু রেবতীবাবুর স্ত্রীর শরীরেই নয়, তাঁর সংসারেও অলক্ষ্যে এক বীজানু ধীরে ধীরে পঙ্গু করে তুলছে সব কিছু। দারিদ্র্যের বীজানু।

সংসারের এই সাজানো কাঠামোটাও একদিন ধুলিসাৎ হয়ে যাবে।

সেরাতে বিছানায় শুয়ে রেবতীবাবু ঘুমাতে পারলেন না।

চিন্তা তার নিত্য সঙ্গী, কিন্তু এ এক নতুন ধরনের চিন্তা।

কি করে তিনি পরাশরের কাছে গিয়ে বলবেন ইংরাজী প্রশ্নপত্রের কথা!

এমনও হতে পারে পরাশর এ বিষয়ে কিছু জানে না। প্রশ্নপত্র তারও নাগালের বাইরে। কিন্তু এমন একটা কৈফিয়তে বরদাবাবু সন্তুষ্ট হবেন না।

বরদাবাবু হাজার টাকা খরচ করবেন, দরকার হলে আরো হয়ত বেশী। প্রশ্নপত্র তাঁর চাই।

হাজার টাকা অনেক টাকা, বিশেষ করে অনটনের গ্রন্থি বাঁধা এই সংসারের কাছে।

রেবতীবাবুকে কে বলেছিল, মাদ্রাজের কাছে এক স্বাস্থ্যনিবাস আছে, সেখানে এসব রোগের নিরাময় সম্ভব। এই হাজার টাকাতে রেবতীবাবুর স্ত্রীকে সেখানে পাঠানো হয়ত যেতে পারে।

এখানকার ডাক্তাররাও সেই পরামর্শ দিয়েছেন।

পাড়ার এক ডাক্তার মাঝে মাঝে আসেন। ইন্‌জেকশন দেন। আশার বাণী শোনান।

রেবতীবাবু শোনেন আর বুঝতে পারেন তাঁর স্ত্রীর পরমায়ু সীমিত। ডাক্তারদের স্তোকবাক্য অর্থহীন।

দুটি মেয়ে বড়, ছেলেরা ছোট।

বড়টি বি. এ. পাশ করতে পারেনি। রেবতীবাবুর আর পড়ানোর সাধ্য ছিল না। ফলে মেয়েটি রোজ সকালে চাকরির খোঁজে বেরিয়ে যায়। সন্ধ্যার ঝোঁকে ম্লান মুখে ফিরে আসে।

ছোট মেয়ে আর ছেলেরা স্কুলে পড়ে। ভাইপোটিও তাই।

এই সব গোষ্পদের মধ্যে একমাত্র রেবতীবাবুই জলাশয়।

তাই সংসার সব তৃষ্ণাটুকু তাঁর কাছেই মেটাতে আসে।

বরদাবাবুর অনেক আছে। তাঁর ছেলের কাছেই রেবতীবাবু শুনেছেন। বড় মকদ্দমায় একদিনেই তিনি পাঁচশো এক টাকা দর্শনী নেন। শহরের বাইরে গেলে হাজার।

প্রশ্নপত্র যোগাড় করে দিতে পারলে বরদাবাবুর কাছে হাজার দুয়েক টাকা আদায় করাও শক্ত হবে না।

হাজার দুয়েক টাকা। কতগুলো একশ টাকার নোট!

রেবতীবাবু উঠে পড়লেন।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে। সর্বশরীরে অসহ এক দাহ।

রেবতীবাবু বাথরুমে গিয়ে মুখে চোখে জল ছিটালেন। ঘাড়ে জল দিলেন।

মাথাটা গরম হয়ে উঠেছিল।

মনে হচ্ছিল দরিদ্র এই সংসারের চারপাশে কেবল নোট উড়ছে। অজস্র নোট।

পরের দিন রবিবার।

অফিস নেই। টিউসনিও নয়।

রাতে ভাল ঘুম হয় নি, তাও রেবতীবাবু ভোর ভোর উঠে পড়লেন। এক কাপ চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লেন।

ভবানীপুর থেকে বরানগর, অনেকটা পথ। তাড়াতাড়ি না বের হলে হয়তো পরাশরকে বাড়ীতে পাওয়া যাবে না।

পরাশর বাড়ীতেই ছিল। থলে হাতে বাজারে বের হবার মুখেই রেবতীবাবু গিয়ে হাজির হলেন।

পরাশর কিছুটা বিস্মিত, কিছুটা সন্ত্রস্ত।

কি খবর আপনি? মাসিমা কেমন আছেন?

রেবতীবাবুর স্ত্রী যে মারাত্মক অসুস্থ এটা তাঁর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সকলেরই জানা ছিল।

ওই একই রকম। তুমি বাজারে বের হচ্ছ নাকি? কথা ছিল তোমার সঙ্গে।

আপনি বাড়ীর মধ্যে গিয়ে বসুন। আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ঘুরে আসছি।

পাঁচ মিনিট নয়, পরাশর ফিরল প্রায় আধ ঘণ্টা পর।

ততক্ষণে রেবতীবাবুর চা-জলখাবার খাওয়া শেষ।

কি বলুন মেসোমশাই ?

রাজনীতির কথা, ছাত্র বিশৃঙ্খলার কথা, অর্থনৈতিক দুরবস্থার কাহিনী, মোট কথা দেশকালের সব রকম কথাই হল, কিন্তু রেবতীবাবু আসল কথাটা আর বলতে পারলেন না।

কিসের যেন বাধা, কোথায় একটা সঙ্কোচ।

শেষবারে ওঠবার সময় মরীয়া হয়ে বলেই ফেললেন।

আচ্ছা পরাশর তুমি এবার কোন পেপার সেট করেছ ?

আমি হায়ার সেকেণ্ডারির ইংলিশ পেপারই সেট করেছি। কেন বলুন তো ?

এমনই জিজ্ঞাসা করছিলাম। আচ্ছা, স্কুল ফাইনালের ইংরাজী কে করেছে জান ?

কি জানি ঠিক জানি না। খোঁজ করতে পারি। কেন বলুন তো মেসোমশাই, আপনার মেয়েরা কেউ দিচ্ছে পরীক্ষা ?

না, না, এতক্ষণে রেবতীবাবু যেন নিশ্চিন্ত হলেন, আমার বাড়ীতে কেউ দিচ্ছে না। এমনই জিজ্ঞাসা করছিলাম। উঠি আজ। সময় পেলে যেও একদিন।

রেবতীবাবু ছাতা সামলে নেমে পড়লেন।

পথে নেমে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। এখন তিনি বরদাবাবুকে বলতে পারবেন, পরাশর ইংরাজী প্রশ্নপত্রের কোন খবর রাখে না। ব্যস তাঁর দায়িত্ব শেষ।

পরের দিন ছাত্রের ঘরে যাবার আগে রেবতীবাবু সাহস করে বরদাবাবুর অফিস-ঘরে ঢুকলেন।

বরদাবাবু একলাই ছিলেন। মোটা একটা আইনের বই খুলে কি পড়ছিলেন।

আসব স্যার ?

আসুন, আসুন। আমি আপনার কথাই ভাবছিলাম।

পরাশরের কাছে গিয়েছিলাম। সে স্কুল ফাইনালের পেপার সেট করে নি।

জানি। আমি খোঁজ নিয়েছি। পেপার সেট করেছে যতীন বোস আর কিরণ সরকার। এই নিন তাদের ঠিকানা। আপনার এই পরাশরবাবু হয়তো এঁদের চিনবেন।

ড্রয়ার খুলে বরদাবাবু একটা চিরকুট এগিয়ে দিলেন রেবতীবাবুর দিকে।

আপনি যদি আমার এ কাজটা করে দিতে পারেন রেবতীবাবু তাহলে আমি আপনাকে খুসী করে দেব। থোক দু হাজার টাকা, একেবারে হাতে হাতে। আমি বরদা সান্যাল, আমার যে কথা সেই কাজ।

দু হাজার টাকা !

আগের রাতের সেই মোহময় অবস্থা আবার ফিরে এল। চোখের সামনে নোটের স্তূপ। দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে সারা শরীর অবশ করে দেয়।

সেদিন ছাত্রকে রেবতীবাবু কি পড়ালেন নিজেই জানেন না। উত্তপ্ত শরীর নিয়ে বাড়ী ফিরে এলেন।

বাড়ীতে শুভ সংবাদ তাঁর প্রতীক্ষা করছিল।

রেবতীবাবুর স্ত্রীর অবস্থা আরও খারাপ। ছোট ছেলেটি স্কুলে খেলতে গিয়ে পড়ে ঠোঁট কেটেছে। ডাক্তারখানায় নিয়ে গিয়ে সেলাই করা হয়েছে। রাত্রে খুব জ্বর এসেছে। সেপটিক ফিবার।

রেবতীবাবু হাতলভাঙা একটা চেয়ারে বসে পড়লেন।

সারা জীবন সততার সঙ্গে অতিবাহিত করেছেন। একটি দিনের জন্যও আদর্শচ্যুত হন নি। এই তার ফল !

ভাঙাচোরা একটা সংসারের হতভাগ্য অধীশ্বর।

অথচ আশপাশের বাসিন্দাদের খবর রেবতীবাবু রাখেন।

একেবারে পাশের শীতাংশুবাবু রোজ গভীর রাতে টলতে টলতে বাড়ী ফিরেন। পাড়া মাত করে। মদ্যপের চীৎকারে কান পাতা যায় না।

অথচ সেই শীতাংশুবাবুর গ্যারেজে দু খানা গাড়ী। ছেলেমেয়েরা ইংরাজী স্কুলে পড়ে। ছবির মতন পরিপাটি বাড়ী।

মোড়ের নিরঞ্জনবাবু। কি যে করেন কেউ জানেন না। কেউ বলে ইনসিওরেন্সের দালাল কেউ বলে মেডিকেল প্রতিনিধি। কালো মোটা একটা ব্যাগ হাতে অষ্ট প্রহর ছুটোছুটি করছেন। প্রতারণার অভিযোগে মাস ছয়েক জেলও হয়েছিল।

কিছুদিন আগে নিরঞ্জনবাবু বললেন কোথায় তিনি জমি কিনেছেন। শীঘ্রই বাড়ী আরম্ভ করবেন।

আরো অনেক উদাহরণ রেবতীবাবু দিতে পারেন। শুধু এই গলির নয়, তাঁর অফিসের, তাঁর পরিচিত মহলের।

ঘোর কলি। যে পরিবারে যত পাপ, যত অনাচার, সে পরিবারের তত উন্নতি।

আর রেবতীবাবু সত্যনিষ্ঠ বলেই বুঝি তাঁর সংসারে এত দুঃখ, এত জ্বালা!

দুদিন বাদ দিয়ে রেবতীবাবু আবার গেলেন পরাশরের বাড়ী।

যে মানুষটা বছরে একবারও আসেন না, তাঁর ঘন ঘন আসাতে পরাশর বিস্মিত হ'ল।

কি ব্যাপার মেসোমশাই?

মানে, তোমার কাছে একটা দরকারে এসেছি পরাশর। ব্যাপারটা একটু গোপনীয়।

বেশ বলুন।

রেবতীবাবু পকেট থেকে বরদাবাবুর দেওয়া কাগজটা পরাশরের সামনে মেলে ধরে বললেন।

দেখো তো, এঁদের দুজনকে চেন?

পরাশর ঝুঁকে পড়ে দেখল তারপর বলল।

যতীনবাবুকে চিনি না। কিরণ সরকারকে চিনি। কেন, বলুন তো।

ইয়ে আর কি।

রেবতীবাবু থেমে গেলেন।

পাশের ঘরে পরাশরের ছেলে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়ছে।

দারিদ্র্য জীবনের অভিশাপ নয়। দারিদ্র্যের চাপে যাহারা বিবেক বিক্রয় করে, তাহারা মনুষ্যপদবাচ্য নহে। দারিদ্র্য কঠিন শিক্ষক। দারিদ্র্য মানুষকে আঘাতে আঘাতে প্রকৃত পথের সন্ধান দেয়।

রেবতীবাবু চমকে উঠলেন।

কম্পিত হাতে কাগজটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে বললেন।

এমনই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছিলাম। আমার ছাত্রের বাপের সঙ্গে এঁদের বুঝি আলাপ আছে। আজ উঠি পরাশর।

সেকি, এইমাত্র এলেন, এর মধ্যে উঠবেন কি?

না, একজায়গায় যেতে হবে। কথাটা মনেই ছিল না।

রেবতীবাবু দ্রুতপায়ে নেমে গেলেন।

চৌরাস্তার কাছাকাছি গিয়ে পকেট থেকে কাগজের টুকরোটা বের করে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেললেন এ পাপ, এ প্রলোভন। একে নষ্ট না করে ফেললে কখন রেবতীবাবুর ক্ষতি করে কিছু ঠিক নেই।

দিনকয়েক এমনই কাটল।

রেবতীবাবু ছাত্র পড়ান। চলে আসেন। বরদাবাবুর ছায়াও মাড়ান না। বরদাবাবুও হয়তো ভেবে নিশ্চিন্ত যে রেবতীবাবু চেষ্টা করছেন।

একরাতে ছেলেমেয়েদের চীৎকারে রেবতীবাবু বিছানার ওপর উঠে বসলেন। তারপর ছুটে গেলেন স্ত্রী ঘরে।

ছেলেমেয়েরা মাকে ঘিরে কান্নাকাটি শুরু করেছে।

রেবতীবাবুর প্রথমে ধারণা হ'ল, স্ত্রী শেষ হয়ে গিয়েছে। চামড়াঢাকা কঙ্কালসার দেহের হৃদস্পন্দ চিরতরে স্তব্ধ।

কিন্তু কাছে গিয়ে বুকে পিঠে হাত দিয়ে আশ্বস্ত হলেন। না, এত সহজে মেয়েদের প্রাণ বুঝি যায় না।

তাঁর নির্দেশে এক ছেলে দৌড়ে গিয়ে পাড়ার ডাক্তারকে ডেকে নিয়ে এল।

ডাক্তার কিন্তু কঠিন সংবাদ শোনাল।

অন্তত গোটা ছয়েক ইঞ্জেকশন দেওয়া দরকার। রোজ দুটো। তা না হলে যে কোন মুহূর্তে রোগীনী শেষ হয়ে যেতে পারেন।

ইঞ্জেকশন ছাড়াও ডাক্তার টনিক আর ওষুধের ফর্দ দিল। পথ্য হিসাবে মহার্ঘ ফলের রস।

ডাক্তার চলে যেতে রেবতীবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসলেন।

মাসের মাঝামাঝি। নিজের কাছে সতেরো টাকা ক পয়সা পড়ে আছে। আর কারো কাছে পয়সা জুটবে এমন সম্ভাবনা সুদূরপরাহত।

মেয়েরা অনবরত কেঁদে চলেছে।

মাকে বাঁচাও বাবা। যেরকম করে হোক বাঁচাও।

রেবতীবাবু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মেয়েদুটোর শরীরের দিকে নজর বোলালেন। গলা খালি, কান খালি, একজন মেয়ের হাতে শুধু দুগাছা করে চুড়ি। তাও ব্রোঞ্জের যার পুর্ণ বিক্রয়মূল্য শূন্য।

অথচ স্ত্রী চলে গেলে এ সংসার মরুভূমি হয়ে যাবে।

স্ত্রীকে বাঁচাবার নৈতিক দায়িত্ব রেবতীবাবুর একথা তিনি অস্বীকার করতে পারেন?

নিজের মাথার চুল মুঠো করে ধরে রেবতীবাবু শোবার ঘরে চলে এলেন।

ছেলেমেয়েরা সারারাত জেগে বসেছিল।

সারাটা রাত তারা শুনেছে রেবতীবাবুর অস্থির পদচারণার শব্দ। মাঝে মাঝে সে শব্দ বন্ধ হয়েছে, কিছু-ক্ষণের জন্য। মানুষটা বোধ হয় ঘুমাবার চেষ্টা করেছে।

দু একজন উঁকি দিয়ে দেখেছে।

না, রেবতীবাবু বুকে বালিশ চেপে ঝুঁকে পড়ে কি লিখছেন। তন্ময় হয়ে।

খুব ভোরে রেবতীবাবু বেরিয়ে পড়লেন।

বড় মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে বললেন।

ইঞ্জেকশন আর ওষুধগুলো নিয়ে আসি মা। দেরী করা উচিত নয়।

কিন্তু টাকা?

মেয়ের কথায় রেবতীবাবু আবার চমকালেন। মাথা নেড়ে বললেন।

দেখি, জোগাড় হয়ে যাবে মনে হচ্ছে।

রেবতীবাবু যখন বরদাবাবুর বাড়ী গিয়ে পৌঁছলেন, তখন ড্রেসিং গাউন গায়ে বরদাবাবু বাগানে পায়চারি করছেন।

রেবতীবাবুকে দেখে বললেন।

এ কি চেহারা হয়েছে আপনার? অসুখবিসুখ করেনি তো?

না, না, শরীর ঠিক আছে। ওই জিনিসটা জোগাড় করতে অনেক রাত হয়ে গেল। দিনেরবেলা হিরণবাবু কথা বলতে রাজী হলেন না।

বরদাবাবু উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

কোয়েশ্চেন পেয়েছেন মাষ্টার মশাই?

হ্যাঁ, একটা পেপার শুধু। পেপার টু।

বাস, বাস, তাতেই হবে। ওই পেপারটাই তো গ্রামার আর কম্পোজিশন।

রেবতীবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন।

আসুন, বাড়ীর মধ্যে আসুন।

বরদাবাবুর পিছন পিছন রেবতীবাবু বসবার ঘরে ঢুকলেন।

পকেট থেকে কাগজটা বের করে বরদাবাবুর হাতে দিলেন।

বরদাবাবু কাগজটার ওপর একবার চোখবুলিয়ে নিয়ে সেটা ড্রয়ারের মধ্যে রেখে দিলেন। তারপর ড্রয়ার থেকেই দশটা একশো টাকার নোট বের করে রেবতীবাবুর দিকে এগিয়ে দিলেন।

লোভী একটা হাত অতি দ্রুত, যেন থাবা দিয়ে, নোট কখানা পকেটের মধ্যে চালান করে দিল।

আচ্ছা আজ উঠি।

রেবতীবাবু বিদ্যুৎবেগে ঘরের চৌকাঠ, লন, গেট পার হয়ে গেলেন।

এখনও পরীক্ষার দেড় মাস বাকি, তার আগে এই ফাঁকি ধরা পড়বে না।

ধরা পড়লেই বা কি, বড় জোর এখানকার টিউশনি যাবে, তার বেশী কিছু নয়।

এ নিয়ে যে থানা পুলিশ করা যায় না সেটা বিচক্ষণ ব্যারিষ্টার ঠিক বুঝতে পারবেন।

রেবতীবাবু হাতটা বুকপকেটে রাখলেন। আঃ, পরম সান্ত্বনা। বুকের ঠিক কাছেই নোটের তাড়া। তিনি অনুভব করতে পারছেন।

নোট নয়, এসব রেবতীবাবুর স্ত্রীর পরমায়ু। ইনজেকশন, টনিক, নানাবিধ ফল, যার সান্নিধ্য রেবতীবাবুর দুর্বল, পঙ্গু হাত কোনদিন পেত না।

কত অবলীলাক্রমে বরদাবাবু ড্রয়ার থেকে দরিদ্রের পরমায়ু বের করে দিলেন। কত নির্লিপ্তভাবে?

চলতে চলতেই রেবতীবাবু থমকে দাঁড়ালেন।

একটা পানের দোকানের আয়নায় তাঁর প্রতিচ্ছবি পড়েছে।

কিন্তু একি তাঁর প্রতিচ্ছবি!

উস্কোখুস্কো চুল, জাগরণক্লান্ত কুৎসিত দুটি চোখ, সারা গাল দাড়িতে আকীর্ণ, ভাঙা চোয়াল, বিশুষ্ক ওষ্ঠাধর।

মানুষের অন্তর থেকে বিবেক নির্বাসিত হলে এমনই বুঝি হয়ে যায় চেহারা!

কিংবা এ রেবতীবাবু নন, শয়তান তাঁর দেহ অধিকার করেছে। রক্তশোষা ভ্যাম্পায়ারের মতন তাঁর দেহ অন্তঃসার শূন্য করে দিয়েছে।

তুচ্ছমাটির আকর্ষণে এতদিনের জমানো সোনা রেবতীবাবু হারিয়ে ফেললেন, সেই দুঃখে, ক্ষোভে বুঝি বা চিন্তায়, রেবতীবাবু পথের ওপর, একপাল লোকের সামনে হাঁউ মাঁউ করে চীৎকার করে উঠলেন। বুক চাপড়ে। বুক পকেটে নোটগুলোর অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে।
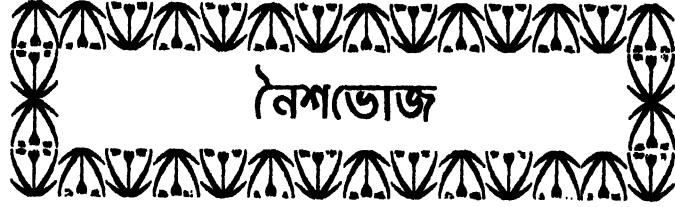
নৈশভোজ

(গল্প)

সুবোধ বসু

একটু বেশিই রাত হয়ে গেছে। ভেবেছিলেন বারোটার মধ্যেই ফেরা যাবে। এখন প্রায় একটা। তা উৎসব করতে গেলে অত হিসেব করে' চলা যায় না, বিশেষতঃ অফিসার্স মেসের শুধু মাত্র পুরুষদের জন্য আয়োজিত পার্টিতে। আর এ পার্টিতো তাঁরই সম্মানে।

মধ্যরাত্রের জনহীন রাস্তা দিয়ে জোরে গাড়ী ছুটিয়েছেন কর্নেল চৌধুরী। যে পরিমাণ তরল পদার্থ পেটে আছে তার হিসেবে গতিটা বরঞ্চ একটু বিপজ্জনক রকম বেশি দ্রুত। তবে আর্মি অফিসারদের এটাই রেওয়াজ। একটু বেপরোয়া হওয়াই দরকার। উত্তরপূর্ব সীমান্তে শত্রুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আশ্চর্য্য সাহসিকতা দেখিয়েছিলেন কর্নেল চৌধুরী। স্বীকৃতি এসেছিল সরকারী সম্মাননায়। সে প্রায় তিন মাস আগের কথা। তিন মাস পরে হেডকোয়ার্টার্সে দু'হপ্তার ছুটিতে ফিরে এলে তার সহকর্মীরা তার অপ্যায়নের জন্যই এই পার্টির ব্যবস্থা করেছিল।

কিন্তু এটা স্ত্রী অনীতার একেবারেই পছন্দ হয়নি। শুধু পুরুষদের পার্টি অর্থাৎ গেলাসের ছড়াছড়ি, হুল্লোড়ের বাড়াবাড়ি। একটু বেশি কড়া অনীতা। আর্মি-অফিসারদের জীবনে অপরিহার্য অনেক কিছুই তার পছন্দ নয়। কর্নেল এ নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাটি করেন না আবার পুরোপুরি স্ত্রীর মেজাজ মেনেও চলেন না। স্ট্র্যাটাজির আশ্রয় নিয়ে যথাসম্ভব সম্মুখ সমর এড়িয়ে চলেন।

ফুলের মতো সুন্দরী মেয়ে অনীতা। গোলাপের মত গায়ের রং। কিন্তু কাঁটাগুলি একটু বেশি ধারালো। গন্ধের মদিরতা অথবা কণ্টকের আঘাত কোন্‌টা বেশি তীব্র বলা কঠিন।

বেয়ারাই দরজা খুলে দিয়েছিল। বাইরে থেকেই জামা-কাপড় ছেড়ে যথাসম্ভব নীরবে বেড-রুমে প্রবেশ করে' সাবধানতার সঙ্গেই জোড়াখাটের তাঁর নিজস্ব অংশে শুয়ে পড়েছেন। অনীতার ঘুম ভাঙেনি দেখে আশ্বস্তই বোধ করেছেন. কিন্তু আরও পাঁচসাত মিনিট পার হবার আগে হাতটা তার গায়ের উপর রাখা নিরাপদ মনে করেন নি।

কিন্তু এ কি! একটা ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো বীরবাহু। যেন ইলেকট্রিকের খোলা তারের উপর অজ্ঞাতসারে ছোঁওয়া লাগায় আচম্বিতে শক্‌ খেতে হয়েছে।

'ওঃ, তুমি জেগে আছ ডার্লিং। আবার হাতটা ফেরৎ পাঠালেন কর্নেল। 'তা সত্যিই তো, রাত এমন কিছু বেশি হয়নি···'

দ্বিতীয়বারের জন্য তাঁর অফেন্সিব প্রতিহত হলো। 'সরে যাও।' ডালিঙের কাছ থেকে প্রেমসম্ভাষণ এলো।' মুখের বোটকা গন্ধে মাথা ধরে যাচ্ছে! হ্যাঁ, রাত বেশি কোথায়। মাত্র মাঝ-রাত্তির!'

'তবে তো বেশ খানিকটা ঘুমিয়ে নিয়েছ।' কর্নেল আক্রমণটা পাশ কাটিয়ে ব্যর্থ করবার চেষ্টা করলেন।

'গত দেড় বছর ধরেই ঘুমিয়ে নিচ্ছি!' অনীতা না দমে বলল। 'চমৎকার আছি। জঙ্গী অফিসারের স্ত্রী হওয়া কম সৌভাগ্য নয়! বেয়ারা বাবুর্চি, আয়া, মালী, সুইপার নিয়ে আরামে ঘর করছি। সাহেব সীমান্ত রক্ষা করছেন, আর ছুটীতে বাড়ী এলে ক্লাবে হুল্লোড় করে' বেড়াচ্ছেন…'

পরের অভিযোগটা এর আগেও অনেকবার শুনতে হয়েছে। ছুটীতে এলে কর্নেল যথাসাধ্য স্ত্রীর খিদমত করে' থাকেন। কিন্তু তার নিজস্বও কিছু স্বাধীনতা থাকা চাই। এটা অনীতা বরদাস্ত করবে না! বার বার এই নিয়ে খোঁচা দেবে।

'স্বামী বেচারিরা শেকল পায়ে পরে যদি নীরবে খেটে যায়, লাফঝাঁপ না দেয়, স্ত্রীর সওদা-পত্র বহন করে' পেছনে পেছনে চলে, তবেই কি সে আইডিয়াল স্বামী হয়? কর্নেল এবার নিজেও আক্রমণাত্মক রণকৌশলের আশ্রয় নিয়ে বললেন।

খুব মারাত্মক নয়। তবে আগুনে বোমা। আগুন জ্বলে উঠতে দেরি হলো না।

'জঙ্গী বীরদের তাই মনে হবে বটে। শান্ত, স্নিগ্ধ গার্হস্থ্যজীবনের মাধুর্য্য বোঝবার যাদের ক্ষমতা নেই।'

'আগেই তা ভাবা উচিত ছিল।' সৈন্যদের মার্চ করবার হুকুম দিয়েছেন কর্নেল এখন পেছানো সম্ভব নয়। জঙ্গীবীরদের পছন্দ না করে' কবিবর কাউকে পছন্দ করলে হতো। বাবুর্চি বেয়ারা আয়া মালী সুইপার কেউ আশেপাশে ভিড় করত না। শান্তির নীড়বেশে কলগুঞ্জন করে' দিন রাত কেটে যেত এক রাঁধা-বাড়া বাসন-মাজার সময় ছাড়া…'

'অনেক ভালো হতো।' অনীতা তীক্ষ্ণকণ্ঠে চেঁচিয়ে বললে। কর্নেলের গায়ে একটা সজোর ঠেলা মেরে যেন ছিটকে বের হয়ে গেল খাট থেকে। 'রাস্তায় বের হয়ে যাব, তবু এমন কসাইয়ের সঙ্গে একই ছাতের তলায় থাকব না।'

কর্নেল চৌধুরীর সঙ্গে এনগেজমেণ্টের আগে এক কলেজের প্রফেসারের সঙ্গে অনীতার বিয়ের কথা হয়েছিল। অধ্যাপক কবিতাও লিখতেন। ইঙ্গিতটা যে সে সম্বন্ধে সেটা বুঝতে এক সেকেণ্ডও দেরি হয়নি অনীতার। রাগে সে ফেটে পড়েছে।

কর্নেল শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। রণকৌশল ঠিক হয়নি। বেফাঁস কথা বের হয়ে গেছে। অনীতার রকমটা তো জানাই আছে। এখানে আক্রমণ চালাতে গেলে লোকসানের আশঙ্কাই বেশি। যা বেপরোয়া রাগী মেয়ে, সত্যসত্যই বের হয়ে যেতে পারে ফলাফল না ভেবে। সামান্য দাম্পত্য-কলহ পাঁচজনের হাসির বস্তু হয়ে উঠবে। কেলেঙ্কারি কাণ্ড।

তড়াক করে' উঠে অনীতা যেখানে অন্ধকারে দরজার ছিটকিনি হাতড়াচ্ছিল, সেখানে এসে গেলেন। অনীতার হাত ধরে' নিরস্ত করবার চেষ্টায় বললেন, 'এ কি পাগলামি হচ্ছে। কোথায় যাচ্ছ?

'যেখানে ইচ্ছে যাচ্ছি।' এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলে অনীতা। 'সরে দাঁড়াও।'

'রাতটা কত হয়েছে আমার খেয়াল ছিল না।' হালকা গলায় বললেন চৌধুরী। 'তোমার খেয়াল আছে কি? মধ্য রাতে কোথায় যাওয়া যায়?'

'যেখানে দু চোখ যায়। সরে দাঁড়াও বলছি।'

'তত দূর কি আর যেতে দেবে।' পরিহাস করে ব্যাপারটা হালকা করার চেষ্টায় বললেন চৌধুরী। 'রাতে ঘুরে বেড়াবার মত চোর বদমাসের অভাব নেই রাস্তায়। এমন সুন্দরী যুবতী হাতের কাছে পেলে অত দূর কি আর যেতে দেবে—।

'যেতে দাও বলছি।' প্রাণপণে মুক্ত হবার চেষ্টা করতে করতে বললে অনীতা। 'তাতে কোন ক্ষতি হবে না। এক জানোয়ারের হাত থেকে আরেক জানোয়ারের হাতে পড়ব মাত্র···'

'ঠিক আছে। তবে এই জানোয়ারও ছাড়ছে না।'

রুখবার চেষ্টা ও মুক্তির চেষ্টা দুইই জোরদার হয়ে উঠল। হুটোপুটি প্রায় মল্লযুদ্ধে পরিণত হয়ে উঠল। ক্রুদ্ধ অভিমানীকে সামলানো যে কত শক্ত ব্যাপার বীর কর্ণেলের তা বুঝতে দেরী হলো না। একে তো পানীয়ের নেশা পা এবং মাথা দুটোকেই কিছুটা নড়বড়ে করে দিয়েছে। তারপর ধ্বস্তাধ্বস্তিতে পা-জামার এক পায়ার প্রান্ত এসে গেছে চটির তলায়। সহসা ধপাস করে ভূপতিত হলেন তিনি।

'বীরত্ব ফলানো হচ্ছিল!' পরিশ্রমে ফোঁস ফোঁস করে হাঁফাতে হাঁফাতে বিজয়িনীর দৃপ্ত কণ্ঠে বললে অনীতা। ভাবটা এই, বীরত্ব দেখাও গিয়ে সীমান্তে। এখানে দেখাতে এলেই কাৎ হবে।

কর্ণেল আহতের ভঙ্গিতে কার্পেটের উপরই শয়ান রইলেন। কিন্তু কিছু লাভ হলো না। অনুতপ্ত বা লজ্জিত হয়ে কেউ সাহায্যার্থ এলো না। তবে প্রতিপক্ষ আর ছিটকিনি খোলবার চেষ্টা করলে না। কয়েক সেকেণ্ড নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে নিজের খাটের উপর দুম্ করে গিয়ে পড়ল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে একটা কান্নার শব্দ উঠল অচিরে। কিছুটা আশ্বস্ত হলেন কর্ণেল।

নিশুতি রাত। চমকে ঘুম ভেঙ্গে গেল অনীতার। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায়নি। কতক্ষণ ঘুমিয়েছে জানে না। কিন্তু গভীর ঘুমের মধ্যেও আওয়াজটা পৌঁছে গেছে। পাশের ঘরে এখনও ঝনঝন শব্দের রেশটা বিলীন হয় নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার শব্দ। যেন দেরাজ খোলার শব্দ। সভয়ে অনীতা পাশের খাটের দিকে তাকালে। কিছুটা আশ্বস্ত হলো। স্বামী তার যথাস্থানে শুয়ে আছেন। বাড়াবাড়ি করেছিল অনীতা। কিন্তু উনি অনেক বিবেচক। ঝগড়ার সময় একেবারে ছেড়ে দেন না, তবে মাথা সুস্থ রাখেন। অনীতার মত পাগল হয়ে যান না। তবু পাশের ঘরের তীক্ষ্ণ আওয়াজে ঘুম ভেঙ্গে যেতে প্রথমেই অনীতা শঙ্কিত হয়েছিল; 'রাগের মাথায় উনি কিছু করছেন না তো!' সে আশঙ্কা দূর হলো, কিন্তু পাশের ঘরের আওয়াজ দূর হলো না। চোর নয় তো? গত দু' এক হপ্তার মধ্যে আর্মি-অফিসারদের বাংলোগুলিতে কয়েকটা চুরি হয়ে গেছে। কোনও কিনারা হয়নি। প্রমাণ হয়েছে, বাঘের ঘরে হানা দেওয়া এমন কোনও দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়।

আবার শব্দ! ভয়ে অনীতা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

প্রায় রাগ ধরে গেল স্বামীর উপর। নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন! মৃদু নাকের ডাক আসছে একটানা। এখন কি করে অনীতা? অন্তত তিন হাতের তফাৎ। এক সময় এই দূরত্ব রক্ষা করতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছিল সে। নিরুপায় হয়ে হাত দেড়েক এগিয়ে এলো।

'এই শুনছ?' ফিসফিসটা গাঢ় রকমের। নাকের ডাক অব্যাহত রইল।

'শুনছ? কি মুস্কিল! এই। কী ঘুম দেখ না একবার, বাবা!'

কোনও সাড়া এলো না ঘুমন্ত চৌধুরীর কাছ থেকে। বাধ্য হয়ে অনীতা আরও এগিয়ে এলো, হাতের নাগালের মধ্যে।

'কি বলছি। উঠে পড়ো। চোর ঢুকেছে বাড়ীতে।' মুখটা চৌধুরীর কানের কাছে নিয়ে চাপা জরুরী কণ্ঠে অনীতা তাড়া দিলে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। বিপদের উপর বিপদ। মধ্য রাত পর্যান্ত হল্লোড় করে ফিরে এলে আর কি আশা করা যেতে পারে! অগত্যা হাত বাড়িয়ে ঝাঁকুনি দিতেই হলো। কিন্তু অত সহজে ঘুম ভাঙবার নয় বেশ কয়েকটা সজোরে ঝাঁকুনি হজম করে নিলেন ঘুমন্ত কর্ণেল। নিরুপায় হয়ে মুখ ধরে ঝাঁকুনি দিতে হলো।

এবার 'উঁহু' বলে সাড়া দিলেন চৌধুরী।

'বাড়ীতে চোর ঢুকেছে। শীগগির ওঠ।'

'আচ্ছা।' ও কাৎ ফিরে শুলেন চৌধুরী।

'কি কুম্ভকর্ণরে বাবা।' চাপা গলায় হতাশার উক্তি করলে অনীতা। 'কি বলছি। চোর এসেছে, তাড়াতাড়ি ওঠ। পিস্তলটা নাও...'

এবার চৌধুরী অনেকটা সজাগ হয়ে উঠলেন। 'চোর। কোথায় চোর?' ঘুমবিজড়িত কণ্ঠে শুয়ে শুয়েই বললেন।

'পাশের ঘরে আওয়াজ শুনছ না?' বিরক্তির সঙ্গে অনীতা বললে। আমার সব দামি দামি রূপোর বাসন, হাতির দাঁতের খেলনা, রেডিও-টেইপ-রেকর্ডার দিয়ে এতক্ষণে থলে ভরে ফেলেছে, ইদিকে নৈশ-পার্টির কল্যাণে বাড়ীর মালিকের ঘুমই ভাঙছে না।'

তিরস্কৃত বাড়ীর মালিক আর বিলম্ব না করে খাট থেকে মেঝেতে নেমে দাঁড়ালেন।

'কিন্তু পিস্তল কোথায়?' অনীতা বাধা দিয়ে বললে।

'ওঘরেই আছে।'

'কী সর্বনাশ। না, এরকম যাওয়া চলবে না। আজকালকার চোরেরা অমনিতেই ভয় পায় না। চাকর বেয়ারাদের হাঁক দাও...'

'ওদের কোয়ার্টারে কি ডাক পৌঁছাবে।' চৌধুরী আর্মি-অফিসারের দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন। 'বরঞ্চ তুমিই এক কাজ করো...'

'আমি! কি কাজ?' উদ্বিগ্ন প্রশ্ন করলে অনীতা।

'ছিটকিনি খুলে বেরিয়ে যাও।

'আমি!'

'ছুটে গিয়ে...'

'লজ্জা করল না একথা বলতে?...'

'ছুটে গিয়ে বারান্দার রেলিঙে বাঁধা টমির শেকলটা নিয়ে এসো। শোবার আগে ওকে বাঁধতে ভুল হয়ে গেছে। অনভ্যস্ত জায়গায় বেচারীর নিশ্চয়ই ঘুম আসছে না, তাই এমন বদমাসি করছে......যতই ট্রেনিং দাও না, কুকুর কি নিজের স্বভাব ভুলতে পারে— কাউ কাউ আওয়াজ পর্য্যন্ত করছিল...'

ঝুম করে আবার বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল অনীতা।

কাব্যে কবির অন্তরাত্মা

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

আদর্শ প্রভৃতি কবিত্বের বিচারে গৌণ বিষয়, মুখ্য বিষয় রসসৃষ্টি—এই হল তেওফিল্ গোতিয়ে, রবীন্দ্রনাথ, বেনেদেত্তো ক্রোচে প্রমুখ বিশ্ববন্দিত মনীষীদের অভিমত। কবিতা কোন আদর্শ বা মতবাদের দাসী নয়; তার মানে, আদর্শ বা বিভিন্ন মতবাদ কাব্যের অনুশীলন-ক্ষেত্র থেকে পরিহার করতে হবে না—কেবল, সেগুলির ওপর জোর দেওয়া চলবে না। যাকে কাব্যে রসসৃষ্টি বলা হয় তা কবির ভগ্নাবরণ অন্তরাত্মার প্রকাশ। সুতরাং কাব্যরচনার সময়ে দেখতে হবে কবি তাঁর অন্তরাত্মাকে কতখানি আবরণমুক্ত ক'রে রসধারাকে উৎসারিত করতে পেরেছেন।

যাকে গদ্যকবিতায় বাস্তববাদ বলা হয়, তা আসলে নিম্নমুখী আদর্শবাদ: ডক্টর জেমস কাজিনস্ ঐ মতবাদকে **Downward Idealism** নাম দিয়েছেন। এই নিম্নমুখী আদর্শবাদ কবির স্বতঃস্ফূর্ত অনুভূতির পথ বেয়ে আসে কি না, সেটাই আমাদের বিচার্য। ফরাসি কবি শার্ল বোদেলেরের রচনায় যে বীভৎস উপাদানের সমাবেশ দেখা যায় তা এক রকম বিকৃত রোমান্টিক চেতনার প্রকাশ। বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক গদ্যকবিতা-সাহিত্যে বোদেলের রচিত কবিতাবলীর স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছলতা নেই; বোদেলের রচনার অন্তরালে আছে এক বিকৃত কিন্তু আলোকপিপাসু আত্মার সংক্ষুব্ধ আকূতি; প্রশ্ন হল বাংলা গদ্যকবিতায় তা আছে কি না।

অন্তরের শাশ্বত প্রেরণার অভাবে বৈচিত্র্য প্রবর্তনের লোভে কিন্তু বৈচিত্র্য প্রবর্তনের সামর্থ্যের অভাবে বাংলা সাহিত্যে এই বৈদেশিক ভাবাদর্শের আমদানি করা হয়েছে। ভাবাদর্শটা বৈদেশিক বলেই নিন্দনীয় নয়, অস্বাভাবিক, বিকৃত ও রুগ্ন ব'লেই নিন্দনীয়। বৈদেশিকতার স্বাভাবিক প্রবর্তনা তখনই হয়, যখন তা কবির কাব্যানুভূতির সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে আসে। যেমন মধুসূদনের "মেঘনাদ-বধ" তিনি বৈদেশিক ভাবধারায় অভিস্নাত হয়ে পাশ্চাত্য সাহিত্যের কাব্যরস আত্মসাৎ করে নিয়েছিলেন। মেঘনাদের সৎকার-দৃশ্য হোমারলিখিত কাব্যের প্রভাবে রচিত। মধুসূদনের মধ্যে যে কবি ছিল তার সঙ্গে আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাব, দুয়েরই যোগ ছিল অন্তরঙ্গভাবে। তিনি বৈদেশিক প্রভাবকে ভারতীয় পরিবেশে স্থাপন করেছেন সুষীম সৌন্দর্যে। তাঁর কাব্যপ্রেরণা বৈদেশিক হাওয়ার দোলা পেলেও তাঁর কাব্যোপাদান দেশের মাটির রসে অভিষিক্ত।

মধুসূদনের আবির্ভাবের জন্যেই আমাদের কাব্য বৈদেশিকতার কুপ্রভাবমুক্ত ছিল। যথেষ্ট পরিমাণে বৈদেশিক উপাদান গ্রহণ ক'রে তাকে স্বীকরণের সামর্থ্য মধুসূদনের দিব্য প্রতিভায় ছিল; অসামঞ্জস্যের বিশৃঙ্খলা তাঁকে একেবারে স্পর্শ করতে পারে নি। বাংলা গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা এই মহান্ কর্তব্যটি সংসাধিত হয়েছিল। পরদেশি মালমশলায় বাংলা সাহিত্য বন্যাপ্লাবিত হয় নি, পক্ষান্তরে বাংলা ভাষার সাহিত্য-ক্ষেত্র বৈদেশিক বারিসেচনের উপযুক্ত সাহচর্যে উৎকৃষ্ট উর্বর ভূমিতে পরিণতি লাভ করে।

পরদেশীয় উপাদান মধুসূদনের শিল্পকৌশলে একেবারে রূপান্তরিত হয়েছে বিদেশী চারাগাছ থেকে দেশী তুলসিতে। ঐ প্রাণদ সুস্বাদ ওষধির উপযোগী গুণের অভাব থাকায় বিখ্যাত ফরাসি সাহিত্য-ঐতিহাসিক Taine সাহেব এ্যাংলো-সাক্সন সাহিত্যকে ইংরেজি সাহিত্যের অংশ ব'লে স্বীকার করতেন না। রবীন্দ্র-প্রেম-কাব্যের পরিবেশ সমসাময়িক দেশ ও কালকে অতিক্রম ক'রে গেলেও কবিকুশলতায় মনে হয়, যেন আমাদের সমাজেই এরও সম্ভাবনা প্রচ্ছন্ন ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক কবিকুলের ভাব-পরিবেশ আমাদের অপরিচিত। আমাদের চেতনায় তার পূর্বস্মৃতি বা সংস্কার আদৌ নেই। সেই জন্যে কবির কাব্যকৌশল দেশীয় উপাদান যেখানে যেখানে ব্যবহৃত হয়েছে এমন-কি সে-সব ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। দ্রৌপদীর শাড়ি, ঋষ্যশৃঙ্গের অপহরণ দময়ন্তীর স্বয়ংবর—এইসব অতি পরিচিত পৌরাণিক উপাদানের সহযোগেও যে আধুনিক কবির রসনির্মিতি সার্থক হয় না তার প্রধান কারণ, কবির ভাব ও পরিবেশনপদ্ধতি পাঠকের স্বাভাবিক মানসপ্রস্তুতির সঙ্গে সমন্বয়সাধনে সমর্থ কি না, সেটা দ্রষ্টব্য।

ম্যাথিউ আর্নল্ডের মতে, সর্বোৎকৃষ্ট পংক্তিসমূহের মানদণ্ডে কাব্যের ভাবাত্মক সংজ্ঞা নির্ণয় করতে হবে। এই পদ্ধতি অবিসংবাদিত নয়। কোন প্রাসাদের মূল্য কেবল কয়েকটি মূল্যবান প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা বিবেচিত হতে পারে না, সমগ্র অট্টালিকার স্থাপত্য-কৌশলও বিচার ক'রে দেখতে হয়। তা ছাড়া, কাব্যের প্রকৃতি অনুসারে কাব্যবিচারের মানদণ্ডের তারতম্য মেনে নিতে হবে। শেলি বা সুইনবার্নের গীতিকবিতায় যে-নৈপুণ্য দাবি করা হয়, ওড-জাতীয় কবিতায় সেটা দাবি করা যায় না। অবশ্যই মহাকবির কাব্যে এমন পংক্তি থাকবে যা সাধারণ ভাব ও মামুলি উৎকর্ষের অনেক ঊর্ধ্বে। কিন্তু সেক্ষেত্রেও কাব্যের মহত্ত্ব সমস্তটার উপর নির্ভরশীল, উৎকৃষ্টতম কয়েকটি পংক্তির ওপর নয়।

শ্রেষ্ঠ কবিতা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে মনে এমন আবেগ সঞ্চিত হবে যার কোন কারণ দেখা যাবে না অথচ যা ব্যক্ত হবার জন্যে অভীপ্সাপরায়ণ। ব্যাখ্যাগম্য না হলেও মনে এই ভাবের সঞ্চারই কবিতার শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতি। প্রকৃত কাব্য এত গাঢ়ভাবসংবদ্ধ যে, তাকে মন্ত্র বলা যেতে পারে। যে-সমস্ত কাব্যাংশের উৎকর্ষ সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশ, কাল ও ব্যক্তিত্বের ঐকমত দেখা যাবে, সেগুলিকে শ্রেষ্ঠ মনে করতে হবে। কাল কাব্যের শ্রেষ্ঠ বিচারক। বিভিন্ন কালে সমাজ ও ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতা ধরা পড়ে; তা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠ কাব্য সম্বন্ধে বিভিন্ন কালের আলাদা আলাদা সমাজের শ্রেষ্ঠ গুণিবৃন্দ একমত; বিভিন্ন কালের গুণিগণের মতের সারসঙ্কলন হল কাব্য সম্বন্ধে যথার্থ কষ্টিপাথর।

যে-কবির লেখা কাব্যলোকের অন্তর্ভুক্ত, সে-কবির লেখা কালজয়ী হবে। এই কাব্যলোক মহাকালের সৃষ্টি। তিল তিল ক'রে আহরণ-করা কাব্যসৌন্দর্য নিয়ে তিলোত্তমার মতো এই কাব্যজগৎ নির্মিত। যিনি কবি-চেতনাকে এই জগতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, তিনিই প্রকৃত কবি। মহাকালের বিচারে উত্তীর্ণ হওয়া মানেই যুগে যুগে গুণীদের স্বীকৃতি-লাভ। কাব্যলোকের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে কাল ও কাব্যবিচার একাত্ম হয়ে ওঠে। কালপুরুষ বিভিন্ন কালের মধ্যে যোগসাধন ক'রে বিভিন্ন যুগের কাব্যের রসমূল্য বিচারের তৌলন নিরিখ দান করেন।

কালোপযোগী ও কালাতীত রচনার পার্থক্যের কারণ, এক-কালের রচনা সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ কিন্তু যুগোত্তীর্ণ সাহিত্য রসানুভূতির সুদূরপ্রসারী আবেদনে চিরন্তন কাব্যলোকে আশ্রয় পায়। উপাদান সুন্দর না কুৎসিত, সে-প্রশ্ন এক্ষেত্রে অনেকটা অবান্তর এই জন্যে যে, ও-দুয়ের মধ্যেই বৈচিত্র্য আছে, আছে সৃষ্টির অপরিসীম সম্ভাবনা। রসিক বিশেষজ্ঞ উভয়ের পার্থক্য দেখিয়ে কাব্য সৃষ্টি করেন। সেই জন্যে ম্যুগোর নোতর দাম দে

পারি, ভবভূতির মালতী মাধব আর বোদেলেয়রের লে ফ্ল্যার্ দ্যু মাল স্থায়ী রসের ভাণ্ডারে পরিণত হয়েছে উপন্যাস, নাটক ও কাব্য রচনা তিনটিতে বীভৎস ও ভয়ানক উপাদানের প্রাচুর্য সত্ত্বেও। কাব্যে কবির অন্তরাত্মা প্রকাশ বড় হয়ে দেখা দিলে নব রসের যে কোন উপাদান গৃহীত হোক না, তাতে কাব্যের হানি হয় না।

অন্তরাত্মা বড়—কথাটির প্রকৃত অর্থ ভেবে দেখা যাক। যে কবি আদর্শবাদী, নীতিবাদী, তিনিই যে কাব্যে বড় অন্তরাত্মার অধিকারী, তা নয়। অন্তরাত্মার প্রকৃত অর্থ, অনুভূতির গভীরতা। যে কবির কাব্যানুভূতি চেতনার গভীর স্তরে উপনীত হয়, তিনিই কাব্যে বড় অন্তরাত্মার অধিকারী। তাঁর সূক্ষ্ম মানসিকতা, মননশীলতা তাঁর কাব্যের ভাষায় প্রতিফলিত হয়। বাইরন নিজে দুর্নীতিপরায়ণ হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতাপ্রসঙ্গে তাঁর চিত্ত প্রসারের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তা বৃহৎ অন্তঃকরণের দ্যোতক। কবির বৃহৎ আত্মার ঔদার্যের পরিচয় অবশ্য ভাষাতেও প্রতিফলিত হওয়া চাই। মিলটনের রচনায় যে কোন পংক্তিতে তাঁর এই আত্মিক বিশালতার পরিচয় পরিস্ফুট। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনী না জানলেও এই প্রসার ধরা যায়।

আধুনিক যুগে মস্তিষ্ক, ইন্দ্রিয় বা স্নায়ুর প্রভাব বেশি হওয়ায় কাব্যে অন্তরাত্মার সাক্ষাৎকার প্রায় দুর্লভ। আধুনিক সাহিত্যিক ঐকান্তিক হয়ে বা সমগ্র ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট ক'রে লেখেন না। লেখায় রচয়িতার সমগ্র চেতনার প্রকাশ প্রায়ই দেখা যায় না। কাব্যবস্তু কি ভাবে কবিচিত্তে প্রতিফলিত হচ্ছে তা দেখে তাঁর অন্তরাত্মা বড় কি না, বোঝা যায়। মহৎ আত্মা ও রসিক মনের পার্থক্য থেকে তথাকথিত Great Art ও Good Art এর প্রভেদের প্রকৃত রহস্য বোঝা যায়।

ব্যক্তিগত জীবনে যাই হোক, রচনাকালে কবির অন্তরাত্মা কবির লেখায় পরিস্ফুট হওয়াই মুখ্য কথা। ব্যক্তিগত জীবনের গুণাগুণ বিচারে দস্যু রত্নাকর থেকে কাজি নজরুল ইসলাম পর্যন্ত অগণিত কবির জীবনযাপন-কাহিনী নিন্দাকলঙ্কমুক্ত নয়। কিন্তু কাব্য রচনার সময়ে কবির বহিরঙ্গকে ঠেলে ফেলে তাঁর অন্তরাত্মা অনেক সময়েই এগিয়ে আসেন। আর সেই জন্যে দূসর ধূলার মর্ত্যভূমিতে সুলভ বর্ণবিলাস প্রকৃত কবি-প্রতিভার দিব্যস্পর্শে উল্লসিত হয়ে অমর আত্মার শিখাকে প্রোজ্জ্বল ক'রে তোলে। যা নেহাৎ মামুলি ও অসার ধূলিম্লান উপাদান, তাই দেখতে দেখতে মানবচেতনাকে রবিকরোজ্জ্বল স্বর্ণিম সুধার স্বাদ বিতরণ করে।

কবিদের অনুভূতি এত সংবেদনশীল যে, তাঁরা সহজে প্রত্যক্ষগোচর ইন্দ্রিয়জগৎ অতিক্রম করতে পারেন এবং চেতনার গভীরতম স্তরে যেখানে পঞ্চেন্দ্রিয়ের চেতনার মধ্যে পারস্পরিক প্রভেদ লুপ্তপ্রায় সেখানে নিজেদের অনুভূতি প্রসারিত করতে পারেন। কিটস্-এর Ode to a Nightingale কবিতায় ফুলের রং, সৌরভ, স্পর্শ সবই একটিমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা হয়েছে। শেলির উত্তেজিত অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে রং, শব্দঝঙ্কার মিশে গেছে একত্র হয়ে। উচ্চতর পর্যায়ের কবিতায় পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের ভোগ একত্র মিলিত হয়।

কবির চেতনা গভীরে গিয়ে না থাকলে অনুভূতির প্রকৃত স্ফুরণ ব্যতীত নিছক বুদ্ধির দ্বারা কাব্যে অন্তরাত্মার প্রকাশ ঘটানো যায় না। মেধা বা প্রচুর পড়াশুনোর দ্বারা কবিত্বের রংমহলের তিমিরদুয়ার খোলা যায় না। অধ্যাত্মসাধকের পক্ষে রসের তিমিরে ডুবে যাওয়া বরং সহজসাধ্য, যদিও সেখানকার বাণী বার্তা কিছুই সাধক বহন ক'রে আনতে পারেন না যদি তিনি সঙ্গে সঙ্গে কবি না হন। অধ্যাত্মজীবন চেতনার যত গভীর স্তর পর্যন্ত প্রসারিত হয়, কবি-জীবন এখনও তা হয় না। ভবিষ্যতের সমাজে হবে কি না, তা বলা কঠিন। এখন পর্যন্ত দেখা যায় যে, কবির শিল্পচেতনা ও ব্যক্তিজীবন অনেক ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র থাকে—খুব কম কবিই প্রকৃত জীবনশিল্পী হতে পারেন। পলকের জন্যে আগত দিব্য অনুভূতিকে শিল্পে ধরা যায় কিনা এবং সেই অনুভূতির সঙ্গে সুসমঞ্জস পথে জীবনকে দৈনন্দিনভাবে চালিত করা যায় কিনা, সেটা এই কারণেই একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। সামঞ্জস্য না

থাকলে শিল্পীর জীবনে শিল্প ও প্রাত্যহিক জীবনযাপন, উভয়ের সংঘর্ষে দুটিই ক্ষুণ্ণ হতে বাধ্য। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও মেটারলিঙ্ক-এর বাইরের অধঃপতন তাঁদের আত্মিক অপকর্ষের নিদর্শন।

জীবনের সঙ্গে শিল্পের একটা আপাত বিরোধ দেখা যায়। অসামান্য শিল্পীর জীবন প্রচলিত মাপের মধ্যে আবদ্ধ থাকে না ব'লেই মনে হয় যে, শিল্প ও জীবনে বিরোধ আছে। কিন্তু এই বিরোধ জীবন থেকে পলায়ন বা জীবনকে অস্বীকার নয়, কেবল অসাধারণ সত্তার অভিব্যক্তি, জীবনের যে-বোধ কবি রচনা করেন তা পালনের জন্যে তাঁর ঐকান্তিক আকূতি। অনেক শিল্পী শিল্পবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে জীবনকে নতুন ক'রে গড়তে চেয়ে পুরোনো জীবনকে ভেঙে ফেলেন কিন্তু নতুন শিল্পবোধ আয়ত্ত করার সঙ্গে সঙ্গে তার উপযুক্ত নতুন জীবনে গঠন করার জীবনশিল্পকৌশল আয়ত্ত করতে পারেন না। সেই জন্যে কোন কোন কবি শিল্পে মহৎ হলেও জীবনে, সাধারণ, সাধারণের চেয়ে নীচ এমন-কি বিকৃত ও কদাচারী হতে পারেন। শেক্‌সপিয়ার, অস্কারওয়াইল্ড, বার্ট্রাণ্ড রাসেল প্রভৃতির রচনা ও মনীষার সঙ্গে তুলনায় জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় যেসব অসঙ্গতির সংবাদ পাওয়া যায়, তাদের মূলে আছে এই বিরোধের অস্তিত্ব।

কাব্যোৎকর্ষের হানি ঘটতে না দিতে হলে সমগ্র চেতনার সহযোগিতা শিল্পসাধনায় একটি আজীবন প্রয়োজন। জীবন থেকেই শিল্প প্রেরণা লাভ করে। জীবন অধোমুখ হলে শিল্পও নেমে যায়। তার নবীন প্রাণোজ্জ্বলতা নষ্ট হয়। সূক্ষ্ম গন্ধসার যেমন পাত্র ব্যতীত ধরা যায় না, শিল্পানুভূতিও তেমনই জীবনাধার ভিন্ন থাকতে পারে না। শিল্পের চরম সার্থকতা ঊর্ধ্বচেতনাময় জীবনেই সম্ভবপর। জীবনকে নিম্নস্তরে প্রত্যাখ্যান ক'রে উচ্চস্তরে জীবনের সূক্ষ্ম বিকাশকে পূর্ণগ্রহণ করাই রোমান্টিক চেতনার লক্ষ্য। তথাকথিত পলায়নী মনোবৃত্তি আসলে জীবনের মূল উৎস আবিষ্কারের প্রয়াস।

কবি তটস্থ ব উদাসীন জীব নন; জীবন-পরিচালক ভাব ও শক্তিসমূহের উপলব্ধিতে তিনি সর্বদা সঞ্চরণশীল; সব সময়ে কর্মের রূপে না হলেও ধ্যান ও মননের দ্বারা তিনি জীবনের মূল প্রবাহের সঙ্গে নিজের চেতনার ধারাটি সংযুক্ত রাখেন। যে-শক্তি ধ্যানে দৃষ্ট ও যে শক্তি কর্মে প্রকাশিত, সেই দুটির মূল উৎসে তাঁর চেতনা সদাবিরাজিত।

জীবনের উচ্চতম স্ফুরণের সঙ্গে শিল্পের উচ্চতম বিকাশের একাত্মতার জন্যে দুয়ের মিশ্রণে ভয় নেই। তাতে বরং সার্থকতর পরিণতি লাভের সম্ভাবনা আছে। শিল্পসাধক যদি একই সঙ্গে জীবনসাধক হন, তা হলে শিল্প উচ্চতম অনুশীলন লাভ করতে পারে। অন্যান্য অবস্থা সমান সমান হলে জীবন-সাধক শিল্পী জীবনে অ-সাধক শিল্পীর চেয়ে বড় হন।

বৈদিক সাহিত্য স্ফুরণের যুগে ভারতীয়-আর্যভাষী সাহিত্যিকদের রচনায় ঋষিত্বের সাধনা আর কবিত্বের ভাবনা একযোগে সংসিদ্ধ ছিল। তার পরে কবিত্বের শাখানদী অন্যদিকে প্রবাহিত হয়েছে। ভবিষ্যতের কবিতায় কবিচেতনা আবার আর্ষচেতনার সঙ্গে মিলে যেতে পারে। অতীতে প্রাচীন ভারতীয়-আর্যভাষায় কবির অখণ্ড চেতনা শরবৎ তন্ময়তা লাভ ক'রে একদিকে প্রযুক্ত হত। বর্তমানে বুদ্ধি দিয়ে খণ্ড খণ্ড ভাবে প্রপঞ্চ মায়ার সমস্ত দিক বিচার করার চেষ্টা হয়। ভবিষ্যতে সমস্ত চেতনার সাহায্যে সমগ্র জীবনের শিল্পায়ন হবে।

নাটক

কুমারলাল দাশগুপ্ত

প্রথম দৃশ্য

মস্ত লাবরেটারির একটা অংশ। অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি ও নিস্তব্ধতা একটা রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সামনে একখানা টেবিল ও কয়েকখানা চেয়ার। পাশের দেয়ালে একটা খোলা জানালা, তার ভিতর দিয়ে সকালের আলো এসে পড়েছে। হাতে একগোছা গোলাপফুল নিয়ে প্রবেশ করে লতা। বয়স চব্বিশ পঁচিশ, সাদাসিদে পোশাক, মুখে-চোখে একটা স্নিগ্ধভাব। টেবিলের এক কোনে ফুলের গোছা রেখে যন্ত্রগুলোর মাঝখানে চুপ করে দাঁড়ায়। একটু পরে একটা যন্ত্রের আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে প্রভাত, বয়স তিরিশ, হাতে টেষ্টটিউব।

প্রভাত—লতা!

লতা—(ডাক শুনে চমকে ওঠে, প্রভাতকে দেখে) একা একা এখানে আমার ভয় করে।

প্রভাত—কেন?

লতা—কেন বলতে পারিনে। বোধ হয় এই যন্ত্রগুলোর জন্যে। মনে হয় যেন ওদের প্রাণ আছে, যেন ওরা চুপি-চুপি একটা ষড়যন্ত্র করছে।

প্রভাত—তোমার শরীর ভাল নেই। কি হয়েছে বলো।

লতা—কিছু তো হয়নি। তবে বাড়ীতে বড্ড একা বোধ হয়। আপনিও অনেকদিন আসেন না।

প্রভাত—আসতে পারি না, সময়ের খুব অভাব।

লতা—আপনার একা বোধ হয় না?

প্রভাত—(হেসে) একা বোধ করবারও সময় নাই।

লতা—তা নয়, হয়তো একা বোধ করেন না। আমারও কাজের অন্ত নাই, তবু একা বোধ করি। (একটু থেমে) অনেক কবিতা লেখা হয়ে পড়ে আছে, আপনার বোধহয় আর শুনতে ভাল লাগে না।

প্রভাত—ভাল লাগে।

লতা—সেই যে জাপানী ফার্ণটা আপনি বাগানে লাগিয়েছিলেন, সেটার কথা জিজ্ঞাসা করেন না, ভুলে গেছেন তাকে?

প্রভাত—ওগুলো প্রায়ই এদেশে বাঁচেনা। বাংলার গরমে টিকবে কিনা সন্দেহ।

লতা—এতদিন টিকে ছিল কিন্তু।

প্রভাত—একদিন গিয়ে দেখবো।

লতা—(একটু হেসে) কবে? আর কিছুদিন ল্যাবরেটারিতে থাকলে আমাকেও ভুলে যাবে।

প্রভাত—(কাছে এসে) না।

লতা—তাই তো মনে হয়।

প্রভাত—না, তা নয়, সুযোগ পেলেই যাব। এখন কতকগুলো বিশেষ পরীক্ষা চলছে। সব সময় ডাঃ মিত্রের কাছে থাকতে হয়।

লতা—বাবাকে দেখতে ইচ্ছে করে, কিন্তু কাছে যেতে সাহস পাইনা। সেদিন গিয়েছিলাম, কথা বলেন নি। একটা যন্ত্রের ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন, আমাকে বোধ হয় দেখতেও পান নি।

প্রভাত—গবেষণায় সবক্ষণ তলিয়ে আছেন। উনি যা আবিষ্কার করেছেন পৃথিবীতে আজপর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক তা করতে পারেনি।

(প্রবেশ করে কনক রায়, জাতীয় মহাবিকাশ পার্টির ধুরন্ধর সচিব। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, চলাফেরা কথাবার্তার মধ্যে হামবড়াভাব, লতা ও প্রভাতকে দেখে দাঁড়ায়)

কনক—আসতে পারি?

(লতা ও প্রভাত ফিরে তাকায়। প্রভাত এগিয়ে যায়। লতা টেবিলের উপর থেকে ফুলের গোছা তুলে নিয়ে একটা শূন্য ফুলদানিতে সাজায়)

প্রভাত—নমস্কার কনকবাবু আসুন। দশটায় আসবেন বলেছিলেন। অনেক আগেই এসে পড়েছেন।

কনক—(নমস্কার করে) ঠিক তাই, অনেক আগেই এসে পড়েছি। এখানকার খবরের জন্যে যে রাত্রে ঘুম হয় না মশায়। বলুন খবর কি?

প্রভাত—খবর ভাল, ল্যাবরেটারির সর্বনিম্ন তাপ ১৮ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, সর্বোচ্চ ২৮ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড জলো ৯০ পারসেন্ট—

কনক—(হাত তুলে) থামুন মশায়, ওসব তথ্য আমি জানতে চাইনে। যে খবর জানতে এসেছি সেই খবর বলুন। কত দূর এগোলো?

প্রভাত—অনেকদূর এগিয়েছে।

কনক—(একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে) অত সংক্ষেপে নয়, খুলে বলুন মশায়।

প্রভাত—ডাঃ মিত্রের অসাধ্য কিছুই নাই। তিনি যখন কাজ হাতে নিয়েছেন তখন নিশ্চিন্ত থাকুন।

কনক—গুরুদায়িত্ব যার ঘাড়ে সে কি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে? রোজই আশা করে আসি শেষ রিপোর্ট পাব। সামনে পার্টির মিটিং সেটা মনে রাখবেন। পার্টি চায় কাজ তাড়াতাড়ি হোক। আর পার্টি চায়, মানে দেশ চায় সেটা বোঝেন তো।

প্রভাত—সব বুঝি। আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করতে হবে।

কনক—(হাত তুলে) আর অপেক্ষা নয়। দেশে দেশে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেছে। যে আগে আবিষ্কার করবে সেই জিতবে। আমাদের পিছিয়ে থাকলে চলবে না।

প্রভাত—মনে হয় পিছিয়ে নেই। এইটুকু শুনে রাখুন খুব মারাত্মক গ্যাস আবিষ্কার হয়েছে। গ্যাসের পরীক্ষা চলছে।

কনক—(উৎসাহিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে) সত্যিই বলছেন প্রভাতবাবু?

প্রভাত—সত্যিই বলছি। আজপর্যন্ত যতরকম মরণগ্যাস আবিষ্কৃত হয়েছে ডাঃ মিত্রের ৫২৫ নম্বর গ্যাস গ্যাসের চেয়ে হাজার গুণ শক্তিশালী।

কনক—(সোৎসাহে) এইরকম গ্যাসই তো চাই। মামুলি একটা গ্যাস আবিষ্কারের জন্তে আমাদের উৎসাহ ন দেশ চায় সব চেয়ে মারাত্মক গ্যাস। পরীক্ষা করে কি রকম ফল পেলেন বলুন তো?

প্রভাত—এখন শেষ পরীক্ষা চলছে।

কনক—(উদগ্রীব হয়ে) কি রকম পরীক্ষা একটু বলুন না মশায়।

প্রভাত—(ল্যাবরেটারির এক প্রান্তে একটা পর্দা দেখিয়ে) ঐ যে পর্দা দেখছেন ওর পেছনে রয়েছে একটা কাঁ ঘর। তাতে পরিমাণমত গ্যাস ঢোকাবার ব্যবস্থা আছে। এখন কাচের ঘরে খরগোশ ঢুকিয়ে তার উপর নম্বর গ্যাসের প্রতিক্রিয়া খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে।

কনক—কি রকম প্রতিক্রিয়া হচ্ছে?

প্রভাত—এই মনে করুন একটা সুস্থ খরগোশ কাঁচের ঘরে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। বাতাসে যেই সামান্য একটু গ মিশিয়ে দেওয়া হোলো, অমনি খরগোশটা টুপকরে মরে পড়ে গেল।

কনক—(নাকে রুমাল দিয়ে) হ্যাঁ মশায়, কাচের ঘর থেকে গ্যাসট্যাস বেরোয় না তো?

প্রভাত—(হেসে) না, একটা পরীক্ষা শেষ হলে কাঁচের ঘরে প্রতিষেধক গ্যাস ছেড়ে দেওয়া হয়, তাতে বিষ গ্যাস নষ্ট হয়ে যায়।

কনক—(নাকের রুমাল সরিয়ে) দিন রাত পরীক্ষা চালিয়ে যান, কাজ শেষ করে ফেলুন।

প্রভাত—আরো কিছু খরগোশ পাঠিয়ে দেবেন।

কনক—খরগোশের অভাব হবে না মশায়। আমার নতুন সেক্রেটারিকে বলে দিয়েছি এখন থেকে বেছে বে প্রাণবন্ত তরুণ খরগোশ নিয়ে আসবে।

(লতা ফুলদানিতে ফুল সাজিয়ে টেবিলের মাঝখানে এনে ফুলদানি রাখে)

প্রভাত—(ফুলদানির উপর ঝুঁকে পড়ে) **Monte Christo?** না। **Marquis de Balbiano. Bourbon grou** **Isle of Bourbon** থেকে এই শ্রেণীর গোলাপ প্রথমে **England**, তারপরে এদেশে আসে।

লতা—এর নাম ধাম সব বল্লেন, সুন্দর কিনা সেকথা তো বল্লেন না?

কনক—আপনার দৃষ্টিভঙ্গী আর বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গী এক হবে কেমন করে?

লতা—প্রভাতবাবু ফুল ভালবাসেন। বাড়ীতে দুজনে মিলে কি সুন্দর বাগান করেছিলাম। আজকাল উনি সময় পান না, আসেন না। আমি একাই দেখি। এ সব আমার বাগানের গোলাপ। বাবা গোলা খুব ভাল বাসেন।

কনক—(আশ্চর্য হয়ে) তাই নাকি?

লতা—ভাবছেন বিজ্ঞানের সঙ্গে বর্ণ গন্ধে সম্বন্ধ কোথায়? আপনি বৈজ্ঞানিককে ভুল বুঝেছেন। তারও সৌন্দর্যবোধ আছে, দয়া মায়া আছে, সুখ দুঃখ আছে। আমার বাবা আপনার আমার মতই মানুষ।

কনক—(মাথা নেড়ে) না, আমি ডাঃ মিত্রকে মানুষ মনে করি না, অতিমানুষ মনে করি। মানুষের ছোটখাট সুখদুঃখ তাঁকে স্পর্শ করে না।

লতা—করে, করে। ছোটবেলায় আমার মা মারা যান, বাবার কাছে আমি মায়ের স্নেহ ভালবাসা পেয়েছি। মনে পড়ে বাবা আমাকে দোলনায় বসিয়ে দোলাতেন, আমার সংগে লুকোচুরি খেলতেন, যেন আমি তাঁর সমবয়সী।

কনক—বিশ্বাস হতে চায় না।

লতা—সত্যই বলছি। অতসময় ল্যাবরেটারিতে বসে বসে আমার জন্যে খেলনা তৈরি করতেন। একবার আমার অসুখ করেছিল, বাবা দিনরাত মাথার কাছে বসে থাকতেন।

প্রভাত—সে অনেক দিনের কথা।

লতা—(দুঃখিতভাবে) হাঁা, সে অনেকদিনের কথা। আজকাল তিনি যেন আগের মত নেই।

কনক—থাকতে পারেন না। আমাকে, তোমাকে, এককথায় মানুষকে তিনি খরগোশের চেয়ে বড় মনে করেন না। একটা মানুষ বা একশটা মানুষ মরে গেলেও তাঁর মনে আঁচড় লাগে না।

লতা—না, না, একথা ভুল, একথা ঠিক নয়।

(একটা বেতের ঝুড়িতে দুটো খরগোশ নিয়ে লিলির প্রবেশ। পোষাক পরিচ্ছদ, প্রসাধন, চলা, বলার কায়দা সবই লিলির অতি আধুনিক)

কনক—এই যে লিলি, খরগোশ এনেছো?

লিলি—হাঁা, এনেছি, খুব সুন্দর দুটো খরগোশ, ধবধবে সাদা। (লতাকে দেখে, ও মা, কতক্ষণ এসেছো ভাই?

লতা—এই একটু আগে।

লিলি—(খরগোশের ঝুড়িটা টেবিলের উপর রাখে, ফুলদানিতে গোলাপ দেখে) কি সুন্দর গোলাপ। লতা এনেছো নিশ্চয়।

লতা—হাঁা, আমার বাগানের গোলাপ।

লিলি—তুমি আনো ফুল, আমি আনি খরগোশ। আমি বড় নিষ্ঠুর তাই না ভাই? (খিলখিল করে হেসে ওঠে)

কনক—ভয় নাই, তোমার পাপ হবে না, তুমি তোমার কর্ত্তব্য করেছো।

লিলি—বাঁচলাম (আবার হাসে)। জানেন, আমরা একসংগে কলেজে পড়েছি। ও ছিল কবি। কলেজের সব চেয়ে ভাল মেয়ে।

লতা—তুমি ছিলে কলেজের সবচেয়ে সুন্দরী মেয়ে।

লিলি—তখন ছিলাম, এখন নেই বুঝি?

লতা—এখনও আছ। তুমি অনেক বদলে গেছ।

লিলি—(খিল খিল করে হেসে ওঠে) আমার খোঁপা, আমার আঁকা ভুরু, আমার ঠোঁটের রঙ, আমার হাইহিল জুতো দেখে বলছো বুঝি?

লতা—(লিলির মুখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসে)

লিলি—আমি বদলেছি, না, যুগ বদলেছে? আমি তো যুগের, নতুন যুগের নতুন উৎসব আয়োজন থেকে সরে থাকবো কেন ভাই? আমি স্রোতের ফুল, স্রোতের সংগে ভেসে যেতে ভালবাসি।

লতা—বেশ তো।

লিলি—মন থেকে বল্লেন। আমি বদলেছি, তুমিও কিন্তু বদলেছো। কি গম্ভীর হয়েছো ভাই! তুমি আর কবিতা লেখো না?

প্রভাত—এখনও লেখে।

লিলি—এই দেখ, আমি কত পিছিয়ে আছি, তোমার আধুনিক কবিতা একটাও পড়িনি। তোমার কথা আমি বুঝতে পারি না, আমার মাথায় কিচ্ছু নাই।

লতা—তা কেন হবে। আমিই ভাল লিখতে পারি না। যা বলতে চাই তা ঠিক বলতে পারি না

প্রভাত—তাই কি? অনেকসময় যেকথা আমরা শুনতে চাই না সে কথা বুঝেও বুঝি না।

লিলি—(খিল খিল করে হেসে) আমরা নতুন যুগের নতুন মানুষ, নতুন কথা শুনতে চাই।

প্রভাত—লতা বলে ও আরো এক পা এগিয়ে আগামী কালের মানুষ হয়েছে। ও আগামী কালের আগমনী গাইছে।

লিলি—তাই নাকি ভাই। তবে তো একদিন তোমার আগামী কালের আগমনী গান শুনতে হবে

লতা—বেশতো, যেদিন তোমার ইচ্ছে হবে এসো।

কনক—(খরগোশের কান ধরে টেনে) খরগোশের কান লম্বা হয় কেন?

(কনকের মুখের দিকে তাকিয়ে সবাই হেসে ওঠে)

কনক—(ভুরু কুঁচকে) হাসছেন কেন?

লিলি—(খিল খিল করে হেসে)

প্রভাত—সচিব মশায় হঠাৎ এমন এক প্রশ্ন করে বসলেন বর্তমান প্রসংগের সংগে যার কোন সম্বন্ধ খুঁজে পাচ্ছি না।

কনক—(বিরক্ত হয়ে) পাবেন না। আমার বক্তব্য হচ্ছে আপনারা দয়াকরে থামুন। এখন কি কাব্য সমালোচনা ভাল লাগে মশায়! দেশের কথা ভাবুন, দশের কথা ভাবুন। আমার দেশকে বিশ্বসভায় সবার উপরে আসন পেতে হবে। শক্তি চাই, মহামারণাস্ত্র চাই। কবিতার নতুন কথা না শুনিয়ে বিজ্ঞানের নতুন কথা শোনান। তাই শুনতেই এসেছি।

প্রভাত—ব্যস্ত হবেন না, পরীক্ষা শেষ হলে ডাঃ মিত্রের মুখেই বিজ্ঞানের নতুন কথা শুনতে পাবেন।

লতা—(এগিয়ে এসে খরগোশের ঝুড়িটা তুলে নিয়ে) কি সুন্দর, কেমন করে তাকাচ্ছে, এদের দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

কনক—আমি ওদের শ্রদ্ধা করি, বিজ্ঞানের প্রগতির জন্যে ওরা প্রাণ দিচ্ছে।

লতা—ওরা তো ইচ্ছেকরে প্রাণ দিচ্ছে না, আপনারা কত কষ্ট দিয়ে ওদের মেরে ফেলছেন। আহা, কত অসহায়! ইচ্ছে করছে এ দুটোকে নিয়ে পালিয়ে যাই।

লিলি—(খিল খিল করে হেসে) How absurd!

প্রভাত—কষ্ট দিয়ে ওদের মারা হয় না, ওরা জানতেও পারে না ওরা মরছে, ওরা ঘুমিয়ে পড়ে। ডাঃ মিত্রের আবিষ্কৃত এই ৫২৫ নম্বর গ্যাসের বিশেষত্ব কি জানো? সাধারণ মরণগ্যাস নিঃশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে গেলে মৃত্যু ঘটে, ৫২৫ নম্বর গায়ে লাগলেই শেষ, তৎক্ষণাৎ মৃত্যু।

লিলি—(খিল খিল করে হেসে) যেন মৃত্যুর নিঃশ্বাস।

কনক—কি সুন্দর!

লতা—আপনি সুন্দর বল্লেন? আমার তো ভয়ঙ্কর মনে হয়।

কনক—যা অসাধারণ আমি তাকেই সুন্দর বলি।

লতা—মৃত্যু কেমন করে সুন্দর হয়?

প্রভাত—ডাঃ মিত্র মৃত্যুকে সুন্দর করতে না পারলেও সহজ করতে পেরেছেন। অ্যাটম বম ভূমিকম্পের মত সব ধ্বংস করে দেয়, শহর ভেঙ্গে গুঁড়ো করে দেয়, পুড়িয়ে ছাই করে দেয়: ৫২৫ নম্বর নিঃশব্দে কেবল প্রাণটি খুঁজে বের করে। শহর যেমন তেমন দাঁড়িয়ে থাকবে, গাছপালা, বাগান সব সাজানো থাকবে, ঘরের আসবাবটি নড়বেনা। সোফার কোনে সুন্দরী যেমন কাত হয়ে বসে আছে ঠিক তেমনি বসে থাকবে। বন্ধুটি জানালার ধারে যেমন দাঁড়িয়ে আছে তেমনি থাকবে, পোষা কুকুরটি টেবিলের নীচে যেমন শুয়ে আছে তেমনি শুয়ে থাকবে, সব যেমন তেমন থাকবে, কেবল প্রাণ থাকবে না।

কনক—(উৎসাহের সঙ্গে) উঃ ডাঃ মিত্র কি বিরাট প্রতিভা। যেদিন ৫২৫ নম্বর গ্যাসের খবর প্রচার হবে সেদিন সারা পৃথিবী আমার দেশের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকবে। সেদিন নতুন ইতিহাস রচিত হবে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ডাঃ মিত্রের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তিনি হবেন চিরস্মরণীয়।

লতা—(ম্লান মুখে) আমার বাবা চিরস্মরণীয় হবেন মানুষকে মারতে শিখিয়ে? না, না, তা যেন কোন দিন না হয়।

কনক—আপনার বাবা চিরস্মরণীয় হবেন দেশকে শক্তিশালী করে। যে মহাশক্তি তিনি দেশের হাতে তুলে দেবেন সমস্ত পৃথিবী তার ভয়ে কাঁপবে, বুঝেছেন, কাঁপবে। কি বলেন প্রভাতবাবু?

প্রভাত—তাইতো মনে হয়, ইতিহাস তো তাই বলে। পৃথিবীতে যে শক্তিধর সেই প্রধান।

কনক—(উৎসাহের সঙ্গে) ঠিক কথা।

লতা—(মাথা নেড়ে) না, ঠিক কথা নয়।

প্রভাত—(লতার হাত ধরে

লতা—(আশ্চর্য হয়ে) কোথায়?

প্রভাত—পাঁচ লক্ষ বছর অতীতে। কি দেখছো?

লতা—(হেসে), পাহাড়, অরণ্য, অদ্ভুত সব প্রাণী, আমার ভয় করছে—

প্রভাত—সেই অরণ্যঘেরা পাহাড়ের একটি গুহা। গুহার সামনে একটু পরিষ্কার জায়গা। তিনটি মানুষ, একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী, একটি শিশু সেখানে বসে। তাদের বলিষ্ঠ দেহ, মাথায় বড় বড় চুল, গায়ে জড়ানো পশুর লোমশ ছাল। পুরুষটি গাছের একটা ডাল আর খানিকটা শক্ত লতা নিয়ে গবেষণা করছে।

লিলি—গবেষণা? বলেন কি, পাঁচ লক্ষ বছর আগেকার বনমানুষ আবার গবেষণা করবে কি?

প্রভাত—হ্যাঁ, গবেষণা, যেমন গবেষণা ডাঃ মিত্র করছেন ঠিক সেই রকম গবেষণা। পুরুষটি ডালটায় লতাটুকু বাঁধছে আর খুলছে। একবার ডালের দুদিকেই লতাটা বেঁধে ফেল্ল, তারপরে চল্ল লতা ধরে টানাটানি। হঠাৎ লতার সঙ্গে জড়িয়ে গেল একটুকরো কাঠ। এবার লতায় টান পড়তেই কাঠের টুকরো ছিটকে দূরে গিয়ে পড়লো।

লতা—ধনুক আবিষ্কার হলো বুঝি?

প্রভাত—ঠিক বলেছো, ধনুক আবিষ্কার হোলো। মস্ত আবিষ্কার। এই যুগের অ্যাটম বম বা ৫২৫ নম্বর গ্যাসের মতই মারণাস্ত্র। মানুষ শক্তিধর হোলো। যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁত, নখ তো অকেজো হয়ে গেলই, লাঠিসোটা, গদাও প্রায় অচল হোলো। ধনুক হাতে মানুষ অরণ্যলোক জয় করে ফেল্ল।

কনক—(মাথা নেড়ে) ঠিক—

প্রভাত—আবার এসো আমার সঙ্গে—

লতা—এবার কোথায়, কতদূর ?

প্রভাত—এবার মাত্র কয়েক শ' বছর অতীতে। স্থান মহাচীন, বাজি তৈরী হচ্ছে, শোরা, গন্ধক, কাঠকয়লা ইত্যাদি মিশিয়ে এমন এক যৌগিক পদার্থ তৈরি হচ্ছে যাতে আগুন লাগামাত্রই বাজি হুস্ করে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে। সেই যৌগিক পদার্থ হোলো বারুদের আদিরূপ। ইউরোপ বারুদকে কাজে লাগালো, তৈরী করলো বন্দুক, কামান।

কনক—আর দেখতে দেখতে ইউরোপ সারা পৃথিবীর মালিক হয়ে বসলো। ইতিহাসের কথা, অস্বীকার করার উপায় নাই।

প্রভাত—(লতার দিকে হাত বাড়িয়ে) আবার এসো—

লতা—(সরে গিয়ে) না, আর আমাকে নিয়ে যাবেন না।

লিলি—(হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে) আমাকে নিয়ে চলুন না।

কনক—(বিরক্তভাবে) তোমার আর অতীতে গিয়ে কাজ নাই, বর্তমানে তোমার অনেক কাজ।

লিলি—আমি সেকেলে বন্দুক কামানের একটা যুদ্ধ দেখতে চেয়েছিলাম।

কনক—দেখতে পাবে, দেখতে পাবে, অধৈর্য হয়ো না, বর্তমানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ দেখতে পাবে। যুদ্ধ আসছে! সেই মহাযুদ্ধে আমাদের ৫২৮ নম্বর গ্যাস কি কাণ্ড করে দেখো।

লতা—ভবিষ্যতেও কি থাকবে মারামারি, হানাহানি ? মানুষ কি কোনদিন সত্যিকার মানুষ হবে না, পশুই থেকে যাবে ? না তা আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

কনক—তুমি বিশ্বাস করতে পারবে না। তুমি একটি শিশু। শিশু যেমন পুতুল নিয়ে খেলা করে, খাওয়ায়, শোয়ায়, পুতুল যেন সত্যিকার মানুষ; তুমিও তেমনি একটা আদর্শ নিয়ে খেলা করছো, মনে করছো আদর্শই বাস্তব। তা নয়, বুঝলে।

লিলি—(খিলখিলিয়ে হেসে) আমি বাস্তববাদী, ধরে ছুঁয়ে সবকিছু অনুভব করতে চাই (প্রভাতের হাত ধরে)

কনক—তোমার ধরাছোঁয়ার ক্ষেত্র ইদানীং বেশ বেড়ে যাচ্ছে লিলি।

(লিলি প্রভাতের হাত ছেড়ে দেয়। হঠাৎ ল্যাবরেটারির ভিতর থেকে ঘড়ির টিক টিক আওয়াজের মত একটা আওয়াজ আসে।)

কনক—ওটা কিসের আওয়াজ, যেন একটা যন্ত্র চলতে শুরু করলো ? উঃ, কি রহস্যময় এই ল্যাবরেটারি!

প্রভাত—বিজ্ঞানের যজ্ঞশালা।

লিলি—ভিতরে এখন কি হচ্ছে বলুন না মিঃ রায় ?

প্রভাত—যন্ত্রপাতিগুলো যথাযথ আছে কিনা দেখা হচ্ছে। একটু পরে একটা পরীক্ষা হবে।

লিলি—আমি দেখবো, আমি ভিতরে গিয়ে দেখবো।

কনক—না, না, ভিতরে যেও না।

লিলি—দূর থেকে একটু দেখেই চলে আসবো। (ভিতরের দিকে এগোয়)

কনক—(তাড়াতাড়ি এসে লিলির হাত ধরে) না, আর এক পাও ওদিকে এগিয়ো না। সেই রকম চোখ দিয়ে একটু দেখাই যথেষ্ট। এই বিষয় নিয়ে অনেক বৈজ্ঞানিক মাথা ঘামাচ্ছেন। এতটুকু তথ্য ফাঁস হয়ে গেলেই সব পরিশ্রম পণ্ড হয়ে যাবে।

লিলি—আমাকে বিশ্বাস করছেন না ?

প্রভাত—(মাথা নেড়ে) না।

কনক—চলো লিলি, এখানে আর কোন কাজ নাই।

লিলি—(লতার দিকে এগিয়ে) তাহলে কবে যাব তোমার কবিতা শুনতে ?

লতা—যেদিন তোমার ইচ্ছে হবে এসো। আমার বাড়ী তো তুমি চেনো।

লিলি—অনেককাল আগে গিয়েছি। ঠিক মনে নেই। মিঃ রায়কে সঙ্গে নিয়ে যাব, তাহলে আর পথ ভুল হবে না।

প্রভাত—আমার উপর নির্ভর করলে আপনার হয়তো ওদিকে যাওয়াই হবে না।

লিলি—(হাসতে হাসতে) আপনাকে ধরে নিয়ে যাব। চল তাহলে লতা, বাই, বাই।

(কনক ও লিলি চলে যায়)

লতা—(প্রভাতের কাছে এসে) কেমন আছেন ?

প্রভাত—ভাল আছি।

লতা—খুব কাজ, খুব ব্যস্ত ?

প্রভাত—খুব।

লতা—একটু সময় করতে পারবেন না ?

প্রভাত—(হাতঘড়ি দেখে) পারবো, বলো কি করতে হবে ?

লতা—(প্রভাতের হাত ধরে) চলুন আমার সঙ্গে।

প্রভাত—কোথায় ?

লতা—দুবার আপনি আমাকে অতীতে নিয়ে গেছেন, আমি একবার নিয়ে যাব ভবিষ্যতে।

প্রভাত—(হাসতে হাসতে) কত দূরে ? পাঁচহাজার বছর, পঁচিশ হাজার বছর পরে ?

লতা—না, অত দূরে নয়, খুব কাছাকাছি, শতাব্দীর শেষের দিকে নিয়ে যাব।

প্রভাত—(চোখে হাত বুলিয়ে) কি দেখবো, কি আছে সেখানে ?

লতা—পাহাড়, অরণ্য, সবুজ মাঠ, জলভরা নদী, গ্রাম, শহর—দেখছেন ?

প্রভাত—(হাসতে হাসতে) হাঁ, দেখছি সবুজ মাঠ, জলভরা নদী, গ্রাম, শহর অসংখ্য Sky Scraper, বড় বড় কারখানা। পথদিয়ে চলেছে স্রোতের মত গাড়ী। আকাশে উড়ছে এরোপ্লেন, বাতাসে ভাসছে রেডিওর গান বাজনা—

লতা—ওসব কি দেখছেন আপনি। ও নয়।

প্রভাত—তবে কি ?

লতা—দেখুন, পথ দিয়ে চলেছে পথিক, আকাশে উড়ছে পাখী, বাতাসে ভাসছে ফুলের গন্ধ। পথের পাশে বাগান, মাঝখানে ছবিরমত সুন্দর ছোট্ট বাড়ীখানা। সাজানো বসবার ঘর, সোফার কোণে বসে আছি আমি, জানালার ধারে দাঁড়িয়ে আছ তুমি, টেবিলের নীচে শুয়ে আছে কুকুরটি—

প্রভাত—(হাসতে হাসতে) সব যেমন আছে তেমন, কেবল প্রাণ নাই।

লতা—(প্রভাতকে থামিয়ে) না, না, ও কথা বলবেন না, আপনি বেঁচে, আমি বেঁচে, পশুপক্ষী সব বেঁচে, মৃত্যুর সেখানে স্থান নাই। আমার ভবিষ্যৎকে আপনি ধ্বংস করবেন না, আমার ভবিষ্যৎকে আপনি বাঁচান। আপনি তো আমাকে ভালবাসেন, বাঁচাবেন না আপনি আমাকে ?

প্রভাত—আমি কি বাঁচতে চাই, তুমি কি বাঁচতে চাও, মানুষ কি বাঁচতে চায় ?

লতা—বাঁচতে চায়, বাঁচতে চায়। তার বাপ, তার মা, তার স্বামী, তার স্ত্রী, তার ভাইবোন, ছেলে, তার ঘর, তার শিল্প, তার সাহিত্য, তার ভালবাসা, সে কি চায় তার এইসব অমূল্য সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাক ? না, তা চায় না, চায় না। বলুন, আপনি বাঁচাবেন।

প্রভাত—কেমন করে বাঁচাবো, বাঁচাবার বিদ্যা আমি জানিনা।

লতা—শিখুন সেই বিদ্যা, ছেড়ে দিন এই মরণ-গবেষণা, বলুন বাবাকে, বলুন আপনার বিজ্ঞান-দেবতাকে, মানুষ মরতে চায় না, বাঁচতে চায়। তিনি বাঁচান সবাইকে, পৃথিবীর ভয় দূর হয়ে যাক।

(ল্যাবরেটারির ভিতর থেকে একটা ঘন্টার আওয়াজ ভেসে আসে)

প্রভাত—(ত্রস্তভাবে) ডাঃ মিত্র আমাকে ডাকছেন, আমাকে যেতে হবে।

লতা—(প্রভাতের হাত ধরে) বলুন আপনি বাবাকে বলবেন ?

প্রভাত—সে সাহস আমার নাই।

(খরগোশের ঝুড়িটা তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি ভিতরে চলে যায়। ঘন্টা বাজতে থাকে, লতা অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ঘন্টা থেমে যায়—ধীরে ধীরে লতা বেরিয়ে যায়)

দ্বিতীয় দৃশ্য

একটা বাড়ীর সামনের বারান্দা। বারান্দায় তিন চারখানা বেতের চেয়ার ও একখানা টেবিল, একপাশে একটা দোলনা ঝুলছে, আর একপাশে খাঁচায় কয়েকটা খরগোশ রয়েছে। বারান্দার সামনে বাগান। বিকেল বেলা। বাগানে দাঁড়িয়ে লতা আর তার পিসীমা। পিসীমার বয়স ষাট, সুন্দর স্বাস্থ্য পাকা চুল পরিপাটি করে বাঁধা। প্রসাধন ও পোষাকের পরিপাট্য আছে, সর্বাঙ্গে সৌন্দর্যের ছাপ এখনও স্পষ্ট।

পিসীমা—(চারিদিকে তাকিয়ে) হ্যাঁ রে লতা, ওখানে যে রজনীগন্ধার ঝাড়গুলো ছিল, সেগুলো কি হোলো ?

লতা—মরে গেছে পিসীমা, নতুন ঝাড় আর লাগানো হয়নি।

পিসীমা—কেন রে, সময় পাসনে বুঝি ?

লতা—সময়ের তেমন অভাব নাই, আর ভাল লাগেনা পিসীমা। নতুন গাছ আর লাগাই না, যা আছে তা কোন মতে বাঁচিয়ে রাখি।

পিসীমা—(একপাশে একটা শুকনো গাছের কাছে গিয়ে) এটা না সেই জাপানের ফার্ণটা, প্রভাতের বন্ধু জাপান থেকে এনে দিয়েছিল ?

লতা—(মাথা নেড়ে) হ্যাঁ পিসীমা।

পিসীমা—মরে শুকিয়ে গেছে যে !

লতা—বাংলার মাটি আর জলহাওয়ায় টিকলো না।

পিসীমা—আগের বারে এসে দেখেছিলাম বেঁচে আছে। প্রভাত বলেছিল সে বাঁচিয়ে রাখবে। গাছের গোড়ায় কতরকম সার দিতো।

লতা—বৈজ্ঞানিক এখন আর বাঁচাবার বিদ্যা চর্চা করছেন না।

পিসীমা—গোলাপ ফুটতে শুরু করেছে রে।

লতা—হ্যাঁ পিসিমা। বাবা গোলাপ ভালবাসেন বলে আমি গাছে দুবার করে জল দি। বাবা দেখলে খুসী হবেন

পিসীমা—আমিও গোলাপ ভালবাসি. গোটাকয়েক নিয়ে আসি। ফুলদানিতে রাখবো। (এগিয়ে যান)

(প্রবেশ করে লিলি, পিছনে প্রভাত)

লিলি—(বাগানে লতাকে দেখে) লতা।

লতা—(লিলিকে দেখে তাড়াতাড়ি কাছে এসে) আরে লিলি যে, এসে পড়েছো ভাই!

লিলি—প্রভাতবাবুকে একরকম জোরকরে ধরে এনেছি। আসতে কি চান, বলেন কাজের ক্ষতি হবে।

লতা—অনেকদিন পরে এদিকে এলেন।

প্রভাত—কেউ টেনে হিঁচড়ে বার না করলে ল্যাবরেটারি থেকে বেরোনো আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব।

লতা—চলো, ভিতরে গিয়ে বসি।

লিলি—ভিতরে কেন ভাই. এই পোর্টিকোতে বসি।

লতা—তাই বোসো।

(প্রভাত বেতের চেয়ারগুলো টেনে এনে দেয়। সবাই বসে)

লিলি—(চারিদিকে তাকিয়ে) তোমার কি সুন্দর বাগান।

লতা—সবখানি প্রশংসা আমার প্রাপ্য নয়, বেশীর ভাগই প্রভাতবাবুর প্রাপ্য। ওঁর সাহায্য না পেলে আমি এত ফুল ফোটাতে পারতাম না!

লিলি—(বাঁক ভুরুজুটি নাচিয়ে প্রভাতের দিকে তাকিয়ে) তাই নাকি?

প্রভাত—কেমিষ্ট্রি-পড়া ছাত্রের সৌন্দর্যবোধ কতখানি থাকতে পারে বুঝে নিন।

লতা—আইনষ্টাইন বেহালা বাজাতেন।

লিলি—(খিল খিল করে হেসে) জবাব দিন মিঃ রায়।

প্রভাত—হার মানলাম। তবে এই যুক্ত উদ্যোগে আমি কোদালই চালিয়েছি, তার বেশী নয়।

লিলি—(দোলনাটা দেখে) দোলনা কেন ভাই? তুমি দোলো বুঝি?

লতা—এক সময় দুলতাম। তখন আমি ছোট্ট। আমি দুলতাম, বাবা আমাকে দোল দিতেন। বাবা যেন আমার সমবয়সী। বলতাম জোরে ঠেলে দাও, বাবা জোরে ঠেলে দিতেন, কি যে মজা হোতো।

লিলি—যিনি একটা ফুঁ দিয়ে হাজার হাজার জীবন-প্রদীপ নিভিয়ে দিতে পারেন, তিনি সাধারণ মানুষের মত মেয়েকে দোলায় বসিয়ে দোলাতেন এ যেন বিশ্বাস হতে চায় না।

লতা—সত্যিই বলছি বাবা আমাকে দোলাতেন। আমার সংগে খেলতেন, হাসাতেন, হাসতেন।

প্রভাত—আমি কখনো তাঁকে হাসতে দেখিনি।

লতা—হাসতেন, সত্যিই হাসতেন, আপনার আমার মত হাসতেন, গল্প করতেন। (একটু থেমে) এখন আর হাসেন না।

লিলি—(কাঠের বাক্সতে খরগোশ দেখে) ও মা গো, ওগুলো কি পুষেছো লতা, গিনিপিগ?

লতা—না, গিনিপিগ নয়, ওগুলো খরগোশ।

লিলি—(খিল খিল করে হেসে) তোমার ভাই সখ আছে।

প্রভাত—সখ না বলে দয়া বলাই ঠিক। ল্যাবরেটারিতে প্রথম প্রথম আমাদের পরীক্ষায় যে খরগোশগুলো মরতো না, অথচ কানা খোঁড়া হয়ে থাকতো, লতা সেগুলোকে এনে পুষেছে। যত্ন করে, খেতে দেয়।

লিলি—তাই নাকি? তা, ওগুলো বাঁচিয়ে রেখেই বা লাভ কি?

লতা—লাভ? লাভ লোকশানের কথা ভাবিনি। ওদের অবস্থা দেখে কষ্ট হয়েছে তাই নিয়ে এসে কাছে রেখেছি। বাঁচতে কে না চায় বলো? অন্ধ মানুষও বাঁচতে চায়, খোঁড়া মানুষও বাঁচতে চায়।

(বাক্স থেকে একটা খরগোশ বার করে আনে)

দেখো, এটা অন্ধ, কেমন অসহায়ভাবে এদিক ওদিক মাথা নাড়ছে ঠিক অন্ধ মানুষের মত। একটু কোলে নাও, দেখবে তোমার হাতে মাথা ঘষবে। এরাও ভালবাসা বুঝতে পারে।

লিলি—না ভাই, আমি কোলে নিতে চাইনে, আমার ঘেন্না করে।

(লতা খরগোশটা খাঁচায় রেখে আসে)

লিলি—(তাকের উপর একখানা ট্রেতে গোটা দুই Test tube ও আরো কিছু জিনিষ দেখে) তাকের উপর ওগুলো কি ভাই?

লতা—আমার ল্যাবরেটারি।

লিলি—তোমার ল্যাবরেটারি?

লতা—হ্যাঁ ছোটবেলায় আমি একদিন বাবাকে বলেছিলাম, আমি তোমার মত মস্ত বৈজ্ঞানিক হব। গোটা দুই Test tube, একটা beaker, pipette, burette, এনে দিয়েছিলেন। আমি তাই নিয়ে খেলা করতাম। বাবা দেখে হাসতেন।

লিলি—(খিল খিল করে হেসে) তোমার Mini Laboratary!

প্রভাত—যাই বলুন, ঐ Test tube, beaker, pipette, burette যেমন বিজ্ঞানের আদিতে দরকার, তেমন অন্তেও দরকার। ও ছাড়া বিজ্ঞানচর্চা হয় না, বড় বড় আবিষ্কারও হয় না।

লিলি—তুমি কবি মন নিয়ে জন্মেছো ভাই, তুমি কোনো কালেও বৈজ্ঞানিক হতে পারবে না। তোমরা ভাই এমন জগতে বাস করো যেখানে দুইএ দুইএ পাঁচ হয়, বৈজ্ঞানিকের বাস্তব জগতে চিরকাল দুইএ দুইএ চার হয়। (খিল খিল করে হেসে ওঠে)

প্রভাত—অনেকসময় দুইএ দুইএ যে পাঁচ হয়, বৈজ্ঞানিকরাও এখন তা অস্বীকার করতে পারছেন না!

লিলি—ঐ দেখো, বৈজ্ঞানিক তোমার দলে ভিড়ে গেলেন, আমি চুপ করলাম।

লতা—তাই একটু করো, আমি ততক্ষণ চা করে নিয়ে আসি।

প্রভাত—কথা ছিল কবিতা পড়া হবে।

লিলি—তাই তো, তোমার কবিতা কখন পড়বে লতা?

লতা—যখন বলবে।

লিলি—তাহলে আর দেরী কোরো না, তোমার কবিতার খাতা নিয়ে এসো।

(লতা ভিতরে যায়, কবিতার খাতা এনে বসে, পাতা ওলটায়, বাগান থেকে এসে পিসীমা পোর্টিকোর সামনে দাঁড়ান)

প্রভাত—(উঠে দাড়িয়ে) কবে এলেন পিসীমা? বসুন (চেয়ার এগিয়ে দেয়)

পিসীমা—আজকাল প্রায়ই আসছি। লতা বড্ড একা বোধ করে। করবেই তো, দাদা বাড়ী আসা ছেড়ে

দিয়েছেন। ভাল আছ তো বাবা? লতা বলছিল তুমিও আজকাল এদিকে আসবার সময় পাও না, কাজে খুব ব্যস্ত আছ?

প্রভাত—হ্যাঁ পিসীমা, সারাদিন প্রায় ল্যাবরেটারিতেই কাটাতে হয়।

(পিসীমা লিলির দিকে তাকান)

লতা—ও লিলি, আমার বন্ধু, আমরা একসংগে কলেজে পড়েছি।

(লিলি উঠে দাঁড়ায়, নমস্কার করে)

পিসীমা—বোসো, বোসো। আহা কি সুন্দর, যেন তাজা গোলাপ ফুলটি।

লিলি—(বসে) অত প্রশংসা করবেন না পিসীমা, আপনার পাশে আমি কিছুই না।

পিসীমা—ওমা, সে কি কথা, আমি বুড়ী!

লিলি—আপনি এখনও কত সুন্দর! পাকা চুল আপনাকে বুড়ী করতে পারেনি।

পিসীমা—(হাসতে হাসতে) আমি বুড়ী হতে চাইনে।

লতা—বয়স যে বুড়ী করে দেয় পিসীমা। কিন্তু বয়স আপনার বেলায় হার মেনেছে।

পিসীমা—আমি কোন দিন বুড়ী হব না। আমি তাড়াতাড়ি মরতে চাইনে, আমি আরো বাঁচতে চাই।

লিলি—বেশীদিন বাঁচায় কি আনন্দ আছে পিসীমা?

পিসীমা—বেশীদিন! পাকা চুল দেখে ভাবছো বুঝি আমার বয়স আশি কি নব্বই! তা নয়, আমার বয়স মাত্র ষাট।

(লিলি খিল খিল করে হেসে ওঠে)

পিসীমা—তোমরা হাসছো, আমি তোমাদের চেয়ে মাত্র কয়েক পা এগিয়ে! আমার ষাট বছর বয়স, কিন্তু আজও আমার ছেলেবেলার কথা স্পষ্ট মনে পড়ে—সেই ডুরে শাড়ী পড়ে পায়ের মল বাজিয়ে বাড়ীময় লাফিয়ে বেড়ানো, ভোরে উঠে সাজি নিয়ে ফুল তোলা, দুপুরে পুকুরে সাঁতার কাটা, বিকেলবেলা বিনুনি করে চুল বাঁধা, যেন সব কালকের কথা।

লিলি—আমারও ছোটবেলার কথা মনে পড়ে। আমি একটা ফুলদানি ভেঙ্গে ফেলেছিলাম, মা ঘরে বন্ধ করে রেখেছিলেন, রাগে আমি ঘরের সব জিনিষ ভেঙ্গে ফেলেছিলাম। বলুন পিসীমা, তারপরে?

পিসীমা—তারপরে যৌবনের উচ্ছল দিনগুলো।

লিলি—(খিলখিল করে হেসে) আপনাদের আমলে যৌবনের উচ্ছলদিন কি ছিলো পিসীমা?

পিসীমা—কেন থাকবে না? যৌবন কি শুধু একালের, সেকালের নয়? ওগো খুকিটি, যেখানে যৌবন সেখানেই প্রেম, সেখানেই উচ্ছল দিন।

লতা—কি সুন্দর কথা বলেছেন পিসীমা।

লিলি—(বিদ্রূপের স্বরে) সেকালের মেয়েরা তো বিয়ের পরে প্রেম করতো, তাই না পিসীমা? তাদের প্রেম মানে তো বিয়ের পরে শ্বশুরবাড়ী এসে রান্নাঘরে ঢোকা! হ্যাঁ, পিসিমা, দশ বার বছরের মেয়ে আবার প্রেমের কি জানে?

পিসীমা—তা যে কি সুন্দর ছিল তা কি বলব তোমাকে। সারা দিন দেখা হবার, কথা বলবার জো ছিল না, কেবল কান পেতে থাকা, দূর থেকে দু এক টুকরো কথা আর পায়ের আওয়াজ শোনা। তোমরা শুনলে অবাক হবে, হাজার জনের মধ্যে আমি ওঁর পায়ের আওয়াজ চিনতাম।

লিলি—(হেসে) এর নাম প্রেম?

লতা—ওঁকে বলতে দাও ভাই।

পিসীমা—তারপর সারারাত কথা, ঘুমোতাম না। আজকাল দেখি সারাদিন কথা বলছে, রাত্রে কথা বলার দরকারই হয় না। যখন বিয়ে হোলো ওঁর বয়স ষোল কি সতর, সবে কলেজে ঢুকেছেন, আমার বয়স বার, আমরা খেলা করেছি, ঝগড়া করেছি, ভালবেসেছি। মুখ না খুলতেই উনি কি বলবেন তা আমি বুঝতে পারি। আজকের বউ তা পারে?

লিলি—সেই আগেকার দিনের কথা ভেবে আপনার বুঝি কষ্ট হয় পিসীমা?

পিসীমা—(মাথা নেড়ে) না। আমি কি মরে গেছি? আমি যেমন সেযুগের তেমন এযুগের। সেদিনের সঙ্গে আজকের যোগ আছে, আজও আমার মন তাজা আছে। দুঃখ, দারিদ্র্য মানুষের মনকে মেরে ফেলে, বয়স মনকে মেরে ফেলে না। আমি আরও বাঁচতে চাই।

লিলি—আমরা সবাই বাঁচতে চাই।

পিসীমা—বেঁচে থাকো, একশো বছর পরমায়ু হোক।

লতা—একশো কেন পিসীমা, দুশো কেন নয়, তিনশো কেন নয়?

পিসীমা—ওর জবাব আমি দিতে পারবো না, প্রভাতকে জিজ্ঞাসা করো, জবাব হয়তো ও দিতে পারবে। ও বৈজ্ঞানিক, এমন একটা কিছু আবিষ্কার করবে যা খেলে মানুষ দু তিনশো বছর বাঁচবে।

লতা—বলুন না ওঁকে তাই করতে!

পিসীমা—(হাসতে হাসতে) তাই করো বাবা, তাহলে আমি আবার খুকী হই।

[লিলি খিল খিল করে হেসে ওঠে]

পিসীমা—(উঠে) তোমরা গল্প করো, আমি চলি আমার কাজ আছে।

লিলি—বসুন, বসুন পিসিমা, কাজ পরে হবে।

পিসীমা—কাজ যত পরে করবো খাওয়াটা তত পরে হবে। কিন্তু পেটের তো সবুর সয় না। (প্রভাতকে) হ্যাঁ বাবা, এই খাওয়ার ঝঞ্ঝাটটা যদি মিটিয়ে দিতে পার তাহলে পৃথিবীর মানুষ তোমাকে আশীর্বাদ করবে।

প্রভাত—আপনি আমাকে বিখ্যাত না করে ছাড়বেন না পিসীমা।

লতা—বৈজ্ঞানিকরা যদি খাদ্যটা জল, বাতাস আর আলোর মত সহজলভ্য করে দেন তাহলে বড় বড় ismগুলো যে অকেজো হয়ে যায়!

পিসীমা—তা যাক বাছা, পৃথিবীর মানুষ শান্তিতে হেসে খেলে বাঁচুক।

[পিসীমা ভিতরে চলে যান]

প্রভাত—কবিতা পড়া হোলো না।

লিলি—এবার তোমার খাতা খোল ভাই, আমরা জমিয়ে বসি।

লতা—আমার কবিতা পড়া হয়ে গেছে।

লিলি—খাতা না খুলেই কবিতা পড়া হয়ে গেল? আমরা তো শুনতে পেলাম না!

লতা—এই তো একটু আগে আমার কবিতা শুনলে। পিসীমা পড়ে শোনালেন।

[লিলি খিল খিল করে হেসে উঠে]

লতা—সত্যি বলছি, পিসীমা যা বল্লেন ঐ আমার কবিতা। কেমন লাগলো বলো।

লিলি—আমিও বুড়ী হতে চাইনে, মরতে চাইনে।

লতা—কেউ মরতে চায় না।

প্রভাত—আপনারা স্বপ্ন দেখুন, আমি উঠি।

লতা—আর একটু বসবেন না ?

প্রভাত—ল্যাবরেটারি থেকে পালিয়ে এসেছি। যেতেই হবে। (উঠে দাঁড়ায়)

[লিলিও ওঠে দাঁড়ায়]

লতা—তুমি কেন উঠলে ভাই, তুমি বোসো।

লিলি—অনেক কাজ যে, Boss হয়তো এতক্ষণ সারা শহর আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। চলি ভাই। বাই, বাই।

লতা—তোমাদের সবারই কাজ, আমিই একমাত্র অকেজো।

[প্রভাত লতার দিকে তাকিয়ে একটু হাসে, তারপরে—এগোয়, সংগে আসে লিলি। লতা তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে]

তৃতীয় দৃশ্য

(প্রকাণ্ড বসবার ঘর, দামী আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো, দেওয়ালে ঝুলছে বড় বড় ছবি, মেজেতে কারপেট পাতা। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে সাত আট বছরের একটি ছেলে air gun দিয়ে লক্ষ্যভেদ করছে। দক্ষিণী শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন একটি নটরাজ মেজেতে পড়ে আছে। ছেলেটি চীনে-তৈরী একটি প্রাচীন ফুলদানিকে তাক করছে এমন সময় প্রবেশ করে কনক)

কনক—(চারিদিকে তাকিয়ে) কি কচ্ছিস খোকা ?

খোকা—(বন্দুক নামিয়ে) বন্দুক চালানো শিখছি বাবা, হাতের টিপ ঠিক করছি।

কনক—(বুঝতে না পেরে) হাতের টিপ ?

খোকা—হ্যাঁ বাবা, এক গুলিতে নটরাজকে কাত করে ফেলে দিয়েছি। হাত ঠিক হয়ে আসছে।

কনক—(অবাক হয়ে) নটরাজকে কাত করে ফেলেছিস মানে ?

খোকা—ঠিক মাথায় লেগেছিল কিনা তাই প্রথম চোটেই পড়ে গেল। ঐ দেখনা টেবিলের নীচে পড়ে আছে।

কনক—(বিরক্ত হয়ে) বন্দুকটা।

খোকা—দিচ্ছি বাবা, আগে তোমাকে হাতের টিপ দেখিয়ে দি (বন্দুক তুলে ফুলদানি লক্ষ্য করে গুলি করে, ফুলদানি ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ে যায়)

কনক—(ব্যস্ত হয়ে এগিয়ে যায়) কি করলি খোকা কি করলি !

ফুলদানির একটুকরো হাতে নিয়ে) আমার দামী Chinese টা। মিং যুগের, অনেক টাকা খরচ করে সংগ্রহ করেছিলাম।

খোকা—(হাসতে হাসতে) দেখলে কেমন টিপ ?

কনক—এ সব কি কাণ্ড করছিস ? সব জিনিষ ভেঙ্গেচুরে তছনছ করছিস ?

খোকা—বন্দুক চালাতে শিখছি বাবা, আমি সৈন্য হব, যুদ্ধ করবো।

কনক—[ধমক দিয়ে] লেখা নাই, পড়া নাই, সৈন্য হবে, বন্দুক চালাতে শিখছে!

খোকা—কেন বাবা, তুমিই তো বলেছো যুদ্ধ হবে। ভীষণ যুদ্ধ হবে! আমি তখন লড়বো, তখন আসল বন্দুক দিয়ে এমনি করে।

[বন্দুক তুলে দেয়ালে টাঙানো একখানা ছবিকে তাক করে]

কনক—[খোকার হাতথেকে বন্দুক কেড়ে নিয়ে] ওকি করছিস্, উনি যে তোর ঠাকুরদাদা!

খোকা—ঠাকুরদাদা তো কবেই মরে গেছেন, আর তো মরবেন না। এবার আমরা মরবো, তাই না বাবা?

কনক—এ সব কি বলছিস খোকা?

খোকা—এবার নাকি গ্যাসের যুদ্ধ হবে, দুপক্ষেরই গ্যাস। সে গ্যাস গায়ে একটু লাগলেই নাকি মানুষ মরে যায়। হ্যাঁ বাবা, আমরা সবাই তো মরে যাব, তুমি আমি, মা মাষ্টার মশায়, আয়া, দারোয়ান সবাই মরে যাব।

কনক—কে বলেছে তোকে এসব কথা? মা কোথায়?

খোকা—মা ওঘরে বই পড়ছে। মা, মা।

[প্রবেশ করে রমা। সুন্দর চেহারা, খোলা চুল পিঠের উপর ছড়ানো, হাতে একখানা বই]

রমা—কি হোলো, এত হৈচৈ কেন?

কনক—কি হয়েছে চেয়ে দেখো, খোকার কাণ্ড। বলছে গ্যাসের যুদ্ধ হবে। কে বলেছে ওকে এসব কথা?

রমা—আমি তো বলি নি। কে বলেছে অনুমান করে নাও।

কনক—অনুমান-টনুমান আমি করতে পারি না। কে বলেছে বলো।

রমা—বলেছে তোমার দশম প্রাইভেট সেক্রেটারিটি।

কনক—[আশ্চর্য হয়ে] লিলি বলেছে?

রমা—বিশ্বাস হচ্ছে না?

কনক—সে তো এত বোকা নয়।

রমা—বোকা কেন হবে, খুবই বুদ্ধিমতী। কতবড় মস্তিষ্ক তা খোঁপার উচ্চতা দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

কনক—যদি বলে থাকে তাহলে খুব অন্যায় করেছে।

খোকা—বাবা, লিলি মাসিমা বলেছেন গ্যাসের যুদ্ধে আমরা সবাই মরে যাব, একটুও কষ্ট হবে না। সত্যি নাকি?

কনক—বাজে কথা, বাজে কথা।

খোকা—তুমি কেন আমাকে অমন সুন্দর কুকুরটা কিনে দিলে, ওটাও তো মরে যাবে?

কনক—[জবাব দেয় না]

খোকা—বলো না বাবা, আমি কি তোমার মত অত বড় হব?

কনক—কি সব বাজে কথা বলছিস খোকা! বড় হবি বই কি, আমার চেয়েও বড় হবি।

খোকা—তাহলে আমি মরবো না?

কনক—[খোকার হাত ধরে] না।

খোকা—মা মরবে না?

কনক—না।

[রমা হেসে ওঠে]

কনক—[বিরক্ত হয়ে] হাসছো কেন?

রমা—মারার ব্যবস্থাটি করছো অথচ বলছো মরবো না, তাই হাসছি।

কনক—আমরা কেন মরবো ? আমরা মরবো না।

রমা—আমরা কি অমর ?

কনক—আরে তা নয়, আমরা মারবো, মরবো না, বুঝলে ?

রমা—তুমি কি মনে করছো অন্য দেশে অন্য বৈজ্ঞানিক ৫২৫ নম্বরের উপরে ৫নম্বর গ্যাস আবিষ্কার করবার চেষ্টা করছে না ?

কনক—হয়তো করছে।

রমা—লড়াই যদি বাধে তাহলে কারা আগে মরবে বলতে পার ?

কনক—আমরা মরবো না, যাতে না মরি সে ব্যবস্থা আমরা করবো, করছি।

রমা—কে বলবে সেই ব্যবস্থা নিরাপদ হবে ?

কনক—আরে আমি বলছি, আমি, আমি।

রমা—[হাসতে হাসতে]তুমি ?

কনক –[বিরক্ত হয়ে] বিশ্বাস হচ্ছে না ?

রমা—হচ্ছে, খুব হচ্ছে। মটির তলায় মজবুত আর নিরন্ধ্র ঘর তৈরি করছো।

কনক –(খুশী হয়ে) ঠিক তাই, এবার মাটির নিচে নয়, জলের নীচে।

রমা—(হাসে)

কনক—এ ছাড়াও আরো অনেক কিছু।

রমা—কিন্তু মশায়, শত্রু যদি গ্যাসমুখোশ পরবার, জলের তলের ঘরে ঢোকবার ও আরো অনেক কিছু করবার আগেই বাতাসে তার গ্যাস ছড়িয়ে দেয়, যাকে বলা হয় surprise attack, তা হলে ?

কনক—[বিরক্ত হয়ে] জানি, জানি, ওসব ফন্দিফিকিরে গত যুদ্ধে কাজ হয়েছে, এবার আর হবে না। এবার আঁটঘাট ভাল করে বাঁধা, বুঝলে ?

রমা—[হাসতে হাসতে] বুঝলাম।

কনক—তোমার সব কথাতেই হাসি।

রমা—[হাসতে হাসতে] একটা কথা ভেবে হাসি পেল।

কনক—হাসি থামিয়ে বলো কি কথা ?

রমা—আচ্ছা, তোমার বৈজ্ঞানিক শুনেছি মস্ত বৈজ্ঞানিক, তাঁর আবিষ্কারে দুনিয়ার তাক লেগে গেছে, তাঁর পেছনে অনেক টাকাও খরচ করছো—

কনক—তা করছি, দেশের জন্যে করছি। আমাদের দেশকে বিশ্বসভায় সবার উপরে আসন পেতে হবে। আমরা বিশ্বের নতুন ইতিহাস রচনা করবো, আমরা—

রমা—[বাধা দিয়ে] থামো, মিটিং-এর বক্তৃতা আর এখানে ঝেড়োনা।

কনক—[থেমে] কি বলছিলে বলো।

রমা—বলছিলাম কি তোমার সেই বৈজ্ঞানিককে দিয়ে একটা অতি সহজ কাজ করাও না।

কনক—সহজ কাজ ? কি সহজ কাজ ?

রমা—[হাসতে হাসতে] এমন একটা গ্যাস আবিষ্কার করতে বলো যা ছেড়ে দিলে কেবল আরশোলা আর ইঁদুর মরবে, আর কিছু মরবে না। একটা গ্যাস-বোমায় শহরের সব আরশোলা আর ইঁদুর যেখানে যেটি দাঁড়িয়ে আছে, বসে আছে বা শুয়ে আছে সেইখানে সেইভাবেই বিনা কষ্টে মরে যাবে।

কনক—[বিরক্ত হয়ে] তোমার বুদ্ধির বলিহারি যাই। এত বড় বৈজ্ঞানিকের প্রতিভা কি এত ছোট কাজে লাগানো যায়? পোকামাকড়ের সংগে লড়াই নয়, বুঝেছো, মানুষের সংগে লড়াই, সমানে সমানে লড়াই।

রমা—বেশ, সমানে সমানেই লড়াই হোক। তিনি তাহলে এমন গ্যাস আবিষ্কার করুন যার একটি বোমা ফাটলে শহরের যত অসৎ, কালোবাজারী আর ভেজালদার মরে যাবে, কিন্তু ভাল লোকের কিছু হবে না।

কনক—তোমার সব সময় রসিকতা, যত উদ্ভট কথা।

রমা—[হাসতে হাসতে] বুঝেছি।

কনক—কি বুঝলে? এতে আবার বোঝবার কি আছে।

রমা—তুমি কোন দলে পড়ছো?

কনক—আমি যাচ্ছি। [ঘড়ি দেখে] এঃ, দুটো বেজে গেছে। একটা মিটিং আছে, তার পরে ল্যাবরেটারিতে যেতে হবে।

খোকা—[এগিয়ে এসে] আমি তোমার সংগে ল্যাবরেটারিতে যাব।

কনক—না, না। তুই কেন সেখানে যাবি?

খোকা—কেমন করে খরগোশ মরে দেখবো।

কনক—(বিরক্ত হয়ে) এ সব খবর কে দেয় ওকে?

রমা—তোমার দশম প্রাইভেট সেক্রেটারিটি।

কনক—তুমি কেবল ভুল করো, দশম নয়, অষ্টম।

খোকা—[কনকের হাত ধরে] বাবা, নিয়ে চলোনা আমাকে।

কনক—(হাত ছাড়িয়ে) না, রে না। তুই খেলা করগে যা। ছবিটবি কিছু ভাঙ্গিস নে যেন। [তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যায়]

খোকা—আমি আর খেলবোনা, স্কুলে যাব। আমি মরবোনা, বাবার চেয়েও বড় হবো, বাবা বলেছে। [ছুটে চলে যায়]

রমা—[হাসতে হাসতে] তোর বাবা যে একটাও সত্যি কথা বলে না রে!

(প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

ল্যাবরেটারি। মাইক্রসকোপ নিয়ে কাজ করেছে প্রভাত। সময় দশটা। প্রবেশ করে লিলি, Tight Jean Tight Jumper এ সজ্জিত, ঠোঁটে রুজ একটু বেশী। লিলি প্রভাতের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কর্মনিরত প্রভাতকে দেখে, তার পরে কথা বলে)

লিলি—দেখবার যা কিছু সবই নীচের দিকে, উপরের দিকে দেখবার কিছুই কি নাই?

প্রভাত—(মাইক্রস্কোপ থেকে চোখ তুলে) কখন এলেন?

লিলি—অনেকক্ষণ।

প্রভাত—একটুও টের পাইনি।

লিলি—আপনি কি এ জগতে ছিলেন যে টের পাবেন? আপনি ছিলেন আর এক জগতে।

প্রভাত—জগত একটাই। তবে মানুষের দুটো চোখই একদিকে বলে অন্য একদিকটা দেখতে পায় না। আমার মনে হয় ভগবান মানুষকে তেমন যত্নকরে সৃষ্টি করেন নি।

লিলি—(আঁকা ভুরুদুটি বাঁকিয়ে) আমি তা বিশ্বাস করি না।

প্রভাত—(হেসে) তা কেন করবেন! আপনি যে ভগবানের বিশেষ সৃষ্টি। (লিলির সর্বাঙ্গে একবার চোখ বুলিয়ে) অনেক খেটে-খুটে নিখুঁতকরে আপনাকে গড়েছেন।

লিলি—(খুসী হয়ে টেবিলের উপর বসে) আপনাকে গড়তেও খাটুনি কম হয় নি।

প্রভাত—বলেন কি! আমার ধারণা আমাকে গড়তে ভগবানের সব চেয়ে কম পরিশ্রম হয়েছে। কোন রকমে খাড়া করে দিয়েছেন।

লিলি—ওটা আপনার ভুল ধারণা। আপনি কেমন সুন্দর সবল পুরুষ। তাছাড়া বুদ্ধিটা যে আপনি অনেকের চেয়ে বেশী পেয়েছেন।

প্রভাত—কারো কারো মতে ওটা দুর্বুদ্ধি, মারণঅস্ত্র আবিষ্কার করছি।

লিলি—কার মতে? লতার মতে?

প্রভাত—[উত্তর দেয় না, একটু হাসে]

লিলি—প্রতিভাবানকে নিন্দাস্তুতি দুই-ই শুনতে হয়। লতা নিন্দুক, আমি আপনার স্তাবক।

প্রভাত—[মাথা নেড়ে] লতা আমাকে নিন্দা করে না, সে এই মানুষ মারা গবেষণা পছন্দ করে না, ছাড়তে বলে।

লতা—কি আশ্চর্য, কেমন করে সে ছাড়তে বলে! এই আবিষ্কার যে আপনাদের দুজনকে বিশ্ববিখ্যাত করবে মিঃ রায়। তার মানে লতা চায় না, আপনি বিখ্যাত ব্যক্তি হন! সে বুঝি চায় আপনি কোন এক পাড়াগেঁয়ে কলেজের শান্তশিষ্ট অখ্যাত প্রফেসর হয়ে সাধারণ মানুষের মত জীবন কাটিয়ে দেন! আমি কিন্তু তা চাইনে, আমি চাই পৃথিবী আপনাদের প্রতিভাকে চিনুক! সত্যি করে বলুন তো, নাম করা মস্তবড় বৈজ্ঞানিক হতে ইচ্ছে করে না আপনার?

প্রভাত—এক এক সময় করে।

লিলি—আবার এক এক সময় দুর্বলতা এসে যায়, তাই না? জানি, বড়রাও মাঝে মাঝে দুর্বল হয়ে পড়েন। তখন কাউকে পাশে এসে দাঁড়াতে হয়; উৎসাহ দিতে হয়।

[প্রভাতের পিঠের উপর হাত রাখে]

প্রভাত—[উত্তর দেয় না, একটু হাসে, আবার মাইক্রস্‌কোপে চোখ লাগায়]

লিলি—আবার দৃষ্টি নীচের দিকে নেমে গেল। মাইক্রসকোপে কি দেখছেন মিঃ রায়?

প্রভাত—দেখছি এক ফোটা রক্ত। রক্তের উপর ৫২৫ নম্বর গ্যাসের প্রতিক্রিয়া কি হয় দেখছি, red আর white corpuscle এর অবস্থা কি।

লিলি—[প্রভাতের পিঠে আবার হাত রেখে] মিঃ রায়, শুনেছি Corpuscle গুলোর জীবন আছে?

প্রভাত—[মাথা নেড়ে] হ্যাঁ, আছে।

লিলি—[প্রভাতের পিঠে হাতের একটু চাপ দিয়ে] তাদের কি মন আছে, তারাও কি ভালবাসে?

প্রভাত—(মুখ তুলে লিলির দিকে তাকিয়ে) জানিনে, হয় তো—

লিলি—মানুষের রক্তেও প্রেম, তাই না মিঃ রায় ?

প্রভাত—[হেসে] আমি ও লাইনে গবেষণা করিনি, তাই বলতে পারবো না।

[আবার মাইক্রসকোপে চোখ লাগায়]

লিলি—[মাথা নীচু করে, প্রভাতের মুখের কাছে মুখ নিয়ে, কাঁধের উপর হাত রেখে] কি দেখেছেন বলুন, আমি শুনবো।

প্রভাত—[হাসতে হাসতে] আচ্ছা বলছি। Corpuscle এর mean Corpuscular haemoglobin কত সেটা Colour index বলে দেয়—। Colour indexটা কি ? সেটা হচ্ছে $\frac{\text{percentage of haemoglobin}}{\text{percentage of red corpuscles}}$

সাধারণত $\frac{100\text{ p.c.}}{100\text{ p.c.}} = 1$; এক্ষেত্রে দেখছি haemoglobin এর percentage খুব high, বুঝতে পারছেন তো, খুব সহজ।

[হাতে এক গোছা ফুল নিয়ে প্রবেশ করে লতা। প্রভাত লিলি তাকে দেখতে পায় না, তারা যেমন কথা বলছিল তেমনি বলে যায়। লতা তাদের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়ায়, হাত থেকে কয়েকটা ফুল খসে পড়ে। একটু পরে নিঃশব্দে ফুলদানিতে ফুল রেখে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়]

লিলি—[খিল খিল করে হেসে] কিচ্ছু বুঝিনি। তবে শুনতে বেশ লাগলো।

[প্রবেশ করে কনক, প্রভাত ও লিলিকে দেখে একটুক্ষণ চুপ করে থেকে একটা সিগারেট ধরায়, একবার কাশে। লিলি চমকে পিছনে তাকায়,—কনককে দেখে টেবিল থেকে উঠে দাঁড়ায়]

প্রভাত—[কনককে দেখে] কখন এলেন কনকবাবু।

কনক [সে কথায় কান না দিয়ে] গবেষণার ব্যাঘাত করলাম নাকি ?

লিলি—[এগিয়ে এসে] মিঃ রায় Red Corpuscle আর white corpuscle সম্বন্ধে বলছিলেন, ভারি interesting [হাসে]

কনক—সত্যি ! কে interesting, corpuscle-না, প্রভাত বাবু ?

লিলি—[খিল খিল করে হেসে] কি যে অদ্ভুত প্রশ্ন !

কনক—তাই নাকি ?

লিলি—আপনি একবার দেখুন।

কনক—ও সব আমি বুঝি না, আমি যেসব বস্তু নিয়ে নাড়াচাড়া করি তা মাইক্রসকোপে ধরা পড়ে না।

প্রভাত—আপনি কি নিয়ে নাড়াচাড়া করেন কনকবাবু ?

কনক—[হাসতে হাসতে] নির্বাচন, প্রচার, Mass psychology, তা ছাড়া investment, share market.

লিলি—বড় নীরস।

কনক—একদিন আমার ব্যাঙ্কের বইগুলো নাড়াচাড়া কোরো তাহলে আমাকেও interesting মনে হবে।

লিলি—[খিল খিল করে হেসে ওঠে]

কনক—আমি তোমাকে আপিস থেকে ফাইলটা আনতে পাঠালাম, তুমি এখানে এলে কেমন করে ?

লিলি—পথে বেরিয়ে মনে হোলো একবার ল্যাবরেটারিটা দেখে যাই। Science আমাকে বড্ড টানে।

কনক—তাইতো দেখছি ! এবার কাজের কথা, প্রভাতবাবু, খবর কিছু আছে নাকি ?

প্রভাত—খবর আছে, মস্ত খবর।

কনক—[এগিয়ে এসে] বলুন, বলুন মশায়।

প্রভাত—আজ রাত্রে একটা পরীক্ষা হবে, কাল পাকা খবর।

কনক—[প্রভাতের কাঁধে হাত রেখে] সত্যিই বলছেন ?

প্রভাত—সত্যিই বলছি। কোন রকমে এই কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষা করুন।

কনক—নিশ্চয়,অপেক্ষা করতেই হবে, অধৈর্য হলে চলবে না ! বার ঘণ্টা কিছু না, কয়েক পেয়ালা কফি আর কিছু সিগারেট। আমি ফোনের কাছে বসে থাকবো, আপনি ডাকলেই ছুটে আসবো। ফোনে কোড ব্যবহার করবেন, সাবধান, খোলাখুলি বলবেন না। বলবেন, বলবেন 'গোলাপ ফুটেছে'। তাহলেই আমি বুঝে নেব।

লিলি—[খিল খিল করে হেসে] মরণগ্যাসকে আপনি গোলাপ নাম দিলেন ? আপনিও কবি দেখছি।

কনক—আমি Politician, ব্যবসাদার, কবিটবি নই। [ফুলদানি দেখিয়ে] ফুলদানির ঐ গোলাপ দেখে গোলাপ বল্লাম।

প্রভাত—[ফুলদানির দিকে তাকিয়ে] গোলাপ এনেছেন কনকবাবু, আপনার রসবোধ আছে।

কনক—[কপালে হাত দিয়ে] আজ আমার ভাগ্য ভাল, কেউ কবি বলছেন, কেউ রসিক বলছেন। তবে গোলাপ কিন্তু আমি আনিনি, ফুলের বাজারে আমার যাতায়াত নাই।

প্রভাত—তাহলে আপনি এনেছেন লিলি দেবী ? ফুলদানিতে তো ফুল ছিল না।

লিলি—জানেন তো আমি খরগোশ আনি, ফুল আনি না। ফুল আনে লতা।

কনক—তবে লতাই এনেছে।

প্রভাত—লতা তো এখনও আসে নি।

কনক—সে কি কথা, লতা আসে নি মানে ? আমি যখন উপরে উঠছি তখন দেখি লতা নামছে। আমি ডাকলাম, সে সাড়া না দিয়ে তাড়াতাড়ি নেমে গেল।

[লিলি প্রভাতের দিকে তাকায়, প্রভাত লিলির দিকে তাকায়]

লিলি—হয়তো আমাদের দেখতে পায়নি। তাই লতা ফুল রেখে চলে গেছে।

প্রভাত—আমরাও দেখতে পাইনি।

লিলি—লতা বড্ড ভাবপ্রবণ মেয়ে—বাবা।

কনক—[ঘড়ি দেখে] আপনার সময় আর নষ্ট করবো না প্রভাতবাবু, আপনার এই ১২ ঘণ্টা সময় বড় মূল্যবান। আমি যাচ্ছি, Code word মনে রাখবেন 'গোলাপ ফুটেছে'।

[দরজার দিকে এগোয়]

লিলি—আমি কি ফাইলটা নিয়ে আসবো ?

কনক—আমি আপিসেই যাচ্ছি। তুমি আমার সংগে এসো, আজ অনেক কাজ।

লিলি—[কনকের পিছনে পিছনে যেতে যেতে] বাই, বাই, wish you look luck.

কনক—And happy dreams. কিন্তু আজ রাত্রে শেষ experiment, বেচারা ঘুমোবার সময়ই পাবেন না।

লিলি—[খিল খিল করে হেসে ওঠে]

[কনক লিলি চলে যায়]

প্রভাত ধীরে ধীরে ফুলদানির কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, পড়ে যাওয়া ফুলটি মেজে থেকে তুলে নেয়, অনেকক্ষণ হাতেকরে দাঁড়িয়ে থাকে। তার পরে ফুলদানিতে রেখে দেয়।

পঞ্চম দৃশ্য

ল্যাবরেটারি। সময় সন্ধ্যা। একটামাত্র আলো জলছে, যন্ত্রগুলোর ছায়া ভিতরে রহস্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। প্রবেশ করে লতা, ল্যাবরেটারির ভিতরে আলোছায়ায় ঘুরে বেড়ায়, তারপরে ধীরে ধীরে খরগোশের খাঁচার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। খাঁচা খুলে দেয়, খরগোশ দুটো বেরিয়ে পড়ে। একটাকে কোলে নিয়ে আদর করে।

লতা—কি সুন্দর তুই, কি নাম তোর? ধবলী নাকি? জানিস নে বুঝি ওরা তোকে মেরে ফেলবে? এই ধুক ধুক করছে ছোট্ট বুকটা কেমন করে এক সেকেণ্ডে থেমে যাবে ওরা সেটা পরীক্ষা করবে···

মানুষ কেন এত নিষ্ঠুর রে···

আমি তোকে ছেড়ে দি, তুই পালিয়ে যা। অনেক দূরে যেখানে মানুষ নাই, গভীর বনে পাহাড়ের কোলে যেখানে ঝরণার ধারে কচি ঘাস গজায়, যাবি সেখানে?

অমন করে চেয়ে আছিস কেন, বিশ্বাস করছিস না?

মানুষ মিছে কথা বলে, মানুষকে বিশ্বাস করিস নে, বিশ্বাস করিস নে।

মানুষ এমন কেন রে?

[একটু ঘুরে বেড়ায়]

আমারও ইচ্ছে করে পালিয়ে যেতে, কোথায় যাব বলতো?

[খরগোশটাকে নীচে নামিয়ে দেয়, সেটা এগিয়ে যায়, আবার ফিরে আসে লতার পায়ের কাছে]

আবার ফিরে এলি, মুক্তি পেয়েও মানুষের কাছে আবার ফিরে এলি?

[কোলে তুলে নেয়]

আমি তোকে ভালবাসি, আমি তোকে মারবো না। সব মানুষ একরকম নয়। এক একজন বড় ভালবাসে, সত্যি সত্যি ভালবাসে, ভালবাসা তাদের কাছে খেলা নয়।

[একটু থেমে]

বৈজ্ঞানিক তো সত্য নিয়ে কারবার করে। ল্যাবরেটারিতে যারা সত্য আবিষ্কার করে, জীবনে তারা সত্য নয় কেন বলতে পারিস?

[ধীরে ধীরে একটু ঘোরে]

মরতে কেমন লাগে রে? ওরা বলে গ্যাসের একটু ছোঁয়া লাগলেই মানুষ মরে যায়, ঠিক যেন ঘুমিয়ে পড়ে। সেই তো বেশ, দেহে মনে শান্তি নেমে আসবে।

আমি ঘুমিয়ে পড়তে চাই, আর জাগবো না।

[খরগোশটাকে নীচে নামিয়ে দেয়]

ধবলী যা, তোকে ছেড়ে দিলাম, তোর যেখানে খুশী চলে যা। পারবি যেতে? এই লোহা, ইটকাঠের খাঁচা থেকে পারবি বেরোতে? ওরা আবার তোকে ধরে ফেলবে।

কিন্তু আমাকে আর ধরতে পারবে না।

[ধীরে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ায় কাচের ঘরটার কাছে। কাচের উপর হাত রাখে]

আঃ, কি ঠাণ্ডা, সব জালা জুড়িয়ে যাবে।

[চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে, হঠাৎ দরজাটা খুলে ঢুকে যায় কাচের ঘরে—বন্ধ করে দেয় দরজা। গ্যাস ঢুকবার কাচের নলটা ভেঙ্গে দেয়, তৎক্ষণাৎ ঢলে পড়ে। মনে হয় যেন ঘুমিয়ে পড়েছে।]

ভিতরে একটা এলার্মঘণ্টা বাজে। একটু পরে ভিতর থেকে ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে আসে প্রভাত—

প্রভাত—[চারিদিকে তাকিয়ে] কি হোল, Alarm bell বাজলো কেন? Accident হলেই ওটা বাজবার কথা, কিছু তো বুঝতে পারছি না—

[পায়ের কাছে একটা খরগোশ দেখে]

খরগোশদুটো খাঁচাথেকে বেরোলো কেমন করে? এ ঘরে কেউ ঢুকেছে নাকি? কারু তো ঢোকবার কথা নয়।

[হঠাৎ চোখে পড়ে কাচের ঘর, তার সামনে গিয়ে দাঁড়ায়]

কে, কে ভিতরে? সাড়া নাই। কে তুমি! বুঝেছি—লতা।

[ছুটে ভিতরে চলে যায়, প্রতিষেধক গ্যাস দিয়ে ভরে দেয় কাচের ঘর। ফিরে আসে। কাচের ঘরের দরজা খুলে বার করে আনে লতাকে। টেবিলের উপর শুইয়ে দেয়।]

লতা, লতা! সাড়া দিচ্ছনা কেন, আমার ডাক শুনতে পাচ্ছে না, তবে কি—

[তাড়াতাড়ি ফোন তুলে নেয়, কনকের নম্বর ডায়াল করে।]

কে, কনকবাবু, আসুন শিগ্‌গির, ডাক্তার নিয়ে, শিগ্‌গির আসুন, দেরী করবেন না, না, প্রশ্ন করে সময় নষ্ট করবেন না,—শিগ্‌গির—

[ফোন রেখে ফিরে আসে লতার কাছে।]

প্রাণ নেই?

৫২৫ নম্বর গ্যাস মৃত্যুর নিঃশ্বাস।

না, না, লতা মরে নি।

ব্যর্থ হয়েছে ৫২৫ নম্বর।

তাই হোক, খ্যাতি থেকে রেহাই দাও ভগবান।

লতা, লতা কথা বলো।

ব্যর্থ হোক ৫২৫ নম্বর।

[ডাক্তার নিয়ে প্রবেশ করে কনক]

প্রভাত—[ব্যগ্রভাবে] ডাক্তারবাবু, আসুন, দেখুন তো একে।

[ডাক্তার এগিয়ে এসে লতাকে পরীক্ষা করে]

প্রভাত—কেমন আছে বলুন, নিঃশ্বাস পড়ছে তো, হৃদপিণ্ড চলছে তো? বেঁচে আছে তো?

ডাক্তার—[পরীক্ষা শেষ করে] না, মরে গেছে।

কনক—এ যে লতা! কি হোল লতার?

ডাক্তার—মেয়েটি মরে গেছে।

কনক—অ্যাঁ, বলেন কি, মরে গেছে! কি হয়ে মারা গেল, Thrombosis, না—

ডাক্তার—[মাথা নেড়ে] না, ধরতে পারছিনা, কেন মারা গেছে। হঠাৎ মারা গেছে মনে হচ্ছে।

কনক—ভাল করে দেখুন, হয়তো মরেনি, আপনি হয়তো ভুল করছেন।

ডাক্তার—ভুল করিনি, মারাই গেছে। আমার করবার কিছু নাই।

[ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায়]

কনক—প্রভাতবাবু, কি ব্যাপার? এ কাণ্ড কেমন করে ঘটলো; লতা কেমন করে মারা গেল?

প্রভাত—[আঙ্গুল দিয়ে কাচের ঘর দেখিয়ে] গ্যাস।

কনক—গ্যাস! ৫২৫ নম্বর গ্যাস?

প্রভাত—(নিঃশব্দে মাথা নাড়ে)

কনক—অ্যাঁ, যেমন করে গ্যাসের ছোঁয়া লেগে খরগোশগুলো মরে তেমন করে?

প্রভাত—(মাথা নাড়ে)

কনক—(প্রভাতের হাত চেপেধরে) বলুন প্রভাতবাবু, গ্যাসের ছোঁয়ায় মানুষ কেমন করে মরে বলুন।

প্রভাত—(হাত ছাড়িয়ে নিয়ে) দয়া করে চুপ করুন।

কনক—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি হারিয়ে ফেল্লেন নাকি মশায়? মানুষের উপর গ্যাসের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করেননি ভাল করে? খরগোশের মতই টুপ করে পড়ে মরে গেল? কত সময় লাগল বলুন তো? হাত পা ছুড়েছে, কি ছোড়েনি, চেঁচিয়েছে, কি চেঁচায় নি?

প্রভাত—(ধমক দিয়ে) চুপ করুন।

কনক—চুপ করবো কি মশায়, মানুষ দিয়ে গ্যাসের শক্তি পরীক্ষা করবার এমন একটা সুযোগ পেলেন, আর কি পাবেন?

প্রভাত—পাব, আবার পাব, এক্ষুনি পাব। (কনকের হাত ধরে টানিতে টানিতে) এবার খুব ভাল করে সব লক্ষ্য করবো, আসুন।

কনক—(হাত ছাড়িয়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়) ক্ষেপে গেলেন নাকি মশায়, আমাকে কাচের ঘরে ঢোকাতে চান?

প্রভাত—(আবার লতার কাছে এসে দাঁড়ায়) লতাকে বাঁচান যাবে না, কেউ বাঁচাতে পারবে না?

কনক—ডাঃ মিত্রকে খবর দিন, তাঁকে বলুন, বাঁচালে তিনিই বাঁচাতে পারেন, আর কারু কর্ম নয়।

প্রভাত—(কনকের মুখের দিকে তাকিয়ে) ডাঃ মিত্র পারবেন বাঁচাতে? হয়তো পারবেন।

(প্রভাত ছুটে ভিতরে চলে যায়। একটু পরে ল্যাবরেটারির ভিতর থেকে ধীরে ধীরে বেরিয়ে আসে এক অদ্ভুত মূর্তি, সর্বাঙ্গ গাউন দিয়ে ঢাকা, মুখে গ্যাস মুখোস, দুহাতে দস্তানা। এগিয়ে

এসে সে মূর্তি দাঁড়ায় লতার মাথার কাছে, কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে লতার দিকে। তারপরে আস্তে আস্তে খুলে ফেলে দুই হাতের দস্তানা, শীর্ণ হাত বেরিয়ে পড়ে, গ্যাস মুখোস খুলে ফেলে, বেরিয়ে পড়ে একখানা শীর্ণ মুখ, পাকা চুল, পাকা দাড়ি গোঁফ। ঝুঁকে পড়ে দেখে লতার মুখ)

প্রভাত—ডাঃ মিত্র, পারবেন বাঁচাতে, বাঁচবে লতা ?

ডাঃ মিত্র—(নিঃশব্দে মাথা নাড়েন)

প্রভাত—আপনিও পারবেন না ?

(ডাঃ মিত্র আবার মাথা নাড়েন)

কনক—(এগিয়ে এসে) এতক্ষণে নিশ্চিন্ত হলাম ডাঃ মিত্র, সার্থক আপনার আবিষ্কার। আমাদের জাতীয় মহাবিকাশ পার্টির পক্ষ থেকে, তার মানে জনগণের পক্ষ থেকে আমি আপনাকে অভিনন্দিত করছি।

(ডাঃ মিত্র নীরব, লতার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকেন। একটু পরে ধীরে ধীরে জানালার কাছে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়ান)

কনক—(গলা নামিয়ে) দেখুন আমি যে বলেছি ডাঃ মিত্র শোক দুঃখের উপরে। মানুষ ওঁর কাছে খরগোশ, গিনিপিগের মতই প্রাণী মাত্র। ওখানে দাঁড়িয়ে কি ভাবছেন জানেন ?

প্রভাত—না

কনক—ওঁর মন যে একটা বিরাট ল্যাবরেটারি মশায়। নতুন নতুন মারণ গ্যাসের ফরমুলা সেখানে সৃষ্টি হচ্ছে।

প্রভাত—(লতার দিকে তাকিয়ে থাকে, কোন জবাব দেয় না)

কনক—অত ভাবছেন কি মশায়, যান, কাজে লেগে পড়ুন। শেষ পরীক্ষাটা শুরু করে দিন। আমি লতার দেহটার ব্যবস্থা করছি।

ডাঃ মিত্র ধীরে ধীরে ফিরে আসেন, আঙ্গুল দিয়ে দরজা দেখিয়ে কনক আর প্রভাতকে বেরিয়ে যেতে ইঙ্গিত করেন। দুজনে নিঃশব্দে বেরিয়ে যায়। ডাঃ মিত্র আবার লতার মুখের উপর ঝুঁকে পড়েন, তার কপালের উপর শীর্ণ হাতখানা রাখেন। অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকেন তার মুখের দিকে। তারপরে ধীরে ধীরে কাঁচের ঘরটার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। হঠাৎ একটা যন্ত্র তুলে নিয়ে ছুঁড়ে মারেন কাচের উপর, ঝন ঝন করে ভেঙ্গে পড়ে কাচ, আলো নিভে যায়,অন্ধকারে অদৃশ্য হয় ল্যাবরেটারি।

অনেক রাত, লতার বাড়ীর বাগান আর পোর্টিকো। দূরাগত পথের আলোয় অস্পষ্ট সব। বাগানের পথ ধরে ধীরে ধীরে এগিয়ে যান ডাঃ মিত্র, পোর্টিকোতে গিয়ে দাঁড়ান। বেতের চেয়ার, টেবিল, ছোটোখাটো জিনিষগুলো ঘুরে ঘুরে স্পর্শ করেন। দোলনায় দোল দেন,

ডাকেন "লতা"। খরগোশগুলোর খাঁচার সামনে গিয়ে দাঁড়ান, ঝুঁকে পড়ে খুলে দেন খাঁচার দরজা, রুগ্ন, খোঁড়া, অন্ধ খরগোশগুলো একটা একটা করে বেরিয়ে পড়ে, তাঁর চারপাশে আস্তে আস্তে ঘুরে বেড়ায়।

হঠাৎ কে যেন ডাকে "বাবা"। লতার গলার আওয়াজ! চমকে ঘুরে দাঁড়ান ডাঃ মিত্র। রুগ্ন খরগোশটা লতার রূপ নিয়ে দাঁড়ায়, শীর্ণ চেহারা, চুল উঠে গেছে, চোখদুটো বসে গেছে। আবার পেছন থেকে ডাকে "বাবা"। আবার ঘুরে দাঁড়ান ডাঃ মিত্র। খোঁড়া খরগোশটা লতার রূপ নিয়ে দাঁড়ায়, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এগিয়ে আসে, কি করুণ দৃষ্টি।

আবার পিছনে শুনতে পান ডাক "বাবা"। ফিরে দাঁড়ান ডাঃ মিত্র। অন্ধ খরগোশটা লতার রূপ নিয়ে দাঁড়ায়, হাতড়ে হাতড়ে এগিয়ে আসে, দেয়ালে ধাক্কা লাগে, অস্ফুট আর্তনাদ করে ওঠে।

আবার কে ডাকে "বাবা"। চারিদিকে লতা, কেউ বলে "বাবা, আমাকে সুস্থ করো," কেউ বলে "বাবা, আমার দৃষ্টি দাও," কেউ বলে "বাবা. আমার প্রাণ দাও।"

ডাঃ মিত্র—আমি তো জানিনা প্রাণ দিতে।

উত্তর—প্রাণ দাও বাবা।

ডাঃ মিত্র—আমি তো শিখিনি সে বিদ্যা।

উত্তর—আমি মরতে চাইনে, মরতে চাইনে, বাবা প্রাণ দাও, স্বাস্থ্য দাও, আনন্দ দাও।

ডাঃ মিত্র—কে তুই ?

উত্তর—আমি লতা।

(পিছনের দরজা খুলে যায়, প্রবেশ করেন লতার পিসীমা)

পিসীমা—দাদা!

(ডাক শুনে ডাঃ মিত্র চমকে ওঠেন, দেখেন তিনি একা, আর কেউ নাই)

পিসীমা—দাদা, কাকে ডাকছিলে তুমি, কার সঙ্গে কথা বলছিলে ?

ডাঃ মিত্র—লতার সংগে।

পিসীমা—লতা নেই, চলে গেছে।

ডাঃ মিত্র—লতা বাঁচতে চায়, তাকে বাঁচাতে হবে।

(ধীরে ধীরে পথদিয়ে এগিয়ে যান)

পিসীমা—কোথায় যাচ্ছ তুমি ?

ডাঃ মিত্র—ল্যাবরেটারিতে।

পিসীমা—দাদা, আবার তুমি মরণগ্যাস তৈরী করবে ?

ডাঃ মিত্র—না, এবার বাঁচাবার বিদ্যা আয়ত্ত করতে যাচ্ছি।

পিসীমা—তা হলে ও ল্যাবরেটারিতে আর তোমাকে ঢুকতে দেবেনা। ওরা চায় অস্ত্র।

ডাঃ মিত্র - আর ঢুকতে দেবে না ?

পিসীমা—না দাদা, তোমাকে ওরা আর ঢুকতে দেবে না। ওরা নতুন বৈজ্ঞানিক খুঁজবে। ওরা যাকে ল্যাবরেটারিতে ঢোকায় তাকে রাক্ষস করে তোলে। তুমি যেও না ওখানে।

ডাঃ মিত্র—আমার যে ল্যাবরেটারি চাই।

পিসীমা—তোমার ল্যাবরেটারি এখানেই আছে দাদা।

(Test tube আর Beaker সমেত ট্রেখানা নিয়ে এসে ডাঃ মিত্রের সামনে রাখে)

ডাঃ মিত্র—এ যে লতার খেলার ল্যাবরেটারি!

পিসীমা—ওআর খেলনা নেই দাদা, ওর মধ্যে লতা রেখে গেছে তার স্বপ্ন। তোমার প্রতিভা লতার স্বপ্নকে সত্য করে তুলুক।

ডাঃ মিত্র—কিন্তু কিছুই তো স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, অন্ধকার, শীতল অন্ধকার। যেন পৃথিবীতে আলো নাই, উত্তাপ নাই।

পিসীমা—ঐ দেখ দাদা।

ডাঃ মিত্র—কি দেখবো?

পিসীমা—ঐ দেখ, রাত শেষ হয়ে গেছে, পুবদিকে আলো ফুটে উঠছে।

ডাঃ মিত্র - ঐ কি নতুন দিন?

পিসীমা—ঐ নতুন দিন।

(ধীরে ধীরে আকাশ আলোর ভরে যায়)
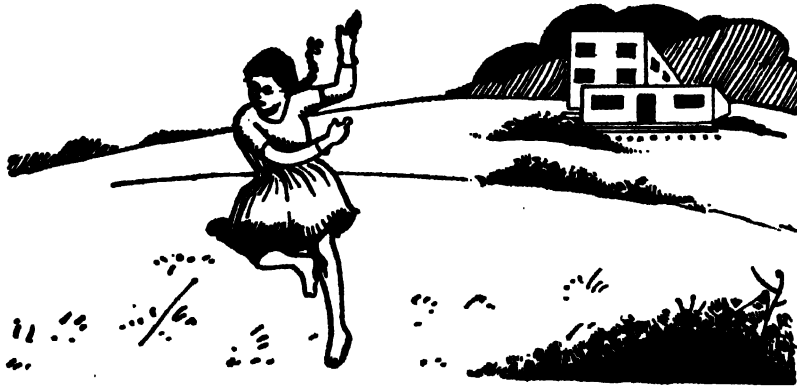
ভারতবর্ষ ও গান্ধীপথ

কানাইলাল দত্ত

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কর্মযজ্ঞে মহাত্মা গান্ধী একটি বহু ব্যবহৃত নাম। কিন্তু গান্ধী মত ও পথ সেখানে আজ সম্পূর্ণরূপে অস্বীকৃত। গান্ধীজির ইচ্ছার বিরুদ্ধে যেদিন আমরা ভারতবিভাগ মানিয়া লইয়াছিলাম সেই দিনই কার্যতঃ গান্ধীবাদের মূল সত্য হইতে আমরা ভ্রষ্ট হইয়াছি। গান্ধীজি তাঁহার স্বভাবসুলভ ভাষায় দেশ বিভাগকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—ইহা খাইলে শূল বেদনায় মারা যাইবে, না খাইলে ক্ষুধার জ্বালায় মরিবে। স্বাধীনতা লাভের ছয় মাসের মধ্যে তাহার আত্মবলিদান আমাদিগকে রক্ষা করিতে পারে নাই।

আজ যাহারা ছাত্র-যুবক তাঁহাদের নিকট গান্ধীজি যেন দূরকালাগত বিস্মৃতপ্রায় একটি বিতর্কিত নাম মাত্র। করুণামিশ্রিত লঘুভাবে আমরা বলিয়া থাকি—নীতি শাস্ত্রে যেসব ভাল ভাল কথা লেখা থাকে তাহাই সমাজ-জীবনে ও সামূহিক আচরণে প্রকটিত করিবার অসম্ভব এবং অপ্রয়োজনীয় চেষ্টায় গান্ধীজি ব্রতী ছিলেন। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব করিতে চাহিয়াছিলেন তাই আমরা অনুকম্পা করিতেও কুণ্ঠিত হই না। কিন্তু যে কঠোর কর্মসাধনার ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া অত্যাচারিত শোষিত ও দলিত ভারতবাসী, জাগ্রত হইয়া মানুষের মহিমায় আত্মপ্রকাশ করে তাহা ইতিমধ্যেই অর্ধজ্ঞাত কিংবদন্তীতে পর্যবসিত হইয়াছে।

গান্ধীজি আজ ইতিহাসের মানুষ। তাঁহার কর্মকৃতি ঐতিহাসিক ঘটনা। কোথাও অমার্জনীয় ঔদাসীন্য, কোথাও সচেতন স্বার্থ-চিন্তা অথবা অনুরূপ কিছু হইতে সেই ইতিহাসকে বিকৃত করিবার সুপরিকল্পিত অপচেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে। ইহার জন্যই মৃত্যুর বিশ বৎসরের মধ্যেই গান্ধীজি অনুকম্পার পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন।

আমাদের সকল ব্যর্থতা, অক্ষমতা ও অযোগ্যতার সমগ্র দায়িত্ব ঐ শুভ্র মানুষটির উপর চাপাইয়া দিয়া আমরা দায়মুক্ত হইতে চাহিতেছি। ইংরেজ যতদিন ছিল ততদিন আমাদের সকল অকৃতির জন্য তাহাদের দায়ী করিয়াছি। তাহারা চলিয়া যাইবার পর গান্ধীজিকে সেই শূন্য আসনে বসাইয়া অভ্যস্ত আচরণের দাসত্ব করিতেছি। ইহার সর্বশেষ নজীর নজরে পড়িল মধ্যমগ্রাম রেলস্টেশন-ঘরের দেওয়ালে C P I (L M) দলের একটি প্রাচীরপত্রে—"নিরস্ত্র জনগণ গান্ধীবাদের শিকার।"

সমকালীন মানুষ গান্ধীজিকে যথার্থভাবে জানিবেন এবং উপলব্ধি করিবেন এমন আশা করা যায় না। উপলব্ধি না থাকিলে চর্চা আসিবে কোথা হইতে? কিন্তু উপলব্ধি হোক, চাই নাই হোক গান্ধীজিকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। জন-জীবনের বা সমাজ-জীবনের এমন কোন ক্ষেত্র নাই যেখানে সেই বৃদ্ধ মানুষটির কল্যাণ হাতের ছাপ পড়ে নি। জটিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা, এবং ধর্ম দর্শনের ন্যায় গুরুতর বিষয় হইতে সুরু করিয়া কৃষিশিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শরীরচর্চা, ব্যক্তিগত আচার আচরণ, আহার বিহার বিশ্রাম, পোষাক-আষাক-প্রসাধন প্রভৃতি যাবতীয় চিন্তনীয় সমস্যায় তিনি হাত লাগাইয়াছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে সর্বকার্যের অন্তিম লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা। গান্ধীজির প্রতিটি কাজও

তাঁহার স্বরাজ-সাধনার অঙ্গ হইয়া উঠে। গঠনকর্মে তাঁহার যেমন গভীর প্রত্যয় ছিল সংগঠনিক শক্তিও ছিল তেমনি অনন্যসাধারণ। এই শক্তি ও বিশ্বাস বলে তিনি ঘোষনা করিতেন—চরকা কাটিলেই স্বাধীনতা, অস্পৃশ্যতা বর্জন, মদ্য ত্যাগ বা পরিপূর্ণ স্বদেশীতেই স্বরাজ!

রাস্তা তৈরি কর, নিরক্ষর মানুষকে সাক্ষর কর, সর্বজনে স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপন করিতে শেখাও, কৃষি ও কুটির শিল্পের উন্নতিবিধান কর—এক কথায় স্বদেশী কর—ইহার দ্বারাই সর্বোত্তম স্বাধীনতা অর্জিত হইবে। লোকের অভাব দূর হইলে তাহারা মনে করে স্বাধীনতা পাওয়া হইল। কিন্তু মানুষের অভাবের তো কোন সীমা-পরিসীমা নাই। কোন ব্যবস্থার দ্বারা ইহা মোচন করা যায় কি? প্রতিনিয়ত আমরা আমাদের অভাব সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছি। একটা অভাব পূর্ণ হইলে আর একটা সেই মুহূর্তেই মাথা চাড়া দিয়া ওঠে। একদিকে অপ্রয়োজনকে প্রয়োজনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়া অভাব বাড়াই, অন্যদিকে দ্রব্যাদির উপযুক্ত ব্যবহার জানি না ও সুব্যবহারের অভ্যাস গঠিত হয় নাই বলিয়া অপচয়ের দ্বারাও অভাব বৃদ্ধি করি। গান্ধীজি সেই জন্য তাঁহার একাদশ ব্রতের মধ্যে অস্তেয় ও অপরিগ্রহ সন্নিবেশিত করিয়াছেন। আশ্রম নিয়মাবলীতে পাই: দাঁতনকাঠি যখন আর দাঁত মাজিবার উপযুক্ত থাকিবে না তখন সেগুলি ফেলিয়া না দিয়া শুকাইয়া আগুন জ্বালাইবার কাজে ব্যবহার করিতে হইবে। রিপু করা খামে বড়লাটকেও তিনি চিঠি পাঠাইতে দ্বিধা করেন নাই। গান্ধী-জীবনে সহস্র উদাহরণ আছে।

আমরা অনেকে ভাবিলাম ও সব অর্থহীন কথা। ইংরেজ অপসারিত হইলে রাজ্যপাট আমাদের হইবে। আমরা তখন দিল্লী কলকাতা বোম্বাই প্রভৃতি সব রাজধানীর ক্ষমতা-কেন্দ্রগুলির পূর্ণ কর্তৃত্ব হাতে পাইব। সেই বিপুল ক্ষমতা পাইলে এই সকল খুচরো কাজ করিতে আর কতটুকু সময় লাগিবে? ইহার জন্য রাস্তায় ঝাড়ু দেওয়া, পায়খানা সাফ করা বা সুতা কাটিয়া পরিশ্রম করার কোন মানে হয় না। এক টাকার মজুর যাহা করিবে তাহার জন্য জহরলালের সময় নষ্ট তথাকথিত অর্থনীতির হিসাবে জাতীয় লোকসান ছাড়া আর কিছুই নহে! দুই হাত সুতা হইলেও তাহা সম্পদ। কিছু না করিলে তো সবটাই লোকসান!

স্বাধীনতার পরে দিল্লী কলকাতা প্রভৃতি রাজধানীর দখল আমরা পাইয়াছি! হুকুমনামাও জারি হইয়াছে। আমাদের সংবিধানেও অনেক কিছু বিধিবদ্ধ হইয়াছে—যেমন অস্পৃশ্যতা বর্জন, সর্বজনীন শিক্ষা ইত্যাদি। অর্থব্যয়ও কম হয় নাই। কিন্তু কোন ক্ষেত্রে এখনও সার্থকতা বা সাফল্য লাভ করা যায় নাই। সেজন্য অসন্তোষের আগুন দাবানলের মত ছড়াইয়া পড়িতেছে।

হুকুমে আইন বদল হয়। আইনের দ্বারা মানুষের চরিত্র গঠিত হয় না। সংস্কার এবং অভ্যাসেরও পরিবর্তন ঘটে না! হুকুমের সঙ্গে থাকা চাই ক্ষমতা বা **authority** তবেই লোকে সেকথা মনোযোগ দিয়া শোনে এবং তদনুরূপ কাজ করিতে যত্নশীল হয়। নৈতিক শক্তি ছাড়া এই ক্ষমতা অর্জন করা যায় না। গান্ধীজিই পৃথিবীর একমাত্র রাজনৈতিক নেতা যিনি সর্বস্তরের মানুষকে নৈতিক-শক্তির ক্ষমতায় দীক্ষিত করেন। আমরা ইতিমধ্যে সে সঞ্চয় ব্যয় করিয়া দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছি। এই নৈতিক-শক্তির জোরে তিনি ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষকে অসাধারণ করিয়া সৃষ্টি করিবার প্রয়াস যত না পাইয়াছেন ততোধিক যত্ন করিয়াছেন প্রতিটি মানুষ যাহাতে স্বাভাবিক উপায়ে সত্যিকারের মানুষের ধর্ম মানিয়া চলে। কোন বিষয়ে দক্ষ বা পারদর্শী হইলেই মানুষকে আমরা 'মানুষ' বলি না। চৌর্য বিদ্যায় যে দক্ষ সে চোরই, যথার্থভাবে মানুষ নয়। অর্থাৎ মানুষ সম্পর্কে আমাদের ধ্যান-ধারণার সঙ্গে চৌর্যবৃত্তির মিল নাই।

ইতিহাসে পশ্চাদ্গতি অসম্ভব। মানুষের অগ্রগতির যাহা সহায়ক তাহাই মাত্র থাকিবে; আর সবই

কালক্রমে পথের ধূলায় ঝরিয়া পড়িবে। ইহাই ইতিহাসের অনিবার্য নিয়ম। ভুল বা স্বার্থবাদী চক্রান্ত সাময়িক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করিতে পারে মাত্র। অচিরেই ধোকাবাজি ধরা পড়ে। আবার শুরু হয় নূতনতর উদ্যোগ। নবীন যাত্রা। অতএব বিতর্কিত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ের বাহিরে মানুষকে মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা ও মহিমায় উদ্ভাষিত এবং জাগ্রত করিবার জন্য মহাত্মা যে কার্যক্রমের সূচনা করিয়াছেন, যে-পথের :সন্ধান দিয়া গিয়াছেন ভারতবর্ষের মানুষকে তাহা চিরকাল স্মরণে রাখিতে হইবে। এই মনুষ্যত্ব সাধনার পথ হইতে আমরা যে'দিন বিচ্যুত হইব সেই দিন হইতে আমাদের সত্যকার পতন সুরু হইবে।

বর্তমানে রাষ্ট্রক্ষমতা কেন্দ্রীভূত এবং তাহা পেশাদার রাজনীতিবিদদের করতলগত। নৈতিক-শক্তির অধিকার তাহাদের কদাচিৎ থাকে। রাজনীতি এখন সর্বগ্রাসী। ক্ষমতার লোভ ও রাষ্ট্রীয় আদর্শের সংঘাতের সহিত নৈতিক-শক্তি হীন পেশাদারি রাজনৈতিক-শক্তি মিলিয়া সমাজ-জীবন মথিত করিতেছে। এই মন্থন হইতে সুধা মিলিবার আশা কম; গরল লাভ করিবারই আশংকা বেশি। কিন্তু কোথা সেই নীলকণ্ঠ যিনি গরলের বিষক্রিয়া হইতে জাতিকে রক্ষা করিবেন? সর্বস্তরের মানুষ আজ বহুধা বিভক্ত; তাহারা পরস্পর-বিরোধী কথা বলিতেছেন; যাহা দলীয় নীতি ও স্বীয় বিশ্বাসের অনুকূল তাহাই করিতেছেন। অধিকাংশক্ষেত্রে সত্য মিথ্যা ন্যায়-নীতির পরোয়া নাই। উপায় যেমন হইবে লক্ষ্যও তেমনি দাঁড়াইবে—গান্ধীজির এ কথা অস্বীকার করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কোন পন্থা-গ্রহণ নিন্দনীয় বা বর্জনীয় বিবেচিত হইতেছে না। আমাদের রাজনীতিবিদরা মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করিয়া অভীষ্ট লাভের শব-সাধনায় লিপ্ত। টোপ্ ফেলিয়া মাছ ধরিবার মত নানা স্বার্থ ও সুবিধার টোপ্ দিয়া তাহারা মানুষ ধরিতেছে; দল স্ফীত করিতেছে, ভোট বাড়াইতেছে। দেশের বর্তমান অবস্থায় অনেকে এই আচরণকে নবজন্মের বেদনাজনিত প্রক্ষেপ বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন।

আত্ম-শাসন ও আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সহজাত কবচকুণ্ডল নানা গুরুতর দুর্দৈব হইতে আমাদিগকে যুগে যুগে রক্ষা করিয়াছে। দেশে দেশে ইতিহাসের নানা অধ্যায়ে কত না সভ্যতার বিকাশ ও বিলোপ ঘটিয়াছে। ভারতীয় সভ্যতা কখনো কখনো বিলুপ্তির প্রান্ত সীমায় আসিয়াছে বটে, কিন্তু কোন না কোন উপায়ে আবার নূতনতর শক্তি ও সামর্থে তাহার পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছে। ইহার বিলুপ্তি কখনো ঘটে নাই। নূতনকে আত্মসাৎ করিবার ক্ষমতাই হইল তাহার আসল সত্য-শক্তি। নবীনকে গ্রহণের সময় ভারতবর্ষ স্বকীয় বিশিষ্টতা ভ্রষ্ট হয় নাই। এইখানেই ভারতধর্ম ও সংস্কৃতির গর্ব, প্রাণশক্তিও। ভারতবর্ষের মূল প্রাণশক্তিকে এ যুগে গান্ধীজিই সম্যকরূপে অনুধাবন করিতে সমর্থ হন এবং তাঁহার কর্মে ইহা প্রতিফলিত হইয়াছে।

বস্তুতঃ গান্ধীজির অভ্যুদয় লগ্নে সমগ্র বিশ্বে পাশ্চাত্য শিক্ষা সভ্যতার বিজয়কেতন উড়িতেছে। বিদ্যার সহিত বিত্ত এবং বুদ্ধির সহিত শ্রম ও বীর্যের অপূর্ব বিকাশে পাশ্চাত্যবাসী শ্রেষ্ঠ মানুষের মর্যদা পাইতেছে। তাহাদের প্রসাদের কণামাত্র পাইলে চরিতার্থ হয় না এমন মানুষ খুঁজিয়া পাওয়া তখন প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই শতমুখ প্রলোভনের অক্টোপাসী বন্ধন হইতে গান্ধীজি তাঁহার সত্যের জোরে আমাদের মুক্তি দিলেন। গান্ধী-জীবন ও কর্মের বিকাশ হয় সত্যকে ভিত্তি করিয়া। তাঁহার সর্বকর্মের নিয়ামকও ছিল সত্য। মহাত্মার সমগ্র কর্মকৃতি, সমস্ত রীতি নীতি সত্যকে অবিমিশ্রভাবে অনুসরণ করিবার প্রয়োজনে সৃষ্টি হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না, বরং আমার মতে ইহাই যথার্থ গান্ধী-ব্যাখ্যা। ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতির গৌরবও এইখানে।

মহাভারতের শ্রেষ্ঠ দুইটি চরিত্র—জননী গান্ধারী ও বিদগ্ধ বিদুরকে আমরা মূর্তিমান সত্য বলিয়া থাকি! যুধিষ্ঠিরের সত্যখ্যাতি তো প্রবাদের মর্যাদা লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্র ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন দেশের রাজপুত্র পিতৃসত্য পালনের জন্য যৌবরাজ্যে অভিষেকের উৎসব-প্রাঙ্গন হইতে বনবাসী হইয়াছেন? মৈত্রেয়ী ছাড়া বিশ্বের

অপর কোন নারী অমৃতের সন্ধানে সম্পদ ত্যাগ করিয়াছেন? ভারতবর্ষ ব্যতিরেকে কোন দেশের প্রাচীনতম সংহিতা দৃঢ়তম প্রত্যয়ের সঙ্গে বলিয়াছে—সত্যমেব জয়তে? ইহা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি ভারতবর্ষের মানুষ সত্যকে কোন্ দৃষ্টি দিয়া বিচার করিয়া থাকে।

সত্যের পথ চিরকালই বন্ধুর। আরাম-আয়াস আর সুখ-সম্ভোগের সোজা সড়কে চলিয়া সত্যসন্ধ হওয়া যায় না। স্বাধীনতা পাইয়া আমরা সেই সোজা সড়কে চলিয়া সত্য হইতে দূরে সরিয়া আসিয়াছি। তাই আমাদের আজ অনেক দুঃখ। কিন্তু মনে হইতেছে ভারতবর্ষের গ্রামের মানুষ এখনো কেন্দ্রচ্যুত হয় নাই। লাভ ও লোভের দ্বন্দ্বে তাহারা এখনো অংশীদার নয়। বর্তমানের জমি-দখলের হিড়িক সত্ত্বেও প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম এখনও শান্ত রহিয়াছে। বলদর্পী মানুষ আপনার ক্ষমতার দম্ভে যেমন করিয়া সত্যকে অস্বীকার করে তেমনভাবে সত্য সেইখানে অস্বীকৃত হয় নাই। এই রাজ্যের সেই অংশটায় গোলমাল বেশি হইতেছে যেখানে বহিরাগত ভাসমান মানুষের স্বার্থ রহিয়াছে।

প্রায় সকল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের উদ্ভাবক বা প্রবর্তকবর্গ মানুষকে শক্তি ও সম্পদলাভের একটা উপায় নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, যে শক্তি ও সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে হীন ও অমানুষিক পন্থাও অস্বীকৃত হয় নাই; সত্য সেখানে অনুচ্চারিত। তাঁহাদের ধারণা দরিদ্র অনাহারক্লিষ্ট মানুষের মনুষ্যত্ব বলিয়া কিছু থাকিতে পারে না। বুভুক্ষু মানুষের সর্বাগ্রে প্রয়োজন খাদ্য। গান্ধীজিও তাহা স্বীকার করেন। তিনি বলিয়াছেন—ক্ষুধার্ত মানুষের নিকট একমাত্র খাদ্যরূপেই ভগবান আবির্ভূত হইতে পারেন সত্যকে পরিহার করিলেই খাদ্য মিলিবে বা বা অন্যান্য প্রয়োজন মিটিবে ইহার কোন প্রতিশ্রুতি নাই। এখানেও গান্ধীজি বিশিষ্ট। এই মতবাদের তিনি শ্রদ্ধেয় ও একমাত্র ব্যতিক্রম। সত্যভ্রষ্ট হইয়া বিশ্বকে লাভ করিলেও মানুষের কোন হিত সাধিত হইবে না। আর সত্য রক্ষা করিতে বিশ্বকে হারাইতে হইলেও সত্যকার কোন ক্ষতি নাই। গান্ধীজি ভিন্ন অন্য কোন রাষ্ট্রনেতা এই কথা বলিতে পারিতেন? হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান স্মরণ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—আমাদিগকে হরিশ্চন্দ্রের মত সত্যাশ্রয়ী হইতে হইবে।

মানুষকে চেষ্টা করিয়া মানুষ হইতে হয়। কথাটা রবীন্দ্রনাথের। কিন্তু ইহা আমাদের নিত্যদিনের অভিজ্ঞতা। এখনও গুরুজনগণ 'মানুষ হও' এই কামনা উচ্চারণ করিয়া আমাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। কেবল হস্তপদাদি বিশিষ্ট বা সম্পদের অধিকারী হইলেই মানুষ হওয়া যায় না ইহা একপ্রকার স্বীকৃত সত্য। মানুষ হইবার তবে উপায় কি? অন্যান্য বিষয়ের সহিত গান্ধীজি এ জন্য যে এগারটি ব্রতের প্রবর্তন করেন তাহা হইল (১) অহিংসা, (২) সত্য, (৩) অস্তেয়, (৪) ব্রহ্মচর্য, (৫) অসংগ্রহ, (৬) শরীর শ্রম, (৭) অস্বাদ, (৯) ভয় বর্জন, (৯) সকল ধর্মের প্রতি সমান শ্রদ্ধা, (১০) সর্ব্ববিষয়ে স্বদেশী হওয়া, এবং (১১) অস্পৃশ্যতা বর্জন।।

আমরা স্বাধীন হইয়া অন্যোন্নতি এবং স্বদেশসেবার এই সকল গান্ধী-পন্থা পরিহার করিয়াছি। নবীন যুগের নূতন মানুষ কি ইহাকে পুরাতন বলিয়া বাতিল করিয়া দিলেন? শহর আধা-শহরের সোচ্চার মধ্যবিত্ত সমাজের বাহিরে যে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষ রহিয়াছেন, যাহারা নীরবে নিভৃতে পল্লী-ভারতবর্ষের প্রাণকেন্দ্র নানা প্রতিকূলতা ও দুর্দশার মধ্যেও কালাতিপাত করিতেছেন তাহাদের কথা আমরা সম্যক অবগত নহি। সুতরাং নিশ্চয় করিয়া কোন কথা বলা যাইবে না। তবে ভারতবর্ষ ও গান্ধীপথ তো ভিন্ন নহে। সুতরাং যতদিন আমরা ভারতবর্ষে স্থিত থাকিব ততদিন গান্ধীপথ হইতে বিচ্যুত হইতে পারিব বলিয়া মনে করিনা।

মধ্যবিত্ত মানুষ পরগাছা বলিয়া স্বীকৃত। শহরে মানুষ মোটামুটি স্বার্থান্ধ। অতএব কলিকাতা বা উপকণ্ঠের কলরোলে ভারত-আত্মার মূর্তি প্রকটিত নহে। উচ্চরব করিয়া যে সেবা তাহার মধ্যে প্রচারে র মানসিকতা ও

স্বার্থের ইন্ধন থাকেই। গান্ধীজি বলিয়াছেন—**The best workers all the world over are generally the most silent (Young India, 29-6-21)** পৃথিবীর সর্বত্রই সাধারণত নীরবতম কর্মীরাই শ্রেষ্ঠ কর্মী।

ভারতবর্ষের বিনাশ নাই, ভারতধর্ম ও সংস্কৃতির বিলোপ নাই। পল্লীর শান্ত ক্রোড় হইতে নবীন ভারতের নূতন নীলকণ্ঠ নায়কের আবির্ভাব ঘটিবে। ভারতপ্রাণ শহরে নয়। গান্ধীজির নির্দেশ ইহার খোঁজ করিতে হইবে ভারতবর্ষের লক্ষ লক্ষ গ্রামে। বিধাতার আশীর্বাদে আজিকার এই যুগসন্ধিক্ষণের সঙ্কটসময়ে গান্ধী শতাব্দী উৎসব সমাগত হইয়াছে। এই উপলক্ষে 'উপেক্ষিত' গান্ধীজির কিছু চর্চা ও আলোচনার সুযোগ পাওয়া যাইবে। আমাদের যুবক ছাত্রগণ যাহারা জন্ম মুহূর্ত হইতে গান্ধীজির বিরূপ সমালোচনা শুনিয়া আসিতেছেন তাঁহারা হয়তো একটি শুভ্র মানুষকে কথঞ্চিৎ জানিতে পারিবেন। ইহাতে তাহাদের লাভ—তাঁহারা মানুষ হইবেন, দেশের হিতে দেশ সত্য পথে চলিবে।

ভারত বিভাগের সমগ্র অপরাধটা আমরা গান্ধীজির উপর চাপাইয়া দিয়াছি। ইতিহাসের কার্যকারণ জানিতে চাহি নাই। অভিমানভরেই ইহা করিয়াছি। গান্ধীজি না করিলে কাহারো সাধ্য ছিল দেশ ভাগ করে। এই বিশ্বাস হইতেই আমরা অভিমান বিক্ষুব্ধ হইয়াছি। গান্ধীজিকে দোষীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছি। সেই অভিমান ত্যাগ করিয়া মানুষ হইবার জন্য গান্ধীপথের আশ্রয় গ্রহণ করিবার প্রয়োজন গান্ধী শতাব্দীর পুণ্যলগ্নে আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হোক। ভারত ধর্ম ও গান্ধীপথ এক ও অভিন্ন এবং এই পথেই নবীন ভারতের অভ্যুদয় ঘটিবে। বন্দেমাতরম।

নবতারার দেশ

(গল্প)

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রমেশ বিবাহের পর এই প্রথম শ্বশুরবাড়ি এসেছে। অর্থাৎ ওর মতে যাকে ঠিক শ্বশুরবাড়ি আসা বলা যায়; করে, বা টানে। এর আগে বার দুই অবশ্য হয়ে গেছে আসা। ছুটি না থাকায় একবার অষ্টমঙ্গলায় এসে রেখে বধূকে, আবার দিন তিনেক পরে এসে নিয়ে যায়। কিন্তু সে কেটেছে কতকগুলা জটিল মেয়েলী আচার-ষ্ঠানের মধ্যে, আর বিবাহ-উপলক্ষ্যে সমাগত নবতারার আত্মীয়স্বজনের গোলকধাঁধার মধ্যে। সম্বন্ধ চিনে, । রেখে, যথোচিতভাবে সম্বন্ধ বজায় রেখে বেরিয়ে আসতে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়েছিল। বিদ্রূপের অধিকারিণীরা রও দিয়েছিল মাথাগুলিয়ে।

তেমনি জুটেছিলও আত্মীয়স্বজনের দল; যেন কোটালের বান ডাকা।

অথচ ওসব 'ভ্যাজাল' বাদ দিলে রমেশের শ্বশুরবাড়ি হয়েছে বেশ ছিমছামই; যেমনটি চেয়েছিল। বড় সম্বন্ধী রা; ঐ একটিমাত্র; শালাজ উৎপলা, আর বছর আটেকের মধ্যে তাদের দুটি ছেলেমেয়ে। এ ছাড়া আছেন ড়র গৃহিণী, কমলাসনা, মথুরানাথের মা, নবতারার জ্যাঠাইমা, বিধবা, বয়স ষাট-বাষট্টি।

সেদিন ভিড়ের মধ্যে এই একান্ত আপন ক-টিকে ভালো করে পাওয়া যায় নি, নূতন সম্বন্ধে আরও মধুরই ।। দুঃখ ক'রে বলেওছিল নবতারাকে। মুখ ঘুরিয়ে শুধু একটু ঠোঁট টিপে হেসেছিল নবতারা। তখন ওর ‍‍য় পরিচয়টা নূতনই, অনেক কথাতেই এই করে সেরে দিচ্ছিল।

এবারে এসেছে নবতারাকে নিয়ে যাবে বলে। দিনসাতেক হোল মথুরানাথ গিয়ে নিয়ে এসেছে। মথুরা টা বড় বিলাতী ওষুধের কারখানার প্রতিনিধি, কিছুদিন করে বাড়ি আসে, আবার কাজে বেরিয়ে যায়। এবার টা বড় কাজ হাতে পেয়ে বারানসী কেন্দ্র করে ওদিকে একেবারে মাসতিনেক থাকবার সুযোগ পেয়ে উৎপলা র ছেলেমেয়ে দুটিকে নিয়ে যাচ্ছে, তাই নবতারা গিয়ে ক'টা দিন সবার সঙ্গে কাটিয়ে আসবে। বুড়ো মা যাবেন একলা থাকবেন—প্রশ্ন করেছিল নবতারাকে, রমেশ। "যান না কোথাও"—বলে মুখ ঘুরিয়ে ঠোঁট টিপে একটু সেছিল নবতারা। তখন মাসতিনেকের ঘনিষ্ঠতা হয়েছে, মথুরা প্রশ্নটা বাড়িয়ে দিয়েছিল—"কেন? বেশ । কাশী জায়গা—ওঁরই তো যাওয়ার কথা আরও।"

নবতারা একটু বেশি করেই ঘাড়টা ঘুরিয়ে সেইভাবে উত্তর দিয়েছিল—"বলেন, যত সব হিন্দুস্থানী, ছুটো । কয়ে সুখ হয় না।"

এবার খুকখুক ক'রে যেন বার দুই শব্দও হোল হাসির।

আর এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করবার কোন উপলক্ষ্য হয়নি। এরপরই মথুরা গিয়ে নিয়েও এল নবতারাকে। একটু বে

কেমন লাগত সেটা মিলিয়েও গেল রমেশের মন থেকে। একটা মুদ্রাদোষই নবতারার। নূতন বিবাহে মুদ্রাদোষগুলা আরও বেশ নূতন লাগে। যত নূতন ততই মিষ্টি।

ওর ছুটির বড্ড কড়াকড়ি, যার জন্যেই রমেশকে গিয়ে নিয়ে আসতে হয় নবতারাকে। ঠিক হয়েছিল পরের রবিবারে রমেশ গিয়ে তাকে নিয়ে আসবে। মথুরা চলে যাবে রবিবার সকালেই। দেখা হবে না; কিন্তু নূতন চাকরি, উপায়ও নেই।

তারপর অনেক চেষ্টাচরিত্র ক'রে শনিবারটা পেয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তবু যাহক একটা রাত পাবে সবাইকে।

জায়গাটা ষ্টেশন থেকে আট মাইল। বাস আছে, তবে পাঁচ মাইল পর্যন্তই। যেখানে নামিয়ে দিয়ে ঘুরে গেল, সেখান থেকে হাঁটা-পথে গ্রামটা প্রায় তিন মাইল। কাল হ'লে সবার জানা, ছই-ওলা বাড়ির বলদগাড়িটা থাকত। আজ হন্টন ভিন্ন উপায় নেই।

ঘণ্টাতিনেক রেলগাড়ি, তারপর যাত্রীঠাসা বাসের ঝাঁকানির মধ্যে এই পাঁচ মাইল, পায়ের মুক্তি ফিরে পেয়ে ভালোই লাগছে রমেশের। মিঠে-মিঠে নূতন শীতও পড়েছে বেশ।

শহুরে মানুষ,পাড়াগাঁ সম্বন্ধে একটা মোহ ছিলই, বিবাহের পর সেটা বেড়েও গেছে, লাগছে বেশ ভালোই। গাড়ি থেকে নেমেছে বিকালে; বাস থেকে যখন নামল তখন সূর্য প্রায় ডোবে-ডোবে। যেতে হয়তো সন্ধ্যা উৎরে যাবে। তা যাক, জানা পথ, সোজ পথ, প্ল্যাসটিকের ব্যাগটাতে টর্চও রয়েছে। তবু একটু সে পা চালিয়ে দিল সেটা চলার আনন্দেই। একটা অদ্ভুতরকম মুক্তি, কলকাতায় যেটার স্বাদ আজ পর্যন্ত কখনও পায়নি। দুদিকে পাকা ধানের ক্ষেত, সূর্যের অস্তরাগ পড়ে কী যে অপরূপ হ'য়ে উঠেছে—এমনটি আর কিছু দেখেনি রমেশ। রাস্তার ধারে দূরে দূরে এক একটা গাছ, এক একটা ঝোপ। কোনটাকেই চেনে না বলে কেমন একটা রহস্য, একটা না-জানার যাদু। বিশেষ ক'রে এক জায়গাতে কাছাকাছি কয়েকটা ঝোপে হলদে রঙের একরকম লতা,—পাতা নেই, এদিকে ঢেকে ফেলেছে ঝোপগুলাকে। সূর্যের শেষ আভা পড়ে আরও যেন অপরূপ। না দাঁড়িয়ে পারল না। পেছনে কিছু দূরে একটা লোক আসছিল, পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলল—"বাবুমশায়ের বোধ হয় কলকাতা থেন্ আসা হচ্ছেন? ও হোল সন্নলতা, গাছগুলোকে সাবড়ে ছাড়বে।"

"তাই নাকি?"—একটু কথা কইতে ভালো লাগলো বলেই যেন দিল উত্তরটুকু; নিজের মনে বলল—"তাহলেও কত সুন্দর!"···একটা ছোট নদী পড়ল। তরতরে জল, তলায় বালি চিকচিক করছে। পায়ের গোছও সব জায়গায় ডোবে না, বাঁ হাতে জুতাজোড়া নিয়ে এমন একটা ছেলেমানুষী খুসিতে মনটা ভরে উঠেছে! সেই লোকটা দাঁড়িয়ে মুখ হাত ধুয়ে নিচ্ছিল,; এবার কথা কইবার আনন্দে রমেশই বলল—"চমৎকার ছোট্ট নদীটি তো!" লোকটা ঘুরে বলল—"আজ্ঞা, চমৎকার বৈকি; একবার পাহাড়ে জল নামতে দেন, "তারপর বলবেন!" রমেশ বলল—"তাই নাকি?" মনে মনে বলল—"সে যবে নামবে; নামবে।"

আসোল কথা, যা দেখছে শুধু তাই তো নয়। সবকিছুর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে নবতারা। মনটা যেন আর কোনদিকে যেতেই দিচ্ছে না, কেবলই মনে হচ্ছে এটা নবতারার দেশ - নবতারার দেশ এটা···

অথচ আশ্চর্য, খোদ নবতারার সঙ্গেই ওর এখানটায় কোন মিল নেই। তার কাছে শহরই ভালো—কেমন কতরকম বাড়ি, কতরকম গাড়ি-সিনেমা, থিয়েটার। মানুষই কতরকম!···

রমেশ হেসে বলে—"কিছুদিন থাকো, তারপরে বোল।" নবতারাও হেসে বলে—"তুমিও কিছুদিন আমাদের ওখানে থেকে এসো। বুঝব।"

রাস্তার ধারেই একটি ছোট্ট গ্রাম। আজন্ম কলকাতার বাসিন্দা হোলেও গ্রাম যে একেবারে দেখেনি এমন নয়, শ্বশুরবাড়িটাই তো গ্রামে! কিন্তু এইরকম পরিবেশে, অস্তরাগের ঝিলিমিলির মধ্যে এমনভাবে এক নজরে সমস্তটুকুর পরিপূর্ণ রূপ কখনও দেখেনি। চারিদিকে পাকাধানের ঢেউ, মাঝখানে গ্রামখানি একটি দ্বীপের মতো আছে দাঁড়িয়ে। খবর নিয়ে জানল, নবতারাদের গ্রামটা এর পরেই মাইলখানেকের মাথায়। খানিকদূরে যে ঝুরিনামা বটগাছটা দেখা যাচ্ছে, ওটা পেরুলেই দেখা যাবে।

আধঘন্টা পরে যখন পা দিল গ্রামে, এতকষ্টের আলোছায়া, শব্দ-নৈঃশব্দের অভিজ্ঞতাটুকু একটি শান্ত-মধুর সুর হয়ে উঠে ওর সমস্ত মনটিকে আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছে।

অন্যমনস্কভাবেই কাজটা হয়ে গেছে, তবে সেটা অনেক পরে স্পষ্টভাবে টের পেল রমেশ। গ্রামের মধ্যে খানিকটা গিয়েই রাস্তাটা তিনভাগে বিভক্ত হয়ে তিন দিকে চলে গেছে। একটু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল রমেশ। বারতিনেক যে এসেছে তা দুই চাকা গরুর গাড়িতেই, তবু মন যেন বলছে বাঁ দিকেরটাই। পা বাড়াতেই যাবে, এমন সময় এক উৎকট আওয়াজ; বাঁ দিকেই, তবে সমস্ত অঞ্চলটাই যেন গমগম করে উঠল।

ভাষায় বুঝল গ্রাম্য কোলাহল। নবতারা বলে—"এক ঝগড়াতেই পাগল ক'রে দেবে, দেখো না!"

এতক্ষণের একটু একটু ক'রে সঞ্চিত সেই সুরটি একেবারে ছিন্নভিন্ন করে দিল। উগ্রের যে একটা আকর্ষণ থাকে তার জন্য একটু থমকে দাঁড়িয়ে থেকে কণ্ঠস্বর আর ভাষার দিকটায় অবহিত হয়েই টের পেল কলহটা দুইদল স্ত্রীলোকের মধ্যে। এর পর অন্যমনস্কভাবেই কখন্ একেবারে ডানদিকের পথটায় পা দিয়েছে বুঝতেও পারে নি।

ওর হুঁস হল যখন আওয়াজটা অনেকখানি মিলিয়ে এসেছে। বাড়ি পৌঁছাতেও যে এতটা সময় লাগবার কথা নয় সে-চৈতন্যটাও এসে গেছে। সন্ধ্যা উৎরে গিয়ে গ্রামের পথে ছায়াও গাঢ় হয়ে আসতে একটা অস্বস্তি জেগে উঠেছে মনে, সামনেই একজন কৃষকগোছের মানুষকে দেখে ওর সম্বন্ধীর নাম করে প্রশ্ন করল—তাদের বাড়িটা কোথায়।

লোকটা বেশ একটু বিস্মিতভাবেই চেয়ে থেকে বলল—রমেশ একেবারে উল্টা দিকে চলে এসেছে। বুঝিয়ে দিল আওয়াজটা যে আসছে ভেসে, তার ওপর কান পেতে এগিয়ে গেলেই পৌঁছে যাবে; আর ভুল হবে না। রমেশ একটু দোমনা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে প্রশ্ন করল আর অন্য রাস্তা আছে কিনা। উত্তরে লোকটা জানাল, এই রাস্তাই ঘুরে গেছে, তবে শ্মশানের পাশ দিয়ে, রাত্রিবেলা যেতে বলতে পারে না।

বললেও যেতনা রমেশ, তবে গ্রামে প্রবেশ করা পর্যন্ত যা অবস্থা যাচ্ছে, তার ওপর আবার এই, দারুণ বিরক্তিতেই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—"বলবে না তো বুঝলাম—তাহলে মড়া-ভূতের ভয়ে ঐ জ্যান্ত-ভূতদের পাশ দিয়ে যেতে হবে?"

লোকটা প্রথমটা একটু ধাঁধায় পড়ে গিয়ে বলল—"অ! আপনি কোঁদলের কথা বলতেছেন? তা কি করবেন?—পাড়াগাঁ, রুদয়ান্ত খেটে খেটে পাট সেরে এইসময় একটু হালকা হয়।···কর্ত্তার আসা হচ্ছেন কনে থেকে?"

একদিকেই যাচ্ছে, রমেশ উত্তর না দিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেল।

একটা বড় ভুল করে বসল রমেশ এরপর।

তার কারণটা মনের বিরক্তি মোটেই বলা যায় না। আনন্দই বলা চলে, আরও ঠিকভাবে বলতে হলে উদারতাই বলা উচিত, যা এক এক সময় হঠাৎ মনে উদয় হ'য়ে নানা রকম অঘটন ঘটায়।

বিরক্তিটা ছিলও না শেষ পর্যন্ত, আশ্চর্যই বৈ কি। যতই এগিয়েছে, গোলমালটা যতই উৎকট হয়ে উঠেছে, সেই বিরক্তির ভাবটা কমে আসতে আসতে কখন্ যে মনে মিলিয়ে গেছে বুঝতেও পারে নি। তার জায়গায় একটা অদ্ভুত কৌতুকরস। যতই এগুচ্ছে, আকাশভেদী চিৎকারের মধ্যে নূতন নূতন কথার টুকরো, ছড়ার কলিগুলো যতই স্পষ্ট হয়ে উঠছে, কৌতূহল বেড়ে গিয়ে পায়ের গতিও ততই ক্ষিপ্র হয়ে উঠছে। এক ধরনের খুশির কৌতূহলই বলা চলে, প্রতি পদক্ষেপেই যে নবতারার ও কাছে এসে পড়ছে, এর মধ্যে সে অনুভূতিটাও কাজ করছে কিনা বলা যায় না।

এর পর অকুস্থলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে আওয়াজটা যেন হঠাৎ খাদে নেমে গেল।

কারণটা তখনই টের পেয়েও গেল। রাস্তা থেকে ত্রিশ-চল্লিশ গজ দূরে একটা পুকুরের ধারে কাণ্ডটা হচ্ছিল, একটা আম-কাঁটালের বাগানে। অন্ধকার জমে এসেছে, তার মধ্যে মনে হোল দুদিকে দশ বারোজন ক'রে নানা বয়সের স্ত্রীলোক মোকাবিলাটা করছিল, দুদিকেই জনকয়েক ক'রে গর গর করতে করতে রণস্থল ত্যাগ করছে। ও যখন একেবারে সামনাসামনি এসে পড়ল, তখন একদিকে তিন জন আর একদিকে মাত্র একজন। জেরটা ধরে রেখেছে তখনও; ছায়াবাজির মতো বিচিত্র ঢঙে হাত পা মুখ নাড়া চলছেই, তবে ধ্বনি-সমষ্টি অনেকটা নীচে; কোথায় ছিল কুড়ি-পঁচিশ, তার জায়গায় মাত্র চারজনই তো এখন।

যাক, এবার যাবেই থেমে। বাড়িটাও এসে প'ড়ে নবতারা আবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সামনের মোড়টা ঘুরে আর একটু; তাহলেই। জানিয়ে আসা নয়, সময়াভাবেই; কিন্তু হবে বেশই। নবতারার বিস্ময়োৎফুল্ল ডাগর চোখ দুটি ভেসে ভেসে উঠছে; উৎপলারও। ভিড়ের মধ্যে ভালো ক'রে পাওয়াই যায়নি তাকে। জ্যেঠ শাশুড়ি কমলাসনাকেও নয়। সেকালের পাড়াগেঁয়ে শাশুড়ি, জামাইয়ের সঙ্গেও কপালঢাকা ঘোমটা দিয়ে কথা, তাও যত কমে সারা যায়।...আস্তে আস্তে ঘোচাবে অভ্যাসটা। এত উগ্র সেকেলেপনা এযুগে অচল...

আবার সুর বদলেছে মনের, এবার প্রিয়-সান্নিধ্যে আরও মধুর হয়েই, হঠাৎ কানটা ঝনঝন ক'রে উঠল। শব্দকেন্দ্র সেই আমবাগান। এবার চারজনের গলাই এত উচ্চ পর্দায়, নিজের নিজের বৈশিষ্টতায় এত স্পষ্ট যে, রমেশের মনে হোল সেই কুড়ি-পঁচিশ জনের সমতানকেন্দ্র ছাড়িয়ে গেছে। সেটা অবশ্য মনের বিরক্তির জন্যেই। পরক্ষণেই কিন্তু কী যে হোল, মনটা হঠাৎ গেল ঘুরে, আর তাইতেই বিপদটা ডেকে আনল নিজের ওপর।

বেশি দূর এগোয়নি তখনও, রমেশ দাঁড়িয়ে পড়ল। নির্জন গ্রাম্যপথ। সন্ধ্যায় রাত্রির ছোঁয়াচ লেগেছে। কেমন হয়, সে যদি গিয়ে থামিয়ে দিতে পারে? কাছে গিয়ে বলবে—বিনীতভাবে না হয়, হাতজোড় করেই বলবে—দোষ কি তাতে? বলবে—সন্ধ্যা হয়ে গেছে—জঙ্গলে জায়গা—আপনারা যদি দয়া ক'রে......মনের সুরটা আরও মিষ্ট হয়ে উঠেছে। যাবে। একটা যদি সত্যই ভালো কাজ করার সুযোগ হোল জীবনে—ক্লাবে ওদের কত সেবাব্রতের জল্পনা-কল্পনা...জোটে কই সুযোগ?...

এদিকে এসে ঠাণ্ডা আরও বেড়েছে। তাছাড়া একটা ভালো কাজ করতে গেলে যেন করেই ইচ্ছে শরীরটাকে ঢেকেঢুকে একটু তপ্ত রাখি। গায়ের উড়ানিটা মাথার ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে, প্লাসটিকের ব্যাগটা উড়ানির মধ্যেই বাঁহাতে ধ'রে এগুল রমেশ। রাস্তা থেকে নেমে আধক্রোশ গেছে, কোলাহলটা একেবারেই গেল থেমে; চারজনেই ঘুরে তাকিয়েছে। অন্ধকারে স্পষ্ট দেখা যায় না, তবে চারজনেই যে অতিরিক্ত বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেছে এটা বেশই বোঝা যায়। আরও কয়েক পা এগিয়ে যেতে একজন সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করল—
"কে?"

"আজ্ঞে আমি, এই এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম—ভাবলাম…"

আটকে যেতে—"হ্যাঁ, কি ভাবলে ? (আরও দু'পরদা চড়িয়ে) এখানে কি ভেবে আসা তাই শুনি ?"

সব গুলিয়ে গেছে। তবু যতটা গুছিয়ে পারল এবং মিনতির দিকটাও যতটা পারল আরও বাড়িয়ে দিয়ে বলল—"ভাবলাম অন্ধকার হয়ে গেছে—পুকুর ধার—জঙ্গুলে জায়গা—ওঁদের পায়ে ধ'রে যদি বলি—আপনারা আর এখানে দাঁড়িয়ে…আমি আসছিলাম কলকাতা থেকে…"

চারটে কণ্ঠস্বরই এক সঙ্গে খনখন করে উঠল—উগ্রতায় জড়াজড়ি হয়ে যাচ্ছে, তার মধ্যেই—"তবেরে ড্যাকরা !…যা যে-চুলো থেকে এসেছিস !—নয়তো এক্ষুনি…আমরা যাই করি—কলিকাতা থেকে সালিসী করতে… গেলি, না ভাঙব গাছের ডাল ?…"

কে কোন্‌টা বলছে বোঝা যায় না, তবে ওকে ঘিরে চারজনের মধ্যে যে কোন মতভেদ নেই এটা বুঝতে বিলম্ব হোল না রমেশের। ঘুরে, যতটা পারল ক্ষিপ্রগতিতে রাস্তায় এসে উঠল।

এ অংশটুকু অবশ্য বাদ দিয়েই বলেছে—নবতারাকে শুধু ওদের পাড়াগেঁয়ে ঝগড়ার স্বরূপ—ওই যেমন বলেছিল তবু হাসতে হাসতে পেটে যেন খিল ধরে যাবে নবতারার। খালি বাড়ি, মথুরা উৎপলাকে তার বাপের বাড়ি থেকে একবার ঘুরিয়ে আনতে গেছে যাওয়ার আগে, চাপা হাসি এক একবার ঝলমলিয়ে বেরিয়ে আসছে। হাজার চেষ্টা করেও—মিষ্টি কথায়, আবার রাগ দেখিয়েও—কোন মতেই এত হাসির মূলে ব্যাপারটা কি বের করতে পারছে না। শেষে রাগ করে ফিরে যাওয়ারই নাম করেছে,—উৎপলারা নেই। জ্যাঠাইমা বাইরে, তারপর নবতারার এই কাণ্ড, বলছে যাবেই ফিরে—এমন সময় সদর দরজার বাইরে খানিকটা দূরে এক আওয়াজ, মনে হ'ল, এই মাত্র যে চারটে শুনে এল তার মধ্যে সব চেয়ে উগ্র এবং কর্কশটা…"আমরা যা করছি করছি !—হাড়হাভাতে বলে, আমি কলকেতা থেকে সালিসী করতে এসেছি—আয়, পালালি কেন ? —ক'রসে সালিসী !—আমার নাম কম্‌লি-বামনী !!"…

—যেন মোড়টা ঘুরে গণগণিয়ে এগিয়ে আসছে আওয়াজটা।

একটু ঘাড় তুলে শোনা, হাসিটা একটা আচমকা ধাক্কা খেয়ে আবার যেন ফুটে বেরুবে—সেই অবস্থাতেই কোন রকমে আঁচলটা সামলে নিয়ে ছুটল সদরের দিকে নবতারা।

—"আমি মেয়ে ছিলুম কলকাতায়—উনি আজ আমায় কলকাতা দেখাতে এসেছেন !!…"

—হঠাৎ আওয়াজটা এইখানেই থেমে গেল।

পুকুরের ধার ছাড়া আর মাত্র একবারই জামাইয়ের সঙ্গে কথা হোল কমলাসনার, বারানসী যাওয়ার জন্যে উনি যখন মথুরার সঙ্গে বেরুচ্ছেন। চাপা হাসির মধ্যে সেই রাত্রেই খবরটা দিল নয়নতারা। সব ঠিক হয়ে গেছে, দু'জন মুনীষ আর পাশের বাড়ির সাতকড়িকাকা এসে শোবে। কবে ফিরবেন জিজ্ঞেস করতে, উচ্চকিত হাসিটা লেপের মধ্যে চেপে বলল—"দাঁড়াও, শাশুড়ি-জামাইয়ের কাহিনীটা গাঁয়ে একটু বাসী হোক আগে।"

রমেশরা বেরুবে বেলা দু'টোয়। গিয়ে প্রণাম করতে কমলাসনা আধ-ঘোমটার মধ্যে দিয়ে বললেন—"রাজা হও। ভালো আছ তো বাবা ?

—স্নেহবিগলিত শশ্রূকণ্ঠেই।

রমেশ ভক্তিমান জামাইয়ের মতোই বিনীত কণ্ঠে উত্তর করল—"আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনার আশীর্বাদে।"

নিজেরে হারায়ে খুঁজি

বিভূতিভূষণ গুপ্ত

সৈকত-নিবাসে খানিক আগে যাঁরা এসে পৌঁছেছেন তাঁদের ব্রেকফাস্ট পরিবেশন করতে গিয়ে হঠাৎ অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে হাউস-কিপার শ্রীমতী সন্ধ্যা। সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠতে বেশ খানিকটা সময় নিতে হয়েছে তাকে। এমন কি দ্বিপ্রহরের আহারের সময়ও তাকে দেখা যায়নি।

সৈকত-নিবাসের মালিক প্রণব হালদার খুবই অসুবিধের মধ্যে পড়েছেন। খানিকটা বিব্রত হ'য়ে বারকয়েক খোঁজ নিয়েও গেছেন। মেয়েটিকে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করেন তার নম্র স্বভাব আর কর্মনিষ্ঠার জন্য।

সন্ধ্যা তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে। বিশেষ কিছু হয়নি তার। হঠাৎ মাথাটা ঘুরে ওঠায় এই বিপত্তি। খানিক বিশ্রাম নিলেই ঠিক হ'য়ে যাবে।

নবাগত বোর্ডারদের তরফ থেকে স্বাতিও তার সঙ্গিনী মিনাকে পাঠিয়ে খবর নিয়েছে ভদ্রতার খাতিরে। সন্ধ্যা ধন্যবাদ জানিয়ে তাকে বিদায় দিয়েছে। কিন্তু মনে মনে এক দুর্জয় ক্রোধে গর্জ্জে উঠেছে এই খবর নিতে পাঠান যে কেন একথা বুঝতে তার সময় লাগল না। আর সকলের অলক্ষ্যে একসময় সন্ধ্যা এসে স্বাতির ঘরের দরজায় টোকা দিল।

দরজা খুলে দিল মিনা। হাসিমুখে বলল, আমার মুনিব আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছেন। ভিতরে আসুন।

অবাক হ'য়ে সন্ধ্যা বলল, আমার ত' আসবার কথা ছিল না!

স্বাতির গলা শোনা গেল। ওকে ভেতরে আসতে বল। আর তুমি বাইরে যাও। আমি না ডাকলে এস না।

মিনা সঙ্গে সঙ্গেই আদেশ পালন করল।

স্বাতির গলা পুনরায় শোনা গেল, দরজাটা বন্ধ করে দাও সন্ধ্যা।

খোলা থাকলে ক্ষতি কি? সন্ধ্যা প্রশ্ন করে।

তোমার না থাকলেও আমার আছে। স্বাতি জবাব দেয়।

কিন্তু কেন?

পরে শুনো। আগে দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও সন্ধ্যা।

ভয় পেলে নাকি?

এ প্রশ্নের জবাব না দিয়ে স্বাতি নিজে উঠে এসে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিল তার পর মৃদু কণ্ঠে বলল, ভয় পেয়েছি কিনা জানতে চাইছিল সন্ধ্যা···ভয়ের চেয়ে লজ্জা পেয়েছি কিনা ভাবছিলাম।

কেন? জ্বলে উঠল সন্ধ্যা, পাছে সৈকত নিবাসের একজন সামান্যা কর্ম্মচারির সঙ্গে তোমার রক্তের সম্বন্ধের কথাটা প্রকাশ পায় এই জন্যে?

সন্ধ্যা—স্বাতির কণ্ঠে ধমকের সুর।

সন্ধ্যার মুখে খানিকটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল। বলল, সন্ধ্যা তোমার দয়ার মুখাপেক্ষি মিনা নয়—এ কথাটা ভুলে না গেলেই খুশী হবো।

তাচ্ছিল্যের সুরে স্বাতি জবাব দিল, আমার দয়ার মূল্য যে কতখানি তা জানলে এ কথা মুখে আনতে না সন্ধ্যা দেবী। মিনা অবশ্য জানে। এখানে কত টাকা মাইনে পাও তুমি?

তোমাকে শোনাবার মত নয়। তবে আমার প্রয়োজনের তুলনায় তা নিতান্ত কম নয়।

প্রয়োজনের ডেফিনেসন কি দয়া ক'রে আমাকে বলবে কি? ডাষ্টবিন থেকে যারা খুঁটে খায়, তারাও প্রয়োজন মিটল ব'লে আত্মপ্রসাদ লাভ করে, কিন্তু ওকে প্রয়োজন মেটা বলে না।

ওটা তোমার নিজের কথা। দেখছি সবদিক থেকেই তোমার প্রচুর উন্নতি হ'য়েছে।

চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও তুমি বুঝবে না আমি জানি, কিন্তু আজ কতকাল পরে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হলো অথচ একবার দিদি ব'লেও ডাকলে না ভাই। তাহ'লে কেন এসেছো? শুধুই কি অপমান ক'রবার জন্য?

সন্ধ্যা জ্বলে উঠল, বলল,সন্ধ্যার দিদি অনেক দিন মারা গেছে।

মিথ্যে ব'লছো সন্ধ্যা। এই যদি তোমার মনের কথা তাহ'লে দেখা করতে এসেছো কেন? আমি ত' তোমাকে চিনতে চাইনি ভাই……

একথার জবাব দিতে পারে না সন্ধ্যা। শুধু বোকার মত চেয়ে থাকে।

স্বাতি ব'লতে থাকে, আমি পারলেও, তুমি পারনি সন্ধ্যা। তাই ছুটে এসেছ।

তোমার প্রতি ভালবাসা আমাকে এখানে টেনে আনেনি এ কথাটা শুনে রাখ।

শুনলাম, কিন্তু বিশ্বাস ক'রতে পারলাম না। স্বাতি স্নিগ্ধ হেসে বলল।

সন্ধ্যার দু চোখে জল। বলল, তুমি এ পথে আসবার আগে মরলে না কেন দিদি।

মরাটা খুব সহজ নয় ব'লেই বোধ হয়। কিন্তু তুই সন্ধ্যা আমাকে এতক্ষণ ধরে এত কষ্ট দিলি কেন বোন। আর আমি তুই আসবি ব'লে রাজারামকে কত ছল ক'রে সরিয়ে দিয়েছি।

সন্ধ্যার মুখের উপর যে নরম ভাবটি ফুটে উঠেছিল এক মুহূর্ত্তে তা দূর হ'য়ে গিয়ে কঠিন হ'য়ে উঠল।

এর এই পরিবর্ত্তনটা এতই স্পষ্ট যে স্বাতিরও তা দৃষ্টি এড়াল না। সে আস্তে আস্তে বলল, না বুঝে তোর দিদির উপর অবিচার করিস না সন্ধ্যা। তোর অভিযোগের বিরুদ্ধে আমারও হয়ত কিছু ব'লবার থাকতে পারে। রাগ না ক'রে একটু স্থির হ'য়ে বোস।

সন্ধ্যা কাঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল।

স্বাতি হাসবার চেষ্টা করে বলল, যদি বসবি না তবে এলি কেন?

সন্ধ্যা কঠিন ভাষায় বলল, জানতে এলাম তুমি আমার বাবার মেয়ে কিনা?

আঃ…স্বাতি তিরস্কার করে বলল, তুমি আমাকে আঘাত ক'রে যে আমাদের মাকে অপমান করে বসলে এ সাধারণ কাণ্ডজ্ঞানটুকু কি তোমার নেই?

সন্ধ্যা হুঁচোট খেল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সামলে নিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, আমি কি বলতে চেয়েছি তা আমার চেয়ে তুমি ভাল ক'রে জান।

জানি। কথাটা স্বীকার ক'রে নিয়ে স্বাতি বলল, কিন্তু মনে মনে। মনের কথা দেখা যায় না। না বললে শোনাও যায় না। মুখ থেকে বার হয় বলেই তা কথা এবং তারই মূল্য সকলে দিয়ে থাকে।

আমি তোমার উপদেশ শুনতে আসিনি। সন্ধ্যা খরখরে গলায় বলে।

স্বাতি রাগ করে না। স্নেহের দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে।

খানিক চুপ করে থেকে সন্ধ্যা পুনরায় একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে মারে, যে লোকটার সঙ্গে তুমি এখানে এসেছ ও তোমার কে?

অদ্ভুতভাবে একটু হেসে স্বাতি বলল, জানি ভেবেছিলাম সব খবরাখবর নিয়ে তবে তুমি এসেছ।

সন্ধ্যা চুপ ক'রে থাকে।

স্বাতি বলে, লোকটি আমার রক্ষক—

অর্থাৎ তুমি ওর রক্ষিতা? সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর রূঢ় হয়ে উঠল।

অনুত্তেজিত গলায় স্বাতি জবাব দিল, কথার মারপ্যাঁচে আরও খারাপ করে বলা যায়। কিন্তু জীবন ব'লতে তুই কি বুঝিস সন্ধ্যা?

সে কথা শুনে তোমার কোন লাভ হবে না। সন্ধ্যার কণ্ঠস্বর আরও কঠিন হ'য়ে উঠেছে।

তুই যে কোন কথাই শুনতে চাস না। তোকে আমি বোঝাই কেমন ক'রে? সত্যিকারের লাভ-লোকসানের তুই কিছু জানিস না ব'লেই জীবনের সহজ অর্থটা তোর কাছে গোলকধাঁধা। বলতে পারিস সন্ধ্যা দুঃখ কষ্টের সঙ্গে এই যে দিনের পর দিন তুই লড়াই ক'রে চলেছিস এতে কতটুকু পেয়েছিস? সংসার কতটুকু তোকে দিয়েছে? তোর মনও ভরেনি, দেহটাও উপবাসী র'য়ে গেছে। এমনি করে বেঁচে থেকেই বা কি লাভ?

দিদি···

রাগ করিসনে সন্ধ্যা। তোর দিদি এই ক'বছরে অনেক দেখেছে, অনেক ঠ'কেছে। তার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছে যে. কেউ এমনি কিছু দেয় না। স্বামী নয়, পুত্র নয়, সংসার নয়। আমায় দাও, তার পরে নাও। হিসেবের উনিশ-বিশ হলেই অশান্তি। তার চেয়ে এ জীবনটা মন্দ কি। নিঃশেষে দেবার প্রশ্ন নেই···একটুখানি হাসি আর ছলনা, কিছুটা নিপুণ অভিনয়। বিনিময়ে দুহাত ভরে নাও। আরাম, স্বাচ্ছন্দ্য কোন কিছুর অভাব হবে না। নাইবা পেলাম সামাজিক স্বীকৃতি।

তুমি থাম—

থামতে পারে না স্বাতি। বলতে থাকে, ভেবে দেখ দেখি আমাদেরই অতীতের দিনগুলির কথা। বাবা দুঃখ কষ্টের সঙ্গে লড়াই ক'রতে করতে অসময় মারা গেলেন। চিকিৎসা হল না। প্রয়োজনীয় পথ্যটুকুও পেলেন না। বাবার মৃত্যুর পরে সংসারের আসল চেহারা দেখে মা ভয় পেয়ে আত্মহত্যা করলেন। বেঁচে রইলাম আমি আর তুই। যারা সাহায্য ক'রতে চাইল তারা প্রতিদানে কিছু প্রত্যাশা ক'রল। আমরা সাড়া না দিয়ে পালালাম। তখন দেহ সম্বন্ধে একটি ধারণা ছিল আমাদের। শুচিতা নষ্ট করে বাঁচাকে মৃত্যুর নামান্তর বলেই জানতাম। কিন্তু অনাহারে যখন একটু একটু করে মরণের পথে এগিয়ে চলেছিলাম আমার মন তখন বিপরীত কথা শোনাতে সুরু করল সন্ধ্যা। জন্মেছি কি ওই ভাবে মরবার জন্যে? আমার যা সম্বল তার মূল্য আমি সুদ সহ বুঝে নেব······

সন্ধ্যা বিদ্রূপ করে বলল, তাই ছোট বোনকে অসহায় অবস্থায় রেখে রাতের অন্ধকারে তুমি পালালে। একবারও ভাবলে না তার কি হবে। কিন্তু সন্ধ্যা মরেনি, আজও বেঁচে আছে। আর তা সম্মানের সঙ্গে। সংসার, স্বামী পুত্র এবং সমাজ নিয়ে অনেক কথা শুনিয়েছ অথচ এবং কোনটারই ধার তুমি ধার না। স্বেচ্ছা-

চারিত্রাকে জীবন সম্বল করে তুমি আত্মপ্রসাদ লাভ ক'রতে পার, আমি পারি না। মানুষের পৃথিবীতে যদি মর্য্যাদা হারিয়ে বেঁচে থাকতে হয়, তাকে যত সুন্দর করে তুমি আঁকতে চাও না কেন, তুমি কোনদিনই প্রশংসা পাবে না।

স্বাতির কণ্ঠস্বর সহসা বদলে গেল। বলল, সম্মানের সঙ্গে বেঁচে আছ ব'লে খুব অহঙ্কার তোমার সন্ধ্যা, কিন্তু সৈকত-নিবাসের তুমি নামে হাউসকিপার হ'লেও তোমার কাজটা কি তা আমি জানি না মনে করেছো?

সন্ধ্যা জবাব দিল, যা সকলে জানে তা তুমি জানলে আমার অসম্মানের কিছু নেই। কোন কাজকেই আমি ছোট মনে করি না। একমাত্র নোংরামি ছাড়া।

নোংরামি তুমি কাকে ব'লতে চাও ব'লবে কি?

জবাব তুমি নিজের কাছেই পেতে পার। আমাকে দিতে হবে না। আশ্চর্য্য! তোমার নিজের চেহারা কি কোন দিন তোমার চোখে পড়ে না?

অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকে স্বাতি। তারপর বলে, পড়ে বৈকি সন্ধ্যা। আর তা একটু বেশী ক'রে পড়ে বলেই আমার দেহের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মূল্য নিভুর্লহিসেবে আদায় করে নিচ্ছি। তুমি জাননা বলেই কলুর বলদের মত আদর্শের ঘানি টেনে চলেছ।

একটু থেমে আবার বলতে থাকে স্বাতি, আদর্শ আমার কাছে ধাপ্পা, অক্ষমের বিলাপ। আমার কাছে প্রয়োজন মেটানই সবার বড় ধর্ম। আমার দেহের আর মনের দাবীকে কখনই আলাদা করে ভাবতে পারিনা।

সন্ধ্যা এতক্ষণ অবাক হয়ে শুনছিল। সহসা শ্লেষপূর্ণ কণ্ঠে বলল, তোমার এই দেহটা কতদিন থাকবে?

যতদিন ধরে রাখা যায়। তোমার চেয়ে কিন্তু তোমার দিদির দেহের বাঁধন আজও অনেক আঁটোসাটো—

সন্ধ্যা মুখ ফিরিয়ে বলল, অশ্লীল......

খুবই অশ্লীল লাগল বুঝি? তোমাদের আদর্শ স্বামী-স্ত্রীর সুশ্রী জীবনযাত্রা দিন রাত্রির মধ্যে কি কখনই অশ্লীল হ'য়ে উঠে না? টেনে টেনে হাসতে থাকে স্বাতি।......

সন্ধ্যা মাথা নীচু করে।

স্বাতি বলতে থাকে, একটা সামাজিক স্বীকৃতি থাকলেই একই বস্তুর দুটো রূপ হ'তে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। ওখানেও মূল্য ধরে দেবার প্রশ্ন রয়ে গেছে কিন্তু তোমরা তা সাহস করে বলতে চাওনা। তোমাদের সঙ্গে আমার তফাৎ এইটুকু সন্ধ্যা।

সন্ধ্যা জ্বলে উঠল, নিজের অপকর্ম ঢাকা দেবার চমৎকার যুক্তি খাড়া ক'রেছ। তোমাকে যত দেখছি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। তোমাকে ব'লবার কিছু নেই।

সত্যি কি কিছু নেই সন্ধ্যা? আমি ত ভাবলাম তুমি এখুনি বুঝি বলবে যে, দেনা-পাওনার প্রশ্ন সবক্ষেত্রে থাকলেও স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে ব্যবসার স্থান নেই। চুপ করে আছ কেন? তোমার মনের মত ক'রে বোধ হয় বলতে পারিনি?

সন্ধ্যা জবাব দেয় না।

স্বাতি বলতে থাকে, জবাব দিতে যদি না চাও দিও না। আমি জানি আমার কথাগুলি যতই অশালীন হোক, একেবারে যুক্তিহীন নয়। তোমার দিকে চেয়ে চেয়ে আমার মনে হচ্ছে যে, আমার বর্ত্তমান জীবন যদি খারাপ হয় তবে তোমার আরও খারাপ। আমি যদি অসুস্থ হই, তুমি মৃত্যুপথযাত্রী। তোমার মত করে বেঁচে থেকে কোন লাভ নেই।

রাত্রে তোমার ঘুম হয় ? হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে গেল সন্ধ্যা।

ঘুম···একটু যেন চমকে উঠে স্বাতি। হবেনা কেন ? খুব হয়। প্রচুর ঘুমাই আমি। বেহুঁশ হ'য়ে ঘুমাই।

ঘুমের ওষুধ খেয়ে বুঝি ? আমি কিন্তু বিছানায় শুতে শুতেই ঘুমিয়ে পড়ি।

সন্ধ্যা কথা থামিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে স্বাতির মুখোমুখি দাঁড়াল। ওর চোখে চোখ রেখে কিসের যেন সন্ধান ক'রল।

স্বাতি দুর্ব্বল গলায় বলে, কি দেখছিস তুই ?

সন্ধ্যা আবেগ-রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, সত্যিই ভুল করেছি কিনা যাচাই করে দেখলাম। তুমি আমায় ক্ষমা করো। আমি বুঝতে পারিনি যে, আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে তুমি এতক্ষণ ধরে নিজেকেই তিরস্কার করেছ।

সন্ধ্যা থামল। স্বাতির মুখেও কথা নেই।

সন্ধ্যা ডাকল, দিদি—

বস্—

তবুও তুমি সর্ব্বস্ব খোয়ালে দিদি! মনের যেখানে সায় নেই আত্মার যেখানে সম্মতি নেই—

স্বাতি ফিস ফিস করে বলে, আমি কি ইচ্ছে করে চলে গেছি রে ছোট। তখন শুধু একটা পথই আমার কাছে খোলা ছিল কিন্তু আমার যে মরতে বড় ভয়।

স্বাতি মুহূর্ত্তের জন্য থেমে পুনরায় আর্ত্তকণ্ঠে বলতে থাকে, তাই রোজ রোজ মরে নতুন করে বাঁচার সাধনা করছি।

সন্ধ্যা দুহাত দিয়ে দিদির গলা জড়িয়ে ধরে। স্বাতি নিঃশব্দে এই মিষ্টি স্পর্শটুকু চোখ বুজে অনুভব করতে থাকে। ওর দুচোখে জল।

পরদিন সকালে রীতিমত চাঞ্চল্য দেখা গেল সৈকত-নিবাসে। স্বাতিকে পাওয়া যাচ্ছে না। আবার নতুন ক'রে হারিয়ে গেল কি স্বাতি ?······ভাবছিল সন্ধ্যা।·········

ধর্মবোধ ও সত্যচেতনা

'সমর বসু'

যা' ধারণ ক'রে কিংবা অবলম্বন ক'রে মানুষ তার পরম লক্ষ্যে উপনীত হ'তে সক্ষম হয়, তাকেই বলা যেতে পারে ধর্ম।

কিন্তু মানুষের পরম লক্ষ্য কি?

মানুষী স্তর অতিক্রম ক'রে উন্নততর স্তরে উত্তীর্ণ হওয়া। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন করে পূর্ণ সত্যকে জানা।

সৃষ্টির প্রথম প্রত্যূষ থেকে এ-যাত্রা সুরু হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য এখনও দূর অস্ত। এ-যাত্রার ক্রম ইতিহাস আলোচনা করলেই দেখা যাবে এই লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্যেই মানুষ যুগে যুগে নানা পথ ও মতের সন্ধানে ফিরেছে। ভুল পথ ধ'রে কিছুটা অগ্রসর হ'য়েছে, পরে ভুল বুঝতে পেরে অন্যতর পথ ও মতের আশ্রয় অবলম্বন করে এগিয়ে যেতে প্রয়াসী হ'য়েছে। এইভাবে নানা রীতি-নীতি বিধি-বিধান গড়ে উঠেছে মানুষের সমাজে। কিন্তু মানুষ তবুও স্থির হতে পারেনি। যে দুরন্ত শক্তি মানুষের অন্তঃ সত্তায় সতত ক্রিয়মান তারই প্রেরণায় মানুষ দুর্বার গতিতে আপন সীমাকে অতিক্রম করতে চায়। নির্দ্দিষ্ট কোনও বিধি-বিধান অবলম্বন ক'রে সে নিজেকে বেঁধে রাখতে পারেনা। —'হেথা নয়, অন্যকোথা, অন্যকোনও খানে'—এই অভীপ্সাই মানুষকে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। এবং এই অভীপ্সাই একদিন মানুষকে তার লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

মানুষের মধ্যে এই অভীপ্সাকেই জাগিয়ে রাখে ধর্মবোধ। তাই ধর্মবোধ মানুষের প্রত্যাহিক জীবনের সঙ্গে এমন গভীরভাবে অনুস্যূত। ধর্মবোধের সাহায্যে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ক্রিয়াকর্মাদি এমন সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করতে হয় যাতে ব্যক্তি মানুষ যেন আদর্শ মানুষে পরিণত হয় এবং তাদের সমবায়ে তারা যেন একটি আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে পারে যার সাহায্যে মানুষ জানতে পারবে পূর্ণ সত্যকে, পরম চেতনাকে, যে চেতনা তারই মধ্যে রয়েছে আবরিত।

প্রাচ্য সভ্যতার ইতিহাসে ধর্মকে এইভাবে মূল্যায়িত করা হয়েছে। প্রতীচ্যের জীবনেও ধর্মবোধের প্রভাব কম ব্যাপক কিম্বা কম গভীর ছিলনা। কিন্তু রেনাসাঁসের সময় এবং তার পরেও মানুষের এই ধর্মবোধের উপর কঠিন আঘাত হানা হ'য়েছে। বর্ত্তমান যুগে মানুষের বহির্মুখী জীবন বুদ্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে বহুতর কুসংস্কার ও অন্ধতার আবরণ অপ্রসারিত ক'রে যে কর্মময় সভ্যতার প্রবর্ত্তন করতে সক্ষম হ'য়েছে সেখানে ধর্মের কাছথেকে সে (মানুষ) কোনও সাহায্যই পায়নি। তাই ধর্মের উপর এই অভিঘাত প্রতীচ্যে

বোধকরি প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু এই আঘাতের সাহায্যে ধর্মচেতনাকে মানুষের অন্তর থেকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। কেননা ধর্মবোধের প্রভাব এমনই তীব্র এবং গভীর যে তাকে মানুষের সহজাত বৃত্তি (Instinct) বললে বোধহয় অত্যুক্তি করা হয়না।

আধুনিক কালে ইউরোপে এবং আমাদের দেশেও ধর্মের উপর প্রত্যক্ষভাবে কোনও আঘাত না হানা হ'লেও মানুষের কাছে তার মূল্য কমতির দিকে। কারণ মনুষ তার বুদ্ধির সাহায্যে এইটুকু স্থির বুঝেছে যে, নব্যবিজ্ঞান চিন্তার ক্ষেত্রে যেভাবে অগ্রসর হতে চায়, ধর্মবোধ সে-যাত্রায় তাকে এতটুকু সহায়তা করেনা বরং যাতে সে অগ্রসর ব্যাহত হয় ধর্মভিত্তিক চিন্তা ভাবনার প্রাচীর তুলে দিয়ে ধর্মবোধ সেই চেষ্টাই ক'রে থাকে। মানুষের রাজনীতিক, সমাজনীতিক কিম্বা সাধারণ জীবনকে সামনের দিকে,—তার মহান ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ধর্মবোধ এতটুকু সাহায্য করেনি। বরং কতকগুলো মধ্যযুগীয় অন্ধকুসংস্কারের কথা শুনিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ধর্মনীতির প্রতি তাই আস্থা হারিয়েছে মানুষ।

ধর্মের প্রবক্তাগণ (চার্চ—পুরোহিত) ধর্মের প্রতি এই অবমাননাকর উক্তি অবশ্যই সহ্য করেন না; তাঁরা বলেন, এ গুলো হ'ল নিরীশ্বরবাদীদের মানসিক বিকৃতি, অথবা স্বাভাবিক অজ্ঞতা। তাঁরা এ-কথাও বলে থাকেন,—পার্থিব সুখৈশ্বর্যের ক্রমবৃদ্ধির প্রত্যাশায় মানুষের প্রাণপণ প্রয়াসের অনুশীলন অপেক্ষা ধর্মের আশ্রয়ে নিজেকে ঘিরে রেখে অপার্থিব শান্তির মধ্যে বাস করা—অনেক—অনেক ভাল।

কিন্তু অন্যদিকে যাঁরা প্রকৃত ধর্মের অনুরাগী তাঁরা বলেন,—যে, গতিই জীবনের ধর্ম। কেননা পৃথিবীর সবকিছুই চলিষ্ণু। তাই পৃথিবীর আর একটি নাম জগৎ। এই চলিষ্ণু জগতে মানুষকেও চলতে হবে। চলতে হবে পূর্ণতার দিকে। যতদিন না মানুষ সত্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হ'তে পারছে—যতদিন না সে জানতে পারছে তার অন্তরপুরুষকে ততদিন আত্মবিভাবনার (Self Creation) ভিতর দিয়ে পথ করে করে তাকে এগিয়ে যেতে হবে। অন্তরপুরুষকে জানবার পরেও তার চলা থামবেনা। কেননা অন্তরপুরুষ হলেন অসীম এবং অনন্ত।

কখনও শ্লথ, কখনও বা দুরন্ত গতিতে এগিয়ে গিয়ে নূতনতর জীবনবোধ গড়ে তোলাই এ চলার উদ্দেশ্য নয়; নিরন্তর এ চলার উদ্দেশ্য হল—মহত্তর আত্মিক সত্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা, আপন সত্তার যা অন্তর্গূঢ় হ'য়ে আছে তাকেই পর্বে পর্বে একটু একটু করে ফুটিয়ে তোলা।

ব্যষ্টির এই প্রচেষ্টা, সমষ্টি অর্থাৎ গোটা সমাজটাকেই সেই সত্যচেতনার দিকে ক্রমশ এগিয়ে নিয়ে যাবে। পরিপূর্ণতার দিকে মানুষের এই সংঘবদ্ধ যাত্রাকে সফল করতে পারে একমাত্র ধর্মবোধ। তথাপি ধর্মানুশীলনের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ মানুষের মনকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে তার হেতু কি সেটাও বিচার করে দেখা দরকার।

একদা মহাপুরুষেরা বা ঋষিরা দুষ্কর তপস্যার সাহায্যে যে সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, সাধারণ মানুষ যাতে সেই সত্যচেতনার স্পর্শ লাভ করতে সক্ষম হয় সেই উদ্দেশ্যে তাঁরা মানুষের আচরণীয় কতকগুলি নীতি ও প্রথার প্রবর্তন করেন। দেহ, প্রাণ ও মনের কামনা-বাসনাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে যে পারস্পরিক বিরোধ মানুষকে সংঘাত প্রবণ করে তুলেছে, তা দূর করতে গেলে অন্তরজীবনে যে Equanimity ও Harmonyর দরকার তা লাভ করতে হবে। যে-পথে তা লভ্য মহাপুরুষেরা সেই পথেরই সন্ধান দিয়েছেন।

কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্য ও টিকাকারগণ আপন আপন মানসিকতা আরোপ করে সেইসব আচরণীয় রীতি-নীতি বা বিধি-বিধানগুলো এমনভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন করেছেন যার ফলে ধর্ম 'দেশাচারে' পরিণত হয়েছে। অত্যন্ত সংকীর্ণ ও অন্ধধারণার বশবর্তী হ'য়ে তথাকথিত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা

দেশাচারের অত্যাচারে ব্যক্তিজীবন তথা সমাজ-জীবনকে একসময় ভীষণভাবে উৎপীড়িত করে তুলেছিল। যার জন্তে সোচ্চার হ'য়ে উঠেছিল রামমোহন বিদ্যাসাগর প্রমুখ মনীষীগণের তীক্ষ্ণ লেখনী।

সেই 'দেশাচার'কে 'ধর্ম' মনে করে আমরা যদি ধর্মের পথ থেকে সরে আসি তাহলে ধর্মের উদ্দেশ্য যেমন সিদ্ধ হবেনা, তেমনি আমাদের জীবনও হবে না সফল। কেননা একদিকে যেমন—In most essence of Religion is the search for God and the finding of God; অন্যদিকে তেমনি—the manifestation of the Divine in himself and the realisation of the God within and without are the highest and the most legitimate aim possible to man upon earth (Sri Aurobindo).

সুতরাং Divine:ক আপন সত্তার অভিব্যক্ত ক'রে তোলাই যদি মনুষ্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হয় এবং ঈশ্বরকে উপলব্ধি করাই যদি উদ্দেশ্য হয় 'ধর্মের', তাহলে তার লক্ষ্যে পৌঁছুবার জন্তে 'ধর্মানুশীল'নই মানুষের পক্ষে অপরিহার্য।

প্রতীচ্যের জীবনে ধর্মনীতি একসময় রাষ্ট্রনীতিতে পরিণত হয়েছিল। Church ই শাসন করত দেশকে। নূতন নূতন রাজনৈতিক, দার্শনিক কিম্বা ভৌগোলিক তত্ত্ব অথবা তথ্যকে কঠোর হস্তে দমন করত Church। শাসনতন্ত্রে যাতে আপন প্রভাব ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে Church এর ছিল সতর্ক দৃষ্টি। ফলে সক্রেটিসকে বিষপান করতে হয়েছিল, গ্যালিলিওকে বরণ করতে হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড।

মনুষ্যসমাজকে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করতে গিয়ে ধর্মের এই ব্যর্থতাই পরবর্তীকালে অর্থাৎ আধুনিককালের মানুষের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। আধুনিক তরুণ তরুণীরা ভাবে,—সমস্ত ধর্ম-চিন্তার মূল নিহিত রয়েছে কোন্ সুদূর অতীতে। ধর্ম-প্রবর্তকেরা বহু শতাব্দী আগে যখন জীবিত ছিলেন তখন পৃথিবীর চেহারা ছিল আজকের থেকে অনেক পৃথক। ভৌগোলিক চেহারা নয়, সমাজ-জীবনের চেহারা। তাঁরা যে-জীবনসমস্যার সমাধান করেছেন, আজকের সমস্যার সঙ্গে বস্তুতঃ তার বিশেষ কোনও সাদৃশ্য নেই। সুতরাং তাঁদের প্রতি এতটুকু অশ্রদ্ধা প্রকাশ না করেও এ কথা বলা যায় যে, আজকের দিনে অতীতের ধর্মনীতি মোটেই প্রযোজ্য নয়।

তাছাড়া আজকের মানুষ দেখছে যে, ধর্মাচরণের নামে আমরা যে আচার-অনুষ্ঠান পালন করি তা ক্রমে সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। ধর্মের নামে লোভের ব্যবসা চলেছে তীর্থে তীর্থে, তা কখনও মানুষকে আধ্যাত্মিকতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে না।

আধুনিক মানুষের মন নিয়ে বিষয়টি শ্রীঅরবিন্দও অনুধাবন করেছেন। তাই 'ধর্ম'কে তিনি দুই ভাগে বিভক্ত করে বলেছেন,—There are two aspects of Religion.—true religion and religionism. True religionই হল প্রকৃত ধর্ম—যার উদ্দেশ্যে হ'ল ঈশ্বরোপলব্ধি। আর Religionism হ'ল মানুষের এই আচার-অনুষ্ঠান-পূজা-উৎসব ইত্যাদি। True religion নয় বলে religionism কে কিন্তু উপেক্ষা করা যায় না। কেননা সমাজ-জীবনে এর প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। অধ্যাত্ম জীবনকে পুরোপুরিভাবে জানতে হলে এই সব আচরণ ও নীতি পালনেরও প্রয়োজন আছে। যদিও—These things are aid and supports not the essence.

শ্রীঅরবিন্দ বললেন,—The spiritual essence of religion is alone the onething supremely needful.

কিন্তু সাধারণ মানুষের ধারণা যে অধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে পার্থিব জীবনের একটা চিরকালের বিরোধ আছে। কতকগুলি দার্শনিকতত্ত্বের কথা শুনে মানুষের এই ধারণা আরও বদ্ধমূল হয়েছে। কোনও কোনও প্রাচীনদর্শনে এই সংসারকে বলা হয়েছে মিথ্যা-মায়া। এই সংসারচক্রে আবদ্ধ হয়ে আছে বলেই মানুষ দুঃখ থেকে অব্যাহতি পাচ্ছেনা। সুতরাং মানুষকে এই সংসার ত্যাগ করে নির্বাণ লাভ করতে হবে যাতে

এই জগতে যেন আর জন্মাতে না হয়। পার্থিব জীবনকে বলা হয়েছে—যেন অর্থহীন আবর্জনা। যত তাড়াতাড়ি তাকে ত্যাগ করা যায়, ততই মঙ্গল। যাঁরা জীবন ভালবাসেন, ভালবাসেন এই মর্ত্যভূমিকে তাঁদের কাছে দার্শনিকের এই উক্তি নিতান্ত বিষবৎ ঠেকে, তাই অধ্যাত্মজীবনের প্রতি একটা বিরূপ ধারণা তাঁহার মনে স্বতঃই জেগে ওঠে। এবং সেই কারণেই ধর্মানুশীলনের প্রতিও তাঁদের স্বাভাবিক অনীহা। কিন্তু True Religion ঈশ্বরোপলব্ধির উদ্দেশ্যে পার্থিব জীবনকে ত্যাগ করার পরমর্শ দেয়না। কেননা True Religion এ কথা স্বীকার করে যে আধ্যাত্মিকতা মানুষের মুক্ত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাশীল। 'মুক্তির' অন্তর্নিহিত অর্থই হল সেই পরমশক্তি যার দ্বারা মানুষ তার স্ব-ধর্ম ও স্বভাবকে প্রসারিত ও বিকশিত করে পরিপূর্ণতার দিকে অগ্রসর হতে পারে। সুতরাং প্রকৃত ধর্মের অনুশীলন সে-প্রসারতায় বাধা দান করতে পারেনা, মানুষের বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারেনা। কেননা প্রকৃত ধর্মানুশীলনের উদ্দেশ্যই হল মানুষকে Perfection এর সন্ধান দেওয়া।

প্রাচীন ভারত এ তত্ত্ব জানত। তাই দর্শন ও বিজ্ঞানের সাধনার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতের মনীষীরা ধর্মের দিক থেকে কোনও বাধা পাননি। যে-দর্শনে আত্মাকে অস্বীকার করা হয়েছে, সে-দর্শনও বিনা বাধায় প্রচারিত হতে পেরেছে। এরই জন্যে প্রাচীন ভারতে বিজ্ঞান ও দর্শন-সাধনা সম্প্রসারণের জন্য ধর্মানুশীল থেকে দূরে থাকার কথা মানুষের মনেও জাগেনি। শুধু বিজ্ঞান ও দর্শনের সাধনার ক্ষেত্রে নয়, রাষ্ট্রনীতিক ও সমাজনীতিক জীবনে পূর্ণতা অর্জনের জন্য মানুষের যে অদম্য অভীপ্সা তা ধর্মের দ্বারা কোথাও ব্যাহত হয়নি। কেবল বিধি-নিষেধের গণ্ডী রচনা করে স্বাভাবিক জীবনধারার সহজগতিকে রুদ্ধ করা ধর্মের উদ্দেশ্য নয়। মানুষের মধ্যে আত্মজিজ্ঞাসাকে জাগরূক করতে, সুনিয়ন্ত্রিত প্রসারের সাহায্যে মানুষকে উচ্চতর মহানশক্তির সন্ধান দিতে যে-ধর্মবোধ সক্ষম তাকেই বলা যেতে পারে প্রকৃত ধর্ম, কেননা এই ধর্মবোধের সাহায্যেই মানুষের পক্ষে সত্যচেতনাকে আপন সত্তার অভিব্যক্ত করে তোলা সম্ভব, অন্যথায় নয়। সত্তার রূপান্তরের ভেতর দিয়ে আত্মার ক্রমোন্মীলনের যে সাধনা তার ভিত্তিতে চাই এই ধর্মবোধ—এই True Religion.

শতাব্দীর ইতিহাস

হীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

সেদিন পৃথিবী ছিল ঘুমে অচেতন,
তন্দ্রাচ্ছন্ন মানব চেতনা !
কুয়াশা-কুটিল পথ,
দৃষ্টিহীন গতি,
পদে পদে ভীরু পদক্ষেপ :
ভয়—ভয়—ভয় !
শুধু গ্লানি, ভয় আর নীরব নিঃশ্বাস :
পরাধীন মানুষের অসহ যাতনা !
নিঃশব্দ ক্রন্দন আর ব্যর্থ আর্তনাদ।
তবু হাসি !
প্রাণহীন পাণ্ডুর বিকার
নিষ্প্রভ মলিন মুখে ;
বক্ষে চাপি বেদনার গুরুভার,
হাসিমুখে জানায়েছে নতি
লক্ষ নরনারী।
শিকারীর তাড়া-খাওয়া শৃগালের মতো
রাত্রিদিন প্রাণভয়ে
খুঁজেছে বিবর শুধু আত্মরক্ষা লাগি।
জানিত না কিবা তার অধিকার,
কেন সে বঞ্চিত !
মানুষের কাছে বেঁচে থাকা মানুষের মতো,
তাও তার নেই অধিকার !
নেই কোন দাবি ?
আপন মৃত্তিকা 'পরে
আপনার পায়ে দাঁড়াতে সে চায়।
আপন শ্রমের অন্ন আপনার মুখে
তুলিতে কম্পিত হাত !
রক্তচক্ষু শাসনের,
শাসকের অস্ত্রের ঝনৃঝনা
পলে পলে জাগায় সন্ত্রাস
অসহায় মনে।
পরাধীন !
লক্ষ লক্ষ মানুষের বুকে রুদ্ধ প্রাণবায়ু।
দিকে দিকে জাগ্রত প্রহরী,
শৃঙ্খল পিঞ্জর !
উদ্যত শাণিত খড়্গ,
পিস্তল—রাইফেল !
ভয় ! মরন-সন্ত্রাস !
রুদ্ধ স্বর কাঁপে কণ্ঠতলে,
হৃৎপিণ্ডে রক্তোচ্ছ্বাস হিম হয়ে আসে।
সে সংকট কালে—
তুমি হে ঋত্বিক্,
নিতান্ত নীরবে
কুয়াশা-কুটিল পথে বনচারী তপস্বীর মত,
রথহীন মহরেথী
নিরস্ত্র সৈনিক,
নগ্ন বক্ষে রিক্ত বাহু মেলি,
অস্ত্রেরে করিল জয় নিরস্ত্র সংগ্রামে।
হিংসার উদ্যত ফণা,
ভয়াল ভ্রূকুটি
হলো অবনত;
কেটে গেল ভয়, দূর হলো অর্ধপথে;
মহাকাশচারী গন্ধর্ব-কিন্নরদল
করে কানাকানি।
মানুষের হানাহানি,
বিশ্বগ্রাসী অনল-উৎক্ষেপ,
আণবিক মহাশক্তি
সত্যাগ্রহী মানব-আত্মার আবেদনে
হলো অন্যমনা,
পৃথিবীর ইতিহাস
লেখা হলো নবছন্দে নির্বাক্ বিস্ময়ে।
হে ঋত্বিক্ ! শতাব্দীর হে মহামানুষ !
ত্রিশকোটি মানুষের মূর্ত প্রতীক্ তুমি,
তোমারে জানাই আজি
শতবর্ষে শত নমস্কার।

গান্ধীজী

ডঃ এস, কে, নন্দী

গান্ধিজি,
নিজের হৃৎস্পন্দনে শুনেছি
তোমার হৃদয়ের দুরন্ত প্রক্ষোভ ;
তোমার স্বপ্নে
আমার স্বপ্নকে দেখেছি !
আমাদের বেদনায়
তোমার সমবেদনা
অযাচিত দাক্ষিণ্যে ঝরেছে
ভরা বাদরের বর্ষণের মত।
ক্ষুধিত মানুষ,
ভারতবর্ষের চল্লিশ কোটি নরনারী
হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান
ক্ষুধার জ্বালায় কেঁদেছে —
"ম্যয় ভুখা হুঁ"
তুমি তা সইতে পারনি।
সইতে পারনি তাদের নিদারুণ লাঞ্ছনা
পুলিশ আর গোরা সৈন্যের হাতে।
আকাশের আলোকে সাক্ষী রেখে
তুমি এগিয়ে গেছ লবণ-অভিযানে,
ওদের বলেছ 'ভারত ছাড়ো'।
সমুদ্রটা উপচিয়ে পড়েছিল,
তার অভিঘাত এসে লাগল
সসাগরা ভারতভূমির দেহে মনে।
বিস্ময়কর প্রতিজ্ঞা তোমার—
করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে,
দুটি ধ্রুবতারার জ্যোতি,
দেশের মাটিতে প্রাণবন্যা বইল
ফুল ফুটল নানান রংয়ের
ফসল ও ফলন
সংখ্যা-গণনার অতীত প্রাচুর্যে।
তবু ধান উঠল না চাষীর গোলায়
খেতে খামারে পঙ্গপালেরা
ঝাঁপিয়ে পড়ল।
তুমি তাদের রুখতে পারলে না।
শহীদ হ'লে,
আত্মদান করলে।
তবু তারা শুনল না তোমার কথা,
বুঝল না তোমার বেদনা ;
ভাগ বাঁটোয়ারা চলল শহরে গ্রামে
দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা শহরে।
তুমি শিলায়িত হ'লে
মূর্তি গড়া হল তোমার
কলকাতার চৌরঙ্গীতে আর শিমলার ম্যালে,
তুমি হারিয়ে গেলে।
শিশুপাঠ্য কেতাবের পাতায়
লেখা হ'ল তোমার কথা।
আমাদের জীবনে
মননে ও ধ্যানে
তুমি রইলে না।
কিন্তু কেন,
এমনটা কেন হ'ল ?
শতাব্দীর সূর্য
তামস প্রচ্ছন্নতায় আত্মগোপন করল
যখন সবে সকালবেলাকার
প্রথম আলোটুকুর প্রসাদ পেয়েছি।
সুদর্শনধারীর ইচ্ছায়
অকাল সন্ধ্যা ঘনিয়ে এসেছিল
ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ;
আয়োজনটা জয়দ্রথবধের
অহিংস সৈনিক তুমি,
তোমার গাণ্ডীবে প্রেমের টঙ্কার,
বৈদান্তিকের সমদর্শন তোমার চোখে,
তবু তোমার এই লীলা কেন,
জাতির জনক, তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি ;
অতিপ্রশ্ন ব'লে
মহামৌনের অন্তরালে আত্মগোপন ক'রো না।
মনে রেখো, বাপু
তোমার অমুক্ত কথায়
দুনিয়ার মানুষের মুক্তির নিশানা।

কুমার সেন মেঘমল্লার প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা
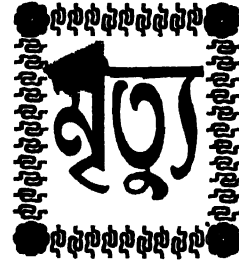
গৌতম সেন

ছোট একটি বটের চারা—কবে সকলের অলক্ষ্যে মন্দিরগাত্রে আশ্রয়লাভ করিয়াছিল তাহা কেহ জানে না। সেদিনের সেই শিশু-চারা তলে তলে তার শিকড় বিস্তার করিয়া যেদিন আত্মপ্রকাশ করিল, সেদিন মন্দিরের ছাদ হইতে প্রাচীরের অনেকখানি ভাঙিয়া পড়িল। শুধু গোপীনাথের মাথার উপরকার ছাদটুকু রক্ষা পাইল।

দত্ত-বাড়ীর প্রাচীন দেবালয়। শোনা যায়, ইঁহাদের পূর্বপুরুষ এককালে জমিদার ছিলেন। আজ ভগ্নপ্রায় অট্টালিকার কিয়দংশ ছাড়া জমিদারীর আর কোনো চিহ্ন নাই। বৃদ্ধ নীলাম্বর দত্তের স্মৃতিতেও সে ঐশ্বর্যের দাগ কাটে নাই, শুধু বংশানুক্রমিক আভিজাত্যটুকু তাঁহার রক্তের মধ্যে রহিয়া গিয়াছে, ইহা তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যায়।

প্রাসাদ-সংলগ্ন গোপীনাথের মন্দির—আজ ভাঙিয়া চুরিয়া সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়া স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে। কাছারি-বাড়ীর চিহ্নও দেখা যায়। বৈঠকখানার সুবৃহৎ খিলান ও একটি থামের ভগ্নাংশ আজো অবশিষ্ট আছে। অনেকগুলি ঘরই ব্যবহারোপযোগী নয়, সেগুলি দত্তমশায় পরিত্যাগই করিয়াছেন। বিচ্ছিন্ন ঘরগুলিকে একত্র করিয়া দত্তমশায় মনে মনে এই বৃহৎ বাড়ীটার একটা রূপ দেবার চেষ্টা করেন, কিন্তু চেষ্টা করিয়াও ইহার ঠিক রূপটি ধরিতে পারেন না। ছেলেদের বলেন, আমার জীবন তো কাটিল, পারো তো তোমরা মেরামত করিয়া লইও।

দুই পুত্রই কৃতী। জ্যেষ্ঠ বিজয়মাধব ইঞ্জিনীয়ার। কনিষ্ঠ অমিয়মাধব 'পি, ডব্লু, ডি'র বড় অফিসার। দুই পুত্রবধূ কিন্তু তাঁদের ছেলেপুলে লইয়া শ্বশুরের কাছে থাকেন। এককালে শক্তি-সামর্থ খুবই ছিল তাই আজো এই বয়সে নীলাম্বর দত্ত সোজা হইয়া ঘোরা-ফেরা করিতে পারেন। আজো নিয়মিত গোপীনাথের মন্দিরে

সন্ধ্যারতির সময় নিজে উপস্থিত থাকেন। বলেন, এমনি করিয়াই একদিন গোপীনাথের চরণে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিব।

একবার মরিস সাহেব শিকার করিতে আসিয়া অমিয়মাধবকে বলিয়াছিল, তোমরা তো 'বিগম্যান'—এতবড় প্যালেশ নষ্ট করিলে কেন?

সেই সময় সাহেব এই প্যালেশের একটি সুড়ঙ্গ-পথ আবিষ্কার করিয়াছিল, যাহা নীলাম্বর দত্তও জানিতেন না। এই পথ কোথায় গিয়া মিশিয়াছে তাহা জানা নাই। কারণ, পথটি কিছুদূর গিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছে। ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রাচীন অট্টালিকার এই ভগ্নাংশ অনেকেরই কৌতূহল উদ্রেক করে। বাড়ীর গঠন-চাতুর্য ও সংরক্ষণ-কৌশলও অপূর্ব্ব। সিঁড়ির দরজার মুখে ফেলা-কপাট আজো তেমনি আছে। পূর্ব্বে চোর-ডাকাতের ভয়ে এইরূপ কপাট ব্যবহার করা হইত। আজ আর কপাট ফেলিবার প্রয়োজন নাই বলিয়া দত্তমশায় উহা খাড়া করিয়া রাখিয়াছেন।

কয়েক পুরুষ আগেও এই গ্রামের শহর বলিয়া খ্যাতি ছিল। আজ শহর নাই বটে, কিন্তু শহরের বিদ্রূপস্বরূপ এই মহানন্দপুর গ্রামে একটি ছোটোখোটো মিউনিসিপ্যালিটি বর্ত্তমানেও আছে, আর আছে ইস্কুল-বাড়ী, থানা, ডাকঘর, লাল ইটের পাকা রাস্তা। 'দত্তঘাট' বলিয়া একটা জায়গা গ্রামের বাহিরে পড়িয়া আছে—যেখানে ঘাটের চিহ্ন নাই বটে, নাম আছে। হয়ত জঙ্গল কাটিলে বাঁধা-ঘাটের দু-একটা সিঁড়ি আজো মিলিলেও মিলিতে পারে।

বহুকালের কথা। সেকালের লোকও আজ বাঁচিয়া নাই—থাকিলে, হয়ত এ-বাড়ীর অনেক ইতিহাস বলিতে পারিত। কিছু কিছু জানেন, গোপীনাথের কুল-পুরোহিত হরিদাসের পিসিমা। তিনি বয়সে নীলাম্বর দত্ত অপেক্ষাও দশ বৎসরের বড়। এই নব্বই বছরের বৃদ্ধার মুখ হইতে এখন যাহা বাহির হয়, তাহার অধিকাংশই রচা-কাহিনী। অবশ্য তিনি অনেক দেখিয়াছেন, কিন্তু যাহা দেখেন নাই, তাহাও তাঁহার মুখ হইতে অনর্গল বাহির হয়। মন্দির-চাতালে এই বৃদ্ধা জপের মালা লইয়া নিয়মিত বসিয়া থাকেন। আর চাহিয়া দেখেন দূরের ঘন ঝোপ-গুলার দিকে। কত কালের কত স্মৃতি! বিস্মরণের পার হইতেও ভাসিয়া আসে! হরিদাসকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলেন, ঐখানে ছিল খাজাঞ্চিখানা। কি কাল ভূমিকম্প এলো—সব ওলোট-পালোট হ'য়ে গেল। নইলে এদের পয়সা আজ খায় কে! ঘড়া-ঘড়া মোহর—আজ ঐ মাটির তলায়! তুই শুনলে পেত্যয় যাবি না হরি, অনেকে শুনেছে—নিশুতি রাতে ঐ জঙ্গল থেকে আসে মোহর-গোণার ঝন্ ঝন্ শব্দ!

—তুমি কি যে বলো পিসিমা! দত্তমশায় জানেন না, এও কখন হয় নাকি?

পিসিমার জপের মালা থামিয়া যায়। বলেন, ও একটা মানুষ না ছাই! নইলে আজ এমন দশা হয়! একবার চেষ্টাও তো মানুষ করে—বন কাটিয়ে মাটি খোঁড়াতে কতই আর খরচ?

এসব কথা হরিদাস বহুবার শুনিয়াছে—তবুও শুনিয়া যায়। অন্ধকারে কেহ কাহারও মুখ দেখিতে পায় না। কথাগুলি অশরীরী হইয়া অন্ধকারে ভাসিতে থাকে। আর তাহার চোখের উপর ভাসিতে থাকে খাজাঞ্চিখানার ঘড়া ঘড়া মোহর।

বিশ্বাস না করিলেও, সেই ঘড়া-ঘড়া মোহরের কথা সে মন হইতে কিছুতেই দূর করিতে পারে না। সত্যই কি মাটি খুঁড়িলে কিছু পাওয়া যায়? গোপীনাথের আরতি সে যথারীতি করে বটে, কিন্তু মন পড়িয়া থাকে ঐ দূর জঙ্গলে। পঞ্চপ্রদীপ কাঁপিয়া কাঁপিয়া মণ্ডলাকারে ঘুরিতে থাকে। গোপীনাথের মুখেও সেই আলোছায়ার কম্পন।

হরিদাস আরতি করে আর দেখে। কি দেখে, সেও জানে না। তবু দেখে।

দীর্ঘ ছায়া পড়ে জীর্ণ মন্দির-গাত্রে। দৈত্যের মতো সেই ছায়া যেন মন্দিরের সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মন্দির-গাত্রে ভাঙা কুলুঙ্গিতে একটা মাটির প্রদীপ জ্বলে। কয়েকপুরুষ ধরিয়াই তাহা জ্বলিয়া আসিতেছে।

হারই কালো শিখার ছোপ পড়িয়াছে ভাঙা দেয়ালের গায়ে। পঞ্চ-প্রদীপের আলো-ছায়ায় ঐ বীভৎস কালো গ যেন আরও ভয়াবহ হইয়া উঠে। আরতি করিতে করিতেও হরিদাসের হৃদ্‌কম্পন থামে না।

অতি পুরাতন ইতিহাস—ঘাঁটাইতেও ইচ্ছা করে না, শুনিতেও ভাল লাগে। নীলাম্বর দত্ত কতটুকু জানেন জানে! কিন্তু তাঁর মুখ হইতে কোন কথাই কেহ কখনো শুনে নাই। শুধু একটা জিনিস লক্ষ্য করা গিয়াছে, অতি-প্রাচীন ভগ্নপ্রায় পৈতৃক বাসভূমির প্রতি তাঁর অসামান্য দরদ। সংস্কার অভাবে একটু একটু করিয়া ারই চোখের উপর অনেক কিছু ভাঙিয়া পড়িতেছে, তবু তাঁহার দরদের অন্ত নাই। কতকালের ভাঙা ইটের —তাহার ফাঁকে ফাঁকে কত আগাছা নিয়তই জন্মলাভ করিতেছে, তবুও নীলাম্বর প্রতিদিন অন্তত একবার ার্ও সেই স্থানগুলি দর্শন করিয়া আসেন। যেন প্রতিদিনের নিয়মিত তীর্থ-দর্শন।

স্বদেশ বলিতে একটা বড় কিছু ধারণা নীলাম্বর দত্তের মনে ছিল না। তিনি জানিতেন, তাঁহার গ্রামকে, ার প্রতিবেশীদের—আর জানিতেন, সেই গ্রামের পরিবেশকে। আবাল্য যাঁহারা তাঁহার কাছে রহিয়াছেন, াদের লইয়াই তো স্বদেশ। নহিলে ভূমির মাধুর্য আর কিসে? ভৈরব ভট্টাচার্য, মধু রায়, কাঙালী মোড়ল, ষষ্ঠী লী— ইঁহাদের বাদ দিয়াও যেমন মহানন্দপুর নয়, আবার ষষ্ঠীতলার ঐ শান-বাঁধানো রোয়াক, গোঁসাইপাড়ার ণ্ডপ, রায়েদের আটচালাহীন মহানন্দপুরও তাঁহার পিতৃভূমি নয়। বনে-জঙ্গলে-ঘেরা এই মহানন্দপুরের বি তিনি আবাল্য দেখিয়া আসিতেছেন, যে-দেশের প্রতিটি তরু-লতার সহিত তিনি আজন্ম পরিচিত, সেই ছু লইয়াই তো তাঁহার পিতৃভূমি। নহিলে, মাটির আর পৃথক্ মূল্য কোথায়?

ূল্য মাটিরও নাই, মূল্য তাঁহার নিজেরও নাই। এই সবকিছু লইয়াই তাঁহার গৌরব। তাঁহার সমাজ, তাঁহার ি, তাঁহার কৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গি সমস্তই ইঁহাদের লইয়া। এতবড় প্রাচীন প্রাসাদের ভগ্নাংশ—তাহারও গৌরব দর লইয়াই। নহিলে আজিকার নীলাম্বর দত্ত আর কতটুকু?

২

কাঙালী মোড়ল সম্পদশালী গৃহস্থ। দশবারোটি ধানের গোলা, পাঁচ-ছটি গোরু, ফলের বাগান—জম-জমাট । এত সম্পদের অধিকারী হইয়াও কিন্তু কাঙ্গালী মোড়লের আচার-আচরণে ইহার কোন ছাপ পড়ে নাই। রও ছিল তাহার তেমনি অমায়িক। দত্তমশায়ের বৈঠকখানায় সে সন্ধ্যারতির পর নিয়মিত আসিয়া –পাড়ায় বড়-একটা যাইত না। আর কাহার নিকটেই বা যাইবে? দত্তমশায়কে সে জ্যেষ্ঠের মতো শ্রদ্ধা । কখন ভুলিয়াও সে ফরাসের উপর বসিত না। সে আসিয়াই একখানি কম্বল টানিয়া লইয়া বসিত। য় বলিতেন, কাঙালীর কোনো পরিবর্তনই দেখলাম না সেই একইভাবে চলছে।

কাঙালী হাসিয়া বলিত, আশীর্বাদ করুন, এইভাবেই যেন যেতে পারি।

কাঙালীর সংসারও বড় ছোট-খাটো নয়। স্ত্রী, কন্যা, এক পুত্র—ইহা ছাড়া, ছটি বিধবা বোন তাহার ড়িয়াছে। ঝি চাকর মুনিষ তাহারাও দুবেলা পাত পাড়িতেছে। কাঙালী বলে, সকলকে লইয়াই তো নহিলে সংসার কিসের! ভগবান দিয়াছেন তো এইজন্যই।

ই কথা শুনিয়া দত্তমশায়েরও চোখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিত।

াঙালী মোড়ল সেদিন আসিয়া বলিল, ষষ্ঠীতলার বটগাছটা আজ গেল।

ত্তমশায় চমকাইয়া উঠিলেন। বলিলেন, সে কি!

দত্তমশায় বলিলেন, তলে তলে ক্ষয় হচ্ছিলো। অমনি ক'রে আমিও একদিন মুখ থুবড়ে পড়বো।

কাঙালী বলিল, কতদিনের হ'লো গাছটা বলুন তো?

—পাঁচশো বছরের কম নয়। আমার ঠাকুর্দার মুখেও শুনেছি, ঐ বটগাছতলায় গাজনের সময় মেলা বসতো।

—আজ গাছ নেই—মেলা জম্‌বেও না।

কাঙালীর এই কথা শুনিয়া দত্তমশায় বলিলেন, তা যা বলেছ, ঐ গাছতলায় মেলা যেন গম্ গম্ করতো। ষষ্ঠী-পূজোর চলনও তো ঐ বটগাছের জন্যে। এবার ষষ্ঠিপূজো নিরর্থক হয়ে গেল। তেমনি নিরর্থক হয়ে গেল মহানন্দপুরের নাম। বহুলোক ঐ বটগাছ নিশানা করেই গাঁয়ে ঢুকতো। গোটা মহানন্দপুর ফাঁকা হ'য়ে গেল। ভৈরব ভট্‌চাজ বলে শোনোনি, ও আমাদের আদিম বুড়ো। এবার আমার পালা। গাঁয়ের বুড়ো বলতে এখন আমিই রইলাম।

—তা সত্যি, আপনি গেলেই এ গাঁয়ের হয়ে গেল। আমাদের ছেলেদের কি আর গাঁয়ের প্রতি মমতা থাকবে! তারা সবাই শহরমুখো। শহরের আরাম যাদের মধ্যে একবার ঢুকেছে, তারা এ-পরিবেশে বাস করতে পারবে না। আমার ছেলেকে দিয়েই তো দেখছি। পড়াশুনো করতে কলকাতায় গেল, আর বাড়ী ফিরতে ইচ্ছে করে না। নেহাৎ না এলে নয়, তাই আসে।

—যাক, ছেলেটা মানুষ হ'লো এই ভালো।

—ভালো আর হ'লো কই দত্তমশায়! বি, এ, পাস করলেই কি মানুষ হয়! ওরা হ'লো জামা-কাপড়ের বাবু। বন্ধু-বান্ধবের কাছে আমার পরিচয় দিতে ওর লজ্জা করে।

—বলো কি কাঙালি! বাপের পরিচয় দেবে না ছেলে? তবে তার অস্তিত্ব রইলো কোথায়?

—তবেই বুঝুন, ও কি কোনোদিন এ-গাঁয়ে এসে বাস করতে পারবে?

—এ হ'লো কি? বেঁচে থাকলে আরও কত দেখতে হবে। বলিয়া দত্তমশায় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

—দেখবেন বই কি। গাঁ ভেঙে সব শহর বানাচ্ছে—শোনেন নি? রানিতলায় বিজলী-বাতি জলছে?

—সবই বুঝতে পারছি কাঙালী, গাঁয়ের সৌন্দর্য ওরা আর রাখবে না!

—সব কারখানা বানাবে। ধান চাষ হবে সব আপন আপন ছাদে।

দত্তমশায় হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, তা যা বলেছো।

—তাইতো বলছি দত্তমশায়, আমাদের শীগ্‌গির শীগ্‌গির যাওয়াই ভাল। বেঁচে থাকলে শুধু দুঃখই পেতে হবে। সাধে কি সেকালের লোকেরা পঞ্চাশ পেরুলেই বনে যেতো।

—বনই বা এখন কোথায়? গতযুদ্ধে তো সব বন কেটে ওরা সাফ করে দিলে। অমন যে সুন্দরবন তাই আর নেই। এখন তো সেখানে বহু লোকের বসতি।

—আচ্ছা, আজ উঠি দত্তমশায়! আপনারও খাওয়ার সময় হয়ে এলো।

—তুমি এলে দুদণ্ড কথা বলে বাঁচি। কেউ আসে না। আর আসবে কেন? সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। এই কিছুদিন আগেও বৈঠকখানায় লোক ধরতো না।

—তাই তো হয় দত্তমশায়! আজকাল মান তো টাকার মধ্যে।

কাঙালী চলিয়া গেল। নীলাম্বর দত্ত চোখ বুজিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলেন। আজ যেন তাঁহার মনে হইল, একটা যুগ পার হইয়া আসিয়াছেন। সে-যুগের কত ঘটনাই না আজ তাঁহার মনে পড়িতেছে। লোকের নালিসই কি সেদিন কম ছিল? অতি তুচ্ছ বিষয়েরও মীমাংসা করিতে সেদিন লোকে তাঁহার কাছে ছুটিয়া আসিয়াছে।

বৈকালে বেড়াইতে বাহির হইতেন। কত লোকের কত কথা, কত আত্মীয়তা। সামান্য অসুখ হইলে সেদিন লোকে ছুটিয়া আসিত। আজ মরিলেও কেহ আসিবে না। চোখ বুজিয়া বসিয়া পুরানো স্মৃতির জাবর কাটিতে আর ভাল লাগে না। তিনি উঠিয়া ভিতরে গেলেন।

ভিতরে আসিয়াও দেখিলেন, তাঁহার জন্য কাহারও কোনো উৎকণ্ঠা নেই। বৌমারাও আপন আপন পুত্র-কন্যা লইয়াই ব্যস্ত। তিনি সোজা নিজের ঘরে গিয়া শুইয়া পড়িলেন। বুঝিলেন, অতঃপর বৌমাদের দয়ার উপরই নির্ভর করিতে হইবে। আরও বুঝিলেন, এ-সংসারে তাঁহার প্রয়োজন ফুরাইয়াছে। এইরূপ গলগ্রহ হইয়া থাকিবার আবশ্যকতা কি? তবে কি জীবনে আরও দুঃখ পাওনা আছে? এইজন্যই সেকালে 'বানপ্রস্থ' লইবার ব্যবস্থা ছিল। নিশ্চয়ই তাঁরা দুঃখ পাইয়াই ইহার প্রচলন করিয়াছিলেন। যে কারণই থাক, তাঁদের কথা স্মরণ করিয়া আজ নীলাম্বর দত্তের শ্রদ্ধায় মাথা নত হইয়া আসিল।

৩

প্রতি বৎসরের মতো এবারেও বারোয়ারীতলায় দুর্গাপুজার আয়োজন হইতেছে। গ্রামে এখন এই একটি মাত্র পুজা অবশিষ্ট আছে। পূর্বে দত্তমশায়ের বাড়িতে ঘটা করিয়া পূজা হইত। সে পুজা অনেকদিনই বন্ধ হইয়াছে। সে-সমারোহের কথা গ্রামের প্রাচীনেরা আজও মনে রাখিয়াছে। গ্রামে এই তিনদিন কাহারও বাড়িতে উনান জ্বলিত না। ব্রাহ্মণ-বিদায়ের ঘটাই কি কম ছিল! তাঁহাদের প্রত্যেককে কাঁসার থালা-বাটি-গ্লাস এবং দক্ষিণা প্রদান করা হইত। কাঙালীও জানে সেকথা। আজ তাহা গল্প-কথায় দাঁড়াইয়াছে। অবস্থা পড়িয়া যাওয়ায় গাঁয়ের অন্যান্য পুজাও বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কেবল মান রাখিয়াছে এই বারোয়ারীতলা। অবশ্য এপূজাও বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে। এবং পূর্বের মতো আজও অষ্টমীর দিনে একশো আটটি ছাগ-বলি দেওয়া হয়। অনেকে ইহা পছন্দ করে না বটে, কিন্তু সাহস করিয়া তুলিয়া দিতেও পারে না—সংস্কারে বাধে। আবার ইহাও প্রথা, এক ব্যক্তি বিশ্রাম না লইয়া একনাগাড়ে এই বলি দিবে। ইহা কম শক্তির প্রয়োজন নয়। এই শক্তি কয়জনেরই বা আছে? এতকাল ভৈরব ভট্টাজ এই কাজ করিয়া আসিতেছেন। অসাধারণ শক্তি ছিল তাঁর! সেরকম বলিষ্ঠ গড়ন প্রায়ই দেখা যায় না। সবাই বলিত অসুর!

অসুরই বটে। বলি দিবার জন্য যখন সে প্রস্তুত হইয়া দাঁড়াইত, তখন তাহাকে দেখিলে ভয়ই হইত। কপালে রক্তচন্দনের তিলক, পরনে লাল চেলি—যেন একজন কাপালিক আসিয়া দাঁড়াইল। খাঁড়া ধরিবার পূর্বে সে একবোতল মদ ঐখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়াই গলায় ঢালিয়া দিত। ঢক্ ঢক্ করিয়া সেই মদ গলাধঃকরণ করিয়া বোতলটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিত। 'মা, মা' বলিয়া বিকট আওয়াজ করিয়া খাঁড়া হাতে যূপকাষ্ঠ স্পর্শ করিত। আয়ত চক্ষু দুটি যেন নাচিয়া উঠিত। বলি শেষ হইলে, এক অঞ্জলি রক্ত পান করিয়া সেইখানেই গড়াগড়ি দিত। সে এক দৃশ্য!

সে ভৈরব ভট্টাজ আর নাই। তাহার বয়স হইয়াছে। আর সে শক্তি নাই। এখন অতগুলি বলি দিবার মতো শক্তিমান পুরুষ কোথায়? কাজেই নিয়মরক্ষার নিমিত্ত এখন একটি করিয়া বলি দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

বারোয়ারী পুজা। নামে পুজা। অর্থাৎ পুজা নাই, আড়ম্বর আছে। শুধু মেরাপ বাঁধিতেই কি কম টাকা খরচ হয়। তারপর আছে আলো। ইলেক্‌ট্রিক নাই, গ্যাসের আলো। তব এই পূজার [illegible]

আছে বলিয়া পাঁচজনে আনন্দ করে। বিভিন্ন গ্রামের লোক আসিয়া ভিড় জমায়। এখনকার মতো তখন মাইকের উৎপাত ছিল না। তিনদিন ধরিয়া যাত্রাগান হয়। কলিকাতা হইতে এই যাত্রা দল আসে।

কাঙালী যাত্রা শুনিতে খুব ভালবাসিত। কিন্তু এক দিনের একটি তুচ্ছ কারণে সে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিল। সেও এক মজার ঘটনা। সেদিন পালা হইতেছিল 'পাণ্ডবের' অজ্ঞাতবাস'। বেশ জমিয়া উঠিয়াছে। কাঙালী একবার বাহিরে আসিয়া 'সাজঘরের' সম্মুখে দাঁড়াইল। দেখিল।দ্রৌপদী বিড়ি টানিতেছে। তার সর্বশরীর ঘিন্ ঘিন্ করিয়া উঠিল। সে আর ভিতরে ঢুকিল না, সোজা বাড়ি চলিয়া আসিল। সেই হইতে আর কখনো যায় নাই। তবে সাহায্য কোনদিনই বন্ধ করে নাই। সে মোটা টাকা চাঁদা দিত। কারণ সে জানিত, গ্রামের ঐ একটি মাত্র পুজা—উহাকে বাঁচাইয়া রাখিতেই হইবে। পুজা শেষ হইয়া গেলে, একদিন 'কাঙালী-ভোজন' হইত। ইহার ব্যবস্থাও কাঙালী করিয়াছিল। সম্পূর্ণ ব্যয়ভার সেই বহন করিত।

দত্তমশায় ইহার সব খবরই রাখিতেন। বলিতেন, কাঙালী ভাল কাজই করিতেছে। নিজে যাহা পারেন না, অপরে তাহা করিলে তাঁহার আনন্দই হয়।

মা লক্ষ্মীও কৃপা করিতেছেন। সেবার ধানও হইল তাহার পর্যাপ্ত পরিমাণে। গোলায় ধান আর ধরে না। কাঙালী অর্দ্ধেক ধান বিক্রয় করিয়া দিল।

মোড়লগিন্নী বলিল, ধানগুলো তাড়াতাড়ি বিক্রি ক'রে দিলে? কিছুদিন পরে বিক্রি করলে চারগুণ দাম পেতে।

—রাখবার জায়গা কোথায়? তার চেয়ে এই ভাল হলো। বেশি লোভ করো না গিন্নী! লোভ পাপ।

—গিন্নী আর কিছু বলে নাই।

—মনে করছি, ঐধান বিক্রির টাকায় দুটো ভাল দেখে গোরু কিন্‌বো।

গিন্নী হাসিয়া বলিল, সে মন্দ কথা নয়। আচ্ছা, একটা কথা শুনছি, লাঙ্গল না থাকলে ধান-জমি নাকি রাখা যাবে না?

—হাঁ লাঙ্গল যার জমি তার।

—তার ব্যবস্থা তাহলে কি করছো?

—দরকার হয় লাঙ্গল কিন্‌বো। কিন্তু নিজে তো চাষ করতে পারবো না। একজন লোক রাখতে হবে আর কি। যাক্ সে পরে দেখা যাবে।

—তোমার দত্তমশায়ের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে একবার দেখো না, তিনি কি বলেন?

—একথাটা মন্দ বলোনি। সময় সময় তোমার বুদ্ধি খেলে ভাল।

—বুদ্ধি তো ভালই ছিল, সুযোগ দিলে কই?

—রক্ষা করো, তোমাদের সুযোগ দিলে অনর্থ ঘটবে।

—সে তো বটেই।··আমরা হাঁড়ি ঠেলতে এসেছি, হাঁড়ি ঠেলেই যাব।

—ওতেই মেয়েদের গৌরব।

—ঐসব বড় বড় কথা দিয়েই তো তোমরা ভুলিয়ে রাখো।

—ভোলানো নয় গিন্নী। শোনো নি, দত্তমশায়ের জেঠীর কথা। একা যজ্ঞিবাড়ির হাঁড়ি ঠেলতেন। সামর্থও ছিল, হাতের রান্নাও ছিল চমৎকার। পাঁচখানা গাঁয়ের লোক খেয়ে নাম করতো। সে অপূর্ব রান্না যে না খেয়েছে তার জন্মই বৃথা। নিরামিষ সাধারণ রান্না যে এত চমৎকার হয় তা জানা ছিল না। তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল 'যজ্ঞিঠাকরুণ।' যাক, সময় হয়ে গিয়েছে—দত্তমশায়ের ওখানে একবার যেতে হবে।

—হাঁ, নইলে ভাত হজম হবে না।

কাঙালী হাসিয়া বলিল, তা সত্যি।

৪

জমিদারী মরিলেও জমিদার মরে না। জমিদার বিহারীলালের দাপট তাই আজও রহিয়া গিয়াছে। সেই একই ইতিহাস। নীলাম্বর দত্তের পূর্বপুরুষ যেভাবে বিধ্বস্ত হইয়াছেন, বিহারীলালও সেইভাবে বিধ্বস্ত হইতে চলিয়াছেন। তবে আগে আর পরে। পাপের সেই একই পিচ্ছিলপথ।

সে বৎসরও বিহারীলাল পাটের ব্যবসায়ে তেমন সুবিধা করিতে পারিলেন না। উপর্যুপরি দুই তিন সন তাঁহাকে লোকসান দিয়া বাজারের সুনাম রক্ষা করিয়া আসিতে হইয়াছে। তাহার উপর কয়লাখনির দুর্ঘটনায় তিনি একেবারেই মুষড়াইয়া পড়িয়াছেন। পূর্বের সে বয়সও নাই, উৎসাহও নাই। পরিশ্রম করিবার শক্তি নাই বলিয়াই হউক বা পড়্‌তা পড়িয়াছে বলিয়াই হউক, তিনি যে আর উঠিতে পারিবেন এরূপ ভরসা নাই। গিন্নী বলিয়াছেন, আর নষ্ট করিয়া কাজ নাই, যাহা আছে তাহাই নাড়িয়া-চাড়িয়া শেষ কয়টা দিন কাটাইয়া দাও,—শেষে কি সব খোয়াইয়া পথে দাঁড়াইব?

কথা মিথ্যা নয়। এরূপ আর বছর কয়েক হইতে থাকিলে তাঁহাকে সর্বস্বান্ত করিয়া ছাড়িবে। এদিকে বিমলাক্ষেরও কিছুদিন হইতে কোনো সংবাদ নাই। সে যে কোথায় কিভাবে আছে, তাহাও জানিবার উপায় নাই। সদর কাছারিতে এক বুড়া নায়েব ছাড়া পুরাতন কর্মচারি আর কেহই নাই। দেবাইপুরের কাছারি জনশূন্য। গোমস্তা রামচন্দ্র যাহা পাইতেছে তাহাই লুটিয়া পুটিয়া খাইতেছে। কেহ দেখিবারও নাই, আর দেখিবেই বা কে? দেখিতে হইলে নিজেকেই ছুটিতে হয়, কিন্তু ছুটাছুটি করিয়াই বা কতদিক রক্ষা করা চলে! দুই ছেলে—নলিনাক্ষ আর বিমলাক্ষ, তাহারা কৃতী হইয়াও বাপের সহিত কোনো সম্বন্ধই রাখিল না। বড় নলিনাক্ষ শুনিয়াছি কোন্ কলেজের প্রফেসর। আর ছোট? সত্য মিথ্যা জানি না, লোকে বলে সে নাকি এক খৃষ্টানীকে বিবাহ করিয়াছে। আজ তাহারা দেখাশুনা করিলে জমিদারীর এই হাল হয়? সবই ভাগ্য। বৃদ্ধ নায়েব আসিলে বলিলেন, মল্লিক, আর কেন—অনেকদিন চুটিয়ে জমিদারী করা গেল, নিলেমে উঠবার আগে ওগুলো বিক্রি করে দাও। দেবাইপুরের খবর কিছু পেয়েছো?

—শুনলাম, প্রজারা এসে কাছারিতে গোমস্তাকে শাসিয়ে গিয়েছে।

—তোমার গোমস্তা রামচন্দ্র কি বলে? তোমার কাছারিতে কেউ কি নেই যে তাকে ধরে আনতে পারে?

—ধরে হয়ত আনা যেতে পারে কিন্তু যা গিয়েছে তা তো আর ফিরবে না।

—তা হয়ত ফিরবে না, কিন্তু জমিদারীটা ফিরবে।

এমন সময় একজন পাইক আসিয়া খবর দিল, দেবাইপুরের কাছারিতে আগুন লাগিয়াছে।

বিহারীলাল মাথায় হাত দিয়া বসিলেন। বলিলেন, এ যে একদিন হবে, এতো জানি মল্লিক। সম্ভবত রামচন্দ্রকে আর পাওয়া যাবে না। বড় দেরী হ'য়ে গেল মল্লিক, দুদিন আগে হলে বোধ হয় কিছু করা যেতো।

মল্লিক বলিল, কিন্তু আমিও কিছু সহজে ছাড়বো না।

বিহারীলাল সহাস্যে বলিলেন, সে তুমি যা হয় ক'রো, কিন্তু আমাদের দৌড়ও তার অজানা নেই। সে জানে, দুই বুড়োর হাত তার আর নাগাল পাবে না।

মল্লিক সে প্রসঙ্গ চাপা দিয়া বলিল, শুনেছেন নলিনাক্ষ কলকাতায় একটা প্রফেসারির কাজ পেয়েছে?

হ্যাঁ, ছেলে বটে একটা, তবে এমন ছেলে থেকেও কোনো কাজে এলো না। ওরা কাছে থাকলে কি আর জমিদারী যায়!

—থাক, সেসব কথা না বলাই ভাল। তাকে মানুষ ক'রে দিয়েছি, সে নিজের জীবনে কষ্ট না পায়। নইলে তার স্বোপার্জ্জিত অর্থ এ-বংশের তহবিলে কোনোদিনই উঠবে না। সে বড় হোক, দশজনের একজন হ'য়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করুক, আমার তাতে কোনো স্বার্থই নাই।

মল্লিক সহাস্যে বলিল, তা তো নিশ্চয়, তবে কিনা ওর নামে ব্যাঙ্কে 'য়্যাকাউন্ট' আছে আর সেটা যখন হুজুরেরই দেওয়া, তারও তো এখন কোনো কাজে লাগছে না—ঈশ্বরেচ্ছায় সে মোটা রকমেরই রোজগার করছে—

—না মল্লিক, বিহারী বাঁড়ুজ্যে যে-থুতু একবার ফেলে তা আর চাটে না।

—তা তো বটেই, তবে কিনা এই দুঃসময়ে টাকাটা পেলে—পরে আবার তার নামেই ব্যাঙ্কে জমা হ'তো।

—না, না মল্লিক, অভাব বোধ কর, মহাল বিক্রি করো—আমি একটা কথাও বলবো না। লোক লাগাও, আমি দেবাইপুরের মহাল বিক্রি করবো। বলিতে বলিতে বিহারীলাল অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন।

ইহার পর আরও দুইমাস গত হইয়াছে। বিহারীলালের দেহ ও মন দুইই ভাঙিয়া পড়িয়াছে, শেষ পর্যন্ত সামলাইতে না পারিয়া শয্যা লইয়াছেন। মনোভঙ্গের এই নিদারুণ ক্লেশ তাঁহাকে একদিকে যেমন পীড়িত করিতেছিল, অন্যদিকে ঠিক তেমনই তিনি ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মল্লিককে ডাকিয়া বলিলেন, শীঘ্র শীঘ্র একটা বিলিব্যবস্থা ক'রে ফেলো, এর পর আর সময় পাবে না।

মল্লিক সহাস্যে বলিলেন, খুব সময় পাবেন, কবিরাজ মহাশয় মিথ্যা বলেন না।

—একটা কথা কি জান মল্লিক, এই দেহটাকে আর বড় বেশী বিশ্বাস করতে পারি না। এখন কেবলই মনে হচ্ছে, ফাঁকি দিয়ে এতটা কাল বেঁচে এসেছি—আর বাঁচতে গেলে নিজেই ঠক্‌বো।

মল্লিক কোনো কথা বলিলেন না। আর বলিবারই বা ছিল কি? সারাটা জীবন কত দুষ্কর্মের মধ্য দিয়া ঐ বিহারীলালের সহিত তাঁহাকেও অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে তাহার ইতিহাস অন্যে না জানিলেও, তিনি তো জানেন, আর জানেন বলিয়াই আজ জীবন-সায়াহ্নে নিজেকেও ক্ষমা করিতে পারিলেন না। তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এমনি করিয়া তাঁহাকেও একদিন সব দেনা শোধ করিয়া যাইতে হইবে।

বিহারীলাল বলিলেন, আমার কি মনে হচ্ছে জান মল্লিক, এর আর আদি-অন্ত নাই,—চোখ বুজে পড়ে পড়ে আমি সেইসব কথাই ভাবছি। একদিন ছিল, যখন এগুলোকে তুচ্ছই মনে হয়েছে, আজ দেখছি, কিছুই ফেলা যায় না—সব পাওনা কড়ায়-গণ্ডায় নিয়ে যেতেই হবে।

—আপনি কেন ভাবছেন, আবার ভাল হয়ে উঠবেন।

—ভাবিনি মল্লিক, আর ভাববারই বা আছে কি—যখন এর কূল-কিনারাও নেই। তবে কি মনে হয় জান, শুধু আমার পাপেই সব জ্বলেপুড়ে গেল।

এমন সময় কাছারি-প্রাঙ্গণে গোলমাল উঠিল, ভৃত্য রামহরি আসিয়া খবর দিল, দেবাইপুরের গোমস্তাবাবুকে কয়েকজন পাইক ধরিয়া আনিয়াছে।

বিহারীলাল উত্তেজিত হইয়া বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। বলিলেন, তাকে একবার এখানে আনতে পারো মল্লিক? আমি শুধু একবার তাকে দেখবো।

মল্লিক দ্রুত বাহির হইয়া গেলেন।

রামচন্দ্রকে সকলে মিলিয়া উহারা বাঁধিয়া আনিয়াছে। ঐ বদ্ধাবস্থাতেই তাহারা তাহাকে কর্তার নিকটে

লইয়া আসিল। কর্তা একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া সহাস্যে বলিলেন, তারপর রামচন্দ্র, বাড়ীঘর, স্ত্রীপুত্রের সব ব্যবস্থা ক'রে এসেছো তো? না এসে থাকো, আমি তার জন্যে তোমাকে আরও কিছুদিন সময় দিচ্ছি।

রামচন্দ্র কাঁদিয়া ফেলিল। বলিল, আমাকে এবারের মতো ক্ষমা করুন।

বিহারীলাল গর্জন করিয়া উঠিলেন: ক্ষমা না করলে তোমাকে এতক্ষণ গুলি ক'রে মারতাম। এর বেশি দয়া তুমি আমার কাছে কি ক'রে আশা করো?

—অভাবের তাড়নায় লোভ আমি সামলাতে পারিনি, কিন্তু আপনার ক্ষতি করবো, এমন অমানুষ আমি সত্যিই নই। বলিতে বলিতে রামচন্দ্রের গলা ধরিয়া আসিল।

বিহারীলাল বিচলিত হইলেন, একবার কি যেন বলিতেও গেলেন—ঠোঁট নড়িল কিন্তু কথা বাহির হইল না।

নায়েব ইহা লক্ষ্য করিয়াই হউক বা যে কোন কারণেই হউক, গর্জন করিয়া বলিলেন, ক্ষতির পরিমাণ সামান্য নয় যে, দুফোঁটা চোখের জল দেখে মানুষ ভুলে যাবে।

—থাক্ থাক্ মল্লিক, ক্ষতি যা হবার তা তো হয়েছে—সে আর ফিরবে না। পরে পাইকদের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ওরে, তোরা বাঁধন খুলে দে,—হারামজাদা ব্যাটারা, এমনি ক'রে মানুষকে বাঁধে কখনো!

রামচন্দ্র ছাড়া পাইয়া আভূমি প্রণাম করিয়া বলিল, আপনার জয় জয়কার হোক্—আপনি দেখবেন, রামচন্দ্র বেইমান নয়।

মল্লিক সহাস্যে বলিলেন, বেইমানের মানে জানো রামচন্দ্র!

বিহারীলাল অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া পড়িলেন, ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, থাক্ থাক্ মল্লিক, ও যখন অনুতপ্ত—

বাধা দিয়া রামচন্দ্র বলিল, অনুতপ্ত সত্যই, কিন্তু সে বেইমানী করার জন্য নয়, কারণ আমি নিজে জানি—আর যাই ক'রে থাকি, বেইমানী আমি করিনি। অভাবের তাড়নায় মানুষ নিজের সন্তানকে পর্যন্ত বিক্রি করে—স কি তার স্নেহের অভাব ব'লে করে? ক্ষতি আমি করেছি—হুজুর বিশ্বাস রাখলে, সে-ক্ষতিরও হয়ত একদিন পূরণ হতে পারবে কিন্তু বিনা চিকিৎসায় ছেলেগুলো ম'রে গেলে—

—না, না. চিকিৎসা হবে না কেন,—বলিতে বলিতে বিহারীলাল চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, মল্লিক, তুমি বরং আরও কিছু টাকা রামচন্দ্রকে দাও। ছেলের চিকিৎসা হবে না, সে কি কথা!

রামচন্দ্র বাধা দিয়া বলিল, না, টাকার আর আমার দরকার নাই। তা ছাড়া, ছেলেরা আমার এখন ভালই আছে।

—যাক্, ভাল থাকলেই ভাল। তোমার সংসারের এ রকম অবস্থা, আমাকে তো কোনোদিন জানাওনি রামচন্দ্র! জানালে ভাল করতে—তা যাক্, যা হবার হয়ে গিয়েছে।

একজন আসিয়া খবর দিল, কবিরাজ মহাশয় আসিয়াছেন। মল্লিক ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, কি অন্যায় করলেন বলুন দেখি! উত্তেজিত হয়ে অনেক বাজে কথা ব'লে কবিরাজ মশায়ের উপদেশ লঙ্ঘন করলেন। তিনি শুনলে দুঃখিতই হবেন।

রামচন্দ্র লজ্জিত হইয়া বলিল, তবে তো খুব অন্যায় করলাম—অসুস্থ শরীরকে আমিই অনর্থক ব্যস্ত ক'রে তুলেছি। না, না, খুবই অন্যায় করেছি। বলিতে বলিতে নিতান্ত অপরাধীর মতো রামচন্দ্র মাথা নীচু করিয়া প্রস্থান করিল।

বিহারীলাল ঠিকই শুনিয়াছিলেন, বিমলাক্ষ কোন্ এক খৃষ্টান-মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। কিন্তু জানেন তাহাদের বিবাহিত জীবনের পরের অবস্থা। সেও এক দুঃখময় জীবন!

বিমলাক্ষ বলিয়াছিল বিলাত যাইবে এবং তাহারই পাথেয় সংগ্রহ করিতে একদিন সে মায়ের শরণ হইয়াছিল। কিন্তু মাতার সাহায্যলাভ করিয়া সেই যে সে একদিন বাটীর বাহির হইয়াছিল, তাহারপর এই তিন বৎসর অতীত হইয়া গেল, বিমলাক্ষের কোনো সংবাদই কেহ জানে না। সে বিলেত গেল, কি কলিকাতা রহিয়া গেল, এ খবরও এতকাল জানা যায় নাই। অবশ্য সে কাহাকেও কিছু না বলিলেও, সে যে আত্মগো করিয়া এই কলিকাতাতেই বাস করিতেছে ইহা অনুমান করা কঠিন নয়। যে কারণেই হোক, বিলেত তা যাওয়া হয় নাই।

বিহারীলালের যখন সময় ভাল ছিল তখন একটি মোটা অঙ্ক দুই পুত্রকে সমান ভাগে ভাগ ক দিয়াছিলেন। বিমলাক্ষ সে টাকায় আজ পর্যন্ত হাত দেয় নাই এবং হাত দিবার সংকল্পও তাহার নাই। এসবের কিছুই জানে না। জানিবার প্রয়োজনও তাহার নাই। আরাম করিয়া থাকিবার সকল রকম উপকরণ হাতের কাছে পাইয়া সে খুশিই আছে। কে কাহার জন্য কতটুকু করিতেছে এবং শেষ পর্যন্ত করিবে কিনা ই জানিবার কৌতূহলও তাহার নাই। ভালবাসিয়া দুঃখকে বরণ করার মধ্যে মহত্ব যদিই বা থাকে, গর্ব কি নাই। তাছাড়া, উহাকে ভালবাসার নিদর্শনরূপে স্বীকার করিতে মিলি কোনদিনই রাজি নয়। বিমলাক্ষ দেখিয়া অবধি তাহার ঐশ্বর্যের রূপটাই মাথার মধ্যে নিরন্তর পাক খাইয়া ঘুরিয়াছে, যাহার জন্য আজ সব কিছু তুচ্ছ করিয়া এই একমাত্র আশ্রয়কেই শ্রেয় ও প্রেয় বলিয়া জানিয়াছে। বিমলাক্ষ ইহার বিন্দুবিসর্গ জা না। সে জানে, মিলির মতো ভালবাসিতে আর কেহ দ্বিতীয় নাই, তাই সর্বস্ব খোয়াইয়াও ঐ মিলির হাতে নিজেকে সঁপিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

কিন্তু ক্রমেই মিলির রূপ প্রকট হইল। গ্রীষ্মের অপরাহ্ন। যাই যাই করিয়াও বেলা আর যাইতে চা না। এক গ্লাস সরবৎ হাতে করিয়া মিলি ঘরে ঢুকিল, বলিল, তুমি কি আজ আর বিছানা থেকে উঠবে না?

—উঠেই বা কি করবো, যতটুকু শুয়ে থাকি ততটুকুই লাভ। তাছাড়া, কাজকর্ম না থাকলে নিজে এমন অসহায় মনে হয়—পুরুষমানুষ না হ'লে বসে বসে কাঁদতাম।

—বেশ তো চলো না, সিনেমায় কিছুক্ষণ কাটিয়ে আসি।

—সে আরও ভয়ানক।—আচ্ছা বলতে পারো, প্রেম এত স্বল্পায়ু কেন? দুদিনেই যেন নিঃশেষ হ গেল! দুঃখ ক'রো না মিলি, তোমাকে অপমান করবার জন্যে বলিনি। তোমাকে আর আমার ভাল লাগছে না একথাও বলতে যতখানি ব্যথা পাচ্ছি, ভাল লাগছে বলতেও ঠিক ততখানি আমার লাগছে। কেন এম হয় বলতে পারো মিলি? অথচ তিন বছর আগে তোমাকে পাবার জন্যে কি চেষ্টাই না করেছি, আজ সেস কথা মনে হ'লে হাসি পায়। কি আশ্চর্য মিলি, একদিন ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করতে চাইনি, আজ ঘুমুতে পেলেই যেন বেঁচে যাই।

মিলি এতক্ষণ পর্যন্ত একটি কথাও বলে নাই, নীরবে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল, এইবার সে চোখ তুলিয়া চাহিল। তাহার মুখ অতিশয় পাণ্ডুর এবং কথা বলিতে গিয়া ওষ্ঠাধরও কাঁপিয়া উঠিল, কিন্তু তাহার পরেই সে দৃঢ়কণ্ঠে বলিল, এমনি ক'রে তুমি আমাকে বার বার অপমান করো কেন বলো তো? ভাল না লাগে, গেলেই পার, আমি তো তোমাকে ধ'রে রাখিনি।

—ধরে বোধ হয় কেউ কাউকেই রাখে না মিলি, কিন্তু তবু ছাড়াও তো কেউ পেলো না দেখলাম। তুমি ভাবছো, আমি চ'লে যাবার জন্যেই এত কথা বলছি, বিশ্বাস করো মিলি, চ'লে আমি যাবো না, আর চলেই বা যাব কোথায়—কোথাও শান্তি নাই মিলি, কোথাও—

বলিতে গিয়াও আর তাহার বলা হইল না। তাহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, এসব মিথ্যা, মিথ্যা। অথচ এই মিথ্যাকে লইয়াই তাহার জীবন কাটিবে!

মিলিও ভিতরে ভিতরে প্রস্তুত হইতেছিল, বলিল, কই আর বুঝি কথা জোগালো না? ভার হ'য়ে থাকি, বিদায় করো।

বাধা দিয়া বিমলাক্ষ চিৎকার করিয়া উঠিল: মিলি! তারপর সুর নামাইয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইয়া বলিল, আমাকে ভুল বুঝো না মিলি, ভাল যদি না লাগে নালিশ করবো না, তাই ব'লে একদিনের ভাল লাগার কি কোন মূল্যই দেবো না?

—তা হয়ত দেবো, কিন্তু দামই যে দিতে হবে, আর সে-দাম যে নিতেই হবে এমনো কোনো কথা নাই।

—কথা যাই থাক্ মিলি, হিন্দু স্ত্রী কিন্তু এই দামের মূল্যই সারাটা জীবন ধরে দিয়ে আসছে। কোনোদিক দিয়ে কোনো কারণেই পরস্পরকে তারা ত্যাগ করবার কল্পনাও করে না। তারা জানে, এ-বন্ধন তাদের ধর্মের বন্ধন। আজ তোমার মধ্যে সেই বন্ধন কোথাও নেই ব'লেই না তোমাকে বিদ্রোহী ক'রে তুলেছে? কিন্তু হিন্দুই বলো, ব্রাহ্মই বলো, আর খৃষ্টানই বলো, মূলত সেই বন্ধনকেই স্বীকার ক'রে নিয়ে এর কাঠামো বানানো হয়েছে। তবে তোমাদের বাঁধন আইনের বাঁধন আর আমাদের ধর্মের। আইনের জোরে এই বাঁধন একদিকে যেমন শক্ত হয়েছে, অন্যদিকে ঠিক তেমনি হয়েছে শিথিল। আজ যে-আশংকা তোমার মনে জেগেছে, তার মূলেও রয়েছে ঐ আইনের ছিদ্র, নইলে একথা তোমাদের কেন মনে হয় না, বিবাহে প্রীতির বাঁধনই বড় বাঁধন? সেখানে কোনো ধর্ম বা আইনের জোর খাটে না?

দেখতে দেখতে মিলির সমস্ত মুখ ক্রোধে কালো হইয়া উঠিল। বিমলাক্ষের কথা শেষ হইতেই কঠিন-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, এক স্বামী নিয়ে ঘর-করার দৃষ্টান্ত এক তোমাদের হিন্দুঘরেই আছে, এই বা তোমার মনে আসে কি করে? ছাপার বইয়ে তুমি যে কথাই প'ড়ে থাকো, এবং আমি খৃষ্টান ব'লে যত অপমানই আমাকে করো, কিন্তু এও জেনো, তোমাদের ঘরের বধূর চাইতে আমি কোনো অংশেই ছোট নই। বলিয়া স্তম্ভিত অভিভূত বিমলাক্ষের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়াই এই গর্বিতা রমণী দৃঢ়-পদক্ষেপে ঘর ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

মিলি চলিয়া গেলে বিমলাক্ষ একইভাবে অনেকক্ষণ বসিয়া রহিল। অনেক দিনের অনেক কথাই আজ একে একে মনে পড়িয়া গেল। যে উদ্দাম ভালবাসা একদিন তাহারই মধ্যে জন্মলাভ করিয়া বর্ধিত হইয়া উঠিয়াছে, সে আজ জীর্ণ আশ্রয়ের ন্যায় তাহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাত্রা করিয়াছে। আপনাকে আপনি সে সহস্র তিরস্কার, সহস্র কটূক্তি করিয়া লাঞ্ছিত করিতে লাগিল, কিন্তু তথাপি এই বিদায়ের বেদনাকে আজ সে কোনোক্রমেই মন হইতে দূরে সরাইতে পারিল না। কিন্তু কেন এমন হয়? মিলির ব্যবহারেও তো এমন কিছুই প্রকাশ পায় নাই, যাতে তাহাকে এতখানি আঘাত না করিলেই চলিতেছিল না? কারণ যাহাই থাক, এ-আঘাত না করিলেই ত ভাল হইত। কারণ, ব্যবহারিক জীবনে সকলদিক মানাইয়া চলাই শান্তিরক্ষার শ্রেষ্ঠ নীতি। আর কিছু না হোক, সংসার রক্ষা করিতে হইলে উহা অপরিহার্য। নিরন্তর জল ঘোলাইতে থাকিলে পাঁকই বাহির হইয়া

কয়েকটি সরকারী কাজের অজুহাতে মল্লিক মহাশয়ও কলিকাতায় আসিয়াছেন। অন্তত বিহারীলাল তাহাই জানেন। কিন্তু মল্লিক মহাশয় আসিয়াছেন প্রকৃত নলিনাক্ষের খোঁজে। অনেক চেষ্টা করিয়া তিনি নলিনাক্ষের মেসের সন্ধান পাইলেন। নলিনাক্ষ প্রথম তাঁহাকে ঠিক চিনিতে পারিল না।

মল্লিক সহাস্যে বলিলেন, আমাকে চিন্‌তে পারলে না তো বাবাজি! কি ক'রে চিন্‌বে! দেখোনি তো অনেকদিন। আমি তোমাদের নায়েব মল্লিকমশায়।

—আপনি হঠাৎ?

—হঠাৎই বটে। সরকারি কাজে কলকাতায় এসেছি, অন্তত তোমার বাবা তাই জানেন। আমি এসেছি নেহাৎ স্বার্থে। কাল ফিরবো।

নলিনাক্ষ ব্যস্ত হইয়া বলিল, আচ্ছা কথা পরে হবে—আপনি চা খান তো?

—চা? খাই না বটে, তবে কিছু না খেলেও তুমি হয়ত রাগ করবে। তা ছাড়া, আজ দুদিন খুব পরিশ্রমও হয়েছে—তোমরা না কি বলো, চা খেলে ক্লান্তি দূর হয়, তা আনাও—তোমরা কি আর মিথ্যা বলবে।

নলিনাক্ষ হাসিয়া ভৃত্য বলরামকে চা-এর কথা বলিয়া দিল। তারপর বলিল, কাল নাই গেলেন, দুদিন বিশ্রাম ক'রে যাবেন।

—না বাবা, সরকারি কাজ—মিছিমিছি দেরি করা নিয়মবিরুদ্ধ। তাছাড়া, লোকজন তো আর কেউ নেই—সব আমাকেই দেখাশোনা করতে হয়। আহা, কি জমজমাটই না ছিল একদিন—তুমি তো দেখোনি, দুপুরবেলাটা সদরকাছারিতে যেন মেলা বসতো। বলিতে বলিতে বৃদ্ধের চোখ ছলছল করিয়া উঠিল, জামার হাতায় চোখ মুছিয়া আবার বলিলেন, কিছু নাই বাবাজি, আর কিছু নাই।

বৃদ্ধের কথায় নলিনাক্ষ বিস্মিত হইল। বলিল, এতবড় সম্পত্তি গেলই বা কিসে?

—সব কর্মফল বাবা, সব কর্মফল। কিছুই ফেলা যায় না। একদিন যিনি দেবার দিয়েছিলেন, আবার তিনিই হাত মুচড়ে কেড়ে নিলেন। আর তাও বলি বাবা, কর্তার আর যে-দোষই থাক, অমন লোক আর হয় না।

ভৃত্য চা আনিয়া দিলে নলিনাক্ষ বলিল, নিন, চা খান কিন্তু আমি বলি কি কাকা, কালকের দিনটা থেকে যান।

—বেশ তাই হবে। বিশেষ ক'রে তোমার কাছেই যখন আসা। আমি এসেছি তোমার কাছে হাত পাততে। জমিদারি গেলে বুড়ো আর বাঁচবে না। এখনো সময় আছে—

—কত টাকা হলে জমিদারি রক্ষা হয় বলতে পারেন?

—লাখখানেক টাকা হলে কতকটা তিনি সামলাতে পারবেন।

—আপনি তো এসেছেন, আমার নামে যে টাকাটা আছে—

—হ্যাঁ বাবাজি! আবার তোমার টাকা তোমাকেই ফিরিয়ে দেব, কিন্তু এই অসময়ে তুমি রক্ষা না করলে—বলিতে বলিতে বৃদ্ধ নায়েব নলিনাক্ষের হাত ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

—আঃ, কি করছেন কাকা! টাকা তাঁরই—আমাকে মানুষ করেছেন, আমারও তো একটা কর্তব্য আছে। টাকাটা ব্যাংক থেকে তুলতে সময় লাগবে, কাজেই আপনাকে থাকতেই হবে।

মল্লিকমহাশয়ের পরিচয় নলিনাক্ষ ভাল করিয়াই জানে। সেখানে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কোন প্রশ্নই উঠে না।

আরও দুটি দিন অপেক্ষা করিয়া মল্লিকমহাশয় টাকা সঙ্গে লইয়াই মহানন্দপুরে ফিরিলেন। বিহারীলাল সহাস্যে বলিলেন, মল্লিকের কি কলকাতা ছেড়ে আর আসতে ইচ্ছা করছিলো না?

মল্লিক হাসিতে হাসিতেই উত্তর দিলেন, কথা মিথ্যা নয়, বুড়ো বয়সে একটু আরাম করতে ইচ্ছে হলো।

তারপর একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ইতস্ততঃ করিয়াই বলিলেন, নলিনাক্ষকে দেখলাম—হাঁ, ছেলের মত ছেলে, তার যত্ন, আপ্যায়ন আমি কোনদিনই ভুলবো না।

বিহারীলাল হঠাৎ যেন জাগিয়া উঠিয়া বলিলেন, তোমাকে তো বোধহয় ভাল করে চেনে না।

মল্লিক সেকথা যেন শুনিতেই পাইলেন না এইভাবে বলিলেন, বিদ্যা যে মানুষকে কত বড় করে, তাকে না দেখলে বলা যাবে না। আমার মুখে সমস্ত কথা শুনে, শুধু এইকথাই সে বললে, আমি তো আপনাদের কোনো কাজে লাগলাম না, তবু যদি আমার টাকাটা কোনো উপকারে লাগে—তা ছাড়া, এ টাকা বাবারই। আবার সময় হলে দেবেন। দূরে আছি, চাকরি করছি—বসে বসে খাবো না বলেই চাকরি করছি। বসে খেলে কুবেরের ঐশ্বর্যও ফুরিয়ে যায়।

বিহারীলাল অনেকক্ষণ কিছু বলিতে পারিলেন না, শুধু বারকয়েক শূন্য আকাশের দিকে চোখ বুলাইয়া লইয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

মল্লিক বলিয়াই চলিলেন, তা আমি মনে করেছি, টাকাটা আমরা কাজে লাগাই, সবকিছু বজায়ও রইলো আবার ঘরের টাকা ঘরেই ফিরে এলো।

এবারেও বিহারীলাল কিছু বলিলেন না। জবাব দিবার জন্য তাঁহার দুই ঠোঁট ঘন ঘন নড়িতে লাগিল, কিন্তু গলা দিয়া একটাও কথা ফুটিল না।

অনেকক্ষণ এইভাবেই কাটিল। কিন্তু তাঁহার মুখের অস্বাভাবিক গাম্ভীর্য লক্ষ্য করিয়া মল্লিক মনে মনে শংকা অনুভব করিলেন। তবু জোর করিয়া একটু হাস্য করিয়া আবার সেই ধুয়া তুলিয়াই বলিতে লাগিলেন, কিন্তু একটুখানি সাম্‌লে না উঠলে—

বাধা দিয়া বিহারীলাল বলিলেন, না, টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা করে দাও। জমিদারী আর থাকবে না, সুতরাং তাকে বাঁচিয়ে আর কোনো লাভ নেই। এরপর সবই সরকারের গর্ভে যাবে। তার চেয়ে যা আছে তাও বিক্রি করে ফেলবার ব্যবস্থা করো—এখনো সময় আছে। এ টাকায় অন্য কিছু করা যাবে। জমিদারীর স্বপ্ন আর দেখো না মল্লিক, ও আমাদের জীবনের সঙ্গেই শেষ হয়ে গেল!

৬

বৃদ্ধ বয়সে ভৈরব ভট্‌চাজের একমাত্র পুত্র নিতাইয়ের মৃত্যুতে বুড়া-বুড়ীর আর গ্রামে থাকিতে ইচ্ছা করিল না। তাঁহারা কাশীবাসী হইবেন স্থির করিলেন। কাঙালীকে ডাকিয়া ভৈরব ভট্‌চাজ বলিলেন, তোমারই বাড়ির সংলগ্ন, তুমি এটা কিনে নিলে, আমরা নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাশী যেতে পারি।

কাঙালী সহজেই সম্মত হইয়া গেল এবং কোন দর-দস্তুর না করিয়াই পাঁচশত টাকা তাঁহার হাতে তুলিয়া দিলো।

বাড়ি, না বাড়ি! কাঠাতিনেক জমির উপর জরাজীর্ণ দুখানি ঘর, কোণে একটু অপরিসর বারান্দা—বারান্দার শেষপ্রান্তে খুবড়ি মত আরও দুখানি ঘর—রান্না বা ভাঁড়ার যে নামই দেওয়া যাক্, বেমানান হবে না। শ্যাওলা-পিছল পাতকুয়াতলা. তার পাশেই আধভাঙা পাঁচিলের গা-ঠেসান দিয়া একটি স্বাস্থ্য-শ্রীমন্ত পাতিলেবুর গাছ। সারা বাড়িটার মধ্যে ঐ গাছটাই যেন খাপছাড়া। অসংখ্য শাখায় ও সবুজ পাতায় এমন ঝাঁকড়া আর ফুলেফলে এমন শ্রীমন্ত চেহারার গাছ এই এঁদোপড়া বাড়িতে—আশ্চর্যই লাগে!

বাড়ি অবশ্য জীর্ণ থাকিবে না—নূতন করিয়া কাঙালী গড়িয়া তুলিবেন। সামনে-পিছনে জায়গা আছে খানিকটা। পুরনো ঘর দুখানা অবশ্য রাখা চলিবে না—বারান্দাটি আরও চওড়া হইবে, তার কোণে সরু রোয়াকটাও। ইটের পঁইঠা ঘুচাইয়া তিন দিক হইতে উঠা সিমেন্টের সিঁড়ি না হইলে মানানসই হইবে না, কুয়াটা নূতন করিয়া কাটাইতে হইবে। আর ঐ ঝাঁকড়া লেবুগাছটা কাটাইয়া—

স্ত্রী মনোরমা বাধা দিয়া বলিল, না, না, অমন সুন্দর লেবুগাছটা কাটা হবে না। অমন ফলন্ত গাছ—দেখলে চোখ জুড়ায়!

কাঙালী কোন কথা বলিল না।

কাশী যাইবার দিন স্থির করিতে বুড়া-বুড়ির আরও দিনকয়েক গেল। কাঙালী বলিল, ব্যস্ত হবার কিছু নাই—আপনারা যতদিন ইচ্ছা এই বাড়িতেই থাকুন।

বুড়ি মনোরমাকে বলিল. আর যাই করিস না কেন, লেবুগাছটা যেন বজায় থাকে। কথায় বলে, 'বাড়ির গাছা—পেটের বাছা।' ছেলে বৌ নাতি-নাত্নী এরাও কখনো-সখনো বাজার হ'য়ে মুখ-ঝামটা দেয়—হ'লো দু-চার মাস সংসার খরচই দিলে না, কিন্তু ফলন্ত গাছ কখনো বঞ্চিত করে না ভাই। কম হোক, বেশী হোক - সে দেয়ই কিছু-না-কিছু। ওকে যত্ন করিস ভাই, তোদের ভাল হবে। বলিতে বলিতে বৃদ্ধার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

বাড়িতে মিস্ত্রী লাগাইবার দিনকয়েক আগের কথা। হঠাৎ একদিন পাড়ার আশু ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া বলিল, কাঙালিদা, শিগ্গির এসো—বুড়ির কাণ্ড দেখবে এসো।

—কি হয়েছে?

—বুড়ি ফড়ে ডাকিয়ে তোমার লেবুগাছের দফা গয়া করছে। শীগ্গির এসো।

—লেবু গাছ!

—হাঁ গো! একগাছ লেবু ফড়ে ডাকিয়ে বিক্রি ক'রে দিচ্ছে। আমরা সবাই বলতে গেলাম, তা বুড়ি গাল দিতে লাগ্লো। এখন আবার রোয়াকে পা ছড়িয়ে বসে মড়া-কান্না জুড়ে দিয়েছে।

কাঙালী মনোরমা দুজনেই বুড়ির সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধা তখনও রোয়াকে পা ছড়াইয়া বসিয়া কাঁদিতেছেন। সম্মুখে একখানা দশটাকার নোটের উপর খুচ্রা দুটি টাকা আর কিছু রেজগি চাপানো—ফড়ে লেবুভর্তি ঝুড়িটা মাথায় তুলিতেছে।

রোয়াকে উঠিয়া আসিল মনোরমা। বৃদ্ধার পাশটিতে বসিয়া বলিল, দিদিমা কাঁদছেন কেন?

এই কথায় বৃদ্ধার শোকসাগর উথ্লাইয়া উঠিল। আরও চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, ওরে নিতাইরে—

—দিদিমা, কাঁদবেন না, টাকাগুলো তুলুন। মনোরমা সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করিল।

বৃদ্ধা বলিলেন, তোমরা এসেছো ভালই হয়েছে, ন্যায্য বিচার করো কাঙালী। পাড়ার লোক বলছে—বাড়ি যখন বেচে ফেলেছো. লেবুতে তোমার দাবিদাওয়া নাই। যথাধর্ম্ম বলছি কাঙালী, পরের হকের ধন আমি নেবো কেন! একে তো গেল-জন্মে কি মহাপাতক করেছিলাম, কাকে বঞ্চিত করেছিলাম তার প্রতিফল বিধাতা দিয়েছেন, আবার এ-জন্মেও অন্যায় করবো? তাই মনটায় তোলাপাড়া করছিল বলেই, কাল হারু গোঁসাইকে বললাম, বাড়ি-বিক্রির আগে গাছে ফল ধরেছিল, আজ-কাল ক'রে বিক্রি করা হয়নি, ফলগুলো গাছেই ছিল। তা এগুলো যদি এখন বেচে দিই?

গোঁসাই বললো, অনায়াসে বেচে দিতে পারো, ও তোমার হক্কের পাওনা। তুমি তো কাশীবাসী হচ্ছো, আর তো নিতে আসছো না—কাঙালীও এতে আপত্তি করবে না। আমি অত আইন-কানুন জানি না—যদি হক্কের পাওনা হয়, তোমরাই নাও টাকা।

মনোরমা বলিল, না, ওটাকা আপনার। আমাদের গাছ তো রইল, আবার লেবু হবে।

বুড়ি খুশি হইয়া বলিলেন, আহা, কি কথাই বললে ভাই, শুনে প্রাণটা ঠাণ্ডা হ'লো। ও গাছ নয় ভাই, ও আমার শত্তুরের দান। তিনবার ফলে, অযচ্ছল ফল, খেয়ে-মেখে-বিলিয়ে দুপয়সা হাতে আসে। তাই সকাল থেকে কোথায় গোবর, কোথায় চূণের খোয়া, কোথায় খড়পচা, মাছের আঁশ, পিণ্ডি এইসব খুঁজে খুঁজে মরি, আর চেয়েচিন্তে গাছের গোড়ায় ঢালি। চোত-বোশেখে ঘড়া-ঘড়া জল ঢালি—কাঁকালে জোর নাই, জল তুলতে পারি না তবু ঢালি। জল ঢালি, সার দিই আর ভাবি আমার নিতাইকে পাঁচ-ব্যঞ্জন রেঁধে খাওয়াচ্ছি। আহা, সে যে আমার পাঁচ-ব্যঞ্জন খেতে বড় ভালবাসতো। বলিতে বলিতে বৃদ্ধা ছেঁড়া আঁচলটা মুখে তুলিয়া আর এক দফা ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে বসিল।

বাড়ি ফিরিবার মুখে মনোরমা বলিল, দেখো লেবুগাছ তো কাটা হবেই না, আর দিদিমা যতদিন ইচ্ছা ভিটায় থাকুন, ওঁকে ভিটেছাড়া করলে আমাদের মঙ্গল হবে না।

কাঙালী বলিল, তাই হবে।

কাশী যাইবার দিন স্থির হইয়া গেল। যাত্রার পূর্ব্বে আর একবার বুড়ি মনোরমার হাত দুটি ধরিয়া ভাঙা ভাঙা গলায় বলিল, দেখিস্ ভাই, গাছটাকে যত্ন-আত্তি করিস, ভালই হবে। মানুষের মতো গাছেরও প্রাণ আছে—ওরাও যত্ন-আত্তি বোঝে। কথা কয় না, ফুল ফল দিয়ে মানুষকে তুষ্ট করে। কথক ঠাকুরের মুখে শুনেছি, সবাইয়ের মধ্যে ভগবান্ আছেন—সবাইয়ের প্রাণ আছে।

কাঙালীর ছেলে কলিকাতায় থাকে। চাকরি করে সরকারী অফিসে। শহরে ইট-কাঠ-লোহার রাজত্ব, জীবনটাও সেই ছাঁচে ঢালা। নানারকমের বাড়ি দেখে দেখে রবীনের মনেও বাড়ি সম্বন্ধে রুচিবোধ জন্মিয়াছে। বাড়ি আসিয়া তাই এই নূতন বাড়ির প্ল্যান দেখিয়া বলিল, এ কি হয়েছে? উত্তরমুখী ঘর কেউ করে?

কাঙালী বলিল, ঐ দিকেই ঘরের পোঁতা রয়েছে।

রবীন বলিল, নতুন করে যা তৈরি হবে তাতে অসুবিধার সৃষ্টি করে কি লাভ? এতো সোনার গয়না নয় যে, বারবার ভেঙে তৈরি করানো যাবে। ঘরগুলো দক্ষিণমুখী হওয়াই ভাল।

মনোরমা ছুটিয়া আসিল। বলিল, না, ও লেবুগাছ কাটা হবে না।

রবীন মায়ের মনোভাব বুঝিয়া আর কোনো কথা বলিল না। রাগ করিয়া তাহার প্ল্যান ছিঁড়িয়া ফেলিল।

৭

কাঙালীকে দেখিয়া দত্তমশায় বলিলেন, ভৈরব তাহলে কাশীবাসী হ'লো?

—অতবড় ছেলেটা দুম্ করে মরে গেল, আর কি তাঁরা গাঁয়ে থাকতে পারেন? জানি না কোন্ অভিশাপে তাঁদের এই সর্বনাশটা হ'লো! অনেকে বলে, বলির নামে তিনি অসংখ্য জীবহত্যা করেছেন—ভগবান অতপাপ সইবেন কেন!

দত্তমশায় বলিলেন, এই কুপ্রথা আজ তুলে দেওয়া উচিত। মা যিনি জগজ্জননী, তিনি কি কখনো রক্তপিপাসু হ'তে পারেন?

—চেষ্টা ক'রে বারোয়ারিতলার এই বলি কি বন্ধ করা যায় না?

—চেষ্টাটা করবে কে? দেখ, তুমি উদ্যোগী হ'য়ে কিছু করতে পারো কিনা।

—গাঁয়ে সেরকম লোক কোথায়? কেউ কারো কথা শুনতে চায় না। আর কি সে গাঁ আছে? গ্রামগুলো উচ্ছন্নে যাচ্ছে তো এই ক'রে! আর একটা খবর শুনলাম দত্তমশায়, রানিতলার মতো এ গাঁকেও নাকি ভেঙে শহর বানাবে। আপনি কি কিছুই শোনেন নি?

—না তো!

—সত্যি হ'লে আমাদের কি দশা হবে! আমরা যাবই বা কোথায়? খেটেখুটে এত জমি করলাম—এক তো নতুন নিয়মে জমি রাখাই কঠিন। লাঙ্গল না থাকলে জমি রাখাই যাবে না।

দত্তমশায় বলিলেন, লাঙ্গল কেনো, চাষ করবার জন্যে লোক রাখো। তোমার সে-সঙ্গতিও আছে। অবশ্য যার তা নেই, তাদের জমি যাবে।

—ধানের জমি কি রাখবে সরকার? সব তো কারখানা বানাবে।

—চাষের ব্যবস্থা না রাখলে লোকে খাবে কি?

—কি জানি, এইসব ভেবে আমার রাতে ঘুম হয় না।

—শুনলাম, নিধু না কি বিধুর মাথা ফাটিয়ে দিয়েছে?

—সেও এক মজার ব্যাপার। কাঙ্গালী হাসিতে হাসিতে বলিল, চার আঙুল জায়গা নিয়ে দুই ভাইয়ে মারামারি। বিধু আমার কাছে এসেছিলো। বললাম, কদিন বাঁচবে বিধু? ঐ জায়গাটুকু নিয়ে কি সঙ্গে যাবে? তার ওপর যা শুনছি, কিছু থাকবে না। সরকারই সব দখল ক'রে নেবে।

দত্তমশায় বলিলেন, এও পাপ কাঙালি নইলে দেশের আজ এই অবস্থা হয়।

কি করিয়া জানি না, হরিদাসের কানেও এই খবর আসিয়াছে—সরকার গ্রাম ভাঙিয়া শহর বানাইবে। তাহা হইলে, ঐ ঘড়া-ঘড়া মোহরের কি গতি হইবে? শেষে পাঁচভূতে লুটপাট করিয়া খাইবে? হরিদাস গভীর রাত্রে একবার চেষ্টা করিয়া ঐ জঙ্গলের খানিকটা অংশ খুঁড়িয়া ফেলিল। পরদিন আবার খুঁড়িল। এইরূপে সাত রাত্রি পরিশ্রম করিয়াও কিছু বাহির করিতে পারিল না। বুঝিল, ইহা একার কর্ম নয়।

অবশেষে সেই দুর্দিন একদিন আসিয়া পড়িল। দত্তমশায়ের কনিষ্ঠ পুত্র অমিয়মাধব—যে পি, ডব্লু, ডির একজন বড় অফিসার, সে সদলবলে মহানন্দপুরে আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহারা গ্রাম জরীপ করিতে আসিয়াছে।

দত্তমশায় পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, যা শুনছি, তা কি সত্যি?

—কি শুনেছেন?

—গ্রাম ভেঙে নাকি তোমরা শহর বানাবে!

—সরকারের এই রকমই স্কীম।

—তাহলে কি আমার ভিটেও যাবে?

—ভয় করবার এতে কিছু নেই। আমাদের এ-বাড়ি যেমন আছে তেমনিই থাকবে, শুধু সংস্কার করা হবে। এটা তো জানেন, সংস্কার না করলে, এ-বাড়ি আর রক্ষা করা যাবে না। বহুকাল আগেই এটা করা উচিত ছিল। অর্থাভাবে আমরা করতে পারিনি। সরকার সেই ভার নিচ্ছে যখন তখন ভালই হচ্ছে বলতে হবে' তবে অনেক

বাড়িই ভাঙা পড়বে—চারদিকে বড় বড় রাস্তা হবে। অবশ্য আমাদের সে-ভয় নেই। শুধু ভাঙা হবে না বিহারী-লালের বাড়ী—সে-বাড়ী ভাঙবার মতো নয়ও।

দত্তমশায় গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, যা ভাল বোঝো কর। তবে আমাকে—এই বুড়োবয়সে ঐ চরম শেলটা আর দিও না।

—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

বৈকালে কাঙালী আসিল। বলিল, তুমি থাকতে বাবাজি, আমরা ধনে-প্রাণে মরবো?

অমিয়মাধব হাসিয়া ফেলিল। বলিল, আপনারা সবাই ভয় পেয়েছেন দেখছি। ক্ষতি কারো হবে না। যাদের বাড়ি ভাঙা হবে, উপযুক্ত মূল্য তারা পাবে। সেই টাকায় আবার তারা নতুন করে বাড়ি করতে পারবে। মহানন্দপুর ছেড়ে আপনাদের কোথাও যেতে হবে না।

—কিন্তু শহর বানালে গাঁয়ের আর কি থাকবে?

অমিয়মাধব বলিল, গাঁয়ের আর কি আছে? আগে গ্রামের যে-সম্পদ ছিল, এখন তার কিছুমাত্র অবশিষ্ট নাই। সেকালের লোকেরা গাঁয়ে পুকুর প্রতিষ্ঠা করতো, এ তারা ব্রত হিসাবে নিয়েছিল। সেই কবে তাঁরা এই পুকুরগুলো প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, তারপর থেকে আপনারা কখনো এই পুকুরগুলোর সংস্কার করেছেন? টাকাওয়ালা লোকের কোনোদিনই অভাব ছিল না। আপনারও যথেষ্ট টাকা আছে—কিছু করেছেন গ্রামের জন্যে? গ্রাম তো আজ মৃত। পুকুরগুলো সব মজে গিয়েছে, পাতকুয়ো খুঁড়ে আপনাদের জল সংগ্রহ করতে হচ্ছে। সন্ধ্যে হলেই সারা গাঁ অন্ধকার। সাপখোপ আর শিয়ালের আড্ডা। দিনে শেয়াল ডাকে। আতংকে কেউ বাড়ির বার হয় না। এই মড়া আগ্লে বসে থাকার কি কোনো মানে হয়? স্নেহবশে কেউ মরা-ছেলে আঁকড়ে থাকে না। তাকে ছেড়ে দিতেই হয়। আজ সংস্কার না হ'লে, আপনাদের সাধের মহানন্দপুর যে শ্মশানে পরিণত হবে। তাই বলছিলাম মোড়লমশাই, এ ভালই হচ্ছে।

—আমার যে অনেক ধানের জমি—

—জমি তো আপনার গ্রামের মধ্যে নেই, সে তো গাঁয়ের বাইরে। জমি আপনার যেমন আছে তেমনি থাকবে। তবে আপনার বাড়িটা ভাঙা যাবে। নতুন ক'রে বাড়ি তুলবেন। তবে রাস্তা তৈরির সময় অনেকের বাড়ি খোয়া যাবে। সে জন্যেও ভয় করবার কিছু নেই। সরকার তার উপযুক্ত মূল্য ধরে দেবে। কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে না—এইটুকু জানবেন। শহর শুনলেই আপনাদের আতংক হয়। সহজভাবে নিশ্বাস নিতে পারবেন, ভালভাবে থাকবেন। জল আলোর সমস্যা -যেটা এখন প্রধান সমস্যা, সেটা আর থাকছে না।

কাঙালী মোড়ল হাসিয়া বলিল, তুমি আছো বাবাজি, তাই নিশ্চিন্ত আছি।

সেইদিনই দত্তমশায় অমিয়মাধবকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার গোপীনাথের দোলের কোনো ব্যাঘাত হবে না তো? আর কয়েকদিন পরেই তো দোল।

অমিয়মাধব জানাইল, প্ল্যানের ছক্ করিতে কয়েকদিন যাইবে, সুতরাং দোলের কোনো ব্যাঘাত হইবে না।

—দোলের সময় তুমি কি থাকতে পারবে না?

—না, আমার ঐ সময়েই কাজ বেশী।

এই দোলের সময় মহানন্দপুর যেন নতুন করিয়া জাগিয়া উঠে। যেমন লোকের ভিড়, তেমনি দোকান-পসারের ভিড়। দেখিতে দেখিতে বাজনদাররাও আসিয়া পড়িল। চতুর্দিক ঢাকের বাজনায় মুখর হইয়া উঠিল। দুর্গাপূজার মতো দোলেও বাজনদাররা ভোর বাজাইল। বাজনা শোনা-মাত্র দত্তবাড়ি সজীব হইয়া উঠিল। আগে পূজার আয়োজন, পরে দোলখেলা। স্নান না করিলে পূজার কাজে হাত দিবার উপায় নাই। বড় বৌ শুদ্ধাচারে ভোগশালায় প্রবেশের পূর্বে ছেলেমেয়েকে গোপীনাথের প্রসাদী-আবির ললাটে পরাইয়া আশীর্বাদ করিলেন। সকলে তাঁহার পায়ে আবির দিয়া প্রণাম করিল। ভোগ চড়াইয়া দিলে, শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তিনি কাহাকেও স্পর্শ করিতে পারিবেন না—আবিরও ভোগশালায় ঢুকিতে পারিবে না। তাই প্রথমেই তিনি শুভ অনুষ্ঠানটুকু সারিয়া রাখিলেন।

ছেলেমেয়েরা সকলে মিলিয়া বাল্‌তি বাল্‌তি রং গুলিতেছে। সারি সারি পিতলের ও টিনের পীচ্‌কারি একত্রিত করিয়াছে। তাহাদের সকলের কোমরে ঝুলিতেছে এক-একটা আবিরের থলে। যে যাকে পারিতেছে রং দিতেছে। পুরোহিত পূজায় বসিলে পূজার উপকরণ মণ্ডপে পৌঁছিলেই, তাহারা বাড়ির বাহির হইবে।

দেখিতে দেখিতে মধ্যাহ্ন-আহারের সময় আসিয়া পড়িল। প্রকাণ্ড বারান্দায় পাতা পড়িয়াছে। একদল উঠিয়া যায়, আবার নূতন করিয়া পাতা পড়ে। এই পর্ব শেষ হইতে প্রায় সন্ধ্যা আসিয়া পড়িল।

সন্ধি-দোলের সময় উপস্থিত। ভিতরে ও বাহিরে ঝাড়-লণ্ঠনগুলি জ্বলিয়া উঠিল। মাঝে মাঝে 'ডে-লাইট'ও জ্বলিতেছে। রঙীন কাগজের মালা ও ফুলের মালা এবং দেবদারু ও আম্র-পল্লবের সংমিশ্রণে মণ্ডপের আঙ্গিনা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায় শোভা পাইতেছে। আবির উড়িতে লাগিল ধূলির আকারে। রূপার পঞ্চপ্রদীপে ঘিয়ের সলিতা জ্বলিতেছে। ধূপে ধূপে কর্পূরে জলশঙ্খে গোপীনাথের আরতি হইল। মখমলের ঝালরযুক্ত পাখায় ও রূপার চামরে বিগ্রহকে শীতল করিয়া সন্ধি-দোল সমাধা হইল।

তখনও বসন্ত বিদায় লয় নাই, তরুমূল ছাইয়া গিয়াছে ঝরাফুলে। পাখীরা মেলা বসাইয়াছে শাখে শাখে। ফুল ফোটার অবসান হয় নাই।

হোলীর রাজা সাজানো হইয়াছে একটি আঠারো-উনিশ বছর বয়সের ছেলেকে। তাহার একগালে চূণ আর একগালে কালি লেপিয়া দেওয়া হইয়াছে। মাথায় মুকুট হইয়াছে মাছের চুবড়ি, গলায় ছেঁড়া জুতার মালা। রাজাকে বসানো হইয়াছে গাধার উপরে, পিছনে মুখ করাইয়া। মাটি ও গোবরের জল চারিদিকে পীচকারী করিয়া ছিটাইতেছে। ভাঙা টিনের বাজনার সঙ্গে হোলীর গান চলিতেছিল। দুষ্ট ছেলের দল হোলীর রাজার মুখে বিড়ি ধরাইয়া দিয়াছে। বিড়ি টানিতে টানিতে রাজা গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতেছে। মুখে গর্বিত হাসি ঝরিয়া পড়িতেছে। ভাঙা টিনের বাজনার সঙ্গে বিকট স্বরে গান গাহিতে গাহিতে রাজা-প্রজারা অগ্রসর হইয়া গেল

মেলা বসিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে আজ হইতেই মেলার আরম্ভ। এ-মেলা পঞ্চম দোলের পরও কয়েকদিন থাকিবে। গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে নানা সামগ্রী আসিয়াছে। খেলনার জিনিস হইতে আরম্ভ করিয়া বিবিধ প্রয়োজনীয় জিনিস আসিয়া জড়ো হইয়াছে। এই মেলা উপলক্ষ্য করিয়া কুটির-শিল্পের প্রচার সেকালে কম গৌরবজনক ছিল না! তাঁতিরাও কাপড়ে হাতের কাজ দেখাইত। কাঠের কাজ, গালার কাজ, হাতীর দাঁতের কাজ প্রভৃতি বিবিধ উপকরণে দোকান-ঘরগুলি সজ্জিত। মাটির পুতুলের বাহারই কি কম! সবার উপরে টেক্কা দিত কৃষ্ণনগরের পুতুল।

মেলায় মেয়েদের ভিড়ই বেশি। এ কদিন যেন তাহারা বেহায়া হইয়া উঠে, যেন কোনো বন্ধনই নাই—মুক্ত বিহঙ্গম আলোকের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। গৃহকর্তারাও এ-কদিন কিছু বলেন না। প্রতিদিনই একটা না একটা জিনিস লইয়া বাড়ি ফিরিতেছে—কেনা-কাটার অন্ত নাই।

আজ সন্ধ্যায় গানের আসর বসিবে। সকলেই ব্যস্ত। চারিদিকে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। যথাসম্ভব সকলে তাড়াতাড়ি আহার-পর্ব মিটাইবার চেষ্টা করিতেছিল। গ্রামস্থ সকলকেই কীর্ত্তন শুনিবার নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। এইজন্য চওড়া বারান্দার দুইদিকে চিক্ টাঙ্গাইয়া দেওয়া হইয়াছে।

বিগ্রহের সম্মুখভাগ খোলা—যাহাতে তাঁহার কুঙ্কুমরঞ্জিত রূপার চৌদলে দোলায়মান মূর্তিটি সকলের নজরে পড়ে।

সন্ধ্যা হইতে না হইতে মণ্ডপের আঙ্গিনা আলোয় আলোময় হইয়া গেল। ভিড় করিয়া গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে লোকে গোপীনাথকে দেখিতে আসিতেছে। কালো কষ্টি-পাথরের গোপীনাথ—কিন্তু অদ্ভুত মনোহর মূর্তি। দুইহাতে মুরলী, চূড়ায় শিখি-পুচ্ছ। গলায় সোনার মালা, দুই বাহুমূলে বলয়, পায়ে রূপার নূপুর। রূপার আঁখিযুগল আলো পড়িয়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে—তাহার মধ্যস্থলে নীল পাথরের দুটি নয়নতারা।

মেয়ে-পুরুষ দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মুগ্ধ হইয়া এই দেবদর্শন করিতেছে। দেখিয়া আর আশা মেটে না।

দেখিতে দেখিতে দোলের এই কয়টা দিন বেশ আনন্দেই কাটিয়া গেল। কিন্তু ইহার পরের কয়েকটা দিন বড়ই বেদনাদায়ক। সকলেরই মনে বিষাদের অন্ধকার নামিয়া আসিয়াছে। এ পরিণতির জন্য যেন কেহ প্রস্তুত ছিল না।—যেন জীবনের সবকিছু শেষ হইয়া গিয়াছে। ঘটনাচক্র এমনি করিয়াই শেষ হয়, আবার সুরু হয় জীবনের নূতন অধ্যায়।

সত্যই নূতন অধ্যায় সুরু হইল। বিজয়মাধব, অমিয়মাধব দুজনেই বাড়ী আসিল। বাড়ি আসিয়া তাহারা জানাইল, আমাদের বাড়িও রক্ষা করা যাইবে না, সমস্তই ভাঙিতে হইবে—গবর্ণমেন্টের এই প্ল্যান।

নীলাম্বর বাদ সাধিলেন। বলিলেন, আমি বেঁচে থাক্‌তে তা হবে না। কত পুরুষের পুরানো স্মৃতি—লোপ করা চলবে না। কাঠামো আমি ভাঙতে দেবো না।

—এ কাঠামো আর কতদিন রাখতে পারবেন? যখন একসঙ্গে সব ভেঙে পড়বে, তখন কি হবে?

'তখন কি হইবে' সে প্রশ্নের সমাধান আর হইল না। বন কাটা সুরু হইয়া গেল।

খবর পাইয়া হরিদাস ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল, ছোটবাবু, পূব-পাড়ার জঙ্গল কাটা হচ্ছে, মাটি খুঁড়বার সময় আপনি উপস্থিত থাক্‌বেন—ঐ মাটির নীচে ঘড়া-ঘড়া মোহর আছে, পিসীমার মুখে শুনেছি।

অমিয়মাধব হাসিয়া ফেলিল। বলিল, ঘড়া-ঘড়া মোহর যদি পাই হরিদাস, তবে অর্দ্ধেক তোমার।

—এ আপনাদেরই হকের ধন। কেন, আপনার মনে নাই শীকার করতে এসে সেবার মরিস সাহেব একটা সুড়ঙ্গ-পথের কথা বলেছিলেন? আমার তো মনে হয় ঐ সুড়ঙ্গ-পথই ওখানে গিয়ে মিশেছে—ওটাই ছিল ধনাগার।

—বাঃ তোমার আবিষ্কার তো বড় চমৎকার! পুরোহিত না হয়ে তোমার প্রত্নতাত্ত্বিক হওয়া উচিত ছিল।

—সে যাই বলুন ছোটবাবু, ঐ জঙ্গলের কথা ভুলবেন না।

অমিয়মাধব হাসিয়া বলিল, তাই ভুলতে পারি—ঘড়া-ঘড়া মোহর ?

হরিদাসকে বিদায় দিয়া অমিয়মাধব প্ল্যান লইয়া বসিল। প্ল্যানে সব ছকা আছে। শহরের মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড একটি চওড়া রাস্তা হইবে—যাহা উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে গিয়া গ্রাণ্ডট্রাংক রোডে মিশিবে। শাখা-রাস্তাগুলিও ছকা আছে। বাড়ি করিবার প্লটগুলি ছবি অনুযায়ী বিলি করিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অবশ্য স্থানীয় লোকদের অগ্রাধিকার দিয়া অপরের কথা চিন্তা করা যাইবে। বড় বড় ধনী-মাড়োয়ারীরা এখন হইতেই আনাগোনা সুরু করিয়াছে। তাহারা চেষ্টায় আছে কয়েকটি মিল প্রতিষ্ঠা করিবে। এইভাবে 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া' গড়িয়া তোলাই গবর্ণমেন্টের উদ্দেশ্য। সরকার এই খাতে বিপুল অর্থ ঢালিতেছেন।

দত্তবাড়ির দেওয়াল-ঘড়িটা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেল। একটানা দু'শ বছর যে-ঘড়ি টক্ টক্ আওয়াজ করিয়া আসিয়াছে আজ আচম্কা সে বন্ধ হইয়া গেল! দু'শো বছর—দীর্ঘ দুশ' বছরের ইতিহাস দত্তবাড়ির এই দেওয়াল-ঘড়ি, শুধু তার স্প্রীং একবার করিয়া জড়াইয়াছে আর খুলিয়াছে—ইহা ছাড়া কোনো নিশানা রাখিয়া যায় নাই সে। আজ ঘড়ি খুলিয়া দেখিলে কিছুই পাওয়া যাইবে না; সব ফাঁপা—দুই দুইটা শতাব্দীর ঘুর্ণিপাকে একেবারে ফোঁপড়া হইয়া গিয়াছে।

আজ সত্যই খুলিয়া দেখিল মধু—দত্তবাড়ির পুরানো চাকর। প্রতিদিনের ছোট-বড় অসংখ্য কাজের মধ্যে প্রথম ও প্রধান কাজ তার ঘড়িতে দম দেওয়া। কাক-পক্ষী ডাকিবার আগে সে এই কাজ করিত। ঘড়িটি মাটি হইতে প্রায় পঁচিশ ফুট উপরে টাঙানো। এত উঁচু, মধুর পক্ষে নাগাল পাওয়া কঠিন। একটা মই আছে—তাহারই সাহায্যে সে উপরে ওঠে। মধুর দম দেওয়ার খানিক পরেই ঘড়িটা গোটা দত্তবাড়িকে সচকিত করিয়া ঠিক পাঁচবার বাজিয়া ওঠে—ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং।

তার পরেই হয় কাজ সুরু। সবাই এই আওয়াজটির প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। এই আওয়াজ শুনিয়াই রামু গয়লার ঘুম ভাঙে; তাহার অনেকগুলো গোরু—দুধের ব্যবসা করে। দত্তবাড়ির উত্তরদিকে—অবশ্য অনেকটা দূরে, ধোপাপাড়া। উহারই কাছাকাছি থাকে বঙ্কু ঘোষ। বড়ই ঘুমকাতুরে এই বঙ্কু। দেওয়াল-ঘড়ির ঢং ঢং, কি ধোপাদের ধুপ-ধাপ কাপড়-কাচার তোড় কিছুতেই তার ঘুম ভাঙাতে পারে না। কিন্তু তাহাকে উঠিতেই হয়—ধোঁয়ার জ্বালায়। ধোপাপাড়ার সারি সারি তোলা উনুনের ধোঁয়ায়। এমনিভাবেই পাড়ার খুঁটিনাটি সমস্ত কাজ নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিয়াছে ঐ একটি ঘড়ি। আজ সেই ঘড়ির দম ফুরাইয়া গেল!

কথাটা যত ছোট বলিয়া মনে হইতেছে, মোটেই তাহা নয়। একটা দেওয়াল-ঘড়ি হঠাৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহাতে হইয়াছে কি? হাঁ, হইয়াছে বই কি। এই প্রকাণ্ড দত্ত-বাড়ির দেওয়ালে যে-ঘড়ি নিরবিচ্ছিন্নভাবে দু'শো বছর ধরিয়া আধিপত্য করিয়া আসিয়াছে—একেবারে নির্ভুলভাবে দত্তবাড়ির সকল মহল্লাকে হাতের মুঠার মধ্যে রাখিয়া ওঠ-বস্ করাইয়াছে—আর আজ কিনা হঠাৎ সেই দেওয়াল-ঘড়ির দম ফুরাইয়া গেল! শুধু দত্ত-বাড়ি কেন, সারাটা মহানন্দপুরের একটা বোবা-কালা-অন্ধ লোকও যে কথাটা কখনও কল্পনা করিতে পারিত না, আজ তাহাই সম্ভব হইয়াছে। দত্তবাড়ির দেওয়াল-ঘড়ি বন্ধ। মনে করিতেও সকলে শিহরিয়া উঠিতেছে।

মধু তো একটা বিকট চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। দেওয়ালের গায়ে মইটা লাগাইয়া যেই না পা বাড়াইয়াছে—সে সাপ দেখার মতো আঁৎকাইয়া উঠিয়াছে! এ কি হইল? পেণ্ডুলামের বলটা যে একটুও নড়িতেছে না—একদম স্থির হইয়া রহিয়াছে! প্রথমটা ঠিক বুঝিতে পারিল না, তারপর ভাল করিয়া চোখ রগড়াইয়া কান খাড়া করিল। না, কোনো শব্দই নাই! মাথাটা তার ঘুরিয়া গেল। কোনোরকমে টলিতে

গোটাকতক দমও দিল, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। বোবা-চাহনি মেলিয়া ঘড়িটা তাহার দিকে চাহিয়া রহিল।

মধুর আর কিছু মনে নাই। শুধু আবছা আবছা মনে পড়ে, হয়ত মইয়ের দু-চার ধাপ নামিয়া আসিয়াছিল, আর কতকগুলি অস্পষ্ট ছবি একের পর এক খুব তাড়াতাড়ি চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিয়াছিল। ইহার পর আর কিছুই সে বলিতে পারে না।

একটা বিকট চিৎকার করিয়া সে মাটিতে পড়িয়া গিয়াছিল, শব্দ শুনিয়া লোকজন আসিয়া দেখিল, মধুর অচৈতন্য দেহ মেঝেতে পড়িয়া আছে। তাহার কপাল কাটিয়া দর দর করিয়া রক্ত ঝরিতেছে। সেইসঙ্গে পাড়ার যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা আবিষ্কার করিল, দত্তবাড়ির দু'শো বছরের দেওয়াল-ঘড়ির কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে।

খবরটা যেন চোখের পলক পড়িবার আগেই সর্বত্রই ছড়াইয়া পড়িল। দেখিতে দেখিতে পিল্ পিল করিয়া লোক ছুটিয়া আসিল। সকলের মুখেই ভয়, উৎকণ্ঠা আর এক বালকসুলভ কৌতূহল।

খবর পাইয়া নীলাম্বর দত্ত নীচে নামিয়া আসিলেন। মধুর সংজ্ঞাহীন দেহ তখনও সরানো হয় নাই। কিন্তু সে দেখিতে তিনি আসেন নাই। এক মধু গেলে দশ-দশটা মধু আসিবে। কিন্তু দত্ত-বাড়ির ঐতিহ্য—যে দু'শো বছর ধরিয়া বুকে করিয়া আগলাইয়া আসিয়াছে, সেই ঘড়ি যদি আজ হঠাৎ বন্ধ হইয়া যায় তবে আর রহিল কি?

নীলাম্বর দত্ত নিষ্পলক চাহিয়া থাকেন দেওয়ালে পঁচিশ ফুট উপরে টাঙ্গানো ঘড়িটার দিকে। ঘড়ির লম্বা পেণ্ডুলাম স্থির, শব্দহীন। দু'শো বছর আগে কোন্ এক শুভক্ষণে চলিতে সুরু করিয়া কত লক্ষ কোটি মুহূর্তকে সীমিত করিয়া দিয়া আসিয়াছে এই ঘড়ি। আজ যেন কাহার অভিশাপে সে নির্বাক, নিশ্চল—মৃত্যুর মতো স্থির।

এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে দুশো বছর আগেকার একটি দৃশ্যপট তাঁহার চোখের সম্মুখে সজীব হইয়া ভাসিয়া উঠিল।

জমিদার শশাঙ্কশেখর। প্রবল প্রতাপ তাঁর—চার-চারটে গাঁয়ের লোক তাঁর ভয়ে মাথা নত করিয়া চলে। যেমন জাঁদ্রেল চেহারা তেমনি তাঁহার কথার জোর।

ইংরেজরা তখন সবে এদেশে আসিয়াছে। অবাধ তাহাদের গতি। গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইয়া লুট-পাট করিয়া চলিয়া যায়। সেবার আসিয়া তাঁবু খাটাইল জমিদার-বাড়ির চৌহদ্দিতে। উহারা যখন-তখন গাঁয়ে ঢুকিয়া লোকজনদের মারধোর করিয়া টাকা-পয়সা, জিনিসপত্তর, গোরু-বাছুর লুটপাট করিতে সুরু করিল। প্রথমটা শশাঙ্কশেখর ইহাকে তেমন আমল দেন নাই, কিন্তু দিন দিন অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়া চলায় প্রতিকার তাঁহাকে করিতেই হইল। চীৎকার করিয়া তাঁহার লোকজনকে ডাকিয়া বলিলেন, যা তো ডিঙ্গিপাড়ের বাঁশঝাড়টা বিলকুল সাফ করে দিয়ে আয়। যে কথা সেই কাজ। পরদিনই বাঁশঝাড় খতম হইয়া গেল। সেই বাঁশে লাঠি প্রস্তুত হইল। তারপর জন-পঞ্চাশ জবরদস্ত লাঠিয়াল লইয়া স্বয়ং শশাঙ্কশেখর পল্টনদের তাঁবুর সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইলেন। সারাদিন লুটপাট করিয়া সাহেবরা তখন মদ গিলিতেছে। তাক বুঝিয়া লাঠিয়ালরা তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। মার খাইয়া নেশা ছুটিল বটে, কিন্তু রাইফেল ধরিবার সুযোগ পাইল না। তাহার পর তাঁবুগুলিতে কেরোসীন তেল ঢালিয়া আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল। দাউ দাউ করিয়া আগুন চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। ইংরেজ-পল্টনের দল বুট-হ্যাট পরিয়াই মহানন্দপুরের পুকুরে ঝাঁপাইয়া পড়িল।

ইহার কয়েকদিন পরে জমিদার শশাঙ্কশেখর তাঁহার কাছারীতে বসিয়া খাতাপত্তর দেখিতেছেন, লালমুখো এক সাহেবকে লইয়া দারোয়ান আসিয়া হাজির হইল।

ভাঙা ভাঙা বাংলায় সাহেব যাহা জানাইল, তাহাতে জমিদার বুঝিলেন, দিনকয়েক আগে যে-ইংরেজ-পল্টনের দল তাঁহার হাতে নাস্তানাবুদ হইয়াছে, এই সাহেব তাহাদেরই পাণ্ডা। জমিদারবাবুকে খুশি করিবার জন্য আজ ভেট লইয়া আসিয়াছে। একটা মস্ত কাঠের বাক্স সম্মুখে রাখিল। শশাঙ্কশেখর হাসিলেন।

সবাই ভাবিয়াছিল, ইহা এমন কি আর হইবে। কিন্তু কাঠের বাক্স খুলিতেই সকলেই তাজ্জব বনিয়া গেল। চক্ চক্ করিতেছে প্রকাণ্ড এক দেওয়াল-ঘড়ি।

সেই দেওয়াল-ঘড়ি আজ দুশো বছর পরে স্তব্ধ হইয়া গেল। এই আকস্মিক দুর্ঘটনা কি দত্ত-বাড়ি ধ্বংশ হইবার পূর্বাভাষ? দত্তমশায় বিচলিত হইলেন।

১০

দোলের পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথা হইতে হাজার হাজার মজুর পঙ্গপালের মতো আসিয়া জুটিল। বিজয়মাধব, অমিয়মাধব দুজনেই বাড়ি আসিয়াছে। এইবারে কাজ সুরু হইবে। অমিয়মাধব জানাইল, আমাদের বাড়ি ভাঙিতেই হইবে, উহা রাখা যাইবে না। সরকারের এইরূপই নির্দেশ।

—আমি জানি, এবার আমারও কাল পূর্ণ হয়েছে। বলিতে বলিতে নীলাম্বর দত্ত কাঁদিয়া ফেলিলেন।

অমিয়মাধব বলিল, আপনি এত উতলা হচ্ছেন কেন? আমি যখন আছি তখন কোনো ক্ষতিই হবে না—নিশ্চিন্ত থাকুন।

—বেশ, আমিই প্ল্যান ক'রে দেবো—সেই অনুযায়ীই বাড়ি করবে।

—আচ্ছা, তাই হবে। আর আমাদের বাড়ির কাজ হবে সব শেষে। আগে ওদিকের কাজ শেষ ক'রে পরে এই অংশে হাত দেবো।

গ্রাম পরিষ্কার করিয়া চতুর্দ্দিকে তাঁবু পড়িল। মস্তবড় ডায়নামো বসাইয়া গ্রাম আলোকিত করা হইল। দিন-রাত্রি কাজ হইতে লাগিল: ঠক্-ঠক্-ঠক্। কালো কালো মানুষ—দানবের মতো প্রকৃতি। সব ভাঙিয়া তছনছ করিয়া ফেলিতেছে। হৃদয়হীনের মতো অমিয়মাধব সর্বত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছে। বড় বড় ইঞ্জিন আসিয়া পড়িয়াছে, পীচের রাস্তা বানাইবে। বড় বড় গাছের গুঁড়িগুলা মেসিনে ফেলিয়া এখন চেলাই হইতেছে। উত্তর-দক্ষিণের বড় রাস্তাটিকে নাকি গ্রাণ্ডট্রাঙ্কের সহিত মিশানো হইবে। যন্ত্র-দানবের নানাবিধ বিকট আওয়াজে নীলাম্বর দত্তের বুক পর্যন্ত শুকাইয়া গিয়াছে। রাত্রে ভাল করিয়া তিনি ঘুমাইতে পারিতেছেন না—ঘুমের ঘোরেও চীৎকার করিয়া উঠিতেছেন। বধূরা শ্বশুরের অবস্থা দেখিয়া শঙ্কিত হইল। নীলাম্বর দত্ত শয্যাগ্রহণ করিলেন।

একদিন নিশুতি রাতে নীলাম্বর ঘুমের ঘোরেই শুনিতে পাইলেন, তাঁহার কানের কাছে কে যেন হাতুড়ি পিটাইতেছে। ধড়মড় করিয়া তিনি বিছানায় উঠিয়া বসিলেন। চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, বৌমা!

বড় বধূ ব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিল।

—ও কিসের শব্দ বৌমা?

—মুখুজ্জেদের বাড়ী ভাঙা হচ্ছে বাবা!

—অমনি শব্দ ক'রে?

—ভাঙতে গেলে তো শব্দ হবেই বাবা!

নীলাম্বর সেকথা যে জানেন না এমন নয়। কিন্তু মনে করিতে ভয় হয়। অমনি শব্দ করিয়া তো তাঁহার বাড়ীও ভাঙা হইবে?

ঠক্ ঠক্ ঠক্—শব্দ নয়, শেলাঘাত! প্রতিটি শব্দ যেন তাঁহারই বক্ষ-পঞ্জরে গিয়া আঘাত করিতেছে। কাঁপিতে কাঁপিতে আবার তিনি বিছানায় শুইয়া পড়েন।

—আপনি ঘুমোন, আমি মাথায় হাত বুলিয়ে দি'। বলিয়া বধূ শয্যার এক প্রান্তে বসিল।

এদিকে অমিয়মাধব একদিন হরিদাসকে ডাকিয়া বলিল, চলো, তোমার জঙ্গল দেখবে চলো। সারা জঙ্গল তখন গভীর করিয়া খোঁড়া হইয়াছে। বলিল, দেখো, এতখানি খুঁড়েও কোথাও এক ঘড়া মোহরও পাওয়া যায় নাই। এবার নিশ্চিন্ত হয়ে তুমি ঘুমুতে পারো।

হরিদাস ক্ষুণ্নমনে বাড়ী ফিরিল।

অনেক বাড়ী ভাঙা হইয়াছে। কাঙালীর বাড়ীও নিশ্চিহ্ন। সে টাকা লইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবে জানাইল। যেখানে তাহার ধানের জমি—তাহারই কাছাকাছি শঙ্করপুকুর গ্রাম। পাঁচ ক্রোশ পথ এমন কিছু দূর নয়—পায়ে-হাঁটা মানুষের পক্ষে এ-পাড়া ও-পাড়া। মাঝখানে নদী থাকিলেও বা কথা ছিল। নদী তো নয়ই—তেমন নাম করা খাল-বিলও নয়—শুধু রচনা করিয়াছে অকূল সমুদ্র ধানক্ষেত। ক্রোশের পর ক্রোশ আদি-অন্তহীন ক্ষেত, বর্ষার জল পাইয়া শ্যামল হইতে হইতে শরতে হিল্লোলময় শব্দহীন সমুদ্র হইয়া উঠে। হেমন্তে সে-সমুদ্রে সোনার রং ধরে আর নুইয়া-পড়া শস্য-মঞ্জরী বাতাসের দোল খাইয়া মৃদু আওয়াজ তোলে- যাহা লক্ষ্মীর চরণ-নূপুরের ঝঙ্কার বলিয়া পরম শ্রদ্ধায় ও আনন্দে চাষাভাইরা কান পাতিয়া শোনে। শীতের মাঠে সবুজ-শ্রী থাকে না, সোনালী রঙে চিত্তহরণ করে না, কিন্তু মাঠের এখানে ওখানে পোয়াল-দেওয়া বিচালীর রাশি ও চূড়াকৃতি ধানের স্তূপ মনকে ভবিষ্যতের স্বপ্ন-সুষমায় নাচাইয়া লইয়া বেড়ায়। কত সাধ—কত আনন্দ, ছোটোখাটো নানা ছবির ভাঙা-গড়া!

বাছিয়া বাছিয়া কাঙালী এই স্থান নির্বাচন করিল। কিন্তু কাঙালী মহানন্দপুর ছাড়িয়া এখানে আসিল কেন? সে গ্রামের মানুষ—গ্রামেই এতকাল কাটাইয়াছে, আজ সে শহরে বাস করিবে কি করিয়া? মহানন্দপুর আজ তাহার জন্য নয়, তাইতো সে পালাইয়া বাঁচিল! তাহার এতগুলি গোরু, এতগুলি ধানের গোলা - এ লইয়া কি শহরে থাকা চলে? যাহারা শহর চাহিতেছে তাহারা শহরের সম্পদ ভোগ করুক। কাঙালীর তাহাতে এতটুকু দুঃখ নাই। আজকের মানুষ গ্রাম চাহে না। কিন্তু কি বুঝিবে তাহারা গ্রামের মাটিতে কি আছে?

কাঙালীর ঘর তুলিতে বেশিদিন লাগিল না। তারপর ধীরে ধীরে সবকিছু গুছাইয়া লইবে।

কিন্তু কাঙালী একাই আসিল না। তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গ্রামের অনেকেই আসিয়া পড়িল। হরীশ মুখুজ্জে, বনমালী, শশধর,—এমন কি, বিধু নিধুও আসিয়া পড়িল। বিধুর প্রতি নিধুর আর সে আক্রোশ নাই, এখন এক হইয়াই তাহারা আসিয়াছে। বলে, মোড়লমশাই, ভগবান যখন শিক্ষা দিয়ে দিলেন তখন আর কেন, পাপের ধনের প্রাচিত্তির এমনি ক'রেই হয়।

শঙ্করপুকুর দেখিতে দেখিতে ভরাট হইয়া গেল। যেন মহানন্দপুর ভাঙিয়া শঙ্করপুকুর হইল। মানুষ লইয়াই তো গ্রাম। নহিলে মাটির আর দাম কি? ইহার পর মহানন্দপুরে যাহারা আসিবে তাহারা ভিন্‌দেশী লোক। নাড়ীর যোগ আর কাহারও সহিত রহিল না। যোগ রাখিবে না বলিয়াই আজ তাহারা শিকড় উপড়াইয়া লইয়া চলিয়া আসিয়াছে।

মুখুজ্জেমশায় সেদিন আসিয়া বলিলেন, হাঁ, বুকের পাটা বটে কাঙালীর! কাঙালী অমন ক'রে না

এলে আমাদের কারুরই সাহস হ'তো না এখানে আসবার। ভাল করেছো কাঙালী, মাটির গন্ধ না হ'লে আমরা কি থাকতে পারি ভাই? এর পর দেখবে, ঐ মহানন্দপুর চিমনির ধোঁয়ায় কালো হ'য়ে গিয়েছে।

কাঙালী ভাবিল, এ ভালই হইল, মেয়ের বাড়ী আরও পাঁচক্রোশ আগাইয়া আসিল। শঙ্করপুকুর হইতে পলাশপুর পাঁচক্রোশ দক্ষিণে। পলাশপুর ঠিক গ্রাম নয় গঞ্জ। সেই গঞ্জেই কাঙালীর একমাত্র কন্যা মঙ্গলার বিবাহ হইয়াছে। মঙ্গলার কিন্তু ভাল লাগে না। গাঁয়ের মানুষ—গাঁয়েই তাহার মন পড়িয়া থাকে। জামাই ষষ্টিচরণ গঞ্জে চালের ব্যবসা করে। টাকা পয়সা অবশ্য সে করিয়াছে, কিন্তু ইহাতে মঙ্গলার মন ভরে না। সেই মন-জুড়ানো, চোখ-জুড়ানো মুক্ত আকাশ কই? নীলে আর সবুজে যেন মাখামাখি।

গঞ্জ হইলেও গ্রাম। আধা-শহর আধা-গ্রাম। অর্থাৎ গ্রামের চিহ্ন কিছু কিছু থাকিলেও, শহরের উপকরণই বেশি। গ্রামের মধ্যে মাঠ নাই—চালাঘর কম, কাদায়-জলে মাখামাখি নয় রাস্তাঘাট। ধান-চাল বিক্রয় করিতে গিয়া যেমন জমজমাট লাগে গঞ্জকে, তেমন মানুষজন, কোঠাবাড়ী, দোকানপসারে গিজগিজ করে না বটে জায়গাটা—তবু সেটা উদাস উদাম মাঠের মাঝখানে রাঙচিতা, লাল ভেরেণ্ডার বেড়া-ঘেরা খানকয়েক চালাঘরের গ্রামও নয়। এখানে জরাজীর্ণ কোঠাঘরই বেশী। সবই প্রায় পাঁচিল ঘেরা। আম-জামের গাছ—অন্ধকার ছায়া ছায়া উঠান—কোনো ঘরের দেওয়ালে চূণবালির পলস্তারা নাই—কোনোটা বা বর্ষার জলে কালো হইয়া গিয়াছে। ইটের ইমারৎ—শ্রী নাই, সৌন্দর্য নাই, মাঠ আছে গ্রামের শেষে। সে মাঠে মালক্ষ্মী প্রতিবারই আসেন না। যেবার আসেন, সেবার গো-যানে চাপিয়া গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করেন না—দূর শহরে চলিয়া যান, যেখানে ধানের কল আছে। সেই প্রাসাদে তাঁর অঙ্গচর্যার কাজটি সম্পূর্ণ হইলে, সেই গোযানে চাপিয়াই তিনি শহরে গিয়া ওঠেন। তারপর রেল-ষ্টীমার-নৌকায় চাপিয়া কোথায় যে ছোটেন কেউ জানে না, কিন্তু সম্পদ হইয়া ফিরিয়া আসেন সিন্দুকে। খাওয়া-পরা, সাধ-আহ্লাদ, দায়-অদায় সবকিছুই মেটে তাঁরই দৌলতে—তাঁকে দু'চোখ ভরিয়া দেখার সাধ শুধু মেটে না।

মঙ্গলার চোখে এই মূর্তিটা ভারি ন্যাড়া ন্যাড়া ঠেকে। সবই আছে—তবু কেমন ফাঁকা ফাঁকা।

একদিন স্বামীকে সে বলিয়াছিল, একটা ধানের মরাই নাই বাড়ীতে, ঢেঁকিশাল নাই—ধান-ভানা হয় কেমন করে? কেমন করেই বা মজুত করো?

ষষ্টিচরণ বলিয়াছিল, ওসব হাঙ্গামায় দরকার কি? আমাদের এখানে নগদা-নগদি কারবার। গ্রামে বড় বড় দোকান আছে, যখন ইচ্ছে গিয়ে কিনে আনো।

মঙ্গলা আর কিছু বলে নাই। শুধু অবাক হইয়া ভাবিয়াছিল, এ দেশ আবার কেমন? সেই সঙ্গে একথাও ভাবিয়াছিল, বাবা এত দেশ থাকিতে বাছিয়া বাছিয়া এখানে কেন বিয়ে দিলেন!

সেও এক অদ্ভুত যোগাযোগ। দেয়াসীর মাঠে এক লপ্তে পাঁচ বিঘা জমি, পাশেই একটা ফালিমত বাঁওড়। বর্ষার সময় যে জলটুকু জমাইয়া রাখিতে পারে, বর্ষাশেষে সেটুকু ছাঁচিয়া লইতে পারিলে আশপাশের জমিগুলি হয় সরস। আশ্বিন কার্তিকের আকাশ কৃপণ হইলেও, জমির মালিকের মুখ শুকায় না। দেবতা যদি বর্ষণ করে ভাল, না করিলে পরিশ্রম করিয়া জল সেঁচিলেই হইল। সেই সোনা-ফলানো জমি কিনিতে একদিন ষষ্টিচরণ শঙ্করপুকুর আসিয়াছিল।

পাশেই কাঙালীর জমি। যাকিছু জিজ্ঞাসাবাদ তাহার সহিতই হইল। জমির বৃত্তান্ত জানিতে জানিতে আকাশ আর মাটি তাতিয়া উঠিল। ষষ্টিচরণ বলিল, দেখুন কাণ্ড, ভাবলাম আজ মেঘ-মেঘ আছে, জমিটা দেখেই আসি, কিন্তু রোদের দাপটটা একবার দেখুন! মেঘভাঙা রোদ কিনা, রোখ্ কত!

—তা নাই বা গেলেন এ বেলা। গ্রামেই তো আছেন—জলে তো পড়েননি। স্নান-আহার শেষ ক'রে বেলা পড়লে বাড়ী যাবেন।

—তা কি ক'রে হয়—

—কেন হয় না? কণ্ঠে জোর দিয়াই কাঙালী বলিল। ভরদুপুরে খেয়ে না গেলে গৃহস্থের অকল্যাণ হয়। আচ্ছা, বুদ্ধি দেখ্ছি আপনার! বলি, ক'বিঘে জমি চাষ করেন? কখানা লাঙ্গল? ক'জোড়া হেলে গোরু?

—লাঙ্গল-গোরু? হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল ষষ্টিচরণ। বলে, মোটে মা রাঁধে না, তপ্ত আর পান্তা! তা ছাড়বেন না যখন, তখন চলুন আপনার আশ্রয়েই গিয়ে উঠি।

এমনি করিয়া আলাপ জমাইয়া উহারা ঘরে ফিরিল। মঙ্গলা তখন ক্ষেত হইতে নটেশাক তুলিতেছিল। নতুন মানুষটাকে লইয়া কাঙালী হাসিতে হাসিতে বাড়ী ঢুকিল। ষষ্টিচরণও হাসিতেছিল। মঙ্গলার কানে এ হাসি নূতন ঠেকিল, ধরনটাও মিষ্ট লাগিল। হাত নাড়িয়া আর ঘাড় দুলাইয়া সেই-হাসি আজও চোখ বুজিয়া দেখিতে পায় মঙ্গলা।

—মুংলি রে, তোর মাকে গিয়ে বল্ আজ ভালো ক'রে রান্না করতে।

—আপনার কন্যা বুঝি মোড়ল মশাই?

মোড়ল হাসিয়া বলিয়াছিল, হাঁ, কন্যাই বটে—আমার মা জননী।

ষষ্টিচরণ চাহিয়া দেখিতেছিল মঙ্গলার রূপ। হাঁ, রূপ বটে! রং যেন ফাটিয়া পড়িতেছে। চাষীর ঘরে এই রং? প্রসন্নদৃষ্টিতে আরও বারকয়েক উহার দিকে চাহিয়াছিল ষষ্টিচরণ। মঙ্গলা তাহাও লক্ষ্য করিয়াছিল।

তারপর জমি দেখিবার উপলক্ষ্যে আরও দুইবার ষষ্টিচরণকে আসিতে হইয়াছিল। দুইবারই কাঙালী জোর করিয়া তাহার বাড়ী লইয়া আসিয়াছিল, আর এই সুযোগে ধীরে ধীরে কোন্ অদৃশ্য সূতায় রঙের মাঞ্জা দিয়া খরধার করিয়া তুলিয়াছিলেন সেই অচেনা বিধাতা—যাঁর কৃপায় কত না অঘটন ঘটিয়া যাইতেছে!

তারপর? তারপর ছিল আনন্দ আর বেদনা মেশানো ছোট্ট একটু ঘটনা—যাহার সহিত প্রথম পরিচয় ঘটিল নূতন দেশে পা বাড়াইবার ক্ষণটিতে।

মায়ের আঁচলে মুখ লুকাইয়া কি কান্নাটাই না কাঁদিয়াছিল মঙ্গলা! তেরো বছরের মেয়ে, জ্ঞান হইয়া অবধি এই মাটি আর এই আকাশের কোলে মানুষ। সবুজের সমুদ্র ছিল তার চারিদিকে—আজ সেসব কোথায় গেল!

গোরুরগাড়ীতে চাপিয়া চোখের জল মুছিতে মুছিতে সে চলিয়াছে। দুপাশে অফুরন্ত মাঠ। বৈশাখে অশ্বত্থ আর জীয়লগাছে চিকণ চিকণ নরম পাতা হাওয়ায় কাঁপিতেছে—চষা ভুঁয়ে পড়িয়াছে কঠিন রোদ। মাঠের এখানে-ওখানে অর্দ্ধশুষ্ক উচ্ছেলতার ঝোপ—বেগুনের মরা গাছ। শুধু কুমড়া আর কাঁকুড়ের লতা ফুলে ফলে ভূমির রূপকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে। দুপাশের আলগুলি রোগজীর্ণ মানুষের পাঁজরের মোটা মোটা হাড়ের মতো ঠেলিয়া উঠিয়াছে ভূমিমাতার দেহ হইতে। রুগ্ন জমি—তবু ইহার কত শোভা—কি স্নেহ! মাঠের পথ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চোখের জল শুকায় নাই মঙ্গলার।

তারপর গ্রাম। এমন চেহারাও হয় গ্রামের। গাছ-গাছালি আছে—ঝোপঝাড় আছে—আছে পাঁচিল-ঘেরা বাড়ীঘর। কেমন যেন টুক্রা টুক্রা চেহারা! চোখের সামনে কতটুকু বা জমি—মাথার উপরে আকাশই বা কতটুকু! গ্রামের কোলে বিল-বাঁওর নাই—যার একদিকে গড়ানে ঢালুজমি আর একদিকে মাঠের আঁচল বিছানো। সেই তিরতিরে জলে পদ্মপাতা, শালুক-শাপ্লারা চকচকিয়ে ওঠে, শ্যাওলার আঁশটে মিষ্টগন্ধ ভাসিয়া বেড়ায় আর পায়ের তলায় তকতকে বালির মেঝে। আশ্চর্য জল! জলে ডুব দিয়া চোখ চাহিলে প্রায়

স্পষ্ট দেখা যায়—নিজের দেহটা। আর দেখা যায় হাত নাড়িলে কয়টা আঙুল। আর এখানে যত পথ ঘুরিয়া যাও শুধু এঁদো পুকুর— শ্যাওলা-পিছল ভাঙা খানা, পা টিপিয়া টিপিয়া নামিতে হয়! আর জলের বর্ণ যে এমন হয়—এই প্রথম দেখিল মঙ্গলা।

স্নান সারিয়া সর্বাঙ্গে ভিজা কাপড় জড়াইয়া, একগলা ঘোমটা টানিয়া ননদের পিছু পিছু বাড়ী ফিরে আসা —যেন জেলখানার কয়েদীকে কোর্ট হইতে জেলে ফিরাইয়া আনা হইল। অনেকদিন আগে শহরে একবার বাবার সহিত গিয়া জেলখানার উঁচু পাঁচিল-ওয়ালা বাড়ী সে দেখিয়াছিল। দুপুরে কোর্টের ধার দিয়া যাইতে যাইতে দেখিয়াছিল কয়েদীভর্তি জেলের গাড়ী। গাড়ীর জালতির ফাঁকে অনেক হাত আর চোখ– অবাক হইয়া তাকিয়ে-থাকা চোখ! বাবা বলিয়াছিল ইহারা জেলখানার লোক। কোর্টে হাজিরা দিতে যাইতেছে—কোর্ট হইয়া গেলে জেলখানায় ঢুকিবে।

উঁচু পাঁচিল-ওয়ালা বাড়ী আর অবাক-চোখে-চাওয়া লোকগুলিকে মঙ্গলা অনেকদিন ভুলিতে পারে নাই। দৃষ্টিটা অবশ্য ক্রমশ ফিকা হইয়া আসিয়াছিল—এখানে আসিয়া সেটা আবার স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

এ বাড়ীতেও পাঁচিল—ওপিঠে কিছু দেখা যায় না। এটা করিতে নাই,'অমন করিয়া জোরে জোরে হাসিও না, শব্দ করিয়া চলিবে না, উঁচু হইয়া বসিবে না। মাথার কাপড়টা তুলিয়া দাও, ভাসুরের সহিত কথা বলিও না, গুরুজনের সম্মুখে হাসিতে নাই, কাসিতে নাই, ছুটিতে নাই—গ্রাসে গ্রাসে মুখে ভাত তুলিতে নাই—ক্রমশই প্রাচীর উঁচু হইয়া ওঠে। মঙ্গলা ছটফট্ করে। দুপুরে আধো অন্ধকারে ঘরে মাদুর পাতিয়া সবাই যখন বিশ্রাম করে, মঙ্গলার চোখ তখন শাসনের জ্বালায় জ্বলিয়া-পুড়িয়া যায়। ভাবে, এত শাস্তিও লেখা ছিল কপালে!

ভোরে কাক-কোকিল ডাকিতে না ডাকিতে যষ্ঠিচরণ বিছানা হইতে উঠিয়া পড়ে। বলে, এইবেলা না বেরুলে গঞ্জের হাটে পৌঁছুতে পারবো না। প্রথম মওকায় মাল কিনতে না পারলে অনেক ভোগান্তি, অনেক লোকসান।

জমি ইহাদের যৎসামান্যই আছে—ধানের গোলা একটিও নাই। জমির ফসল গোলায় ওঠে না—হাটে-বাজারে ব্যাপারী মহাজনের হাত-ফেরাফেরি হইয়া ওঠে গিয়া গোরুরগাড়ীতে, কিংবা নৌকায়। ইহারা এক গা ধুলা লইয়া আর ট্যাক্ ভর্তি টাকা লইয়া হাসিমুখে বাড়ী ফেরে। কোনো কোনোবার শস্তাদামের চুলের ফিতা, কাঁটা, গিল্টির গহনা, ধামা-কুলা বঁঠি বা এলুমিনিয়মের বাসন লইয়া আসে। সেইগুলি লইয়া এ বাড়ীর মানুষদের কি আনন্দ, কি কল্‌কল্-গল্‌গল্ কথা!

আনন্দের প্রকাশ বাপের বাড়ীতেও দেখিয়াছে মঙ্গলা। অগ্রহায়ণে সুরু হয় সে-উৎসব নতুন চালের নবান্ন দিয়া—শেষ হয় পৌষ সংক্রান্তিতে। তখন চলে চাল-কোটার ধূম—সারারাত দমাদ্দম পাড় পড়ে ঢেঁকিতে। গঞ্জ হইতে নূতন খেজুর গুড় আসে, আর আসে নৌকা বোঝাই নারিকেল পূব হইতে। ক্ষেতের তিল তখন ঝাড়া হয় না। সন্ধ্যা হইতে রাত দুপুর পর্যন্ত তৈরী হয় আস্কে পিঠে, সরুচাকলি, সিদ্ধপুলি, মুগপুলি—রকমারি রাশি রাশি পুলি আর পিঠে। আজ সেসব দিন কোথায় গেল? মঙ্গলার মন কেমন করে!

১১

রাস্তার কাজ শেষ করিয়া, এবার প্লট বিলি করিবার কাজে নামিল অমিয়মাধব। অধিকাংশ প্লটই মাড়োয়ারীরা কিনিয়া লইল। স্থানীয় লোক কাহাকেও বিশেষ পাওয়া গেল না। তাহারা অধিকাংশই গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে। মাড়োয়ারীরা মোটা মোটা টাকা ঢালিতেছে কারখানার জন্য। কেহ কাপড়ের কল বানাইবে,

কেহ কাগজের কল, কেহ বা তেলের কল, চটকল। আর যাহারা আসিল, তাহারাও ধনী—কেহ ব্যবসা করিবে, কেহ ব্যবসায় মুনাফা লুটিবে।

বিজয়মাধবের মন কিন্তু ইহারই মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। তাহার ধারণা, বাংলাদেশ কারখানার দেশ নহে, তাহার নিজস্ব সম্পদ হারাইয়া সে ইহাতে দেউলিয়াই হইয়া যাইতেছে। এ বুদ্ধি বিদেশের ধার করা। এর মাটির দিকে চাহিয়া দেখিল না হতভাগারা! এ মাটিতে ফসলই ফলে।

—তবে এ কাজে হাত দিলে কেন দাদা? অমিয়মাধব বলিল।

—আমি না দিলে আর কেউ এসে দিতো। সরকারের যখন প্ল্যান। তবে আমি জানি, এতে বাংলাদেশের ভাল হবে না। এর জন্য অন্য দেশ আছে।

—তুমিও দেখছি বাবার মতো কথা বলছো।

—না, একটু তফাৎ আছে। বাবার হলো সংস্কার। পুরনো কাঠামোকে তিনি নষ্ট হতে দিতে চান না। স্মৃতিরও তো একটা মূল্য আছে। শুধু আমাদের দেশে কেন, ওদের দেশেও দ্যাখো। সেক্‌সপীয়ারের বাড়ী ভাঙা হয়নি—সংস্কার করা হয়েছে। এ বাড়ীতে সেক্‌স্‌পীয়ার বাস করতেন, তার চিহ্ন আছে বলেই আমরা বলতে পেরেছি। নইলে সে বাড়ীর মূল্য কোথায়? আমাদের বাড়ীর এক পুরনো গোমস্তা ছিল, তার একটা ছাতা ছিল। কবে থেকে সে ব্যবহার করছে কেউ জানে না। কাপড়খানায় শততালি পড়েছে, শিকও অনেক বদল হয়েছে—জরাজীর্ণ, মনে হয় এখুনি খসে পড়বে। একটা দড়ি দিয়ে বেঁধে গোমস্তা মশায় বগলে নিয়ে বেরোন। গোমস্তা-মশায়ের টাকার অভাব ছিল না—অনায়াসে একটা নতুন ছাতা কিনতে পারতেন। আমি সেকথা বলেছিলাম, তার উত্তরে তিনি কি বলেছিলেন জানো? বলেছিলেন, এর দাম তোমরা বুঝবে না। এর সঙ্গে কতদিনের স্মৃতি জড়িয়ে আছে, এ যে কত আদরের—এর অঙ্গ স্পর্শ করলে বুঝতে পারি। আজ নতুন ছাতা বগলে নিলে মনে হবে যেন অপরের ছেলেকে কোলে নিয়েছি। তোমরা বুঝবে না—এ আমার কত আদরের।

কথাটা শুনলে তোমরা হাসবে। কিন্তু ভাবো দেখি এর যোগসূত্রটি কোথায়? বাবাও সেই আকুলি-বিকুলি করছেন ঐ কাঠামোকে ধরে রাখবার জন্যে।

এ 'সেন্টিমেন্ট' অমিয়মাধবের মধ্যে নাই, তাই হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল ভাঙার কাজ আর কতটা বাকি আছে দেখিতে।

আজ কতদিন ধরিয়া কাজ চলিতেছে, দুজনেরই পরিশ্রম কম হইতেছে না। রাত্রে নামমাত্র একটু ঘুমাইয়া লয়—তাও ক্যাম্পে। বাড়ীর সহিত সম্পর্ক খুবই কম। দুবার আসিয়া খাইয়া যায় মাত্র।

অমিয়মাধব ক্যাম্পে আসিয়া দেখিল, ধ্যানচাঁদ আগরওয়ালা আসিয়া বসিয়া আছে। বলিল, বাবুজি, ঐ জমিটা আমার নামে লাগিয়ে দিন।

—তা কি ক'রে হয় ধ্যানচাঁদ! একজনকে অত জমি দিতে গেলে ঝগড়া হবে।

—খুব হোবে বাবুজি! পাঁচ-দশহাজার আপনি ভি লিয়ে নিন, হামরা ভি কাজ হয়ে যায়।

অবশেষে তাহাই হইল। জমি ধ্যানচাঁদই পাইল।

এদিকে মহানন্দপুরের কাজ প্রায় শেষ হইয়া আসিল। বাকি রহিল শুধু পূব-অংশ—যেদিকে দত্তবাড়ি আছে। বিজয়মাধব সেকথা তাহার বাবাকে জানাইল: আপনারা এবার কলকাতার বাড়িতে থাকবেন, চলুন।

নীলাম্বর বলিলেন, আর আমার গোপীনাথ?

—গোপীনাথও যাবেন। সঙ্গে হরিদাস, পিসীমা দুজ নেই থাকবেন। নইলে গোপীনাথকে দেখবে কে?

—আমার প্ল্যান দেখেছো তো?

—হাঁ, দেখেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।

কলিকাতায় যাইবার আয়োজন তো কম নয়। জিনিসপত্র পাঠাইতেই সাতদিন কাটিয়া গেল।

নীলাম্বর দত্ত কলিকাতার বাড়ীতে বহুবার আসিয়াছেন। কিন্তু এবারের আসা যেন হৃদয়বিদারক। তিনি দূরে থাকিলেন, না জানি উহারা কি করিবে! এ যেন একটা কঠিন অপারেশনের জন্য ছেলেকে টেবিলে শোয়াইয়া দিয়া বাপের বাহিরে প্রতীক্ষা করা! দত্তমশায় দুরু দুরু বক্ষে দিন গুনিতে লাগিলেন।

অবশ্য সময় কাহারও জন্য বসিয়া থাকে না। দত্তমশায়েরও থাকিল না। ক্রমশ তাঁহার মানসিক অবস্থা সহজ হইয়া আসিল। এক ভরসা, তিনিই নূতন বাড়ীর প্ল্যান ছকিয়া দিয়াছেন। প্ল্যান আর কি—সেই প্রাচীন দত্তবাড়ীর ছকে ফেলা প্ল্যান; তেমনি দত্ত-সড়কের ধারে, তেমনি বড় বড় থামওয়ালা দক্ষিণ-দুয়ারি বাড়ী। তেমনি উঠানের একধারে অন্দর, অপরধারে মন্দির-চত্বর। সব সেইরূপই আছে—শুধু, যাহা ভাঙিয়া গিয়াছিল, তাহা জোড়া দেওয়া হইতেছে মাত্র। আছে সেই কাছারি-বাড়ী, খাজাঞ্চিখানা, সদর-দেউড়ি। গ্রামের বাহিরে দত্ত-ঘাটকেও তিনি রক্ষা করিয়াছেন।

কলিকাতায় বসিয়া তাঁহার অলস দিন আর কাটে না। তাই প্ল্যানের পর প্ল্যান তৈয়ারি করিয়া পাঠাইতেছেন, আর ওদিকে কোম্পানী তাহার ইচ্ছামত বাড়ী বানাইতেছে।

বিধাতার অদ্ভুত পরিহাস!

মঙ্গলা বাপের বাড়ি আসিয়াছে। যেন হাতে চাঁদ পাইয়াছে। সেই ছোটবেলার মতো নাচিয়া কুঁদিয়া সর্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। ধানের গোলাগুলি দেখিয়া যেন চোখ জুড়ায়। গোয়ালে গোরুগুলি তাহাকে দেখিয়া 'হাম্বা হাম্বা' করিয়া ওঠে। মঙ্গলা তাহাদের গায়ে হাতবুলায়। উঠানভরা তরিতরকারীর গাছ—মঙ্গলার দেখিয়া আর আশা মেটে না।

রান্নাঘরে ভাতের থালার সামনে বসিয়া, সে আনন্দে লাফাইয়া উঠিল। বলিল, কতদিন যে এই লাল চালের ভাত খাইনি।

মোটা মোটা ফাটা লাল চাল শুধু আহার্যে স্বাদ আনে না—অতি পরিচিত পুরাতন মাটির স্পর্শটুকু ধরিয়া দেয়। ক্ষেতের তরকারি আর বাজারের কেনা তরকারিতে কত তফাৎ। এ যেন আর এক জাতের।

মঙ্গলা বলিল, এবার নতুন চাল উঠলে আমাকে কিছু পাঠিয়ে দিও বাবা। ওরা তো গোলায় রাখতে চাইবে না, নইলে তোমাকে বলতাম দুটো গোলা করতে। মজুত করলে ওদের ব্যবসা চলবে কি করে? ওদের নগদানগদি কারবার।

—সবই বুঝি মা! ভাগ্যদোষে তোর প্রকৃতির বিপরীত ঘর হ'লো। এখন একেই তোকে মানিয়ে নিতে হবে। এই মানিয়ে না নিতে পারলেই সংঘর্ষ বাধবে। যা আজকাল হচ্ছে। যার ফলে মারামারি কাটাকাটি লেগেই আছে।

—কিন্তু যাই বলো বাবা, আমি মহানন্দপুরকে আজো ভুলতে পারি নি।

—তাকি ভোলা যায় মা! ওর সঙ্গে যে আমাদের নাড়ীর টান আছে।

—আচ্ছা বাবা, মহানন্দপুর শহর হ'লে একবার দেখতে যাবে না ?

—না মা, ও-রূপ আমি দেখতে পারবো না। তার চেয়ে মহানন্দপুরের পুরনো ছবি আমার মনে গাঁথা থাক্। আজ সেখানে কত কলকারখানা বসেছে। চিমনির ধোঁয়ায় আজ মহানন্দপুরের সারা অঙ্গে কালি !

—মহানন্দপুরের মতো গাজনের মেলা শঙ্করপুকুরে যদি থাক্‌তো তাহলে বেশ হ'তো—নয় বাবা ?

—সব করবো মা ! গাজনের মেলা, দোল-দুর্গোৎসব সব হবে। উৎসব না হ'লে মানুষ বাঁচবে কি ক'রে ? আমাদের ঐ মজাপুকুরটা এবার কাটাবো ঠিক করেছি। সারা গাঁয়ে একটা পুকুর নেই। লোকে জল খেয়ে বাঁচবে।

—খুব ভাল হবে বাবা ! ওতে মাছ ছাড়বে, তাহলে মাছেরও অভাব হবে না।

কাঙালী হাসিয়া বলিল, বেশ তাই হবে।

বৈকালে নরেন মুখুজ্জে আসিলে কাঙালী তাহার মনের কথা জানাইল।

মুখুজ্জে বলিল, তুমি যা বলবে আমরা তাই করবো। তোমার দৌলতেই আমাদের এখানে আসা। নইলে কি দুর্গতি হ'তো বলো দেখি আজ ? শহরের খাঁচায় আমরা দম বন্ধ হয়েই মারা যেতাম ! তা বলতে গেলে এসেছি আমরা সবাই। তার পর তুমি যা বলছো, তা যদি করে তুলতে পারো—শঙ্করপুকুরই হবে মহানন্দপুর। আরে, লোক নিয়েই তো গ্রাম। লোক রইলো এখানে—তারপর আনন্দ-উৎসব সব এখানে, মহানন্দপুরে রইলো কি ?

কাঙালী হাসিয়া বলিল, কেন, চিম্‌নির ধোঁয়া ?

—তা যা বলছো। এখন মাড়োয়ারীর দেশ—মানাবে ভাল।

—উঃ, এও দেখতে হলো ? বলিয়া কাঙালী দীর্ঘ একটি নিশ্বাস ফেলিল।

মুখুজ্জে বলিল, যাক্, তোমার প্ল্যান তো শুনলাম কিন্তু এসব করবে কে ? টাকা তো সোজা নয়। চাঁদা ? চাঁদা তুলে এসব কাজ হয় না।

—টাকা আমি দেবো মুখুজ্জে। তোমারা শুধু উদ্যোগী হও।

—এক কাজ করো ! মুখুজ্জে বলিল। একদিন সবাইকে ডাকাও, ভাগাভাগি করে সবাইকে কাজের ভার দাও। কেউ গররাজি হবে না। মানুষের মতো গাঁয়ে বাস করতে হবে তো।

—আমিও তো তাই বলি। ছেলেপুলেদের পড়াশুনা করবার জন্যে স্কুলও একটা দরকার।

—নিশ্চয়। গাঁয়ের ছেলে গ্রামান্তরে যাবে কেন পড়তে !

—সবই তো বুঝলাম। কিন্তু এসব করবার জন্যে 'ইয়ংম্যান' দরকার। তোমার আমার মতো বুড়ো-হাবড়া দিয়ে তো সব কাজ হবে না। কিন্তু সে ছেলে কোথায় ? সকলের ছেলেই তো আজ কলকাতায়।

—এক কাজ করো। ছেলেরা ছুটিতে বাড়ি এলে, তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দাও এইসব কাজ। ঘাড়ে পড়লে, তাদেরও জিদ্ চেপে যাবে।

—দেখি, কি কতদূর করতে পারি।

—তোমাকে কিন্তু একটা কাজের ভার নিতে হবে মুখুজ্জে, আমি টাকা দিয়ে খালাস। সেই টাকা কোন্ বাবদে, কি পরিমাণে খরচ হচ্ছে তার হিসেব তোমাকে রাখতে হবে।

—রক্ষা করো কাঙালী, আজকের নতুন অঙ্ক আমি জানি না। আমাদের আমলে চলেছে টাকা

আনার হিসেব—আজ যা অচল। উঃ কি পরিবর্তনই হয়ে গেল দেখতে দেখতে। ছোটবেলায় নারান পণ্ডিতের কাছে এই শুভঙ্করীর আর্য্যা মুখস্থ নিয়ে কম মার খেয়েছি। প্রাণপণে মুখস্থ করেছি—

'সের প্রতি যত তঙ্কা হইবেক দর,
তঙ্কা প্রতি এক আনা ছটাকেতে ধর।'

কোথায় গেল আজ সের, আর কোথায় গেল ছটাক। পণ্ডিতমশায় কি ছালই তুলেছেন পিঠের। কিছুতেই মুখস্থ হয় না—

'কুড়বা কুড়বা কুড়বা লিজ্যে
কাঠায় কাঠায় কাঠায় লিজ্যে

আজ পণ্ডিতমশায়ের যদি একবার দেখা পেতাম—

কাঙালী হাসিতে লাগিল। বলিল, সত্যি, কোথায় গেল এইসব? আজ নতুন ওজন, নতুন টাকা-পয়সার হিসাব। আর শুনেছো মুখুজ্জে, সংস্কৃত ভাষা আর থাকলো না—তার বদলে হিন্দীকে ওরা চালু করলো। সংস্কৃত নাকি 'ডেড্-ল্যাংগুয়েজ'—মৃতভাষা। শুনলে হাসিও আসে, দুঃখও হয়। অথচ আমাদের গোটা শাস্ত্রটাই সংস্কৃত ভাষায়। তোর বাপের মুখে পিণ্ডি দিতে গেলেও সংস্কৃত আওড়াতে হবে।

—কি রাগ ছিল নারান পণ্ডিতের। চণ্ডাল রাগ! পাঠশালার একটা সাইনবোর্ড ছিল—তাতে তাঁর নামটাই ফলাও করে লেখা ছিল। তার গায়ে এতটুকু আঁচড় সহ্য করতে পারতেন না পণ্ডিতমশায়। একটা দিনের কথা মনে আছে—যদু, ধর্মদাসের ছেলে—বাঁশের গায়ে ছুরি দিয়ে কেটেকেটে তার নাম লিখেছিল। আর যায় কোথায়। হুঙ্কার দিয়ে ডাকলেন, যদু! যদু কাছে আসতেই মার সুরু হলো—উঃ, কি সে মার! আজ কোথায় গেল সেই পণ্ডিতমশায়, আর কোথায় গেল যদু। পাঠশালা গেল, শুভঙ্করীর আর্য্যা গেল। সব ওলট-পালট হয়ে গেল।

কাঙালী আক্ষেপ করিয়া বলিল, কি কাল স্বাধীনতা এলো! এরা দেখালো স্বাধীন হওয়া মানে বাঁদর হওয়া—আইন মান্‌বো না, শৃংখলা মান্‌বো না—যা খুশি তাই করে বেড়াবো। আবার সরকার কিছু বলতে গেলেই 'ঘেরাও' হবে। বলে, আমাদের দাবি মানতে হবে। অর্থাৎ ওঁরা যা খুশি করে বেড়াবেন তাই মানতে হবে।

—যাই বলো কাঙালী, ইংরেজদের আমলই ভাল ছিল। স্বাধীন হয়ে কি সুখে রাখলি আমাদের! কেউ কল্পনা করতে পেরেছিলে ছ'টাকা কিলো চাল! যা আমরা তিনটাকা মণ দরে কিনেছি। এক পয়সা সের পটল আজ একটাকা হলো। কাপড় পরবার উপায় নাই। আগে বারো আনায় একখানা কাপড় পরেছি, আজ সেটা সাতটাকা! স্বাধীন হয়ে এইতো হলো!

কাঙালী বলিল, যাক্, সে দুঃখ ক'রে আজ লাভ নাই। মেনে নেওয়াই হ'লো আজকের দিনের ধর্ম্ম।

মুখুজ্জে চলিয়া গেলে, মনোরমা আসিয়া বলিল, সবই তো করছো, কিন্তু আমার মনে একটা খেদ থেকে গেল। বুড়ীর লেবুগাছটা রাখতে পারলাম না।

—উপায় কি? আমাদেরকেই চলে আসতে হলো! আজ গিয়ে দ্যাখো, কোথায় কি ছিলো চিনতেই পারবে না!

—তোমার দত্তমশায় তো রয়ে গেলেন।

—তাঁর অবস্থা তো বুঝতে পারছি। তিনি এখন ছেলেদের হাতে। বেশিদিন বাঁচবেন বলেও মনে হয় না।

ইহার পর মনোরমা আর কিছুই বলিতে পারিল না, তাহার কথা বন্ধ হইয়া গেল।

১৩

কলিকাতায় আসিয়া হরিদাস হাঁপাইয়া উঠিয়াছে। তাহার মন পড়িয়া আছে মহানন্দপুরে। কত জমি খোঁড়া হইল, কত বাড়ী ভাঙা হইল—ঘড়া ঘড়া মোহর কোথায় চাপা পড়িয়া রহিল কে জানে! আজো সে মোহরের কথা ভুলিতে পারে নাই। ঘাটবন্দরের জঙ্গলে নাই বলিয়া কি কোথাও নাই? কি জানি, সে থাকিলে হয়ত এতটা অবহেলা হইতে পারিত না। ছোটবাবু কি সেইভাবে খুঁজিবে? মোহর আছে বলিয়া তিনি বিশ্বাসই করেন না! পিসিমা সবই বলিয়াছে, কিন্তু নির্দিষ্ট জায়গা বলিতে পারে নাই। গোল তো সেইখানেই বাধিয়াছে। পিসিমাকে আসিয়া বলিল, একবার মনে করে দ্যাখ দেখি, জায়গাটার হদিস করতে পারো কিনা?

—আরে সে কি আর আছে?

—কিন্তু ছোটবাবু যে বললে—

—সে কি আজকের কথা রে! সে সব মাটির সঙ্গে মিশে গিয়েছে।

—দূর পাগল! সোনা কখনো মাটি হয়?

—তুই কদিনের ছেলে, কতটুকু জানিস? মাটি থেকেই সোনা হয়—আবার সেই সোনা মাটিতে গিয়ে মেশে। এইসব কথা শুনিতে শুনিতে হরিদাসের মাথা গুলাইয়া যায়।

হরিদাস দত্তবাড়ির কতটুকুই বা জানে! জানিবার ইচ্ছা করে। কিন্তু কে বলিবে পুরানো ইতিহাস? কদিনের জন্য আসিয়া মরিস সাহেব সুড়ঙ্গ-পথের কথা বলিয়া গিয়াছেন। সুড়ঙ্গ নিশ্চয়ই অকারণে নির্মিত হয় নাই! ভাঙিবার সময় কে ইহা লক্ষ্য করিবে? তাহারা ভাঙিতে আসিয়াছে, ভাঙিয়াই যাইবে। তাহারা আবিষ্কারের মন লইয়া আসে নাই—সে দৃষ্টিও তাহাদের নাই। মনে হয়, একবার ছুটিয়া গিয়া সে ছোটবাবুকে ঐ সুড়ঙ্গের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া আসে। এসময় কলিকাতায় আসিয়া সে কি ভুলই করিয়াছে!

হরিদাসের মন ব্যাকুল হইয়া উঠে—দত্তমশায়কে আসিয়া সেকথা জানায়।

দত্তমশায় হাসিয়া বলেন, তোমার যে আমার সেই শালার মতো অবস্থা হ'লো। আমার শ্বশুরবাড়ি ছিল মুর্শিদাবাদে। ছোটবেলায় সে ছিল খুব ডাংপিটে—ভয় কাকে বলে জানতো না। প্রাচীন শহর। জঙ্গলের মধ্যে কত বাড়ীর ভগ্নাংশ ইতস্ততঃ ছড়ানো রয়েছে—তার ইতিহাস সংগ্রহ করা যতীনের একটা কাজ ছিল। জাফরগঞ্জে মীরজাফরের বাড়ির ধ্বংসাবশেষ আজো আছে। নির্ভয়ে যতীন সেই বাড়ির মধ্যে একদিন ঢুকলো। একটা সুড়ঙ্গের সন্ধান পেয়ে তার কৌতূহল হলো। খবর নিয়ে জানলো, এই পথ খোসবাগে সিরাজের কবর পর্যন্ত গিয়েছে। এই যে তার মাথায় ঢুকলো—ভূত চাপলো! রাতদিন ঐ এক চিন্তা।

একদিন সে সত্যই নাম্‌লো। গুঁড়িমেরে সে সিরাজের কবরের পাশে এসে বসলো। দেখলো, উপেক্ষার মতো পড়ে আছে এই কবর। একটি মাটির প্রদীপ জ্বেলে দেবার লোকও সেখানে নাই! হায়রে, বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলা—মৃত্যুর পরেও পেলো না তার যোগ্যমর্যাদা। অতবড় ভূখণ্ডের মালিক হয়েও তাকে নিতে হ'লো আলিবর্দ্দির সমাধির পাশে স্থান?

প্রাচীরের ওদিকটায় একটি মুসলমান যুবক চুপ করে বসে আছে। পরনে ঢিলা পায়জামা ও গায়ে মিরজাই। টক্ টক্ করছে গায়ের রং। যতীনকে সেইদিকে আসতে দেখে যুবকটি উঠে দাঁড়ালো।

যতীন বললে, তোমাকে তো এতক্ষণ দেখিনি—কোথায় ছিলে তুমি?

—আমি এখানেই থাকি।

—সর্বনাশ! এই জঙ্গলে? তোমারই ওপর বুঝি এই বাগানের ভার আছে?

যুবকটি হেসে উত্তর দিলে, এ আমারই এলাকা।

হঠাৎ মনে হ'লো, কবরের পিছনটায় কারা যেন খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো।

যতীন বুঝলো যুবকটি সপরিবারে এর কাছাকাছি কোথাও থাকে।

যুবকটি অনেক কথাই বললো : এদেশের মাটি ছেড়ে যেতে পারি না। এই মাটিতেই আছে আমার দাদুর কবর, আমার স্ত্রীর কবর—

হঠাৎ একটা দমকা বাতাসের সঙ্গে গোলাপের গন্ধ ভেসে এলো।

যতীন অবাক হয়ে বাগানের চারিদিক দেখে। শূন্য বাগান খাঁ খাঁ করছে, কোথাও একটি গাছ নাই—অথচ মনে হলো কোথায় যেন অজস্র ফুল ফুটে আছে।

ঝির ঝির ক'রে জল পড়ার শব্দে যতীনের কান খাড়া হ'য়ে ওঠে। অস্পষ্ট শব্দ কিন্তু যতীন বেশ বুঝতে পারে—বুঝতে পারে, কারা যেন সেই জল-ধারায় স্নান করছে।

যুবকটি নিজেই উত্তর দেয়, ফোয়ারার জলে মেয়েরা স্নান করছে।

—সে না হয় বুঝলাম, কিন্তু এমন মিষ্টিগন্ধ কোথা থেকে আসে? এ বাগানে তো ফুলের নাম-গন্ধও নেই। পিছনে কি তোমার বাগান আছে?

যুবকটি হাসলো। বললো, এ গোলাপজলের গন্ধ। এই গন্ধের লোভে অনেক হতভাগাই যায় ওদিকে এগিয়ে—যারা যায়, তারা আর ফিরে আসে না। কালো কালো হাবসিরা দিচ্ছে পাহারা।

যতীনের বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো। ভালো ক'রে যুবকটির মুখের দিকেও পারলো না চাইতে। বললে, আমি চললাম, থাকো তুমি তোমার ঐশ্বর্য নিয়ে।

যুবকটি চুপ এগিয়ে এসে যতীনের হাত ধরলে—তুহিন-শীতল স্পর্শ!

যতীন চমকে উঠে হাত ছাড়াতে গেল। পারলে না।

যুবকটি বললে, দেখতে এসেছ সিরাজের দেশ—না দেখেই চলে যাবে?

যতীন অতিকষ্টে উচ্চারণ করে, আমার যা যা দেখবার দেখা হয়ে গিয়েছে।

—দেখেছো? সিরাজের প্রাসাদ দেখেছো? দেখেছো, মতি ঝিল, হীরা ঝিলের স্বপ্ন-পুরী?

যতীন সাহস সঞ্চয় করে বলে, সে কি আর আছে?

যুবকটি হাসে। বলে, আছে আছে—জগতে কিছুই হারায় না বন্ধু!

যতীন বিস্ফারিত চোখ নিয়ে এদিক-ওদিক চায়। সবই যেন তার চোখে অন্ধকার হয়ে নেমে আসে।

একদল হাবসি এসে যতীনকে ডেকে নিয়ে গেল।

সাত-মহলা সিংহ-দরজা পার হয়ে যতীন যেখানে এসে দাঁড়ালো, তারই পাশ দিয়ে চলে গিয়েছে উপরে যাবার সিঁড়ি। সিঁড়ির দুধারে হাবসি-সৈন্য উন্মুক্ত-কৃপাণ হাতে আছে দাঁড়িয়ে—কালোপাথরে খোদাই-করা মূর্তি যেন!

হঠাৎ কানে এলো বহুলোকের গুঞ্জন। হাবসি বললে, মীরজাফরের বিচার হচ্ছে।

—মীরজাফর! যতীন তার মনের অতলে হাঁতড়ে বেড়ায় এই নাম। ভুলবার নয়, ঐতিহাসিক নাম।

যতীন জানবার চেষ্টা করে, কিসের এই বিচার—কেই বা বিচারক।

বিচারকের আসনে বসে আছে—

যতীন চমকে ওঠে! এযে পরিচিত ছবি—কতবার করে দেখেছে ইতিহাসের পাতায়—মানুষের আঁকা ছবি কি এমন জীবন্ত হয়?

যতীন নিজের কানে শুনলে, বাংলার নবাব সিরাজদ্দৌলার বজ্রগম্ভীর স্বর—জাফর আলি!

দরবার-কক্ষে সেই স্বর যেন আছড়ে পড়লো—'তুমি শুধু দেশের কলঙ্ক নও, তুমি সমগ্র মানব জাতির কলঙ্ক। তুমি শুধু আজকের নও—তোমাকে দেখেছি, রাবণরাজার অন্তঃপুরে—তোমাকে দেখেছি, পৃথ্বীরাজের সঙ্গে—দেখেছি রাণা প্রতাপের ঘরে—তুমি আছো এবং থাকবে। মানুষ বারবার ভুল করবে এবং তোমাকে নিয়েই রচনা করবে নব নব ইতিহাস। তুমি সারা জগতের হাহাকার—

হাবসিরা কোথাও বেশিক্ষণ দাঁড়াতে দেয় না। তারা নিয়ে গেল গোলঘরে। এই গোলক-ধাঁধায় বন্দীদের দেওয়া হয় ছেড়ে। তারা বেরুবার পথ পায় না—মুক্তির ব্যাকুলতায় একই চক্রে বারবার করে ঘোরে।

যতীনের সর্বশরীর ঘেমে উঠলো। বললে, আমাকে বাইরে নিয়ে চলো।

সুড়ঙ্গ-পথ দিয়ে চলে যতীন। সুড়ঙ্গের পর সুড়ঙ্গ—

যতীন এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ালো। হাবসিরা ধমক্ দিয়ে বলে, দাঁড়িও না—চলে এসো, অনেক হতভাগ্য ঐ লোভে প্রাণ হারিয়েছে।

নবাবের কোষাগার—অন্ধকার-সুড়ঙ্গ-পথকে আলোকিত করে রেখেছে এই ধনাগার। যতীন পাগলের মতো বলে, ওগুলো জলছে কি হীরা-জহরৎ?

হাবসি ধমক্ দেয়, এগিয়ে চলো! যতীন পাগলের মতো ছোটে।

হাবসি-প্রহরী কাছে এসে ডাকে, বাবুজি, মাথা ঠাণ্ডা করো। তোমার মতো অনেকেই এই লোভে চেয়েছিল খোসবাগের ঘাটে নৌকো ভেড়াতে—তারা পারেনি। কত নৌকো ডুবেছে এই খোসবাগের দরিয়ায়—তোমারই মত সব তরুণ যুবক, টাট্‌কা ফুলের মতো চেহারা। আজো তারা কেঁদে কেঁদে ঘুরে বেড়ায় এই খোসবাগের বালুচরে।

সুড়ঙ্গ-পথের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়ালো হাবসিরা। বললে, এবার, যাও বাবুজি, আমাদের যাবার হুকুম নাই। কিন্তু খবরদার, এ পথে আর ফিরে এসো না।

—কিন্তু মীরজাফরের কি হলো, দেখা হলো না।

—নাই বা দেখলে। মীরজাফর কোনোদিন মরে না। সর্বকালে, সর্বদেশে—তোমাদেরই মতো মানুষের মধ্যে থাক্‌বে বেঁচে।

—এ কি ভগবানের অভিশাপ!

হঠাৎ বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দে হাবসির হাতের আলো গেল নিভে। বললে, পালাও, সামনেই সিঁড়ি। দেখতে দেখতে হাবসিরা সেই অন্ধকারেই মিলিয়ে গেল। যতীন প্রাণভয়ে ছুট্‌তে ছুট্‌তে সিঁড়ির ওপরেই আছড়ে পড়লো।

সকালবেলায় গোঁ গোঁ শব্দ শুনে তার বিছানার কাছে ছুটে গেলাম। দেখি, তার মুখ দিয়ে ফেনা কাট্‌ছে। জ্ঞান হলে সে এই কাহিনী বললে।

দেখছি, তোমার ঘাড়েও যতীনের ভূত চেপেছে। খবরদার, ও চিন্তা ছেড়ে দাও—ওতে মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। তুমি গোপীনাথের পুজো করছো, তোমার লোভ হবে কেন?

হরিদাস আসিয়া গোপীনাথের চরণে লুটাইয়া পড়িল।

১৪

ইহার পর হইতেই হরিদাসের অদ্ভুত পরিবর্তন দেখা গেল। সে সম্পূর্ণরূপে বদ্‌লাইয়া গেল। তাহার এই পরিবর্তন সকলকেই বিস্মিত করিল। সে সারাক্ষণ গোপীনাথের সম্মুখে বসিয়া তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া সর্বক্ষণ বসিয়া থাকে। কি যে দেখে সেই জানে! সর্বদাই কীর্তনের কলি তাহার মুখে লাগিয়াই আছে। আগেও গাহিত, কিন্তু এখন সে গাহিতে গাহিতে তন্ময় হইয়া যায়।

বঁধু কি আর বলিব তোরে।
অলপ বয়সে, পিরীতি করিয়া,
রহিতে না দিলি ঘরে॥

অপূর্ব সুরের অতুলনীয় পদাবলী কীর্তন। গানের প্রথম কয়েক কলি গাহিতেই হরিদাসের দুই চোখ সজল হইয়া আসে। মানসপটে ফুটিয়া উঠে শ্রীরাধার অপরূপ মূর্তি। যাহা দেখিবার জন্য সারাদিন ব্যাকুল নয়নে পথের দিকে চহিয়া থাকিতেন রাধামাধব।

পিসিমাও মুগ্ধ হইয়া হরিদাসের গান শোনেন। বলেন, আহা, ঐ নিয়েই আছে, বেশ আছে—মা-মরা ছেলে। সন্ধ্যা হইলেই জপের মালা লইয়া পিসীমা আসিয়া বসেন। বলেন, একটা গান শোনা হরিদাস!

হরিদাসের কণ্ঠে গান যেন লাগিয়াই আছে। সে গাহিল:—

"সই, কেবা শুনাইল শ্যাম নাম।
কানের ভিতর দিয়া, মরমে পশিল গো,
আকুল করিল মোর প্রাণ—"

মধুরভাবে বিভোর হরিদাস। সে ভুলিয়া গিয়াছে স্থান কাল সবকিছু।

না জানি কতেক মধু, শ্যাম নামে আছে গো,
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।
জপিতে জপিতে নাম, অবশ করিল গো,
কেমনে পাইব সই তারে।

গান শুনিতে শুনিতে পিসীমার চোখেও জল আসিয়া পড়িল। গান তিনি অনেক শুনিয়াছেন, কিন্তু কাহারও মধ্যে দেখেন নাই এমন কৃষ্ণপ্রেম।

গান থামে একসময়। হরিদাসের দুই চক্ষু বহিয়া ঝরিতেছে তপ্ত অশ্রুধারা। উদাসীন দৃষ্টি। দেহ নিঃসাড়।

এইসময় আসিয়া দাঁড়াইলেন নীলাম্বর দত্ত। অনেকক্ষণ ধরিয়া দেখিলেন হরিদাসকে। ডাকিলেন, হরিদাস!

হরিদাস একবার চাহিয়া দেখিল মাত্র।

দত্তমশায় বলিলেন, কি দেখছো অমন করে?

—দেখছি রাধার নয়নে ধারা।

নিকটেই ছিলেন হরিদাসের পিসিমা। বলিলেন, এই নিয়েই আছে, সবাই বলে পাগল হয়েছে। আমি তো ভেবে মরি।

দত্তমশায় বলিলেন, বেশ আছে হরিদাস। সব ভুলে বসে আছে। আমিও যদি অমনি সবকিছু ভুলতে পারতাম।

—গোপীনাথের সংসার নিয়েই আছে। সকাল থেকে আমারও খাটুনির বিরাম নাই। কিছু ত্রুটি হ'লেই বকুনি। বলে, গোপীনাথের পাট সেরে তবে অন্য কাজ করবে।

হরিদাসের এ-মূর্তি নীলাম্বর কখনো দেখেন নি। মানুষ কত শীঘ্র বদ্‌লাইয়া যায়—সম্পূর্ণ আর এক মানুষ যেন! কেন হয়, কি করিয়া হয়—ইহার প্রয়োজনীয়তাই বা কি, কে বলিয়া দিবে?

নীলাম্বর চলিয়া গেলে, পিসীমা গোপীনাথের পূজার ব্যবস্থা করিতে বসিলেন। বধূরা আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আজ দেশে থাক্‌লে এতক্ষণ হৈ-চৈ পড়ে যেতো। আমাদেরই কি কাজের অন্ত থাকৃতো!

পিসীমা বলিলেন, কেন আজ কি?

বড় বৌ হাসিয়া বলিল, পিসিমাও কি কলকাতায় এসে সব ভুলে গেলেন? আজ যে পৌষ সংক্রান্তি। পৌষ-পার্বণে পিঠেপুলীর কথা মনে নেই আপনার?

—মনে নেই আবার। কেন, এখানে হতে কি বাধা আছে? কলকাতার লোক কি পিঠে খায় না? তুমি আয়োজন করো। আমি জোগান্ দেবো। গোপীনাথকে পিঠে না দিলে হয়!

পিসীমার মনে পড়ে, এই পৌষ-পার্বণের পূর্ব হইতেই এ-পাড়া সে-পাড়া হইতে চাষী বালকের দল গান গাহিয়া পাড়ায় পাড়ায় চাল ও গুড় সংগ্রহ করিতে আসিত। পোড়া শহরে সেসব কিছু আছে?

—কেন, সিনেমা আছে পিসীমা। কলকাতা হলো সিনেমার দেশ। বলিয়া বড় বৌ হাসিল।

—তা যা বলেছো বৌমা! কি যে দেখে ওরা ওর মধ্যে! আমি একবার দেখেছিলাম—ঠাকুর-দেবতার পালা হচ্ছে শুনে গেলাম। তা বসতে পারলাম না বৌমা, রাধার ঐ নাকি সুর শুনে পালিয়ে এলাম।

বড় বৌ হেসে গড়িয়ে পড়লো।

পিসীমা বলিলেন, তোমাদের রান্নার যোগাড় কতদূর কি হয়েছে?

—কিছুই হয়নি পিসীমা!

—চলো, আমিও যাই। আজ একাদশী, বিধবাদের খাওয়া নাই। গোপীনাথের ভোগের সামান্য কিছু রেঁধে দিলেই হবে।

বড় বৌ বলিল, পিসীমা, ছোট বৌ বলছে সে আজ ঠাকুরভোগ রাঁধবে।

পিসীমা বলিলেন, ভালই তো। গৃহ-প্রতিষ্ঠিত গোপীনাথ, তাঁর সেবা তো করতেই হয়। তুমিই ভোগ রান্না করো ছোট বড়ি ভাজা, একটা তরকারি—আর যা হয় করো। ভোগে তিনপদ রান্না দিতে হয়।

বড় বৌ বলিল, পিসিমা, আজ একাদশীর উপবাস, রাতে আমার খেয়াল হয়নি। আপনি শোবার আগে জল খেলেন না কেন?

—খেয়েছি বই কি বৌমা! তুমি যে আমাকে তোমার বাপের বাড়ীর পাকা কুমড়ার মেঠাই শিলে ছেঁচে তুলো তুলো ক'রে কৌটো ভরে দিয়েছিলে, শেষ রাতে তোমার ঘরের যখন বাতি নিবৃলো তখন তার এক খাব্‌লা বাতাসা দিয়ে খেয়ে এক ঘটি জল খেয়ে নিয়েছি।

ছোট বৌ তরকারির ডালা লইয়া বসিল। পিসীমা চিড়ার মোয়ার গুড় চড়াইয়া দিলেন। খেজুর গুড়ের গন্ধে সারা বাড়ী মৌ মৌ করিতেছে। মনে পড়িয়া গেল, দেশের বাড়ীতে এতক্ষণ পৌষ-পার্বণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। হিন্দুর পাশাপাশি থাকিয়া সেখানকার মুসলমানেরাও পৌষ-পার্বণ পালন করিতে শিখিয়াছে। অবশ্য তাহারা রকমারি পিঠা করিতে জানে না। জানিলেও সাধ্যে কুলায় না। তাহারা করে ধামা ধামা সরাপিঠে। রাঙা আলু সিদ্ধ করিয়া পুলিপিঠার মধ্যে পুর দিয়া গুড়সংযোগে সিদ্ধ করিয়া খায়। তাহারা গরীব, নারিকেল কিনিবার পয়সা তাহাদের নাই। তবু তাহারাও পিঠা করিয়া খায়। ঘর দ্বার পরিষ্কার করে। ছেঁড়া কাপড়

সাজিমাটি দিয়া কাচিয়া লয়। লক্ষীমাস, মা লক্ষী সকল জাতিরই দেবতা। তিনি বিমুখ হইলে অনাহারে প্রাণ দিতে হইবে। ভক্তিতে না হোক, ভয় সকলেরই আছে। ভয়ের জন্যই সকলে পৌষপার্বণ না মানিয়া থাকিতে পারে না।

ছোট বৌর এবারে তরকারি কোটা হইয়াছে। এখন স্নান করিয়া গোপীনাথের ভোগ রাঁধিতে যাইবে।

পিঠা দেখিয়া হরিদাসের আনন্দ আর ধরে না। সে হাসিয়া বলিল, কলকাতায়ও তাহ'লে পিঠে হয়?

পিসীমাও হাসিলেন। বলিলেন, 'ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে'।

১৫

পূজার ছুটিতে গাঁয়ের ছেলেরা বাড়ি আসিল। কাঙালী তাহাদের ডাকাইয়া সকল কথাই বলিল। এবং ইহাও বলিল, তোমাদের কাছে আমরা অনেক আশা রাখি। আমরা বুড়ো হয়েছি, খাটবার শক্তি নাই। এককালে আমরাও অনেক করেছি, আজ শুধু টাকা দিতে পারি—

—ঠিক আছে জেঠামশায়, আমরা ভার নিলাম। তবে একটা কথা ঐ সঙ্গে বলে রাখি, আমরা যা করবো তাতে কেউ বাধা দেবেন না।

—নিশ্চয়। তোমাদের নতুন চোখ—তোমরা ইচ্ছামতো একে গ'ড়ে তোলো। নতুন শঙ্করপুকুর হবে তোমাদেরই সৃষ্টি। ছেলেদের উৎসাহ দেখিয়া, কাঙালী তাহাদের হাতে কিছু টাকা দিলেন। বলিলেন, যখন প্রয়োজন হবে, কোনো সংকোচ না ক'রে আমার কাছে এসে টাকা চাইবে।

কাজ অবশ্য ধীরে ধীরে আগাইতে লাগিল। সম্পূর্ণ করিতে হইলে আরো অনেকগুলি ছুটির প্রয়োজন। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এই কয়দিনের মধ্যে তাহারা দুর্গোৎসবের ব্যবস্থাও করিয়া ফেলিয়াছে। ছেলেরা নিজেরাই মেরাপ বাঁধিয়াছে, নিজেরাই শহর হইতে প্রতিমা আনিয়াছে। কাঙালীর প্রথম স্বপ্ন সফল হইল, শঙ্করপুকুরে বোধনের বাজনা বাজিল।

ছেলেদের উৎসাহ বাড়িয়া গেল। বলিল, গাজনের মেলা বসাইতে তাহারা ছুটি লইয়া আসিবে। পূজার কয়দিন খুব আনন্দেই কাটাইল। কাঙালীর মেয়ে, তাহার জামাইও আসিয়াছে। মঙ্গলা বহুদিন পরে গ্রামে আসিতে পারিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

সে বাগানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এটা-ওটা দেখিতে লাগিল। দেখিল, রান্নাঘরের পিছনে এক জোড়া নারিকেল গাছে এবার প্রথম ফল ফলিয়াছে। এদেশে ভাল নারিকেল ফলে না। মনোরমা এই গাছের জন্য কম যত্ন করিয়াছে! গাছের গোড়ায় ঝুড়ি ঝুড়ি পুঁটি মাছের ক্ষার আর রাশি রাশি নুন ঢেলেছে, তবে ফল ফলেছে। ফিঙে পাখীরা বাসা বাঁধিয়াছে নারিকেল গাছে। তাদের কি চিৎকার! মঙ্গলা তাহাদের চেঁচানো দেখিয়া আনন্দে হাততালি দিয়া উঠিল।

কাঙালী আসিয়া মঙ্গলাকে নূতন পুকুর, দেখাইতে লইয়া গেল। পুকুর দেখিয়া মঙ্গলার আনন্দ আর ধরে না। ইচ্ছা করে একটা ডুব দেয়, কিন্তু মা বারণ করিয়া দিয়াছে, নতুন জলে স্নান করিস না। তাই সে ইচ্ছা দমন করিল। বলিল, মাছ ছেড়েছো তো বাবা?

—হাঁ, বড় হ'লে তোকে পাঠিয়ে দেব।

ষষ্টিচরণ জানাইল, এবার যাইতে হইবে, ব্যবসার ক্ষতি হইতেছে। সত্যই তো, যাহারা দিন আনে,দিন

খায়—তাহাদের বসিয়া থাকা চলেনা। ব্যবসা করিতে বসিলে পুরাদস্তুর মাড়োয়ারী হইয়া যাইতে হইবে তাহারা বসিয়া থাকিতে জানে না। বেড়াইতে বাহির হইলেও 'ভাও বাৎলায়।' আর এইজন্য উন্নতিও করে ব্যবসা তাহাদের মতো কেহ বোঝে না, যতই বাঙালীরা গর্ব্ব করুক। নহিলে কোন্ মুলুক হইতে আসিয় বাংলাদেশ জুড়িয়া রাজত্ব করিতেছে। অর্থের জন্য তাহারা এমন পাপ নাই যে করিতে পারে না। তাহারা আপন সন্তানকে টাকা দিতে হইলে কর্জ হিসাবে দেয়। তবে হঁা, তাহাদের গুণও আছে। তাহারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পরিশ্রমী। মেয়েরা দিবা-নিদ্রা কাহাকে বলে জানে না। তাহারা জাঁতা-পিষিয়া, ডাল বাছিয়া, মসলা বাছিয়া, গোরুর সেবা করিয়া সময় কাটায়। তাহারা নিজেরা ভাল খায়, অপরকে বিষ খাওয়ায়। এ প্রকৃতি বাঙালী মেয়েদের নাই। তাহারা অলস—কাজ করিবার ভয়ে অনায়াসে তাহারা নোংরা খাদ্য গলাধঃকরণ করে।

কিন্তু ইহা কি চিরকালই ছিল? এই মেয়েরাই তো একা ভোজ-বাড়ীর হাঁড়ি ঠেলিয়াছে। সংসারে কে কতটা কাজ বেশি করিল তাহার হিসাব রাখে নাই। তবে কেন এমন হইল? ইংরাজিশিক্ষাই আমাদের কাল হইয়াছে। উহাদের মধ্যে এ-বিষয় আজো প্রবেশ করে নাই।

কাঙালীর মেয়ে-জামাই চলিয়া গেল। এক বস্তা লাল চাল—যাহা মঙ্গলা ভালবাসে, তাহা সে যাইবার সময় লইতে ভোলে নাই।

কয়েকদিনের উৎসব শেষ করিয়া কাঙালী মন-মরা হইয়া রহিল।

বিকালের দিকে মুখুজ্জে আসিল। বলিল, আজ চেয়ে চেয়ে দেখছিলাম শঙ্করপুকুরের দিকে। কি ছিল একবার ভাবো দেখি, শুধু ডাঙ্গাজমি ধূধূ করছে—আর ছিল নাবাল-জমিতে ধানের ক্ষেত। এক ঘর মুসলমান চাষী ছাড়া গাঁয়ে লোক ছিল না। সেচের জন্যে জল নাই—দেবতার কৃপা হলে তবেই ধান হয়। শঙ্করপুকুর তো মজা পুকুর। আজ সেই পুকুরে জল থৈ থৈ করছে। দেখতে দেখতে কত লোক এসে আজ ঘর তুললো। আজ গাঁয়ের শ্রী দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়। এর সবটুকু কৃতিত্ব তোমার। মহানন্দপুর ছেড়ে আসার জন্যে আজ আমার কোনো দুঃখ নাই।

—কিন্তু আমি ভুলতে পারি না মুখুজ্জে! একটা ইতিহাস আজ মরে গেল! খবর পেলাম দত্তবাড়ি ভাঙা হচ্ছে। যারা ভাঙছে—তারা জানলোও না, কি আজ চলে গেল! কতকালের স্মৃতি বহন করছিলো ঐ বুড়ো-বাড়ি! কথা বলতে পারে না, নইলে প্রতিটি দেয়াল আজ চিৎকার ক'রে উঠতো! সেকালের ডাক্‌সাইটে জমিদার ছিলেন মহানন্দ দত্ত—যার নামে আজ মহানন্দপুর গ্রাম।

মুখুজ্জে হাসিয়া বলিল, হাঁ, আমিও শুনেছি—টাকার গদীতে শুয়ে থাক্‌তেন।

—হাঁ, অনেক গল্পই কিংবদন্তীর মতো ছড়িয়ে আছে। কিন্তু যেটা গল্প নয়, সেই কথাই বলি শোনো। কাছারি-বাড়ির পিছনটায় ছিল প্রকাণ্ড একটি 'হল-ঘর।' যেটাকে ওরা বলতো 'নাচঘর।' কর্তামশায় মারা যাওয়ার পর সে-ঘর আর খোলা হয়নি। সাহেবসুবোরা আসতো এই ঘরে আমোদ-আহ্লাদ করতে। বড় বড় বাক্‌স-ভরতি মদ থাকতো তাদের জন্যে। কর্তামশাই তো রাতদিন মদেই ডুবে থাকতেন। একদিকে বাঈজীদের নাচ, আর একদিকে সাহেবদের হুল্লোড়! অন্দরের সঙ্গে জমিদারের কোনো সম্পর্কই ছিল না—নাচঘরও ছিল অন্দর থেকে বিচ্ছিন্ন। অতবড় বৃহৎ সংসার চলতো গৃহকর্ত্রীর তত্ত্বাবধানে। সেকালের একান্নবর্তী পরিবার। জমিদার-বাবুরা ছিলেন সাতভাই। তাঁদের প্রত্যেকের স্ত্রী-পুত্র-পরিবার—দাস-দাসীর সংখ্যাও কম নয়। দুবেলায় পাতাই কি কম পড়তো! আর ব্যবস্থাও ছিল সুন্দর। কলের মত কাজ হয়ে যাচ্ছে। সন্ধ্যার আগে দাস-দাসীরা প্রত্যেক ঘর বারান্দা ধুয়ে মুছে চলে যাচ্ছে, বাতিদার ঘরে ঘরে আলো জেলে দিয়ে যাচ্ছে—এর কোনো ব্যতিক্রম নাই।

—তুমি এসব শুনলে কার কাছ থেকে? মুখুজ্জে বলিল।

—আমি ঠিক লোকের মুখেই শুনেছি। নীলাম্বর দত্ত খুব চাপা। বলেন, এসব গল্প না করাই ভাল। কি ছিল আর কি নাই, তার হিসাব-নিকাশ করে আজ কি হবে? এ তো বংশের গৌরব-কথা নয়। মহানন্দ দত্ত ছিলেন ধন-কুবের। টাকা থাক্‌লে যা হয়—সেকালের জমিদাররা তো এমনি করেই উচ্ছন্নে গিয়েছে। নাচঘরেই পড়ে থাকতেন। সাহেবরা এসে 'বাহবা' দিতো। জমিদারের অহংকার স্ফীত হয়ে উঠতো। সাহেবদের খানাপিনার জন্যে এক বাবুর্চি ছিল। জমিদারের আহার-পর্বও এইখানেই সমাধা হতো। 'মরিয়ম' বলে এক বাঈজী ছিল, রূপের জোরে সে জমিদারকে বশ করেছিলো। কিন্তু এই বশ করাই কাল হলো!

—সর্বনাশ!

—এক সাহেব মরিয়মকে লুঠ করার সংকল্প করলো। সাহেবের পরামর্শে মরিয়ম তখন জমিদারবাবুকে প্রচুর মদ গেলাচ্ছে। জমিদারবাবু তখন শুয়ে পড়েছেন। সাহেব মরিয়মের হাত ধরতেই সে খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠলো। মহানন্দ দত্ত সিংহের মতো গর্জন করে উঠলেন। পকেট থেকে পিস্তল বের করে দুজনকেই গুলী করলেন।

চিৎকার মুখুজ্জেও করিয়া উঠিল। বলিল, তুমি ইতিহাস বলছো কি কাঙালী, ওতো খুনেবাড়ি!

কাঙালী হাসিয়া বলিল, তা তুমি যে নামই দাও। ও বাড়ি আজ খাড়া থাক্‌লে ইতিহাসই বহন করতো।

—কিন্তু দত্তমশায় জেনেশুনে এতকাল ও বাড়িতে বাস করলেন কি করে? দু-দুটো অপঘাত মৃত্যু—কিছুই কি শোনেন নি কোনোদিন?

—হাঁ শুনেছেন। এক রাত্রির কথা বলি। তখন দত্তমশায় যুবক। ষষ্ঠিতলায় যাত্রা শুনে যখন বাড়ি ফিরলেন তখন গভীর রাত্রি। নাচঘরের পাশ দিয়ে আসছেন, হঠাৎ শুনতে পেলেন ঘরের মধ্যে নাচ হচ্ছে। প্রথমটা তিনি বুঝতে পারেন নি, ভাবলেন, যাত্রাগানের রেশ তাঁর কানে ঝম্‌ ঝম্‌ করছে। কিন্তু তাতো নয়, এ যে স্পষ্ট ঘুঙুরের আওয়াজ! দরজায় কান পাতলেন—আওয়াজ স্পষ্ট হয়ে উঠ্‌লো—ঝম্‌ ঝম্‌ ঝম্‌—

দত্তমশায় আর কোনোদিন ও পথ মাড়ান নি। পরিত্যক্ত হয়েই পড়েছিল এতকাল। এ ঘটনা বাড়ির আর কেউ জানে না—তিনি কোনোদিন বলেনও নি।

১৫

মহানন্দপুর শহর হইল। ছিল গ্রাম, হইল কোলাহলময় নগর। বড় বড় পীচের রাস্তায় যখন একসঙ্গে আলো জলিয়া উঠে, তখন মহানন্দপুরের আদি অধিবাসীরা বড় বড় চোখ করিয়া দেখে। হয়ত উল্লসিতও হয়। অন্ধকার হইতে আলোকে আসিয়াছে, ইহাতো কম কথা নয়! তবে নিয়ত বাস-লরীর ভীড়ে তাহারা বিব্রত হয়। ইহাতে তাহারা অভ্যস্ত নয়। আশ্রয়ের নির্জনতা ভঙ্গ হওয়ার মতো বেদনা যেন তাহাদের নিত্য খচ্‌খচ্‌ করে। তবে শহরের সুখ-সুবিধাও আছে, ক্রমে তাহাদের মন বসিয়া যায়।

এই শহর বানাইতে গ্রামের প্রায় সব বাড়িই ভাঙিতে হইয়াছে। শুধু ভাঙা হয় নাই বিহারীলালের প্রাসাদতুল্য বাড়ি। ভাঙিবার মতো জীর্ণ অবস্থা তো তাহার হয় নাই। তাই অক্ষতই রহিয়া গিয়াছে। বিহারীলাল মল্লিককে ডাকিয়া বলিলেন, যে টাকা ব্যাংকে আছে তা তুলে একটা কাগজের কল কিনবার ব্যবস্থা করো। নলিনাক্ষকে বলো, সেই সব ব্যবস্থা করবে। মাড়োয়ারীরা দুটি কল বসাচ্ছে—চটকল আর চালকল। আমি করবো কাগজের কল—একমাত্র বাঙালী প্রতিষ্ঠান। ভালো হবে না মল্লিক?

মল্লিক বলিল, খুব ভালো হবে। টাকাটা সত্যিই এবারে কাজে লাগলো।

বিহারীলাল হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, এবারে বুঝতে পারছো, কেন টাকাটা খরচ করতে দি'নি; আর নলিনাক্ষকে বলো, চাকরি ছেড়ে দিয়ে দেশে চলে আসুক। মিলের সকল দায়িত্ব তার হাতে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হবো। এবারে আমার ছুটি মল্লিক।

মল্লিক সেইদিনই কলিকাতায় চলিয়া গেল এবং নলিনাক্ষকে সকল কথা বলিল।

সমস্ত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া কয়েকদিনের মধ্যেই নলিনাক্ষ দেশে ফিরিল। পুত্রকে পাইয়া বিহারীলাল হাতে স্বর্গ পাইলেন।

মাড়োয়ারীর দুইটি কল চালু হইবার কয়েকদিনের মধ্যেই নলিনাক্ষের 'পেপার মিল'ও চালু হইয়া গেল।

কিন্তু সাতদিনের মধ্যেই শ্রমিকরা গোলমাল বাধাইল। তাহারা বলিতেছে, মালিকদের ব্যবস্থা তাহাদের মনঃপূত হয় নাই—টাকার পরিমাণ তাহারা আরও বাড়াইতে চায় এবং বছরে দুইটি করিয়া বোনাস। সুরুতেই তাহাদের এই সুবিধাগুলি করিয়া লইতে না পারিলে, কোনোদিনই আদায় করা যাইবে না। একথা তাহাদের 'ইউনিয়ন'ও বলিয়াছে। মিল স্বতন্ত্র হইলেও শ্রমিকরা এখানে একজোট। কারণ স্বার্থ সকলের এক। এখানে নূতন আসিলেও তাহারা পাকা লোক। কি করিয়া সুবিধা আদায় করিতে হয় তাহা তাহারা ভাল করিয়াই জানে।

কিন্তু মালিকরা ইহাতে সম্মত নয়। কাজেই শ্রমিকরা ধর্মঘট করিয়া বসিল।

আকবর ধর্মঘট করিয়া বুড়া হইয়া গিয়াছে, সে জানে কি করিয়া ধর্মঘট চালাইতে হয়। তাই সে উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিল, 'আমাদের ন্যায্য পাওনা—যা আমরা দাবী করেছি, তা আমাদের চাই!

এ ঘোষণা মালিকদের কানে পৌঁছিয়াছে, কিন্তু তাঁহারা এ পর্যন্ত কোনো জবাবই দেন নাই। মনে করিয়াছেন, দুদিনের চেঁচামেচি আপনিই বন্ধ হইয়া যাইবে।

আকবর অনেক মিলের ধর্মঘট দেখিয়াছে এবং করিয়াছে। তাই সে ভাল করিয়াই জানে, ধর্মঘট শেষপর্যন্ত টেঁকে না। ধনিকের কাছে শ্রমিকের সেই চিরন্তন পরাজয়। তাই সেদিন সে সকলকে ডাকিয়া বলিল, বেশ ক'রে ভেবে বলো, এ-জিদ্ তোমরা শেষপর্যন্ত রাখতে পারবে তো?

সকলেই সমস্বরে উত্তর দেয়: জান কবুল।

গভীররাত্রে তাহার দাওয়ায় বসিয়া তাহারা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিল: জান কবুল।

আকবর সেইরাত্রেই সকলের বাড়ি-বাড়ি গিয়া খবর লইল, কাহার কতদিনের চাল মজুত আছে।

মজুত আর কি। যাহা আছে, কোনোরকমে সাতদিন চলিতে পারে। কেবল ধরম সিং-এর কিছু ঘাটতি আছে।

আকবর তাহাকে কিছু চাল দিলো। বলিল, মনে থাকে যেন ভাই সব—জান কবুল।

মিলের কাজ বন্ধ হইয়া গেল। মিল-মালিকরাও তালা বন্ধ করিয়া দিয়া মজা দেখিতে লাগিলেন। তাঁহারা ভাল করিয়াই জানেন, পেটে টান পড়িলে, আবার তাহারা কাজে আসিবে।

চাল-কলের মালিক গণেশ সারাওগী বলিলেন, আরে ভাই, লুকসান দুপক্ষেরই আছে, মিটমাট কোরে লাও।

—তুমি চুপ করিয়ে থাকো গণেশ, দেখো আমি কি কোরে। বলিলেন, রামজী ভকত।

—ওরা হল্লা করিবে, সে কি ভালো হোবে?

—ওরা হল্লাই ভি কোরবে, আর কুছু পারবে না।

কাগজের কলের মালিক বিহারীলাল বলিলেন, ধর্মঘট কাকে বলে, তা ওরা জানে না। কিছুটা শুনেছে, কিছুটা বা দেখেছে—কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ওদের কারুরই নাই।

গণেশজী বলিলেন, সব সাচ হ্যায়, লেকিন লেবারদের খোশ না রাখলে কাম চলে না।

বিহারীলাল বলিলেন, লেবারদের চালায় কে জানো গণেশজী, এই ধনীদের টাকাতেই ঐ দল পুষ্ট হচ্ছে। অথচ ওরা জানেও না কাদের সঙ্গে লড়াই করছে।

—ঠিক বাত বলিয়েছে।

ননিলাক্ষ বলিল, কিন্তু ওদের দাবী তো অন্যায় নয়। বিহারীলাল হাসিলেন।

—দেশের পনের আনা লোক দু-বেলা পেট ভরে খেতে পাচ্ছে না, সব জিনিসই দুর্মূল্য। ওরা যা কল চালিয়ে পায়, তাতে একজনেরও পেট ভরে না।

—সে আমিও জানি। কিন্তু এতো খেতে না পাওয়ার সুর নয় নলিনাক্ষ!

—হয়ত নয়। আজ কাজ বন্ধ করলে কাল কি খাবে, এমন সংস্থানও হয়ত ওদের কারো কারো নাই –

—এমন অবস্থায় ওরা কাজই বা বন্ধ করে কোন্ সাহসে? এক ইউনিয়নের ভরসায়? কিন্তু ওরা নাচাতে জানে, খাবার চাইলে ওরা গা-ঢাকা দেয়।

—কিন্তু এমনও তো দেখা গিয়েছে, ওরা জয়ী হয়েছে?

—সে আমিও দেখেছি। খবর নিয়ে জানো, তার পেছনে ছিল প্রচুর ধনবল এবং লোকবল। এ নইলে কোনো ধর্মঘটই 'সাক্সেসফুল' হয় না!

নলিনাক্ষ বলিল, যাই হোক, এ-আন্দোলনকে বাড়তে না দিয়ে সময় থাকতে মিটিয়ে নেওয়াই ভাল।

—তোমার কি ভয় করছে?

—এ ভয়ের কথা নয়। আজকের যুগে যে চোখ-রাঙিয়ে কাজ করানো যাবে না, এইটিই আপনাকে বলতে চাই।

চোখ রাঙিয়েই ধর্মঘট ভেঙে দিয়েছে—এও তো জানি

—সে কাল আর নেই।

—কালের কোনো পরিবর্তনই হয়নি। তোমরাই গিয়েছ বদলে। সে ধৈর্য তোমাদের নাই। ক্ষতি হবে বলে একটা বোঝাপড়া করতেই হবে—এ মতবাদে আমার মন সায় দেয় না। লড়াই করতেই যখন ওরা চায়, তখন দস্তুরমত লড়াই হোক।

—ঠিক বলিয়েছেন। লড়াই হোনে দেও। বলিয়া রামজী হাসিলেন।

নলিনাক্ষ বলিল, কিন্তু ওরা তো লড়াই চায় না, চায় পাওনা।

—এ তো চাওয়া নয়, আদায় করার চেষ্টা।

—লেবার-পার্টি আজ যথেষ্ট শক্তিশালী। আপনার মিলের ঐ কজনকে তুচ্ছ ভাবলে আজ চল্‌বে না। সময় থাকতে মিটিয়ে নেওয়াই ভাল।

বিহারীলাল হাসিলেন। বলিলেন, আমি যখন থাক্‌বো না, তখন তোমাদের মতই চলবে।

ধর্মঘটের সাতদিন উত্তীর্ণ হইয়া গেল। কর্তৃপক্ষের কোনো উচ্চবাচাই শোনা গেল না।

আকবর চিন্তিত হইয়া পড়িল। মজুরদের ডাকিয়া বলে, মনে থাকে যেন ভাই সব, সত্যিকার অগ্নিপরীক্ষা এইবার আমাদের সুরু হ'লো। ধৈর্য ধরে আরো সাতদিন অপেক্ষা করো। খাবার যাদের ঘরে নেই, তারা এখান-ওখান থেকে সংগ্রহ করো—যেমন করে পারো, এই সাতটা দিন চোখ বুজে থাকো।

রহিম বলিল, আমরা ঠিক আছি সর্দার। মরার বেশি আর তো গাল নেই—না হয় মরবো।

প্রত্যেকের বাড়ি-বাড়ি গিয়া আকবর খোঁজ লয়, অনেকেরই চাল নাই—যে দুই-একজনের আছে, তাহাতে তাহাদের তিন চার দিন চলিতে পারে। আকবর নিজের ঘর হইতে কিছু চাল উহাদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিল। বলিল, এতেই তোমারা হপ্তাটা চালাও, তারপর তোমাদের যা অবস্থা আমারও তাই।

পাড়ার মধু ভট্টাজ—যিনি আজও মহানন্দপুরে থাকিয়া গিয়াছেন, তিনি বলিলেন, তোদের যে বড় বাড় বেড়েছে রে! বড়লোকের সঙ্গে পারবি কেন? ওদের দু-চার লাখ টাকার ক্ষতিতে কিছু যাবে আসবে না, কিন্তু তোদের যে ভাতে মারবে!

—দেখো কর্তা, এ ইজ্জৎ নিয়ে কথা। আর মরবার কথা কি বলছো হুজুর, আমরা তো মরেই আছি তোমাদের পায়ের তলায়।

মধু ভট্চাজ নরম হইয়া গেলেন। বলিলেন, দেশের অবস্থাও তো ভাল নয়, কেউ যে দু-পয়সা সাহায্য করবে তার উপায়ও নেই। তাই বলছিলাম, কাজটা ভাল করলি না রে!

আকবর বলিল, বিনয়বাবু খবরের কাগজের অফিসে কাজ করে—তেনারে বললাম, তিনি তো বললেন, তোদের কোনো ভয় নাই—খুব গরম গরম ক'রে লিখে দেবেন কাগজে।

—শুধু লিখ্লেই কি আর কাজ হবে রে, পেটের ব্যবস্থা করবে কে?

আকবর হাসিল। বলিল, পেটের ব্যবস্থা কি আমরা করি কর্তা, যিনি করবার তিনিই করবেন।

মধু ভট্চাজও হাসিলেন।

সেদিন ঐ পর্যন্ত। দু-চারদিন বাদে ধরম সিং খবর লইয়া আসিল, বাবুরা আসানসোল হইতে মজুর লইয়া আসিতেছে।

আকবর বলিল, তাতেই বা ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেলে চলবে কেন? আমাদের তো অনেক পরীক্ষা দিতে হবে গো! তবে এও বলে রাখছি ধরম সিং, ও আসানসোলের কাজ নয়। বিনয়বাবু আজ সকালে এসে বলে গেলেন, বোম্বেওলা আমাদের খুব তারিফ করে চিঠি লিখেছে।

ওদিকে গভীর রাতে আকবর চোরের মত ঘরে ঢোকে। কাহাকেও কোনো প্রশ্ন সে করে না—করিতে ভয় করে। ছেলেগুলি নির্জীব হইয়া একপাশে পড়িয়া আছে—বৌটা কয়দিন হইতেই ধুঁকিতেছে। মেঝের উপর কয়দিনের পচা বাসিভাত আর খানিকটা নুন তাহার জন্য ঢাকা দেওয়া রহিয়াছে। একটা কেরোসিনের ডিবা জ্বলিতেছে ঘরের একটি কোণে। আকবর কাহাকেও কিছু না বলিয়া, হাত মুখ ধুইয়া ভাতগুলা গোগ্রাসে গিলিয়া গেল। তাহার পর এক ঘটি জল খাইয়া নিঃশব্দে শুইয়া পড়িল।

ভোর না হইতেই ছেলেমেয়েদের কান্নায় আকবরের ঘুম ভাঙিল। আমিনার মেজাজও আজকাল রুক্ষ হইয়া উঠিয়াছে। কয়দিন চেষ্টা করিয়া এর-ওর বাড়ি হইতে চাল মুড়ি সংগ্রহ করিয়া এখন সে হাল ছাড়িয়া দিয়াছে। নিত্য কে কাহার জন্য করে? ভিক্ষা চাহিলে ভিক্ষা হয়ত এখনো মিলে, কিন্তু তাই বা কাহার দরজায় গিয়া দাঁড়াইবে?

আকবর বিছানা ছাড়িয়া উঠিল। গফুর মিঞা তামাকের কারবার করিতেছে—তাহার টাকাও আছে। জাত-ভাই, তাই অসংকোচে গিয়া তাহার নিকট হাত পাতিল।

সমস্ত শুনিয়া গফুর বলিল, কাজটা ভাল করোনি আকবর। তোমাদের নিত্য অভাব মেটাবে কে? তারপর দশসের চাল আর পাঁচটা টাকা দিয়া বলে, কালথেকে কাজে যাবি, বুঝলি?

আকবর কিছু না বলিয়া চাল আর টাকা কয়টা লইয়া ঘরে আসিল।

আমিনা আবার আজ নূতন করিয়া রাঁধিতে বসিল।

এদিকে উত্তেজনা বাড়িয়াই চলিয়াছে। এখানে-ওখানে খণ্ড খণ্ড জটলা। ধরম সিং-এর পাঁচগণ্ডা পয়সা এখনো কোমরে শক্ত করিয়া বাঁধা আছে। বলে, আমার আবার ভাবনা কি, এক পয়সার ছাতু, একটু নিমক আর এক ঘটি জল—ব্যস্।

এককড়ি বলে, ভগবান আছেরে, ভগবান আছে। ক'দিন তো জ্বরেই কেটে গেল—বিছানায় পড়ে থাকি, আর গোঙাই। খাওয়ার বালাই নাই—বৌটাকে পাঠিয়ে দিয়েছি বাপের বাড়ি। নে এখন, কতদিন ধর্মঘট চালাবি, চালা না!

বসিরুদ্দিনের অনেকগুলি কাচ্চাবাচ্চা। তার উপর বাড়িতে দুইটা বৌ। সম্প্রতি সে একটা নিকা করিয়াছে। বলে, মরতে আমিই মরবো সপরিবারে।

বাহিরের উত্তেজনা ছাড়িয়া ঘরে আসিলেই, উহাদের কলরব স্তিমিত হইয়া আসে। ভুখা বালবাচ্চাদের দিকে তাকাইলেই মনে হয়—কাজ নাই ধর্মঘটে, কালই কাজে যাইব। কিন্তু ভোরের আলো চোখে লাগিলেই সুর বদলায়।

অনেকদিন পর আমিনা পেট ভরিয়া খাইল। ছেলেমেয়েরাও আনন্দ করিয়া খাইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শুধু ঘুম নাই আকবরের চোখে। উদার-উন্মুক্ত আকাশের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আকবরের চোখে জ্বালা ধরিয়া যায়। আর কয়টা দিন যদি সে কাটাইয়া দিতে পারে, তবে জয় তাহাদের অবশ্যম্ভাবী। সে খবর পাইয়াছে, বাবুরাও মিটিং করিতেছে—একটা হিল্লে এবার হইবেই।

আকবর আবার নূতন করিয়া তোড়জোড় করে। সকলের বাড়ি-বাড়ি গিয়া হাতজোড় করিয়া বলে, ক'দিন না খেলে আমরা মরবো না—চালিয়ে যাও।

সকলে সমস্বরে চিৎকার করে: 'ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ'।

ধর্মঘটের পনেরটি রাত্রি প্রভাত হইল। নলিনাক্ষ অন্যান্য মালিকদের ডাকাইয়া বলিল, এবার আমাদের কর্তব্য স্থির করবার সময় এসেছে। যেটা আপনারা সামান্য মনে করে নিশ্চিন্ত ছিলেন, সেটা যে সামান্য নয় এবং আর যে উপেক্ষা করা চলে না এইটিই আমি বলতে চাই।

গণেশজী বলিলেন, আপনি এবার বেপারটা বুঝুন। হামিতো বোলিয়েছে, এ চল্‌নেসে বহুৎ নুক্‌সান। আপনার পিতাজী পুরানা লোক—ঐসা হালচাল আজ কভি চোলে?

নলিনাক্ষ বলিল, স্ট্রাইকারদের ঐ মুষ্টিমেয় সংখ্যাকে নগণ্য মনে করবার কোনো হেতু নাই, একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান ওদের পিছনে। কে বলতে পারে, আজকের এই তুচ্ছ শ্রমিক-আন্দোলন একদিন বড় আকার ধারণ করবে কিনা! কাজেই সময় থাকতে ষ্টেপ নেওয়া উচিত।

এ খবর বিহারীলালের কানে পৌঁছাইল। তিনি নলিনাক্ষকে ডাকিয়া বলিলেন, এত অল্পে তোমরা বিচলিত হও কেন? ক্ষতি অবশ্য হচ্ছে কিন্তু আমার বিশ্বাস, আর কিছুদিন অপেক্ষা করলেই এ ধর্মঘটের অবসান হবে।

—তার কোনো লক্ষণই আজ পর্যন্ত প্রকাশ পায় নি। বরং বাইরে থেকে ওরা সমর্থন পাচ্ছে।

—তোমরা বাইরেটা দেখছো, কিন্তু ভেতরে তাদের ঘুণ ধরেছে। না খেয়ে তারা বেশীদিন লড়তে পারবে না, তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়েছে। আমার বিশ্বাস, তারা আর কয়েকদিন পরে সর্দারের আদেশ মানবে না।

উত্তরে নলিনাক্ষ বলিল, সাধারণভাবে ভাবতে গেলে এইটিই স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। কিন্তু এমনও দেখা গিয়েছে, ওরা প্রাণ দিয়েছে তবু কবুল করেনি।

—তুমি ভুলে যাচ্ছ নলিনাক্ষ, আমার বয়স ষাট।

—শ্রমিকরাও নতুন নয়, তারাও অন্য জায়গা থেকে এসেছে। মজুরদের ধমকে কাজ করানোটাই আপনার জানা আছে, কিন্তু আজ কাজ করাতে হলে তাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে।

বিহারীলাল হাসিসেন। নলিনাক্ষ আর কিছু না বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

একুশ দিন উত্তীর্ণ হইয়া গেল। আশ্চর্যের বিষয় কোন পক্ষই নত হইল না!

না খাইয়া খাইয়া আকবরের ছেলেটা অসুখে পড়িয়াছে। ঘরে কাহারও খাবার নাই। কেহ একবেলা মুড়ি খাইয়া আছে, কেহ কেহ ইহার-উহার বাড়ি গিয়া হাত পাতিতেছে। বৌগুলো উঠিতে-বসিতে গাল দিতেছে। কেহ কেহ দল বাঁধিয়া আকবরের বাড়ি যাইতেছে। বলে চোখের মাথা কি খেয়েছিস বৌ! তোর ছেলেটার কি হাল হয়েছে তাও কি দেখ্‌ছিস না!

আমিনা শুধু কাঁদে! কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ ফুলাইয়া ফেলিয়াছে।

দূরে মিলের চিম্‌নিগুলি দেখা যাইতেছে। তাহাদের বিশ্রী কালো ধোঁয়া নীল আকাশটার মুখখানায় একটু একটু করিয়া কালি মাখাইয়া দিতেছে!

আকবর আসিতেই আমিনা কাঁদিয়া উঠিল: আমাদের বুকে পা দিয়ে মেরে ফেলে তারপর তোমার যা ইচ্ছে হয় করো।

আকবর যেমন নিঃশব্দে আসিয়াছিল, তেমনি নিঃশব্দেই বাহির হইয়া গেল।

বৈকালের দিকে গণেশ সারাওগীকে লইয়া নলিনাক্ষ আকবরের বাড়ি আসিল। নলিনাক্ষের উপর তাহারা উভয়েই ভর করিয়াছে। কারণ তাহারা ভাল করিয়াই বুঝিয়াছে, বৃদ্ধ বিহারীলালের কথায় চলিলে তাহাদের লোকসানের মাত্রা আরও বাড়িয়া যাইবে। বরং নলিনাক্ষ যাহা করিতে যাইতেছে তাহা সকলের ভালোর জন্যই করিতেছে।

মালিককে দেখিয়া আকবর ব্যস্ত হইয়া উঠে—কোথায় টুল, কোথায় মোড়া—

নলিনাক্ষ বলিল, আমাদের জন্যে তোমাকে ব্যস্ত হতে হবে না সর্দার! এখন কাজের কথা বলো।

—বলুন হুজুর! আমরা তো চিরকালই আপনাদের অন্ন খেয়ে আসছি।

নলিনাক্ষ আত্মসংযমী লোক। বলিল, তোমার অর্গানিজেসনের প্রশংসা করি—এমন ধৈর্যের সঙ্গে ধর্মঘটকে এগিয়ে নিয়ে চলেছো—নাঃ, তোমার বাহাদুরী আছে আকবর!

—আজ্ঞে, কি যে বলেন!

—না, এ প্রশংসা তোমার প্রাপ্য। থাক্, কি হ'লে এখন কাজে যেতে পারো বলো দেখি মিঞা?

—আজ্ঞে হুজুর, আমরা তো জানিয়েছি সেকথা।

—কিছু কিছু ছাড়ো—বুঝলে মিঞা!

—সবাইকে বলে দেখবো হুজুর!

—সবাই কে? তুমিই সব। তুমি বললেই ওরা কাজে যাবে।

আকবর একগাল হাসিয়া বলে, কি যে বলেন হুজুর!

—দেখো, আমি যা বলি শোনো—কাজে যাও, কিছু তোমরা ছাড়ো, কিছু আমরাও ছাড়ি।

—সে হয় না হুজুর!

নলিনাক্ষ বহুকষ্টে নিজেকে সামলাইয়া লইল। বলিল, আমরা তোমার বাড়ি এসেছি—অনুরোধ রাখবে না?

—আপনারা বড়লোক। আপনাদের একটু-আধটু ক্ষতিতে কিছু যায় আসে না, কিন্তু আমরা যে হুজুর, না খেয়ে মরবো। না হয়, আমাদেরকেই দয়া করলেন।

—তোমাদের আর সব কোথায়, একবার ডাকো—না হয়, বলে যাই।

—আমরা তো কাজে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েই আছি হুজুর!—একটা জবাব দিন।

—বোনাসের টাকা, যা তোমরা চেয়েছো তা পাবে, কিন্তু হপ্তা বাড়াতে পারবো না।

—তা হ'লে আমরা কি ক'রে যাই হুজুর।

এবার নলিনাক্ষ উত্তেজিত হইল। বলিল, তা হ'লে তোমরা কাজে যাবে না?

আকবর হাসিয়া বলে, আপনারাই তো যেতে দিচ্ছেন না হুজুর!

নলিনাক্ষ আবার স্বর নরম করিল: আচ্ছা তাড়াতাড়ি উত্তর দেবার দরকার নাই—আজ পরামর্শ করো। তবু যাবার আগে বলে যাই, আমার কথা শুনলে তোমাদের ভাল হবে!

আকবর হাসিল।

ওদিকে শ্রমিকদলের জটলা বাড়িয়াই চলিয়াছে। তাহারা সর্বত্র ঘোঁট করিয়া কাজে যাইবার জন্য তৈরী হইতেছে। বলিতেছে, আর কতদিন আমরা অপেক্ষা করিব? যাহারা বলিয়াছিল, তোমাদের কোনো ভাবনা নাই, আমরা পিছনে আছি—তাহারা পিছনেই থাকিয়া গেল, আগাইয়া আসিতে কাহাকেও দেখিলাম না! মরিতে আমরাই মরিব—আকবরের কি, উহার জান শক্ত!

বৈকালেই উহারা মিটিং করিল—আকবরকে বাদ দিয়া। খবর পাইয়া আকবর ছুটিয়া আসিল। বলিল, তোরা আর দুটো দিন সবুর কর—আমাদের মুস্কিলআসান হয়েছে রে! বাবুরা এসেছিলো—তারা কিছু কিছু ছাড়তে রাজি হয়েছে। ওরে, আর দুটো দিন—তোদের পায়ে পড়ি—

—কি বলিস সর্দার! কাচ্চাবাচ্চাগুলো না খেয়ে মরতে বসেছে—তোরও তো আছে রে, গরীব বলে কি কি আমরা বাপ নইরে!

কথা সত্য। আকবরও কয়েকটি শিশু-সন্তানের পিতা। বাপ হইয়া সেও তো চোখের উপর দেখিতেছে, ক্ষুধার জ্বালায় কিভাবে তাহারা ছট্‌ফট্‌ করিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। একটা ছেলে তো তিলে তিলে শুষিতেছে—না আছে পথ্য, না আছে ঔষধ। কিন্তু বাবুরা আসিয়াছে, তাই আকবরের বুকে বল বাড়িয়াছে। আর কয়টা দিন—হে ভগবান!

আমিনা আসিয়া আছড়াইয়া পড়িল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, ওগো, তোমার কি দয়ামায়া নাই? এমনি করে বাছাদের তুমি না খাইয়ে মারবে? সবাই তোমাকে গাল দিচ্ছে, তোমারই জন্যে ওরা কাজে যায় না। এ শাপ তোমার লাগবে গো লাগবে!

আকবর পাষাণের মতো চাহিয়া থাকে শূন্য দিগন্তের পানে—অপলক, অকরুণ!

ছোট ছেলেটা কাঁদিয়া উঠিল। আমিনা ছুটিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল। শুষ্ক স্তন তাহার মুখে গুঁজিয়া দেয়। দুধ নাই—তাহাই কিছুক্ষণ টানে, শেষে ক্লান্ত হইয়া নেতাইয়া পড়ে। রুগ্ন ছেলেটি টিঁ টিঁ করে—কি বলে বোঝা যায় না।

আমিনাও কাঁদে, ছেলেগুলিও কাঁদে—কাঁদে অদৃশ্য ভগবান।

কাঁদে না শুধু আকবর।

এবারে সত্যই তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। ছোট ছোট দল: ঘোঁট করে, জটলা করে, হল্লা করে।

শঙ্করলাল, শুকলাল, রহিম, ঝড়ু, ধরমসিং সকলেই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে : আমরা মানবো না আকবরের কথা।

সুযোগ বুঝিয়া নলিনাক্ষের লোক ইহাদের বুঝাইয়া গেল : তোমরা কাজে যাও, বাবুরা তোমাদের বিষয় বিবেচনা করবেন। পরের কথায় তোমরা উত্তেজিত হ'য়োনা, তারা খেতে দেবে না। এই তো দেখলে এতদিন ধরে—কেউ কিছু করলে না, ওরা তোমাদের শত্রু।

কথাগুলি উহাদের মর্মে গিয়া বিঁধিল। সত্যই তো, কেহই কিছু করে নাই—জান দিতে বসিয়াছে তবু কেহ আহা বলে নাই! খবরের কাগজওয়ালারা শুধু গরম গরম কথাই লিখিতে জানে। ঠিকই বলিয়াছেন বাবুরা, উহারা শত্রু।

সন্ধ্যার দিকে আকবরের ছেলেটা মারা গেল। আমিনা চীৎকার করিয়া আছড়াইয়া পড়িল।

পাড়ার মেয়ে-পুরুষ আসিয়া জটলা করে। সকলেই আকবরকে গাল দেয়।

আকবর পাথরের মতো দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে অনন্ত অসীম আঁধার···

সেই অন্ধকারেও আকবরের চোখ দুটি দেখা যায়—হায়নার চোখ।

ছেলেটাকে খবর দিতে হইবে। আকবর ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়। গফুরের কাছে গিয়া বলে, ভাই, খাবার জন্যে আসিনি, ছেলেটাকে কবর দিতে হবে।

গফুর তিক্তস্বরে জবাব দেয়, কবরের টাকা তুই যেখান থেকে পারিস জোগাড় করগে যা। আমি আর এক পয়সাও দেবো না।

আকবর টলিতে টলিতে রাস্তায় নামে। একবার থম্‌কাইয়া দাঁড়ায়, আবার পথ চলে। বাড়ির কাছাকাছি আসিয়া তাহার পা দুইটি যেন পাথর হইয়া গেল।

আমিনা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছে : তোকে একদিনও পেট ভরে খেতে দিতে পারলাম না রে! তোর অন্ন যারা কেড়ে খেলে, আল্লা যেন তাদের কসুর মাপ না করে।

আকবর সোজা উঠানে আসিয়া দাঁড়াইল। বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ডাকিল, আমিনা, তোর ছেলে শহীদ হয়েছে রে—চোখের জল ফেলে তার অকল্যাণ করিস না। যারা ভীরু, যারা নামে মরদ তারা দাঁড়িয়ে দেখুক, কেমন ক'রে বাপ তার ছেলেকে কবর দিয়ে আসে। বলিয়া, আকবর তাহার মরা-ছেলেটাকে বুকে করিয়া একটা শাবল লইয়া ছুটিয়া আসিয়া রাস্তায় নামে।

রাত্রির অন্ধকারে আকবর হন্‌ হন্‌ করিয়া আগাইয়া চলে কবরখানার দিকে।

প্রাণপণ শক্তিতে মাটি খুঁড়িয়া আকবর কবর বানাইল। তারপর ছেলেটাকে বুক হইতে নামাইয়াই আকবর এতদিন পরে এই প্রথম চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। পাষাণের বাঁধ ভাঙিয়াছে : সে লুটাইয়া কবরের উপর কাঁদিল।

অন্ধকার : কিছু দেখা যায় না। শুধু কালো রাত্রি তাহার ডানা মেলিয়া ওঁৎ পাতিয়া বসিয়া আছে।

সকালে আকবর যখন ছেলেটাকে কবর দিয়া ফিরিল, তখন শুনিল, সবাই কাজে যাইবার জন্য তৈরী হইয়া বাবুদের বাড়ি গিয়া জমায়েৎ হইয়াছে। সেখানে তাহারা নিজের নিজের কাজ বুঝিয়া লইবে। আকবর আর দাঁড়াইল না, সেই পায়েই ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। এখনো সময় আছে, এখনো যদি তারা ফেরে—

বাবুদের বাড়ির বৃহৎ প্রাঙ্গণে সকলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। উপরের চাতালে দাঁড়াইয়া নলিনাক্ষ।

আকবর স্বকর্ণে শুনিল, নলিনাক্ষবাবু বলিতেছেন, তোমরা কাজ করো—আমরা তোমাদের প্রতি অবিচার করবো না।

আকবর দূরে দাঁড়াইয়া দেখিল, তাহাদের বুড়া কর্ত্তা বিহারীলাল দোতলার একপাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। জনতার কোলাহলকে ছাপাইয়া নলিনাক্ষবাবু চীৎকার করিয়া বলিতেছেন, তোমরা কাজ চাও, না আকবরকে চাও? যে তোমাদের সর্বনাশ করেছে, যে তোমাদের শত্রু, যে তোমাদের মঙ্গল চায় না--

—আমরা আকবরকে চাই না হুজুর! জনতা সমস্বরে উত্তর দেয়।

—তোমরা অনেক ক্ষতি করেছো মালিকের, তবু আমি তোমাদের পনের দিনের তলব দেবার ব্যবস্থা করবো। যাও, কাজে যাও। আর আজ থেকে আকবরের পরিবর্তে আমার মিলে রহিম সেখ হেড্‌মিস্ত্রীর কাজ করবে।

জনতা সমস্বরে উল্লাস ক'রে ওঠে: বাবুদের জয় হোক্। উল্লাস করিতে করিতে শ্রমিকদলের মিছিল দৃষ্টির আড়ালে বাহির হইয়া গেল। আকবর ঠিক একই জায়গায় পাথরের মতো দাঁড়াইয়া রহিল।

মহানন্দপুরের মিল-ষ্ট্রাইকের কথা শঙ্করপুকুরেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কাঙালী বলিল, এ যে কি-হাওয়া কোথেকে এলো, মানুষকে আর আনন্দ করে বাঁচতে দিলে না। গ্রামের স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে ওরা আজ কলের মানুষ। কলের মতো ওদের জীবন-যাত্রা। কলে চলে, কলে হাসে।

মুখুজ্জে হাসিল। বলিল, আজকাল স্কুল-কলেজের ছেলেরাও আন্দোলন করছে।

—করবেই তো। ছেলেদেরকে নাচানো যে সোজা। এই রাজনীতিই দেশের সর্বনাশ করলো। ছেলেদের ইহকাল পরকাল সব গেল!

—কি বলছো কাঙালী, ছেলেরা আজকাল বাপকে মানে না।

—ঐ রাজনীতি। বাপের চেয়ে তাদের রাজনীতি বড়। যার বিষে সমাজ আজ ভেঙে গেল! ঐ দুঃখেই তো পালিয়ে এলাম শঙ্করপুকুরে। আমাদের জীবন অবশ্য কেটে যাবে, ছেলেরা গাঁয়ে থাকে তবে তো?

—তা থাকবে। গাঁয়ের ওপর টান আছে ছেলেদের। দেখলে না পুজোর সময় তাদের কি উৎসাহ?

—তা সত্যি। জোর করে যে কিছু করানো যায় না তা আমার ছেলেকেই দিয়ে বুঝেছি।

—সে কি গাঁয়ে কোনদিন আসবেই না?

কাঙালী একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, না। এই একটি মাত্র বেদনা কাঙালীর অন্তরে ক্ষত হইয়া রহিয়া গেল। একটু থামিয়া বলিল, যাক্ ওসব কথা। তোমার ছেলে ডাক্তার হয়ে কবে আসছে?

পরীক্ষা তো শেষ হয়েছে। পাসের খবর বেরুলেই চ'লে আসবে। বলেছে গাঁয়েই ডাক্তারি করবে।

—খুব ভাল। পাশাপাশি একটি গ্রামেও ডাক্তার নাই। কপালে থাকে, এখানে থেকেই প্রচুর রোজগার করবে।

—হাঁ, ছেলেও সেকথা বলেছে।

—এসব ছেলেই গাঁয়ের ভবিষ্যৎ। গ্রামকে বাঁচাতে হবে এই বুদ্ধি আজ সকলের হওয়া দরকার।

—কিন্তু গ্রামকেই বা আর কদিন রক্ষা করতে পারবে? রাজনীতি-রাহু তোমার গ্রামকেও রেহাই দেবে না।

—তা তো জানি মুখুজ্জে, কালের গতি কেউ রুখতে পারবে না। মানুষকে আজ এত নীচে নামিয়েছে এই রাজনীতি যে, মানুষকে আর মানুষ বলে চেনা যায় না। এরা পার্টির জন্যে নিজের ছেলে-বৌকে খুন করছে। রাজ্যে শাসন নাই—সেখানেও বিশৃংখল। মেয়েদের নিয়ে কলকাতায় পথ চলার উপায় নাই। বেশী-দিনের কথা নয়—কদিন আগেই কলকাতা গিয়েছিলাম, দিন-দুপুরে একটা বৌ-এর গলা থেকে হার ছিনিয়ে নিয়ে চলে গেল—পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে। এই তো আমাদের অবস্থা।

কদিন পরেই ছেলেরা দল বাঁধিয়া বাড়ি আসিল। তাহাদের কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ হইয়া গেল। এক অধ্যাপককে কোন্ ছেলে বোমা মারিয়াছে। তাঁর অবস্থা নাকি গুরুতর।

কাঙালী ছেলেদের ডাকাইয়া পাঠাইল। বলিল, অধ্যাপকের অবস্থা কেমন ?

—ভাল নয়। হাসপাতালে আছেন। উত্তর দিল বিমান, হরিশের ছেলে।

—হয়েছিল কি ?

—ছেলেটি ফেল করেছে, পাশ করিয়ে দিতে হবে।

—বাঃ আব্দার মন্দ নয়! ছেলেরা হ'লো কি ?

– এ ওদের দোষ নয় জেঠামশায়। ছেলেদের মাথা খাচ্ছে নেতারা।

—কিন্তু তোমরা যে বড় দলের বাইরে ?

—বাইরে থাকাই ভাল জেঠামশায়। আমাদেরকে ওরা বলে গেঁয়ো। সত্যিই তো, আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক, রাজনীতি বুঝিনা – বুঝতেও চাই না।

—খুব ভাল। ঈশ্বর তোমাদের সদ্‌বুদ্ধি দিন।

—আচ্ছা গাজনের তো আর দেরী নাই, এখন থেকেই তো আয়োজন করতে হয়।

—তা হয় বৈকি। মন্দিরটারও একটু সংস্কার করতে হবে। কতকালের মন্দির কেউ জানে না। জঙ্গলে পড়ে ছিল—দুটো বেলপাতা দেবারও লোক ছিল না। এবারে যা হোক করে চালাতে হবে, পরে নতুন মন্দির ক'রে দেবো।

—তাই হবে জেঠামশায়, আমরা এর মধ্যে গাঁয়ে গাঁয়ে ঢোল-সহরৎ করে দিচ্ছি। আমরা নিজেরাও ঘুরবো —প্রচার ভাল ক'রে করতে হবে।

তা এই কয়দিন সময় পাওয়ায় তাহারা প্রচার ভালই করিল। তাহারা গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া হ্যাণ্ডবিল বিলি করিয়াছে। প্রত্যেককে অনুরোধ করিয়াছে।

এই গাজনের উৎসব হিন্দুদের একটি পরম উৎসব। তাহারা বলে, এই দিনটিতে শিব ভক্তদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করেন। ভক্তরা আসিয়া ধর্ণা দেয় শিবের মন্দিরে। তাহারা কেহ চায় অর্থ-বৈভব, কেহ চায়, মান-যশ, কেহ চায় রোগমুক্তি আবার কেহ বা সত্যিকারের শান্তি। তাহারা আসিয়া বিল্বদল আর চিনির বাতাসা দিয়া নৈবেদ্য সাজায়, কেহ আসিয়া দেয় সোনার টিকলী আর একমণ দুধের ভোগ, আবার কেহ দেয় অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

পাপখণ্ডন করিতে আসে অনেকেই। সারাটা বছরের জমানো পুঞ্জীভূত পাপ তাহারা খণ্ডন করিতে চায় বৎসরের শেষান্তে এই একটি দিনে। তারা জীবন্ত শিবের অন্নে কাঁকর মিশিয়ে, জীবন্ত প্রাণময় শিবকে গৃহহীন ভিখারী সাজাইয়া পাথরের জড়-স্থবির শিবের মাথায় ঝুনা নারিকেল ভাঙিয়া জল দেয়, খাঁটি দুধ দিয়া স্নান করায় শিবলিঙ্গকে।

মেলা। যেন বিরাট জনসমুদ্র একটা, তার কূলকিনারা নাই! কেবল মানুষ—মানুষ আর মানুষ। ছোট-বড়, বুড়া-যোয়ান,—শিশুরাও আসিয়া ভিড় করিয়াছে। সবাই আসিয়া দোকান দেখিতেছে।

মন্দিরের পাশ থেকেই দোকানের সুরু। সারি সারি দোকান বসিয়াছে রাস্তার দুইধারে। রকমারি দোকান। খাবারের দোকান, মাদুর, তালপাখা, মনোহারী জিনিস, লোহার বঁটি, হাতা, আরও নানান টুকিটাকী। খেলনার দোকানই কি কম! কত রকমের খেলনা—একটা দম-দেওয়া ঘোড়া পা উঠাইতেছে আর নামাইতেছে। ইঞ্জিন ছুটিতেছে, এরোপ্লেন উড়িতেছে—কত বড় বড় ডল-পুতুল গাটাপার্চারের, চমৎকারভাবে সাজানো। সাড়ে ছ'আনার দোকানই বসিয়াছে দু-দশটা। মাথার ফিতার দোকানে মেয়েদের ভিড় বেশি।

চুড়ির দোকান বসিয়াছে পুরা একসারি। চোখ ঝলসে যায় এদিক-ওদিক চাহিলে। রকমারি দোকান আর রকমারি সব বাতি। কেহ কেহ ডে-লাইট আর হ্যাসাক জ্বালিয়াছে। নাগরদোলা আর চড়ক বসিয়াছে নীচের দিকের মাঠে। ছেলে-ছোকরাদের ভিড়ই সেখানে বেশি।

মেয়েরা—যাহারা নিজের হাতে কেনাকাটা করার সুযোগ পায় না, তাহারা মেলায় আসিয়া ইচ্ছামত জিনিস কিনিতে পারিয়া তাহাদের প্রাণ যেন ভরিয়া যায়। কাঙালীর মেয়ে আসিয়া অনেক জিনিসই কিনিয়া লইয়া গেল। আয়না, তরল আলতা, পেতলের ধুপদানি, বড় চামচ—আর কিনিল কয়েকটি পাথরের বাটি।

একদিনের মেলা। পরের দিনই সব ফাঁকা। বড় ন্যাড়া-ন্যাড়া ঠেকে এই দিনটি। ছেলেরা আসিয়া কাঙালীকে বলিল, জেঠামশায়, একদিনের ষ্টল-ভাড়া দেড়শো টাকা উঠেছে। এ টাকা আপনার কাছে জমাই থাক্। এমনি করে টাকা জমিয়ে জমিয়ে—আরো কিছু চাঁদা তুলে একটা স্কুল করতে হবে।

কাঙালী হাসিয়া বলিল, নিশ্চয়। স্কুল যেমন করে হোক করতেই হবে।

ছেলেরা চলিয়া গেলে কাঙালী শঙ্করপুকুরের দিকে একবার চাহিল। এ সেই শঙ্করপুকুর—যাহার তিনদিকে মাঠ আর একদিকে ধানক্ষেত। মানুষের চেষ্টায় আজ তাহার শ্রী ফিরিয়াছে। কে বলিবে এ সেই শঙ্করপুকুর! শিল্পীর হাতে একখানি নিখুঁত ছবি! কাঙালীর চোখ ভরিয়া উঠিল।

১৭

সুখ কাহারও চিরদিন থাকে না। কাঙালীরও থাকিল না। অল্প কয়েকদিন জ্বরে ভুগিয়া তাহার স্ত্রী মনোরমা মারা গেল। কাঙালীর চোখের সম্মুখ হইতে পৃথিবী বিলুপ্ত হইয়া গেল। এ-যাওয়া যে তাহার কি যাওয়া, সে ভাল করিয়াই জানে। সে রহিল তাহার পৃথিবীতে একা! কেহ রহিল না তাহাকে সান্ত্বনা দিতে, মন্ত্রণা দিতে,—কেহ রহিল না তাহার সুখ-দুঃখের অংশ লইতে—তাহাকে সাহায্য করিতেও কেহ রহিল না। মনোরমা তাহাকে জীবন্মৃত করিয়া রাখিয়া দিয়া চলিয়া গেল। সে আজ সকলরকমে পঙ্গু। তাহার আর কিছু করিবার নাই। তাহার কাজ ফুরাইয়া গিয়াছে। এখন সে তাহার এই সম্পদ লইয়া কি করিবে? সম্পদই যে এখন তাহার গলগ্রহ হইয়া উঠিল। পুত্র আছে, কিন্তু সে থাকিতেও নাই—সে আর কোনদিন তাহার কাছে আসিবেও না। নির্বান্ধব-পুরীতে তাহাকে শ্মশান আগলাইয়া যাইতে হইবে! এই কি তাহার কর্মফল? এমন করিয়া মনোরমা চলিয়া যাইবে, সে স্বপ্নেও কোনদিন ভাবে নাই। সে আজ নাই—কোথায় গিয়াছে সেই জানে। সেখানে কি আমাদের মতোই কোনো সংসার আছে? সেখানে গিয়া কি সে সুখি হইবে? লোকে বলে পরলোক। সেখানকার কথা কি কোনোরকমেই জানিবার উপায় নাই? জানিতে পারিলে ভাল হইত।

মনোরমা একদিন বলিয়াছিল, তোমাকে ছাড়িয়া আমি যাইব না—তোমাকে কে দেখিবে? কিন্তু তাহাকে যাইতে হইল। সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া যাইতে হইল। ভগবানের অমোঘ বিধান। না, না, সে মরে নাই—নিশ্চয়ই কোথাও আছে। এখুনি আসিল বলিয়া। সে নাই—একথা সে কি করিয়া বিশ্বাস করিবে?

লোকে বলে আত্মা অমর। দেহ না থাকিলেও আত্মা থাকে। আত্মাই তো সব, দেহ তো খোলসমাত্র। শুনিয়াছি, আত্মা সর্বত্র বিচরণ করে। নিশ্চয়ই সে আমার কাছে-কাছেই আছে। নিশ্চয়ই আমার দুঃখ সে অনুভব করিতেছে। শক্তি নাই কিছু করিবার! ইহাতেও কি সে দুঃখ পাইতেছে না? নিরুপায়ের বেদনা সে তো আরও ভয়ংকর! একবার মরিয়া দেখিতে ইচ্ছা করে সে কি করিতেছে। তখন কি আবার আমরা মিলিত হইব না? না, কাঙালী আর ভাবিতে পারে না। সে কি পাগল হইয়া যাইবে?

মেয়ে দিনকতক থাকিয়া গেল। কাঙালীই তাহাকে জোর করিয়া পাঠাইয়া দিল। বলিল, কোনো চিন্তা করিস না মা, আমি একা মানুষ, দুটো ভাত ফুটিয়ে খুব খেতে পারবো। অসুখ-বিসুখ হ'লে খবর দেবো, তখন এসে সেবা করিস। মঙ্গলা কাঁদিতে কাঁদিতে চলিয়া গেল।

মুখুজ্যে আসিয়া বলিল, এমন ক'রে থাকলে তো তোমার চল্‌বে না কাঙালী। যেকটা দিন বাঁচতে হবে সেকটা দিন কাজ ক'রে কাটিয়ে দাও। কাজই মানুষকে সব ভোলাতে পারে। তোমাকে কাজ নিয়েই থাক্‌তে হবে। দেখবে, শান্তি পাবে। স্কুল করেছো—ঐ স্কুলের কাজ নিয়েই ডুবে থাকো। সংসারে কে কার? তোমার এই সন্ন্যাস-জীবনের প্রয়োজন ছিল। সব হারালে তবে তো তাঁকে পাওয়া যায়।

কাঙালী বলিল, সবই বুঝি ভাই, কিন্তু মনকে যে কিছুতেই শান্ত করতে পারছি না!

—পারবে, ভাই, পারবে। চেষ্টা করো সব মন থেকে দূর ক'রে ফেলবার। পরের জন্যে জীবন উৎসর্গ করো। সকলে যে তোমারই মুখ চেয়ে আছে। তোমারই হাতে-গড়া শঙ্করপুকুর, তার ভবিষ্যৎ তোমারই ওপর নির্ভর করছে।

কিন্তু মনোরমার চিন্তা কাঙালী ছাড়িতে পারিতেছে না। তাহাকে চিন্তা করিতেও যে তাহার ভাল লাগে। এ-চিন্তা সে ছাড়িবে কি করিয়া?

স্বপ্নেও সে মনোরমাকে দেখে। কত হাসি, কত গল্প। এ সুখ-স্বপ্ন সে ছাড়িবে কি করিয়া?

ছেলেরা আসিয়া বলিল, জেঠামশায়, আপনি এমন ক'রে থাক্‌লে, আমরা কাজে উৎসাহ পাই না।

—না বাবা, আমি আবার কাজে নাম্‌বো। সামলাতে একটু সময় লাগ্‌ছে তাই। বলিতে বলিতে কাঙালীর গলা ধরিয়া আসিল।

মনোরমা কি সত্যই মরিয়াছে? কাঙালীর মন কিছুতেই মানিতে চাহে না সে মরিয়া গিয়াছে। সে অন্যত্র গিয়াছে, এখই আসিয়া পড়িবে। এই ছিল, এই নাই—এও কি কখনো হয়? তাহার কাপড়-জামার দিকে কাঙালী সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া থাকে। কয়েকদিন আগেও সে এই কাপড় পরিয়াছে—এই কাপড়ের প্রতিটি পরতে তাহার স্পর্শ লাগিয়া আছে। কাপড়গুলি আনলায় সেইভাবেই ঝুলিতেছে। কাঙালী তাহা কোনোদিনই তুলিবে না—ঐ ভাবেই ঝুলিতে থাকিবে।

ছেলেরা আসিয়া বলিল, এই গাঁয়ে একটা কলেজ করবো—চেষ্টা করলে অনেক টাকাই উঠ্‌বে।

—চাঁদা তুলবার দরকার নেই। টাকা আমিই দেবো। নাম দাও "মনোরমা মেমোরিয়াল কলেজ।"

—খুব ভাল হবে জেঠামশায়। যা মহানন্দপুরে আজো হয়নি, আমরা তারই প্রতিষ্ঠা করবো।

১৮

তিন বছর পরে নীলাম্বর দত্ত দেশে ফিরিলেন। শহর দেখিয়া তাঁহার সমস্তই কেমন যেন গোলমাল হইয়া গেল। যেদিকে চোখ ফিরাইয়া দেখেন, সবই তাঁহার কাছে অপরিচিতের মতো ঠেকে। তিনি সর্বত্রই কি যেন খুঁজিয়া দেখিবার চেষ্টা করেন। কোথায় গেল রায়েদের সেই আটচালা, কোথায় বা গোঁসাইপাড়ার চণ্ডীমণ্ডপ—নাই পাকুড়তলার পাঠশালা, নাই শানে-বাঁধানো ষষ্ঠীতলা। ছেলেদের ডাকিয়া বলেন, আমাকে তোমরা কোথায় আনিলে? এ কি আমার সেই মহানন্দপুর?

সত্যই সে মহানন্দপুর নয়।

এ মহানন্দপুর গ্রাম নয়, শহর। নূতন শহরে নূতন অধিবাসী আসিয়া ভিড় জমাইয়াছে। প্রাচীন বাসিন্দা যাহারা, তাহারা গ্রামের স্বাচ্ছন্দ্য হারাইয়া গ্রামান্তরে চলিয়া গিয়াছে। নাই অঘোর চাটুজ্যে, ভৈরব ভট্‌চাজ—নাই মধু রায়, ষষ্ঠী গাঙ্গুলী, নাই কাঙালী মোড়ল।

নিজের বাড়িতে প্রবেশ করিয়া হকচকাইয়া গেলেন! এ কোন্ বাড়ি? এ তো তাঁহার বাড়ি নয়! বুঝিলেন—সবই বুঝিলেন। দানবেরা নির্মমভাবে সমস্তই ধ্বংশ করিয়াছে। তাহারা ইতিহাস ধ্বংস করিয়াছে। নীলাম্বর মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িলেন। বধূরা আসিয়া ভিতরে লইয়া গেল।

গোপীনাথের মন্দিরে নীলাম্বর আসিয়া দাঁড়াইতেই হরিদাস হাসিমুখে আগাইয়া আসিল। ভাঙা ইট বাহির-করা চাতালের পরিবর্তে মার্বেল পাথরের ঝক্‌ঝকে চাতাল বৃদ্ধা পিসীমাকে আজ খুশিই করিয়াছে দেখিলেন। শুধু খুশি হইতে পারিতেছেন না নীলাম্বর নিজে।

মন্দির নয়, ঐশ্বর্যের দম্ভ!

তিনি বেশ দেখিতে পাইতেছেন, এখানে তাঁহার গোপীনাথকে মানাইতেছে না। দেখিলেন, প্রদীপের ক্ষীণ আলোয় পূর্বে গোপীনাথের যেরূপ খুলিত, সেই স্বয়ম্প্রকাশ দিব্য-জ্যোতি আজ বিজলি-বাতির কৃত্রিম আলোয় যেন ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। পুরোহিতের হাতে পঞ্চপ্রদীপের আলো হাজার বাতির নীচে আজ কোনো মহিমাই প্রকাশ করিতেছে না।

মানাইতেছে না তাঁহার নিজেকেও। চেষ্টা করিতেছেন মানাইয়া লইবার, কিন্তু পারিতেছেন না। পুরাতন চোখ সেই পুরাতনকেই খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছে।

মহানন্দপুর আজ নূতন শহর। ঘুমন্ত পল্লীর বুকে গড়িয়া উঠিয়াছে নব নব সৌধ। নূতন মানুষের নূতন রচনা। শুধু মহাকাল মাঝখানের কয়েকটি বছরের দুঃস্বপ্ন লইয়া একমাত্র নীলাম্বরকেই বিধ্বস্ত করিয়া গিয়াছে।

আচার্য যদুনাথ সরকার

[১৮৭০-১৯৫৯]

রণজিৎকুমার সেন

আচার্য যদুনাথ সরকার মূলতঃ ইংরেজি ভাষায় তাঁর অধিকাংশ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করলেও বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁর মমতা ছিল গভীর। বঙ্গীয় সংস্করণ 'শিবাজী' ও 'মারাঠা জাতীয় বিকাশ' তাঁর বঙ্গভাষার প্রীতির এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ যদুনাথকে ১৩৪২-৪৩, ১৩৪৭-৫১ ও ১৩৫৪ সালে সভাপতি নির্বাচন করেন এবং ১৯৪৯ সালে তাঁর অষ্টসপ্ততিতম বয়সপূর্তি উপলক্ষে তাঁকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। উত্তরে তিনি যে ভাষণ দেন তার মধ্যেই বঙ্গসাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ বিশেষভাবে ফুটে ওঠে। প্রসঙ্গতঃ তিনি বলেন: '—কিন্তু আজ যে বিশ্বময় বিজ্ঞানের রাজত্ব! আজ যে সব দেশেই, মানবজীবনের সব ক্ষেত্রেই বিজ্ঞানের প্রণালী ও মন্ত্রতন্ত্র একাধিপত্য করছে। এ রাজত্ব শুধু রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা, চিকিৎসা বা যন্ত্রপাতির কারখানা নয়; সাহিত্যের সব বিভাগেও প্রকাশ্যেই হোক বা তলে তলে হোক, বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুসৃত হয়েছে। প্রথম থেকেই আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল—কি ক'রে বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে এই বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি ও কর্মপ্রণালী আনা যায়।... সাহিত্য পরিষদ বর্তমান যুগে এই কাজ আরম্ভ করেছে এবং তার এই প্রচেষ্টায় উপদেশ ও সাহায্য দিতে পেরে আমি চরিতার্থ হয়েছি।'

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে ইতিহাস-চেতনা তাঁকে এক অনন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহত্তর জীবনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। ইতিহাসের প্রথম প্রেরণা লাভ করেন তিনি তাঁর পিতৃদেব রাজকুমার সরকারের কাছ থেকে। ইতিহাসের প্রতি রাজকুমারের অনুরাগ ছিল অসাধারণ, আর এই অসাধারণ অনুরাগই বালক যদুনাথকে অনুপ্রাণিত করে। পিতৃদেব সম্পর্কে যদুনাথ নিজেই বলেছেন: 'যাঁকে দেখে আমি নিজ জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য স্থির করতে পেরেছি, তিনি আমার পিতা। ধনী জমিদার সন্তান এবং ইংরেজি শিক্ষিত হলেও তিনি কখনও ভোগসুখ বা আড়ম্বর চাননি; চিরদিন সরল সংযত জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁর জীবনের ব্রত ছিল আমাদের রাজসাহী জেলার সবরকম লোকহিতকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত করা। বাংলার প্রথম যুগের ইংরেজি শিক্ষার সমস্ত সুফলই তিনি পেয়েছিলেন। অথচ তাঁর চিত্ত শান্তি পেতো, বল পেতো বৈষ্ণবধর্মের এক সরল উদার রূপ হৃদয়ে মেনে নিয়ে —এতে কোনো বাইরের ভঙ্গী বা বদ্ধ কুসংস্কার ছিল না, এজন্য তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে গুরুর মতো শ্রদ্ধা করতেন, কলকাতায় এলেই তাঁকে দর্শন করতেন। মুর্শিদাবাদ জেলার মরিচা-দিয়াড়ে তাঁর এক কাঠা ভূমিসম্পত্তিও ছিল না, অথচ সেখানকার মুসলমান প্রজাদের নীলকুঠিওয়ালা সাহেবদের অত্যাচার থেকে উদ্ধার করবার জন্য তিনি অনেক বৎসর ধরে নিজের খরচে লড়াই করেন।...ইতিহাস ছিল তাঁর প্রিয় পাঠ্য। তিনি আমার বালক চিত্তে ইতিহাসের নেশা জাগিয়ে দেন। আমাকে প্রথমে প্লুটার্কের লেখা প্রাচীন গ্রীক ও রোমান মহাপুরুষদের জীবনী পড়ান। সেই থেকে এবং পরে ইউরোপীয় ইতিহাস পড়ে আমার যেন চোখ

খুলে গেল। আমার তরুণ হৃদয়ে অঙ্কিত হলো—কি করলে জাতি বড় হয়, কি করলে ব্যক্তিগত জীবনকে সত্য সত্যই সার্থক করা যায়। স্বদেশী বস্ত্র ও শিল্পদ্রব্য ব্যবহার করা যে আমাদের নৈতিক কর্তব্য, তা তিনি পুরাতন পার্টিশন আন্দোলনের যুগে নিজে বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত প্রকাশ্য সভায় উপস্থিত হয়ে নির্ভয়ে বলেছিলেন।'

বলতে বাধা নেই যে, পিতার এই জীবনমন্ত্রেই যদুনাথ দীক্ষিত হ'য়ে ওঠেন। রাজসাহী জেলার অন্তর্গত করচমাড়িয়া গ্রামে ১৮৭০ সালের ১০ই ডিসেম্বর তাঁর জন্ম হয়। শিক্ষাজীবনে তিনি মেধাবী ছাত্ররূপে সকলের নিকট সুপরিচিত ছিলেন। বি, এ পরীক্ষায় তিনি ইংরেজি ও ইতিহাসে অনার্স নিয়ে উত্তীর্ণ হন এবং এম, এ পরীক্ষায় ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কর্মজীবনে যদুনাথ প্রথমে রিপণ কলেজে ও পরে বিদ্যাসাগর কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অধ্যাপনার সঙ্গে তাঁর গবেষণা কার্যও চলতে থাকে। ১৮৯৭ সালে যদুনাথ প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি লাভ করেন। তাঁর এই বৃত্তিপ্রাপ্ত গ্রন্থটি ১৯০১ সালে 'India of Aurangzib' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৯৪ সালে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজি অধ্যাপক হন, পরে পাটনা কলেজে চলে যান; পুনরায় পাটনা থেকে এসে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা করতে শুরু করেন। ১৯০২ সালে তিনি আবার পাটনায় যান। এবার তাঁর অধ্যাপক-জীবনে পরিবর্তন ঘটলো। এখন থেকে তাঁর অধ্যাপনার বিষয় হলো ইতিহাস। পাটনায় থাকাকালে তিনি খোদাবক্স লাইব্রেরীতে ঐতিহাসিক গবেষণায় নিযুক্ত থাকতেন। এই পাঠাগার যদুনাথকে প্রভূত প্রেরণা জুগিয়েছিল। পরে তিনি কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারতেতিহাসের প্রধান অধ্যাপক (১৯১৭ আগষ্ট—১৯১৯ জুলাই) নিযুক্ত হন। সুদীর্ঘকাল পরিশ্রম, যত্ন ও অনুশীলন ক'রে তিনি ভারতেতিহাসের সত্য উদ্‌ঘাটিত করেন। এ সম্পর্কে যদুনাথ 'আমার জীবনতন্ত্র' প্রবন্ধে লিখেছেন: 'নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলে কোনো একজন দিল্লীর বাদশা অথবা মারাঠা রাজার ইতিহাস লিখতে গিয়ে আমাকে প্রথম দশ বছর ধরে তার উপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে; সেগুলি সাজিয়ে, সংশোধন করে আলোচনা করে, মনের মধ্যে হজম করে দশ বছর পরে ঐ পুস্তকের লেখা আরম্ভ করি, তার আগে নয়। পাণ্ডিত্যপূর্ণ দুষ্প্রাপ্য পুস্তক কিনতে ও ফার্সী হস্তলিপির নকল নিতে বোধ হয় আমার উদ্বৃত্ত আয়ের অর্ধেক খরচ হয়েছে; মারাঠা দেশে ত্রিশ বত্রিশ বার, এবং আগ্রা, দিল্লী, মালব, রাজপুতনা প্রভৃতি ঐতিহাসিক প্রদেশে বারো তেরো বার বেড়িয়েছি। এ ছাড়া ঐ উপকরণসমূহ রীতিমতো বুঝবার জন্য আমাকে ফার্সী, ও পর্তুগীজ প্রভৃতি নূতন ভাষা শিখতে হয়। এই দশ বৎসর বাইরের জগতের কাছে আমার কাজ সম্বন্ধে নীরব থাকতে হতো।

তাঁর 'History of Aurangzib' পাঠ করে বীভারিজ বলেন:—

"Jadunath may be called 'Primus in Indis' as the user of Persian authorities for the history of India. He might also be styled the Bengali Gibbon."

বাংলাভাষায় যদুনাথের গ্রন্থ সংখ্যা অধিক না হলেও সাময়িক পত্রে তাঁর ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক প্রবন্ধ কম প্রকাশিত হয় নি। এই জাতীয় প্রবন্ধগুলির মধ্যে—'দুই রকম কবি—হেমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ' (প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩১৪), 'বাঙালীর ভাষা ও সাহিত্য' (প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৭), রজনীকান্ত সেন' (জাহ্নবী, অগ্রহায়ণ ১৩১৮), 'বঙ্কিম প্রতিভা' (শনিবারের চিঠি, আষাঢ়, ১৩৪৫), 'যুগধর্ম ও সাহিত্য' (অলকা, আশ্বিন, ১৩৪৫), 'স্বাধীনতার উষার চিন্তা' (প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৫৪) প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'সোনার তরী' কবিতাকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রকাব্যে অস্পষ্টতা নিয়ে সাহিত্যিকমহলের প্রবল আলোচনা ও সমালোচনার সময় যদুনাথ 'সোনার তরীর ব্যাখ্যা' (প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩১৩) প্রবন্ধ প্রকাশ করে কবিকে সমর্থন করেন। ১৯১০ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধ ও গল্পেরও ইংরেজি অনুবাদ করে তিনি 'মডার্ণ রিভিউ' পত্রিকায়

প্রকাশ করেন। আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অচলায়তন' নাটকখানি যদুনাথের নামে উৎসর্গ করেন।

সুলভ মূল্যে বিশ্বের বিবিধজ্ঞান সহজ বাংলাভাষায় প্রচারের জন্য রবীন্দ্রনাথ 'বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ' গ্রন্থমালা প্রকাশের প্রস্তাব করলে যদুনাথ তাতে সাড়া দিয়ে "প্রবাসী" পত্রিকায় (শ্রাবণ, ১৩২৪) একটি প্রবন্ধ লেখেন। এতদ্ব্যতীত বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর পরিষৎ-সংস্করণে মুদ্রিত ঐতিহাসিক উপন্যাস 'আনন্দমঠ', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'দেবী চৌধুরাণী', 'রাজসিংহ' ও সীতারাম (২য় সংস্করণ)-এর তিনি ভূমিকা লিখে দেন। ১৩২২ সালে বর্ধমানে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের অষ্টম অধিবেশনে ইতিহাস-শাখার সভাপতির ভাষণে তিনি বাংলাভাষায় ইতিহাস অনুশীলন সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেন, তা তাঁর মাতৃভাষার প্রতি প্রবল অনুরাগেরই পরিচায়ক। তিনি বলেন—

"আমাদের সম্মেলন বঙ্গভাষাভাষীদের। সুতরাং ঐতিহাসিক চর্চার অত্যাবশ্যক গ্রন্থগুলি বাংলা আকারে সাধারণের হাতে দিতে না পারলে আমাদের কর্তব্যে ত্রুটি হবে। এই দেখুন প্রতি বছর শত শত বঙ্গভাষী সংস্কৃত পরীক্ষা দেয়, তারা ইংরেজি জানে না এবং অসংখ্য বাংলা মাসিকের পৃষ্ঠায় ঐতিহাসিক প্রবন্ধগুলি খুঁজে পড়বার অবসর এবং সুযোগও তাদের নেই। সুতরাং ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস ও সভ্যতা সম্বন্ধে যেসব নব নব সত্য ইংরেজিতে প্রকাশিত হয়েছে, তা এই সব ছাত্রের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তারা প্রত্নতত্ত্ব ও বৈজ্ঞানিক ইতিহাস সম্বন্ধে এখন মধ্যযুগে বাস করছে, মানবজ্ঞান যে এতদিনে কতদূর অগ্রসর হয়েছে, তার কিছুই জানে না। অথচ তাদের মধ্যে অনেক মেধাবী ও মৌলিকতাসম্পন্ন ছাত্র আছে; দেশ সম্বন্ধে, তাদের পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে নিজ ধর্ম জানা সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান হতে শুধু ত্রিভাষী বলে এরা যে চির বঞ্চিত হয়ে থাকছে, এটা কি পরিতাপের কথা নয়?...গুজরাতী ভাষা বাংলার চেয়ে কত কম লোকে বলে, অথচ গুজরাতী ভাষার সেবকগণের আগ্রহ, শ্রমশীলতা ও দূরদর্শিতার ফলে সর্ববিধ বিভাগের পুস্তকের অনুবাদে গুজরাতী ছেয়ে গেছে। আর আমরা বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতার গর্ব করে অলস হয়ে বসে আছি। লোকশিক্ষার দিকে দৃষ্টি নেই, অথচ এই লোক-শিক্ষার প্রতি অধিকতর দৃষ্টি দেওয়ার ফলে ক্রমে গুজরাত ও মহারাষ্ট্রে সাধারণের জ্ঞানের সীমা বঙ্গের লোক-সমষ্টির জ্ঞানের সীমাকে অতিক্রম করবে।'

বাংলাভাষার প্রতি এই একাত্মবোধ যদুনাথকে বাঙালী মনীষার বিশেষ এক সম্মানিত আসনে অভিষিক্ত করেছিল।

১৯২৬ সালে তিনি অধ্যাপনার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। এই বছরই তিনি সি. আই. ই. ও ১৯২৯ সালে নাইট উপাধি লাভ করেন। ১৯২৩ সালে তিনি রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি অব গ্রেট ব্রিটেনের সম্মানিত সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯২৬ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার নিযুক্ত হন। ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ১৯৪৪ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় যদুনাথকে ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করেন।

বিশ্বভারতী গঠনের পর রবীন্দ্রনাথ বহুবার যদুনাথকে তার কর্ণধার হবার জন্য অনুরোধ জানান, কিন্তু নীতিগত মতানৈক্যের জন্য যদুনাথ সেই ভার গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকেন। তাঁর শিক্ষানীতির একটা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যই ছিল, সেই নীতির জন্য বৃহত্তর ত্যাগ স্বীকারেও তাঁর কুণ্ঠা ছিল না। ১৯৫৮ সালের ১৯শে মে ৮৮ বছর বয়সে তাঁর জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্গে ইতিহাস-চর্চার ন্যায়নিষ্ঠ দিকটিরও অবসান ঘটে। তাঁর মৃত্যুর মাত্র কিছুকাল পূর্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করতে চাইলে যদুনাথ সে-উপাধি প্রত্যাখ্যান করেন।

বাংলার দলগত আন্দোলন ও ছাত্র-অসন্তোষ ও উচ্ছৃঙ্খলতা সম্পর্কে ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতালগ্নে তিনি যেকথা লিখেছিলেন, তা দেশের সামনে আজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তিনি লিখেছিলেন: "সাইমন

কমিশনের সময় হইতে এই বিশ বৎসর ধরিয়া ছাত্রগণকে স্কুলের অপোগণ্ড শিশুদের পর্যন্ত—রাজনৈতিক আন্দোলনে, নামতঃ 'স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সেনানী ; কিন্তু কার্যতঃ নেতাদের বেগার খাটার কুলী, camp followers রূপে ব্যবহার করিবার ফলে আমাদের ছাত্রমহলে (বিশেষতঃ বাংলায়) নিয়মপালনের রীতি ও প্রবৃত্তি discipline একেবারে লোপ পাইয়াছে। অকারণে অথবা তুচ্ছ কারণে, কথায় কথায় ছেলেরা ষ্ট্রাইক ঘোষণা করে, তাহাদের দল, বয়স্ক রাজনৈতিক দলের গঠন ; বক্তৃতা, ঘোষণা, সংবাদপত্র চালনা, এমন কি দুই দলের মধ্যে মারামারি ও সভা পণ্ড করা পর্যন্ত অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। স্কুল-কলেজের দরজা আগলাইয়া গরীব ও সুবোধ ছাত্রদের পড়াশুনা করিতে যাইবার বাধা দেয়। পরীক্ষামন্দিরের প্রহরকে অথবা শিক্ষককে প্রহার করা কেহ কেহ বীরত্বের চিহ্ন বা স্বদেশসেবার অঙ্গ বলিয়া গণ্য করে, তাহাদের কাজ দেখিয়া এরূপ বোধ হয়। ইহার কুফল প্রথমতঃ তাহারাই নিজ ভবিষ্যৎ-জীবনে ভোগ করিবে এবং দেশ যে এজন্য কিরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, তাহা বলিবার নয়।"

এ কথার যাথার্থ্য আজ দেশবাসী ক্রমেই উপলব্ধি করছেন।

যদুনাথের ইংরেজি ঐতিহাসিক গ্রন্থাবলী, যথা—India of Aurangzib: Topography Statistics, and Roads (1901), Economics of British India (1909), History of Aurangzib, Vol. I-V 1912-24), Anecdotes of Aurangzib and Historical Essays (1912), Chaitanya: His Pilgrimages and Teachings (afterwards Chaitanya's Life and Teachings, 1932) (1913), Shivaji and His Times (1919), Studies in Mughal India (1919), Mughal Administration, Vol: I-II (1920-25), Later Mughals. 1707—1739 By Wm. Irvine, ed. and continued by J. N. Sarkar, Vols: I-II (1922), India through the Ages (1928), Short History of Aurangzib (1930), Bihar and Orissa During the Fall of the Mughal Empire (1932), Fall of the Mughal Empire, Vol: I-IV (1932, 34, 38, 50), Studies in Aurangzib Reign (1933), House of Shivaji (1940), Maasir-i-Alamgir (Bib Indica), English Translations by J. N. Sarkar (1947) Poona Residency correspondence (Edited), Vols: I, XIII, XIV (1936, 45-), Ain-i-Akbari, Bib. Indica (Edited), Vol: III, English Translation by Jarret, and Vol: II, Cambridge History of India (Vol: IV: 1937), History of Bengal, Vol: II, Edited (1948), etc.

ডাকাতের মা

(গল্প)

শশাঙ্কশেখর সান্যাল

বোধ হয় ইংরাজী ১৯৩৯-৪০। বঙ্গীয় বিধান মণ্ডলী অধিবেশন রত। আমি সভার সদস্য। শেষ রাতে আপ ট্রেনে কলিকাতা থেকে বহরমপুরে এসে বাড়ী পৌঁছে দেখি বারান্দাতে একটি লোক শুয়ে। ওরকম উকীলের মুসাফেরখানায় পড়ে থাকা নিত্যনিমিত্ত। কোন ঔৎসুক্য জাগল না। সকালে ঘুম ভেঙে জানলাম ঐ লোকটা রাত্রি ১২টার ডাউন ট্রেনে এসে আমার মেয়েকে উঠিয়ে উকীল বাবুর জন্ত আনা দুইটা ইলিশ গছিয়ে বারান্দা দখল নিয়েছে। নেমে এসে পরিচয়ে জানলাম পদ্মধারের অধিবাসী—নাম ইছাহক। লোকে সাহু বলে ডাকে। তার আত্মীয় লালবাগ মহকুমা আদালতে ফৌজদারী আসামী, আমার সাহায্য সমর্থনপ্রার্থী। কথা কইতে কইতে পেটে যন্ত্রণা—মাঝে মাঝে নাকি গোটা উঠে। লালবাগ যেতে চায়। কিন্তু তার আগে ডাক্তারের আশ্রয় দরকার। আমার আত্মীয় ভাল ডাক্তার। তাকে অনুরোধ-পত্র দিয়ে পাঠালাম। এই প্রথম পরিচয়।

২

হাজতি আসামী পাহারাদার মারফতে যে খবর পাঠিয়েছে তাতে জানলাম, আমার পত্র ও ডাক্তারের লিখিত নির্দেশ তার পকেটেই ছিল। সেই অবস্থাতে লালবাগ আদালত-প্রাঙ্গণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ঐ কাগজগুলি ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ যা পারে জানলাম তাতে রাত্রি ১২টা থেকে ১টার মধ্যে ভগবানগোলা থানার পাশাপাশি দুই গ্রামে বিস্ফোরক সহ ভয়াবহ ডাকাতি দুই জায়গাতেই, একাধিক ব্যক্তি সাহুকে ক্রিয়ারত অবস্থায় দেখেছে চিনেছে—থানায় লিখিত এজাহারে সে কথা লিপিবদ্ধ।

৩

ডাকাতির তারিখ ও সময় মিলিয়ে দেখা গেল—ঘটনার সময় সাহু আমার বাড়ীতে। ইংরাজ পুলিশ-কর্তাকে সব জানালাম। আমরা দুজনে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করলাম যে ২৫।২৬ মাইল দূরে ঐ সময় অভিযানে যোগ দেওয়া এবং সেই সময় বা তার কাছাকাছি সময়ে আমার বাড়ীতে থাকা এক সঙ্গে হ'তে পারে না এবং আমরা উভয়েই একমত যে সে খুব সম্ভব ডাকাতির সব আয়োজন গুছিয়ে দিয়ে স'রে প'ড়েছে এবং এমন স্থানে এমনভাবে এসেছে যে তাকে ধ'রে ছুঁয়ে পাওয়া যাবে না। তার জামিন হ'ল। শেষ পর্য্যন্ত তার বিরুদ্ধে পুলিশ মোকর্দ্দমা চালান না।

৪

অন্য আসামীদের বিচার চলছে। আমি উকীল এবং সাহু অনলস তদ্বিরকার। একদিন রাত্রি দশটার সংবাদ এল বাহুদের পাশের গ্রামের এক নিরপরাধ নির্দ্দল দ্বাদশবর্ষীয়া চাঁই মেয়েকে মুসলমানের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া

প্রায় পাকাপাকি—১০।১২ ঘণ্টাতেই সব শেষ হ'য়ে যাবে। আমি সারা জেলার হিন্দুদের (অমুসলমানদের) নির্বাচিত প্রতিনিধি। আমার অসহায় উদ্বেগের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য আমার ধর্মতঃ পিতা ও ডাকাতের সর্দার সাহু। ম্যাজিষ্ট্রেট পুলিশ সাহেব অতরাতে কাকে পাবো? তাই টেলিফোন হয়নি। সকালেই যা হয় করা যাবে।

৫

সকাল ৭টায় জেলার শাসন মালিকদের কাছে যাব, দেখি সাইকেল নিরুদ্দেশ। আমার পার্শ্বেল ভৃত্য জানালেন আগের কাজে সাহু নিয়ে গিয়েছে। বিরক্ত হ'য়ে যানবাহনের চেষ্টা করছি এমন সময় সাইকেল থেকে সাহুর সগৌরবে অবতরণ—পিছনে বসে কুচকুচে কাল রংএর সেই চাঁই বালিকা। মোটা মোটা চোখ চওড়া কপাল বয়সের চেয়ে বড় মনে হয়। উদ্ধারের বিবরণ সংক্ষেপে রেখে সাহু শেষে বলল 'আমার জাত ভাইদের হাত থেকে আমার মাকে উদ্ধার করেছি। কিন্তু আপনার বিটি আপনাদের সমাজে বর পাবে না—যদিও তার রীত-চরিত্রে কোন কাল দাগ নাই।"

৬

দেশ বিভক্ত। পদ্মার মাঝে একটা নুতন চর--দুই রাষ্ট্রই দাবী করে। বাস্তুহারা রাজসাহী ছাড়া কতক লোক এখানে আস্তানা গড়েছে। আগে থেকেই সাহুর দখলে। নামকরণ হ'য়েছে সাহুর চর। সরকারি দপ্তর-খানাতেও সেই নাম। লিখিতভাবে চালু। আজ রাজসাহী কাল মুর্শিদাবাদ। সাহু পাকিস্তানে যেতে চায় না। পুলিশের উৎপীড়ন অত্যাচারের তিক্ততায় সে পালিয়ে এসে নুতন নিরাপদ রাজ্য গ'ড়েছে। দুই রাষ্ট্রের পুলিশের নাগালের বাইরে—তা ছাড়া ভয়ে কোন পক্ষই এগোয় না।

প্রতিবেশী এক মণ্ডলের জোয়ান ছেলের সঙ্গে সাহু তার সেই কাদম্বিনী মায়ের বিয়ে ঠিক করেছে--মেয়েটী তখন একুশের ঘরে। এর আগে কত বিয়ে ঠিক হ'য়েছে। একঘ'রের, ভয়ে সব ভেঙেছে। সাহু কিন্তু হাল ছাড়েনি। উকীলের বিটিকে ঘর বর দিতেই হবে।

মোল্লাপাড়া গ্রামে মাঝামাঝি আয়োজন উৎসাহে দুই হাত এক হ'ল। সাহু প্রাণ ভ'রে যৌতুক উপহার পাঠিয়েছে। তার দেওয়া শাড়ী কাদম্বিনী নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করে অঙ্গে জড়িয়ে মন্ত্র শুনেছে। সে আসতে পারেনি-আসা সম্ভব নয়। সত্যি মিথ্যা বড় বড় মোকর্দ্দমায় তার বিরুদ্ধে জামিন না পাওয়া গ্রেপ্তারি পরওয়ানা আছে। হুলিয়াও হ'য়েছে। শাদা পোষাকধারী ডিটেক্টিভ্ পুলিশ সাহু আসতে পারে ভেবে সন্ধ্যা থেকেই আনাচে কানাচে আড়ি পেতে আছে। চাঁদ ঢ'লে প'ড়েছে। বাসরের মেয়েরা ঘুমে আচ্ছন্ন। টিকটিকির দল দেওয়ালে ঠেস দিয়ে নিদ্রাকারে। নবদম্পতী সলাজ মৃদু আলাপনে সবে কথা সুরু ক'রেছে। এক বাবাজী এসে আশীর্ব্বাদ করে গেল। অন্য কেউ চিনলনা, জানলনা। অবশ্য কাদম্বিনী ভুল করেনি। মায়ের আনত চোখের দুফোঁটা জল সাহুর আশীর্ব্বাদি হাতে। সে হাত তখন চিবুক ধরা।

হাতেহাতে ধরা পড়া ডাকাতের মধ্যে সাহু একজন। যদিচ সাহুর ধরা-পড়ার জায়গা ও ডাকাতির ঘটনাস্থল অনেক ব্যবধান। হ'লে হবে কি, সাহু হিন্দুস্থানের আতঙ্ক। জুরি-বিচারে দোষী সাব্যস্ত হ'ল। জজসাহেব যাবজ্জীবন জেলখানায় পাঠালেন। বেশ কিছু দিন মেয়াদের কতক খেটে কতক মকুব পেয়ে সাহু ফিরে এসে ঘরসংসার করছে। তার দুই সংসার—ছেলেপুলে। তার দলের অনেকেই পাকিস্থানে।

সেখান থেকে পার হ'য়ে আসে ডাকাতি লুটপাট করে আবার পার হয়ে চ'লে যায়। সীমান্ত পুলিশ সে ত দশ বিশ টাকার ব্যাপার। সাহু তাদের প্রশ্রয় দেয়না—তারাই তার প্রধান শত্রু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। চাষবাস করে আর মাঝে মাঝে চর থেকে এসে উকিলের চিঠির সঙ্গে এখানে ওখানে দেখা ক'রে ফলটা দুধটা দিয়ে যায়। গ্রামের লোকেরা কেউ ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করেনা। সাহু পাকিস্তানে যায়নি, যেতে চায়না। বলে ওপারের বেহেস্ত অপেক্ষা এ পারের জেল তার আপন।

পাকিস্তানি দল ধরা প'ড়েছে। আসামীর মিথ্যা ও শিখিয়ে দেওয়া স্বীকারোক্তিতে সাহুর আবার যাবজ্জীবন মেয়াদ—এবার খুনসহ ডাকাতি।

৯

সেদিন কলকাতায় এক জেলখানায় গেছি। বন্ধু ও সহকর্মী রাজবন্দীর সঙ্গে মোলাকতে। বেরিয়ে আসছি—দেখলাম পিছন দিয়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘদেহী আত্মপ্রত্যয়ী কয়েদী সাহু তার যক্ষ্মাগ্রস্ত দ্বিতীয় পত্নীর সঙ্গে গরাদের ব্যবধানে কথা কইছে "খোদার ফজলে আমি ফিরব তবে ততদিন কি তুই থাকবি?" মেয়েটা বিদায় দিচ্ছে। কয়েদী দুহাতে সজোরে গরাদ চেপে ধরে হঠাৎ শেষ প্রশ্ন করল। "হ্যাঁরে আমার কাছুমা ভাল আছে?" উত্তর কানে গেলনা। সবাই সবাই নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেল সাহু ঘেরা দেওয়ালের অন্তঃপুরে। আমি যেন পরের পায়ে হেঁটে বেরিয়ে এলাম অপরাধীর মত ভাবছি। সাজা পাওয়া খুনি ডাকাত উকিলের চিঠির জন্য তার কি দরদ।

প্রকৃতির পরিহাস

·অশোক সেন·

এ্যালবেয়ার কামুর একটি নাটকে কয়েক বছর আগে এক অদ্ভুত কাহিনী পড়েছিলাম। ফ্রান্সের কোন এক শহরের সীমান্তে একটি ছোট হোটেলগোছের ছিল। এর খুব কাছেই ছিল সমুদ্র। হোটেলটি চালাতো এক বিধবা মহিলা এবং তার মেয়ে। এই বৃদ্ধা বিধবার একমাত্র ছেলে বছর কুড়ি আগে এখান থেকে পালিয়ে যায়—তারপর আর তার কোনও খোঁজ এরা পায়নি।

এই কুড়ি বছরের ভেতর ব্যবসা করে ছেলেটি নিজের ভাগ্য ফিরিয়ে ফেলে। ইতিমধ্যে সে বিয়েও করেছিল। এরপর সে স্ত্রীকে নিয়ে মা এবং বোনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য তার কর্মস্থল থেকে রওনা হয়। সোজাসুজি মায়ের ওখানে না গিয়ে সে শহরের একটি বিখ্যাত হোটেলে এসে ওঠে এবং স্ত্রীকে সেখানে রেখে পরের দিন বিকেলে মায়ের সঙ্গে দেখা করতে যায়। স্ত্রীকে বলে যায়, সে রাত্রে সে মায়ের ওখানে গিয়ে উঠবে এবং পরের দিন বিকেলের আগে নিজের থেকে নিজের পরিচয় প্রকাশ করবেনা। তার মা, বোন যদি তাকে চিনতে না পারে তাহলে এ নিয়ে খুব মজা করা যাবে। তার স্ত্রীকে সে নির্দেশ দিয়ে যায়, সে যেন পরদিন সন্ধ্যায় তার মার ওখানে গিয়ে মিলিত হয়। লোকটি আসবার পর মা এবং বোন সত্যিই তাকে চিনতে পারেনা। এদিকে ঐ মা এবং বোন কিছুকাল থেকেই একটা বীভৎস উপায়ের সাহায্যে অর্থ উপার্জন করছিল। কোন ধনী তাদের হোটেলে এসে উঠলে তারা গভীর রাতে লোকটিকে খুন করে তার টাকাকড়ি সবকিছু আত্মসাৎ করতো এবং শবদেহটি নিয়ে সমুদ্রে ফেলে দিত। এই রাতে মা মেয়ের সাহায্যে তার একমাত্র ছেলেকে চিনতে না পেরে, খুন করে তার দেহও সমুদ্রে ফেলে দিয়ে আসে। পরেরদিন ছেলের বৌ আসার পর মা ছেলের সম্বন্ধে সব খবর জানতে পারে এবং তখন সবাই মিলে হাহাকার শুরু করে দেয়। একাহিনীটি কিন্তু আমার খুবই অস্বাভাবিক এবং অবাস্তব বলে মনে হয়েছিল প্রথমে। কিন্তু এর কিছুদিন বাদেই খবরের কাগজে পড়লাম গয়াতে একটি হোটেলে ঠিক ঐ ধরনেরই একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা।

রাধেশ্যাম শুকলা বলে একটি যুবক গয়ার শহরতলীর একটি হোটেলে এসে উঠেছিল। সে ছিল এলাহাবাদের কোন কলেজের ইতিহাসের লেকচারার। ভারতবর্ষের হিন্দু মন্দিরগুলোর স্থাপত্য সম্বন্ধে একটা থিসিস তৈরী করে ডক্টরেট ডিগ্রী নেবার জন্য সে প্রস্তুত হচ্ছিল এই সময়টায়। গয়াতে যে এসেছিল প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দিরের আর্কিটেকচারের সম্বন্ধে গবেষণা করতে। কিছুদিন বাদে খরচ কমাবার জন্য সে শহরের হোটেল ছেড়ে শহরতলীর একটি সস্তা হোটেলে উঠে যায়। তারপরেই সে নিখোঁজ হয়। পরে পুলিশের অনুসন্ধানে আবিষ্কৃত হয় যে, হোটেলের মালিকই তাকে হত্যা করে হোটেলের ভেতরদিকের জমির সংলগ্ন একটি পাতকুয়োতে তার খণ্ড-বিখণ্ড দেহ ফেলে দিয়েছিল তার টাকাকড়ি আত্মসাৎ করবার জন্য। রাধেশ্যামের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছাড়াও ঐ পাতকুয়োতে আরও কয়েকটি মানুষের দেহের কর্তিত অংশবিশেষ পাওয়া যায়। হোটেলের মালিক মহেশ্বরীপ্রসাদ

শর্মাকে এর পর গয়ার পুলিশ খুনের অপরাধে গ্রেপ্তার করে। তারপর আর এই খুনসংক্রান্ত কোন খবর আমাদের এখানকার কোন কাগজে আমার চোখে পড়েনি।

কিন্তু এর বছরকয়েক বাদে লক্ষ্ণৌতে বেড়াতে গিয়ে অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট জয়প্রকাশ ভাল্লার সঙ্গে আমার আলাপ হয়। কথায় কথায় একদিন তিনি আমাকে রাধেশ্যাম হত্যার সমস্ত কাহিনীটি বলেন। ঐ হত্যার সময়ে ভাল্লা সাহেব ছিলেন গয়ার প্রধান থানার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ-অফিসার। এ কেসটির ইন্‌ভেস্টি-গেশনের ভার তাঁরই উপর পড়েছিল।

ভাল্লা সাহেবের কাছে যে কাহিনী শুনেছিলাম। তা হচ্ছে এই :

রাধেশ্যাম ছিল দয়াস্বরূপ শুক্লার পালিত পুত্র। ছোটবয়সে তার মা তাকে নিয়ে প্রয়াগে কুম্ভমেলা দেখতে এসেছিল দেশের কয়েকজন লোকের সঙ্গে। সেখানে একদিন সে হারিয়ে যায়। দয়াস্বরূপ শুক্লা সেসময় একটি জীবনবীমা কম্পানীতে ইন্সপেক্টরের কাজ করতেন। তাঁর অফিসের কেরাণী হরিনাথ পাণ্ডে ছেলেটিকে রাস্তার ধারে কাঁদতে দেখে তাকে বাড়ী নিয়ে আসে। এরপর দয়াস্বরূপ এবং হরিনাথ অনেক খোঁজখবর করেও ছেলেটির মা বা অন্য কোন আত্মীয়ের সন্ধান পাননি। পুলিশেও খবর দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তারাও কিছু করতে পারেনি—কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া সত্বেও কোন জবাব পাওয়া গেল না। শেষে পুলিশের অনুমতি নিয়ে দয়াস্বরূপ ছেলেটিকে নিজের কাছে পালতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রীও ছেলেটিকে পেয়ে খুব খুশী। কারণ তাঁদের নিজেদের কোন সন্তান ছিল না। ছেলেটার গলায় একটা পিতলের হার ছিল তার সঙ্গে যুক্ত ছিল একটি লকেট। লকেটটি খুলে দেখা গিয়েছিল তার ভিতরে খোদাই করে আঁকা রয়েছে বর্শাবিদ্ধ একটি বন্যবরাহের ছবি।

যাই হোক দয়াস্বরূপের বাড়ীতেই মানুষ হতে লাগল রাধেশ্যাম—এঁদের স্বামী-স্ত্রীকেই সে নিজের বাবা-মা বলে জানতো। রাধেশ্যাম নামটাও দিয়েছিলেন এঁরাই। রাধেশ্যামের বয়স যখন একুশ-বাইশ সেই সময় দয়াস্বরূপের স্ত্রী মারা যান। এর পর থেকে তাঁর সমস্ত স্নেহ গিয়ে পড়লো এই ছেলেটার ওপর। কারণ সংসারে দয়াস্বরূপের নিজেরজন বলতে আর কেউ ছিলনা।

লেখাপড়ার ব্যাপারে রাধেশ্যাম বেশ মেধার পরিচয় দিয়েছিল। প্রত্যেকটি পরীক্ষায় সে প্রথম বিভাগে পাশ করে, শেষপর্যন্ত ইতিহাসে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে সনাতন মহা আর্যবিদ্যালয় কলেজের ইতিহাস-বিভাগে লেকচারারের পদ পায়। এরপর সে ঠিক করে ভারতের সমস্ত হিন্দুমন্দিরের আর্কিটেকচারের উপর সে একটি থিসিস লিখবে। এই থিসিসের উপর সে নিশ্চয় পি-এইচ্-ডি ডিগ্রী অর্জন করতে পারবে এবং তখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা বড় চাকরি পাবার আর কোন বাধা থাকবে না। আগেই বলা হয়েছে যে, সে গয়াতে এসেছিল বিষ্ণুমন্দির ও অন্যান্য ছোটখাট হিন্দুমন্দিরগুলো পরীক্ষা করে দেখবার জন্য।

দয়াস্বরূপ সেইসময় কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করে এলাহাবাদেই রয়েছেন। রিটায়ার করবার পর অফিস থেকে যে টাকা তিনি পেয়েছিলেন তাই দিয়ে এলাহাবাদে একটি দোতলা বাড়ী তিনি করেছিলেন উপরতলায় থাকতেন তিনি এবং রাধেশ্যাম, আর একতলাটা ভাড়া খাটতো। এই ভাড়ার টাকা এবং রাধেশ্যামের রোজগারে ভালয়-মন্দয় চলে যাচ্ছিল।

রাধেশ্যামকে দয়াস্বরূপ সহজে চোখের আড়াল করতে চাইতেন না। কিন্তু রিসার্চ করবার জন্য যখন তার বাইরে যাবার দরকার দেখা দিল তখন আর বাধা দেবেন কি করে। তবে রাধেশ্যাম তাঁকে আশ্বস্ত করে গেল যে, যেখানেই যখন সে থাকবে, সপ্তাহে দু'টি করে চিঠি তাঁকে লিখবে। এর আগে যখন সে দক্ষিণ-ভারতে এবং অন্যান্য জায়গায় কাজ করতে গেছে, নিয়মিতভাবেই তার কাছ থেকে চিঠি পেয়েছেন দয়াস্বরূপ। কিন্তু গয়ায়-শহরতলীতে রঘুবীরপ্রসাদের হোটেলে ওঠবার পর প্রথম সপ্তাহে একটিমাত্র

সপ্তাহ থেকে চিঠি আসা বন্ধ হয়ে যায়। দয়াস্বরূপ একটা টেলিগ্রাম করলেন। কিন্তু কোন উত্তর এল না রাধেশ্যামের কাছ থেকে। এরপর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে খোঁজ নিতে গেলেন—কারণ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বৃত্তি নিয়েই সে রিসার্চ করছিল। সেখানে গিয়ে জানলেন যে, দিন চৌদ্দ আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রাধেশ্যামকে হাজারখানেক টাকা পাঠানো হয়েছিল—এটা ছিল তার তিনমাসের পাওনা টাকা। এর প্রাপ্তি সংবাদও দুদিন বাদেই তাঁরা পেয়ে গেছিলেন। তবে এরপর রাধেশ্যামের তরফ থেকে আর কোন খবর বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেনি।

দয়াস্বরূপ এরপর খুবই চিন্তিত হয়ে উঠলেন। তাঁর মন তাঁকে বার বার বলতে লাগল নিশ্চয়ই রাধেশ্যামের খুব বড়রকমের একটা বিপদ ঘটেছে—তা যদি না হোত তাহলে এতদিন সে চিঠি বন্ধ করে থাকত না। টেলিগ্রাম করলেন, তারও উত্তর এল না। বৃদ্ধ দয়াস্বরূপ আর স্থির থাকতে পারলেন না। গয়াতে গিয়ে নিজেকেই খোঁজ নিতে হবে—ভাবলেন দয়াস্বরূপ।

তার পরের দিন ভোরবেলায় তিনি গয়াতে এসে পৌছলেন। তারপর একটি টাঙ্গা নিয়ে সোজা চলে এলেন মহেশ্বরীপ্রসাদের হোটেলে। হোটেলটিতে গোটাদশেক ঘর, পেছনদিকে একটি মাঠ। মহেশ্বরী ভোরবেলাতেই কি একটা কাজে বেরিয়েছেন—তাঁর ম্যানেজার কিফায়েৎ কিন্তু উপস্থিত ছিল। লোকটির গাট্টাগোট্টা চেহারা—চোখদুটো লাল, দেখলেই বোঝা যায় সুরাপানে অভ্যস্ত। কথাবার্তা কিন্তু তার বেশ মিষ্টি। দয়াস্বরূপ যখন তাকে রাধেশ্যামের বিষয় জিজ্ঞেস করলেন, প্রথমটায় সে ঠিক চিনতে পারল না। তারপর খাতাপত্র দেখে বললে—হ্যাঁ হ্যাঁ, কদিন আগে ঐ নামের এক ভদ্রলোক এসেছিলেন। দিনকতক এই হোটেলে ঐ কোণার ঘরে ছিলেন। তারপর এখান থেকে চলে গেছেন। তা আপনি যদি এখানে থাকতে চান তো ঐ ঘরেই থাকতে পারেন—ঘরটা সেই থেকে খালিই আছে। দয়াস্বরূপ প্রথমটায় একটু হকচকিয়ে গেলেন। তাহলে রাধেশ্যাম গেল কোথায়? আর কোথাও গিয়ে থাকলেই বা তাঁকে কোন খবর দিল না কেন? যাই হোক ট্রেন-জার্নির পর একটু বিশ্রাম না করে আর চলে না। অগত্যা তিনি কিফায়েতের কথামতই সেই ঘরটিতে বাক্স বিছানা নিয়ে উঠলেন। স্নান সেরে চা খেয়ে একটু সুস্থ হয়ে নিলেন দয়াস্বরূপ। এমন সময় হোটেলের মালিক মহেশ্বরীপ্রসাদ এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন—এইমাত্র বাইরে থেকে এসে শুনলাম আপনি এসেছেন রাধেশ্যামবাবুর খোঁজ নিতে। কয়েকদিন আগে দিন তিনেকের জন্ম তিনি আমার হোটেলে উঠেছিলেন। তার পর চলে গেছেন—আমাদের এখান থেকে কোথায় গেলেন তা তো বলতে পারিনা। তিনি কি আপনার আত্মীয়।

"আমি তার বাবা।"

"বড়ই তাজ্জবের কথা। আমাদেরও কোন পাত্তা দিয়ে যান নি, আপনাকেও কোন চিঠিপত্র লেখেন নি। আপনার চিন্তা হওয়াটা তো খুবই স্বাভাবিক।" মহেশ্বরী প্রসাদের পায়ের দিকে চেয়ে কিন্তু দয়াস্বরূপের মাথা ঘুরে গেছিল। যে চপ্পলটি সে পরেছিল সেটা যে রাধেশ্যামের, এ বিষয়ে তাঁর কোন সন্দেহই ছিল না। কারণ রাধেশ্যাম একটা বিশেষ ডিজাইন করে এলাহাবাদের একটি দোকান থেকে এটি তৈরী করিয়েছিল। বাজারে এই রকম চপ্পল কোথাও বিক্রী হয় না। মহেশ্বরীপ্রসাদ হঠাৎ লক্ষ্য করলেন দয়াস্বরূপের দৃষ্টি তাঁর চপ্পলের উপর। চমকে উঠেই তিনি তখুনি আবার নিজেকে সামলে নিলেন। তারপর বললেন: "আমার একটু কাজ আছে, পরে আপনার সঙ্গে বসে আলাপ করব।" মহেশ্বরী ঘর ছেড়ে যাবার পর দয়াস্বরূপ যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। বৃদ্ধ দয়াস্বরূপ সারাজীবন জীবনবীমার অফিসে কাজ করেছেন। অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছে—কত উঁচু উঁচু [illegible]

সংস্পর্শে আসতে হয়েছে। আত্মবিস্মৃত হয়ে কখনও নিজের স্বাভাবিক বুদ্ধি তিনি হারিয়ে ফেলেন নি। কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি নিজের যথাকর্তব্য স্থির করে ফেললেন।

দুপুরে খাবার সময় তিনি জানিয়ে দিলেন যে, সন্ধ্যার গাড়ীতে তিনি এলাহাবাদ ফিরে যাবেন। তাঁর যাবার সময় মহেশ্বরীপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। তিনিও যেন খুব চিন্তিত এই রকম ভাব দেখিয়ে বললেন: "ছেলের পাত্তা নেই। ভারি তাজ্জব ব্যাপার। একটা চিঠি দেবেন শুক্লা সাহেব! এই কদিন আগে আমার এখান থেকে গেলেন রাধেশ্যাম বাবু তারপর আর খবর নেই—আমারও খুব চিন্তা রইল মনে মনে।"

"তা নিশ্চয় জানাবো"—জবাব দিলেন দয়াস্বরূপ। তিনি লক্ষ্য করলেন যে এবার আর মহেশ্বরীর পায়ে আগের চপ্পলটি নেই। তাঁর সন্দেহ আরও ঘনীভূত হল।

বিকেলবেলা টাঙ্গায় মালপত্র চাপিয়ে দয়াস্বরূপ হোটেল থেকে রওনা হলেন—কিন্তু ষ্টেশনে না গিয়ে সোজা চলে গেলেন গয়ার প্রধান পুলিশ-অফিসে। ওখানকার ভারপ্রাপ্ত পুলিশ-অফিসার ভাল্লা সাহেবের সঙ্গে দেখা হোল। দুজনেই দুজনকে দেখে অবাক। কলেজে পড়বার সময় ভাল্লা সাহেব ছিলেন দয়াস্বরূপ বাবুর সহপাঠী। প্রাথমিক আলাপ আপ্যায়নের পর জয়প্রকাশ ভাল্লাকে তাঁর এখানে আসবার কারণ বিশদভাবে বর্ণনা করলেন দয়াস্বরূপ শুক্লা। সমস্ত শুনে ভাল্লা জিজ্ঞেস করলেন:

"তুমি কি একেবারে নিঃসন্দেহ যে মহেশ্বরীপ্রসাদের পায়ে তুমি রাধেশ্যামেরই চপ্পলজোড়া দেখেছিলে?"
"এ বিষয়ে আমার কোনই দ্বিধা নেই—ঐ ডিজাইনের চপ্পল বাজারে পাওয়া যায় না।"

ঐ হোটেলটা সম্বন্ধে কিছু কিছু খবর আগেও আমাদের কানে এসেছে—তবে এমন কিছু প্রমাণ পাইনি, যার উপর নির্ভর করে ওখানে খানাতল্লাশী চালানো সম্ভব ছিল। যাক্ গে তুমি এখন আমার বাড়ীতে চল —আমি আমার ডেপুটীর সঙ্গে পরামর্শ করে একটু বেশী রাতে ঐ হোটেলটা সার্চ করবার ব্যবস্থা করবো।

এর পরের কাহিনী সংক্ষিপ্ত। রাত দশটার পর জনদশেক পুলিশ সঙ্গে নিয়ে ভাল্লা সাহেব তাঁর ডেপুটী এবং দয়াস্বরূপ সহ মহেশ্বরীপ্রসাদের হোটেলে এসে হাজির হলেন। সারা হোটেল তন্ন তন্ন করে তল্লাসী করেও সন্দেহজনক কিছু পাওয়া গেলনা—এমন কি চপ্পলজোড়াও উধাও।

মহেশ্বরীপ্রসাদকে চপ্পল সম্বন্ধে দয়াস্বরূপের সন্দেহের কথা বলাতে তিনি চোখ কপালে তুলে বললেন— "কি তাজ্জব কথা! এখন যে চপ্পলটা পরে আছি, সেটাই সকালে পায়ে ছিল। দু'জোড়া চপ্পল ব্যবহার করবার মত শখ বা পয়সা আমার নেই পুলিশসাহেব।

কিন্তু সমস্ত প্রকাশ হয়ে পড়লো যখন হোটেলের ভেতরদিকের প্রাঙ্গণটা দেখতে গিয়ে ভাল্লা আবিষ্কার করলেন মাটির সঙ্গে লাগা কুয়োটাকে। কুয়োটার উপরে কয়েকটা তক্তা বিছিয়ে দেওয়া ছিল। ভাল্লা সাহেব তক্তাগুলোর উপরে টর্চের আলো ফেলছেন দেখে মহেশ্বরীপ্রসাদ বললেন: "রাতের বেলায় কোন বোর্ডার এদিক দিয়ে আসতে গেলে কুয়োটায় পড়ে যেতে পারে—এই বিপদ এড়াবার জন্তই ওটার মুখটা তক্তা পেতে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।"

"তাই বুঝি! তা কুয়োর চারপাশটা উঁচু দেওয়াল দিয়ে বাঁধিয়ে দেননি কেন? এই রামশরণ! তুমি আর লছমন তক্তাগুলো হটাও তো।"

মহেশ্বরীপ্রসাদ এবার ভেতরে কাজ আছে বলে সরে যেতে চাইছিলেন। ভাল্লার ইঙ্গিতে দু'জন এসে তাঁর দু'পাশে দাঁড়ালো।

কুয়োটার ভেতর মানুষের অঙ্গের অনেক কর্তিত অংশ পাওয়া গিয়েছিল ডিকম্পোজড্ অবস্থায়। তাছাড়া কিছু হিউম্যান স্কেলিটনও ছিল তলার দিকে।

মহেশ্বরী প্রসাদকে গ্রেপ্তার করা হল এবং তার বিরুদ্ধে খুনের অপরাধে সরকারের তরফ থেকে কেস করা হল। সমগ্র বিহারে এই কেসটা তখন একটা বিরাট আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল।

মহেশ্বরী প্রথমটায় নিজেকে নির্দ্দোষ বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রসঙ্গে দয়াশ্বরূপ যখন তাঁর পালিতপুত্র রাধেশ্যামকে কিভাবে পেয়েছিলেন, তার গলার পেতলের হার এবং লকেটের ছবি প্রভৃতির বর্ণনা দিচ্ছিলেন—মহেশ্বরীপ্রসাদ চীৎকার করে কেঁদে ওঠেন। এরপর তিনি কিছুক্ষণের জন্য জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। তাঁকে সুস্থ করে তোলার পর সমস্ত অপরাধ স্বীকার করে নিয়ে কোর্টে সবার সামনে মহেশ্বীরপ্রসাদ এক স্বীকারোক্তি দেন।

সেই স্বীকারোক্তির সারমর্ম ছিল এই রকম: রাধেশ্যাম তাঁরই শিশুকালে হারিয়ে-যাওয়া ছেলে বিশ্বেশ্বরীপ্রসাদ। তাঁর মায়ের সঙ্গে যে এলাহাবাদে কুম্ভমেলা দেখতে গিয়েছিল। তারপর আর তার পাত্তা পাওয়া যায়নি। তাঁর স্ত্রী সন্তানের শোকে বছর দুয়েকের মধ্যেই মারা যান। রাধেশ্যামের গলায় যে লকেটটি ছিল ওটি বহুকাল থেকে তাঁদের বংশে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। তাঁদের এক পূর্বপুরুষ একবার বর্শার আঘাতে একটি বন্যবরাহকে বধ করেন। সেই থেকেই পরিবারের জ্যেষ্ঠপুত্রের গলায় ঐ ধরণের একটি ছবি লকেটের ভেতর এঁকে সেটি একটি পেতলের হারে যুক্ত করে ঝুলিয়ে দেওয়া হোত। এতদিন ধরে অর্থের লোভে মানুষ খুন করে যে অপরাধ তিনি করেছিলেন। আজ বৃদ্ধ বয়সে তার উপযুক্ত শাস্তি ঈশ্বর তাঁকে দিয়েছেন—নিজের একমাত্র সন্তানকে তিনি হত্যা করেছেন।

এর দু'একদিন বাদেই তীব্র অনুশোচনার জ্বালায় মহেশ্বরীপ্রসাদ বদ্ধ উন্মাদঅবস্থা প্রাপ্ত হন। বিচারে আজীবন কারাদণ্ডের আদেশ হলেও তাঁর অবস্থা দেখে তাঁকে রাঁচীর উন্মাদাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। এরপর মাসখানেকের মধ্যেই হার্ট-ষ্ট্রোকে তিনি মারা যান।

কাহিনী শেষ হবার পর ভাল্লা সাহেবকে জিজ্ঞেস করেছিলাম—"মহেশ্বরীপ্রসাদ কোন্ সাহসে রাধেশ্যামকে হত্যা করবার পর তার চপ্পলজোড়া ব্যবহার করছিল?"

ভাল্লা সাহেব বলেছিলেন—"এসব ক্ষেত্রে কি হয় জানেন? ক্রমাগত খুন করে করে এবং পুলিশের চোখে ধুলো দিতে পেরে, খুনীর মনে একটা অদ্ভুত ধরণের আত্মপ্রত্যয়ের ভাব আসে—সে ভাবে, সে যাই করুক না কেন, কেউ তাকে সন্দেহ করবে না। আর এইসব ছোটখাট ভুলগুলোর জন্যই শেষপর্যন্ত তারা ধরা পড়ে যায়। রাধেশ্যামের চপ্পলজোড়াও আমরা ঐ রাত্রেই পেয়েছিলাম কিদায়েতের বাড়ী সার্চ করতে গিয়ে। এসব জিনিসকে খুনীরা প্রাণ ধরে নষ্ট করতে পারে না। নিজেদের নানা ধরণের দুষ্কৃতির স্মারকচিহ্ন হিসাবে এসবের একটা বিশেষ মূল্য ওরা দিয়ে থাকে।

বিপ্লবী রাসবিহারী ও আজাদ হিন্দ ফৌজ

অধ্যাপক— নিশীথকুমার দত্ত

১৯১১ সালে দিল্লী ভারতের নূতন রাজধানীতে পরিণত হ'ল। এর আগেও কলকাতা ছিল ভারতের রাজধানী। নতুন রাজধানীতে এক দরবার উপলক্ষে ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর রাজকীয় মর্যাদায় হাওদায় বসে এক বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে বেরিয়েছেন বড়লাট হার্ডিঞ্জ। শোভাযাত্রার আয়োজন প্রচুর ও প্রকাণ্ড। দিল্লীর আবালবৃদ্ধবণিতা বেরিয়েছেন এই শোভাযাত্রা দেখবার জন্য। শোভাযাত্রা ক্রমশঃ এগুতে এগুতে যখন এসে পৌছুল চাঁদনী-চকে তখন শোভাযাত্রার শোভা আর ধরে না। হঠাৎ যেন বজ্রপাত। আকাশ তো পরিষ্কার তবে কি হলো? খোঁজ খোঁজ রব পড়ে গেল। হৈ হৈ ব্যাপার দেখা গেলো হাওদায় একটা বোমা পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে দুইজন নিহত, লেডি হার্ডিঞ্জ আহত, লর্ড হার্ডিঞ্জ একটুর জন্যে স্বর্গ যাবার পাশপোর্ট পেলেন না। কে যে ঐ বোমা মারল তার কোন হদিশ পাওয়া গেল না। ডাক পড়ল দেশবিদেশের ধুরন্ধর পুলিশ অফিসার, ও সি, আই, ডিদের। অনেককেই সন্দেহ করে আটক করা হ'ল এবং পরে বিচার হ'ল। কেউবা পেল দ্বীপান্তরের পরওয়ানা, কেউবা পেল পৃথিবী ছাড়ার হুকুমনামা। সেদিনের বিচারকে বিচার বলা যায় না। কেন না আসল বোমা নিক্ষেপকারী রয়ে গেল পুলিসী জালের বাইরে।

মানব-যজ্ঞের এই প্রধান পুরোহিতের মাথায় উপর ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করল দশ হাজার টাকা। কিন্তু সবই ব্যর্থ। ঐ দিনই সন্ধ্যাবেলায় দেরাদুন শহরে এক সভায় লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ করার জন্য তীব্রনিন্দা করলেন এক বাঙালী যুবক। সাহেবের দল তাকে দিল বাহবা এবং তাঁদের একজন পরমবন্ধু বলে জানল। এই যুবকের এত সাহেব-প্রীতি কেন? উত্তর এখুনি মিলবে।

এই যুবকই হ'ল দিল্লীর চাঁদনীচকের লর্ড হার্ডিঞ্জের হাওদায় প্রকৃত বোমা-নিক্ষেপকারী শ্রীরাসবিহারী বসু। ইনি বোমা নিক্ষেপের কিছুক্ষণ পরে দিল্লী থেকে উধাও হয়ে দেরাদুন উপস্থিত হন। পাছে কেউ সন্দেহ করে তাই দেরাদুনে প্রকাশ্যসভায় বড়লাটের হাওদায় বোমা-নিক্ষেপকারীর তীব্র নিন্দা করেন। আজকের স্বাধীন ভারতে বসে এতবড় ধাপ্পাটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হচ্ছে কিন্তু অগ্নিযুগের রাসবিহারীর কাছে এটা একটা তামাসা মাত্র।

বিশ্বাসঘাতক মির্জাফরের অভাব কোন সময়েই ছিল না। তাই ধীরে ধীরে ব্রিটিশ সরকার প্রকৃত দোষীর নাম জানতে পারল। রাসবিহারী গোপনে গা ঢাকা দিয়ে পালিয়ে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু এইরকম করে গা ঢাকা দিয়ে অলস হয়ে বসে থাকা তার মোটেই ভাল লাগল না। তিনি ব্রিটিশ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে ভারত ত্যাগ করার সংকল্প নিলেন। কিন্তু অন্যদেশে পালাব বল্লেই পালান যায় না, চাই পাশপোর্ট। তিনি শুনলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জাপান-শকরের জন্য আমন্ত্রিত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। তিনি রবীন্দ্রনাথের দূর-আত্মীয় পি, এন, ঠাকুর এই ছদ্মনামে জাপানে যাবার পাশপোর্ট যোগাড় করলেন। শেষপর্যন্ত

রাজা পি, এন, ঠাকুর জাপানে গিয়েও পৌঁছুলেন। কিছুদিন যেতে না যেতেই ব্রিটিশ সরকার খবর পেলেন ঐ পি, এন, ঠাকুর রাসবিহারী বসু ছাড়া আর কেউ নয়। ব্রিটিশ সরকার জাপান-সরকারকে অনুরোধ জানালেন রাজা পি, এন, ঠাকুর বলে যে লোকটি জাপানে গেছে তাকে ফেরারী আসামী বলে গ্রেপ্তার করে ভারতে পাঠাতে। জাপান-সরকারের আদেশ অনুযায়ী জাপানী-পুলিশ তাকে ধরার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। কিন্তু তার চেয়ে বেশী তৎপর হয়ে উঠল রাজা পি, এন, ঠাকুরের বন্ধুরা তাঁকে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। তাঁকে রক্ষা করার ব্যাপারে যাঁরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা হলেন জাপানের ব্লাক-ড্রাগন সোসাইটির প্রধান কর্মকর্তা ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় নেতা শ্রীমিৎ-সুই তোয়ামা শ্রীআইযো সোমা ও শ্রীমতী সোমা এবং আরো অনেকে। আইযো সোমার টোকিও শহরে নিজেদের বাড়ীতে একটি পাউরুটির দোকান। দোকানটিতে মোটামুটি সব সময় ভীড়।

জাপানে রাসবিহারী বসু কি করে পুলিশের হাত থেকে রক্ষা পেলেন তার একটি বিবরণ দিয়েছেন শ্রীমতী সোমা। Rash Behari Basu (Memorial series) গ্রন্থে এই বিবরণ থেকে জানা যায়--টোকিওর মধ্যস্থানে প্রকাণ্ড উদ্যানযুক্ত শ্রীতোয়ামার বাড়ী। তোয়ামার বাড়ীর পাশেই হল অধ্যাপক টেরাওয়ের বাড়ী। রাসবিহারী ও তাঁর বন্ধু হেরম্বলাল গুপ্ত দুইজনে তোয়ামার বাগানবাড়ীর মধ্য দিয়ে ঢুকে অধ্যাপক টেরাওয়ের বাড়ী প্রবেশ করে অবশেষে টেরাওয়ের বাড়ীর অব্যবহৃত পেছনের দরজায় এঁদের জন্য অপেক্ষমান একটি মোটরে চড়েন। পুলিশের সন্দেহ এড়াবার জন্য রাসবিহারী ও তাঁর বন্ধু মাথায় টুপি লাগিয়ে জাপানী-ওভারকোট পরিহিত অবস্থায় ছিলেন। মোটরে রাসবিহারীর সঙ্গী হলেন দুইজন জাপানী শ্রীসোমা ও তুকুদা। তুকুদা হলেন সন্ত্রাসবাদী একজন জাপানী-নেতা। রাত্রির অন্ধকারে এই চারজনকে নিয়ে এই গাড়ী এগিয়ে চলল শ্রীসোমার দোকানের দিকে। সময় প্রায় রাত্রি বারোটা। সোমার দোকান বন্ধ হব হব অবস্থায়। চারজন লোক কিছুক্ষণের জন্য মোটর থেকে নামল। লোকেরা কে তা বলা নিষ্প্রয়োজন হলেও পরে যে চারজন ঐ মোটরে ফিরে গেলেন তাদের পরিচয়টা নিতান্তই প্রয়োজন। রাসবিহারী ও শ্রী.হেরম্বলাল গুপ্ত ও শ্রীসোমা নিজে মোটর থেকে নেমে আর মোটরে ওঠেননি। এদের বদলে উঠেছিলেন শ্রীসোমার তিনজন কর্মচারী। সুতরাং মোটরে মোট চারজনই রইলেন পুলিশের সন্দেহ এড়াবার জন্য। রাসবিহারী বসুকে সোমাদের বাড়ীর এক নির্জন কোণে সময় কাটাতে হত। জাপানী ভাষা না জানায় সোমা পরিবারের মধ্যে রাসবিহারীর বসবাসের যথেষ্ট কষ্ট হয়েছিল সন্দেহ নাই। তবে সোমা পরিবারের রাসবিহারীর প্রতি অকপট ভালবাসা সেই কষ্টের অনেকখানি লাঘব করেছিল। শ্রীসোমাকে বাবা ও শ্রীমতী সোমাকে মা বলে ডাকতেন তিনি। সোমারাও পুত্রের মত তাকে স্নেহ করতেন।

গ্রেপ্তারি পরওয়ানা জারী হবার চারমাস পরে হঠাৎ এক ব্রিটিশ সামরিক-জাহাজ হঙকঙ-(Hongkong) গামী জাপানী ষ্টীমারে যাত্রীদের উপর অকথ্য অত্যাচার করে। এই অত্যাচারের সংবাদে সমগ্র জাপানী জনগণ ব্রিটিশ সরকারের তীব্রনিন্দা করতে লাগল। জাপানী-জনগণের এই বিক্ষোভে ভীত হয়ে ব্রিটিশ সরকার শংকিত হলেন এবং ভাগ্যক্রমে রাসবিহারী বসুকে ভারতে চালান দেবার আদেশ স্থগিত রাখলেন। এই আদেশের সুযোগ নিয়ে ১৯১৫ সালে এপ্রিল মাসের এক ভোরবেলায় রাসবিহারী সোমা-পরিবারের কাছ থেকে চলে গিয়ে অন্যান্য বন্ধুদের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে রইলেন দীর্ঘ আট বৎসর। সোমা পরিবারে তিনি ছিলেন প্রায় সাড়ে চার-মাস এবং এই অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্বোধ্য জাপানী-ভাষাকেও ভাল করে আয়ত্ত করেন। সোমাপরিবার রাসবিহারীকে এত স্নেহ করতেন যে শেষপর্যন্ত তাদের জ্যেষ্ঠ কন্যা তোসিকো সোমার সঙ্গে শ্রীবসুর বিবাহ দেন। রাসবিহারীর গোপন বাসকালে এই বিবাহ গোপনে সম্পন্ন করা হয়। বিবাহ সম্পন্ন হলে শ্রীতোয়ামার চেষ্টায় ১৯২৩ সালে রাসবিহারীর জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করার কোন প্রশ্ন উঠে না। সুতরাং আরম্ভ হোল ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রকাশ্য অভিযান ও আন্দোলন। জাপানের সভা-সমিতিতে তিনি ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে

জনমত গড়ে তুলতে লাগলেন। এছাড়াও "Voice of Asia" নামক একটি মাসিক সংবাদপত্রিকা প্রকাশ করেন।

ইণ্ডিয়ান ইন্‌ডিপেণ্ডেনস্ লীগ (I. I. L.)--যুদ্ধকালে জাপ-অধিকৃত ব্রিটিশ দেশগুলির ভারতীয় নাগরিকগণকে যাতে করে শত্রুপক্ষের লোক না ভাবা হয় পরন্তু তাদের জাপানের বন্ধু হিসাবে গণ্য করা হয় তার জন্য রাসবিহারী আবেদন জানালেন মার্শাল শুগিয়ামার কাছে। শুগিয়ামা হচ্ছেন Chief of the Imperial General Staff of Japanese Army, শুগিয়ামা রাসবিহারীর কথায় রাজী হলেন না। তিনি বল্লেন ব্রিটিশ রাজ্যের যেকোন লোকই জাপানের শত্রু। রাসবিহারী তাকে বোঝালেন যে ব্রিটিশ ভারতীয়দের স্বাধীনতা হরণ করেছে সুতরাং ভারতীয়রা কিছুতেই ব্রিটিশের বন্ধু হতে পারে না। ভারতীয়রা তাদের নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ব্রিটিশ সরকারের হুমকিতে ব্রিটিশকে সমর্থন করেছে। মনেপ্রাণে এরা ব্রিটিশকে ভারতভূমি থেকে উৎখাত করতে চায়। শুগিয়ামার কাছে আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হল। তিনি সরাসরি Deputy War Minister-এর সঙ্গে দেখা করে তাকে সব বুঝিয়ে বললেন। তিনি শেষ পর্য্যন্ত রাসবিহারীর সকল প্রস্তাব মেনে নিলেন এবং সৈন্যবাহিনীকে নির্দেশ দিলেন জাপ অধিকৃত ব্রিটিশ দেশগুলির ভারতীয়দের সঙ্গে যেন বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করা হয়। রাসবিহারীর উদ্দেশ্য ছিল সমগ্র পূর্ব এশিয়ার ভারতীয়দের এক করে ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র অভিযান চালিয়ে ভারত ভূমি থেকে ব্রিটিশদের উৎখাত করা।

দূর প্রাচ্যের ভারতীয়দের একজোট করে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অভিযান চালাবার জন্য ১৯২৪ সালে রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে গড়ে উঠল জাপানের Indian Independence League (I. I. L)। রাসবিহারী বসুই হলেন এই I. I. L এর সভাপতি। এরপরে I. I. L-এর বিভিন্ন শাখা ছড়িয়ে পড়ল পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে

ক্রমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে জাপান অক্ষশক্তির সঙ্গে যোগ দিল ও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। রাসবিহারী এই সুযোগ নিতে ভুললেন না। জাপানী-সৈন্যদের সঙ্গে একযোগে ভারতের ইংরেজ সরকারকে আক্রমণ করবার কথা ভাবলেন। ১৯৪২ সালে ১৫ই জুন ব্যাঙ্ককে I. I. L-এর একটি সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে Indian National Army-র গঠন ও কার্যপ্রণালী বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এই সম্মেলনে স্থির করা হয় যে জাপানকর্তৃক ধৃত ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে (I. N. A) গড়ে তোলা হোক। ভারতের মুক্তির জন্য আগ্রহী ভারতীয় যুবকরাও যাতে I. N. A তে যোগ দিতে পারে সেকথাও এই সম্মেলনে বলা হল। এই সম্মেলনে ঠিক করা হয় যে, I. N. A কে পরিচালনা করবেন একজন General Officer Commanding. এই G. O. C আবার Council of Action এর মতামতানুযায়ী চলতে বাধ্য থাকবেন। Council of Action হ'ল I. I. L এর একটি বিশেষ বিভাগ। I. N. A গঠিত হলে I. N. A এর G .O. C পদে অধিষ্ঠিত হলেন ক্যাপ্টেন মোহন সিং। কিন্তু মোহন সিং চাইলেন যে তাঁর উপরে কথা বলবার আর কেউ থাকবে না। অর্থাৎ মোহন সিং Council of Action এর কর্তৃত্ব মানতে অনিচ্ছুক হলেন। এই নিয়ে I. N. A পরিচালনায় ভাঙন দেখা দিল। রাসবিহারী এতে যথেষ্ট চিন্তিত হলেও ভেঙে পড়লেন না। তিনি পুনরায় ঢেলে সাজালেন I. N. A কে। কিন্তু এই সময় তাঁর শরীর বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ায় তিনি I. I. L ও I. N. A কে সুযোগ্য লোকের হাতে তুলে দেবার কথা চিন্তা করলেন। রাসবিহারীর মত এক দূরদর্শী বিপ্লবী-নেতার মোটেই ভুল হল না তাঁর উত্তরাধিকারী স্থির করতে। তিনি ডেকে পাঠালেন ভারতের আর এক বিপ্লবী সন্তান সুভাষচন্দ্র বসুকে। সুভাষচন্দ্র বসু তখন ভারত থেকে গোপনে পালিয়ে জারমানিতে গিয়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য নিরলস চেষ্টা করছিলেন। সুভাষচন্দ্র কোন দ্বিধা না করে আনন্দের সঙ্গে সাড়া দিলেন রাসবিহারীর এই ডাকে।

জারমান সরকার সুভাষচন্দ্রকে জাপানে পাঠাবার সকল ব্যবস্থা করলেন। জারমান থেকে জাপানে আসতে গেলে যে কোন মুহূর্তে শত্রুপক্ষের হাতে ধরা পড়ার সম্ভাবনা। সুভাষচন্দ্রর জারমান থেকে জাপানে আসা একটা সত্যিই চমকপ্রদ ঘটনা। হিউ টয়ের লেখা থেকে এর একটু বলছি—"সুভাষচন্দ্র বসু ও আবিদ হোসেন ১৯৪৩ এর ৮ই ফেব্রুয়ারী এক জারমান সাবমেরিনে করে কিয়েল ত্যাগ করলেন। তারা অনেকটা ঘুরে আটলান্টিকে এসে পড়লেন এবং তারপর উত্তমাশার মাদাগাস্কারের চারশো মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে পূর্ব-নির্দিষ্ট এক জায়গায় এসে পৌঁছুলেন। সেখান থেকে ২৮শে এপ্রিল রবারের ডিঙিতে চড়ে তাঁরা জাপানী 1—29 ডুবোজাহাজে গিয়ে উঠলেন। এই ডুবোজাহাজে ভারত মহাসাগর পার হলেন। সুমাত্রার উত্তর প্রান্তের সাবাং (Sabang) থেকে তারা কর্নেল ইয়ামামোতোর সঙ্গে বিমানপথে টোকিও গেলেন। কর্নেল ইয়ামামোতো সাবাং (Sabang) এ অভ্যর্থনার জন্যে উপস্থিত ছিলেন। জাপানে পৌঁছানোর পরদিন নেতাজীকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন জেনারেল তোজো। জারমান থেকে জাপানে পৌঁছুতে নেতাজীর সময় লেগেছিল পাঁচমাস। অবশেষে নেতাজী ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরে পৌঁছুলেন। ঐ স্থানের ক্যাথি রঙ্গমঞ্চ প্রাঙ্গণে এক আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে শ্রী রাসবিহারী বসু নেতাজীকে I. I. L এর সভাপতি ও I. N.A-এর সর্বোচ্চ সেনাধিনায়কের পদে অভিষিক্ত করলেন। এইভাবে আজাদহিন্দের ভার অর্পিত হয়েছিলো সুভাষচন্দ্রের ওপর।

এ প্রবন্ধটি "Rasbehari Basu; His Struggle for Independence" নামক সংকলন গ্রন্থ ও Hugh Toye-এর "Subash Chandra Bose" গ্রন্থ অবলম্বনে বিরচিত।

বাংলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে 'বিবেকের' বিষম দংশন !!

'রাষ্ট্রপতি' সর্ব্বভারতের, কাজেই রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন তথা ভোটদান বিষয়ে বাঙলা ও বাঙালীর দিক হইতে কিছু মন্তব্য করিবার অবকাশ অবশ্যই আমাদের আছে। রাষ্ট্রের চতুর্থ 'পতি' নির্ব্বাচনে এবার আমরা অনেকের বিশেষ করিয়া কংগ্রেসীদের মনে বিবেকের দংশন, তথা ক্রিয়া দেখিয়া পরম তৃপ্তিলাভ করিয়াছি। এতদিন ভাবিতাম যে 'বিবেক' নামক অদৃশ্য কিন্তু 'হাই-পাওয়ার' শক্তিটি মানুষের মনে ধর্ম্ম এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত মানবিক (পলিটিক্যাল নহে) বিষয়ে (যেমন ভগবানে বিশ্বাস, জাতিভেদ, অস্পৃশ্যতা, পশুহত্যা প্রভৃতি) কাজ করিয়া থাকে এবং মানুষকে সত্যপথ দেখায়; কিন্তু রাজনৈতিক ব্যাপারে বিবেকের কোন স্থান আছে বলিয়া এতাবত জানিতাম না। এইটাই জানিতাম যে রাজনীতি তথা পলিটিক্সে বিবেকের কোন স্থান নাই এবং বিবেকবান' ব্যক্তি রাজনীতিতে এই বস্তুটির আমদানী করা বিপজ্জনক বলিয়া মনে করেন। সাধারণত যাঁহারা রাজনীতি লইয়া মাতিয়া থাকেন এবং নক্ আউট টুর্ণামেন্টে অংশ লইয়া থাকেন তাঁহারা তাঁহাদের বিবেক (যদি থাকে) নামক বস্তুটিকে অন্য কোথাও বা অন্য কাহারও 'সেক্-ডিপজিটে' গচ্ছিত রাখিয়া রাজনীতি অর্থাৎ পলিটিক্সের ডার্টি-গেমে আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ বাক্য প্রায়ই শোনা যায় Honesty is the best policy। এই প্রবাদ বাক্যের বাস্তব অর্থ এই যে—অনেষ্টির (সততা) নিজস্ব মূল্য কিছুই নাই, কিন্তু অনেষ্টি অমূল্য সম্পদে পরিণত হয় সেই মুহূর্ত্তে, যে মুহূর্ত্তে পলিসি হিসাবে ইহা অতিফলদায়ক বা কার্য্যকর হয়।

এবারের রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের ব্যাপারে যে সকল মহাশয় কংগ্রেসী সদস্য এবং অন্যান্য সদাশয় রাজনৈতিক দলীয় এম এপি, এম এল এ, এবং এম-এল-সিদের মনে হঠাৎ এমন একটা বিরাট এবং বিষম বিবেক-চেতনা এবং জনগণের প্রতি প্রেমের বন্যা প্রবাহ দেখা গেল, তাহা অদ্ভুত এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব !

রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনের ব্যাপারে ভোটদান প্রসঙ্গে এতকথা বলিবার প্রয়োজন হয়ত হইত না যদি না দেখিতাম একশ্রেণীর রাজনৈতিক তৃতীয় শ্রেণীর খেলোয়াড় প্রায় মৃত কংগ্রেসকে শেষ আঘাত হানিবার জন্য কংগ্রেসী মহলে ভাঙ্গন ধরাইবার প্রাণপণ চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করিতেন। নিজেদের দলীয় শক্তি এবং পার্টি-ডিসিপ্লিন অটুট রাখিয়া অকংগ্রেসী পার্টিগুলি কংগ্রেসী সদস্যদের একটা বড় অংশকে বিবিধ প্রকারে প্ররোচিত উৎসাহিত করিয়া দলীয় নির্দ্দেশ অমান্য করিতে যথেষ্ট 'সাহায্য' করেন, তাঁহাদের এ-অপচেষ্টা সার্থকতাও অর্জ্জন করে প্রভূত পরিমাণে।

তথাকথিত কংগ্রেসী সিণ্ডিকেটের প্রতি কোন প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি আমাদের নাই এবং একথা আমরা বিশ্বাস করি যে, এই সিণ্ডিকেটই একদা বিরাট শক্তির আধার কংগ্রেসকে আজ প্রায় শক্তিহীন করিয়াছে।

এবং এই গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল সিণ্ডিকেটের মোড়লরাই কংগ্রেসকে যথাসময়ে দিল্লীর শান্তিবনে চিরশান্তির আস্তানা করিয়া দিবে! এ বিষয়ে কাহারও সাহায্য প্রয়োজন হইবে না। ভাবিতে দুঃখ হয়, মনে বিস্ময়ও জাগে, আমাদের প্রধান মন্ত্রী মহাশয়া, কংগ্রেসের দৌলতে দেশের প্রধান প্রশাসকের পদপ্রাপ্তির পর উচ্চ আসনে বসিয়া কংগ্রেসরূপ মইটিকে লাথি মারিয়া মাটিতে ফেলিয়া দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা লজ্জা, সঙ্কোচ বোধ করিলেন না! জানিনা কে বা কাহারা তাঁহার মনে এ ধারণার সৃষ্টি করিল যে, তিনি (শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মহাশয়া) হিটলার, মুসোলিনী, সুকর্ণ, নক্রুমা প্রভৃতি সুবিখ্যাত ডিক্‌টেটারদের অপেক্ষাও অধিকতর শক্তির ধারিকা! কথায় কথায় শ্রীমতীজি, তাঁহার প্রাসাদের সামনে জনসমাবেশ দেখিয়া মনে ভাবিয়াছেন সারা দেশের লোক (শতকরা ৯৫) তাঁহার প্রশাসন ব্যবস্থার সমর্থক! হিট্‌লার, মুসোলিনী এবং সুকর্ণকেও একথা, অর্থাৎ তাঁহাদের উঠতির সময়ে দেশের শতকরা শতজন লোকই তাহাদের বিপুল সমর্থন জানাইতে কসুর করে নাই। কিন্তু কালের বিচিত্র বিধানে সেই জনগণই বৃহৎ শক্তির আধার ডিক্‌টেটারদের পথের ধারে ডাষ্টবিনে নিক্ষেপ করতে দ্বিধা করে নাই। শ্রীমতী ইন্দিরা গত তিরিশ বছরের পৃথিবীর ইতিহাসের মাত্র কয়েকটি বিশেষ পৃষ্ঠা পাঠ করিবেন। ইতিহাসের শিক্ষা বুঝিবার এবং গ্রহণ করিবার মত মেজাজ এবং বুদ্ধি তাঁহার যদি থাকে তবে কাজে লাগাইবার চেষ্টা করুন। ভগবান ইন্দিরাকে দীর্ঘজীবী করুন!

পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে ভাঙ্গন?

সত্য ভাষণে অপরাধ নাই। পশ্চিম বাঙ্গলার কংগ্রেস আজ শক্তিহীন প্রায় সর্ব্বদিকে। এখনও বাঙ্গলার যে জনসমষ্টি কংগ্রেসের সমর্থক. রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচনে ভোটদানের ব্যাপারে বাঙ্গলা এম এল এ (এম পি) পার্টি নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া, তাঁহারা বিবেকের অনুশাসনে অকংগ্রেসী রাষ্ট্রপতি নির্ব্বাচন প্রার্থীকে ভোট দিয়াছেন—সহজ কথায় ইঁহারা 'জাতির জননী' প্রধান মন্ত্রী মহোদয়াকেই তাঁদের আনুগত্য দান করিয়াছেন যে প্রধান মন্ত্রী শ্রীরেড্ডির পক্ষে (রাষ্ট্রপতি পদের জন্য) স্বয়ং তাঁহার মনোনয়ন পত্র পেশ করেন কিন্তু তাহার অল্প পরেই নিজের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে 'চক্র-রেল' চালনা সুরু করেন এবং কংগ্রেসী সদস্যদের ভোটদান ব্যাপারে বিবেকের ঠেলা মত কাজ করিতে প্ররোচিত করেন কংগ্রেস নির্ব্বাচিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে! পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসী সদস্যরা, প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভোটদান ব্যাপারে নির্দ্দেশ অমান্য করিলেন! পশ্চিম বঙ্গ বিধান সভায় কংগ্রেসী সদস্য সংখ্যা বোধ হয় ৫৫। এবার বোধ হয় এই ৫৫ জন এম এল এ—দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিবেকের ঠেলা বা উস্কানী মত কাজ করিবেন!

রাজনৈতিক দলের সদস্যদের যদি পার্টির প্রতি আনুগত্য না থাকে এবং তাঁহারা পার্টি ম্যানডেট্ মানিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে পার্টি হিসাবে কোন দলই বেশীদিন বাঁচিতে পারে না, দলের শৃঙ্খলাও ভাঙ্গিয়া পড়িতে বিলম্ব হয় না; বাঙ্গলার দুটি কম্যু পার্টি কংগ্রেসী সদস্যদের পার্টি নির্দ্দেশ স্বীকার না করাতে তাহাদের আনন্দ গোপন করতে পারে নাই—এবং কম্যুর দল এই আশাই মনে মনে করিতেছে যে কংগ্রেস যত দুর্ব্বল হইবে ক্রমে ক্রমে, কম্যুদের শক্তি বৃদ্ধি ততই ঘটিতে থাকিবে! কম্যুর দল ভুলিয়া যাইতেছে "বিবেকের দংশন" রোগটা সংক্রামক এবং অবিলম্বে তাহা সকল রাজনৈতিক পার্টির দেহে সংক্রামিত হইতে পারে। পার্টি সদস্যদের যদি তাঁহাদের নিজ নিজ বিবেকের প্ররোচনা মত কাজ করিবার তথা ভোট দিবার অধিকার স্বীকার লওয়া ব্যাপারে শ্রীকৃপালনীর মন্তব্য উল্লেখ করা অবান্তর হইবে না। আচার্য্য কৃপালনী বলিতেছেন।

'This word (conscience) is used by Europeans in spiritual matters and not in political affairs. It is a word of doubtful content. To use it in party politics is to give it an anarchic conception. It can not regulate the conduct of an organization or party of individuals. In the west people in politics do not talk of their conscience but of their politcal principles"—

এ-বিষয় অধিক আর কিছু বলার কোন প্রয়োজন বর্ত্তমানে নাই। কেবল এই টুকু মন্তব্য করাই যথেষ্ট হইবে যে যদি কোন সদস্য মনে করেন তাঁহার পার্টির কোন সিদ্ধান্ত অথবা নির্দ্দেশ তাঁহার মতে অন্যায় বা যথোচিত হয় নাই, তবে সেই ক্ষেত্রে তাঁহার বক্তব্য হইবে (১) পার্টির সদস্যপদ ত্যাগ করা কিম্বা (২)পার্টির অন্যান্য সদস্যদের যুক্তি তর্ক দ্বারা তাঁহার মতাবলম্বী করা।

পার্টিতে থাকিব, প্রয়োজনমত পার্টির সকল সুযোগ সুবিধা গ্রহণে দ্বিধা করিব না, অথচ নিজের সুবিধা মত পার্টির নির্দ্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া পার্টির বিরুদ্ধাচরণে কোন দ্বিধা সংকোচ করিব না—পার্টি-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে এমন প্রকার সদস্যদের যথোচিত বিচার করিয়া শাস্তি বিধান, পার্টিকে বাঁচাইতে হইলে, অবশ্যই করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিতে হইবে বিচার যেন প্রহসনে পরিণত না হয় এবং বিচার যেন ব্যক্তি বা ব্যক্তিত্ব বিচার করিয়াও না হয়। মনে রাখা দরকার বিচারের মাপকাঠিতে সকলেই সমান।

প্রধান মন্ত্রীর বিষম ক্রোধ—!

ভাবিতে দুঃখ হয়, বলিতে লজ্জা বোধ করি আমাদের দেশ-মাতা প্রধান মন্ত্রী ক্রমে ক্রমে তাঁহার মানসিক ক্ষমতা হারাইয়া ফেলিতেছেন, নিজের সম্বন্ধে তাঁহার অতি শ্রদ্ধা এবং নিজের সকল সিদ্ধান্তকে তিনি এতই নির্ভুল মনে করেন যে কোন সংবাদপত্রে তাঁহার বিরূপ সমালোচনা, এমন কি তাঁহাকে লইয়া কার্টুন চিত্রও তিনি আবার সহজভাবে লইতে পারেন না। প্রায় প্রত্যহ তাঁহার প্রাসাদের সামনে "সেই মিটিং এ কয়েক হাজার শ্রমিক, রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, রজক, নাপিত এবং অন্যান্য শ্রেণীর কিছু সংখ্যক 'তথা কথিত' ছাত্র এবং বেকার ব্যক্তি 'ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় করণ' এর জন্য প্রধান মন্ত্রীকে সমর্থন জানাইতে সমবেত হয়। গত কিছুদিন হইতে প্রধান মন্ত্রীর এই সমাবেশে বিবিধ প্রশাসনিক বিষয়ে ভাষণ প্রদানই প্রধানতম কর্ত্তব্য হইয়াছে এবং এই কর্ত্তব্য তিনি পরম উৎসাহের সহিত পালন করিতেছেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে এই প্রকার একটি "গেট-মিটিং"-এ প্রধান মন্ত্রী সংবাদপত্রে তাঁহার ব্যাঙ্ক-রাষ্ট্রীয়করণ সম্পর্কে বিরুদ্ধ মন্তব্য এবং কয়েকটি কার্টুন চিত্রের প্রতি গেটে সমবেত পণ্ডিতমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কঠোর ক্রুদ্ধ ভাষায়। বলা বাহুল্য কলিকাতার এক বিখ্যাত ইংরেজি দৈনিক এবং একটি বাঙ্গলা সংবাদপত্রই প্রধান মন্ত্রীর টারগেট্! কোন রাষ্ট্রের কোন মাননীয় মন্ত্রীর নিকট হইতে পাবলিক্ মিটিং এ দেশের সংবাদপত্রের প্রতি এমন অশালীন কটূক্তি আমরা পূর্ব্বে দেখি নাই। কতকগুলি মতলবী স্তাবক এবং ভক্তের অহরহ প্রশংসাবাণী এবং নিজের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিতে করিতে আমাদের জাতির-জননী প্রধান মন্ত্রী নিজেকে সকল বিষয়ে অভ্রান্ত বলিয়া মনে করিতেছেন এবং তাঁহার এ-ধারণাও হয়ত হইয়াছে যে—সমগ্র ভারতের জনগণ তাঁহার গেট মিটিংএ প্রত্যহ সমবেত হইয়া তাঁহার সকল কার্য্যেরই প্রশংসা সমর্থন জানাইতেছে। প্রধান মন্ত্রী মহাশয়া সংবাদপত্রের 'পূর্ণ স্বাধীনতার' কথা বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রগুলিকে তাহাদের দায়িত্ব সম্পর্কেও সতর্ক এবং সচেতন করিয়া দিয়াছেন। এই এই সতর্কতা বাণীর মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন হুমকীর আভাস পাওয়া যায়। মনে হয় বিশেষ কয়েকটি সংবাদপত্র যদি শ্রীমতী গান্ধীর সম্পর্কে তাহাদের বর্ত্তমান মনোভাব এবং মন্তব্য প্রকাশে বিরত না হয়, তাহা হইলে দেশ-মাতা

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁহার মত এবং মনোভাব পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবেন! ইহার অর্থ অতি পরিষ্কার অর্থাৎ খবরের কাগজ চালাইয়া যদি ব্যবসা করিতে হয়, তাহা হইলে সংবাদপত্র মালিক এবং সম্পাদকগণ যেন প্রত্যহ 'গেট মিটিং-এ হাজিরা দিয়া প্রধান মন্ত্রীকে তাঁহার সর্ব্বপ্রকার কাজে এবং বেপরোয়া নীতি ঘোষণাকে তারস্বরে বাহাবা দিয়া আসেন। বর্ত্তমানে আত্মরক্ষার এই একমাত্র পথ। আমাদের একমাত্র মন্তব্য"—পথ ভাবে আমি দেব······"ইত্যাদি।

কার্য্যত দেখা যাইতেছে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণে প্রধান মন্ত্রীর সমর্থনে এমন সব ব্যক্তি, যাহাদের ব্যাঙ্কের সহিত কোনপ্রকার কাজ কারবার নাই বলিলেই হয়। অথচ ব্যাঙ্কের ঘনিষ্ঠভাবে যাহাদের স্বার্থ জড়িত, সেই হতভাগ্য আমানতকারীদের মতামত গ্রহণের কোন আবশ্যকতা কেন্দ্রীয় সরকারের বর্ত্তমান কর্ত্রী—একবারও মনে করিলেন না। প্রধান মন্ত্রী দেশের সাধারণজনের ভাগ্য পরিবর্ত্তন মানসেই নাকি আমানতকারীদের ব্যাঙ্কে গচ্ছিত অর্থ সরকারী নিয়ন্ত্রণে গায়েব করিয়াছেন। ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে আর্থিক অসাম্য দূর করাই ধনীর দুলালী বেশ কয়েক লক্ষ টাকার মালিক আমাদের প্রধানমন্ত্রীর এখন একমাত্র কার্য এবং এই মহতকর্ম্মে তিনি জনগণের পূর্ণ সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছেন। অতি উত্তম কথা এবং আমরা ইহাকে পূর্ণ সমর্থন জানাই। কিন্তু প্রধান মন্ত্রী এবং তাঁহার উগ্র এবং অন্ধ সমর্থনকারী ধনী ভক্তের দল এ-বিষয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলে কাজ সহজ হইবে। অসাম্য বিতাড়নের কাজটা প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং বাস্তবে কিছু পরিমাণে দেখাইতে পারেন, তাঁহার সঞ্চিত ধনভাণ্ডার এবং প্রয়াগস্থিত আনন্দ ভবনটি জনগণের আনন্দবর্দ্ধন এবং হিতার্থে দান করিয়া। এক সঙ্গে দিল্লীতে সরকারী আটদশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রধান মন্ত্রীর জন্য প্রস্তাবিত প্রাসাদ নির্ম্মাণ পরিকল্পনাটিও পরিত্যাগ করিয়া। প্রধান মন্ত্রী মহোদয়া যদি নিজের স্বার্থ এবং সম্পদ ত্যাগ করিয়া একটা দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, তাহার শুভফল হাজার হাজার 'গেট মিটিং' অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে।

পিতৃ-নিন্দা?

প্রধান মন্ত্রী মহাশয়া কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার 'গেট-মিটিং'-এ এক ভাষণে বলেন যে—গত ২০।২১ বছর দেশের শাসন ব্যবস্থায় এমন কিছুই করা হয় নাই যাহাতে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অসাম্য দূর করা সম্ভব হইত। বিগত ২০।২২ বছর দেশের প্রায় সকল প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল কংগ্রেস তথা কেন্দ্রের হাতে। পশ্চিম বঙ্গ এবং অন্যান্য সকল রাজ্যও কংগ্রেসীদের দখলে ছিল এবং সব কিছুর উপরে ছিলেন প্রধান মন্ত্রীর পিতা-ঠাকুর শ্রীজবাহর লাল নেহেরু! শ্রীনেহেরু ছিলেন অসীম ক্ষমতার ধারক এবং তাঁহার আদেশ নির্দ্দেশের, বিরুদ্ধতা করা দূরে থাক, সামান্য প্রতিবাদ করার সামান্য সাহসও কোন মন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় কর্ত্তাদের ছিল না। এমন কথাও শুনা যায় যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর তিন পোয়া, আধসেরী এবং ছটাকে মন্ত্রীদের মধ্যে কেহই আট দশ বছরে শ্রীনেহেরুর কামরায় প্রবেশ করিবার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন নাই, কোন মন্ত্রীর পক্ষে নেহেরু-দর্শন এবং তাঁহার শ্রীমুখের বাণী সাক্ষাতে শ্রবণ করা ত স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। এক কথা যায় বলা, যে, শ্রীনেহেরু তাঁহার রাজত্বকালে ভারতে পরম এক একনায়কতন্ত্রের শাসন চালাইয়া যান। পৃথিবীর অন্য দেশের ডিক্টেটারগণও যে, ক্ষমতা এবং অধিকার লাভ বিশেষ করেন নাই। অতএব দেখা যাইতেছে গত ২০।২২ বৎসরে দেশে যদি গরীবদের জন্য কিছু না করা হইয়া থাকে, তাহার জন্য প্রধানতম দায়ী ব্যক্তি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পিতা শ্রীজবাহর লাল নেহরু।

গত দুই দশকের প্রশাসন ব্যর্থতার কথাটা শ্রীমতী গান্ধী আজ প্রকাশ করিয়া দিয়া পিতৃ-তর্পণ করিলেন!! ধন্যবাদ!!

বাঙ্গলার বাহিরে অন্যরাজ্যে—বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীর অবস্থা !

বিহার, উত্তরপ্রদেশ এবং দিল্লী প্রভৃতি অঞ্চলেস্থিত বাঙ্গলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলি পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন লাভের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট প্রার্থনা জানাইয়াছেন। ইহার কারণ হিন্দীকে শিক্ষার বাহন বা মাধ্যম না করিলে ঐ সকল বাঙ্গালা-মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির অনুমোদন বাতিল করা হবে। পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু ব্যবস্থা অন্যপ্রকার—এ-রাজ্যে ২০০টি হিন্দী মাধ্যম বিদ্যালয় ছাড়াও তামিল, তেলেগু, উর্দ্দু, এবং অন্যান্য আরো কয়েকটি ভাষাকেও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে অনুমোদন দান বহুকাল যাবত চলিয়া আসিতেছে।

এ-রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর মতে বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিকে বাঙ্গলার মাধ্যমে অর্থাৎ বাঙ্গালী ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃ ভাষায় শিক্ষালাভ করা হইতে কেন বঞ্চিত করা হইবে, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি আরো বলেন যে—অন্য রাজ্যের বাঙ্গলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিকে এই রাজ্যের মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নহেন, কারণস্বরূপ তিনি বলেন যে এই অনুমোদন দিলে দেশ হিসাবে ভারতের 'একত্ব' (?) কি ভাবেব জায় রাখা যাইবে! ভারতের ঐক্য বজায় রাখার দায়িত্বটা তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বাঙ্গালা বিশেষ করিয়া বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদের মাতৃ-ভাষায় শিক্ষালাভের অধিকার হরণ করিয়া রক্ষা করা হইবে! তাহাই যদি হয়, তবে এ রাজ্যের অবাঙ্গলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিকেও কেন সমান ভাবে বিচার করা হইবে না।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় ভারতের কয়েকটি স্থানে অর্থাৎ বিশেষ কয়েকটি বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের সিনিয়র এবং জুনিয়র কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার অনুমোদন এবং অধিকার বহুকাল ধরিয়া বহাল আছে।

আমাদের শিক্ষামন্ত্রী কিছু দিন পুর্ব্বে-বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলির সমস্যার কথা প্রধান মন্ত্রীর গোচরে আনিয়াছেন, ফলাফল এখনও জানা যায় নাই। কখনও জানা যাইবে কি না তাহাও জানা নাই। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মহাশয় ঘটার সহিত ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ব্যাপারে মাতৃভাষার উপর বিশেষ জোর দিয়াছেন, কিন্তু বাঙ্গালী ছাত্রছাত্রীদের (বাঙ্গালার বাহিরে) অসুবিধার বিষয় তাহার কৃপা দৃষ্টিতে পড়িতে কিনা বলা যায় না।

আমাদের মতে সর্বত্রই সকল রাজ্যে ছাত্রছাত্রীদের নিজনিজ মাতৃভাষায় শিক্ষা লাভ করিবার সর্ব্ববিধ সুযোগ সুবিধা দানই সরকারী নীতি হওয়া উচিত। কিন্তু এ-বিষয় যদি সর্ব্বভাষার প্রতি সম দৃষ্টি এবং এবং সম বিচার না পাওয়া যায়, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে অবাঙ্গলা মাধ্যম বিদ্যালয়গুলিকে সরকারী অনুমোদন হইতে বঞ্চিত করা ছাড়া দ্বিতীয় পথ কি থাকিতে পারে? ফ্রন্ট সরকার আশা করি শিক্ষার ব্যাপারে কেন্দ্রের সহিত একটা স্থায়ী মীমাংসা করিতে পারিবেন। 'চাপনিষ্ঠ' কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চাপের নিকট অবশ্যই নতি স্বীকার করিবেন। এ-রাজ্যের কংগ্রেসী সরকার (যখন ছিল) কেন্দ্রের হিন্দী জবরদস্তির নিকট সর্ব্বক্ষেত্রেই 'বশ্যতা' স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আশাকরি ফ্রন্ট সরকার সে-পথে যাইবেনা।

একই ঘটে দুইদেবতা

আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে—কোন বিশিষ্ট রাজ্যমন্ত্রী তাঁহার মন্ত্রিত্ব বজায় রাখিয়া একই সঙ্গে এবং একই সময়ে শ্রমিক ইউনিয়ন নেতার পদে পূর্ণ মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকিতে পারেন কি না। রাজ্যের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পর মন্ত্রী মহাশয়কে সকল প্রজার সম্পর্কে সমদৃষ্টি রাখিয়া তুলাদণ্ডে সম বিচারের পূর্ণ অধিকার

দিতে হইবে—এইটাই সাধারণ নিয়ম বলিয়া এত দিন চলিয়া আসিতেছিল" কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের প্রখ্যাত শ্রমনেতা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিবার পরেও, একদিকে (ন্যায় বা অন্যায় যে-কোন কারণেই) শ্রমিকদের ধর্মঘট করা, বিক্ষোভ প্রদর্শন (যাহা বহু ক্ষেত্রে হিংস্র আকার ধারণ করে) এবং ঘেরাও বে-আইনী ক্রিয়াকলাপে, প্রকাশ্যে না হইলেও পরোক্ষে প্ররোচনা দান করিতেছেন বলিয়া শুনা যাই অভিযোগও উঠিয়াছে। এ-রাজ্যের মন্ত্রীমণ্ডলী 'যুক্তফ্রণ্ট' মন্ত্রী সভা বলিয়া কথিত। মন্ত্রীসভা 'যুক্ত' বলিয়া কি একই মন্ত্রী সরকারী এবং বেসরকারী দুই শক্তির যুক্ত আধার হইতে পারেন? আমাদের কখনই নহে। কারণ মন্ত্রী হিসাবে তাঁহার কর্ত্তব্য অতি স্পষ্ট—তিনি ন্যায় বিচারের প্রতীক হইবেন। ট্রেড-ইউনিয়ন নেতা হিসাবে তাঁহার প্রধানতম কার্য্য হইতেছে, রাজ্যের এবং অশ্রমিক রাজ্যবাসীদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবলমাত্র শ্রমিক স্বার্থরক্ষার প্রতি সর্ব্বতোভাবে প্রয়াসী হওয়া। নেতা হিসাবে যে কোনো ব্যক্তির দৃষ্টি একমুখো হইতে বাধ্য, প্রায় একচক্ষু হরিণের দৃষ্টির মতই। ইহাই দেখা যাইতেছে।

কোন ব্যক্তি যদি মন্ত্রী হইয়াও সেই সঙ্গে অন্যকাজ (বেসরকারী) করিতে পারেন বা করেন, হইলে অন্যান্য মন্ত্রী মহাশয়রাও, মন্ত্রিত্বের মর্য্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া, শিক্ষকতা, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের পরিচ এমন কি ('অফিস'-টাইম বাদ দিয়া) সেল্সম্যান হিসাবে কেন কাজ করিতে পারিবেন না, বিশেষ যখন এ-রাজ্যের সাধারণ মন্ত্রীর বেতন মাত্র ৫০০ টাকা (মাসিক)।

শ্রমিকদের দাবী ন্যায় কি অন্যায় সে-বিচার আমরা করিব না, আমাদের প্রশ্ন 'বিচারপতি' আসনে বসিয়া মামালাকারীর পক্ষে ওকালতীও করিতে পারেন কিনা, ইহা সমীচীন হইবে কি না। মালিক দুই পক্ষের দাবী-দাওয়ার বিচার এবং সে সম্পর্কে সরকারী রায় দান মন্ত্রী মহাশয়গণই করে এবং এই রায়দানে, লোকে আশা করিবে যে কোন মন্ত্রী পক্ষপাতিত্ব দেখাইবেন না। কিন্তু ইউ-এফ সরকা আমলে ইহার ব্যতিক্রমই দেখা যাইতেছে, মামলা সুরু হইবার আগেই সরকারী মুখপাত্রেরা ঘোষণা করিতে তাহারা সর্ব্বদা এবং সর্ব্বক্ষেত্রে শ্রমিকদের পক্ষই সমর্থন করিবেন এবং শ্রমিক স্বার্থ রক্ষাই তাহাদের এক না হইলেও—প্রধানতম কর্ত্তব্য। সরকারী নীতি যদি এই হয়, তাহা হইলে দ্বি বা ত্রি-পক্ষীয় আলাপ আলোচ প্রহসন না করিয়া এক তরফা ডিক্রিজারী করাই সঙ্গত। এরূপ আলোচনায় এক পক্ষই যখন সর্ব্ব-শক্তি দ্বিতীয় পক্ষ তখন অবশ্যই দোষী"—

পীড়িত সমাজ—বিকারগ্রস্ত মানুষ—অদাকার পশ্চিমবঙ্গ!

দেশ এবং জাতিকে চিকিৎসা করিয়া বাঁচাইবার, সমাজকে সুস্থ করিবার দায়িত্ব যাহাদের হা তাঁহারা নির্ব্বিকার! তাঁহাদের একমাত্র কর্ত্তব্য দলীয় স্বার্থ এবং প্রভাব বৃদ্ধ করা ছাড়া আর কিছুই "নাই"—

চারিপাশের দৃশ্যপট যদি হয় আয়না, তবে সেই আয়নার মুখ দেখিয়া মাঝে মাঝে প্রশ্ন জাগে—আ

কতখানি সভ্য?......শোভাবাজারে ষাট বছরের বৃদ্ধাকে যে-জনতা পিটাইয়া মারিল, শুক্রবার বেলঘরিয় ছেলেধরা সন্দেহে একজন যুবককে যাহারা হত্যা করিয়াছিল, নিছক সেই কয়জন, সেই কয়েক শ অথবা সেই কয়েক সহস্র অন্ধ, উন্মাদ, হিংস্র জনগোষ্ঠীকে দোষ দিতেছি না। এ-দায় সামগ্রিকভা গোটা সমাজের—"এ আমার এ তোমার পাপ।"

কিন্তু আজ ন্যায় অন্যায়ের বিচার কে কয়জন করিতেছে—"

"আর বিষয়টি যেহেতু মানবিক তথা সমাজিক—রাজনৈতিক নয়—সুতরাং ইহাও জানি যে, এত বড় অন্যায় লইয়া কোনও বিক্ষোভ মিছিল ইত্যাদি দেখা যাইবে না, গড়িয়া উঠিবে না কোনও আন্দোলন—প্রতিব

কাটিয়া পড়িবে না, উচ্চারিত হইবে না অভিশাপ। আমরা সকলে, ভদ্রতার লেবেল-মারা বড় বড় শ্লোগান আওড়ানেওয়ালা সম্ভ্রান্ত অথবা অসম্ভ্রান্ত নাগরিক—আমরা সকলে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইব, অথবা কখনও বা "দেশের কী হইল"—"পুলিস কিছু করে না" ইত্যাদি বিজ্ঞবচন ছাড়িয়া পাশ ফিরিয়া ফের ঘুমাইয়া পড়িব।"

রাজ্য মন্ত্রীদের মধ্যে একমাত্র অজয়বাবু ক্ষীণকণ্ঠে এ-রাজ্যে উইচ-হাণ্টের সামান্য প্রতিবাদ এবং কিঞ্চিৎ দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পরম জ্যোতির্ময় পুরুষরাজ্যের সর্ব্বশক্তিধর, কর্ত্তব্য পরায়ণ উপমুখ্যমন্ত্রী এ-বিষয় নির্ব্বাক, বোধ হয় শোকে আজ বাক্যহীন।

ছেলেধরাঘটিত ঘটনাগুলির দুই দিক। দুই-ই সমান লজ্জাকর। এক, এ দেশে সত্যই এখনও ছেলেধরা আছে। প্রমাণ, রাস্তার ভিখারির বহর। সকলেই বোধ হয় ভিখারী বংশধর নহে। অর্থাৎ সেকালের "স্লেভ ট্রেডের মত মানুষেরা মানুষ-বেচাকেনার কারবার চালায়। সেই সঙ্গে মানুষ শিকারীদের কৃপায় মানুষ চুরির হীন পেশাও এখনও দিব্য বহাল। এ তো গেল একদিক। আবার অন্যদিকে দেখি জনচেতনায় হিংসা বুঝি পারদের মত ফুটিয়া উঠিতেছে, ক্লানিকর রোগের বিকারে সমাজ দেহ জর্জ্জর। হাজার লোক মিলিয়া একটি বৃদ্ধার প্রাণহানি—হননকারীরা কাহার অনুচর? ইহারা কারা, যারা বিশশতকের এই শেষ পাদে এ দেশে মধ্যযুগীয় ইউরোপের অন্ধকারকে ডাকিয়া আনে? ডাকিনীতন্ত্র উচ্ছেদের নামে ইহাদের উল্লাস কেবল পৈশাচিক কাণ্ডে। কোন্ ধর্ম্মের নামে এই নরবলি? নিগ্রো লিঞ্চিং-এর নামে আমরা ঘৃণায় অষ্টাবক্র হইয়া যাই, পৃথিবীর কোন খানে বিন্দুমাত্র নৃশংসতার সংবাদ পাইলে আমাদের পবিত্র ক্রোধের সলিতাটি দপ করিয়া জলিয়া উঠে, কিন্তু কই, নিজের কুকীর্তির জন্য যথাযোগ্য যন্ত্রণা কই?

"নাই। যে-হিংসাকে চারিদিকে দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে দেখি, ওই বৃদ্ধার হত্যা ওসেই হিংসারই রকমফের। কলসি খুলিয়া যাঁহারা দৈত্যকে আহ্বান করিয়াছেন, তাঁহারা নিজের বিবেকের সঙ্গে একবার বোঝাপড়ায় বসুন। সংসদীয় রাজনীতিতে যে-বিবেকের দোহাই পাড়া আজ ফ্যাশন হইয়া উঠিয়াছে সামাজিক স্তরে ও ন্যায় অন্যায়ের বিচারে সেই বিবেক থাকে কোথায়? কোথায় থাকে আমাদের বৈপ্লবিক আস্ফালন? অথবা শোভাবাজার বেলঘরিয়ার ঘটনা বোধ হয় এই শিক্ষাই দিল যে আস্ফালন মাত্রেই "বিপ্লব" নয়, গণতন্ত্রের অর্থ গণরাজ নয়। ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানবটির বিকট আচরণ তার স্রষ্টাদের স্পষ্টভাবে দেখাইয়া দিতেছে সব কিছু জনতার হাতে তুলিয়া দিলে পরিণতি কত দূর ভয়াবহ হইতে পারে। এই দানবকে "গণেশ" বানাইয়া তাহার পূজায় বসায় কিছুমাত্র জাতীয় ইষ্ট নাই। আরণ্যক আইন আইনই না। শুধু পুলিশকে দায়ভাগী করাও এক ধরনের সামাজিক শঠতা, নিজের সঙ্গে নিজেরই জুয়াচুরি। প্রাথমিক দায় পুলিশের অবশ্যই, কিন্তু মারমুখী রক্তলোভী জনতার আশেপাশে সচ্চরিত্র সবিবেক বহু নাগরিকও ছিলেন নিশ্চয়ই; যাঁহারা নিরুপদ্রব অহিংস প্রণালীতে সব কিছু প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ইঁহারা পুরুষ না কাপুরুষ? পুলিশ না-হয় তাহার কর্ত্তব্য করিতে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে কিন্তু পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব, ব্যায়াম সমিতি, যুব সংঘ ইত্যাদি তো আছে। পরিস্থিতি নিছক উদ্বেগের পর্যায় পার হইয়া যাইতেছে। তবু মনুষ্যত্বের প্রতি শেষ বিশ্বাসটুক আমরা হারাইতে চাই না। আর সেই বিশ্বাসটুকুর ভরসাতেই জানিতে চাই, "ডাইনী ডাইনী" চিৎকার করিয়া যাহারা সেদিন নিরুপায় বৃদ্ধার হত্যালীলায় মাতিয়াছে, তাহাদের মধ্যে এমন একজনও কি ছিল না, যে বিজয়াদশমীর সন্ধ্যায় নত হইয়া নিজের ঠাকুরমাকে প্রণাম করে?"

গত ২০ এ ভাদ্রের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত এই সম্পাদকীয় মন্তব্যের উপর আর বেশী কিছু মন্তব্য করিবার প্রয়োজন নাই।

সাধারণের টাকায় পালিত যে-পুলিশ, তাহাকে যদি বিশেষ আজ্ঞাবহ করিয়া রাখা হয়, তাহা হইলে দেশের মানুষ অর্থাৎ ট্যাক্সদাতারা রাজ্যের বর্ত্তমান "দলে ভারী" এবং সর্ব্বশক্তির একমাত্র ধারক ও বাহকদের (প্রশাসনিক) নিকট হইতে কি আশা করিতে পারে?

যুক্তফ্রন্ট শরিকদের মনে রাখা কর্ত্তব্য যে—পশ্চিমবঙ্গের ভোটদাতারা তাঁহাদের গদিতে বসাইয়াছে, প্রাক্-নির্ব্বাচন পবিত্র তথা গালভরা প্রতিশ্রুতিগুলি শিকায় তুলিয়া রাখিয়া নিজেদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থ লইয়া কোন্দল করিয়া কালক্ষেপ করিবার জন্য নহে।

ফ্রন্ট নেতারা একবার ভাবিয়া দেখুন গত প্রায় সাত মাসে তাঁহাদের ৩২ দফা প্রতিশ্রুতি পালনের পরিবর্ত্তে দেশের ও দশের 'দফা নিকাশ' করাতেই তাহারা প্রায় সর্ব্বসময় ব্যস্ত রহিয়াছেন কি না?

প্রশাসনিক নিষ্ঠা যদি থাকে—

তাহা হইলে বর্ত্তমান রাজ্যপুলিস মন্ত্রীর ভদ্রজনোচিত কার্য্য হইবে পুলিস দপ্তরের ভার অবিলম্বে ত্যাগ করা। ফ্রন্ট সরকার গঠনের প্রাক্কালে পুলিস দপ্তর হাতে পাইবার জন্য শ্রীজ্যোতিবসুর যে প্রকার বিষম তৎপরতা এবং প্রবল আগ্রহ দেখা যায় তখনই আমরা এবং অন্যান্য আরো অনেক হীনবুদ্ধিজন মন্তব্য করি যে—পুলিস দপ্তর হাতে পাইলে জ্যোতিবাবু তথা সি পি এম দলভুক্ত বড়, মেজ এবং ছোট কর্ত্তারা আমাদের এক চোট দেখিয়া লইবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেখাইয়া দিবেন তাঁহাদের প্রতাপের তাপ সূর্য্যের প্রখর তাপকেও অতিক্রম করে কিনা। অবশ্যই স্বীকার করিব, একদা শক্তিশালী পশ্চিম বঙ্গের পুলিস আজ প্রায় ক্লীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ইহা ঘটিয়াছে খোদ পুলিস মন্ত্রীর দক্ষতার কল্যানেই।

যে-রাজ্যে পথে ঘাটে খুন জখম চুরি ডাকাতি ছিনতাই—অহরহ ঘটিতেছে সে-রাজ্যের নিরীহ জনগণের অবস্থা সহজে অনুমেয়। খুনে-ডাকাতের মৃতদেহ লইয়া রাজ্যের রাজধানীতে যখন দেখা যায় শোভাযাত্রা বাহির হয়, মৃতদেহে বিভিন্ন মহল হইতে পুষ্পদান করা হয় এবং বিশেষ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের বহু নেতা এবং ভক্ত এই পুলিসের গুলিতে নিহত ডাকাতের শেষযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে, তখন আমরা নিরাশা ছাড়া আর কি আশা করিব? খুনে আসামীকে যথাযোগ্য দণ্ড দান করিবার ফলে যেখানে আদালত প্রাঙ্গণে শত শত ব্যক্তি বিচারের রায়ের তথা বিচারকের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানাইতে ভয় বা লজ্জা পায় না, এবং যে বিক্ষোভ পুলিসও থামাইতে ভয় পায়, সেই রাজ্যের পুলিস মন্ত্রী মহাশয়ের লজ্জাবোধ সামান্য পরিমাণে থাকিলেও—তাঁহার স্পষ্ট কর্ত্তব্য—পদত্যাগ করা, কিন্তু আমরা জানি তিনি তাহা প্রাণ থাকিতে করিবেন না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কর্ত্তব্য এ-বিষয়ে কি তাহা তিনি ভাবিয়া দেখিবেন। কেবল মাত্র আবেদন আহ্বান জানাইলেই দায়িত্ব পালন করা হয় না।

হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৬১-১৯৪৫)

······················দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়······················

সেকালের সঙ্গীতজগতে হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় একজন আচার্য স্থানীয় ধ্রুপদী ছিলেন। তিনি বিগত যুগের সঙ্গে আধুনিক যুগের যোগসূত্রস্বরূপ সগৌরবে অবস্থান করে ছিলেন তাঁর দীর্ঘকালের সঙ্গীতজীবনে।

উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে বৃহত্তর বাংলার এক সুযোগ্য প্রতিনিধি হিসাবেও গণ্য করা যায়। বারাণসী নিবাসী ছিলেন বলে তাঁর সঙ্গীতসাধনার পর্ব প্রধানত সেখানেই উদযাপিত হয়েছিল এবং সেই সূত্রে তিনি বাংলার সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গীতচর্চার ধারাকে সংযুক্ত করেছিলেন। যেমন উত্তর ভারতের বিভিন্ন সঙ্গীতাসরে তেমনি বাংলাদেশেও নানা সময়ে সঙ্গীতানুষ্ঠান করেন তিনি।

তাঁর সঞ্চিত বিপুল সঙ্গীতভাণ্ডার তিনি পরবর্তীকালের নিষ্ঠাবান সঙ্গীতচর্চার আশায় কয়েকটী মূল্যবান পুস্তকে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গীত-গ্রন্থাবলীর মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য—চার খণ্ডে প্রকাশিত 'প্রাচীন ধ্রুপদ স্বরলিপি'। প্রথমে তাঁর এই নির্ভরযোগ্য ধ্রুপদসম্ভারের স্বরলিপি পুস্তকগুলি হিন্দিতে প্রকাশিত হয়। পরে তিনি তাদের বাংলা সংস্করণও প্রকাশ করেন। বাংলাভাষায় তাঁর উক্ত গ্রন্থমালা ভিন্ন অন্যান্য পুস্তকের নাম—'সঙ্গীত গুরুপ্রসাদ', 'সঙ্গীতে পরিবর্তন' ও 'প্রাচ্য সঙ্গীত-তথ্য'। শেষোক্ত পুস্তিকাটি হরিনারায়ণ বারাণসীতে 'সঙ্গীত মহাসম্মেলন' উপলক্ষ্যে রচনা করেছিলেন। 'সঙ্গীতে পরিবর্তন' পুস্তকটির বিষয়বস্তু—তাঁর যৌবনকালের অভিজ্ঞতালব্ধ সঙ্গীতজগতের সঙ্গে তাঁর পরিণত বয়সে দেখা সঙ্গীতচর্চার বিশেষ ধ্রুপদগানের পরিবর্তন বা পার্থক্য প্রদর্শন। বইখানির আকার ক্ষুদ্র হলেও এটি নানা মূল্যবান তথ্যে পূর্ণ এবং সঙ্গীতবিষয়ে লেখকের গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। এই পুস্তকে প্রকাশিত কোন কোন সঙ্গীতপ্রসঙ্গের উল্লেখ পরে করা হবে। হরিনারায়ণের রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষার ও সাধনার পরিচয় ও প্রামানিকভাবে জানা যায় শুধু এই বই খানি থেকেই।

হরিনারায়ণের প্রধান সঙ্গীতগুরু ছিলেন ধ্রুপদগুণী রামদাস গোস্বামী। 'প্রাচীন ধ্রুপদ স্বরলিপি' পুস্তকমালায় হরিনারায়ণ ধ্রুপদ গান স্বরলিপিবদ্ধভাবে প্রকাশ করেছেন তার অধিকাংশই রামদাস গোস্বামীর নিকটে প্রাপ্ত। কিন্তু তাঁর আর একখানি ধ্রুপদ গানের গ্রন্থকে বিশেষ করে তাঁর সঙ্গীতগুরুর স্মৃতিতে চিহ্নিত করে রেখেছেন: 'সঙ্গীত গুরু প্রসাদ'। এই বইখানিতে স্বরলিপিসমেত মুদ্রিত সব ধ্রুপদ গানগুলি তিনি ধ্রুপদাচার্য রামদাস গোস্বামীর নিকটে শিক্ষাকালে লাভ করেছিলেন। হরিনারায়ণ প্রণীত 'প্রাচীন ধ্রুপদ স্বরলিপি' এবং 'সঙ্গীত গুরুপ্রসাদ' গ্রন্থাবলী থেকে ভবিষ্যৎকালের ভারতীয় সঙ্গীত গবেষকগণ নানা মূল্যবান উপকরণ লাভ করবেন, এবিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই সঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় সঙ্গীতবিদ্যার চর্চা বা সাধনা সম্পর্কে তিনি ছিলেন রক্ষণশীল। তাঁর রচনাদিতে প্রকাশিত তাঁর মন্তব্য থেকে পরিষ্কার ধারণা করা যায় যে, তিনি এই ঐতিহ্যপূর্ণ সঙ্গীতসম্পদকে যথাসম্ভব অবিকৃতভাবে রক্ষা করতে একনিষ্ঠ

প্রয়াসী ছিলেন। তাঁর ধ্রুপদগান যথাযথভাবে প্রকাশ করার মূল উদ্দেশ্যও ছিল তাই। সুলভ জনপ্রিয়তার আকর্ষণে তিনি পরম্পরাগত সঙ্গীত-ঐশ্বর্যকে ক্ষুণ্ণ করতে কথনোই প্রস্তুত ছিলেন না।

বাংলার সঙ্গে ভারতীয় মূল সঙ্গীতধারার যোগসাধনে হরিনারায়ণের মধ্যস্থতার কথা তাঁর বারাণসীতে অবস্থানের প্রসঙ্গে যে উল্লেখ করা হয়েছে তা তাঁর রচিত সঙ্গীত-পুস্তকগুলি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। অর্থাৎ তিনি উক্ত গ্রন্থাবলী রচনা করার ফলে বাংলা ও উত্তর ভারতের সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে একটি সেতুবন্ধন ঘটেছিল। সেই সঙ্গে একথাও বলা যায় যে, যেমন তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার বিষয়ে তেমনি তাঁর সঙ্গীতশিক্ষাদানের প্রসঙ্গেও বাংলার সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের নিবিড় যোগ অনুধাবনযোগ্য। এ সম্পর্কে নিম্নলিখিত বিবরণ তথ্য হিসাবে উপস্থাপিত করা হল:

হরিনারায়ণের প্রধান সঙ্গীতশিক্ষক রামদাস গোস্বামী ছিলেন বাংলার সন্তান এবং শ্রীরামপুরের বিখ্যাত গোস্বামী পরিবারভুক্ত। কিন্তু যখন তিনি হরিনারায়ণের সঙ্গীতগুরু তখন জীবনের সেই শেষপর্বে কাশী বাসী ছিলেন এবং পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গুণীর সঙ্গে তাঁর সঙ্গীতজীবনে সে সময় বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ও সহযোগিতা ছিল। গোস্বামী মহাশয়ের তৎকালীন বারাণসীর গৃহে যে আচার্যস্থানীয় এবং সর্বভারতীয় কলাবিদগণ আগমন ও সঙ্গীতচর্চা করতেন কিম্বা যাঁদের নানা আসরে তিনি যোগ দিতেন গায়করূপে, তাঁদের মধ্যে উল্লেখণীয় হলেন ধ্রুপদী গোপালপ্রসাদ মিশ্র, বীণ্‌কার বন্দে আলী খাঁ, মৃদঙ্গী গণেশ সিংহ, বীণ্‌কার সাদিক আলী খাঁ, সুরশৃঙ্গার বাদক নিসার আলী খাঁ' সেতারী গণেশ বাজপেয়ী, বীণ্‌কার মহেশচন্দ্র সরকার, সেতারী অর্জুন বৈদ্য, সুরশৃঙ্গারবাদক পান্নালাল জৈন প্রভৃতি। উক্ত গুণীবৃন্দ সহযোগে রামদাস গোস্বামী তৎকালীন বারাণসীর যে উচ্চমানের সঙ্গীতজগতে সংযুক্ত ছিলেন, হরিনারায়ণও শিক্ষা ও সাধনপর্বে সেই আবহে প্রভাবিত ছিলেন। অর্থাৎ হরিনারায়ণ তাঁর সঙ্গীতজীবনের সূচনাকাল থেকেই যুক্ত হন ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ধারার সঙ্গে এবং সেইভাবেই গঠিত হয় তাঁর সঙ্গীতমানস।

হরিনারায়ণের শিষ্যমণ্ডলীতেও বাঙ্গালী অল্পই ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সব চেয়ে খ্যাতিমান হন (সঙ্গীতগবেষক ও ধ্রুপদগায়ক) চন্দ্রশেখর পন্থ। রামা পাঠক, আমানৎ এবং পণ্ডিত সত্যনারায়ণ তাঁর অপর তিনজন কৃতী শিষ্য। তা ভিন্ন গঙ্গাধর পাঠক, মুকুন্দ কলাবিন্ট্‌ ও বিষ্ণু কলাবিন্ট্‌, শিবাজীচন্দ্র ভাস্কর, রামকৃষ্ণ ভাট, টি. এস. বেঙ্কটরমণ, বালকৃষ্ণ কেশকর (ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় মন্ত্রী) প্রভৃতিদের নিয়ে হরিনারায়ণের উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় শিষ্যসম্প্রদায় গঠিত ছিল। কাশীনিবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে উত্তরকালের স্বনামধন্য ধ্রুপদী গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শিক্ষা কিছু লাভ করেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ সঙ্গীততত্ত্বজ্ঞ এবং ভারতীয় সঙ্গীতের বিস্তৃত ইতিহাস লেখক স্বামী প্রজ্ঞানানন্দও প্রথম জীবনে বারাণসীতে কিছুকাল সঙ্গীতচর্চা করেন হরিনারায়ণের শিক্ষাধীনে। কাশীর সুবিখ্যাত বীণ্‌কার মহেশচন্দ্র সরকারের ভ্রাতুষ্প্রৌত্র রমেশচন্দ্র দে (সরকারও) প্রথম জীবনে তাঁর শিক্ষালাভ করেছিলেন। কলকাতার ভবানীপুর নিবাসী গায়ক এবং অঘোরনাথ চক্রবর্তীর অন্যতম সঙ্গীতগুরু ভোলানাথ দাসের পুত্র মণিলাল দাসও হরিনারায়ণের অন্যতম শিষ্য। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাটখণ্ডে তাঁর ধ্রুপদসংগ্রহ অভিযানের মধ্যে হরিনারায়ণের নিকট কয়েকটি ধ্রুপদ গান স্বরলিপি করে শিক্ষা করেছিলেন।

তাঁর উক্ত শিষ্যপ্রসঙ্গ থেকেও ধারণা করা যায়, ভারতবর্ষে সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে হরিনারায়ণের স্থান কোথায় ছিল।

সঙ্গীত, বিশেষ ধ্রুপদ বিষয়ে তিনি শুধু অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না, তার চেয়েও বড় পরিচয় তাঁর

ছিল সুকণ্ঠ ধ্রুপদ-গায়ক রূপে। পশ্চিমাঞ্চলে এবং কলকাতারও নানা আসরে তিনি গুণপনা প্রদর্শন করেছিলেন। বাংলার অন্যান্য সঙ্গীতাসরে তাঁর গানের কথা তাঁর জীবনকথার পরিচয়ে দ্রষ্টব্য।······

হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় যে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন তাঁদের আদি নিবাস ছিল যশোহর জেলার মহেশপুর নামক গ্রামে। সেখানকার এই প্রাচীন মুখোপাধ্যায় বংশ সমাজে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন। হরিনারায়ণের এক উর্ধতন পূর্বপুরুষ হলধর মুখোপাধ্যায় (চক্রবর্তী উপাধিধারী) ছিলেন যশোহর মন্দিরের রাজ পুরোহিত।

হরিনারায়ণের পিতামহ শ্রীধরশিরোমণি কলকাতার মলঙ্গা লেনে প্রতিষ্ঠিত চতুষ্পাঠীতে সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। শ্রীধর শিরোমণির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন বাংলার অন্যতম দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ। 'মহেশ ওস্তাদ' নামে সুপরিচিত হয়ে বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে তিনি সমকালে টপ্পাচার্যরূপে অবস্থান করেছিলেন। মহেশচন্দ্র ছিলেন বিখ্যাত প্রসদ্দু মনোহর ঘরাণার রামকুমার ও শিউসহায় মিশ্রের শিষ্য। মহেশচন্দ্রের শিষ্যবর্গের মধ্যে রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (গোন্দল পাড়া), সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখনীয়। হরিনারায়ণ অবশ্য মহেশচন্দ্রের সঙ্গীতজীবনের প্রভাবে আসেননি। হরিনারায়ণের জন্মের পূর্ব থেকেই চাকুরি সূত্রে কাশীপ্রবাসী হয়েছিলেন হরিনারায়ণের পিতা মধুসূদন।

বারাণসীতে ১৮৬১খৃ হরিনারায়ণের জন্ম হয়। নিজের প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা সম্পর্কে তিনি বিবৃত করেছেন এইভাবে—'ইংরাজী ১৮৭৪ কি ৭৫ সালে, তখন আমি কাশীর বাঙ্গালীটোলা স্কুলে পড়ি, বয়স ১৩।১৪ বৎসর হইবে। হঠাৎ শুনা গেল, একজন ভাল বাঁশী বাজিয়ে কাশীতে আসিয়াছেন, আমার লেখাপড়ায় তত বিশেষ মনোযোগ ছিলনা; বাঁশীর কথা শুনিয়া মন চঞ্চল হইল। আমি তাঁহার সন্ধান করিলাম এবং বাঁশী শিক্ষা করিব বলিয়া তাঁহাকে জানাইলাম। তাঁহার আরও ৩।৪ জন শিষ্য ছিল। এই বাঁশী বাজিয়ের নাম শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মিত্র; বর্তমানে লক্ষ্ণৌতে আছেন।···বাঁশীতে আমার হাতেখড়ি হইল। 'নি সা ধা নি প' বেহাগের গৎ হইল।···বেহাগের গৎ শেষ হইলে বিভাসের গৎ 'সা রে গা গগা প প্ল গা রে গা ধা প নি ধা প'গা প গা রে স' আরম্ভ হইল।···এইরূপে চারি পাঁচখানি গৎ শিখিলাম এবং আমাদের ছোট একটি কনসার্টপার্টি হইল।···ক্রমশ সুরের একটু ব্যবহার বিচারবোধ করিতে লাগিলাম। শানাই বাঁশী কিছুদিন বাজাইয়াছিলাম; ক্রমে গান শিখিতে ইচ্ছা হইল; বাঁশী ছাড়িয়া দিলাম।' (১)

প্রায় সেই সময়েই, হরিনারায়ণ তখনো বাঙ্গালীটোলা স্কুলের ছাত্র, কাশীতে দীঘাপতিয়া-রাজার ভবনে একটি উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতাসর হয়েছিল। দীঘাপতিয়া-রাজার আমন্ত্রণে সেই গুণী সমাবেশে যোগ দেন—কলকাতা থেকে গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী (মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক এবং নুলো গোপাল নামে সুপরিচিত); কাশী থেকে গোপালপ্রসাদ মিশ্র গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর সঙ্গীতগুরু) বীণকার মহেশ চন্দ্র সরকার, ধ্রুপদী রামদাস গোস্বামী, মৃদঙ্গী গণেশ সিংহ, মৃদঙ্গী কাশীনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি; পশ্চিমাঞ্চল থেকে বীনকার বন্দে আলী খাঁ প্রভৃতি। উল্লিখিত গুণীবৃন্দের দীঘাপতিয়া ভবনের সঙ্গীতানুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে হরিনারায়ণ ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ঐশ্বর্যের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হন। রামদাস গোস্বামীর কণ্ঠে ধ্রুপদ গান শুনে আনন্দ পান হরিনারায়ণ। রীতিমতভাবে গান শিক্ষার জন্যে তাঁর বিশেষ আগ্রহ জাগল। কিন্তু তখন সে-উদ্দেশ্যসিদ্ধির কোন সুযোগ পেলেন না বালক বয়সের জন্যে।

তার কিছুদিন পরে বারানসীর মদনপুরার গিরিশচন্দ্র লাহিড়ীর গৃহে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় যন্ত্রীর সঙ্গীতানুষ্ঠান হল। হরিনারায়ণ সে-আসরে শুনলেন বন্দে আলী খাঁ, সাদিক আলী খাঁ ও মহেশচন্দ্র সরকারের বীনাবাদন; এবং গনেশ বাজপেয়ী ও আহম্মদ খাঁর সেতার বাদন, ইত্যাদি। সেইসব উচ্চাঙ্গের

অনুষ্ঠান শুনে তাঁর ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল। এমনিভাবে আরো কবছর গেল।

তারপর হরিনারায়ণের বয়স যখন ১৯ বছর সেসময় অভাবিতভাবে সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ পেলেন তিনি। এ সম্পর্কে তিনি নিজে প্রকাশ করেছেন—'ইংরাজী ১৮৮০ সালের বৈশাখ মাসে আনন্দচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাটিতে বৈশাখ-উৎসব উপলক্ষে গানবাজনা হইয়াছিল। আমাদের বাড়ির নিকটেই তাঁহার বাড়ি। যখন সেখানে গান-বাজনা হইত আমি গিয়া শুনিতাম। এদিনেও গিয়াছিলাম। দেখিলাম, গায়কদিগের মধ্যে শ্রীরামপুরের একজন বর্দ্ধিষ্ণু জমিদার রামদাস গোস্বামী মহাশয়...। গানবাজনা হইতেছিল, অন্যান্য শ্রোতৃগণ ছিলেন, আমিও শুনিতেছিলাম। গানবাজনা বন্ধ হইলে পর সেন মহাশয় বলিলেন, '...রামদাস বাবু তোমাকে যত্ন করিয়া ধ্রুপদ শিখাইবেন।' সেন মহাশয় খেয়াল অপেক্ষা ধ্রুপদের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রশংসাবাদ করিতে লাগিলেন এবং রসুল বক্সের ঘরের ধ্রুপদের তুল্য ধ্রুপদ আর নাই বলিয়া পরিচয় দিলেন। রামদাসবাবুও আমাকে গান শিখাইবেন বলিলেন এবং তাঁহার বাড়িতে পরদিন যাইতে ব'ললেন। যথাসময়ে আমি গোস্বামী মহাশয়ের বাড়িতে উপস্থিত হইলাম। তাঁহার বাড়ির নীচের ঘরে দুইজন ভদ্রলোক গান করিতেছিলেন।...রামদাসবাবু নীচে আসিয়া আমার সুরবোধ আছে কিনা জানিবার নিমিত্ত কণ্ঠে সরগম বাহির করিতে বলিলেন। আমি পূর্বে বাঁশী বাজাইতাম এবং অল্প গানও করিতে পারিতাম বলিয়া সুর বাহির করা কঠিন হইলনা। যে দুটি গান ঐ দুইজন ভদ্রলোক শিক্ষা করিতেছিলেন, রামদাসবাবু সে দুইটি আমাকেও শিখাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। প্রথম গানটি কোকব বেলাবল 'শুভ সগন শুভ লগন ছত্র ধরাউ আজ মিলি পণ্ডিত লগন ধরাউ।' দ্বিতীয় গানটি সিন্ধু 'কাটিয়া দুখ পায়ো মোহন প্যারে তেহারে দরশন বিন ঘড়ি পল ক্ষণ দিন রয়ন পড়ত নহি চয়ন।' গুরুদেবের সঙ্গে সঙ্গে আমি গান দুটি তিন চারিবার গাহিলাম, পরে একলাই দুটি অস্থায়ী গান করিলাম। সেদিন প্রাতঃকালে প্রায় দুই ঘণ্টাকাল কাটিয়া গেল। গুরুদেব আমাকে পুনরায় বৈকালে আসিতে বলিলেন। আমি যথাসময়ে উপস্থিত হইলাম। গুরুদেব তখন পাশা খেলিতেছিলেন। আমাকে দেখিয়া খেলিতে খেলিতে গান দুটির অন্তরা শিখাইতে লাগিলেন। আমি তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে গান করিতে লাগিলাম। পাঁচ সাতবার গান করিবার পর আমি একলাই গান করিলাম। দুই এক স্থানে ভুল হইল কিন্তু তিনি সেগুলি সংশোধন করিয়া দিলেন। গুরুদেব তাম্বুরার সহিত গান করিতে বলিলেন। তাম্বুরা ধরিতেই পারি না, সুর কেমন করিয়া ছাড়িতে হয় জানি না, গান করা কঠিন বোধ হইতে লাগিল। সপ্তাহ পরে তাম্বুরায় সুর ছাড়িতে পারিলাম। দুইখানি গান দুই তুকের বলিয়া এই কয়দিনে আদায় হইয়াছিল, তাহাই তাম্বুরার সুর মিলাইয়া তাহার সহিত গান করিলাম। তাল বড় ভাল হইলনা। তালের জন্য তিনি বলিলেন, 'পরে হইবে।' সুর ছাড়া সেই সুরে গান করা এবং তাল দেওয়া কঠিনবোধ হইতে লাগিল।

পরদিন হইতে আমার গান শিক্ষা আরম্ভ হইল। গুরুদেবের আদেশ হইল; প্রাতে দুই ঘণ্টা, অপরাহ্নে দুই ঘণ্টা এবং রাত্রে দুই ঘণ্টা শিক্ষা করিতে হইবে। প্রাতে সুর সাধনা অর্থাৎ মন্দ্র সপ্তক সাধন এবং অন্য সময়ে গান শিক্ষা, এইরূপ বন্দোবস্ত হইল। আমি তদনুযায়ি শিক্ষা ও সাধনা করিতে লাগিলাম। মাস দুই মধ্যে চারি পাঁচখানি গান আদায় হইল কিন্তু সেগুলি সাধনা অভাবে পরিষ্কার (অর্থাৎ সুরিলি) হইলনা। ক্রমে ক্রমে সময় বাড়াইতে হইল এবং তাঁহার আদেশমত এক একখানি গান একশতবার করিয়া সাধন করিতে লাগিলাম।......এইরূপে এক বৎসর কাটিয়া গেল। যেখানে গোস্বামী মহাশয় গান করিতেন, সেখানে আমাকেও লইয়া যাইতেন এবং সঙ্গে গাওয়াইতেন। কখন কখন একলা গান করিতে

বলিতেন। অল্পদিন মধ্যে শ্রীরামপুর হইতে নিমাইচরণ ঘোষাল নামে একজন আমারই সমবয়স্ক গান শিখিবার নিমিত্ত গুরুদেবের নিকট উপস্থিত হন। আমাদের শিক্ষার পক্ষে বড়ই সুবিধা হইল। এক সঙ্গেই গুরুদেবের নিকট থাকিতাম। শিক্ষা ও সাধনা উত্তমরূপেই হইতে লাগিল। তিন বৎসর এইরূপ কঠোর পরিশ্রমের পর গুরুদেব আমাদিগকে শ্রীরামপুরে লইয়া যান এবং আমাদের গান শুনাইবার নিমিত্ত নিকটস্থ গুণীদিগকে আহ্বান করেন। তখন প্রাচীন গুণী ও গায়কমণ্ডলীর মধ্যে অনেকেই শ্রীরামপুরে আসিতেন।

আমরা একমাস সেখানে ছিলাম। প্রত্যহই সকালে বিকালে ও রাত্রিতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি গান-বাজনা হইত। কাশী ফিরিবার সময় বিষ্ণুপুর, কাশীপুর, হেতমপুর প্রভৃতি রাজ-স্থান দেখিবার এবং তত্তৎ-স্থানীয় গুণীদিগের গান বাজনা শুনিবার ইচ্ছা আমরা গুরুদেবকে জানাই এবং তদনুযায়ী তিনি তত্তৎ স্থানে পত্র লিখিয়া জানাইলেন। যথাসময়ে প্রথমে কাশীপুরের (পঞ্চকোট রাজ্যের রাজধানী—বর্তমান লেখক) রাজবাটিতে যাই। সেখানে কাসিম আলি খাঁ (রবাবী) ছিলেন।' সন্ধ্যার সময় খাঁসাহেবের সুরশৃঙ্গার বাজনা হইল।...খাঁ-সাহেব এক ঘণ্টা আলাপ করিয়া গান করেন এবং বিষ্ণুপুরের একজন মৃদঙ্গী মৃদঙ্গ বাজান। বীণার সঙ্গে গান বন্দে আলি খাঁর শুনিয়াছিলাম, আর এই শুনিলাম। পরে আর শুনিতে পাই নাই।......পরদিন...প্রাতে আমাদের গান হইল ও খাঁ-সাহেব বীণাতে সঙ্গত করিলেন। আমরা 'তুরী মন সুমিরণ' ললিত রাগের গান করিলাম। খাঁ সাহেব বড়ই খুসী হইলেন এবং তিনিও সঘন বন ছায়ো' ললিতের ধ্রুপদ গান করিলেন এবং বীণাতে সঙ্গত করিলেন।...খাঁ-সাহেব বৈকাল বেলায় বীণায় আলাপ করিলেন ও সাময়িক রাগে গান করিলেন। সন্ধ্যার পর আহারান্তে রাজার সহিত রামদাসবাবুর সঙ্গীত সম্বন্ধে নানাবিধ কথোপকথন হইল।' (২)

এই দীর্ঘ উদ্ধৃতি থেকে হরিনারায়ণের পদ্ধতিগত সঙ্গীতশিক্ষার আরম্ভ, রীতিনীতি ও উন্নতির কথা বিস্তৃতভাবে জানা গেল। সেই সঙ্গে সেকালের সঙ্গীতগুরু ও শিক্ষার্থীর পারস্পরিক সম্পর্ক কি হৃদয়গ্রাহী ছিল তারও একটি অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ হ'ল। শিষ্যের যেমন একনিষ্ঠ সাধনা, বিনয়নম্র অনুবর্তিতা, গুরুর প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা ও আস্থা, প্রকাশ পেত তেমনি গুরুরও অন্তরের স্নেহ, যত্ন, ধৈর্য এবং শিক্ষাদান বিষয়ে নৈপুণ্যের সঙ্গে অকৃপণভাবে সঙ্গীতবিদ্যা বিতরণ করার দৃষ্টান্ত পাওয়া যেত। রামদাস গোস্বামীর মতন বিচক্ষণ ও বিবেকবান সঙ্গীতগুরু এবং হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়ের মতন সুযোগ্য শিষ্য সেকালের সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে আদর্শ ছিল। গোস্বামী মহাশয়ের উদার দাক্ষিণ্যের কথা সকৃতজ্ঞচিত্তে প্রকাশ করেছেন হরিনারায়ণ—"...আমি ১০।১২ বৎসর তাঁহার সেবা না করিয়া তাঁহারই যত্নে ও সেবাতে মানুষ হইয়া যৎকিঞ্চিৎ সঙ্গীত-বিদ্যা শিখিয়াছি।' (৩)

হরিনারায়ণ সেযাত্রা গুরুর সঙ্গে শ্রীরামপুর, পঞ্চকোট, বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে সঙ্গীত-উপলক্ষ্যে ভ্রমণ শেষে বারাণসীতে প্রত্যাগত হন এবং গুরুর শিক্ষাধীনে সঙ্গীত সাধনায় আরো অগ্রসর হতে থাকেন। সেসময় চন্দ্রকুমার মৈত্র এবং উপেন্দ্রচন্দ্র রায় নামে দুজন খেয়াল গায়ক ধ্রুপদ-শিক্ষা আরম্ভ করেন রামদাস গোস্বামীর নিকটে। তার কিছু দিন পরে কলকাতার প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় কাশীতে আসেন এবং রামদাস গোস্বামী মহাশয়ের কাছে কয়েকটি ধ্রুপদ গান সংগ্রহ করেন। পরের বছরও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় চার মাস বারাণসীতে অবস্থান করে রামদাস গোস্বামীর নিকট থেকে অনেকগুলি ধ্রুপদ নেন স্বরলিপির সাহায্যে। কিন্তু, হরিনারায়ণ অভিযোগ করেছেন যে, কৃষ্ণধনবাবু সেই ধ্রুপদ গানগুলি পরিবর্তিত আকার

(পৃথক রাগরূপে) আপন পুস্তকে পরে প্রকাশ করেন। কৃষ্ণধন কর্তৃক ধ্রুপদগুলির এই বিকৃতিসাধন তালিকাবদ্ধ করে' সদৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন হরিনারায়ণ (সঙ্গীতে পরিবর্তন' পৃষ্ঠা :—২৩-২৫)।

উক্ত পুস্তিকায় প্রকাশিত হরিনারায়নের বিবৃতি থেকে জানা যায় যে তারপর শান্তিরাম মুখোপাধ্যায় (হেতমপুর, বীরভূম) ও গোষ্ঠবিহারী প্রামাণিক (ঢাকা) নামে দুজন কাশীতে এসে রামদাস গোস্বামীর নিকটে কিছুকাল সঙ্গীতশিক্ষা করেন।

এইভাবে গুরুর শিক্ষাধীনে প্রায় দশ বছর অতিবাহিত হল হরিনারায়ণের। রামদাস গোস্বামীর কাছে তাঁর শিক্ষার শেষসময়ের কথা এবং সঙ্গীতগুরুর অন্তিম-পর্বের কথা সংক্ষেপে তিনি বর্ণনা করেছেন: 'আমার শিক্ষা ক্রমে ক্রমে অল্প হইয়া আসিতে লাগিল। নিমাইচরণ স্বদেশে চলিয়া গেলেন। গুরুদেবের শরীর ক্রমশঃ ভগ্ন হইতে লাগিল। তথাপি তিনি শুইয়া শুইয়াও 'গৌড়মল্লারের ওখানটা দেখে নেও', 'মেঘমল্লারের ও মিয়ামল্লারের খোঁচগুলো দেখে নেও,' 'কানাড়ার খোঁচগুলো দেখে শুনে নেও' এইরূপ বলিতেন। এমন গুরু আজকাল কোথায়? গুরুদেব পীড়িত অবস্থায় ৩,৪ বৎসর অল্প অল্প করিয়া শিক্ষা দিতেন।···কিছুদিন পরে গোস্বামী মহাশয়ের কাশীলাভ হয় (১৮৯১)' (৪)

রামদাস গোস্বামীর মৃত্যুর এক বছর আগে হরিনারায়ণ চাকুরী গ্রহণ করেন এবং গুরুর মৃত্যুর বছর তিনেক পরে টেলিগ্রামের চাকুরি সূত্রে অন্যত্র বদলি হয়ে যান। সেই কর্ম উপলক্ষ্যে ভারতের নানাস্থানে বিভিন্ন সময়ে অবস্থান করতে হয় তাঁকে। তাতে সঙ্গীতচর্চার কিছু অসুবিধা ঘটলেও সাধনায় কখনো বিশেষ ছেদ পড়ে নি। স্থানান্তরবাসের মধ্যে যখন যেসব সঙ্গীতকেন্দ্রে বাস করেছেন, সেখানকার সঙ্গীত সমাজে ও সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন—যথা, মহারাষ্ট্র ও বিহারে এবং কলকাতায়। চাকুরিজীবনের শেষ পর্যন্ত তাঁর কাশীতে কেটেছিল। সেসময় এবং অবসর গ্রহণের পরও দীর্ঘকাল তিনি সসম্মানে এবং নেতৃবৎ অবস্থান করেন বারাণসীর বিদগ্ধ সঙ্গীতসমাজে। কাশীতে স্ব-প্রতিষ্ঠিত সানন্দে ধ্রুপদ ক্লাবে' তিনি নিয়মিত সঙ্গীতানুষ্ঠান করতেন। শেষ জীবনে তিনি স্বয়ং বারাণসীর এক সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিলেন, বলা যায়। সবদিক থেকেই হরিনারায়ণ ছিলেন সেকালের উত্তর ভারতের অন্যতম দিকপাল ধ্রুপদগুণী।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) সঙ্গীতে পরিবর্তন, পৃষ্ঠা ১-১। হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায়। ১৯৩১

(২) " " পৃষ্ঠা ১২-১৬। " " "

(৩) " " পৃষ্ঠা ১৯। " " "

(৪) " " পৃষ্ঠা ৩২-৩৩। " " "

বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬২-১৯৪৫)

বাঙালীর খেয়ালগানের চর্চাপ্রসঙ্গে বেহালার বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। সমসাময়িক কালের বাংলাদেশে তিনি একজন আচার্যস্থানীয় ছিলেন খেয়াল সঙ্গীতের ক্ষেত্রে।

তাঁর সঙ্গীতজীবনের সময়ে বাংলার রাগসঙ্গীতের জগতে খেয়ালের তুলনায় ধ্রুপদের চর্চা বা প্রচলন অধিকতর ছিল। সেযুগে বাংলার গুণী গায়কদের মধ্যে বেশির ভাগ ছিলেন ধ্রুপদী। অল্প কয়েকজন মাত্র বাঙালী গায়ক খেয়ালগানের জন্যে চিহ্নিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখনীয় হলেন রাণাঘাটের নগেন্দ্রনাথ

ভট্টাচার্য, বেহালার রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কলকাতার সাতকড়ি মালাকার। তাঁরা তিনজন একসময়ে বাংলার সঙ্গীতাসরে খেয়ালগানের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিস্বরূপ গণ্য হতেন। উক্ত ত্রয়ী সমকালীন হলেও সমবয়সী ছিলেন না: নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সর্বজ্যেষ্ঠ এবং সাতকড়ি মালাকর কনিষ্ঠতম। উত্তরকালের জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ধ্রুপদী ও ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ খেয়ালগুণীদের সঙ্গীতাসরে যোগ দেওয়ার পূর্বে শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী খেয়াল গায়করূপে বিদ্যমান ছিলেন উক্ত নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সাতকড়ি মালাকার। তিন প্রধানের মধ্যে রাণাঘাটের নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরি এই চার অঙ্গেই অভিজ্ঞ ছিলেন এবং আসর হিসাবে কিংবা অনুরোধে উক্ত চার প্রকার সঙ্গীতই পরিবেশন করতেন। তবে তিনি সাধারণত খেয়াল ও টপ্পাই গাইতেন আসরে। সাতকড়ি মালাকারও খেয়াল ও টপ্পাগানই শোনাতেন কারণ তিনি ওই দুই রীতিতেই সঙ্গীত-সাধনা করেছিলেন।

কিন্তু রামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতের আসরে সুপরিচিত ছিলেন খেয়াল-গায়ক রূপেই। খেয়ালগানের জন্যেই তিনি প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন এবং বহু বিচিত্র তানকর্তবই তাঁর সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ছিল। তবে তাঁর অনুশীলিত ও পরিবেশিত সেই খেয়ালগান হাল্কা চালের নয়, রীতিমত ভারি চালের। রামাচরণের খেয়াল ছিল ধ্রুপদ ঘেঁষা। কারণ তিনি গোয়ালিয়রে প্রচলিত ধ্রুপদ-ভাঙ্গা গম্ভীররীতির খেয়াল তাঁর প্রধান ওস্তাদ আলী বখসের নিকট শিক্ষা করেছিলেন। গোয়ালিয়রনিবাসী এবং সেখানে শিক্ষাপ্রাপ্ত খেয়ালসঙ্গীতের গুণী গায়ক আলী বখ্স্ মেটিয়াবুরুজে নবাব ওয়াজিদ আলীর দরবারে নিযুক্ত থাকেন কয়েক বছর। সে সময়েই তাঁর শিক্ষাধীনে রামাচরণ খেয়ালরীতির চর্চা আরম্ভ করেন। মেটিয়াবুরুজে কয়েক বছর শিক্ষার পর নবাবের মৃত্যুতে আলী বখস্ বড়বাজার অঞ্চলে বাস করবার সময়েও অনেকদিন তাঁর কাছে তালিম নেন রামাচরণ। এইভাবে তাঁর খেয়ালগানের চর্চা দৃঢ়ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়েছিল। আলী বখস্ ভিন্ন অন্য ওস্তাদের কাছেও কিছু কিছু শিক্ষা ও সংগ্রহ করেছিলেন রামাচরণ। তবে তাঁর বেশির ভাগ শিক্ষাই আলী বখসের অধীনে।

সেকালের আর একজন বিখ্যাত খেয়াল-গুণী মহম্মদ খাঁর নিকটেও রামাচরণ কিছুকাল খেয়াল শিখেছিলেন। লক্ষ্ণৌ থেকে আগত খেয়াল-গায়ক আহম্মদ খাঁও একসময়ে নিযুক্ত ছিলেন মেটিয়াবুরুজের নবাব-দরবারে। সেসময়েই তাঁর কাছে রামাচরণ খেয়াল শিক্ষা করেন। রাণাঘাটের নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের অন্যতম ওস্তাদ ছিলেন আহম্মদ খাঁ এবং স্বামী বিবেকানন্দের প্রধান সঙ্গীতশিক্ষক বেণীমাধব অধিকারীর ওস্তাদরূপেও আহম্মদ খাঁর নাম পাওয়া যায়। রামাচরণ, নগেন্দ্রনাথ এবং বেণীমাধবের ওস্তাদ আহম্মদ খাঁ অভিন্ন ব্যক্তি কিনা নিশ্চিতরূপে জানা যায়নি। তবে অভিন্ন হওয়ারই সম্ভাবনা অধিক। কারণ উক্ত তিন জনের আহম্মদ খাঁ নামধারী ওস্তাদ একই-কালে বাংলাদেশে অবস্থান করেছিলেন।

রামাচরণের ওস্তাদ আহম্মদ খাঁর নিকটে লক্ষ্ণৌতে সঙ্গীতশিক্ষা করেন আড়িয়াদহের রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শোভাবাজারের বিখ্যাত দেব-পরিবারভুক্ত হরিতকৃষ্ণ দেব উক্ত রামকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকটে আহম্মদ খাঁর গান কিছু সংগ্রহ করেছিলেন।

রামাচরণবাবু মেটিয়াবুরুজে আহম্মদ খাঁর কাছে যে যে রাগের গান শিখেছিলেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য— হাম্বির, মালকোষ, আড়ানা, পরজ, খাম্বাজ ভৈরবী, দরবারি কানাড়া ('ভবত বৈঠে যতন কি ন') ইত্যাদি। কথিত আছে, আহাম্মদ খাঁর তানকর্তব্যে অসাধারণ পারদর্শিতার জন্যে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ তাঁকে উপাধি দেন 'তানবাজ।' আহম্মদ খাঁর নিকটে রামাচরণ নানাপ্রকার তানের (বিজলী তান, ছুট তান ইত্যাদি) রীতিনীতি শিক্ষা করেছিলেন। গোয়ালিয়র ঘরাণার খেয়ালগানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য যে 'হলক্ তান' তার তালিম

তিনি অবশ্য পান আলী বখ্‌সের নিকটে। আহম্মদ খাঁর কাছে রামাচরণের খেয়াল-শিক্ষা দীর্ঘকালের না হলেও তাঁর সঙ্গীতজীবনে তার প্রভাব অল্প কার্যকর হয়নি।.........

সুদূর পশ্চিম পাঞ্জাবের রাওয়ালপিণ্ডি শহরে ১৮৬২ খৃঃ ১৬ অক্টোবর তারিখে জন্ম হয় রামাচরণের। তাঁর পিতা ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভারত সরকারের সামরিক-বিভাগে কর্মসূত্রে সপরিবারে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বাস করতেন। ব্রজনাথের পৈত্রিক বাস ছিল হাওড়া জেলার বালিতে। বেহালার মুখোপাধ্যায়-পরিবার তাঁর মাতুল বংশে। সেই সম্পর্কে তাঁর বেহালার সঙ্গে যোগাযোগ এবং পরবর্ত্তীকালে রামাচরণেরও বেহালায় বাস।

শিশুবয়সে রামাচরণ পিতৃহীন হয়েছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় তখন রেলওয়েতে কার্য পেয়েছিলেন। এবং তাঁর সঙ্গে রামাচরণ পশ্চিমাঞ্চলের নানা স্থানে বাস করেন ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত। সেজন্যে একদিকে যেমন তাঁর বিদ্যালয়ের শিক্ষালাভ ব্যাহত হয়, তেমনি অন্যদিকে তিনি হিন্দুস্থানী ও উর্দুতে রীতিমত অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। ফলে পরবর্ত্তীকালে তাঁর চোস্ত জবান হিন্দুস্থানী খেয়ালগানের চর্চার পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

প্রায় ১৬ বছর বয়সে তিনি বেহালায় বাস করতে আসেন পিতার মাতুল দিগম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাড়ীতে। সেই বাড়ীর নিকটেই 'হরি সভা' গৃহে তখন নিয়মিত ধ্রুপদ গানের আসর বসত এবং রামাচরণ সেইসব সঙ্গীতানুষ্ঠান থেকেই সঙ্গীতে আসক্ত হন। গান শোনবার আশায় তিনি যাত্রার আসরেও উপস্থিত হতেন দোহারের আকর্ষণে।

এমনিভাবে রামাচরণের ১৭/১৮ বছর বয়সে রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষার জন্যে অদম্য আগ্রহ প্রকাশ পায়। কিছুদিন পরে এক যাত্রানুষ্ঠানের সভায় ব্রজজীবন মুখোপাধ্যায় নামে একজন ধ্রুপদগায়কের সঙ্গে পরিচিত হন তিনি। ব্রজজীবনকে তিনি গান শিক্ষা করবার ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করেন। ব্রজজীবন একদিন রামাচরণকে নিয়ে যান নিজের সঙ্গীতগুরু লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজীর নিকটে। বাংলার অন্যতম দিক্‌পাল সঙ্গীতজ্ঞ লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী সঙ্গীতজগতে এক দুর্লভ ও বহুমুখী প্রতিভার আধারস্বরূপ সেকালে বিরাজমান ছিলেন। তিনি একাধারে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুংরি গায়ক এবং বীণা, এসরাজ, পাখোয়াজ, তবলা প্রভৃতি যন্ত্রবাদক। বাংলাদেশে এমন বৈচিত্রপূর্ণ সঙ্গীতপ্রতিভার দৃষ্টান্ত উত্তরকালে মোহিনীমোহন মিশ্র ভিন্ন আর দেখা যায়নি। লক্ষ্মীনারায়ণ সেসময় বাস করতেন গড়পারে। কিন্তু তাঁর কাছে সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ রামাচরণ লাভ করেননি।

তাঁর বয়স তখন প্রায় ২০ বছর। তিনি জানতে পারলেন, মেটিয়াবুরুজে অনেক ওস্তাদ বাস করেন তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে তিনি ওস্তাদের সন্ধান করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত শিবপুরনিবাসী এবং আলী বখ্‌সের শিষ্য গিরীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামে জনৈক গায়কের মধ্যস্থতায় আলী বখ্‌সের কাছে শিক্ষা আরম্ভ করবার সুযোগ পেলেন রামাচরণ।

উত্তরজীবনে সেসব দিনের কথা স্মরণ করে রামাচরণ বলতেন, 'অতি কষ্টে গান শিখি।' সেকথা আক্ষরিক সত্য। আলী বখ্‌সের কাছে সঙ্গীত শিক্ষার জন্যে তিনি বেহালা থেকে পদব্রজে মেটিয়াবুরুজে যাতায়াত করতেন। অনেক সময়েই রাতে যাওয়া-আসা করতে হত ওই পথে, সেকালে যা নিরাপদ ছিল না। উপরন্তু, প্রথম কয়েক বছর, অনেক ওস্তাদের মতন, সঙ্গীতবিদ্যা দান করতে অত্যন্ত কার্পণ্য করতেন আলী বখ্‌স্। রামাচরণের শিক্ষার জন্যে ঐকান্তিক আগ্রহ ও মেধা সত্ত্বেও ওস্তাদজী নানা অজুহাতে কালহরণ করতেন। ছাত্রকে অযথা অসুবিধায় ফেলতেন। যেমন একদিন রামাচরণ বেহাগ শিক্ষা করতে চাইলে, আলী বখ্‌স্ তাঁকে আসতে বললেন রাত বারোটায়। ওস্তাদ হয়ত আশা করেছিলেন অত রাতে মেটিয়াবুরুজে ছাত্রের উপস্থিতি ঘটে উঠবেনা। কিন্তু অকুতোভয় এবং সঙ্গীতশিক্ষায় অদম্য আগ্রহী রামাচরণ সেই রাত্রে মেটিয়াবুরুজে বেহাগ শিক্ষা করে শেষ রাতে পদব্রজে ফিরে আসেন বেহালায়। এমনি নানা অসুবিধার মধ্যে দিয়ে রামাচরণের সঙ্গীতশিক্ষা প্রথম

কবছর অগ্রসর হয়েছিল। ওস্তাদকে ভালভাবে দক্ষিণা দেবার জন্যে একটি চালের দোকানের পত্তন করেছিলেন তিনি। দক্ষিণার আতিশয্যে দোকানের অবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তবুও আলী বখ্‌সের মন পাননি বামাচরণ। উপযুক্তভাবে তাঁকে শিক্ষা দিতে আলী বখ্‌স বেশ কাতর হতেন। আরো কতদিন এই শিক্ষা-সঙ্কোচ চল্‌তো বলা যায় না। কিন্তু কয়েক বছর ওস্তাদের এই সঙ্কীর্ণতা লক্ষ্য করে তাঁকে হঠাৎ একদিন তীব্র ভর্ৎসনা করেন তাঁরই পত্নী মুন্না বেগম। শুধু তাই নয়, আলী বখ্‌সের শিক্ষাদানের ঘাটতি পূরণ করতেন মুন্না বেগম—তিনি নিজেও কলাবতবংশীয়া ভাল সঙ্গীতজ্ঞা ছিলেন, প্রকাশ্যে গান না গাইলেও—কিছুদিন বামাচরণকে পুত্রস্নেহে তালিম দিতে থাকেন। এইভাবে মুন্না বেগমের নিকটে তিনি লাভ করেন ছায়ানট, ছায়াকামোদ, তিলক কামোদ, মল্লার প্রভৃতির রাগের গান।

অবশেষে বামাচরণকে যথার্থ মন দিয়ে আলী বখস্‌ শেখাতে আরম্ভ করলেন। তার আগে ১৮৮৭খৃঃ নবাব ওয়াজিদ আলীর মৃত্যু থেকে আলী বখ্‌স্‌ বড়বাজার অঞ্চলে মনসিরুদ্দিন লেনে বাস করতেন বামাচরণেরই উদ্‌যোগে। আলী বখ্‌স্‌ এবার সেখান থেকে বেহালাতেও এসে নিয়মিতভাবে তাঁকে তালিম দিতে লাগলেন—প্রতি সপ্তাহে কবার, বার করে। এইভাবে ওস্তাদের কাছে তিনি দীর্ঘকাল শিক্ষা পেয়েছিলেন। তারপর তিনি বাংলার সঙ্গীতজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন কৃতবিদ্য খেয়াল গায়করূপে।

বামাচরণের সঙ্গীতজীবন সম্বন্ধে আরো আলোচনা এবং মেটিয়াবুরুজ দরবারে তাঁর একদিনের সঙ্গীতানুষ্ঠানের বর্ণনা অন্যত্র প্রকাশ করা হয়েছে।

তাঁর ওস্তাদ আলী বখ্‌স্‌ ও অঘোরনাথ চক্রবর্তীর ওস্তাদ আলী বখ্‌স্‌ সমনামী হলেও যে ভিন্ন ব্যক্তি, এ বিষয়ে অঘোরনাথ সম্বন্ধীয় অধ্যায়ে মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে যোগ করা যায় যে, অঘোরনাথের ওস্তাদ আলী বখ্‌স্‌ বামাচরণের ওস্তাদের তুল্য সঙ্কীর্ণমনা ছিলেন না বিদ্যাদান বিষয়ে। অঘোরনাথের সঙ্গীতশিক্ষক আলী বখ্‌স্‌কে তাঁর বংশধরের অন্যান্য সমধর্মাবলম্বীরা নিয়ত প্ররোচিত করতেন যাতে কাফেরকে তিনি শিক্ষা না দেন। কিন্তু শিক্ষাদান বন্ধ করা দূরের কথা, অঘোরনাথকে যথাসম্ভব তালিম দিয়ে যান তাঁর ওস্তাদ। দুই আলী বখ্‌সের প্রকৃতি ছিল বিপরীত।

বামাচরণের ব্যক্তি-জীবনের দু একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। গুরুদক্ষিণার কল্যাণে চালের দোকানের অপমৃত্যু ঘটায় টাঁকশালে কিছুদিন চাকুরি নিয়েছিলেন তিনি। তারপর স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র তাঁকে হাইকোর্টের রেজিষ্ট্রার অফিসে চাকুরির ব্যবস্থা করে দেন। সেখানেই পরিণত বয়স পর্যন্ত কাজের পর বামাচরণ অবসর গ্রহণ করেন এবং তারপরেও তাঁর সঙ্গীতজীবনে কোন ছেদ পড়েনি। স্যর রমেশচন্দ্র মিত্রের প্রসঙ্গে উল্লেখ্য এই যে, তিনি ছিলেন বামাচরণের সঙ্গীতগুণের জন্যে অনুরাগী ও হিতাকাঙ্খী। আরো কথা এই যে, রমেশচন্দ্রের পরিবারে সঙ্গীতচর্চা ভালভাবেই হত। তাঁর অন্যতম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেশবচন্দ্র মিত্র ছিলেন বাংলার এক নেতৃস্থানীয় পাখোয়াজবাদক। সেই সূত্রে তাঁদের ভবানীপুর পদ্মপুকুরের ভবনে নিয়মিত সঙ্গীতের আসর বসত। রমেশচন্দ্র সেইসব সঙ্গীতানুষ্ঠানে বোদ্ধা শ্রোতারূপেই শুধু যোগ দিতেন না, কোন দিন হারমোনিয়াম-বাদকরূপেও তাঁকে পারিবারিক আসরে—দেখা যেত।

বামাচরণবাবু বেহালায় ৭, হরিসভা রোডে গৃহনির্ম্মাণ করে জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত বাস করেছিলেন। তাঁর অন্তিমকালের দু বছর উক্ত বাড়িটি সরকার যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে অধিকার করায় তিনি একটি ভাড়া বাড়িতে থাকতেন ১৪, বনমালি নস্কর রোডে।

তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কমলকৃষ্ণ (১৮৯৫-১৯২৩) আসরে পিতার গানের সঙ্গে হারমোনিয়মে সঙ্গত করতেন। এস্রাজও ভাল বাজাতেন কমলকৃষ্ণ। ১০।১১ বছর বয়স থেকে তিনি হারমোনিয়ম বাজাতে

আরম্ভ করেন কারো কাছে শিক্ষা না করেও; এবং পরে পিতার গানের সঙ্গে হারমোনিয়মে সুন্দর সঙ্গত করতেন। তাঁর অকাল মৃত্যুতে কঠিন আঘাত পেয়েছিলেন বামাচরণ। সেই শোকে তিনি আসরে গান করা প্রায় ত্যাগ করেছিলেন। তবে সঙ্গীত-শিক্ষাদান থেকে বিরত হননি, শরীর যতদিন পর্যন্ত সক্ষম ছিল।

স্বর্গত রমেশচন্দ্রের জীবনকালে তাঁর ভবনে সব চেয়ে বেশি গানের আসর হয়েছে বামাচরণবাবুর। তা ছাড়া, এণ্টালি, বাগবাজার, শিবপুর ইত্যাদি স্থানের কয়েকটি বিশিষ্ট সঙ্গীতাসরেও তাঁর গানের অনুষ্ঠান হত। তাঁর সঙ্গে বেশির ভাগ আসরে তবলায় সঙ্গত করতেন বিহারী মুখোপাধ্যায়। লাখপৎ হোসেনও (স্বনামধন্য তবলাগুণী আবিদ হোসেনের ভগ্নিপতি) তাঁর গানের সঙ্গে অনেক আসরে তবলাসঙ্গত করেন। বামাচরণবাবু আসরে এক একটি গান বেশিক্ষণ না গাইলেও একজন যথার্থ গুণীরূপে সম্মানিত ছিলেন সঙ্গীতজ্ঞ মহলে। সঙ্গীত-শিক্ষাদানের বিষয়েও তিনি উদার ছিলেন। নিষ্ঠাবান ও ঐকান্তিক শিক্ষার্থীদের তিনি সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন অকৃপণভাবে।

তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর কথা উল্লেখনীয়। স্বনামধন্য দিলীপকুমার রায় এককালে বামাচরণবাবুর নিকটে সঙ্গীতশিক্ষার্থী ছিলেন। তাঁর অন্যান্য কয়েকজন শিষ্যের নাম: সুশীলকুমার বাগচী, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (বড়িশা), সুবোধ মুখোপাধ্যায় (দৌহিত্র), প্রবুদ্ধনাথ চট্টোপাধ্যায় (চক্রবেড়িয়া), হরিহর দাস ও ভূপেন্দ্রনাথ লাহিড়ী (শ্রীরামপুর), পাঁচুগোপাল হালদার ও বিপিনচন্দ্র পাল (বেহালা), বিভূতি ভট্টাচার্য (আন্দুল) ছুটবিহারী চক্রবর্তী (এণ্টালি), শচীন্দ্রনাথ মিত্র, বিনয় গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি।

বাংলার অন্যতম দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত ক্ষেত্রে তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন।

বামাচরণবাবুর প্রিয় রাগ ছিল—দরবারি কানাড়া, পুরিয়া, পুরবী, কামোদ ('যানে না ছুঙ্গী…' গানখানি বড় চমৎকার গাইতেন), মল্লারের দর, ইত্যাদি।

তিনি অতি দীর্ঘজীবি ছিলেন। ৭৬।৭৭ বছর বয়স পর্যন্ত নিয়মিত সঙ্গীতশিক্ষা দিয়ে গেছেন। অবশেষে ১৯৪৪খৃঃ ১১আগস্ট বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৮২ বছর বয়সে মৃত্যু হয় ১৪, বনমালি নস্কর রোডে। তাঁর আত্মীয় এবং শিষ্য প্রবুদ্ধনাথ চট্টোপাধ্যায় বামাচরণবাবুর স্মৃতিরক্ষাকল্পে ৬২, চক্রবেড়িয়া নর্থ ঠিকানায় 'সুরধারা' (বামাচরণ সঙ্গীত ভবন) নামে সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। সেখানে বামাচরণের বার্ষিক স্মৃতিসম্মেলন উপলক্ষ্যে সঙ্গীতানুষ্ঠান হত।

রাজা জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী

বাংলায় রাগ-সঙ্গীতচর্চার শ্রীবৃদ্ধিতে পৃষ্ঠপোষকদের দান স্মরণীয় হয়ে আছে। সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞদের প্রতি অকৃপণ দাক্ষিণ্য প্রকাশ করে বাংলাদেশে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রসারে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন বদান্য সঙ্গীতপ্রেমীগণ। তাঁরা অধিকাংশই বিগত যুগের ভূম্যধিকারী। সমগ্র উনিশ শতক যাবৎ এবং বর্তমান শতকের প্রথম ভাগেও তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতার পরিচয় বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে সুপরিস্ফুট হয়ে আছে। গত শতকের বাংলাদেশে উদযাপিত ভারতীয় সঙ্গীতের নবজাগৃতিপর্ব অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিল তাঁদের আনুকূল্যের ফলে। কলকাতা থেকে আরম্ভ করে বাংলার নানা অঞ্চলের ভূস্বামীবর্গ উদারভাবে ভারতের

ঐতিহ্যপূর্ণ সঙ্গীতধারাকে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন। পশ্চিমাঞ্চল থেকে সমাগত গুণীদের পৃষ্ঠপোষকতা করে তাঁদের নিশ্চিন্তে সঙ্গীসাধনায় সুযোগ দিয়েছেন তাঁরা এবং ফলস্বরূপ বাংলাদেশে উচ্চশ্রেণীর সাঙ্গীতিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিমা কলাবতদের অবস্থানের ফলে তাঁদের সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষার সুবিধা পেয়েছেন বাঙালী শিল্পীরা। অনেকক্ষেত্রে উক্ত পৃষ্ঠপোষকদের কল্যাণে ও সহায়তায় বাংলার সঙ্গীতশিক্ষার্থীরা বহিরাগত গুণীদের নিকটে সঙ্গীতের ঐশ্বর্য লাভ করেছেন। এইসব প্রক্রিয়ার যোগাযোগে বাংলাদেশ সমৃদ্ধ হয়েছে সঙ্গীত বিষয়ে। ধনী সঙ্গীতপ্রেমীরা সঙ্গীতজ্ঞদের প্রতি আনুকূল্য প্রকাশের সঙ্গে কেউ কেউ সঙ্গীতচর্চাও করেছেন। তবে তাঁরা অধিকাংশই থেকেছেন বোদ্ধা হয়ে। ইতোপূর্বে লিপিবদ্ধ নানা গুণীর প্রসঙ্গে তাঁদের উল্লেখ করা হয়েছে, পরেও অনেকের কথা নানা সূত্রে দেখা দেবে। বর্তমান অধ্যায়ের আলোচ্য হলেন ময়মনসিংহের মুক্তাগাছার (রাজা) জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী।

ময়মনসিংহ জেলায় যে বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণ জমিদারগোষ্ঠী বিখ্যাত মুক্তাগাছার আচার্য চৌধুরী বংশও তাঁর অন্তর্ভুক্ত। উক্ত সকল ভূস্বামী পরিবারের আদি নিবাস ছিল বগুড়া জেলার চাম্পারণ গ্রামে। পরে তাঁদের মুক্তাগাছা গ্রামে বাসের পত্তন হয়। এই বংশীয়রা অনেকেই সঙ্গীতপ্রেমীরূপে পরে সঙ্গীতজগতে সুপরিচিত হন। প্রসিদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত উদয়নাচার্য ভাদুড়ি এই বংশের আদি পুরুষ। তাঁর অধস্তন পঞ্চম পুরুষে শ্রীকৃষ্ণ আচার্য মুর্শিদাবাদের নবাব-সরকার থেকে আলাপ সিংহ পরগণার জমিদারি এবং চৌধুরী উপাধি লাভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ আচার্য চৌধুরীর মৃত্যুর পর তাঁর চার পুত্র পূর্ব বসতি চাম্পারণ ত্যাগ করে বাস করিতে আসেন মুক্তাগাছায়। শ্রীকৃষ্ণের প্রপৌত্র কাশীকান্ত অপুত্রক থাকায় সূর্যকান্তকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। ময়মনসিংহের প্রধান ভূস্বামী-রূপে মহারাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী স্বনামপ্রসিদ্ধ ছিলেন বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে। তাঁরই অনুজ জগৎকিশোর আচার্য চৌধুরী, রাজা উপাধিপ্রাপ্ত এবং মুক্তাগাছার ভূম্যধিকারী।

সঙ্গীত ও সঙ্গীতশিল্পীদের জন্যে মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষকরূপে জগৎকিশোর খ্যাতনামা ছিলেন। তিনি নিজেও সঙ্গীতচর্চা করেছিলেন সৌখীনভাবে। ধ্রুপদ সঙ্গীতের কিছু অনুশীলন তিনি করেছিলেন এবং তাঁর কণ্ঠের প্রাইভেট রেকর্ডিং রক্ষিত হয়েছিল। যেমন, লচ্ছাশাখ রাগে তাঁর গীত 'দেবী দুর্গে'।

কলাবতদের আনুকূল্য করবার জন্যে জগৎকিশোর প্রচুর অর্থ ব্যয় করতেন। অনেকসময়েই একাধিক পশ্চিমাগুণী নিযুক্ত রাখতেন তাঁর সঙ্গীতসভায়। বেতিয়া ঘরাণায় কৃতী ধ্রুপদী বজরঙ্গ মিশ্র দীর্ঘকাল এইভাবে তাঁর নিকটে গায়করূপে অবস্থান করেছিলেন। বজরঙ্গ মিশ্রের দৃষ্টান্তে ধ্রুপদসঙ্গীতে অভিজ্ঞতা লাভ করেন জগৎকিশোর। সঙ্গীতগুণী মদনমোহন বর্মণের নিকটেও তিনি অনেক ধ্রুপদ গান সংগ্রহ করেছিলেন।

আরো কয়েকজন নেতৃস্থানীয় সঙ্গীতশিল্পী অনেকদিন যাবৎ যুক্ত ছিলেন রাজা জগৎকিশোরের সঙ্গীতসভায়। তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখনীয় হলেন শ্রীজান বাঈ। সুপ্রসিদ্ধা কলাবতী গায়িকা শ্রীজান বাঈ ও তাঁর স্বামী, পাখোয়াজবাদক ছোট্টে খাঁ বছরের মধ্যে অর্ধেক সময় মুক্তাগাছার দরবারে এবং অবশিষ্ট সময়ে গোবরডাঙার ভূম্যধিকারি-সঙ্গীতসাধক জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের আনুকূল্যে অবস্থান করতেন। শ্রীজান বাঈ মুক্তাগাছায় নিযুক্তা থাকবার সময় জগৎকিশোরের জ্যেষ্ঠপুত্র জিতেন্দ্রকিশোর সঙ্গীতের শিক্ষা পেতেন শ্রীজানের কাছে। বালক বয়স থেকে জিতেন্দ্রকিশোর শ্রীজানের নিকটে সঙ্গীত শিক্ষা করতেন এবং বিশেষভাবে খেয়াল গান। শ্রীজানের অনেক গান জিতেন্দ্রকিশোর স্বরলিপি করে নিয়েছিলেন।

সেকালের বিখ্যাত তবলাগুণী, বারাণসীর মৌলবিরাম জগৎকিশোরের সঙ্গীত সভায় অনেকদিন নিযুক্ত ছিলেন।

বিখ্যাত সুরবাহার-গুণী মহম্মদ খাঁও মাঝে মাঝে মুক্তাগাছায়-এসে যন্ত্রসঙ্গীতের অনুষ্ঠান করতেন এবং সেই হিসাবে জগৎকিশোরের দাক্ষিণ্য পেতেন। তবে মহম্মদ খাঁকে নিয়মিত নিযুক্ত রাখেন জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় নিজের ওস্তাদরূপে। বাংলাদেশে মহম্মদ খাঁর সুরবাহারে তালিম যথার্থত জ্ঞানদাপ্রসন্নই দীর্ঘকাল যাবৎ লাভ করেছিলেন। মহম্মদ খাঁ ছিলেন লক্ষ্ণৌর স্বনামধন্য সুরবাহার সেতারসাধক সাজ্জাদ মহম্মদের প্রধান শিষ্য। সুরবাহার যন্ত্রের আদিবাদক লক্ষ্ণৌর গুণী গোলাম মহম্মদের পুত্র ও শিষ্য উক্ত সাজ্জাদ মহম্মদ শেষজীবনের অধিকাংশ কাল কলকাতায় রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের দরবারে আশ্রয়লাভ করেছিলেন। বিষ্ণুপুরের রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় সে সময় সাজ্জাদ মহম্মদের কাছে কিছু শিক্ষা পান বলে কথিত আছে। সাজ্জাদ মহম্মদের ঘরাণা বিদ্যার উত্তরাধিকারী অবশ্যই মহম্মদ খাঁ সুরবাহারী। বাংলাদেশে মহম্মদ খাঁর প্রধান সঙ্গীতশিষ্য ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন জ্ঞানদাপ্রসন্ন। তাঁর সূত্রেই মহম্মদ খাঁ জগৎকিশোরের সঙ্গীতসভাতেও মাঝে মাঝে যোগ দিতে যেতেন।

গোবরডাঙ্গার ভূস্বামী ও সুরবাহার-বাদক জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় ছিলেন জগৎকিশোরের অন্তরঙ্গ সুহৃদ। সুদক্ষ শিকারীরূপেও জ্ঞানদাপ্রসন্নের বিশেষ প্রসিদ্ধি ছিল গারো পাহাড়ে শিকারের উদ্দেশ্যে তিনি আগমন করতেন বন্ধু জগৎকিশোরের মুক্তাগাছা ভবনে। সাধারণত শীতঋতুতে গারো পর্ব্বতে তাঁরা শিকার-অভিযানে যাত্রা করতেন। সেই শিকার উপলক্ষ্য শিবিরে অবস্থানের সময় সঙ্গীতেরও আসর বসত মনোগ্রাহী পরিবেশে। এইসব সঙ্গীতানুষ্ঠানে শ্রীজান বাঈ গান শোনাতেন, ছোটে খাঁ পাখোয়াজে সঙ্গত করতেন। মহম্মদ খাঁ বাজাতেন সুরবাহার। জগৎকিশোর এবং জ্ঞানদাপ্রসন্ন দুজনেরই সুহৃদ, মধুরকণ্ঠ গায়ক রাণাঘাটের নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (তাঁর কথা পূর্ববর্ত্তী একটি অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে) গান গাইতেন। শিকার-শিবিরের মধ্যেই উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতানুষ্ঠান হত জগৎকিশোরের আতিথ্যে।

জগৎকিশোরের মুক্তাগাছার নিয়মিত সঙ্গীতসভায় আর একজন গুণী নিযুক্ত ছিলেন। তিনি সরদ বাদক আহম্মদ আলী খাঁ। রামপুরের সুরশৃঙ্গারবাদক আসদ খাঁর তিনি ভাগিনেয়। রামপুর ঘরাণার অন্যতম প্রবর্ত্তনকর্ত্তা বাহাদুর হোসেনের নিকটে প্রায় ১৫ বছর অবস্থান করে আসাদ খাঁ প্রথমোক্তের ঘরাণাবিদ্যা কিছু আত্মস্থ করেন, তাঁর প্রথামত শিষ্য না হয়েও। আসাদ খাঁর ভাগিনেয় আহম্মদ আলী মাতুলের তালিমে কৃতী সরদবাদক হয়ে প্রথমে দিনাজপুর রাজসভায় ও পরে মুক্তাগাছায় নিযুক্ত হন। উক্ত দুটি সঙ্গীতসভায় এককালে বছরের মধ্যে পালাক্রমে যোগ দিতেন আহম্মদ খাঁ।

রাজা জগৎকিশোর ও আহম্মদ খাঁর যুক্ত প্রসঙ্গে পরবর্ত্তীকালের স্বনামপ্রসিদ্ধ গুণী আলাউদ্দিন খাঁর সঙ্গীতজীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সম্পর্ক আছে। আলাউদ্দিনের সঙ্গীতজীবনে এক বৃহত্তর যোগাযোগ সাধনের সহায়ক হয়েছিলেন জগৎকিশোর। সে সময় আলাউদ্দিন খাঁ কলকাতায় থিয়েটারে যন্ত্রবাদকের কার্য করতেন। সেই সময় বা তার আগে আলাউদ্দিন শিক্ষার্থী ছিলেন অমৃতলাল দত্তের কাছে। তখন তিনি জগৎকিশোরের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তাঁর সরদচর্চার ইচ্ছা পূরণ করবার জন্যে জগৎকিশোর তাকে কলকাতায় থেকে নিয়ে আসেন মুক্তাগাছায়। সরদ-গুণী আহম্মদ আলী খাঁ সেসময় দিনাজপুর ও মুক্তাগাছায় অবস্থান করতেন। তাঁর কাছে আলাউদ্দিনের শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন জগৎকিশোর।

কিন্তু জগৎকিশোরের আনুকূল্য সত্ত্বেও আহম্মদ খাঁ আলাউদ্দিনকে বিদ্যাদানে কার্পণ্য করতে লাগলেন।

আলাউদ্দিন কিছুকাল পরেই বুঝতে পারেন যে আহম্মদ আলীর কাছে বেশি কিছু শিক্ষার আশা নেই। তিনি জগৎকিশোরকে সেকথা নিবেদন করলেন। আরো জানান যে, আহম্মদ আলীর শিক্ষা যে রামপুরে, সেখানকার দরবারের আনুকূল্যে অনেক গুণী বাস করেন। তাঁদের মধ্যে আছেন স্বনামধন্য উজীর খাঁ। রামপুরে গিয়ে ভালভাবে তালিম নেবার ইচ্ছার কথা আলাউদ্দিন রাজা জগৎকিশোরকে প্রকাশ করলেন। জগৎকিশোর আরো আর্থিক সাহায্য করে আলাউদ্দিনকে রামপুরে যাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেখানে গিয়ে আলাউদ্দিন চাকুরি পেলেন রামপুর নবাবের ব্যাণ্ড-পার্টিতে। তাঁর উজীর খাঁর নিকটে সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ পাওয়া অবশ্য নিজের ঐকান্তিক আগ্রহের ফলে সম্ভব হয়েছিল। তবে আহম্মদ আলীর নিকটে আলাউদ্দিনের শিক্ষা লাভের প্রচেষ্টা (রামপুরে গুণীদের অবস্থানের কথাও আলাউদ্দিন সম্ভবত আহম্মদ আলীর কাছেই শোনেন) এবং রামপুরে তাঁর আসা, এই দুই ঘটনা ঘটেছিল রাজা জগৎকিশোরের বদান্যতায়।......

সে যা হোক, মুক্তাগাছায় জগৎকিশোর যে সঙ্গীতচর্চার আবহ সৃষ্টি করেছিলেন, তা পরবর্তী কালেও লুপ্ত হয়নি। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জিতেন্দ্রকিশোর শ্রীজ্ঞানের কাছে লালাবাজ থেকে খেয়ালের তালিম পেয়েছিলেন, একথা আগেই উল্লেখ করা হইয়াছে। জিতেন্দ্রকিশোর স্বয়ং সঙ্গীতচর্চা যেমন করতেন তেমনি পৃষ্ঠপোষকও ছিলেন। জগৎকিশোরের দ্বিতীয় পুত্র শশিকান্তকে দত্তক গ্রহণ করেন তাঁর (জগৎকিশোরের) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহারাজা সূর্যকান্ত। শশিকান্তও সঙ্গীতপ্রেমী এবং সঙ্গীতজ্ঞের ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

গ্রন্থপঞ্জী

—সঙ্গীতের আসরে, পৃষ্ঠা ১৬২-১৬৭। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।
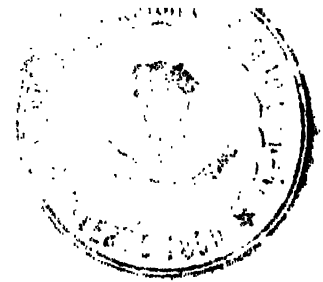
গাছের কথা

ডাঃ রবীন্দ্রমোহন দত্ত

রস বাহির হইয়া আসিলে গর্তের মধ্যে ধরিয়া শুকাইয়া লয়। তখন চিনি পাওয়া যায়। আমাদের স্বাধীন ভারতে যেরূপ চিনির কাটুকা চলিতেছে তাহাতে ভারত সরকারের কি এ গাছ চাষ করা উচিত নয়? এদের অনেক প্রজাপতির পাতার বাহার আছে। বাগানে Ornamental হিসাবে রাখা হয়। তাহাতে চিনি পাওয়া যায় না। Beta vulgaris বা বীট শিকড় হইতে বীট চিনি প্রস্তুত হয়। উক্ত চিনির কদর খুব। Sorghum vulgare var. Saccharatum এর ডাঁটা হইতে চিনি প্রস্তুত হয়। কতকগুলি সুমিষ্ট গাছের নাম জানাইলাম।

(৩) এইবার ১টি লবণনির্দেশক গাছের নাম বলিতেছি। Peganum harmala যে জমিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়, বুঝে নিতে হবে যে সেই সকল জমিতে Potassium nitrate সঞ্চিত হইয়াছে।

(৪) Carthamnus Oxyacantha কয়েক বছর আগে উত্তর প্রদেশে হলদে ধুলাবালির ঝড়ে (yellow dust storm) আনিত হইয়াছে। এই Weed (আগাছা) জমির খাদ্য শুষে খেয়ে ফেলে (exhausts the soil)। এপ্রিল ও মে মাসে বাতাস গরম হলে এদের বীজ অঙ্কুরিত হয়। অদ্ভুত জীবনেতিহাস নয় কি? এমন শোষণ যে ঘরজামাই-এর মতন শোষণ!! ইহা একটি শোষণকারী গাছ।

(৫) Australiaর Eucalyptus amygdalina ৪৫০ ফুটের বেশী লম্বা দেখা যায়, চওড়া ১২৯ ফুট। উদ্ভিদবিজ্ঞানীরা এই গাছটিকেই দীর্ঘতম বলিয়া স্বীকার করেছেন। দক্ষিণ আমেরিকার Psendostuga douglassce প্রায় ২০০ ফুট লম্বা। Sequoia sempervireny (coast Red Wood) খুব মূল্যবান বৃক্ষ। কাঠ খুব দামী বলে সকলে জানে। উচ্চতায় ৩৭৬ ফুট। Californiaর Arcata Red wood Companyর Tree Farmএ আজও সংরক্ষিত অবস্থায় আছে। Sequoia giganteaর উচ্চতা ৩২৫ ফুট। এর গুঁড়ি (পাগুটা) এত বড় যে সেটাকে কেটে সুড়ঙ্গ করে গাছের মধ্য দিয়া পাকারাস্তা করা হইয়াছে এবং ঐ রাস্তা দিয়া আমেরিকাবাসীরা মোটর চালাইয়া যাতায়াত করে থাকে। ২৩ বছরে এর চাষ হয়েছেন বোধ হয়। Australiaর উপরোক্ত Eucalyptus গাছটি এত চওড়া যে ২৫/২৬ জন স্বাস্থ্যবান লোক পাশাপাশি হাত ধরাধরি করিয়া দাঁড়ালে তবে ঐ গাছটিকে ঘেরা যায়। ইংলণ্ডের largest Eucalyptus tree—Eucalyptus coccifera ১৯৬২—৬৩ সনে মারা গেছে। ৮৫ ফুট ৬ ইঞ্চি গুঁড়ির পরিধি। Earl of Devon এর Exeterএর সন্নিকটস্থ Powderham Castle-এ গাছটি ছিল।

Dendrocalamus giganteus একবীজপত্রী বাঁশ গাছ। ১২০ ফুট পর্যন্ত লম্বা হয়। বাঁশঝাড়ের বেড় ৪০-৫০ ফুট। Young shoot বা কোঁড় প্রতিদিন ১ ফুট করে বাড়ে। এই গাছের কয়েকটা প্রজাতি আবার লতানে। ব্রহ্মদেশে আবাসস্থান। কয়েকটা দীর্ঘতম গাছের নাম জানিতে পারিলেন।

(৬) কষ্টসহিষ্ণু ও কঠিন প্রাণবন্ত গাছের নাম ২১টী জানাইব।

Agropyron caninum ইংলণ্ডের একটী troublesome weed (আগাছা)। ভূমধ্যে ইহার ডাঁটা থাকে। সম্পূর্ণভাবে তুলিয়া না পোড়াইয়া ফেলিলে নিস্তার নাই। কোনরকমে মাটির মধ্যে এক টুকরা থাকিয়া গেলে পুনরায় গাছ বাহির হইবে। কোন অংশ অতি ছোট ছোট টুকরা করিয়া ফেলিয়া দিলেও রক্ষা নাই। প্রত্যেক টুকরা হইতে একটী করিয়া ঐ গাছ। একেবারে রক্তবীজের ঝাড়।

Anastatica hierochuntea ভূমধ্য সাগরের Rose of Jericho বলিয়া সুপরিচিত। যখন গ্রীষ্মকালে বীজ পাকে, সব পাতা গাছ থেকে ঝরে পড়ে। ডালগুলি গুটাইয়া গাছটিকে বলের আকারে পরিণত করে। ঝড়ে বালি উড়াইলে শিকড় বাহির হইয়া পড়ে। তখন বলগুলি বাতাসে ভেসে বেড়ায়। একস্থান হইতে আর এক স্থানে এইরূপে বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ঐ সকল শুষ্ক মরুভূমিপ্রধান স্থানে বৃষ্টি খুবই কম। এক পশলা বৃষ্টির সাথে সাথেই গাছটী শিকড় গাড়ে এবং সেই স্থানে স্থায়ী হইয়া যায়। আবার বৃদ্ধি— ফুল, ফল, বীজ ও বিস্তার।

• Bellis perennis ইংলণ্ডের Daisy ফুল গাছ। নাম অনেক শুনেছেন। ভূমধ্যস্থ ডাঁটা শীতকালে সুপ্ত থাকে (hibernates)। এই ডাঁটাগুলির সাহায্যে বংশবিস্তার করে। পুষ্পগুচ্ছ বৃষ্টির জল পেলে রাত্রে ঘুমাইয়া পড়ে রৌদ্র পাইলে পুনরায় প্রস্ফুটিত হয়।

Bertholletia গণের প্রজাতির বীজ খুব তৈলাক্ত। Brazil nut বলিয়া প্রখ্যাত। ফলটী এত শক্ত যে কুড়ালের সাহায্যে কেটে ফেললে তবে বীজটী বের করা যায়।

Magnolia Kobus var. borealis জাপানের Hokkaidoতে জন্মায়। 0C. এর নীচে ঠাণ্ডায় বেঁচে থাকতে দেখা যায়। নিম্নলিখিত বাঁশগাছগুলিও ঐরূপ; উদ্যানবিদরা এগুলিকে sub-zero type বলে :—

(১) Arundinaria japonica—১৫ ফুট লম্বা পর্যন্ত হয়। Soil erosion control এ ব্যবহৃত হয়।

(২) Semiarundinaria fastuosa—২৫ ফুট লম্বা।

(৩) Phyllostachys fastuosa - ৮০ ফুট লম্বা ; ৬ ইঞ্চ মোটা।

(৪) Phyllostachys aureo-sulcata—৩০ ফুট লম্বা; এদের রং দেখে yellow grove bamboo বলে।

(৫) Phyllostachys aureaর সোনালী রং বলে The Golden Bamboo বলে। এ গাছ lower growing ; খুব উঁচু হয় না।

এইগুলি প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে। এরূপ এদের সহ্য শক্তি !!

বারান্তরে ঠাণ্ডা সহ্যকারী গাছের কথা বলিব।

(৭) পশ্চিম হিমালয় পর্বতে, নেপালে ও কাশ্মীরে দ্বিবীজপত্রী গাছের মধ্যে ক্ষুদ্রতম গাছ পাওয়া গেছে। নাম Arceuthobium minutissimum। ইহা পরগাছা, Pinus excelsa র [illegible] ত্বকের মধ্যে জন্মায় ও বাস করে। পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র ভারতেই পাওয়া যায় (Endemic in India)। এই গাছের সবটাই আশ্রয়দাতার ত্বকের মধ্যে থাকে; ২-৩ মিলিমিটার মাত্র লম্বায়। Complete Parasite বা সম্পূর্ণভাবে পরগাছা। আশ্রয়দাতার ত্বক ভেদ করে পুং ও স্ত্রী পুষ্প আলাদা আলাদাভাবে আলপিনের মাথার ন্যায় বাহির হয়। গাছটী diolcious অর্থাৎ পুং ও স্ত্রী পুষ্প আলাদা আলাদা গাছে হয়। সকল উদ্ভিদ বিজ্ঞানীরা Sir J. D. Hookerকে সমর্থন ক'রে পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম দ্বিবীজ গাছ বলে স্বীকার করেছেন। গত ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিভাগে বর্তমান লেখক এই গাছের শরীর-সংস্থা (anatomy) গবেষণা করিয়াছিলেন। এক বীজপত্রীদের মধ্যে পুকুরের গুড়ি পানাই ক্ষুদ্রতম। বৈজ্ঞানিক নাম Wolffia arrhiza।

এদের চেয়ে অবশ্য বড় কিন্তু ক্ষুদ্র হচ্ছে Alpine Region এর Loiseleuria procumbens। চলতি ক Alpine Zalea বলে। এই গাছটি Snow Lichen (Citraria nivalis) এর মতন উচ্চতাতে এবং এদের সা বসবাস করে। বৈজ্ঞানিক মতে এই গাছটী একটী taxonomic relic। স্বজাতীয় গাছগুলি মরে হেজে গে এইটী ঐজাতীয় গাছের মধ্যে এটী এখনও বেঁচে আছে।

Cassiope hypnoidesও খুব ছোটগাছ : moss heatteer বলে। ফুল না থাকলে moss (মস) বলিয়া ভ্রম এই জন্য প্রজাতির নাম বৈজ্ঞানিকভাষায় hypnoides অর্থাৎ মসের ন্যায়। Pinguicula villosa গা শীর্ণকায় গাছের অন্যতম; অতি ক্ষুদ্রতর। ফুল ধারণ না করলে চেনার উপায় নাই। Sphagnum ম সাথে জন্মায়। কীট পতঙ্গভুক গাছেদের অন্যতম। Sasa pygmaea একপ্রকার বাঁশ গাছ। মাত্র ১০ ই লম্বা। এটী একটী একবীজপত্রী। বহুক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্রতম গাছের কথা জানালাম।

Baja Californiaর Pachycereus pringeli কে সকলে দৈত্য ক্যাক্টাস বা Giant Cactus ব ঐ দেশীয় চলতি ভাষায় Cardou। অনেকে ভুল করে Arizona মরুভূমির দৈত্য ক্যাক্টাস্ মনে করেন গাছটীকে। তা নয়। সে গাছটী এর চেয়ে একটু ছোট—নাম Carnegia gigantea। পূর্বোক্ত গাছটী ফুট লম্বা হয়। ভেতরে শক্ত কাঠ জন্মায় বলিয়া গাছটী সোজা হয়ে থাকে। ঐ দেশের আদিবাসীরা ঐ কাঠ দিয়া বাড়ীর চার পাশে বেড়া দেয় এবং চালের ছাতের বরগা হিসাবে ব্যবহার করে থাকে। Pachyce pectan aboriginum একটু ছোট গাছ। এর ফলে খুব ঘন কাঁটা আছে। তাহার সাহায্যে আদিবাসী চুল আঁচড়ায় এবং চুল পরিষ্কার করে। আধুনিকারা এরূপ চিরুণি দেখেছেন কি?

(৯) Ailanthus altissima (A.glandulosa) হচ্ছে Australiaর Tree of Heaven বা স্বর্গীয় গা এর পত্রফলক (lamina) ও পত্রদণ্ড (petiole)—দুয়েরই তলায় abscession layer (ছেদকোষ সমা তৈয়ার হয় (form করে)। প্রথমে ফলকটী খসে পড়ে। তারপর পত্রদণ্ডটী খসে যায়। প্রকৃ অদ্ভুত খেয়াল। অন্য গাছে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া বোধ হয় নরলোক স্বর্গীয় গাছ নামক করিয়াছে। Ailanto কথার স্থানীয় মানে—Tree of Heaven। ইহা হইতে গাছের নাম Ailanthu ডাল কেটে পুঁতলে জমিতে শীঘ্র শিকড়ও বাহির হয়। অত্যধিক ধূম (Smoke) সহ্য করতে পারে ব স্ত্রীগাছগুলিকে রাস্তার ধারে পোঁতা হয়। সেই জন্যই কি স্ত্রীলোকদের হাতে রান্নার ভার পুরুষরা আ কালে চাপাইয়াছিল। পুরুষগাছগুলির ফুল হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। পাতা ঘসলে একটা দু (desageeable odour) বাহির হয়। এই গাছের রেণু—(pollen) নিশ্বাসের সঙ্গে দেহের মধ্যে যাই সর্দ্দি কাশি হয়, রোগসৃষ্টি করে।

A. vilmorina ও A.altissima গাছের পাতা চীন দেশে এণ্ডী পোকা (Eri silk worm) চাষে খ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। স্বর্গীয় গাছ "নন্দন কানন" হইতে আসিয়াছে কিনা তার সঠিক বিবরণ অষ্ট্রেলি বাসীরা বা বৈজ্ঞানেকরা এখনও দিতে পারে নাই।

(১০) Rafflesia Arnoldii-র ফুল হচ্ছে পৃথিবীর সর্ব্ব বৃহৎ পুষ্প। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভিদবিদ Dr. Arno সুমাত্রার জঙ্গলে প্রথম আবিষ্কার করেন। মালয়প্রদেশের গবর্ণর (তদানীন্তন রাজ্যপাল) স্যার স্টামফো র‍্যাফেলস্ ডঃ আর্ণল্ডকে নূতন নূতন গাছপালা আবিষ্কারের কাজে উৎসাহিত করতে তাঁর সঙ্গে স বনে জঙ্গলে ঘুরতেন। সেইজন্য তাঁর স্মৃতির উদ্দেশে গনের নাম রাখা হয়েছে Rafflesia প্রথম আবি

ফারকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে Arnoldii প্রজাতি নামের সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে। এটি কিন্তু একেবারেই পরগাছা। এক একটি ফুলের ওজন—১৫ পাউণ্ডেরও বেশী। চওড়া ৩ ফুটেরও অধিক।

Aristolochia gigas এর ফুলটি ৭।৮ইঞ্চি চওড়া। সামনের দিকে ২০—২৪ ইঞ্চি একটি ল্যাজের মত অংশ আছে। দক্ষিণ আমেরিকায় ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পাওয়া যায়।

Victoria regia ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রেজিলে বনভূমির জলায় আবিষ্কৃত হয়। তদানীন্তন ইংলণ্ডের মহারাণী Victoriaর সম্মানার্থে নামকরণ করা হইয়াছে। এর পাতা ৫।৭ ফুট চওড়া। পাতার কিনারা তিন ইঞ্চি উঠান (Upturned)। অনেকটা থালার মতন। আজকাল ভারতের বহু জায়গায় এইগাছ রোপণ করে রাখা হয়েছে। Botanic Gardens এও দেখতে পাবেন।

মালয় প্রদেশের Giant orchid এর নাম Grammatophyllum Speciosum। গাছটি জমির উপর জন্মায়। পুষ্পগুচ্ছ ৫।৭ ফুটলম্বা। সুমাত্রায় Amorphophallus titanum আর একটি নাম আম্বাগাছ। একটি করে পাতা বাহির হয়। পত্র ফলকটী (Blade) ৪—৫ ফুট; ইহার ডাঁটাটি ১০ ফুট লম্বা। যে পাতা দ্বারা (Spathe) পুষ্পগুচ্ছ (Spadix) ঢাকা থাকে তার পরিমাপ ৪ফুট × ৩ফুট। পুষ্পগুচ্ছটি—
১০ ইঞ্চি লম্বা × ৩১ ইঞ্চি চওড়া।

Dracontium (Godwinia) gigas এর জন্মস্থান Nicargua তে। পাতা ৮—১০ ফুট লম্বা। Spathe এর পরিমাপ ৪-৫ ফুট অর্থাৎ যে পাতায় পুষ্পগুচ্ছ ঢাকা থাকে।
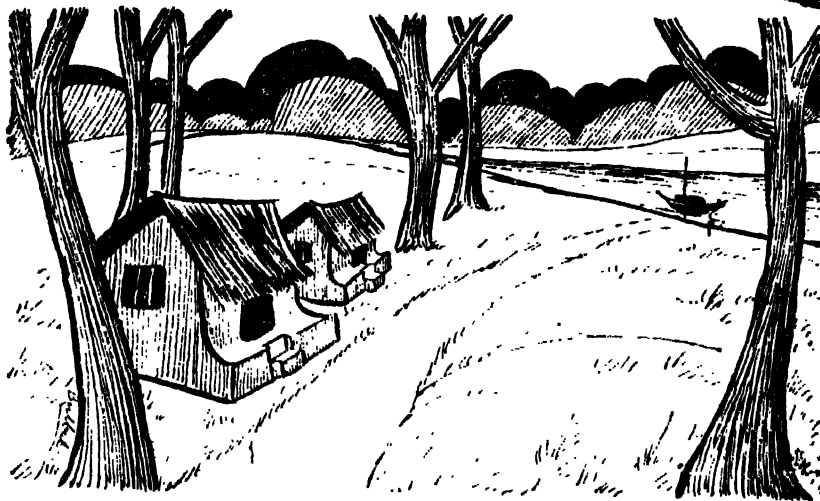
হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতাচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতাচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের খ্যাতি বহুদিন হতে আমি শুনে এসেছি। উপযুক্ত পিতার উপযুক্ত পুত্র হিসাবে বিষ্ণুপুর ঘরানার ঐতিহ্যকে তিনি অমর ক'রে রেখেছেন। কিন্তু তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয়ের সুযোগ ঘটে যখন আমার ওপর রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলবার ভার সরকার অর্পণ করেন। তিনি নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন এবং দুটি বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সঙ্গীত ও নৃত্যবিভাগ। পরে তিনি সমগ্র চারুকলা শাখার ডীন নিযুক্ত হন।

তাঁর সহিত বৎসরের পর বৎসর ধরে এক যোগে কাজ ক'রে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য লাভের আমার সুযোগ ঘটেছিল। মানুষ হিসাবে তিনি মৃদুভাষী এবং একান্ত ভদ্র ছিলেন; রুষ্ট হয়ে রূঢ় কথা তাঁকে কোনদিন কাউকে বলতে শুনিনি। যে দুটি বিভাগ তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল তাদের তিনি বিশেষ যোগ্যতার সহিত প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত করেছিলেন। সঙ্গীত ও নৃত্যে ডিগ্রি স্তর হতে স্নাতকোত্তর পরীক্ষাগুলি পর্যন্ত বিভিন্ন পাঠক্রম রচনায় তাঁর এই শাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পেয়েছি। আজ যে রবীন্দ্রভারতীর সঙ্গীত বিভাগ এত জনপ্রিয়, এবং এত অধিক ছাত্রছাত্রী সঙ্গীত চর্চা করেন, তা তাঁরই ঐকান্তিক চেষ্টায় সম্ভব হয়েছে।

এই রবীন্দ্রভারতীর দুটি বিশেষ প্রকল্প রচনায় এবং তাদের কার্যে রূপান্তরে তাঁর সক্রিয় সহযোগিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত সঙ্গীতে নিজে সুর দিতেন কারণ সুর-রচনায় তিনি যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন তা কোনো প্রচলিত পথে চলত না। তিনি বলতেন ভাবের সঙ্গে সুরের মিলন সাধনাই তাঁর ব্রত। এই কারণে তাঁর প্রদত্ত সুরের ব্যতিক্রম তিনি পছন্দ করতেন না। এই অবস্থায় তাঁর গায়কী ধরে রাখবার একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। সেই উদ্দেশ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের কাছে বা দিনেন্দ্রনাথের কাছে যাঁরা রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করেছিলেন তাঁদের গান টেপরেকর্ড করে সংরক্ষণের একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। অনুরূপভাবে বাংলায় প্রচলিত ধর্মসঙ্গীতের সুর ধরে রাখবারও একটি প্রকল্প গৃহীত হয়। বর্তমানকালে প্রযুক্তি বিদ্যাভিত্তিক সংস্কৃতি যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা মানুষের মনকে ধর্মসম্পর্কে খানিকটা উদাসীন করেছে। এই সব সঙ্গীত পরে পরে হয়ত তার ফলে লোপ পেয়ে যাবে। এই কারণেই তাদের সংরক্ষিত করবার জন্য ধরে রাখবার এই চেষ্টা। এই দুই প্রকল্পই তাঁর পরিচালনায় সাফল্যের সঙ্গে রূপায়িত হয়েছে। ফলে তাঁর নিজকণ্ঠে গাওয়া সঙ্গীতও টেপরেকর্ডে ধরা পড়েছে।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করেছি, প্রৌঢ় বয়সেও তিনি নূতন পরীক্ষা করতে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। এই প্রসঙ্গে একটি সুন্দর উদাহরণ স্থাপন করা যেতে পারে। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তলের মত নাটক বর্তমানকালে সাধারণ রসিকসমাজে স্থাপন করা যায় না, কারণ তা সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ভাষায় রচিত এবং সাধারণ মানুষ এখন তেমন সংস্কৃত চর্চা করেন না। তাই এই অনন্যসাধারণ নাটকের অনুবাদ সাধারণ রসিকের কাছে পৌঁছে দেবার ইচ্ছায় আমি তাঁর কাছে প্রস্তাব করি, তার নৃত্যরূপ দিয়ে রঙ্গমঞ্চে স্থাপন করা হয়; কারণ দেহভঙ্গির ভাষায় আবেদন বিশ্বজনীন, তিনি প্রস্তাবটি সর্বান্তকরণে গ্রহণ করেন এবং তাঁর তত্ত্বাবধানে অধ্যাপক শিবসংকরণের নির্দেশনায় তার নৃত্যনাট্যরূপ দেওয়া হয়। নৃত্যের সঙ্গে গাইবার জন্য কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোকও সঙ্গীতে রূপান্তরিত করা হয়।

তার সুর-সংযোজন তিনি নিজে করেছিলেন। বলাবাহুল্য এই পরীক্ষা সফল হয়েছিল। রবীন্দ্রভারতীর ছাত্র-ছাত্রীগণ তার নৃত্য-অভিনয় ক'রে দর্শকদের প্রশংসা আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

এই প্রসঙ্গে তাঁর আর একটি উল্লেখযোগ্য কাজের কথা বলা যেতে পারে। তাঁর পিতা সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দুখানি সঙ্গীত-সংকলন-গ্রন্থ সম্পাদন করেন; তাদের নাম 'সঙ্গীতলহরী' এবং 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা'। উভয়েই মূল্যবান গ্রন্থ। গানের প্রাচীন সুর এই গ্রন্থ দুটিতে সংরক্ষিত হয়েছে। গ্রন্থ দুখানি বহুবৎসর পূর্বে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তার পর দীর্ঘকাল বাজারে পাওয়া যেত না। দ্বিতীয় বইখানির সম্প্রতি তাঁর ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রভারতী হতে নূতন সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে। ফলে তানসেন হতে আরম্ভ ক'রে বৈজু বাওরা প্রভৃতি সমগ্র ভারতে খ্যাতিসম্পন্ন নানা সুরকারের সঙ্গীত স্বরলিপি সহ সঙ্গীতরসিকের নাগালের মধ্যে স্থাপিত করেছে। প্রথম বইখানি এখন যন্ত্রস্থ।

এইভাবে দীর্ঘকাল এক সঙ্গে বাস করবার ফলে অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমার একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সম্প্রতি কয়েকমাস আগে যখন গুরুতর পীড়ায় আমি শয্যাশায়ী হয়েছিলাম তিনি আমার শয্যার পাশে গিয়ে আমার আরোগ্য কামনা করে এসেছিলেন। পরে আমি মরণের হাত হতে ফিরে এসে খানিক সুস্থ হয়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার হতে মুক্তি নিলাম, অধ্যাপকমণ্ডলীর সভাপতিরূপে তিনি আমার জন্য একটি বিদায় সভার আয়োজন করেন। সেদিন কে জানত যে তার দিন দশেকের মধ্যেই আকস্মিকভাবে আমাদের ছেড়ে তিনি চলে যাবেন। তাঁর সেই সৌম্য সুদর্শন সদাহাস্যমণ্ডিত মুখখানি এখনও চোখের সামনে ভাসে। ভাবতেই পারা যায় না তাঁকে আর পাব না।

এমন একটি মহান শিল্পীর স্মৃতি তর্পণের জন্য ব্রাহ্ম যুবসমাজ আজ যে আয়োজন করেছেন তা সর্বদা অভিনন্দন-যোগ্য। ব্রাহ্মসমাজের অকুণ্ঠ সেবা করেও তিনি যে এঁদের গভীর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিলেন তা আমার অবিদিত নয়। এই সভার যারা আয়োজন করেছেন তাঁদের পক্ষ হতে এবং ব্যক্তিগতভাবে আমার নিজের পক্ষ হতে সঙ্গীতাচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করে এই ভাষণ শেষ করবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

* গত ১৫ই চৈত্র ১৩৭৫ শনিবার সন্ধ্যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে যুব সমিতি কর্তৃক আয়োজিত শোক-সভায় প্রদত্ত ভাষণ। তত্ত্বকৌমুদী হইতে উদ্ধৃত।

পরলোকে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

যুগবাণীতে বাহির হইয়াছে: পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন মন্ত্রী এবং এককালের বিপ্লবী কর্মী নিরঞ্জন সেনগুপ্ত গত ৩রা সেপ্টেম্বর বুধবার শেষ রাত্রিতে ৬৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁহার শেষকৃত্য সমাধা হয় এবং সরকারী অফিস আদালত ও স্কুল কলেজে ছুটি ঘোষণা করিয়া মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়। নিরঞ্জনবাবু ১৯০৪ সালে বরিশালের নারায়ণপুর গ্রামে জন্মলাভ করেন। পিতা সর্বানন্দ সেনগুপ্ত। অনুশীলন সমিতির সদস্যরূপে কিশোর বয়সেই তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ছাত্রাবস্থায় সক্রিয়ভাবে রাজনীতি করেন। কিছুদিন সারা ভারত ছাত্র সংগঠনের যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন। বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে বি, এস-সি পরীক্ষা দেওয়ার প্রাক্কালে পুলিশ তাঁহাকে গ্রেফতার করে। তাই পরীক্ষায় বসা হয় না। ১৯২৯ সালে মেছুয়াবাজার বোমা মামলার অন্যতম আসামীরূপে ধৃত হন ও ১০ বছরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। পরে অবশ্য মেয়াদ ৫ বছর হ্রাস করিয়া তাঁহাকে আন্দামানের জেলে রাখা হয়। ১৯৩৮ সালে তিনি কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং '৪২ সাল হইতে যুদ্ধকালে সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির অনুকূলে বিষোদগারকারী 'জনযুদ্ধ' পত্রিকার সম্পাদকীয় মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য মনোনীত হন। কমিউনিষ্ট পার্টি দুইভাগে বিভক্ত হইলে তিনি মার্কসবাদী গোষ্ঠীভুক্ত হন। স্বর্গীয় নিরঞ্জনবাবু ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে বীজপুর কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হন। ১৯৬২ সালে কমিউনিষ্ট পার্টি অব ইণ্ডিয়ার প্রার্থীরূপে টালিগঞ্জ কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হন এবং ১৯৬৭ সালে মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট প্রার্থীরূপে উক্ত কেন্দ্র হইতে নির্বাচিত হইয়া উদ্বাস্তু ও ত্রাণমন্ত্রীরূপে শপথ নেন। ১৯৬৯-এর অন্তর্বর্তী নির্বাচনে পুনরায় টালিগঞ্জবাসীরা তাকে বিজয়ী করেন ও তিনি মন্ত্রী হন।

দেশ-বিদেশের কথা

"হিপ্পি সম্প্রদায় লইয়া মাথাব্যথা"

ইয়োরোপ আমেরিকায় একটি সম্প্রদায় গড়িয়া উঠিতেছে যাহাদের চলিত ভাষায় নাম দেওয়া হইয়াছে
ি"। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা পাশ্চাত্য সভ্যতার অসারতা সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয় হইয়া উক্ত সভ্যতার নির্দ্দেশ
র ও অবহেলা করিয়া নিজেদের প্রাণের আবেগের উপর নির্ভর করিয়া জীবন নির্ব্বাহের ধারা নির্দ্ধারণে
নিয়োগ করিয়া থাকেন। হিপ্পিদিগকে সর্ব্বত্রই দেখা যায় ও তাহারা বস্ত্রে ব্যবহারে চালচলনে বিশেষ করিয়াই
দের মত। ইয়োরোপ আমেরিকার মানুষ আফ্রিকা অথবা এশিয়ার মানুষের তুলনায় অনেক অধিক নিয়মের
তাহারা যথা ইচ্ছা দাড়ি গোঁফ চুল রাখা, ঢিলাঢালা বর্ণবহুল বস্ত্র পরিধান যত্রতত্র বসবাস অথবা ঘোরা-
করিতে সাধারণত সাহস পায় না। সকলেই সমাজের নিয়ম মানিয়া চলে এবং আকৃতি ও স্বভাবে ছাঁচে-
বলিয়া প্রতীয়মান হয়; পাশ্চাত্যের মানুষ হঠাৎ আলখাল্লা অথবা ঐ জাতীয় কিছু পরিয়া পথে বাহির
চায় না; পথে বসিয়া খায় না, অথবা যেখানে সেখানে শুইয়া রাত্রি যাপন করে না। হিপ্পিরা এইসকল
চলে না। তাহারা যাহা করে অথবা করে না, তাহাতে পাশ্চাত্যের সমাজনেতাদিগের
। মাথাব্যথার কারণ হইয়াছে। ইহারা কি আর একটা জিপসি বা যাযাবর সম্প্রদায়
গঠিত হইবে; অথবা ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি হইয়া শেষ অবধি কি ইয়োরোপ আমেরিকার সভ্যতা রসাতলে
? হিটলার থাকিলে হয়ত ইহাদের সকলকে প্রাণে মারিয়া সমাজরক্ষা করিত। কিন্তু বর্ত্তমান জগতে
ছে যে ইহাদের সামলাইতে সক্ষম হইবে?

মাওৎসে তুঙ্গ

আমেরিকান অপপ্রচার বিশ্বকে বোঝাবার চেষ্টা করে, মাওৎসেতুঙ্গ হয় মৃত নয় এমন কোন রোগাক্রান্ত
য় আর বাঁচিবার সম্ভাবনা থাকে না এই প্রচারের মূল কোথায়? বিগত কিছুকাল নাকি
রেডিও মাও এর নাম উল্লেখ করে না। পূর্ব্বে সকল প্রচারের সময়ই মাও এর নাম শুনা যাইত;
ম্যান মাও দীর্ঘজীবি হউন" "চেয়ারম্যান মাও এই বলিয়াছেন অথবা তাই বলিয়াছেন" ইত্যাদি কথা
সময়েই উচ্চারিত হইত। এখন কিছুকাল মাও এর নাম গন্ধ থাকে না পিকিং বেতার প্রচারে। তাই
শ্রোতাগণ মনে করেন যে রুশে যেমন একসময় ষ্টালিনের নাম উচ্চারণ না করিয়া মানুষের মন থেকে
ক সরাইয়া দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল; পিকিং রেডিও সম্ভবত ঐ একই উপায়ে চীনের মানুষের মন
ও ৎসে তুঙ্গকে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সকল অপপ্রচারের সময়েই আবার মাও ৎসে
টা বিরাট জনবহুল সভাতে লিন পিয়াওকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি যে মৃত বা রুগ্ন
হেন তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ দিবার জন্য। তাঁহাকে দেখিয়া কাহারও মনে হইল না যে তিনি পূর্ব্বের

মতই শক্তিমান ও মানসিকভাবে পূর্ণ সজীব নহেন। তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে অথবা তিনি নিদারুণ রোগে আক্রান্ত বলিয়া কাহার কি সুবিধা হয় তাহা আমরা বুঝি না; কিন্তু এই জাতীয় গুজব রাষ্ট্র করা এইবার লইয়া কয়েকবার করা হইল দেখা যাইল। আমাদের দেশে লোকে বলে মৃত্যুসংবাদ ভুল করিয়া প্রচারিত হইলে মানুষের পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। আশা করি মাও ৎসে তুঙের পরমায়ু এইভাবে ক্রমে ক্রমে বাড়িতে থাকিবে।

পাশ্চাত্যে, ভাষা চিত্র ও ব্যবহারে নগ্নতাবৃদ্ধি

আমাদের বাল্যকালে ইয়োরোপীয় (অর্থাৎ বৃটিশ) দিগের চক্ষে আমরা অত্যন্তই বিবস্ত্র ভাবাপন্ন বলিয়া প্রচারিত হইতাম। আমাদের নাকি হাঁটু অবধি পা দেখা যায়; নারীরা একবস্ত্রা থাকে ইত্যাদি। আমাদের ধর্ম্মমন্দিরের প্রাচীন সাহিত্যের ও সভ্যতার নানা অঙ্গেই নাকি আদিরসের আধিক্য দেখিয়া সুরুচি ও সুরুচির আকর ইয়োরোপীয়গণ বড়ই কষ্টবোধ করিতেন। ভারতের সকল চিন্তাই যৌনভাবে ভরপুর এবং তাহা দেখিয়া আমাদের ভবিষ্যত কিরূপ অন্ধকার ভাবিয়া ভারত কল্যাণকামী ইয়োরোপীয় চিন্তাশীলগণ সদা সর্ব্বদাই বিশেষ আকুল থাকিতেন। ইহার পরে ইউরোপীয়গণ ক্রমে ক্রমে বিবেকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া নারীদিগের পোষাক উপর হইতে আরম্ভে বিলম্ব করিয়া ও নীচ হইতে ধীরে ধীরে উর্দ্ধ হইতে আরও উর্দ্ধে উঠিয়া পা ও গা দেখানর একটা চূড়ান্ত করিলেন। পুরুষরা ঐভাবে দেহে হাওয়া লাগাইতে না পারিলেও হাফ প্যাণ্ট কোয়ার্টার প্যাণ্ট পরিয়া এবং সার্টকে টিসার্ট নামধেয় গাত্রাবরণে পরিণত করিয়া কতকটা আধুনিকতা বজায় রাখিলেন। "সূর্য্যস্নান" ও "অনাচ্ছাদনবাদ" প্রভৃতি নব নব দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক চিন্তার আবেগে লক্ষ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ নরনারী বস্ত্র বর্জ্জন করিয়া সভ্যতাকে একটা নূতন চূড়ায় তুলিয়া বসাইয়া দিলেন। তার পরে আসিল উত্তমাঙ্গ ও অধমাঙ্গ আবরণ লইয়া একটা মহা বিপ্লব। ইহা এখনও চলিতেছে ও বহুস্থলেই উচ্চশিক্ষিত ও উচ্চ বংশজাত ইউরোপীয়গণ উলঙ্গতার প্রতিযোগিতায় পরস্পরকে পরাজিত করিবার জন্য উন্মত্তের ন্যায় পথেঘাটে বস্ত্র ত্যাগ করিয়া ঘোরাফেরা করিতেছেন।

দেহের নগ্নতাকে একটা আদর্শে দাঁড় করাইয়া এই সকল ব্যক্তিগণ যাহা না করিয়াছেন; সাহিত্যে ও সমাজে যৌন সম্বন্ধে ব্যভিচারকে কৃষ্টির উচ্চ শিখরে স্থাপন করিয়া ইঁহারা মানবসভ্যতার ক্ষেত্র হইতে সংযম, ইন্দ্রিয়দমন, ব্রহ্মচর্য্য, দেহের মনের পবিত্রতা প্রভৃতিকে নির্ব্বাসন দিয়াছেন বলা যাইতে পারে। সম্প্রতি ইয়োরোপের উচ্চস্তরের লেখকদিগের মধ্যে একটা অশ্লীলতার প্রবল আগ্রহ জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। বহু পুস্তক ও পত্রিকা আজকাল এমন কুৎসিত ও লজ্জাকর বিষয়সমূহ সকল বন্ধন ও আবরণ মুক্ত করিয়া সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছে যাহাতে মনে হয়, মানব-সভ্যতার সকল আদর্শই এতকাল উল্টা পথে চলিয়া আসিয়াছে এবং আমরা যাহাকে বর্ব্বরতা, অসভ্যতা, অন্যায় ও মিথ্যা বলিয়া আসিয়াছি তাহাই আসলে সত্য, ন্যায়, সুন্দর ও সুসভ্য। অবশ্য সহজেই বুঝা যায় ও প্রমাণ করা সম্ভব যে অশ্লীলতার এই নূতন আবেগ কোন নূতন আদর্শের সৃষ্টি নহে। ইহা শুধু অতিমাত্রায় সংযম পালন ও নিয়ম মানিয়া চলার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া। ইহা কখনও দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না।

ইহার মধ্যে শুধু এইটুকুই ভয়ের কথা যে ইয়োরোপের সকল স্বাস্থ্যবিপর্য্যয়ই ঘুরিয়া ফিরিয়া আমাদিগের স্কন্ধে আসিয়া স্থান দখল করিয়া বসে। এই অশ্লীলতাবাদও আমাদের স্কন্ধে আরোহণ করিবে বলিয়া ভয় হয়। আগে হইতে সাবধান হইলে তাহা না হইতেও পারে।

মসীযুদ্ধ ও অসিযুদ্ধ

"যুগজ্যোতি" সাপ্তাহিকের উপরোক্ত আখ্যার মন্তব্য বিশেষ পাঠযোগ্য হইয়াছে। আমরা তাহার অনেকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও বাঙ্গলা কংগ্রেস নেতা অজয় মুখোপাধ্যায় যুক্তফ্রন্ট সম্পর্কে মন্তব্য করিয়াছেন—"নীচের তলায় অসি যুদ্ধ ও উপরের তলায় মসী যুদ্ধ। দক্ষিণ কম্যুনিষ্ট দলের নেতা সোমনাথ লাহিড়ি সাংবাদিকদের নিকট বলিয়াছেন "যুক্তফ্রন্টের বিউটিই হইল এই যে আমরা ঝগড়াও করি আবার এক সঙ্গে কাজও করি।" দুজনের কাহারও কথা মিথ্যা নয়। অকপট ও সরলভাবে দুই নেতাই যুক্তফ্রন্টের বর্তমান অবস্থা লোকচক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। যুক্তফ্রন্ট আজিও অটুট আছে; নেতৃপর্য্যায়ে ভাঙ্গন ধরিবার অথবা দলত্যাগের ফলে মন্ত্রীসভার পতন ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই দেখা যাইতেছে না। অথচ পরস্পরের প্রতি বিষোদ্গীরণ সমানে চলিয়াছে। ইহার ফলে প্রতিটি দলের ও প্রতিটি নেতারই ভাবমূর্ত্তি কালিমালিপ্ত হইতেছে ও জনমনে তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছে। বিরোধী দল মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিলে অথবা তাহাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি স্বজনপোষণ ও পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আনিলে তাহাতে বিশেষ কিছু যায় আসে না। জনগণ ইহাকে স্বভাবতই ক্ষমতার লড়াইয়ের অত্যাবশকীয় অঙ্গহিসাবে বিচার করে ও বিশেষভাবে প্রমাণ পাইবার পূর্ব্বে তাহা বিশ্বাস করে না। কিন্তু এক মন্ত্রী অথবা তাঁহার দলীয় মুখপত্র যদি প্রকাশ্যে অপর মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনুরূপ অভিযোগ আনয়ন করে তাহা হইলে জনচিত্তে তাহা দৃঢ় রেখাপাত করিবে, ইহা স্বাভাবিক।

এই সকল কুৎসিত অভিযোগ ও প্রতি-অভিযোগের আরও একটি বিষময় ফল দেখা যাইতেছে। ইহা পশ্চিমবঙ্গের সামাজিক জীবনে গুরুতর বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করিতেছে। প্রতিটি রাজনৈতিক দলেরই মধ্যেই অল্পাধিক সুযোগসন্ধানী ও সমাজবিরোধী লোক থাকে। তাহারা নেতৃত্বের মধ্যে বাদ-বিসংবাদের সুযোগ গ্রহণ করিয়া নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য ও প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য সংঘর্ষ বাধাইয়া তুলিবে তাহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও গুরুতর বিপদ হইয়াছে সৎ আদর্শনিষ্ঠ ও উৎসাহী কর্মীদের লইয়া। তাহারা তাহাদের দলীয় আদর্শ ও নেতৃত্বের প্রতি পরিপূর্ণ আস্থাবান ও আন্তরিকভাবে অনুরাগী। তাই দলীয় আদর্শের প্রতি কটূক্তি করিলে অথবা দলীয় নেতৃত্বের ভাবমূর্ত্তিকে কালিমালিপ্ত করিলে তাহারা মানসিক ভারসাম্য হারাইয়া ফেলিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠিবে ও বিচারবুদ্ধি হারাইয়া ফেলিয়া ভাবাবেগের দ্বারা পরিচালিত হইয়া উন্মত্তের মত হিংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত হইবে তাহাতেই বা আশ্চর্য্যের কি আছে? নিজদলের প্রভাব প্রতিপত্তি

ধ্বংস হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে অথবা সহকর্মী কেহ হত, আহত বা লাঞ্ছিত হইলে প্রতিপক্ষকে প্রত্যাঘাত করিবার জন্ম তাহারা জীবন পণ করিয়া সংগ্রামে অগ্রসর হইবে, ইহাই তো স্বাভাবিক। তাই উপরের তলায় মসীযুদ্ধ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ না হইলে নীচের তলায় অসিযুদ্ধ কোনদিনই বন্ধ হইবে না—হইতে পারে না।

সোমনাথ লাহিড়ি যুক্তফ্রন্টের যে "বিউটি" লইয়া গৌরব অনুভব করিতেছেন, তাহাই বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রেরই অন্তরে আতঙ্কের সঞ্চার করিতেছে। নেতারা পরস্পরের দলীয় কর্মীদের অনাচার হিংসাজনক কার্য্য লইয়া প্রচণ্ড বিতণ্ডা চালাইতেছেন এবং পরিশেষে ঐক্যের খাতিরে সাময়িকভাবে প্রতিটি প্রশ্নে আপোষ করিতেছেন। ইহার ফলে কোন পক্ষের দুষ্কৃতকারীরাই শাস্তি পাইতেছে না এবং তাঁহাদের এই কার্য্যে প্রতিটা দলের সৎ ও অসৎ উভয় শ্রেণীর কর্মীই হিংসাত্মক কার্য্য অনুষ্ঠানের সাহস ও প্ররোচনা পাইতেছে। বরানগরে সি পি আই এমের জনৈক কর্মীর বিরুদ্ধে যখন গুরুতরভাবে আহত অপর পক্ষীয় কর্মী নির্দ্দিষ্ট অভিযোগ করিয়াছিল তখনও পুলিশ কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নাই। সি পি আই-এর নেতারা উক্ত সি পি আই এমের কর্মীর গ্রেপ্তার দাবী করিলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতিবসু বলিয়াছিলেন যে, যাহাকে আঘাত করা হইয়াছে সেই ব্যক্তি বলিয়াছে বলিয়াই কোন লোককে গ্রেপ্তার করা যায় না—তাহার অপরাধের প্রমাণ আবশ্যক। টিটাগড়ে সম্প্রতি প্রথমে একজন সি পি এম কর্মী নিহত হইয়াছে। পরিস্থিতি যে গুরুতর তাহাতে সন্দেহ নাই কারণ সেখানে নৈশ-আইন জারি করা হইয়াছে ও সৈন্যবাহিনীকে তলব করা হইয়াছে। অথচ সেখানে এ পর্য্যন্ত একজনকেও গ্রেপ্তার করা হয় নাই। সংবাদপত্রে দেখিলাম আততায়ী কে বা কাহারা তাহা নাকি জানা গিয়াছে কিন্তু তাহাদের গ্রেপ্তার করা উচিত কিনা ইহা লইয়াই বিভিন্ন দলীয় নেতাদের বৈঠকে কোনরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায় পুলিশ নিষ্ক্রিয় হইয়া রহিয়াছে। এই যদি অবস্থা হয় তাহা হইলে সাধারণ মানুষেরই বা জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা কোথায়? কোন রাজনৈতিক দলের পতাকা লইয়া কেহ যদি কাহারও গৃহ লুণ্ঠন করে অথবা কাহাকেও হত্যা করে, এবং তাহাকে সনাক্ত করা সত্ত্বেও যদি পুলিশ মন্ত্রীর বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দাখিল করা না যায় ও দলীয় নেতাদের বৈঠকে এই অপরাধীর গ্রেপ্তারের প্রস্তাব অনুমোদন লাভ না করে তাহা হইলে যদি অপরাধীকে গ্রেপ্তার করা না যায় তবে পুলিশবাহিনী পুষিবার অথবা আদালতগুলি বজায় রাখিবার কোন অর্থই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ও যথেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দিয়া শাসনকার্য্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় না। যে আইন অন্যায় অথবা জনস্বার্থ বিরোধী তাহা পরিবর্ত্তিত বা বাতিল করিতে হইবে। জনস্বার্থ রক্ষার জন্ম প্রয়োজনীয় নূতন আইনও করা যাইতে পারে। কিন্তু কোন আইন তাহা "বুর্জ্জোয়া" আইনই হোক বা সমাজ-তন্ত্রবাদী আইনই হোক না কেন, যতদিন তাহা প্রচলিত থাকিবে, ততদিন তাহাকে উপেক্ষা করা চলিতে পারে না।

ভারতীয় স্কুল জুনিয়র মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

বিগত ৩১শে জুলাই হইতে ৩রা আগষ্ট অবধি কলিকাতায় সর্ব্বভারতীয় স্কুল ও জুনিয়র মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ইহার কেন্দ্র হইয়াছিল কলিকাতার আর্য্যমী কলেজ। এই প্রতিযোগিতায় ১০১ এর অধিক মুষ্টিযুদ্ধ হইয়াছিল। শেষদিনে বাংলার অস্থায়ী লাট শ্রীডি. এন. সিংহ প্রতিযোগিতা কেন্দ্রে উপস্থিত হইয়া পুরস্কার বিতরণ করেন ও একটি বিশেষ উপদেশপূর্ণ ভাষণ দান করেন। যে সকল মুষ্টিযোদ্ধাগণ এই ক্রীড়ায় যোগদান করে তাহাদের মধ্যে ৪৪ জন জুনিয়র ও ৭৬ জন স্কুলের খেলোয়াড় ছিল। বাংলাদেশের ছেলেরা স্কুল প্রতিযোগিতায়

প্রথম স্থান অধিকার করে ও ৩৭ পয়েণ্ট প্রাপ্ত হয়। রাওর খেলা ইস্পাত কারখানায় স্কুলগুলি ২৬ পয়েণ্ট পাইয়া দ্বিতীয় স্থান দখল করে। জুনিয়র মুষ্টিযোদ্ধাগণের মধ্যে জব্বলপুরের ছেলেরাই শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়।

এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন বাংলার অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশন—ভারতীয় অ্যামেচার বক্সিং ফেডারেশনের সহায়তায় ভারত সরকার এই আয়োজন করিবার জন্ত ৫০০০ টাকা সাহায্য দান করেন। মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা চালনা বিশ্ব অলিম্পিক নিয়ম অনুসারে করা হয় ও যাঁহারা বিচারক ছিলেন তাঁহারা সকলেই এই কার্য্যে বিশেষজ্ঞ বলিয়া প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তি।

মধ্যবিত্ত সমিতির অধিবেশন

বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজের দুঃখ ও দুর্দ্দশার কথা আজ সর্ব্বজ্ঞাত। এই মধ্যবিত্ত সমাজের জনসংখ্যা বাংলার কারখানায় শ্রমিকদিগের তুলনায় অধিকই হইবে এবং যদি অবাঙ্গালী শ্রমিকদিগকে গণনার বাহিরে রাখা যায় তাহা হইলে মধ্যবিত্ত সমাজের লোক সংখ্যা তুলনায় আরই অধিক হইবে মনে হয়। মেদিনীপুরের মধ্যবিত্তগণ বহুকাল হইতেই নিজেদের দুঃখ নিবারণের চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি তাঁহার একটি অধিবেশনে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা প্রদীপ পত্রিকা হইতে উহার বর্ণণা উদ্ধৃত করিতেছি।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর, বুধবার তমলুক রাজবাড়ীতে রাজা বীরেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে তমলুক, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম, সুতাহাটা, পাঁশকুড়া ও ময়না থানার মধ্যবিত্ত সমাজের বিশিষ্ট প্রতিনিধিদের একটি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

এই অধিবেশনে মেদিনীপুর জেলা মধ্যবিত্ত সমিতির সভাপতি নারায়ণ গড়ের রাজা ভুবনমোহন পাল মহাশয়ের উপস্থিত থাকিবার কথা ছিল; কিন্তু তিনি অন্যত্রে সমিতির আর একটি অনুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকায় এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। প্রাদেশিক সমিতির প্রধান সম্পাদক শ্রীবিধুভূষণ জানা মহাশয় এই অধিবেশনে তাঁহার দীর্ঘ ভাষণে এই সমিতির আদর্শ ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করেন। তিনি বলেন—বর্ত্তমানকালে সমাজবাদী নামে পরিচিত নেতাদের ব্যক্তিগত অভিরুচি ও চরিত্র এবং তাঁহাদের দ্বারা প্রবর্ত্তিত বিধি-বিধান, ও রীতি-নীতি, আদর্শগত সমাজতন্ত্রের অথবা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। ভারতের জাতীয়তাবাদ ও ভারতীয় সংস্কৃতি আজ সম্পূর্ণ অবলুপ্তির পথে। সংবিধান-শাসিত ভারত রাষ্ট্রে আজ সংবিধান অবমানিত হইতেছে। কিন্তু বহু যুগ পরেও ভারতীয় আধ্যাত্মিক ভাবসম্পন্ন রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র তথা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে।

তিনি আরও বলেন—অদূরদশী বিধিদ্বারা শোষণ পীড়িত অর্থনৈতিক দুর্দ্দশাগ্রস্ত এই সমাজ, ব্যক্তি স্বার্থ ও বিভ্রান্তি বশতঃ যে পথ অনুসরণ করিতেছে, তাহার অনিবার্য পরিণতিস্বরূপ সর্ব্বত্র অশান্তি এবং সর্ব্বস্তরে যে অরাজকতা ও অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে, তাহার প্রতিকারের জন্ত আজ এই সমাজের আত্মচেতনাকে জাগ্রত করিবার দায়িত্ব এই সমাজকেই গ্রহণ করিতে হইবে। এজন্ত দলমত নির্ব্বিশেষে এই সমাজের ঐক্য ও সংগঠন প্রয়োজন।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তমলুকে এই সমিতির একটি সংগঠন ছিল। রাজা সুরেন্দ্রনারায়ণ রায়, প্রবীণ আইনজীবী প্রবোধচন্দ্র নায়ক এবং প্রবীণ দেশসেবক উমেশচন্দ্র ঘোড়াই মহাশয়ের পরলোক গমনের পর আজ তমলুকে আমাদের এই অধিবেশন প্রথম এবং শোকসন্তপ্ত। এই অধিবেশনে তাহাদের স্থান পূরণ করিবার জন্ত

পুনর্নির্ব্বাচনের একান্ত আবশ্যক দেখা দিয়াছে। জাতির এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে জাতির নেতৃত্বকে শক্তিশালী করিবার জন্য উপযুক্ত ব্যক্তির প্রয়োজন। সে অভাব তাম্রলিপ্ত পূরণ করিতে পারিবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।

অতঃপর তমলুকের প্রসিদ্ধ আইনজীবি শ্রীহিরালাল অধিকারী ও শ্রীরঘুনাথ মাইতি মহাশয় উপরোক্ত ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে আলোকপাত করিয়া ভাষণ দেন এবং সমিতির বর্ত্তমান সময়ের ১৬ দফা দাবীর ঘোষণা সহ সমিতির নূতন ১৭ দফা—"বর্ত্তমান সরকার কৃষি ভূমির উপর ন্যায় নীতি বহির্ভূতভাবে ও যে হারে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যাহার করাইবার" দাবী সমর্থন করেন।

অতঃপর সমিতির আদর্শগত প্রত্যেকটি কর্ম্মসূচী এবং প্রস্তাবকে কার্য্যকরী করিবার জন্য একটি শক্তিশালী মহকুমা কমিটি গঠন করিবার একান্ত প্রয়োজন একবাক্যে স্বীকৃত হওয়ায় যথা নিয়মে নিম্নরূপ মহকুমা কার্য্যকরী কমিটি গঠিত হয়:—রাজা বীরেন্দ্রনারায়ণ রায়—সভাপতি, শ্রীহিরালাল অধিকারী ও শ্রীরঘুনাথ মাইতি—সহ-সভাপতি; শ্রীরবীন্দ্রনাথ প্রামাণিক—সম্পাদক; শ্রীসূর্য্যনারায়ণ মাইতি—সহযোগী সম্পাদক; শ্রীনগেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক—কোষাধ্যক্ষ। সদস্য: শ্রীগোপালচন্দ্র ভৌমিক, শ্রীযামিনীকান্ত দাস, শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ জানা, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ জানা, শ্রীশরৎচন্দ্র মাইতি, শ্রীবিধুভূষণ বেরা, শ্রীসতীশচন্দ্র সামন্ত, শ্রীবনমালী চরণ আদক, শ্রীরাজীবলোচন মণ্ডল, শ্রীবলরাম খুটিয়া, শ্রীবানেশ্বর ভট্টাচার্য্য ও শ্রীশিবপ্রসাদ জানা। এছাড়া প্রত্যেক থানা কমিটির সম্পাদকসহ আর একজন করিয়া সক্রিয় সদস্য এই কার্য্যকরী সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিবেন।

এই মহকুমা সমিতির ঠিকানা: "তমলুক রাজবাড়ী", পো: তমলুক, মেদিনীপুর।

এই অধিবেশনে প্রত্যেক থানা ও অঞ্চলে সমিতির শাখা ও কার্য্যক্রম প্রসারণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

(৯ম পৃষ্ঠার পর)

সংগ্রহের কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোরারজির অনুচরদিগের ভিন্ন হইয়া যাওয়াতে কংগ্রেসের একান্নবর্ত্তী পরিবার এখন অধিক খরচ না করিলে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া চলিতে পারিবে না। সুতরাং গ্রামে গ্রামে সহরে সহরে একটির পরিবর্ত্তে দুইটি করিয়া সংসার গড়িয়া উঠিবে ও তাহার ব্যয় ও দ্বিগুন না হইলেও টাকায় আট আনা বাড়িবেই। এই ব্যয়বৃদ্ধি মিটাইবার উপায় কি হইবে? যদি নানা প্রকার কাজ কারবার করিয়া কংগ্রেস কর্ম্মীগন নিজ নিজ খরচ পুরাইতে পারিতেন তাহা হইলে বিষয়টা সহজ হইত। বিশেষ করিয়া এখন জাতীয় ব্যাঙ্কগুলি ছোট ছোট কাজ কারবারে মূলধন সরবরাহ করিবেন বলিয়া যখন শুনা যাইতেছে। আমাদের দেশে ইউ. এফ. সরকার শুনা যাইতেছে এখন মুরগী ছাগল গরু লইয়া দেশের আর্থিক উন্নতি সাধন চেষ্টা করিবেন। ইহাতে যদি জাতীয় ব্যাঙ্কগুলী মূলধন দিবার ব্যবস্থা করে তাহা হইলে কাজটি হয়ত সম্ভব হইবে।

কিন্তু রাষ্ট্রীয় দলের লোকেদের ব্যবসাবুদ্ধির উপর সর্ব্বদানির্ভর করা যায় না। তাঁহারা টাকাকে টাকা বলিয়া মনে করেন না এবং অপব্যয় ও অপহরণ এই দুই এর কোনটিই তাঁহারা রোধ করিতে সক্ষম হন না। সুতরাং তাঁহারা যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কারবার চালাইতে অক্ষম হ'ন, তাহা হইলে জাতীয় ব্যাঙ্কের নিকট টাকা পাইলে সে টাকাও তাঁহারা উড়াইয়া দিতে বিলম্ব করিবেন না। মহাত্মা গান্ধীর খদ্দরের ব্যবসা এক সময় উত্তম রূপেই চলিত। সেই সময়কার দেশসেবকগণ আর্থিক বিষয়ে অনেক অধিক নির্ভরযোগ্য ছিলেন। এখন যদি ব্যাপকভাবে অর্থ নৈতিক ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীদিগকে নিযুক্ত করা হয় তাহা হইলে সেই সকল কর্ম্মীকে বাছাই করিয়া ও যথাযথ শিক্ষাদিয়া তবে কর্ম্মে নিয়োগ করা উচিত হইবে।

মার্কিনদিগের চন্দ্রে পুনর্যাত্রা

মার্কিনদিগের দ্বিতীয় চন্দ্র গমন অভিযান শীঘ্রই আসিতেছে। এই অভিযান অ্যাপোলো ১২শ নামে পরিচিত হইবে। ইহাতেও তিনজন অংশগ্রহণ করিবেন। চার্লস কনরাড (প্রধান), রিচার্ড এফ গর্ডন (চালক), ও অ্যালেন এল বীন (চন্দ্রে অবতরণ যান চালক)। মার্কিন জাতির পক্ষে এত অল্পদিনের মধ্যে দুইটি চন্দ্র অভিযান ব্যবস্থা করা বিশেষ গৌরবের কথা। যদিও অনেকে বলেন যে এত অর্থ ব্যয় করিলে অনেক সৎকার্য্য করা যাইত; তাহা হইলেও মনেরাখা উচিত যে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া পৃথিবীতে ঘোড়দৌড়, মদ্যপান ও যুদ্ধবিগ্রহও করা হইয়া থাকে। সুতরাং কোন খরচ না করিলে যে সেই খরচে সৎকার্য্য হইবে, এমন কথা কেহ বলিতে পারে না। এই দ্বিতীয় অভিযানে বিমানচারীগণ নানা প্রকার নূতন নূতন বিষয় অনুশীলনের ব্যবস্থা করিয়া নূতন জ্ঞান লাভের চেষ্টা করিবেন।

রাষ্ট্রপতি গিরির বৈজ্ঞানিকদিগকে অনুরোধ

রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরি ভারতের বৈজ্ঞানিকদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন যাহাতে তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা খাদ্য লইয়া অনুশীলন বিশ্লেষন করেন তাঁহারা যেন অল্পমূল্যে যাহাতে ভারতের মানুষ পূর্ণ পুষ্টিকর খাদ্য খাইতে পায় সেই বিষয়ের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। ২২ বৎসর স্বাধীনতার পরেও যে ভারতের মানুষের যথাযথ পুষ্টি সম্ভব হয় না ইহা বড়ই অনুশোচনার কথা। রাষ্ট্রপতির আরও বলা দরকার যাহাতে সকল ভারতীয়গণ শিক্ষালাভ করে ও ভারতের সকল গ্রামের মধ্যে উত্তম রাস্তার যোগ স্থাপিত হয়। নয়ত বৈজ্ঞানিকদিগের চর্চ্চার ফল ভারতীয়দিগের মনের ও দেহের ভিতরে পৌছাইবে না।

যাচ্ছি আমি কি দেখে ?

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

দেখিয়াছি যাঁদিকে—
দর্শনীয়ের দর্শনীয় ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকে।
সে প্রতিভার কী পরিবেশ!
দেখ্‌তো চেয়ে দেশ ও বিদেশ,
অমর করে রাখি পূর্ণিমার সে রাত্তিকে।

২

সুখও ছিল, দুঃখও ছিল, ছিল অভাব অনটন।
মনীষার সে মিছিল দেখে উল্লসিত হ'ত মন।
মনুষ্যত্ব যা দেখিছি—
দেবত্বের তা কাছাকাছি।
প্রতি উষার সূর্য্যোদয়ের গায়ত্রীর যে হয় স্মরণ।

৩

দেখছি যাহা স্বাধীন স্বদেশ যাচ্ছে ডুবে হীনতায়
একটাও প্রাণ নেই কি দেশে পঙ্ক থেকে যে উঠায়?
দেশকে আবার করে শুচি,
ফিরায়ে দেয় জাতির রুচি।
অধঃপতন রোধ করিতে দেখছিনা তো কেউ আগায়!

৪

চাই যে আবার মহানুভব মহামানব মহাপ্রাণ
করবে মহাজাতিকে যে এই মহাপাপ হতে ত্রাণ।
উন্মাদনায় আবার মাতি,
ইঙ্গিতে তার চলবে জাতি
যাঁহার কাতর ব্যাকুল তাকে সহায় হবেন ভগবান।

ঘুমপাড়ানী গান

ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়॥

চুপ্‌ চুপ্‌ চুপ্‌, খোকামণি, ঘুমাও আবার।
কোনোখানে কিছু তো নেই, ভয় কি তোমার?
চাঁদের আলো, ঘুম নিঃঝুম, আর তো আমি,
সব চুপচাপ্‌, সকল সুরই গেছে থামি'।
নেইকো ইঁদুর, ঝিঁঝিঁর ডাকও যায়না শোনা,
বাইরে ঘরে নেইকো কারও আনাগোনা।
তবে কেন কাঁদছ তুমি মিছেমিছি?
স্বপ্ন দেখে চমকে গেছ? এই এসেছি।
মায়ের বুকে ঘুমিয়ে থাকো, সোনা আমার,
আমি তোমার কাছেই আছি, ভয় কি আবার?
শোনো শোনো, হুতুমথুমোর ডাক শোনা যায়,
ঘুমপাড়ানী মন্ত্রে বলে, খোকন ঘুমায়।
মিষ্টি নরম বিছানা তার, দোল্‌না দোলে,
সবাই আমার খোকন সোনার মায়ায় ভোলে।
আঁধার রাত্তি দাঁড়ায় এসে দোরের পাশে,
চাঁদের আলো তারই হাসি দেখতে আসে।
ঘুমাও ঘুমাও, দোলনা দুলুক, ঐ তো বুঝি
ঘুমের ছোঁয়ায় চোখের পাতা এলো বুজি'।
নরম নরম নিশাস পড়ে, দোলনা দোলে,
এধার থেকে ওধার আলো-ছায়ার কোলে।

সেই ঈশ্বরী

দিলীপ দাশগুপ্ত

পৃথিবীতে জন্ম নেয়া কোন অতিমানব নয়,
নয় কোন মহামানবী,
সেই এক ঈশ্বরীকে খুঁজেছি বারবার।
অজ্ঞানে জ্ঞানে সব চঞ্চলতার এক অবসর মুহূর্তে
অমর্তবাসিনী, অলৌকিক শক্তিময়ী, মধুময়ী সেই দেবী
বহুবারই দিয়েছিলেন দেখা।
তাই পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেও
এক অপার্থিব শক্তি প্রতিভার দীপ্তরাগে
জ্বলেছে। দিয়েছে। ক্রয় করেছে আমাকে
আমারই বহু সত্তা থেকে স্বতন্ত্র করে, পূর্ণ করে।
আজ পরিণত বয়সে সেই ঈশ্বরী
বাল্মীকি কালিদাস বা রামকৃষ্ণ বা যে কোন সাধক
যা বিন্দুমাত্র পেয়ে ধন্য—তা দিয়েছেন
সিন্ধুর উদারতায়। আমি ধন্য। পূর্ণ আমি। আমি অ-মৃত।
সুবাসিত মঙ্গলবারি সিঞ্চনে, পুষ্পদানে, প্রসাদ বিতরণে
আর কল্যাণকামনায় এই ঈশ্বরী
ভদ্রকালী সরস্বতী কণ্ঠে আর লেখনীতে দিয়েছেন ভাষা,
এই কণ্ঠ আর লেখনী
সর্বজনের কল্যাণে, অনাগত ভবিষ্যতের অগ্নিগর্ভে
অমরত্ব লাভ করুক দেবীর সানুগ্রহ প্রসাদে।
প্রত্যক্ষ অনুভূতি, চাক্ষুস দৃষ্টান্তের অপার্থিব লীলা
অপূর্ব অদ্ভুত হয়ে অবিশ্বাসকে এনেছে
স্থির বিশ্বাসের মহা অসীমে। সে অসীমে
সীমিত আমি, ঈশ্বরীর সঙ্গে একান্ত।

কেন ডাকি

সন্তোষকুমার অধিকারী

এ কথা বলবো কাকে,—কেন তাকে ডাকি বারেবারে?
খুঁজি কেন তারই হাত শুধু? নীলছায়ার আঁধারে
সমুদ্র উত্তাল হ'য়ে সারারাত মাথাঠুকে যায়,
বনঝাউ ঝড়ের নিঃশ্বাসে কাঁপে; কী আশায়
অরণ্য উত্তাল করে' ডাকে পাখী, বলে—দ্বার খোলো:
সে জানেনা,—এ' আঁধার কোনদিনই খুলবেনা দ্বার—
—তুমি তাকে বোলো।

বিষণ্ণ কুয়াশা তার চারিদিকে; নিঃসঙ্গ হৃদয়
কাঁপে ম্লান ব্যর্থতায় শুধু। ক্লান্ত দুই চোখে ভয়,
হানে মুষ্টিবদ্ধ হাত একা অন্ধকারে। জানেনা কে
এ' কুয়াশা ছিঁড়ে নবজীবনের আলো দেবে তাকে।
বারে বারে শুধু তাই ডেকে যায়—ওগো দ্বার খোলো:
সে জানেনা,—এ' আঁধার খোলেনা, খুলবেনা দ্বার
…তুমি তাকে বোলো।

সে ভাবে এ' আকাশের কুয়াশা পেরিয়ে গেলে আলো:
এই বনভূমি ভরা অন্ধকারে ছায়ালোক কে তাকে
দেখালো!

অবোধ হৃদয় এক নিশ্চলপাথরে কর হানে…দ্বার খোলো
খোলেনা দুয়ার, আশা থাকে দূর আঁধারেই
…তুমি তাকে বোলো।

জীবন জাগাতে হবে

শান্তশীল দাশ

জীবন জাগাতে হবে সুপ্রসন্ন ভূমার আলোকে।
এই যে প্রভাতে সূর্য দিয়ে যায় অকৃপণ আলো,
সেই আলো ব্যর্থ হবে? অন্ধকারে কেন এ বসতি?
প্রসন্ন আলোক নিয়ে রাঙাতেই হবে এ জীবন।
থাকুক আঁধার ঘন, থাকুক না কালো কালো মেঘ:
আঁধারের আবরণ ছিন্ন করে আলোর প্রসাদ
নামবেই—এ প্রত্যয় বারে বারে কেন ভেঙে যায়?
কালো মেঘ সত্য নয়, চিরন্তন উজ্জ্বল আকাশ।
দূর করে দাও সব অতীতের গ্লানির কালিমা,
হতাশার বিষণ্ণতা শেষ হয়ে যাক একেবারে;
আলো আছে অফুরণ আর দীপ্ত প্রসন্নতা—
চলার পথের সাথী হোক সেই অনির্বাণ শিখা।
বুকে ভরে নাও আলো, আর সেই আলো জনে জনে
দিয়ে যাও যত পার, তবে হবে সার্থক জীবন।

ডাইনী

(গল্প)

—.........জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

গোপালজীর সড়কের (রাস্তা) ধারে একটা বাড়ীর সামনে অনেকগুলি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করছিল।

হঠাৎ দূর থেকে একটা মিষ্টি গানের সুর ভেসে এল। গ্রাম্য সঙ্গীত। প্রায় সকলেরই জানা। ছেলেমেয়েরা চকিত হয়ে উঠল সেদিকে চেয়ে। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকের বাড়ীর জানলা দরজা খুলে গেল। আর ঠাকুমা দিদিমা মা মাসী পিসির দল বেরিয়ে এসে ছেলেমেয়েদের টেনে হাত ধরে দাঁড়াল একটু। তারপর কি যেন দূর থেকে দেখতে পেয়ে বাড়ীর মধ্যে ছোটদের নিয়ে যেতে লাগল।

সকলেরই চোখের দৃষ্টি চকিত ত্রস্ত। দু একজন চাপাগলায় বললে 'ডাকন্ ছে' (ডাইনী)। ডাইনী। ডাইনীর নাম শুনে নিমেষে পথ খালি হয়ে গেল। শুধু কৌতূহলী বড় বড় মেয়েরা দাঁড়িয়ে।

আর চারপাঁচ বছরের একটা হৃষ্টপুষ্ট সুন্দর দেখতে মেয়ে তার ছোট্ট আঙরাখা আর ঘাগরা পরে পথে দাঁড়িয়ে রইল। তার মা বাড়ী নেই। বাড়ীতে আর কেউ বড় তেমন না থাকায় কেউ তাকে ঘরে ডেকে নেয় নি।

গান ও গায়িকা সদলে এগিয়ে এলো। ছেলেমেয়েরাও ঠাকুরমা মাদের পিছনে পিছনে ঘরের দরজা থেকে দেখতে এগিয়ে এলো একটু।

কমবয়সী বৌ মেয়েরা কেউ কেউ চুপি চুপি বড়দের জিজ্ঞাসা করে, 'ডাইনী কোনটা?'

বুড়ী ওমরাও পঙ্করের মা ধমক দিয়ে বললে 'চুপ কর্, শুনতে পাবে। শেষে তোকেই নজর দিয়ে খাবে।'

হঠাৎ তার নজরে পড়ল ঐ ছোট লক্ষ্মী ঠাকুরুণের মতন একলা মেয়েটীর দিকে। সেও কাজলপরা বড় বড় চোখ মেলে গান শুনছিল। আর ভিড় দেখছিল। পাড়ার সবাই চেনা সকলের। বুড়ী তার হাত ধরল 'আরে জি জি কোড়ে? তু একলি কাঁইনে খড়ি, চাল মাইনে।' (আরে তোর মা কোথায়, তুই একলা দাঁড়িয়ে আছিস কেন? ভেতরে আয়)।

ওমরাও পঙ্করের মা ঐ চোখে কাজল, মাথায় পেটী (বেণী) পায়ে কাঁসার মল, কানে মাকড়ী, নাকে নথ পুতুলের মত দেখতে মেয়েটীকে ঘরে নিয়ে যাবার আগেই গানের দলের একটা মেয়ে এসে তার হাত ধরে নিলে।

আর বুড়ীর বুক হিম হয়ে গেল। ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। সে শুকনো মুখে কিন্তু মিষ্টি সুরে একটু এগিয়ে গিয়ে ছোট মেয়েটার হাত ধরে নিয়ে বললে, 'তোরা কোথায় যাচ্ছিস বাছা?'

যে হাত ধরেছিল সে বিহ্বল চোখে তাকাল। জবাব দিলে না। শুধু হাতটা ছেড়ে দিল।

গানটা থেমেছে। দলের একটা মেয়ে বললে এগিয়ে এসে 'আমরা গলতা পাহাড়ে যাব ওই মেয়েটীকে তার মামার বাড়ী পৌঁছে দিতে যাচ্ছি।' কে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন কি হয়েছে ওর?'

সঙ্গিনীরা জবাব দিলে না। শুধু বললে 'চল্, চল্।'

হঠাৎ আশেপাশে জনতা জড় হতে লাগল। বললে, 'এ পথে কেন এসেছিস্? দেখছিস্ না ওর চোখ লাল। ও চারদিকে কেমন যেন তাকাচ্ছে। ওকে ডাইনীতে 'ভর' করেছে। বেরিয়ে যা এ পাড়া থেকে।' আর একজন। আমাদের সব ছোট ছেলেমেয়ে—'

আর চারদিকে থেকে ছোট ছোট পাথর ঢিল ধুলো বালি ছুঁড়তে আরম্ভ করল সবাই। একজন ছুঁড়বে তো সবাই ছোঁড়ে।

যে মেয়েটীকে 'ডাইনী' বলা হল তার হিষ্টিরিয়ার মত হয়েছিল, তা সেকথা তো ওদের শ্রেণীতে কেউ বুঝবে না। কেউ বললে ডাইনী, কেউ বলে, ভূতে পেয়েছে। কেউ বলে অসুখ—যার একটু বুদ্ধি আর মায়া দয়া আছে।

গলির লোক সব দু-তিন দল হয়ে গেল। কেউ ধুলো দেয়, ঢিল ছোঁড়ে।

অনেকেই বাধা দেয়। বলে, 'চলে যেতে দে। মারছিস্ কেন।' অনেকে শুধু দর্শক।

একটা বড় সেকরার দোকানের একটা লোক বেরিয়ে এলো। বুড়ো মানুষ। সে বললে, 'কে ডাইনী? ওই মেয়েটা? তা মেরো না। ওকে চলে যেতে দাওনা। ওতো কারুকে 'খায়নি'। 'নজরও' দেয় নি। কেপালে 'নজর' দিতে পারে। চলে যেতে দাও যেখানে যাচ্ছে।'

দোকানটা বড়, দোকানীও প্রবীণ। গলির জনতা থামল। বৃদ্ধ এগিয়ে এলো। বল্লে, 'কে তোরা? কোথেকে আসছিস্? কোথায় যাচ্ছিস ওকে নিয়ে?'

ডাইনীর সংগিনী তিন চারজন ছিল। তারা বললে আমরা ওকে গলতা পাহাড়ে ওর মামার বাড়ীতে পৌঁছতে যাচ্ছি। ওর অসুখ করেছে বৈদ্যজী (ডাক্তার) বলেছে। কিন্তু ওর শ্বশুরবাড়ীর লোকরা বলেছে কিছু হয় নি। হয় ও ডাইনী, নয় পাগলি হয়েছে। আসছি 'ঘাট দরজা' থেকে ওর শ্বশুরবাড়ী।

এবার ডাইনী চুপ করে দোকানটার সিঁড়িতে বসে পড়ল। চোখদুটো লাল। দৃষ্টি বিভ্রান্ত। ঠোঁট দুটো কাঁপছে একটু একটু। চেহারা দেখলে মনে হয় বেশ জ্বরের ঘোরে রয়েছে। সংগিনীরা সকলেই সেখানে দাঁড়াল। কেউ কেউ বসল। কেউ একটু জল চাইল। ডাইনীকে জল দিল। সবাই খেল। দোকানীই জল দিল।

২

জল দিয়ে দোকানী আবার এসে দাঁড়াল।

'গলতায় কার বাড়ী যাবি তোরা? তোরা ওর কে হস্?'

একটা কমবয়সী মেয়ে বললে 'আমরা ওর কেউ নয়। আমি ওর 'ভাইলী' (সই) আমার পিসির বাড়ী 'গলতা' পাহাড়ে। সেখানে ছোটবেলায় ডাইনী পাতাই। এখন সেখানে নিয়ে যাচ্ছি। ওর মামার বাড়ীতে কে যে আছে ও জানে না। নামও জানে না। জিজ্ঞেস করলে বলেনা--নয়ত বলে ভুলে গেছি। এখন আমার পিসির বাড়ী যদি জানতে পারি। তা পিসিও তো মরে গেছে কবে। যদি তার ছেলেরা চিনতে পারে ওকে।'

বৃদ্ধ চিন্তিত মুখে বল্লে, 'ওর শ্বশুরবাড়ীতে ওর বর নেই? সধবা দেখছি তো। 'বোরলা' রয়েছে মাথায় (রূপার বা সোনার ঘুঁটে বিশেষ)।'

আর একজন বললে, 'সেই তো কথা। বর গেছে সিপাহীতে চাকরী নিয়ে। আর শাশুড়ী হল সৎমা। শ্বশুর বুড়ো তাকে খুব ভয় পায়। বাড়ীতে আর যারা আছে কাকা জ্যেঠা তারাও সাহস করে না কিছু বলতে, ঝগড়ার ভয়ে। শাশুড়ী খাটাতো খুব। এখন অসুখের জন্য কাজ করতে পারে না। খেতেও দেয় না। ক'দিন ধরে অসুখের জন্যে। দেখছ তো 'আঁখ' লাল। ওরা বলে 'উপগর কি হাজরা' নাকি—প্রায়ই অসুখ করে।

কাঁদে—। বিজ বিজ করে বকে। ওরা তাই তাড়িয়ে দিয়েছিল। পাশেই আমাদের বাড়ী এসে পড়েছিল। এখন আমরাই বা কি করি। কিছু বললেই ঝগড়া হয়ে যাবে আমাদের সঙ্গেও। তারা বলেছে ওকে মামার বাড়ী দিয়ে আয়।'

'তা মা বাপ নেই? বর চিঠিপত্র টাকাকড়ি দেয় তো বাপকে?'

'না, মা বাপ নেই। নানীর কাছে মানুষ। নানীও মরে গেছে। বরতো শুনেছি, জানি, বাপকে চিঠি টাকা পাঠায়।'

'তা' নানার নাম জানিস? আমারও তো বাড়ী গলতায়। এখুনি তো সন্ধ্যের আগেই যাব। নইলে সন্ধ্যের পর পাহাড়ে "শেররা" (বাঘ) জল খেতে বেরোয়। কি জাত ওরা? দেখি চিনি কিনা ওদের? ওর নাম কি?

'ওর নাম লছমী। আমরা নানার নাম জানিনে। নানীর নাম রতনবাই। জাত ব্রাহ্মণ।

'রতনবাই? দুতিনজন ওই নামের মেয়ে আমাদের ওখানে ছিল। কোন্ রত্নীবাইয়ের নাতনী—খুঁজে দেখতে হবে।' বুড়োর মনে পড়ে তার বোনের বাড়ীতেও একটা রত্নীবাই ছিল তার ননদ। দুটো রত্নীবাই ব্রাহ্মণ। একটা রাজপুত।

সহসা ডাইনীর সঙ্গিনীরা নিজেরা কি যেন বলাবলি করে হাত জোড় করে দাঁড়াল বৃদ্ধের সামনে।

ডাইনীর সখি বললে, 'বুড়োবাবা, তোমায় অনেক 'ঢোক' (প্রণাম) দিচ্ছি। এই বিকালবেলা আমরা গিয়ে তো আর পাহাড় থেকে ফিরে আসতে পারব না। তুমি বলছ 'নাহার' 'শের' বেরুবে। আমাদের ঘরে বাচ্চা আছে। মরদ আছে। অন্য সবাই আছে। রান্নাবাড়া করতে হবে। তুমি যদি ওকে নিয়ে ওর নানীদের বাড়ী খুঁজে রেখে দাও তো আমরা আর যাই না। বেঁচে যাই। তোমার বাড়ী কোথায় ঠিকানা বলো। আমরাও কাল-পরশু কারুকে দেখা করতে পাঠিয়ে দোব। বাবা, তোমার পাঁও লাগি (পায়ে পড়ি)। এই মেহেরবানিটা কর। দয়া করো বাবা।'

বৃদ্ধ পাথর ঢিল ধুলো ছোঁড়া থেকে বাঁচিয়েছে, আবার গলতায় বাড়ীও, তারা মিনতি করতে লাগল।

ডাইনী তখন জল খেয়ে দোকানের চৌকাটের পাশে শুয়ে পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

বুড়ো দোকানী চেয়ে দেখল, বছর উনিশ কুড়ি বয়স হবে, শান্ত সুন্দর ঘুমন্ত মুখখানি এখন। পাগলামী বা হিষ্টিরিয়ার ভাব নেই। হয়ত জ্বরেই চোখ লাল। বললে, 'ও যদি ঘুম ভেঙে হুজ্জত করে, কাঁদে, তোমরা একজন থাক কাছে। কাল বাড়ী ফিরে যেয়ো। নয়ত আমি এখনি দোকান বন্ধ করে যাব। আজই ফিরে আসতে পারবো। ওকে ওর আপনার লোকের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে।'

একজন প্রৌঢ়া সঙ্গিনী রাজী হয়ে দোকানে বসল। বুড়ো দোকানপাট তোলে।

বাইরে কৌতূহলী জনতা আছে কিছু।

এখন ডাইনী ঘুমোচ্ছে। ভয় কমেছে লোকেদের।

কিন্তু ডাইনীর 'নজর' দেওয়া শিশুদের খেয়ে ফেলা, রক্ত শুষে রোগা করে দেওয়ার সবাই ভীষণ ভীষণ ব্যাখ্যা করছে। জনে জনে যে যেমন জানে। যেমন শুনেছে। (দেখেনি যদিও কেউ।)

একজন বলে, 'ডাইনীরা চোখ দিয়ে রক্ত শুষে নিতে পারে। সে তাকালে ছোট মুখ তাজো [illegible]

আস্তে দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে থাকে। তারপর মরে যায়।' না জানা কেউ প্রশ্ন করে 'তাতে তার লাভ? সে তো রক্ত খেতে পেল না?'

'আরে ওরা তো ওই রকম করে খায়। তারপর শুকিয়ে শুকিয়ে মরে গেলে ছেলেটা বা মেয়েটা—তাকে যখন মশানে (শ্মশানে) ফেলে আসে লোকে—মাটী দিয়ে। শুনেছি তখন সে মশানে যায় রাত্রে, নিজের কাপড়জামা সব ছেড়ে রেখে দিয়ে নেড়া মাথা ছোট্ট একটা মানুষের মতন হয়ে গিয়ে একটা 'জরখের' (খ্যাকশিয়ালী বা উল্কামুখী) পিঠে উল্টোমুখ হয়ে বসে ছেলেটাকে মন্ত্র পড়ে মশানে মশানে ঘুরে ডাকতে থাকে। তারপর ছেলেটাকে মাটীর নীচের থেকে খুঁজে তুলে বাঁচিয়ে নিয়ে খেলা করে সারারাত—। আর 'জরখটা'র উল্কামুখার মুখ দিয়ে আগুন বেরোয়। যত ডাকে, সেও খ্যাঁক খ্যাঁক করে ডাকে। ভোরবেলা আবার কাপড়জামা পরে মানুষের মত হয়েই বাড়ী ফিরে আসে। ছেলেটাকে মাটী চাপা দিয়ে।'

জনতা আতঙ্কে বিমূঢ় নীরব। জননীরা আপন আপন শিশুদের কোলে জড়িয়ে বাড়ী ফেরার পথে যায়। কে জানে 'নজর' দিয়েছে কিনা ডাইনীটা। আরও ডাইনী তো জনতার মধ্যে থাকতে পারে।

একজন বললে, 'কি লাভ ওর, ওকে মেরে আবার বাঁচিয়ে খেলা করার? শুধুই খেলা করে? খায় না? লাভটা কি তাতে ডাইনীদের? আর নেড়া মাথায়—সকালেই আবার চুল কি করে হয়?'

বক্তা বা গ উল্টে বললে, 'রাম জানে কাঁই ফায়দা (রাম জানেন কি লাভ)। ডাইনীর বা ভূতপেত্নীর মনের কথা কি মানুষ বোঝে? না জানে? লোকে বলে তাই শুনেছি। আর চুল হওয়া রাতারাতি? ওরা না পারে কি? ওরা ডাইনী।'

বৃদ্ধ দোকানী শিউলাল বেরিয়ে এসে দাঁড়াল। ডাইনী জেগেছে। তার সঙ্গিনী তাকে হাত ধরে পথে নাবাল। দোকানে তালা দিতে হবে।

ডাইনীর জাগরণে আর পথে নাবার সঙ্গে সঙ্গে জনতার রোমাঞ্চ গল্প শ্রোতাদের ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল পথের এখানে ওখানে। বাড়ীর মধ্যেও ঢুকে গেল কিছু।

৪

শিউলালের বাড়ী গলতা পাহাড়ে। সেও ব্রাহ্মণ। পূজারী সূর্য্যমন্দিরের। সকালে দুটী ফুল চন্দন ফেলে দেবকার্য সেরে সে নিজের দোকানে আসে দুপুরের খাবার নিয়ে। বাড়ীতে স্ত্রী আর ছেলে আছে। ভারি দয়ালু স্নেহময় মানুষ।

এখন রত্নীবাইয়ের ঠিকানাতে ওর কে আছে জানা দরকার। বুড়োর মায়া হয়। মনে হয় ওর মা রত্নীবাইয়ের মেয়ে ভোঁরীবাইকে ও চিনত। সেই রত্নীবাই যদি হয়।

বাড়ী পৌছল। সূর্য্যমন্দির ছাড়িয়ে গোমুখীর গঙ্গার ঝরণার স্বচ্ছ কালো জলে ভরা একটি হ্রদের বা পুকুরের ধারে আরো অনেক দেবতার ঠাকুরদের ছোটবড় 'থান' (স্থান) সেইখানে ওর বাড়ী।

সেদিন তখনো বেলা আছে। বাড়ী থেকে ওর বৌ ছেলে বেরিয়ে এলো। সঙ্গে এদের দুজনকে দেখে অবাক হল। বললে, 'এরা কে?'

বুড়ো বললে 'পাহুনা (অতিথি)। মেয়েটি আমার বোনের ননদের নাতনী। আমারও নাতনী ভাই। চল্ ওদের কিছু রোটী পানির ব্যবস্থা কর্।'

স্ত্রী ভ্রূকুঞ্চিত করে দেখে ওদের ঘরে নিয়ে গেল।

ছেলে ভারি খুশী। কম বয়সের মেয়েটিকে তার নিজের সঙ্গী মনে হল, সঙ্গিনী মেয়েটি ডাইনীর খাওয়া হলে বল্লে, 'আরে লিছমী তুই আজ এই নানাজীর বাড়ী থাক্ এও তোর নানা। আমি আজ বাড়ী যাই। আবার

এসে তোর খবর নিয়ে যাব। আর বুড়োবাবা তুমি ওকে একটু দেখো। যদি ওর নানীর বাড়ীর কারুকে পাও। দেখো। আমরা ওর শাশুড়ী শ্বশুরকে তাই বলব।'

জ্বরক্লান্ত লছমী চুপ করে একটা খাটিয়ায় শুয়ে পড়েছে। সে যেন বুঝতেও পারছে না তার নিজের অবস্থা এবং ব্যবস্থার কথা। বৃদ্ধের গৃহিণী বিরক্তমুখে অতিথিকে বিদায় দিল। বললে 'এটা তাহলে রইল।'

শিউলাল কাজের মানুষ। তবু একে ওকে রত্নীবাইয়ের গুষ্টির কথা জিজ্ঞাসা করে সকালবেলা নেবে যায় শহরে। সন্ধ্যায় আসে।

লছমীর জ্বর সারল পরদিন কিন্তু হঠাৎ শিউলালের ছেলের খুব জোর জ্বর এলো। সম্ভবতঃ লছমীর জ্বরের ছোঁয়াচ।

বাড়ীর গৃহিণী ছেলের মা সন্ধ্যাবেলা স্বামী আসতে বললে, 'কোত্থেকে একটা ছুঁড়ি ধরে এনেছ। চোখদুটো লাল রাক্ষুসীর মত। আসতে আসতেই আমার ছেলের জ্বর হ'ল। লোকে বলছে ওর 'নজর' লেগেছে তোর ছেলের ওপর···। কে জানে বাবা, এখন ওকে নিয়ে কি করবো। আচ্ছা বিপদ ঘাড়ে এনেছ। আমার ভয় হচ্ছে···।'

শিউলাল শান্তভাবে বললে 'ওকে রুটী পানি করতে দেনা। নয়ত 'ভায়ার' (খোকার) কাছে বসে গান শোনাক, কথা বলুক। তোরও তো কাজের লোক নেই ঘরে। সময় পাবি। ওকে দেখেশুনে শীগগীর পাঠিয়ে দেব ওর মামার বাড়ী। খবর করছি কেউ আসে যদি।'

লছমীর অসুখের বিহ্বলতা বিভ্রান্তি কেটেছে। কিন্তু ভয় যায়নি। সভয়ে ফ্যাল ফ্যাল চোখে তাকায়। কাজ করে। শুধু ঐ খোকা কিষণের কাছে বসে গল্প করতেই ওর ভালো লাগে। গান গেয়ে ওকে ভোলায়। সন্ধ্যেবেলা রুটী করে রান্নাঘরে।

কিষণও ভালোবাসে ওকে। কিন্তু কিষণের জ্বর আর ছাড়ে না। চারদিন হয়ে গেল।

কিষণের মাকে পাড়ার হিতৈষীরা বলে, 'ওই মেয়েটির আসার সঙ্গেই জ্বর হ'ল ছেলের। নিশ্চয় ওর নজর লেগেছে। ওকে আর রাখিসনে ঘরে। ওর শ্বশুরবাড়ী মামারবাড়ী যেখানে হোক যেতে বলে দে। শিউলালজীকে বল্।'

সন্ধ্যা হয় হয়। শিউলাল ফিরেছে ঘরে। ছেলের জ্বর তেমনি। একলা ঘরে শুয়ে। ছেলের মা রান্নাঘরে।

শিউলাল ছেলের মাথায় হাত দিয়ে জ্বর দেখল। কাছে বসল। স্ত্রী খেতে ডাকল কিছু। খেতে গেল। চারদিকে চাইল লছমী কোথায়?

জিজ্ঞাসা করল, 'লছমী কোথায় কিছু কাজ করছে? না কোথায় পাঠিয়েছ?'

স্ত্রী বললে, 'তুমি খেয়ে দেয়ে নাওনা। সে গেছে একটা কাজে। কি দরকার তোমার?'

'না, দরকার আর কি? খোকা একলাটি শুয়ে আছে। তাই ভাবছি সে গেল কোথায়। একটু ভজন গান করতো। ভালো লাগতো খামকি বখ্‌ত্ (সন্ধ্যাবেলা।)

রাত্রি হয়ে এলো। লছমী এলো না। বৃদ্ধ ব্যস্ত হয়ে বললে, 'কোথায় গেছে লছমী? এত রাত্রে আসবে কি করে?'

এবারে ছেলে চোখ খুলল। আস্তে আস্তে বললে, 'মা বহিনজীকে ডাইনী বলে তাড়িয়ে দিয়েছে।'

বৃদ্ধ স্তম্ভিত। ছেলের মা রান্নাঘরে। বুড়ো উঠল। স্ত্রীকে দেখা যাচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলে রুক্ষকণ্ঠে

'তুমি লছমীকে তাড়িয়ে দিয়েছ? এই অজানা জায়গা—কম বয়স 'ছোরী' (মেয়ে)। আর বাঘের ভয় পাহাড়ে। কোথায় গেছে সে? কোথায় পাঠিয়েছ? কখন গেছে?'

উগ্র রুষ্টমুখে স্ত্রী বললে, 'যেতে বলেছি তার শ্বশুরবাড়ী বা মামার বাড়ী যেখানে হোক। তাড়াব কেন? অতবড় মাগী সে যাবে'খন নিজের বাড়ী চিনে। আমার ঘর আমার ছেলে আগে না 'নজর' দেওয়া ডাইনী তোমার পেয়ারের লছমী আগে। সে দুপুর বেলা গেছে। এতক্ষণ 'ঘাটদরজায়' পৌঁছে গেছে।

বৃদ্ধ স্তব্ধ। এত রাতে আর গলতা পাহাড়ের পথে বেরোনোর ভরসা কোনোকারুরই নেই। কোথায় খুঁজবে তাকে? সে কি সত্যিই চিনে যেতে পেরেছে? পারবে? সেদিন সঙ্গে অতগুলো সঙ্গিনী ছিল। একেবারে ছেলেমানুষ তরুণী। রুগ্ন আবার। শুকমুখে বৃদ্ধ স্ত্রীকে বললে, খুব খারাপ কাজ করেছ। সে হারিয়ে যাবে। দুষমনের হাতে পড়বে—কম বয়স তো। আর যদি না গিয়ে থাকে তো 'শেরের' মুখে এখানেই রাত্রেই পড়বে। হায়! হায়! ডোকরী (বুড়ী) কে ডাকন্ আর কে নয় সে তো রামজী জানে। তুই ঘরে থেকে—শরণ নিয়েছে যে,—আশ্রয় দিয়েছি আমি, তাকে তাড়িয়ে খুব 'খোটা' (খারাপ) কাজ করলি। এতে কি ছেলেদের 'ভালাই' হবে।

গৃহিণী গুম হয়ে রইল। ছেলে আচ্ছন্ন হয়ে ঘুমচ্ছে। বুড়ো রুটী আর খেলনা। দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ল।

সকলেরই চোখে তন্দ্রা এসেছে। কিংবা শুধু জেগে শুয়ে আছে।

সহসা পাহাড়ের নীচের কোন্ হ্রদের ধারে না বনের মাঝে বাঘের একটা ভীষণ গর্জন শোনা গেল। গাছে গাছে ময়ূর ডেকে উঠল। ঘরে ঘরে মানুষ আতঙ্কে সিটিয়ে উঠল। চেঁচাল 'ভাইসব খবরদার।' যদি কেউ বাইরে থাকে। টিন পেটালো জোরে জোরে ঘরের মাঝেই। আর ঐ সঙ্গে সঙ্গেই শিউলালের বাড়ীর যেন দরজার সামনেই নারী কণ্ঠের একটা সরু তীক্ষ্ণ আতঙ্কের আর্ত চিৎকার শোনা গেল, অরে বারে। মরয়ারে। (ওরে বাবা। মলামরে)

বুড়ো চমকে উঠে দাঁড়াল, 'ছোরী লিছমী না? আরে আরে কি করি এখন।'

বুড়ীও উঠল। হাত ধরল। বললে, 'বাইরে যেও না। ও কোনো 'পিরেত' ডাইনী চেঁচিয়েছে (প্রেতিনী)। তোমাকে ভুলিয়ে নিয়ে যাবে। নয়ত শের খেয়ে ফেলবে।'

ক্রুদ্ধ বৃদ্ধ তাকে সরিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে সদর দরজা খুলল।

চারদিকে ঠাণ্ডা ম্লান জ্যোৎস্না। শ্রাবণের রাত্রি। দরজার চৌকাঠের সামনে একটা রঙিন ঘাগরা ওড়নার স্তূপ পড়ে আছে।

আবার কোন দিকে একটা রুষ্ট বাঘের গরগর শব্দ শোনা গেল। পাহাড়ের ওপরে না নিচে? নিশুতি রাত্রি কিছু বোঝা যায় না।

বুড়ো কাপড়ের স্তূপটা টেনে তুলে দরজার ভিতরে ফেলে দরজায় খিল দিল। ভীত স্ত্রী পিছনে দাঁড়িয়ে। রোগা ছেলে খাটে উঠে বসেছে।

স্ত্রীকে বললে একে ধর ঘরে নিয়ে শোওয়াও। আমি ভাল করে দরজা বন্ধ হল কিনা দেখি। শের কাছে কাছেই আছে। গন্ধ পাচ্ছি।

নিঃশব্দে স্বামী স্ত্রী দুজনে ওকে ঘরে এনে শুইয়ে দিল। সে ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপছে দাঁতে দাঁতে লেগে যাচ্ছে।

বুড়ো তার মুখে কপালে জল দিয়ে বললে, 'বেটী—ভয় নেই। শুয়ে থাক। স্ত্রীকে বললে 'ওকে একটু দুধ গরম করে খেতে দে।' ছেলেকে বললে 'তুই শুয়ে পড় বহিনজী এসে গেছে। কোই ডর নেই। (ভয় নেই কিছু)'

বুড়ো খোঁজ খবর করে। জানা গেল বোনের রত্নীবাই নামে ননদ মারা গেছে। মেয়েটি তার মেয়ের মেয়ে। বুড়োর সঙ্গেও কি একটা মামা না জ্যেঠা সম্পর্ক বেরুল।

রত্নীবাইয়ের ছেলেরা বললে, 'তোমার কাছেই রাখো, এখন আমরা একদিন সবাই মিলে ঘাটদরজায় ওর শ্বশুরবাড়ীতে নিয়ে ওকে রেখে আসব। এখন বড় কাজ কম পড়েছে। একটু সময় করে নিই। খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি ওর শ্বশুরবাড়ী।'

অন্ত আপনার লোকের সন্ধান পেয়ে রাগটা বুড়ীর একটু সামলেছে। আর ছেলেও সেরে উঠেছে। মেয়েটা রাঁধে বাড়ে। গম ভাঙে। জল আনে। অনেক কাজ করে।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা শিউলাল একটা চিঠি হাতে বাড়ী এলো। তার বড় ছেলের চিঠি, সেও সিপাইতে চাকরী করে। ছুটিতে আসছে।

বুড়ো বুড়ীর আনন্দের সীমা নেই।

আশ্বিনের সোনালী সকাল। পাহাড়ে পাহাড়ে রদ্দুর। সহরে দশেরার নবরাত্রির উৎসব বসে গেছে। অম্বরে কালীমন্দিরে নবরাত্রির পাঠপূজা চণ্ডীপাঠ চলছে। সূর্য্যমন্দিরেও কার্ত্তিকের আগে সর্বত্র চুণকাম 'সফেদী' আরম্ভ হয়ে গেছে।

ডাইনী লছমী সেরে উঠেছে। কোনও অসুখ নেই। সব নামও মনে পড়ছে এখন তার। তার সব আপন জনের। মামাতো ভাইদের চেনাও হয়েছে।

কিন্তু কাজকর্মের মাঝে মন তার 'সুন্‌সান্' (শূন্য) লাগে। পাহাড় আকাশ বন হ্রদ জল তার মন উদাস বিকল করে দেয়। ভাবে, সে কি চিরকাল এইখানেই থাকবে? আর লোকে ডাইনী বলবে। বর? বরও কি একে ডাইনীই বলবে? শ্বশুরবাড়ীওতো বলেছে—তার ভালো ঘরে বিয়ে দেবে, ডাইনীকে নিয়ে ঘর করবে না।

ঘোমটার আড়ালে চোখ মোছে। আর প্রাণপণে কাজ করে যদি অন্য মন হয়। ভাবে ভালো হত, সেদিন যদি বাঘে খেয়ে নিতো। যদিও ভয়ে শিউরে ওঠে তবু মনে হয় কোথায় যাবে। কতদিন এখানে কি করে থাকবে।······

নবরাত্রি। দশেরা'র অষ্টমীর সকাল। রৌদ্রে ঝলমল বর্ষার শেষের সবুজ পাহাড়।

লছমী মাথায় তিনটে কলসী উপরো উপরি করে নিয়েছে। ওড়নাটি কোমরে আঁট করে বেঁধেছে। হ্রদের জল নিতে হবে। বাড়ী গিয়ে রুটী করতে হবে। অনেক কাজ।

হঠাৎ পিছনে ভারি জুতোর আওয়াজ শোনা গেল।

সে কোনোক্রমে মাথার ঘোমটা একটু টানল কিন্তু 'লুগড়ি' তো কোমরে জড়ানো। পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল পথের একদিকে।

দেখতে পেল দুজন খাঁকি-পরা লোক সিপাহীদের মতন—পায়ে পট্টী বাঁধা হাতে বন্দুক। তাদের বাড়ীর দিকেই গেল।

সেপাইরাও ওদের বাড়ীতে ঢুকল। সেও ঢুকল।

আর বাড়ীতে আনন্দের ধ্বনি জেগে উঠল। কিষণ শিউলাল একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল আরে নারায়ণ আগিয়া (নারায়ণ এসেছে)।

রান্নাঘর থেকে মা বেরিয়ে এলো উজ্জ্বল মুখে। ওদের পাশ দিয়ে কলসী মাথায় লছমীও রান্নাঘরে ঢুকল। মুখ একটু একটু দেখা যাচ্ছে। সেপাইরা ওর দিকে তাকিয়ে।

নারায়ণ বললে, বাবা এ আমার সেই বন্ধু। যার কথা লিখেছিলাম। ও কে বাবা মেয়েটি?

বাবা বল্লে 'আমার আপনার লোক একজন। তোর পিসির ঘরের নাতনী। খুব ভালো মেয়ে। এখন মুখ হাত ধোও। কি খাবে সব?'

ছেলে বললে, হ্যাঁ চা খাব আগে।

বাবা বললে 'আরে লছমী—চায় বানা। সব ভাইয়া এসেছে তোর। লছমী শুনে ছেলের বন্ধু চকিত নেত্রে আবার সেদিকে তাকাল।

লছমী ঝকঝকে মাজা কয়েকটা গিলাস দুটো হাতল ভাঙা কাপ ডিস এনে রাখল। মাথায় একটু ঘোমটা কন্যাদের মত। রাজস্থানী প্রথামত।

তারপর এক 'লোটা' চা এক বাটি দুধ এক বাটি চিনি এনে ওদের সামনে দিল। মা নিয়ে এলো ঘি মাখানো গরম রুটি আর আচার। আবার সে আর ছেলের বন্ধু দুজনেই লছমীর আনত মুখের দিকে চাইল।

বন্ধুকে বুড়ো জিজ্ঞাসা করলে 'তোমার বাড়ি কি এইখানেই জয়পুরেই। তোমার নাম কি? কোনখানে বাড়ি? দুদিন এখানে থাকবে তো? বাবার নাম কি তোমার?'

নারায়ণ বললে 'ওর বাড়ি ঘাটদরজায়। ওর নাম গোবিন্দ রায়।'

নাম শুনে রান্নাঘরে লছমীর ঘোমটা সরে গেল। হাতের দুধের হাতাটা মাটিতে পড়ে গেল।

এবারে বন্ধু বললে 'আমার বাবার নাম গোপাল রায়।'

লছমী অবাক হয়ে শুনছে।

শিউলাল বললে 'যাই হোক আজ কাল দুদিন এখানে থাকো। তোমার বাবা মাকে খবর পাঠিয়ে দোব। শিউলালের ওদের নাম জানা ছিল না।

গৃহিণীকে বললে 'আরে নারাণ্যার মা, আজ একটু 'চুরুবাটি' ভালো করে বানা। লছমী আর তুই।'

'চুরুবাটী' হল রাজস্থানী জনসাধারণের অতিপ্রিয় ভোজ্য। যেন আমাদের ঘরোয়া আনন্দ নাড়ু। অথবা সহুরে লুচি সন্দেশ।

তৈরীর ব্যাপারটা অতি সোজা। উঠানে মস্ত ঘুঁটের আগুন তৈরী হয়। আর এক পরাত (বড় কানা উঁচু থাল) আটা মেখে বড় বড় লেচি করে—সেই ঘুঁটের আগুনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়—রুটী বেলা হয়না। সেগুলো অনেকক্ষণ ধরে গরম আগুনে সেকা হয়। তারপর তার কিছুভাগ ছাই ঝেড়ে মুছে একটি ঘিয়ের বাটীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়। ঘৃতসিক্ত হয়ে নরম হয়। সুস্বাদু হয়। আর বাকি 'বাটিয়া'গুলো একটি হামানদিস্তের কুটে গুঁড়ো করে ফেলা হয়। সেই গুঁড়ো বাটিয়াতে প্রচুর চিনি আর ঘৃত মিশিয়ে যা তৈরী হয় লাড্ডু বা গুঁড়ো আকারেই;—তার নাম হল 'চুরু'। রাজস্থানী অতিপ্রিয় ও আতিথ্যে উৎসবে এবং অসুবিধার দিনেরও খাদ্য। যখন 'চাটুকড়া' আদি রান্নার বাসন থাকে না পথে-প্রবাসে-শিকারে বেরুলে—ঐটাই তৈরী করে নেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ডাল বসে ঘুটের ওপর।

চকিত নেত্রে লছমী আটামাখা ঘুঁটে জ্বালা নানা কাজে হাত দিল।

মনে লজ্জা উদ্বেগ আনন্দ ভয়। স্বামীর নাম জেনেছে। দু'বছর আগে দেখা চেহারা আরও জোয়ান হয়েছে তার। তাই চিনেও ভয় করছিল। কিন্তু কি করে বলবে এদের যে ওই সিপাহী ওর স্বামী। চোখে জল আসে। স্বামীও যদি না চিনতে পারে। কিংবা 'ভাইনী' ভেবে নেয়। কিছু মন্দ ভাবে।

পুত্র অতিথি ও আতিথ্য নিয়ে খেতে বেলা হল। ঘাটদরজায় কারুকে পাঠাবার আগেই হঠাৎ পাহাড়ের পথে একটি বৃদ্ধ আর ডাইনীর সেই 'ভায়লী' বা সখীকে দেখা গেল।

পথের সামনে নারায়ণ আর গোবিন্দরাম আর অন্ত ছেলেরা পাড়ার লোক শিউলাল সব দাঁড়িয়ে জটলা হচ্ছিল। ডায়লী আবক্ষ ঘোমটা টেনে বাড়ীতে ঢুকল। দূর থেকে গোবিন্দরাম অবাক হয়ে আগন্তুক বৃদ্ধের দিকে চেয়ে ছিল। এবার কাছে আসতেই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়ে বৃদ্ধকে প্রণাম করে বললে 'বাবা তুমি কি করে জানলে আমি এখানে এসেছি? আমাকে এ ছাড়েনি। আজই যেতাম বাড়ী।'

শিউলালও অবাক। সামনে এসে হাত জোড় করে অভিবাদন জানালো কুটুম্ব এবং অতিথির পিতাকে।

ব্যাপারটা একেবারে গল্পের মতই মোড় নিয়েছে। কেউ বুঝল না কি করে এটা হল।

ডাইনীর সখি রান্নাঘরে গিয়ে যথারীতি প্রণাম 'ঢোক' গৃহিণীকে জানিয়ে আপনার মনের মত হামানদিস্তায় 'চুরু' কুটতে বসল। লছমীকে জড়িয়ে ধরল কাছে এসে।

চুপি চুপি বললে, তোর বরের চিঠি এসেছে কদিন আগে। সেই জন্তে তোর শ্বশুর ভয় পেয়ে সে আসার আগে তোকে নিতে এসেছে। আর দেখছি সে তো এসে গেছে?'

লছমী শুধু বিভ্রান্ত বিহ্বল অবোধ্য আনন্দিত মুখে তাকে জড়িয়ে ধরল। তার ভাষা হারিয়ে গেছে।

সই বললে 'সেরে গিছিস?' সে ঘাড় নাড়ল শুধু।

কুটুম্ব অতিথি সৎকার করে শিউলাল বললে, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাই আজকের দিনটা সবাই আপনারা এখানে থাকুন। লছমীকে কাল 'লগ্ন' দেখে বাড়ী নিয়ে যাবেন। আমার কাছে এতদিন রয়েছে।' (শুভক্ষণ)

সখিরও ফেরা হল না।

শরৎকালের পাহাড়ের সন্ধ্যা হিম শান্ত মুখে গাছে গাছে পাহাড়ের শিখরের ছায়ায় ছায়ায় এপাশ ওপাশ দিয়ে উঁকি মারছে। তার নিচে যাবার আর সময় নেই। রোদও শিখর শৃঙ্গের আড়ালে আড়ালে নেমে যাচ্ছে উঁকি-ঝুঁকি দিয়ে।

লছমীর জন্ত শোবার ঘরেরও ব্যবস্থা হল।

কিন্তু রাজস্থানী দাম্পত্য-আলাপ কি রকম হয় তা আমার জানা নেই

তবে জানি সখির সাজিয়ে দেওয়া মোম দিয়ে চুল বাঁধা বেণী (চোটী), কাজল পরা সরল চোখে, 'সুরুখ' (লাল) লুগড়ী বা ওড়নার ঘোমটা টেনে আরক্তমুখে রাত্রে লছমী স্বামীর ঘরে এলো।

তারপর? স্বামীকে 'ঢোক' দিতে স্বামী কাছে বসাল বোধ হয়। আর হয়ত হাতটি ধরে'স্বামী জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি এখানে এবাড়িতে কি করে এলে? আমি তো চিনতেই পারিনি তাই।'

তাতে হয়ত তার কাঁদনঝরা চোখ দুটি জলে ছল ছল করে উঠল। ঠোঁট দুখানি থর থর করে একটু কেঁপে উঠল। সে কিছুই বলতে পারল না। কি ক'রে বলবে তার বাপ মার কথা তাকে!—

তবে মন জেনেছে হাবিলদারের বৌকে আর কেউ 'ডাইনী' বলতে সাহস করবে না।

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৯শ ভাগ দ্বিতীয় খণ্ড	অগ্রহায়ণ, ১৩৭৬	২য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলার "রাজা" কে ?

রাজা কথাটির অর্থ হইল শাসক অথবা প্রভু। শাসক বলিলে স্বভাবতই মনে হয় যে কেহ কোন নিয়ম কানুন ও রীতি নীতি সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতেছেন এবং রাজ্যের নানা কার্য্যের পরিচালনার ভার লইয়া তিনি সকল বিষয় সুনিয়ন্ত্রিতভাবে গতিশীল রাখিয়া সমাজের ও দেশের জীবনধারা সুপ্রবাহিত রাখিবার ব্যবস্থা করিতেছেন। যদি কেহ তাহা না করিয়া শুধু নিজ শক্তি ব্যবহারে অপর সকল দেশবাসীর সম্পদ লুণ্ঠন কিম্বা তাহাদিগকে নিজ আদেশ পালন করিতে বাধ্য করিতেই আত্মনিয়োগ করিয়া নিজকার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে মনে করেন, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিকে শাসক বলিলেও কথাটার প্রকৃত অর্থ তাহার কার্য্যে যথাযথভাবে ব্যক্ত হইবে না। কারণ তাঁহার শাসন ও প্রভুত্বের তখন অর্থ হইবে শুধু নিজের সুবিধা সাধন। দেশবাসীর জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহিত রাখা হইবে না এবং বহুক্ষেত্রেই দেশবাসী একপ্রকার দাসত্বে আবদ্ধ হইয়া কালাতিপাত করিতে বাধ্য হইবে। ইহাকে ঠিক রাজ্যশাসন বলা চলিবে না। স্বাধীনতার আদর্শও ইহাতে ক্ষুণ্ণ ও নষ্ট হইবে; সুতরাং সেক্ষেত্রে পাশবিক শক্তি ব্যবহারে প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা মাত্র সাধিত হইয়াছে বলিয়া ধরিতে হইবে। রাজা কথাটির মূল অর্থ যাহা, অর্থাৎ প্রজা-রঞ্জন করিয়া প্রজার শাসন যিনি করেন তিনিই রাজা, সে অর্থেও এস্থলে কেহ রাজত্ব করিতেছেন বলা চলিবে না। রাজ্যশাসনের প্রাচীন বা আধুনিক কোন অর্থই জোর করিয়া সকল দেশবাসীকে কাহারও প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইয়া দিন কাটাইতে বাধ্য করানর দ্বারা যথার্থ প্রকাশিত হয় না।

প্রাচীন কালে কোন কোন সময় রাজত্ব ও প্রভুত্ব অর্থে প্রজার দাসত্ব বোঝা যাইত। অর্থাৎ কোন কোন রাজা বা শাসক কখন কখন অন্যায় অত্যাচার ও প্রজাপীড়ন করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেন। কিন্তু সেইরূপ ব্যবহার কেহ শাসন কার্য্য সাধন বলিয়া স্বীকার করিয়া লইত না। পাশবিক শক্তিকে কেহই রাজগুণ বলিয়া মানিয়া লইতে চাহিত না। সুতরাং পাশবিক শক্তিজাত প্রভুত্ব শুধু ততক্ষণই প্রতিষ্ঠিত থাকিত যতক্ষণ প্রজাগণ তাহা অপসৃত করিতে সক্ষম হইত না। গায়ের জোরের প্রভুত্ব প্রজারাও গায়ের জোরেই শেষ করিয়া দিত, যথাশীঘ্র সম্ভব। আধুনিককালে ব্যক্তিগত রাজশক্তি কোন দেশেই জনসাধারণ সহজে মানিয়া চলিতে চাহে নাই। ইংলণ্ড অথবা সুইডেনে রাজশক্তি শাসন কার্য্যে ব্যবহৃত হইত না। রাজা প্রজার ইচ্ছাতেই রাজ্যের প্রধান রূপে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিতেন; কিন্তু শাসন কার্য্য প্রজাদিগের ইচ্ছা অনুসারেই তাহাদিগের প্রতিনিধিদিগের দ্বারাই পরিচালিত হইত। সুতরাং রাজার প্রতিষ্ঠার অবসান চেষ্টা ঐ সকল দেশে কেহই প্রায় করিত না। কোন কোন দেশে রাজা প্রজাদিগকে যথেষ্ট স্বাধীনতা না দেওয়াতে রাজার শাসন প্রজারা মানিতে চাহিত না। বর্ত্তমান শতাব্দীর আরম্ভ হইতে এবং তৎপূর্ব্বেও কয়েকটি দেশে রাজার প্রভুত্ব দূর করিবার জন্য নানা প্রকার বিদ্রোহ, বিপ্লব প্রভৃতির চেষ্টা চলিত। রুশ-দেশের উদাহরণ ইহার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য করেণ রুশে রাজার শাসনের অবসান জনসাধারণের স্বাধীনতা লাভের সক্ষম প্রচেষ্টার এক বৃহত্তম ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত। রুশ সাম্রাজ্য সুদূর প্রসারিত এবং বহুজাতি ও সম্প্রদায় ঐ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং এখনও রহিয়াছে। এক মহা বিপ্লবের দ্বারা এই বিরাট সাম্রাজ্যের ব্যক্তিগত ও বংশগত রাজত্বের অবসান মানব-সং...মানব ইতিহাসে অতুলনীয়।

রুশ দেশের এই বিপ্লবের মূল মন্ত্র ছিল ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যের, সম্পদের অধিকারের, শ্রেণীগত উচ্চনীচ বিভেদের দূরীকরণ এবং মানবসমাজকে নূতন আদ... গঠন করিয়া শ্রমিক কৃষক ও সৈন্যদিগের প্রভুত্ব ও, শা... অধিকারের প্রতিষ্ঠা।

আরম্ভে সকল বিষয়ে ও সকল প্রতিষ্ঠানে শ্রমি... প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিবার বিশেষ চেষ্টা হইয়াছি... শিক্ষিত ও সর্ব্বপ্রকার প্রতিষ্ঠান চালনায় সুদ... ব্যক্তিদিগকে সরাইয়া শ্রমিকদিগকেই উচ্চতম প... অধিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা বিশেষ করিয়া করা হইয়াছি... **Intelligentsia** বা বুদ্ধিজীবিশ্রেণীকে প্রথমে শ্রমি... দিগের প্রাধান্য মানিয়া চলিতে বাধ্য করা হয়। বি... তাহা অধিকদিন ধরিয়া চালান সম্ভব হয় নাই শ্রমিকদিগের মধ্যেই যাহারা বুদ্ধিমান এবং শিক্ষা কার্য্যদক্ষতায় বিশিষ্টভাবে তৎপর হইয়া উঠিল, তাহা অতি শীঘ্রই যাহারা অল্পবুদ্ধি ও অশিক্ষিত তাহাদিগে... সঙ্গ ও সাহচর্য্য ত্যাগ করিয়া নিজেদের বিশেষ এক দল গঠন করিয়া চলিতে আরম্ভ করিল। এইভাবে এক নূতন **Intelligentsia** (বুদ্ধিজীবি) ও **Technocra...** (কর্ম্মকৌশলদক্ষ) সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন হইল সেই সম্প্রদায় ক্রমে ক্রমে সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্ত... করিয়া জোরাল হইয়া উঠিল। শ্রমিক, কৃষক সৈন্যগণ সর্ব্বকার্য্যে ও শাসনক্ষেত্রে অধিনায়কত্ব করি... এবং শিক্ষিত ও সুদক্ষ ব্যক্তিগণ তাহাদের আদে... কার্য্য করিবে, এই সমাজ সঞ্চালনা রীতি কম্যুনিজ... প্রতিষ্ঠার অল্পদিনের মধ্যেই বহু কম্যুনিষ্ট দেশ হই... অচল বলিয়া উঠাইয়া দেওয়া হইল। রুশ দে... স্টালিন ও পোলাণ্ডে গোমুলকার পরে সর্ব্ব ব্যবস্থাপ... শাসন ও কর্ম্মনিয়ন্ত্রণে হাতুড়েতন্ত্র উঠাইয়া দিয়া হাতু... ও কাস্তে শুধু জাতীয় প্রতীকে পরিণত হইল শিক্ষা ও জ্ঞানের মর্য্যাদা সমাজে আবার প্রায় পূ... যুগের মতই দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেখা যাইতে লাগিল।

বাংলাদেশে যাঁহারা আজকাল যুক্তফ্রণ্ট না... প্রদেশ শাসনে নিযুক্ত আছেন তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নিজেদের মার্কস্‌বাদী, কম্যুনিষ্ট অথবা নান... প্রকারের সমাজতান্ত্রিক, অর্থাৎ ব্যক্তিগত অধিকা...

পরিবর্ত্তে সমষ্টিগত অধিকারে বিশ্বাসী, বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। দুই একটি দলের লোক তাঁহারা কংগ্রেস বিরোধী বলিয়াই যুক্তফ্রন্টের গঠনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন এবং তন্মধ্যে বাংলাকংগ্রেস ঐ কার্য্যে বিশেষ উদ্‌যোগ করিয়া উক্ত সংগঠনে প্রাধান্য আহরণ করিয়াছিলেন। এই সকল দলের লোকদের মধ্যে শ্রমিক, কৃষক ও সৈন্য কতজন আছেন তাহা আমরা জানিনা; তবে দলগুলির নেতাদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকই বুদ্ধিজীবি বলিয়া মনে হয়। ছাত্র, বেকার ও শ্রমিক নেতাও অনেকে এই সকল দলের বলিয়া শুনা যায়। ছাত্র ও বেকারব্যক্তিগণ এবং বুদ্ধিজীবি শ্রমিক নেতাদিগকে ঠিক শ্রমিক বা কৃষক বলা চলে না। সুতরাং যদি বলা হয় যে এই সকল দলের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ শ্রমজীবি নহেন, কৃষকও নহেন এবং সৈন্য ত নহেনই তাহা হইলে সত্যকথাই বলা হইবে। এ কথাও বলা চলে যে, এই সকল লোকের মধ্যে অনেকেই পেশাদার রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মী ও তাঁহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়ও প্রধানত রাষ্ট্রনৈতিক কার্য্যের মধ্যেই নিহিত দেখা যাইবে।

দেশের বর্ত্তমান অবস্থা বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, বাংলার সর্ব্বত্রই দাঙ্গা, হাঙ্গামা, চুরী, ডাকাতি ও সাধারণভাবে বিশৃঙ্খলতা ও আইন না মানিয়া চলা বিশেষ বর্দ্ধনশীল। ইহার মধ্যে কিছু কিছু সাম্প্রদায়িক কলহও দেখা যাইতেছে। সর্ব্বাপেক্ষা প্রকট হইয়াছে যুক্তফ্রন্টের রাষ্ট্রনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক সংঘাত। এই সংঘাতের ফলে বহুলোক হতাহত হইয়াছে ও হইতেছে বলিয়া শুনা যায়। ইহার মধ্যে কিছু কিছু লুঠতরাজ সমাজের অর্থনীতি সংস্কারের নামেও কোথাও কোথাও করা হইতেছে। যথা কৃষিক্ষেত্রে ফসল ও মৎস্যপালনের ভেড়ি লুঠ করিলে সমাজতন্ত্র স্থাপিত হয় বলিয়া অনেক লুণ্ঠনকারী পরদ্রব্য অপহরণ করিয়া নিজ নিজ ভোগের জন্য ঐ ফসল ও মৎস্য ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে সাধারণভাবে সমাজের কোন লাভ হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। ছাত্রগণ পাঠ না করিয়া ধর্ম্মঘট, দল পাকাইয়া মারপিট, শিক্ষকদিগকে অপমান করাতে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেও সমষ্টিবাদ প্রতিষ্ঠিত হয় না। কারখানার শ্রমিকগণও ঐ ভাবে ধর্ম্মঘট ও দাঙ্গা হাঙ্গামা করিলে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার কোন সাহায্য হয় না। এক কথায় বলিতে চাহিলে বলা প্রয়োজন যে, ভারতের সর্ব্বত্র যতটুকু সমষ্টিবাদ, যে ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে বাংলাদেশেও ততটুকুই হইতে পারিবে—শান্তিপূর্ণ ভাবে ও বাংলার জনমত অনুসারে। ভয় দেখাইয়া, মারপিট করিয়া সকলকে অল্পসংখ্যক "আদর্শবাদীর" মতে চলিতে বাধ্য করিলে তাহাকে আমরা "ফ্যাশিজম" বলিয়া থাকি। গায়ের জোরের রাজত্ব সমাজবাদ বা সমষ্টিবাদ নহে। দ্বিতীয়ত ভারতের সকল প্রদেশ মোটামুটি এক আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিবে ইহাই বাঞ্ছনীয়; কারণ নানান প্রদেশ নানান ভাবে চলিলে তাহাতে ভারতের সকল মানুষের জাতীয়তা নষ্ট হইয়া যাইবে, শক্তি হ্রাস হইবে এবং বিদেশী শত্রুর নিকট আশঙ্কার কারণ ভয়াবহরূপ ধারণ করিবে। সুতরাং প্রথমত বাংলাদেশে ছাত্র, শ্রমিক অথবা বেকার-দিগের প্রভুত্বের শক্তিতে পেশাদার রাষ্ট্রনৈতিক কর্ম্মীদিগের রাজত্ব চলিতে দেওয়া জনসাধারণের পক্ষে মঙ্গলকর হইবে না এবং সকল বাংলাবাসীর চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে ঐরূপ না হয়। বিশেষ করিয়া বাংলার শ্রমিকদিগের মধ্যে শতকরা ৫০।৬০ জন মানুষ অবাঙ্গালী। ঐ শ্রমিকদিগের নিযোক্তাগণের মধ্যেও অবাঙ্গালীর সংখ্যা অনেক। রাজনীতি ও অর্থনীতি, উভয়দিক হইতেই বাঙ্গালীকে নিজের আত্মমর্য্যাদা ও নিজত্ব রক্ষা করিয়া প্রগতিশীল হইতে হইবে। বিদেশীর আশ্রয়ে থাকিয়া বাঙ্গালী বড় হইবে এ আশা শুধু আত্মসম্মানবোধ বিরুদ্ধ নহে; ইহা মিথ্যার চরম অভিব্যক্তি। বাংলাদেশে জনহিতাকাঙ্খী বুদ্ধিমান লোকের অভাব নাই। বাঙ্গালীর পক্ষে উচিত হইবে পেশাদারদিগকে ছাড়িয়া জাতির প্রতিভার আশ্রয়ে গমন করা। ইহা করিলে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা, প্রগতিশীলতা, সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, আর্থিক উন্নতি প্রভৃতি সকল অভীষ্ট প্রাপ্তিই সম্ভব হইতে পারিবে।

কোন জাতির পক্ষেই নিজেদের প্রতিভা, প্রেরণা ও অন্তরের গভীরতম অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করিয়া অপরের মনোভাবের আশ্রয়ে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা। বাংলা চিরকাল যে পথে চলিয়া জগতসভায় নিজের একটা স্থান করিয়া লইয়াছে, আজ সেই পথ ছাড়িয়া নূতন পথে শক্তি ও প্রতিষ্ঠার অনুসন্ধান করিতে যাওয়া অজানার অন্ধকার আবর্তে নিজেদের নিক্ষেপ করা ব্যতীত আর কিছু নহে। ধর্ম্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীর প্রতিভা বারে বারে উজ্জলভাবে জগতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে। বিগত পাঁচ শত বৎসরে পরে পরে বহু মহামানব বাংলায় জন্মগ্রহণ করিয়া মানব-প্রাণে ধর্ম্মবোধ জাগ্রত করিতে ও অনন্তের পিপাসা তৃপ্ত করিতে সাহায্য করিয়া গিয়াছেন। জ্ঞান ও ভক্তি উভয় পথেই আদর্শ উপলব্ধির চেষ্টা হইয়াছে এবং সেই চেষ্টা শুধু বাংলাদেশেই আবদ্ধ থাকিয়া যায় নাই। কাব্য, সঙ্গীত, সাহিত্য শিল্পকলা প্রভৃতি মানব-কৃষ্টির বহু শাখা প্রশাখায় বাঙ্গালীর প্রতিভা বিকশিত ও ব্যক্ত হইয়াছে এবং আজও বাঙ্গালী এই সকল দিকে অন্তরের প্রেরণায় পূর্ণ জাগ্রত রহিয়াছে। অর্থনীতি অথবা সমাজগঠনের ক্ষেত্রে অভিনব রীতি ও পদ্ধতির প্রতিষ্ঠা চেষ্টা প্রেরণার দিক হইতে বাঙ্গালীর নিজস্ব নহে। অপরের অনুকরণ করিয়া কোন মহৎকার্য্য কখনও সাধিত হয় না। বিশেষত যদি অনুকরণ করিয়া যাহা করা হয়, তাহা নিজ জাতির ঐতিহ্য, মনোভাব ও প্রেরণার প্রতিকূল হয় তাহা হইলে সেইরূপ ধার করা আগ্রহের কোন মূল্যই থাকে না। এই জন্যই আজকালকার বাংলার বিভিন্ন আন্দোলনের সহিত বাংলার মানুষের কোন অন্তরের ঘনিষ্ঠতা অথবা প্রাণের যোগ নাই। বহু বিজাতীয় ভাব অপরিণত বাঙ্গালীর মনে ক্ষণিকের জন্য স্থান পায় ও ভাবের খোরাকের অভাবে শীঘ্রই শুখাইয়া যায়। বাংলার জাতীয়তা ঐ সকল দূর আকাশের মেঘের ছায়াপুষ্ট হইয়া কখন জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে না। সেইজন্য বাঙ্গালীকে আজ নিজ প্রাণের সত্য প্রেরণার অনুসন্ধানে অবতীর্ণ হইবে।

জল হাওয়া অপরিষ্কার, অশুদ্ধ ও বিষাক্ত হইতেছে।

বিজ্ঞান ও বৃহৎ কারখানার প্রসারের ফলে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই জল হাওয়া ক্রমশঃ অপরিষ্কার, অশুদ্ধ ও বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে। লক্ষ লক্ষ নানা প্রকারের যন্ত্রচালিত যান ধোঁয়া ছাড়িয়া হাওয়ার পবিত্রতা ও শুদ্ধতা প্রতিদিন নষ্ট করিতেছে। তাহার উপরে আছে শত শত কোটি রন্ধনের চুল্লি এবং যন্ত্র চালাইবার আগুন ব্যবহারকারী ইঞ্জিন। বহু কোটি মানুষ ইহার উপর ধুমপান করিয়া পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অন্ধকার করিবার চেষ্টা করিতেছে। হাওয়া অপরিষ্কার, অশুদ্ধ ও বিষময় করিবার মূলে প্রধানত রহিয়াছে অগ্নি জ্বালাইয়া তৎসাহায্যে যন্ত্র-চালনার শক্তি সৃষ্টি করা। এই উপায় ছাড়িয়া দিয়া যদি অগ্নি না জ্বালাইয়া শক্তি উৎপাদন করা হয় তাহা হইলে বায়ু-মণ্ডল আর ততটা বিষাক্ত হইয়া উঠে না। কি ভাবে তাহা সাধিত করা যায়, এই বিষয় বৈজ্ঞানিক গবেষণা করিবার প্রয়োজন আছে। বহু উপায় মানুষ এখনই জানে। যথা জলশক্তি ব্যবহারে (জলপ্রপাত ইত্যাদি) বিদ্যুৎ উৎপাদন করিলে তজ্জন্য আগুন জ্বালাইতে হয় না। সূর্য্যের তাপ ব্যবহারে বিদ্যুৎ উৎপাদনও সম্ভব এবং সমুদ্রে যে জোয়ার ভাটা হয় তাহা দ্বারাও শক্তি জনন হইতে পারে। এই সকল উপায় ও বেতারে দূর দূরান্তরে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রেরণ প্রভৃতি লইয়া এখন হইতে বিশেষ চেষ্টা হওয়া প্রয়োজন। কারণ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পরিষ্কার রাখিতে হইলে যথাশীঘ্র সম্ভব আগুন না জ্বালাইয়া প্রচুর বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ব্যবস্থা করা আবশ্যক। আর একটা ব্যবস্থা হইতে পারে, তাহা আনবিক শক্তি ব্যবহার। এই বিষয়ে বহু গবেষণা, পরীক্ষা ও যান্ত্রিক ব্যবস্থা করা হইয়াছে ও হইতেছে; কিন্তু সামরিক ব্যবহারের কার্য্য যতটা উত্তমরূপে সাধিত হইয়াছে, মানবজাতির কল্যাণ চেষ্টাতে আনবিক শক্তি ব্যবহারে তাহার অল্পাংশও করা হয় নাই। আনবিক শক্তি ব্যবহারে যদি [illegible]

গাড়ী ও বিমান চালনা করা যায় তাহা হইলে আকাশ অনেক কম ধূম্রাচ্ছন্ন হইবে বলিয়া মনে হয়। আনবিক শক্তি ব্যবহারে বিদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ হইলে এবং রন্ধন ও আলোকের ব্যবস্থা বিদ্যুৎ ব্যতীত অপর উপায়ে করা যথাসম্ভব কমাইয়া দিলে হাওয়া আরও পরিষ্কার থাকিবে। আগুন জালান ব্যতীত আরও অন্য উপায়েও বহু ক্ষেত্রে বায়ুর পবিত্রতা নষ্ট করা হইয়া থাকে। রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যেসকল কার্য্য করা হয় তাহাতে নানা প্রকার বাষ্প উৎপন্ন হয়, যাহা অনিষ্টকর। এই সকল বাষ্প রাসায়নিক উপায়েই এমনভাবে পরিবর্ত্তিত করা যাইতে পারে যাহাতে সেইগুলি হাওয়ায় মিলিয়া গিয়া মানুষের পক্ষে অনিষ্টকর না হইয়া মাটির সহিত মিলিয়া যাইতে পারে। মানবসমাজকে তাহা হইলে আগুন জালান, ধোঁয়ার সৃষ্টি ও অনিষ্টকর বাষ্প উৎপন্ন হইতে দেওয়া প্রভৃতি ক্রমশঃ সম্পূর্ণরূপে নিবারণ করিতে হইবে। ইহার জন্য যে পথ বিজ্ঞান খুলিয়া দিয়াছে তাহা হইল প্রাকৃতিক তেজ বা শক্তি ব্যবহারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করিয়া; (অর্থাৎ জলস্রোত, জলপ্রপাত, সমুদ্রের জলের উত্থান পতন, আনবিকশক্তি ও সূর্য্যালোক); সেই বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারে সকল কার্য্য করিয়া জলন্ত অগ্নি ক্রমে ক্রমে আর না ব্যবহার করা। মানুষ এখন হইতে এই আদর্শের অনুসরণ করিলে অদূর ভবিষ্যতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আর অকারণে অপরিষ্কার ও অনিষ্টকর ধূম্র বাষ্পাদিপূর্ণ হইতে থাকিবে না। ইয়োরোপ আমেরিকার বহু দেশে চিমনির ধোঁয়া ও মোটর গাড়ীর ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করা হয়। কলিকাতায় যেরূপ উৎকটভাবে ধোঁয়া ছাড়িয়া চলিতে থাকিলেও পুলিশ কোন গাড়ী-চালককে কিছু বলে না, পাশ্চাত্যের বহু দেশে সেইরূপ হইলে গাড়ীর মালিকের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। ফ্যাক্টরীর চিমনিও যত্রতত্র ধোঁয়া ছাড়িতে পারে না। অপর ব্যবস্থা থাকিলেও কয়লা জালাইয়া উনান ধরান আর একটা অন্যায় সমাজ-বিরুদ্ধতার উদাহরণ! যথাসম্ভব বৈদ্যুতিকশক্তি

অতঃপর দেখা যাউক, মানুষ কতভাবে পৃথিবীর নদ, নদী, সমুদ্র, হ্রদ, পুষ্করিণী ও অপরাপর জলাশয়গুলির জল অপবিত্র, অশুদ্ধ ও বিষাক্ত করিয়া তুলিতেছে। বড় বড় শহর ও গ্রামের যত নালার জল, যাহা অপরিষ্কার, অপবিত্র ও বিষাক্ত, ক্রমাগতই নিকটস্থ নদী, হ্রদ বা সমুদ্রে পতিত হইয়া থাকে। যদি ঐরূপ বৃহৎ জলাশয় না থাকে তাহা হইলে পুষ্করিণীতেও জল ছাড়িয়া দেওয়া হয়। আজকাল কারখানার ব্যবহৃত ও বিষাক্ত জলও নিকটস্থ নদী বা বৃহৎ জলাশয়ে পরিত্যক্ত হইয়া পতিত হইয়া থাকে। যে সকল দেশে বহু কারখানা আছে ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ব্যবহার ব্যাপকভাবে করা হয়, সেই সকল দেশের নিকটস্থ নদী বা সমুদ্রে ঐ সকল অশুদ্ধ ও বিষাক্ত জল পড়িয়া জলচর জীবদিগের বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে। এমন উদাহরণ আছে যে লক্ষ লক্ষ মৎস্য মরিয়া সমুদ্রে বা নদীতে ভাসমান দেখা যায়। এই সকল কারণে এখন বিশেষ চেষ্টা হইতেছে যাহাতে কারখানার পরিত্যক্ত জল শোধন করিয়া তবে নদী বা সমুদ্রে ছাড়া হয়। সুইডেনে আইন করা হইতেছে যাহাতে দুই বৎসর কাল ঐ দেশে কোথাও ডি ডি টি ঔষধ কেহ ব্যবহার না করে। আরও অনেক কীট ও বীজানুনাশক ঔষধ আছে যাহার ব্যবহার ও পরে যাহা জলধৌত হইয়া নদী ও সমুদ্রে পড়িয়া অপর প্রাণীর সমূহ ক্ষতি করিয়া থাকে। বৈজ্ঞানিকগণ বিচার করেন যে, যদি এই সকল ঔষধ জলে মিশ্রিত হওয়া নিবারণ না করা হয় তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে নদী ও সমুদ্রে আর মৎস্য ও অপর জলচর জীব বাস করিতে সক্ষম হইবে না। এই জন্য এখন আইন করিয়া সকলকে বাধ্য করিতে হইবে যাহাতে কেহ কোন বিষাক্ত পদার্থ জলে বা হাওয়ায় ছড়াইয়া না দেন। বিষাক্ত বস্তু ব্যবহার করিলে ব্যবহারের পরে সে সকল বস্তু যাহাতে শোধিত ও নিষ্ক্রিয় অবস্থায় আনীত হইয়া পরে পরিত্যক্ত হয় তাহাও আইন করিয়া বাধ্যতামূলক করা আবশ্যক হইবে। ভারতের মানুষ

অনুসরণ করিয়া থাকে। এই জন্য এখন হইতেই বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র জল ও হাওয়া শুদ্ধ, পবিত্র ও অবিষাক্ত থাকে। বহুকাল হইতেই এই দেশের মানুষ পুষ্করিনী শোধন বা পরিষ্কার রাখার কোন চেষ্টা করে না। নদীর জল সর্ব্বত্রই যথেচ্ছা ময়লা করাই একটা রীতি দাঁড়াইয়াছে। এই দৃষ্টিভঙ্গীর আমূল পরিবর্তন একান্ত আবশ্যক।

পূর্ব্ব জার্ম্মাণী

জার্ম্মাণ জাতির প্রতিভা সম্বন্ধে কাহারও কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না। যুগে যুগে সেই প্রতিভা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতে থাকিবে। বিসমার্কের সময়ে জার্ম্মাণ জাতির মিলন ও সংগঠনের শক্তি বিশেষভাবে বিকশিত হইয়াছিল, প্রথম মহা যুদ্ধের পরাজয়ের পরেও বিধ্বস্ত জার্ম্মাণী নিজের চূর্ণবিচূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান সমূহের পুনর্গঠন সাধন করিয়া পৃথিবীকে দেখাইয়া দেয় যে, কর্ম্মশক্তি ও কর্ম্মপ্রেরণা থাকিলে কোন জাতিকেই কেহ বহুকাল পদদলিত ও নির্জীব অবস্থায় অশাড় করিয়া রাখিতে পারে না। জার্ম্মাণীর সেই পুনরুত্থান যদিও হিটলারের উন্মাদ ও পাশবিক স্বৈরাচারের ধাকায় জাতির উপকার না করিয়া জাতির সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল; তথাপি এ কথা স্বীকার করিতেই হয় যে, হিটলারের পন্থা যতই ঘৃণ্য ও জঘন্য ছিল না কেন জার্ম্মান জাতি ঐ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নিজের শক্তি সামর্থ্য যেভাবে দেখাইয়াছিল তাহা অতি বিস্ময়কর বলিয়া বিশ্ববাসীকে মানিতে হইয়াছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পরাজয়-জর্জ্জরিত জার্ম্মাণী যদিও দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যায় ও এক ভাগ রুশীয় আদর্শে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তাহা হইলেও জার্ম্মাণ জাতির প্রতিভা ও প্রগতির প্রেরণা তাহাতে বিন্দুমাত্র নষ্ট হইয়া যায় নাই। পূর্ব্ব জার্ম্মাণী আজ কুড়ি বৎসর কাল হইল এক সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ অনুসারে চালিত রহিয়াছে। এই সময়ের মধ্যে পূর্ব্ব জার্ম্মাণী আবার শিক্ষায় ও কর্ম্মে বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছে। জনসংখ্যার তুলনায় উচ্চশিক্ষিত লোকের সংখ্যা পূর্ব্ব জার্ম্মাণীতে উল্লেখ-যোগ্য ভাবে অধিক। কর্ম্মকৌশলে সুদক্ষ লোকের সংখ্যাও পূর্ব্ব জার্ম্মাণীতে অন্যান্য ইয়োরোপীয় দেশের তুলনায় অনেক অধিক। ইহা দ্বারা প্রমাণ হয় যে, জাতীয় প্রেরণাও পূর্ব্ব জার্ম্মানদিগের মধ্যে পূর্ণ জাগ্রত ও বর্দ্ধনশীল রহিয়াছে। এই বৎসর যে রাষ্ট্রগঠনের বার্ষিকী অনুষ্ঠিত হইল তাহাতে সকল দেশের লোকেরাই পূর্ব্ব জার্ম্মাণীকে বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধিত করিয়াছেন ও বিশ্ব সভ্যতায় ঐ দেশের অবদান স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব্ব জার্ম্মাণী প্রমাণ করিয়াছে যে, রাষ্ট্রীয় আদর্শ, রীতি বা সংবিধান ভিন্নপ্রকার হইলেও জাতীয় প্রতিভা সতেজে বিকশিত থাকিতে পারে।

রাষ্ট্রনীতিবাজি, গুণ্ডাবাজি ইত্যাদি

রাষ্ট্রনীতিবাজ দুর্নীতিপরায়ণ অসৎ ব্যক্তিদিগের সহিত জনসাধারণের উৎপীড়ক আমলাতন্ত্র চালক, রাজকর্ম্মচারীদিগের মিলিত প্রয়াসে আজ ভারতের মানুষ স্বাধীন হইয়াও পরাধীনতার চরম পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত অবস্থায় জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইতেছে। দাস যে তাহাকে প্রভু রক্ষা করে ও খাওয়াইয়া পরাইয়া সুস্থ দেহে দাসত্বের ভার বহন করিতে সাহায্য করে। ঘৃণ্য অবস্থা হইলেও দাসকে সেই উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় না যাহা শক্তিশালী অধার্ম্মিক নেতা ও অত্যাচারী রাজকর্ম্মচারীদিগের স্বৈরাচারপ্রসূত হইয়া জনসাধারণের অঙ্গে অঙ্গে শৃঙ্খলের ন্যায় জড়াইয়া থাকে ও সর্ব্বমানবকে অপরের ইচ্ছায় উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে বাধ্য করে। সেই সুনীতি, ধর্ম্ম ও ন্যায়বর্জ্জিত ব্যঙ্গ-স্বাধীনতা পরাধীনতা অপেক্ষাও বহুভাবে নিকৃষ্ট হইতে পারে ও হইয়া থাকে। ঐ দুষ্ট নেতা ও শাসকসম্প্রদায়কে দমন না করিতে পারিলে স্বাধীনতার উপলব্ধি কখনও সম্ভব হইতে পারে না এবং সেইজন্য রাষ্ট্রীয় সংস্কার চেষ্টা কোন কোন অবস্থায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের মতই প্রয়োজনীয়, কঠিন ও কষ্টকর হইয়া দাঁড়ায়।

বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষের যে রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্ট হইয়াছে তাহার মধ্যে দেখা যাইতেছে সেই ভয়াবহ আমলাতন্ত্র ও পেশাদার রাজনিতিবাজদিগের মিলিত স্বৈরাচার। যেসকল ব্যক্তি ভারতের জনসাধারণকে রাজনীতি ও শাসন বিক্রয় করিয়া জীবন নির্ব্বাহ করিতেছেন তাঁহারা ভারতের বাজারের চিরপ্রচলিত রীতি অনুসরণে ভেজাল, মিশাল, নকল ও নিকৃষ্ট প্রকারের পণ্য সরবরাহ করিয়া অপর ব্যবসায়ীদিগের ন্যায়ই লোক ঠকাইতে ব্যস্ত রহিয়াছেন। ফলে আমরা বিভিন্ন প্রকারের রাজনৈতিক আদর্শাক্রান্ত এবং দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া মানসিকভাবে বিভ্রান্ত ও কার্য্যক্ষেত্রে লক্ষ্যহীন হইয়া পড়িতেছি। তাহার উপর রহিয়াছে আমলাতন্ত্রের অসংখ্য শাখা প্রশাখা সমাচ্ছন্ন নিয়মারণ্য যাহার অন্ধকারে কেহ কিছুই না দেখিতে পায়, না বুঝিয়া কোনদিকে অগ্রসর হইতে পারে। দুর্নীতি যখন জটিল নিয়মের আকার ধারণ করিয়া মানবজীবনকে গতিহীন ও অচল করিয়া তোলে তখন সে অবস্থার সহিত একমাত্র পক্ষাঘাতগ্রাক্রান্ত অর্দ্ধমৃত নিশ্চলতারই তুলনা হইতে পারে। ভারতের জনসাধারণ আজ তাই একটা অস্বাভাবিক বিরতগতি প্রাণশক্তির ক্ষীণ ধুকধুকানি মাত্র অবলম্বন করিয়া কোন মতে বাঁচিয়া রহিয়াছে। ভারতে আজ শুধু প্রবলভাবে তাহারাই জীবিত রহিয়াছে যাহারা দল পাকাইয়া আদর্শবাদের মিথ্যা অভিনয় করিয়া লোক ঠকাইয়া নিজেদের অর্থ, প্রভুত্ব ও জনশোষণশক্তি বৃদ্ধি করিতে নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহাদিগের সমর্থক (নিজ সুবিধার জন্য) সেই সকল রাজকর্ম্মচারী যাহারা কোন মত বা আদর্শের অনুগত নহেন; শুধু রাজশক্তির আধার যখন যে বা যাহারা তাহাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিতেই সদা সচেষ্ট ও নিপুণ। এই সকল রাজকর্ম্মচারী সকল কার্য্যই প্রভুর নির্দ্দেশে করিতে অভ্যস্ত; কিন্তু নির্দ্দেশ কি তাহা তাঁহারা নিজেরাই ছকিয়া দিয়া প্রভুদিগের মোহর লাগাইয়া দেশবাসীমহলে প্রকাশ ও প্রচার করিয়া শাসনে নিযুক্ত হয়েন। ফলে প্রভুরা এবং দেশবাসী উভয় পক্ষই ক্রমে ক্রমে আমলাতন্ত্র নিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইয়া থাকেন। কোন সময়েই যদি দেশের খবরাখবর চর্চ্চা করা যায় তাহা হইলে দেখা যায় রাষ্ট্রীয় অথবা শাসন ঘটিত ব্যাপারের দুষ্ট অবস্থার ভয়ঙ্কর চিত্র। যথা এইমাত্র সংবাদপত্র উল্টাইয়া যাহা দেখা যাইতেছে তাহা বিশেষ করিয়া প্রমাণ করে যে দেশের অবস্থা আজ কোথায় গিয়া পড়িয়াছে।

প্রথম দেখিলাম, সোনারপুরের নিকটে কোন এক স্থানে তথাকথিত কম্যুনিষ্টদলের কিছু লোক অপরপন্থী ও অপর প্রকারের কম্যুনিষ্টদিগের দফতর আক্রমণ করিয়া তিন ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছে। ভারতবর্ষ কম্যুনিষ্ট দেশ নহে এবং এই দেশে এখনও মানুষ খুন করিলে তাহা আইনত দণ্ডনীয়। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পুলিশ কাহাকেও গ্রেপ্তার করে নাই। ইহার কারণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিতেছে যে বাংলার পুলিশ এখন কম্যুনিষ্ট নেতাদিগের নির্দ্দেশে চলিতেছে এবং মানুষ খুন হইলেও দলের সুবিধা হইবে জানিলে বহুক্ষেত্রে গ্রেপ্তারের হুকুম আসে না বা আসিতে এত বিলম্ব হয় যে প্রমাণাদি সেই সময়ের মধ্যে লোপ পাইয়া যায়। কথাটা সত্য কিনা বিচার না করিয়া বলা যায় যে, হত্যা কার্য্যটাত সত্যই হইয়াছে। তাহার জন্য রাষ্ট্রীয় দলগুলি কি করিতেছেন?

একটি খবরে অদ্যই দেখা যাইতেছে যে নিকটবর্ত্তী বারুইপুরে বহু রাষ্ট্রীয়দলের লোককে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। এই সকল ব্যক্তি এস এস পি দলভুক্ত, অর্থাৎ কম্যুনিষ্ট দলের নহেন। লোকে বলিতেছে যে কম্যুনিষ্ট দলের জোর বাড়াইবার জন্যই এস এস পি দলের লোকেদের গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সত্য কি তাহা বিচার না করিয়া বলা যায় যে অল্পকারণে কোথাও লোক গ্রেপ্তার হইতেছে এবং নরহত্যা করিলেও অপর স্থলে কেহ গ্রেপ্তার হইতেছে না, ইহা সুশাসন পদ্ধতির লক্ষণ বলা যায় না।

রাষ্ট্রীয় দলের সমাজবিরুদ্ধতার কথা ছাড়িয়া অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে দেখা যাইতেছে যে, খান আবদুল গফর খানকে ভারত সরকারের নিযুক্ত ডাক্তারগণ এমন

অতিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে যে সেই বৃদ্ধ ভারতের ডাক্তারদিগকে কাছে আসিতে দিতে চাহিতেছেন না। ইহা একটি আমলাতন্ত্রের বাড়াবাড়ি করার উদাহরণ। ভারত সরকারের দ্বারা নিযুক্ত সকল ব্যক্তিই, তাহারা ডাক্তার হউন কিম্বা রাজকর আদায়ে নিযুক্তই হউন, বাড়াবাড়ি করিয়া সকলকে নাজেহাল না করিলে তাঁহাদের কখন তুষ্টি হয় না। বিশেষ করিয়া যদি যাঁহারা তাঁহাদের পাল্লায় পড়েন তাঁহারা যদি খ্যাতনামা ব্যক্তি হয়েন তাহা হইলে সরকারী "অভিভাবক"গণ উৎপাতটা আরও জোরালভাবে করিতে থাকেন। অজানা গরীবদিগের চিকিৎসা করিবার সময় রাজকীয় ডাক্তারদিগকে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হয়; কিন্তু কোন মহারথীকে পাইলে আর চিকিৎসার ধাক্কা কেহ সামলাইয়া উঠিতে পারে না। রাজকর আদায়ের সময়ও দেখা যায় যাহারা অজানা লোক তাহারা কিছু দক্ষিণা দিয়া পার পাইয়া যাইতেছে; কিন্তু নামজাদা লোকের আর নিস্তার থাকে না। নানা প্রকারের "ফর্ম্ম" ও "স্টেটমেণ্টের" বন্যায় তাঁহারা প্রায় ভাসিয়া যা'ন।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমলাদিগের অত্যাচারে শত শত স্বর্ণকার আত্মহত্যা করিয়া নিজেদের দুঃখের অবসান করিয়াছে। এই গরীব শ্রমিকদিগের উপর জুলুম আরম্ভ হয় পূর্ব্বকালের অর্থ মন্ত্রী মোরারজি দেশাই-এর স্বর্ণনিয়ন্ত্রণের সময়। তিনি স্বর্ণ ব্যবহার ও আমদানী কমাইবার জন্য নানা প্রকার আইন ও নিয়ম প্রবর্ত্তন করিয়া সোনার কালো বাজার আরও লাভজনক ও সচল করিয়া তোলেন। যখন স্বর্ণ আনয়ন তাঁহার আইন ও নিয়মকে অগ্রাহ্য করিয়া বাড়িয়া চলিতে লাগিল তিনি তখন আরও নানা প্রকার নিয়ম করিয়া আমলাদিগের উৎপীড়ন আরও প্রবল করিয়া দিলেন। বর্ত্তমানে স্বর্ণকারদিগের উপর যেসকল নিয়ম প্রয়োগ হইতেছে সেগুলির কোনই জাতীয় অর্থনৈতিক মূল্য নাই। শুধু আছে আমলাদিগের জনসাধারণকে বিরক্ত ও ত্যক্ত করিবার উপায় ও ব্যবস্থা। যাহারা আত্মহত্যা করিয়াছে তাহাদিগকে আর বাঁচান সম্ভব হইবে না। কিন্তু যাহারা বাঁচিয়া আছে ও যাহাদিগের দ্বারা জনসাধারণের নানা প্রকার চাহিদা মিটিয়া থাকে তাহাদিগকে আমলাদিগের হস্ত হইতে বাঁচাইবার ব্যবস্থা করিলে সকলদিক দিয়াই দেশের মঙ্গল হইবে। নিয়ন্ত্রণ বাহুল্য একটা মহামারীর মতই ভারতের বক্ষে চাপিয়া বসিয়াছে। ফলে দেশের মানুষের জীবন দুর্বিষহ ও অর্থনৈতিক অবস্থা দ্রুত অবনতিশীল হইয়া উঠিয়াছে এবং সমাজ-বিরুদ্ধতা দোষদুষ্ট ব্যক্তিদের প্রভুত্ব ও শক্তির প্রাবল্য বৃদ্ধি কর্কট রোগের মতই অপ্রতিহতভাবে সমাজের স্বাস্থ্য ও সুস্থ অঙ্গগুলিকে গ্রাস করিয়া ক্রমশঃ জাতিকে মরণের পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে।

লিখিবার সময়ে শেষ খবর যাহা পাওয়া যাইল তাহা হইল ভারতের জাতীয় কংগ্রেসদলের মিলিত ও সংহত সংস্থার অবসান। কংগ্রেস যখন হইতে ভারতের শাসনভার প্রাপ্ত হয় তখন হইতেই তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গণ্ডির স্বার্থসিদ্ধির আগ্রহের ফলে শাসনকার্য্য উত্তরোত্তর অপকৃষ্ট হইতে থাকে। এইবার সেই স্বার্থসিদ্ধির বিষ কংগ্রেসকে শেষ করিয়া দিবে।

কালা গ্লেসিয়ার অভিযান

আসানশোলের মাউণ্টেন লাভারস্ অ্যাসোসিয়েশন এই বৎসর হিমালয়ের কালা গ্লেসিয়ার অঞ্চলের কয়েকটি পর্ব্বত শিখর আরোহণ করিবার জন্য একটি অভিযান গঠন করিয়াছিলেন। তাঁহারা সম্প্রতি ঐ অঞ্চলের একটি প্রায় ২১০০০ ফুট উচ্চ শিখর আরোহণ করিয়া বাংলার যুবকদিগের পর্ব্বত আরোহণ দক্ষতা প্রমাণ করিয়াছেন। পাঁচজন শিখর চূড়ায় উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে দুইজন ছিলেন অভিযানের সভ্য ও তিনজন শের্পা পদপ্রদর্শক। পর্ব্বত আরোহণ এবং উচ্চ উচ্চ স্থানে গমনাগমন আজকাল ভারতের একটা জাতীয় সংরক্ষণ কার্য্যের অঙ্গ হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

(এর পর ২৬৪ পাতায়)

শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মসমন্বয় ও সাম্যবাদ

সংগ্রামসিংহ তালুকদার

মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম্মসমন্বয়বাদ ও, সাম্যবাদের বিষয় আলোচনা করতে হলে, মহাভারত, হরিবংশ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবতই অনেকাংশে প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণীয়। গ্রহণীয় হ'লেও প্রক্ষিপ্ত অতিশয়োক্তি যা পরবর্ত্তিকালে তাঁর ভক্তগণ দ্বারা সুনিপুণভাবে মূল গ্রন্থের ভিতর সংযোজিত করা হ'য়েছে, সেগুলো পরিত্যাগ না করলে মানবীয় ধর্ম্ম ও সমাজতন্ত্রের সার্থক স্রষ্টা ও সমর্থকরূপে তাঁকে গ্রহণ করায় অনেক অসুবিধার উদ্ভব হয়।

আমার মনে হয় অবশ্য যতদূর আমি জেনেছি "পরব্রহ্ম" সম্বন্ধে সাধারণের জ্ঞান সীমিত হওয়ায় অতিমানবীয় অলৌকিকত্ব যাঁর ভিতরে প্রকাশিত হ'য়েছে তাঁকেই হয় স্বয়ং 'ব্রহ্ম' না হয় "ব্রহ্ম-অংশ"রূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করা হ'য়েছে। এবং পরবর্ত্তী কালে বহু সাধক ও সাধক সম্প্রদায় শাস্ত্রপ্রমাণ অবলম্বনপূর্ব্বক সেই পথেই অগ্রসর হ'য়েছেন. ক্রমে কালের গতিতে মহামানবগণ "ব্রহ্ম" পদবাচ্য হ'য়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এবং উপরি উক্ত রূপে ইহা স্বভাবতই স্বাভাবিক যে এই সুদীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণের অন্তরে তাঁকে ব্রহ্মপদবাচ্য করায় এখন ইহা প্রায় সত্যে পরিণত হ'য়েছে। পূর্ব্বের কথা পরিত্যাগ করলেও আধুনিক কালেও আমরা অনেক অনেক মহাত্মাকেও ব্রহ্মরূপে ভজনা করতেও দ্বিধাবোধ করছিনা। এতে মানবসমাজের কি লাভ হ'য়েছে জানিনা। কিন্তু ক্ষতি যে অপূরণীয় হ'য়েছে তাতে সন্দেহের কোনই অবকাশ নাই। ধর্ম্মমত ও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হ'য়েছে সত্য, কিন্তু সামাজিক, রাষ্ট্রিক, নৈতিক ও জাতীয় জীবনধারা নৈরাশ্যবাদের দিকেই দুর্নিবার আকর্ষণ করেছে। মনে হয় এত অগণিত সংখ্যক মহামানব ভারত ভিন্ন অন্য কোনও দেশে আবির্ভূত হ'য়েছে কিনা সন্দেহ। তা' সত্ত্বেও জাতীয় জীবনে এত পঙ্কিলতার স্থান কি ক'রে হয়? হয়; তার কারণ মহামানবদিগকে মানবরূপে গ্রহণ না করে, তাঁদের জীবনাদর্শকে ব্যক্তিগত জীবনের ভিত্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত না করে, তাঁদের করেছি "ব্রহ্ম"রূপে ভজন এবং সেই ব্রহ্মের আদর্শ অতি স্বাভাবিকরূপে ভজনীয় ও পূজনীয়ই হ'য়েছে, কিন্তু ব্যক্তিগত বা সামাজিক জীবনে গ্রহণীয় হয় নাই।

তাই আমি মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণকে মহামানব রূপে গ্রহণ করে তাঁর প্রচারিত ধর্ম্মসমন্বয়বাদ ও "সাম্যবাদের" বিশেষ বিশেষ অংশের আলোচনা করব। অবশ্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা অসম্ভব। অতি সংক্ষেপে যতটা সম্ভব পরিবেশন করছি।

আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে শ্রীকৃষ্ণের সময়ে রাষ্ট্র, ধর্ম্ম ও সমাজের, তৎকালীন কি অবস্থা ছিল। উক্ত তিন স্তরেই যে গভীর গ্লানি উপস্থিত হ'য়েছিল ইহা নিঃসন্দেহ। এই গ্লানি নিরসন হেতুই যে তাঁর মত মহামানবের আবির্ভাব হ'য়েছিল সেটা আজ নিঃসংশয়রূপে বলা যায়।

ভারতবর্ষে তখন রাষ্ট্র ত বিদ্বেষ অত্যন্ত প্রবল। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বহু রাজন্যবর্গ নিজ নিজ রাজ্য গণ্ডিবদ্ধ করে নিজ নিজ অভিরুচি ও প্রণালী অনুসারে প্রজাসাধারণের উপর তাদের নিরঙ্কুশ শাসনের অপ্রতিহত ক্ষমতা নির্ব্বিচারে প্রয়োগ করতেন। রাজাই একমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ায় রাজার ক্ষমতা অবিসংবাদি ছিল। রাজার বিচারই সর্ব্বত্র গ্রাহ্য ছিল। সেখানে রাজার বিচার অন্যায় হলেও সাধারণের ক্ষমতা ছিল না যে সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করে। সেই সময়

বহু রাজার বহু অপকর্ম্মই প্রজাগণ নিরুত্তাপে সহ্য করেছে। অন্য দিকে—এমন কোনও সার্ব্বভৌম সম্রাট ছিল না যে সেইসব রাজাদের অপকর্ম্মের সমুচিত শাস্তি বিধান করে। প্রত্যেক রাজাই স্ব স্ব প্রধান ও নিজেকে প্রবল ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করতেন। স্বভাবতই ক্ষুদ্র ও দুর্ব্বল রাজ্য বৃহৎ ও প্রবলপরাক্রান্ত রাজ্য দ্বারা আক্রান্ত হওয়া প্রায় স্বাভাবিক প্রথায় দাঁড়িয়েছিল। এক রাজ্যের রাজার সৈন্যসামন্ত ও প্রজাগণের বাহুবলের দ্বারাই অন্য রাজার আক্রমণ হ'তে নিজেদের রক্ষা করতো। আক্রান্ত ও পরাজিত রাজা ও রাজ্যের প্রজাগণের অশেষ দুর্গতি সহ্য করতে হ'ত। তাদের গোধন, স্ত্রীধন ও অন্যান্য ধনসম্পত্তি লুণ্ঠিত হ'ত, ও সেই রাজ্যবিজয়ী রাজার অধীনে করদ রাজ্য হিসাবে পরিণত হত। না হয় সেই রাজাকে হত্যা করে নিজ রাজ্যের কুক্ষিগত করা হ'ত। এইভাবে বহুধা বিভক্ত ভারতের রাজন্যবর্গ সুবর্ণভূমি ও দেবভূমি ভারতকে এক মহা গ্লানিকর অবস্থায় নিক্ষেপ করেছিলেন। পূর্ব্বেই বলেছি সার্ব্বভৌম ও অপ্রতিদ্বন্দ্বি ক্ষমতাবান কোনও সম্রাট না থাকায় ভারতরাষ্ট্র এক মহাসমস্যার ভিতরে পরিণত হ'য়েছিল।

বেশীর ভাগ রাজন্যবর্গ ক্ষত্রিয় ছিলেন। অবশ্য কিছু কিছু বৈশ্য ও শূদ্র রাজ্যও ছিল। সমধিক সংখ্যায় ক্ষত্রিয় রাজা থাকায় ও প্রত্যেক ক্ষত্রিয় রাজ্যের পরিধি বৈশ্য ও শূদ্র রাজ্য অপেক্ষা বৃহৎ থাকায় ও ক্ষত্রিয় রাজাদের শৌর্য্য বীর্য্য ও প্রতাপ অপরিসীম হওয়ায় ক্ষাত্র-ধর্ম্ম রূপে এক রাষ্ট্রনীতি শাস্ত্রের বিধানরূপে প্রচলিত ছিল। এই ক্ষাত্রধর্ম্মীয় রাষ্ট্রনীতি অনুসারে যুদ্ধে গুরু ও ব্রহ্মণের প্রতি কোনরূপ পক্ষপাত করার নিয়ম ছিল না। যেমন—"ক্ষত্রনীতি আছে এই শাস্ত্রের বিধান।

যুদ্ধেতে ব্রাহ্মণ গুরু একই সমান ॥

(আদিপর্ব-সভা)

সুতরাং নির্ব্বিরোধি গুরুশ্রেণী ও ব্রাহ্মণসম্প্রদায় অনেক সময় রাজসভায় নিমন্ত্রিত হ'য়েও হঠাৎ উপস্থিত রাজাদের ভিতরে মতান্তর বা বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় বিনা দোষেও হতাহত হ'তেন। যেমন—

"প্রাণ লইয়া পলাইল যতেক ব্রাহ্মণ।
উর্দ্ধমুখে ধাইয়া পলায় মুনিগণ ॥
বিংশতি সহস্র শিষ্য লইয়া মার্কণ্ড।
পঞ্চদশ শিষ্য লয়ে পলাইল কৌণ্ড ॥

(আদিপর্ব্ব-সভা)

এইরূপ শ্রান্ত অরাজক ও গ্লানিকর রাষ্ট্রনীতি নিরসন-কল্পে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মহা শৌর্য্যের ও শাসনের দ্বারা ভারতের বহু রাজন্যবর্গকে একতাবদ্ধ করতে ও পরস্পরের প্রতি বৈরীভাব পরিত্যাগ করতে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হ'য়েছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ ক্ষাত্রধর্ম্ম যা দুর্ব্বল নারী, শিশু, ব্রাহ্মণ, গুরু ও বেদবিদ্ মুনিঋষিগণকে বিপদ ও সংশয়ের হাত থেকে রক্ষা করা বুঝায় সেই ক্ষাত্রধর্ম্মের পক্ষপাতি ছিলেন। দস্যুগণ দ্বারা নিপীড়িত জনসমাজকে রক্ষাকল্পেই তাঁর ক্ষত্র-ধর্ম্মের প্রতি পক্ষপাতিত্বের সূচনা, তিনি নিজ জীবনে অন্যায়কে কখনও প্রশ্রয় দেন নাই। সারা জীবন ক্ষাত্র-ধর্ম্মকে ঈশ্বর-অভিপ্রেত ধর্ম্মরূপে পালন করেছিলেন। সেই রূপ যদি না হ'ত তবে অর্জ্জুনকে তিনি কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রবৃত্ত করতেন না। তাঁর জীবনে ব্রাহ্মণে ভক্তি ও ব্রাহ্মণব্রাদগকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষার প্রচেষ্টা ইহাই প্রমাণিত হয় যে নিজ জীবনে পালন করে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সর্ব্বসমক্ষে স্থাপন করা। শ্রীকৃষ্ণ-আচরিত এই বিশুদ্ধ ক্ষাত্রধর্ম্মের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রনীতির বন্ধনে ভারতের সকল রাজন্যবর্গকে এক মহা একতার সূত্রে বন্ধন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার জন্য যদিও তাঁকে এক মহা রক্তক্ষয়ি সংগ্রামে লিপ্ত হ'তে হ'য়েছিল তবুও তিনি বুঝেছিলেন যে ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে এ দৃষ্টান্ত একটি উপযুক্ত আদর্শ নীতিরূপে রাষ্ট্রনায়কদের নিকট গ্রহণীয় হবে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে তার পরবর্ত্তী কালের ভারত তাঁর সেই সুশিক্ষা অদ্যাবধি গ্রহণ করে নাই—সে প্রমাণ ভারতের ইতিহাস।

এখনকার রাজনীতিজ্ঞদের ধারণা যে রাজনীতিতে ধর্মনীতি বিসদৃশ বর্জ্জনীয়। কি International Jurisprudence এ দেখা যায় যে এখনও যুদ্ধে এমন সব নীতি প্রচলিত আছে ও সেগুলোকে মান্য করা হয় যাহা মানবধর্ম অনুমোদিত ন্যায়ের বিধান।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বাপর সকল অবস্থার বিচার করলে শ্রীকৃষ্ণ কার্য্যাবলীর পারম্পর্য্য বিশ্লেষণ করলে ও পঞ্চ পাণ্ডবগণের সহিত তাঁর সর্ব্বঅবস্থায় সুদৃঢ় বন্ধুত্ব বন্ধনে বদ্ধ হবার প্রয়াসের বিষয় চিন্তা করলে ইহাই প্রমাণিত হয় যে তিনি এক মহা শক্তিশালী সার্ব্বভৌম সুনীতিপরায়ণ সম্রাটের অধীনে সমগ্র ভারতকে এক সুদৃঢ় নীতিগত ভিত্তিতে একতাবদ্ধ করবার প্রয়াস করেছিলেন। যেখানেই যে রাজা বিদ্রোহ করেছেন তৎক্ষণাৎ তাকে দমন তাঁর একটি বিহিত কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য হ'ত। তখনকার দিনে অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারাই সম্রাটের সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকৃত হ'ত। তাঁরই ইচ্ছা অনুসারে যুধিষ্ঠির কৃত কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে ও পরে অশ্বমেধ যজ্ঞের ব্যবস্থায় ইহাই প্রমাণিত হয়। যে ভারত এক শক্তিশালী সুনীতি ভিত্তিক, একতাবদ্ধ রাজ্যরূপে পরিণত হোক। যেহেতু নৃপতিরাই প্রজাগণের প্রতিভূ হিসাবে রাজ্য শাসন করবেন সেই হেতু মহাশক্তিশালী সম্রাটের অধীনেই সকল নৃপতিগণকে আনুগত্য স্বীকার করিয়ে একতাবদ্ধ হবার সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা করেছিলেন। আমার মনে হয় এই প্রচেষ্টা তাঁর সফলও হ'য়েছিল। কারণ দেখা যায় যে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধোত্তরকালে যুধিষ্ঠিরের অধীনে যে একক ভারত-সাম্রাজ্য তিনি স্থাপন করে গিয়েছিলেন পাণ্ডববংশের পরবর্ত্তী রাজন্যবর্গ সে সাম্রাজ্যকে বহুদিন শান্তিতে সুশাসন করে গিয়েছিলেন।

তৎকালীন সমাজ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে বলতে হয়, তখনকার সমাজ বর্ণাশ্রমিক ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের দ্বারা গঠিত এক সমাজ ছিল যা বহুকাল ধরে গঠিত রীতি, নীতি, সংস্কার, আচার ও আচরণের দ্বারা পরিচালিত হ'চ্ছিল। বর্ণাশ্রমিক সমাজের উদ্ভব কখন থেকে হয় তাহা বলা যায় না। মনুকেই যদি আমরা প্রাচীনতম সমাজসংস্কারক হিসাবে ধরে নিই তাঁরও কাল নির্ণয় সম্ভব নয়। মনু সংহিতার লিপিকার কোন্ মনু সে বিষয়েও মতদ্বৈধ আছে। যা হোক্ শ্রীকৃষ্ণের সময়ে যে বর্ণাশ্রমিক সমাজ ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। তিনি নিজে ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু বর্ণাশ্রমিককে নিছক ক্রমিক বা আশ্রমিক ভিত্তিতে গ্রহণ করেন নাই। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করে অব্রাহ্মণোচিত কার্য্য করলেও যে সে ব্রাহ্মণপদবাচ্য হবে ইহা তাঁহার নিকট গ্রহণীয় ছিল না। প্রত্যেকের প্রত্যেক আশ্রমোচিত কার্য্য করণের দ্বারা তার আশ্রমের নিদৃষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদনই উপযুক্ত বর্ণকে সূচিত করবে এই তাঁর মত ছিল। এ বিষয় গীতায় তিনি তাঁর মতকে অতি প্রাঞ্জলরূপে অর্জ্জুনের নিকট ব্যক্ত করেছেন—

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণ কর্ম বিভাগশঃ
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্য কর্ত্তারমব্যয়ম। গীতা (৪।১৩)

গুণ ও কর্ম্ম অনুসারেই অর্থাৎ তাহার বিভাগ অনুসারেই আমি চারি বর্ণের সৃজন করিয়াছি; যদিও আমি সেই বিভাগের কর্ত্তা, তথাপি আমায় অকর্ত্তা ও বিকার রহিত বলিয়া জানিবে।

সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণ। এই ত্রিবিধ গুণ হ'তে—শম, দম, তপ, শৌর্য্য, তেজ, উৎসাহ, শুশ্রূষা, ধনোপার্জ্জন ইত্যাদি কর্ম্মবিভাগ। সুতরাং যার মধ্যে যে গুণ কর্ম্ম বিশিষ্ট তিনি সেই আশ্রমের আশ্রমিক। এখানেও দেখা যাচ্ছে যে তিনি আক্ষরিক বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের সংস্কারক। তিনি বহুবার অর্জ্জুনকে বলেছেন যে তুমি ক্ষত্রিয় হ'য়ে যদি ক্ষাত্রধর্ম্ম অনুসারে কাজ না কর তবে তুমি পতিত হবে। এখানেও তিনি সমন্বয় সাধনই করেছেন।

মানবসমাজে শ্রেণী-বিভাগ রোধ করা অসম্ভব। অত্যাধুনিক কালেও আমরা কর্ম্মানুসারে শ্রেণীর বিভিন্নতা সমাজে মান্য করতে বাধ্য হচ্ছি। মনীষী Karl Marx এর শ্রেণীহীন সমাজ অস্পষ্ট। কারণ Marx পন্থীগণ তাঁদের নিজ নিজ সমাজে বিভিন্ন কর্ম্মানুসৃত সামাজিক

গোষ্ঠিকে এক স্তরে এনে এক দৃষ্টিতে সম মর্য্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু কর্ম্মানুসারে উচ্চ জ্ঞানবান ব্যক্তি যদি সর্ব্বস্তরের মানবকে আপন আত্মীয় জ্ঞান করেন তবে উচ্চ নীচ নির্ব্বিশেষে সকল স্তরের মানবগণ একে অন্তের প্রতি স্নেহ প্রীতি ও মমতা পোষণ করে প্রত্যেক গোষ্ঠির সমূহ উন্নতি বিধানে যত্নবান হবে। সে অবস্থা হয় কখন? যখন মানুষ আত্মস্বার্থ বিস্মৃত হয়ে পরোপকারে রত হয় তখনই তার অন্তর সমাজের শ্রেণীর বিভিন্নতা সত্ত্বেও সকল মানবকে আপন বিবেচনা করে ও তখনই সাম্যের অবস্থা সৃষ্ট হয়। আত্মোপলব্ধির দ্বারাই ইহা সম্ভব হয়। যোগ ভিন্ন আত্মোপলব্ধি হয় না। যোগ কার সঙ্গে? যদি ঈশ্বর মানি তবে তাঁর সঙ্গে। যদি ঈশ্বর না মানি তবে নিজ আত্মার সঙ্গে যোগ। অর্থাৎ গভীরে প্রবেশ করে আত্ম-সমাহিত হ'য়ে নিজ স্বরূপের উপলব্ধি। নিজ স্বরূপের উপলব্ধি হ'লেই সকল জীবে সেই স্বরূপের অন্তর্গত সেটা স্পষ্ট হৃদয়ে প্রতিভাত হয় ও তখনই মানবে মানবে সকল বিভেদ দূর হ'য়ে আসল মৈত্রী ও প্রীতির সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়। Materialistic ব্যবধান দূর করলেও মানসিক ব্যবধান বা বৈরীতা দূর হয় না।

"যোগস্থঃ কুরুকর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমোভূত্বা সমত্বং যোগমুচ্যতে।।
গীতা (২-৪৮)

নির্ব্বিকার হ'য়ে যোগে স্থিতিপূর্ব্বক কর্ম্ম কর। সিদ্ধি অসিদ্ধিতে যে সমত্ব, সেই সমত্বই যোগ।

আমি বলি আত্ম সমাহিত যোগে যে কর্ম্মপ্রেরণা অর্থাৎ পরোপকারী কর্ম্মের যে প্রেরণা অন্তরে জাগ্রত হবে তার ভাব "সাম্য" অর্থাৎ সকলের প্রতি সমদৃষ্টি। এখানেই Kari marx এর সাম্যবাদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের সাম্যবাদের পার্থক্য প্রমানিত সত্য। কারণ Western Philosophy সর্ব্ব সময়েই বলেছে "অনেক লোকের অনেক উপকার" কিন্তু Oriental Philosophy বলছে" নিজ আত্মায় প্রবেশ কর, নিজ সুখ ও দুঃখের অনুভূতি কর। যে যে কারণে তুমি যতটা সুখ দুঃখ পাও পায়। সুতরাং তখনই তোমার অন্তের প্রতি মমতা জাগবে ও দুঃখ নিরসন করবার বাসনা জাগবে যখন তোমার অন্তরে সেই আত্মানুভূতি জাগ্রত হবে। Karl Marx এর সাম্যবাদের Philosophy এখানে দাঁড়াতে পারেনা।

কর্ম্মটাই আসলে গ্রাহ্য নয়। বুদ্ধিই আসল। অর্থাৎ যে বুদ্ধির দ্বারা চালিত হয়ে কর্ম্ম সম্পাদিত হয় সেই বুদ্ধিই কর্ম্ম সম্পাদনের জন্য দায়ী। যোগের দ্বারাই নির্ম্মল ও নিরপেক্ষ বুদ্ধির উৎপত্তি হয় ও সেই বুদ্ধিই মানবে মানবে কোনও পার্থক্য দেখতে পায় না ও এক অখণ্ড শ্রেণীহীন মানবসমাজকে দেখতে পায়। এখানেই শ্রীকৃষ্ণের অপূর্ব্ব সাম্যবাদের পরিচয় পাই ও ইহাই ভবিষ্যৎ পৃথিবীর সাম্যবাদ। এখানেও কিন্তু আমরা International Jurisprudence এর অংকটা সমর্থন পাই।

আমার মনে হয় "ধর্ম্মের" প্রকৃত অর্থ আমরা অনেকেই জানিনা। ধর্ম্ম বলতে আমরা বুঝি কোনও বিশিষ্ট ধর্ম্ম-মত বা পথ—যেমন সনাতন ধর্ম্ম (হিন্দু ধর্ম্ম), ইসলাম ধর্ম্ম, খৃষ্ট ধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম ইত্যাদি। কিন্তু আমার মনে হয় শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মকে অতিগভীর ও ব্যাপক অর্থে প্রয়োগ করেছেন :—

"সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীতা (১৮।৬৬)

সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সমুদয় পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।

অর্জ্জুন ত সনাতন ধর্ম্মাবলম্বি হিন্দু ছিলেন। তবে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণ কেন বললেন যে সমুদয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হও। তা হ'লে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা এক ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকলেও আরও অনেক ধর্ম্ম আছে। সেগুলো কি? এরা হ'ল নিখিল প্রকৃতিসম্ভূত বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম। মানবেতর জীবের পক্ষে স্ব ধর্ম্মের গণ্ডির বাহিরে যাওয়া সম্ভব নয়। কারণ তাদের প্রবৃত্তি বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান আহরণের

করতে পারেনা ও সেটাই তার প্রকৃতিগত ধর্ম্ম। এ ধর্ম্ম সে আমরণ আচরণ করে। কিন্তু মানবের জ্ঞান আহরণের ক্ষমতা থাকায় সে বহুবিধ ধর্ম্মের দ্বারা নিজ প্রকৃতিকে সংযোজিত ও সংযমন করে রাখে। তার প্রকৃতিসম্ভুত গুণ বা দোষ স্বভাবজাত হ'য়ে জীবনে আচরিত হ'লে সেটাই তার ধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হয়। শাস্ত্রকারদিগের মতে ধর্ম্ম বহুবিধ তার মধ্যে—শ্রবণ, মনন, ধ্যান, নিদিধ্যাসন, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অক্রোধ, অপ্রমত্ত, অচৌর্য, দান, তিতিক্ষা, মৈত্রী নীতি, সত্য, সমাধি, প্রজ্ঞা, আচার, পুণ্য, তপস্যা,উপবাস,ব্রহ্মচর্য্য,সংযম, দয়া, বৈরাগ্য স্বার্থনাশ; ভক্তি শ্রদ্ধা, উদ্যোগ, উৎসাহ, দীনতা ইত্যাদি বহুবিধ সত্ত্বগুণাশ্রিত গুণসকল ধর্ম্ম হিসাবে গ্রহণীয়। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন সকলপ্রকার ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ করলেই তোমাকে সকল প্রকার পাপের হাত থেকে আমি উদ্ধার করব। আর এক জায়গায় কিন্তু তিনি বলছেন—"শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠীতাৎ। স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ॥

গীতা (৩।৩৫)

সেই যুগে সনাতন হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোনও ধর্ম্ম প্রচলিত ছিল না। তা সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণ এ কথা অর্জ্জুনকে কেন বললেন। তা হ'লে তিনি এমন কোনও ধর্ম্মের প্রতি ইঙ্গিত করছেন যে ধর্ম্ম প্রত্যেক মানব স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে প্রকৃতিগত কারণে জন্মগ্রহণের ভিতর দিয়ে লাভ করে থাকে। সত্ত্ব ও রজোগুণ সংমিশ্রিত যে ক্ষাত্রধর্ম্ম সেইটাই যে অর্জ্জুনের ধর্ম্ম ও তমোগুণাশ্রিত জীব সকলের তথাকথিত ধর্ম্ম অর্থাৎ ক্লীব ধর্ম্ম থেকে দূরে থাকতে উপদেশ দিচ্ছেন। তা হ'লে দেখা যাচ্ছে যে তিনি বলছেন মানবতা সমন্বিত ক্ষাত্রতেজ সম্ভূত যে ধর্ম্ম অর্জ্জুন বংশানুক্রমে জন্মলাভের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছে সেই ধর্ম্ম-আচরণই তার পথে শ্রেয়স্কর। ইহা ভিন্ন অন্য ধর্ম্ম যতই ভাল হোক না কেন তাহা গ্রহণীয় নয়। এখানে এ কথা বলা প্রয়োজন যে শ্রীকৃষ্ণ এমন ধর্ম্মের কথা বলছেন যাহা সকলের উপকারার্থে প্রযোজিত হয়।

সর্ব্বভূতাস্থং আত্মানং সর্ব্বভূতানি চ আত্মানি।
ঈক্ষতে যোগ যুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শন॥

গীতা (৬।২৯)

এই যে "সর্ব্বভূতাত্মৈক্য রূপ নিষ্কাম বুদ্ধি ইহাই কর্ম্মযোগ ও মোক্ষের মূল, এই শুদ্ধ বুদ্ধি ব্রহ্মাত্মৈক্য জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এই বুদ্ধিরই দ্বারা প্রত্যেক মনুষ্যকে স্বধর্ম্মানুসারে প্রাপ্ত আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম আজন্ম করিতে হইবে।" (ভক্তি যোগ, ত্রয়োদশ প্রকরণ—গীতারহস্য ও কর্ম্মযোগ শাস্ত্র—বাল গঙ্গাধর তিলক।) তাহ'লে দেখা যাচ্ছে ধর্ম্মের দিকেও তিনি "সর্ব্বভূতাত্মৈক্য রূপ" নিষ্কাম ধর্ম্মকেই প্রকৃত মানবধর্ম্ম বলেছেন। অন্যায় রূপ যে তামসিক ধর্ম্ম তার বিরুদ্ধে সত্ত্বগুণাশ্রিত যে ন্যায়ের ধর্ম্ম যাহা সর্ব্ব সাধারণের মঙ্গলকর সেই ধর্ম্মকেই প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল।

রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্ম্মনীতির ভিতর দিয়ে যে মহা মঙ্গলকর সাম্যনীতির ইঙ্গিত গীতায় শ্রীকৃষ্ণ দিয়ে গিয়েছেন সে নীতি সর্ব্বকালের পক্ষে হিতকর ও ভবিষ্যৎকালে এই নীতিই একমাত্র গ্রহণীয়। শুধু Food and Mood দিয়ে মানবসমাজে সাম্যনীতি প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব নয়। যে পর্য্যন্ত না আত্মোপলব্ধির দ্বারা সর্ব্বভূতাত্মৈক্য রূপ Spritual Oneness প্রতিষ্ঠিত হবে, এক কথায় "Mood" কে আমরা প্রত্যেকের অন্তরে জাগ্রত না করতে পারব ততদিন আধুনিক শ্রেণীহীন সমাজের (Communism) পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। গীতার সাম্যবাদই একমাত্র পথ যে পথে সর্ব্বমানবের মহা মঙ্গলকর বিধান পরিলক্ষিত হয়।

সত্যং শিবং সুন্দরং

দাঁড়ি পাল্লা

(গল্প)

প্রশান্তকুমার মৌলিক

হ্যাঁ, হ্যাঁ—আরে বাপু অত ভয় কেন? এখানে আর পুলিশ নেই যে তোর সব কেড়ে-কুড়ে নেবে।···

তা "হ্যাঁ" ক'রে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? নামা না···

প্রথম গলার স্বরটা ভৃত্য হারাধনের আর দ্বিতীয়টা আমার স্ত্রী নীলার।

শীতের ভোরে উঠি-উঠি করেও বিছানা ছেড়ে আর উঠ্‌তে ইচ্ছা হচ্ছিল না। লেপ মুড়ি দিয়ে ঘাপ্‌টি মেরে পড়েছিলাম। কিন্তু, আর থাকা গেল না। ব্যাপার কী? এত ভোরে পুলিশের ভয়!

বিছানা থেকে তড়াক্‌ করে লাফিয়ে উঠে একেবারে অকুস্থলে গিয়ে হাজির হলাম।

নাঃ, ব্যাপারটা ভয়ের কিছু নয় বরং আনন্দেরই। আমাদের হারাধন কোথা থেকে দু'জন চালের চোরা-ব্যবসায়ী পাকড়ে এনেছে।

—চ' আমার সাথে। নইলে পুলিশে ধরিয়ে দেব। দামের জন্যে অবিশ্যি তোর কোন ভাবনা নেই। যা-দরে এখানে বেচ্‌ছিস তাই পাবি।

কী আর করে? অগত্যা এগলি সেগলি দিয়ে হারাধনের পিছু পিছু আমার বাসায় এসে হাজির।

একজন প্রায় মাঝ-বয়সী আর একজন যুবতী। অস্থি-চর্মসার ওদের দেহে লজ্জানিবারণের মত কেবল-মাত্র নোংরা, ছেঁড়া সাড়ী দু'খানা কোনরকমে জড়ানো। বড়জনের কপালে সধবার চিহ্ন—মস্তবড় এক লাল সিঁদুরের টিপ। ছোটটি বোধ হয় কুমারী। দু'জনের মাথাতেই শাক-সব্জী-বোঝাই মস্ত দুই ঝাঁকা। ঝাঁকার ভারে টলমল করছে ওদের মাথা দুটো। দেখলেই বোঝা যায়, শাক-সব্জীগুলো আসল পণ্য নয়—আসল পণ্য ওগুলোর আড়ালে।

মেয়ে দুটো ভেতরে আসতে তখনও ইতস্ততঃ করছিল। কিন্তু, নীলার দ্বিতীয় আহ্বানে আর অপেক্ষা করলো না। একেবারে ভিতরেই চলে এল। রান্নাঘরের সামনের বারান্দায় ওদের বোঝা দুটোকে বেশ যত্ন করেই নামানো হ'ল।

বোঝা নামিয়েই হাঁপাতে থাকে মেয়ে দুটো।

মা, একটু জল দেবেন খেতে? উঃ, সেই কতদূর থেকে আসছি লুকিয়ে লুকিয়ে। কী যে বিপদ মা, সে কেবল ঈশ্বরই জানেন। কী করব পেটের দায়ে···

কথা আটকে যায় বড়জনের। এই শীতের ভোরেও ঘামের রেখা ফুটে ওঠে ওর কপালে।

—কোথা থেকে আসছ তোমরা? প্রশ্ন করি আমি।

—শীতলাপুর থেকে বাবু।

বলে কী! অতদূর থেকে! সত্যিই মায়া হয় ওদের ওপর। ক'টা পয়সার জন্যে কত বিপদ আর লাঞ্ছনার ঝুঁকি নিয়েই না ওরা বেরিয়ে পড়েছে এপথে। কিছুদিন আগে রাণাঘাট-লাইনের ট্রেনে ওদের দৌরাত্ম্য দেখে মনে মনে বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু আজ প্রসন্নতার রৌদ্রা-লোকে সে-বিরক্তির কুয়াশাটুকু কেটে গেল অনিবার্য্য-ভাবেই। বাজার থেকে এক কিলো, দু'কিলো করে লুকিয়ে লুকিয়ে চাল কিনে আনার কথা মনে করে ওদের কাছে কৃতজ্ঞতা বোধ করলাম মনে মনে।

—এই! ও-দাঁড়িপাল্লায় মাপ্‌লে চলবে না। হারাধনের কর্কশস্বরে চমক ভাঙে আমার।

তোর বাটখারা দেখি। তোদের তো আবার কম থাকে ওজনে। নীলা সন্দিগ্ধস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে।

কী যে বলেন মা! বাড়ী বয়ে এসে কম দিয়ে যাব আপনাদের? ও-রকম "অধম্মো" করিনে কখনো।

এতো একদিনের কারবার না যে আপনাদের ফাঁকি দিয়ে যাব।···বাবু, আমরা দর নিয়ে মারামারি করি বটে, কিন্তু ওজনে কোন জুয়াচুরি করিনে। মাঝ-বয়সী মেয়েটা আমাকে লক্ষ্য করে বললে শেষের কথাগুলো।

যা হোক্, নীলা দেখি এরি মধ্যে আমাদের পিতলের দাঁড়ি-পাল্লা আর নূতন-কেনা ওজনের সেট নিয়ে এসে হাজির।

—হ্যাঁ মা, এই ভাল। দিন্, আপনাদের দাঁড়িতেই ওজন করে দিই।

ছোটজনা শাক-সব্জীর আবরণ সরিয়ে রেখে চাল বের করে মাপতে সুরু করে। সুন্দর মিহি চাল। এর পাশাপাশি কাঁকর-ভরা রেশনের চালের কথা মনে করলে সত্যিই চোখে জল আসে।

নীলারও বোধ হয় সহানুভূতি জাগে ওদের জন্যে। আহা, তাইতো, এত কষ্ট করে অতদূর থেকে চাল এনেছে।

নীলা প্রশ্ন করে—তা' বাছারা বেরিয়েছিলে কখন বাসা থেকে?

—হ্যাঁ মা, তার কি আর ঠিক আছে। সেই রাত্তির থাকতে থাকতেই। ভোরের আগে এদিকে না এলে তো আর আসাই যায় না মা।

দাঁড়িয়ে থাকবার আর সময় ছিল না আমার। অফিসের জন্যে তৈরী হতে চললাম। পোষাক পরতে পরতে শুনলাম নীলা নাকি ওদের চা আর পাঁউরুটি খাওয়াচ্ছে। যাক্ ভালই হল। মেয়ে দুটো তাহলে চাল নিয়ে আবার আপনা থেকেই আসবে। চালের জন্যে আর ভাবতে হবে না আমাদের একটুও। খুসী মনে বেরিয়ে পড়লাম অফিস-মুখো।

কাজে-ঠাসা সপ্তাহের বাকী দিন দুটোও কেটে গেল অজানিতে।

পরদিন সোমবার সকাল। বসবার ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছি। এমন সময় শশব্যস্ত হয়ে নীলা এসে ঘরে ঢুকলো।

—জানো কী হয়েছে? অত করে সেদিন চা-পাঁউরুটি খাওয়ালাম···মেয়ে দুটো কী বেইমান···জোচ্চর।

—কেন কী হ'ল? চাল কম দিয়েছে নাকি? উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করি আমি।

—কম যখন দিতে পারলো না তখন আর কি?··· অন্য দিক দিয়ে পুষিয়ে নিয়েছে হারামজাদীরা। ভেল্কি জানে বটে ও দুটো। আমাদের সব্বার চোখে ধুলো দিয়ে দাঁড়ি-পাল্লা আর বাটখারাগুলো নিয়ে হাওয়া। চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিকরে পড়ে নীলার।

—এ্যাঁ, বল কি? অতগুলো টাকা খরচ করে কিনে আনলাম সেদিন!

ক্রোধে আর ঘৃণায় জ্বলতে থাকে সারা মনটা। সত্যিই বিশ্বাস নেই ওদের একটুও। ওদের জাতই ঐ রকম। পাই একবার ওদের হাতে। দেখিয়ে দেবো কী করে শিক্ষা দিতে হয় বেইমানীর। মনে মনেই গজরাতে থাকি আমি।

॥ ২ ॥

মনে মনে আক্রোশ করলে আর কী হবে? মেয়ে দু'টো যে আর এ-মুখো হবে না সে তো জানা কথা। হারাধন অবিশ্যি বলেছিল—বাবু, যাবে কোথায়? আমাকে ফাঁকি দেওয়া অত সোজা নয়। আমি ঠিক বাজার ঘুরে ঘুরে ধরে ওদের আনবই। দুটো মেয়ে-মানুষে আমায় ঠকিয়ে যাবে!

তা' হারাধন যাই বলুক, আমি জানতাম ওদের আর হাতের নাগালে পাওয়া যাবে না। কিন্তু, কখনো কখনো অসম্ভবও সম্ভব হয়, অপূর্ণ ইচ্ছাও পূরণ হয় আশ্চর্য্যভাবে।

তাই দিনসাতেক পর, আরেক ভোরবেলায় হারাধনের পিছু পিছু উপস্থিত হয় ঝাঁকা মাথায় মাঝ-বয়সী সেই মেয়েটা। সঙ্গীটি আসে নি। আসল দোষী যে কে তা স্পষ্টই বোঝা গেল। তা' যাক্‌গে। জোচ্চরের সঙ্গীকে দিয়েই জোচ্চর ধরা যাবে অনায়াসে।

বেশ নিশ্চিন্তেই ঢুকে পড়ে মেয়েটা বাসার ভেতর—যেন নিরাপদ আশ্রয়ে এসে গেছে। আমাকে, নীলাকে

আর ছোট্ট ছেলে খোকনকে দেখে মুখে-চোখে খুশির ভাব ছড়িয়ে পড়ে ওর। পূর্ব্ব পরিচয়ের স্বীকৃতি আর কি।

—হ্যাঁ রে, তোর সাথে যে সেদিন মেয়েটা এসেছিল সে কোথায়? মনের রাগটা চেপে বেশ সহজ গলায় প্রশ্ন করবার চেষ্টা করি।

—বাবু, ও-র তো ভীষণ জ্বর আজ তিন দিন থেকে। একা একা আমাকেই আসতে হল তাই বাজারে। বাবু, এ বয়সে কি আর আমি একা পারি এসব। ও থাকলে তাও কিছু সুবিধা হয়। চালটা মেপে দিতে পারে। তা' কী করব বাবু বলুন? ঘরে আবার সোয়ামী দু'মাস হল শয্যাশায়ী। চাল বেচে পয়সা নিয়ে যাব—তবেই ওষুধ পথ্য কেনা হবে। এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে ফেলে হাঁপাতে থাকে মেয়েটা ঘন ঘন।

ওঃ, কী মিথ্যা কাঁদুনিই না গাইতে পারে এই মেয়েগুলো। শয়তানের ঝাড় এরা। দাঁড়াও না, একটুখানি পরেই শয়তানী এদের ভাঙ্‌ছি আমি। হারাধনকে ইসারায় ওর দাঁড়ি-পাল্লাতেই চালগুলো মেপে নিতে বলি আমি।

চালগুলো সব উপুড় ক'রে ঢেলে দিয়ে মেয়েটা নিশ্চিন্তে বসে থাকে পা ছড়িয়ে।

হারাধন চালগুলো বস্তায় ভরে নিয়ে গুটিগুটি এগিয়ে গিয়ে ঢুকে পড়ল রান্নাঘরে।

—বাবু, দেখলেন তো, কেমন সুন্দর চাল এবারের। দু'গণ্ডা ক'রে কিন্তু পয়সা বেশি দিতে হবে এবার কিলোয়।

—পয়সা? মনের চাপা রাগটাকে এবার গলার স্বরে ছড়িয়ে দিয়ে বলি—প্রতি কিলোয় দু'গণ্ডা করে পয়সা দিলে যা হবে তার চেয়ে ঢের বেশি নিয়ে গেছিস তোরা সেদিন আমার বাড়ী থেকে। যা যা, বেরো-বেরো, শিগ্‌গির বেরো আমার বাড়ী থেকে······জোচ্চর সব······বেইমানের দল। রাগে ফেটে পড়ি আমি এবার। পেতলের দাঁড়ি পাল্লা আর বাটখারাগুলোর দাম কত জানিস্?

আচমকা ধমকে এবং ভয়ে আর বিস্ময়েই বোধ হয় এতটুকু হয়ে যায় মেয়েটা। ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে থাকে অসহায় ভাবে মিনিটখানেক। ঝড়ের রাতে ঘরে আটকা-পড়া বনের পাখী আর কি। তারপর ঝর-ঝর ক'রে কেঁদে ফেলে ও।

—সত্যি বলছি বাবু, মা কালীর দিব্যি···আপনার পা ছুঁয়ে বলছি······আমরা নিই নি বাবু। ডাকুন মা-কে উনি তো ছিলেনই সারাক্ষণ আমাদের সামনে। এ চাল-বেচা পয়সা না পেলে বাবু, না খেয়ে মরব আমরা······আপনারা রাজা মানুষ বাবা······এ-বুড়ো মানুষকে আর মারবেন না······

বাকী কথাগুলো বোধ হয় কান্নায় ধুয়ে গেল। ওঃ, কী অভিনয়ই না করতে পারে এরা। মঞ্চে না নেমে এরা চাল বিক্রি করতে আসে কেন? চোখের জলে মন ভিজালে চলবে না। শান্তস্বরেই তাই বললাম—বেশ তো, আমাদের দাঁড়িপাল্লা আর বাটখারাগুলো ফেরৎ দিয়ে পাওনা টাকা নিয়ে যাস। দেবো না তো বলছি না।

সময় নষ্ট করার আর উপায় ছিল না। চলে এলাম ওর সামনে থেকে।

হারাধন এগিয়ে গিয়ে মেয়েটাকে বললে—মিছামিছি সময় নষ্ট করে আর কি হবে বাছা। এবারে পথ দেখো।

৩

শাস্ত্রে কথা আছে—শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। মেয়েটার প্রতি আমার সেদিনকার ও-আচরণে দোষ দেখিনি আমরা কেউ। টাকা দেওয়ার কোন অনিচ্ছাই ছিল না আমার। পিতলের দাঁড়ি-পাল্লা আর বাটখারাগুলো ফেরৎ দিয়েই টাকা নিয়ে যেতে পারে ও যে কোন সময়ে। বাড়ীতে নীলার হাতেও এ-বাবদে অতিরিক্ত কিছু টাকা রেখেছিলাম; দু'একদিন খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, মেয়েটা আর আসে নি। তারপর এ-কাজে সে-কাজে ওদের কথা একেবারে ভুলে গেলাম।

সেদিন রবিবার। শীতের পড়ন্ত রোদে পিঠ দিয়ে

একখানা ইংরাজী ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিলাম। নীলা বৈকালিক জলযোগের আয়োজনে ব্যস্ত।

—কৈ-গো, নীলা, বড্ড দেরী ক'রে ফেললাম। সেদিন তোমায় পেলাম না। তাই তোমার বোন শীলাকে বলেই নিয়ে গিয়েছিলাম। তোমাদের খুব অসুবিধা হ'ল তো?

পাড়ার বামুন-গিন্নির গলার আওয়াজে পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখি বামুন-গিন্নির হাতে আমাদের সেই পিতলের দাঁড়ি-পাল্লা আর বাটখরার সেট। ব্যাপার কী? কী রকম হল? 'থ' বনে যাই আমি।

নীলা ঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল—আরে, এগুলো বুঝি আপনার কাছে? এদিকে আমরা কত খোঁজাখুঁজি করছি।

—ভাই, তোমাদের খুব অসুবিধা হ'ল। তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দেব মনে ক'রেও ভাই, দেরী ক'রে ফেললাম। মনে কিছু ক'রে না।

—না না, অসুবিধা আর কী এমন? মানে জিনিষগুলো না পেয়ে খুঁজছিলাম আর কি।

খানিকটা অপ্রতিভের ম্লান হাসি হেসে ধীরে ধীরে চলে গেলেন বামুনগিন্নি।

খানদুয়েক বাড়ীর পরেই বামুন গিন্নির বাসা। মাঝে মাঝে আমাদের কাছ থেকে তিনি এটা-ওটা নিয়ে যান। ফিরিয়েও দেন অবশ্য যথাসময়ে। কিন্তু ওঁর উপরই বা রাগ করে লাভ কি? প্রথম যেদিন মেয়ে দুটো চাল নিয়ে আসে তারপরদিনই আমরা ছোট শালী শীলা এসে আমার এখানে একদিন থেকে গিয়েছিল। সে বোধ হয়, আমাদের বলতেই ভুলে গেছে দাঁড়ি-পাল্লার কথা।

শীলা ধীরে ধীরে এসে আমার সামনে দাঁড়ি-পাল্লা আর বাটখারাগুলো নামিয়ে রেখে চলে গেলো। মুখ নামিয়ে বসে রইলাম আমি। মুখ তুলে ওর দিকে তাকাবার আর আমার মুখ কই?

খোকন হামাগুড়ি দিয়ে এসে দাঁড়ি-পাল্লার উপর এক থাবল মারলে। ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে পাল্লা দুটো কেবল কাঁপতে লাগলো। থর্‌থর্‌ করে—কান্নায় ভেঙে-পড়া এক মাঝ-বয়সী রোগা চেহারার মেয়ের মত।

মেয়ে দুটোকে কি আর দেখতে পাওয়া যাবে? দেখুক না হারাধন বাজার খুঁজে খুঁজে। ধরে নিয়ে আসতে হবে না। কিছু বেশি টাকাই না হয় দিয়ে আসুক ওদের। জোরে ডাক দিই হারাধনকে—ওরে হারাধন!...হারাধন!...গেলি কোথায়?

'সাহিত্য' ও সুরেশ সমাজপতি

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

বাংলা পত্রপত্রিকার ইতিহাসে ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' (১২৩৭) ও রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৭৭৬)—এই দুইটি যুগান্তকারী প্রকাশকে বাদ দিলে পাঠকের স্মৃতিতে তৃতীয় যে নাম জেগে ওঠে তা বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১২৭৯)। 'বঙ্গদর্শন' এর আবির্ভাব শুধু বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয় সমগ্র বাঙালী জাতির জীবনে একটি বড় অবদান। বস্তুতঃ 'বঙ্গদর্শন' থেকেই বাংলা সাহিত্যের জয়যাত্রার সূচনা হয়। এর পাঁচ বছর পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'ভারতী' পত্রিকার প্রকাশ (১২৮৪) আর একটি উল্লেখ যোগ্য ঘটনা। 'ভারতী' পত্রিকার এই বৈশিষ্ট্য ছিল যে সে যুগের অধিকাংশ পত্রিকার ন্যায় এটি স্বল্পায়ুতা লাভ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' যেমন কেবলমাত্র অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ লেখক-গণের রচনায় সমৃদ্ধ হত 'ভারতী' কিন্তু প্রাচীন লেখক-গণের সঙ্গে নবীনদের রচনার যথেষ্ট সুযোগ প্রদান করত। ঠাকুরপরিবারের যেসব অল্প বয়স্ক লেখক লেখিকাগণ সাহিত্যের অনুশীলন করতেন তাঁদের উৎসাহিত করাই উদ্দেশ্য ছিল 'ভারতীর'। পরবর্ত্তী-কালে 'ভারতীর' এই গৌরবজনক ঐতিহ্য যে-পত্রিকা পরিপূর্ণ ভাবে অনুশীলন করেছিল তার নাম 'সাহিত্য' (১২৯৭) এবং যে ব্যক্তির সম্পাদকীয় দক্ষতা ও সাহিত্যিক দূরদর্শিতার গুণে ঐ পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে, তিনি স্বনামধন্য সুরেশচন্দ্র সমাজপতি।

১২৯৬ সালে আষাঢ় মাসে শিবপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্যের সম্পাদনায় 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রকাশক উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (পরে বসুমতীর সত্বাধিকারী) ঐ বছর মাঘ মাস থেকে সুরেশচন্দ্রকে সম্পাদক নিযুক্ত করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র কুড়ি বছর। বলাবাহুল্য ঐ পত্রিকা সম্পাদনাকালে তিনি কোনও পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না। ১২৯৭ সালে সুরেশচন্দ্রের ইচ্ছানুসারে 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' এর নাম পরিবর্ত্তন করে 'সাহিত্য' রাখা হয়। এর পরের বছর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পুনরায় ব্যোমকেশ মুস্তফীর সম্পাদনায় 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামে আর একটি পত্রিকা প্রকাশ করলে সুরেশচন্দ্র স্বয়ং 'সাহিত্য' এর সত্বাধিকার অর্জ্জন করেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত (১লা জানুয়ারী ১৯২১) অব্যাহতভাবে ঐ পত্রিকাটি সম্পাদনা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েক মাস মাত্র এর সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করেন। অতঃপর এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়।

'সাহিত্য' ব্যতীত সুরেশচন্দ্র 'বসুমতী' 'সন্ধ্যা' 'নায়ক' 'বাঙ্গালী' প্রভৃতি সংবাদ পত্রগুলিও যোগ্যতার সঙ্গে সম্পাদনা করেন।

বাংলা মাসিক পত্রিকার অতীত ইতিহাস যাঁরা সাগ্রহে অনুধাবন করবেন তাঁদের কাছে 'সাহিত্য' একটি গৌরবজনক অধ্যায় হিসেবে দেখা দেবে। কি বিগত যুগে, কি বর্ত্তমান যুগে উভয় যুগেই যেসব পত্রিকার সঙ্গে পাঠক-সমাজ পরিচিত হয়েছেন তাঁরা যদি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে ও তুলনামূলক ভঙ্গীতে বিচার করেন তাহলে নিশ্চয়ই তাঁদের বুঝতে বিলম্ব হবেনা যে সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত 'সাহিত্য' নানা কারণে একক ও অনন্য সম্মানের সুউচ্চ আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে আছে। 'সাহিত্য' ও সমাজপতি শিক্ষিতসমাজে অবিস্মরণীয় পরিচয় বহন করে চলেছে। যুগের পরিবর্ত্তনেও তার ঔজ্জ্বল্য ম্লান হয়নি। 'সাহিত্য' এর রচনা বৈশিষ্ট্য এবং সুরেশচন্দ্রের সম্পাদকীয়

কৃতিত্ব সম্বন্ধে বিশদ আলোচনার পূর্ব্বে সুরেশচন্দ্রের রচনাবলী সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। সুরেশচন্দ্র স্বসম্পাদিত পত্রিকায় অনেকগুলি ছোট গল্প প্রকাশ করেন। ঐগুলির মধ্যে আটটি ছোটগল্প 'সাজি' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। যেসব গল্প গ্রন্থভুক্ত হয়নি তার মধ্যে 'বড় কে'? (১২৯৮ জ্যেষ্ঠ) 'পিপলকাপেড়' (১৩১১ শ্রাবণ) 'তাগা' (১৩২৩ বৈশাখ) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কবিতা রচনায়ও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর 'দোল' (১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ), 'মলয়ের আক্ষেপ তবু কাঁদে হৃদয়' (ভাদ্র ১৩০৯) 'উপহার' (বৈশাখ ১৩০০) রসোত্তীর্ণ কবিতার নিদর্শন। সমালোচনামূলক প্রবন্ধের মধ্যে 'মেঘদূত' (ভাদ্র ১২৯৮), 'ভূদেব মুখোপাধ্যায়' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০১) 'নবীনচন্দ্র' (বৈশাখ ১৩১৬), 'গিরীশচন্দ্র (বৈশাখ ১৩১৯), 'মহাকবি মধুসূদন' (আষাঢ় ১৩২৩), রামেন্দ্রসুন্দর (আশ্বিন ১৩২৬) 'সেকাল একাল' (ভাদ্র ১৩২১) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। তিনি 'কবিতা পাঠ' নামে একটি পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করেন। এ ছাড়া মূল সংস্কৃত থেকে অনুবাদ 'কল্কিপুরাণ' এবং স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের 'To Arms' এর অনুবাদ 'রণভেরী'ও প্রকাশ করেন। ১৩২৬ সালে 'বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের' উদ্যোগে 'আগমনী' নামে একটি পূজাবার্ষিকী প্রকাশিত হয়। তাতে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, প্রমথচৌধুরী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেন্দ্রকুমার রায়, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ইত্যাদি লেখকগণের রচনা স্থান পায়। ঐ সঙ্কলনে সুরেশচন্দ্রের 'পেস্তার বরফী, নামে একটি গল্পও সংগৃহীত হয়। 'বঙ্কিমচন্দ্র' নামে তিনি একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেন। ঐ গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, অক্ষয় সরকার, শ্রীশ মজুমদার, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, চন্দ্রনাথ বসু, পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির চিন্তাপূর্ণ প্রবন্ধ ছাড়া সুরেশচন্দ্রের 'স্মৃতিকথা' নামক রচনাটিও অন্তর্ভুক্ত হয়।

'সাহিত্য' পত্রিকার প্রসঙ্গে ইতিপূর্ব্বে বলা হয়েছে যে এই পত্রিকা ছিল প্রবীণ ও নবীন উভয় শ্রেণীর লেখকগণের আত্মপ্রকাশের মুখপত্র। এতে যেসব লেখক নিয়মিতভাবে অথবা মাঝে মাঝে রচনা প্রদান করতেন তাঁদের মধ্যে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন, ঈশান বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেন্দ্রনাথ সেন, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রিয়নাথ সেন, নিত্যকৃষ্ণ বসু, গোবিন্দ চন্দ্র দাস, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রজনীকান্ত গুপ্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, প্রসন্নময়ী দেবী, সরোজকুমারী দেবী, কামিনী সেন, প্রমীলা নাগ (বসু), নিখিলনাথ রায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, সখারাম গণেশ দেউস্কর, অক্ষয় মৈত্রেয়, উমেশ বটব্যাল, অক্ষয় বড়াল, অনন্তপ্রসাদ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেন্দ্রকুমার রায়, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রমথ চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন সিংহ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বঙ্গদর্শন' এ বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ছিলেন সব লেখকগণের মধ্যে উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক বা কেন্দ্রবিন্দু, 'সাহিত্য' পত্রিকায় সুরেশচন্দ্রও ছিলেন এই সকল লেখক-সমাজের মধ্যমণি।

সুরেশচন্দ্রের 'সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদকীয় বৈশিষ্ট্য কি তা জানতে হলে সুদীর্ঘ ত্রিশবছর ধরে যে অক্লান্ত অধ্যবসায়, আত্যন্তিক নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি সাহিত্যের নানা অনাচার, কুসংস্কার ও কুরুচির বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করে গিয়েছেন তার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে হবে। 'সাহিত্য' পত্রিকার সূচনায় তিনি ঘোষণা করেছিলেন :

"বাংলা সাহিত্যের সেবার জন্য 'সাহিত্যের' জন্ম হইল। জাতীয় শ্রীবৃদ্ধিসাধন আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। যাহা কিছু সত্য ও সুন্দর 'সাহিত্যে' আমরা তাহারই আলোচনা করিব।" বলাবাহুল্য এই প্রতিশ্রুতি তিনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। একদিকে প্রাচীন রক্ষণশীল সমাজব্যবস্থার অনুগমন ও কুসংস্কারের বেড়াজাল, অন্যদিকে নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায়ের চিরাগত ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার প্রতি বিদ্বেষ ও অনাস্থা এই দুইয়ের পরস্পরবিরোধী ধারার সংঘাতে দেশের বিভ্রান্ত যুবকসমাজ যখন 'ন যযৌ নতস্থৌ' অবস্থায় বিমূঢ় হয়ে পথের অনুসন্ধান করছিলেন সুরেশচন্দ্র তখন তাঁর

'সাহিত্য' এর মাধ্যমে বাংলাদেশের সেই কর্ম বিমুখ যুবসমাজকে দেশগঠনের আহ্বান জানালেন। পূর্ব্বতন আচার্য্যদের পথ অনুসরণ করুন। জাতীয় জীবনের উন্নতি সাহিত্যসাপেক্ষ একথা সর্ব্ববাদিসম্মত। দেশের শিক্ষিত যুবকগণ যদি সেই জাতীয় জীবন গঠনের জন্য প্রাণপাত না করেন তবে আর কে করিবে?'

বস্তুতঃ সুরেশচন্দ্রের আহ্বানে দেশের শিক্ষিতগণ আন্তরিক সাড়া না দিলে বাংলা সাহিত্যের অগ্রগতি ত্বরান্বিত হত না এবং পাঠকসমাজে 'সাহিত্য' পত্রিকাও সমাদর লাভ করত না।

'সাহিত্য' পত্রিকার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য এইযে মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় নিয়মিতভাবে ছোট গল্প প্রকাশ করার রীতি সুরেশচন্দ্রই প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। এই কথার প্রমাণস্বরূপ একটি উক্তি উদ্ধৃত হল:

"আমার যেন মনে হইতেছে 'সাহিত্য' সম্পাদক মনস্বী শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় ছোটগল্প সর্ব্বপ্রথম মাসিকপত্রের হাটে আমদানী করেন। তাঁহার সম্পাদিত 'সাহিত্য' পত্রে তাঁহার লিখিত 'প্রাইভেট টিউটর' এই রকমের [ফরাসী অনুসরণে] ছোট গল্পের অগ্রদূত। সেই সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্ববিজয়ী রবীন্দ্রনাথ এই ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন এবং সেই 'কাবুলীওয়ালা' হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত এই ক্ষেত্রে সর্ব্ববাদিসম্মতক্রমে সর্ব্ব প্রধান আসন অলঙ্কৃত করিয়া আসিতেছেন [জলধর সেন, উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণ, মানসী, বৈশাখ ১৩২২]

কেবলমাত্র ছোট গল্পই নয় বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ গল্পের প্রথম প্রকাশ 'সাহিত্য' থেকে সূচিত হয়। প্রমথ চৌধুরী মূল ফরাসী থেকে 'ফুলদানী' নামক যে অনুবাদ-গল্প রচনা করেন বাংলা সাহিত্যে তাই প্রথম অনুবাদগল্প। এরপর নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়, মোপাসাঁ, হাইনে, পীয়েরলোতি প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত গল্পকারদের রচনার ইংরাজী অনুবাদ থেকে বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করে বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করেন।

'সাহিত্য' পত্রিকার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কি এই প্রশ্ন করলে; পাঠকমহলে হয়তো নানাপ্রকার বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে; কিন্তু একটি বিষয়ে সকলেই একমত হবেন সেটি হল এর সমালোচনা রীতি ও পদ্ধতি। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' থেকেই প্রথম রীতিসম্মত বা বিধিসম্মত সমালোচনার সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়। পরে অল্পবিস্তর সব পত্রিকায় সেই ধারার অনুশীলন চলে। সুরেশচন্দ্র সম্পাদিত 'সাহিত্য' কেবল মাত্র সেই ধারার অনুশীলন ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু প্রদর্শন করতে অগ্রসর হন। তাঁর 'সাহিত্য' এর তিনটি বিভাগ 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা', 'সহযোগী সাহিত্য' এবং 'এমাসের বহি' বাংলা পত্রিকার সম্পাদনাক্ষেত্রে নতুন পথের পথিকৃৎ বললে অত্যুক্তি হবেনা। এই তিনটি বিভাগের সম্বন্ধে আলোচনার পূর্বে 'সাহিত্য' পত্রিকায় বিভিন্ন খ্যাতনামা লেখকগণের যেসব আলোচনামূলক রচনা প্রকাশিত হয়েছিল দৃষ্টান্তস্বরূপ সেই বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বললে আশা করি তা অবান্তর হবেনা।

হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'রৈবতক কাব্য' (সাহিত্য ১ম বর্ষ) নবীনচন্দ্রের কাব্যত্রয়ীর দ্বিতীয় কাব্যের একটি উৎকৃষ্ট সমালোচনা। 'নব্যভারত' পত্রিকার কোনও এক সংখ্যায় জনৈক সমালোচক নবীনচন্দ্রের 'কুরুক্ষেত্র' কাব্যটিকে মৌলিকতাবিহীন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্রের' অনুকারীরূপে বর্ণনা করেন। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত 'সাহিত্য' [ফাল্গুন ১৩০০] পত্রিকায় 'কুরুক্ষেত্র ও নব্যভারত' নামে একটি সুদীর্ঘ রচনা প্রকাশ করে 'নব্যভারত' এর সমালোচকের যুক্তিখণ্ডন করেন। এ ছাড়া পরের বছর কার্ত্তিক সংখ্যায় 'কুরুক্ষেত্র' সম্বন্ধে বিশদ সমালোচনায় প্রবৃত্ত হন। 'সাহিত্য' এর তৃতীয় বর্ষে প্রকাশিত 'কালিদাস ও সেক্সপীয়ার নামক রচনাটি দুই কবি-প্রতিভার তুলনামূলক বিচারভঙ্গীর একটি মূল্যবান সংযোজন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'কবিকঙ্করাম' (জ্যৈষ্ঠ ১৩০০) যেমন লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক, তেমনি দ্বিজেন্দ্রনাথের 'কালিদাস ও ভবভূতি' (১৩১০) উভয় কবির কাব্যরস বিচারের উৎকৃষ্ট নমুনা। এছাড়া গিরীন্দ্রমোহিনী দাসীর 'মানসী' এবং 'রাজা ও রাণী,' গিরীজাপ্রসন্ন রায়ের

'সাইলাসমার্নার,' সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সূর্য্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী,' 'কপালকুণ্ডলা ও মিরান্দা' বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের' কবি ও সেন্টিমেন্টাল,' ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ওয়াল্ট হুইটম্যান,' ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 'কবিবর রোবার্ট ব্রাউনিং সাহিত্য' এর দ্বিতীয় বর্ষে প্রকাশিত কয়েকটি উপভোগ্য আলোচনা। অতঃপর বিভিন্ন বর্ষে যসব সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে তার সুদীর্ঘ তালিকা তারা এই প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত না করে যেসব রচনা তৎকালীন লেখকগণের মৌলিক চিন্তাশক্তির ও মননশীল সবিশ্লেষণের এবং বিচিত্রধর্ম্মী মূল্যায়ণের সাক্ষ্য বহন করছে তার নমুনাহিসেবে নিত্যকৃষ্ণ বসুর 'সাহিত্য সেবকের ডায়েরী' প্রমথনাথ বসুর 'কল্যাণী ও চন্দ্রশেখর' শাহ্‌সেনের 'বঙ্গসাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থা,' ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্কিমবাবু সম্বন্ধীয় স্মৃতি' নবকৃষ্ণ ঘোষের 'বিহারীলাল ও অক্ষয়কুমার' এবং 'সাজাহান নাটক,' পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,' কালীপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘরে বাইরে,' যতীন্দ্রমোহন গুপ্তের 'সাহিত্যে স্বাস্থ্যরক্ষা,' বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের 'রাধা মাধব' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। 'সাহিত্য' পত্রিকার দীর্ঘ যাত্রাপথে এই ধরনের বহুমূল্যবান রচনার আত্মপ্রকাশ ঘটে যেগুলির সব গ্রন্থাকারে প্রকাশিত না হওয়ায় নাটকের পরিচয় লাভের সুযোগ হবে না।

অতঃপর 'সাহিত্যে'-এর তিনটি বিভাগ সম্বন্ধে আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাক। প্রথমেই উল্লেখযোগ্য 'সহযোগী সাহিত্য বিভাগ'। এই বিভাগে সম্পাদক স্বয়ং এবং তাঁহার অন্যতম সহকর্ম্মী পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিমাসেই সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ অথবা রাষ্ট্রকে অবলম্বন করে তার বিভিন্ন দিক নিয়ে মৌলিক আলোচনা পরিবেশন করতেন। এই আলোচনার বিষয় কেবলমাত্র আমাদের দেশকে কেন্দ্র করেই অভিব্যক্ত হ'ত তাতে বিশ্বের সকল দেশের প্রধান সমস্যাগুলি স্থান লাভ করে। 'সহযোগী সাহিত্য' বিভাগের আলোচনাগুলি কিরূপে চিত্তাকর্ষক হত তার নমুনাস্বরূপ একটি অংশ উদ্ধৃত হল : "মাসিক পত্রে মাসে মাসে ছোট গল্প দিবার চেষ্টা প্রথম 'সাহিত্য' হইতে আরম্ভ। সাহিত্যশিল্প হিসাবে ছোট গল্পের মূল্য এখনও আমরা ঠিক বুঝিতে পারি নাই। কবিতা যেমন হৃদয়ের একটা ভাব বা আবেগ প্রকাশের চেষ্টা করে, ছোটগল্প সেইরূপ জীবনের একটা ঘটনা বর্ণনার চেষ্টা করে। বিচিত্র সুখ দুঃখ, হর্ষবিষাদ, উত্থান-পতন, সংঘাতময় জীবনে একটা ছোট ঘটনা অধিক প্রাধান্য পাইবার উপযোগী নাও হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে সেই প্রাধান্যদানই গল্প রচনার কৌশল। ফরাসীগল্প প্রকৃত শিল্প; ইংরাজী গল্প শিল্প-চাতুর্য্যবিহীন বাক্যস্তূপ মাত্র। বহু দোষ সত্ত্বেও কিপলিংএর ছোট গল্পগুলি প্রকৃতই শিল্প-কার্য্য। [সহযোগী সাহিত্য (কিপলিং) সাহিত্য নবম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১৩০৫]

'এ মাসের বহি' সাহিত্য পত্রিকার একটি উপভোগ্য বিভাগ। আমাদের দেশে মাসিক পত্রিকায় সাধারণতঃ পুস্তক সমালোচনা নামে যে অতি সংক্ষিপ্ত নিন্দা এবং প্রশংসার অতিশয্যপূর্ণ পরিচিতি প্রকাশিত হতে দেখা যায় 'সাহিত্য' এর 'এ মাসের বহি' তা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বস্তুত, যেসব পুস্তকের সমালোচনা একদিন সাহিত্য' এর পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়েছিল, আজ তার থেকে অর্দ্ধশতাব্দীকাল উত্তীর্ণ হয়ে এসেও পাঠক যদি পুনরায় সেই অভিমত ও বিচারপদ্ধতির প্রতি স্মৃতির রোমন্থন করেন তাহলে তাঁরা আশ্চর্য্য হবেন এই দেখে যে অতীতের সেই মতামতগুলি সজীবতায় ও অভিনবত্বে প্রোজ্জল হয়ে আছে। প্রথম যখন 'এ মাসের বহি' আরম্ভ হয় (মাঘ ১৩০০) সেইসময় সম্পাদক সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনাবলী 'সঞ্জিবনীসুধার' সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন : 'প্রতিমাসে উৎকৃষ্ট ও আলোচনার উপযুক্ত গ্রন্থ 'এ মাসের বহি' প্রবন্ধে পরিচিত হইবে। 'সঞ্জীবনী সুধা' ব্যতীত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের 'ছেলে খেলা,' যোগীন্দ্রনাথ সরকার সঙ্কলিত 'খুকুমণির ছড়া' (সাহিত্য, ভাদ্র ১৩০৬) অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত 'শ্রীচৈতন্য

ভাগবত (সাহিত্য বৈশাখ ১৩০১) চন্দ্রশেখর কর প্রণীত 'সেকাল ও একাল' (সাহিত্য ভাদ্র—১৩২৭) দীনেন্দ্রকুমার রায়ের 'পিশাচ পুরোহিত' (ভাদ্র ১৩১৮) ইত্যাদি গ্রন্থের সমালোচনায় সুরেশচন্দ্র গভীর বিচারবুদ্ধি ও রসবিশ্লেষণের মৌলিকতার পরিচয় দেন।

'সাহিত্য' পত্রিকার সবচেয়ে মূল্যবান বিভাগ এবং সম্পাদক সুরেশচন্দ্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা।' এই বিভাগে সে যুগের সমস্ত পত্রিকার (মাসিক ও সাপ্তাহিক) রচনার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচার ও বিশ্লেষণ থাকত।

যেসব পত্রিকার রচনা আলোচনার অন্তর্ভূত হত তাদের নাম—তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, সাধনা, ভারতী, নব্য ভারত, বান্ধব, উদ্বোধন, প্রদীপ, প্রবাসী, অনুসন্ধান, নবপ্রভা, আরতি, পূর্ণিমা, সুধা, ভারত মহিলা, ভারতবর্ষ, বসুমতী ইত্যাদি।

অনেকের ধারণা 'মাসিক সাহিত্য সমালোচনা' বিভাগে সুরেশচন্দ্র কেবলমাত্র প্রতিকূল আলোচনা বিরুদ্ধ সমালোচনাকেই প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু যাঁরা নিয়মিত সাহিত্য পত্রিকার সংখ্যাগুলি পাঠ করেছেন তাঁদের নিশ্চয়ই বুঝিয়ে দিতে হবে না যে সুরেশচন্দ্র কখনও প্রকৃত গুণীকে সমাদর করতে কার্পণ্যবোধ করেননি। সাহিত্যের মৌলিক আদর্শ ও সৃষ্টিধর্ম থেকে স্খলন দেখলে তিনি ক্ষুরধার লেখনীর আঘাতে অবশ্যই তিরস্কার করতেন। কিন্তু যেখানে সত্যের প্রতিষ্ঠা শিবের প্রচার এবং সুন্দরের প্রকাশকে অব্যাহত দেখেছেন সেখানে তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে প্রশংসায় মুখরিত করেছেন। কয়েকটি দৃষ্টান্ত থেকে এই উক্তির যাথার্থ নিঃসংশিত হবে।

১৩০০, চৈত্র সংখ্যা 'সাধনার' রচনা আলোচনা-প্রসঙ্গে বলেছেন: "এবারকার' সাধনায়' সর্ব্বপ্রধান ও সর্ব্বশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজসিংহের সমালোচনা। লেখক প্রবন্ধটিকে সমালোচনা বলিতে সম্মত নন। কিন্তু উপন্যাসের এমন উপন্যাসবৎ সুমিষ্ট সমালোচনা আমরা ইতিপূর্ব্বে আর দেখি নাই। রাজসিংহের অনেক প্রচ্ছন্ন সৌন্দর্য্য রবীন্দ্রবাবু এমন কৌশলসহকারে ধীরে ধীরে ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা কেবল তাঁহার ন্যায় সৌন্দর্য্যের ঐন্দ্রজালিকের পক্ষেই সম্ভব।"

"এবার ফিরাও মোরে" শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি চিন্তাপূর্ণ কবিতা।" (১৩০১ বৈশাখ) সংখ্যায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' সম্বন্ধে 'সাহিত্য' এই মন্তব্য প্রকাশ করে ছিল। এবারকার 'সাধনায়' সর্ব্বপ্রধান প্রবন্ধ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বঙ্কিমচন্দ্র'। বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এ পর্য্যন্ত যিনি যাহা বলিয়াছেন বা লিখিয়াছেন রবীন্দ্রবাবুর 'বঙ্কিমচন্দ্র' তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বঙ্কিমবাবুর বিষয়ে আমরা এরূপ রচনা দেখিতে পাইব, সে আশা ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রবাবু বাংলা সাহিত্যের মুখ রাখিয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যমূর্ত্তির উজ্জ্বল নিখুঁত চমৎকার ছবি আঁকিয়াছেন। আমরা সকলকে রবীন্দ্রবাবুর বঙ্কিমচন্দ্র পড়িতে অনুরোধ করি। এরূপ প্রবন্ধ ভাষার গৌরব। (সাহিত্য ১৩০১ জ্যৈষ্ঠ্য।

'সোনারতরী' প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র লিখেছেন "আমরা বহুদিন এমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রকৃত কবিতা পড়ি নাই।... ইহার কবিত্ব ও সৌন্দর্য্য রচনাতীত, তাহা কেবল হৃদয় দিয়ে অনুভব করা যায়। তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা দুরূহ। বিদায় অভিশাপ নাটিকা সম্বন্ধে বলেছেন: 'বিদায় অভিশাপ' শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি দীর্ঘ কবিতা। দুইটি মাত্র চরিত্র ও বিদায়ের দৃশ্য লইয়া নাটকীয় প্রথায় রচিত। কচ ও দেবযানী ইহার নায়ক। এই ক্ষুদ্র নাট্যকাব্য পড়িয়া আমরা তৃপ্ত হইয়াছি। বাঙ্গলা সাহিত্যের সৌভাগ্য কল্পনা করিয়া তৃপ্ত হইয়াছি। রবীন্দ্রবাবু কচের চরিত্র মহাভারত অপেক্ষা উন্নত করিয়াছেন। ভাষা ও ছন্দ এমন অবলীলাকল্পিত যে দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এক একটি বর্ণনা ও চিত্র যেন প্রকৃতির ফটোগ্রাফ। তাঁহার মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণ-শক্তি প্রশংসনীয় এবং উপভোগের যোগ্য।

১৩০১ সালের বৈশাখ সংখ্যা নব্যভারত পত্রিকায় সম্পাদক দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী 'ত্রয়োদশ শতাব্দী' নামে

একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত করেন। এই প্রবন্ধটিকে কেন্দ্র করে সে যুগের শিক্ষিতসমাজে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। সুরেশচন্দ্রও তাঁর পত্রিকায় এই অভিমত প্রকাশ করেন: "লেখক পুঞ্জ ঘটনা সংগ্রহ করিয়া প্রবন্ধটি পূর্ণ ও দীর্ঘ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ইহাতে নূতন, শিক্ষাযোগ্য বা জ্ঞাতব্য কথা একটাও নাই। বিষয় বিস্তৃত কিন্তু লেখকের শক্তি সঙ্কীর্ণ। কাজেই প্রবন্ধটি অকাল কুষ্মাণ্ডে' পরিণত হইয়াছে। আর একটি বিচিত্র সংবাদ পাঠকেরা শুনিয়া রাখুন। নব্য ভারত 'সম্পাদক' ত্রয়োদশ শতাব্দী প্রবন্ধে দাশু রায় পর্য্যন্ত অনেকের নাম করিয়াছেন, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের গৌরব, গীতিকবিদের শিরোমণি, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম করেন নাই। ইহার কোনও নিগূঢ় কারণ আছে কি? নবযুগের বাঙলা সাহিত্য হইতে যিনি রবীন্দ্রবাবুর প্রতিভা বাদ দেন আমরা মৃদু বাক্যে বলিতেছি—'তাঁহার জন্য দাশু-রায়ের পাঁচালী ব্যবস্থা' বাঙলা সাহিত্যের আলোচনা করিবার যোগ্যতা তাঁহার এক বিন্দুও নাই।"

সুরেশচন্দ্রের প্রতিকুল সমালোচনা এক সময় সাহিত্য-ক্ষেত্রে এমন সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল যার ফলে অনেক খ্যাতনামা লেখকের রচনাও পাঠকগণ কর্ত্তৃক নিকৃষ্ট বিবেচনায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। সেইসময় এক শ্রেণীর ভিন্নপন্থী আলোচক সুরেশচন্দ্রের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করলে তার প্রত্যুত্তরে লিখেছিলেন: "সাহিত্যের সমালোচনা সময়ে সময়ে উগ্র, তীব্র ও তীক্ষ্ণ হইতে পারে, হইয়াই থাকে, হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তাহার উপাদান ও অভিপ্রায় কখনও নিছক নিন্দা ও নিরবচ্ছিন্ন স্তবস্তুতি নহে; সর্ব্বোপরি তাহার সমালোচনা যে কখনও অনুরাগসঞ্জাত নহে, ইহাও অপক্ষপাতী বিচারকগণ স্বীকার করিতে কখনই কুণ্ঠিত হইবেন না। সুখ্যাতির স্থলে 'সাহিত্য' মুক্তকণ্ঠেই সুখ্যাতি করিয়া থাকে, পক্ষান্তরে কর্ত্তব্যানুরোধে দোষ দর্শাইতেও সে সঙ্কুচিত হয় না। 'সাহিত্য' সাহিত্যা-ধিকার ভিন্ন অপর কোনও অধিকারেই কখনও কাহারও সমালোচনা করে না। (সাহিত্য-১৩০৮ চৈত্র)

সুরেশচন্দ্রের সমদৃষ্টি নিরপেক্ষ রসবিচার শক্তির পরিচয় প্রদান করার জন্যই অক্ষয়কুমার মৈত্রের মহাশয় লিখেছিলেন। "সাহিত্যে' ভণ্ডামী ছিল না বলিয়াই গোঁড়ামী তাহাকে সঙ্কীর্ণ নীতিতে গণ্ডীবদ্ধ করিতে পারে নাই। বিদেশের সাহিত্য যাহা কিছু ভাল বাহির হইত বিদেশী বর্জ্জনের আন্দোলনের দিনেও তাহা সাদরে সাহিত্যে স্থানলাভ করিত। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদক ছিলেন সাহিত্যগত প্রাণ। সাহিত্যকে তিনি সব কিছুরই উপরে আসন প্রদান করিয়াছিলেন।" সুরেশচন্দ্র পারিবারিক পরিচয়সূত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে দৌহিত্র সম্পর্কিত ছিলেন। মাতামহের আদর্শ, নিষ্ঠা, অক্লান্ত দেশসেবা তাঁকেও বহুলাংশে অনুপ্রাণিত করেছিল। বর্ত্তমান বছরই সুরেশচন্দ্রের জন্মশতবর্ষ পূর্ত্তির শুভ লগ্নে সমুজ্জ্বল। অতএব এই বছরে সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ যদি তাঁর অপ্রকাশিত রচনা ও টীকাটিপ্পনী ও মন্তব্যগুলি একত্রিত করে পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে অগ্রণী হন তবেই সুরেশচন্দ্রের প্রতি সর্ব্বাপেক্ষা সম্মান প্রদর্শনের গৌরব অর্জ্জন করবেন।—

রবীন্দ্র-সাহিত্যে বৈষ্ণবকাব্যের প্রভাব

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

বৈষ্ণবকাব্যের এক সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়েছে বাংলার পরবর্তী সাহিত্যের উপর। বৈষ্ণবকাব্যই হচ্ছে একমাত্র উৎস, যেখান থেকে যথেচ্ছ আহরণ করা সম্ভব এবং এই আহরণও যথার্থভাবে সুধাসংকেতবাহী। বাংলা-সাহিত্যে পূর্বসূরীত্বের গৌরব যদি কাউকে দিতে হয় তবে বৈষ্ণবকাব্যসাহিত্যই সর্ব্বাগ্রে তার দাবী রাখবে। পরবর্ত্তী সাহিত্যিকদের সাহিত্যসাধনায় বৈষ্ণবসাহিত্যই একমাত্র দিকদিশারীর সুকঠোর দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে যা সম্ভব হয়নি অনেক কষ্ট করেও, বৈষ্ণবসাহিত্য তা' সম্ভব করে তুলেছে অতি সহজেই।

সাহিত্যের যে মূল প্রেরণা প্রেম, সেই প্রেম সম্পর্কেও বৈষ্ণবসহজিয়াদের যে ধারণা সেই ধারণাই পরবর্ত্তী সাহিত্য-সেবীদের ব্যাপক অংশকে প্রভাবিত করেছে। এর অবশ্যই একটা কারণ আছে। কারণ হলো এই যে, অধুনা সাহিত্যিকরা প্রেমকে দেহজসীমায় আবদ্ধ না রেখে তাকে বিশ্বজনীন করবার দিকেই অধিক পক্ষপাতিত্ব করে থাকেন। সংস্কৃতকাব্যে প্রেমের এই বিশ্বমিলন রস (?) নেই। সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে ভোগরসের লালসা। কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্যে প্রেম দৈহিক আকাঙ্খার পারাবার পার হয়ে প্রীতিরসের পূর্ণ উপলব্ধির মধ্যে নিমগ্ন হয়েছে।

রবীন্দ্রসাহিত্যেও প্রেমসাধনা দেহকে অতিক্রম করে চিত্তলোকে উত্তীর্ণ হয়েছে। তারপর সে সাধনা ভেতর থেকে বাইরে, যুগল থেকে বিশ্বে, আদ্যকাল থেকে অনন্তকালের উপলব্ধির তটে পৌছেছে। এর ফলেই কবি বলতে পেরেছেন—

> "তুমি প্রশান্ত চির নিশিদিন
> আমি অশান্ত বিরামবিহীন,
> চঞ্চল অনিবার,
> যতদূর হেরি দিকদিগন্তে তুমি আমি একাকার।"

বৈষ্ণবদের মতন রবীন্দ্রনাথেরও উপলব্ধি—প্রণয়াস্পদের প্রেমের ছায়া প্রণয়িনীকে অতিক্রম করে সমস্ত জগতে ছড়িয়ে পড়ে। এই উপলব্ধিই মানসীর কবিতায় রূপ লাভ করেছে।

অতি শৈশবকাল থেকেই রবীন্দ্রনাথ পদাবলীসাহিত্যের সুমধুর রাগিণীতে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। গোপী-প্রেমের আদর্শ রবীন্দ্রমানসে ফেলেছিল এক শান্তশীতল ছায়া। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন—

"Fortunately for me a collection of old lyrical poems composed by the poets of the Vaishnava Sect came to my hand when I was young. I became aware of some underlying depth in the obvious meaning of these love poems, I felt the joy of an explorer who suddenly discovers the Key of the language lying hidden in the hieroglyphs which are beautiful in themselves. (Religion of Man)"

এই আকর্ষণ থেকেই কবি তাঁর তরুণ বয়সে রচনা করেছিলেন ভানুসিংহের পদাবলী। রবীন্দ্রসাহিত্যে বহুমুখী প্রভাবের মধ্যে বৈষ্ণবকাব্যের প্রভাব তাই এক বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বৈষ্ণবকাব্যের নায়ক শ্রীকৃষ্ণ বহুবল্লভ; রবীন্দ্রকাব্যের নায়ক বিশ্বপ্রেমিক। বৈষ্ণবসাহিত্যের মূলকথা পরকীয়া প্রেম। রবীন্দ্রকাব্যেও পরকীয়া প্রেমতত্ত্ব বর্ত্তমান। বৈষ্ণব-কাব্যে দৈহিক সৌন্দর্য্যের বর্ণনা আছে, বল্লভের সঙ্গে মিলন আছে, আর আছে বিরহ। বৈষ্ণবকাব্যে দেখি শ্রীকৃষ্ণদেহের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গোপীকুলকে বিমুগ্ধ করেছে এবং প্রধানা গোপী শ্রীরাধিকা তার দেহের তরঙ্গ দিয়ে, যৌবনের মাদকতা দিয়ে, অঙ্গের ভঙ্গিমা দিয়ে প্রিয়তমকে চঞ্চল এবং নিজেকে ভোগ্যা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথও লিখেছেন—

"ফেলগো বসন ফেল—ঘুচাও অঞ্চল।
পর শুধু সৌন্দর্য্যের নগ্ন আবরণ
সুর বালিকার বেশ কিরণ বসন।
পরিপূর্ণ তনুখানি—বিকচ কমল ;
জীবনের যৌবনের লাবণ্যের মেলা।
বিচিত্র বিশ্বের মাঝে দাঁড়াও একেলা।"

এইভাবে দয়িতাকে যে নগ্ন হয়ে দয়িতের কাছে আসতে হয়, একথা বৈষ্ণবপদকর্তারা বারবার বলেছেন। গোবিন্দদাস লিখেছেন—

"কণ্ঠে ভূষন কলঙ্কের হার, নাসার ভূষণ গন্ধ।
পীরিতি ভূষণ প্রতি তনুমন, কহয়ে দাস গোবিন্দ।"

বৈষ্ণবসাহিত্যের এই যে দয়িত মিলনের তত্ত্ব, এ তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের উপন্যাসগুলিতে বিশেষ ছায়াসম্পাতিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে
চলবে না,
এবার হৃদয় মাঝে লুকিয়ে বোসো,
কেউ জানবে না, কেউ বলবে না"

উল্লিখিত ছত্রটিতে বৈষ্ণব ঢঙ রয়েছে। এতে মধুর রসের সাহায্যে প্রিয়ার উৎকণ্ঠা নিয়ে ভগবানকে ভাববার, খুঁজবার এবং পাবার প্রচেষ্টা আছে। রবীন্দ্রকাব্যে বৈষ্ণবীয় সুর ও গমক রয়েছে সুপ্রচুর। কোথাও বৈষ্ণবসাহিত্যের ললিতমধুর ভাব থেকে কবি আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন নি। তিনি ভগবানকে বলবার অধিকার পেয়েছেন—

"সখা তোমার হাওয়া লাগল হিয়ায়
তবু কি প্রাণ গলবে না?"

কিংবা—

"মুখ ফিরিয়ে রব তোমার পানে
এই ইচ্ছাটি সফল কর প্রাণে।"

অথবা—

"আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরাণ সখা বন্ধু হে আমার"

এই যে প্রিয়ার মাধুর্য নিয়ে ভগবানকে ডাকা, বলাই বাহুল্য, এ বৈষ্ণব-প্রভাবেরই ফলশ্রুত।

গীতাঞ্জলির কবি গেয়েছেন—

আমার মাথা নত করে দাও হে,
তোমার চরণ ধূলার পরে,
সকল অহঙ্কার আমার
ডুবাও চোখের জলে......"

এ যেন প্রকৃত বৈষ্ণবেরই কথা। অভিমান ও অহঙ্কারকে বিসর্জন না দিলে ভগবানের প্রসাদ নামবে না অন্তরে। তারপর যেখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"কেন চোখের জলে ভিজিয়ে
দিলাম শুকনো ধূলো যত?
কে জানিত আসবে তুমি গো
অনাহূতের মতো?"

সেখানে বৈষ্ণবহৃদয়ের গভীর আর্তিই প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রিয়তমের মাহাত্ম্য বর্ণনে বৈষ্ণবপ্রভাবে বিশেষ প্রভাবিত হয়েছেন। শ্রীরাধিকা যখন বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হয়ে কদম্বের মূলে শ্রীকৃষ্ণদর্শনে অধীরা হলেন, সেই অবস্থা বর্ণনা করতে যেয়ে চণ্ডীদাস লিখলেন—

"পুলকে পূরয়ে অঙ্গ আঁখে ঝরে জল
তাহা নেহারিতে আমি হই যে বিকল।"

রবীন্দ্রনাথও সেই গোপীভক্তের মতনই বলেছেন—

"আমার দুটি মুগ্ধ নয়ন
নিদ্রা ভুলেছে।
আজ আমার হৃদয় দোলায়
কে গো দুলিছে।
দুলিয়ে দিল সুখের রাশি
লুকিয়ে ছিল যতেক হাসি,
দুলিয়ে দিল জনমভরা
ব্যথা-অতলা।"

রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণবকাব্যের যে প্রভাব দেখা গেছে তা' প্রধানত গীতিকবিতার ক্ষেত্রেই প্রবহমান হয়েছে। রবীন্দ্র-

নাথের সাহিত্যাদর্শনে বৈষ্ণবপ্রভাব মুখ্য হয়ে দেখা দিতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের প্রকৃতি ও নিসর্গবিষয়ক রচনাকে বহুলাংশে অনুসরণ করেছেন সত্য, কিন্তু দুর্বলের অন্ধ ও অক্ষম অনুকৃতির মালিন্য কোথাও তাঁকে স্পর্শ করতে পারে নি। রবীন্দ্রসাহিত্যে বৈষ্ণবকাব্যের প্রভাব থাকলেও বৈষ্ণব-দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রদর্শনের সুনিশ্চিত পার্থক্য বর্তমান।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবকাব্যের দ্বারা প্রভাবিত হলেও কোথাও আপন ব্যক্তিত্বকে খণ্ডিত করেন নি। বৈষ্ণবপ্রভাব থাকা সত্ত্বেও তাই রবীন্দ্রসাহিত্যের মৌলিকতা অত্যন্ত স্পষ্ট রেখায় বর্তমান।

রাধাপ্রেম ও গোপীপ্রেম একমাত্র পুরুষকে (শ্রীকৃষ্ণকে) অবলম্বন করেই বিকশিত। রবীন্দ্রকাব্যের নায়িকা আপন প্রণয়াস্পদকে খুঁজেছে বিশ্বমানবের মধ্যে, খুঁজেছে সীমা থেকে অসীমের কেন্দ্রে। তিন সঙ্গীর লাবণ্য তাই একটিমাত্র পুরুষের মধ্যে আপনাকে নিঃশেষিত হতে দেখেনি। তার নারীসত্তা বিশ্বমানবের মধ্যে আপনাকে খুঁজেছে। শেষের কবিতার লাবণ্যও অমিতের স্পর্শেই নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। দামিনীর মধ্যেও দেখি দিগন্তপরিভ্রমণের সুদূর কল্পনা। তাই বলছিলাম, বৈষ্ণবসাহিত্যে রয়েছে তন্ময়তা আর রবীন্দ্রসাহিত্যে অন্বেষণ।

প্রকৃতির ভিতরে যে আদানপ্রদান চলেছে নিশিদিন, দিবানিশি বৈষ্ণবপদকর্তাগণ তার সঙ্গে প্রণয়ীহৃদয়ের ব্যথা-বেদনাকে তেমন করে অঙ্গীভূত (?) করেননি। প্রকৃতির সঙ্গে নরনারীর যে আন্তরযোগ রয়েছে, তাকে বৈষ্ণবপদ-কর্তাগণ অনুসন্ধান করেন নি। বৈষ্ণবকাব্যে দয়িতকে পেতেই হবে—তারই আশ্রয়ে প্রেমতত্ত্ব হবে পরিস্ফুট। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে পাওয়ার চেয়ে খোঁজার তাগিদই বেশী। রবীন্দ্রকাব্যের প্রেমসাধনায় মধ্যে মধ্যে সংশয় এসেছে। কিন্তু বৈষ্ণবসাহিত্যে সংশয় দুর্লভ—অভিমানের পদেও কোন সংশয় নেই। বিরহের ব্যথায় রবীন্দ্রনাথ আনন্দের আস্বাদ পেয়েছেন—"পথ চাওয়াতেই আনন্দ।" বৈষ্ণবসাহিত্যের বিরহে এই পথ চাওয়ার আনন্দ নেই।

রবীন্দ্রকাব্যের বিরহের রূপ ও বৈষ্ণবকাব্যের বিরহের রূপ সম্পূর্ণ আলাদা। রবীন্দ্রসাহিত্যে বিরহে বেদনা মুখ্য নয়, বৈষ্ণবসাহিত্যে বেদনাই সার।

বৈষ্ণবকবিতা প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত ও লীলাতত্ত্বের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত ও লীলাতত্ত্বের ভিত্তির উপর তাঁর কাব্যকে দাঁড় করান নি।

বৈষ্ণব মূর্তিবাদী রাধাকৃষ্ণ এক সুন্দর রসঘন বিগ্রহ বলেই বৈষ্ণবেরা তা' অবলম্বন করে আনন্দ পান। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রহস্যময়ের পূজারী।

তাছাড়া শ্রীরাধার সঙ্গে বিশ্বপ্রকৃতিরও তেমন সংযোগ নেই। শ্রীরাধা একজন নায়িকামাত্র। রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব-কাব্য ও অন্যান্য কাব্যের প্রেমের তীব্রতা অটুট রেখে তার মধ্যে বিরাট ব্যাপকতা আনবার চেষ্টা করেছেন

কিন্তু বৈষ্ণবকাব্যে এই বিরাট ব্যাপকতা কোথায় তেমন করে উপস্থিত হয়েছে?

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় বৈষ্ণবপ্রভাব গ্রহণ করলেও গ্রহণ করেননি অন্ধভাবে।

রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবদের ভক্তি চেয়েছেন, চাননি মুক্তি চাননি তাঁদের নামসঙ্কীর্তনের পরিধির ভেতরে সঙ্কীর্ণ হয়ে যেতে। রবীন্দ্রনাথের পথ চলায় তাই ক্লান্তি নেই, শেষ নেই। তিনি অবসর মাগেননি কোথাও। কেবল বারবার জেগে উঠতে চেয়েছেন নব নব রূপে। বৈষ্ণবদের মতন সহজমুক্তি-তত্ত্বের অনুসন্ধান করেননি রবীন্দ্রনাথ। সংসারের সঙ্গে একটা নিবিড় সংযোগই রবীন্দ্রনাথের কবিমানসের নির্মিতি। তিনি বৈষ্ণবদের মতন সংসারপলাতক নন। সংসারের মধ্যে থেকেই তিনি খুঁজেছেন তাঁর অভীষ্টকে, খুঁজেছেন তাঁর বাঞ্ছিতে মুক্তিকে॥

বামপন্থী আর্ট

সরোজেন্দ্র নাথ রায়

সমাজজীবনের সঙ্গে আর্টের সম্বন্ধ যে কতখানি নিবিড় তাহা আমাদের নিকট ক্রমেই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। গত শতাব্দীর শেষ দিক হইতে নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ববিদেরা ইহা লইয়া গবেষণা করিতেছেন ফলে এরূপ তথ্য আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে যাহা আমাদের কল্পনায় বহির্ভূত ছিল। আমাদের কাছে ইহা স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে সমাজের অর্থনৈতিক বিবর্তনের ফলে শ্রেণীভেদ জন্মলাভ করিয়াছে ও শ্রেণীভেদের প্রভাব আর্ট ও সাহিত্যের প্রতি অঙ্গে সুচিহ্নিত।

সভ্যতার আদি যুগে সমাজ শ্রেণীবিহীন ছিল। তখন আর্ট ও সাহিত্য সমাজের সমূহ প্রচেষ্টা ও সাধারণ চৈতন্য হইতে জন্মলাভ করিত। আমরা যাহাকে বলি লোকসাহিত্য ও লোকচিত্র তাহা এই যুগের সৃষ্টি। ইহার কোন বিশেষ স্রষ্টা ছিল না। ইহার কোন জাতি বা বর্ণভেদ ছিল না। ইহা সাধারণ অনুভূতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল ও সর্বসাধারণের উপভোগ্য ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সমাজে পুঁজিদারদের অভ্যুদয় হইল। সঞ্চিত অর্থের বলে এক শ্রেণী অপরের উপর প্রভুত্ব করিতে লাগিল ও মানুষের অনুভূতি ও চিন্তাধারার মধ্যে স্তরভেদ দেখা দিল। ব্যাধ তাহার গিরিগুহার প্রাচীরে মৃগয়ার চিত্র আঁকিতে লাগিল। বৈশ্য রত্নমাণিক্য দিয়া তাহার গৃহ ও অঙ্গের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। এইভাবে ধনিক ও শ্রমিকের আনন্দের উৎস পৃথক হইয়া গেল।

ধনিকের আর্ট ও সাহিত্য সাধারণ জীবন হইতে ক্রমেই সরিয়া যাইতে লাগিল। ক্রমেই ইহা বাস্তবতার সত্যভূমি পরিত্যাগ করিয়া কল্পলোকে প্রবেশ করিতে লাগিল। ধনতন্ত্রবাদ ও ব্যক্তিবাদ (individualism) একই বৃক্ষের দুই ফল। ধনিক তাহার ধনসঙ্কুলের অতৃপ্ত আকাঙ্খায় সমাজের সকল ব্যক্তি হইতে পৃথক হইয়া নিঃসঙ্গ একাকীত্বের মধ্যে বাস করে। তাহার একমাত্র চিন্তা হয় নির্দ্দয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার দ্বারা সকলকে পরাভূত করা। সমাজজীবন হইতে বিচ্ছিন্ন এই মানুষটি সাধারণের আনন্দে আনন্দিত নয়। সাধারণ লোক খাটিয়া খায়। কাঠ কাটে, মাছ ধরে, শিকার করে, ধান রোপে ও ফসল তোলে সকলে এক সঙ্গে আনন্দ উৎসব করে। তাহাদের জীবনের একটা সাধারণ ঐক্য আছে তাহাদের আনন্দের মধ্যেও তাই একটা যোগসূত্র আছে। একটা সামগ্রিক সজীবতা আছে। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সভ্যতা একাকীত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহার মন্ত্র বিদ্বেষ ও ক্রূর প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

জীবনের যাহা সাধারণ উৎস তাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া এই সাহিত্য কৃত্রিম ও প্রাণহীন হয়। ইহার কোন সত্য ভূমি নাই কোন ধ্রুব রূপ নাই। ফলে যুগে যুগে ইহার রূপান্তর সাধিত হয়। লোকসাহিত্য ও লোককলা কিন্তু সকল যুগের ও সকল মানুষের। ধ্রুব সাহিত্যের শাশ্বত উপাদান জীবন—মানবের আদি ও চিরন্তন সুখ দুঃখ, ব্যথা ও আনন্দ। মানুষ যেখানে সমাজজীবনে একত্রে বাস করে, সেখানে সংঘর্ষের মধ্য দিয়া নিত্য নূতন সত্য উদিত হয়। সত্যের এই নবীনতম রূপটি প্রকাশ করাই সাহিত্য ও চিত্রের আসল কাজ। প্রত্যেক সাহিত্যের দুটি দিক আছে—একটি যুগগত, অপরটি চিরন্তন। যাহা কালাতীত নিত্য বস্তু তাহাই সাহিত্যকে বাঁচাইয়া রাখে। যুগে যুগে লোক তাহা খুঁজিয়া বাহির করে। সে আবার নূতনতম রূপে প্রকাশিত হয়। এইভাবে সাহিত্য ও আর্ট অগ্রসর হইতেছে।

ধনতান্ত্রিক আর্ট একটি বিশেষ গোষ্ঠীর, একটি বিশেষ

যুগের। সে ক্রমেই পৃথিবীর দৈনিন্দিন জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মৃত্তিকার স্পর্শ হইতে বহু দূরে বহু উর্দ্ধে গগনচুম্বী মিনারশীর্ষে আত্মগোপন করে। ধরার ধূলি সে ঘৃণা করে। টেনিসনের প্যালেস্ অব আর্টে তার একটি প্রতিচ্ছবি আমরা দেখিতে পাই। একজন রস-পিপাসু ব্যক্তি আমাদের ধূলিমলিন পৃথিবীকে অবজ্ঞা করিয়া একটি সুউচ্চ প্রাসাদ রচনা করিল। সেই 'হস্তিদন্ত-মন্দিরে' (ivory tower) সে এক নূতন পৃথিবী রচনা করিল। কক্ষে কক্ষে নানা উপাদানে সজীব পৃথিবীর বিচিত্র কর্ম্মজীবনের প্রাণহীন প্রতিকৃতি রচনা করিয়া সে ভাবিল যে, সে বিশ্বকর্ম্মাকে হারাইয়া দিয়াছে। নক্ষত্রখচিত আকাশের দিকে তাকাইয়া তাহার হৃদয়ে কোন বিস্ময় জাগে না। সৌরমণ্ডলের নকল দৃশ্যে গৃহ সজ্জিত করিয়া সে মুগ্ধ নয়নে চাহিয়া থাকে। নীচে ধরণীর ধূলিতে লুণ্ঠিত পীড়িত মানবসমাজের আকুল ক্রন্দন তার প্রাসাদে পৌঁছায় না। সত্যের সাধক যেখানে আদর্শের সংগ্রামে প্রাণ দেয় সেখানে তার যোগ নাই। সে মুগ্ধ হয় তার চিত্রে—রক্তমাংসস্পর্শহীন চিত্রে। কোন মহৎ সাধনায় এমন কি কোন ব্যর্থ প্রচেষ্টার রক্তাক্ত পথে তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

ধনতান্ত্রিক আর্ট সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর লক্ষ্যে ধাবিত হয়। পৃথিবীর স্থূল স্পর্শ হইতে সযত্নে নিজেকে রক্ষা করিয়া—সে ভাবলোকে বিরাজিত হয়। বিগত শতাব্দীর শেষ পাদে ইংরেজ কবি অস্কার ওয়াইল্ড বলিয়াছেন আর্টের সঙ্গে নীতির কোন যোগ নাই। কেননা মানুষের কর্ম্মই একমাত্র নৈতিক নিয়মের অধীন। আর্ট কোন কর্ম্ম নয়। ইহা অনুভূতির বস্তু। আনন্দই ইহার একমাত্র লক্ষ্য। ওয়াইল্ডের সমকালীন আর্ট-জগতে বিখ্যাত চিন্তানায়ক ও আর্টসমালোচক রজার ফ্রাই মনে করিতেন যে আর্ট কেবলমাত্র গঠনসৌষ্ঠব বা আধারের রূপ (form) লইয়াই ব্যস্ত। ইহাতে আধেয় (content) এর কোন স্থান নাই। জহুরী যেমন নানাবিধ রত্নসমাবেশে অলঙ্কারের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি করে, তাহার যেমন ইহা ব্যতীত আর কোন কিছুতেই দৃষ্টি নাই, তেমন আর্টিষ্ট সেই রত্নকারের ন্যায় একমাত্র আধারকে রূপান্তরিত করিয়া তোলে—বিষয়-বস্তুর প্রতি তার দৃষ্টি নাই। নীতি লইয়া সে কারবার করে না। রূপ দেয় তার নিজস্ব আনন্দ। তার মূল্যের আর কোন মাপ নাই। নিছক সৌন্দর্য্য মানবপ্রচেষ্টা নয়, কাজেই নীতির অধীন নয়। কোন পুস্তকের বিচার্য্য বিষয় ইহা নহে যে ইহা সুনীতি কিংবা দুর্নীতিপরায়ণ। ইহার রচনাকৌশল সুন্দর কিংবা অসুন্দর ইহাই দেখিতে হইবে। এইভাবে জীবন হইতে দূরে সরিয়া গিয়া সাহিত্য একটি কৃত্রিম বস্তুতে পরিণত হয়।

বামপন্থীদের সঙ্গে ধনতন্ত্রীদের এইখানেই গুরুতর মতভেদ। বামপন্থী স্বীকার করে না যে আর্ট শুধু কল্প-লোকের বস্তু—মানবপ্রচেষ্টার পর্য্যায়ভুক্ত নয়। স্বীকার করে না যে রূপের জন্যই রূপের বিচার করিতে হইবে, এবং যেহেতু ইহা মানবীয় কর্ম্মের সমতুল্য নয়, সেই হেতু ইহা কোন নীতির শাসন মানিবে না। সে স্বীকার করে না যে আর্ট একটি গোষ্ঠীর (coterie) উপভোগ্য বস্তু মাত্র—গোষ্ঠীর রুচি হইতে উদ্ভূত—গোষ্ঠীর আনন্দদানের জন্য। সে বিশ্বাস করে আর্ট সর্বজনীন, সকলের জন্য সকলের রচিত। ইহাতে কোন গণ্ডীর ছাপ নাই। যতদিন সমাজে শ্রেণীভেদ আছে ততদিনই আর্ট এক একটা গণ্ডীর তুষ্টিবিধান করিবে। কিন্তু সাম্যবাদের প্রভাবে যখন সমাজ শ্রেণীবিহীন হইবে, মানুষে মানুষে সমতা প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন আর্ট হইবে সকলের। সকলেই চিত্র আঁকিবে ও সকলেই কবিতা রচনা করিবে। আর্ট সুন্দর করিয়া চিত্র আঁকিবার পদ্ধতি নয়, কিন্তু সুন্দরের চিত্র অঙ্কন।

মার্কসবাদীদের মতে জীবন আর্ট হইতে শ্রেষ্ঠ। রুচিবাগীশদের মতে জীবন হইতে আর্ট শ্রেষ্ঠ। রুচিবাগীশেরা আর্টকে জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ কল্পলোকে একটি স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ একান্ত বস্তুরূপে দেখে। তাহার পরিমাপ সে নিজে। তাহার বিচার করিতে হইবে তাহার নিজের ধর্ম্ম বা প্রকৃতি অনুসারে। মার্কসবাদীরা এই মতবাদকে অগ্রাহ্য করে। বিখ্যাত রুশ সাহিত্যিক ও রূপবাগীশ চেনিশেভ্স্কি বলিয়াছেন যে, আর্টের প্রধান কাজ হইতেছে যে জীবনব্যাপারে যে যে বস্তুতে মানুষের আত্মা সাড়া দেয় তাহা প্রকাশ করা। যখন রূপসৃষ্টি-

সম্পন্ন কোন ব্যক্তি জীবনরহস্য বুঝিতে আগ্রহী হয় ও জীবনসমস্যা সম্বন্ধে সে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হয়, তখন তাহার সৃষ্টি জ্ঞাতসারেই হউক অথবা অজ্ঞাতসারেই হউক তাহার আভিমত প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারে না। তাহার উপন্যাস, কবিতা, নাটক বা চিত্র সেই সমস্যার সমাধানে বিমুখ থাকিতে পারে না।

ইহা হইতে ইহাই স্পষ্ট হইতেছে যে, চের্নিশেভ্স্কির মতে সেই সৃষ্টিই শ্রেষ্ঠ যাহা মানবসমস্যার সত্য ও পরিপূর্ণ চিত্র দিতে সমর্থ হয় ও তাহার সমাধানে তৎপর হয়। জীবনচিত্রকে এইভাবে আকারিত করিতে গেলে রূপকারকে এই সব সমস্যাসম্বন্ধে নিজ মতামত প্রকাশ করিতেই হইবে। সুতরাং আর্ট যে নীতিবিহীন—এ দাবী অগ্রাহ্য। চের্নিশেভ্স্কির মতে জীবন বস্তুটি শুধু একটা মধুর স্বপ্ন নয়। সুন্দর ও অসুন্দর উভয়ই ইহার মধ্যে আছে। জীবনকে যাহা রক্ষা করে ও যাহা ধ্বংস করে এই উভয় ধর্মই ইহার মধ্যে নিহিত আছে। জীবন চলমান, প্রগতিশীল। ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে ইহার নিত্যরূপ বিকশিত হয়। দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের (dialectic) মধ্য দিয়া ইহা আপন চরম লক্ষ্য আবিষ্কার করে। সুতরাং সৌন্দর্য্যসৃষ্টির অর্থ শুধু আকৃতিগত রূপরচনা নয়। কিন্তু সেই রূপ প্রকটিত করা যাহাতে বাহ্যরূপ ও আদর্শভাব (idea—'বুদ্ধ্যাকার') এর সমন্বয় হয়। সমস্ত চারুকলার ইহাই লক্ষ্য হওয়া উচিত। তাঁহার মতে সৌন্দর্য্য একটা আকাঙ্ক্ষাবিহীন ভাবনা নয়, কিন্তু কোন একটি বস্তু বা ব্যক্তির রূপ।

এইখানেই মার্কস্‌বাদীদের আসল পার্থক্য। পার্থিব বস্তু লইয়া মার্কস্‌বাদীদের কারবার। সুদূর চিন্তালোকে সে পথ হারাইতে প্রস্তুত নয়। তাছাড়া মানুষের চিন্তা বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। মানুষের চেতনা নিরবলম্বন নয়। চেতনার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ভাষা সৃষ্টি করিয়াছে অন্য মানুষের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে। ভাষা দ্বারা মানুষ জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়। সে যে একাকী নিঃসঙ্গ নয়, তাহার প্রমাণ ভাষাসৃষ্টি। আর্ট আত্মচেতনার একটি প্রকাশ মাত্র। যখনই আর্টের কথা বলি তখনই একটি ব্যক্তি বা বস্তু লইয়া ভাবিতে আরম্ভ করি। নীতি, ধর্ম্ম, অধ্যাত্ম-তত্ত্ব কিছুই শূন্যে অবস্থিত নয়। মানুষে মানুষে যে সম্পর্ক তাহার মধ্যেই ইহাদের জন্ম। মার্কস্ ও এঙ্গেলসের মতে বস্তু ও চিন্তার কোন সম্পর্কচ্ছেদ ধনতন্ত্রের ফলশ্রুতি। অর্থাৎ যেদিন হইতে শ্রমবিভাগের ফলে শারীরিক ও মানসিক শ্রমের মধ্যে ব্যবধান আসিয়া পড়িয়াছে সেইদিন হইতেই ইহার সৃষ্টি হইয়াছে। শ্রমবিমুখ মানুষ অনায়াসলব্ধ সম্পদের উপর বসিয়া চিন্তার কুয়াসা রচনা করিয়াছে। মানবকর্ম্মের ফলে চেতনার উন্মেষ হয়। কিন্তু ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমের সঙ্গে চিন্তার আর কোন যোগ রহিল না। সত্য কর্ম্ম কি সে-চিন্তা না করিয়াই সত্যের চিন্তা আরম্ভ হইল। সংসার হইতে স্বতন্ত্র হইয়া দর্শনশাস্ত্র 'শুদ্ধ' মতবাদ, 'শুদ্ধ' সৌন্দর্য্যবাদ, নীতি ও ধর্ম্মতত্ত্বের চর্চ্চায় নিযুক্ত হইল।

"জার্ম্মান ইডিওলজি" নামক গ্রন্থে মার্কস ও এঙ্গেলস শ্রমবিভাগের ফলে আর্টে যে বিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া বলিয়াছেন। চারুকলা চর্চ্চার জন্য যে প্রতিভা, দৃষ্টি ও অনুরাগ আবশ্যক তাহা অর্থনৈতিক কারণে একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর ব্যক্তিদিগের কুক্ষিগত হইয়াছে। ইহার ফলে কলাচর্চা জনসাধারণ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হইলে সমাজে শ্রেণীবিভাগ থাকিবেনা, সঙ্গে সঙ্গে আর্টেও থাকিবে না তখন আর কোন একজন ব্যক্তি কোন একটি আর্ট লইয়া ব্যস্ত থাকিবে না। যে চিত্রকর সে ভাস্করও হইবে। অথবা আরও কিছু হইবে। আর্ট কিরূপভাবে সঙ্কীর্ণ শ্রেণীগত হইয়া পড়িয়াছে তাহা এইসব বিভিন্ন পেশার নাম শুনিলেই বোঝা যায়। শ্রেণীহীন সমাজে আর চিত্রকর বলিয়া কিছু থাকিবে না—থাকিবে মানুষ যাহারা চিত্র রচনা করিতে জানে। উভয় নেতার মতে ধনতান্ত্রিক সমাজ আর্টের ঘোর শত্রু। এইজন্য উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে যন্ত্রযুগের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে হস্তশিল্প অবজ্ঞাত হইয়াছে ও তাহার ক্রমিক অবনতি ঘটিয়াছে। হস্তশিল্পে শিল্পী স্বাধীন। সে তার মনের আনন্দ নানা বর্ণে, নানা আকারে

প্রস্ফুটিত করিয়া তোলে। কিন্তু যন্ত্রশিল্পে শিল্পী হয়ে দাঁড়ায় সাধারণ একটি পরিচয়হীন শ্রমিক মাত্র। তার সৃষ্টি তাকে আনন্দ না দিয়ে তার চিত্তকে অবসন্ন করিয়া তোলে। নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী নির্মাণের সময় শিল্পীর দুইটি উদ্দেশ্য থাকে: প্রথম, সেই বস্তুটিকে সম্পূর্ণরূপে ব্যবহারের উপযোগী করিয়া তোলা; দ্বিতীয়, তাকে সুন্দর করিয়া তোলা। এইভাবে সৌন্দর্য্যপ্রীতি ও কলাকৌশল সমাজের সকল মানুষের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। কিন্তু ধনতন্ত্রে তাহা ক্ষুদ্রগণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকে ও একমাত্র বিশেষজ্ঞের বিচার-বুদ্ধি ও রুচির দ্বারা পরিচালিত হয়। ইহাতে রচনা-শৈলীর উৎকর্ষ সাধিত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু এই উৎকর্ষের মধ্যেই আবার ধনতন্ত্রের ধ্বংসের বীজ নিহিত আছে। দুর্ভাগ্যের বিষয় ধনতন্ত্রের সমর্থকগণ ইহা বুঝিতে পারে না। যন্ত্র মানুষের শ্রম লাঘব করে কিন্তু যন্ত্রই আবার মানুষকে খাটাইয়া মারে, অনাহারে রাখে। মানুষ যতই উপার্জ্জন করে, মানুষের অভাব ততই বৃদ্ধি হয়। ধনতন্ত্রের জাদুস্পর্শে স্বর্ণের স্তূপ ভস্মে পরিণত হয়। মানুষ প্রকৃতিকে জয় করে বটে, কিন্তু স্বাধীন মানুষ আবার প্রকৃতির ক্রীতদাসে পরিণত হয়। মানস-শক্তির বলে পদার্থের শক্তি বলীয়ান হয় বটে কিন্তু মানুষের চেতনা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। মানুষ যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করে। একদিকে যন্ত্রশিল্প ও বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে অপর দিকে মানুষের ক্লেশ বৃদ্ধি পাইতেছে—সমাজ ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হইতেছে। এইরূপে মানুষের সৃজনী-শক্তি ও তাহার সামাজিক সম্বন্ধের মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হইতেছে। অবশ্য জোড়াতালি দিয়া এই বিরোধের মীমাংসা করার একটা চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু তাহা বৃথা। জনগণের মধ্যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা ও জনতার অভ্যুত্থানের দ্বারাই একমাত্র ইহার অবসান ঘটিতে পারে।

আজ কৃষকের চোখে সৌন্দর্য্যের একরূপ, আর ধনিকের চোখে অন্যরূপ। কৃষক খাটিয়া খায়। সুতরাং কিষাণ সুন্দরীর ছোট ছোট নরম হাত পায়ের কল্পনা সে করে না। লোকসঙ্গীতে এইরূপ বর্ণনা পাওয়া যায় না। উজ্জ্বল স্বাস্থ্য ও সমন্বিত শক্তি তাহাকে সুন্দর করিয়া তোলে। তাহার বর্ণে থাকে উজ্জ্বলতা, দেহে দৃঢ়তা, দৃষ্টিতে বল। শ্রমবিমুখ বিলাসী লোকেদের নিকট ইহা রূপ নহে কুশ্রীতা। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, এই দুই শ্রেণীর সৌন্দর্য বোধের মাপকাঠি পৃথক। এই পার্থক্যের কারণ নিঃসন্দেহে তাহাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ও তজ্জনিত রুচির বিভেদ। জীবনযাত্রার বিভিন্নতা আর্টের লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে। এই পৃথক চাহিদা অনুসারে রূপকার তার রূপ সৃষ্টি করে। ইতিহাসেও তাই যুগে যুগে এই বিরোধের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় সমালোচকদের সমালোচনার মাপকাঠিও তাই পৃথক হয়। এই জন্যই সাহিত্যের স্বরূপ লইয়া এত বিবাদ

লেনিন বলেন যে, একান্ত সত্যের (absolute truth) নিকট পৌঁছিতে অনেক বাধা দেখিতে পাওয়া যায় ইতিহাসে ইহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। আর্টের যাহা লক্ষ্য তাহা যুগে যুগে ভিন্ন আকারে প্রকাশিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু লক্ষ্য একই আছে। আমরা ক্রমেই তাহার নিকট অগ্রসর হইতেছি। ছবির রূপরেখা কালের প্রভাবে ভিন্ন হইতে পারে কিন্তু আদর্শ ভাব(absolute idea) চির স্থির। সৃষ্টির মধ্যে ব্যষ্টি (individual) ও সমষ্টি (totality) পারস্পরিক সত্য (relative truth) ও একান্ত সত্য (absolute truth) এর যে বিরোধ আছে, বিজ্ঞান ও আর্ট তাহার সমন্বয়সাধন করিয়া আসিতেছে। নিত্য নূতন আবিষ্কারের দ্বারা বিজ্ঞান সমগ্রের (whole) অন্তর্নিহিত সত্যরূপ বুঝিতে চেষ্টা করে যতটুকু জানে তাহা আবার পূর্ণতর সত্যের পথ নির্দ্দেশ করে। তাহার আবিষ্কৃত যে-সত্য তাহা আবার কিছুদিনের মধ্যে ম্লান হইয়া পড়ে। আবার সন্ধান আরম্ভ হয়। বিজ্ঞানী আবার নূতন সত্যে উপনীত হয়। তখন পুরাতন সত্য আর গ্রহণীয় থাকে না। এইভাবে আমরা পরিপূর্ণ সত্যের দিকে অগ্রসর হইতেছি। পুরাতন সত্য অনাদৃত হয় বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে চিরন্তনের

অন্তর্নিহিত যে ইঙ্গিত থাকে তাহাই বিজ্ঞানীকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়।

আর্টে কিন্তু অন্যরূপ ব্যবস্থা দেখি। ইহাতেও অবশ্য সত্যের পরিপূর্ণ রূপ দেখিতে পাইনা। মানুষ যুগে যুগে খণ্ডের মধ্য দিয়া অখণ্ডের দিকে চলিয়াছে। কিন্তু সাহিত্যে যার একবার সৃষ্টি হয় তার মৃত্যু নাই—তা সে খণ্ডের রূপই হউক বা অন্য কিছুই হউক। শুধু তা সাহিত্য হওয়া চাই। সময়ে সময়ে আমরা তাহাকে ভুলিয়া যাই বটে কিন্তু তাহার মৃত্যু নাই। ইতিহাসের তরঙ্গ যাহাকে একদিন ডুবাইয়া দেয় আবার আর একদিন তাহাকে নদীতীরে ভাসাইয়া তোলে। লোকে তাহাকে লইয়া আবার আনন্দ করে। সহস্র বিজ্ঞানী একই সত্য আবিষ্কার করে, কিন্তু বিভিন্ন রূপস্রষ্টা একই সত্যকে বহু রূপে প্রকাশিত করে। তাহাদের সৃষ্টি কখনও পুরাতন বা প্রাণহীন হয় না। প্রকৃতির মধ্যে যে নিত্য দ্বন্দ্ব চলিয়াছে বিজ্ঞান নব নব আবিষ্কারের মধ্য দিয়া তাহার সমন্বয় সাধন করিতে চেষ্টা করে, কিন্তু আর্ট তাহার সৃষ্টির মধ্যে ক্ষুদ্র ও বৃহত্তের বিশিষ্ট (Particular) ও সমূহের (General) একত্ব প্রতিষ্ঠিত করে। সমুদয়ের মধ্যে এক ও একের মধ্যে সমুদয় ব্যষ্টির মধ্যে সমষ্টি ও সমষ্টির মধ্যে ব্যষ্টির নিবিড় মিলন হয়। তাই আর্ট চিরকাল বাঁচিয়া থাকে। যে আর্ট ভাবকে (Idea) প্রতিকৃতির (image) মধ্যে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিতে পারে না সে বাঁচেনা। কেননা তাহাতে প্রকৃতির দ্বন্দ্ব (dialectic) সমাধান করিবার কোন চেষ্টা নাই। মার্কসবাদীদের মতে বিজ্ঞানই হউক আর আর্টই হউক সবই ডাইলেকটিক বা ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বন্দ্বের জবাব। একটি ক্ষণিক মুহূর্তে আর্টিষ্ট এই দ্বন্দ্বের সত্যরূপ দেখে ও আর্টে চিরস্থায়ী করিয়া রাখে। এইখানেই তাহার শ্রেষ্ঠত্ব। আর্ট শুধু তৃপ্তি বিধান করিবে না, কিন্তু চিত্তকে প্রবুদ্ধ করিবে। এই হইল আর্টের আদর্শ। প্রকৃত আর্ট বাস্তবকে প্রতিবিম্বিত করে। যে আর্ট কুহেলি সৃষ্টি করে রঙীন ধোঁয়ায় আপনাকে আচ্ছন্ন করে, তা একটি যুগ বা গণ্ডীবিশেষের আনন্দদান করিতে পারে; মাত্র। কিন্তু যে-আর্ট চিরন্তন হইবার আশা রাখে তাহাতে সত্য বস্তু থাকিতেই হইবে। মার্কসীয় আর্টের শ্রেষ্ঠত্ব বা অপকর্ষের ইহাই একমাত্র মাপকাঠি।

যে সব লোক খাটিয়া খায়, জীবনধারণের জন্য যাহাদিগকে খাদ্যের অন্বেষণে ঘুরিতে হয়, তাহারা আর্টে বাস্তবতা চায়। তাহারা চায় আর্ট তাহাদের জীবনসমস্যার সমাধান করুক। লেনিন বলিয়াছেন: "আমরা কতিপয় ব্যক্তি আর্ট সম্বন্ধে কি ভাবি তাহাতে কিছু আসে যায় না। একটা জাতির মধ্যে আমাদের মত কয়েক হাজার বা কয়েক লক্ষ লোক কি ভাবে তাহাতে কিছু আসে যায় না। আর্ট জনসাধারণের বস্তু। আর্টের শিকড় জনজীবনের গভীরতম দেশে প্রবেশ করুক। সব লোক আর্ট বুঝুক ও ভালবাসুক ইহাই চাই। আর্ট এই সব নরনারীর ভাব, চিন্তা ও ইচ্ছাকে এক সূত্রে গ্রথিত করুক ও উচ্চ গ্রামে লইয়া যাক। জনতার মধ্যে যেসব রূপপিপাসু লোক আছে তাহারা জাগিয়া উঠুক ও আর্ট তাহাদিগকে সম্মুখের দিকে লইয়া যাক"।

———

শ্যামদেশের জোড়া-যমজ বা শ্যায়ামিজ টুইন্স

অনাথবন্ধু দত্ত

যমজ ছেলে মেয়ের জন্ম খুবই দেখা যায়। এপ্রসঙ্গে তনটি সন্তানের জন্ম অবশ্য অল্পই দেখা যায়। তবে চার, াচ বা আরও বেশী সন্তানের জন্ম যে মানুষের দেখা য় না তাহা নহে তবে ইহাদের সংখ্যা খুবই কম। ানাডার ডাইওনি কুইন্স এবং আর্জেন্টিনার ভিলিজেন্টি ইন্স কিছুকাল বাঁচিয়া খুব বিখ্যাত হইয়াছিল।

জোড়া যমজ সন্তানের জন্মের খবর খবরের কাগজে ায়ই দেখা যায়। ইহারা কেবল যমজ নহে, উভয়ের রীর এরূপভাবে জোড়া যে অস্ত্রোপচার করিয়া থক করাও সম্ভব নহে। অনেকক্ষেত্রেই এরূপ ন্তান জন্মের পর অল্প সময়ই বাঁচিয়া থাকে। অনেক ত্রর মৃত প্রসব হয়। তবে কোন কোন সময় এরূপ ন্তানেরা দীর্ঘ জীবন পায়।

এই সকল জোড়া যমজের উভয়ের শরীরে যন্ত্রগুলি ায়ই পৃথক পৃথক থাকে। এরূপ সন্তানের জন্ম শগত নহে। কোন কোন বিজ্ঞানী মনে করেন যে কাধিক ডিম্বাণু হইতে অসম্পূর্ণভাবে জন্মিবার জন্যই রূপ হইয়া থাকে। উভয় সন্তানের উদর বুক, পিঠ বং মাথার উপরের অংশ পরস্পর সংলগ্ন থাকে এবং ধিকাংশ ক্ষেত্রেই শরীরের প্রধান প্রধান যন্ত্রগুলি রস্পর নির্ভরশীল থাকায় অস্ত্রোপচার সম্ভব হয় না।

কিছুকাল পূর্ব্বে সিংহলে ও আসামে এরূপ কয়েকটি াড়া যমজের জন্মের খবর পাওয়া গিয়াছিল। অল্প ছুদিন পূর্ব্বে কেরেলায় ত্রিবিক্রম হইতে কুড়ি মাইল র এক হরিজন স্ত্রীলোক এরূপ একটি সন্তান প্রসব রিয়াছিল—উহার মাথা দুটী, হাত চারিখানা এবং পা রিখানা। এই মৃত অদ্ভুত শিশু বা জন্তকে দেখিবার ন্য হাসপাতালে বহুলোকের সমাগম হইয়াছিল। খবরের কাগজেও এই অদ্ভুত শিশুর ছবি বাহির হইয়াছিল।

আমেরিকার লস্‌এঞ্জেলসের 'যুক্ত ভগিনী' নামে পরিচিত যোড়া-যমজ ভগিনীদ্বয় পঞ্চাশ বৎসরের অধিক কাল বাঁচিয়া গত ফেব্রুয়ারী মাসে প্রায় একই সময়ে মারা গিয়াছে।

পৃথিবীর যে কোন স্থানেই জোড়া যমজের জন্ম হউক খবরের কাগজে উহাকে 'শ্যায়ামিজ টুইন্স' বা শ্যামদেশের জোড়া যমজের জন্ম হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হয়।

যাহাদের নামে সারা পৃথিবীর জোড়া যমজের নামকরণ বা পরিচয় সেই শ্যামদেশের জোড়া যমজের কথা এখন বলা যাক্। অবশ্য শ্যামদেশ আর শ্যামদেশ নাই। বহুদিন পূর্ব্বেই ইহার নাম হইয়াছে 'থাইল্যাণ্ড বা থাইদের দেশ।

আসল 'শ্যায়ামিজ টুইন্‌স' এর নাম ছিল চ্যাং এবং ইং। তাহারা ছিল অদ্ভুত ধরনের মানুষ এবং সুখে-সাচ্ছন্দ্যে তাহারা বাট বছর বাঁচিয়াছিল! তাহারা জীবনে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিয়াছিল এবং বহু ছেলে-মেয়ের জন্ম দিয়াছিল। কেবল "Siamese Twins" এই নামটীর কপিরাইট রেজিষ্ট্রী করা ব্যতীত তাহারা সবকিছু করিয়া গিয়াছিল।

কিছুদিন পূর্ব্বে ত্রিবন্দ্রমে দুই মাথা, চার হাত চার পা ওয়ালা যে 'রাক্ষস' জোড়া যমজ শিশুর জন্ম হইয়াছিল চ্যাং-ইং দেখিতে অনেকটা সেরূপ ছিল। কিন্তু চ্যাং ইং এর পৃষ্ঠদেশ ছিল যেন একখণ্ড মাংসে তৈরী।

চ্যাং-ইং এর প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে মৃত্যু হইয়াছে। তাহাদের অদ্ভুত জন্মকথা এবং আরও

অদ্ভুত জীবনযাপন আজও মানুষের বিস্ময়ের বস্তু। পরবর্ত্তীকালে নানা দেশে অনেক যুগ্ম যমজ জন্মিয়াছে কিন্তু তাহাদের মত দ্বিতীয়টী আর কোথাও দেখা যায় নাই।

চ্যাং-ইং-এর জন্ম হয় ১৮১১ খৃষ্টাব্দে। পিতা ছিল চীনা মৎস্যজীবী, তার মাতা চীনা, শ্যামদেশীয় বর্ণসঙ্কর বংশের মেয়ে। কিন্তু শ্যামদেশে জন্ম হওয়ায় তাহারা ছিল শ্যামদেশের নাগরিক বা লোক। কিন্তু পিতা প্রচলিত নিয়ম-অনুযায়ী তাহাদের চীনা নামই দিয়া ছিল।

এরূপ শিশু প্রসব হওয়ায় সেদেশে খুব উত্তেজনা দেখা গিয়াছিল। পৃথিবীতে শীঘ্রই কোন অমঙ্গল ঘটিবে সকলে এরূপ আশঙ্কা করিতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, এই অদ্ভুত রাক্ষসের মাতাকে জ্যান্ত পোড়াইয়া মারা উচিত। কিন্তু চ্যাং-ইং-এর মা ছিল খুব সাহসী, ভয় পাইল না। কেহ কেহ এরূপও বলিল, যে এই জোড়া যমজকে করাতে কাটিয়া পৃথক ভাবে পোড়ান উচিৎ—মাতা তাহাতে ঘোর আপত্তি করিল। মাতা এই যমজদের দৌড়-ঝাঁপ, খেলায়, সাঁতার কাটিতে এবং মাছ ধরিতে খুব উৎসাহ দিত। এই যমজ শিশু অনেক সময় জলে কাটাইত এবং এইরূপে তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সঞ্চালন সরল হইয়াছিল।

আট বৎসর বয়সে তাহাদের পিতার মৃত্যু হয়। চ্যাং-ইং জীবিকার জন্য প্রথমে ফেরী এবং পরে হাঁস পালন শুরু করিল। তাহাদের যখন সতের বৎসর বয়স তখন এক ইংরেজব্যবসায়ীর নজর তাহাদের উপর পড়ায় তাহাদের জীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্ত্তন আসিল।

ইংরেজব্যবসায়ী দেখিল যে চ্যাং-ইংকে শো হাউস বা সার্কাসের খেলায় সাজাইলে বেশ কিছু আয়ের সম্ভাবনা। মাতাকে মোটা টাকা দিয়া সে যমজদুটীকে হাত করিল এবং শ্যামদেশ ত্যাগ করিল। ইংলণ্ডে শো-হাউসে খেলা দেখাইয়া অল্পদিনেই পসার জমাইয়া ফেলিল।

লণ্ডনের ডাক্তারেরা পরীক্ষা করিয়া দেখিল যে, জোড়ার নিকটে যমজদের নার্ভ সিষ্টেম পৃথক হইলেও উভয়ের একটিমাত্র নাভি। এজন্য সংযোগস্থলে একটি পিনের আঘাত দিলে উভয়েই উহা অনুভব করে কিন্তু আধইঞ্চি দূরের এরূপ আঘাত তাহারা পৃথক পৃথকভাবে টের পায়।

ইংলণ্ডে তাহাদের খেলা বেশ জমিয়াছিল। জোড়া সত্ত্বেও তাহাদের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাধীন চলাচলে সকলে আশ্চর্য্যান্বিত হইত। ঐ অবস্থায় তাহাদের দাঁড়ান। পিঠাপিঠি শোয়া, দৌড়ঝাঁপ, ঘোড়ায় চড়া, ডিগবাজি খাওয়া সবকিছু দেখান চলিত। তাহারা ব্যাডমিন্টন খেলায় পারদর্শী হইয়াছিল এবং ইহাও ছিল সার্কাসের একটী অঙ্গ।

কয়েক বৎসর ইংলণ্ডে বাস করিয়া তাহারা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে যায়। প্রথম খেলা দেখায় নিউইয়র্ক মিউজিয়মে। পরে নিজেরাই খেলা দেখাইতে শুরু করে। আমেরিকায় তাহারা গাড়ী করিয়া হাজার হাজার মাইল ঘুরিয়াছে এবং কোন শহরে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই লোক মারফৎ হ্যাণ্ডবিল পাঠাইয়া তাহাদের আগমন ঘোষণা করিত "শ্যামদেশের যুগ্ম যমজ" আসিতেছে। এইরূপে যথেষ্ট অর্থ রোজগার করিয়া নর্থ ক্যারোলিনা ষ্টেটে ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছিল।

তারপর সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। চ্যাং-ইং দুইজন আমেরিকান, কোয়েকার সহোদরা ভগ্নীর সহিত প্রেম করিয়াছিল। এই মহিলাদের পূর্ব্বপুরুষ ছিল ডাচ, এবং আইরিশবংশীয়। চ্যাং এবং ইং যথাক্রমে এডেলেড ইয়েট্স্ এবং সারা এবং সারা ইয়েট্সকে বিবাহ করিয়াছিল। দুইটী বিবাহই পৃথক পৃথকভাবে সম্পন্ন হইয়াছিল এবং এই বিবাহ খুবই সুখের হইয়াছিল।

এই যুগ্ম যমজ একমাইলের ব্যবধানে দুইটি পৃথক বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিল। কনফুসিয়াসের নীতির সহিত বাস্তবের সামঞ্জস্য ঘটাইয়া এরূপ একটা সময়পঞ্জী আবিষ্কার করিয়াছিল যে অবাক্ না হইয়া থাকা যায়

না। তাহারা একটি বাড়ীতে একজন স্ত্রীর সাহিত সপ্তাহের প্রথম তিন দিন বাস করিত এবং দ্বিতীয় তিন দিন অপর বাড়ীতে অপর স্ত্রীর সাহিত থাকিত। এরূপ দিনপঞ্জী অতি সুন্দরভাবে পনের বৎসর পালিত হইয়াছিল। ইহার ফলস্বরূপ চ্যাং এডেলেড সাতপুত্র তিন কন্যা এবং ইং-সারা সাত পুত্র পাঁচ কন্যা লাভ করিয়াছিল। অর্থাৎ উভয়ে বাইশটি সন্তানের জননী হইয়াছিল।

এই যুক্ত যমজেরা বেশ সুখেই ছিল তবে নিজেদের ছোটখাট আমোদ-প্রমোদ লইয়া একটু আধটু গোলমালের সৃষ্টি হইত। ইং সমস্ত রাত জাগিয়া বন্ধুদের সঙ্গে পোকার (তাসের জুয়া) খেলিতে ভালবাসিত কিন্তু চ্যাং এই খেলার কিছুই বুঝিত না এবং ইহাতে খুবই অসুবিধা বোধ করিত এবং কষ্ট অনুভব করিত। তাহারা মাঝে মাঝে প্রায়ই বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দ্বারা পৃথক হইবার জন্য পরীক্ষা করাইত। তাহাদের স্ত্রীরাও তাহাই চাহিয়াছিল। কিন্তু ডাক্তারগণ ইহাতে অমত করেন।

হঠাৎ একদিন স্নায়বিক আক্রমণ (ষ্ট্রোক) হওয়ায় চ্যাং এর শরীরের কিছু অংশ পক্ষাঘাতে গ্রস্ত হয়। তাহার মেজাজ যেন কিছু বিকৃত হইল—সে মদ খাওয়া আরম্ভ করিল। ইং মদ একেবারে স্পর্শ করিত না। কিন্তু তাহার ভ্রাতার মদ্যপানে নিজের কোন নেশা হইত না। নেশা না হইলেও তাহাকে বসিয়া সময় কাটাইতে হইত। এজন্য দুই জনের মধ্যে প্রায়ই কলহ হইতে লাগিল।

উভয়ে এক সঙ্গে যাতায়াত করিলেও (অবশ্য ইহা ব্যতীত অন্য উপায় ছিল না) অনেকদিন উভয়ের মধ্যে বাক্যালাপ বন্ধ ছিল। ইহা সত্ত্বেও তিন দিন অন্তর উভয়ের স্ত্রীর নিকট যাওয়া অব্যাহত ছিল। ইহাদের নিজেদের দুঃখ কষ্ট যাহাতে স্ত্রীদের উপরে না বর্ত্তায় এবিষয়ে উভয়ে সজাগ ছিল।

চ্যাং মদ খাইয়া এবং ইং উহা স্পর্শ না করিয়াই এক জন্মবার্ষিক উদ্‌যাপন করিয়াছিল এবং ইহার কিছুকাল পরে একদিন ইং-এর ঘুম ভাঙ্গিলে সে দেখিল চ্যাং যেন অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছে। তখন ইহারা সারার (ইং-এর স্ত্রী) বাড়ীতে ছিল।

ইং সাহায্যের জন্য হাঁক দিতে তাহার এক ছেলে ছুটিয়া আসিল। ছেলে বাবাকে বলিল—"চ্যাং খুড়ো মারা গিয়েছে।" সঙ্গে সঙ্গে ইং বলিল—"আমিও চলিলাম।" ডাক্তার আসিবার পূর্ব্বেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল।

আধুনিক জগতের বিখ্যাত এবং সর্ব্বপ্রথম যুগ্ম যমজ শ্যামদেশের এই অদ্ভুত মানুষ চ্যাং-ইং-এর তিরোধান এইভাবে হয়।

পৃথিবীতে আরও বহু জোড়া যমজ জন্মিয়াছে, সার্কাস বা খেলা দেখাইয়া তাহারা অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছে। কিন্তু কেহ এই শ্যামিজ টুইনসের মত প্রভূত সম্পদ লাভ বা দাম্পত্যজীবন ভোগ করিয়াছে বলিয়া জানা যায় না।

কান্তকবি রজনীকান্ত

রমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গভূমি সত্যই রত্নপ্রসূ। কত যে প্রতিভাদীপ্ত লেখক, গায়ক, রাজনীতিজ্ঞ, সমাজসেবক সেযুগে এদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার ইয়ত্তা করা কঠিন। কিন্তু দুঃখ ও ক্ষোভের বিষয়, তাঁহাদের মধ্যে অনেককেই আত্মবিস্মৃত বাঙালী জাতি আজ ভুলিয়া গিয়াছে। তাঁহাদের যথাযথ পরিচয় আজ অবলুপ্তপ্রায়। কান্তকবি রজনীকান্ত তাঁহাদের অন্যতম। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আত্মার সেই মুক্ত স্বরূপ" এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনমানসে তাঁহার জীবন-কথা আজ সংক্ষেপে আলোচনা করিব।

১২৭২ সালের ১২ই শ্রাবণ, ইংরাজী ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই বুধবার প্রত্যুষে পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে বৈদ্যবংশে রজনীকান্ত সেনের জন্ম। সে গ্রাম এখন পাকিস্তানের কবলিত।

রাজারাম সেন ও রাজেন্দ্রাম সেন মৈমনসিংহের সহদেবপুর গ্রাম হইতে আসিয়া ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে বৈদ্যবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে উহা একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে পরিণত হয়। ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি আরও অনেক জাতি এখানে আসিয়া বাস করিতে থাকেন।

রজনীকান্তের পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ছিলেন সবজজ্। তাঁহার জ্যেষ্ঠতাত গোবিন্দলাল ছিলেন রাজসাহীর প্রসিদ্ধ উকিল। দুই ভাইয়ের অর্জ্জিত অর্থে ভাঙ্গাবাড়ীতে প্রাসাদোপম বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়। ভূসম্পত্তিও অনেক কেনা হইয়াছিল। এখন সেই গ্রামই আবার বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

গুরুপ্রসাদ শাক্তকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও বৈষ্ণবধর্ম্মে অনুরক্ত হন। বৈষ্ণবশাস্ত্র ও প্রাচীন বৈষ্ণবপদাবলী তিনি নিয়মিত আলোচনা করিতেন। ১৮৮৩ সালে, ইংরাজী ১৮৭৬-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গুরুপ্রসাদ "পদ চিন্তামনি মালা" নামে একখানি সুবৃহৎ পদাবলী গ্রন্থ সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। উহাতে বহু সংখ্যক মনোরম পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। পুস্তকখানির নামকরণ করেন কালনা নিবাসী তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ভগবান-দাস বাবাজী, এবং উহার ভূমিকা লিখিয়াছেন শান্তি-পুরের বিখ্যাত ভাগবত প্রভুপাদ মদনমোহন গোস্বামী। গুরুপ্রসাদ সুগায়ক না হইলেও বিশেষ সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। হরিনাম সংকীর্ত্তনে যোগ দিয়া তিনি প্রায় ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন।

গুরুপ্রসাদ দাদাকে গুরুর ন্যায় শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। "পদচিন্তা মণিমালা" তাঁহাকে দেখাইলে তিনি পুস্তক-খানির প্রশংসা করিলেন বটে, কিন্তু আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—"এতে মায়ের নাম কৈ? তখন গুরুপ্রসাদ শক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া "অভয়া বিহার" নামে আর একখানি কাব্য রচনা করেন। সেখানি মুদ্রিত-হইবার অবকাশ পায় নাই। গুরুপ্রসাদের মৃত্যুর অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে উহা রচিত হইয়াছিল।

রজনীকান্তের পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন তাহা রজনীকান্তের লেখনী মুখেই

জানা যায়। তাঁহার অসম্পূর্ণ আত্মচরিত্রে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—"আমার পিতা কিছু ধীর, স্থির ও গম্ভীর প্রকৃতির লোক ছিলেন। পিতৃজ্যেষ্ঠের প্রকৃতিতে তেজস্বিতা, অহংকার, হঠকারিতা বহুল, পরিমাণে লক্ষিত হইত। একজন কোমল, নম্র, মাটির মানুষ; আর একজন উদ্ধত, মানোন্নত, গর্ব্বী। এই দুই বিভিন্ন প্রকৃতি আজন্মপরিবর্দ্ধিত সখ্যে মিলিয়া মিশিয়া কোমল কঠোর, স্নিগ্ধ ও গর্ব্ব, গম্ভীরতা ও ঔদ্ধত্য, কেমন করিয়া নির্বিরোধে ও স্বচ্ছন্দে একত্রে বাস করিতে পারে, তাহার উজ্জ্বল ও মনোহর দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন।"

"উভয়েই অন্নবিতরণেও বিপন্নের সাহায্যে অর্থদান করিতে মুক্তহস্ত ছিলেন। ধর্ম্মপ্রধানতা, ঈশ্বরনিষ্ঠা, দুঃস্থের প্রতি করুণা, ও দান, ইহার উপর অসামান্য প্রতিভা—এই সকল দুর্লভ গুণ উভয় ভ্রাতাকেই ভগবান ভূষিত করিয়াছেন।"

রজনীকান্তের মাতুলালয় ছিল সিরাজগঞ্জ মহকুমার বাগবাটী গ্রামে। তাঁহার মাতামহ হরিমোহন সেন মহাশয় রঙ্গপুরে চাকুরি করিতেন।

রজনীকান্তের জননী মনোমোহিনী দেবী ছিলেন অশেষ গুণবতী, অতীব ধর্ম্মপরায়ণা ও বিশেষ তেজস্বিনী। তাঁহার ন্যায় সুগৃহিণী সেযুগে বিরল ছিল। ভাসুরের পুত্রকন্যাদিগকে তিনি এরূপ যত্ন-আদর করিতেন যে তাঁহারা মায়ের অভাব অনুভব করিতে পারিতেন না। গোবিন্দলালের প্রথমা পত্নী চার পাঁচটি শিশুসন্তান রাখিয়া অল্প বয়সেই মারা যান। তিনি দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন। সেই সব মাতৃহারা শিশুদিগকে মনোমোহিনী দেবীই সযত্নে লালন-পালন করেন। রন্ধনকার্যেও ছিলেন তিনি সুনিপুণা। কাজ-কর্ম্মের বাড়ীতে গ্রামের লোকেরা তাঁহাকে রন্ধন করিবার জন্য ডাকিয়া লইয়া যাইত। তিনিও হৃষ্টচিত্তে সকল কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া দিয়া আসিতেন।

রজনীকান্ত তাঁহাদের তৃতীয় সন্তান। জ্যেষ্ঠ পুত্র চণ্ডীপ্রসাদ দুই বৎসর বয়সে 'কলেরা' রোগে মারা যান। প্রথমা কন্যা ত্রিনয়ণী অল্প বয়সে একটি কন্যা প্রসব করিয়া সূতিকা রোগে প্রাণত্যাগ করেন। রজনী-কান্তের পরে ক্ষীরোদবাসিনী নামে একটি কন্যা, এবং জানকীকান্ত নামে একটি পুত্র জন্মিয়াছিল।

রজনীকান্তের শৈশব অতি আদরেই অতিবাহিত হয়। অধিকাংশ সময়েই জননীর সহিত তিনি পিতার বিভিন্ন কর্ম্মস্থলে থাকিতেন। মনোমোহিনী দেবী লেখাপড়া জানিতেন। তাঁহারই নিকট কুচবিহারে তিনি প্রথম পড়াশুনা আরম্ভ করেন। তাঁহার স্মৃতিশক্তি অতি প্রখরা ছিল। মাতার নিকট রামায়ণ মহাভারত পড়িয়া উহাদের নানা অংশ তিনি সুন্দর আবৃত্তি করিতে পারিতেন। আবৃত্তি ক্ষমতাও ছিল তাঁহার অসামান্য। পুত্রের এইরূপ আবৃত্তি-শক্তি দেখিয়া গুরুপ্রসাদও বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, এবং স্বরচিত পদাবলী তাঁহাকে ধীরে ধীরে মুখস্থ করাইতেন। আবৃত্তির প্রথা ও প্রণালী শিক্ষা দিতেন। পিতামাতার সংস্পর্শে শৈশবেই রজনীকান্তের সাহিত্যপ্রীতি জন্মে। কবিতার কানও তৈয়ারী হইয়া যায়, যাহার ফলে সঙ্গীতরচনা তাঁহার পক্ষে সুগম হইয়া উঠে।

১২৮১ সালে, ইংরাজী ১৮৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে গুরুপ্রসাদ ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের অনুরোধে চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন। রজনীকান্তের বয়স তখন ১০ বৎসর। যাঁহাদিগের ভরসায় গুরুপ্রসাদ অকালে "পেনসেন" লইলেন, তাঁহারাই তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। বৃদ্ধ গোবিন্দলালের পৌত্র কালীপদ, এবং গুরুপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র জানকীকান্তও অতি অল্প বয়সেই ইহলোক ত্যাগ করিল। সেন পরিবারে শোকের গাঢ় ছায়া পড়িল। তাঁহাদের সঞ্চিত অর্থ রাজসাহীর ইন্দ্রচাঁদ কাইয়ার কুঠিতে জমা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সে কুঠি দেউলিয়া হইল। ইহাতে তাঁহাদের আর্থিক কষ্টও দেখা দিল। রজনীকান্তের হৃদয়ে ঈশ্বর-নির্ভর তার জীবনে এই সময়েই উপ্ত হয়।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে আঠার বৎসর বয়সে রজনীকান্ত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন, এবং মাসিক দশ টাকা

বৃত্তি পান। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজসাহী কলেজ হইতে এফ্.এ. পাস করেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সিটি কলেজ হইতে বি. এ. পাস করিয়া ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বি. এল্. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তৎপরে রাজসাহিতেই ওকালতি আরম্ভ করিয়া পসার-প্রতিপত্তি লাভ করিতে থাকেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেই ১২৯০ সালের ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই মে বৃহস্পতিবার তারকনাথ সেন মহাশয়ের তৃতীয়া কন্যা হিরন্ময়ী দেবীর সহিত রজনীকান্তের বিবাহ হয়। তাঁহাদের বিবাহিত-জীবন সুখেরই হইয়াছিল, এবং তাঁহারা কয়েকটি সুসন্তানও লাভ করিয়াছিলেন।

শিশুকাল হইতেই রজনীকান্ত সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। বড় হইয়া অপরের রচিত গান গাহিয়া তিনি বিশেষ তৃপ্তি পাইতেন না। কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার গান বাঁধার চেষ্টা দেখা যায়। পনের বৎসর বয়সে তাঁহার রচিত একটি গানের কয়েক পংক্তি পাওয়া যায়। উহার চারিটি চরণ :—

"(মায়ের) চরণ যুগল প্রফুল্ল কমল
মহেশস্ফটিক জলে,
ভ্রমর নূপুর ঝঙ্কারে মধুর
ও পদ কমলদলে।"

শুধু লেখা নয়, কবিতাপাঠেও তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, কৃত্তিবাস, কাশীদাস, কবিকঙ্কন প্রভৃতি প্রাচীন কবিগণ হইতে আধুনিক কালের সকল কবির কাব্যগ্রন্থ তিনি পাঠ ও আলোচনা করিতেন। ভাঙ্গা বাড়ীর তৎকালীন বিদ্যালয়ের প্রধান পণ্ডিত মহম্মদ নজিবর রহমন সাহেব অনেক সময় রজনীকান্তের সাহিত্যালোচনায় যোগ দিতেন। পাকিস্তানী বুদ্ধি তাঁহাদের মস্তিষ্কে তখন প্রবেশ করে নাই। এ কালকূট দেশে প্রবেশ করিয়া চিরকালের জন্য জাতীয় সংস্কৃতি পঙ্গু করিয়া দিল।

কবিতা রচনা ব্যতীত নাট্যকলা ও অভিনয়েও তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইত। 'বিল্বমঙ্গল" "পাগলিনীর" ভূমিকায় এবং রাজা ও রাণীতে" "রাজার" ভূমিকায় অভিনয় করিয়া তিনি বিশেষ সুনাম অর্জ্জন করেন। চরিত্র দুইটিই গভীর হৃদয়বৃত্তির দ্যোতক।

রজনীকান্ত শুধু সুসাহিত্যিক ছিলেন না, তিনি সুরসিকও ছিলেন। অল্প বয়স হইতেই তাঁহার রসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সংস্কৃত ভাষায় ছোট ছোট সরস কবিতা তিনি ছাত্রজীবনেই রচনা করিয়াছিলেন। উহার দুইটিমাত্র উদাহরণ দেওয়া হইল।

কালীকুমার দাস মহাশয় রাজসাহী "কলিজিয়েট স্কুলের" প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ব্যাকরণে তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। সভাসমিতিতে কিন্তু তিনি ভাল বলিতে পারিতেন না। তাঁহার সম্বন্ধে রজনীকান্ত লেখেন—

"ব্যাকরণে মহাবিদ্যা "ব্যা" ব্যাকরণতৎপরঃ
কস্মিংশ্চদ্ যদি বা কালে ক্রিয়তে হসৌ সভাপতিঃ
সমারোহং সমালোক্য "চরকীমাতম্" প্রজায়তে॥"

এড্ওয়ার্ড সাহেব রাজসাহী কলেজের অধ্যক্ষ। বিনোদবিহারী সেন ছিলেন তাঁহার প্রিয় কেরাণী। শুদ্ধ ইংরাজী বলিতে না পারিলেও তিনি সর্ব্বদাই ইংরাজী বলতেন। সেই বিনোদবাবুকে লক্ষ্য করিয়াই রজনীকান্ত লিখিয়াছিলেন—

"এড্ওয়ার্ড কপেরস্তা বিনোদঃ ইতি নামতঃ।
বিদ্যারম্ভা বুদ্ধিরম্ভা ইংলিশঃ সর্ব্বদা মুখে ॥

১২৯৭ সালের ভাদ্রমাসে, ইংরাজী ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে "আশালতা" নামে একখানি মাসিক পত্রিকায় রজনীকান্তের "আশা" শীর্ষক একটি কবিতা প্রকাশিত হয়। ইহাই তাঁহার প্রথম মুদ্রিত কবিতা।

রজনীকান্তের ওকালতিতে পসার কিছু বাড়িলে তিনি রাজসাহীতে ছোট একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করেন। সেই সময় তাঁহার জ্যেঠতুতো ভাই উমাশঙ্করের "ক্যানসার" রোগ দেখা যায়। কলিকাতায় আসিয়া

চিকিৎসার জন্য পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াও রজনীকান্ত তাঁহাকে বাঁচাইতে পারেন নাই।

রাজসাহীতেই রজনীকান্তের সাহিত্য-সাধনা আরম্ভ হয়। নিজে গান বাঁধিয়া গাহিতে তিনি ভালবাসিতেন। অপরের গান কদাচিৎ গাহিতেন; তিনি জন্মগত সাহিত্যমোদী। সে কথা তিনি নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। "আমি আইনব্যবসায়ী, কিন্তু আমি ব্যবসা করিতে পারি নাই। কোন্ দুর্লঙ্ঘ্য অদৃষ্ট আমাকে ঐ ব্যবসায়ের সহিত বাঁধিয়া দিয়াছিল, কিন্তু আমার চিত্ত উহাতে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। আমি শিশুকাল হইতেই সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম, আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।"

তিনি গান গাহিয়া নিজে আনন্দ পাইতেন, বন্ধুবান্ধবদিগকেও আনন্দ দান করিতেন। কিন্তু তাঁহার রচিত গানগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে চাহিতেন না। সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় একদিন রজনীকান্তের কবিতাগুলি প্রকাশ করিবার প্রস্তাব করিলেন। রজনীকান্ত তখন সভয়ে বলিলেন—"শ্রীসুরেশ চন্দ্র সমাজপতি মহাশয় রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়া কথা বলেন নাই। আর আমার কবিতার কিরূপ সমালোচনা করিবেন—কে জানে?"

অক্ষয়কুমার কিন্তু একথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি জলধর সেনের বাড়ীতে এক সাহিত্যসভায় সমাজপতিকে নিমন্ত্রণ করিলেন, এবং সেই সভায় রজনীকান্তকে দিয়া তাঁহার স্বরচিত কয়েকটি কবিতা আবৃত্তি করাইলেন। ইহাতে সুফল ফলিল। কিছুদিনের মধ্যেই রজনীকান্তের "বাণী" প্রকাশিত হইল। অক্ষয়কুমারই উহার ভূমিকায় কবিতাগুলিকে "কান্তপদাবলী" নাম দেন। তদবধি রজনীকান্ত "কান্তকবি" বলিয়া খ্যাতিলাভ করেন।

"বাণীতে' যে কয়টি কবিতা প্রকাশিত হয়, তাহার অধিকাংশই ভক্তিমূলক গান। উহা সহজেই বাঙ্গলাসাহিত্যে স্থানলাভ করে, এবং অনুপম বলিয়াই অনেকের মনে হয়। এই পুস্তকের অন্তত ত্রিশটি গান ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে "ব্রাহ্ম সঙ্গীতের" একাদশ সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় উহা জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রজনীকান্ত হাসির গানও অনেক লিখিয়া গিয়াছেন। সেগুলি নিছক হাস্যোদ্দীপক। উহাতে কোনরূপ ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ বা হিংসাদ্বেষের লেশমাত্র নাই। তিনি নিজে উকিল ছিলেন, অথচ উকিলদের লইয়াই গান বাঁধিলেন—

"দেখ, আমরা জাতের pleader যত public movement এর leader আর conscience to us is a marketable thing we sell to the highest bidder,"—ইত্যাদি। এরূপ অপক্ষপাত ছিলেন তিনি। শুধু হাসিবার জন্যই হাসির গান লিখিতেন। উহার পশ্চাতে কোন উদ্দেশ্য লিখিত থাকিত না।

স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও তাঁহার কণ্ঠ নীরব ছিল না। তিনি স্বদেশী গানও অনেক বাঁধিয়াছিলেন। সভাসমিতিতে সেসকল গান গাহিয়া যুবকেরা বিশেষ উৎসাহ পাইত। "এন্টি সারকিউলার সোসাইটির" শোভাযাত্রাতেও রবীন্দ্রনাথের গানের সহিত তাঁহার রচিত গানও পথে পথে শোনা যাইত।

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।

দীনদুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশী আর সাধ্য নাই।"

গানটি বিশেষ লোকপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

"বাণী" প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে। উহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইলে বৃটিশ গভর্ণমেন্ট বইখানি বাজেয়াপ্ত করেন এবং উহার প্রকাশ বন্ধ করিয়া দেন। তাহাতে রজনীকান্তের স্বদেশী গানগুলির চাহিদা আরও বাড়িয়া যায়। এবং সকল লোকের প্রিয় হইয়া ওঠে।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার "কল্যাণী" প্রথম প্রকাশিত হয়। "অমৃত" প্রকাশিত হয় ১৯১০ সালে, এবং

"সদ্ভাবকুসুম" ১৯১৩ সালে। সুসাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীপ্রমথনাথ বিশি শেষোক্ত পুস্তক দুইখানির কবিতাগুলিকে রজনীকান্তের হাসির গান ও স্বদেশী গানগুলি অপেক্ষা শ্রেয় মনে করেন।

পাঁচ বৎসরের শিশু রজনীকান্ত জ্যেষ্ঠতাতের ক্রোড়ে বসিয়া হাততালি দিয়া যখন গাহিতেন—

"মা আমায় ঘুরাবি কত
চোখ ঢাকা বলদের মত"

তখনই কি তিনি বুঝিয়াছিলেন—"মা তাঁহাকে মারিতে মারিতে নিজের কোলে টানিয়া লইবেন। তিনিও মার খাইতে খাইতে অভ্যস্ত হইয়া ইহাতে আনন্দ পাইবেন।" নতুবা তাঁহার তৃতীয় পুত্র ভূপেন্দ্রনাথের মৃত্যুতে কি করিয়া তিনি এই গানটি লিখিলেন—

"তোমারি দেওয়া প্রাণে তোমারি দেওয়া দুখ
তোমারি দেওয়া বুকে তোমারি অনুভব।"

* * *

তোমারি দেওয়া নিধি, তোমারি কেড়ে নেওয়া।
তোমারি শঙ্কিত আকুল পথ চাওয়া,
তোমারি নিরজনে ভাবনা আনমনে
তোমারি সান্ত্বনা শীতল সৌরভ।

* * *

আমারি বলে কেন ভ্রান্তি হল হেন
ভাঙ্গ এ অহমিকা মিথ্যা গৌরব।"

তাঁহার প্রথমা কন্যা শতদলবাসিনীর মৃত্যুতেও তাঁহাকে বলিতে শুনা গিয়াছিল—"যাঁহার দান তিনিই লইয়াছেন।"

ইহার সহিত "দাদাঠাকুরের" (৺ শরৎচন্দ্র পণ্ডিত) রচিত একটি গানের তুলনা দেওয়া চলে। তিনিও তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর পর শ্মশানে গিয়া জলন্ত চিতার পার্শ্বে বসিয়া স্বরচিত গান গাহিয়া নিজেকে সান্ত্বনা দিয়াছিলেন। গানটি এই—

"দুখ দিয়ে বুক ভাঙবে তুমি
তাই ভেবেছ ভগবান।
আমি মার খাবো তাও কাঁদবো নাকো
পরাণ খুলে গাইবো গান।
তোমার দেওয়া, তোমার নেওয়া,
আমার এতে কি লোকসান?
দত্তাপহারী হলে যে—
নিলে জিনিস করে দান।
ভাগ্যে আমার হবে যা হোক,
হলাম তোমার দুঃখের গ্রাহক,
তোমার ভাণ্ডারের দুখ ক'রে খালি
করবো দুঃখের অবসান।"

১৩১৩ সালের আশ্বিন মাসে, ইংরাজী ১৯০৬ খৃঃ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ৪১ বৎসর বয়সে রজনীকান্ত মূত্রকৃচ্ছ্রতারোগে আক্রান্ত হন। এই কালব্যাধি তাঁহার জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে ছাড়ে নাই। ম্যালেরিয়া জ্বরও তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। তিনি কিন্তু কোনও দিনই শরীরের বিশেষ অযত্ন করেন নাই। নিয়মিত ব্যায়াম করিয়া তাঁহার দেহ বেশ বলবান ও কর্ম্মপটু হইয়াছিল। শ্রীভগবানের প্রতি আত্যন্তিক ভক্তি উদ্দীপিত করিবার জন্যই কি তাঁহার এইসকল রোগভোগ? রাজসাহীতে চিকিৎসায় কোন সুবিধা না হওয়ায় কলিকাতায় আসিয়া তিনি আবার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

১৩১৪ সালে (১৯০৭-০৮ খৃঃ) কবিরাজী চিকিৎসায় একটু সুস্থ হইয়া তিনি রাজসাহীতে ফিরিয়া যান। সেখানে পৌঁছিয়া পুনরায় কাছারি যাইতে লাগিলেন। জ্বরের আক্রমণ হইতে তিনি সম্পূর্ণ অব্যাহতি পাইলেন না। প্রায়ই জ্বরে কাঁপিতে কাঁপিতে কাছারি হইতে বাড়ী ফিরিতেন। এইরূপ অসুস্থ শরীর লইয়াও তাঁহার গান-বাজনা, আমোদ-আহ্লাদের বিরাম ছিল না। বন্ধুবান্ধব লইয়া অধিক রাত্রি পর্যন্ত গান-বাজনা চলিত। রাত্রি জাগিয়া কবিতা ও গান রচনা করিতেন।

এইসময় বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে রজনীকান্তকে ভাঙা-বাড়ীতে যাইতে হয়। সেখানে গিয়া তিনি আবার ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত হইয়া একেবারে শয্যাগত হইয়া পড়েন। তখন সিরাজগঞ্জে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া সেখানে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাল্যবন্ধু তারকেশ্বর কবিশিরোমণির চিকিৎসায় কিছুদিনের মধ্যে তিনি আরোগ্যলাভ করিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বের স্বাস্থ্য আর ফিরিয়া পাইলেন না।

১৩১৫ সালের ২১শে অগ্রহায়ণ, ইংরাজী ১৯০৮ খৃঃ ৬ই ডিসেম্বর, রবিবার, কলিকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নব গৃহপ্রবেশের বৎসরে রজনীকান্ত স্বরচিত দুইখানি গান গাহিয়া সমবেত সাহিত্যিকদিগকে মুগ্ধ করেন। সেই সভাতেই তাঁহাদের সহিত অনেক সাহিত্য সেবক ও সাহিত্যবন্ধুর পরিচয় ঘটে।

ইহার প্রায় দুই মাস পরে ১৮ই ও ১৯শে মাঘ, ১৯০৯ খৃঃ ৩১শে জানুয়ারী ও ১লা ফেব্রুয়ারী রবি ও সোমবার দুই দিবস বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন রাজসাহীতে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও রজনীকান্ত স্বরচিত গান গাহিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করেন।

১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে, [১৯০৯ খৃঃ মে-জুন] একদিন রাজসাহীতে পান চিবাইতে চিবাইতে রজনীকান্তের মুখ চুণে পুড়িয়া যায়। ইহাই তাঁহার কণ্ঠরোগের সূত্রপাত। চিকিৎসার ব্যবস্থা হইলেও বিশ্রামের কোন ব্যবস্থা তখন তিনি করেন নাই। অবিশ্রান্ত গান গাওয়া ও রাত্রি জাগরণ চলিতেই থাকে। ফলে কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার স্বর বিকৃত হইল, খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করিতে কষ্ট হইতে লাগল। রাজসাহীতে রোগের উপশম না হওয়ায় ১৩১৬ সালের ২৬শে ভাদ্র, ইংরাজী ১৯০৯ খৃঃ ১১ই সেপ্টেম্বর শনিবার রজনীকান্ত সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। সাহেব ডাক্তার দেখান হইল। তিনি বলিলেন—"অতিরিক্ত কণ্ঠস্বর চালনার ফলেই উঁহার গলায় "ক্যান্সার" হইয়াছে। রজনীকান্ত বুঝিলেন এ রোগ হইতে আর নিস্তার নাই। তাঁহার জেঠতুতো ভাই উমাশঙ্করও এই রোগে মারা যান।

মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও রজনীকান্ত ভীত হইলেন না। প্রচলিত চিকিৎসায় কোন উপকার হইবে না বুঝিয়া তিনি কাশীধাম চলিয়া গেলেন। সেখানে বালাজি মহারাজ নামে কোন এক অবধুতের চিকিৎসাধীনে রহিলেন। অর্থাভাবে তখন তাঁহার 'বাণী' ও 'কল্যাণী'র মালিকানাস্বত্ব মাত্র চারিশত টাকায় বিক্রয় করিতে হইল।

প্রথম কয়েকমাসে তিনি অনেকটা সুস্থবোধ করিলেন। অবধুতের ব্যবস্থামত প্রত্যহ পদব্রজে হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান ও দেবদেবী দর্শন করিয়া তাঁহার মনের সহজ প্রফুল্লতা ফিরিয়া আসিল।

মাঘ মাসের প্রথমদিকে হঠাৎ একদিন তাঁহার জ্বর আসিল। সঙ্গে সঙ্গে গলাও ফুলিয়া উঠিল, এবং গলদেশে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব করিতে লাগিলেন। বালাজি মহারাজের ঔষধে আর কোন উপকার পাওয়া গেল না। তখন তিনি কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। হোমিওপ্যাথি, এ্যালোপ্যাথি, ও কবিরাজী অনেক চিকিৎসারই ব্যবস্থা হইল, কিন্তু রোগের কোনরূপ উপশম দেখা গেল না। অধিকন্তু শ্বাস কষ্ট আরম্ভ হইল। অবশেষে অবস্থা এরূপ দাঁড়াইল যে নিশ্বাস লইবার ক্ষমতাটুকুও প্রায় লুপ্ত হইয়া আসিল। যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া তিনি লিখিয়া জানাইতে লাগিলেন—"হয় মৃত্যু, নয় শ্বাসপ্রশ্বাস লইবার ক্ষমতা দাও ঠাকুর।" ইতমধ্যে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া কথা বলিবার শক্তি প্রায় লোপ পাইয়াছিল।

সেই সময় ডাক্তার বার্ড সাহেবকে ডাকা হইল। অস্ত্রোপচারে গলায় ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্রের মধ্যে রবারের নল লাগাইবার তিনি ব্যবস্থা দিলেন। ইহার তিন দিন পরে রজনীকান্তকে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হইল। ক্যাপটেন ডেনহাম্ হোয়াইট ২৮শে মাঘ, ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার বেলা ১২টার সময় তাঁহার কণ্ঠদেশে

"ট্র্যাকিওটমি" (Trachiotomy) অস্ত্রোপচার দ্বারা শ্বাসচলাচলের জন্য গলায় ছিদ্র করিয়া দিলেন। কবিকণ্ঠ চিরদিনের জন্য নীরব হইল। রবারের নল দিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের ব্যবস্থা করিয়া দিলে রজনীকান্তের আপাতত প্রাণরক্ষা হইল।

হাসপাতালে থাকিয়া রজনীকান্ত তাঁহার রোজ-নামচায় (Diary) ইংরাজীতে লিখিলেন-"The literature loving section of Bengalies (is) bearing the major portion of my expenses. Is it not unprecedented in a poor country like mine?" বাঙ্গালীদের মধ্যে যাঁহারা সাহিত্যপ্রিয় তাঁহারা আমার চিকিৎসার অধিকাংশ ব্যয়ভার বহন করিতেছেন। আমার দেশের মত দরিদ্রদেশের পক্ষে ইহা অভূতপূর্ব্ব নয় কি?"

অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া মেডিক্যাল কলেজের 'কটেজে' (Cottage) পরানুগ্রহে থাকিয়াও রজনীকান্ত ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিবিশ্বাস হারান নাই। তখনও তাঁহার হৃদয় মথিত করিয়া গান উৎসারিত হইল "আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ গর্ব্ব করিতে চূর।" ঈদৃশ' আত্মনিবেদন তাঁহার মাতৃচরিত্রেও দৃষ্টি হয়। ধ্যান ও পূজায় তিনি নিজেকে এমনভাবে নিমগ্ন করিয়া দিতেন যে একদিন যখন রজনীকান্তের অবস্থা খুবই খারাপ হইয়া পড়িয়াছে, তখন তাঁহার মাকে জপের আসন হইতে উঠাইয়া মৃত্যুপথযাত্রী সন্তানের শয্যাপার্শ্বে তুলিয়া আনিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

হাসপাতালে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি রজনীকান্তকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহারা নানাভাবে তাঁহাকে সাহায্যও করিতেন। সার প্রফুল্লচন্দ্র রায় একদিন রজনীকান্তের গৃহে আসিয়া বলিলেন-"আমার মৃত্যুতে যদি উঁহার মূল্যবান জীবন কয়েক বৎসরের জন্যও বর্দ্ধিত হয়, আমি সানন্দে মৃত্যু বরণ করতে পারি।"

শ্রদ্ধেয় রামতনু লাহিড়ীর পুত্র শরৎকুমার লাহিড়ী, এস্ কে লাহিড়ী পুস্তকালয়ের প্রতিষ্ঠাতা, এই দুঃসময়ে "অমৃতের একটি সংস্করণ বিনামূল্যে ছাপাইয়া দিলেন। হাইকোর্টের বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র, এবং ভক্তভৈরব গিরিশচন্দ্র ঘোষ উভয়ের প্রচেষ্টায় মিনার্ভা থিয়েটার এক রাত্রির অভিনয়ের সমগ্র আয় রজনীকান্তকে পাঠাইয়া দেয়। স্বনামধন্য অশ্বিনী কুমার দত্ত বরিশাল হইতে বেশ কিছু অর্থ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কাশিমবাজার ও দীঘা-পতিয়ার মহারাজেরা প্রভৃত সাহায্য করিতে লাগিলেন। অনেক অজ্ঞাত গুণগ্রাহীও ১২নং কটেজ-ওয়ার্ডে বিশেষ উদ্বিগ্নভাবে রজনীকান্তের সংবাদ লইতে লাগিলেন।

কুমার শরৎচন্দ্র রায় বাহাদুরের নামে ছোট একটি কবিতা লিখিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত "অমৃত" পুস্তকখানি উৎসর্গ করেন। সেই কবিতাটির শেষের তিনটি ছত্র এইরূপ:—

"গেঁথেছি এ ক্ষুদ্রমালা বড় কষ্ট ক'রি',
পর দীন উপহার; এই মোর শেষ,
কুমার! করুণানিধি! দেখো, র'ল দেশ।"

লক্ষ্য করিবার বিষয় মৃত্যুশয্যাতেও রজনীকান্ত দেশের কথা ভুলেন নাই। এমনই তিনি নিজের দেশকে অন্তরের সহিত ভালবাসিতেন।

জুন মাসেই রজনীকান্তের অবস্থা বিশেষ আশংকাজনক হইয়া উঠিল। এইমাসের মধ্যভাগে রজনীকান্তেরই অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ তাঁহাকে দেখিতে আসেন। কাগজে লিখিয়াই তাঁহাদের কথাবার্ত্তা চলে। রজনীকান্ত তাঁহার দিনলিপিতে (Diary) এই কথোপকথন লিখিয়া রাখিয়া যান। উহা পড়িলে চোখের জল রোধ করা যায় না। বিদায়কালে রজনীকান্ত হারমোনিয়াম বাজাইলেন, এবং তাঁহার পুত্রেরা রজনীকান্তেরই রচিত গান—

"বেলা যে ফুরায়ে যায়,
খেলা কি ভাঙ্গে না হায়,
অবোধ জীবন পথযাত্রী"...

গাহিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঘর হইতে বাহিরে যাইবার পরই রজনী-কান্ত..."আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ"...গানটি রচনা করেন।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ বাড়ী গিয়া লিখিয়া পাঠাইলেন —'মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিলাম। * * * কাঠ যতই পুড়িতেছে অগ্নি আরো ততবেশী করিয়াই জ্বলিতেছে। * * * দেখিলাম আত্মার এক মুক্ত স্বরূপ।" কবির এ প্রশস্তি রজনীকান্তের অন্তর-লোকের সম্যক পরিচয়।

এই 'কটেজ-ওয়ার্ডে' থাকিয়াই রজনীকান্ত পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুতিমত তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শচীন্দ্রনাথের বিবাহ দিলেন। যাদবচন্দ্র সেনের তৃতীয়া কন্যা গিরীন্দ্রমোহিনীর সহিত এ বিবাহ সম্পন্ন হইল। নববধূ আসিয়া পীড়িত শ্বশুরের সেবায় সানন্দে নিযুক্ত হইলেন। রজনীকান্ত তাঁহার রোজনামচা'য় লিখিলেন—"ভাল করে তোল, ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর সেরে উঠি।"

এই সময়েই রজনীকান্তকে দেখিতে আসিয়া তাঁহার ভগিনীপতি রোহিনীকান্ত নিজেই সহসা পীড়িত হইয়া পড়িলেন, এবং সেই পীড়াতেই তাঁহার মৃত্যু হইল। রজনীকান্তের একমাত্র সহোদরা ভগিনী ক্ষীরোদবাসিনী বিধবা হইলেন। মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে রজনীকান্ত আর একটি মর্ম্মান্তিক আঘাত পাইয়া গেলেন।

সকলের আন্তরিক চেষ্টা ও আকুল প্রার্থনায় এ কাল ব্যাধির কিছুমাত্র উপশম হইল না। অবশেষে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই সেপ্টেম্বর —"মা আমার, মারি, কোলে নে মা। আমায় মার্জ্জনা করে নে মা"—এই শেষ কথা কয়টি লিখিতে লিখিতেই রজনীকান্তের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল, বিশ্বমাতার শান্তিময় ক্রোড়ে তিনি আশ্রয় পাইলেন।

বন্ধুবান্ধবেরা হাসপাতালের দ্বারে উপস্থিত হইয়া তাঁহারই রচিত—"কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারই রসাল নন্দনে, কবে তপিত এ চিত করিব শীতল তোমারই করুণা চন্দনে" গানটি গাহিতে গাহিতে রজনী-কান্তের পার্থিব দেহ গঙ্গার তীরে লইয়া গিয়া ভস্মীভূত করিল। কান্ত কবির ইহলীলার শেষ হইল।*

---

* নলিনীরঞ্জন পণ্ডিতের "কান্তকবি রজনীকান্ত" ও স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত আর. কে. দাশগুপ্তের প্রবন্ধ হইতে উপাদান সংগৃহীত। তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্মৃতিচারণ ঃ রাষ্ট্রপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি

দেবেন্দ্রনাথ মিত্র

সাল ও তারিখ মনে নাই। গোয়ালন্দ (অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) হইতে চাঁদপুর (অধুনা পূর্ব পাকিস্তান) অভিমুখী মেল জাহাজে ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়: তখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Inspector of Colleges, কলিকাতা হইতে আসিতেছিলেন, গোয়ালন্দে জাহাজে ওঠেন। আমি পরের ষ্টেশন টেপাখোলা হইতে জাহাজে উঠিয়াছিলাম এবং জাহাজের যে কামরায় প্রবেশ করিয়াছিলাম সেই কামরার একটি 'বার্থে' ডাঃ মুখার্জি ছিলেন. আর একটি 'বার্থে' কেহই ছিলেন না, আমি উহা দখল করিলাম। ডাঃ মুখার্জি তাঁহার 'বার্থে' শুইয়াছিলেন, আমাকে দেখিয়া উঠিয়া বসিলেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই পরস্পরের পরিচয় হইল। জাহাজে আমরা দ্বিপ্রহর হইতে অপরাহ্ন পর্যন্ত এক সঙ্গে ছিলাম, প্রায় ৩ ঘণ্টা। পরে আমি জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়া অন্যত্র গমন করি, তিনি জাহাজেই রহিলেন। আমি কৃষি-বিভাগে কাজ করি শুনিয়া তিনি আমাদের দেশের কৃষির নানা সমস্যার কথা বলিলেন; আমার সঙ্কীর্ণ শিক্ষা, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা-অনুযায়ী তাঁহার সহিত আলোচনা করিলাম। তিন ঘণ্টা কোথা দিয়া কাটিয়া গেল বুঝিতে পারিলাম না। আমি জাহাজ হইতে নামিবার পূর্ব্বে তিনি তাঁহার একটি "ক্যাম্বিসের ব্যাগ" খুলিলেন এবং তাহার ভিতর হইতে একটি খাবারের কৌটা বাহির করিলেন এবং উহার মধ্যে যেসকল খাদ্যদ্রব্য ছিল, দুই ভাগ করিলেন, আমাকে এক ভাগ খাইতে দিলেন, নিজে আর-এক ভাগ খাইলেন। মনে হইল দু'জনেই যেন কত দিনের পরিচিত। ঐ "ক্যাম্বিসের ব্যাগ হইতেই তাঁহার ডাবা হুঁকা, কলিকা, তামাক, টিকা বাহির হইল এবং তাঁহার ভৃত্য তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। জাহাজ হইতে নামিবার সময় তাঁহার পদধূলি লইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম; তিনি যেন একটু বিব্রত হইলেন এবং বলিলেন কলিকাতায় যাইলে যেন তাঁহার সহিত দেখা করি। ঘটনাচক্রে দেখা করা আর হয় নাই, তবে তাঁহার সহিত চিঠিপত্রের আদান-প্রদান হইয়াছিল, সবই কৃষি-সমস্যা সম্বন্ধে।

উপরোক্ত ঘটনার বহুদিন পর মধুপুরে তাঁহার সহিত জাহাজের পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। সেখানে আমি তাঁহার বাড়ীতে প্রায়ই যাইতাম, তিনি মাঝে মাঝে আমার শ্বশুরালয়ে (অরুণোদয়ে) আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। বেশী দিন স্যার আশুতোষ মুখার্জির বাড়ীতেই (গঙ্গাপ্রসাদ হাউসে) দেখা হইত; সেখানে তিনি রমাপ্রসাদ বাবু ও শ্যামাপ্রসাদ বাবুর সহিত দেখা করিতে আসিতেন, আমিও সেখানে যাইতাম। মধুপুরেই হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির ভিতরের মানুষটিকে চিনিতে পারি। তাঁহার জীবনের কত কথাই আমাকে বলিয়াছেন। বেশ মনে আছে তিনি বলিয়াছিলেন যে প্রথম জীবনে এক বিলাতী ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে তাঁহাকে একটি উচ্চপদে নিযুক্ত করিবার জন্য মনোনীত করেন, নিয়োগ-পত্রও আসে, তিনি উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি (প্যাণ্ট, কোট ইত্যাদিও) প্রস্তুত করেন, কিন্তু পরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে তাঁহার নামের আগে একটি বিলাতী নাম রাখিতে বলেন, তিনি এই প্রস্তাব ঘৃণার সহিত ত্যাগ করেন। একাধারে তিনি আপাতঃদৃষ্টিতে কৃপণ, দানবীর, দেশ-প্রেমিক এবং খাঁটি বাঙালী। মধুপুরের গাড়ীর গাড়োয়ানরা তাঁহার সম্বন্ধে বলিত, এই বাবু যখন

মধুপুরে আসেন এবং অবস্থান করেন তখন দুই বার গাড়ীতে উঠেন, একবার যখন মধুপুর রেল-ষ্টেশন হইতে ৫২ বিঘাতে তাঁহার গৃহে গমন করেন, আর এক বার যখন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময় মধুপুর ষ্টেশনে আসেন। তাঁহার গুণাবলীর বিবরণ দেওয়া অনাবশ্যক। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, মধুপুরে যতবার তাঁহার বাড়ীতে গিয়াছি তাঁহার সহধর্মিণীর নিজ হস্তে প্রস্তুত জলখাবারে তৃপ্ত করিয়াছেন, কিছু না কিছু বাড়ীতে থাকিতই। আর একটি হাসির কথা বলিতেছি; তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার ভৃত্য সকালে মধুপুরের বাজারে বাজার করিতে যাইত. তাঁহার গৃহ হইতে মধুপুরের বাজার প্রায় ২ মাইল। কিন্তু তিনি ছোট-খাটো জিনিষ যেমন হলুদ কি ধনে ভৃত্যকে কিনিয়া আনিবার জন্য বলিতেন না। উক্ত ছোটখাটো জিনিষ কিনিবার ওজুহাতে তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী অপরাহ্নে বাজারে আসিতেন, ইহার ফলে তাঁহাদের অপরাহ্নে বেড়ানোও হইত তিনি বলিতেন, যদি এইরূপ ছোট-খাটো অথচ প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনিবার গরজ না থাকিত তাহা হইলে তাঁহাদের বেড়ানোর গরজও হইত না।

মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যুবকগণকে কি ভাবে কৃষি-কার্য্যে উদ্বুদ্ধ করা যায়, সেসম্বন্ধে তাঁহার সহিত আলোচনা হইত, তাঁহাকে একটি পরিকল্পনাও দিয়াছিলাম, কিন্তু উহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। এই সম্পর্কে তাঁহার সহিত চিঠির আদান-প্রদান হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন আগে যে সকল প্রতিশ্রুতি দিয়াছি সেগুলো সম্পন্ন করিবার পর এই পরিকল্পনা ধরবো। বিধাতার ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ।

ইহার পর তাঁহার সহিত খেই হারাইয়া ফেলি। তিনি তখন Constituent Assemblyর Vice-President, কি করিয়া সেই হারানো খেই আবার জোড়া লাগিল, এখন তাহাই বলিতেছি। ১৯৫১ সালের ২৪শে জুলাই তদানীন্তন খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের নেতৃত্বে আমার গ্রামে (হুগলী জেলার আঁটপুর) পশ্চিম বাংলার প্রথম ভূমি-সেনা (Land Army) গঠিত হয়। শ্রীসেন আমাদের বলেন, ডাঃ মুখার্জি প্রথম দলের একজন ভূমি-সেনা হইবার এবং ঐ দিন আঁটপুর যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা যেন নিমন্ত্রণ করি। তদনুসারে কৃষি-বিভাগের অধিকারিক ডাঃ এইচ, কে নন্দী, সহকারী অধিকারিক শ্রীএস, সি রায় ও আমি ডাঃ মুখার্জির ভিহি শ্রীরামপুরের বাড়ীতে তাঁহাকে নিমন্ত্রন করিতে যাই। আবার বহুদিন পর আমাকে দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন এবং ঐ দিন আঁটপুর যাইতে রাজী হইলেন। কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর আমি হঠাৎ ডাঃ মুখার্জিকে বলিয়া ফেলিলাম, আপনি ত সাহিত্যের লোক, ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের অনুপস্থিতির সময় Constituent Assemblyর কূটনৈতিক তর্ক-বিতর্কের সমাধান কি করিয়া করিতেন; তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আবার ছাত্র হইতে হইয়াছিল। অনেক আন্তর্জাতিক ইতিহাসের বই পড়িতে হইয়াছিল।

দুঃখের বিষয় অসুস্থতাবশতঃ ডাঃ মুখার্জি ঐ দিন আঁটপুর যাইতে পারেন নাই। ঐ দিন আঁটপুরে একটি মনোরম অনুষ্ঠানে ১০০ জন ভূমি-সেনা শপথ গ্রহণ করেন। সরকার পক্ষ হইতে প্রত্যেককে একটি 'ব্যাজ' ও একটি কোদাল দেওয়া হয়। শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ও শ্রীহেমচন্দ্র নস্কর (তদানীন্তন মন্ত্রী) ভূমি সেনার 'ব্যাজ' ও কোদাল পাইয়াছিলেন। পরে তখনি নব-গঠিত ভূমি-সেনার দল আঁটপুরের পার্শ্ববর্ত্তী গড়পাড় গ্রামে কোদাল দিয়া মাটি কোপান, উহাদের মধ্যে উভয় মন্ত্রীই ছিলেন। সরকার হইতে ইহার ছায়াচিত্রও তোলা হয়, এবং কলিকাতার ও অন্যান্য স্থানের প্রেক্ষাগারে উহা প্রদর্শিত হয়। দুঃখের বিষয় এত আড়ম্বরের সহিত ভূমি-সেনার দল গঠিত হইবার পর উহার অস্তিত্ব লোপ পায়; সরকারী মহলের রীতি-নীতি বুঝা কঠিন।

ইহার কয়েক মাস পরেই ডাঃ মুখার্জি পশ্চিম বাংলার রাষ্ট্রপাল পদে অভিষিক্ত হন। কলিকাতা ইউনিভারসিটির বিশেষ কর্ম্মচারী, আমার প্রতিবেশী শ্রীসুশীলকুমার আচার্য্য (এখন স্বর্গত) ও আমি ডাঃ

মুখার্জিকে আমাদের অভিনন্দন জানাইবার জন্য তাঁহার ডিহি শ্রীরামপুরের বাড়ীতে যাই. সুশীলবাবু পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত সুপরিচিত ছিলেন ; যাইবার সময় তিনি বলিয়াছিলেন, ডা: মুখার্জি কড়া পাকের সন্দেশ খাইতে ভালবাসেন, কিছু লইয়া গেলে ভাল হইত ; কিন্তু আমরা লইয়া যাইতে পারি নাই। আমরা বাসে প্রায় ঝুলিতে ঝুলিতে গিয়াছিলাম, এবং বাস হইতে নামিয়া পথে আরও কষ্ট পাইতে হইয়াছিল ; আমি বলিয়া ফেলিলাম. কি দুর্ভোগ : সুশীলবাবু সদাশিব লোক, বলিলেন, তীর্থস্থানে যাইতে হইলে দুর্ভোগ সহ্য করিতে হয়। আমরা সিঁড়িতে উঠিয়াই সামনের ঘরে দেখিলাম ডা: মুখার্জি অনাবৃত দেহে দাবা হুঁকায় তামাক খাইতেছেন। অতি অল্প ক্ষণ আমাদের সহিত কথা বার্ত্তা হইয়াছে, এমন সময় স্থানীয় একটি যুবক আসিয়া বলিলেন আমাকে ইলেকট্রিকের কিছু কাজ দিবেন ! ডা: মুখার্জি উত্তরে বলিলেন আমার বাড়ীতে ত ৩।৪টি আলো জ্বলে, তোমাকে আর কি কাজ দোব ? যুবকটি বলিলেন, এখানে নয়, রাজভবনের ইলেকট্রিকের কাজ ; উত্তরে ডা: মুখার্জি বলিলেন. সেখানে আমার কোন কাজ দিবার ক্ষমতা নাই. তুমি হাতের কাজ শিখেছ তোমার ভাবনা কি, আমারই এখন ভাবনা : লাটসাহেবের চাকরী যখন শেষ হয়ে যাবে, কোন জায়গাতেই আমি কোন কাজ পাব না, যেখানেই চাকরীর জন্য দরখাস্ত করবো, সেখানেই বলবে "তুমি লাটসাহেব ছিলে, তোমাকে আমরা আর কি কাজ দোব" এই বলে আমাকে ভাগিয়ে দেবে। রসিকতা করে এই কথা বলিলেন, কিন্তু হাতের কাজকে এবং শ্রমের মর্যাদাকে সম্পূর্ণ মূল্য দিলেন। রসিকতার আরও পরিচয় দিতেছি, আমি যখন বলিলাম, আমাদের ইচ্ছা ছিল এখানে আসিবার সময় আপনার জন্য একটু কড়া পাকের সন্দেশ আনিব, কিন্তু হইয়া উঠিল না ; তিনি বলিলেন আজ যদি আনতে, খেতাম ; কিন্তু রাজভবনে পাঠালে অনেক প্রহরীকে পার হতে হবে, আবার রটে যাবে লাটসাহেব ঘুষ নেয়। আর একটা হাসির কথা বলি ; কথায় কথায় তিনি বলিলেন এখন একটা বড় রকমের দুর্ভাবনা গেল। আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম সেই দুর্ভাবনটা কি ? তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, এখানে চাকর আসে, ২।১ দিন পরেই কাজ ছেড়ে চলে যায়, আমরা দু'জন মানুষ. হাট বাজারটা কম, তাদের লাভ কিছু থাকে না. কাজে কাজেই ছেড়ে চলে যায়, চাকর খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হতে হয়। রাজভবনে গেলে আর চাকর খুঁজতে হবে না, লাটসাহেব হয়ে এই একটা খুব বড় সুবিধা হল। আমরাও তাঁহার এই কথা শুনিয়া খুব হাসিতে লাগিলাম। আমাকে বলিলেন, এখন প্রচুর সময় পাবো, তোমার সঙ্গে কৃষির আলোচনা করবো। 'আমি তাঁহাকে বলিলাম, আমার গ্রামে ভূমি-সেনা গঠনের দিন যাইতে পারেন নাই, ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল রাজ্যপাল হইয়া যাইবেন. এইবার আপনাকে আমার গ্রামে একবার যাইতেই হইবে। প্রতিশ্রুতি দিলেন যাইবেন।

লাট সাহেব হইয়াছেন, কিন্তু সেই সহজ, সরল, রসিক মানুষটিই আছেন. কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই, বেশ ভূষায় ত নয়ই, বাড়ীর আসবাবপত্রেরও কোন রদবদল হয় নাই : সেই এলোমেলো আগেকার অবস্থা, ঘরের সামনে ভৃত্য বা দারোয়ান নাই, কার্ড দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে হয় না, মোটারও নাই, এমন কি টেলিফোনও নাই : অথচ কত বড় বড় লোক অভিনন্দন জানাইবার জন্য যাইতেছেন, এ দিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নাই। ফিরিবার পথে সুশীলবাবুর কথা মনে হইল, যেন তীর্থক্ষেত্রে গিয়াছিলাম, তীর্থক্ষেত্র হইতে ফিরিতেছি।

ইহার পর ৩।৪ মাস কাটিয়া গেল। আমার গ্রামে বার্ষিক পল্লী উন্নয়ন প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিন স্থির হয় ১৯৫২ সালের ১৬ই মার্চ। তদানীন্তন খাদ্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র সেন উদ্বোধন করিতে স্বীকৃত হন ; প্রধানত: তাঁহারই উৎসাহে ও প্রেরণায় ১৯৫০ সালে এই প্রদর্শনী প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। ৪ঠা মার্চ আমি রাজভবনে যাইয়া রাজ্যপাল ডা: হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির সহিত দেখা করি এবং প্রদর্শনীর বিতরণী-সভায় পৌরোহিত্য করিবার জন্য অনুরোধ করি ; বেশ মনে আছে তাঁহার

প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর আপত্তির কথা : তিনি বলিলেন, প্রথমতঃ মার্চ মাসের একটি দিনও রাষ্ট্রপালের Engagement ছাড়া নাই, দ্বিতীয়তঃ মার্চের গ্রীষ্মে মার্টিন কোম্পানীর ছোট রেলে ২৫ মাইল পথ আড়াই ঘণ্টায় অতিক্রম করা রাজ্যপালের পক্ষে খুবই কষ্টকর হইবে, তৃতীয়তঃ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পরামর্শ না করিয়া রাজ্যপালের আঁটপুর যাওয়া সম্বন্ধে কিছুই নিদ্দিষ্টভাবে বলা যায় না। রাজ্যপাল কিন্তু তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা মনে রাখিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার Engagement Book দেখিয়া বলিলেন ২৮শে মার্চ সকালে তিনি আঁটপুর যাইতে পারেন, কিন্তু ঐ দিন অপরাহ্ণে তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইবে। আমি তাঁহার জন্য Special train এর কথা তুলিয়াছিলাম, তিনি হাসিয়া বলিলেন আমার জন্য আবার Special train. রাজ্যপাল আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আমাকে আঁটপুরে কি খাওয়াইবে? আমি শুক্তো এবং আর কয়েক প্রকার সাধারণ তরকারীর কথা বলিয়াছিলাম, তিনি বলিয়াছিলেন, কেবল শুক্তো হইলেই হইবে। শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জ্জির যাইবারও কথা ছিল। এইসব কথাবার্ত্তার পরেও প্রাইভেট্ সেক্রেটারী মহাশয় আমাকে সাবধান করিয়া দিলেন আমি যেন তৎক্ষণাৎ রাজ্যপালের ২৮শে মার্চ আঁটপুর যাইবার কথা ঘোষণা না করি, তাঁহাকে procedure অনুসারে চলিতে হইবে। আমি তথাস্তু বলিয়া চলিয়া আসিলাম।

উপরে যাহা বলিলাম তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে রাজ্যপাল তাঁহার প্রতিশ্রুতির কথা ভোলেন নাই, এবং আমার প্রতি গভীর প্রীতি ও স্নেহবশতঃ তাঁহার প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর আপত্তি সত্ত্বেও এবং হয় ত নিজেকে অসুবিধায় ফেলিয়া ২৮শে মার্চ আঁটপুর যাওয়া স্থির করিলেন।

আমার গ্রামে ১৬ই মার্চ পল্লী উন্নয়ন প্রদর্শনীর উদ্বোধন হইল। উহাকে ২৮শে মার্চ পর্য্যন্ত স্থায়ী করিতে হইল; সাধারণতঃ উহা এক সপ্তাহ স্থায়ী হয়। প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর নিষেধ অনুসারে আমরা ঘোষণা করিতে পারিলাম না যে ২৮শে মার্চ প্রদর্শনীর পুরস্কার-বিতরণী-সভায় রাজ্যপাল পৌরোহিত্য করিবেন। যাহা হউক ২০শে মার্চ রাজ্যপালের "প্রোগ্রাম" পাইলাম যে তিনি ২৮শে মার্চ সকালে রাজভবন হইতে মোটারে মার্টিন কোম্পানীর ডোমজুর ষ্টেশনে আসিবেন এবং তথা হইতে ট্রেনে আসিয়া বেলা ১০ টার সময় আঁটপুর পৌঁছিবেন এবং ঐ দিন অপরাহ্ণের ট্রেনে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। এখন আমরা রাজ্যপালের 'প্রোগ্রাম' প্রচারিত করিলাম। এ ধারে পুলিস বিভাগের নানা স্তরের কর্ম্মচারীগণ আঁটপুরে আমার বাড়ীতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন; রাজ্যপাল কোন্ কোন্ রাস্তা দিয়া কোন্ কোন্ জায়গায় যাইবেন, প্রদর্শনীতে কোথায় বসিবেন, আমার বাড়ীর কোন্ ঘরে অবস্থান করিবেন, কোন্ ঘরে আহার গ্রহণ করিবেন, ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে খোঁজ খবর লইলেন; এমন কি সাদা পোষাক পরিহিত পুলিস কর্ম্মচারীরা কোথায় অবস্থান করিবেন সেই জায়গা আমাকে দেখাইতে হইল এবং তাঁহাদের অবস্থানে উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে হইল। আমি তখন পুলিস বিভাগের কর্ম্মচারীদিগকে বলিলাম, হরেন্দ্রকুমার মুখার্জ্জির নিরাপত্তার জন্য এই সকল ব্যবস্থার প্রয়োজন কি, তিনি সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন। এখানে সকল সম্প্রদায়ের সকল লোক তাঁহার প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিবেন। তাঁহারা বলিলেন, আগেকার সব নিয়ম এখনও বজবৎ আছে, এবং তাঁহাদের সব নিয়ম পালন করিতে হইবে। ইহার পর আমি নীরব রহিলাম, এবং ভাবিলাম স্বাধীনতা লাভ করা সত্ত্বে আমরা বৃটিশ আমলের রীতি-নীতি এখনও অনুকরণ করিতেছি।

ডোমজুর ষ্টেশনে রাজ্যপালকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য আমাদের পক্ষ হইতে কয়েকজন প্রতিনিধি (শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ধর, শ্রীসুজ্যোতিনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি) উপস্থিত ছিলেন। রাজ্যপালের জন্য ট্রে

একটি 'সেলুন' যুক্ত ছিল, ডোমজুর ষ্টেশনে বহু জনসমাগম হইয়াছিল। রাজ্যপালের 'সেলুনে' আমাদের প্রতিনিধিগণও উঠিয়াছিলেন। রাজ্যপাল 'সেলুনে' বসিয়া ষ্টেশনের সিগারেট-বিক্রেতাকে সিগারেট কিনিবার জন্য ডাকিলেন, এই সময় শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ধর তাহার নিজের পকেট হইতে এক প্যাকেট সিগারেট বাহির করিয়া অতি সম্ভ্রমের সহিত রাজ্যপালের হাতে দিলেন। তিনিও উহা অমায়িকভাবে গ্রহণ করিলেন। ইনি হচ্ছেন আমাদের রাষ্ট্রপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি। ঠিক আগেকার মতই আছেন, কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই। আর কোন V.I.P. করিতে পারিতেন কি?

ডোমজুর ষ্টেশন হইতে আঁটপুর ১৭।১৮ মাইলের পথ, এবং ৮।৯টা ষ্টেশন। প্রত্যেক ষ্টেশনেই বিপুল লোক, এবং প্রত্যেক ষ্টেশন হইতে বহুলোক ট্রেণে আঁটপুর আসিলেন। আঁটপুর ষ্টেশনে রাজ্যপাল যখন ট্রেণ হইতে অবতরণ করিলেন তখন ষ্টেশনে তিল ধারণের স্থান ছিল না, বিপুল জনসমাগমের বিপুল উত্তেজনা। এইরূপ পল্লী-অঞ্চলে রাজ্যপালের বোধ হয় এই প্রথম আগমন। ষ্টেশনে শত শত বালিকা শঙ্খধ্বনির দ্বারা রাজ্যপালকে স্বাগতম জানাইলেন। আঁটপুর ভূমিসেনার দল তাঁহাদের ব্যাজ পরিয়া কোদাল স্কন্ধে তাঁহাকে অভিবাদন জানাইলেন। ষ্টেশন হইতে প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণ খুবই নিকটে ছিল। তবুও রাজ্যপালকে স্থানীয় একখানা ট্যাক্সিতে প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে আনা হইল। রাস্তার দুই ধারেই বালক-বালিকাগণ পতাকা হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন; তাঁহারা করজোড়ে রাষ্ট্রপালকে প্রণাম করিলেন। রাজ্যপালও তাঁহার দুই হাত তুলিয়া তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। গাড়ীতে তাঁহার সহিত আমি ছিলাম, প্রথম কথা তিনি আমাকে বলিলেন, আমার জন্য কেন এত খরচ করলে, আমি বললাম আপনার এই অভ্যর্থনায় আমি মোটেই খরচ করিনি, সবই স্বতঃস্ফূর্ত্ত।

তারপর রসিকপ্রবর রাজ্যপাল আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের ভূমিসেনার কোদালগুলো সবই চক্ চক্ করছে, ওগুলো দিয়ে কখনও কি মাটি কাটা হয়েছে, না ওগুলো তোলা থাকে, কেউ এলে কাঁধে নিয়ে দাঁড়ানো হয়। তাঁহার কথাগুলো প্রায়ই সত্য। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভূমিসেনার অকালে মৃত্যু ঘটিয়াছিল। গাড়ীতে আসিবার সময় রাজ্যপালকে বলিয়াছিলাম, উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিদর্শনের কথা নাই, বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিয়াছিলাম, তিনি স্বীকৃত হইয়াছিলেন। পরে এই সম্বন্ধে একটি অপ্রীতিকর তর্ক-বিতর্কের কথা বলিব। আমি বিদ্যালয়ের সম্পাদক ছিলাম।

প্রথমে রাজ্যপালকে আঁটপুর মিত্র-বাটীর শ্রীশ্রী৺রাধাগোবিন্দ জিউর মন্দিরপ্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত শিশু-প্রদর্শনীতে আনা হইল। অসুস্থতা বশতঃ শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জি আসিতে পারেন নাই বলিয়া রাষ্ট্রপাল শিশু-প্রদর্শনীতে পুরস্কার বিতরণ করিলেন এবং একটি ভাষণ দিলেন। পরে কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে আগত সকলের সহিত জুতা খুলিয়া দেউলের উপর উঠিয়া দেউড়ির নিকট দাঁড়াইলেন। ইহার দ্বারাই তিনি সকলের হৃদয় জয় করিয়া ফেলিলেন। মনে আছে মধুপুরে মিত্র ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক নির্মল মিত্র বলিয়াছিলেন, হরেন মুখার্জি আবার খ্রীশ্চান নাকি, ও ত তামাক খায়, আড়ালে বলিতেন ও তো তামাক-খেকো খ্রীশ্চান। এই কথা তাঁহাকে আমি বলিয়াছিলাম, তিনি কেবল হাসিয়াছিলেন, নির্মল মিত্র তাঁহার নিকট সুপরিচিত ছিলেন।

ইহার পর দেউলের সম্মুখে এক অতি প্রাচীন বকুল বৃক্ষের তলদেশে বাঁধানো বেদীতে তাঁহাকে আনা হয়। এই বেদীও বহুদিনের। এইখানে নানা ক্রীড়া-কৌতুক দেখানো হয়। একজন তাহার একটি মেয়েকে খুব লম্বা বাঁশের শিরোভাগে উঠাইয়া নানারূপ রোমাঞ্চকর খেলা দেখাইয়াছিল, পরে সে যখন রাজ্যপালের নিকটে খেলার জন্য সার্টিফিকেট লইতে আসিয়াছিল, তিনি অত্যন্ত কুপিত হইয়া বলিয়াছিলেন, আমার যদি ক্ষমতা থাকিত তোমাকে জেলে দিতাম, তুমি তোমার মেয়ের সর্ব্বনাশ

করছ, তার ভবিষ্যতের নারীত্ব নষ্ট করছ। আমরাও এইরূপ খেলার আয়োজন করিয়া রাজ্যপালের কথাতে খুবই লজ্জিত হইলাম। পরের কার্য্যসূচী ছিল অনতিদূরে মিত্রবাটীর আটচালায় পুরস্কার বিতরণ; এখানকার জনসমাগম বর্ণনাতীত। তখন প্রায় দ্বিপ্রহর, দারুণ গরম, অতি কষ্টে রাজ্যপালকে তাঁহার আসনে বসানো হইল, তিনি যেন চেপ্‌টে গেলেন, কার্যসূচী খুবই সংক্ষিপ্ত করা হইল। এই সভায় আমি ঘোষণা করিলাম যে রাজ্যপাল কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের সময় যখন ষ্টেশনে যাইবেন, সেই সময় পথে আঁটপুর উচ্চ বিদ্যালয় পরিদর্শন করিবেন।

তাহার পর নিকটেই আমার কুটীরে আগমন। বলা বাহুল্য রাজ্যপালের আগমন হেতু অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তি ঐ দিন আঁটপুর আসিয়াছিলেন; সকলেই আমার আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাজ্যপালের সঙ্গে ছিল একটি ছোট চামড়ার সুটকেশ, যাহা হউক একটা উন্নতি দেখিলাম, জাহাজে দেখিয়াছিলাম ক্যাম্বিসের ব্যাগ। আর ছিলেন ২ জন তকমা-আঁটা চাপরাশী। রাজ্যপালের পরনে ছিল ধুতি ও কোট। অতি সাধারণ। একটি সাধারণ তক্তাপোশে তাঁহার জন্য বিছানা পাতিয়া রাখিয়াছিলাম, গদী নয়,তোষক। যদিও তাঁহার বসিবার জন্য ২।১ খানা গদী-আঁটা চেয়ার সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলাম; রাজ্যপাল ঘরে ঢুকিয়াই কোট, গেঞ্জী খুলিয়া ফেলিলেন এবং বিছানায় হেলান দিয়া বসিলেন। একজন বালক-ভৃত্য (সেবা মালিক) বড় একখানা তালপাতার পাখা লইয়া তাঁহাকে বাতাস করিতে লাগিল; ইতিমধ্যে একজন চাপরাশী সুটকেশ হইতে দাবা হুঁকা, তামাক টিকা বাহির করিল এবং তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল। আমার এক পুত্র (সমর) কলিকাতা হইতে রূপা-বাঁধানো হুঁকা গড়গড়া, নল, তামাক লইয়া আসিয়াছিল। সেও গড়গড়ায় তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল, রাজ্যপাল তাহাকে বলিলেন, আমার তামাকটা আগে খাই, তোমার তামাকটা পরে খাবো-তবে রূপা-বাঁধানো হুঁকা, নল ব্যবহার করবো না। তাঁহার নিজের ডাবা হুঁকায় তামাক খাইতে লাগিলেন। এই অবস্থাতেই সকলের সঙ্গে দেখা করিলেন, কত কথা বলিলেন। F.A.O.র ডাঃ ফরসাইথও আমার নিমন্ত্রণে ঐদিন আঁটপুর গিয়াছিলেন। তিনিও দেখা করিবার জন্য ঐ ঘরে ঢুকিলেন। তাঁহাকে বলিলেন See, how I live in private. বহু মহিলা ও বালিকাও আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে কত হাসি ঠাট্টা করিলেন। তাঁহাদের বলিলেন, সাবান, পাউডার ব্যবহার করো, লিপষ্টিক ব্যবহার করো না, নখে রং মেখো না। ইতিমধ্যে আমার পুত্র তাহার আনীত তামাক সাজিয়া তাঁহার ডাবা হুঁকায় দিল; সেই তামাক খাইয়া তাহাকে বলিলেন, তোমার তামাকটা আমার তামাকের চেয়ে ভাল, যাবার সময় নিয়ে যাবো। আমার মনে হয় আমার পুত্রের প্রতি প্রীতি ও স্নেহবশতঃ এই কথা বলিয়াছিলেন, তামাকের গুণাগুণ প্রশ্ন ছিল না; যে বালক-ভৃত্য বাতাস করিতেছিল তাহার সহিতও কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন, তাহার সব খোঁজ খবর নিলেন, সে জাতিতে দুলে, তাহাকে লেখাপড়া শিখিতে বলিলেন।

ইতিমধ্যে জেলা-শাসক আমাকে আমার কুটীরের বারান্দায় ডাকিয়া বলিলেন, তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া রাজ্যপালের আঁটপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় পরিদর্শনের কথা ঘোষণা করা আমার উচিত হয় নাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম, রাজ্যপাল আমাকে বলিয়াছেন, তদনুসারে আমি ঘোষণা করিয়াছি তিনি আমাকে বলিলেন যখন প্রাইভেট্ সেক্রেটারী তাঁহার সঙ্গে আসেন নাই তখন তাঁহার এখানে গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করার ভার আমার উপরেই ন্যস্ত আছে। আমি জেলা শাসকের আপত্তির কথা বলিলাম, তিনি বলিলেন আমি যখন বলিয়াছি এবং তুমি ঘোষণা করিয়াছ, আমি যাইবই, ওদের মনোভাব এখনও আগেকার মত। আর ২।১ টি বিষয় সম্পর্কে জেলা শাসকের সহিত অপ্রীতিকর কথাবার্তা হয়। তিনি বলিলেন স্বামী বিবেকানন্দ যে আঁটপুর আসিয়াছিলেন এবং এখানেই সন্ন্যাসধর্ম্ম

গ্রহণের চরম সঙ্কল্প করেন তাহার কোন প্রমাণ নাই; তাঁহাকে রোমাঁ রোলাঁর রামকৃষ্ণের জীবনী পড়িতে অনুরোধ করা হইল। মনে হইতেছে আঁটপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় হইতে রোমাঁ রোলাঁর উক্ত পুস্তক আনিয়া দেখানোও হইয়াছিল।

এইবার মধ্যাহ্নভোজনের পালা। আমি রাজ্যপালকে জিজ্ঞাসা করিলাম তিনি উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণের সহিত চেয়ারে বসিয়া টেবিলে খাইবেন, না অন্য সকলের সহিত মাটিতে বসিয়া খাইবেন? তিনি বলিলেন আমি সকলের সঙ্গে এই রকম খালি গায়ে মেঝেতে বসে কলাপাতায় খাবো। তাহাই করিলেন, তবে তাঁহাকে কুশাসনের পরিবর্ত্তে একটা কার্পেটের আসন দেওয়া হইয়াছিল এবং কলাপাতার পরিবর্ত্তে একটা কাঁসার থালায় আহার্য্য দ্রব্য দেওয়া হইয়াছিল। আমার ভাগিনেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান্ বিভাগের অধ্যাপক ডাঃ পূর্ণেন্দুকুমার বসু (বর্ত্তমানে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সালার) এবং আরও অনেক স্থানীয় ও কলকাতা হইতে আগত ব্যক্তি একই পংক্তিতে খাইতে বসিয়াছিলেন। খাইতে খাইতে কত রকমের হাসির গল্প বলিলেন, যাকে আমরা সাধারণ কথায় বলি 'জমাইয়া' রাখিলেন। সকলের সঙ্গে যেন মিশিয়া গেলেন। হঠাৎ প্রশ্ন করিলেন, কোন্ তরকারীটা বাঙালার অতি প্রিয়, কিন্তু অন্য কোন প্রদেশে উহার প্রচলন নাই, অনেকে অনেক রকম তরকারীর নাম করিলেন। তিনি বলিলেন কারোর ঠিক হল না, বলিলেন, শুক্তো। তখন আমার মনে হইল আমাকে কেন বলিয়াছিলেন কেবল শুক্তো হলেই হবে। আমাকে বলিলেন-তুমি অনেক বেশী আয়োজন করেছ। আমি বলিলাম সবই স্থানীয়; তিনি বলিলেন, দই মিষ্টিটা নিশ্চয়ই কলকাতা থেকে আমদানী করেছ। আমি বলিলাম ও দুটোও স্থানীয়। আশ্চর্য্য হইলেন, সুখ্যাতি করিলেন, দামও জিজ্ঞাসা করিলেন। খাওয়া শেষ হইবার পরেই খোঁজ লইলেন চাপরাশীরা কি করিতেছে; আমি বলিলাম খাইতেছে; তখন বলিলেন ওদের এখন বলো না আমার খাওয়া শেষ হয়ে গেছে, খেতে খেতে তামাক দেবার জন্য উঠে আসবে। খোঁজ লইলেন পুলিসের লোকেদের খাওয়া হইয়াছে কিনা। আমি বলিলাম তাঁহারা খাইতেছেন। নিজে যাইয়া দেখিয়া আসিলেন; এমন দরদী মন! আমার পুত্র তামাক সাজিয়া আনিয়া দিল।

ট্রেন ছাড়িবার সময় খুব কম ছিল; আমি বলিলাম ষ্টেশন-মাষ্টারকে সংবাদ দিলে তিনি একটু দেরী করে ট্রেন ছাড়বেন। উত্তরে বলিলেন আমার জন্য দেরী করে ট্রেন ছাড়লে কত লোকের অসুবিধা হবে ভেবেছ কি। আমি নিরুত্তর রহিলাম; সংবাদপত্রে পড়িয়াছি কত V. I. P.র জন্য কত সময় ট্রেন দেরীতে ছাড়ে; কি পার্থক্য! আমার পুত্র ধরিয়া বসিল তাঁহাদের সহিত ছবি তুলিতে হইবে। সময় নাই, তবুও তাহাকে নিরাশ করিলেন না। বাড়ীর ভিতরের উঠানে ছবি তোলা হইল, আমার পুত্র তাঁহার গলায় মালা পরাইয়া দিতে গেলে, বলিলেন তোমাদের সঙ্গে ছবি তুলবো, মালা পরবো কেন, মালা পরিলেন না! প্রত্যাবর্ত্তনের সময় পুত্রের আনীত শালপাতায় মোড়া তামাকটুকু নিজে সুটকেশে পুরিলেন! ইনিই হচ্ছেন আমাদের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি, খাঁটি বাঙ্গালীর মন! ষ্টেশনে বিরাট জনসমাবেশ, সকলেই চিৎকার করিয়া বলিলেন আবার আসিবেন; ট্রেনের দরজায় দাঁড়াইয়া সকলকে হাত তুলিয়া নমস্কার করিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া আমাকে একটি আঁটপুরে পল্লী-উন্নয়নের কথা লিখিয়াছিলেন, আমাকে শুভেচ্ছা জানাইয়াছিলেন।

ইহার পর কলিকাতায় অনেক সভা সমিতিতে আমার সঙ্গে দেখা হইয়াছে, ব্যস্ততার মধ্যেও আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন গ্রামে পল্লী-উন্নয়নের কাজ কেমন চলছে। আমি উত্তর দিয়াছি ভূমি-সেনাদলের কোদালের মত। হাসিতেন। একবার রাজভবনে তাঁহার সভাপতিত্বে বনমহোৎসবের এক মিটিং হইয়াছিল; অনেক উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কথা উঠিল একজন বেসরকারী ব্যক্তিকে বেতারে বনমহোৎসব সম্বন্ধে বলিতে হইবে। এই বেসরকারী ব্যক্তিটি কে হইবেন, প্রশ্ন উঠিল; আমি দূরে

বসিয়াছিলাম, আমার প্রতি অঙ্গুলী দেখাইয়া রাজ্যপাল বলিলেন, ঐ ত আমাদের বেসরকারী লোক রয়েছে। আমার প্রতি এইরূপ তাঁহার প্রীতি ও স্নেহ ছিল। আমি ১৯৪৫ সালে সরকারী কাজ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলাম।

১৯৬৬ সালের ২১শে জুলাই কলিকাতার ব্যাপটিষ্ট গার্লস হাই স্কুলে বনমহোৎসবের এক অনুষ্ঠান হয়। আমি তখন এই স্কুলের Ad-hoc commiteeর সেক্রেটারী এবং Rev E. G. T. Madge সভাপতি। ঐ অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করিবার জন্য আমি রাষ্ট্রপালকে অনুরোধ করি, এবং শ্রীমতী বঙ্গবালা মুখার্জিকেও আমন্ত্রণ জানাই। উভয়েই তৎক্ষণাৎ আমার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন; এবারে আমাকে আর Private Secretaryর বেড়া পার হইতে হয় নাই। সেই অনুষ্ঠানে শিক্ষা-বিভাগের তদানীন্তন অধিকারিক ডাঃ পরিমল রায় এবং বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। বিদ্যালয়ের প্রশস্ত প্রাঙ্গণে তিল ধারণের স্থান ছিল না, কার্য্যসূচীও বিচিত্র ছিল। রাজ্যপাল ও শ্রীমতী মুখার্জী সকলের সহিত মিশিয়া গেলেন, পরিচিত কত লোকের সহিত কত কথা বলিলেন। ভাষণে প্রথমেই বলিলেন, আমি এতদিন ভাবছিলাম এত প্রতিষ্ঠান আমাকে আমন্ত্রণ করেছে, আমার নিজের পাড়ার পরিচিত স্কুল থেকে আমন্ত্রণ আসছে না কেন, তাই আপনাদের আমন্ত্রণ পেয়েই ব্যারাকপুর থেকে ছুটে এসেছি। স্কুল প্রাঙ্গণে তিনি একটি ইউক্যালিপটাস গাছের চারা রোপণ করিয়াছিলেন। পরে আমি একটি কাষ্ঠফলকে লিখিয়া রাখিয়াছিলাম, Planted by Dr. H. C. Mookherjee, Governor of W. Bengal. গাছটি ভালভাবেই বর্দ্ধিত হইতেছিল। জানি না এখন তার অবস্থা কেমন। পরবর্ত্তী ৭ই আগষ্ট সন্ধ্যার সময় Radioতে রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির মহাপ্রয়াণের সংবাদে প্রচারিত হইল। অসংখ্য লোকের মত আমিও মনে করিয়াছিলাম, আমিও একজন পরম আত্মীয়কে হারাইলাম।

রাজ্যপালের কত কথাই এখনও মনে আছে। তি[illegible] বলিয়াছিলেন, রাজ্যপালের পদ হইতে অবসর গ্র[illegible] করিবার পর আবার ডিহি শ্রীরামপুরের পুরাতন বাড়ী[illegible] ফিরিয়া যাইব, টেলিফোন থাকবে না, মোটরও থাক[illegible] না, আগের মতই ছাতা হাতে করে হেঁটে হেঁ[illegible] বেড়াবো। জানি না আর কোন রাজ্যপাল এইর[illegible] কথা বলিয়াছিলেন কিনা। তিনি প্রায় ৫।৬ বৎ[illegible] রাজভবনের পরিবেশে অবস্থান করিয়াছিলেন, কি[illegible] উক্ত পরিবেশ তাঁহার কোন পরিবর্ত্তন সাধন করি[illegible] পারে নাই; তিনি নির্লিপ্তভাবেই সেখানে অবস্থ[illegible] করিয়াছিলেন।

আমার এই দীর্ঘ প্রবন্ধ পড়িয়া হরেন্দ্রকুম[illegible] মুখার্জীর ভিতরের মানুষটিকে হয়ত কতকটা হৃদয়[illegible] করা যাইবে। তিনি সকলের সঙ্গে একত্ব (onenes[illegible] প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। রাষ্ট্রপালের গদীতে বসিয়[illegible] এই একত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

তাঁহার পদধূলিতে আমার গ্রাম ধন্য হইয়াছে, আম[illegible] কুটীর ধন্য হইয়াছে। আমার গ্রামের লোকেরা এখ[illegible] তাঁহাকে শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তাঁহাকে শ্রদ্ধা[illegible] প্রণাম জানাই। তাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী বঙ্গবা[illegible] মুখোপাধ্যায়কেও আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। তি[illegible] তাঁহার স্বামীর মহান আদর্শে নিজের জীবনকে উৎ[illegible] করিয়াছেন। একদা যিনি পশ্চিম বঙ্গের প্রথম ম[illegible] ছিলেন এবং রাজভবনে রাজসিক পরিবেশে অব[illegible] করিতেন, অধুনা তিনি তাঁহার ডিহি শ্রীরামপু[illegible] পুরাতন বাড়ীতে বাস করিতেছেন। প্রচুর সম্প[illegible] অধিকারিণী হইয়াও দারিদ্র্যের ব্রত গ্রহণ করিয়াছে[illegible] সংবাদপত্রে পড়িয়াছি সাধারণ রিক্ত মহিলার [illegible] রেশনের দোকান হইতে নিজে রেশন আনিতেছে[illegible] রাস্তার টিউবওয়েল হইতে নিজে জল আনিতেছে[illegible] বর্ত্তমান যুগের এই অসাধারণ মহিলাকে আবার প্র[illegible] জানাই।

কোন্ ভাঙনের পথে

রথীন্দ্রনাথ ঘোষ

রাত্রি প্রায় দশটা হবে, ট্যাক্সী নিয়ে ব্যারাকপুর স্টেশনের পাশ দিয়ে ফেরবার সময়ে এক যুবক আমাকে হাত তুলে দাঁড়াতে ইঙ্গিত ক'রলো।

জিজ্ঞাসা ক'রলাম—কোথায় যাবেন?

নৈহাটী।

নৈহাটী!—আমি আপত্তি ক'রলাম:—না স্যার। যদি কলকাতা হত—

যুবক বেশ অসহায়ের মত বললো—বড় বিপদে পড়েছি। আপনি যদি—

মাপ ক'রবেন। আপনি বরং অন্য ট্যাক্সী দেখুন।

যুবক আমার দিকে আরও ঝুঁকে এলো:—অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু একটাও ট্যাক্সী পাচ্ছিনা। অথচ এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে এমন বিপদে পড়েছি—

ভদ্রমহিলা! আড়চোখে তাকালাম। এক পাশে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। পরনে খুব সাধারণ শাড়ী। মাথায় লম্বা করে ঘোমটা দেওয়া। খালি পা। কেমন যেন বিষণ্ন।

ঠিক আছে উঠুন।—আমি গম্ভীর সুরে ব'ললাম। —কিন্তু টাকা বেশী লাগবে। মানে, মিটারের চার্জ ছাড়াও—

হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই।—এতক্ষণ পর যুবক যেন একটু আশ্বস্ত হল।—আপনি যত টাকা চাইবেন দেব। অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।

প্রথমে মহিলা এবং পরে যুবক গাড়ীতে উঠে দরজা বন্ধ করলো। আমি ষ্টার্ট দিলাম। অনেকক্ষণ পর আমি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকালাম। দেখলাম দুজনে দুদিকে কেমন জড়সড় হয়ে বসে আছে। ভদ্রমহিলাকে কেমন ফ্যাকাশে মনে হল। মনে হল কেমন যেন আতঙ্ক। আর যুবক ভীত, সন্ত্রস্ত।

আমার মনের মধ্যে একটা সন্দেহ হঠাৎ যেন উঁকি মারলো। যুবক এই ভদ্রমহিলাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছেনা তো? যুবকের পোষাক-পরিচ্ছদ যেন কেমন ধরনের। গায়ে ডোরা-কাটা গেঞ্জি। ডান হাতের ওপর ঘড়ি, পরনে টাইট প্যান্ট। মাথার চুলগুলো কদম ছাঁট করে ছাটা।

মহিলাকে যুবকের কোন আত্মীয়া বলে মনে হ'চ্ছে না। অথচ যুবক বললো, ভদ্রমহিলাকে নিয়ে খুব বিপদে পড়েছে। কিন্তু কি এমন বিপদ? যদি দুজনে কোথাও পালিয়ে যাবার মতলবেই বেরিয়ে থাকে তাহ'লেও এমন বিপর্যস্ত অবস্থা কেন? এরকম লঙ্কু মত, ভীত, সন্ত্রস্ত। যুবক হয়তো ভদ্রমহিলাকে কোন প্রলোভন দেখিয়ে—

আর একবার আড়চোখে ওদের দিকে তাকালাম না। সেই একইভাবে দুজনে দুদিকে গুটিয়ে ব'সে আছে। কোন পুরুষ এবং মহিলাকে এভাবে ট্যাক্সিতে উঠে চুপচাপ বসে থাকতে তো কখনও দেখিনি: কোন যুবক যুবতী হ'লে তো কথাই নেই। উত্তেজনার উন্মাদনায় উন্মত্ত হ'য়ে সামনের ড্রাইভারের উপস্থিতিও একেবারে ভুলে যায়। কি বীভৎস কাণ্ড। কখনও কখনও বিদেশী মদের সঙ্গে উগ্র সেন্টের গন্ধ। শাড়ী আর চুড়ির শব্দ। টুকরো

টুকরো কথা। কোন নির্জন জায়গা দেখতে পেলেই পুরুষ কণ্ঠে কোঁকিয়ে ওঠে—"এই ট্যাক্সী রোখো।" কেমন বিষণ্ণ, আচ্ছন্ন, ঠাণ্ডা কণ্ঠস্বর। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী থামাই। আমার হাতে দুটো কি তিনটে দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে যায়। মাঝে মাঝে ঠিক এই সময়ে ঐ সমস্ত মহিলাদের চোখে চোখ পড়লেই শিউরে উঠি। শানানো ইস্পাতের ফলার মত কেমন তিক্ত ঝিলিক ওদের চোখে, ঠিক যেন কোন ভয়ঙ্কর বিষধর সাপের কুটিল দৃষ্টি। আর এদের সঙ্গের পুরুষ সঙ্গীটিকে মনে হয় বিষের ভারে জর্জরিত, আচ্ছন্ন। কেমন যেন ঢুলুঢুলু ভাব।

—আপনি আত্মহত্যা করতে গিয়ে ছলেন কেন?

আত্মহত্যা! পেছনের সিটে বসা যুবকের কণ্ঠে হঠাৎ এ প্রশ্ন শুনে আমি যেন একটু চমকেই উঠলাম।

—এই যে শুনছেন? আপনাকে বলছি।—যুবক ছোট্ট করে কাশির শব্দ ক'রলো।—আপনি আত্মহত্যা ক'রতে গিয়েছিলেন কেন?

বেঁচে থেকে লাভ নেই বলে।—ভদ্রমহিলা খুব শুকনো জবাব দিলেন।

বেঁচে থেকে লাভ নেই?—যুবক একটু থতমত খেলো।—অথচ প্রত্যেক মানুষ তো বাঁচতে চায়।

হ্যাঁ, তা চায়।—ভদ্রমহিলা জবাব দিলেন।—এবং আমিও এতদিন তাই চেয়েছিলাম।

—কিন্তু আজকেই বা হঠাৎ এভাবে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিলেন কেন?

—এতদিন বাঁচতে চেয়ে যে ভুল করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত করতে। কিন্তু আপনিই বা আমাকে বাঁচালেন কেন? আমি এখন কি করবো—ভদ্রমহিলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

কি আশ্চর্য্য!—যুবক একটু অপ্রস্তুত হন।—প্লীজ চুপ করুন। সামনে ড্রাইভার রয়েছে, কি ভাববে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। যুবক বোধহয় বাইরের দিকে তাকিয়ে বসেছিল।

আমি স্টিয়ারীং-এ হাত রেখে স্তব্ধ হয়েই বসে রইলাম। ওদের কথাবার্তা কিছুই বুঝতে পারছিলাম না।

—মানুষ কখন বিদ্রোহ করে ব'লতে পারেন?—একসময় ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করলেন।

—এ্যাঁ, আমাকে ব'লছেন?

—মানুষ কখন বিদ্রোহ করে বলতে পারেন?

—বিদ্রোহ! বোধহয় যখন প্রয়োজন হয়।—যুবক উত্তর দিল।

—কিন্তু প্রয়োজনটা হয় কখন?

—হয়তো যখন অত্যাচারীর অত্যাচার সহনকারীর সহ্য-শক্তির বাইরে চলে যায়।

—আমিও ঠিক সেইরকম অবস্থার মধ্যে পড়েছিলাম।

—কিন্তু আত্মহত্যা করা ছাড়া বিদ্রোহ করার আর কি কোনও পথ ছিল না?

—হয়তো ছিল।—ভদ্রমহিলা আলগাসুরে জবাব দিলেন।—কিন্তু এই পথটাই সহজে চোখে পড়েছিল।

আমি হয়তো আপনাকে খুব বেশী বিরক্ত ক'রছি।—যুবক একসময় একটু বিনয়ী হন।—কিন্তু এ রকম অবস্থায় আমার কি ঘটনাটা সবটাই জানা উচিত নয়?

হ্যাঁ, নিশ্চয়!—ভদ্রমহিলা খুব তীক্ষ্ণসুরে জবাব দিলেন।—এবং মেয়েদের ওপর আপনাদের চিরকালের অভিভাবকত্বের লোভটাই বা ছাড়বেন কেন?

যুবক একটু শব্দ করে হাসলো।—এটা কিন্তু আপনার জমানো অসন্তোষের একটা টুকরো নিশ্চয়ই।

ভদ্রমহিলা কোন উত্তর দিলেন না। সম্ভবতঃ অপ্রস্তুত।

—আচ্ছা এই যে অসন্তোষ, বিদ্রোহ, অত্যাচার এ সবের কারণ কি?

সন্দেহ।—ভদ্রমহিলা উত্তর দিলেন।—স্ত্রীর প্রতি স্বামীর সন্দেহ।

বলেন কি!—যুবক ভীষণভাবে অবাক হয়।—আপনার স্বামী কি করেন?

—কলকাতায় এক কলেজের প্রফেসর।

—প্রফেসর! কিন্তু একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক বিনা কারণে তাঁর স্ত্রীকে সন্দেহই বা ক'রবেন কেন?

—নিশ্চয়ই।—ভদ্রমহিলা তীক্ষ্ণস্বরে জবাব দিলেন। —কাজেই ধরে নিতে হয় তাঁর ধারণা ঠিক এবং আমার ভাসুরের সঙ্গে আমার একটা গোপন সম্পর্ক আছে।

আপনার ভাসুর! মানে আপনার স্বামীর বড় ভাই!

হ্যাঁ, এবং এক সম্পর্কে তিনি আমার জামাইবাবু।

আপনি কি ভালবেসে বিয়ে করেছিলেন?

না।—আমার দিদির বিয়ের পর তার দেওর আমাকে দেখে ধনুকভাঙা প্রতিজ্ঞা নিয়ে বসলেন। আমি ছাড়া নাকি তাঁর পাশে দাঁড়াবার যোগ্যতা আর কারও নেই। এবং আমাকেও সেই যোগ্যতা নিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াতে হল। আমাদের মত সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারে এ ধরণের করুণার মূল্য তো অনেক।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল।—ভদ্রমহিলা নির্লিপ্তস্বরে জবাব দিলেন।—আমরা দু'বোন একই বাড়ীর বড় বৌ আর ছোট বউ হলাম। প্রথমে সুখেই ছিলাম। পুরুষেরা তো বিয়ের পর বেশ কয়েকটা মাস বিভোর হয়ে থাকে।

ঠিক মানতে পারিনা।—যুবক প্রতিবাদ জানালো।

এতক্ষণ পর ভদ্রমহিলা একটু হাসির শব্দ করলেন।—ও হাঃ কথাটাতে আপনার পৌরুষে লাগবেই।—একটু থেমে বললেন—আপনি বিয়ে করেছেন?

না।

তাহলে সত্যমিথ্যা বিচার এখন করতে পারবেন না। কিন্তু এরকম হয়। মেয়েদেরও হয়। কিন্তু পুরুষদের উচ্ছৃলতা মেয়েদের তুলনায় একটু বেশী।

যাই হোক তারপর বলুন কি হল—

তারপর আর কি? মাসছয়েক যেতে না যেতেই তাঁর নেশা কেটে গেল। উনি ভাবলেন আমাকে একটু আড়ালে রাখা উচিত। লোকে বলে আমি নাকি দেখতে সুন্দর। কাজেই পুরুষদের বিষাক্ত নজর থেকে আমাকে বাঁচানোর একটা সামাজিক কর্তব্য তাঁকে নাড়া দিল। অতএব বাইরে বের হওয়া বন্ধ হল। কিন্তু ঘরে যে আর একজন পুরুষ অর্থাৎ আমার ভাসুর তথা জামাইবাবু রয়েছেন তাঁকেও বিশ্বাস করতে ভরসা পেলেন না। তাঁর ধারণা পুরুষ এবং নারীর তুলনা আগুন আর ঘি। অতএব বাড়ী দুভাগে ভাগ হয়ে মাঝখানে পাঁচিল উঠলো। দিদি আর জামাইবাবুর সঙ্গে একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হল।

—তখন বিদ্রোহ করেন নি কেন?

—ঠিক সেই অবস্থায় যতটা করা যায় করেছিলাম। কিন্তু তাঁর বিশ্রী অশ্লীল কটুক্তির ভয়ে পরে চুপ করে গিয়েছিলাম।

—কিন্তু আজকেই বা এরকম জ্বলে উঠলেন কেন?

—আগেই তো বলেছি তাঁর অত্যাচার আমার সহ্যের সীমা পেরিয়ে গিয়েছিল। গত কয়েকদিন ধরে দিদি খুব অসুস্থ। কথাটা শুনে থাকতে পারিনি। আমার স্বামী কলেজে বেরিয়ে গেলেই আমি দিদির কাছে বসতাম কিন্তু আজ উনি কলেজ বেরিয়ে যাবার ঘণ্টাখানেক পর আবার বাড়ী ফিরে আসেন। অথচ আমি তখন দিদির কাছে। কিছুক্ষণ পর বাড়ী ফিরে এসে দেখি উনি অসম্ভব গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। আমিও নিজেকে ঠিক করে নিলাম। ভাবলাম আজ যা হবার হয়ে যাবে আমি তো কিছু অন্যায় করিনি। আমিই বা ভয়ে ভয়ে থাকবো কেন?

কাছে গিয়ে বললাম—কি গো এত তাড়াতাড়ি ফিরে এলে যে?

তার উত্তরে কি বললেন জানেন, বললেন—খুব অসুবিধা হল তাই না? কিন্তু অভিসার তো বেশ ভালোই চলছে।

আমি গম্ভীর হয়েই বলেছিলাম—কি বলতে চাইছ তুমি?

উনি চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন—কেন, তুমি কি কিছু বুঝতে পারছোনা? কিন্তু এবার আরোও ভালো করে বোঝাবো। এবার আর কথা নয়, এবার চাবুক।

আমার মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠলো। রাগে আমার গোটা শরীর থরথর করে কাঁপছিল। বললাম— তুমি কি আমাকে তোমার বাড়ীর পোষা কুকুর গরু মনে করেছ নাকি! কিন্তু আমিও ছেড়ে কথা বলবো না।

উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন:—কি বললে, তুমিও ছেড়ে কথা বলবেনা? বেশ দেখি।

ভদ্রমহিলা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।—তারপর কি করলো জানেন? পা থেকে জুতোটা খুলে আমাকে মারলেন; বুকে পিঠে—

আপনাকে!—যুবকের গলার শব্দ কেমন বিভ্রান্ত। কি রকম হোঁচট খাওয়া অবস্থা। ভদ্রলোক আপনাকে জুতো মারলেন!

বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দেখুন —

আমি স্টীয়ারীং এ হাত রেখে সামনের দিকেই তাকিয়ে রইলাম। যুবক মুখে একটা শব্দ করে যেন আঁৎকে উঠলো। ভদ্রমহিলা তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদছেন।

ভদ্রমহিলাকে আমি এখনও পরিষ্কার দেখিনি। অথচ ভদ্রমহিলার একটা ছবি কল্পনা করতে গিয়ে আমি কেন যেন কৃষ্ণাকেই চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কৃষ্ণার মৃত্যুর পর একদিনও কৃষ্ণার কথা ভাবতে চাইনি। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আজ এতদিন পর আমি পিছনের সিটে বসা ভদ্রমহিলার জায়গায় কৃষ্ণাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। খুব পরিষ্কার। ওর ঠোঁটের ডান দিকের কোনের ছোট্ট কালো তিলটা পর্য্যন্ত। সামনের দাঁতটা একটু ভাঙা। আর একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেই মনে হত সামান্য একটু ট্যারা।

কিন্তু কৃষ্ণা আজ নেই। ওকে হত্যা করেছি আমি। ওর দু'কাঁকে দেহটা ঘিরে যখন অসংখ্য লোকের ভিড় জমেছিল তখন আমি সেখানে গিয়ে একবারও দাঁড়াইনি। আমার বুকের মধ্যে একটা বিষাক্ত আগুনের পিণ্ড তখনও দাউ দাউ করে জ্বলছিল, থানায় দারোগা যখন জিজ্ঞাসা করেছিল—দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা? ইনি কি আপনার স্ত্রী?" আমি তখন সেই বীভৎস, বিকৃত মৃতদেহটার দিকে তাকাইনি, অ দিকে দৃষ্টি রেখেই শুকনো জবাব দিয়েছিলাম।

এই যে ড্রাইভার, এখানে।

আমি গাড়ী থামালাম। ওরা থামলো। যুব এগিয়ে এসে বললো,—আপনি কাইণ্ডলী এক দাঁড়াবেন? আমি ভদ্রমহিলাকে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসছি। আপনার সঙ্গেই যদি ফিরে যাই আপনার কি কিছু অসুবিধা হবে?

না, না, অসুবিধা কিসের?—আমি নরম সুরে উত্তর দিলাম। আপনি আসুন। আমি গাড়ীটা ঘুরিয়ে অপেক্ষা করছি।

গাড়ী ঘুরিয়ে রাস্তার একপাশে রাখলাম। খুব ক্লান্ত লাগছে। কেমন অবসন্ন, অসুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। কাঁচটা সবটা নামিয়ে দরজার গায়ে মাথা রাখলাম। বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় বুক ভরে নিশ্বাস নিলাম।

জীবনটা যেন অসীম সমুদ্রে একটা ছোট্ট নৌকা। একটু বেসামাল হলেই কোথায় কোন্ অতলে হারিয়ে যায়। কোন চিহ্ন থাকে না। যেমন হারিয়ে গেছে কৃষ্ণা। আর আমি? আমিও বোধহয় একটা ধ্বংস-স্তূপের তলায় আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছি। অথচ এই সামান্য ভুল না হলে এমন কিছুতেই হত না।

কৃষ্ণার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার একবছর না পেরুতে পেরুতেই আমার মনের মধ্যে একটা ছোট্ট বিষাক্ত আগুনের পিণ্ড আস্তে আস্তে জ্বলে উঠলো। মনে হল কৃষ্ণার মত রূপবতী মেয়ে কখনই আমার মত একজন সাধারণ ট্যাক্সী ড্রাইভারকে পছন্দ ক'রতে পারে না। কৃষ্ণার রূপ ছিল অতুলনীয়। শান্ত স্নিগ্ধ চেহারা। ওরকম মমতাময়ী রূপ সচরাচর চোখে পড়ে না।

সন্দেহ করেছিলাম সঞ্জয়কে। সেই সময়ে কৃষ্ণার সঙ্গে ওর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছিল। সিনেমা, বাজার—যেখানেই প্রয়োজন হত কৃষ্ণা সঞ্জয়কে সঙ্গে নিত। আমি ওর সঙ্গে তখন কোথাও যেতে চাইতাম না। আমি তখন

ওদের দু'জনকে কিছুতেই সহ্য করতে পারছিলাম না। যদিও সঞ্জয় কৃষ্ণাকে বড়দি বলে সম্বোধন করতো।

কিন্তু আমি ভেতরে ভেতরে জ্ব'লছিলাম, কি তীব্র জ্বালা সে আগুনের। সবরকম বিবেচনাশক্তি আমি তখন হারিয়ে ফেলেছিলাম। সঞ্জয়কে মনে মনে 'শালা শুয়োরের বাচ্ছা' বলে গালাগাল দিতাম। কথায় কথায় কৃষ্ণাকে অপমান করতাম।

আগুনটা ধিকিয়ে ধিকিয়ে হঠাৎ একদিন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। আর সেই ভয়ঙ্কর দাবানলে গোটা সংসারটা জ্বলে-পুড়ে, তছনছ হয়ে গেল।

কৃষ্ণার গর্ভে যে সন্তান এসেছিল সে আমারই বংশের প্রথম প্রদীপ। অথচ কেন যেন আমি সেদিন তা স্বীকার করিনি। আমার মনের মধ্যে একটা জানোয়ার সেদিন আমার মানবিক চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রাস করেছিল। একটা ভয়ঙ্কর বিষাক্ত আগুনের জ্বালায় আমি তখন ভীষণভাবে জ্ব'লছিলাম।

তাই সেদিন কৃষ্ণার মুখে এ খবর শুনে অস্বাভাবিক গম্ভীর হ'য়েছিলাম, বাঁকা সুরে বলেছিলাম, তাই নাকি? সঞ্জয় শুনেছে?

বারে।—কৃষ্ণা বলেছিল।—সঞ্জয় শুনবে কেন? তা ছাড়া সঞ্জয়কে ব'লতে লজ্জা ক'রবে না?

আমি বিশ্রী শব্দ করে হেসেছিলাম।—তাই নাকি? তা এটাই তো প্রেমের রীতি। যাইহোক ওকে জানিও। খুব খুশি হবে। কৃষ্ণা আমার কথা শুনে অবাক হ'য়েছিল। আমার কুটিল, হিংস্র, বিষাক্ত চোখ দুটোর দিকে তাকিয়ে কেমন যেন হয়ে গিয়েছিল। থেমে থেমে বলেছিল, তুমি কি বলছো বুঝতে পারছিনা। আবার সেই হিংস্র হাসির একটা ঘর ঘর শব্দ আমার গলা দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল।—কেন বুঝলে না? বাঁকা চোরা কিছুতো বলিনি। বল'ছিলাম, পিতৃত্ব যে দিয়েছে খবরটা কি সর্বপ্রথম তার প্রাপ্য নয়?

তার মানে?—কৃষ্ণার চোয়াল দুটো কেমন শক্ত হয়ে উঠেছিল। আমিও হিংস্র হয়ে গিয়েছিলাম। চিবিয়ে চিবিয়ে বলেছিলাম—আমি অন্ধ নই কৃষ্ণা। তাছাড়া পাড়ার লোকেরাও চোখ বুজে নেই। শুধু আমি কেন, সবাই বলবে তোমার গর্ভের সন্তানের পিতা সঞ্জয়।

কৃষ্ণার মুখ-চোখ লাল হয়ে গিয়েছিল।—কি বললে, তুমি এত নীচ, তুমি এত ছোটলোক: জানোয়ার, তোমার লজ্জা করে না?

ও আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আমাকে খামচে ছিঁড়ে একাকার করে দিয়েছিল। আমিও তখন পুরোপুরি একটা পশু হয়ে গিয়েছিলাম। পা থেকে জুতোটা খুলে দাপটে মেরে'ছিলাম ওর মুখে। কৃষ্ণা আমার বুকের কাছে জামাটা খামচে ধরে নেতিয়ে পড়েছিল। ওর মুখ দিয়ে গল্ গল্ করে রক্ত প'ড়ছিল। ওকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলাম। সারা-রাত্রি গ্যারেজে ছিলাম। পরের দিন সঞ্জয় এসে খবর দিয়েছিল কৃষ্ণা রেল লাইনে আত্মহত্যা ক'রেছে।

এই যে শুনছেন?

ও! ওহোঃ, আপনি?—দু'হাতের পিঠ দিয়ে চোখটা মুছে নিলাম,—একটু ঝিমিয়ে পড়ে'ছিলাম।

যুবক গাড়ীতে উঠে দরজা বন্ধ ক'রলো। একটা সিগারেট আমাকে দিয়ে নিজে একটা ধরালো। আমি ষ্টার্ট দিলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর আমিই প্রথম কথা বলার চেষ্টা ক'রলাম। এই শব্দবিহীন সময়টাকে আমার কেমন যেন ভয় ভয় ক'রছিল। আপনার সব কাজ মিটে গেল স্যার?

এঁ্যা! যুবক একটু সামনের দিকে ঝুঁকে বললো।—আমায় কিছু ব'লছেন?

আপনার সব কাজ মিটে গেল?

হ্যাঁ আপাতত মিটলো ব'লতে পারেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য ঘটনা বলুন তো? একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক আজকের যুগেও তাঁর স্ত্রীকে নির্য্যাতন ক'রছেন, এ যেন একেবারেই বিশ্বাস করা যায় না। অসভ্যতার অন্ধকারে আমরা এখনও সেই একই জায়গায় সমাজের পঁচা দুর্গন্ধময় অবস্থায় লুটোপুটি খাচ্ছি। এই সমস্ত পশু গুলোকে ধরে ধরে চাবকাতে হয়। রাস্তায় দাঁড় করিয়ে গুলি করে মারতে হয়।

যুবক উত্তেজিত হয়ে উত্তপ্ত ভাষায় আরও অনেক কিছু বলেছিল। আমি সব কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ ক'রছিল। বুকের মধ্যে পাক-খাওয়া যন্ত্রণাটা মধ্যে মধ্যে গুমরে গুমরে উঠছিল।

ব্যারাকপুর ষ্টেশনের পাশে গাড়ী থামালাম। চারিদিক নিস্তব্ধ। ধীরে অনেক যুবক গাড়ী থেকে নামলো, কয়েকটা দশটাকার নোট আমার দিকে এগিয়ে দিল।

একটা কথা বলবো স্যার?—আমি বিনীত সুরে বললাম।

যুবক অবাক হ'ল। ভাবলো আমি হয়তো আরও বেশী টাকা চাইছি।

আমি জড়িয়ে জড়িয়ে ব'ললাম—জীবনে ভাল করার কোনদিন সুযোগ পাইনি স্যার। আজ আপনার ভাগের কিছুটা অংশ আমায় দেন তো নিজেকে ভাগ্যবান ব'লে মনে করবো।

না, না একি ব'লছেন?—যুবক বেশ বিব্রত হল আপনি এত টাকা—

আমি আর কথা ব'লতে পারলাম না। চোখ কেমন জ্বালা জ্বালা করে উঠলো, গলাটা বুজে এ চুপচাপ গাড়ীতে স্পীড দিয়ে যুবককে রেখে বে গেলাম। পেছনে একবার তাকিয়ে দেখলাম যুবক সেইভাবে হাতে টাকাগুলো নিয়ে আমার গাড়ীর তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

টাকের ভাবনা বড় ভাবনা

জিতেন্দ্রনাথ দত্ত

টাকের ভাবনা বড় ভাবনা। একবার টাক বাড়তে আরম্ভ করলে আহার নিদ্রা সব মাথায় উঠে। দিনরাত এক চিন্তা লেগে থাকে তাহলে কি হবে!

এই কিছুদিন আগে দেশে গিয়েছিলাম। সেখানে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। তাকে তো প্রথমে চিনতেই পারি নি। চেনার পর শক্‌ড্‌ হ'লাম। বয়স এমন একটা আর কি পঁয়ত্রিশও ছাড়ায় নি কিন্তু পঁয়তাল্লিশের পারাবার পার হয়ে পঞ্চাশের দিকে পাড়ি জমাচ্ছে বলে মনে হল। ব্রহ্মতালু ত বলতে গেলে একরকম ফাঁকা। কিছু চুল কানের পাশে ও পিছনে বাকী আছে, মানে শেষ হতে হতেও শেষ হয় নি।

বললাম, এ কি করে হল রে, একেবারে যে গড়ের মাঠ দেখছি!

বন্ধু বললে-না ভাই, গড়ের মাঠ আর টে গড়ের মাঠে তবু ত ঘাস আছে, কিন্তু আমার…..

শেষের কথাটার সঙ্গে যেন কিছু হতাশার আভা পাওয়া গেল।

ভাববারই বিষয়। কারণ বন্ধু কৌমার্যব্রত ভঙ্গ করে'ন তখনও। কিন্তু এমন পাত্রকে কো মেয়েই বা বিয়ে করবে।

অনেক ভেবেচিন্তে শেষপর্যন্ত বললাম, দে চুল উঠে যাওয়া একটা রোগ। প্রাথমিক প্রতিকা

হিসাবে কয়েকটা ষ্টেপ, নেওয়া যেতে পারে—যেমন ব্যাকব্রাশ মোটেই করবিনা। চুল উলটিয়ে আঁচড়ানর জন্যই চুল উঠে যায়। খুব আলতো করে চিরুনী চালিয়ে নাল কেটে সিঁথি কাটবি। তাই বা করার দরকার কি? ছেলেবেলায় স্কুলে পণ্ডিতমশাইকে দেখিস নি কেমন করে চুল রাখতেন? ঠিক ওমনি করে কপাল থেকে চুলগুলো আঙুল দিয়ে আলগোছে সরিয়ে দিবি। আঁচড়াতে গেলেই চুল উঠে যাবে। এরপরেও যদি দেখিস চুল উঠা বন্ধ হচ্ছে না, তখন এক কাজ করবি। তোর পাশের চুল তো আছে দেখছি। পাশের এই চুলগুলো একদম কাটবি না।

বন্ধু আঁৎকে উঠে বলে, কি যাচ্ছেতাই বলছিস? বললাম, থাম্ যে ভারী চুলের বাহার তার আবার কাটা। হাঁ, যা বলছিলাম চুলকাটবার নামটি পর্যন্ত মুখে আনবিনা। এবং ঐ চুল যখন লম্বা হয়ে কানের দুইপাশে বাবরীর মত ঝুল ঝুল করবে, তখন ঐ বাবরী দিয়ে লতিয়ে লতিয়ে সারা চাঁদটা ঢেকে দিবি। আর আর এই কাজটা যদি একটুখানি 'ট্যাক্ট্ফুলি' করতে পারিস তবে ত আর কেও টেরই পাবে না ঐ লতার নীচে কি আছে।

বন্ধুর দুঃখ দেখে মনে হল না, ও কোন রকম উৎসাহ পাচ্ছে। তাই আর একটুখানি প্রাকৃটিক্যাল হওয়ার চেষ্টা করলাম। আজকাল খবরের কাগজে মাসিক পত্রিকায় এমনত ভুরি ভুরি বিজ্ঞাপন দেয় দেখি—'আপনার কি চুল উঠিতেছে—আমাদের বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রস্তুত অমুক তৈল ব্যবহার করিয়া ইহার সুফল পরীক্ষা করুন—কার্যকরী না হইলে অবিলম্বে মূল্য ফেরৎ দেওয়া হয়।' তা গ্যাঁট থেকে কিছু পয়সা খসিয়ে দুই একটা ভাল তেল ব্যবহার করে দেখ্ না। আমার আবার নাম মনে থাকে না। আমার এক শ্যালিকা বলেছিল কয়েকটা ভাল তেলের নাম। হাঁ…হাঁ…মনে পড়েছে—অলকানন্দা…মন্দাকিনী…আর একটা যেন কি…কৃষ্ণ…কৃষ্ণকুন্তলিনী।

বন্ধু বললে, আর কোন কুন্তলিনী বাদ দেই নি। কিন্তু হা হতোস্মি। আমি আরও 'সিরিয়াসলি' ভাবতে লাগলাম কি করা যায়। ভেবে কোন কূলই পেলাম না। মনে হল, বৈজ্ঞানিকরা ত কত অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছেন। এইত কিছুদিন আগে হয়েল-নারলিকারের 'থিওরী' সারা বিশ্বে একটা আলোড়ন এনেছিল। জগতের কোন এক বস্তুর অন্যসকল বস্তুর উপর নির্ভরশীল এমনি সব নাকি কথা। বলি ওসব না হয় সবই হ'ল। কিন্তু এই যে কেশগুচ্ছ কিভাবে ব্রহ্মতালুতে ভর করে থাকবে তার কি কেউ একটা আভাস ইঙ্গিত দিতে পারে না? নিদেন পক্ষে কাজ চালানর মত দুই একটা 'ষ্টিকিং গাম কি 'এ্যাঢেসিভ্' গোছের কিছু আবিস্কার করে টাক পড়ার দুর্ভাবনা থেকে দুর্গতজনদের মুক্ত করতে পারে না?

বেচারা বন্ধুর কথা ভেবে দুঃখই হল।

রাগ সঙ্গীতে বাঙ্গালী

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০৩ খৃঃ)

বাঙ্গালীর রাগসঙ্গীতচর্চার ঐতিহাসিক বিবরণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দের প্রসঙ্গও অন্তর্ভুক্ত করবার যোগ্য। কারণ তিনি কৃতবিদ্য সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

ভারতীয় নবজাগৃতির অন্যতম প্রধান হোতা স্বামীজীর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব ও কর্মধারায় অন্তর্লোকে ছিল এক শিল্পীসত্তা। তাঁর সেই শিল্পীমানস নানা মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ভ্রমণ, কাহিনী, পত্রাবলী, এবং গান ও কবিতা রচনায়; সাহিত্য, কাব্য ও চিত্রশিল্পাদি বিষয়ে গভীর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন অনুরাগে; সঙ্গীতচর্চায় ও সঙ্গীত-চিন্তায়।

প্রথম জীবনে নরেন্দ্রনাথ দত্ত-রূপে তিনি যখন ব্রাহ্ম-সমাজে যাতায়াত করতেন, তখন থেকেই তিনি সুকণ্ঠ গায়ক বলে সুপরিচিত ছিলেন। সমাজমন্দিরে ব্রহ্ম-সঙ্গীত পরিবেশন করে তিনি অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন সেই নবীন বয়সে। গানের সূত্রেই তিনি প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচিত হন এবং রবীন্দ্র-নাথের গানের প্রথম যুগের গায়করূপে নরেন্দ্রনাথের নামও গণনীয়। মনীষী রাজনারায়ণ বসুর কন্যা লীলাবতী এবং কৃষ্ণকুমার মিত্রের বিবাহসভায় নরেন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-নাথের 'দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি' গানখানি যে গেয়েছিলেন (১৮৮১ খৃঃ) তা' রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁকে প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন। পরে যখন নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘে যোগদান করেন এবং বরাহনগর মঠে অবস্থান করেন সে সময়েও তিনি রবীন্দ্রনাথ রচিত নানা গান গাইতেন জানা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সঙ্গে পরিচিত হবার পর দক্ষিণেশ্বরে এবং অন্যত্র তাঁকে গান শোনাবার সময়েও তাঁর অনেকবার রবীন্দ্রনাথের গান গাইবার দৃষ্টান্ত দেখা গেছে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' প্রমুখ গ্রন্থাদিতে।

শ্রীরামকৃষ্ণর সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়ের সূত্রপাতও হয় সঙ্গীতের যোগাযোগে। শিমুলিয়া দত্ত-পরিবারের প্রতিবেশী সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে আমন্ত্রিত শ্রীরামকৃষ্ণকে গান শোনাবার জন্যে নরেন্দ্রকে নিয়ে আসা হয়। সেখানে তাঁকে নরেন্দ্র শুনিয়েছিলেন দুটি প্রসিদ্ধ ব্রহ্মসঙ্গীত—'যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে' (ভীমপলশ্রী, একতালা) ও 'মন চল নিজ নিকেতনে' (সুরটমল্লার, একতালা)। তাঁর কণ্ঠে গান দুখানি শুনে ও গায়ককে লক্ষ্য করে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যাবার জন্যে বলেন। তারপর থেকেই উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা আরম্ভ হয়, এসব কথা তাঁর জীবনী পাঠকদের সুপরিজ্ঞাত।

তিনি যে একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন, তাঁর সঙ্গীতজ্ঞতার বিষয়ে তাই শেষ কথা নয়। তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভা বহুমুখী ছিল, বলা যায়। সঙ্গীতের ক্রিয়াংশে তিনি শুধু কৃতী ছিলেন না, তাঁর অধিকার ছিল ঔপপত্তিক বিষয়েও। প্রথম জীবনে কণ্ঠসঙ্গীত-শিল্পীরূপে তিনি পরিচিত হলেও দুএকটি বাদ্যযন্ত্রেও তাঁর হাত ছিল। পিতার ব্যবস্থাপনায় একাধিক সঙ্গীতগুণীর অধীনে রীতি-মত শিক্ষালাভের ফলে তিনি হয়েছিলেন কৃতবিদ্য সঙ্গীতজ্ঞ। অর্থাৎ তিনি অশিক্ষিত পটু ছিলেন না।

স্বামীজী ধ্রুপদ ও খেয়াল নিয়মতান্ত্রিকভাবে শিক্ষা করেন এবং সেই সঙ্গে পাখোয়াজ ও তবলা বাদন। অপরপক্ষে, তাঁর কয়েকটি গান এবং সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার কথাও স্মরণীয়। তা'

ভিন্ন, তাঁর রচনাবলীর নানাস্থানে প্রকাশ পেয়েছে সঙ্গীত-সম্পর্কিত তাঁর চিন্তাপ্রসূত মতামত। সঙ্গীতের তত্ত্ব-বিষয়ে সুদীর্ঘ প্রবন্ধটি এবং সঙ্গীতশিল্প সম্পর্কে প্রকাশিত তাঁর ধ্যান ধারণাদি থেকে বোঝা যায় যে স্বামীজী ছিলেন সঙ্গীতবিষয়ে ভাবুক। তাঁর বিশিষ্ট সঙ্গীতচিন্তা ছিল।

সঙ্গীতজ্ঞরূপে তাঁর উক্ত গুণাবলী ও কৃতিত্ব সমগ্রভাবে বিবেচনা করলে মনে হয় যে অল্প বয়সেই তিনি হয়েছিলেন সুসমঞ্জস সঙ্গীতবিদ্যার অধিকারী। তাঁর সঙ্গীতকৃতির মূল্যায়ন করলে ধারণা করা যায় যে, তাঁর জীবন সন্ন্যাসের পথে অগ্রসর না হলে তিনি সঙ্গীতজ্ঞরূপেও কীর্তিত থাকতেন। বরাহনগর মঠে যোগদান ও পূর্ণ সন্ন্যাসের জীবন অবলম্বন করবার আগেই তাঁর সক্রিয় সঙ্গীত-জীবনের অধ্যায় একপ্রকার সমাপ্ত হয়েছিল। অর্থাৎ তাঁর মাত্র ২৩ বছর বয়সের মধ্যেই সঙ্গীতজীবনের প্রধান পর্বের অবসান ঘটে জীবনে অভূতপূর্ব অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষ ও বিকাশে এবং সেই সম্বন্ধীয় বিপুল কার্যধারার ফলে। সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়ে তাঁর বিস্তৃত রচনাটিও বরাহনগর মঠে যোগ দেবার অব্যবহিত পূর্বে এবং গৃহী-জীবনের শেষ পর্যায়ে রচিত। তারপর থেকে নিয়মিত সঙ্গীতচর্চা আর তাঁর পক্ষে সম্ভব হতে পারেনি বটে, কিন্তু জীবনের কোন অংশেই তিনি সম্পূর্ণভাবে সঙ্গীতবর্জিত ছিলেন না। সন্ন্যাস অবলম্বন করে পূর্বাশ্রমের সব কিছুই তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। ত্যাগ করতে পারেননি শুধু সংগীত। কারণ সঙ্গীতচিন্তা তাঁর ছিল অন্তরঙ্গ। জীবনের সর্ব পর্বের মতন অন্তিম অধ্যায়েও বেলুড় মঠে তাঁকে গায়ক ও পাখোয়াজ বাদকরূপে দেখা গেছে। এমন কি দেহত্যাগের দিনও সকালে ধ্যানান্তে একখানি শ্যামাসঙ্গীত গেয়েছিলেন ঠাকুর ঘরে—'মা কি আমার কালো, কালোরূপা এলোকেশী হৃদিপদ্ম করে আলো।' (১)

তাঁর সঙ্গীতজীবনের বিস্তারিত আলোচনা স্বতন্ত্র পুস্তকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। (২) এখানে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত সাঙ্গীতিক পরিচয় দেওয়া হল।

উত্তর কলকাতার শিমুলিয়া পল্লীর বনিয়াদী দত্ত-বংশের সন্তান নরেন্দ্রনাথ উত্তরাধিকার সূত্রে সঙ্গীতপ্রীতি লাভ করেছিলেন।

তৎকালীন কলকাতায় উক্ত দত্ত-পরিবার সংস্কৃতি-বানরূপে সুপরিচিত ছিল এবং সঙ্গীতের আদর ও চর্চা ছিল এখানে। নরেন্দ্রনাথের পিতামহ দুর্গাপ্রসাদ (পত্নী ও শিশুপুত্রকে পরিত্যাগ করে যৌবনেই সন্ন্যাসী) সঙ্গীতে আসক্ত এবং সুকণ্ঠগায়ক ছিলেন। নরেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ শুধু সঙ্গীতানুরাগী নন, কিছুকাল সঙ্গীতচর্চাও করেছিলেন কলাবতের শিক্ষাধীনে। এমনকি নরেন্দ্র-নাথের ১৩।১৪ বছর বয়সে মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে সপরিবারে অবস্থানকালে, বিশ্বনাথ দত্ত পুত্রকে প্রথম সঙ্গীতশিক্ষা দেন। সে সময়েই নরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতবিষয়ে মেধা ও নৈপুণ্য দেখে কলাবতের অধীনে তাঁর রীতিমত সঙ্গীতচর্চার কথা চিন্তা করেন এবং ৩।৪ বছর পরে কলকাতায় নরেন্দ্রনাথের প্রবেশিকা পরীক্ষা শেষে সঙ্গীতাচার্য বেণীমাধব অধিকারীর নিকটে পুত্রের সঙ্গীত-শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছিল যে, নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর জ্ঞাতিভ্রাতা অমৃতলাল ওরফে হাবুদত্তকেও বেণীমাধবের শিক্ষাধীনে সঙ্গীতচর্চার সুযোগ করে' দেন বিশ্বনাথ। তাঁরা সকলেই ৩, গৌরমোহন মুখার্জী ষ্ট্রীটে একান্নবর্তী পরিবারে বসবাস করতেন।

মসজিদবাড়ি স্ট্রীট নিবাসী বেণী ওস্তাদের নিকটে তখন থেকে রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ হল নরেন্দ্রনাথের। ওস্তাদের শিক্ষাধীনে তিনি খেয়াল-অঙ্গে কণ্ঠসঙ্গীত চর্চা করতেন মনে হয়। কারণ উক্ত বেণীমাধব অধিকারী ছিলেন বিখ্যাত খেয়ালগুণী আহম্মদ খাঁর শিষ্য। তা ভিন্ন, বারাণসীর প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী এবং অনেক বছর যাবৎ কলকাতা নিবাসী জোয়ালাপ্রসাদ মিশ্রের নিকটেও নরেন্দ্রনাথ ধ্রুপদ গান শিক্ষা করেছিলেন বলে কথিত আছে। উপরন্তু তিনি সঙ্গীতশিক্ষার্থী-রূপে যাতায়াত করতেন উক্ত আহম্মদ খাঁ, এস্রাজবাদক কানাইলাল ঢেঁড়ী প্রভৃতি কলাবতের নিকটেও।

এইভাবে নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীত কৃতবিদ্য হয়েছিলেন এবং ফার্স্ট আর্টস ক্লাসের ছাত্র অবস্থাতেই সুকণ্ঠ

গায়করূপে খ্যাতিমান হতে আরম্ভ করেন। সেই সময়ে ব্রাহ্মসমাজে নিয়মিত যাতায়াত করতেন তিনি এবং সেখানে তাঁর প্রধান পরিচিতি ছিল গায়করূপে। তারপর ১৮৮১ খৃঃ শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম সম্মিলনের দিনটি থেকে আরম্ভ করে তাঁদের দুজনের যতবার সাক্ষাৎ ঘটেছে, তাতে একটি প্রধান স্থান অধিকার করেছে সঙ্গীত। শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর ভাবযোগের সূত্র হয়েছিল সঙ্গীত। তাঁদের সাক্ষাৎকারের যত দিনের বিবরণ পাওয়া যায়, তার বেশির ভাগই নরেন্দ্রনাথের গানের প্রসঙ্গে পূর্ণ। নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হলে তিনি তাঁর গান না শুনে তৃপ্ত হতেন না, সেজন্যে শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে তানপুরা, পাখোয়াজ, তবলা ইত্যাদি সঙ্গীতের সরঞ্জাম রেখেছিলেন। নরেন্দ্রের গান শুনে তিনি ভাবে আত্মহারা এবং অনেক সময় সমাধিস্থও হয়ে যেতেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি ব্রহ্মসঙ্গীত, শ্যামাসঙ্গীত, সুরদাস কবীর নানক প্রভৃতির ভজন, আগমনী, কীর্তন, রবীন্দ্রনাথের গান ইত্যাদি নানাপ্রকার গান শুনিয়েছেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁর একদিন (১৮৮২, ২অক্টোবর) খোল বাজাবার প্রসঙ্গও পাওয়া যায়।

১৮৮৬খৃঃ ১৫ই আগস্ট্ শ্রীরামকৃষ্ণের দেহত্যাগের পর নরেন্দ্রনাথের জীবনেরও একটি পর্বের অবসান হয়। বরাহনগর মঠে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে অবস্থানকালেও তাঁর নিয়মীত ব্রহ্মসঙ্গীত ও অন্যান্য ভক্তিসঙ্গীত গাইবার বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে তাঁর ভারতব্যাপী পরিব্রাজক জীবনে, দেশ দেশান্তরে ভ্রমণকালেও গান গেয়েছেন প্রায় সর্বত্র। 'সঙ্গীতসাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীতকল্পতরু' পুস্তকে তার বিস্তারিত বি বরণ দেওয়া হয়েছে। এখানে শুধু একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ্য। তাঁর ভারতপরিক্রমা কালে, জয়পুরের নিকটবর্তী খেতরি রাজ্যে তাঁর শিষ্য-সেবক রাজা অজিত সিংহের অনুরোধে তিনি দরবারী কানাড়া, ইমন কল্যাণ ইত্যাদি রাগের ধ্রুপদ গান শুনিয়েছিলেন।

স্বামীজীর জীবনের অন্তিম অধ্যায়ের সঙ্গীতানুষ্ঠানের সঙ্গী, তাঁর হাতের তানপুরা ও পাখোয়াজ যন্ত্র দুটি বেলুড় মঠের পুণ্য স্মৃতি-কক্ষে সযত্নে রক্ষিত আছে তাঁর সঙ্গীতচর্চার নিদর্শনস্বরূপ।.........

স্বামীজীর সঙ্গীতপ্রতিভার আর এক নিদর্শন হল তাঁর রচিত গানগুলি। তাঁর গান সংখ্যায় অল্প হলেও (মাত্র ছখানি) রচনার উৎকর্ষে ও সঙ্গীতহিসাবে উচ্চাঙ্গের। গান কখানির প্রথম গায়ক এবং সুরসংযোজকও তিনি স্বয়ং। তাঁর গান একাধারে বৈদান্তিক সন্যাসীর সাধনভাবের বাহক এবং গীতশিল্পীসত্তার পরিচায়ক। তাঁর রচিত ও গীত-গান শ্রোতাদের অন্তরে যে গভীর ভাবের দ্যোতনা সৃষ্টি করত তার নানা দৃষ্টান্ত স্বামীজীর প্রসঙ্গে প্রকাশিত বহু পুস্তকের বিবরণী থেকে জানা যায়। তাঁর রচনার নিদর্শনস্বরূপ গান ছ'খানি এখানে উদ্ধৃত করা হল :

(১) বাগেশ্রী—আড়াঠেকা

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোম ছায়া সম ছবি বিশ্ব চরাচর ।।
অস্ফুট মন-আকাশে জগৎ সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর ।।
ধীরে ধীরে ছায়াদল মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র 'আমি' 'আমি' এই ধারা অনুক্ষণ।।
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্মনসোগোচরম্, বোঝে-প্রাণ বোঝে যার ।।

(২) খাম্বাজ—চৌতাল

একরূপ, অরূপ-নাম-বরণ, অতীত আগামী-কাল-হীন,
দেশহীন,সর্বহীন, 'নেতি নেতি' বিরাম যথায় ।।
সেথা হতে বহে কারণ-ধারা ধরিয়ে বাসনা বেশ উজলা
গরজি গরজি উঠে তার বারি,
অহমহমিতি সর্বমিতি সর্বক্ষণ ।।
সে অপার ইচ্ছা-সাগর মাঝে,
অযুত অনন্ত তরঙ্গ রাজে,
কতই রূপ, কতই শকতি, কত গতি
স্থিতি কে করে গণন ।।

কোটি চন্দ্র কোটি তপন লভিয়ে
সেই সাগরে জনম,
মহা ঘোর রোলে ছাইল গগন,
করি দশদিক জ্যোতিঃ মগন ॥
তাহে বসে কত জড় জীব প্রাণী,
সুখ দুঃখ জরা জনম মরণ,
সেই সূর্য তারি কিরণ,
যেই সূর্য সেই কিরণ ॥

(৩) কর্ণাট—সুরফাঁকতাল

হর হর হর ভূতনাথ পশুপতি।
যোগেশ্বর মহাদেব শিব পিনাকপাণি ॥
ঊর্ধ্ব জ্বলন্ত জটাজাল,
নাচত ব্যোমকেশ ভাল,
সপ্ত ভুবন ধরত তাল, টলমল অবনী ॥

(৪) কর্ণাট—একতালা

তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা,
ববম্ বাজে গাল ॥
ডিমি ডিমি ডিমি ডমরু বাজে
দুলিছে কপাল মাল ॥
গরজে গঙ্গা জটা মাঝে,
উগরে অনল ত্রিশূল রাজে,
ধক ধক ধক মৌলিবন্ধ,
জ্বলে শশাঙ্ক ভাল ॥

(৫) মূলতান—ঢিমা ত্রিতালী

মুঝে বারি বনোয়ারী সেঁইয়া
যানেকো দে।
যানেকো দে রে সেঁইয়া
যানেকো দে (আজু ভালা) ॥
মেরা বনোয়ারী, বাঁদি তুমারি
ছোড়ে চতুরাই সেঁইয়া
যানেকো দে (আজু ভালা) ॥

(মোরে সেঁইয়া)
যমুনা কি নীরে ভরোঁ গাগরিয়া
জোরে কহত সেঁইয়া
যানেকো দে ॥

(৬) মিশ্র—চৌতালি

খণ্ডন-ভব-বন্ধন, জগ-বন্দন বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময় ॥
মোচন-অঘদূষণ, জগভূষণ, চিদ্‌ঘনকায়।
জ্ঞানাঞ্জন-বিমল-নয়ন বীক্ষণে মোহ যায় ॥
ভাস্বর ভাব-সাগর চির-উন্মদ প্রেম-পাথার।
ভক্তার্জন-যুগলচরণ, তারণ-ভব-পার ॥
জৃম্ভিত-যুগ-ঈশ্বর, জগদীশ্বর, যোগসহায়।
নিরোধন, সমাহিত মন, নিরখি তব কৃপায় ॥
ভঞ্জন-দুঃখ গঞ্জন, করুণাঘন, কর্মকঠোর।
প্রাণার্পণ-জগত-তারণ, কৃন্তন কলিডোর ॥
বঞ্চন-কামকাঞ্চন, অতি-নিন্দিত-ইন্দ্রিয়-রাগ।
ত্যাগীশ্বর, হে নরবর, দেহ পদে অনুরাগ ॥
নির্ভয়, গত সংশয়, দৃঢ় নিশ্চয় মানসবান।
নিষ্কারণ-ভকত-শরণ, ত্যজি জাতিকুলমান ॥
সম্পদ তব শ্রীপদ, ভব-গোষ্পদ-বারি যথায়।
প্রেমার্পণ, সমদরশন, জগজন-দুঃখ যায় ॥

শেষোক্ত গানখানি বেলুড় মঠে শ্রীরামকৃষ্ণ-আরাত্রিক রূপে প্রতি সন্ধ্যায় গীত হয়ে থাকে। গানখানি স্বামীজী কর্তৃক তাঁরই একটি পূর্বরচিত গানের পরিবর্তিত রূপ।

তাঁর রচনাবলীর নানা স্থানে প্রকাশিত সঙ্গীতবিষয়ে ক'টি মন্তব্য এখানে উদ্ধৃত করা হবে। তাঁর এই সংক্ষিপ্ত মতামত থেকেও ধারণা করা যাবে সঙ্গীতসম্পর্কে তাঁর ধারণা কেমন ছিল—

'সঙ্গীত সর্বশ্রেষ্ঠ ললিতকলা, এবং যাঁরা তা বোঝেন তাঁদের নিকট উহা সর্বোচ্চ উপাসনা।' (৩)

'শুধু সুর আর তাল বজায় রাখাটাই গানের সব কথা নয়। গান অবশ্যই একটা ভাব প্রকাশ করবে। কৃত্রিম ভঙ্গীতে গাওয়া গান কি কারো ভাল লাগে? গানের

ভেতরকার ভাব গায়কের অনুভূতিকে জাগাবে, কথাগুলিকে পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করতে হবে এবং সুর ও তালের ওপর ঠিক ঠিক লক্ষ্য রাখতে হবে। যে গান গায়কের মনে অনুরাগ ভাব জাগাতে না পারে, তা গানই নয়।' (৪)

'গান হচ্ছে, কি কান্না হচ্ছে, কি ঝগড়া হচ্ছে—তার কি ভাব, কি উদ্দেশ্য তা ভরত ঋষিও বুঝতে পারেন না। আবার সে গানের মধ্যে প্যাঁচের কি ধুম? সে কি আঁকাবাঁকা ডামাডোল, বত্রিশ নাড়ির টান তায় রে বাপ? তার ওপর মুসলমান ওস্তাদদের নকল দাঁতে দাঁত চেপে নাকের মধ্যে দিয়ে আওয়াজে সে গানের আবির্ভাব। এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন, প্রাণহীন, সে ভাষা, সে শিল্প, সে সঙ্গীত কোনও কাজের কথা নয়।' (৫)

স্বামীজীর সঙ্গীতচিন্তার প্রসঙ্গে বিশেষ স্মরণীয় কথা এই যে, তিনি ছিলেন সঙ্গীততত্ত্বের এক ভাষ্যকার। সঙ্গীতের ঔপপত্তিক ও ক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি একটি বিস্তারিত প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন এবং একখানি গীত-সংকলন গ্রন্থও তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ খৃঃ তা একত্র মুদ্রিত হয়েছিল 'সঙ্গীত কল্পতরু' নামে পুস্তকে। গ্রন্থটির বটতলাশ্রিত প্রকাশক নিজের নাম গ্রন্থকাররূপে মুদ্রিত করলেও বস্তুত তা স্বামীজীরই যথাক্রমে রচনা ও সম্পাদনার ফল। এ বিষয়ে অন্যত্র প্রমাণপঞ্জী সমেত যথাসম্ভব আলোচনা এবং তাঁর সঙ্গীততত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধের পুনর্মুদ্রণ প্রকাশ করা হয়েছে। (৬)

স্বামীজীর উক্ত 'সঙ্গীত কল্পতরু' পুস্তকটির অধিকাংশ স্থান অধিকার করে আছে বিপুলসংখ্যক গানের সংকলন, তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কয়েকটি সমেত স্বামীজীর সব প্রিয় গানগুলিই অন্তর্ভুক্ত দেখা যায়। গ্রন্থের উপক্রমণিকাস্বরূপ সঙ্গীতের উপপত্তি ও ক্রিয়াদি বিষয়ক ৯০ পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ দেওয়া হয়েছে, যা একটি স্বতন্ত্র পুস্তিকারূপেও মুদ্রিত হতে পারত। প্রকাশক জানিয়েছেন যে, এটি 'নরেন্দ্রনাথ দত্ত বি, এ,' রচিত।

উক্ত প্রবন্ধটি 'সঙ্গীত কল্পতরু'র ভূমিকাস্বরূপ রচনা করবার পরেই তাঁর সন্ন্যাসজীবন আরম্ভ হয়েছিল।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) উদ্বোধন, শ্রাবণ ১৩০৯ সাল।

(২) সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়। ১৯৬৩।

(৩) পত্রাবলী, দ্বিতীয় ভাগ, ১৭৭ পৃঃ—স্বামী বিবেকানন্দ।

(৪) Life of Swami Vivekananda. By his Eastern & Western Disciples P. 20.

(৫) ভাববার কথা, পৃঃ ১০—স্বামী বিবেকানন্দ।

(৬) সঙ্গীত সাধনায় বিবেকানন্দ ও সঙ্গীত কল্পতরু পৃঃ ১৩১-২০৬—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী (১৮৬৩-১৯২৫)

বাংলার অন্যতম দিকপাল সঙ্গীতসাধক ছিলেন বিষ্ণুপুরের সন্তান রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। সমকালীন সঙ্গীতজগতে তিনি আচার্য্যস্থানীয়রূপে গণ্য হতেন। শুধু বাংলায় নয়, সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও তিনি সম্মানের আসন লাভ করেন একজন সঙ্গীতাচার্য্যরূপে। এ বিষয়ে তাঁকে যদু ভট্ট এবং অঘোরনাথ চক্রবর্তীর উত্তরসূরী বলা যায়। অঘোরনাথের খ্যাতির মুকুট তিনি ধারণ করেন সগৌরবে।

বিগত শতকের মহাগুণী বাঙালীদের মধ্যে তিনি প্রায় আধুনিককালে উপনীত হয়েছিলেন এবং পশ্চিম-অঞ্চলে নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে আপন প্রতিভার পরিচয় দেন সর্বভারতীয় গুণীজন সমক্ষে। মৃত্যুর অব্যবহিতপূর্বে ১৯২৪ খৃঃ তিনি লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনে গুণপনা প্রদর্শন করে ওস্তাদ আল্লাদে খাঁর সঙ্গে পুরস্কৃত হয়েছিলেন। সেই সম্মেলনে "গোঁসাইজী'র (এই নামেই

রাধিকাপ্রসাদ সঙ্গীতজগতে সুপরিচিত ছিলেন—বর্তমান লেখক) বিশুদ্ধ নায়কী ও মুদ্রাকী কানাড়া গানে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, ঠাকুর নবাবালি প্রমুখ বোদ্ধারা স্বীকার করেছিলেন যে, তিনি একজন শিক্ষিত ওস্তাদ ছিলেন বটে।

"প্রথম দিন গোঁসাইজীকে তিনি (ভাতখণ্ড) বলেছিলেন যে, তিনি গোঁসাইজীর শিষ্য হয়ে তাঁর কাছ থেকে অনেকগুলি ধ্রুপদ শিখে নেবেন—স্বরলিপি করে প্রকাশ করবার জন্যে।" (১)

ক্ষীণকায় বিনয়ী এবং নিরীহ স্বভাবের রাধিকাপ্রসাদ সঙ্গীত-জগতের এক বিরাট পুরুষ ছিলেন। প্রধানত ধ্রুপদী হলেও খেয়াল অঙ্গেও তিনি রীতিমত কৃতী ছিলেন এবং দুই প্রকার সঙ্গীতই পরিবেশন করেন আসরে। তাঁর সঙ্গীতভাণ্ডার অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। বড় বড় আসরে এত বিভিন্ন এবং অপ্রচলিত রাগের গান তিনি শোনাতেন যা ছিল বিস্ময়ের বস্তু। তাঁর সঙ্গীত-জীবনের নানা প্রসঙ্গ এবং কয়েকটি আসরে সঙ্গীতানুষ্ঠানের বিবরণ অন্যত্র বর্ণনা করা হয়েছে। (২)

সঙ্গীতাচার্যরূপে তাঁর প্রভাব ও দান স্মরণীয় হয়ে আছে বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে। তাঁর সঙ্গীতগুণের অন্যতম প্রকৃষ্ট পরিচয় তাঁর গঠিত কৃতী শিষ্যমণ্ডলী। বাংলার কয়েকজন প্রথম শ্রেণীরগুণী তাঁর শিক্ষাধীনে সঙ্গীতকৃতী হয়েছিলেন। যথা,—ধ্রুপদী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী প্রভৃতি। উক্ত মহীন্দ্রনাথের কৃতী শিষ্যবৃন্দ তাঁর মৃত্যুর পরে রাধিকাপ্রসাদের নিকট শিক্ষা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। বহরমপুরের কিশোরীমোহন ভাস্করও গোস্বামী মহাশয়ের একজন গুণী-শিষ্য। তা ছাড়া বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেয়াল-গায়ক সাতকড়ি মালাকর, স্বনামপ্রসিদ্ধ দিলীপকুমার রায়, নাটোর রাজ যোগীন্দ্রনাথ রায়, সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতিও কিছুকাল রাধিকাপ্রসাদের নিকট সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ গোস্বামীও পিতার শিক্ষায় সুকণ্ঠগায়ক হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি পরলোকগত হয়েছিলেন অকালে। বিষ্ণুপুর অঞ্চলে সিমলাপাল রাজবাড়িতে সঙ্গীতানুষ্ঠানে যোগদান করিতে গিয়ে রাধিকাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোবিন্দপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে।...

বহরমপুরে মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী যে সঙ্গীত-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন, রাধিকাপ্রসাদ তার অধ্যক্ষরূপে অবস্থান করেন সুদীর্ঘকাল। সেখানেই তাঁর শিক্ষাধীনে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর সঙ্গীতজীবন, গঠিত হয়। কিশোরীমোহন ভাস্করও গোস্বামী মহাশয়ের প্রতিভাবান শিষ্য ছিলেন বহরমপুরে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি, বিশেষ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাঙ্গীতিক যোগাযোগ রাধিকাপ্রসাদের জীবনের অন্যতম উল্লেখনীয় অধ্যায়। আদি ব্রাহ্মসমাজ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-পরিচালিত ভারত সঙ্গীতসমাজ প্রভৃতিতে যুক্ত থাকবার সময় তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর গুণমুগ্ধ। উপরন্ত, হিন্দীরাগসঙ্গীতের আদর্শে বাংলা গান রচনায় রবীন্দ্রনাথ তাঁর সহযোগিতা লাভ করেছিলেন বলে কথিত আছে। গোস্বামী মহাশয়ের কণ্ঠে নানা উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ এবং কিছু খেয়াল গানও শুনে অনুপ্রেরণা পান রবীন্দ্রনাথ। রাধিকাপ্রসাদের গান অনেকবার ঘরোয়া-আসরে শুনেছিলেন তিনি এবং তারমধ্যে কয়েকটি গানের কাঠামো অনুসরণে বাংলা গান রচনা করেন। যথা—'কৌন রূপ বনি হো রাজাধিরাজ' (যদু ভট্ট রচিত) থেকে 'মধুররূপে বিরাজো হে বিশ্বরাজ' (তিলক কামোদ); 'তেরো রি নয়নবান ভোহেঁ ধনুষ' থেকে' তোমারি মধুররূপে ভরেছে ভুবন' (ঝিঁঝিট খাম্বাজ); 'দুসহ দুখ দুখদলন করো' (লচ্ছাশাখ) থেকে 'বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দধারা'; 'সুন্দর লাগো রি' থেকে 'মন্দিরে মম কে'; (খেয়াল—আড়ানা) 'মোরি নৈ লগন লাগিরে' (খেয়াল—নটমল্লার) থেকে 'মোরে বারে বারে ফিরালে।'

মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত উক্ত সঙ্গীতকেন্দ্রে দীর্ঘকাল আচার্যরূপে অবস্থান করে রাধিকাপ্রসাদ অঞ্চলটিতে সঙ্গীতচর্চার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়েছিলেন। বাংলার এক শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত-প্রতিভা গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী তরুণ বয়সে সঙ্গীতসাধনায় অগ্রসর হন তাঁর শিক্ষাধীনে। কিশোরীমোহন ভাস্কর রাধিকাপ্রসাদের এই সঙ্গীত-বিদ্যালয় থেকেই কৃতী গায়করূপে বিকশিত হচ্ছিলেন, কিন্তু অকালমৃত্যুর ফলে তাঁর সঙ্গীত-জীবন অপূর্ণ থেকে যায়।.........

অবশেষে গোস্বামী মহাশয় বহরমপুর থেকে কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন পরিণত বয়সে। তারপর জীবনের শেষ ৯।১০ বছর তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন পাথুরিয়াঘাটার সঙ্গীতপ্রেমী (এবং নিখিল বঙ্গসঙ্গীত সম্মেলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক) ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ। রাধিকাপ্রসাদ প্রথমে ঘোষ মহাশয়ের পাথুরিয়াঘাটাস্থ ভবনে দেড় বছর বাস করেন। এখানেই বহির্মহলে একটি ত্রিতল ঘরে রাধিকাপ্রসাদের নিকটে সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ও পরবর্তীকালের বাংলার এক সঙ্গীতরত্ন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী।

পরে ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের অনুরোধে রাধিকাপ্রসাদ আপন পরিবারবর্গকে বিষ্ণুপুর থেকে আনয়ন করে ঘোষ মহাশয়ের ৩৬ বি মসজিদবাড়ি স্ট্রীটের বাড়িতে প্রায় ৮ বছর বসবাস করেন। পাথুরিয়াঘাটার গৃহে ভূপেন্দ্রনাথ যে অবৈতনিক সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন সেখানে নিয়মিত শিক্ষা দিতেন গোঁসাইজী। তা ছাড়া, দ্বিতলের আসরে প্রায় প্রতিদিন তাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠান হত। তাঁর সেইসব গানের আসরে তবলা সঙ্গত করতেন সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ইনি টপ্পাগায়কও ছিলেন এবং সেই সূত্রে টপ্পাচার্য মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের শিষ্য)। এক একদিন রাধিকাপ্রসাদের গানের সঙ্গে ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ হারমোনিয়মে সহযোগিতা করতেন।

কলকাতায় রাধিকাপ্রসাদের অন্যান্য আসরের মধ্যে নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথ ও রাজা প্রফুল্লনাথ ঠাকুরের ভবন, বৌবাজারের 'ওল্ড ক্লাব' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তা ছাড়া, দক্ষিণেশ্বরের শ্রীরামকৃষ্ণ উৎসবে তাঁকে গান গাইবার জন্যে নিয়ে যেতেন সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অমৃতলাল বসু' নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত প্রমুখ তাঁর অনুরাগী-বৃন্দ এবং শ্রীরামকৃষ্ণসঙ্ঘের স্বামী সারদানন্দ, স্বামী শিবানন্দ প্রভৃতি তাঁর গানের পরম ভক্ত ছিলেন।

পরিণত বয়সে বাংলাদেশে এবং উত্তর ভারতে রাধিকাপ্রসাদ অসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিলেন। যে লক্ষ্ণৌ সঙ্গীত সম্মেলনের কথা প্রথমেই উল্লিখিত হয়েছে সেখানে স্বর্ণপদক ও গুণীর সম্মানলাভ তাঁর সঙ্গীত-জীবনের শেষ কীর্তি। লক্ষ্ণৌ থেকে প্রত্যাগমনের দেড় মাসের মধ্যেই রাধিকাপ্রসাদের আকস্মিক মৃত্যু হয়। মসজিদবাড়ি স্ট্রীট থেকে বিষ্ণুপুরে তিনি গিয়েছিলেন এবং সেখান থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই আসে তাঁর মৃত্যু সংবাদ। তাঁর মৃত্যুতে কলকাতায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে এক বিরাট সমাবেশে শোক সভা অনুষ্ঠিত হ'য়েছিল। পরিষদের রমেশ ভবনে বাংলার মনীষীবৃন্দের তৈলচিত্র সংগ্রহ শালায় রক্ষিত আছে রাধিকাপ্রসাদের প্রতিকৃতি।

গ্রন্থপঞ্জী

(১) ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জীকা—দিলীপ কুমার রায়।
(২) সঙ্গীতের আসরে পৃষ্ঠা—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।
(৩) রবীন্দ্রসঙ্গীত, দ্বিতীয় সংস্করণ—শান্তিদেব ঘোষ।
সাঙ্গীতিকী—দিলীপকুমার রায়।

প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯৫৬)

রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর প্রায় সমবয়সী প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বাংলার সঙ্গীত-জগতের অন্যতম গৌরব ছিলেন। তিনিও সর্বভারতীয় সঙ্গীতজগতে স্মরণীয় প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন একজন নেতৃস্থানীয় আচার্যরূপে।

ভারতের বৃহত্তর সঙ্গীতক্ষেত্রে তাঁর সম্মানের আসন রাধিকাপ্রসাদের তুলনায় অধিকতর দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল বলা যায়। কারণ প্রমথনাথ সুদীর্ঘ আয়ু লাভ করে রাধিকাপ্রসাদের মৃত্যুর পরও প্রায় ৩০ বছর অবস্থান করেছিলেন সঙ্গীত-জগতে। উনিশ শতকের গৌরবোজ্জ্বল সঙ্গীতধারার সঙ্গে একেবারে আধুনিক-কালের যোগসূত্র স্বরূপ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বিদ্যমান ছিলেন। বর্তমান শতকের প্রথম ভাগে তিনিই সম্ভবত সর্বপ্রথম সর্বভারতীয় সঙ্গীতসম্মেলনে যোগদান করেন (আমেদাবাদ, ১৯১৯) বাংলার পক্ষ থেকে। তখন থেকেই তিনি পশ্চিমাঞ্চলের কলাবত-সমাজে স্বীকৃতিলাভ করেন। মধ্য বয়স থেকে উত্তর ভারতের বহু সঙ্গীতকেন্দ্রে ও সঙ্গীত সম্মেলনে গুণপনা প্রদর্শন করে তিনি আপন মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেছিলেন সর্বভারতীয় সঙ্গীতক্ষেত্রে।

পরিণত বয়সে প্রমথনাথ সঙ্গীতসমাজে যন্ত্রীরূপে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠানের বাহন ছিল সুরশৃঙ্গার যন্ত্র। সুরশৃঙ্গারে রাগের সুসম্পূর্ণ ও পদ্ধতিগত আলাপচারিতে, বিশেষ বিলম্বিত লয়ে তাঁর প্রতিভা সম্যক প্রকাশমান হত। অল্পসংখ্যক গুণীই রাগ রূপ প্রকটিত করতেন এমন নিপুণ ঢিমা রীতির আলাপ বাদনে। স্বনামধন্য বীণকার উজীর খাঁর শিষ্য বলে তিনি সুখ্যাত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর এই আলাপচারির পদ্ধতি উক্ত ওস্তাদের অনুবর্তী ছিল না। এবিষয়ে তিনি ছিলেন তাঁর অপর সঙ্গীতগুরু আন্না ঘোড়পুরের বাদন-রীতির অনুসারী। (প্রমথনাথের অন্যতম শিষ্য এবং বাংলার এক কৃতী সঙ্গীতবিদ মোহিনীমোহন মিশ্রের মতে, ধ্রুপদগুণী মুরাদ আলী খাঁর ঢিমা আলাপের ঢঙ্ও বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাদন শৈলীতে প্রকাশ পেত। গিধৌড়ের দরবারে প্রমথনাথের সুরশৃঙ্গার বাদন শুনে সেজন্যেই রবাবী মহম্মদ আলী খাঁ মন্তব্য করেছিলেন, 'তুমি উজীর খাঁর কাছে শেখোনি। কারণ উজীর খাঁ এত বিলম্বিত বাজাতেন না।'

যন্ত্রীরূপে তিনি প্রখ্যাতনামা হলেও তাঁর প্রায় ৪০ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি প্রধানত কণ্ঠসঙ্গীতের অর্থাৎ ধ্রুপদ ও খেয়াল গানের সাধনা করেছিলেন এবং সে সময় তিনি ছিলেন মূলত ধ্রুপদী। সেসব প্রসঙ্গ তাঁর জীবন কথায় পরে উল্লেখ করা হবে। এখানে শুধু বক্তব্য যে, একাধারে ধ্রুপদ, খেয়াল গানের চর্চা এবং একাধিক যন্ত্রসঙ্গীতের সাধনার যোগফলে দুর্লভ সমৃদ্ধিশালী হয়েছিল তাঁর সঙ্গীত-জীবন।

ভারতের বহু সঙ্গীতাসরে অংশগ্রহণ তিনি সমকালীন নেতৃস্থানীয় কলাবতদের অন্যতমরূপে সর্বত্র সম্মানিত ছিলেন। আমেদাবাদ, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি সঙ্গীতসম্মেলন ভিন্ন লাহোর, কাশ্মীর, শিমলা, নাগপুর, পুনা, বাঙ্গালোর বারানসী, গিধৌড়, দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি দরবার ও আসরে স্বীকৃত হয়েছিল তাঁর গুণপনা। জীবনের শেষ ৫ বছর তিনি দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাদেমীর কার্যকরী সমিতির সদস্য ছিলেন। যেসব বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞ তাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠানের ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিখ্যাত রুশ পিয়ানোবাদক মিরোভিচের নাম উল্লেখ-যোগ্য।

কলকাতার এক প্রাচীন সঙ্গীতসংস্থা ভবানীপুর সঙ্গীতসম্মিলনীর তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। সহ-সভাপতি রূপে সুদীর্ঘকাল তিনি সম্মিলনীর কর্মধারার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন;

ভারতীয় সঙ্গীতের রাগপদ্ধতি সম্বন্ধে ক্রিয়াত্মক ও তাত্ত্বিক জ্ঞানের কিছু পরিচয় তিনি রেখে গেছেন তাঁর

'রাগ নির্ণয়' নামক অপ্রকাশিত পুস্তকের তিনখণ্ড পাণ্ডুলিপিতে। উক্ত গ্রন্থে তিনি বহু প্রচলিত ও অপ্রচলিত রাগের ঠাট, রূপ পরিচয়, বিস্তারের নির্দেশ ইত্যাদি প্রণালীবদ্ধভাবে গ্রথিত করেছেন। শুধু উত্তর ভারতীয় নয়, বহু কর্ণাটকী রাগের পরিচয়ও তিনি দিয়েছেন—যথা, দিধি আওছ, সুধা ধানশী, পূর্ণ সদ্‌জমা, মায়াবতী প্রভৃতি। কিন্তু, দুঃখের বিষয় এই মূল্যবান পুস্তকটির আজো মুদ্রণের সুযোগ ঘটেনি।

বারাণসীর ধ্রুপদগুণী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রমথনাথের সঙ্গীতজ্ঞানের প্রতি এমন আস্থাবান ছিলেন যে, তাঁর ধ্রুপদের স্বরলিপি পুস্তকমালা মুদ্রণের পূর্বে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মতামত গ্রহণ করতেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডেও চমৎকৃত হয়েছিলেন প্রমথনাথের জ্ঞানের পরিচয় লাভ করে।

প্রমথনাথের সঙ্গীতজীবনের একটি উল্লেখ্য কৃতী ছিল তাঁর প্রযোজিত রাগসঙ্গীতে চণ্ডীগানের অনুষ্ঠান। সতীশচন্দ্র ঘটকের সহযোগিতায় তিনি চণ্ডী-মাহাত্ম্য বিষয়ে গীতাবলী রচনা করেছিলেন। তাঁর সুরসংযোগে গঠিত সেই গীতিমালিকার ডালি নিয়ে তাঁর শিষ্যবর্গ চণ্ডীর গান পরিবেশন করতেন সুদীর্ঘ সঙ্গীতাসরে। বিভিন্ন রাগে এবং ধ্রুপদাঙ্গে অনুষ্ঠিত সেইসব গানে তাঁর শিষ্যগণ বিশেষ জিতেন্দ্রনাথ মিত্র উদাত্তকণ্ঠে এক অভিনব পরিবেশ সৃজন করতেন। প্রমথনাথের পরিকল্পিত ও পরিচালিত সেই চণ্ডীপূজার সঙ্গীতানুষ্ঠান উচ্চ ভাবের আবেদনে গভীর দ্যোতনা জাগাত শ্রোতাদের মনে।......

প্রমথনাথের সঙ্গীতভাণ্ডারে রাগের সঞ্চয় বিপুল ছিল এবং বিভিন্ন আসরে অনুষ্ঠানের সময় তিনি সে-পরিচয় দিতেন। তাদের মধ্যে তাঁর প্রিয় রাগ ছিল—ইমন কল্যাণ, দরবারি কানাড়া, বাগেশ্রী, পুরিয়া, জয়জয়ন্তী, ভৈরবী, দরবারি তোড়ি প্রভৃতি।

তাঁর বিরাট শিষ্যগোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকজনের নাম হল —কুমুদেশ্বর মুখোপাধ্যায়, মোহিনীমোহন মিশ্র, জিতেন্দ্রনাথ মিত্র, বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন্দ্রনাথ মিত্র, বিনোদ চট্টোপাধ্যায়, সুধীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, নৃসিংহ মুখোপাধ্যায় (জামাতা), ডঃ অনন্ত সেনগুপ্ত, ললিত পাল, সন্তোষ সুর, মুলুকচাঁদ ও অনুপচাঁদ বেদী। প্রমথনাথ যে বহুমুখী প্রতিভাসম্পন্ন সঙ্গীতাচার্য ছিলেন, তা' তাঁর শিষ্যবৃন্দের সঙ্গীতজীবন থেকে ধারণা করা যায়। কারণ তাঁর সাক্ষাৎ শিক্ষায় তাঁরা কেউ ধ্রুপদী, কেউ খেয়াল-গায়ক, কেউ সুরশৃঙ্গারবাদক রূপে সঙ্গীতক্ষেত্রে স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। বাংলার সঙ্গীতজগতে তাঁর প্রভাব ও দানের একটি দৃষ্টান্ত হল তাঁর কৃতী শিষ্যমণ্ডলী গঠন।......

১৮৬৪ খৃঃ প্রথম ভাগে (বাংলা ১২৭১ সনের ১লা পৌষ) দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে প্রমথনাথের জন্ম হয়। হরিশ পার্কের পশ্চিমে, ৮০২ হরিশ মুখার্জি রোডে তাঁর জন্মস্থান। পূর্ব্বকালে এই হরিশ পার্ক অঞ্চলের নাম ছিল রাজার বাগান এবং অঞ্চলটিতে উক্ত বন্দ্যোপাধ্যায়-বংশীয়দের প্রায় ২০০ বছরের বাস। প্রমথনাথের জনৈক পূর্ব্বপুরুষ কালিঘাটের হালদার-পরিবারের জামাতা ছিলেন এবং সেই সূত্রে তাঁদের আদি নিবাস গোবিন্দপুর (ফোর্ট উইলিয়ম ও গড়ের মাঠ এলাকা) ত্যাগ করে হালদারমহাশয়দের সুবাদে রাজার বাগান অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। প্রমথনাথের সেই পূর্ব্বপুরুষ হালদারবংশে বিবাহের ফলে কালী মন্দিরের পালার অংশ লাভ করেন এবং পরবর্তীকালে প্রমথনাথও হন মন্দিরের পালার এক ক্ষুদ্রাংশের অধিকারী।

তাঁর পিতা হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীতচর্চা করতেন, তবে তা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। বাড়ীতে সঙ্গীতযন্ত্রাদি ছিল এবং প্রমথনাথ নিতান্ত শিশুকালে বাড়ীর একটি পরিত্যক্ত সেতার নিয়ে আপন মনে বাজাবার চেষ্টা করতেন এবং শৈশব থেকেই তিনি সঙ্গীতের অনুরাগী। তাঁর ৬ বছর বয়সে পিতৃবিয়োগ

ঘটে। তারপর ভবানীপুরের লণ্ডন মিশনারি স্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হয়, কিন্তু বিদ্যাচর্চায় মনোযোগের অভাবে শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখেই বিদ্যালয় ত্যাগ করেন। তাঁর ১৫।১৬ বছর বয়সে আন্তরিক আগ্রহের জন্যে পিতৃব্য তাঁকে গোবিন্দ বসু লেন নিবাসী এস্রাজবাদক শ্যামলাল গোস্বামীর নিকটে সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেন। গুণী এস্রাজী শ্যামলাল ছিলেন নবাব ওয়াজিদ আলীর মেটিয়াবুরুজ দরবারের ওস্তাদ শানাইবাদক প্যারে খাঁর শিষ্য। শ্যামলাল গোস্বামীর শিক্ষাধীনে প্রমথনাথ বেশ কয়েক বছররীতি মত সঙ্গীতচর্চা করেন এবং গোস্বামী মহাশয়ের শেষজীবন পর্যন্ত তাঁর কাছে যেতেন।

শ্যামলালের শিক্ষাই প্রমথনাথের ভিত্তি গঠন করে এবং প্রায় শেষবয়স পর্যন্ত এস্রাজ-যন্ত্রটি ঘরোয়াভাবে বাজাতেন প্রমথনাথ। শ্যামলালের সূত্রে আরো এক কারণে তিনি সঙ্গীত-শিক্ষার্থী রূপে বিশেষ লাভবান হন। মেটিয়াবুরুজ দরবারে অনেক বিশিষ্ট গুণীর সঙ্গীতানুষ্ঠান তিনি শোনার সুযোগ পান গোস্বামী মহাশয়ের সঙ্গে থেকে। তা ভিন্ন, শ্যামলালবাবুর বাড়ীতে সপ্তায় একদিন মেটিয়াবুরুজ ও অন্যান্য স্থানের কলাবতদের আসর বসত এবং প্রমথনাথও সেসব আসরে উপস্থিত হতেন। এমনিভাবে আরো দুটি জায়গার জলসায় প্রতি সপ্তায় দুদিন যোগ দিয়ে প্রভূতভাবে উপকৃত হন তিনি। একটি হল ভবানীপুরের রূপচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি রূপচাঁদ মুখার্জি লেন ও কালিঘাট রোডের সংযোগস্থলে)। এখানে নবাব ওয়াজিদ আলীর দরবারের অনেক গায়ক-বাদকদেরই সঙ্গীতানুষ্ঠান শোনবার সুযোগ তাঁর হয়। দ্বিতীয়, পাখোয়াজগুণী কেশবচন্দ্র মিত্রের ভবানীপুর পদ্ম-পুকুর রোডস্থ গৃহে সমাগত সঙ্গীত-শিল্পীদের অনুষ্ঠানেও উপস্থিত থাকতেন তিনি। কেশবচন্দ্রের ভবনে একসময় সুপ্রসিদ্ধ ধ্রুপদী মুরাদ আলী খাঁ ছমাস অবস্থান করেন এবং সেখানেই খাঁ সাহেবের নিকট ধ্রুপদ তালিম নেবারও সুবিধা হয় প্রমথনাথের। তাছাড়া, ওস্তাদ আলী বখ্‌সের এক শিষ্য ডঃ বেচু শেখের ভবানীপুর-গৃহে আলি বখ্‌সের আগমন ঘটলেই প্রমথনাথ সংবাদ পেয়ে ওস্তাদের সকাশে উপনীত হতেন এবং আলী বখ্‌সের গানের সংগে হারমোনিয়ম সঙ্গত করতেন। এইভাবে নিজেও লাভবান হতেন সঙ্গীতচর্চায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, অল্প বয়স থেকেই কৃতী হারমোনিয়মবাদক রূপে তিনি দক্ষিণ কলকাতায় খ্যাতিমান হন এবং আলী বখ্‌স্, মুরাদ আলী প্রমুখ বিশিষ্ট গুণীদের গানের সহযোগিতায় হারমোনিয়ম-বাদন করতেন। এই সূত্রেও তাঁর সঙ্গীত-জীবন সমৃদ্ধ হত, একথা বলা বাহুল্য।

সেই সঙ্গে, গোবরডাঙ্গার সুরবাহার-শিল্পী জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও প্রমথনাথের সঙ্গীতসেবার মাধ্যমে হৃদ্যতা ছিল। ফলে, জ্ঞানদাপ্রসন্নের কলকাতার (বিবেকানন্দ রোডে) ভবনে স্বনামধন্য সুবারাহার-গুণী সাজ্জাদ মহম্মদের কাছে মাঝে মাঝে শিক্ষার এবং শ্রীজানের কাছে খেয়াল ও টপ্পা সংগ্রহের সুযোগ লাভ করেন তিনি।

পশ্চিমাঞ্চলের বিখ্যাত ধ্রুপদী নেহেলচাঁদ মিশ্রের শিক্ষাও প্রমথনাথ পেয়েছিলেন। কালিঘাট মন্দিরে ঘটনাচক্রে একদিন তিনি পরিচিত হন নেহেলচাঁদ মিশ্রের সঙ্গে। তার আগে চুনিয়ালাল শীলের জোড়াসাঁকো ভবনে তিনি শ্যামলাল গোস্বামীর সঙ্গে নেহেলচাঁদের-ধ্রুপদ গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাই সেদিন কালীমন্দিরে পূজা দেবার পর নেহেলচাঁদ অন্যতম পাণ্ডারূপে প্রমথনাথকে দক্ষিণা দেবার সময় তিনি জোড়হাতে প্রার্থনা জানালেন, 'আমায় দয়া করে, কিছু বিদ্যা দান করুন।' তারপর তাঁর সঙ্গে পরিচয় ও কথাবার্তার পর তাঁকে ধ্রুপদ শেখাতে সম্মত হন।

পুনার স্বনামধন্য বীণকার এবং দ্বারবঙ্গ রাজ্যের নিযুক্ত সভাবাদক আন্না ঘোড়পুরের সঙ্গেও তিনি এমনিভাবে পরিচিত হয়েছিলেন কালীমন্দিরে। সেইসূত্রেই উক্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিলম্বিত-আলাপী বীণকারের নিকটে প্রমথনাথের তালিমের ব্যবস্থা হয়। আন্না ঘোড়পুরে কয়েকমাস তাঁর গৃহে সম্মানিত গুরুরূপে অবস্থান করে তাঁকে সযত্নে শিক্ষাদান করেছিলেন। প্রমথনাথ যে উত্তরজীবনে আলাপচারিতে আন্না ঘোড়পুরের ঢিমা

বাদনরীতি অনুসরণ করতেন, সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে যথাস্থানে। অবশ্য তিনি সারস্বত বীণা পরে বাজাতেন না। তিনি যন্ত্রবাদকরূপে সুরশৃঙ্গারকেই সঙ্গীত-সাধনার মাধ্যম করেছিলেন।

সুরশৃঙ্গার যন্ত্রে তিনি তালিম পান রামপুর ঘরাণাদার ওস্তাদ উজীর খাঁর নিকটে। গত শতকের শেষপাদকে উজীর খাঁ কলকাতায় ক'বছর একাদিক্রমে অবস্থানের সময়ে প্রমথনাথ তাঁর কাছে শিক্ষার দুর্লভ সুযোগ লাভ করেন। প্রমথনাথ ভিন্ন আর দুজন মাত্র বাঙ্গালী উজীর খাঁর শিক্ষা পেয়েছিলেন কলকাতায়। তাঁদের অন্যতম ক্ল্যারিওনেটবাদক অমৃতলাল বা হাবু দত্তের কথা আগেকার একটি অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে এবং সুরবাহার-বাদক যাদবেন্দ্রনন্দন মহাপাত্রের বিবরণ পরবর্তী এক অধ্যায়ে দেওয়া হবে। অমৃতলাল এবং যাদবেন্দ্রনন্দন রামপুর রাজ্যে উপস্থিত হয়েও উজীর খাঁর শিক্ষা লাভ করেছিলেন। উজীর খাঁর চতুর্থ বাঙ্গালী শিষ্য আলাউদ্দিন খাঁ ওস্তাদের তালিম পান সব শেষে এবং রামপুরে। প্রমথনাথ সেবার কলকাতায় উজীর খাঁর কাছে শিখেছিলেন।

উক্ত ওস্তাদদের নিকট শিক্ষা ছাড়াও, মেটিয়াবুরুজ দরবারের দুজন গুণী খেয়ালগায়ক আন্‌সাদ দৌলা ও মুস্তাকিন দৌলার কাছেও শিক্ষার সুযোগ পান প্রমথনাথ।

তাঁর সঙ্গীতগুরুদের নামগুলি এখানে আনুপূর্বিক তালিকাবদ্ধ করে দেওয়া হল: শ্যামলাল গোস্বামী, মুরাদ আলী খাঁ, সাজ্জাদ মহম্মদ, শ্রীজান বাঈ, আল্লা যোড়পুরে, আন্‌সাদ দৌলা, মুস্তাকিন দৌলা, নেহালচাঁদ মিশ্র ও উজীর খাঁ। এত বিভিন্ন রীতি প্রকৃতির গুণীদের শিক্ষা খুব অল্প সঙ্গীতজ্ঞই লাভ করেছেন। উক্ত নানাপ্রকার কলাবতদের শিক্ষা লাভ করতে যাওয়া তাঁর পক্ষে লঘুচিত্ততা বা অস্থিরমতিত্বের পরিচায়ক কিন্তু নয়—যা অন্য সাধারণ শিক্ষার্থীর পক্ষে বলা যেত। বিচিত্র ও বিশিষ্ট ছিল প্রমথনাথের সঙ্গীতপ্রতিভা। তাই এত বহুত্বের মধ্যেও তিনি ভারতীয় সঙ্গীতের মূলধারার সন্ধান ও সাধনা করে তার স্বরূপকে আত্মস্থ করেছিলেন। নানা ধারায় অর্জিত রাগবিদ্যাকে একনিষ্ঠ, গভীর চর্চা ও উপলব্ধিতে অখণ্ডী করে নেন তিনি। প্রমথনাথের সঙ্গীতজীবন এই দিক থেকে এক অবশ্য ছিল।

যেমন উজীর খাঁর কাছে তেমনি অন্যান্য উল্লিখিত গুণীদের নিকটেও তিনি সঙ্গীতশিক্ষা করেন বিনা বেতনে। তিনি নিজেও কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ভিন্ন বিদ্যাদান বিষয়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন না।

তিনি প্রথম পারিশ্রমিক নেন ও পরে জীবিকা হিসাবে সঙ্গীতকে অবলম্বন করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের অনুরোধে। চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয় তাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠানের গুণমুগ্ধ অনুরাগী ছিলেন এবং প্রমথনাথের সঙ্গীতজীবনে দেশবন্ধুর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল। গুণীস্বরূপে প্রমথনাথকে তিনি সবিশেষ শ্রদ্ধা করতেন এবং ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময়চিত্তে শুনতেন তাঁর যন্ত্রবাদন। তাঁর আন্তরিক অনুরোধে প্রমথনাথ তাঁর কন্যাদ্বয়ের সঙ্গীতশিক্ষক হয়েছিলেন দেড়শ টাকা মাসিক দক্ষিণায়। সে সম্ভবত ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের কথা। চিত্তরঞ্জন তখনো দেশবন্ধু হননি। কিন্তু সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিষ্টারের মহাপ্রাণতা ও স্বদেশীয় সংস্কৃতির গুণগ্রাহিতার কথা তখনও সুবিদিত। তিনি সে সময় স্বয়ং শুধু কবি নন—সাহিত্য, সঙ্গীত ইত্যাদি দেশের মানসসম্পদ এবং তাদের সেবকদের মহান পৃষ্ঠপোষক। পূর্ববর্তী এক অধ্যায়ে খ্যাতনাম্নী গায়িকা যাদুমণির প্রসঙ্গেও চিত্তরঞ্জনের সঙ্গীতানুরাগ ও গুণীসমাদরের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রমথনাথের সঙ্গীতজীবন সঙ্গীতজ্ঞদের পৃষ্ঠপোষকতার এ বিষয়ে আর একটি দৃষ্টান্ত।

তাঁর সঙ্গে পরিচয়ের আগে প্রমথনাথ কলকাতা কর্পোরেশনে চাকুরি করিতেন। চিত্তরঞ্জন তাঁকে সেই কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করালেন সঙ্গীতচর্চায় নিরবকাশ আত্মনিমগ্ন হওয়ার জন্য। প্রমথনাথের সাংসারিক প্রয়োজনের নিরাকরণে তিনি তাঁকে মাসিক আড়াই শ' টাকা দক্ষিণা দিতে লাগলেন। অবশেষে যখন তিনি হলেন দেশবন্ধু, দেশের সেবায় সর্বস্ব-ত্যাগী, রিক্ত, তখন উপায়ান্তরে প্রমথনাথকে ব্যবস্থা করে দিলেন পাটনায়।

তাঁর নির্দেশে সেখানে তাঁর ভ্রাতা, বিখ্যাত আইনজীবী পি. আর. দাশ মহাশয়ের ভবনে এবং ডুমরাওনের রাণীর (ব্যারিষ্টাররূপী চিত্তরঞ্জনের মোয়াক্কেল) সঙ্গীতশিক্ষক নিযুক্ত হলেন প্রমথনাথ। শুধু তাই নয়! পশ্চিমাঞ্চলের গুণীসমাজে প্রমথনাথের সঙ্গীতপ্রতিভার প্রকাশ্যে পরিচয়-দানের ব্যবস্থাও প্রথম করে দেন চিত্তরঞ্জন। তিনি বিষ্ণুদিগম্বর পালুসকরকে পত্র লিখে আমেদাবাদ সঙ্গীত সম্মেলনে প্রমথনাথকে যোগদান করিয়েছিলেন। শেষ পর্বে সর্বত্যাগী চিত্তরঞ্জন পরিত্যাগ করতে পারেননি তাঁর সঙ্গীতপ্রেম। মৃত্যুর এক, দেড় বছর আগেও সম্ভব হলে তিনি প্রমথনাথের সুরশৃঙ্গারবাদন শুনে পরিতৃপ্ত হতেন। তাঁর আমন্ত্রণে একদিন তাঁর গৃহে মহাত্মা গান্ধীকে বাজনা শুনিয়েছিলেন প্রমথনাথ। সে অনুষ্ঠানের বিবরণ এবং প্রমথনাথের সঙ্গীতজীবন ও সঙ্গীতচর্চার নানা কথা অন্যত্র প্রকাশিত হ'য়েছে। (১)

প্রমথনাথ তাঁর সুদীর্ঘ ৯৩ বছরের জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত সঙ্গীতচর্চা ক'রে গেছেন। মৃত্যুর তিনমাস পূর্বেও সঙ্গীতনাটক অ্যাকাদমির কার্যকরী সমিতিতে (একসিকিউটিভ বোর্ড) যোগদান করেছেন দিল্লীতে। বাংলার বাইরে শেষ সঙ্গীতাসরে সুরশৃঙ্গার বাজিয়েছিলেন ১৯৪৭ খৃঃ নাগপুরের গোন্দোয়ানা ক্লাবে।

তাঁর আসরে যন্ত্রবাদনের প্রসঙ্গে আর একটি তথ্য উল্লেখনীয়। সুরশৃঙ্গারে রাগালাপ করবার পর তিনি অন্য একটি যন্ত্রে গৎ বাজাতেন তবলা সঙ্গতে। হার্পের অনুকরণে তাঁর নিজের ফরমায়েসে প্রস্তুত সেই যন্ত্রের তিনি 'সুর আয়না' নাম দিয়েছিলেন। কাঠের ফ্রেমের মধ্যে ২০টি তারের আড়াই সপ্তক বিশিষ্ট সুর আয়নায় তিনি দক্ষিণহস্তের দুই অঙ্গুলি এবং বাম হস্তের এক অঙ্গুলিতে মেজরাফ ধারণ করে বাজাতেন তবলার সহযোগিতায়। আগে তিনি 'আলাপী' নামে আর একটি যন্ত্রও প্রস্তুত করিয়েছিলেন, কিন্তু মনোমত না হওয়ায় বর্জন করেন। পরিণত বয়স থেকে আসরে সঙ্গীত পরিবেশনের সময় সাধারণত প্রথমে সুরশৃঙ্গার ও পরে সুর-আয়না বাজাতেন তিনি।...

জীবনের শেষ ২২ বছর তিনি তাঁর ৭৯।১ হরিশ চ্যাটার্জী স্ট্রীটে গঙ্গাতীরের স্বগৃহে বাস করেন এবং সেখানেই ১৯৫৬ খৃঃ ২৯ নভেম্বর সেই জ্ঞানবৃদ্ধ বয়োবৃদ্ধ সঙ্গীতসাধকের জীবনাবসান হয়।

---

(১) সঙ্গীতের আসরে, পৃঃ ১৫৭-১৬১। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গের নূতন ট্রেড ইউনিয়ন আইন।

রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী তাঁহার রচিত ট্রেড ইউনিয়ন বিল বিধান সভায় পেশ করিয়া, সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে তাহা আইনে পরিণত করিলেন। বর্ত্তমান নিবন্ধে এই নব-বিধানে সব কয়টি ধারা লইয়া আলোচনা করা নিরর্থক এবং তাহার অবকাশও আমাদের নাই। শ্রমমন্ত্রী তাঁহার নূতন আইনে হাইকোর্ট কর্ত্তৃক বে-আইনী ঘোষিত 'ঘেরাও'কে এবার আইনসঙ্গত বলিয়া স্বীকৃতি দিলেন। এতদিন অবশ্য হাইকোর্টের নিষেধসত্বেও ঘেরাও-চক্র সজোরে ঘুরিতেছিল কিন্তু তাহা সত্বেও ঘেরিতদের মনে আদালতে যথাযথ বিচার পাইবার একটা আশা ছিল, কিন্তু এবার সেই সামান্য আশাকে একেবারে নির্ম্মূল করা হইল। অতঃপর বিধিসঙ্গত ঘেরাও কি ভীষনভাবে এবং প্রতাপে চলিতে থাকিবে, তাহা ভাবিতেও ভয় হয়। এই নূতন আইনের আওতা হইতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল প্রভৃতি অ-ব্যবসায়ী সংস্থাগুলিকেও ছাড় দেওয়া হয় নাই। স্কুল-কলেজ এবং হাসপাতালের শ্রমিক ইউনিয়নগুলিও আইনত স্বীকৃতি পাইবে—এইসব সংস্থার কর্ত্তৃপক্ষও এ-স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হইলেন। ইহার ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে ছাত্রদের তাহাদের প্রধানতম কর্ত্তব্য লেখাপড়ার যতটুকু অবশিষ্ট আছে এখন, তাহাও আশা করি অচিরে লোপ পাইবে। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ঘেরাও গত কিছুকাল হইতে চলিতেছে। নূতন ট্রেড ইউনিয়ন আইন পাশ হইবার মাত্র কয়েকদিন পরেই আলিপুরের বিহারীলাল কলেজের Viharilal College College. Or Home and Social Sciences) অধ্যক্ষ মহাশয়াকে ঘেরাও করা হয়। এবং প্রায় বেশ কয়েক ঘণ্টা আটক থাকিবার পর কি তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়েন। অজ্ঞান হইবার পূর্ব্বে কর্ম্মীরা তাঁহাকে নানা ভাবে নিগ্রহীত করে এবং বার বার প্রার্থনা করা সত্বেও তাঁহাকে সামান্য একটু জলপান করিতেও দেওয়া হয় নাই! বলা বাহুল্য যে বিভিন্ন দাবি পুরণ এবং আদায় করিবার জন্য এই ঘেরাও সংঘটিত হয় কর্ম্মীদের সেই সম্ভব এবং অসম্ভব দাবি পুরনের কোন ক্ষমতা কিংবা অধিকার অধ্যক্ষা মহাশয়া নাই। ঘেরাও এর ফলে তিনি গুরুতর ভাবে অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং তাঁহাকে হাসপাতালে সরানো হয় পুলিসের সাহায্যে। তাহার পর উল্লিখিত কলেজটিকে অনির্দ্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করিয়া দিতে হয় বাধ্য হইয়া। নূতন ট্রেড ইউনিয়ন তথা শ্রম-আইন বিধিবদ্ধ হইবার পর দিন হইতে ঘেরাও অসম্ভব রকম বৃদ্ধি পাইয়াছে সঙ্গে সঙ্গে আইনী-বেআইনী ধর্ম্মঘটের সংখ্যাও।

উপরি উক্ত আইন পাস হইবার সময় আলোচনা-কালে—বিধান সভায় বিভিন্ন সদস্য, বিশেষ করিয়া যুক্ত ফ্রন্টীয় সদস্যগণ মালিকপক্ষকে নানা ভাবে নিন্দা (সোজা কথায় যাহাকে নিছক গালাগালি বলা যায়) করেন। বহু সদস্যের মতে মালিকপক্ষ আদি কাল হইতেই শ্রমিকের রক্তশোষণ করিতে অভ্যস্ত—এইবার নূতন আইন পাশ হইবার পর শ্রমিকসাধারণ মালিকদের উপর বেশ একহাত লইতে পারিবে! প্রতিশোধ?

শ্রমিক-স্বার্থে বর্ত্তমান সরকার সব কিছুই করিলেন এবং ভবিষ্যতে আরো বহুপ্রকার মালিক-বিরোধী

বিধিব্যবস্থাও নিশ্চয়ই গ্রহণ করিবেন, কারণ, এখন যেমন দেখা যাইতেছে এবং অবস্থা যাহা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে রাজ্যে নাগরিক বলিতে একমাত্র শ্রমিকরাই, অন্যান্য হতভাগ্য রাজ্যবাসীরা বলিতে গেলে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক মাত্র, তাহাদের অধিকার ট্যাক্স দেওয়া এবং সর্বপ্রকারে সর্ববিধ কষ্টভোগ করা।

একজন সি পি আই সদস্য বলিয়াছেন ছাত্র এবং হাসপাতাল-কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার দেওয়া একটি সাহাসিকতাপূর্ণ পদক্ষেপ (কিংবা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং হাসপাতালগুলিকে—পদাঘাতও বলা চলে)। পৃথিবীর সোসালিষ্ট দেশগুলিতে নাকি ছাত্র ও হাসপাতালকর্মীদের এই অধিকার আছে। সি পি আই বক্তামহাশয় আশা করি সোসালিষ্ট দেশগুলির মধ্যে রাশিয়া, চীন, উত্তর কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, পোলাণ্ড, পূর্ব্ব জার্মানী প্রভৃতি দেশগুলিকে নিশ্চয়ই ধরিবেন না। উক্ত দেশগুলিতে, যতদূর জানা যায় শ্রমিকদের একমাত্র কাজ —প্রোডাকশন্ বাড়ানো, কোন প্রকার ইউনিয়ন গঠন বা বিক্ষোভ প্রদর্শন করিবার অধিকার তাহাদের নাই।

এত ঘটা করিয়া বহু কাঠ-খড় পোড়াইয়া হঠাৎ নূতন ট্রেড ইউনিয়ন তথা শ্রম-আইন পাশ করিবার কি কোন প্রয়োজন ছিল? বর্ত্তমান সরকার যে-দিন হইতে রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা হইয়াছেন, প্রায় সেইদিন হইতেই সরকার, বিশেষ করিয়া বৃহৎ শরিকদলগুলি (যুক্ত ফ্রন্ট সরকারের) শ্রমিকদের সর্ব্ববিধ দাবি, তাহা যতই অসঙ্গতিপূর্ণ, অসম্ভাব্য এবং জবরদস্তিমূলক হউক না কেন, তাহাই সঙ্গত এবং অবশ্যপূরণীয় বলিয়া রায় দিতেছেন। সকল বিবাদের মধ্যেই দুইটি দল বা পার্টি থাকে বলিয়া জানিতাম, এখন দেখা যাইতেছে আমাদের 'জানা' প্রায় অজানা বস্তুই ছিল। শ্রমিক-মালিক বিবাদে মালিকপক্ষ প্রতিবাদী হইলেও, কর্ত্তাদের নব-বিধানে প্রতিবাদীর সাক্ষ্য-প্রমাণের কোন মূল্য নাই এবং বিচার প্রায়-ক্ষেত্রেই এক তরফা হইতেছে। শ্রমিকদের দাবি, বিশেষ করিয়া আর্থিক দাবি মালিকপক্ষ কতখানি পূরণ করিতে সক্ষম, তাহা নথিপত্র এবং সংস্থার হিসাবপত্র দিয়া দেখাইয়া দিলেও তাহা অগ্রাহ্য হইবে, কারণ মালিকদের শতকরা শতজনই শ্রমিক-শোষণে এবং তাহাদের সর্ব্ববিষয়ে বঞ্চিত করিতে চির-অভ্যস্ত, কাজেই তাহাদের সাক্ষ্য প্রমাণ মূল্যহীন ও অগ্রাহ্য।

পশ্চিম বঙ্গ সরকার নূতন করিয়া যে শ্রম-আইন পাশ করিলেন, তাহাতে হয়ত শ্রমিকদের বিবিধ অধিকার সরকারীভাবে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। তাহাদের দাবি পূরণের জন্যও হয়ত মালিকদের আপাতত বাধ্য করা যাইতে পারে। অতি উত্তম ব্যবস্থা হইল স্বীকার করিব, কিন্তু শ্রমিকদের কর্ত্তব্য পালনের বিষয়ে একটি বাক্যও উচ্চারিত হইল না কেন? শ্রমিকদের দাবি পূরণে মালিকপক্ষ বাধ্য থাকিবেন, কিন্তু মালিক পক্ষের আত্ম এবং ন্যায্যস্বার্থ রক্ষার কারণে কি দাবি করিবার কিছুই থাকিবে না? ঘটি বাটি বিক্রয় করিয়া বহু কষ্টে এবং দীর্ঘ অধ্যবসায়ের দ্বারা যাহারা একটি শিল্পসংস্থাকে সামান্য সূচনা হইতে আজ বৃহতে পরিণত করিয়াছে, তাহারা সকলেই কি অপরাধী, ভক্ষক এবং শোষকের শ্রেণী ভুক্ত হইবে, মালিকদের মধ্যে হীন চরিত্রের বঞ্চক নাই, এমন কথা বলি না কিন্তু তাহাদের সংখ্যা কত এবং তাহারা কে তাহা যথাযথ বিচার করিয়া তাহার পর দোষী নির্দোষী বিচার করাটাই বোধহয় সঙ্গত হইত। গাঁয়ের এক বা দুইজন চোর বলিয়া গাঁয়ের সকল বাসিন্দাকেই চোর বলিয়া ধরিয়া লইয়া তাহাদের পিটুনীর ব্যবস্থা করাটা কতখানি সঙ্গত তাহা কার্ত্তারাই বিচার করিবেন—যদি যথার্থ বিচার-বুদ্ধি তাহাদের থাকে।

বাঙলার নূতন ট্রেড্-ইউনিয়ন আইনে এখন কতকগুলি ধারা বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে যাহা ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রসরকার প্রণীত Industrial Disputes Act এর বিপরীত। চলিত আইনের বিশেষ ধারাগুলি বাতিল না করিয়া নূতন কোন আইন কোন রাজ্য-সরকার প্রণয়ন করিতে পারেন কি না আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা বিচার করিয়া দেখিতে পারেন।

বিধান সভার সদস্যদের নূতন দাঁত ও চশমা—

বাঙলার যুক্ত-ফ্রন্ট সরকারের বহু ঘোষিত ৩২ দফা কর্মসূচী সমাপনান্তে আর একটি বহুমূল্যবান এবং

অত্যাবশ্যক কর্মসূচী অর্থাৎ ৩২এর পর ৩৩ দফা কার্যসূচী গ্রহণ করা হইয়াছে। প্রজাপালন এবং জনকল্যাণের জন্য ইহা খুবই উচিত এবং অতি উত্তম কার্য হইয়াছে—একথা বাঙ্গলার প্রতিটি করদাতা স্বীকার করিবে। এই নূতন কার্যসূচীতে ফ্রন্টীয় মন্ত্রীদের, সরকারী, আমাদের অর্থাৎ করদাতাদের খরচায় প্রয়োজনমত দন্ত এবং চশমা দেওয়া হইবে।—

ফ্রন্টীয় মন্ত্রীদের নূতন দাঁতের প্রয়োজন, অতি প্রয়োজন যে হইয়াছে তাহা আমরা প্রত্যহ দেখিতেছি। সরকারের শরিক দলগুলির, তথা মন্ত্রীদের মধ্যে অতি সদ্ভাবপ্রসূত স্বাভাবিক দন্ত প্রদর্শন, ঘর্ষণ এবং অবস্থা বিশেষে কামড়াকামড়ী' অহরহ ঘটিতেছে, এমত অবস্থার পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত দুইপাটি দন্ত সাত মাসেই প্রায় যায় যায় অবস্থাপ্রাপ্ত। সরকারী কাজ পরিচালনার সঙ্গে দলীয় স্বার্থসিদ্ধি সাধনে অবকাশ ও প্রয়োজনমত এক শরিক অন্য শরিককে ফাঁক পাইলেই এক দাঁত' (এক হাতের পরিবর্তে) দেখিয়া লইতেছেন এবং এই অতি ব্যবহারের ফলেই বেচারা মন্ত্রীদের আজ প্রায় বে-দন্ত হইতে হইয়াছে। নূতন দাঁত সরবরাহ অবিলম্বে করা প্রয়োজন। নব-দন্তে দন্তীয়ান হইয়া মন্ত্রী-মহাশয়রা কি প্রচণ্ড বিক্রমে আমাদের পয়সার প্রান্ত, দন্ত বিকশিত করিয়া প্রজাপালন এবং জনকল্যাণ ব্রত পালন করিবেন, তাহা মুগ্ধনয়নে অবলোকন করিবার জন্য আমরা ব্যাকুল হইয়া বসিয়া আছি—

কিন্তু মন্ত্রী মহাশয়দের নূতন চশমাতে কি কোন বিশেষ লাভ হইবে। চশমার দামটা না হয় শ্রীযুক্ত গৌরীসেনের কোষাগার হইতে দেওয়া হইবে, কিন্তু নূতন চশমা হইলেই কি মানুষের দৃষ্টিশক্তি কিংবা ভঙ্গী বদলায়?

চশমার পরিবর্তে ফ্রন্টীয় জাঁদরেল মন্ত্রীদের বিশেষ শল্য-চিকিৎসার সাহায্যে 'চোখ' বদলাইবার ব্যবস্থা করাটাই সর্বাপেক্ষা উত্তম কার্য্য হইত! রাজত্বের প্রারম্ভ কাল হইতে আমাদের মন্ত্রী মহারাজদের, বিশেষ করিয়া পাঁচটি 'বৃহৎ' দলভুক্ত মন্ত্রীদের চোখে রাজ্যের সাধারণ মানুষের দুঃখকষ্ট অভাব অভিযোগ ধরা পড়ে না। তাঁহাদের চোখের একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ দেখে কেবল দলীয় স্বার্থ এবং সেই স্বার্থসিদ্ধির কারণে—অন্যদলগুলিকে দাবাইয়া নিজ দলের প্রাধান্য এবং কর্তৃত্ব স্থাপন চেষ্টা চলে। গত সাত-আট মাসে ফ্রন্ট সরকার তাঁহাদের বহু ঘোষিত এবং বিষম-প্রচারিত ৩২ দফা কর্মসূচীর কি করিয়াছেন তাহা সাধারণ লোকে এখনও জানে না। অন্যদিকে ৩২ দফা কার্যসূচীর বাস্তব রূপায়ণ হউক বা না হউক—

ফ্রন্ট সরকার রাজ্য এবং রাজ্যবাসীদের দফা প্রায় নিকাশ করিয়াছেন! এ বিষয় মুখ্য মন্ত্রী হিসাবে অজয়বাবুর কৃতিত্ব কম নহে! রাজ্যে খুনখারাবি, চুরি-ডাকাতি, লুটপাট, শিল্পক্ষেত্রে বিষম হট্টগোল এবং অন্যবিধ অনাচার যতই ঘটুক না কেন, এবং রাজ্যের অবস্থা সকল বিষয়ে যতই ক্রম নিম্নমুখী হউক না কেন, অজয়বাবুমহাশয় তাঁহার ঝাপসা চোখে 'পশ্চিম বঙ্গে সবই ঠিক আছে' দেখিতেছেন, এমন কি খুনখারাবীর মধ্যেও তিনি "জাঁতি-বিচার" করিয়া ফেলিয়াছেন। শ্রীঅজয়ের মতে 'পলিটিক্যাল মার্ডার'কে—'ক্রিমিন্যাল মার্ডার' বলা যায় না। নরহত্যা বিষয়ে এমন অপূর্ব্ব বৈজ্ঞানিক তথ্য পৃথিবীতে এই বোধহয় প্রথম। সেকথা যাক

আমরা সর্ব্বপ্রথম মুখ্য মন্ত্রীর 'চোখ' বদলাইয়া তাহার পর চশমার ব্যবস্থা করা একান্ত কর্তব্য বলিয়া মনে করি। কারণ আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যদি তাঁহার স্বাভাবিক দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পান, হয়ত তিনি রাজ্য সরকারের নানা গলদ দূর করিবার চেষ্টা অন্তত করিবেন। উপ মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে কিছু বলার নাই, কারণ তাহার মার্ক্সীয় জ্যোতি উদ্ভাসিত চোখে যেকোন চশমা লাগানো হউক না কেন—বেচারা চশমাটাই খারাপ হইয়া যাইবে। অসম্ভব মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন মানুষের হাতে তৈরী কোন চশমাই করিতে পারে না।

পরের জমি বেদখল করার মহান ও গৌরবময় মন্ত্রীর বিষয়েও আমরা একই মত পোষণ করি। আমাদের কাতর প্রার্থনা শুধুমাত্র এই যে হরে কৃষ্ণ! হরে কৃষ্ণ! দয়া কর, দয়া কর, দেশকে বাঁচাও! শ্রীগৌরবার মহাশয়কে এ-পাপ মর্ত্তলোক হইতে তাঁহার যোগ্যধাম মার্কসলোকে স্থান দাও! (কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহ আছে

যে মার্কসাত্মা তাঁহার রাজ্য হইতে বিতাড়িত হইবার ভয়ে হয়ত শ্রীগোঁসাইকে আরও উর্দ্ধলোকে প্রেরণ করিবেন।

সি পি এম সম্পর্কে নব বারতা

কিছুদিন পূর্ব্বে ফরোয়ার্ড ব্লক নেতা শ্রীঅশোক ঘোষ ঘোষণা করেন যে "উত্তর বঙ্গের তিনটি জেলায় পুলিশ, প্রশাসন, কংগ্রেসের একাংশ এবং সমাজ-বিরোধী ব্যক্তিদের যোগসাজসে সি পি এম এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে চাইছে যাতে সাধারণ প্রগতিশীল মানুষও 'ভিন্ন' মত পোষণ করতে সাহস না পায়। অশোকবাবু আরো বলেন যে "সি পি এম যদি মনে করে থাকে যে তাদের পার্টির নেতৃত্ব স্বীকার করে না নিলে ফ্রন্টের অন্য কোন শরিকদলের অস্তিত্ব বিপন্ন করে দেওয়া হবে, তাহলে ফরোয়ার্ড ব্লকও সেই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। নেতাজীর পার্টি কারো কাছে আত্মসমর্পণ করতে রাজী নয়! (এখানে একটা প্রশ্ন আছে—যে কমিউনিষ্ট পার্টি গত যুদ্ধের সময় নেতাজীর শ্রাদ্ধ এবং তাঁহার সম্পর্কে হাজারো প্রকার হীন জঘন্য কুৎসা পথে ঘাটে ট্রামে বাসে রেলগাড়ীতে প্রচার করিতে দ্বিধা করে নাই সেই কম্যুদের সঙ্গে এক আসরে বসিয়া ক্ষমতা ভোগ করিতে নেতাজির ধ্বজাধারী এবং তাঁহার না-ভাঙাইয়া-খাওয়ার দল কোন দ্বিধা বা লজ্জাবোধ করিতেছে না কেন?)

টিটাগড় এবং অন্যান্য বহুস্থানে অহরহ নানা হাঙ্গামার ঘটনার বিবরণ দিবার সময় একজন সাংবাদিক তাঁহাকে প্রশ্ন করেন যে (জ্যোতিবাবুকে—)

হামেশাই সংঘর্ষের ঘটনা হচ্ছে—এটা কি উদ্বেগ-জনক নয়? —'-জবাবে জ্যোতিবাবু বলেন যে—

"কি আর করা যাবে। এই সব সংঘর্ষের মধ্যে দিয়েই সংশ্লিষ্ট লোকেরা শিক্ষালাভ করবেন—তাদের কর্ত্তব্য কি।"

বাজে প্রশ্নের অ'তি মোক্ষম জবাব জোতিবাবু দিয়াছেন! কিন্তু প্রশাসকের আসনে বসিয়া এবং রাজ্য-পুলিশের কর্ত্তা সর্ব্বশক্তিমান উপমুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার কর্ত্তব্য, তাহা কেবল মাত্র 'কি আর করা যাবে'—এই জবাবের অর্থ কি? তবে জ্যোতিবাবুর হইয়া জবাবটা আমরা দিতে পারি। রাজ্যের বর্ত্তমান সঙ্কটে এবং মানুষের বিপদ ত্রাণ করিবার মত শক্তি যদি তাঁহার না থাকে—তবে তাঁহার মত শিক্ষিত, ভদ্র এবং জনদরদী মন্ত্রীর উচিতকার্য্য—অবিলম্বে পদত্যাগ করা। তবে এতটা যদি না পারেন তাহা পুলিসদপ্তরের ভার অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তির হাতে অর্পণ করা। রাজ্য-পুলিসকে বেকার রাখিয়া নিজ দলের স্বার্থে কাজে লাগাইবার কোন অধিকার জ্যোতি বসুর নাই! যদিও তিনি মনে করেন—আছে!

আর একজন সংসদ-সদস্য এবং সি পি আই নেতা শ্রীকল্যাণশঙ্কর রায় (ইনি বোধ হয় স্বর্গত কিরণশঙ্কর রায়ের পুত্র) বলিয়াছেন—আসানসোল কয়লা খনি অঞ্চলের আইন শৃঙ্খলা আজ চম্বল উপত্যকার (দস্যু-শাসিত) মত হইয়াছে। এই অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। এখানে পুলিশের কাজ জনগণের নিরাপত্তা বিধান নহে। পুলিশের কর্ত্তব্য হইয়াছে—দাঙ্গা হাঙ্গামায় হতাহতদের সরাইয়া লওয়া এবং যে-সব মানুষ প্রাণভয়ে অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া অন্য নিরাপদ অঞ্চলে পলাইতে চায়, তাহাদের পলায়নের ব্যবস্থা করা, তাহাও সাধ্যমত!—জ্যোতি বসুর ফ্রন্ট সরকারের বহু শরিকদলও জ্যোতিবাবু এবং তাঁহার পুলিস সম্পর্কে ঐ একই প্রকার প্রশংসাবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন।

কেবলমাত্র বেতনভোগী পুলিসের নিন্দা করিয়া লাভ নাই যখন দেখা যাইতেছে জনগণের কল্যাণে সর্ব্বত্যাগী বারোয়ারী সরকারের বিশেষ কয়েকজন মন্ত্রী শ্রমিক এবং এক শ্রেণীর লোকের বিক্ষোভ সমাবেশে তাহাদের ন্যায় সকল প্রকার অন্যায় আচার-অনাচারের সাধুবাদ করিতে কোন সঙ্কোচবোধ করেন না।

এ যাবত লোকের ধারণা ছিল মন্ত্রীর পদে বসিবার পর মানুষের দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান অঙ্কুরিত হয়। কার্য্যকালে দেখা যাইতেছে, যাহাদের সামান্য পরিমাণ দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্যজ্ঞান ছিল, পশ্চিমবঙ্গের ফ্রন্টীয় মন্ত্রী হইবামাত্র, তাঁহাদের সেই জ্ঞানটুকুও উবিয়া যায়!

এ-রাজ্যের মন্ত্রীদের আজ সর্ব্বাপেক্ষা বড় কাজ হইয়াছে 'প্লেয়িং টু দ গ্যালারী!' খেলাটা সাধারণ দর্শকদের খানিকক্ষণ হয়ত ভাল লাগিতে পারে কিন্তু বাড়াবাড়ি হইলে শেষপর্যন্ত 'মাঠে' ইষ্টক-বোতল বৃষ্টি হইতে বাধ্য! ফ্রন্ট আজ যে-ভাবে তাঁহাদের কর্ত্তব্য-দায়িত্ব পালন করিতেছেন, অগ্রপশ্চাত বিবেচনা না করিয়া আমরা শেষের দিনের শেষ খেলার পরিণাম বিষয়ে শঙ্কিত বোধ করিতেছি। আমাদের একমাত্র প্রার্থনা—রাজ্যের ভাগ্যবিধাতা মন্ত্রীদের কিঞ্চিত আত্মসচেতনতা দান করুন, যাহাতে তাঁহারা বিক্ষুব্ধ, বঞ্চিত এবং প্রতারিত জনগণের কোপাগ্নি হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারেন, সময় থাকিতে তাঁহারা নিজ নিজ পৃষ্ঠদেশ রক্ষার জন্ত একটি করিয়া দৃঢ় শীল্ডের ব্যবস্থা করিয়া রাখেন! এমন দিন প্রায় আগত যখন এই পৃষ্ঠ-রক্ষক ঢালের অতি প্রয়োজন হইবেই হইবে।

জনতারাজের পর 'হকার-রাজ'

পশ্চিমবঙ্গে কিছুদিন হইল জনতারাজ স্থাপিত হইয়াছে! এই নব-রাজতন্ত্রে আইন-কানুন শৃঙ্খলা, সাধারণ শান্তিপ্রিয় মানুষ অর্থাৎ যাহাদের প্রদত্ত অর্থে রাজ্যসরকার চলে, তাহাদের নিরাপত্তা এবং স্বাধীনভাবে শান্ত জীবন যাপন এবং নিজ নিজ কাজকর্ম্ম করিয়া জীবন অতিবাহিত করিবার সকল অধিকার বিনষ্ট হইয়াছে। বর্ত্তমানে জনতারাজের হুকুমমত না চলিলে যে কোন নাগরিককে সর্ব্বপ্রকার বিপদের ঝুঁকি লইতে হইবে, অবস্থা বিশেষে দেহপিঞ্জর হইতে প্রাণপক্ষীকেও ছাড়িয়া দিতে হইতে পারে। সে কথা থাক—

গত কিছুকাল হইতে কলকাতার বড় বড় রাস্তাগুলি একের পর এক হকার মহারাজদের জমিদারীতে পরিণত হইতেছে, বিশেষ করিয়া সেই সব অঞ্চলের রাস্তাগুলি যেখানে এমনিতেই সাধারণ ভিড়ের জন্ত মানুষ সহজে পথ চলিতে পারে না। অত্যন্ত এবং বিশেষ প্রয়োজনেও যেখানে একজন পথচারীকে এক মাইল রাস্তা অতিক্রম করিতে সময় লাগে এক দেড় ঘন্টার কম নহে। বিকালের দিকে কলকাতার মৌলালীর মোড় হইতে শিয়ালদহ পার হইয়া মির্জ্জাপুর মোড় পৌঁছিতে মোটর, ট্যাক্সিরও সময় লাগে অন্তত ৪০ মিনিট—অথচ এই দূরত্ব আধ মাইলেরও কম হইবে। রাস্তায় (ফুটপাথ সহ) হকারদের অতি বাহুল্যই ইহার প্রধানতম কারণ।

শহরে যেভাবে বাঙ্গালী এবং অবাঙ্গালী হকার-সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতেছে, আশু প্রতিকার না হইলে (কে করিবে জানি না) শহরে লব্ধ প্রতিষ্ঠিত ছোটবড় দোকানগুলির ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ হইতে বাধ্য—কারণ হকারারণ্য ঠেলিয়া কিংবা অতিক্রম করিয়া কোন ক্রেতাই বোধ হয় দোকানে প্রবেশ করিতে পারিবে না—ফলে হয়ত বর্ত্তমান দোকানগুলিকে হকারদের মাধ্যমে মাল বিক্রয় করিতে হইবে। এখনই এই রকম কিছু কিছু ঘটিতেছে বলিয়া শুনা যাইতেছে। রাস্তা খোলা রাখিবার দায়িত্ব কলিকাতা পুলিশের, পরিষ্কার রাখিবার দায়িত্ব পৌরকর্তৃপক্ষের। কলিকাতা পুলিস (মাপ করিবেন জ্যোতিবাবুর পুলিস বলাই ঠিক হইবে) রাজ্য-পুলিসের মতই বেকার—কর্ত্তার হুকুম না পাইলে পুলিশ কিছুই করিতে পারে না, করিবে না। তাহা ছাড়া বর্ত্তমানে শাসনব্যবস্থায় পুলিশকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তোলা হইয়াছে, পুলিশ আজ প্রাণভয়ে ভীত। কলিকাতা পৌরকর্তৃপক্ষ শহরবাসীর প্রতি তাঁহাদের সামান্যতম কর্ত্তব্য পালন করার সময় পাইতেছেন না। পৌর মা-বাবারা দেশের এবং জাতির বৃহত্তর সমস্যা লইয়া অতীব চিন্তিত!

অতএব কলিকাতাবাসীর তথা করদাতাদের দুইটি পথ খোলা আছে—প্রথমত তাহারা পৌর-টেক্স বন্ধ করিতে পারেন, দ্বিতীয়ত গাঁটরি-গাঁটরা লইয়া শহর পরিত্যাগ করিয়া অন্তত্র কোথাও সোঁদর বন কিংবা দণ্ডকারণ্যে আশ্রয় খুঁজিতে পারেন। দ্বিতীয় আশ্রয়টি ভাল কারণ প্রথমটি অর্থাৎ সোঁদর বনে বসবাস করিতে হইলে, রয়েল বেঙ্গল টাইগার অপেক্ষা বলবান হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ নাম জপ করিতে করিতে ঐ অঞ্চলে যাইতে হইবে। কি করিবেন?

পরিবার পরিকল্পনা এবার অবশ্যই সার্থক হইবে !

পাকা পরিকল্পনা হইয়া গিয়াছে ! গত ৩০এ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত এক সংবাদে নিউ দিল্লী হইতে বলা হইয়াছে, এখন হইতে নব-বিবাহিত দম্পতিদের দেওয়া হইবে "Gifts from the nation" এই উপহারটি আর কিছুই নহে একটি "neatly packed gift box which will contain one gross condoms !"

ট্রান্‌জিস্‌টার সেট উপহার দিয়া, আপন হইতে পাহাড় পর্ব্বতে থাল-খানা এবং নদীর জলে সচিত্র সুমুদ্রিত হাণ্ডবিল নিক্ষেপ করিয়া, এবং সমগ্র দেশকে লুপবদ্ধ করিয়া ফল বিশেষ হইল না, কিন্তু এইবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ফ্যামিলী প্ল্যানিং এবং জন্মনিয়ন্ত্রণের জন্য যে ব্যবস্থা লইলেন, তাহা একেবারে অব্যর্থ—অমোঘ !

আমাদের কেন্দ্র স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীচন্দ্রশেখর সত্যই অসামান্য ব্যক্তি (কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলির প্রত্যেকেই অবশ্য তাই) কিন্তু তাঁহার মস্তকে চন্দ্রের প্রভাব অত্যাধিক দেখা যাইতেছে, কিন্তু রাজ-চিকিৎসকের মস্তক-রোগের চিকিৎসা কে করিবেন ?

কেন্দ্র সরকার জন্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য এবার যে-অভিনব পরিকল্পনা করিয়াছে তাহা সত্যই বর্ত্তমান জগতে অচিন্ত্য-অভূতপূর্ব্ব বিপ্লবিক ঘটনা ! আমাদের আশা কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সর্ব্বপ্রথম এই পরিকল্পনার বাস্তবরূপ দিবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর অতি সুখী পরিবারে। প্রত্যেক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পুত্র, কন্যা, ভগিনী এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের বিবাহের পর মুহূর্ত্তেই এই 'জাতীয় উপহার' দান করিবেন এবং সতর্ক দৃষ্টি রাখিবেন যে এই 'জাতীয়-উপহারের' মর্য্যাদাও উপযুক্তভাবে রক্ষিত হইতেছে।

'জাতীয়-উপহারের' সুষ্ঠু প্রচারের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া উচিত বেতার রাষ্ট্র-মন্ত্রী রূপে যে-পণ্ডিত বেতারমন্ত্রক গুলজার করিয়া রাখিয়াছেন, সেই সর্ব্ববিদ্যাধর শ্রীগুজরালের উপর। নামে রাষ্ট্রমন্ত্রী হইলেও কার্য্যত বেতার দপ্তর-গুলজারী এই গুজরালই প্রকৃতপক্ষে আসল মন্ত্রী। শ্রীসিন্‌হা ত নাম-কা-ওয়াস্তে ;

বাঙ্গলা দেশে এই 'জাতীয় উপহার' যথার্থ কার্য্যকর করিতে হইলে কলিকাতা আকাশবাণীর, কৃষি-কথার আসরের মোড়ল (গাঁয়ে না মানিলেও) নামক সর্ব্বগুণধর —একাধারে লেখক-নাট্যকার, নট-নাট্য-পরিচালক গীতকার শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভক্ত এবং তাঁহাদের বাণী প্রচারক—নামক ব্যক্তিটির উপর। এই ব্যক্তির প্রধানগুণ এই যে তিনি সব কিছু, সর্ব্বপ্রকার টেকনিক স্বয়ং পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলেই তাহার প্রচার সুরু করেন ! (এই প্রসঙ্গে মোড়লের লুপিং দি লুপের কথা স্মরণ করুন)।

কেন্দ্রীয় সরকারের 'এক এক জন বিভাগীয় মন্ত্রী, সর্ব্ববিষয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রের আরো স্বাধীন' নৃপতির মত। কাহারো সহিত কোন পরামর্শ না করিয়াই গরীব জনগণের টাকা যেমন ইচ্ছা, যখন ইচ্ছা দান খয়রাতী করিতে পারেন। বাধা দিবার কেহ নাই। দিবেনই বা কেন, সবই ত করা হইতেছে নিপীড়িত দরিদ্র দুঃখী-জনের ভালোর জন্যই ! কেন্দ্রীয় সুখী পরিবারের কর্ত্তী সকল বিষয়ে সজাগ আছেন !

শ্রী জ্যোতিবসু পদত্যাগ করিবেন না !

পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেসমহল হইতে, পশ্চিম বঙ্গের অরাজকতা এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার অভাব এবং রাজ্যের সর্ব্বপ্রকার ক্রম-নিম্নমুখী গতির জন্য জ্যোতি বসু দায়ী এই কথা বলিয়া উপমুখ্য মন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেন। ইহার জবাবে জ্যোতি বাবু বলিয়াছেন—তিনি অত্যন্ত দুঃখিত যে কংগ্রেসের দাবি মত পদত্যাগ করিবেন না। কারণ এখনও তাঁহার জীবনের মিশন সার্থক হয় নাই। তাঁহার জীবনের মিশন পশ্চিম বঙ্গ সহ সমগ্র ভারতে 'পিপলস-রাজ' অর্থাৎ জনগণতন্ত্র স্থাপন করা। অতি সাধু ইচ্ছা— এবং বখ্‌তীয়ার খিলজীর মত মাত্র ৮০ জন বিধান সভায় সদস্য বাহিনী লইয়াই সমগ্র ভারতে তাঁহার অর্থাৎ জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিবেন ! পুরাণ প্রবাদে বলে পঙ্গুর পর্ব্বত অতিক্রমের আশা—কিন্তু এ-প্রবাদ জ্যোতিবাবুকে স্পর্শ করে না, কারণ তিনি পঙ্গু নহেন এবং লোকে যাহাকে পর্ব্বত বলিয়া মনে করে সেই পর্ব্বত তিনি মহাবীরের মত এক লাফেই অতিক্রম করিতে পারিবেন !

আমরা সারা ভারতে নব জ্যোতির্ম্ময় রাজের আশায় থাকিব : পশ্চিম বঙ্গে জ্যোতিবাবুর 'মিশন' প্রায় পূর্ণ হইয়াছে এবং আশা হইতেছে জ্যোতিবাবু এবং তাহার পার্টির আধিপত্য এবং কর্ম্মসূচীর আরো একটু বিস্তার হইলেই পশ্চিম বঙ্গবাসী আমরা সশরীরে স্বর্গলাভ করিব, ধরাধামের সকল দুঃখ কষ্ট অতিক্রম করিয়া !

বডি বিল্‌ডিং কাকে বোঝায় ?

সমর বসু

বডি বিল্‌ডিংয়ের প্রবক্তা প্রখ্যাত জার্মান জোয়ান ইউজেন সাণ্ডো। বস্তুতঃ, পৃথিবীর প্রায় সর্ব দেশে শরীরচর্চার নানা ধারা শতাব্দীর পর শতাব্দী যাবৎ প্রচলিত থাকলেও দ্রুততম সময়ে পৈশিক পুষ্টির জন্ম সাণ্ডোই প্রথম 'উইল পাওয়ার' অর্থাৎ মনঃসংযোগের কথা বলেছিলেন; কেবল তাই নয়, এ উইল-পাওয়ারকে কার্যকর করবার যোগ্যতম পন্থা স্বরূপ তিনিই প্রথম আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে ব্যায়াম করবার প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেছিলেন। তাঁর এ ব্যবস্থা যে অভ্রান্ত ছিল তাও প্রমাণিত।

মনঃসংযোগে সহায়তার জন্ম সলিড্ ডাম্বেলের বদলে স্প্রিংগ্রিপ ডাম্বেলের উদ্ভাবনও ছিল সাণ্ডোর অনন্য মনীষার পরিচয়। এরূপ নানাকারণে তাঁর ব্যায়াম-প্রণালী তাঁর জীবদ্দশাতেই সর্বজগতে এমন জনপ্রিয় এবং প্রভাবসম্পন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে এক জোড়া স্প্রিংগ্রিপ ডাম্বেলকে ড্রয়িংরুমের টেবিলে রাখা বিলাসব্যসনপ্রিয় ধনবান ব্যক্তিদের কাছেও এক ফ্যাসানে পরিণত হয়েছিল।

কিন্তু বডি বিল্‌ডিং বলতে কি বোঝায়? সাণ্ডো কেবল দেহের বাইরের পেশীর স্ফীতাই নয়, সেই সংগে দেহের আভ্যন্তরীণ পেশীসহ সমস্ত যন্ত্রের যথাযথ পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধনের কথাও বলেছিলেন অর্থাৎ দেহকে সর্বকালের উপযুক্ত করে তোলাকেই তিনি বডি বিল্‌ডিং বলেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিশেষ বিশেষ পেশীর কসরতে পেশিনিচয়ের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা সহজ বলেই ব্যায়ামীর মনও সেকাজে সহজে কেন্দ্রীভূত হয় এবং তার ফলে দ্রুত সময়ে পেশীর পরপুষ্টি ঘটে। পেশীর এই পরিপুষ্টিতে ব্যায়ামী নিজের দেহের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে অধিকতর উৎসাহসহকারে দেহগঠনের অন্যান্য কাজ সম্পাদনে ব্রতী হয়।

কিন্তু সাণ্ডোর ধারণা ও কাজ যত মূল্যবান হোক সর্বক্ষেত্রে যে সমান ফলপ্রসূ হয়নি, তাতে কোন সন্দেহ নেই। তিনি হয়তো ধারণাও করতে পারেননি যে কোনো কোনো লোক বডি বিল্‌ডিংয়ের কেবল প্রাথমিক বিষয় অর্থাৎ 'দেখনাই' চেহারা নিয়েও খুশী থাকতে পারে এবং সেসব ব্যক্তিরা কেবল সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আয়নাসর্বস্ব জিমনাশিয়াম বানাতে থাকবে। তিনি একথাও নিশ্চয় ভাবেননি যে বডি বিল্‌ডিংয়ের নামে এক শ্রেণীর লোক শুধু 'মাস্‌ল বিল্‌ডিং' নিয়ে মত্ত থাকিবে এবং তারা 'মিঃ' 'মিস' বা 'শ্রীমান' 'শ্রীমতী' দের নিয়ে লাফালাফি করতে থাকবে। জানি না আজ সাণ্ডো বেঁচে থাকলে তিনি কি করতেন! কেননা তিনি, দৃশ্যতঃ যত সুন্দর হোক, মাটির পুতুলের পক্ষপাতী ছিলেন না, এবং স্বামী বিবেকানন্দের মতো তিনিও বজ্রসদৃশ পেশী ও ইস্পাতের মতো স্নায়ুযুক্ত সর্ব কর্মের উপযোগী সুস্থ ও সুন্দর মানুষ চেয়েছিলেন।

আসল কথা এই যে, বডি বিলডিংয়ের মূল কথা হয়তো অনেকে বিস্মৃত হয়েছেন কিংবা সস্তায় বাজি মাত্ করবার জন্য তাঁরা কেবল মাস্‌ল বিল্‌ডিং এবং মাস্‌ল পোজিংকেই ধরে বসে আছেন। সাণ্ডো নিজেও জনচিত্তে উৎসাহ সঞ্চারের জন্য মাস্‌ল পোজিং এবং মাস্‌ল কন্ট্রোলিং দেখাতেন, কিন্তু তারপর তিনি অতি কঠিন কঠিন শক্তি-পরীক্ষা দিতেন। মাত্র ১৮৫ পাউণ্ড দেহভারে সাণ্ডোর একহাতি বেণ্ট প্রেসের বিশ্ব-রেকর্ড ছিল ২৫৫ পাউণ্ড! আমাদের দেশের মাস্‌ল বিল্‌ডারদের কাছে তা কল্পনার অতীত। আমি আমাদের দেশের এক তরুণকে দেখেছিলাম যে কতকগুলি

মাস্‌ল পোজিং প্রতিযোগিতায় নেমে কয়েকটি খেতাবও অর্পণ করেছিল; অথচ ১৪৫ পাউণ্ড দেহভারে সে সামান্য ১৪০ পাউণ্ড বারবেলটিকেও দুহাতি স্ন্যাচে ঠিকমতো তুলতে পারত না! এ কাদার দেহের দাম কি?

সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়, এখনকার মিঃ মিস কিংবা শ্রীমান শ্রীমতীদের নিয়ে যত হৈচৈ বা প্রচার প্রপাগাণ্ডা চলুক না কেন, আখেরে এসবের অবলুপ্তি অবশ্যম্ভাবী। কারণ সবাই জানেন, যেসব দেশে যথার্থ বডি বিল্‌ডার্স তৈরি হচ্ছে, সেসব দেশই ওলিম্‌পিক, স্পার্তাকিয়াদ, ইউনিভার্সিয়াড, এসিয়ান গেম্‌স বা ঐ জাতীয় বৃহৎ বৃহৎ প্রতিযোগিতায় জয়ী হচ্ছে। সেসব দেশে তথাকথিত বডি বিল্‌ডিং অর্থাৎ মাস্‌ল বিল্‌ডিং প্রতিযোগিতা আদৌ পাত্তা পায় না। এবং তাদের সে নীতি ক্রমশঃ অন্যান্য দেশেও প্রভাব বিস্তার করে চলেছে।

আরো লক্ষণীয় যে, ওলিম্‌পিক, স্পার্তাকিয়াদ, ইউনিভার্সিয়াড কিংবা এসিয়ান গেম্‌সে এরূপ মাস্‌ল পোজিং স্বীকৃত বা গৃহীত হয় না। একথাও যথার্থ যে, ১৯৫১ তে দিল্লীর এসিয়ান গেম্‌সের আন্তর্জাতিক ওলিম্‌পিক কমিটির স্বীকৃতি না পাওয়ার একটি কারণ তথাকথিত বডি বিল্‌ডিং বা 'মিঃ এসিয়া' প্রতিযোগিতা। পরবর্তী এসিয়ান গেমে তাই এ বস্তুকে বাদ দিতে হয়েছিল। মোট কথা, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে বস্তু অপদার্থ ও মূল্যহীন, এবং স্কেল, টেপ বা টাইম দিয়ে যা বিচার বা পরিমিত হবার অযোগ্য, তার যথার্থ গুণাগুণ নির্ণয় অসম্ভব। সে বস্তুর বিচারে বিভ্রান্তি বা পক্ষপাতিত্ব প্রায় অনিবার্য,—অন্তত ১৯৫১ তে ৮ মার্চ দিল্লীর এসিয়ান গেমে এবং ১ সেপ্টেম্বর লণ্ডনের ন্যাশন্যাল আমেচার বডি বিলডার্স অ্যাসোসিয়েশনে সেরূপ ত্রুটির পরিচয় মিলেছিল।

কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, তবে কি এসব বডি বিল্‌ডিং প্রতিযোগিতায় যারা নামে তারা সবাই অপদার্থ? যথার্থ দেহবিদ্‌ (Body Builder) ও জোয়ান কি তাদের মধ্যে কেউ থাকে না? হয়তো থাকে; অন্তত কোন কোনো যথার্থ বডি বিল্‌ডারকে এসব প্রতিযোগিতায় নামতে দেখা গেছে। কিন্তু যেখানে দেহবল বা দেহদক্ষতার কোনো পরীক্ষা গৃহীত হয় না, এবং কেবল মাস্‌ল পোজিং বিচার্যের বিষয়, সেখানে এ মুষ্টিমেয় সংখ্যক বডি বিল্‌ডারের যোগদান শুধু অর্থহীন নয়, রীতিমতো প্রহসন। প্রহসন বলবার কারণ এই যে, বহু সময়ে তারা এসব প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারে না, এবং কেবল পোজিং বীরদেরই জয় জয়কার ঘটে। সুতরাং আজও যদি যোগ্য বডি বিল্‌ডারদের মধ্যে কেউ কেউ এসব মাস্‌ল পোজিং কম্‌পিটিশনের অসারতা বুঝে না থাকেন, তবে শীঘ্রই যে বুঝবেন তাতে সন্দেহ নেই। কারণ ওসব বস্তু জাতি বা সমাজের কোনো কাজে আসে না। সুতরাং অতি স্পষ্ট করে বলা যায়, শক্তি ও দেহদক্ষতায় যাঁরা ভারতবর্ষকে যথার্থ উন্নত ও অগ্রগামী করতে চান্‌ তাঁরা কিছুদিন বিলম্বে হলেও ও সাজোয়ানী ব্যবসাকে ঘৃণার সহিত বর্জন করে একমাত্র বডি বিলডিংয়েই মনোনিবেশ করবেন। কারণ তা ভিন্ন জাতির মেরুদণ্ডকে জোরদার করবার আর কোন পথ নেই। বিগত যুগের ফ্রান্স, জার্মানি ও অস্ট্রিয়া এবং এ যুগের রুশিয়া ও চীনের ঘটনাবলী আমাদের সে শিক্ষা দিচ্ছে। আমরা কি আজ তাদের পশ্চাতে পড়ে থাকব?

(১৯২ পাতার পর)

ইহার কারণ চীনাদিগের ভারতের প্রতি শত্রুভাব ও ভারত চীন সীমান্তে সামরিক আয়োজন বৃদ্ধি করা। এখন ভারতের সৈন্যদিগের মধ্যে প্রায় সকলকেই পর্ব্বত আরোহণ দক্ষতা অর্জ্জন করিতে হয়। অতি উচ্চ স্থানে পৃষ্ঠে মালপত্র ও হস্তে যুদ্ধের অস্ত্র লইয়া দেশরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাকা বিনা শিক্ষায় ও সর্ব্বদা অভ্যাস না করিলে কাহারও পক্ষে সম্ভব বা সহজসাধ্য হয় না। পর্ব্বত আরোহণ ও উচ্চ পার্ব্বত্য অঞ্চলে ভ্রমণ করা এই কারণে ভারতীয় নরনারীর অবশ্য শিক্ষা করা উচিত। মাউন্টেন লাভারস্ অ্যাসোসিয়েশন এই কারণে ভারতের একটি অবশ্যকরণীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে বলা যায়। আমরা এই শক্তিমান যুবকদিগের উত্তরোত্তর আরও অধিক সাফল্য কামনা করি। দেশের জনসাধারণের নিকটও আমাদিগের নিবেদন যেন তাঁহারা যথাসাধ্য এই জাতীয় প্রচেষ্টার সমর্থন করেন।

শহিদ কথাটির অর্থ

আমরা পূর্ব্বেও বলিয়াছি ও এখনও বলিতেছি যে, শহিদ কথাটির অর্থ ধর্মযুদ্ধে নিহত ব্যক্তি। এবং ঐ ধর্মযুদ্ধ হইল মুসলমানদিগের "জিহাদ"। সুতরাং আজকালকার প্রগতি বিক্রেতাগণ যখন যাহাকে খুশি শহিদ মার্কা লাগাইয়া সমাজে চালাইবার চেষ্টা করেন তখন আমাদিগের মনে সেই সম্বন্ধে কোনও অনুমোদন বা সম্মতি-অনুভূতি জাগ্রত হয় না। আমরা যাঁহারা দেশের জন্য, আদর্শের জন্য আত্মবলিদান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে শহিদ বলিতে চাহিনা এবং বলিনা। আত্মোৎসর্গ বা আত্মত্যাগ কথাগুলি দুর্ব্বোধ্য নহে। সুতরাং শহিদ না বলিয়া আত্মত্যাগ বা আত্মোৎসর্গকারী বলিলে কাহারও অর্থ বুঝিতে কষ্ট হওয়ার কথা উঠেনা। দুর্ব্বোধ্য ফারসী কথা ব্যবহার করিলে কোন লাভ হয় না। মিনার কথাটিও ফারসী। শুদ্ধ বাংলায় মিনারের অর্থ হইল জয়স্তম্ভ কিম্বা স্মৃতিস্তম্ভ অথবা যদি কোন স্মৃতিরক্ষা-সৌধ স্তম্ভ না হইয়া অপর আকারের হয় তাহা হইলে তোরণ বা সৌধকিরট বা মন্দির কথার ব্যবহার চলিতে পারে। অনেকে ভাবেন মুসলমানী ঢংয়ের কথার মধ্যে একটা প্রগতিশীলতা লুকান আছে, কিন্তু ধর্ম্মোন্মাদনা প্রভৃতি মনোভাবের সহিত প্রগতিশীলতার কোন ঘনিষ্ঠতা আছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। সুতরাং বাংলা দেশের কৃষ্টি সভ্যতা বা প্রগতির সহায়তার জন্য একটা স্মৃতিস্তম্ভকে শহিদ মিনার বলার কোন সার্থকতা থাকে না। আত্মোসর্গ স্তম্ভ বলিলে প্রগতির গতি আড়ষ্ট হইয়া যায় কিনা তাহা বাংলার জনসাধারণের বিচার করা প্রয়োজন।

রাজস্ব আদায় ও শাসন কঠোরতা

বৃটিশ রাজত্বে শাসন কঠোরতাই ছিল সাম্রাজ্য পরিচালনার মূল মন্ত্র। প্রজার সহিত মধুর সম্বন্ধ স্থাপন সাম্রাজ্যবাদের প্রতিকূল বলিয়া বিচার করা হইত। কারণ সম্রাট প্রবল প্রতাপশালী ও তাঁহার শক্তি অসীম। তাঁহার পক্ষে প্রজারঞ্জন করিয়া চলার একমাত্র অর্থ হইবে যে প্রজা মিষ্ট ব্যবহারকে দুর্ব্বলতা বলিয়া গ্রহণ করিবে ও সম্রাটের প্রতি ভয় ভক্তি হারাইয়া বিদ্রোহে নিযুক্ত হইবে। এই ধারণা যেখানে শাসনের দৃষ্টিভঙ্গী নির্দ্ধারণ করে সেখানে প্রজার নিকট শাসকের রূপ ভয়াবহ ও কঠোর না হইলে চলে না। ভারত যখন স্বাধীন হইল তখন মানুষ আশা করিয়াছিল যে, অতঃপর শাসক ও শাসিতের সম্বন্ধ প্রীতির, পারস্পরিক বিশ্বাসের ও বন্ধুত্বের হইবে। উৎপাত, অত্যাচার, উৎপীড়ন, অকারণে উদ্বাস্তুকরণ, অবিশ্বাস ও পরস্পরকে বাধা ও অন্তরায় সৃষ্টি করিয়া ঠকাইবার অথবা নাকাল করিবার চেষ্টা আর দেখা যাইবে না। কিন্তু পণ্ডিত নেহেরু মহাত্মা গান্ধীর আদর্শ পরিত্যাগ করিয়া যখন বৃটিশসাম্রাজ্যবাদীদিগের শাসন রীতি ও পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়া নূতনকে আসিতে না দিয়া পুরাতনকেই উন্নতির সোপান হিসাবে ব্যবহার করিতে লাগিলেন তখন শাসনপন্থার কোন উন্নতিই হইল না। বৃটিশআমলাতন্ত্র আরও জোরাল হইয়া উঠিল ও সর্ব্বক্ষেত্রেই দেশের জনসাধারণ আমলাদিগের নিকট

অপদস্থ, অবমানিত ও উৎপীড়িত হইতে থাকিল। আমলাতন্ত্রের একটা চিরঅনুসৃত কর্ম্মপদ্ধতি আছে, তাহা হইল জনসাধারণকে আইন মানিয়া চলিতে কোন সাহায্য যথাসময়ে না করা এবং বসিয়া বসিয়া দেখা যে কখন কাহাকে আইন ভাঙ্গিয়াছে বলিয়া জরিমানা করিবার সুবিধা উপস্থিত হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে, আমলাগণ দুই দশ বৎসর অবধি অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকে যাহাতে কোন নিরপরাধ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে আইনের কবলে ফেলা যায়। অনেক সময়ই শুনা যায় যে, অমুক ঐ প্রকার স্বীকারপত্রী অথবা হিসাব যথাসময়ে দাখিল করে নাই। একথা কিন্তু কেহ বলে না যে, আমলাগণ যথাসময়ে অল্প বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ঐ পত্রাদি দাখিল করাইয়া লয় নাই কেন। কাহাকেও জরিমানা অথবা বিপর্য্যস্ত করিবার জন্য আমলাগণ যে পরিমাণ সময় নষ্ট করিয়া থাকে তাহার অর্দ্ধেক সময়েই মানুষকে দিয়া কাজটা করাইয়া লওয়া যায়। আর একটি কথা এই যে, সকল সময়েই যে শোনা যায় হাজার হাজার কোটি টাকা রাজস্ব অনাদায়ী রহিয়াছে; তাহার জন্য দায়ী কি শুধু রাজস্ব দিবে যে সেই? যাহারা ক্রমাগত রকমারি প্রশ্নের ফিরিস্তি তৈয়ার করিয়া রাজস্বদাতাকে হায়রান করে তাহাদের দায়িত্ব আমাদের মতে অনেক অধিক। আজকালকার সরকারী যে কোন ফিরিস্তি, তালিকা, প্রশ্নোত্তরের লিখিত প্রমাণ বর্ণনা বা এজাহার ইত্যাদি কোন সাধারণ মানুষ বুঝিতেও পারে না, লিখিয়া দিতেও পারে না। সকল সরকারী উক্তি লিখিতে হইলেই উকিল বা বিশেষজ্ঞ প্রয়োজন হয়। এক একটা বিষয় লইয়া অকারণে শত শত প্রশ্ন করা আমলাতন্ত্রের রীতি। যে সকল লোক রাজস্ব আদায় দফতরে বসিয়া সরকারী পয়সা লইয়া সময়ের অপব্যয় করে তাহাদের যদি আদায় অনুপাতে বেতন দেওয়া হয় ও সময় নষ্ট করিয়া কিছু আদায় না হইলে বেতন কাটা হয়, তাহা হইলে দেখা যাইবে ঐ সকল ব্যক্তি অর্দ্ধেক বেতনও পাইবে না। ভারত সরকার ও প্রদেশ সরকারগুলির প্রয়োজন জনসাধারণকে আমলাদিগের অকারণ উপদ্রব হইতে রক্ষা করা। কোথাও কোথাও আমলাগণ উৎপাত করিয়া উৎকোচ আদায়ের ব্যবস্থাও করিয়া থাকে।

প্রতীক্ষা

(গল্প)

অবনী মোহন চট্টোপাধ্যায়

খবরের কাগজগুলো সযত্নে চেপে ধরে বাস টার্মিনাস থেকে অনিরুদ্ধর দোকানের উদ্দেশ্যে চলল বিভাস, সাইকেলটা নিতে হবে।

বেলগাছিয়া পুলটা পার হবার আগে অনিরুদ্ধর ওয়েল্‌ডিংয়ের দোকান। ঐ ত, একটু এগোলেই একেবারে মোড়ের ওপর দোকান। বাড়ী ফেরার পথে দুটো হাতপাখা আর একটা বল কিনতে হবে, বিভাস ভাবতে ভাবতে চলে। যা গরম পড়েছে তাতে দুটো হাতপাখা না হলে চলে না, আর মিণ্টুর জন্যে চাই একটা বল। ছোট বল চলবে না, বড় রবারের বল চাই। মিণ্টুর বায়না, একমাত্র ছেলে মিণ্টুর বায়না। কিন্তু দাম? অসংকুলীন সংসার খরচ, মহাজনের টাকা বাদ দিয়ে বাড়তি পয়সা? পকেট হাতড়ে দেখতে চায়, বিভাস, পকেটে শীত না বসন্ত।

অনিরুদ্ধর দোকানের সামনে এসে বিভাস থমকে দাঁড়াল। সে বিভাসের পুরানো বন্ধু। অতীতে কারখানায় কাজ করেছে দুজনে। এখন অনিরুদ্ধ ওয়েলডিংয়ের দোকান করে দুপয়সা কামাচ্ছে, ছোটখাট কন্‌ট্রাক্‌টও ধরে। লোহার দাম ধীরে ধীরে বাড়তে থাকায় অনিরুদ্ধর অর্থ ও কাজের চাপ দুইই বেড়েছে। চার পাঁচজন ওর অধীনে এখন অন্নসংস্থান করে। অনিরুদ্ধ ইচ্ছে করলে আরও লোক রাখতে পারে। ও বিভাসকে সে ইংগিত দিয়েছিল, যদি ইচ্ছা হয় হকারের কাজ ছেড়ে দিয়ে ওর অধীনে কাজ করতে পারে। কিন্তু বিভাস রাজী হয় নি।

অনিরুদ্ধর দোকান থেকে নিজের সাইকেলটা নিয়ে বাড়ী ফেরার পথে বিভাস একবার বন্ধুকে স্মরণ করিয়ে দিলে, সেই টাকাটার কথা মনে আছে ত?

অনিরুদ্ধ কালিঝুলিমাখা মুখখানা বন্ধুর দিকে ফিরিয়ে একটু হেসে বললে, আছে। কবে থেকে সুরু করবে স্থির করলে?

যদি যোগাযোগ হয় তাহলে পয়লা আষাঢ় থেকে। তার মধ্যেই ব্যবস্থাটা করতে হবে কিন্তু ভাই।

ভেবো না, যথাসময়েই হাতে পাবে।

দোকানের অন্য কর্মিদের এদের কথায় সজাগ-কর্ণ হওয়ার সুযোগ বঞ্চিত করে নিম্নস্বরে বিভাস প্রয়োজনীয় কথাগুলো সারলে, তারপর হৃষ্টচিত্তে সাইকেলে উঠল।

আর, জি, কর হাসপাতালকে পিছনে রেখে ব্রীজটা পেরিয়ে পূবমুখো খানিকটা পথ অতিক্রম করে পুনরায় বাগজোলা খালের ধারে প্রত্যাবর্তন। প্রত্যাহিক দুবেলার মুখস্থ-পথে ওর যাতায়াত। বেলা আর গরম একসঙ্গে বেড়েছে। গলদঘর্ম হয়ে বস্তীর একধারে এসে সাইকেল থেকে নামল বিভাস। সাবিত্রী ঘরের কাজ সেরে মিণ্টুকে স্নান করাচ্ছে। বাবাকে দেখে মিণ্টু খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠল, বললে, বাবা ফুটবল? তুমি যে বলেছিলে আজ নিয়ে আসবে।

বিভাস সাইকেলে বাঁধা কাগজগুলো গুছিয়ে তুলে নিতে নিতে একটু মুখভঙ্গীতে অভিনয়ের ভাব ফুটিয়ে বললে, একেবারে ভুলে গিয়েছি, কাল নিয়ে আসব।

ও তারপর আর দাঁড়ায় না,—কাগজগুলো নিয়ে ঘরের মধ্যে তাকে সাজিয়ে রাখতে চলে যায়। অতটুকু ছেলের মুখের দিকে তাকাবার সাহস এখন বিভাসের

হল না, মনের ভিতর থেকে কি যেন একটা তরলতা ওকে তাকাতে দিলে না।

মিণ্টু অভিমানাহত হল, হাতের নাগালে মায়ের মুখটা পেয়ে জলমাখা হাতদুটো মায়ের দুগালে ঘষে দিলে বললে, দুষ্টু।

সাবিত্রী ছেলের গা মোছাতে মোছাতে হাসলে।

মিণ্টু অভিমানের সুরে বললে, বাবা রোজেই ভুলে যায়। ভারী দুষ্টু।

মিণ্টুর কামনা মা তার কথায় সায় দেয়, বাবাকে বকে। সাবিত্রী ছেলেকে প্যাণ্টটা আগিয়ে দিয়ে বললে, এনে দেবে অখন, ভুলে না গেলে নিশ্চয়ই বল আনত।

মা-বাবা উভয়েই ভুলে যাওয়ার কারণটুকু ছেলেকে বোঝাতে চেষ্টা করে না। বিভাসের ফ্যাক্টরীর কাজটা থাকলে আর এই ছলনার আশ্রয় নিতে হত না, সংসারও রুদ্রমূর্তিতে এমনভাবে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকত না হয়ত। পুরানো ফ্যাক্টরীর কাজ গেলেও নতুন কাজ জোটাতে পারত বিভাস কিন্তু চেষ্টা বিশেষ করে নি। কারন মেহনত করে যারা অন্নসংস্থান করে, সৎপথে তাদের জন্তে আবার ইউনিয়নে মাততে হত নতুন চাকুরির স্থলে, আবার মালিকের সঙ্গে সংগ্রামে নামতে হত, হয়ত আবার চাকুরী হারিয়ে বেকার-জীবনে পথেপথে ঘুরতে হত। দায়িত্বশীল জীবনসংগ্রামে বিভাসের কাছে বেকারত্ব শুধু অভিশাপ নয়, বিলাসও বটে। সমাজ-প্রবঞ্চনাহীন কায়িক শ্রমলব্ধ অর্থ তাই বিভাসের কাছে যত সামান্যই হোক তা হল মানবমর্যাদার স্বীকৃতি।

চাকুরিও দুএকটা যে যোগাড় হয় নি এমন নয়। পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রশংসাপত্র না থাকায় সে সকল কাজের শিকে ওর ভাগ্যে আর ছেঁড়ে নি। সংবাদ অনুসারে কলকারখানার দারস্থ যে ও হতে অস্বীকার করেছে তা নয় তবে চাকুরীর মরুভূমিতে অভাব মেটানোর প্রচেষ্টাটুকু তৃষ্ণায় মরীচিকার অনুধাবনে পরিণতি লাভ করেছে। অবশেষে আর কালক্ষেপ না করে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তা করে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক কাগজপত্র বিক্রয়ের কাজই বেছে নিলে বিভাস। অদূর ভবিষ্যতে নিজে দোকান খুলে স্বাধীন ব্যবসা করবে এই ওর স্বপ্ন।

কাগজগুলো মিণ্টুর নাগালের বাইরে উঁচু কাঠের তাকে সাজিয়ে রাখলে বিভাস। তারপর গামছা আর ভাঙ্গা হাতপাখাটা নিয়ে একটু জিরোতে বসল। মাটির দেওয়াল টিনের চালা। দুপুরে যা গরম হয় তাতে গায়ের চামড়া খসে যাওয়ার উপক্রম হয়। সাবিত্রী তেলের পাত্রটা আগিয়ে দিয়ে বললে, তাড়াতাড়ি চানটা সেরে এস, মিণ্টুকে খাইয়েই তোমার ভাত বাড়ব।

বিশ্রামান্তে তেলের বাটিতে হাতের দুটো তিনটে আঙুল ডুবিয়ে বিভাস সুরু করে, সামনের বছরে মিণ্টুকে স্কুলে ভর্তি করে দেব, অনিরুদ্ধর ছোট ছেলেটা ওর‌ই বয়সী, স্কুলে যায়। এখন থেকে ওকে স্বাবলম্বী করে তোল, খাইয়ে দেওয়ার পাট তুলে দাও, সাবি। পাঁচ বছর বয়স হল ওর।

মিণ্টুর পরেও একটা খোকা হয়েছিল, বাঁচে নি। তাই সাবিত্রীর মাতৃহৃদয়ের সবটুকু স্নেহ মিণ্টুকে আশ্রয় করে একটু অধিকমাত্রায় সিঞ্চিত হওয়ার কারণ বিভাসের অজ্ঞাত নয়। তবু স্বাবলম্বী করে তোলার কথা স্বামী প্রায়ই বলায় সাবিত্রী চুপ করে থাকতে পারল না, বললে, বোঝবার বয়স হলে আপনিই তা হবে, মা কি আর ছেলেকে চিরকাল খাইয়ে দেয়।

বিভাস চুপ করে যায়। রান্নার স্বল্প পরিসর ঠাঁই থেকে ভাতের ছোট থালাটি হাতে নিয়ে এলো সাবিত্রী। বিভাস স্ত্রীর মুখপানে তাকিয়ে গামছাটা কাঁধে ফেলে, দরজার দিকে অগ্রসর হল, এগোতে এগোতে বললে, খাল থেকে চট করে ডুবটা দিয়ে আসি, এই গরমে ঘরেতে ত আর চানের জল থাকার উপায় নেই।

সাবিত্রী মিণ্টুর ভাত মাখতে মাখতে সুরু করে, তাড়াতাড়ি এস কিন্তু, মুখপোড়া কলেতে গরমের দিনে ত একটু জলটা বেশী করে দেবে না। টিউবকলটাও সেই মোড়ের মাথায়, লাইন দিয়ে জল আনতে হয়। তবু খালটা ঘরের লাগোয়া তাই রক্ষে।

সাবিত্রী মুখে এখন বাগজোলা খালের সুখ্যাতি করলেও সামনের বর্ষার কথা স্মরণ করে অন্তরে ঘৃণায়

শিউরে উঠল। বর্ষায় সাবিত্রীর চোখে জল আসে। খালের পচা আবর্জনাময় জল ওর রান্নার যায়গা পর্যন্ত তোলপাড় করে। সপ্তাহখানেক সে জল আর নিকাশ হতে চায় না, ঘরের আবহাওয়া পর্যন্ত দুর্গন্ধে ভরিয়ে রাখে, জীবন ওষ্ঠাগত হয়ে থাকে। গত বছর বিভাস বাধ্য হয়েছে এমন ঘর ভাড়া নিতে, নেহাৎ অভাবের দারুণ রোষে। ফ্যাক্টরীর চাকরীটা যাওয়ার পর পাকা ছাদের ঘর ছেড়ে দিতে বাধ্য হল বিভাস। সংসার চালানোর আয়ত্তের মধ্যে থাকতে ওরা উঠে এসেছে এই বস্তীর ঘরে।

বিভাস স্নান সেরে তাড়াতাড়ি ফিরল। মিন্টুর খাওয়া শেষ হলে মুখমুছিয়ে দিয়ে সাবিত্রী ছেলের সামনে কতকগুলো দিয়াশলাইয়ের খালি বাক্স সাজিয়ে রেখে স্বামীর জন্য ভাত বাড়তে গেল।

কলাইয়ের থালায় চুড়ো করে ভাত সাজালো, পাশে পেঁপের বড়া, একটা বাটিতে কলাইয়ের ডাল, এইটুকুই সামর্থ। হাতপাখাটা নিয়ে স্বামীকে বাজন করতে বসল সাবিত্রী। মিন্টু ঘরের একধারে দিয়াশলাইয়ের রেলগাড়ী বানিয়ে মুখে বুউ-উ বু উ উ বলে ঠেলে ঠেলে খেলছে। বিভাস খেতে খেতে পুরানো কথাটার পুনরুক্তি করল, জান সাবি, দোকানটা সামনের মাসে খুলতে না পারলে আর চলে না।

সাবিত্রী পাখা টানতে টানতে প্রশ্ন উত্থাপন করে, কিন্তু টাকার কি ব্যবস্থা করলে?

—অনিরুদ্ধকে ত ধরেছি—

—কোন অনিরুদ্ধ, চুরির জন্যে যার ফ্যাক্টরীতে থেকে চাকরী যায়? তুমি যখন ফ্যাক্টরীতে হেডমিস্ত্রী ছিলে আর যে তোমার অধীনে একজন সাধারণ মিস্ত্রী ছিল?

—হ্যাঁ, তা, তাই বটে। বড়লোক হবার ইচ্ছাটা ওর খুব প্রবল ছিল। তাই নৈতিক জ্ঞানের মাত্রাটা কখন কখন ঠিক থাকত না। একবার ভাগবাঁটোয়ারার ধার তেমন ধারে নি বলে ধরা পড়ল। পুলিশ আগে থেকে খবর পেয়ে একটা মা বোঝাই লরীকে ধরার জন্য ওঁত পেতেছিল। জেরায় নিজেকে ও লরীর হেল্পার বলে পরিচয় দিয়ে নির্দোষীর অভিনয় করলে, তাতে বিশেষ ফল হল না। জেল হয়নি, চাকরীটা গেল।

—সেই অনিরুদ্ধ তোমাকে টাকা ধার দেবে বলেছে?

—হ্যাঁ পাঁচশো টাকা ধার দেবে বলে স্বীকার হয়েছে। বিভাস বেশ নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে জবাব দেয়।

—কিন্তু বন্ধুটিকে আমার কেমন মনে হয়, বাপু।

—মনে নেই, তোমাকে ডাকতে এলেই আমার দিকে কেমন ভাবভ্যাব করে চেয়ে থাকত।

বিভাস হেসে উঠল, তাতে তোমার গরব করবারই কথা গো। প্রজাপতির দিকে তুমি তাকাও না?

সাবিত্রীর কথাটা মনঃপুত হল না, একটু বিরক্তির সুরে বললে, অমন গরবে আমার কাজ নেই।

বিভাস সাবিত্রীকে বোঝে। তাই একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে, কিন্তু অনিরুদ্ধ ছাড়া আর আমাদের কে ধার দেবে বল? অতগুলো টাকা—

সাবিত্রীও জানে এ সংসারে বন্ধু তেমন কেউ নেই যার সাহায্যে আর্থিক আনুকূল্য কিছু ঘটতে পারে। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে হাতের চুড়িগুলো নাড়া চাড়া করে, তারপর স্বামীর দৃষ্টি ঐগুলোর প্রতি আকর্ষণ করে বলে, এগুলোতেও ত ভরি দেড়েক হবে। এখন ত সোনার অনেক দাম।

বিভাসের অসম্মতি ফুটে উঠে ওর চোখে মুখে, মুখের গ্রাসটুকু নিঃশেষ করার সময়টুকুও পায় না, সুরু করে, ওকথা আর এনো না মুখে, গড়িয়ে দেবার এতটুকু মুরোদ নেই আমার, ভেঙ্গে খাওয়ার যম।

—এত ভেঙ্গে খাওয়া নয়, বেঁচে থাকার চেষ্টা।

ফ্যাক্টরীর চাকুরী খোয়ানোর পর নতুন কাজের সন্ধানে থাকার বৃথা কালব্যয়ের মধ্যে সাবিত্রীর বিয়ের গয়নাগুলো প্রায় সবই গেছে। বাকীটুকু ব্রোঞ্জের চুড়ির উপর সমভাবে বর্তমান। বিভাস সে বিষয়ে হুঁসিয়ার হয়েছে যাতে আর না খোয়াতে হয়। বিচক্ষণ বিভাস তাই নারাজ চোখে বাধা দিয়ে বলে সাবিত্রীর কথায়, আমাকে যদি ভিক্ষেও করতে হয় তবু তোমার সোনায় আর হাত দিতে পারব না আমি, এ কথা আর তুমি মুখে এনো না,

সাবি। বাঁচার চেষ্টায় তোমার সোনার হাত রাংতায় মুড়তে পারব না আমি।

—আমি যে অপয়া তোমার সংসারে। সাবিত্রীর কণ্ঠে অভিমানের সুর।

—ছিঃ সাবি, অপয়া আমি নিজে, তোমাকে বিয়ে করে ত হেড টার্নার অবধি উঠেছিলু—আজ যদি সে চাকরীটা থাকত তাহলে বাউণ্ডুলের মত সব উড়িয়ে ফেলতুম না।

দীপ্তকণ্ঠে সাবিত্রী বাধা দেয়, সে ত আর বাইরে ফুর্তি করতে উড়িয়ে দাও নি।

—তা না হয় গেল। কিন্তু আর নয়, তাতে দোকান হোক আর নাই হোক।

—তাহলে তুমি দোকান করবে না? বাস ছাড়ার জায়গায় দাঁড়িয়ে সকালে বিকেলে শুধু ফেরি করবে? আর তোমার দোকান করার স্বপ্ন ধুলোয় মিলিয়ে যাবে?

—উপায় কি বল? অনিরুদ্ধ তবু পাঁচশো টাকা খালি হাতে ধার দিতে রাজী হয়েছিল। কথাগুলো বলে বিভাস দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে চিন্তা করতে চায় যদি অন্য কোন মরুদ্যানের সন্ধান পাওয়া যায় হতাশার সাহারায় অন্যমনা বিভাসের চমক ভাঙে সাবিত্রীর প্রশ্নে।

বিভাস অনিরুদ্ধের অসজাগ মনের অনেক সংবাদই রাখে। তার মনের অন্ধকার গহনে সাবিত্রীর প্রতি লোলুপতার সন্ধান বিভাসের অজ্ঞাত নয়। সাবিত্রীর উপস্থিতিতে পূর্বে অনিরুদ্ধর চোখে যে ভাবান্তরটুকু ধরা পড়ে বিভাসের তা লক্ষ্য এড়ায় নি কখনও। সম্প্রতি গত্যন্তরহীন হয়ে বিভাস অনিরুদ্ধের সেই গোপন হৃদয়-তন্ত্রীতে একটু আঘাত দিয়েই দেখেছে যে সুবিধে পাওয়ার চেষ্টা অফলপ্রসূ হবে না বলেই বিশ্বাস। কিন্তু একটু অহেতুক ধিক্কার ওর নিজের মনের অন্তঃস্থলে ফণা বিস্তার করে বসেছে, মুক্তি পাচ্ছে না কিছুতেই, যেন মনের এই ধূর্ততায় ওর সচেতন মনের বিচারক ওকে মুক্তি দেবে না কোনদিন কোন কারণেই। সাবিত্রীর কাছে স্বীকারোক্তির দ্বারা যদি কিছু হালকা হয় ওর মনের শান্তি, তাই অকপটে ও সুরু করলে, জানো সাবি, অনিরুদ্ধকে বললুম—

—কি, থামলে যে—

—বললুম, আমার সঙ্গে বিয়ে হয়েই সাবিত্রীর যত কষ্ট। ···সংসার আর চলে না···দোকান দিলে একটা স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারে জীবনে। অনিরুদ্ধর সঙ্গে কথোপকথনের সংক্ষিপ্ত সারটুকু সাবিত্রীর নিকটে পরিবেশন করলে বিভাস।

—আমার নাম বললে কেন? সে ত জানেই, নতুন ইউনিয়নের পাণ্ডাগিরি করে করে তোমার চাকরী গিয়েই সংসারের এমন হাল হয়েছে।

মুখের শেষ গ্রাসটুকু গলাধঃকরণের পর বিভাস জবাব দিলে, জানি। কিন্তু না বলে আর থাকতে পারলুম না। তোমার মুখে সেই হাসি আর নেই, সাবি।

—কে বললে? গ্রীবা হেলিয়ে ফ্যাকাসে মুখে মৃদু হাসবার চেষ্টা করে সাবিত্রী।

হাতমুখ ধুয়ে এসে পুরানো কাগজের গোলা পাকাতে বসল বিভাস। ছেলের জন্যে ফুটবল বানাতে হয় এমন অনেক বাপকে। এঁটো বাসন নিয়ে খাওয়ার জায়গাটা পরিষ্কার করে ফেললে সাবিত্রী এই অবসরে, তারপর মাদুর বিছিয়ে দিয়ে চলে গেল নিজের কড়কড়ে ভাত-গুলো বেড়ে নিতে। এই সময়টা মিন্টু প্রত্যহ বাবার কাছে রাজপুত্তুরের গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। এই ফাঁকে সাবিত্রী খাওয়া, বাসনমাজা ও রান্নার স্বল্প পরিসর ঠাঁইটুকু ওবেলার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে রাখে,—নিত্য অভ্যাসগত কর্ম। কাজ-কর্ম সেরে সাবিত্রী এসে দেখে বাপ-বেটা ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত্রির ক্ষীণ অবশিষ্টাংশে দৈনিক কাগজগুলোর জন্য বিভাসকে পথে নামতে হয়। ভোর না হতেই বাড়ীতে বাড়ীতে কাগজ পৌঁছে দিয়ে বাকী কাগজগুলো নিয়ে সে বাস টারমিনাসে হাঁকে। ঘরে ফিরতে এক না একদিন বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে যায়, ক্লান্তি অপনোদনে দু-একঘণ্টা দিবানিদ্রা ব্যতীত ওর শরীর আর ভারসাম্যে থাকতে চায় না। বিকালে আবার কাগজের সঙ্গে সাপ্তাহিক, মাসিকপত্রগুলো নিয়ে রাত নটা দশটা পর্যন্ত ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে হাঁকাহাকি।

সেদিন সাবিত্রী ঘরে ফিরে এসে দেখে, বিভাস জেগে আছে। সাবিত্রী কারণান্বেষণে প্রশ্ন করলে, আজ দুপুরে ঘুমূলে না?

—না, দিবাস্বপ্ন দেখছি। জানো, দোকান খুলে একবার বসতে পারলে, ব্যস, এ সংসারের হাল বদল হয়ে যাবে, হয়ত ভবিষ্যতে একটু জমিজমাও কিনতে পারব। স্বপ্ন, স্বপ্ন দেখছি সাবি, তোমার গা ভরে উঠবে গয়নায়, তোমার সংসারে কাজের জন্যে লোক রাখব আমি। খোকা যাবে ইস্কুলে, সঙ্গে যাবে চাকর।

কিছুটা হকচকিয়ে তাকিয়ে থাকে বিভাসের মুখের দিকে সাবিত্রী। এত নিকটে তবু যেন বিভাস কত দূরে রয়েছে, কতদূর থেকেই সে যেন এক অস্পষ্ট জগতের কথা বলছে। সাবিত্রী স্বামীকে বোঝে, স্বামীর ব্যথা-ভরা মন থেকে ছুটির ইশারায় এগিয়ে চলার কথাগুলো শুনে তাই প্রথমটা হকচকিয়ে তাকিয়ে থাকলেও তা ক্ষণিকের, সাবিত্রীর সম্বিত ফিরে পাওয়ার বিলম্ব হয় না। বিভাসকে প্রেরণার উদ্দীপনে সাবিত্রী সচেষ্ট হয়, বলে, বেশ ত ধার যখন পাবে, চেষ্টা করলেই ত হয়, ভগবান হয়ত এবার মুখ তুলে দেখবেন।

—দেখ সাবি, দোকানের জন্যে চলতি পথে ঘর আমি দু-চারটে দেখিনি যে এমন নয়—

—তাহলে?

—কিন্তু সেলামীটা দিতেই অনেক টাকার দরকার যে,—তাই কূলকিনারা পাচ্ছি না।

বিভাসের পাশে মাদুরের কিনারায় সাবিত্রী বসে পড়ে। সে জানে স্বামীর এই ইচ্ছাটি কতখানি প্রবল তবু 'কিন্তু' থেকে যায়। যে শক্তির জোরে স্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্যের সীমারেখা মানুষের ক্ষমতায় অন্তর্লীন থাকে সেই অর্থশক্তির দৌর্ব্বল্য বিভাসের ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও পথের সন্ধান দেয় না। সাবিত্রী কতটুকুই বা এক্ষেত্রে তাকে অনুপ্রেরণা যোগাতে পারে, তবু স্বামীর দুশ্চিন্তার অংশীদার হতে চায় সে। স্বামীর দুঃখের সার্থক সঙ্গিনী হতে চায় সে। তাই বিভাসের সৎপ্রচেষ্টার কর্মোদ্যমকে উত্তেজিত রাখতে সাবিত্রী বাসনা প্রকাশ করে বলে, চলো, তোমার সঙ্গে আমিও দোকানঘরগুলো দেখে আসি। নিয়ে যাবে আমাকে?

—তুমি দেখতে যাবে?—অপ্রস্তুত বিভাস যেন আকাশ থেকে পড়ল। পথে বেরোলে যে সাবিত্রী আড়ষ্ট হয়ে যায়, যার সহজাত শান্তস্বভাব পথের পাদচারণায় দ্বিগুণ প্রশান্তির ভাব প্রকাশ করে, অবগুণ্ঠন যার পথের মাঝে পাগলা হাওয়াও সরাতে পারে না। সেই সাবিত্রী তার সঙ্গে স্বেচ্ছায় দোকানঘর দেখতে যেতে কামনা করছে। বিভাসের কাছে এই প্রস্তাব অনাস্বাদিতপূর্ব্ব এক অভিনব আশ্চর্যের বিষয় বটে। বিভাসের চিন্তায় যতি পড়ল সাবিত্রীর কথায়।

—হাঁ্যা, ক্ষতি কি! এমনও ত হতে পারে যে আমার অনুরোধে সেলামী লাগল না বা কিছু কম হল!

—কথাটা মন্দ নয়। কিন্তু সময়?

—আজ আর নাই বা কাগজ নিয়ে বেরোলে। সন্ধ্যায় মিণ্টুকে পাশের ঘরের বৌয়ের কাছে রেখে বরং আমরা দুজনে বেরোব। ওর কাছে মিণ্টু থাকলে আমাদের সঙ্গে যেতে বায়নাও করবে না।

—যুক্তিটা মন্দ নয়, সাবি।

সন্ধ্যায় সাজগোছ করে সাবিত্রী বিভাসের সঙ্গে পথে নামল অনেক—অনেকদিন পরে। সাবিত্রী একটু সাজলেই ওর দেহে যেন ঝরণার খলখল হাসি ছড়িয়ে পড়ে। তাকিয়ে দেখে সে চলার ছন্দ অনেকেই, সেই সলাজ চাহনিতে চোখ পড়লে শোণিতের নাচনের বেগ বেড়ে যায়, অনেক রসিক বুড়োও আড্ডায় নিম্নস্বরে কথা বলে ওর দেহের বাঁধুনির দিকে চেয়ে চেয়ে। এর ওপর যদি সাবিত্রীর পুরানো হাসির উচ্ছলতার দীপ্তি ভাসে ওর মুখে, ওর চোখে, তাহলে ত কথাই নেই, দরিদ্র বিভাসও ঈর্ষার পাত্র হয়ে ওঠে।

পাঁচমাথার মোড়ে একটা ঝাঁপফেলা দোকানকে উদ্দেশ করে দুজনে হাজির হল ভাড়ার জন্য মালিকের সরকারের -কাছে। সরকার মশাই বিনা ভণিতায় জানালেন, আপনারা সেলামীবাবদ যৎসামান্যই দেবেন। তবে তিন হাজারের কমে ত আর হয় না।

সাবিত্রীর বুকের মধ্যে দুরু দুরু করে উঠল। তবু বিভাস মুখ ফুটে কিছু বলার পূর্ব্বেই সাবিত্রী সগাম্ভীর্যে বিদ্রূপের সুরে বললে, মাত্র এককালি ত জায়গা তার জন্যেই জমিদারীর এত সেলামী!

সরকারমশাই পাশের একটা সেলুনের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, ওই সেলুনটার জন্যে সেলামী নেওয়া হয়েছিল পাঁচহাজার টাকা, আর ওর পাশে ঐ কাপড়ের দোকানটার জন্যে দশহাজার টাকা নেওয়া হয়, সেই তুলনায় এ ত সস্তা—

বিভাসের হাতটায় টান পড়তে সাবিত্রীকে অনুসরণ করলে বিভাস। সে একটু ভ্যাবাচাকা খেয়েছিল বোধ হয়, সম্বিত ফিরে পেয়ে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে, শুনলে সাবি, ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয় না। গরীবের অন্নসংস্থানের ডাকে ভগবান কালা হয়ে থাকেন।

সাবিত্রীর মুখে কথা এলো না। স্বামীর সঙ্গে নীরবে ক্রোধ অবদমন করে পথ অতিক্রম করে চলল, ইচ্ছে হয়েছিল বলে, টাকা খোলামকুচি নয় যে পথে ছড়িয়ে দিলেই হল। বলে নি শুধু এই ভেবেই যে যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলেও দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সাংসারিক খরচ সংকুলান করতে পারে না তারা ছাড়া অপরে অভাবের তাড়না বুঝতে পারে না। পর পর আরও দু-একটা দোকান ঘর দেখল ওরা। দুজনে অনেক ইনিয়ে-বিনিয়ে অনুরোধ করেও নিজেদের প্রত্যাশার আয়ত্তের মধ্যে মালিকের মর্জিকে আনতে পারলে না। অন্ততঃ দু হাজার টাকা সেলামীর এক পয়সার কমে কেউ রাজী নন। সাবিত্রী অনুনয়-বিনয় করে মিষ্টভাষী এক মালিকের কাছে তবু বললে, ছোট বোনের অক্ষমতার দিকে তাকিয়েও সেলামীটা পাঁচশো টাকায় কোনমতে রফা করা যায় না!

শুধু বিপক্ষ তরফ থেকে বিগলিত মৃদু হাসির সঙ্গে উত্তর এলো, আপনি সঙ্গে এসেছেন তাই যথাসম্ভব চেষ্টা করেই দু হাজারে রাজী হলুম, নইলে—

বিভাস এগিয়ে পড়েছে অন্য মালিকের সন্ধানে। সাবিত্রী স্বামীকে অনুসরণ করলে বাকী 'নইলে' টুকুতে মনঃসংযোগে বাঞ্ছিত অবজ্ঞা প্রদর্শন করেই। আশা ভঙ্গের পক্ষে গোড়ার কথাটুকুই ওদের মত স্বল্প সামর্থের জন্য যথেষ্ট ইন্ধন যোগাতে সমর্থ।

বিভাস কয়েকপদ অগ্রসর হয়ে মুখ খুললে, পাষাণ গলানোর উপায় আমাদের জানা নেই। বসে থাকুক মালিকগুলো ওদের দোকানঘর, কোলে নিয়ে। মনে হচ্ছে অভিসম্পাত দিই, ওদের ঘর কেউ না ভাড়া নেয়।

মুখে রা নেই, রাগে গরগর করছিল সাবিত্রীও।

সীমিত শক্তির নাগালের বাইরে প্রলুব্ধ হওয়ার মত এমন অনেক ক্ষুদ্র বস্তুই আছে যেটুকুর অপ্রাপ্তিতে সাময়িকভাবে মন প্রতিক্রিয়ার বিষাক্ত বাষ্পে ভরে উঠে। ওদের মনেও নূতন অভিজ্ঞতায় যে বিষের হাওয়া সঞ্চিত হওয়ার সুযোগ অন্বেষণ করছিল।

পাঁচ মাথার মোড় থেকে দুজনে পদবিক্ষেপে অনেকখানি পথ ঘরমুখো ফিরে এসেছে। হঠাৎ অনিরুদ্ধর ওয়েলডিংয়ের দোকানের সামনে এসে পড়ায় মানসিক ক্ষোভের গতির মোড় ঘুরিয়ে বিভাস সাবিত্রীর কাঁধে হাত রেখে থমকে দাঁড়াল, বললে, চল, এতদূর ঘোরাঘুরি করলে এবার অনিরুদ্ধর দোকানটা দেখবে, এস।

সাবিত্রী যথারীতি অবগুণ্ঠনটিকে সংযত সম্ভ্রমের আকারে নামিয়ে রেখে অনুগামিনী হল স্বামীর। সস্ত্রীক বিভাসকে দেখে আদর-আপ্যায়ন করলে অনিরুদ্ধ। দোকানের ভিতর ওয়েলডিং প্লেটিংএর কাজের সরঞ্জামে কালিঝুলির ফাঁকে কোথায় যে বন্ধুপত্নীকে সাদরে আসন দেবে তা অনিরুদ্ধ খুঁজে পায় না। তাই বিনীত ভঙ্গীতে দুটো টিনের চেয়ার ফুটপাতের ওপর বার করে রেখে সসংকোচে হাসতে হাসতে বললে, আজ আমার এত সৌভাগ্য, তবু লক্ষ্মীঠাকরুনকে একটু বসতে যে জায়গা দেব তার সুযোগ নেই।

এই অভাব অভিযোগের দিনে সাবিত্রীকে কেউ ইদানীং 'লক্ষ্মী' বলে সম্বোধন করলেও মনে অসন্তুষ্টই হয় কিন্তু আজ অনিরুদ্ধর কথায় সাবিত্রী মনের মধ্যে কোন বিকলন লক্ষ্য করল না। হয়ত বস্তুজগতকে ও সাময়িক-

ভাবে দূরে সরিয়ে রাখতে চায়, সাহ্ন্য-সঞ্চিত তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে হয়ত মুক্তি পেতে বাসনা করে, স্বামী পাশেই আছে তাই ফুটপাতের ওপরে ও স্বপ্নের বৈকুণ্ঠ রচনা করে নিতে কার্পণ্য করে না। একথা অবশ্য ওর অজানা নয় যে এই বিশ্রামের বৈকুণ্ঠ ক্ষণিকের, কল্পনায় সুখকে বশীভূত করা যায় না, কল্পনার সুখ বাস্তবের ব্যথাকে তীব্রতর করে তোলে।

জাগ্রত চেতনায় তাই সৌজন্য প্রকাশের পালা করে অনিরুদ্ধের প্রতি সাবিত্রী নরম চোখে কিছুটা অনুরোধের সুরেই বললে, তা বন্ধু হয়ে একটা ছোটখাট দোকানঘর দেখে দিন না—

সচেতন অনিরুদ্ধের ভুল হয় না বুঝতে, সে শুনতে পায় সাবিত্রীর কণ্ঠে একটা যেন আবদারের সুর রণিত। নিঃস্বার্থ সাহায্যের ভঙ্গীতে তাড়াতাড়ি তাক লাগিয়ে জবাবে সে বলে, হ্যাঁ, ভুলে গিয়েছিলুম। বিভাসকে বলতে, গজ দুই লম্বা আর চওড়াতেও গজখানেক হবে এমন একটা দোকানঘর ভাড়া দেবে বলেছিল একজন বটে।

নৈরাশ্যের অন্ধকারে আশার আলোকে উৎসাহিত হয়ে উঠলো বিভাস আর সাবিত্রী। বিভাস ব্যস্ততায় দীপ্ত হয়ে বললো, কোথায়? কতদূরে? কত টাকা সেলামী?

অনিরুদ্ধ স্নিগ্ধচোখে হাসলে, বললে, কাছেই। আমার জানা লোকের ঘর। টাকা-পয়সার ব্যাপারে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবে এমন লোক। দেখতে চাও ত একদিন এস দুজনে।

স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উত্তেজনায় ছটফট করে উঠল। সাবিত্রী নিজেকে বোঝাতে চাইলে কী ভুল ধারণাই অনিরুদ্ধের প্রতি সে পোষণ করে এসেছে, ছিঃ! এমন পরোপকারী বন্ধুর প্রতি কি অবিচারই করেছে সে মনে। দু চোখে চাপা আনন্দের শিহরণ খেলে গেল সাবিত্রীর। যে অনিরুদ্ধর প্রতি অন্তরে ওর বিকর্ষণী শক্তির প্রতিক্রিয়ার এতটুকু দরদ ছিল না হঠাৎ তার জন্য মনে ও শ্রদ্ধা অনুভব করলে। বিভাস বন্ধুর কালিমাখা ডানহাতটি খপ করে ধরে ফেলে মৃদু আকর্ষণ করলে বুকের কাছে, বললে, ভাই তোমার ওপর আমার অনেকটুকু নির্ভর আছে বলেই আমি সাহস ধরেছি, আজই একবার দেখিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে পার না?

অনিরুদ্ধর চোখের বলদুটো বিভাস আর সাবিত্রীর মুখ আবর্ত্তে ঘুরে এল, দেখলে সে সাবিত্রীর মুখেও নীরব অনুরোধের একই লিপি।

অনিরুদ্ধ তাই কাজ ছেড়ে দু পা যেতে সম্মত হল। তার মনের কোণে কাউকে বাধিত করার প্রতিষ্ঠাভূমির স্বপ্ন। ঘরটির মালিকের সঙ্গে ওদের আপনজন বলে পরিচয় করিয়ে দেবার পালা সঙ্গে করে কথাবার্তায় গতিমুক্ত করে সে বললে, পাঁচশ টাকার বেশী কিন্তু এরা সেলামী দিতে পারবে না খুড়ো, বলে দিলুম আগে।

বুড়োর বৈষয়িক জ্ঞান কম নয় এ বিষয়ে তবু অনিরুদ্ধর মধ্যস্থতায় সুবিধের আশা ত্যাগ করতে হল, তিনি বললেন, ভাইপো, খুড়োকে যেন চামার মনে কোরো না! মাঝে মাঝে তোমার শরনাপন্ন না হতে হলে অ-ন্য এ কথা উড়েই দিতুম।

বুড়োর সঙ্গে স্থির হল জ্যৈষ্ঠ সংক্রান্তির সন্ধ্যাবেলায় সেলামী আর ভাড়ার টাকাটা জমা দিয়ে বিভাস স্বস্তির নিশ্বাস ফেলবে দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে।

বহুদিনের প্রতীক্ষা এবার শেষ হতে চলেছে। আষাঢ়ের প্রথম দিনটির সকাল থেকেই খবরের কাগজ, সাপ্তাহিক, মাসিক, গল্পের বইপত্তোর নিয়ে দোকান খুলে বসতে পারবে বিভাস!

অনিরুদ্ধকে পথে ছেড়ে দিয়ে স্বামী-স্ত্রী খুশীর পাল তুলে দিয়ে এগিয়ে চলল। ঘরে ফেরার পথে বিভাস প্রস্তাব করলে সাবিত্রীর অনুমোদনের আশায়, দোকানের নাম হবে, সাবিত্রী ষ্টোর্স্।

সলজ্জ সাবিত্রী বাধা দিলে, না কখখনো না। যদি নাম রাখতে হয় তাহলে নাম থাকবে, বিভাস স্টোর্স্।

সন্ধি হল দুজনে। বিভাস স্থির করলে, বেশ, সাবিত্রীর 'সা' আর আমার নামের প্রথমটুকু 'বি', এই দুই মিলিয়ে দোকানের নাম হবে,সাবি স্টোর্স্।

সাবিত্রী খুঁত খুঁত করতে লাগল। বিভাসের আদরের ডাকা নামটা আর গোপনে থাকবে না,

জনসমাজে ফাঁস হয়ে যাবে। অবশ্য কেউ যে অনুমান করতে পারবে না সেটুকু সাবিত্রী বোঝে।

ঘরে ফিরে সাবিত্রী পাশের ভাড়াটে ঘরের বৌয়ের কাছে মিণ্টুকে আনতে গেল। মিণ্টুর সঙ্গে মৃদুলা তখন একটা রবারের বল নিয়ে খেলা করছে। নিঃসন্তান মৃদুলা। ঘরের কাজকর্মের ফাঁকে স্বামী ডিউটিতে বেরিয়ে গেলে প্রত্যহ সাবিত্রীর কাছ থেকে ও মিণ্টুকে নিয়ে আসে ওর ঘরে,—খেলা দেয়, মিষ্টি দেয়, আদর করে বুকে চেপে ধরে।

সাবিত্রী এসে দাঁড়াতে বলটা দেখিয়ে মিণ্টু খুশীতে উৎফুল্ল হয়ে মাকে বললে, এই দেখ, কেমন সুন্দর বল, তুমি ত দিলে না, নতুন মাসী দিয়েছে।

-আদায় করে ছেড়েছ! তাহলে আর কি নতুন মাসীর কাছেই থাক, আমি ঘরে ফিরে যাই। কৃত্রিম ভঙ্গীতে গমনোদ্যত হল সাবিত্রী।

মৃদুলা হাসে বলে, বেশ ত থাক না আমার কাছে। তবে ছেলে পর হয়ে গেলে জানি না বাপু।

মিণ্টু ভাবলে সত্যি মা তাকে নতুন মাসীর কাছে রেখে চলে যাচ্ছে। মায়ের পাশটিতে বল হাতে এসে দাঁড়ালো মিণ্টু। সাবিত্রীর ইতিমধ্যে চোখ পড়েছে মৃদুলাদের বিপরীত সারির ঘরের জানলার অভ্যন্তরে, প্রাচীর দিয়ে আড়াল থাকা সত্ত্বেও মৃদুলাদের ঘরের সামনের উচুঁ দাওয়া থেকে ওদিকটা, বেশ নজরে পড়ে। সাবিত্রী চোখ ঘুরিয়ে মৃদুলার দৃষ্টি আকর্ষন করে প্রশ্ন করলে, ওদিকের ভাড়াটেদের ঘরে ও লোকটা কে মৃদুলা? ওর স্বামীকে ত দেখেছি আর ভাইকেও মাঝে মাঝে আসতে যে দেখি নি তা নয়!

মৃদুলা ঘরের মেঝেতে বসে থেকেই জবাব দিলে, মনের মানুষ গো দিদি। স্বামীর আফটার নুন্ ডিউটি, রাত দশটার পর ফিরবে ত তাই বিয়ের আগের বন্ধুর সঙ্গে একটু গোপনে মেলামেশা।

সাবিত্রীর চোখের বল দুটো আরেকবার ফিরলো সেদিকে, পরক্ষণেই ও মৃদুলার দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে। কথার ঝাঁঝে অসীম অসন্তোষের ছোঁয়া, বললে, স্বামীর চোখের আড়ালে এমন নির্লজ্জ জীবনে ঘেন্না, মৃদুলা। সরাসরি তেমন আড্ডায় উঠে গেলেই হয়।

আমরা হলুম সেকেলে, দিদি, ও ই সম্পর্ক ধরতে পারি না।—সরলকণ্ঠে নিজের মনের ভাব স্বীকার করল মৃদুলা।

সাবিত্রী আর দাঁড়াতে চায় না, মনের কোণে অবাঞ্ছিত রোষানল চেপে ঘরের দিকে পা বাড়ালে, মিণ্টু বললে, কাল লবেনচুস্ দেবে ত?

মৃদুলা হাসে, বলে, আচ্ছা, আমার কাছে থাকতে হবে, কিন্তু। সাবিত্রী ছেলের হাতে টান দিয়ে কৃত্রিম অসন্তোষ প্রকাশ করে বললে, খালি পাওনার দিকে চেয়ে থাকার গোঁসাই।

মৃদুলা হাসলে, রহস্যদীপ্ত হাসি। সাবিত্রী ছেলের হাত ধরে ঘরে ফিরে এলো।

পরদিন দুপুরে খেতে বসে বিভাস বললে, দেখ সাবি, একটা কথা। সাবিত্রী স্বামীকে খাবার হাওয়া করতে করতে প্রশ্ন করলে, কি?

—ভাবছি, অনিরুদ্ধকে একবার নেমন্তন্ন করতে হয়।

—বেশ ত।

আজ কাল পাঁচশো টাকা খালি হাতে বিনা সুদে কে দিতে চায়, বলো।

—সে ত বটেই।

—ফ্যাক্টরীতে কাজের সময় ওর যেমন বদনাম হয়েছিল এখন ঠিক তার বিপরীত।

—মানুষ ত বদলায়। দার্শনিকের মত বললে সাবিত্রী।

—কিন্তু কথা হচ্ছে, একটু ভালমন্দ করে খাওয়াতে ত খরচ আছে -সেইসঙ্গে নিজেরাও ত বাদ নয়!

—সে তুমি ভেবো না। আমাদের সপ্তাহে যে দুদিন মাছ আসে তা বন্ধ করে দিলেই হবে। এখানের আধকিলো বনস্পতিও।

—দেখ, অনিরুদ্ধ তোমার হাতের মুড়িঘণ্ট খেয়ে অনেকদিন আগে একবার সুখ্যাতি করেছিল, মনে আছে?

—জানি, কিন্তু অনভ্যাসে তেমনটি আর পারব কিনা জানি না।

—সত্যি সাবি, ভুলে যাওয়াই স্বাভাবিক।—বিভাস অতীত মন্থন করে একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে।

—একটু চচ্চড়ি এনে দি?

—না থাক্। শোনো, অনিরুদ্ধকে নেমন্তন্ন করার উপলক্ষটা তাকে কি বলা যায়? ভাববে, টাকা ধার দিতে স্বীকার করায় তাকে নেমন্তন্ন করছি।—বিভাস জলের গ্লাসটা তুলে নেয় মুখে।

সাবিত্রী ক্ষণিক চিন্তা সেরে মুরুব্বিয়ানায় বললে, বন্ধুকে বোলো, অনেকদিন থেকেই তাকে আমার খাওয়াবার সখ, শুধু সুযোগের অভাবে যোগাযোগ করে উঠতে পারি নি।

সাবিত্রীর মুখের দিকে তাকিয়ে মতলবটা শুনে খুশি হল বিভাস, এই সামান্য কথাগুলো তার মাথায় গজায় নি; সাবিত্রীর বুদ্ধির প্রাখর্যে নিজেকে গর্বিত অনুভব করলে বিভাস। এই সূত্র ধরে মনস্থির করতে দেরী হল না যে সন্ধ্যায় একবার অনিরুদ্ধর কাছে গিয়ে কিছু বাজে কথার পর হঠাৎ মনেপড়ে যাওয়ার ভানে সাবিত্রীর খাওয়ানোর ইচ্ছাটার কথা পাড়তে হবে।

আহার সেরে উঠে পড়ল বিভাস। সাবিত্রী উচ্ছিষ্টসমেত বাসন তুলে স্বামীর বিশ্রামের ব্যবস্থা করে নিজে খেতে বসতে গেলো। হাতমুখ ধুয়ে মাদুরে আশ্রয় নিলে বিভাস। নিমন্ত্রণ করার ব্যাপারে যদি অপরপক্ষ থেকে শুরু আপত্তি উঠে সেজন্য সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তরগুলো একটু চিন্তা করে নেওয়া প্রয়োজন। অনিরুদ্ধর সামনে একটু সৌজন্য এবং বিনয়ও দেখাতে হবে, একটু কৃতজ্ঞতা না বোঝাতে পারলেই বা চলবে কেন? যা সোজাসুজিভাবে প্রকাশ করা যায় না, যে ভাষাকে সাজাতে হয়, মুখের যে ভাবটুকু কথার সাথে থাকছে কি না সে বিষয়ে সতর্ক হতে হয়, তেমন ভাবভঙ্গীর প্রকাশ বিভাসকে পূর্বেই স্থির করে নিতে হবে বৈ কি মনে মনে। অধিকদূর চিন্তা অগ্রসর হতে বাধা সৃষ্টি হল, মিন্টুর আগমনে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হয়ে গেল। শুধু তাই নয়, নিত্য অভ্যাসমতো বাবার পাশে শুয়ে সে আবদার ধরলে, বাবা, গল্প বলো।

অন্যদিনের মতো বিভাসের গল্প বলার ইচ্ছা ছিল না। তাই ছেলের কথায় শুধু বললে, গল্প নয়, ঘুমোও।—পুনরায় চিন্তার ছিন্ন সূত্র একহারে গ্রথিতকরণে মনোনিবেশ করতে চায় বিভাস।

মিন্টু ছাড়বার পাত্র নয়, প্রাত্যহিক পাওনার জন্য জেদ ধরলে, গল্প না বললে কিছুতেই ঘুমোব না।

বিভাস তখন দোকানের সমৃদ্ধির দিবাস্বপ্ন দেখছে, অন্যমনস্কভাবে ছেলের কথার জের টানলে, ঘুমুবে না ত জেগে থাক।

—গল্প বল না। একই আবদার, একই সুর। প্রাত্যহিক আদারের ঘরে শূন্যতাকে বরণ করতে মিন্টু চায় না।

—আমার মিছে গল্প আর নেই।

মিন্টু বড় বড় বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অবিশ্বাসের সুরে খেই ধরলে, হ্যাঁ, মিছে গল্প? কে বললে? কাল তুমি বললে, রাজপুত্তুর তেপান্তর মাঠ পেরিয়ে একা একা ঘোড়ায় চেপে চলে গেল,—আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। তারপর কি হল বল না!

বিভাস বন্ধুকে নিমন্ত্রণের ব্যাপারে মনে মনে একটা খরচের হিসাবে ব্যস্ত ছিল। বারবার মিন্টু তাগাদায় গল্পটা সংক্ষেপে শেষ করতে চাইল, বললে, তারপর? তারপর রাজপুত্র ঘোড়া থেকে পড়ে মরে গেল।

মিন্টুর কল্পনায় রাজপুত্রের মরে যাওয়া নেই। তাই বাবার মুখের দিকে তাকে অবিশ্বাসে অনুযোগ করলে, ধ্যেৎ, মিছে কথা। তারপর কি হল, বল না!

বিভাসের মনে মনে সন্তর্পণে কষা হিসাবে গরমিল হল। ফলে, মিন্টুর বায়নায় আজ ওর রাগ হল। ছেলেকে আচমিতে মাদুরের ওপর বসিয়ে দিয়ে ধমক দিলে, ঘুমুতে হবে না, যা, যা, আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যা।

অভিমানাহত মিন্টু চোখভরা জলে ঘর থেকে বেরিয়ে মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

সাবিত্রী মুখের গ্রাসটুকু শেষ করতে করতে প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করলে বিস্ময়ে, কি হল?

মিণ্টু চোখ মুছতে মুছতে আবেগে ফেটে পড়ল, টেনে টেনে বললে, বা—বা, ব—কে—ছে।

পাশের ঘরের মৃদুলা দাওয়ায় একটা ভিজে কাপড় তারে মেলে দিতে এসে দাঁড়িয়ে গেল মিণ্টুর দিকে তাকিয়ে। নীচু প্রাচীরের ওপার থেকে প্রশ্ন করলে, কি হয়েছে মিণ্টু বাবু, মা মেরেছে?

মিণ্টু ছোট মুঠার ঘুষি দেখিয়ে জিভ ভেঙচালে, কিছু বললে না, অভিমান তার এখন সবার ওপর। মৃদুলা ভিজে কাপড়টা ভাল করে মেলে দিয়ে সেদিকে তাকিয়ে হেসে কুটোকুটি। বললে, লজেন্স দেবো, গল্প বলবো।

নিমেষের মধ্যে মিণ্টুর অভিমান কর্পূরের মত উবে গেল, আর আভিমানিক গাম্ভীর্যে চুপ করে থাকতে সে পারলো না। বললে, দাও।

মৃদুলা সদর দিয়ে এসে মিণ্টুকে বুকে তুলে নিলে। যাবার সময় সাবিত্রীকে বলে গেলো, সেই বিকেলে ছেলে ফেরত পাবে, তার আগে নয়।

সাবিত্রী বাটির অবশিষ্ট জলটুকু নিঃশেষ করে ঘাড় নাড়লে, রাতটাও রেখে দিলে পার।

মৃদুলার কানে আর বাকী কথাগুলো পৌঁছাল না, মিণ্টুকে বুকে চেপে সে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেছে।

বিকেলে অনিরুদ্ধর দোকানে সাইকেল রাখতে গিয়ে মনে মনে গুছিয়ে-রাখা কথায় কোনরকমে সৌজন্য, বিনয় প্রভৃতি বজায় রেখে বিভাস বন্ধুকে নিমন্ত্রণটা সারলে। সামনের রবিবার দিন স্থির হল—ওদিনটা ছুটির দিন। অনিরুদ্ধর তাগাদার দিন আর জানাশোনা লোকের কাছে অর্ডার ধরার দিন। রাজী হয়ে গেল অনিরুদ্ধ। বন্ধুর কাছে বিদায় নিয়ে বিভাস বেরিয়ে পড়ল বাস টার্মিনাসের উদ্দেশ্যে।

সেদিন কাগজ কটা বেচে দিয়ে বাস টার্মিনাসে আর দাঁড়াল না। আটটা বাজার অনেক আগেই ঘরের দিকে বিভাসের মন উধাও হয়ে গেল। মাসিক, সাপ্তাহিকগুলো বগলে চেপে ফিরতে লাগল বিভাস। মিণ্টুকে দুপুরে অহেতুক বকেছে, বেরোবার সময় দেখেও আসা হয় নি।

বিভাস সাইকেলটা থেকে তালা খুলে বাহনটাকে পথে নামিয়ে সাপ্তাহিক, মাসিকগুলো বেঁধে রাখলে। অনিরুদ্ধ অসময়ে বন্ধুকে দেখে হাতের কাজ রেখে মুখ তুলে প্রশ্ন করলে, কি ব্যাপার, আজ এত তাড়াতাড়ি?

—মনটা ভাল লাগছে না।

—কেন বৌঠানের শরীর ভাল নয়, নাকি?

—না, দুপুরে মিণ্টুর ওপর রাগ করেছিলুম।

—ওহো, তা বাপ কি ছেলের ওপর রাগ করে না?

—করে। তবু কেন জানি না। ফুটপাত থেকে নেমে সাইকেলে চাপলো বিভাস।

হঠাৎ সে একটা খেলনার দোকানের সামনে এসে থামলো। টিন আর প্লাষ্টিকের নানা দামের নানা রকমের খেলনা,—পাঁচটাকা থেকে আট আনা। বাগ্‌বিতণ্ডায় বিভাসের জিত হল। আট আনার জিনিষটা চার আনায় কিনে হৃষ্টচিত্তে বিভাস ঘরে ফিরল। দাওয়ার নীচে দাঁড়িয়েই সাবিত্রীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করলে বিভাস,—মিণ্টু কই?

—মিণ্টুকে পড়তে বসিয়েছি, কেন?

—মিণ্টু—

বাবার ডাকে মায়ের শাসনে পড়তে বসাকে অগ্রাহ্য করলে মিণ্টু! ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতে বিভাস পকেট থেকে গাড়ী বের করলে। সাবিত্রী খুশী হল মনে, তবু মুখে বললে, আবার বাজে খরচ কেন করতে গেলে, কদিনই বা টিকবে।

বিভাস হাসতে হাসতে জবাব দেয়, আমাদের জীবনটাই ত বাজে খরচ। ভয় নেই, দাম বেশী নয়।

—অতো জানিনে বাপু। খালি দেশলাইয়ের গাড়ীও ত বেশ হয়।

সাইকেলটাকে যথাস্থানে রাখতে রাখতে বিভাস সাবিত্রীর কথার জের টানে, হয় তা জানি, কিন্তু আমার খুশী হওয়াটা ত আর তাতে মেটে না।

সাবিত্রী স্বামীর এই সামান্যতম খুশী হওয়ার মাঝে

আর কথার বাদ সাধতে চায় না, নীরবে মিণ্টুর উল্লসিত মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে।

রবিবার সন্ধ্যার অব্যবহিত পরেই হাজির হয়েছিল অনিরুদ্ধ। বিভাস আর অনিরুদ্ধ মুখোমুখি আর মিণ্টু বাপের পাশে বসেছে। লণ্ঠনের আলোয় মাছের কাঁটা বেছে দিতে হবে বলে বিভাসই ছেলের আপত্তি সত্ত্বেও তার আসন নিজের পাশটিতে পেতেছে। এমন আহার্যের বৈচিত্র্য রোজের নয়, মিণ্টু মহাখুশী।

আহারান্তে অনিরুদ্ধকে জলের বালতি মগ এগিয়ে দিলে সাবিত্রী। সৌজন্যের কোন ত্রুটি সাবিত্রী রাখতে চায় না। তাই কর্তব্যের ভঙ্গীতে সাবান ও গামছা বাগিয়ে দেওয়ার জন্য নিকটেই দাঁড়িয়ে থাকে। নীরবতা অবলম্বন অসৌজন্যের পরিচায়ক হতে পারে ক্ষণিক চিন্তা করে সাবিত্রী, সুতরাং নীরবতা ভঙ্গ করাই শ্রেয়। তাই সারল্যের চোখে সে সুরু করলে গরীব বন্ধুর কুঁড়েতে এমনি মাঝে মাঝে যেন পায়ের ধুলো পড়ে।

সাবিত্রী এত নিকট দাওয়ায় দাঁড়িয়ে। লণ্ঠনের আলোয় ওর রমণীয়তার প্রতি একবার চোখ বুলিয়ে নিতে ভুলল না অনিরুদ্ধ। সাবানের টুকরাটুকু হাতে ঘষতে ঘষতে স্বর নামিয়ে ঘনিষ্ঠ হতে চাইলে, বললে, হ্যাঁ, নেমন্তন্ন কাজের চেয়ে লোভের জন্যেই আসতে হবে দেখছি।—অনিরুদ্ধর কণ্ঠের সুরে শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন হল কিনা বলা মুস্কিল।

সাবিত্রী আলগা আঁচলটা কোমরে সশিলভাবে পাক খাইয়ে অনিরুদ্ধর হাতে জল ঢালতে ঢালতে সহজ হবার চেষ্টা করে হাসতে চায়, বলে, লোভ যে পুড়িয়ে দেয়।

অনিরুদ্ধ গামছায় হাত মোছার ফাঁকে সাবিত্রীর চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসিতে ভরে উঠলো, মানুষ লোভের আশায় বেঁচে থাকে আর আমি একটু চোখের আভাসে এগোতে পারব না?

সাবিত্রীর ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে বুঝি। গম্ভীর হয়ে গেল ও। অনিরুদ্ধর আবেদনটা যে জাতের সাবিত্রী অন্তরের ঐশ্বর্যে তা থেকে অনেক যোজন দূরে। তবু বিভাসের নতুন দোকান খোলার উৎসাহের মূলে অনিরুদ্ধর সাহায্যটুকু ওদের অধীর প্রতীক্ষার পক্ষে অকিঞ্চিৎকর নয় জানা থাকায় সাবিত্রী ভদ্রতা বজায় রেখে কথার মোড় ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টায় নিরত হয়, বলে, গরীব বোনের চোখে মায়ামৃগ ধরার ইসারা নেই।

বিভাস মিণ্টুকে খাইয়ে বেরিয়ে এলো দাওয়ায়। হারিকেনের আলোয় সাবিত্রীর ছায়াটুকু গিয়ে পড়লো বিভাসের পায়ের কাছে, যেন ছায়ারও আছে একটা অভয় আশ্রয়।

অনিরুদ্ধ ত্বরান্বিত হয়ে উঠলো, আর দেরী করতে পারব না বিভাস, কিছু ঘুরে বাড়ী ফিরতে হবে।

—খেয়ে উঠেই দৌড়বে নাকি? একটু জিরিয়ে যাবে। বলে বিভাস, অনিরুদ্ধর ব্যস্ততা যেন সীমা মানতে চায় না। তার মনের সর্পিল গতি সারল্যের প্রাচীরে বুঝি আঘাত পেয়েছে, মুহূর্তের জন্যও আর এ পরিবেশ ওর বরণীয় নয়; বিভাসের শোভন হৃদয়ের কাছে ওর অবচেতনের কোন রণদুর্মদ শক্তির পরাজয় ঘটেছে। তাই সাবিত্রী আর বিভাসের দিকে ও তাকাতে পারল না, শুধু মিণ্টুকে উদ্দেশ্য করে বললে, আসি কাকু।

বিভাস দরজা পর্যন্ত বন্ধুকে পৌঁছিয়ে দিতে এসে থেমে গেল। আচম্বিতে গলায় আঁচল জড়িয়ে অনুরুদ্ধকে প্রণাম করে সাবিত্রী উঠে দাঁড়িয়ে বললে, ছোট বোনের বাড়ীতে দাদার নেমন্তন্ন সব সময়ে। মনে থাকবে ত?

অনিরুদ্ধ আদৌ প্রস্তুত ছিল না, ইন্দ্রিয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে চৈতন্যের শিহরণ লেগে যায়। এক পা পিছিয়ে সে সাবিত্রীর এই অনাকাঙ্খিত আচরণে আত্মসংবরণের স্থির-কণ্ঠে জবাব দিলে, নিশ্চয়ই মনে থাকবে।

সাবিত্রীর শ্রদ্ধায় অনিরুদ্ধর স্বাতন্ত্র্যের অনালোকিত মনের কোঠায় যেন কিসের এক রশ্মি এসে পড়েছে, মানসিক কলুষতা মুক্তির আস্বাদ যেন পেলে অনিরুদ্ধ। কি আর কী! দুর্দমনীয় হৃদয় ধারায় এতদিন ও শুধু নারীর আসঙ্গ লিপ্সার তরঙ্গায়িত আবেগ অনুভব করেছে আর আজ সাবিত্রীর আত্মপ্রতিষ্ঠিত দীপ্তিতে সে প্রবাহে অনিরুদ্ধ দেখলে সেখানে ভোগাকাঙ্খার আবিলতা নেই, যেন হিমাদ্রীশেখর থেকে সবেমাত্র মাটি স্পর্শ করা গঙ্গার

পবিত্র বারিধারা, শুধু প্রকৃতির মালিন্যকে ধুয়ে নেওয়ার গতি আছে তার মধ্যে! তাই সাবিত্রীর আচম্বিত আচরণে এক মোহশূন্য নিরাতঙ্ক প্রীতিতে অনিরুদ্ধ গমনোদ্যতহয়ে বললে আজ, আসি বোন—। আর থামলে না, থমকে দাঁড়ালে না অনিরুদ্ধ।

সেদিন গভীর রাত্রিতে হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল সাবিত্রীর। নির্বিঘ্ন নিদ্রার মাঝে বিশ্রামের উপায় নেই। ঘরের বাইরে ধপাস করে একটা মৃদু শব্দ হতে সাবিত্রী উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। শব্দটা আবার যেন সন্তর্পণে রান্নার জায়গায় নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। খুটখাট আওয়াজ এলো। অনিরুদ্ধ পাঁচশো টাকা বিভাসকে দিয়ে গিয়েছে। অতগুলো টাকা ডালা ভাঙা ট্রাঙ্কটায় সাবিত্রী তুলে রাখা অবধি যেন ওর স্বস্তি গেছে। লণ্ঠনটা নিভিয়ে শোবার আগে বন্ধ দরজার খিলটা ঠিকমত আছে কিনা খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছে সাবিত্রী। না, সাবিত্রী আর চুপ করে থাকতে পারলে না। নিদ্রিত বিভাসের গায়ে হাত বুলিয়ে নীচু গলায় ডাকলে শুনছ?

বিভাস তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে সাড়া দিলে।

—বাইরে একটা শব্দ হল।

বিভাস আধ নিদ্রিত ভাবে নাকের মধ্য দিয়ে একটা শব্দ করে বললে, হুঁ। বাইরে আবার শব্দ হলো, এবারে স্পষ্ট বাসন নাড়ার আওয়াজ। সাবিত্রী স্বামীর বুকের মধ্যে সরে এসে ভয়ার্তকণ্ঠে বললে, শুনলে!

—হুঁ, উঠে দেখতে হয়।

—হাতে যদি ছুরিটুরি থাকে। কেঁদে ফেলে বুঝি সাবিত্রী।

বিভাস বালিশের তলা থেকে দেশলাইটা হাতড়ে বার করে লণ্ঠনটা জ্বালালে। তারপর অন্বেষণ করে ঘরের কোণ থেকে একটা দুহাত লম্বা লাঠি সংগ্রহ করে দরজা খুলতে এগোল। সাবিত্রীর মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে, অস্বস্তিতে বাধা দিয়ে বললে, কি দরকার ঘরের মধ্যে ত ঢোকে নি!

পুরুষোচিত সাহসে ভর করে ইংগিতে সাবিত্রীকে চুপ করতে বলে ঘরের বাইরে লণ্ঠনটা নিয়ে সন্তর্পণে পা বাড়ালে বিভাস। এদিক সেদিক লণ্ঠনটা ঘুরিয়ে নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে ও নিরীক্ষণ করলে। সাবিত্রীও ঘরের বাইরে এসে স্বামীর অনুসন্ধান লক্ষ্য করছে। তন্ন তন্ন করে খোঁজার পর বিভাস সাবিত্রীর দিকে হেসে উঠলো, একটু উচ্চরোলেই হাসলে সদ্য আবিষ্কৃত শত্রুটির প্রতি সাবিত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিভাসের হাসি শুনে সাবিত্রী সাহস সঞ্চার করে প্রশ্ন করলে, কি, কি হল?

মুখের রেখায় হাসি নিয়ে বিভাস বললে, মাত্র একটা বেড়াল আর আমরা ভেবেই খুন!

সাবিত্রী সরলচোখে স্বামীর হাসিতে যোগ দেয়। বলে, গরীবের ঘরে হঠাৎ একদিন বেশী পয়সা থাকলে সে যক্ষ হয়ে ওঠে

—সত্যি সাবি, মাত্র দু তিন দিন ত থাকবে ঘরে টাকাটা। তারপরেই সেলামিটা দিয়ে দিলেই ব্যস।
—আবেগে নিশ্চিন্তে স্বামীর বুকের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ে। দীর্ঘপ্রতীক্ষার অবসান হয়ে আসছে এই ওদের জাগরণে নিদ্রায় স্বপ্ন।

চৈত্রের সংক্রান্তির দিন। বিভাসের আজ অবসর নেই। সন্ধ্যায় সেলামী ও ঘরভাড়ার টাকাটা জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে যেতে হবে। আগামীকাল সকাল থেকে নতুন করে জীবনের উদ্দীপন। পূজা দিয়ে দোকান খুলে বসা, বাসস্ট্যান্ডের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর ক্রেতাদের উদ্দেশ্যে হাঁকাহাঁকি নেই। তবে অনিরুদ্ধর ধার দেওয়া টাকাটা সেলামীর জন্য ব্যয় হয়ে যাবে, ভাড়া আর সাহিত্য-পণ্যের বাবদ হাতে কিছু নগদ টাকা চাই, তাই বেলা হওয়ার অনেক আগেই অনিরুদ্ধর দোকান থেকে সাইকেলটা নিয়ে পোদ্দারের দোকানের দিকে এগিয়ে পড়লো বিভাস। দু'গাছা চুড়ি বন্ধক দিয়ে সামান্য টাকার সংস্থান করে ঘরমুখো সাইকেলে চাপলে সে। সাবিত্রীর সঙ্গে অনেক কথা কাটাকাটির পর গত্যন্তর না থাকায় বিভাস রাজী হয়েছিল স্ত্রীর চুড়ি বন্ধক দিতে। সাবিত্রীর সজল চোখের কাতর অনুরোধের মুখখানি এখনও ওর মনের পটে অটুট আঁকা রয়েছে। একান্তই যখন ও সাবিত্রীর চুড়িগুলো

নিয়ে ঘর থেকে পথে সাইকেলে নেমেছিল তখন ও প্রতিজ্ঞা করতে ভোলেনি যে বছর ঘোরার আগেই সাবিত্রীকে চুড়িগুলো নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবে, নিশ্চয়ই ফিরিয়ে দেবে।

জ্যৈষ্ঠর প্রখর সূর্যতাপে বেলা বাড়তে থাকার সঙ্গে পিচঢালা পথে যাতায়াতে শরীরে অসহ্য জ্বালা ধরিয়ে দেয়। ঘর্মাক্ত কলেবরে বিভাস যানবাহনের ভীড় ঠেলে আর. জি. কর হাসপাতালকে বাঁদিকে রেখে এগিয়ে চলল ঘরমুখো মনে। পুলটা পার হয়েই যে ঘটনা প্রত্যক্ষ করলে তাতে আর মনটা কেঁপে উঠলো, কেঁদেও উঠলো। ঠিক মিন্টুর মত একটা ছোট ছেলে, নিরুপায় মৃত্যুর সম্মুখীন। কেমন করে যে ছেলেটা ফুটপাত থেকে ভীড়ের রাস্তার মধ্যে এসে পড়লো তা ভাবনার আর সময় নেই। রাজপথের এক দিশাহারা বেওয়ারিশ ষাঁড় ছেলেটার দিকে তেড়ে আসছে, অনেকেই দূরে থেকে চেঁচাচ্ছে কিন্তু সাহায্যের জন্য এগোচ্ছে না। ছেলেটা বিভাসের দিকে তাকিয়ে কেঁদে উঠলো। ছেলেটার ব্যাকুল আর্তনাদে অগ্রপশ্চাৎ চিন্তার আর সময় নেই. বিভাসের পিতৃহৃদয়ের এক সূক্ষ্মতন্ত্রীর উপর ছেলেটার আর্তনাদের সুর প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

বিভাস ছেলেটাকে পেছনে রেখে সামনের দিকে জন্তুটির গতিরোধ করতে ঝুঁকে পড়লো। আচম্বিতে শত্রুতার জন্য ষাঁড়টি প্রস্তুত ছিল না। দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্যাবস্থায় সে পিছনের চাকার পরিধির মধ্যে শিং চালিয়ে দিলে। বিভাস সে টাল সামলাতে অসমর্থ হয়ে ট্রামলাইনের একপাশে নিমেষের মধ্যে ছিটকে পড়লো আর পড়লো এক মালবাহী লরীর তলায়। এমন দ্রুত ঘটনার পরিণতি থেকেই হয়ত প্রত্যক্ষ সত্য হলেও অবিশ্বাস্য বলে ভ্রম হয়।

চারিদিক থেকে কর্মস্থলমুখো জনতা হৈ হৈ করে উঠলো। বিভাস একবার চোখ মেলে দেখলে ছেলেটাকে কোন এক সহৃদয় পথিক ফুটপাতের ওপর টেনে নিয়েছেন। ব্যস, ও স্বস্তির নিঃশ্বাসের সঙ্গে জ্যৈষ্ঠের তৃষ্ণার্ত রাজপথে মাথাপেতে দিয়ে চোখ বন্ধ করলে। সাইকেলটা ভেঙ্গে গিয়েছে, কাগজ, সাপ্তাহিক, মাসিক-পত্রগুলো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে পড়েছে আর বিভাসের মাথা থেকে ফিন্কি দিয়ে রক্ত ছুটছে।

জনতা থেকে ব্যবস্থা করে ওর অচৈতন্য দেহটা তোড়জোড় করে নিকটস্থ আর, জি, কর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ায় একটু স্বাভাবিক বিলম্ব হল। এ্যাম্বুলেন্সে উঠিয়ে দেওয়ার পর কৌতূহলী জনতা ওর দেহটা বারবার নিরীক্ষণ করেও আন্দাজ করতে পারল না বিভাসের প্রাণটুকু পারাপারের কোন দিকে।

এদিকে বিভাসের ফিরতে দেরী হচ্ছে দেখে উনুনের পাশে স্বামীর ভাত আগলে সাবিত্রী তখনও নীরব প্রতীক্ষায় বসে আছে।

যৌবনের প্রতি

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(সংস্কৃত শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে)

যৌবন, হায় কত দীর্ঘশ্বাস ফেলি এখন !
আজ তোর অভাব পাচ্ছি ঢের্ !
জানতাম কই আগে মূল্য তোর এত ভীষণ
রাতদিন দুখের টানছি জের ।
সম্ভোগ লিপ্সাতে চিত্ত যার সদা আকুল,
দুর্ব্বল দেহের কই সে-বল্ !
সিন্ধুর মাঝখানে বিন্দুজল পেতে ব্যাকুল,
চিৎকার অসার হয় কেবল !!
চক্ষের সম্মুখে দেখছি লোক কাঁদে ক্ষুধায়,
মৃত্যুই ঘুচায় সর্ব্ব দুখ ;
এক মুঠ্ ভাত দিয়ে কেউ তো আর নাহি শুধায়,
খুঁজছেন সবাই আত্মসুখ !
আহ্বান শুনবে কে, জাগবে আর কি রে মানব !
যৌবন আমার নাইরে নাই !
দুর্দ্দম দল বেঁধে লুঠছে সব কিছু দানব,
আজ ধূম দেখায় বঞ্চনাই !!
দেশ হয় খণ্ডিত লুব্ধদের প্ররোচনায়,
ফল তার ভীষণ ভুগছি আজ !
দুর্ভোগ দুর্দ্দশা বাড়ছে খুব মানবতায়
তণ্ডুল কোথায়, হায় কি লাজ !
যৌবন, দাও মোরে পূর্ব্বেকার সুখী জীবন
একলাই হাজার করতে কাজ !
সংশয় শঙ্কাতে রাত্রিদিন ভাবি এখন,
চিন্তায় মাথায় পড়েছে বাজ !!
একবার দাও যদি লুপ্ত তেজ দেহে আমার,
দুর্দ্দিন ঘুচাই দেশ জাতির ;
কলুষে দূর করি গুপ্ত দল গড়ি' আবার,
পুণ্যের বাড়াই হকখাতির !
মৃত্যুর শঙ্কাতে চৌর্য্য রইতো না মোটেই,
সংসার সুখের ঠিক হোতোই ;
দুর্লোভ জোচ্চোরি ভাগ্তো দেশ ছেড়ে বটেই;
জয় গাই তোমার নিশ্চিতই !!

আমাকে ডেকো না আর

মনোরমা সিংহরায়

আমাকে ডেকো না আর তোমার অমের অহঙ্কারে
বার বার দিয়েছ ফিরিয়ে। স্বতঃসিদ্ধ অবহেলা
সময়ের স্রোতে ভেসে যায় নি কথারা। অন্ধকারে
হীরক নিবাদ্দী দ্যুতি ছড়িয়ে জ্বলছে। ইন্দ্রনীলা
দুই চোখ তবুও ভুলি নি। তবুও তোমার কণ্ঠস্বর
বররুচি অনিন্দ্য বিলাসে চোখে নিয়ে আনে জল ॥
বসন্ত বিদায় নিয়ে বহুদিন হয়েছে বিলীন
তখন ডাকো নি তুমি। আজ এই মনোমুগ্ধকর
অতুল ঐশ্বর্য নিয়ে ডাকো যদি সে তোমার শুধু
অহঙ্কার। হৃদয় সেখানে হবে একান্ত নির্ভর
অন্তরে মমতা যদি থাকে কিছু শান্ত অমলিন ॥
তোমার করুণা জেনো আনবে না ফিরিয়ে সেদিন ॥

সন্তোষ

(Robert Green. 1560-1592)

শ্রীযতীন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য্য

মধুর হয় সে চিন্তা সন্তোষের স্বাদ যাতে রয়;
রাজমুকুটের চেয়ে শান্ত মন বেশী মূল্যবান্;
সে-রাত্রি মধুর হয় নিরুদ্বেগ ঘুমে ঢলে লয়;
ক্ষুদ্রবিত্ত ঘৃণা করে সৌভাগ্যের [illegible]।
এই তৃপ্তি, এই মন, এই নিদ্রা, আনন্দ মধুর
রাজপুত্রে নাহি পায়, ভোগ করে ভিক্ষুক আতুর
সাদাসিধে গৃহ যেথা আছে মহাশান্তির বিশ্রাম;
দেমাক্ অথবা চিন্তা যে কুটীর করে না প্রদান;
পল্লীগানে সর্ব্বাধিক যাহাদের পূরে মনস্কাম;
আমোদ, গানের সঙ্গী যাহাদের হয় প্রিয় প্রাণ,
আঁধার জীবন হয় সুগভীর আনন্দ-প্রতীক,
রাজা আর রাজ্য দুই-ই যাহাদের মন তুষ্ট ঠিক

এখনো বিকেল হয়

করুণাময় বসু

এখনো বিকেল হয়, ছবি আঁকা সোনার বিকেল,
পড়ন্ত রৌদ্রের রঙে তুলি টেনে আঁকে রঙ ছবি
প্রাচীন মন্দির গায়ে, ভাঙাচোরা বিবর্ণ দেয়ালে,
লতার দুরন্ত ফুলে, পুষ্পরঙ্গ চম্পা, দূর্বাবনে।
আশ্চর্য আলোর রঙে প্রত্যহের উজ্জ্বল প্রভায়
দিনান্তের শেষ লগ্নে হৃদয়ের বালিপাড় ভেঙে
পাখিদের ডেকে আনে, ডেকে আনে শান্ত আকাশের
শেষ আলো-সমুদ্রের একমুঠো রঙের অঞ্জলি।
এই রঙ ছবি হয়, স্বপ্ন হয়, মুক্তা হয়ে ফোটে
শিল্পের অতীতলোকে সৌন্দর্যের শুভ্র চেতনায়
কল্পনার স্বপ্ন স্বর্গে;
বেলাশেষে পদ্মকুঁড়ি বনে
মৌমাছির শেষ মন্ত্রপাঠ স্তব্ধতার নম্রস্তবে।
ঝরা পাতা গান গায়, কান পেতে শোনে শূন্য মাঠ,
ফসলের শেষ আঁটি ঘরে গেছে, ক্লান্ত পথ একা।
আমার মৌমাছি-মন এইবার শ্রান্ত পাখা বোজে
অসীম নির্জন নীড়ে দুরাশার দূর যাত্রা শেষে;
হেমন্তের পীত রৌদ্রে বাসাভাঙা তানপুর, সেই সুর
ঠোঁটে নিয়ে চলে গেল দূর দেশে নীলকণ্ঠ পাখি।

কচুরি পানা

সুধীর গুহ

ফুলন্ত কচুরিপানা বেগনী বর্ণের
অফুরন্ত পুষ্প-ভারে ভরে পল্লী বিল।
ঢেকে দেয় সমারোহে সব [illegible]।
[illegible] উৎবর্ণ [illegible]
আনন্দ-বর্দ্ধন করে। স্ফটিক পর্ণের
স্নিগ্ধ [illegible] মতো ঢাকা তরল সলিল
[illegible] পত্র-ফাঁকে [illegible]
[illegible] স্পর্শ অসীমের [illegible] স্বর্গের।
এদের আগাছা ভাবি' হেলা করে সবে।
ত্যাজ্য কচুরির তবু গ্রাম্য পরিবেশ
পরিপূর্ণ ক'রে রাখে যৌবন-বৈভবে।
সন্তোষে এরা যে যোগায় সৌন্দর্য্য-সন্দেশ।
মানুষের স্বার্থ-দুষ্ট বিচারে কী হবে!—
সৃষ্টি লীলা অনির্বাচ্য-অনিন্দ্য-অশেষ।

সাময়িক পত্রসেবায় অবিনাশচন্দ্র দাস

হারাধন দত্ত

উনিশ শতকের বাংলাসাহিত্যের যে অভিনব জাগরণতা কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রচেষ্টার ফল নয়—নব্যশিক্ষিত জিজ্ঞাসা-মুখর বাঙালীর সাবিক প্রচেষ্টার ফল। সে যুগের বাণীর সেবীদের সর্বাংগীন পরিচয় আজও উদ্ঘাটিত হয়নি। অবিনাশচন্দ্র দাস গতযুগের এমনই একজন সাহিত্যিক ব্যক্তি।

অবিনাশচন্দ্রের সাহিত্যিক মানসপ্রবণতা গড়ে উঠেছিল উনিশ শতকের আলো বাতাসে যদিচ তাঁর জীবন ও অনাবাস-লেখনী বিশের শতকের তিরিশের দশক পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। অবিনাশচন্দ্রের আবির্ভাব, শিক্ষা, মানসিক প্রস্তুতি ও সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়াস সবই সম্পন্ন হয় বিগত শতকের শেষার্দ্ধে। তখনও জাগরণের রাগরক্ত মুছে যায়নি বরং যুগপ্রবৃত্তি অনেকাংশে জিজ্ঞাসা ও যুক্তি-পন্থা পরিত্যাগ করে উন্মাদনা ও আবেগের বন্যাবেগে উতরোল। উনিশ শতকের জাগরণ বিশেষতঃ যুগের দ্বিতীয়ার্দ্ধ নব্যহিন্দু সংস্কৃতির পুনরুত্থান কাল বলে চিহ্নিত করা যায়। স্বাজাত্য সংস্কৃতির প্রতি প্রগাঢ় নিষ্ঠাই অবিনাশচন্দ্রের কালের বৈশিষ্ট্য। যদিও ব্রাহ্ম সম্প্রদায়-ভুক্ত ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ বাঙালীর মানস-জাগৃতির ক্ষেত্রে নব নব বীজ বপন করেছিলেন—তৎসত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র কেশবচন্দ্র-রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-বি জ য় কৃ ষ্ণ গোস্বামী সকলেই হিন্দুর চিরকালীন সত্তাটিকে বাঙালীর চিত্তলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অবিনাশচন্দ্র ছিলেন এই নবজীবন প্রত্যয়ের মুক্ত উপাসক।

সেকালের সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির মধ্যে যুগের চিত্ত বিস্ফোরক শক্তি নিহিত থাকতো। বাঙালীর চিত্তজাগরণের উৎসবে সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি নতুন জীবনচেতনার মশাল ধরেছিল। যুগের বিবিধ ভাব-দ্বন্দ্ব-ধর্ম-সমাজশিক্ষার বাত্যাবিক্ষুব্ধ ঘাত-প্রতিঘাত এবং স্বাধীনতার প্রলয়ঙ্কর উন্মাদনা পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল। বস্তুত সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যেই বাঙালী পরিবর্তিত মানসজীবনের পূর্ণ প্রতিফলন ঘটল। অবিনাশচন্দ্র উপন্যাসিক-গল্পলেখক-কবি ও নাট্যকার। তিনি আরও উল্লেখ্য মননশীল প্রবন্ধলেখকরূপে ও বেদজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সর্বজ্ঞ গবেষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি দেশের সীমা অতিক্রম করেছিল। এতৎ সত্বেও তাঁর সাময়িক পত্রসেবার দিকটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সাময়িক পত্রসেবা তাঁর সাহিত্যসাধক-জীবনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ অধ্যায়। অবিনাশচন্দ্রের সাময়িক পত্রসেবার দিকটি বক্ষমান আলোচনায় বিবেচ্য।

কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী সাহিত্যের কৃতিছাত্র অবিনাশচন্দ্র, এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যাপক অবিনাশ চন্দ্র Rigvedic India নামক গ্রন্থে মৌলিক গবেষণার জন্য পি এইচ ডি লাভ করেন। ইংরেজী-বাংলা-সংস্কৃত এই সব বিদ্যাতে তিনি ছিলেন পারঙ্গম। ইংরেজী এবং বাংলা এই উভয় ভাষাতে তিনি প্রায় পঁচিশখানির মত গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। পত্র-পত্রিকায়, বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে—তাঁর এমন ইংরেজী এবং বাংলা রচনার সংখ্যা অগণিত কিন্তু অবিনাশ চন্দ্রের সাহিত্যিক চেতনার স্ফুরন ঘটে সাময়িক পত্রকে

অবলম্বন করে। বেশ কয়েকখানি সাময়িক পত্রের সম্পাদনা বিভাগে নিযুক্ত থেকে তিনি দেশ কাল ও যুগ-প্রবৃত্তির যথার্থ সাহিত্যিক ব্যক্তিরূপে আত্মঘোষণা করেন। গ্রন্থ-প্রণেতারূপে আবির্ভাবের আগেই তিনি সেকালের প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রগুলির সংস্রবে আসেন। আবার পরিণত বয়সেও তিনি পত্রিকা সম্পাদনা ও পত্র-পত্রিকায় রচনাদি প্রকাশ করে সাময়িক পত্র-পত্রিকা নিষ্ঠ সাহিত্যক-চেতনা অক্ষুণ্ণ রাখেন।

অবিনাশচন্দ্র পাটনা কলেজ থেকে ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন ১৮৮৮ সালে। এই সময় থেকেই ছাত্রব্রত উদ্‌যাপনের জন্য তিনি কোলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। এম. এ. (ইংরেজী) ও 'ল' পাশ করলেন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে। তখন দেশের নবজাগৃতি মানুষের কাছে নতুন দিগন্তের সংবাদ বহন করে এনেছে। মাইকেল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র এবং রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি মনস্বী বাঙালী সাহিত্য-চিন্তা ও ভাবের জগতে বিপুল আলোড়ন এনেছেন। রাষ্ট্রচিন্তা-সমাজচিন্তা ও ধর্মচিন্তার চিরাভ্যস্ত সংস্কারের ভিত পড়েছে ধসে। হাওয়া বদলের যুগ। সেই সময়েই প্রচারিত পত্র-পত্রিকাগুলি যেন চিত্ত-জাগরণের প্রদীপ্ত মশাল। সাময়িক পত্র-পত্রিকার মধ্যে বাংলা দেশের হৃদ্‌স্পন্দন অনুভব করা যাচ্ছে। এই যুগচাঞ্চল্যের মধ্যে-অবিনাশচন্দ্র সাময়িকপত্রের লেখকরূপে দেখা দিলেন।

১৮৮২ সালের প্রথম দিক থেকে অবিনাশচন্দ্র লেখা শুরু করেন। সমকালীন বাংলা কবিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশের বাণী খুঁজে পেলেন তিনি। অবিনাশচন্দ্রের বয়স তখন পনের। তাঁর পরবর্তী 'গাথা' কাব্যখানির সূচনা এই সময় থেকে। ১৯০৭ সালে কাব্যখানি প্রকাশিত হলেও-১৬৭পৃষ্ঠার এই কাব্যগ্রন্থে ১৮৮২ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে লিখিত অনেক কবিতা বিধৃত হয়েছে। এই গ্রন্থের অনেক কবিতা ধর্মবন্ধু, দাসী, প্রদীপ, নব্যভারত, ভারতী, প্রবাসী, প্রভৃতি পত্রিকায় আত্মপ্রকাশ করেছিল। সাময়িকপত্রকে অবলম্বন করেই তাঁর জাগ্রত সাহিত্যচেতনা চরিতার্থ হয়। এর আগেই ১২৯৭ সালে তাঁর অপূর্ব গদ্য গ্রন্থ "সীতা" প্রকাশিত হয়। শুধু বাংলা সাহিত্যের সেবকরূপেই নয়—ইংরেজী বিদ্যার ক্ষুরধার অবিনাশচন্দ্র ছাত্রজীবনেই সাময়িক পত্র-পত্রিকার সংস্রবে আসেন, আর সে যুগে বাংলা অপেক্ষা ইংরেজীর মধ্যেই যেন আত্মপ্রকাশের পথ সহজ ও তীর্থক হয়ে দেখা দিয়েছে। ১৮৯০ থেকে তিনি বিভিন্ন ইংরেজী পত্র-পত্রিকায় কখনও স্বনামে কখনও বা Indian Graduate, A Hindu, ;Onlooker প্রভৃতি ছদ্মনামে অনর্গল লেখনী চালিয়ে গেছেন। ইংরেজী সাময়িক পত্রগুলিতে তাঁর প্রথমদিকের রচনা সমূহ ছিল পত্রাশ্রয়ী—বিষয়বস্তুতে কোন সীমাবদ্ধতা ছিলনা। উত্তরকালে সাহিত্যসাধক অবিনাশচন্দ্রের প্রসার পরিধি সীমারেখা না মানার কারণও তাঁর প্রথম লেখকজীবনের ভিত্তি। সাময়িক পত্র সেবা তাঁর কর্মজীবনে ও নেশা ও পেশা, জীবনও জীবিকা হিসাবে দেখা দিয়েছিল। এবিষয়ে তাঁর পথপ্রদর্শক হয়ে এলেন The Bengalee" সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং Indian Mirror সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন। এঁদের উত্তপ্ত বহ্নিকণাস্পর্শে অবিনাশ চন্দ্রের প্রাণশক্তি অগ্নিময় হয়েছিল।

বাস্তবিকই অবিনাশচন্দ্রের জীবন গঠনে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং 'মিরর' সম্পাদক নরেন্দ্র-নাথ সেনের প্রভাব অসীম। ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক চেতনায় দিগ্বিজয়ী সেনাপতি, সংবাদপত্রসেবী, খ্যাত-কীর্তি অধ্যাপক, বাগ্মী ও লেখক হিসেবে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন তৎকালীন ভারতের যুগপুরুষ। Indian Mirror এর নরেন্দ্রনাথ সেন ছিলেন সেকালের একজন গণণীয় ব্যক্তি। অবিনাশচন্দ্র অচিরে এই দুই বঙ্গ মনীষীর সংস্রবে আসেন। তিনি Bengalee ও Indian Mirror এর লেখক শ্রেণীভুক্ত হয়ে পড়েন। ১৮৯২ সালের দিক থেকে অবিনাশএই দুই পত্রিকায় নিয়মিত লেখক ছিলেন। Indian Mirror একটু নরমপন্থী কাগজ ছিল। রাজ-নৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে অবিনাশচন্দ্র প্রথমদিকে ছিলেন উগ্রপন্থী; পরিশেষে অবিনাশচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের মতাদর্শী হয়ে ওঠেন। নরেন্দ্রনাথের নির্দেশ অনুসারে তিনি

'মিরারের' জন্য প্রবন্ধাদি লিখতে থাকেন। এসময়ে তাঁর কর্মক্ষেত্র ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জে।

১৮৯৪ সাল থকে অবিনাশচন্দ্র Indian Mirror ও Bengaleeর বিভাগীয় লেখকরূপে কাজ করে চলেছিলেন। এসময়ে তাঁর রচনাগুলো নামযুক্ত হয়ে ছাপা হোত না। কদাচিৎ দু-একটি রচনায় তাঁর নাম থাকতো। ক্রমে Indian Mirrorকেই তিনি সর্বশক্তি দিয়ে সেবা করতে থাকেন। ঠিক এই মুহূর্তে বাঙালীর রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা অগ্নিবিভায় বিভাসিত হয়ে উঠল। এল বঙ্গভঙ্গ। সুরেন্দ্রনাথ, বিপিনচন্দ্র, অরবিন্দ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তখন বাংলাদেশে যে স্বদেশী আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন অবিনাশচন্দ্র ছিলেন তার নিঃশঙ্ক সমর্থক। স্বাভাবিক কারণেই দেশহিতৈষী সংবাদপত্রগুলির দায়িত্ব গেল বেড়ে। Indian Mirror সে সময়ে দেশ ও জাতির মর্মবেদনার বার্তাবাহী হিসেবে দেখা দিল। অবিনাশচন্দ্র 'মিররের' সংগে দীর্ঘকাল গভীরভাবে যুক্ত থাকলেও পত্রিকা সম্পাদনার গুরুদায়িত্ব এতদিন গ্রহণ করেননি। যদিও সাময়িকী ও সম্পাদকীয় তিনি নিয়মিত লিখেছেন। ১৯০৫ সালের সেই বিক্ষুব্ধ বাংলাদেশে অবিনাশচন্দ্র Indian Mirror পত্রিকার সহসম্পাদক পদে বৃত হলেন। সংবাদপত্র সেবার গুরুদায়িত্ব নিলেন। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত তিনি Indian Mirrorএর সহ-সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ শারীরিক পীড়িত থাকায় সম্পাদকের পূর্ণ দায়িত্বও অবিনাশচন্দ্রকে পালন করতে হোত। Indian Mirror-এর সম্পাদক নরেন্দ্রনাথ সেন মহত্ব ও চরিত্র গৌরবের জন্য অবিনাশচন্দ্রের হৃদয় স্পর্শ করেছিলেন। নরেন্দ্র-নাথের সংগে তাঁর অন্তরঙ্গতা-সম্পর্কও কৃতজ্ঞতার বিশদ বিবরণ দিয়ে তিনি একাধিক প্রবন্ধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।(১)

রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের Bengalee পত্রিকার সংগে তাঁর অন্তরঙ্গ সংস্রবের কথা আগেই বলেছি। Bengalee পরিচালনার ব্যাপারে সুরেন্দ্রনাথও অবিনাশচন্দ্রের উপর নির্ভর করতেন। ১৯০৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ শারীরিক পীড়িত হয়ে পড়ায় Bengalee সম্পাদনার সম্পূর্ণ দায়িত্ব তিনি অবিনাশচন্দ্রের উপর অর্পণ করেন। Bengalee-র সহ-সম্পাদকরূপে তিনি দেড় বৎসরকাল দক্ষতার সংগে পত্রিকা সম্পাদনা করেন। অবিনাশচন্দ্র নিজেই লিখেছেন—"১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মে ও জুন মাসে সুরেন্দ্রনাথ যখন অসুস্থ হইয়া দীর্ঘকাল শিমুলতলায় বাস করিতেছিলেন সেই সময়ে এই প্রবন্ধ লেখককে তাঁহার দৈনিক ইংরেজী পত্রের জন্য সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিবার ভারার্পণ করিয়াছিলেন, তাহা কৃতজ্ঞতার সহিত তিনি স্মরণ করিতেছেন।" (২) এই প্রবন্ধেই অবিনাশচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে গভীরতর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছেন।

উনিশ শতকের শেষপাদে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ সেন এই দুইজন বরেণ্য সংবাদপত্রসেবীর পদতলে বসে অবিনাশচন্দ্র পত্রিকা সম্পাদনার পাঠ গ্রহণ করেন। বিংশ শতকের প্রথম দশকে অর্থাৎ ১৯০৪ ও ১৯০৫ সাল থেকে দুখানি ইংরেজী দৈনিকের সহকারী সম্পাদকের পদ অলঙ্কৃত করে তিনি সাময়িকপত্রসেবী জীবনের যাত্রা ঘোষণা করেন। বঙ্গভঙ্গের সময় তিনি নিজেই একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পত্র সম্পাদনা সুরু করেন। এই সময় নরেন্দ্রনাথ সেনের প্রেরণায়, ২৪নং মির্জাফর্‌লেনে "স্বদেশ প্রেস" প্রতিষ্ঠা করেন। অবিনাশচন্দ্র এই মির্জাফর্‌লেনের (বর্তমান কলেজ রো) বাসভবনে দীর্ঘকাল কোলকাতায় জীবন অতিবাহিত করেন। ১৯১০ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েও এখানে বসবাস করতেন। অবিনাশচন্দ্র সম্পাদিত এই পত্রিকা দুখানির নাম "গন্ধবণিক" ও "স্বদেশ"।

বঙ্গভঙ্গের সময় অবিনাশচন্দ্র 'স্বদেশ' নামক বাংলা সাপ্তাহিক পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। 'স্বদেশ' পত্রিকা-খানি নিয়মিত প্রকাশের জন্য তিনি 'স্বদেশ প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। ১৩১২ সালের ২০শে কার্তিক সাপ্তাহিক 'স্বদেশের' প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। স্বদেশী আন্দো-লনের সেই যুগে দেশ ও জাতিকে স্বদেশীভাবনায়

উদ্বুদ্ধ করাই ছিল, 'স্বদেশের' লক্ষ্য। তদানীন্তন বাংলার রাজনৈতিক চিন্তার জগতে উগ্রপন্থী ও উদার পন্থী দুটি দল ছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত পত্র পত্রিকা—বিশেষ করে 'সন্ধ্যা' নামক দৈনিক পত্রখানি উগ্রপন্থার পরিপোষণ করেছিল। নরেন্দ্রনাথ সেনের প্রভাবে অবিনাশচন্দ্র তখন চরম পন্থী পথ পরিহার করে নরমপন্থা অনুসরণ করেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর একান্ত শ্রদ্ধাভাজন। স্বদেশের পিছনে সুরেন্দ্রনাথের সহানুভূতি ছিল। সাপ্তাহিক স্বদেশের উদ্দেশ্যের কথা বলতে গিয়ে সম্পাদক অবিনাশচন্দ্র প্রথম সংখ্যাতেই বলেছিলেন "এক কথায় যাহাতে একখানি মার্জ্জিতরুচি, জাতীয় ভাবোদ্দীপক, লোকশিক্ষাবিধায়ক সর্ব্বাঙ্গসুন্দর, উচ্চশ্রেণীর সাপ্তাহিক সংবাদপত্র গৃহে গৃহে সাদরে পঠিত হইতে পারে, তাহারই চেষ্টা করা এই পত্র পরিচালকগণের প্রধান উদ্দেশ্য।"৩

দেশের অমঙ্গল নিবারণের জন্য অবিনাশচন্দ্র 'স্বদেশ' নামক বাংলা সাপ্তাহিক খানি প্রকাশ করেন। কিন্তু তখন সাধারণের মধ্যে বিপ্লবভাবের যে প্রবল বন্যা নেমে এসেছিল তার প্রতিরোধ করার শক্তি 'স্বদেশের' মত সাপ্তাহিক পত্রের ছিলনা। প্রায় পনের মাস কাল পত্রিকাখানি জীবিত থাকে, অবশেষে সম্পাদকের অসুস্থতার জন্য পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। স্বদেশ পত্রিকা সম্পাদনায় অবিনাশচন্দ্র অনন্য সাহিত্যব্রতী ও সাময়িক পত্রসেবী রূপে দেখা দেন। একই সংগে চারখানি পত্রিকার সম্পাদনা-বিভাগে নিরত থেকে অনর্গল লেখনী চালনা করেন। এই স্বল্পস্থায়ী পত্রিকাখানিতে তিনি বিপুল সংখ্যক লেখকের সমাবেশ করে তোলেন।

স্বদেশ পত্র প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে বাংলাদেশের সুধীসমাজ পত্রিকাখানিকে অভিনন্দিত করে। Indian Mirror, Hindu-patriot, Indian Messenger, The Bengalee, The Telegraph, Englishman, Unity and Minister, সময়, মানভূম, বীরভূম বার্ত্তা, পল্লীবাসী, প্রভাত, কাশীপুর নিবাসী, হাওড়া-হিতৈষী, রত্নাকর প্রভৃতি পত্র পত্রিকা সাপ্তাহিক 'স্বদেশ' পত্রিকাখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে উচ্ছসিত প্রশংসার অঞ্জলি নিবেদন করে। Indian Mirror পত্রিকাখানি দীর্ঘ সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিল—"This is just the sort of journal which every lover of the country and the Bengali language ought to cherish and patronize. We specially recommend it to our young men and women who have hither to been sadly in need of a respectable vernacular weekly paper. The name of Babu Abinash Chandra Das M.A.B.L, the well-known author of Sita and Palasban etc, who has taken up the editorial charge, is a sure guarantee that the journal will never degenerate into a disreputable print."৪

সাপ্তাহিক 'স্বদেশ' সম্পাদনার পর অবিনাশচন্দ্র পুনরায় পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ করেন, এ ১৯১০ সালের কথা। এবারে রাজনীতির আবর্ত থেকে তিনি সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারের দিকে দৃকপাত করলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে প্রেরণা যোগালেন পরমহংসদেব শ্যামাপ্রসন্ন। ১৯০৯ সালের অক্টোবর মাসের দিকে শ্যামাপ্রসন্ন দেব বাঁকুড়ায় আগমন করেন। অবিনাশচন্দ্র বাঁকুড়াবাসী হিসাবে অচিরে তাঁর সান্নিধ্য লাভ করলেন পরমহংস দেব সেকালের সেই তরঙ্গক্ষুব্ধ ভাবান্দোলনের বাংলা-সনাতন হিন্দুধর্ম প্রচারে মনোনিবেশ করেন। তিনি বাঁকুড়া শহরে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। তিনি ছিলেন উদারপন্থী বাঙালী ধর্মগুরু। হিন্দু—মুসলমান—খ্রীষ্টান—বৌদ্ধ-জৈন সব সম্প্রদায়ের লোককেই তিনি সমদৃষ্টিতে দেখতেন। ব্রহ্মচর্য ও অহিংসার প্রচারকার্যে তিনি আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। বেদের পঠন পাঠন ও মহাত্ম্য প্রচারে তিনি ছিলেন নিরলস; তিনি নিঃসন্দেহে সেকালের একজন বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। দেশের যুবক ও তরুণ শিক্ষার্থী সমাজে বেদশিক্ষা যাতে প্রচারিত হতে পারে সেজন্য

তিনি ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বেদবিদ্যালয় স্থাপনে পরম উৎসাহী ছিলেন। তখন বংলাদেশে দয়ানন্দ সরস্বতীর বেদধর্মের তরঙ্গাঘাত ঘটেছে—লোকমান্য তিলক Orion or Researches into the Antiquity of Vedas এবং the Arctic home in the Vedas প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশের দ্বারা বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন। রমেশচন্দ্র প্রমুখ কৃতবিদ্য বহু মনীষীগণ বাংলায় বেদ-চর্চার একটা আদর্শ স্থাপন করেছেন। অবিনাশচন্দ্রের মানসক্ষেত্র বেদের দিব্য আলোকে পূর্ব থেকে আলোকিত হয়েছিল। শ্যামাপ্রসন্ন দেবের সংস্পর্শে এসে তা অগ্নি-শিখায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল—এর একটি স্ফুলিঙ্গ "সনাতনী" নামক পত্রিকার প্রকাশ। অবিনাশচন্দ্র পরবর্তী জীবনে ঋকবৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রবক্তারূপে যে আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেন সেই ঋকবৈদিক চেতনার দৃঢ়মূল ভিত্তি স্থাপিত হয় এই সময়ে। বৈদিক পণ্ডিতরূপে অবিনাশচন্দ্রের আত্মঘোষণার মূলে পরমহংস শ্যামাপ্রসন্ন দেব ও তৎপ্রভাবিত সনাতনীর প্রভাব নির্বিবাদ। 'সনাতনীর' ফাইল সম্ভবতঃ আজ দুষ্প্রাপ্য, তথাপি অনুমান করা যায় এই পত্রিকাখানির প্রকাশ ঘটে ১৯১০ সালে। এই সময়ে Indian Mirror এ শ্যামাপ্রসন্ন দেবের উপর একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধ দেখা যায়। সেই রচনায় সনাতনীর প্রসঙ্গ বিদ্যমান। Mirror পরমহংস দেব সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনাকালে মন্তব্য করে লিখেছিল—

In order that his teachings might be widely read, he has been issuing a monthly magazine in Bengali, under the name of "Sanatani" the first two numbers of which are lying on our table. The Paramhansa Dev has secured the services of Babu Abinash Chandra Das M.A.B.L., the well known scholar and author, to edit the magazine, and the selection made by him is exceedingly happy.···The first two number of 'Sanatani' lying before us, bristle over with many interesting readings in matters spiritual and social, The then articles breath a sprit of tolerence and Catholicily, and some of them contain practical hints and suggestions for spiritual culture. We have no doubt that the magazine will remove a long felt want from the country.

অবিনাশচন্দ্র দাস যে সকল পত্রিকার সহ সম্পাদক ও সম্পাদকরূপে সাময়িক পত্র সেবা করেছেন নিম্নে তার একটি চিত্র দেওয়া গেল।

সহ-সম্পাদকরূপে

১। The Beangalee (১৯০৪ সালের মে মাস থেকে অক্টোবর ১৯০৫)

২। The Indian Mirror (১৯০৫ থেকে ১৯১০)

সম্পাদকরূপে

১। [illegible] (মাসিক) (১২৯৯) সাল থেকে। অন্য তথ্য জানা নেই)

২। স্বদেশ (সাপ্তাহিক) ১৩১২, ২০শে কার্তিক থেকে মাঘ, ১৩১৩)

৩। সন্দর্শক (মাসিক) (১৩১২, বৈশাখ থেকে চৈত্র ১৩১৯, পরে ১৩২৮ মাঘ থেকে ভাদ্র ১৩৩৩ পর্যন্ত)

৪। সনাতনী (মাসিক) ১৯১০ থেকে। অন্য তথ্য জানা নেই।

সম্পাদকরূপে অবিনাশচন্দ্রের সাময়িক পত্রসেবী জীবনের কথঞ্চিৎ উপস্থিত করা গেল। কিন্তু এই বিবরণ তাঁর সাময়িক পত্রসেবী জীবনের যথার্থ পরিচয় নয়। তিনি তাঁর সমকালীন বাংলাদেশের তাবৎ পত্র-পত্রিকার বিশিষ্ট লেখকরূপে দেখা দিয়েছিলেন; এই সমস্ত বিচিত্রমুখী পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে তৎকালীন বাঙালীর যুগজিজ্ঞাসা চরিতার্থ করার জন্য অজস্র লিখেছেন। কবিতা গল্প উপন্যাস-নাটক মননশীল প্রবন্ধ—সাহিত্য-কলার সর্ববিষয়েই তাঁর অনায়াস দক্ষতা ছিল। বিশেষ

করে মননশীল ও গবেষণাধর্মী প্রবন্ধের ক্ষেত্রে অবিনাশচন্দ্র একটি বিশিষ্ট নাম। ইংরেজী ও বাংলা ভাষাতে তিনি ২৫ খানির মত গ্রন্থ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাঁর সাহিত্য-কর্মের বিপুলতম অংশ পত্র-পত্রিকার মধ্যেই বিক্ষিপ্ত রয়ে গেছে। সেই সমস্ত রচনার সংগ্রহ বর্তমানে খুবই শ্রমসাধ্য। বর্তমান লেখকের ধারণা তাঁর এই বিপুল সংখ্যক প্রবন্ধ রাজির একটা যথার্থ সূচি তৈরী হলে কিংবা এগুলি গ্রন্থরূপে প্রচারিত হলে সাহিত্যক্ষেত্রে বহু চারিতায় মুখর একজন বাঙালী সাহিত্যিক ব্যক্তিত্বের যথার্থ পরিচয় মিলবে। তিনি সেকালের অসংখ্য পত্র-পত্রিকায় লিখেছেন। আজ তার সামগ্রিক পরিচয় উদ্ধার করাও বোধ হয় কঠিন। তথাপি ধর্মবন্ধু, দাসী, প্রদীপ, নব্যভারত, প্রবাসী, ভারতী, বঙ্গদর্শন, সাহিত্য বসুমতী, ভারতবর্ষ, প্রবর্তক, পন্থা, ভারতের সাধনা, হিন্দুমিশন, ভারতমহিলা, বাঁকুড়াদর্পণ, গন্ধবণিক, Modern Review, Calcutta Review, Journal of the Department of letters (c. n), Monthly Indian Messenger, Englishman, Amritabazar, Hope, Unity and Minister, প্রভৃতি পত্র পত্রিকায় তাঁর বহুবিধ রচনা প্রকাশিত আছে। তদুপরি যে সব পত্রিকাগুলির সংগে তিনি সম্পাদনা কর্মে জড়িত ছিলেন সেগুলিতেও তাঁর বিপুল-সংখ্যক রচনা বিক্ষিপ্ত আছে। Indian Mirror ও স্বদেশ' পত্রিকার তাঁর লিখিত রচনারাজির কিছু উদ্ধার করেছি। গন্ধবণিকে প্রকাশিত তাঁর যাবৎ রচনার একটি সূচী প্রণীত হয়েছে। অন্যান্য পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর কিছু কিছু রচনার তালিকা প্রস্তুত করা সম্ভব হয়েছে। বাস্তবিকই অবিনাশচন্দ্রের সাহিত্যসাধক-জীবনের যথার্থ পরিচয় উদ্ঘাটন করতে গেলে সাময়িক পত্র সেবী অবিনাশচন্দ্রের ঘটনাদীপ্ত জীবন একটা গুরুত্ব-পূর্ণ অধ্যায়রূপে বিবেচিত হবে।

১। (ক) স্বর্গীয় নরেন্দ্রনাথ সেন। বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৩১৮

(খ) মহাত্মা নরেন্দ্রনাথ সেন, গন্ধবণিক আশ্বিন ১৩৪২

২। মহারথী সুরেন্দ্রনাথ। গন্ধবণিক শ্রাবন ১৩৩২

৩। স্বদেশ, ২০ শে, কার্তিক, ১৩১২

৪। Indian Mirror. 9th nov. 1905

৫। Paramhansa, Shama Prasanna Deb and the Sanatani Dharmasram of Bankura(editorial) The Indian Mirror. April 23. 1910

যন্ত্রযুগ ও কবিতা

অনিলকুমার রায়

এযুগে বিজ্ঞান ও টেক্নোলজির চোখ ধাঁধানো সাফল্য মানুষের চিন্তার রাজ্যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দিয়েছে। রকেটে চ'ড়ে আমরা চাঁদে পাড়ি দিচ্ছি, কম্পিউটার দিয়ে হাজার মানুষের কাজ নিখুঁতভাবে বিস্ময়কর অল্প সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করছি—আরাম আর স্বাচ্ছন্দ্যের সব রকম আয়োজন হাতের কাছেই। নতুন নতুন চমকপ্রদ আরো কত কিছু ঘটে চলেছে আজকের দুনিয়ায় যা দেখে আমরা কখনো বিস্মিত, কখনো মুগ্ধ। ব্যবহারিক জীবনে বর্তমান সভ্যজগতে যন্ত্র অপরিহার্য্য। স্বাভাবিকভাবেই আমরা জীবিকার সন্ধানে যন্ত্র বা মেসিনের চার পাশে ঘুরপাক খাচ্ছি। কারণ, রুটী রোজগারের জন্ম মেশিনের উপর নির্ভর করাটাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে বিবেচিত। তাই কবিতা লেখার চেয়ে বরং মোটরের পার্টস্ তৈরী করার কৌশল শিখতে পারলে নিজেকে বেশী ভাগ্যবান ভাবা যায়। এ যুগের অধিকাংশ লোকের ধারণায়, কবিতা লেখা আসলে অলস ব্যক্তির ভাবনা-বিলাস বা মূল্যবান সময় ও মস্তিষ্কের অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। অনেকেই ভাবেন, বিজ্ঞান ও টেক্নোলজির অগ্রগতির যুগে কবিতার কোন স্থান নেই।

একথা আজ অনস্বীকার্য যে এত যান্ত্রিক ও বৈষয়িক অগ্রগতির যুগেও মানুষের ব্যক্তিজীবন ও সমাজজীবনে সমস্যা বেড়েছে অনেক। সামগ্রিকভাবে সমাজের উপরে বিজ্ঞানের শুভ প্রভাব যতটুকু পড়া বাঞ্ছনীয়, সবক্ষেত্রেই ততটুকু এসে পড়েনি এখনো। সাধারণ মানুষের অর্থ ও শ্রম নিয়োজিত হচ্ছে এমন কতকগুলি ক্ষেত্রে যার ইমিডিয়েট সুফললাভে সে বঞ্চিত। রকেট আর কম্পিউটার সাধারণ মানুষের মনে যেমন এনেছে বিস্ময়, তেমনি এনেছে সন্দেহ। সমাজের বিভিন্ন স্তরে দেখা দিয়েছে সন্দেহ, বিক্ষোভ ও ছাত্র অবিশ্বাস আর নানা রকম দ্বন্দ্ব। শ্রেণী সংগ্রাম, বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদের সংঘাত বিক্ষোভ ও ছাত্র অশান্তির মধ্য দিয়ে দৈনন্দিন জীবনের যে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে চারদিকে, তা জীবনযন্ত্রণার এক অনিবার্য্য প্রকাশ। যন্ত্রবিজ্ঞানের যে অগ্রগতির দিকে তাকিয়ে আমরা মুগ্ধ হচ্ছি, তা কিন্তু এই জীবনযন্ত্রণাকে এতটুকু প্রশমিত করতে পারেনি। যদি তা পারত, যে সব দেশ বিজ্ঞানে এত এগিয়ে সে সব দেশেও সমাজজীবনের অস্থিরতা এত প্রকট হয়ে উঠত না। একবার তাকিয়ে দেখুন ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি অগ্রগামী দেশের দিকে। সামাজিক অস্থিরতার অবশ্যম্ভাবী ফল হল নৈতিকতার অপমৃত্যু, যার বলি হিপি-বিটলে-মস্তানরা।

মানুষ যেন আজ দিশেহারা। কি তার উদ্দেশ্য, কোথায় সে চলেছে কিছু সে জানে না। কিন্তু কেন এ বিভ্রম? সে তার নিজের সত্তাকে হারিয়ে ফেলেছে। হয়ত তার লক্ষ্যহীনতার মূল কারণ তাই। হারিয়ে যাওয়া সেই সত্তাকে ফিরে না পাওয়া পর্য্যন্ত সে থাকবে লক্ষ্যহীন ও লক্ষ্যভ্রষ্ট। বিজ্ঞানের দেওয়া যন্ত্র তিলে তিলে তার আত্মাকে হনন ক'রে সেই লক্ষ্যভ্রষ্টতার করুণ পরিণতির সহায়ক হয়েছে।

কবিতা মানুষের সেই হারিয়ে-যাওয়া সত্তাকে ফিরিয়ে দিতে পারে। লক্ষ্যহীনতা ও বিভ্রমের ঘূর্ণিপাক থেকে তাকে তুলে এনে কাঙ্খিত জীবনের পথের সন্ধান দিতে পারে। কবি দ্রষ্টা, কবি স্রষ্টা, কবি সাধক। শব্দ, অর্থ আর কল্পনা দিয়ে তিনি যে অপূর্ব কর্ম সৃষ্টি করেন, তার মাধ্যমে তিনি বিশ্বস্রষ্টার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার সাধনা করেন। বিশ্বস্রষ্টা তাঁর

সৃষ্টির মধ্যে সমস্ত বিশ্বে বিলীন হয়ে আছেন এক অদৃশ্য বিরাট সত্তারূপে। কবিতা (যা আসলে একটা ধর্ম, যার কোন বিষয়বস্তু নেই। এই বিশ্বসত্তার সঙ্গে মিলিত হওয়ার মাধ্যম ও মিলনভূমি দুই-ই। পাঠক মাধ্যম ও মিলনভূমিকে এক করে প্রত্যক্ষ করে। কবিতায় বিশ্বসত্তার সঙ্গে কবির ব্যক্তিসত্তার একাত্ম হতে দেখে পাঠক নিজেও তার সত্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে ও বিশ্বসত্তায় লীন হতে চায়। কিন্তু কবির পক্ষে যা সম্ভব, পাঠকের পক্ষে তা সম্ভব নয় যদি না সে সাধক হয়। তবুও, এই সদা-সচেতনতা পাঠককে তার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। জীবনের সেই লক্ষ্যের পৌঁছানোর জন্য সে তাই সদা সতর্ক পদক্ষেপে এগিয়ে চলে। লক্ষ্যহীন ও লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবনের বিভ্রমের মধ্যে সে নিজেকে হারিয়ে ফেলতে চায় না।

যন্ত্রযুগে তাই কবিতার প্রয়োজন অপরিসীম। যন্ত্রযুগের যন্ত্রণার উপশম এবং অস্থিরতার নিরসন সম্ভব করে বাঁচার এক নতুন অর্থ এনে দিতে পারে কবিতা। হাজার বছর ধরে পৃথিবীর পথে ঘোরা ক্লান্ত নায়ক এসে যখন বনলতা সেনকে প্রত্যক্ষ করে, তখন সে জীবনের সব সৌন্দর্য্য খুঁজে পায় তার মধ্যে। বনলতা হল এমন এক সৌন্দর্য্য যা হারিয়ে ফেলার পর জীবনের সব আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়, জীবনের সব রস, সব আশা, সব স্বপ্ন যায় শুকিয়ে। তাই সেই হারানো সৌন্দর্য্য যখন এক ক্লান্ত বিষণ্ণ জীবন আবার খুঁজে পায়, তখন জীবনের সব-কিছুই সে ফিরে পায়। শুষ্ক ও শ্রান্ত জীবনে ফিরে আসে এক অদ্ভুত প্রশান্তি। বনলতা সেন যে সৌন্দর্য্য, সেই সৌন্দর্য্যই তো কবিতা। দৈনন্দিন প্রয়োজনের জগতে সে সৌন্দর্য্য অত্যন্ত একান্ত বিরল।

গ্রাম বাংলার পাঁচালী

মৃণালকান্তি দত্ত

মাঘের দুপুরে হাঁটতে ভালই লাগছিল। অনেকদূর চলে এলাম গ্রাম ছাড়িয়ে বিষহরির থানের কাছে। চল্লিশের চালশে-ধরা মন এখন-তখন কেমন যেন হয়ে ওঠে, দূরবীনের উলটো দিক দিয়ে দেখার মত—সরে যাওয়া কৈশোর যৌবনের সঙ্গী হতে চায়—। এই গ্রামেই তো শৈশব কেটেছে আর প্রাক্-যৌবনের অদ্ভুত করুণ দিনগুলো। "নস্টালজিয়া"র বাংলা প্রতিশব্দ মনে আসছে না।

গ্রাম-দেবী বিষহরির থান আজও জঙ্গল। সেদিনও ছিল তবে তা ছিল সন্ধ্যাকার জঙ্গল—কুলবঁইচি আর মনসা-কাঁটার ঝোঁপ, শেয়াল, খ্যাঁক শেয়ালের বাসা। ভুতুড়ে কাঁড়া ঠেকা বিবরা তলায় পূজো দিতে আসত মানুষ। মুকুল মাঝি তীর দিয়েই বাঘ মারল সেই জঙ্গলে। মরা বাঘ গ্রামের শিবতলায় নিয়ে ফেলল। বাবা তাকে একটি টাকা দিয়েছিলেন, রূপোর টাকা, সপ্তম এডোয়ার্ডের প্রোফাইল তাতে। নেহরু-মার্কা ঠুনকো টাকাগুলোর যে ইন্দ্রলুপ্ত সম্বলিত আকৃতি দেখা যায়, তার সঙ্গে বেশ মিল ছিল শুধু শব্দ সম্পদের তুলনা

করলে বলতে হয় আগের গুলো যেন ভয়ঙ্করী আর এখনকার গুলো যেন জ্যাক। মুংলা মাঝি যখন বাঘ মেরেছিল তখন মুসোলিনী চেষ্টা করছিল হাইলে সেলাসীকে মারতে।

আজকের জঙ্গল সাজানো বন। সরকারী বন বিভাগের ফিতে বাঁধা সারিতে সারিতে শাল সেগুন মাথা তুলছে, যেন হোমগার্ডের কুচকাওয়াজ। আরণ্যক পরিবেশ সৃষ্টি করতে এ অক্ষম। এ যেন আকাশবাণীর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ষ্টুডিয়োতে সাঁওতালী সুর বা ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল হাউসিং এষ্টেটে ভাটিয়ালী গম্ভীরার জলসা। প্রাকৃতিক জলধারা অবহেলায় অনাদরে শুকিয়ে দিয়ে, তারপর বাঁধ বাঁধার কথা ভাবা।

ফরাক্কা এই তো বার মাইল পশ্চিমে। ফরাক্কা এ অঞ্চলে অনেক কিছুর দ্যোতক। ফরাক্কা মানে টাউনশিপ ট্রানজিষ্টর, সিনেমা, টেরিলিন, গোড়ালি চাপা ট্রাউজার্স, পেটকাটা ব্লাউজ, সহজলভ্য অর্থ ইত্যাদি। দেড়শ মাইল দক্ষিণে কলকাতায় ফরাক্কার অর্থ চালু বন্দর হিন্টারল্যাণ্ডের সর্ববিধ অর্থনৈতিক উজ্জীবন। করাচির সরকারী মহলে ফরাক্কার অর্থ গভীর চক্রান্ত। ঠিক এই জায়গাটা যেমন আমার কাছে বিষহরির থান, সরকারী অরণ্য-বিভাগের কাছে একটি ক্রম বর্দ্ধমান অরণ্য-সম্পদ, ফরেস্ট গার্ডের কাছে ছোট খাট একটি স্বর্ণখনি।

সত্যই এটা খনি। একদিন ভাবতাম এই ডাঙ্গা খুঁড়ে দেখব। সেই খনন আমাকে রাখালদাস সাহনীর সমগোত্রীয় করে তুলবে। ভাবতাম এবং এখনও ভাবি, ইতিহাস এখানে বোবা হয়ে মাটির নীচে পড়ে আছে। কেন এত দূরে সরে এলেন গ্রামদেবী? তাহলে কি কোন সমৃদ্ধ জনপদ এতদূর অবধি বিস্তৃত ছিল? সে এক খরার বৎসর যখন রায় জ্যাঠাদের পুকুরটা খোঁড়া হল তখন এই পূর্ব পারে বিরাট বাঁধান ঘাট মাটির তলা থেকে উঠেছিল। এই ডাঙ্গা যদি চিরদিনই জনবিরল ছিল তাহাহলে কি প্রয়োজন হয়েছিল ঐ বিরাট ঘাটলার? গঙ্গা থেকে যে বিলটি বেরিয়ে এসে একটু দূর দিয়ে দক্ষিণে চলে গেছে, তার উৎপত্তি কত শতাব্দী আগে? এও কি গঙ্গারই আরো একটি কীর্তিনাশা দিক? গঙ্গার কোন আকস্মিক কূল প্লাবনে এই বিলের কি উৎপত্তি হয়েছিল যার ফলে ঘনবসতি জনপদ উৎখাত হয়ে ছড়িয়ে যায়, সরে যায়। পশ্চিমে আমার গ্রাম ছাড়িয়ে আরো একটি জায়গা আছে। কেউ জানে না কেন বা কত দিন তা জনমানবহীন। কিন্তু সেখানের—পুরাতন পুষ্করিণী দিঘী তাদের অতি জীর্ণ কিন্তু অতি বিশাল বাঁধানো ঘাটগুলো দেখে মনে হয় কত নিতম্বিনী ঐ ঘাটে বসে গাত্রমার্জনা করছে, কত—প্রোষিতভর্তৃকার চোখের জল ঐ ঘাটের জলে মিশেছে, কত বালিকা কিশোরী কলসী ভরে নিয়ে—সে তার শিবের [illegible] বুড়ো বটগাছতলায় [illegible] শিবলিঙ্গ আর ঐ পুকুর, ইটের প্রকাণ্ড ঘাটগুলো আজও আমাকে সোচ্চারে ডাকে, বলে তাদের অনেক কথা বলার আছে। মজা দিঘীর নিস্তব্ধ মধ্যখানে কে যেন গলায় কলসী দিয়ে ডুবে মরেছে, তবে বিশ্বাস কর সে কুলত্যাগিনী, কুলটা নয়। তাকে লোকে অমন বলেছে।

হঠাৎ নজর পড়ল কুকুরটার ওপর। আমি ভেবেছিলাম এই নির্জনতায় আমি বুঝি একাকী, নিঃসঙ্গ। একটা উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে দক্ষিণ দিকে মুখ তুলে গন্ধ শুঁকছে, বোধ হয় খ্যাকশেয়ালীর গাত্রগন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে। কুকুরটার লেজ জিলিপীর মত জড়ান। প্রতিবেশী অযোধ্যাপ্রসাদ মহাশয়ের একটি কুকুরী ছিল, আদর করে নাম রেখেছিলেন "জিলাপী"।

এক ঝাঁক নীলকণ্ঠ পাখী মাথার উপরে সভা করছিল। নির্জনতা, নিঃসঙ্গতায় কোন ছেদ পড়েনি। একটু আগে একটা শেয়াল ফোলা লেজ দেখিয়ে ইতিউতি করে সরে গেল, তখনও একাকিত্ব যায় নি। শেয়ালটা যেন অস্বাভাবিক হৃষ্ট পুষ্ট। এই খাদ্যসঙ্কটের দিনের ওরা এত বাড়ছে কি করে? পিল পিল করে মানুষ বাড়ছে ফলে দুফসলী থেকে ত্রিফসলী চাষ হচ্ছে। তাই বোধ হয় যে কটা শেয়াল এখনও টিকে আছে তারা পেটভরে খেতে পাচ্ছে। "সবার উপরে টিকে থাকা সত্য, তাহার উপরে নাই"। আমার সাড়া পেয়ে কুকুরটা দিব্যি চলে এল এবং কি আশ্চর্য কোন দ্বিধা,

ভয় সঙ্কোচ না রেখে লেজ নাড়তে লাগল। আমি যেন তার কত কালের চেনা। পা চেটে আনুগত্যের অঙ্গীকার নিল, রকমারী কায়দায় লেজ সমেত পশ্চাদ্দেশ নাড়াতে লাগল। আমি এই শীতের বিকেলে সঙ্গী পেলাম।

একবার ভাবলাম হেঁটে হেঁটে চাঁদপাড়া চলে যাই। ভাঙ্গা সুলতানী মজিলের ঢিপিগুলো প্রদক্ষিণ করে আসি। কুকুরটা বোধ হয় সঙ্গী হবে। নাঃ, বড় দূর, ফিরতে হয়ত রাত্রি হয়ে যাবে। তার চেয়ে কুকুরটার সঙ্গেই একটু সমঝোতা পাতাই। চাঁদপাড়া থেকে গৌড় কতই বা দূর! কাক-ওড়া পথে বোধ হয় পাঁচ ক্রোশ। বল্লাল সেন বা লক্ষ্মণ সেন কি কোনদিন এই পথে এসেছিলেন, এই বিষহরি ডাঙ্গা দিয়ে, হাতির পিঠে চড়ে, টগবগিয়ে ঘোড়ার পিঠে কিংবা ক্রীতদাস কর্করবাহিত পালকি চড়ে।

বল্লাল সেন মদীয় পিতৃদেবকে খুব কষ্ট দিয়েছেন। ভদ্র লোকের বরাবর মনোকষ্ট ছিল যে আমরা কুলীন কায়স্থ নই। অবাঙ্গালী বল্লাল সুদূর কর্ণাটক থেকে এসে কি ভয়ানক বিভেদের সূত্রপাত করে গেলেন। আমরা বাঙ্গালীরা দক্ষিণী বল্লালকে মেনে নিয়েছিলাম, তার রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃত্ব স্বীকার করেছিলাম, কিন্তু আমি যদি এখানে বসে কোন মদ্রদেশীয়াকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করতাম, ওরা সব গাড়, ছুড়ে মারতেন। সহর কলকাতার কথা বাদ দিন, এখানে কোন মুসলমান দম্পতিকে বেয়াই-বেয়ান বানানর কথা চিন্তা করা যায় কি?

কুকুরটার রং বাদামী, মাঝে সাদা ছোপ, আর কপালটায় যেন সাদা তিলক। আমার ধুতি কামড়ে আলতো টানছে। "চল না, একটু খেলি, একটু হুটোপুটি করি"। উঠলাম, উঠতেই হল। কুকুরটা আনন্দে কয়েকবার ঘুরপাক খেল, একটা কাঠবিড়ালীকে তাড়া দিয়ে এসে আবার আমার পা শুঁকে চাটল। ওর বেদবর্জিত একরোখা চেহারা দেখে মনে হল এ বোধ হয় আমাদের সাঁওতাল পাড়ার বাসিন্দা কিন্তু সাঁওতাল পাড়া তো ঝাড়া পশ্চিমে, সেই কাণসোনার ডাঙ্গার দিকে। কাণসোনা কি কর্ণ সুবর্ণের অপভ্রংশ? ঐ ঢিপির নিচেও কি মূক ইতিহাসের কঙ্কাল? আবার প্রায় ৪০।৪৫ মাইল দূরে দক্ষিণপূর্ব দিকে আরো এক কর্ণসুবর্ণ মাটির তলা থেকে উঠছে—রক্তমৃত্তিকা বিহারের ভগ্নাবশেষ—ছিরুটি রেলষ্টেশনের কাছে। আমাদের এই কাণসোনা কি অকারণে ঐ একই নাম বহন করে আসছে? হয়তো আমাদের এই কাণসোনায় পাওয়া যাবে প্রকৃত রক্তমৃত্তিকা বিহার, কিম্বা হয়তো অণ্য কোন ক্ষুদ্রতর বিহার, কোন বৈশালী কি শ্রবস্তিপুর। কোন রাখালদাস সাহনীর দল গাঁইতি কোদালের ঘায়ে মহান করুণ অতীতকে মূর্ত্ত করবে। কালবৈশাখীর ঝড় সেই মৃত স্তুপের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কান পাতলে শোনা যাবে, "বুদ্ধের শরণ লইলাম"।

নাঃ কুকুরটা দেখছি নাছোড়বান্দা। গলার তলাটা চুলকে দিতেই আনন্দে গদগদ হয়ে পায়ের উপর শুয়ে পড়ল। এমনও তো হতে পারে, জন্মান্তরবাদ যদি সত্যই হয়, যে আমি এমনি কোন বিহারে ভিক্ষু হয়ে নির্বাণ খুঁজেছি, হাতে ধর্মচক্র, কণ্ঠে তথাগতের করুণা-ভিক্ষা। হয়তো তখন এই কুকুরটাও, ঐ জাতকের গল্পের মত, একই বিহারে ভিক্ষু হয়ে বাস করত। হয়তো কুকুরটাই ছিল মঠাধ্যক্ষ, আমি ছিলাম সঙ্ঘের ক্ষুদ্রতম সেবক। বন্ধু শান্তিরঞ্জন জন্মান্তরে বিশ্বাস করতেন না আর আমার মনে হত বিশ্বাস করতে পারলে শান্তি পেতেন। তিনি তখন প্রত্যহ বিংশতিবার মার্কস্ নাম এবং এক বিংশত বার ষ্ট্যালিন-নাম জপ না করে সকালের চা চাখতেন না। তার ষ্ট্যালিন ভক্তিকে গুরুবাদ আখ্যা দিলে তিনি বলতেন এগুরু অন্য গুরু। সব চেলাই এ কথাই বলে। তারপর যদ্দুর জানি বহুদিন জপ করেছিলেন "ষ্ট্যালিন নাম হারাম হ্যায়।" এখন নাকি শুনছি ষ্ট্যালিন সাহেবের পুনর্জন্ম সাধনের গূঢ় সাধনা চলছে। হাজার হোক মাতৃঋণ, পিতৃঋণের মত গুরুঋণও অশোধ্য। জয় গুরু! যাই হোক ওরা বলেন জীবন্ত শুক্রকীট ছাড়া যখন নূতন জন্ম অসম্ভব, তখন জন্মান্তরও আজগুবী।

আত্মার পুনর্জন্ম সম্বন্ধে রাজস্থানের ডাঃ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বন্ধুবর শান্তিরঞ্জনের যতই মতবিরোধ থাকনা কেন, কিঞ্চিৎ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা না থাকলে, দুনিয়ায় অনেক ভেলকিই ফুরিয়ে যেত। ধরা যাক যীশুর রেজরেকসন। দুটি মিরাকলের উপর সারা ক্রিশ্চেনডম্ দাঁড়িয়ে। প্রথমত তিনি ভগবানের সাক্ষাৎ পুত্র, দ্বিতীয় তাঁর পুনরুত্থান। ধরা যাক লক্ষ্মনের শক্তিশেল। তিনি যদি আর না উঠতেন বাল্মীকি বড় বেকায়দায় পড়তেন। ইহুদিগুলো ইসরাইলে পুনরুত্থিত হতে কি বিভ্রাটটাই না বাধাচ্ছে।

মনে মনে কুকুরটার নামকরণ করলাম আনন্দ। বিকেলের ছেঁড়া ছেঁড়া চিন্তার ফাঁকে, আমাকে খুশী করবার আপ্রাণ চেষ্টাই না করে যাচ্ছে। হঠাৎ মনে পড়ল একটি কবিতার কথা। বহু—বহুদিন আগে পড়া, যার প্রথম পংক্তি "আনন্দ, আনন্দ কই? শয্যা-তলে জাগিল রমণী-"। আরো একটি লাইন রতিহীন রাত্তি কাটে পতিহীন নারীর মতন। দরাজগলায় আবৃত্তি করতে করতে বড়দার প্রচণ্ড হুমকি খেয়েছিলাম। শব্দরূপ, ধাতুরূপের চাপে আনন্দ গুঁড়িয়ে গিয়েছিল। ঐ কবি একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক। রাজনীতি ; সাংবাদিকতা সম্পাদনার চাপে তার কবিসত্বা গুঁড়িয়ে না গেলেও অনেক মাটির তলায় বোধ হয়। তার কবিতা আমার ভাল লাগত, অনেকেরই লাগত। তিনি শুধু কবি হয়ে থাকলে কত ভাল হত।

আমরা সবাই আনন্দ খুঁজে বেড়াচ্ছি। শৌণ্ডিকালয়ে বা সুমেরুতে, ক্যাবারেতে কিংবা কপিলাবস্তুতে, গণিকালয়ে কিংবা গহনবনে—সবাই তো আনন্দ খুঁজছি। আজকে এই যে দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, শাল গাছের ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হল, এওতো আনন্দেরই সন্ধানে। আর, "আনন্দ" চারপায়ে ঝুলুক ঝুলুক করে ধেয়ে এসে দিয়ে গেল, আনন্দ কত সহজ।

মেয়েটিকে দেখলাম আমাদের পাশে আসতে। মাথায় একবোঝা শুকনো ডালপালা। কোন সাঁওতাল মেয়ে বোধ হয়, বাঁধনা পরবের আগে জ্বালানী সংগ্রহে বনে এসেছে। "আনন্দ" এক দৌড়ে মেয়েটির কাছে গেল। গায়ের উপর দিব্যি পাতুলে দিয়ে দুবার ডাকল। লেজটা তখন এত জোরে নড়ছে মনে হয় এক্ষুনি খুলে পড়ে যাবে। পর মুহূর্তে আর এক লম্বা দৌড় দিয়ে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মেয়েটি আমার কাছে অবধি না আসা পর্যন্ত এইভাবে ছুটোছুটি করে একটা যেন যোগসূত্র সৃষ্টির চেষ্টা করতে লাগল। তার মনিবটির সঙ্গে বুঝি আমার পরিচয় করে দিতে চায় এমনি করে এক সেতুবন্ধ রচনা করে। আমি যখন চীরপরিগ্রহ করে বুদ্ধের, ধর্মের আর সঙ্ঘের শরণ নিয়েছিলাম তখন বুঝি ঐ কন্যাটিও পরিব্রজ্যা নিয়ে কোন ভিক্ষুণী সঙ্ঘারামে দীপ জ্বালিয়ে তথাগতের মৌন মূর্ত্তি আলোকিত করত। ভিক্ষাপাত্র নিয়ে নগর পরিক্রমায় বেরিয়ে বুঝি ঐ ভিক্ষুণীর সঙ্গে কখনো আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

সাঁওতাল যুবতী তার সিতা (কুকুর) নিয়ে মাথায় জ্বালানীর বোঝা বয়ে চলে গেল। কষ্টিপাথরের পিঠে পৈতের মত এক ফালি কাপড় দেখতে দেখতে বনের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। শুধু আনন্দ আরো একবার ছুটে এসে আমাকে ভাল করে শুঁকে চলে গেল। পশ্চিমে বংশীয়া গ্রামের পিছনে সূর্য তখন তলিয়ে যাচ্ছে। বিষন্ন সূর্যের দিকে মুখ করে ক্ষেত প্রত্যাগত দুজন মুসলমান নমাজ পড়ছে। ডাঙাপাড়ার কোন নববধূ কি নবোঢ়া কন্যা শাঁখে ফুঁ দিয়ে রাত্রিকে তাড়াতাড়ি ঘরে আনতে চাইছে। মনে হল ওরা যেন সবাই আমার আত্মার আত্মীয়—যে আত্মার অতীত ছিল এবং ভবিষ্যৎ আছে।

চলচ্চিত্রে নগ্নতা

তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকায় সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে :

ভারতবর্ষে নাট্যশিল্প ও নাটকাভিনয়ের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। আধুনিক যুগে সুশিক্ষিত উচ্চাংগ ও লৌকিক নাট্যাভিনয়ের দুইটি ধারাই এদেশে অব্যাহত রহিয়াছে ও ক্রমশঃ নূতন নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা বৈচিত্র্য ও সমৃদ্ধি লাভ করিতেছে। আধুনিক যুগে পৃথিবীর সর্বত্র অভিনয়কলা অপর যে আধারকে আশ্রয় করিয়া বিকশিত হইয়াছে তাহা চলচ্চিত্র। সম্ভবতঃ ইহা বর্তমানে প্রচলিত লোকরঞ্জক আমোদ-প্রমোদসমূহের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়। আঙ্গিক, বিন্যাস ও পরিবেশনের ক্ষেত্রে অবশ্য সাধারণ মঞ্চাভিনয়ের সহিত চলচ্চিত্রের যথেষ্ট পার্থক্য আছে—কিন্তু তাহা উপস্থিত প্রসঙ্গের আলোচ্য নহে। অভিনয়কলা চলচ্চিত্রের প্রধান অবলম্বন ও উপজীব্য; মঞ্চাভিনয়ের সহিত এখানেই তাহার সাদৃশ্য—যদিও বিষয়বস্তুকে দৃশ্যতঃ বহুগুণে সমগ্রতর ও বিস্তীর্ণতর রূপে উপস্থিত করিতে চলচ্চিত্র সমর্থ। মানবজীবনের ও মানবসংসারের যে চিত্র ইহার মাধ্যমে রূপায়িত হয় সেই কারণে তাহা পূর্ণাঙ্গতর হইবার সম্ভাবনা অধিক। ইহার প্রচলন, দ্রুত বিস্তার ও জনসাধারণের নিকট ইহার প্রবল আকর্ষণ ও জনমানসের উপর ইহার সুগভীর প্রভাবের কথা বিবেচনা করিলে—লোকশিক্ষার মাধ্যমরূপে ইহার বিরাট সম্ভাবনার বিষয়ও স্বীকার করিতে হয়। এক্ষেত্রে প্রাচীনতর মঞ্চাভিনয়শিল্প ইহার নিকট সম্পূর্ণ পরাজিত। কিন্তু জনসংযোগের মাধ্যমরূপে এরূপ প্রবল শক্তির অধিকারী বলিয়াই—চলচ্চিত্রশিল্পের পক্ষে একটি মহান দায়িত্বকে এড়াইয়া যাইবার উপায় নেই। সমাজ-সংসার সম্পর্কেও বহির্জগতের যে তথ্যকে রূপায়িত করিবার ভার ইহা লইয়াছে—তাহা যাহাতে মানব-সমাজের সর্বাংশে কল্যাণকর হইতে পারে তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখা ইহার অন্যতম প্রধান কর্তব্য গণ্য হওয়া প্রয়োজন। জীবনের ও জগতের সত্যরূপ প্রকাশ করা সকল মহৎ শিল্পেরই প্রধানতম লক্ষ্য। কিন্তু সেই প্রকাশ যদি রসোত্তীর্ণ না হয় তাহা হইলে শিল্পহিসাবে তাহা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইবে। সাহিত্যেই হউক বা অপর কোন ক্ষেত্রেই হউক শিল্প জীবনভিত্তিক হওয়া একান্ত আবশ্যক—কিন্তু ইহা জীবনের অবিকল ফটোগ্রাফ নহে। প্রকাশের মাধ্যমে তাহার একটি সূক্ষ্ম রূপান্তর ঘটে যাহা তাহাকে শিল্পসুষমায় মণ্ডিত করে। দ্বিতীয়তঃ জীবনের সকল ক্ষেত্রকে বাদ দিয়া মাত্র একটি অতি সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রকে অবলম্বন করিলে শিল্প সেই একদেশদর্শিতা হেতু তাহার মান হইতে ভ্রষ্ট হয় ও জীবনসত্যের সর্বতোমুখিতা প্রকাশ করিতেও অক্ষম হয়। শ্লীল অশ্লীলের প্রসঙ্গ ছাড়িয়া দিলেও ইহা স্বীকার্য, এই প্রকার উদ্দেশ্যমূলক একদেশদর্শিতা শিল্পকে জীবনবিমুখ ও অবাস্তব করিয়া তুলে।

সম্প্রতি চলচ্চিত্রে স্ত্রীপুরুষের দৈহিক নগ্নতা ও চুম্বন-বিনিময় প্রদর্শনের স্বপক্ষে যে প্রচার চলিতেছে সেই প্রসঙ্গ মনে রাখিয়া পূর্বকথিত ভূমিকার অবতারণা করিলাম। চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষেত্রে বহু সার্থক সৃষ্টির সহিত আমাদের পরিচয় আছে। পৃথিবীর নানা ভাষায় বহু সুমহৎ সাহিত্যগ্রন্থের চলচ্চিত্রায়িত রূপ আমরা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। কত প্রতিভাশালী শিল্পী চলচ্চিত্রকে

অবলম্বন করিয়া এযাবৎ তাঁহাদিগের অভিনয়প্রতিভার চূড়ান্ত পরিচয় দর্শকসমাজের নিকট ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু জীবনসত্যের শিল্পায়িত রূপ দৈহিক নগ্নতার মাধ্যমে ভিন্ন প্রকাশ করা অসম্ভব, এই দাবী শিল্পী বা দর্শক কোনো সমাজ হইতেই উত্থাপিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হয় নাই। স্ত্রীপুরুষের দৈহিক নগ্নতা চিত্রপটে প্রদর্শন না করিলে চলচ্চিত্র শিল্পের উৎকর্ষ সাধিত হইতে পারে না—ইহা একটি অশ্রুতপূর্ব দাবী। পাশ্চাত্য-সমাজে প্রকাশ্য চুম্বনবিনিময় সুদীর্ঘকাল প্রচলিত। অনুরাগের এই বাহ্য প্রকাশ সেখানে অশালীন গণ্য হয় না। কিন্তু ভারতবর্ষে স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এই প্রকার প্রকাশ্য প্রেমসম্ভাষণ প্রচলিত নাই। তাহাতে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড রসাতলে যায় নাই। ইহা ব্যতিরেকে—মঞ্চাভিনয়ে ও চলচ্চিত্রাভিনয়ে—বহু সার্থক প্রেমাভিনয় হইয়াছে ও এবং হৃদয়াবেগের সেই শালীন ও সংযত প্রকাশে দর্শক এযাবৎ তৃপ্ত হইয়াছেন। সহসা আমাদের প্রচলিত সামাজিক শিষ্টাচারকে লঙ্ঘন করিয়া প্রকাশ্যে চুম্বনের অভিনয় দেখাইবার এই আগ্রহ কেন? ভারত-বাসীর জীবনের কি ইহা সত্য পরিচয়? যাঁহারা ইহা প্রবর্তন করিতে চাহেন তাঁহারা মুষ্টিমেয় পাশ্চাত্য-প্রভাবিত জনসাধারণের সহিত সম্পর্কশূন্য একটি মণ্ডলীর আদরণীয় জনসমাজে অপ্রচলিত এই প্রথাটিকে চিত্রপটে দেখাইয়া সমাজ-জীবনের কোন বাস্তব রূপটিকে উদ্ঘাটন করিতে চাহিতেছেন? আর যৌনবিকার-প্রসূত এই নগ্নতার মোহ? এতকাল আমরা জানিতাম মনোবিকারগ্রস্ত কিছু লোক পাশ্চাত্যে ও প্রাচ্যে অতি সংগোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে কুখ্যাত নাইটক্লাব ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে সমবেত হইয়া এই নগ্নতার চর্চা করিয়া থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে পাশ্চাত্য-দেশসমূহের শালীনতাবোধ সম্পর্কিত ধারণা দ্রুত পরিবর্তিত হওয়ায়—সেখানে নারীসমাজের পোষাক-পরিচ্ছদেও একটা বাঁধন ছেড়া বে-আব্রুভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। কিন্তু পশ্চিমের নগ্নতাচর্চাকে এদেশে চল-চ্চিত্রের মাধ্যমে রূপায়িত করিয়া অগণিত ভারতবাসীর জীবনের কোন বাস্তবপরিচয় নগ্নতা-সমর্থক চলচ্চিত্র-নির্মাতাগণ প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন? যদি জানি-তাম বাস্তবে এই প্রকাশ্য নগ্নতাচর্চা আমাদের জন-সাধারণের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে—তাহা হইলে অন্ততঃ একথা বলা চলিত চলচ্চিত্রে উহার প্রকাশ স্থগিত রাখিলে প্রকৃত অবস্থার প্রতি চক্ষু বুজিয়া থাকা হইবে। সেক্ষেত্রেও অবশ্য সমাজকল্যাণের দিক হইতে প্রশ্নটির অপকারিতার বিষয় বিবেচনা করিবার প্রয়োজন থাকিয়া যাইত। কিন্তু মুষ্টিমেয় যৌনবিকারগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে প্রচলিত একটি কদর্য সংস্কারের চিত্রায়িত রূপের সর্ব-সাধারণের মধ্যে পরিবেশন—জীবনসত্য, সমাজকল্যাণ, দুর্নীতি—কোনও কিছুর মানদণ্ডেই সমর্থনীয় হইতে পারে না। সেই জন্যই আজ ইহার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদের প্রয়োজন হইয়াছে।

ঈশ্বরের চোখে সকলেই সমান

মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে মতামত পুস্তকাকারে বাংলায় প্রকাশিত হইয়াছে। এই পুস্তকটি পাবলিকেশনস্ ডিভিশন প্রকাশ করিয়া ১।৹ মূল্যে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাংলা তর্জমা সুপাঠ্য হইয়াছে। একটি লেখা উদ্ধৃত করা হইল।

মাদ্রাজের 'পঞ্চম':

মাদ্রাজের মত এমন নিষ্ঠুর ব্যবহার পঞ্চমরা আর কোথাও পায় না। তাদের ছায়া অবধি ব্রাহ্মণদের অশুচি করে। ব্রাহ্মণ পল্লী দিয়ে তারা হাঁটতে পর্যন্ত পায় না। অব্রাহ্মণরাও যে খুব ভালো ব্যবহার করে এমন নয়। এবং এই দুজনের মধ্যে পড়ে পঞ্চমরা পিষে গুড়িয়ে যাচ্ছে। তবু মাদ্রাজ মন্দির ও ধর্মোপাসনার দেশ। সেখানকার লোকেরা বড় বড় তিলক, লম্বা চুল আর মার্জিত নগ্নগাত্রে ঋষির মতই প্রতিভাত হয়। মনে হয় বাইরের আচার অনুষ্ঠানেই তাদের ধর্ম ফুরিয়ে গেছে। যে দেশে শঙ্কর ও রামানুজের জন্মভূমি, সে দেশে সবচেয়ে পরিশ্রমী ও উপকারী শ্রেণীর প্রতি এই দুর্ব্যবহার সত্যই দুর্বোধ্য। কিন্তু এই রকম শয়তানের মত আচরণ সত্ত্বেও আমি আমার দক্ষিণী বন্ধুদের প্রতি

আস্থা হারাই নি। বড় বড় সভায় আমি তাদের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছি যে এ অভিশাপ থাকতে স্বরাজ লাভ সম্ভব নয়। আমি তাদের আরো বলেছি যে, সমস্ত পৃথিবীতে আমরা যে কুষ্ঠরোগীর মত ব্যবহার পাই, তার কারণ, আমরা নিজেরা আমাদের জাতির এই পঞ্চম ভাগকে আবর্জনার মত দেখেছি এবং দেখে আসছি। আমি ভবিষ্যদ্বাণী করতে ভয় পাই না যে, যে মুহূর্তে ভারত অস্পৃশ্যদের প্রতি ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হবে, সেই মুহূর্তে কঠিন হৃদয় বলে পরিচিত ইংরেজ রাজ-পুরুষরা পর্যন্ত বিদেশী বস্ত্র পরিহার আন্দোলনকে একটি সাহসী জাতীয় প্রচেষ্টা বলে সহানুভূতি জানাবে'। আমি জানি, হিন্দুরা যদি ইচ্ছে করে তাহলে তারা তথাকথিত পঞ্চমদের নিজেদের সমান সুখ-সুবিধাও দিতে পারে, আর খাদ্যের মত নিজেদের প্রয়োজন অনুযায়ী বস্ত্রও তৈরী করে নিতে পারে। তাই আমার বিশ্বাস স্বাধীনতা এ বছরেই আসতে পারে। এই পরিবর্তন বিস্তৃতভাবে পরিকল্পিত একটা যান্ত্রিক আন্দোলনের দ্বারা লভ্য নয়। ঈশ্বরের করুণা দ্বারাই একমাত্র লাভ করা যেতে পারে। কে অস্বীকার করবে যে ঈশ্বর সত্যই আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে এক আশ্চর্য পরিবর্তন আনছেন? যাই হোক, প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীর এখন কর্তব্য—হিন্দু হয়েও যারা হিন্দু নয়, তাদের কাছে গিয়ে গিয়ে বারবার করে বলা—যে বেদ উপনিষদ্ ভগবদগীতায় উক্ত হিন্দুধর্মে, শঙ্কর রামানুজের হিন্দুধর্মে কোন মানুষকেই অস্পৃশ্য জ্ঞান করবার সমর্থন নেই, সে যতই পতিত হোক্ না কেন। প্রত্যেক কংগ্রেস কর্মীর উচিত যথা সম্ভব সুন্দরভাবে রক্ষণশীল হিন্দুদের বুঝিয়ে বলা যে এই নিষ্ঠুর ব্যবধান অহিংসার আদর্শের বিরোধী।

গান্ধী শতবার্ষিকীতে আপত্তিকর কার্য্য

যুগবাণী সাপ্তাহিকে গান্ধী শতবার্ষিকীতে কোথাও কোথাও যাহা ঘটিতেছে তাহা লইয়া তীব্র সমালোচনা করা হইয়াছে:

গান্ধী জন্ম শতবর্ষ পূর্ত্তি উৎসব উপলক্ষে সরকারী টাকায় যে রুচিহীন এবং গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন অনুষ্ঠানগুলি আয়োজিত হইয়াছে আবদুল গফফর খাঁ সে সম্পর্কে তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। উৎসবের যে নমুনা আমরা কলিকাতায় বসিয়াও পাইয়াছি তাহাতে সমস্ত ব্যাপারটা হাস্যকর ঠেকিতেছে। গত ২রা অক্টোবর একটি সুদীর্ঘ শোভাযাত্রা কলিকাতার রাস্তা পরিক্রমা করিতেছিল, দেখা গেল উহার সঙ্গে একটি ট্রাকে পাঁচজন ব্যক্তিকে গান্ধীজীর মেক-আপ দিয়া সাজাইয়া লওয়া হইয়াছে। উহাদের সঙ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। ট্রাকে চড়িয়া প্রকাশ্য রাস্তায় শোভাযাত্রার মুখ্য আকর্ষণ রূপে এই পঞ্চগান্ধী মূর্তি যাইতে যাইতে বিড়ি সেবন করিতেছিল—ইহার চেয়ে কুৎসিত দৃশ্য যাহারা গান্ধীর মর্মর মূর্তিতে আলকাতরা লেপন করিয়াছে তাহারাও দেখাইতে পারে নাই। গান্ধী শিষ্যরা গান্ধীকে কোথায় টানিয়া নামাইয়াছে তাহা বোঝার ক্ষমতা হয়তো তাহাদের নাই;—কারণ তাহারা যে উৎসবের মাতামাতি সৃষ্টি করিয়াছে উহার লক্ষ্য বস্তু ১৯৭২ সালের নির্বাচন। আগামী এক বছর অর্থাৎ ১৯৭০ সাল ব্যাপিয়া সরকারী টাকায় গান্ধীবাদ প্রচারের ধুম থাকিবে, কারণ ১৯৭২ সালের গোড়ায় অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচনে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করার পক্ষে কংগ্রেসের তাহাতে খুবই সুবিধা হইবে। এবারের উৎসবের কেন্দ্রস্থল দিল্লী—অব্যবস্থার চূড়ান্ত হইয়াছে সেখানেও। গান্ধী দর্শন নামে একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হইতেছে—উহাই গান্ধী শতবার্ষিকী উৎসবের মুখ্য আকর্ষণ। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করার কথা ছিল আবদুল গফফর খাঁর,—তিনি যান নাই উদ্বোধন করিয়াছেন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী। বহু কাল যাবত ঐ প্রদর্শনীর আয়োজন সম্পূর্ণ করার কাজ চলা সত্ত্বেও এখনও উহা অর্ধ সম্পূর্ণ রহিয়াছে—কাজ ঢের বাকি। প্রদর্শনীর হাল দেখিয়া বিদেশী অভ্যাগতরা হাসাহাসি করিতেছে ও ভারতীয়দের কর্মনিষ্ঠার অভাব সম্পর্কে কড়া মন্তব্যও করিতেছে। আবদুল গফফর খাঁ চারদিকের জাঁক-জমক দেখিয়া ইন্দিরা গান্ধীকেও ধমক দিতে ছাড়েন

নাই;—বলিয়াছেন, এ কি বাপুজীকে শ্রদ্ধা দেখানো, না, বাপুজীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার পরিচয়? ইন্দিরা এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে সক্ষম হন নাই।

সেদিন কলিকাতার বস্তি সাফ করিতে বাহির হইয়াছিলেন রাজ্যপাল ধাওয়ান, প্রফুল্ল সেন ইত্যাদি। ধাওয়ান বহু বড় বড় কথা এই উপলক্ষে বলিয়াছেন। তিনি বস্তিবাসীদের দুর্দশা দেখিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। বস্তিতে একটি ঘরে একটি গোটা পরিবার থাকে ইহা দেখিয়া তিনি মর্মাহত হইয়াছেন। রাজ্যপাল ধাওয়ানের সঠিক বয়স কত আমরা জানিনা, তবে তিনি একজন রিটায়ার্ড জজ এবং বৃদ্ধ ব্যক্তি। ভারতবর্ষের সাধারণ মানুষ কী অবস্থায় বাস করে তাহা এতদিন পর্যন্ত তাঁহার জানার অবকাশ হয় নাই। হঠাৎ একদিন তাঁহার দিব্যচক্ষু খুলিল এবং গরীব জনতার প্রতি সমবেদনার গরম গরম বুলি বাহির করিলেন—ইহার চেয়ে গান্ধীকে অপমান আর বেশি কিভাবে করা যায় আমরা জানিনা। গান্ধী তাঁহার প্রথম যৌবন হইতে দরিদ্রতম ভারতীয়দের সঙ্গে একসঙ্গে ওঠাবসা করিয়াছেন, বাস করিয়াছেন তাহাদের সঙ্গে তাহাদেরই একজন হইয়া—গান্ধীর সবচেয়ে বড় গুণ তিনি জনসাধারণের সঙ্গে একাত্ম হইয়াছিলেন। আজ সুখলালিত রাজপুরুষেরা হঠাৎ একদিনের জন্য জনসাধারণের মাঝে লাফাইয়া পড়িয়াই মধুবর্ষী বাক্যের ফুলঝুরি সৃষ্টি করিতেছেন, ইহা বিশুদ্ধ ন্যাকামি ও ভণ্ডামি;—গান্ধীজীর জন্ম শতবর্ষ পূর্তি উৎসব ইহারই ফলে অন্তঃসারশূন্য তাণ্ডবে পরিণত হইয়াছে।

ইউ এফ রাজ

যুগজ্যোতি সাপ্তাহিকে অধীররঞ্জন যে লিখিয়াছেন:

বুঝিতে পারা গেল পশ্চিম বঙ্গের নব-নিযুক্ত রাজ্যপাল শান্তিস্বরূপ ধেওয়ান ঝানু লোক। ধরমবীরের এপিসোড, হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন! পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রীমণ্ডলীর ডি-ফ্যাক্‌টো কর্ণধার কে তাহা বুঝিতে তাহার কোন কষ্ট হয় নাই—জ্যোতি বসুর প্রশংসা আগেই করিয়াছেন—সাংবাদিক সম্মেলনে বলিয়াছেন যুক্ত-ফ্রন্ট মহৎ কাজের উদ্দেশ্য লইয়া সরকার গঠন করিয়াছেন—কংগ্রেস বিদায় লইয়াছে,—পশ্চিম বঙ্গে রাজনৈতিক স্থিতিবস্থা আসিয়াছে—রাজ্যপালের কাজ সাংবিধানিক, রাজনৈতিক, মন্ত্রী সভার পরামর্শ শিরধার্য্য—সেই রাজ্যে আসিয়া ধন্য হইলাম, যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ সহচর সেইরাজ্যের সেবা করিবার সুযোগ পাইয়া তিনি ধন্য—বাংলা ভাষা মরি মরি ভাষা, এই ভাষাতেই রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব জয় করিয়াছেন—আমি বাংলা শিখিব—ইত্যাদি।

যুক্তফ্রন্ট সরকার তো মেহনতি জনতার সরকার, বুর্জ্জুয়া সেবক নহে—অন্ততঃ ফ্রন্টের উচ্চ কণ্ঠের ঘোষিত নীতি ইহাই। রাজ্যপাল ধেওয়ানের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী সভার মাননীয় সদস্যগণের সহিত যে সব মাননীয় নাগরিক মহোদয়গণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে কোন মেহনতি সর্ব্বহারার নামগন্ধ পাই নাই।

কোন জরুরী ব্যাপারে রাইটার্স বিল্ডিংস-এ কোন মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে যে ঝামেলা সহ্য করিতে হয়—যে মেহনত করিতে হয় তাহা কোন শিক্ষিত ভদ্রলোকের পক্ষে নক্কারজনক। কংগ্রেসী আমলেও এত মেহনত মন্ত্রী দর্শন প্রার্থীদের করিতে হইত না। যতীন চক্রবর্ত্তী, সুবোধ ব্যানার্জ্জীর দর্শন আগে সহজে পাওয়া যাইত। আজকাল চোখ টেপা ইঙ্গিতের জন্যই বোধহয় তাহাদের চেম্বারের সামনেও বার্লিন প্রাচীর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। একজন বিভাগীয় সেক্রেটারী অবশ্য আমাদের এই নিষিদ্ধ এলাকায় সহজে প্রবেশ লাভের খিড়্‌কির দরজার সন্ধান দিয়াছিলেন—১৪ পার্টির যে কোন এক পার্টির ব্যাজ বুকে আঁটিয়া নিলে—কিংবা দল বাঁধিয়া ই-ন-কি-লাব—ই-ন-কি-লাব করিয়া আগাইয়া আসিলে এই নিষিদ্ধ কি-লা-বে (অর্থাৎ কেল্লায়) সহজেই ইন্ করা যায়। কোন পাশপোর্ট লাগে না। "জন-বাণী" সাপ্তাহিক পত্রিকায় উপমুখ্য মন্ত্রী জ্যোতি বসু ও তথ্য প্রচার মন্ত্রী

জ্যোতি ভট্টাচার্য্যের কলিকাতার এক বিখ্যাত হোটেলে আনন্দ-বাজার পত্রিকা গ্রুপের মালিক পক্ষের সহিত জান-পহচান্ করার সাক্ষাৎকার ও গেলাস টানার যে খবর বাহির হইয়াছে তাহা আমাদের বিশ্বাস হয় না। জ্যোতি ভট্টাচার্য্যকে আমরা জানি না—এইবার মন্ত্রীর গদীতে বসিয়া ভদ্রলোক বহু আবোল তাবোল বকিয়াছেন—কিন্তু জ্যোতি বসুকে আমরা দীর্ঘকাল ধরিয়া জানি—দরিদ্র নিপীড়িত জনতার নেতা জ্যোতি বসুর যে ছবি আমাদের চোখের উপর আছে তাহার সহিত "জনবাণী"র প্রচারিত সংবাদের জ্যোতি বসুর ছবির কোন সাদৃশ্য নাই। আমরা যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রীদের সহিত কংগ্রেসী কাপ্তেন মন্ত্রীদের যদি কোন প্রভেদ-ই না বুঝিতে পারি তবে জনসাধারণের মধ্যে এই মনোভাবই দেখা দিবে—যে যায় লঙ্কায় সেই হয় রাবণ!! যুক্তফ্রন্ট সরকার এইবার ক্রট মেজরিটিতে কায়েম হইবার পর বহু "ঘেরাও" হইয়াছে—; "ঘেরাও" হওয়া অফিসারা বা মালিকরা বহু সময়ে প্রহৃতও হইয়াছে, তবুও তাহাদের পুলিশ কোন সাহায্য করে নাই। এমন কি আদালত হইতে ঘেরাও-মুক্ত করার আদেশ পর্য্যন্ত থানার দারোগাবাবু উপেক্ষা করিয়াছে। অথচ বিড়লা বাড়ী "ঘেরাও" হইবার আগেই পুলিশ গিয়া বাড়ীটি ঘিরিয়া পাহারা দিয়াছে। জ্যোতি বসু বলিয়াছেন পুলিশ কমিশনার নাকি তাহাকে জানাইয়াছিলেন যে বিড়লারা পুলিশের সাহায্য চান। পুলিশ কমিশনার ও পুলিশ মন্ত্রীর এই দায়িত্বজ্ঞান সাধারণ-মধ্যবিত্ত মালিক বা মালিকদের আজ্ঞাধীন ঘেরাও-হওয়া অফিসারদের বেলায় কেন দেখা দেয় না?

দেশ বিদেশের কথা

পূজার চাঁদা

অন্য বৎসরের মতই এইবৎসরেও পূজার চাঁদা আদায় লইয়া বহু স্কুলে জোরজুলুম, ভয় দেখানো, মারপিট, খুন, জখম প্রভৃতির কথা শুনা গিয়াছে। বাংলায় ইউএফ সরকারের যে অঙ্গ শান্তি ও আইন রক্ষাতে নিযুক্ত সেই কম্যুনিষ্ট দলের মতবাদে ধর্ম্ম, দেবদেবী বা আধ্যাত্মিকতার কোন স্থান নাই। কিন্তু চাঁদা আদায় করিয়া মহা সমারোহে পূজার ব্যবস্থা করা দেখা যাইতেছে কম্যুনিষ্ট আদর্শের সহিত বেশ ছন্দ রক্ষা করিয়া চলিতে পারে। ইহার কারণ কম্যুনিষ্ট মতবাদের একটা প্রধান মন্ত্র হইল, যে কোন উপায়ে দলের লোকের সংখ্যা ও তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করা অতি অবশ্যক। তাহার জন্য বুর্জ্জোয়া, সমাজবিরুদ্ধচরিত্র চোর, ডাকাত, ধর্ম্মান্ধ সাম্প্রদায়িক গুণ্ডাগোষ্ঠী ও ভক্তিরস ভারাক্রান্ত ভগবতবিশ্বাসী জনগণ; সকলকেই স্বাগত সম্ভাষণ করিয়া কম্যুনিষ্ট পতাকার ছায়ায় ডাকিয়া আনা হইতেছে। পরে মতলব হাসিল হইয়া যাইলে পরে কাহার অবস্থা কি হইবে সে কথার আলোচনা করিয়া লাভ নাই, কারণ সুবিধাবাদ শুধু যে কম্যুনিষ্টের আকাঙ্খিতকেই নিকটে আনিয়া দেয় তাহা নহে সকল মতের লোকই সুবিধার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে ও সুবিধা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহা গ্রহণ করিতেছে চাঁদা আদায় করিয়া পরের খরচে আনন্দ করার সুবিধা কে না চায়?

বিশেষ করিয়া যে সকল লোক পাড়ায় পাড়ায় গায়ের জোরে চাঁদা আদায় করেন, তাঁহারা সুনীতি বোধ ও সততার জন্য প্রসিদ্ধ নহেন এবং তাঁহাদের কোন মতেই বিশ্বাস খুব গভীর নহে। শুধু অনর্জ্জিত অর্থ প্রাপ্তি ও ব্যয় করিবার যে আনন্দ তাহা কম্যুনিজম মতবাদে বর্জ্জনয়ী হইলেও বহু বামপন্থী সমাজসেবক উহাতে কোন আপত্তি করেন না। বলপূর্ব্বক দান আদায় করা বিশেষ-ভাবে আপত্তিকর কার্য্য। ইহা কোনও সভ্য দেশে কেহ বরদাস্ত করে না এবং করা উচিত নহে। অপরের অর্থ জোর করিয়া কাড়িয়া লওয়া যতটা দোষাবহ, ভয় দেখাইয়া টাকা আদায় করা তাহা অপেক্ষা কোন অংশে কম দোষ ও অপরাধের কথা নহে। এই জাতীয় অত্যাচার সম্পূর্ণভাবে নিবারণ করা আবশ্যক। পশ্চিম বাংলা সরকার এ বিষয়ে কি করিবেন আমরা জানিতে চাহি।

পূর্ব্ব পাকিস্থানে জাতিগত বিবাদ

মহম্মদ আলি জিন্না সাহেব যখন ভারতে দুইটি প্রধান জাতি আছে বলিয়া একটি জাতির অর্থাৎ মুসলমানদিগের জন্য একটি ভিন্ন রাষ্ট্র দাবি করেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে ঐ মুসলমান জাতির সকলের চালচলন বেশভূষা ভাষা সামাজিক রীতি-নীতি একপ্রকার। অর্থাৎ ভারতের সকল মুসলমান আচার ব্যবহারে এক এবং পোষাক পরিধানে খাদ্যে ভাষায় এক। ভারতের সকল মুসলমানের ভাষা তখন বলা হইয়াছিল উর্দ্দু। কিন্তু পরে দেখা যাইল যে ভারতের অধিকাংশ মুসলমান বাংলা ভাষাভাষী এবং তৎপরে আসে যাহারা পাঞ্জাবী, সিন্ধি, পুস্তু, বালুচি প্রভৃতি ভাষা বলে। উর্দ্দ ভাষা অতি অল্প মুসলমানেরই মাতৃভাষা।

পূর্ব্ব পাকিস্থানের মুসলমানগণ বাংলা বলেন। তাঁহারা উর্দ্দু বলেন না। বলিতে চাহেনও না। বাংলা উর্দ্দু লইয়া বহু রক্তপাত হইয়া গিয়াছে এবং বাংলা পাকিস্থানের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা বলিয়া স্বীকৃত মুসলমানের বিরোধ ক্রমে ক্রমে আরও প্রবল হইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমানে পশ্চিম পাকিস্থানের সৈন্যদল আসিয়া পূর্ব্ব পাকিস্থানে চড়াও হইয়া বসিয়াছে এবং বাঙ্গালী মুসলমানদিগের সহিত ঐ সৈন্যদিগের এবং অপরাপর অবাঙ্গালী রাজকর্ম্মচারীদিগের সংঘর্ষণ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াই চলিতেছে। সামরিক শাসন-নীতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াও অবস্থার কোন উন্নতি হইতেছে না। অনেকেই মনে করিতেছেন যে পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্থান আর মিলিতভাবে এক রাষ্ট্রের অন্তর্গত থাকিতে সক্ষম-হইবে না। অবস্থা খুবই সঙ্কটময় ও ঘোর বিপদ সঙ্কুল।

আভিজাত্য এবং খাটিয়া খাওয়া

অতি প্রাচীন কাল হইতেই উচ্চস্তরের অভিজাত-দিগের নজরে যাহারা ব্যবসাবাণিজ্য অথবা উৎপাদনী কার্য্য করিয়া খায় তাহারা হেয় ও নিম্ন শ্রেণীর মানুষ বলিয়া পরিগণিত হইত। ব্যবসাদার কিম্বা কার-খানার মালিক বলিতে এখন যেমন উচ্চস্তরের মানুষই বুঝায়; পূর্ব্বে তাহা হইত না। জিনিষ কেনাবেচা, মাল অমাদানি রপ্তানি, কাটিয়া ছাঁটিয়া ভাঙ্গিয়া গড়িয়া নানা দ্রব্য প্রস্তুত করা উচ্চস্তরের কার্য্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। এমনকি স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য ও চিত্রাঙ্কনও হাতের কাজ করা বলিয়া উন্নত কার্য্যের ভিতরে ধরা হইত না। শুধু অগাধ সম্পত্তির মালিক, বহু প্রজার খাজনা আদায়ের উপর যাহাদের উচ্চ আসনে স্থিতি, তাঁহারাই অভিজাত ও উচ্চশ্রেণীর মানুষ বলিয়া গণ্য হইতেন। এবং তাঁহারা হাতের কাজ করা কিম্বা বেতন উপার্জ্জন করাকে ছোটকাজ বলিয়া মনে করি-তেন। ইয়োরোপে প্রাচীন আভিজাত্যের কেন্দ্র যে সকল দেশ ছিল, যথা পোলাণ্ড, সেই সকল দেশে যখন কম্যুনিজম প্রতিষ্ঠিত হইল, তখন প্রথমে এই আভিজাত্য ও কর্ম্মক্ষেত্রের শ্রেণীবিভাগের সংঘাতে নানান সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল। পোলাণ্ডে প্রথমে

অধীনে কাজ করিতে বাধ্য করা হয়। কিন্তু তাহা অধিককাল স্থায়ী হয় নাই। কর্ম্মকৌশল, যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতির জ্ঞান ও দক্ষতার, উপরে এক নব আভিজাত্য পোলাণ্ডের কার্য্যক্ষেত্রে শীঘ্রই প্রতিষ্ঠিত হয়; এবং যাহারা নিছক শ্রমজীবি তাহারা আবার নিম্নাসনে বসিতে বাধ্য হয়।

ইহা ব্যতীত রাজকার্য্যে নিযুক্ত হওয়ায় অথবা উচ্চ-শিক্ষালব্ধ বিদ্যার ব্যবহারে, যথা চিকিৎসা বিদ্যায়, একটা বিশেষ সম্মানের স্থান গড়িয়া উঠিয়াছিল। ইহাও এক প্রকারের নূতন আভিজাত্য বলিয়া গ্রাহ্য হইয়াছিল। অর্থাৎ কম্যুনিজম্ যদিও "ফিউডাল" অথবা ভূস্বামিত্বজাত শ্রেণীবিভাগ উঠাইয়া দিতে সক্ষম হইয়াছিল তাহা হইলেও অপরজাতীয় শিক্ষা ও প্রতিভা নূতনভাবে অক্ষমের উপর সক্ষমকে ও দুর্ব্বলের উপর সবলকে স্থাপন করিয়া কম্যুনিজমের দ্বারা গ্রাহ্য এক নূতন উচ্চশ্রেণী বিভেদ সৃষ্টি করিয়া দিয়াছিল। এই উচ্চশ্রেণীর লোকেরা পূর্ব্বকালের অভিজাতদিগের তুলনায় কিছু কম প্রভুত্ব কামনা করিত না। পোলাণ্ডেই দেখা যায় এখন আর শ্রমিকের কোন উচ্চ স্থান নাই। যাহারা শিক্ষায় জ্ঞানে, কর্ম্মকৌশলে, দ্রব্যোৎপাদন দক্ষতায় শ্রমিক-দিগের উপরে অধিষ্ঠিত হইয়া কর্ম্ম-পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হয় তাহারাই এখন ঐ দেশের উচ্চ শ্রেণীর লোক এবং তাহারা সাধারণ শ্রমিককে আর নিজের সমতুল্য বলিয়া মনে করে না। পূর্ব্বে অভিজাতগণ যেমন সাধারণ মানুষ হইতে তফাতে থাকিয়া নিজেদের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিতেন এখন এই কার্য্য-পরিচালকগণ ও উচ্চপদস্থ রাষ্ট্রীয়কর্ম্মী, বৈজ্ঞানিক, শিক্ষক, চিকিৎসক ও আইনজ্ঞ-গণ সেইভাবেই নিজেদের পদমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন।

কয়লাখাদের অনাদায়ী রাজস্ব

পশ্চিম বাংলার কয়লাখাদের তোলা কয়লার ওজন অনুপাতে যে রাজস্ব দিবার কথা তাহার শতকরা ৪০ চল্লিশ টাকা আদায় হয় নাই। এই টাকার মোট পরিমাণ ১১ কোটি টাকা ও এই টাকার অধিকাংশই প্রায় ৮৮টি কয়লাখাদের নিকট পাওনা বলিয়া প্রকাশ। বাংলা সরকার হয়ত এই কারণে ঐ ৮৮টি কয়লাখনি-মালিকদিগের নিকট হইতে লইয়া সেইগুলিকে জাতীয় সম্পদ বলিয়া নিজস্ব করিয়া লইবেন। অবশ্য বাংলা সরকার কিম্বা কেন্দ্রীয় সরকার কেহই ব্যবসা করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে বিশেষ যোগ্যতা এখন অবধি দেখাইতে পারেন নাই। ব্যবসা বাণিজ্য খনি কারখানা অথবা বাসট্রাম প্রভৃতি জাতীয়ভাবে পরিচালিত হইলেই লাভ হইবে এমন কোন নিশ্চয়তা আমরা দেখি না। বরঞ্চ লোকসান হইবার সম্ভাবনাই অধিক লক্ষিত হয়। সুতরাং জাতীয় না করিয়া খাজনার দায়ে লাটে তুলিয়া সেই বিক্রয়লব্ধ অর্থ যাহা পাওয়া যাইবে তাহাই লইয়া বাংলা সরকারের সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

বৃটিশের আর্থিক সাহায্যদান পদ্ধতি

বৃটিশ জাতির নিজের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বযুগের তুলনায় এখন বিশেষ সুবিধার নহে। তাহা হইলেও বৃটিশ জাতি অপর দেশগুলিকে আর্থিক সাহায্য দান করিয়া থাকেন। গত বৎসর বৃটিশের এই হিসাবে ব্যয় হইয়াছিল ৩৭৮ কোটি টাকা। এই সাহায্য করার ফলে বৃটিশের যে কোন লাভ হয় না তাহা নহে। কারণ এই সাহায্য যেভাবে দেওয়া হয় তাহাতে বৃটিশের যন্ত্রপাতি বিক্রয় বৃদ্ধি ও বৃটিশ কর্ম্মীর নানা দেশে কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সুযোগ সৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে নানা দেশে ১৫০০০ বৃটিশ কর্ম্মকৌশলদক্ষ ব্যক্তি নিযুক্ত আছেন। ইহার মধ্যে ১২০০০ লোক বিভিন্ন সর্ত্তে কাজ করেন যাহাতে বৃটিশ তরফ হইতেই তাহাদিগের নিয়োগ বেতন-প্রাপ্তি প্রভৃতি নির্দ্ধারিত হয়। এই সকল সর্ত্তের মধ্যে বৃটিশের সাহায্যে কারখানা গঠন, বাঁধ ও খাল গঠন ও খনন, রেলপথ কিম্বা ডক নির্ম্মাণ ইত্যাদি নানা কথাই থাকে যাহাতে বৃটিশ ব্যবসায়ের সাহায্য হয়। বৃটিশের সহিত ভারতের ব্যবসার আকার বিচার করিলে দেখা যাইবে যে আমাদের সহিত বৃটিশ জাতি এখনও কিভাবে জড়িত রহিয়াছে। ১৯৬৯ এর জানুয়ারী—জুন এই ছয় মাসে বৃটিশজাতি আমাদিগকে ৩৪১৪০০০০ পাউণ্ড মূল্যের মাল সরবরাহ করিয়াছে। আমাদিগের নিকট হইতে বৃটিষগণ আমদানি করিয়াছে এই সময়ে ৫১৩৯০০০০ পাউণ্ডের মাল। অর্থাৎ যেকোন কারণেই হউক আমরা এখনও বৃটিশদিগকে যাহা পাই তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দিয়া থাকি। ইহা কি শোধ, সুদ না বৃটিশকর্ম্মীর বেতনের হিসাবে হইয়া থাকে?

সাময়িকী

ডাক্তার কালিদাস নাগের মৃত্যু বার্ষিকী

বিগত ৮ই নভেম্বর ২২শে কার্ত্তিক ডাক্তার কালিদাস নাগের মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়। ডাক্তার কালিদাস নাগের জীবনের আদর্শ ও প্রধান আয়াস ছিল বিশ্বশান্তি স্থাপন ও আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে প্রীতি ও সখ্যের সৃষ্টি। তিনি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া পৃথিবীর দেশে দেশে গমন আরম্ভ করেন। বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিয়া ভারত ইতিহাস সম্বন্ধে বক্তৃতা দিবার ব্যবস্থা করেন। তিনি বিশ্বের, বিশেষ করিয়া এশিয়ার বিভিন্ন জাতির মিলন ও বন্ধুত্বের জন্য বহু কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার এই সকল কার্য্যের আরম্ভ বুঝিতে হইলে প্রথমে দেখিতে হইবে ভারতে আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা কেমন করিয়া হইল।

কলিকাতার ঠাকুর পরিবারের লোকেরা প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় হইতেই সভ্যতা ও কৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশ্ব ও ভারত সম্বন্ধে সবিশেষ জাগ্রত ছিলেন। সভ্যতা, কৃষ্টি, শিল্পকলা, সাহিত্য সকল বিষয়েই ঠাকুরপরিবার ভারতের দিক হইতে বিশ্বের দরবারে সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইতেন। এবং সকল দেশের শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ যাহা কিছু তাহা ভারতে আনিতেন। অনেকেই জানেন না যে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বৃদ্ধ বয়সে সমুদ্রপথে চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন ও তাঁহার লিখিত প্রবন্ধাদির শুধু কিছু কিছু ১৮৭৫—৭৬ এর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ খৃঃ অব্দে যখন ইয়োরোপীয়গণ আফিং রপ্তানী করিয়া চীন দেশবাসীকে মৃত্যুর পথে আগাইয়া দেওয়ার ব্যবস্থায় নিযুক্ত ছিল তখন সেই দুষ্কর্ম্মের বর্ণনা করিয়া বাংলায় একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস মহাসভা তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পরে লোস ডিকিনসনের Letters of John Chinaman পাঠ করিয়া রবীন্দ্রনাথ "চীনাম্যানের পত্র" নামে ১৯০৫—০৬ খৃঃ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও তৎপরে রবীন্দ্রনাথ চীনের সভ্যতা ও কৃষ্টি এবং চীনদেশে ইউরোপীয়দিগের শোষণ অভিসন্ধিমূলক অনুপ্রবেশ প্রভৃতির বর্ণনা করিয়া সর্ব্বাগ্রে এদেশের মানুষের মনে অন্য দেশের জনমঙ্গল চিন্তা জাগাইবার চেষ্টা করেন। জবাহরলাল নেহেরু যখন ১৯৪৭ খৃঃ অব্দে নবদিল্লীতে প্রথম এশিয়ান কনফারেন্স আহ্বান করেন তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীয় পরিকল্পনা প্রকৃষ্টরূপ ধারণ করিয়া ভারত ও বিশ্বের অপরাপর দেশের সম্বন্ধ নিকটতর করিয়া আনিয়াছিল। তিনি নিজে প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বহু দেশে গমন করিয়াছিলেন ও তাঁহার এই কার্য্যে যে সকল উচ্চশিক্ষিত যুবক সেই সময় বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে প্রধান ছিলেন কালিদাস নাগ। প্রথম এশিয়ান কনফারেন্সে ডাঃ নাগকে ঐ কনফারেন্সের জ্ঞাতব্য বিষয় ও তথ্য বর্ণনা লিখিয়া দিতে বলা হয়। এই লেখাটি ছাপাইয়া কনফারেন্সে আগত ব্যক্তিদিগকে দিবার ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৫৭ খৃঃ অব্দে বাংলার দেশপাল ডাঃ হরেন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় ডাঃ নাগের বহুবার এশিয়া ও অপরাপর দেশ ভ্রমণ এবং অন্যান্য দেশের ও ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টির সমন্বয় ও পূর্ব্বকালের যোগ অনুসন্ধান কার্য্যে অকাতর অনুসন্ধান চেষ্টার কথা ডাক্তার নাগের ডিসকভারি অফ এশিয়া পুস্তকের ভূমিকায় বিশেষ করিয়া লিখিয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে কালিদাস নাগের বারম্বার বিদেশ গমন ভারতের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ গঠনে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিল। চীনের ও জাপানের সহিত ভারতের সম্বন্ধ তাঁহার

ব্যক্তিগত চেষ্টায় ক্রমশ: গভীরতরভাবে প্রগাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইতেছিল এবং রাষ্ট্রনৈতিক অভিসন্ধির বিষ এই সম্বন্ধকে চীনের সহিত শত্রুতায় পরিণত করিয়া না দিলে আজ সম্ভবত জগতসভায় ভারতের খুব উন্নত অবস্থাই থাকিত।

এশিয়া ও আফ্রিকার নানা দেশে ও আমেরিকার উপকূলবর্ত্তী কয়েকটি স্থানে ভারতীয়দিগকে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ করার যে নির্দ্দয় ও অন্যায় রীতি ইউরোপীয় মালিকগণ প্রবর্ত্তন করিয়াছিল; ভারতের আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ নির্দ্ধারণ সম্পর্কে ভারতের নিজস্ব সভ্যতা, কৃষ্টি ও সুনীতির কথার অবতারণা হওয়াতে ভারতীয় "কুলি"দের শোষণ ও উৎপীড়ন শীঘ্রশীঘ্রই নিবারিত হইয়া যায়। এই কার্য্যে মহাত্মা গান্ধী বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। আর ছিলেন দীনবন্ধু অ্যাণ্ড্রুজ। আমাদের দেশের উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নানা দেশে গমনাগমনের ফলেও ভারতীয়দিগের "কুলি"ভাব ক্রমশঃ দূর হয় ও জাতির অমর্য্যাদার এই কারণ আর থাকে না। সাক্ষাৎভাবে এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ না করিলেও নিজ ব্যক্তিত্বের শক্তি নিয়োগ করিয়া কালিদাস নাগ বিদেশে ভারতীয়দিগের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

কালিদাস নাগ মানবাত্মার অনন্ত উন্নতি ও অমরত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি উচ্চ নীচ শ্রেণী বিভেদে বিশ্বাস করিতেন না এবং বিশ্বমানবীয় সাম্য ও সৌহার্দ্যে আস্থাবান ছিলেন। তাঁহার Discovery of Asia গ্রন্থে তিনি নব এশিয়ার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা হইতে বুঝা যায় জগৎবাসীর কল্যাণের কোন আদর্শ তিনি নিজ অন্তরে পোষণ করিতেন।

Discovery of Asia গ্রন্থের কথাই অতঃপর কিছু কিছু স্বাধীন মর্ম্মার্থ তর্জ্জমা করিয়া দেওয়া হইতেছে। ইহা হইতে ডাঃ কালিদাস নাগের বিভিন্ন বিষয়ে মনোভাব পরিষ্কারভাবে বোধগম্য হইবে।

"এশিয়া পৃথিবীর বৃহত্তম জাতি সমূহের ও নানান সভ্যতার জন্মস্থান। এই মহাদেশেই এই সকল জাতি ও তাহাদিগের কৃষ্টি গঠিত হইয়া পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। নীল নদের নিকট হইতে আরম্ভ করিয়া ইয়াঙ্গসিকিয়াং ও হোয়াঙ্গহোর উপকূল অবধি সর্ব্বত্র মানব-ইতিহাসের কাহিনী বিভিন্নরূপে লিখিত রহিয়াছে; কিন্তু এই বিস্তৃত ক্ষেত্রে অনুসন্ধানপ্রয়াসী পণ্ডিত সমাগম যথাযথরূপে এখনও হয় নাই। এই দেশের শিক্ষার আদর্শ ইয়োরোপ হইতে আমদানি হওয়াতে সেই শিক্ষায় প্রাচ্যের সভ্যতার তথ্য আলোচনা ঠিকভাবে হয় নাই এবং পাশ্চাত্যের ইতিহাসে যতটা মন দেওয়া হয় আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজেদের সভ্যতা লইয়া ততটা চেষ্টা বা সময় ব্যয় করা হয় না।

"প্রাচ্যের সভ্যতা ও কৃষ্টির আলোচনা শুধু বিরাট বিরাট পিরামিড, স্তূপ, মন্দির অথবা মহাকাব্য, উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত, দর্শন প্রভৃতির কথাতেই সম্পূর্ণ হয় না। প্রাচ্যের মানব-ইতিহাস চর্চ্চা পূর্ণভাবে করিতে হইলে আরও দেখিতে হইবে সেইসব অতি প্রাচীন আদিবাসী জাতিদিগের নৃত্য, গীত, কলা, উপাখ্যান প্রভৃতি যাহার মধ্যে ঐ সকল জাতির ইতিহাসের অতি পুরাতন কাহিনী আত্মগোপন করিয়া রহিয়াছে।

"এশিয়া বিরাট; কিন্তু এশিয়ার মানুষ সর্ব্বত্রই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত হইয়া গ্রাম্য পরিবেশে নিজেদের ছোট ছোট সংসার লইয়া সহস্র সহস্র বৎসর অতিবাহিত করিয়া বর্ত্তমানে আসিয়া পৌঁছিয়াছে। বিরাট সাম্রাজ্য ও জনবহুল রাজধানী এশিয়ার সকল দেশেই ছিল কিন্তু মানুষের জীবন ও সুখদুঃখের আশ্রয়স্থল ছিল ঐ অরণ্যের ছায়ায় ও কৃষি ক্ষেত্রের পরিবেশে। কোন কথাই মানব-ইতিহাসে ছোট নয়। শুধু বৃহৎ, প্রবল, জমকালো আড়ম্বরের কেন্দ্রগুলি দেখিলেই মানুষের ইতিহাস শিক্ষা করা যায় না।

"সকল জাতি যদি অপর সকল জাতিকে চিনিতে চায় তাহা হইলে সকলের কবিতা সকলের গান ও সকলের জীবনের রসধারা নিজের করিয়া লইলে তবেই সে পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধি সহজ নহে। ইহার

মধ্যে ইতিহাস. ভূগোল, স্থাপত্য ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত, সাহিত্য, দর্শনের সহিত মিলিতভাবে থাকে জীবনযাত্রার একান্ত ছোট ছোট কথা। পট, আলপনা, ছাঁচ, পুতুল, খেলাধুলা, গল্প কাহিনী, নাচ গান ও পূজা-পার্ব্বণের কথাও ভিতর হইতে দেখিয়া বুঝিতে হইবে।

"অতি পুরাতনকে বাদ দিয়া বর্ত্তমানের দিকে আসিলেও আমাদের খৃঃ পূঃ ১০০০০ হইতে খৃঃ পূঃ ২০০০ অবধি যুগের অনুশীলন বিশেষ পরিশ্রম করিয়া করিতে হইবে। কারণ এই যুগের কথা বহুলাংশে খুঁজিয়া দেখিয়া, অর্থ বিচার করিয়া, হারাণ টুকরাগুলিকে একত্র করিয়া, জুড়িয়া, সম্পূর্ণতা দান করিয়া তবে বোধগম্য হইবে। তাহার পরে আসিবে যাহা গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার পূর্ণ বোধ। শত শত জাতির সহস্র সহস্র বৎসরের ইতিহাসের ভিতরে অসংখ্য বিষয় থাকিবে। কোনটির সহিত কোনটির কি সম্বন্ধ তাহা ঠিকভাবে বুঝিয়া লওয়া সহজ নহে। ইহা না করিলে সেই অন্তরের মিলন সম্ভব নহে যে মিলন হইতে সত্যকার আন্তর্জাতিক সখ্য ও ভ্রাতৃত্ব জন্মলাভ করিতে পারে। অন্তরের যোগ সত্য যদি না হয় তাহা হইলে কেমন করিয়া সর্ব্বমানব পরস্পরের সহিত প্রীতির বন্ধনে বাঁধা থাকিবে এবং কেমন করিয়াই বা সকল শত্রুতা ভুলিয়া তাহারা এক পরিবারঅন্তর্ভুক্ত আত্মীয়ের ন্যায় শান্তিতে সহবাস করিতে শিখিবে।

"এশিয়ান রিলেশনস অরগ্যানাইজেশন গঠনে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরু রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর আন্তর্জাতিক মিলনের আদর্শই অনুসরণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে পূর্ণ ব্যবস্থা করা প্রয়োজন এবং তাহার সম্বন্ধে আমার নিজের মনের কথা ভারত সরকারকে পূর্ণরূপেই আমি জানাইয়াছি। তাঁহারা সেই সকল কথার সত্যতা মানিয়া লইয়াছেন এবং ব্যবস্থা যাহাতে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় সে চেষ্টা করিতেছেন।

ভারতের পাঁচ হাজার বৎসরের ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া যে আদর্শ উপলব্ধি করা যায় তাহার সার কথা মহাকবি রবীন্দ্রনাথের বাণী ও মহাত্মা গান্ধীর শিক্ষার ভিতরে পাওয়া যায়। এই পৃথিবী যদি আজ ধ্বংসের ও মরণের পথ ছাড়িয়া মানবজাতির অমরত্বের পথে প্রতিষ্ঠিত হইতে চায় তাহা হইলে যে আন্তর্জাতিক মিলনের কথা বলিয়াছি তাহা সত্যভাবে গঠিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। তাহা হইবে কিনা সেকথা নির্ভর করে সকল জাতি পারস্পরিক পরিচিতিকে সত্য ও আন্তরিক করিয়া লইতে পারিবে কিনা তাহার উপর।

নবদিল্লীর এশিয়ান রিলেশন্স অর্গানাইজেশন পণ্ডিত জবাহরলাল নেহেরুর সময়ে একটা বড় কিছু হইয়া গড়িয়া উঠিবে বলিয়া সাধারণের মনে আশার সঞ্চার করিয়াছিল। কিন্তু পরে ভারত সরকারের সর্ব্বগ্রাসী প্রগতিশীলতার আবর্ত্তে পড়িয়া অন্য বহুকিছুর সহিত এই আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ গঠন প্রতিষ্ঠানও সম্ভবত কার্য্যকরী হইয়া উঠিতে পারে নাই। আন্তর্জাতিক সম্বন্ধ গঠনের জন্য ভারতের গুণী লোকেদেরও বিদেশ গমন আবশ্যক। কিন্তু বিদেশ ভ্রমণ আজকাল শুধু ভারত সরকারের অনুগৃহীত ও নির্ব্বাচিত লোকেদের পক্ষেই সম্ভব। এই

সকল ব্যক্তিদিগের দ্বারা দেখা যাইতেছে ভারতের সম্মান অপর দেশে বিশেষ রক্ষিত হইতেছে না। ইহার জন্য প্রয়োজন আরও অধিক সংখ্যায় উচ্চশিক্ষিত ও গুণী ব্যক্তিদিগের বিদেশভ্রমণ ব্যবস্থা করা। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ইহা সম্ভব হইবে ও এশিয়ার জাতি-সংঘ বন্ধুত্বের বন্ধনে এক পরিবারভুক্ত হইতে সক্ষম হইবে।

বাংলার রাজ্যপালের মতামত

এইবারকার ওরিয়েণ্টাল কনফারেন্স যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং বাংলার রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত ধাবন ঐ মহাসভার আলোচনার আরম্ভ করেন। তাঁহার বক্তৃতা বিশেষ জ্ঞানগর্ভ ও সকলের চিত্তবিনোদনকারী হইয়াছিল। তিনি যেসকল কথা বলেন তাহার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ করিয়া উল্লেখযোগ্য। প্রথমে বলেন প্রাচ্য বা ওরিয়েণ্টাল কথাটির ব্যবহার সম্বন্ধে। ইয়োরোপ আমেরিকায় ওরিয়েণ্টাল কথাটির অর্থ প্রাচ্যদেশের লোকেদের অপবাদসূচক। প্রাচ্যবিদ্যা সম্বন্ধে শ্রদ্ধাজ্ঞাপক অর্থে ওরিয়েণ্টাল কথাটি ব্যবহৃত হয় না। ইহার কারণ প্রাচ্য দেশ লুণ্ঠন করিয়া নিজেদের ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধি হওয়াতে পাশ্চাত্যের জনসাধারণ নিজেদের অপরাধের সাফাই হিসাবে প্রাচ্যের লোকেদের নিন্দা করিয়া থাকেন। পৃথিবীর সকল জ্ঞান, ধর্ম্ম ও নীতির আরম্ভ বহুলাংশে প্রাচ্যদেশেই হইয়াছে এবং সেই কথা যথাযথভাবে ইতিহাসে, প্রবন্ধে নিবন্ধে, আলোচনায় ও প্রচারে সর্ব্বত্র বিস্তার করিতে পারিলে ওরিয়েণ্টাল কথার প্রকৃত অর্থ ক্রমশঃ জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে। প্রাচ্যবিদ্যার যে সকল অংশ ভারতে উদ্ভূত তাহার সহিত পূর্ণ পরিচয় হওয়ার জন্য প্রয়োজন সংস্কৃতের চর্চ্চা ও জ্ঞান। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদিগের দেশে এখন সংস্কৃতশিক্ষা ক্রমে ক্রমে না হওয়ার দিকেই চলিয়াছে। সুতরাং যদি আমরা এই অবস্থার উন্নতি না করিতে পারি তাহা হইলে প্রাচ্যের সম্মান আমরা নিজেরাই রক্ষা করিতে পারিব না। সংস্কৃতচর্চ্চা ও শিক্ষার সহিত জড়িত রহিয়াছে প্রত্নতত্ত্ব ও পুরাতত্ত্বের ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এই কার্য্যও আমরা যথাযথভাবে করিতেছি না। আমরা জানি যে কোথায় কোথায় পুরাতনের সহিত পরিচয় আরও গভীর, ঘনিষ্ঠ ও পরিষ্কার হইতে পারে। বহু অজানার অন্ধকার জ্ঞানের আলোতে দূর হইতে পারে কিন্তু ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ সেইরূপভাবে কাজ চালাইতে পারে না; কারণ ঐ কার্য্যের জন্য অর্থ সাহায্য যাহা পাওয়া উচিত তাহা ভারত সরকার দিয়া উঠিতে পারেন না। হস্তিনাপুর দিল্লী ও মিরাটের কাছাকাছি ছিল ও সেইখানে উপযুক্ত খনন ব্যবস্থা করিলে বহুকথা জানা যাইতে পারে যাহা এখনও ঐতিহাসিক প্রমাণাভাবে পুরাণ বা উপাখ্যানের আসরেই আবছাভাবে শোভমান রহিয়াছে; কিন্তু সে ব্যবস্থা কবে হইবে তাহা কেহ বলিতে পারে না।

দ্বিতীয় কথাটা আমাদের নিজেদের দোষের কথা। আমরা বিদ্যা ও বিদ্বান এর প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিতে এখনও শিখি নাই। শিক্ষকদিগকে আমরা যেভাবে অভাব-জর্জ্জরিত করিয়া রাখিয়াছি তাহাতেই প্রমাণ হয় যে আমরা পাণ্ডিত্যের প্রতি কত শ্রদ্ধা পোষণ করি। উপার্জ্জনের ক্ষেত্রে যে সকল স্তর আছে শিক্ষকগণ তাহার মধ্যে একটা বেশ নিচের স্তরেই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। আমাদের দেশের কোন মহা পণ্ডিত ব্যক্তি যদি বিদেশে কোথাও গমন করেন তাহা হইলে সেইদেশে আমাদের সরকারী প্রতিনিধিগণ এক পয়সা ব্যয় করিয়াও সেই গুণী ব্যক্তির সম্যক সম্বর্দ্ধনার ব্যবস্থা করেন না। কোন রাজনীতির ক্ষেত্রের মহারথী কেহ বিদেশ গমন করিলে টেলিগ্রাম, সংবাদপত্রের খবর, অভিনন্দন প্রভৃতির বান ডাকিয়া চরাচর ভাসাইয়া দেয়। সরকারী ইস্তাহারে কে কাহার অপেক্ষা অধিক সম্মান পাইবার অধিকারী তাহার বর্ণনায় মহা মহা পণ্ডিতজনের নামও থাকে না কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের রাজকর্ম্মচারীদিগের নাম উচ্চস্থানেই দেখা যায়। অর্থাৎ কোথাও দরবার বসিলে কে কাহার সম্মুখে স্থান পাইবে তাহার বিচারে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্ক বা ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপকের স্থান জেলা শাসকের পশ্চাতে হইবে। কোথায় হইবে তাহাও পরিষ্কার বোঝা যায় না কারণ

পণ্ডিতজনের রাজসভায় কোন বিশেষ স্থান আছে বলিয়া আজকালকার রাষ্ট্রে কেহ কিছু স্বীকার করেন না। পণ্ডিতদিগকে যে দেশে অর্থাভাবে ইতঃস্তত ঘুরিয়া আত্ম-সম্মান নষ্ট করিতে হয়; সে দেশের কৃষ্টি, সভ্যতা, বিদ্যা ও জ্ঞানের ঐতিহ্য, কোন কিছুরই কোন মূল্য থাকে না।

অতীতের সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া নূতন সভ্যতা ও সমাজগঠনের আদর্শ অনুসরণ করিয়া মানব-জীবনকে আরও সুন্দর, আনন্দময় ও প্রগতিশীল করিয়া তুলিবার চেষ্টা আজকাল জগতের বহু জাতির মধ্যে প্রবলভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে। অতীত মৃত ও তাহার সহিত সংযোগরক্ষার কোন সার্থকতা নাই একথা হয়ত মার্কস বা এঙ্গেলস ভাবিয়া থাকিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে যে সকল কথা মানবজীবনের নিত্য ও অবিনাশী সত্য সেই কথাগুলি মিথ্যা প্রমাণ হইয়া যায় না। অতীত কখনও মৃত হয় না। মানুষের দেহেও যেমন পূর্ব্বপুরুষের রক্ত ও অবয়ব চিরজীবিত থাকে; তাহার সভ্যতা, কৃষ্টি, ভাষা ও চিন্তাতেও তেমনি অতীত চিরবর্ত্তমান থাকিয়া যায়। অতীতকে সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জন কেহ করিতে পারে না এবং তাহার চেষ্টাও কখন কোন লাভের বা উন্নতির কারণ হয় না। নূতন আদর্শের বীজ সর্ব্বদাই পুরাতন চিন্তাধারার মধ্যে কোথাও না কোথাও আছে দেখিতে পাওয়া যায়। শুধু দেখিয়াও না দেখিলে তাহা নাই বলা সম্ভব হয়। সকল অনুভূতি সকল প্রেরণা ও সকল আগ্রহ পুরাতনকে ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নূতন উৎস হইতে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিবে; একথা চিন্তা করাও শুধু অসম্ভবের অনুসন্ধিৎসা।

মহাসংগ্রাম : বিমলেন্দু চক্রবর্তী, স্বস্ত্যয়ন, ২২।২এ বাগবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা ৩। মূল্য পাঁচ টাকা।

সম্পূর্ণ এক নূতন পটভূমিকায় এই গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে। তখন পর্তুগীজদের অত্যাচারে বাংলা দেশ জর্জরিত, লবঙ্গ এলাচের সঙ্গে লিসবন বন্দরে মেয়েদেরও বিক্রয় করা হইত; অপরদিকে পিশাচসিদ্ধ তান্ত্রিকদের পঞ্চমকার সাধনার ব্যভিচারে কুমারীর কৌমার্য লইয়া ছিনিমিনি খেলা চলিতেছে।

পর্তুগীজ দস্যু হইয়াও আলভেরো কুনহাল ছিল স্বপ্ন বিলাসী। বাংলাদেশে তাহার মন ভুলাইয়াছিল। যাহাকিছু সে দেখিত সবই তাহার চোখে সুন্দর লাগিত। বাংলাদেশের মেয়েদেরও সে পছন্দ করিত। কুনহালের চেহারাও ছিল সুন্দর। বিশেষ করিয়া তাহার নীল চোখ দেখিয়া অনেক মেয়েই তাহাকে ভালবাসিত।

গৌরী—আনন্দচাঁদের কন্যা। জন্মের পূর্ব হইতেই পিশাচসিদ্ধ কালিকানন্দের কাছে উৎসর্গীকৃতা। সেই গৌরী এখন বড় হইয়াছে। কালিকানন্দকে তাহার বড় ভয়। মোগলসম্রাট সাজাহান তখন পর্তুগীজদের ধরিবার জন্য জাল পাতিয়াছেন। পর্তুগীজরা ভয়ে যে যেখানে পারিতেছে পালাইয়া যাইতেছে। এই পলায়নে গৌরী কুনহালকে সাহায্য করিল। সে দেখিল, কালিকানন্দের হাতে পড়া অপেক্ষা কুনহালের সহিত পালাইয়া যাওয়া ভাল। গোপনে সে কুনহালের সহিত পালাইয়া গেল। মোটামুটি কাহিনীর সারাংশ এই।

লেখক অতি সুন্দরভাবে এই কাহিনীকে লইয়া গিয়াছেন। লেখক সহজ করিয়া বলিতে জানেন। এই সহজ ভঙ্গিটি লেখকের বড় কৃতিত্ব। লেখক নিজে শিল্পী, তাই ভাবাকেও তিনি সুন্দর করিয়া আঁকিতে পারিয়াছেন। বইখানি পড়িতে ভাল লাগে, ইহাই সবচেয়ে বড় কথা।

খান আবদুল গফ্‌ফর খান

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৯শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড | পৌষ, ১৩৭৬ | ৩য় সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

বাংলা দেশে অপরাধ দমন হইতেছে না

বাংলা দেশে আইনের জোর এত কমিয়া গিয়াছে যে, দেশে প্রায় সর্ব্বত্রই খুন খারাবি, চুরি ডাকাতি প্রভৃতি প্রবলভাবে বিস্তৃত হইয়া এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। এই অবস্থায় বাংলার মুখ্য মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় ও তাঁহার সহযোগীগণ দেশের অবস্থা আর যাহাতে খারাপ না হয় সেই জন্য কলিকাতা ও অন্যান্য স্থানে সত্যাগ্রহব্রত পালন করিয়া দেশবাসীর মনে অপরাধবিমুখতা জাগাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই সত্যাগ্রহ আরম্ভ হয় অজয়বাবু নিজে কলিকাতায় অনশন করিয়া সকলকে দেশের অবস্থা সম্বন্ধে উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া। প্রথমে তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণ সত্যাগ্রহ লইয়া ঠাট্টা তামাসা করিয়া তাঁহার এই চেষ্টা নিষ্ফল করিবার আয়োজন করে; কিন্তু দেখা যায় যে ঠাট্টা-তামাসাতে জনসাধারণ যোগ দান করিতেছে না। কারণ দেশবাসী সকলেই দেশের সর্ব্বত্র যে মারপিট দাঙ্গাহাঙ্গামা বাড়িয়া চলিয়াছে তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন ও তাহা নিবারণ করিতে হইলে, হয় গায়ের জোরে সে কার্য্য সম্পন্ন করা সম্ভব, নয়ত মনের জোরে। মনের জোর যথাযথভাবে প্রয়োগ করা হইলে তাহাতে মানুষকে অন্যায় ছাড়িয়া ন্যায় ও ধর্ম্মের পথে ফিরাইয়া আনা যায় একথার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নাই। গান্ধীবাদ যদি মানুষে না মানিতে চাহে, তাহা হইলেও তাহাকে একথা নিশ্চয়ই মানিতে হইবে যে, সম্রাট অশোক দুই হাজার বৎসরেরও অধিকদিন পূর্ব্বে দেশবাসীকে সৎপথে চলিতে শিখাইয়াছিলেন সদুপদেশ দান ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়া। অশোক গায়ের জোরের ক্ষেত্রে পূর্ণ সক্ষম ছিলেন। তিনি যুদ্ধে প্রবল পরাক্রান্ত ও বিজয়ী ছিলেন; কিন্তু তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, সকল জয়-পরাজয়ের উপরে আছে নীতি ও ধর্ম্ম। সেই জন্য তিনি

শক্তিমান হইলেও শক্তি ব্যবহার না করিয়া মানুষকে সুশিক্ষার দ্বারা সততা ও সভ্যতার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার আয়োজন করিয়াছিলেন। এবং এই কার্য্যে সক্ষমও হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান কালে মানুষের শক্তি এমন ভয়াবহরূপ ধারণ করিয়াছে যে, মানুষ শক্তি ব্যবহারে প্রলয়ের সূচনা করিতে পারে। এই কারণে সকল শক্তিমানগণই এখন চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে শক্তির ব্যবহার ক্রমশঃ মানবসমাজে পূর্ণরূপে বর্জ্জন করার ব্যবস্থা হয়। রুশিয়া আমেরিকা প্রভৃতি মহা শক্তিশালী জাতিগুলি এখন এই কার্য্যে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। এই সকল জাতি আনবিক অস্ত্রের ব্যবহারে এক মুহূর্ত্তে লক্ষ লোকের প্রাণ নাশ করিতে সক্ষম। কিন্তু সেই সক্ষমতাই তাঁহাদিগকে বুঝাইয়াছে যে প্রচণ্ড শক্তির পথ সর্ব্বমানবের ধ্বংশের পথ। তাঁহারা সেই জন্যই এখন দেখিতে চাহিতেছেন কেমন করিয়া অস্ত্র বর্জ্জন করিয়া মানবসভ্যতা শান্তিতে বাড়িয়া চলিতে পারে।

এই অবস্থায় যদি ক্ষীণজীবী স্বল্প অস্ত্রধারী ব্যক্তিগণ গায়ের জোরকেই ধর্ম্ম বলিয়া অবলম্বন করিয়া জীবনযাত্রার পথে প্রবলের রীতিনীতির অনুকরণ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে সেই কার্য্য একপ্রকার অভিনয় মাত্র হইয়া দাঁড়াইবে। এবং যদি ঐ সকল দুর্ব্বল ও অস্ত্রহীন ব্যক্তিগণ ভুল পথে চলিয়া সত্য সত্যই যুদ্ধে ফাঁসিয়া যান; তাহা হইলে তাঁহাদের অবস্থা শোচনীয় হইবে নিঃসন্দেহে। সুতরাং বাংলা দেশের মুখ্যমন্ত্রী যে সত্যাগ্রহ করিয়া অপরাধ নিবারণ চেষ্টা করিতেছেন; তাহা তিনি ঠিকই করিয়াছেন।

অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সহকর্ম্মী শ্রীজ্যোতি বসু সত্যাগ্রহ প্রভৃতিতে বিশ্বাস করেন কিনা আমরা জানি না। তিনি বিশ্বাস অবিশ্বাস প্রভৃতি মানসিক বিকার সম্বন্ধে কি মনোভাব পোষণ করেন তাহাও আমরা জানি না। অস্ত্র ব্যবহার করা সম্বন্ধে তাঁহার মত হয়ত "অ্যাড হক।" কিন্তু তিনি অজয়বাবুর কার্য্য ঠিক পছন্দ করিতেছেন না বলিয়া মনে হয়। কারণ তিনি সংখ্যা প্রমাণ (statistics) ব্যবহারে দেখাইতে চাহিয়াছেন, যে, দেশে অরাজকতা তেমন জমাট হইয়া উঠে নাই। ইহাতে মনে হয় যে অরাজকতা বৃদ্ধি পাইলে শ্রীজ্যোতি বসু তাহা আপত্তিকর বলিয়া মনে করিতে পারেন। তিনি যে সংখ্যাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৯৬৯ খৃঃ অব্দের অক্টোবর মাস অবধি বাংলা দেশে ডাকাতি, বলপূর্ব্বক লুঠ, চুরী (বাড়ীতে ঢুকিয়া) এমনি চুরী ও খুন কতগুলি হইয়াছে। এই সংখ্যাগুলি নিচে দেখান হইল।

বৎসর	ডাকাতির সংখ্যা	জোর করিয়া লুঠ	অন্দরে ঢুকিয়া চুরী	এমনি চুরী	খুন
১৯৬১	৫০৬	৫৮৯	৯০৯৬	১৯৫৬৭	৪২৯
১৯৬২	৭১০	৬২২	১০১৩২	২১৫২৪	৪৩৯
১৯৬৩	৬৬৪	৬১৮	১১০৬৭	২০৫৭৪	৪৪৬
১৯৬৪	৫১১	৫২২	১০৩৬৮	১৯৮২৮	৫২০
১৯৬৫	৫৪৩	৪৫২	৯৪৩৮	১৯৯৬৩	৪৩২
১৯৬৬	৬৫১	৫০৬	১০৪২০	২০৪৫৪	৪৪৯
১৯৬৭	৮২২	৬২৭	১১৯৮৭	২৭১০০	৫৮৪
১৯৬৮	৮৪৭	৬১৭	১০২৫২	২৩৮৮৩	৫৭৫
১৯৬৯ (অক্টোবর পর্য্যন্ত)	৭৩৯	৯৫	৮২৯৩	২৪৪৩০	৫৭৯

উপরোক্ত সংখ্যাগুলি হইতে শ্রীজ্যোতি বসু ইহাই প্রমাণ করিতে চাহিতেছেন, যে দেশের পুলিশের প্রকাশিত অপরাধের হিসাব মোটামুটি পূর্ব্বের মতনই আছে অপরাধ বৃদ্ধি হয় নাই। কিন্তু ঐ হিসাব হইতে অপরাধ ও আইনভঙ্গের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায় না। কারণ দেশে যা হইতেছে তাহাতে প্রধানত দেখা যায় দাঙ্গা হাঙ্গামা, মারামারি, ইট ও সোডার বোতল ছোঁড়াছুঁড়ি, হরতাল, ঘেরাও, বাস-ট্রাম জ্বালান, স্ত্রীপুরুষ নির্ব্বিচারে ধাক্কা দেওয়া ও অপমান করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এই জাতীয় ঘটনার কোন হিসাব পুলিশ রাখে না এবং তাহা শ্রীজ্যোতি বসুর নিকট পেশ করে না। ছুরিছোরা দেখাইয়া ভয় দেখান, পূজার চাঁদা আদায় করিবার জন্য মানুষকে শাসান, গুণ্ডাবাজী, দোকান হইতে জিনিস তুলিয়া লওয়া। ক্ষেত হইতে ধান কাটিয়া লওয়া গাছ হইতে ফল ও পুকুর হইতে মাছ তুলিয়া, লওয়া প্রভৃতি অরাজকতাজ্ঞাপক কার্য্যও পুলিশের হিসাবে পাওয়া যায় না। এই জাতীয় আইন-অমান্যকর কার্য্য বাংলায় সর্ব্বত্র প্রবলভাবে করা হইতেছে ও যখন হয় তখন শ্রীজ্যোতি বসুর পুলিশ তাহা থামাইবার বিশেষ চেষ্টা করে না। দেশের মানুষ তাঁহার মন্ত্রীত্ব সম্বন্ধে ক্রমশঃ আস্থা হারাইয়াছে। অজয়বাবু সম্বন্ধেও কোন আস্থা নাই। কিন্তু তাঁহার মনোভাব সম্বন্ধে কাহারও অশ্রদ্ধা নাই।

অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের সত্যাগ্রহ আরম্ভ হইবার পরে বাংলা দেশে অপরাধ বৃদ্ধি কিছুটা হ্রাস হইয়াছে বলিয়া কাহারও কাহারও মনে হয়। অর্থাৎ খুনের সংখ্যা আর বাড়ে নাই। কিন্তু ঘরে আগুন লাগান, লুঠ, ধান কাটিয়া লওয়া, স্ত্রীলোকদিগের নিকট হইতে অলঙ্কার প্রভৃতি কাড়িয়া লইয়া অথবা, তাঁহাদিগকে অপমান করা, মারপিট, দাঙ্গা, ঘেরাও ইত্যাদি কিছুমাত্র কমে নাই।

সুতরাং শ্রীজ্যোতি বসুর জন সমক্ষে বড়াই করিবার বিষয় কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি যদি বাংলার সকল মানুষকে মাওবাদ কিম্বা মার্কসবাদের বাঙ্গালীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনে সক্ষম হইতেন তাহা হইলে না হয় আমরা তাঁহার প্রভুত্বই স্বীকার করিয়া লইয়া নূতন পথে জীবন ধারা প্রবাহিত করিয়া লইতে পারিতাম। কিন্তু তাঁহার আদর্শবাদের ধাক্কায় যদি অনৈক্য ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে, তাহা হইলে তাঁহার প্রভুত্ব সর্বনাশের কারণ হইবে এবং সেই প্রভুত্বের অবসান আবশ্যক। আমরা চাই বাংলা দেশে শান্তিপূর্ণভাবে সকলে খাইতে পরিতে পায় ও জীবনপথে কিছুটা অন্ততঃ অগ্রগমনে সক্ষম হয়। কিন্তু যাহা দেখিতেছি তাহাতে মনে হয় বাংলার প্রতিভা, বাংলার জাতীয় উন্নতি ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠা, সকল কিছুই ক্রমে ক্রমে রসাতলে যাইতেছে। কোন বিদেশী আদর্শবাদের তাৎপর্য কি তাহার আবৃত্তি করিয়া কোন জাতি নিজের মানসিক রসঅনুভূতির পূর্ণপ্রকাশ করিতে পারে না। এবং যেটুকু পারে তাহার কোন বিশেষ মূল্য থাকে না, এই কারণে যে তাহা মনের ক্ষেত্রে জোর করিয়া ও কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন আবেগের ফল। বাংলা দেশের মানুষ ইয়োরোপ আমেরিকার ঝড়তি পড়তি মনোভাব লইয়া নাড়াচাড়া করিয়া মানসক্ষেত্রে দিন-গুজরাণ করিবে, ইহা কোন বিশেষভাবে বাঞ্ছনীয় অবস্থা নহে। আমাদের রাজনীতিবিদগণ একথা মনে রাখিলে ভাল হয়।

দারিদ্র্যের কারণ কি ?

ভারতবর্ষের মানুষ দরিদ্র। তাহার যথেষ্ট ও উপযুক্ত খাদ্য জোটে না। পরিধানের বস্ত্র, শীত হইতে বাঁচিবার দেহাবরণ, শয্যা ও শয়নের খাটিয়া অথবা গদি, বাসস্থান ও সেখানে জলের ব্যবস্থা, উপযুক্ত শৌচাগার ইত্যাদিও ভারতের মানুষের নাই। আসবাব, আভরণ সঞ্চয়, জমিজমা, যানবাহন ও অন্যান্য যাহা কিছুতে মানুষের ঐশ্বর্য্য রূপায়িত হয়, সে সকল বস্তুর কথা ভারতের মানুষের শতকরা পঁচানব্বই জনের ক্ষেত্রেই উঠে না। এই দারিদ্র্যের কারণ কি ? কেহ বলেন

প্রভুত্বে শত শত বৎসর থাকার ফলে ভারত আর্থিক উন্নতি লাভ করে নাই, কেহ বা বলেন যে,শোষণের ফলে অল্প সংখ্যক ব্যক্তি অপর সকলের সম্পদ অন্যায়ভাবে কাড়িয়া লইয়া অধিকাংশ দেশবাসীকে গভীর অভাবের পঙ্কে নিমজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। এই সকল কথাই কিছু কিছু সত্য কিন্তু ভারতের দারিদ্র্যের কারণ বিচার করা এই সকল কথাতে সম্পূর্ণ হয় না! প্রাকৃতিক কারণ কি যাহার জন্য দারিদ্র্য ঘটিতে পারে? ধরা যাউক জলের অভাবে উত্তমরূপে চাষ করা সম্ভব হয় না। চাষ যথাযথভাবে হয় না এবং জলাভাবে আকাশের দিকে চাহিয়া জলের আশায় বসিয়া থাকিয়া ভারতের মানুষ অদৃষ্টে বিশ্বাস করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে এবং উদ্যম ও কর্ম্মশক্তিতে বিশ্বাস না করাই তাহার স্বভাব দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এই ভারতেই প্রাচীন কাল হইতে জলসেচনের বহু আয়োজন মানুষ বহু পরিশ্রম করিয়া সাধিত করিয়াছে ও তাহার ফলে তাহার অভাবও বহুস্থলে দূর হইয়াছে। সুতরাং এ কথা ঠিক নহে যে, ভারতীয় মানুষ অদৃষ্টবাদী ও কর্ম্মশক্তিতে অবিশ্বাসী। ভারতের মানুষই কোন সময় বৃহৎ বৃহৎ জলাশয় খনন; নদীর জল খাল কাটিয়া লইয়া যাওয়ার ব্যবস্থা করা, গভীর কূপ খনন ও বাঁধ বাঁধিয়া বর্ষার জল ধরিয়া রাখা ও বর্ষার জল যখন নদীতে বন্যা ঘটায়, তখন সেই বন্যার জল ও খাল কাটিয়া দূর দূরান্তরে পাঠাইয়া তত্রস্থ জলাশয়ে সংরক্ষণ করিবার আয়োজন করিয়াছে। ভারতের মানুষ বিরাট বিরাট শিক্ষাকেন্দ্র, দুর্গ, মন্দির, প্রাসাদ, রাজপথ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া দেখাইয়াছে যে, বস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে তাহার প্রতিভা, দর্শন ও ন্যায়ের ক্ষেত্রের মনীষার তুলনায় কম ছিল না। সুতরাং প্রকৃতিকে কর্ম্মের দ্বারা নিজকার্য্যে নিযুক্ত করিতে ভারতীয় মানুষ অক্ষম ছিল না। বিদেশীর প্রভুত্ব বর্ত্তমান থাকিলেও ভারতের মানুষ কর্ম্মে অপারগ ছিল না। কিন্তু কোন এক সময় ভারতের মানুষ উপযুক্ত নেতৃত্ব না পাইয়া ক্রমশঃ অসহায় হইয়া পড়িতে আরম্ভ করে। তখন হইতেই তাহার দৈন্যের সূচনা ও সে তাহার তাহাতেই-তৃপ্ত-ভাব দেখাইয়া জগতের অপর জাতিদিগকে আশ্চর্য্য করিতে আরম্ভ করে। ১৯৪৩ খৃঃ অব্দে যখন বাংলায় ১৪লক্ষ মানুষ না খাইতে পাইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখনও কেহ প্রাণ বাঁচাইবার জন্য কোন আড়ত বা সরকারী ভাণ্ডার লুঠ করে নাই। এইভাবে মৃত্যু বরণ করা অপর জাতির লোকেরা বুঝিতে অক্ষম। সেই সময় কোন কোন দলের জননেতাগন সকলকে বুঝাইতেন যে, যদি লুটপাট আরম্ভ হয় তাহা হইলে বৃটিশের ফ্যাশিষ্টদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাধাপ্রাপ্ত হইবে; সুতরাং মানুষ-মরা নিবারণ চেষ্টা না করাই সমীচীন। যে দেশে এইরূপ পুরুষত্বহীন নেতৃত্ব গজাইতে পারে সে দেশের মানুষ যে নিশ্চেষ্টভাবে আকাশের দিকে তাকাইয়া দিন কাটাইবে ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। ভারতে মুসলমান ও তৎপরে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ভারতের নিজস্ব নেতৃত্বের প্রতিভা ও কর্ম্মের প্রেরণা ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া অবশেষে না থাকার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। যে সতেজ কর্ম্মশক্তি মহা পরাক্রমে সকল বাধা বিপত্তিকে অপসৃত করিয়া মানুষকে দারিদ্র্যের দুর্দ্দশা হইতে তুলিয়া জীবনের পূর্ণতার মধ্যে বসাইয়া দেয়, ভারতের নেতাদিগের মধ্যে সে পৌরুষ ও শৌর্য্য বহুকাল হইতে আর দেখা যায় না। সেই নেতাগণ তাই ভারতের দারিদ্র্যের মিথ্যা কারণ দেখাইয়া নিজেদের অক্ষমতা লুকাইবার চেষ্টা করেন। যে দেশের মানুষের গড়পড়তা মাথা পিছু বাৎসরিক আয় মাত্র ৩০০৲ টাকা সেই দেশের কাহার টাকা কে লইয়া যায় ও কেইবা কাহার ঐশ্বর্য্য শোষণ করিয়া ফাঁপিয়া উঠে? সকল মানুষের সকল সম্পদ সমানভাবে ভাগ করিলে যেখানে মাসিক ২৫৲ টাকা মাত্র কেহ পাইতে সক্ষম হইবে, সেখানে অন্ধও দেখিতে পায় যে, উৎপাদনী-শক্তির ব্যবহার হইতেছে না এবং সেই জন্যই এই নিদারুণ দৈন্য ও অভাব। অল্পসংখ্যক মানুষ বহু-সংখ্যক মানুষকে শোষণ করিতেছে বলিলে গড়পড়তা মাথা পিছু মাসিক ২৫ টাকার কথাটার ভিতরের অর্থটা যাহা আছে তাহাই থাকিয়া যায়। গড়পড়তা

নির্ব্বিচারে ঐ মাসে ২৫৲ টাকাই থাকিয়া যায়।

আসল কথা ভারতবর্ষে বা অন্য কোন দেশে যাহারা শোষিত হয় তাহারা অপরের নিযুক্ত কর্ম্মী হিসাবে যাহা উৎপাদন করে তাহার অল্প অংশই মজুরী হিসাবে পায়। বাকি যাহা থাকে তাহা নিয়োক্তার ভাগে লাভ হিসাবে থাকিয়া যায়। অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন হয় তাহার মূল্যের অনেকাংশ উৎপাদককে না দিয়া নিযোক্তার ভোগে লাগে। যাহারা চাষ করে তাহারা যদি এত খাজনা দিতে বাধ্য হয় যাহাতে খাজনা দিবার পর আর বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না তাহা হইলে সেইখানেও শোষণ চলিতেছে বলা যায়। ভারতবর্ষে কিন্তু অধিকাংশ লোকই কোন কার্য্যে কাহারও দ্বারা নিযুক্ত নহেন। অথবা তাঁহারা চাষবাসও করেন না। এক্ষেত্রে ঐরূপ নিষ্কর্ম্মা লোককে শোষণ করা একটা মহা অসম্ভব কাজ। সুতরাং ভারতের দারিদ্র্য কোন সর্ব্বব্যাপী শোষণ-রীতির ফলে হইয়াছে ভাবিবার কোন অর্থ হয় না। কারণ ঐ দারিদ্র্য এতই সর্ব্বত্র বিস্তৃত ও প্রগাঢ় যে তাহা ঐশ্বর্য্য-শালী সকল ভারতবাসীর সকল ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইয়া সর্ব্বজনে বিতরণ করিয়া দিলেও গড়পড়তা আয় হইবে মাসিক মাথা পিছু ২৫৲ টাকা।

ভারতের দারিদ্র্য হইল সাধারণভাবে সর্ব্বজনের সকল সম্পদের অভাব। উহা দূর করিবার উপায় হইল সম্পদ উৎপাদন। অর্থাৎ সকল বা অধিকাংশ ভারতবাসী যদি কিছু না কিছু উৎপাদনে লাগিয়া যান তাহা হইলে গড়পড়তা রোজগারটি বাড়িয়া যাইতে পারে। এখন শুধু শতকরা ৫।৭ জন মানুষ মাত্র পূর্ণউদ্যমে উৎপাদনের কাজে লাগিয়া আছে। এই পাঁচ সাতজন মানুষ যে কাজ করে তাহার ফল অনেকটা উৎপাদক পায় না এবং পায় উৎপাদনের ব্যবস্থাপক মূলধন সরবরাহকারী মালিকগোষ্ঠী। ভারতের অর্থনীতির এই অংশ খুব বিরাট নহে। ইহার মোট উৎপাদিত সম্পদের বাৎসরিক পরিমাণ যাহা তাহা হইতে ৩২ লক্ষ কর্ম্মী ৬৫০ কোটি টাকা পাইয়া থাকে। অর্থাৎ ভারতের এই অংশের বৃদ্ধির পরিমাণ ১২০০ কোটি টাকা বাৎসরিক। ইহার মধ্যে অর্দ্ধেকের অধিক কর্ম্মীরা পায়। ইহাদের গড়পড়তা বাৎসরিক আয় মাথা পিছু ২০০০ টাকা অর্থাৎ ভারতের মানুষের গড়পড়তা রোজগারের ৬ গুণেরও অধিক। কাঁচামালের মূল্য ইত্যাদি যোগ করিলে মোট উৎপাদিত মূল্যের পরিমাণ হয় ৩০০০ তিনহাজার কোটি টাকার অধিক। ভারতের মোট বাৎসরিক উৎপাদনের পরিমাণ সব মিলাইয়া প্রায় বহু সহস্র কোটি টাকা হয় এবং সেই জাতীয় আয়ের অধিকাংশই এখন মানুষের দ্বারা উৎপাদিত. যাহারা কাহারও নিযুক্ত কর্ম্মী নহে। এই সকল কর্ম্মী কখন কাজ করে কখনও কাজ করে না। বহু সংখ্যক লোক প্রায় পূর্ণ বেকার। এই কারণেই ভারতের জাতীয় আয় যাহা হওয়া উচিত ও সহজেই সম্ভব তাহার এক চতুর্থাংশ মাত্র হইয়াছে। সকল মানুষ যদি কর্ম্মে আত্মনিয়োগ করিত তাহা হইলে ভারতের জাতীয় এবং ভারতীয়দিগের ব্যক্তিগত আয় হইত অনেক অধিক। কিন্তু ভারতের নেতাগণ কোন সময়েই মানুষকে পূর্ণ উদ্যমে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করেন নাই। স্বদেশী আন্দোলনের সময় অনেক চেষ্টা হইয়াছিল কোন কোন কর্ম্মক্ষেত্রে ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করিয়া বৃটিশ ব্যবসা অপসারণ ব্যবস্থা করিবার। ব্যাঙ্ক, বীমাপ্রতিষ্ঠান, কাপড়ের কল, চা বাগান, পাটের কল, ছোট ইঞ্জিনিয়ারীং প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি ঐ সময়ের চেষ্টায় বৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের বিরাট জনশক্তির পূর্ণ ব্যবহার চেষ্টা কেহ কখন করে নাই। আজ ব্যাঙ্ক ও বীমাপ্রতিষ্ঠান জাতীয় করিয়া লওয়া হইয়াছে। কিন্তু সেই সকল প্রতিষ্ঠানের গঠনে যে কর্ম্মশক্তি সেইগুলির উদ্যোক্তা ও প্রতিষ্ঠাতগণ দেখাইয়াছিলেন, সেই কর্ম্মশক্তির অল্পাংশও প্রতিষ্ঠান-গুলিকে এখন যাঁহারা জাতীয় করিয়া লইয়াছেন সেই রাষ্ট্রনেতাদিগের নাই। কোন কাজ না করিয়া অপরের কর্ম্মশক্তির ফল উপভোগ চেষ্টা অলস ও নিষ্কর্ম্মা লোকের পক্ষে স্বাভাবিক! আমাদের রাষ্ট্রনেতাগণ ঐ দোষে দোষী। তাঁহারা যাহাই করিতে যান তাহা অচিন্ত্যাৎ

আত্মশ্লাঘা অনুভব করিতে থাকেন। এই দোষের ফলে যত রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তাঁহারা ঋণ করিয়া বসাইয়াছেন তাহার প্রায় সকলগুলিই লোকসানে চলিতেছে। সুতরাং রাষ্ট্রীয়করণ অর্থনৈতিক দিক দিয়া ভারতীয় উৎপাদনী প্রতিষ্ঠানগুলির পক্ষে লাভজনক হয় নাই। উপরন্তু ভারতে যেটুকু আর্থিক গঠনশীলতার প্রতিভা ও প্রেরণা আছে, রাষ্ট্রীয়তার দোহাই দিয়া সেটুকুকে গলা টিপিয়া মারিয়া জাতির কতটা মঙ্গল হইবে তাহাও ঠিক বোধগম্য হইতেছে না। কারণ রাষ্ট্রনেতাগণ ভারতে সহজেই সর্ব্বক্ষেত্রে অবনতির পথে গড়াইয়া যান।

ধনী ও দরিদ্র লোকের সংখ্যার তারতম্য

আমাদের দেশের বহু চিন্তাশীল ব্যক্তি বুঝিতে পারেন না কেন এ দেশে গরীবের সংখ্যা এত অধিক ও ধনীগণ সংখ্যায় এত কম। অনেকে ঐ কথাটাই ঘুরাইয়া বলেন যে, অল্প সংখ্যক ধনীর হস্তে জাতীয় সম্পদের একটা অংশ রক্ষিত আছে ও বহু দরিদ্র ব্যক্তি অতি অল্পবিত্তভাবে জীবন যাপন করিতেছে। একথা বলা বাহুল্য যে, যাহারা ধনবান তাহাদের ঐশ্বর্য্যের উৎপত্তি তাহাদের তুলনায় দরিদ্র কর্ম্মীদের কর্ম্মক্ষমতার মধ্য হইতেই। কিন্তু ভারতের সাধারণ মানুষ ঐ সকল শোষিত কর্ম্মীদের তুলনায় আরও অনেক দরিদ্র। আমরা পুর্ব্বে এক স্থলে দেখাইয়াছি যে, ধনীদিগের সহিত সকল, সম্বন্ধ বর্জ্জিত যে সকল কোটি কোটি মানুষ ভারতবর্ষে বাস করে তাহারা মাথা পিছু পায় মাসিক পঁচিশ টাকা মাত্র। যাহারা ধনীদের দ্বারা নিযুক্ত তাহারা গড়ে পায় মাসিক ১৫৬ টাকা। সুতরাং শোষিত হইলেও ধনীদের নিযুক্ত লোকেরা অপর গরীবদিগের তুলনায় ছয়গুণ বেশী রোজগার করিয়া থাকে। ভারতে গরীবের সংখ্যা যে এত অধিক তাহার কারণ আমরা দেখাইয়াছি উৎপাদনী কার্য্যের অভাব। ভারতের নেতাগণ সকল দেশবাসীকে উৎপাদন কার্য্যে লাগাইতে না পারার ফলেই এই দারিদ্র্য। তাঁহাদিগের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাগুলি শুধু কোথাও কারখানা, কোথাও জলসেচের ব্যবস্থা ও অপর হইয়াছে। সাধারণভাবে সকল ভারতবাসীকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা তাঁহারা করেন নাই। এই কারণে বলা যায় গরীবের সংখ্যাধিক্যের জন্য ঐ নেতারাই দায়ী। ঐ অসংখ্য গরীবদিগকে কিছু কিছু শোষণ একমাত্র ভারত বা প্রাদেশিক সরকারই করিয়া থাকেন —রাজস্ব আদায়ের ভিতর দিয়া। কারণ সরকারী খাজনা মাসুল প্রভৃতি সকলেই দিয়া থাকেন বস্ত্র, তামাক চিনি প্রভৃতি ক্রয় করিলেই এবং গরীব মানুষরা ইহা হইতে বাদ যান না।

কলিকাতায় অষ্ট্রেলিয়ান ক্রিকেট

এই বৎসর ভারতবর্ষে যে "টেষ্ট" ক্রীকেট প্রতিযোগিতা হইতেছে তাহার চতুর্থ খেলাটি হয় কলিকাতায়। এই খেলায় যাহা যাহা ঘটিয়াছে তাহার মধ্যে তিনটি বিষয় উল্লেখযোগ্য। প্রথমত ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দিগের লজ্জাকর ভাবে পরাজয় হওয়াতে কলিকাতার ক্রীকেট উৎসাহিগণ বড়ই ব্যথিত ও লজ্জিত হইয়াছেন। প্রথম ইনিংস এ ভারত করেন ২১২ রান ও অষ্ট্রেলিয়া ৩৩৫ রান। ইহার পর মাত্র দুই দিনের খেলা বাকি ছিল; কিন্তু ভারতীয়দল দ্বিতীয় ইনিংস্ এ এত অল্প রান করিয়া, আউট হইয়া যায় যে অষ্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংস্-এ কোন উইকেট না হারাইয়াই ভারতের মোট রান সংখ্যা অতিক্রম করিয়া ভারতকে দশ উইকেটে পরাজিত করে। ঐ দিন প্রাতঃকালে বহু সহস্র লোক দৈনিক টিকেট ক্রয় করিবার জন্য কিউ বাঁধিয়া ক্রীড়া-ক্ষেত্রের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল। টিকেট বিক্রয় আরম্ভ হইবার পুর্ব্বেই শোনা যায় যে, ঐ স্থলে কিছু ধাক্কাধাক্কি ও মারপিট হওয়াতে পুলিশ সেখানে ঘোড় সওয়ার দিয়া জনতার উপর হামলা করে, লাঠি চালায় ও ফলে লোকজন ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়নপর হয়। তাহারা পুলিশকেও আক্রমণ করে এবং পুলিশ কাঁদুনে গ্যাসের গোলা চালায়। এই সকল হাল্লাহাঙ্গামার মধ্যে পড়িয়া ছয়জন বালক ও যুবক জনতার নিষ্পেষণে মারা যায়। ক্রীড়াক্ষেত্রে এইরূপ ঘটনা কলিকাতায় কোথাও

সম্বন্ধে একটা মহা বিতৃষ্ণার ভাব জাগ্রত হইয়াছে। আরও কথা হইয়াছে যে কেন বহু বক্তৃতা দিয়াও কলিকাতায় উপযুক্ত রকম ষ্টেডিয়াম নির্ম্মাণ করা হয় নাই। যেখানে এক বা দুইলক্ষ লোক খেলা দেখিতে চাহে, সেখানে মাত্র পঞ্চাশ হাজার দর্শকের স্থান থাকিলে কেমন করিয়া হাল্লাহাঙ্গামা না হইয়া শান্তিরক্ষা সম্ভব হইতে পারে?

তৃতীয় কথা অষ্ট্রেলিয়ানদিগের ব্যবহার। তাহারা নাকি সেইদিন প্রেস-ফোটোগ্রাফারদিগকে প্রহার করিয়াছে, গালি দিয়াছে এবং পরের দিনও জাতি তুলিয়া অসম্মানজনক কথা বলিয়াছে। এই কারণে বাঙ্গালোরে তাহাদিগকে প্রেস-ফোটোগ্রাফারগণ বয়কট করিয়াছে। একথা মানিতেই হইবে যে, ভারতীয় ক্রীড়া-দর্শকগণ সভ্যতা ও ভদ্রতার জন্য বিখ্যাত নহেন। তাঁহারা ইষ্টক ও বোতল নিক্ষেপ করিয়া হর্ষ বা বিষাদ জ্ঞাপন করিতে অভ্যস্ত এবং প্রায়ই দৌড়িয়া ক্রীড়াপ্রাঙ্গণে অনুপ্রবেশ করিয়া খেলোয়াড়দিগকে ভীত সন্ত্রস্ত করিয়া তোলেন। এইরূপ ঘটিলে বাহিরের খেলোয়াড়গণ ভারতীয়দিগকে সর্ব্বদা সসম্মানে অভ্যার্থনা করিবে এরূপ আশা করা যায় না। তাহা হইলেও অষ্ট্রেলিয়ানদিগের অসভ্যতা নীরবে সহ্য করাও উচিত নহে। আমরা জানিতে উৎসুক রহিলাম এ বিষয়ে ভারত সরকার বা অন্য কোন প্রকৃষ্ট ক্ষমতাবান কেহ কি করিলেন বা বলিলেন।

ব্যাঙ্কে ডাকাতি ও দ্বারপাল হত্যা

সম্প্রতি কলিকাতার জনবহুল রাজপথে প্রতিষ্ঠিত ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার পার্ক ষ্ট্রীট শাখাতে একটি সশস্ত্র ডাকাতি হইয়া গিয়াছে। প্রাতে ব্যাঙ্ক খুলিবার সময় কয়েকজন অস্ত্রধারী যুবক গাড়ী চড়িয়া উক্ত স্থলে উপস্থিত হইয়া ব্যাঙ্ক লুঠ করে। তাহারা ঠিক জানিত শাখায় কি প্রকারে বাক্সে টাকা রাখা হয় এবং তাহারা ব্যাঙ্কের ভিতরের বেড়া যথাস্থানে ডিঙ্গাইয়া সেই সকল বাক্স তুলিয়া লইয়া পলায়ন করে। ব্যাঙ্কে ঢুকিয়াই ডাকাইতগণ ছাদের দিকে লক্ষ্য করিয়া গুলি চালায় ও সকলকে ভয়াকুল করিয়া নিজেদের দুষ্কার্য্য সম্পন্ন করিয়া লয়। একজন দারোয়ান নিজের বন্দুকে টোটা ভরিতে যাওয়ায় ডাকাইতগণ তাহাকে গুলি মারে ও সে বেচারা গুলির আঘাতে মারা যায়। ডাকাইতগণ চার লক্ষের অধিক টাকা লুঠ করে। এখন অবধি তাহাদিগের ব্যবহৃত দুইটি গাড়ীই পুলিশ নিকটের রাস্তায় পরিত্যক্ত অবস্থায় পাইয়াছে। গাড়ীতে কিছু কিছু লাল পতাকা ও মাওবাদী পুস্তিকা পাওয়া গিয়াছে কিন্তু পুলিশের মতে উহা লোকের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃজন চেষ্টা মাত্র। ডাকাইতগণ যদি বৌদ্ধধর্ম্ম, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ বা অপর কোন মতবাদে বিশ্বাসী হইত তাহা হইলে তাহাদিগের অপরাধ কম হইত না। পরদ্রব্য লুণ্ঠন ও নরহত্যা যে জাতীয় অপরাধ তাহা যে কেহই করুক না কেন তাহার গর্হিত ভাব অপরাধীর রাষ্ট্রীয় মতামতের জন্য কমেবাড়ে না। এবং ধরা পড়িলে অপরাধীর শাস্তিও অপরাধীর শাস্ত্রমত অনুসারে নির্দ্ধারিত হয় না।

ভারতের সর্ব্বত্রই অপরাধপ্রবণতা বর্দ্ধনশীল। ইহার কারণ শাসন বিষয়ে সকল প্রদেশেই শাসনকর্ত্তারা শিথিল ও অসমর্থ। রাষ্ট্রে সর্ব্বক্ষেত্রেই কেহ নিজ কর্ত্তব্য কড়া নজরে দেখিয়া নির্ভীকভাবে করে না। ঢিলাভাব সর্ব্ববিষয়েই দেখা যাইতেছে এবং সেই কারণে আইন, নিয়ম বা শৃঙ্খলার কোন মর্য্যাদা রক্ষিত হইতেছে না। শুধু পুলিশকে দোষ দেওয়ার কোন সার্থকতা নাই। কারণ যদি সকল কার্য্যে সকল কর্ম্মচারীকে নিজ নিজ কর্ত্তব্য করিতে বাধ্য করা হয় তাহা হইলে পুলিশও নিজ কর্ত্তব্য আপনা হইতেই করিবে।

ইউ এফ মন্ত্রীদের মৌরসি পাট্টা

সম্প্রতি ইউ এফ দলের কোন কোন পাণ্ডা মত প্রকাশ করিয়াছেন যে,দলের যে সকল মন্ত্রী যে যে কার্য্যের ভার লইয়া মন্ত্রীত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন তাঁহাদিগকে সেই সকল কার্য্য হইতে সরাইয়া দিবার অধিকার কাহারও নাই। অর্থাৎ শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় যদি মনে করিয়া থাকেন যে তিনি ইচ্ছা করিলে কোন মন্ত্রীকে নিজ কার্য্য ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করিতে পারেন; তাহা তিনি-

করিতে পারেন না; কারণ ইউ এফ দল গঠিত হইবার সময় কে কোন মন্ত্রীত্ব পাইবে তাহার সম্বন্ধে সর্ত্ত করিয়া দল গঠিত হইয়াছিল এবং সেই ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করিলে দল আর চালিত থাকিতে পারিবেনা। অজয়বাবু যদি কাহারও মন্ত্রীত্ব কাড়িয়া লয়েন তাহা হইলে তিনি সর্ত্ত ভাঙ্গিয়া ইউ এফ দল গঠনের মূলে কুঠারাঘাত করিবেন। আইনতঃ তাঁহার সে অধিকার থাকিলেও নৈতিক দিক দিয়া তাঁহার সে অধিকার নাই বলিয়াই ধরিতে হইবে।

এই সকল যুক্তি তর্কের মূল্য রাষ্ট্রীয়দলের লোকেরা যাহাই ধার্য্য করুন না কেন, জনসাধারণ বিষয়টাকে সেই-ভাবে দেখিতে পারেন না। তাঁহারা দেখিবেন যে, কোন কার্য্যভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিজ কার্য্য কর্ত্তব্যনিষ্ঠভাবে করিতেছেন কি না। যদি কোন মন্ত্রী নিজকার্য্য অবহেলা করিয়া যথেচ্ছাচারে আত্মনিয়োগ করেন; তাহা হইলে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় তাঁহাকে নিষ্কাষিত না করিলেও জনসাধারণ তাঁহাকে যথা শীঘ্র বিদায় দিবার চেষ্টাই করিবেন। শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে বাংলা দেশের জনগণ মুখ্য মন্ত্রীর আসনে বসাইয়াছে তিনি দেশের শাসন কার্য্য শৃঙ্খলার সহিত চালাইবেন বলিয়া। তিনি বা তাঁহার অনুচরগণ যদি নিজ নিজ কার্য্য না করেন তাহা হইলে সাধারণের পূর্ণ অধিকার থাকিবে অক্ষম ও কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন মন্ত্রীদিগকে পদত্যাগ করিয়া সরিয়া যাইতে বলিবার। ইউ এফ দলের অংশীদার-দিগের মধ্যে মন্ত্রীত্বের ভাগ-বাটোয়ারার যে ব্যবস্থাই হইয়া থাকুক না কেন; বাংলার জনসাধারণ সে ব্যবস্থার বন্ধনে বাঁধা থাকিতে কোনভাবেই বাধ্য নহেন। তাঁহারা যে কোন সময়েই যে কোন মন্ত্রীকে বলিতে পারেন যে সেই মন্ত্রী নিজ কর্ত্তব্য করিতেছেন না এবং তাঁহার কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া প্রয়োজন। জনমত বিচার করিয়া অজয়বাবুরও কর্ত্তব্য হইবে অকর্ম্মণ্য ও দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রীদিগকে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করিতে। তিনি যদি তখন ইউ এফ গঠনের আদি সর্ত্তের কথা ভাবিয়া নিজ কর্ত্তব্য না করেন তাহা হইলে জনমত বলিবে তাঁহারও কার্য্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাওয়া আবশ্যক। জনসাধারণ কোন মন্ত্রীরই মৌরসি পাট্টাতে বিশ্বাস করে না। মন্ত্রীত্বের স্থিতি উপযুক্তভাবে কার্য্য করার উপরে।

স্বামী বিবেকানন্দ-স্বদেশে ও বিদেশে

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্ত্তী

বিবেকানন্দের জীবনসাধনাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, তা তিনটি মার্গের মধ্যে দিয়েই সিদ্ধিলাভ করেছে। প্রথমে জ্ঞানমার্গ পরে ভক্তিমার্গ এবং সবশেষে কর্ম্মমার্গ। তাঁর কৈশোর-জীবন অতিক্রান্ত হবার পর থেকে ছাত্রজীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত অবস্থাকে জ্ঞানমার্গ বললে বোধ হয় ভুল হবেনা। কেননা ঐ সময়ের মধ্যে কেবলমাত্র "ছাত্রাণাং অধ্যয়নং তপঃ" এই সাধুবাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করা ছাড়া তিনি এমন কিছু করেছিলেন যার ফলে তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের গতিপথ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। স্কুল ও কলেজের নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যক্রম অনুশীলন করাই সকল ছাত্রের কর্ত্তব্য। যাঁরা মেধাবী ছাত্র তাঁরা পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের নিমিত্ত অতিরিক্ত পাঠ্যক্রম অধিগত করেন এবং উত্তরকালে সার্থক কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করেন। কিন্তু বিবেকানন্দ কখনও সেই পথ অনুসরণ করেননি। অর্থাৎ কোনও পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করার আকাঙ্খা কখনও তাঁকে উদগ্রীব করে তোলেনি। তিনি বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতা নিয়ে। ছাত্র হিসাবে তিনি কৃতী না হয়েও একাগ্রচিত্ত, অধ্যবসায়ী ও স্বকর্ত্তব্যনিষ্ঠ ছিলেন। আর সবচেয়ে বড় কথা এই যে, বিদ্যার্জ্জন কালে তিনি আদৌ অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার এবং গতানুগতিকতাকে প্রশ্রয় দেননি। ছাত্রের অনুসন্ধিৎসা সংস্কারমুক্তমন, বৈজ্ঞানিক-মনন এবং সর্ব্বোপরি দৃষ্টিভঙ্গীর ঔদার্য্য নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। প্রাচ্যের প্রাচীনশাস্ত্র, দর্শন ও ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের আধুনিক সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানকে সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করার দৃষ্টান্ত সেযুগে আর কেউ প্রদর্শন করতে সক্ষম হননি। তাঁর আদর্শ ছিল যেন উপনিষদের সেই বাক্য "অবিদ্যয়া মৃত্যুংতীর্ত্বা বিদ্যয়া অমৃতমশ্নুতে" অর্থাৎ অবিদ্যারূপ-মৃত্যুকে উত্তীর্ণ হয়ে বিদ্যারূপ অমৃতত্ব লাভ করতে হয়। বিবেকানন্দের বিদ্যার্জ্জন অভীপ্সা কিন্তু নির্ব্বিচার ছিলনা। কি প্রাচ্য কি পাশ্চাত্য উভয়দেশের সম্বন্ধে তিনি যা কিছু জ্ঞানলাভ করেছিলেন তার মূলে ছিল নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি এবং প্রতিটি তত্ত্ব ও তথ্য সম্বন্ধে গভীর বৈজ্ঞানিক এষণা। এর ফলে যে কোনও বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ না হওয়া-পর্য্যন্ত তিনি অনুসন্ধান-প্রচেষ্টা থেকে বিরত হতেন না। তাঁর প্রশ্নের সঠিক জবাব না মেলা পর্য্যন্ত তিনি অন্বেষণ ও অনুধাবন অব্যাহত রাখতেন। তাই স্বদেশের ও বিদেশের শিক্ষাকে নিঃশেষে অধিকার করার পরও তাঁর জ্ঞানের আকাঙ্খা যেন নির্ব্বাপিত না হয়ে দ্বিগুণ হয়ে জ্বলে উঠল। তাঁর মনে নানা জিজ্ঞাসা তোলপাড় করতে থাকল। একের পর এক তিনি শিক্ষক, অধ্যাপক ও আচার্য্যস্থানীয় ব্যক্তিগণের সমীপবর্ত্তী হয়ে নিজের সকল জিজ্ঞাসার জবাব সংগ্রহ করতে থাকলেন। তারপরে এল আত্মজিজ্ঞাসার সেই তুরীয় অবস্থা—জ্ঞানের শেষ অগ্নিপরীক্ষা। যে প্রশ্ন সৃষ্টির আদিকাল থেকে যুগযুগে ভক্ত সাধক ও জ্ঞানী তপস্বীকে নাড়া দিয়েছে, অভিভূত করেছে, সেই অনাস্বাদিত চিরবাঞ্ছিত প্রশ্নের সূর্য্যোদয় তাঁর মনেই দেখা দিল। অর্থাৎ স্বচক্ষে ভগবানদর্শনের বাসনা তাঁকে পেয়ে বসল। তিনি ছুটে গেলেন ব্রহ্মানন্দ কেশব সেনের অন্যতম অনুগামী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সান্নিধ্যে, উপস্থিত হলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্মুখে। কিন্তু কোথায় সেই প্রশ্নের উত্তর? বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে এলেন। উদ্‌ভ্রান্ত অবস্থায় আরও কিছুদিন কাটল। অশান্ত হৃদয় অধীরচিত্ত—কিন্তু লক্ষ্যের কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়নি এবং ধৈর্য্য পূর্ব্বাপেক্ষা অটল বলা চলে। এই সময়েই এল সেই সুবর্ণ সুযোগ। যে প্রশ্ন শোনামাত্র সে যুগের লব্ধ-

প্রতিষ্ঠ মণীষীগণ একে একে উপহাস করেছেন, অপরিণত-বুদ্ধি বালকের সাময়িক-মস্তিষ্ক বিকৃতি জ্ঞানে সদুপদেশ দিয়েছেন সেই প্রশ্নের সমাধান মিলল দক্ষিণেশ্বরের এক পাগল পূজারীর কাছে। পৃথিবীর ইতিহাসে এর চেয়ে বড় বিস্ময় আর কিসে হতে পারে?

সবজ্ঞানের শেষকথা শোনা গেল কিনা এক নিজ্ঞানীর কাছে! কিন্তু বিবেকানন্দ কি শুধু মুখে শুনেই সন্তুষ্ট হবেন, তাঁর প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই, নইলে প্রত্যয় প্রতিষ্ঠিত হবে কেন? তাই উভয়ের সাক্ষাৎকার হওয়া-মাত্র চলল নানা সংলাপ। কিন্তু সবই যেন এক তরফা। একদিকে বিবেকানন্দের অসংখ্য প্রশ্নের পর প্রশ্ন, তর্কের পর তর্ক, যুক্তির পর যুক্তি, অন্যদিকে তার সংক্ষিপ্ত উত্তর, সুনিশ্চিত প্রমাণ এবং নির্দ্বন্দ্ব সমাধান যেন মুহূর্ত্তের মধ্যে সকল সন্দেহের নিরসন করে দিল। একবার চোখবুজে পুনরায় খোলার সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন জগৎ যেন অপসৃত হয়ে নূতনরূপে প্রতিভাত হল। অর্থাৎ জ্ঞানের অহমিকা যেন ভক্তির পাদমূলে লুটিয়ে পড়ে আত্মসমর্পণ করল। বস্তুতঃ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সঙ্গে বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার কেবলমাত্র মামুলী ঘটনা নয়। এ বিধাতার নিগূঢ় বিধানের ন্যায় অবশ্যম্ভাবী ওঅপ্রতিরোধ্য। সাধক ও ভক্তের, গুরু ও শিষ্যের এই মিলন না ঘটলে ঠাকুর এবং বিবেকানন্দ বিশ্বমানবের নিকট শুধু অপরিচিতই থাকতেন না—ভারতের ইতিহাসের পরবর্ত্তী অধ্যায় ভিন্নরূপে লিখিত হত। বস্তুতঃ ঠাকুর ও বিবেকানন্দের সাক্ষাৎকার কেবলমাত্র কবির ভাষায় যাকে বলে 'Deep calling unto deep" তাই নয়, তা গভীর তাৎপর্য্য পূর্ণ। জ্ঞানতাপস বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের করুণা লাভ করার পরই ভক্তিমার্গের পথিক হন। তাঁর হৃদয় সকল তর্কের অবসানে, সকল জিজ্ঞাসার সমাধানে ভক্তিরসধারায় আপ্লুত হয়ে ওঠে, যার বলে বলীয়ান হয়ে তিনিও উপনিষদের ঋষির মত এই বিশ্বাস লাভ করলেন নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য, ন মেধয়া ন বহুশ্রুতেন।

জ্ঞানযোগী বিবেকানন্দ ভক্তিযোগে ব্রতী হয়ে একান্ত করেন। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন আহ্বান করেছিলেন মানসিক দ্বন্দ্বে বিচলিত অর্জ্জুনকে—সর্ব্বধর্মং পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ' এই বাণী উচ্চারণ করে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর অন্তরের প্রিয়তম শিষ্যকে তেমনি মনের সকল অস্থিরতাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মানবভক্তির নতুনমন্ত্রে দীক্ষিত করলেন। বিবেকানন্দও তখন অখণ্ড বিশ্বাস ও অচল ভক্তির অর্ঘ্য সাজিয়ে পরিপূর্ণ আত্ম-সমর্পণের প্রণিপাত জানিয়ে যেন নিবেদন করলেন: " কস্মিন্ ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি" —কি সেই বস্তু যাকে জানলে সমুদয় জানা হয়। গুরুর কৃপায় শিষ্যের দিব্যদৃষ্টি লাভ করতে বিলম্ব হলনা। এই দিব্যদৃষ্টির ফলেই তিনি উত্তরকালে এই অভিমত ব্যক্ত করেন: " বিধাতার ইচ্ছায় আমি এমন এক ব্যক্তির সহবাসের সুযোগ লাভ করিয়াছিলাম যিনি একদিকে যেমন ঘোর দ্বৈতবাদী তেমনি অপরদিকে ঘোর অদ্বৈতবাদী ছিলেন, তিনি একদিকে যেমন পরম ভক্ত অপরদিকে তেমনি পরম জ্ঞানী ছিলেন। এই ব্যক্তির শিক্ষাফলেই আমি প্রথম উপনিষদ ও অন্যান্য শাস্ত্র কেবল অন্ধভাবে ভাষ্যকারদিগের অনুসরণ না করিয়া স্বাধীনভাবে উৎকৃষ্টরূপে বুঝিতে শিখিয়াছি। আর আমি এ বিষয়ে যৎসামান্য যাহা অনুসন্ধান করিয়াছি তাহাতে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে এই সকল শাস্ত্র-বাক্য পরস্পরবিরোধী নহে"। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বিবেকানন্দ জ্ঞান ভক্তির সমন্বয়াচার্য্যরূপে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁর মতে শ্রীরামকৃষ্ণ শঙ্করের অদ্ভুত মস্তিষ্ক এবং চৈতন্যের অদ্ভুত বিশাল অনন্ত হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন।

১৮৮১ খৃঃ থেকে ১৮৮৮ খৃঃ পর্য্যন্ত এই আটবছরকাল বিবেকানন্দের ভক্তিযোগ সাধনায় পর্ব্ব। এই সময়ে গুরুসেবা ও গুরুশুশ্রূষায় তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন তার তুলনা অন্যত্র দুর্লভ। ১৮৮৮ খৃঃ বিবেকানন্দ বরাহনগর উদ্যানবাটিকায় অবস্থানকারী অন্যান্য গুরুভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ভারত পরি-

করে দেশ ও জনসাধারণ সম্বন্ধে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা অর্জন করলেন। তারপর ভারতবর্ষের দক্ষিণ সীমারেখার শেষপ্রান্তে কুমারিকা অন্তরীপের এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করে গভীর সাধনায় নিমগ্ন হলেন। সেই ধ্যানাবিষ্টচিত্তে তিনি ভারতের অতীত গৌরব, বর্ত্তমান দৈন্য ও ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করলেন। তাঁর মনে এই বিশ্বাস সুদৃঢ় হল যে ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন অবনতির মূল তার ধর্মানুষ্ঠান নয় কেননা ধর্মচেতনার সত্যকাররূপ মানুষের হৃদয় থেকে মুছে গেছে। দৈন্য ও পর উৎপীড়নতা স্বাধীন-চিন্তাকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে। অতএব প্রাচীন ঋষিদের ধর্মসাধনাকে পুনরায় অবিকৃত করে জনসাধারণের মনে অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া ছাড়া ভারতের দুরবস্থা থেকে মুক্তির অন্য উপায় নেই। একদিকে ভারতের সমস্যা-জর্জ্জরিত সঙ্কটজনক পরিস্থিতি অন্যদিকে অসংখ্য নরনারীর বেদনার্ত্ত মুখের ছবি বিবেকানন্দের হৃদয়কে বেদনায় উদ্বেলিত করল। যে অশিক্ষা, কুসংস্কার ও পরাধীনতার গ্লানি ভারতের জনসাধারণের আত্মাকে আচ্ছন্ন করে মহতী বিনষ্টির দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে প্রতিরোধ করার জন্য বিবেকানন্দ বদ্ধপরিকর হলেন। কিন্তু যেকোনও প্রকার সংগঠন কর্মে অবতীর্ণ হলে প্রথমেই প্রয়োজন কয়েকজন নিষ্ঠাবান ও একান্ত অনুগামী কর্মী এবং আবশ্যক অনুযায়ী কিছু পরিমাণ অর্থ।

এই অর্থ সংগ্রহের অভিপ্রায় নিয়ে দেশের কয়েক জায়গায় চেষ্টা করেও যখন আশানুরূপ সাড়া পেলেন না তখনই তাঁর মন বিদেশযাত্রার দিকে ঝুঁকে পড়ল। কিন্তু বিদেশ যাওয়ার কথা চিন্তা করলেই তা কাজে পরিণত করা যায় না; সেপথে অনেক অন্তরায়। তথাপি তাঁর মন দৃঢ়তার সঙ্গে এই বিশ্বাসকেই আশ্রয় করল যে, বিদেশ থেকে অর্থ সাহায্য না এলে এদেশে কোনও সংগঠনই সম্ভবপর নয়। কারণ পরাধীনতার নাগপাশ এবং বিদেশী-শাসনের দৌরাত্ম্য এই দেশের মানুষকে এমন পঙ্গু করে রেখেছে এবং মিথ্যা ও অপপ্রচারে এই দেশের সম্বন্ধে পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশের মানুষের মনে এমন আবমাননার সৃষ্টি করেছে যেগুলি সম্পূর্ণরূপে অপনোদিত না করলে এই জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ মুক্তিলাভ করা অসম্ভব। অতএব যেকোন প্রকারে বিদেশগমন করতেই তিনি বদ্ধপরিকর হলেন। তাঁর কর্মযোগের প্রথম পর্য্যায়ের যে সাধনা তার সূচনা এখানেই দেখা গেল। এবং জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত কর্মসাধনা থেকে তিনি ক্ষণেকের জন্যও বিরত হননি।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে বিবেকানন্দ আমেরিকার চিকাগো সহরে ধর্ম্মমহাসভা (Parliament of Religion) অনুষ্ঠানের কথা শুনেছিলেন। কিন্তু সেখানে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে তাঁর বেশ কয়েকমাস লেগেছিল। পরের বছর মে মাসে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চীনদেশ, জাপান প্রভৃতি ছুঁয়ে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে ভ্যাঙ্কুভার গিয়ে ট্রেনে করে চিকাগো পৌঁছাতে তাঁর প্রায় দুমাস কেটেছিল।

আমেরিকায় পদার্পণ করে তিনি জানলেন যে, 'ধর্ম্মমহাসভা' অনুষ্ঠিত হতে তখনও প্রায় দেড়মাস বাকী। এই সময়টুকু তিনি কিন্তু কালক্ষেপণ না করে অর্থসংগ্রহ-মানসে নানাস্থানে ভাষণ দিয়ে বেড়াতে থাকলেন। সে দেশের প্রাচুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যের আতিশয্য ও মানুষের কর্মপ্রেরণা যতই দেখতে থাকলেন তাঁর মন ততই স্বদেশের দীনতা, হীনতা ও পরাধীনতার জড়ত্ব ভরা মানুষের কথা চিন্তা করে ব্যথিত ও পীড়িত হত। তথাপি নিজের কাজে দ্বিগুণ উৎসাহ সঞ্চার করতে তিনি সেই দুশ্চিন্তার মাঝেও ঐশীপ্রেরণার সন্ধান করতে থাকলেন। শতাব্দীকাল ধরে ভারতবাসীর সম্বন্ধে সেদেশে যেসব বিকৃত তথ্য, মিথ্যা ঘটনা পরিবেশিত ও বিবৃত হয়েছে সর্ব্বাগ্রে তিনি সেই দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বিদেশী শাসন বিশেষতঃ—ইংরাজ-শাসক কিভাবে ভারতের আত্মাকে অপমৃত্যুর দিকে ঠেলে নিয়ে গেছে তার প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বললেন :

"India has been conquered again and again for years and last and worst of all came the Englishmen. You look about India, what has the Hindoos left? Wonderful

temples every where. What has the Mohammadans left? Beautiful palaces. What has the Englishman left? Nothing but mounds of broken brandy bottles."

ভারতীয় ধর্মের বা হিন্দুধর্মের অলৌকিকত্ব নিয়ে যাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন বিবেকানন্দ তাঁদের উদ্দেশে স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করলেন :

"I cannot comply with the request ....to work a miracle in proof of my religion. In the first place, I am no miracle worker and in the second place the pure Hindoo religion I proffess is not based on miracles. We do not recognise such a thing as miracle."

ভারতীয় ধর্মের ভিত্তিমূল কোথায় তা বোঝাতে গিয়ে বললেন :

"Religion is not the outcome of the weakness of human nature; religion is not here because we fear a tyrant; religion is love, unfolding, expanding, growing."

হিন্দুধর্মের এই বিশালতা, ব্যাপ্তি এবং ঔদার্যের তুলনায় খ্রীষ্টধর্মের গোঁড়ামি যে কত ক্ষুদ্র তা অসমসাহসিকতার সঙ্গে প্রমাণ করিয়ে দিতে বিবেকানন্দ বলেছিলেন :

"I take your Jesus. I take him to my heart as I take all the great and good of all lands and of all times. But you, will you take my Krishna to your heart? No you can not, you dare not, still you are the cultured and I am the heathen."

ভারতবর্ষের তদানীন্তন কুপ্রথা যেমন সতীদাহ, সাগরজলে সন্তান নিক্ষেপ, রথচক্রে আত্মবলিদান ইত্যাদি সম্বন্ধে সেদেশের শ্রোতৃবর্গ কটাক্ষ নিক্ষেপ করলে বিবেকানন্দ তার সমুচিত উত্তর ও যুক্তিপূর্ণ জবাব দিয়ে এই সম্বন্ধে অতিশয়োক্তি ও দুরভিসন্ধিমূলক বিদেশী শাসকদের অপপ্রচারের খণ্ডন করেছিলেন। ভারতবাসী নারীজাতিকে কি মহান দৃষ্টিতে দেখে এবং তার সতীত্বকে যে কত মূল্যবান সম্পদ মনে করে তা ওদেশের নারীর সঙ্গে তুলনা করে অকপটে এই উক্তি করেছিলেন :

I think that unchastity is the one great sin of your country. It must be so, there is so much luxury here. A poor girl would sell herself for a new bonnet. In India the women was the visible manifestation of God and that her whole life was given up to the thought that she was a mother and to be a perfect mother she must be chaste ...The girls in India would die if they like American girls were obliged to expose half their bodies to the vulgar gaze of young men."

১৮৯৩ সালে ১১ই সেপ্টেম্বর যে 'ধর্মমহাসভার' উদ্বোধন হয়েছিল তার মূল বাণী ছিল :

A new commandment I give unto you, that ye love one another.'

কিন্তু বিবেকানন্দ তাঁর ভাষণে বিশ্ববাসীকে যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তার সার কথা এই :

"Learn to think without prejudice, to love all beings for loves sake, to express your conviction fearlessly, to lead a life of purity and the sunlight of truth will illuminate you."

সাড়ে তিন বছর আমেরিকায় অবস্থানের পর বিবেকানন্দ ভারতে প্রত্যাবর্তন করলেন। ১৫ই জানুয়ারী ১৮৯৭ সালে তিনি সিংহলের কলম্বো সহরে অবতরণ করলেন। দেশের মাটীতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভিন্ন ভূমিকা গ্রহণ করলেন। এ যাবৎ বিদেশে তিনি ভারতীয় হিন্দুধর্ম বা বেদান্ত ধর্মের মাধ্যমে শীর্ষস্থান লাভ করেছিল তাকেই পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে সচেষ্ট ছিলেন। দেশের জন্য অর্থ সংগ্রহ এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের হৃতগৌরবের বা লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধার ছিল তাঁর প্রধান লক্ষ্য। এখন দেশে ফিরে এসে তাঁর প্রধান কর্ম হল স্বদেশবাসীর মধ্যে কর্মপ্রেরণা এবং কর্মী

ও স্বদেশচিন্তাকে পুনরুজ্জীবিত করা। এই উদ্দেশ্যে প্রথম তিনি যে ভাষণ দিলেন তার অংশ বিশেষ এই : "পৃথিবীর যে কোনও দেশেই আমি গিয়াছি সেখানেই দেখিয়াছি এখনও পরধর্মাবলম্বীর উপর প্রবল পীড়ন বর্তমান, নূতন বিষয় সম্বন্ধে পূর্ব্বেও যেসকল আপত্তি উত্থাপিত হইত এখনও সেই প্রাচীন আপত্তিসকল উত্থাপিত হইয়া থাকে। জগতে যতটুকু পরধর্মে বিদ্বেষরাহিত্য ও ধর্মভাবের সহিত সহানুভূতি আছে, কার্য্যত তাহা এই-খানেই এই আর্য্যভূমিতেই বিদ্যমান, অন্য কোথাও নাই। এইখানেই কেবল ভারতবাসীরা মুসলমানদের জন্য মসজিদ ও খ্রীশ্চিয়ানদের জন্য গির্জ্জা নির্মাণ করিয়া দেয়, আর কোথাও নহে।"

ভারতবাসীর সামগ্রিক উন্নতির পথ যে কেবলমাত্র সমাজসংস্কার বা লৌকিক ধর্মভাবের অভ্যুদয় দ্বারা সম্ভব নয় তা স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করে বিবেকানন্দ এই আহ্বান জানালেন: "বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—আপনার উপর বিশ্বাস, ঈশ্বরে বিশ্বাস ইহাই উন্নতি-লাভের একমাত্র উপায়।"

"আমি কোনরূপ সাময়িক সমাজসংস্কারের প্রচারক নহি। আমি সমাজের দোষ সংশোধনের চেষ্টা করিতেছিনা; আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—তোমরা অগ্রসর হও এবং আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সমগ্র মানবজাতির উন্নতি বিধানের জন্য যে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে কার্য্যে পরিণত কর। তোমাদের নিকট আমার কেবল ইহাই বক্তব্য যে, তোমরা সমগ্র মনুষ্যজাতির একত্ব ও মানবের স্বাভাবিক ঈশ্বরত্ব ভাবরূপ বৈদান্তিক আদর্শ উত্তরোত্তর অধিকতর উপলব্ধি করিতে থাক।" বেদান্ত-ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তা উল্লেখ করতে বিবেকানন্দ বলেছেন: "বেদান্তেই কেবল সেই মহান তত্ত্ব নিহিত যাহা সমগ্র জগতের ভাবরাশিকে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিবে এবং বিজ্ঞানের সহিত ধর্মের সামঞ্জস্য বিধান করিবে।...সমগ্র জীবনে আমি এই মহাশিক্ষা পাইয়াছি—উপনিষদ বলিতেছেন, হে মানব, তেজস্বী হও, দুর্ব্বলতা পরিত্যাগ কর।...জগৎ-সাহিত্যের মধ্যে এই কেবল ইহাতেই...অভীঃ...ভয়শূন্য এই শব্দ বার বার ব্যবহৃত হইয়াছে।... জগৎ আমাদের উপনিষদ হইতে আর এক মহান উপদেশ লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে সমস্ত জগতের অখণ্ডত্ব।" আমাদের জাতীয় জীবনের গলদ কোথায় এবং কিরূপে তার প্রতিকার সম্ভব সেদিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করে বিবেকানন্দ বলেছেন: শতশত শতাব্দী ধরিয়া আমরা ঘোরতর ঈর্ষা-বিষে জর্জ্জরিত হইতেছি আমরা সর্ব্বদাই পরস্পরের হিংসা করিতেছি। ...ইহা ত্যাগ করিতে হইবে। যদি ভারতে কোনও প্রবল পাপ রাজত্ব করিতে থাকে তবে তাহা এই ঈর্ষাপরায়ণতা। সকলেই আজ্ঞা দিতে চায়, আজ্ঞা পালন করিতে কেহই প্রস্তুত নয়। প্রচীনকালের সেই অদ্ভুত ব্রহ্মচর্য্যআশ্রমের অভাবেই ইহা ঘটিয়াছে। ঈর্ষাদ্বেষ পরিত্যাগ কর তবেই তুমি এখনও যেসব বড় বড় কাজ পড়িয়া রহিয়াছে তাহা করিতে পারিবে।"

বিবেকানন্দের এই উক্তির সত্যতা আজ সুদীর্ঘ সত্তর বছর পরেও প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। আজ স্বাধীন ভারতের দুদশক অন্তেও যখন ভেদবুদ্ধির চরম প্রকাশ আমরা উগ্র হয়ে উঠতে দেখি তখন কি একথা মনে হয় না যে, বিবেকানন্দের অমোঘ বাণী আমরা যদি কিছুটাও ব্যক্তিজীবনে গ্রহণ করতাম তাহলে আজকের দুর্দ্দিন এমন ঘোরতর আকারে দেখা দিত না।

সিগন্যাল

(গল্প)

গৌতম সেন

লছমীপ্রসাদ—এ সেই লছমীপ্রসাদ, যে গত মহাযুদ্ধে বর্মা-ফ্রণ্টে ইংরেজের হ'য়ে লড়েছে। লছমীপ্রসাদ আজ রেলে কাজ করছে। কাজ আর এমন কি! ঘুরে ঘুরে রেল-লাইন তদারক করা তার কাজ—গলদ দেখলে সারতে হয়। তাই করে লছমীপ্রসাদ। কেবিনও একটা পেয়েছে সে—তবে দূরে, ষ্টেশন থেকে বেশ-খানিকটা দূরে। চারদিকে জঙ্গল—লোকালয় বড় একটা নেই।

এককালে সবই ছিল এই লছমীপ্রসাদের। আজ সেসব কথা বলতে চায় না সে। এখন এক স্ত্রী ছাড়া তার আর সংসারে কেউ নেই। অতি দুর্দিনে সে এই রেলের চাকরি পেয়েছিল। সেও এক মজার ঘটনা।

চাকরির সন্ধানে তখন ঘুরে বেড়াচ্ছে লছমীপ্রসাদ। একটা ষ্টেশনে হঠাৎ দেখা হ'য়ে গেল মহাদেও-এর সঙ্গে। মহাদেও, যুদ্ধক্ষেত্রে যে একদিন তার ওপরওয়ালা ছিল। লছমী চেয়ে আছে একদৃষ্টে তার মুখের দিকে। মহাদেও-ও বার বার দেখছে তাকে। শেষে মহাদেওই ডেকে কথা বলে, তুমি লছমীপ্রসাদ না?

—আজ্ঞে হাঁ হুজুর। আমি ঠিকই চিনেছিলাম, কিন্তু কথা বলতে সাহস করিনি।

—কি করছো এখন?

—কিছুই না হুজুর, চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বলদেও বলে, রেলে চাকরি করবে? দিতে পারি একটা। দিনকতক থাকো আমার কাছে, কাজ বুঝিয়ে দেবো।

হাতে স্বর্গ পেলো লছমীপ্রসাদ।

বলদেও সেই ষ্টেশনের ষ্টেশন-মাষ্টার। তাই চাকরিটা অতি সহজেই মিলে গেলো।

ছোট্ট কেবিন। সামনে একটুখানি বাগান, রেল-লাইনের পাশে খানিকটা চাষের জমি। লছমীর মন খুশিতে ভরে ওঠে—খেয়ে-পরে দিব্যি চলে যাবে তার। সামনের জমিটায় সে ভুট্টা লাগিয়ে দিলে। ইচ্ছে আছে, হাতে কিছু টাকা জমলে একটা গোরু কিনবে।

এর পরের কেবিনটায় থাকে এক বুড়ো। অনেক-দিন থেকে আছে। তার আর কাজ করবার শক্তি নেই। তবু সে রয়ে গেছে। ছাড়ালেও ছাড়তে চায় না। নাম ভগবান তেওয়ারী। লছমী তার সঙ্গে ভাব ক'রে এলো। কেবিনটা একটু দূরে। কিন্তু নিঃসঙ্গের আবার দূর কি! দক্ষিণের কেবিনটায় থাকে একজন তরুণ—তার সঙ্গেও একদিন আলাপ হ'য়ে গেল। দুজনেই টহল দিতে বেরিয়েছিল। লোকটা খুব কম কথা বলে। সুখন তার নাম।

কিন্তু মাসখানেকের মধ্যে ওদের ভাব জমে উঠলো। দুজনেই অবসর পেলে একজায়গায় এসে মেলে। বয়স অল্প হলেও দারিদ্র্যের রুক্ষতায় সুখনকে আরো কর্কশ দেখায়। লছমী গল্প পেলে থামতে চায় না। সুখন বকতে পারে না, চুপ ক'রে শোনে আর খইনী ডলে।

দুঃখের গল্প ক'রেই সময় কাটে। তার বেশি কল্পনা আর তাদের নেই।

লছমী বলে, জীবনে দুঃখ পেয়েছি অনেক—যদিও বয়স আমার খুব বেশি হয়নি। আমার ভাগ্য ভাল নয়—চেষ্টা করতে কসুর করিনি। কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়েছে। সামান্য কিছু ছিল, কিন্তু সবকিছুই নির্ভর করে অদৃষ্টের ওপর। ভগবান যার জন্যে যা ব্যবস্থা করেছেন,

সে তো তাই পাবে। তার অতিরিক্ত আশা করাই বৃথা। তাই দুঃখ আমার আর নেই—

সুখন চেঁচিয়ে ওঠে। তুমি থামো! ভাগ্য বলে কিছু নেই। আমরা কষ্ট পাই মানুষের দোষে—মানুষই আমাদের সর্বনাশ করেছে!

লছমী তার কথা শুনে চমকে ওঠে! বলে, তোমার কথা আমি মানতে রাজি নই।

—বলতে পারো, তুমি আমি আজ এই কেবিনে কেন? কার দোষে এই নিঃসঙ্গ-জীবন যাপন করছি—লোকালয়ের বাইরে, সমাজের বাইরে? ঐ মানুষ—মানুষই আমাদেরকে বঞ্চিত করেছে সকলরকম আরাম থেকে।

লছমী দুঃখিত হয়ে বলে, কিন্তু আমার তো ভাই এই কেবিনে থাকতে বেশ লাগছে।

সুখন বিড় বিড় করে বলে, তোমার অনুভূতি পর্যন্ত মরে গেছে। টের পাচ্ছো না, কি করে জীবনের রস তিল তিল ক'রে ওরা শোষণ করছে। একদিন টের পাবে যেদিন নিঃশেষ হবে—বার্ধক্যে যেদিন অক্ষম হবে। ঐসব বড়লোকদের তুমি বিশ্বাস করো? ছিবড়ে—ছিবড়ে ক'রে ফেলে দেবে! খুব সাবধান!

লছমী শুনে হাসে।

কদিন পরে একটা ট্রলি এসে থামলো লছমীর কেবিনের সামনে। লছমী শশব্যস্তে ছুটে এলো। ওপরওলার ট্রলি।

সাহেব বললে, তুমি কতদিন আছো এখানে?

—মাস দুই হবে হুজুর।

—৩২ নম্বরে কে আছে?

—আজ্ঞে, সুখন আছে হুজুর!

ওপরওয়ালা আর কোনো কথা না ব'লে ট্রলি নিয়ে চ'লে গেল।

লছমীর ভয় হ'লো, কিছু একটা হয়ে থাকবে। আর সুখন যে বদরাগী—রাগের মাথায় এখন আবার কিছু না ক'রে বসে।

হলোও তাই। একটু পরে সুখন ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। বললে, চললাম।

লছমী তার মুখের দিকে চেয়ে চমকে উঠলো! তার নাক দিয়ে ঝর ঝর ক'রে রক্ত পড়ছে।

লছমী শুধু চেয়ে রইলো।

সুখন বললে, তবে এ আমি ভুলবো না—পারি তো প্রতিশোধ নিয়ে যাব। কাঁধের পুঁটলিটা ঝাঁকানি দিয়ে সুখন টলতে টলতে উত্তরদিকের লাইন ধ'রে চলতে লাগলো। লছমী চেয়ে রইলো কিছুক্ষণ—দৃষ্টি ঝাপসা হ'য়ে এলো। সুখনকে সত্যই সে ভালবেসেছিলো।

লছমীও আর একা একা বসে থাকতে পারলো না, সেও বেরিয়ে পড়লো বাঁশের খোঁজে। সে বেশ বাঁশী তৈরি করতে পারে। অবসর পেলেই ছোট ছোট বাঁশ কেটে ঘরে আনে। গভীর রাত্রে যখন কেউ কোথাও থাকে না তখন একলা মনে সে বাঁশী বাজায়।

এই বাঁশ সংগ্রহ করতে তাকে অনেকটা পথ যেতে হয়। কিন্তু তাতে তার ক্লান্তি নেই। এখানে সে শিল্পী, অসীম ধৈর্য নিয়ে যে জন্মেছে।

এমনি বাঁশ কেটে নিয়ে একদিন সে ফিরছে। হঠাৎ একটা আওয়াজ কানে এলো। সে থমকে দাঁড়ালো। কিছুই বুঝতে পারে না লছমী, তবু এগিয়ে চলে। শব্দ আরো স্পষ্ট হ'লো। লাইনে তো কোথাও মেরামতের কাজও হচ্ছে না, তবে এ কিসের শব্দ! দ্রুত পা চালিয়ে জঙ্গলের সীমানায় এসে সে দাঁড়ালো। সামনে উঁচু বাঁধ, নীচে থেকেই দেখতে পেলে, কে একজন লোক লাইনের ওপর ব'সে আছে। লছমী অতি সন্তর্পণে বাঁধের ওপর উঠতে লাগলো। তার ধারণা, লোকটা নিশ্চয়ই 'বোলট নাট' চুরি করতে এসেছে। একটু পরেই লছমী দেখলে, লোকটা উঠে দাঁড়িয়েছে—হাতে তার একটা শাবল। কিন্তু মুহূর্তমাত্র—তারপর লোকটা প্রাণপণশক্তিতে সেই শাবল চালিয়ে দিলে রেল-লাইনের নীচে।

লছমী চীৎকার করবার চেষ্টা করে, কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরোয় না। লছমি চিনেছে—সে সুখন।

লছমী যখন ওপরে উঠে এলো তখন সুখন [illegible]

সুরু করেছে বাঁধের ওধার দিয়ে। লছমী চীৎকার ক'রে ডাকলো, সুখন, শাবলটা দিয়ে যা ভাই, কেউ জানবে না —আমি আবার লাইনটা বসিয়ে দেবো।

লছমী কত অনুনয়-বিনয় করলে, কিন্তু সুখন ফিরলো না, জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

লছমী দাঁড়িয়ে রইলো সেই ভাঙা রেল-লাইনের ধারে। কি সর্বনাশ ক'রে গেল সুখন—একটু বাদেই ট্রেন আসবে—মালগাড়ি নয়, প্যাসেঞ্জার গাড়ি। লছমী পাগলের মতো রেল-লাইনের ধারে ঘোরাঘুরি করে। কি ক'রে সে গাড়ি থামাবে? কোনো সিগন্যালই যে তার হাতে নেই! যন্ত্র নেই যে লাইনটা বসিয়ে দেবে। সে কি ছুটে কেবিনে যাবে? কিন্তু ফিরে আসবার সময় পাবে কি? গাড়ি আসবার সময় হ'য়ে এলো! ভগবান রক্ষা করো!

দূরের বাঁকে একটু পরেই গাড়ি দেখা গেল। লছমীর চোখে অন্ধকার নামলো!

গাড়ি আসছে—বিদ্যুৎবেগে গাড়ি আসছে। সর্বনাশ! এতগুলো জীবহত্যা হবে তারই চোখের সামনে? সে ভাবতে পারে না। থর থর ক'রে মাটি কাঁপছে কাঁপছে লছমীও। হঠাৎ তার মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। তার পরনের কপড় সে দু-টুকরো ক'রে ফেললো। ধারালো কাটারি—যে কাটারি দিয়ে সে বাঁশ কেটে এনেছে, সেই কাটারি দিয়ে তার হাতের খানিকটা কেটে ফেললে। গল্ গল্ ক'রে রক্ত বেরোয়—সেই রক্তে কাপড়ের টুকরো ভিজিয়ে নিয়ে বাঁশের ডগায় বেঁধে দিলে। চমৎকার সিগন্যাল হলো। লছমী শক্ত ক'রে সেই সিগন্যাল তুলে ধরলো লাইনের ধারে। প্রাণপণ শক্তিতে সেই নিশান সে ওড়াতে থাকে—ড্রাইভার দেখছে কিনা কে জানে। ট্রেন হু হু শব্দে এগিয়ে আসছে—লছমী আর পারে না, ক্ষতস্থান দিয়ে রক্ত সমানে পড়ছে। লছমী ভাবে, এত রক্ত দেহে ছিল কোথায়!

লছমীর পা টল্‌ছে, দেহ নিস্তেজ হয়ে আসছে—আসুক, সে যদি মরেও যায় কোনো দুঃখ নাই—একটা প্রাণের বিনিময়ে তবু তো এতগুলো প্রাণ রক্ষা হবে। কিন্তু গাড়ি থাম্‌লো কই? ড্রাইভার কি দেখতে পায়নি? কিন্তু আর যে সে পারে না—দেহ অবশ হয়ে আসছে! মাথাটা ঘুরছে, কতকগুলো কালো মাছি যেন বন্ বন্ ক'রে ঘুরছে চোখের সামনে—তারপর সব অন্ধকার। শুধু কানে বাজতে থাকে ঝন্ ঝন্ শব্দ! ট্রেন সে আর দেখতে পায় না, ইঞ্জিনের আওয়াজও কানে আসে না—মনে মনে বলে, আর আমি হয়ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারবো না—তখন কি হবে? নিশান নিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়বো, গাড়ি চলে যাবে আমার ওপর দিয়ে। ভগবান, তুমি তো সব জান, কাউকে পাঠিয়ে দাও, কেউ এসে সাহায্য করুক এসময়, আমাকে দায়িত্ব থেকে মুক্তি দাও ভগবান!

আর সে ভাবতে পারে না—চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে যায়, দুর্বল হাত থেকে খসে পড়ে সিগনালটা। কিন্তু মাটিতে পড়বার আগেই কে যেন ধরে ফেলে সেই নিশান—নিশান পড়লো না বটে, লছমী পড়লো মুখ থুবড়ে।

গাড়ি সশব্দে ব্রেক-কষে দাঁড়িয়ে গেল! ট্রেন থামতেই অনেক লোক ছুটে এলো সেখানে। দেখ্‌লে, সাম্‌নে অনেকখানি রেল লাইন নেই, আর তারই সামনে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে একজন লোক—সর্বাঙ্গ রক্তে লাল, আর তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক বাঁশ ধরে—সেই বাঁশের আগায়-বাঁধা রক্ত মাখা একখানা কাপড়!

সুখন তাই ধ'রে চীৎকার ক'রে বলছে, ওগো, এ-সিগন্যাল আমার নয়—আমিই অপরাধী, লাইন আমিই ভেঙেছি, আমাকে তোমরা বাঁধো,—আমাকে তোমরা বাঁধো।

রবীন্দ্রকাব্যে দুঃখের স্বরূপ

সুচিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুঃখ চিরকাল ধরে মানুষের অন্তরপ্রকৃতিতে প্রেরণা যুগিয়েছে। কেমন করে বিশ্বব্যাপী দুঃখের হাত হ'তে মুক্তি পাওয়া যায় এই চিন্তা যুগ-যুগান্তর সহস্র ধারায় প্রবাহিত হয়ে ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করেছে। দুঃখের অন্ত নেই; আবার দুঃখ হ'তে পরিত্রাণলাভের চেষ্টারও বিরাম নেই। দুঃখ ও মৃত্যু'র বিরুদ্ধে সংগ্রামই জীবনের মূলকথা, আর কাব্যের প্রধান উপাদান হচ্ছে জীবন। একজন ইংরেজ সমালোচকের মতে কাব্য জীবনের সমালোচনা। যে দুঃখ জীবনের নিত্যসহচর, যার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জীবনের সমস্ত শক্তি নিঃশেষিত হচ্ছে,—সেই দুঃখকে বাদ দিয়ে জীবনের কোন সমালোচনা হ'তে পারে না এই জন্যই দেখা যায় দুঃখ ও মৃত্যু কাব্য ও সাহিত্যের অনেকটা স্থান অধিকার করে আছে। সমস্ত ট্রাজেডী, বিশেষ করে গ্রীক ট্রাজেডীগুলি দুঃখেরই কাহিনী। দান্তের Divine Comedy সম্বন্ধে কার্লাইল বলেছেন, এই কাব্য কবির হৃদয়ের রক্ত দিয়ে লেখা। Shakespeare-এর King Lear, Hamlet, Macbeth প্রভৃতিতে দেখতে পাই মানুষের হৃদয়-সমুদ্র দুঃখের ঝড়ে অশান্ত বিক্ষুব্ধ হয়ে প্রলয়ের মূর্তি ধরেছে। Shelley জীবনকে বলেছেন, 'This vast vale of tears, vacant and desolate," এবং তাঁর কবিতায় মানবহৃদয়ের গভীর বেদনা করুণ মূর্চ্ছনায় প্রতিধ্বনিত হয়েছে। কবি আমাদের সম্মুখে তাঁর কাব্যে "অশ্রুভরা আনন্দের সাজি" ধরেছেন। দুঃখের আগুনে পুড়ে কবিকে সৃষ্টি করতে হয়। Shelley বলেছেন:—

> Most wretched men
> Are cradled into poetry by wrong,
> They learn in suffering what they teach in song.

গভীরতায় ও ব্যাপকত্বে সাধারণ মানুষের দুঃখের সঙ্গে কবির দুঃখের তুলনা হয় না। যে দুঃখ আমাদের মনে তার কোমল পরশমাত্র বুলায় তাই কবির চিত্তকে গভীর-বেদনায় অধীর করে তুলে, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

> …অলৌকিক আনন্দের ভার
> বিধাতা যাহারে দেয় তার বক্ষে বেদনা অপার,
> তার নিত্য জাগরণ; অগ্নিসম দেবতার দান
> ঊর্ধ্বশিখা জ্বালি চিত্তে অহোরাত্র দগ্ধ করে প্রাণ।

যুদ্ধক্ষেত্রে দূত যখন Lady Macbeth-এর মৃত্যুসংবাদ Macbethকে দিল তার উত্তরে Macbeth বললেন,—

> She should have died hereafter,
> There would have been a time for such a word.
> To-morrow and to-morrow and to-morrow
> Creeps in this petty pace from day to day
> To the last syllable of reccorded time;
> And all our yesterdays have lighted fools
> The way to dusty death. Out, out brief candle,
> Life's but a walking shadow, a poor player
> That struts and frets his hour upon this stage,
> And then is heard no more; it is a tale
> Told by an idiot, full of sound and fury
> Signifying nothing.

King Lear তাঁর কন্যা Goneril ও Regan এর অকৃতজ্ঞতার বিষে জর্জরিত হয়ে কি বহ্নিজ্বালাময় অভিশাপই না বর্ষণ করেছেন। এই বিষ কবিকেও আকণ্ঠ পান করতে হয়েছে; তাই সুধার সন্ধান মিলেছে। আবার যখন দেখি অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা Lear—

দস্তভরে যাঁর উদ্দাম ও উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তিকে সংযত করবার কোন প্রয়োজনই কোনদিন হয় নি, অতি তুচ্ছতম বাধার সংঘাতে যিনি উন্মত্তরোষে গর্জন করে উঠেছেন,—সেই উদ্ধত দাম্ভিক তেজোদীপ্ত নৃপতি জীবনসায়াহ্নে জীবনের গতি ফিরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন, সুদীর্ঘ ৮০ বৎসরের মধ্যে একদিনের জন্যও যে সংযম অভ্যাস করেননি তারই জন্য কাতরকণ্ঠে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন,—তখন আমাদের হৃদয় গভীর বেদনায় পূর্ণ হয়ে উঠে; কবিকেও এই বেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে হয়েছিল। তারপর দেখতে পাই প্রকৃতির মধ্যে প্রলয়ের ঝড় উঠেছে, তারই মধ্যে দাঁড়িয়ে Lear উন্মত্ত প্রলাপে গর্জন করছেন; Lear এর অন্তরের সমস্ত দুঃখ, ক্ষোভ ও ক্রোধ যেন প্রলয়ের মূর্তি ধরে দিক্‌দিগন্ত ঘোর অন্ধকারে ব্যাপ্ত করে বিদ্যুতের অট্টহাসিতে আকাশ বিদীর্ণ করে উন্মত্তভাবে খেলে বেড়াচ্ছে! প্রলয়ের এই তাণ্ডবলীলার অভিনয় কবির অন্তরেও হয়েছিল। কাব্যে তিনি তাঁর অন্তরের বিপ্লবের ছবি এঁকেছেন।

কবির দুঃখের অনুভূতি অতি সূক্ষ্ম ও গভীর। সেই অনুভূতি প্রকাশের শক্তিও তাঁর অসাধারণ। কিন্তু যেমন নিবিড়ভাবে দুঃখকে তিনি আপন হৃদয়ে অনুভব করেন তাকে যে ঠিক তেমনটি করেই প্রকাশ করতে পারেন তা নয়। ভাষার প্রকাশ-শক্তির একটা সীমা আছে, সেইজন্যই অনুভূতির কিছুটা অব্যক্ত থেকে যায়। তাই "What do you read my Lord?'—Polonius এর এই প্রশ্নের উত্তরে Hamlet বলছেন, "Words, words, words". Tennyson তাঁর "In Memorium" এ বলেছেন,—

"I sometimes hold it half a sin
To put in words the grief I feel;
For words, like nature, half revealed
And half-concealed the soul within.
In words, like weeds, I will wrap me o'er
Like coarsest clothes against the cold,
But the large grief which these enfold,
Is given in outline and no more."

রবীন্দ্রনাথও তাঁর প্রকাশবেদনায় বলেছেন,—

আপন প্রাণের গোপন বাসনা
টুটিয়া দেখাতে চাহি রে,
হৃদয়-বেদনা হৃদয়েই থাকে
ভাষা থেকে যায় বাহিরে।
শুধু কথার উপরে কথা
নিষ্ফল ব্যাকুলতা,
বুঝিতে বোঝাতে দিন চলে যায়
ব্যথা থেকে যায় ব্যথা।

ভাষার এই অসম্পূর্ণতার জন্য কবির অন্তরের দুঃখের গভীরতা আমরা ঠিক পরিমাণ করতে পারি না। তবুও বুঝতে পারি এই দুঃখ অতলস্পর্শ।

দুঃখের সাধনার ভিতর দিয়ে সকল কবিকে কাব্যলক্ষ্মীর প্রসাদ লাভ করতে হয়, সেইজন্য সকল কবিরই দুঃখের সঙ্গে নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে এবং দুঃখের প্রকৃত অর্থ কি তা জানবার জন্য আমরা যেমন ধর্মগুরু বা দার্শনিকের স্মরণ লই তেমনি কবির নিকটেও আমাদের জিজ্ঞাসা নিয়ে দাঁড়াতে পারি।

দুঃখ কিন্তু সকল কবির মানসলোকে একই মূর্তি ধরে দেখা দেয় না। কবির শিক্ষা ও প্রকৃতি অনুসারে দুঃখ ভিন্ন ভিন্ন রূপ নিয়ে আবির্ভূত হয়। গ্রীক ট্র্যাজেডীয়ানদের নিকট দুঃখ ও মৃত্যু হল নিয়তির বিধান। মানুষের আশা-ভরসা, প্রেম স্নেহ প্রীতি এই নিয়তির কঠিন নিষ্পেষণে অবিরত বিধ্বস্ত হচ্ছে। মানুষ এই হৃদয়হীন শক্তির বিরুদ্ধে নিতান্ত নিঃসহায়, নিয়তির উদ্যত বজ্র বুক পেতে নীরবে গ্রহণ করা ছাড়া তার আর কোন উপায় নেই। এতে দুঃখ দুঃখই থেকে যায়, তার কোন প্রতিকার হয় না; এতে কোন সান্ত্বনা নেই, মুক্তির কোন আশা নেই। দুঃখ ও মৃত্যুর এই ধারণা কাব্যে ও নাটকে করুণরস সৃষ্টি করবার পক্ষে বেশ উপযোগী। কিন্তু এ হচ্ছে গভীর নিরাশার বাণী। Shakespeare-এর ট্র্যাজেডীতে আমরা দুঃখের আর এক মূর্তি দেখি। তাঁর ধারণায় জগতে একটি নৈতিক বিধান আছে; এই নৈতিক বিধান লঙ্ঘন করাই পাপ, আর পাপ হতে দুঃখের

উৎপত্তি। পাপ আত্মঘাতী, যদিও পাপের আপনাকে হনন করবার চেষ্টা হতে দুঃখের সৃষ্টি। এই দুঃখ যে কেবল পাপীকেই নষ্ট করে তা নয়, যে নিষ্পাপ তাকেও অনেক সময় দুঃখের আগুন দগ্ধ করে, ভস্মীভূত করে। যে নিষ্পাপ সে কেন দুঃখের গ্রাসে কবলিত হয়, সে সম্বন্ধে Shakespeare নীরব। দুঃখ যদি কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, তাহলে যে পাপ হতে দুঃখের উৎপত্তি তার সঙ্গে দুঃখের একটা সূক্ষ্ম অনুপাত থাকা দরকার; কিন্তু অনেকস্থানে তা পাওয়া যায় না। Lear-কে যে পাপের ফলে কল্পনাতীত দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়, সে পাপ অকিঞ্চিৎকর। পাপের সঙ্গে প্রায়শ্চিত্তের এই অনুপাতের অভাব নাটকের রসসৃষ্টিতে কোন বাধা দেয় নি; কিন্তু এইটিই দুঃখের প্রকৃত অর্থ, এইটিই তার সত্য রূপ বলে গ্রহণ করতে মন কুণ্ঠাবোধ করে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে দুঃখকে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে দেখতে পাই। নিয়তির অমোঘ বিধানের নির্মমতা এতে নেই, পাপের এই প্রায়শ্চিত্ত নেই যার আবর্তে পড়ে অপরাধী ও নিরপরাধ উভয়কে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়। আবার দুঃখের হাত হ'তে পরিত্রাণ লাভ করবার জন্য যে মায়াবাদের সৃষ্টি হয়েছে, যার মতে আমরা যাকিছু দেখছি, যাকিছু শুনছি, যে সুখ-দুঃখের দোলায় চিত্ত আমাদের নিয়ত দুলছে সে সকলই মিথ্যা মায়া;—vanity of vanities, all is vanity, সেই মায়াবাদও রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্য্যানুরাগী হৃদয়কে আকর্ষণ করতে পারেনি। কবির পক্ষে এই মায়াবাদ গ্রহণ করা আর মৃত্যুকে বরণ করে নেওয়া একই। যিনি প্রতিমুহূর্ত্তে অনুভব করছেন,

> এ সাতমহলা ভুবনে আমার
>
> চিরজনমের ভিটাতে
>
> স্থলে জলে আমি হাজার বাঁধনে
>
> বাঁধা যে গিঁঠাতে গিঁঠাতে।

তিনি কখনই ছোট কণাটিকেও তুচ্ছ করে দেখতে পারেন না; তা করলে ধূলায় ধূলায় যে প্রেম আছে, নিখিলে যে আনন্দ আছে তা সবই ব্যর্থ হয়ে যায়। এই দীনা মর্ত্যভূমিকে ভাল না বেসে কবির উপায় নেই। যাকে আমরা ভালবাসি তার সমস্ত দোষ ত্রুটি অপূর্ণতা নিয়েই তাকে ভালবাসি, তার জন্য অশেষ দুঃখ কষ্ট ভোগ করতেও আনন্দ পাই। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকে অনুরাগের দৃষ্টিতে দেখেছেন বলেই বিশ্বের দুঃখ, মৃত্যু ও অপূর্ণতা তাঁর চিত্তকে বিমুখ করতে পারে নি। ধরিত্রী দরিদ্রা বলেই একে তিনি ভালবাসেন। নিখিল দুঃখের অন্ত আছে কিনা তা তিনি জানেন না, সুখ-বুভুক্ষুর আশা মেটে কিনা তাও তিনি জানেন না; তবুও –

> চাহি না ছিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর
>
> লক্ষকোটি প্রাণী সাথে এক গতি মোর।

তিনি জানেন তিনি যে ধরণীর কোলে জন্মগ্রহণ করেছেন তা দুঃখের ছায়াপাতে ম্লান, তার বক্ষ শোকাশ্রুধারা অভিষিক্ত, তবুও এই সুখদুঃখপূর্ণ জীবনধারা হতে বিচ্ছিন্ন হবার ইচ্ছা নেই।

> অসীম ঐশ্বর্য্যরাশি নাহি তোর হাতে,
>
> হে শ্যামলা সর্বসহা জননী মৃন্ময়ী
>
> সকলের মুখে অন্ন চাহিস জোগাতে,
>
> পারিস নে কতবার,—কই অন্ন কই
>
> কাঁদে তোর সন্তানেরা ম্লান-শুষ্ক মুখ;—
>
> জানি মাগো তোর হাতে অসম্পূর্ণ সুখ,
>
> যা কিছু গড়িয়া দিস ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়,—
>
> সবতাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভুখ।
>
> সব আশা মিটাইতে পারিস নে হায়
>
> তা ব'লে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক?
>
> দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশী ভালবাসি,
>
> হে ধরিত্রী, স্নেহ তোর বেশী ভাল লাগে,
>
> বেদনা কাতর মুখে সকরুণ হাসি
>
> দেখে মোর মর্মমাঝে বড় ব্যথা বাজে
>
> * * *
>
> কত যুগ হতে তুই বর্ণগন্ধগীতে
>
> সৃজন করিতেছিস আনন্দ আবাস,
>
> আজও শেষ নাহি হ'ল দিবসে নিশীথে,
>
> স্বর্গ নাই, রচেছিস স্বর্গের আভাস।

তাই তোর মুখখানি বিষাদ কোমল,
সকল সৌন্দর্য্যে তোর ভরা অশ্রুজল।

আমাদের কল্পনার স্বর্গভূমিও এই দুঃখমৃত্যুমলিন মর্ত্তের মত কবির নিকট লোভনীয় নয়। শতলক্ষ বৎসর স্বর্গে বাস করিবার পর কবির বিদায়ের সময় তিনি আশা করেছিলেন, বিচ্ছেদের ক্ষণে স্বর্গের নয়নে অশ্রুধারা দেখবেন! কিন্তু স্বর্গ শুষ্ক উদাসীন নয়নে চেয়ে আছে। অশ্বত্থ শাখা হ'তে একটি জীর্ণতম পাতা পড়লে তার যতটুকু ব্যথা বাজে, যখন শত শত নরনারী দেবলোক হ'তে স্খলিত হয়ে পৃথিবীর জন্মমৃত্যু স্রোতে ভেসে পড়ে, তখন স্বর্গের প্রাণে ততটুকু বেদনাও বাজে না. এই শোকহীন, হৃদয়হীন, নির্বিকার সুখস্বর্গভূমির চেয়ে স্নেহতপ্ত, অশ্রুসিক্ত, মৃত্যুভয়াকুল ধরিত্রীমাতার বক্ষে আশ্রয় নেবার জন্য তাঁর বেশী আগ্রহ।

থাক স্বর্গ হাস্যমুখে, কর সুধাপান
দেবগণ! স্বর্গ তোমাদের সুখস্থান—
মোরা পরবাসী, মর্ত্ত্যভূমি স্বর্গ নহে
সে যে মাতৃভূমি—তাই তার চক্ষে বহে
অশ্রুজলধারা, যদি দু'দনের পরে
কেহ তারে ছেড়ে যায় দুদণ্ডের তরে।
যত ক্ষুদ্র, যত ক্ষীণ, যত অভাজন
যত পাপী তাপী, মেলি ব্যগ্র আলিঙ্গন
সবারে কোমল বক্ষে বাঁধিবারে চায়—
ধূলিমাখা তনুস্পর্শে হৃদয় জুড়ায়
জননীর। স্বর্গে তব বহুক অমৃত,
মর্ত্তে থাক সুখদুঃখে অনন্ত মিশ্রিত
প্রেমধারা—অশ্রুজলে চিরশ্যাম করি
ভূতলের স্বর্গখণ্ডগুলি!

কবি একটি দিব্য প্রেমের অনুভূতি নিয়ে বিশ্বকে দেখেছেন বলে বিশ্বের সুন্দর রূপটি তাঁর কাছে ধরা পড়েছে। দুঃখ, ক্লেশ, শোক, তাপ এই সৌন্দর্য্যকে ক্ষুণ্ণ না করে উজ্জ্বলতর করে ফুটিয়ে তুলছে। তাঁর সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী দুঃখের অতীত নহে। বিশ্বের সৌন্দর্য্য-রাশি যে উর্ব্বশীর মূর্তি ধরে তাঁর কাব্যে দেখা দিয়েছে, সেই উর্ব্বশীকে লক্ষ্য করে কবি বলছেন,—

'জগতের অশ্রুধারে ধৌত তব তনুর তনিমা
ত্রিলোকের হৃদিরক্তে আঁকা তব চরণ শোণিমা।

তাঁহার মানসপ্রতিমার চরণ তিনি আপন হৃদয়রক্ত রঞ্জনে রাঙিয়ে দিয়েছেন, নিজের সুখদুঃখ ভেঙ্গে সুধাবিষে মিশিয়ে তার অধর এঁকেছেন। সৌন্দর্য্যলক্ষ্মী সোনার তরীতে কবিকে নিয়ে যে সৌন্দর্য্যসাগরের উপর দিয়ে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বাহির হয়েছে, সে সমুদ্র স্থির শান্ত নহে, তা ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ, জগৎপ্লাবী করুণ রোদনে আকুল—

হু হু করে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশ্বাস!
অন্ধ আবেগে করে গর্জ্জন
জলোচ্ছ্বাস!
সংশয়ময় ঘন নীল নীর,
কোন দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর.
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
দুলিছে যেন,
তারি পরে ভাসে তরণী হিরণ
তারি পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ
তারি মাঝে বসি' এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন?
আমি তো বুঝি না কি লাগি' তোমার
বিলাস হেন?

এ যাত্রার শেষ কোথায়, এর অবসানে শান্তি মিলবে কি না, আশার স্বপন সোনার ফলে ফলবে কি না, তা তিনি জানেন না, রহস্যময় সঙ্গিনীকে জিজ্ঞাসা করেও কোন উত্তর মিলে না। তবুও এই রহস্যময়ীর ইঙ্গিতে পরিপূর্ণ বিশ্বাসভরে এই সৌন্দর্য্যসাগরের উপরে ভেসে চলেছেন। এই গভীর সৌন্দর্য্যানুরাগ জগতের দুঃসহ দুঃখকষ্ট-মৃত্যুকেও মধুর করে তুলেছে।

সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করতে হলে দৃষ্টির প্রসারতা চাই। যে বস্তু তার সমগ্র রূপটি নিয়ে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয় তাকেই আমরা সুন্দর দেখি। সৌন্দর্য্য অংশবিশেষে নেই। আমরা জীবনের অংশবিশেষে, ধারাবাহিক

ঘটনাপরম্পরায় কোন একটি বিশেষ ঘটনায় আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখি বলে তা আমাদের নিকট অসুন্দর ও অর্থহীন বলে মনে হয়। কিন্তু কোন বস্তু বা ঘটনা আপনার মধ্যে তার অর্থ নিঃশেষ না করে সমস্ত জগতের সঙ্গে একটি সম্বন্ধ স্থাপন করে আপনাকে প্রকাশ করেছে। যখনই আমরা এই সম্বন্ধ হতে বিচ্ছিন্ন করে সেটাকে দেখি তখনই তা অসঙ্গত, নিরর্থক ও কুৎসিত হয়ে দেখা দেয়।

Emerson বলেছেন,—

"As it is dislocation and detatchment from the life of God that makes things ugly, the poet who re-attaches things to nature and the whole—attaching even artificial things and violations of nature to nature—disposes very easily of the most disagreeable things."

আমরা ব্যক্তিগত জীবনে বা ব্যক্তিজীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখি বলে জীবনের সৌন্দর্য্য দেখতে পাই নে, দুঃখ ও মৃত্যু নিতান্ত অসঙ্গত বলে মনে হয়। কিন্তু কবির পক্ষে জীবনকে খণ্ড খণ্ড করে দেখা অসহ্য, তাহলে জীবনের সমস্ত সৌন্দর্য্য বিকৃত হয়ে লুপ্ত হয়ে যায় এবং জীবনের সমস্ত দৈন্য, অভাব ও মলিনতা বড় হয়ে দেখা দেয়। তাই বর্ষশেষ কবিতায় তিনি বলেছেন,

শুধু দিনযাপনের গ্লানি,
সময়ের ডালি,
নিশি নিশি রুদ্ধঘরে ক্ষুদ্র-শিখা স্তিমিত দীপের
ধূমাঙ্কিত কালি,
লাভ ক্ষতি টানাটানি, অতি সূক্ষ্ম ভগ্ন অংশ ভাগ,
কলহ সংশয়,
সহে না সহে না আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি,
দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।
যে পথে অনন্তলোক চলিয়াছে ভীষণ নীরবে
সেপথ প্রান্তর
একপার্শ্বে রাখ মোরে, নিরখিব বিরাট স্বরূপ
যুগ যুগান্তর,
শ্যেনসম অকস্মাৎ ছিন্ন করে উর্দ্ধে লয়ে যাও
পঙ্ক-কুণ্ড হ'তে
মহান্ মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি করে দাও মোরে
বজ্রের আলোতে।

জীবনের এই বিরাট্ স্বরূপ দেখতে পেলে মৃত্যুর ভীষণতাও স্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যে দীপ্ত হয়ে উঠে, মৃত্যুর অর্থও পরিষ্কার হয়। সমস্ত বিশ্ব জুড়েই তো মৃত্যুর লীলা চলছে! কিন্তু—

হারায় নি কিছু ফুরায় নি কিছু
যে মরিল যে বা বাঁচিল।
বহি সব সুখদুখ
এ ভুবন হাসিমুখ;
তোমারি খেলার আনন্দে তার
ভরিয়া উঠেছে বুক।

আরও বলেছেন,—

অল্প লইয়া থাকি তাই মোর
যাহা যায় তাহা যায়।
কণাটুকু যদি হারায় তা লয়ে
প্রাণ করে হায় হায়।"

বিরাটের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখলেই দুঃখ ও মৃত্যুর রূপ পরিবর্তিত হয়ে যায়।

তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে
যত দূরে আমি যাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
কোথা বিচ্ছেদ নাই।
মৃত্যু সে ধরে মৃত্যুর রূপ,
দুঃখ হয় হে দুঃখের কূপ,
তোমা হতে যবে হইয়ে বিমুখ
আপনার পানে চাই।
হে পূর্ণ তব চরণের কাছে
যাহা কিছু সব আছে আছে আছে—
নাই নাই ভয়, সে শুধু আমারি,
নিশিদিন কাঁদি তাই।

"ধর্মের সরল আদর্শে" কবি বলেছেন, 'যাহা ধারণা করিতে পারি তাহাতে আমাদের তৃপ্তির অবসান হইয়া যায়, যাহা ধারণা করি তাহাতে প্রতিক্ষণে বিকার ঘটিতে থাকে। সুখের আশাতেই আমরা সমস্ত কিছু আশা

করিতে নাই, কিন্তু যাহা ধারণা করি তাহাতে আমাদের সুখের অবসান হয়। এইজন্যে উপনিষদে আছে, যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি।

"যাহা ভূমা তাহাই সুখ, যাহা অল্প তাহাতে সুখ নাই। সেই ভূমাকে যদি আমরা ধারণাযোগ্য করিবার জন্য অল্প করিয়া লই তবে তাহা দুঃখসৃষ্টি করিবে—দুঃখ হইতে রক্ষা করিবে কী করিয়া? অতএব সংসারে থাকিয়া ভূমাকে উপলব্ধি করিতে হইবে, কিন্তু সংসারের দ্বারা সেই ভূমাকে খণ্ডিত করিলে চলিবে না।"

বিশ্বজীবনকে সমগ্ররূপে দেখবার জন্য কবি তাঁর দৃষ্টিকে একদিকে যেমন দেশ দেশান্তরে অন্যদিকে তেমনি যুগ যুগান্তরে বিস্তারিত করে দিয়েছেন। তাঁর কল্পনা অতীত এবং ভবিষ্যৎকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করবার জন্য ব্যগ্র। সৃষ্টির কোন আদিম প্রভাতে এই পৃথিবী নীহারিকার আকারে আকাশময় ব্যাপ্ত হয়ে ছিল, তারপর জলন্ত বহ্নিময়রূপে কত যুগ যুগান্তর অশ্রান্ত চরণে সবিতৃ-মণ্ডলকে প্রদক্ষিণ করেছে,—সেই অতীত ইতিহাস তাঁর কল্পনায় ভেসে উঠে—

ধীরে যেন উঠে ভেসে
কত যুগ-যুগান্তের অতীত আভাস,
কত জীব জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
যেন খসে পড়ে সেই বাল্য নীহারিকা,
তারপর প্রজ্জ্বলন্ত যৌবনের শিখা,
তারপরে স্নিগ্ধশ্যাম অন্নপূর্ণালয়ে
জীবধাত্রী জননীর কাজ, বক্ষে লয়ে
লক্ষকোটি জীব—কত দুঃখ কত ক্লেশ
কত যুদ্ধ কত মৃত্যু নাহি তার শেষ।

বর্তমানে মানবচিত্তে যেসকল ভাবনা ও কামনা স্বপ্নের আবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে তারা সুদূর ভবিষ্যতে রূপ নিয়ে আত্মপ্রকাশ করবার জন্য উন্মত্ত আবেগে অনাগতের উদ্দেশে ছুটে চলেছে। কবির দৃষ্টি ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করে সেই নূতন সৃষ্টির অনুধাবন করতে বিমুখ নয়।

অস্ফুট ভাবনা যত দলে দলে ছুটে চলে
মোর চিত্ত গুহা ছাড়ি,'
দেয় পাড়ি
অদৃষ্টের অন্ধ মরু, ব্যগ্র ঊর্দ্ধশ্বাসে
আকারের অসহ পিয়াসে।
কি জানি কে তারা কবে
কোথা পার হবে
যুগ-যুগান্তরে
দূর সৃষ্টি পরে
পাবে আপনার রূপ অপূর্ব আলোতে।
আজ তারা কোথা হ'তে
মেলেছিল ডানা
সেদিন তা রহিবে অজানা।

বিশ্বজীবনকে সর্বদেশে ও সর্বকালে ব্যাপ্ত করে দেখবার ফলে এর আরেকটি বিশেষত্ব তাঁর নিকট ধরা পড়েছে; তা হচ্ছে বিশ্বের অন্তর্নিহিত গতিবেগ। কিছু স্থির হয়ে নেই, সব বস্তু রূপ হতে রূপান্তরে চলেছে। এককালে যেখানে অতলস্পর্শ সমুদ্র ছিল আজ সেখানে অচল পর্বত মাথা উন্নত করে দাঁড়িয়ে আছে; আবার এই পর্বতের অন্তরে পরিবর্তনের ক্রিয়া অলক্ষিতভাবে অবিরাম গতিতে চলেছে, যার ফলে এই পর্বতের কোন নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু হবে। বিশ্বের সর্বত্রই এই চঞ্চলের পদধ্বনি। এই চঞ্চলের পদধ্বনি তাঁকে উতলা করেছে—

"ওরে কবি, তোরে আজ করেছে উতলা
ঝংকারমুখরা এই ভুবনমেখলা
অলক্ষিত চরণের অকারণ অবারণ চলা।"

জীবজগতে এই গতিবেগ আরও পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত। কোন অনাদিকাল হতে জীবনের খরস্রোত পুরাতনকে ভেঙে নূতনকে গড়ে আপন গতি অক্ষুণ্ণ রেখে বয়ে চলেছে। পদে পদে এই জীবনধারাকে বাধা অতিক্রম করতে হচ্ছে, আর বাধা অতিক্রম করতে গেলেই ভাঙতে হয়; ভাঙন হতেই দুঃখ ও মৃত্যুর উৎপত্তি। বাধা না পেলে এই গতিবেগ রুদ্ধ হয়ে যায়; বাধা উত্তীর্ণ হবার জন্যই জীবনের গতিবেগ। সুতরাং বাধা, বিঘ্ন, দুঃখ, ক্লেশ, মৃত্যু জীবনের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। জীবনকেই

চলতে চলতে যেমন ভাঙতে হচ্ছে তেমন গড়তেও হচ্ছে, ধ্বংসের সঙ্গে সৃষ্টিও করতে হচ্ছে। সেইজন্যই দুঃখ-সাধনার ভিতর দিয়ে সৃষ্টির কার্য্য চলেছে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,—দুঃখ আমাদের সুপ্ত শক্তিকে বিকশিত করে, চৈতন্যকে উদ্বোধিত করে, কল্যাণের পথে আমাদের মুক্তি দেয়।

এই ক'রেছ ভালো, নিঠুর,
এই ক'রেছ ভালো;
এমনি করে হৃদয়ে মোর
তীব্র দহন জ্বালো।
আমার এ ধূপ না পোড়ালে
গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে
আমার এ দীপ না জ্বালালে
দেয় না কিছুই আলো।

তাঁর নববৎসরের আশীর্বাদ হচ্ছে—

পথে পথে অপেক্ষিছে কালবৈশাখীর আশীর্বাদ
শ্রাবণরাত্রির বজ্রনাদ।
পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা,
পথে পথে গুপ্তসর্প গূঢ়-ফণা।
নিন্দা দিবে জয়শঙ্খনাদ
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।
ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার,—
সে ত নহে সুখ, ওরে সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা
এই তোর নববৎসরের আশীর্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় কবির কানে যখন দূর হতে মৃত্যুর গর্জন, ক্রন্দনের ধ্বনি ও রক্তের কল্লোল এসে বাজছিল তখন এই রুদ্রদেবতার প্রসন্ন মুখের প্রতি চেয়ে অটল বিশ্বাসভরে বলেছিলেন,—

জীবনেরে কে রাখিতে পারে?
আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে।
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে॥

মৃত্যু যেন বদল ছাড়া আর কিছুই নয়—

এই সাজের এই রূপের খেলা
এবার করি শেষ;
সন্ধ্যা হল, ফুরিয়ে এল বেলা,
বদল করি বেশ।

কবি "পঞ্চভূতে" লিখেছেন, "জগৎ-রচনাকে যদি কাব্য হিসাবে দেখা যায়, তবে মৃত্যুই তাহার সেই প্রধান রস, মৃত্যুই তাহাকে যথার্থ কবিত্ব অর্পণ করিয়াছে। যদি মৃত্যু না থাকিত, জগতের যেখানকার যাহা সেইখানেই যদি অবিকৃতভাবে দাঁড়াইয়া থাকিত, তবে জগৎটা চিরস্থায়ী সমাধি-মন্দিরের মত অত্যন্ত সংকীর্ণ, অত্যন্ত কঠিন, অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া রহিত। এই অনন্ত নিশ্চলতার চিরস্থায়ী ভার বহন করা প্রাণীদের পক্ষে বড় দুরূহ হইত। মৃত্যু এই অস্তিত্বের ভীষণ ভারকে সর্বদা লঘু করিয়া রাখিয়াছে এবং জগৎকে বিচরণ করিবার অসীম ক্ষেত্র দিয়াছে। যেদিকে মৃত্যু সেই দিকেই জগতের অসীমতা। সেই অনন্ত রহস্য-ভূমির দিকেই মানুষের সমস্ত কবিতা, সমস্ত সংগীত, সমস্ত ধর্মতন্ত্র, সমস্ত তৃপ্তিহীন বাসনা সমুদ্রপারগামী পক্ষীর মত নীড় অন্বেষণ করিয়া চলিয়াছে।" এই ভাবই বলাকার "চঞ্চলা" কবিতায় অপূর্ব অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তুমি তাই
পবিত্র সদাই।
তোমার চরণ স্পর্শে বিশ্বধূলি
মলিনতা যায় ভুলি
পলকে পলকে—
মৃত্যু ওঠে প্রাণ হয়ে ঝলকে ঝলকে।

মৃত্যুই বিশ্বের জীবনকে পবিত্র ও চিরনবীন করে রেখেছে।

তব মৃত্যুমন্দাকিনী নিত্য ঝরি ঝরি
তুলিতেছে শুচি করি

নিঃশেষ নির্মল নীলে বিকাশিছে নিখিল গগন।
…দুঃখেরে দেখেছি নিত্য, পাপেরে দেখেছি নানা ছলে;
অশান্তির ঘূর্ণি দেখি জীবনের স্রোতে পলে পলে।
মৃত্যু করে লুকোচুরি
সমস্ত পৃথিবী জুড়ি।
ভেসে যায় তারা সরে যায়
জীবনেরে করে যায়
ক্ষণিক বিদ্রূপ।
আজ দেখ তাহাদের বিরাট্ স্বরূপ।
তারপরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বলো অকম্পিত বুকে,—
তোরে নাহি করি ভয়,
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।

তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দেব, দেখ
শান্তি সত্য, আমি শিব সত্য সেই চিরন্তন এক।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর আত্মপরিচয়ে বলেছেন, "আমি স্বীকার করি আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে এবং আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি—কিন্তু সেই আনন্দ দুঃখকে বর্জন করা আনন্দ নয়, দুঃখকে আত্মসাৎ করা আনন্দ। সেই আনন্দের যে মঙ্গলরূপ তা অমঙ্গলকে অতিক্রম করেই, তাকে ত্যাগ করে নয়। তার যে অখণ্ড অদ্বৈত রূপ তা সমস্ত বিভাগ ও বিরোধকে পরিপূর্ণ করে তুলে, তাকে অস্বীকার করে নয়।"

মৃত্যুও কবির নিকট নূতন অর্থে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। মৃত্যু জীবনের অবসান নয়, জীবনের নূতন জয়যাত্রার তোরণদ্বারমাত্র, নূতন সৃষ্টির উপকূলে যাওয়ার খেয়াতরী। চঞ্চলের নৃত্যস্রোত দেখে কবির—

মনে আজি পড়ে সেই কথা—
যুগে যুগে এসেছি চলিয়া
স্খলিয়া স্খলিয়া
চুপে চুপে
রূপ হতে রূপে
প্রাণ হতে প্রাণে।

যে জীবনধারা অনাদি অতীত হতে প্রবাহিত হয়ে নানারূপের ভিতর দিয়ে বর্তমানে এসে পৌঁছেছে, মৃত্যুতে কি তার পরিসমাপ্তি?

তাঁর "ফাল্গুনী" নাটকেরও মর্মকথা "জীবনকে সত্য বলে জানতে গেলে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তার পরিচয় চাই। যে মানুষ ভয় পেয়ে মৃত্যুকে এড়িয়ে জীবনকে আঁকড়ে রয়েছে, জীবনের পরে তার যথার্থ শ্রদ্ধা নেই বলে জীবনকে সে পায় নি। তাই সে জীবনের মধ্যে বাস করেও মৃত্যুর বিভীষিকায় প্রতিদিন মরে।"

মৃত্যুকে কবি ঠিক মিথ্যা বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। এর মধ্যে যতটুকু সত্য আছে তা তিনি স্বীকার করে নিয়েছেন। এর ন্যায্যমূল্যটুকু দিতে তিনি কুণ্ঠিত নন। জন্মের সময় প্রকৃতির নিকট আমরা যে রক্তমাংসের ঋণ গ্রহণ করেছি, মৃত্যুর মধ্যে আমরা সেই ঋণ পরিশোধ করি। মৃত্যুর বেদনাও কবির চিত্তে গভীরভাবে বাজে।

তবুও মরিতে হবে এও সত্য জানি।
মোর বাণী
একদিন এ বাতাসে ফুটিবে না,
মোর হিয়া ছুটিবে না
অরুণের উদ্দীপ্ত আহ্বানে;
মোর কানে কানে
রজনী কবে না আর রহস্যবারতা,
শেষ করে' যেতে হবে শেষ দৃষ্টি, মোর শেষ কথা।

কিন্তু ইহার মধ্যেও তাঁর বিশ্বাস আছে—

এমন একান্ত করে চাওয়া
এও সত্য যত,
এমন একান্ত ছেড়ে যাওয়া
সেও সেই মত।
এ দুঃখের মাঝে তবু কোনোখানে আছে কোন মিল।
নহিলে নিখিল
এতবড় নিদারুণ প্রবঞ্চনা
হাসিমুখে এতকাল কিছুতে বহিতে পারিত না।
সব তার আলো
কীটে-কাটা পুষ্পসম হয়ে যেত কালো।

তবে এই মিল যে কোথায় আছে তা তিনি জানেন না, জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে যে যবনিকার ব্যবধান রয়েছে, তা না উঠলে এই রহস্য জানবার কোন উপায় নাই।

আর একটি কবিতায়ও আছে—

"প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে,—
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর।
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল
পশ্চিম সাগরতীরে
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
কে তুমি
পেল না উত্তর।"

যদিও এই প্রশ্নের উত্তর নেই, তবুও যে-অজানার সঙ্গে সারা জীবন ধরে তাঁর বারবার নূতন করে পরিচয় হয়েছে, যে পরিচয়ের অন্ত সেই, মৃত্যুর পরপারে নেই অজানার সঙ্গে আবার চেনাশুনা হবে—

ঘণ্টা যে ঐ বাজল কবি, হোক্ রে সভাভঙ্গ।
জোয়ারজলে উঠেছে যে তরঙ্গ।
এখনো সে দেখায় নি তার মুখ
তাই তো দোলে বুক।
কোন্ রূপে যে সেই অজানার কোথায় পাব সঙ্গ,
কোন্ সাগরের কোন্ কূলে গো কোন নবীনের রঙ্গ।"

মৃত্যু তত বিভীষিকাময় নয় যত মৃত্যু ভয়। যখন মৃত্যুকে আসন্ন বলে মনে করি ও তার বজ্র উদ্যত দেখি তখনই ভয়ে বুক কাঁপে। কিন্তু সেই বজ্র যখন নেমে আসে তখন ভয় ভেঙে যায় এবং এই উপলব্ধি জাগে যে মানুষের সত্তা মৃত্যুর চেয়ে বড়।

কবি দুঃখের মধ্যে আনন্দের সন্ধান পেয়েছেন, অন্তরে অনন্ত মৌনের বাণী শুনেছেন, শূন্যময় আঁধার প্রান্তরে জ্যোতির পথ দেখেছেন। তাঁর বিশ্বাস—

"নহি আমি বিধাতার বৃহৎ পরিহাস
অসীম ঐশ্বর্য দিয়ে রচিত মহৎ সর্বনাশ।"

সুখলতা রাও (১৮৮৬—১৯৬৯)

পূর্ণেন্দু বসু

ট্রেনপথে এক প্রবীণ কোন এক নবীনের হাতে 'সন্দেশ' পত্রিকাখানি দেখে বলে উঠলেন, 'কী দিন গেছে আমাদের! সেদিনের 'সন্দেশ' 'মৌচাক' নিয়ে কাড়াকাড়ি। আর কিছু লাগত না। খাওয়া দাওয়া ছিল তুচ্ছ ব্যাপার। সে লেখা—সে আনন্দ জীবনে ভুলতে পারব না।

তরুণটি শুধু একবার বিস্ময়ভরা চোখে প্রবীণটির দিকে তাকাল। সুখলতার কথা লিখতে গিয়ে কেন জানি না ঘটনাটা মনে পড়ল।

নব পর্য্যায়ের 'সন্দেশ' বা একালের অন্যান্য শিশু-মাসিক কতটা আনন্দ দেয় তা ভাবলেই সে-যুগের সোনার দিনগুলির স্মৃতি বেশী করে মনে জাগে। আনন্দটা সে যুগে ছিল ছেলে, বুড়ো—সবার। শিশু-সাহিত্যের হয়তো অনেক উন্নতি হয়েছে। কিন্তু সেদিনের লেখকগোষ্ঠী আজ আর নেই। নতুন লেখক এসে সে-স্থানকে ঠিক যেন পূর্ণ করতে পারছেন না। অথচ সেযুগের অনেক অভাব আজ মিটেছে। ভাল ছবি ও মুদ্রণ-পারিপাট্য এখন সহজেই ছোটদের মন মুহূর্তে কেড়ে নিতে পারে। পত্র-পত্রিকারও অন্ত নেই। লেখায় রেখায় সুসজ্জিত হয়ে শিশুর মনোরাজ্যের দ্বারে তারা ভীড় জমায়।

বাস্তবিক সেই আকাশ, সেই আলো—মানুষ, জীবজন্তু—সেই চাঁদ সবই আছে। নেই কেবল সোনারকাঠি ছুঁইয়ে সব সোনা ক'রে তুলবার মানুষগুলো।

শিশুসাহিত্য আজ উপেক্ষিত নয়। সমৃদ্ধির পথে সে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে—একথাও সত্য। কিন্তু ঠিক লেখার সেই মেজাজ, সেই মনটিকে যেন পাই না। সহজে মন্‌কে কেড়ে নেবার মত লেখার অভাব রয়ে গেছে।

শিশু-সাহিত্যের স্বর্ণযুগের লেখকগোষ্ঠী অবসিত প্রায়। তেরো নম্বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের রায়বাড়ী প্রাণচঞ্চল আনন্দ দিয়ে ছিল গড়া। গান, গল্পের আসরে মেতে ওঠা এই বাড়ীটি উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর। তিনি একাই মাতিয়ে রাখতেন সবাইকে। ময়মনসিংহের (মসূয়া) আদি বাস ছেড়ে প্রথমে কলকাতার ছাত্রাবাসে কিছুকাল কাটান তিনি। সনাতন হিন্দুধর্ম ছেড়ে ব্রাহ্ম হন। স্বদেশবৎসল নারীকল্যাণব্রতী দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রথমা কন্যা বিধুমুখী ছিলেন উপেন্দ্রকিশোরের সহধর্মিণী।

উপেন্দ্রকিশোরের ছয় পুত্র-কন্যাদের মধ্যে সুখলতাই সবার বড়। তারপর সুকুমার রায় (তাতা) যিনি শিশুর মনোরাজ্যে অনাবিল হাসি, আর লেখার যাদু নিয়ে এলেন। "আবোল-তাবোল," 'হ য ব র ল' 'পাগলা দাশু', 'বহুরূপী,' 'খাই খাই' প্রভৃতি লেখা কোনকালে পুরোনো হবে না। শিশু একডাকে চেনে সুকুমার রায়কে। ছবি আঁকায়, গল্প বলায়, অভিনয়-আড্ডায় মাতিয়ে রাখতে তাঁর জুড়ি নেই।

পুণ্যলতা [খুসী] তাঁর তৃতীয় সন্তান। লেখাতে তাঁর হাতও কম নয়। তাঁর "ছেলেবেলার দিনগুলি" স্মৃতিচিত্রের এক অসাধারণ গ্রন্থ। চতুর্থপুত্র সুবিনয় রায়চৌধুরী বিজ্ঞানবিষয়ক রচনা ছোটদের কাছে সহজ করে পরিবেশন করেছেন। এই ধরনের রচনায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

এরপর ছিলেন শান্তিলতা (টুনী), আর সবার ছোট সুবিমল রায়চৌধুরী। এঁরাও গল্প বলা ও ছড়া তৈরীতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন।

সুরমা নামে একটি মেয়ে তাঁদের ঐ বাড়ীতেই বাবামায়ের সঙ্গে থাকত। মায়ের আকস্মিক মৃত্যু ও পিতার সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগের ফলে উপেন্দ্রকিশোর সুরমাকে আপন পরিবারভুক্ত করে নিলেন। তিনি সবার সুরমামাসী ব'লে পরিচিত হলেন। উপেন্দ্রকিশোরের ভাই প্রমদারঞ্জনের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। সুখলতার চেয়ে তিনি ছিলেন দুবছরের বড়।

বঙ্গসংস্কৃতি ক্ষেত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ি এক অবিস্মরণীয় নাম; কিন্তু উপেন্দ্রকিশোরের তেরো নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের বাড়ীটির দানও যে কম নয় সে খবর আমরা অনেকেই রাখিনা। উপেন্দ্রকিশোরের পরিবারস্থ প্রায় সকলেই বিবিধ গুণে গুণী ছিলেন। বিশেষতঃ শিশুসাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁদের দান অসামান্য। ছবি আঁকা ও ছবি ছাপার সার্থক ব্যবস্থা উপেন্দ্রকিশোরই সর্বপ্রথম করে যান। হাফটোন ব্লক তিনিই আবিষ্কার করেন। অথচ বিলাতের পেনরোজ কোম্পানীকে এর স্বত্ব দিয়ে দিতে একটুও কার্পণ্য প্রকাশ করেননি। মুদ্রণশিল্পে, উদ্ভাবনী প্রতিভা যে তাঁকে প্রতিষ্ঠা এনে দিতে পারে তা তিনি ভাবেননি। ছোটদের জন্য বহুগল্প, ছড়া, কবিতা তিনি লিখে গিয়েছেন। লাভ লোকসানের দিকে না তাকিয়ে বহু অর্থব্যয়ে গ্রন্থের পর গ্রন্থ রচনা ক'রে যাওয়া তাঁর স্বভাব বললেও অত্যুক্তি হয় না।

উপেন্দ্রকিশোরের এই স্বভাব তাঁর অন্যান্য ভাইদের মধ্যেও ছিল। আর পুত্রকন্যাদের মধ্যে ছিল তা পূর্ণরূপে। এককথায় উপেন্দ্রকিশোরের ধারা তার পুত্রকন্যাগণ অক্ষুণ্ণ রেখে বাংলা সাহিত্য—সংস্কৃতির প্রভৃত উন্নতিসাধনে সহায়তা করেছেন।

পরিবারের এই স্বাভাবিক ট্রাডিশনকে বজায় রেখে সুখলতা সাহিত্যসেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সুখলতার জন্ম। পুণ্যলতা তাঁর লেখায় বলেছেন—"দিদি সবার বড়, আর খুব শান্তশিষ্ট। ছেলেবেলায়ও দিদিকে কখনও চেঁচামেচি করতে কিম্বা হুড়োহুড়ি করে খেলতে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। শুনেছি ছেলেবেলায় নাকি দিদির খুব অসুখ করেছিল। হাঁটতে এবং কথা বলতে শিখেও অসুখের জন্য ভুলে গিয়েছিল, আবার দাদার (সুকুমার রায়) সঙ্গে সঙ্গে শিখতে আরম্ভ করল। সেইজন্যেই বোধহয় দিদির মধ্যে কেমন যেন একটু ভীরু করুণভাব ছিল"। *

প্রথমে কোলকাতার ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে এবং পরে বেথুন কলেজে সুখলতা শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৭ সালে সুখলতার সঙ্গে জয়ন্ত রাওয়ের বিবাহ হয়। উড়িষ্যার প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও সমাজসংস্কারক জয়ন্ত রাওয়ের পিতা ছিলেন ভক্তকবি মধুসূদন রাও। বিবাহের পর সুখলতা সাহিত্য-চর্চাকে ঠিকমতই বজায় রাখেন। তাঁর শেষ জীবন কাটে কোলকাতার কিড্ ষ্ট্রীটের বাড়ীতে। ১৯৬৫তে স্বামীর মৃত্যুর পরই তিনি কোলকাতায় বসবাস করতে সুরু করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র জিষ্ণুরাও এখন ইউরোপে আছেন। দুইকন্যা সুজাতা ও শীলা (দাস) আছেন কোলকাতাতেই।

সুখলতার অনেকগুণ। গল্প বলা, ছবি আঁকা, ছড়া ও অন্যান্য লেখায় তিনি সিদ্ধহস্ত। সমাজসেবায় সুখলতা নিজেকে দিয়েছিলেন সঁপে। কটকে থাকাকালে উৎকলবাসী বাঙ্গালী অবাঙ্গালী নির্বিশেষে তিনি সেবা করেছেন দুঃখী আর অসহায়দের। নিজে যা বই লিখে পেতেন, তার অনেক অংশই দিতেন বিলিয়ে। সমাজ সেবার স্বীকৃতিও মিললো। কাইজার-ই-হিন্দ্ পুরস্কার পেলেন উৎকল বাসকালেই।

সুখলতা তাঁর দীর্ঘজীবনের শেষসময় পর্যন্ত সাহিত্য-সাধনা করেছেন। প্রায় বিশটি গ্রন্থ তিনি লিখেছেন। তাঁর লেখাগুলিকে তিনটি পর্য্যায়ে ভাগ করা চলে। (১) গল্প, (২) ছড়া বা কবিতা ও (৩) নাটিকা। এছাড়া আছে প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযোগী গ্রন্থ।

আগেই বলেছি, রায়পরিবারে সকলেই গল্প বলার কৌশলটি উত্তরাধিকারসূত্রে সার্থকভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। সুখলতা বাবার কাছেই পেয়েছিলেন সবচেয়ে বেশী প্রেরণা। ছবি আঁকা বাবা তাঁকে খুব যত্ন করেই শিখিয়েছিলেন। লেখার সঙ্গে তাই তাঁর অপূর্ব ছবিও আজ আমরা দেখতে পাই।

গল্প বলা আর গল্প লেখা যে এক নয়, তা অনেকে বুঝতে ভুল করেন। আর সেই ভুলবশতঃই হয় ভুল বিচার। অনেকে গল্প লেখেন না, গল্প বলেন। উপেন্দ্রকিশোর, কুলদারঞ্জন, অবনীন্দ্রনাথ প্রমুখ লেখকবর্গ তাঁদের লেখায় গল্প না লিখে তা বলার চেষ্টাই করেছেন বেশী। আলাপের কথ্য ভাষা হয়েছে সুখলতার গল্পের বাহন। এ যেন গড়িয়ে চলা নব তৃণদলের অনন্ত শোভাযাত্রা।

শিশুর গল্প হবে স্পষ্ট—ভাষা সহজ—বর্ণনা হবে সংক্ষিপ্ত। এখানে গল্পে রাজপুরী বা দৈত্যপুরীর পথ ঘোরালো হতে পারে কিন্তু তাই বলে কাহিনীকে তেমন হলে চলে না।

"এক দরজীর তিন ছেলে। তার একটা ছাগলও আছে। আর সেই ছাগলটাকে সে ছেলেদের চেয়েও বেশী ভালবাসে।

একদিন সে তার বড় ছেলেকে ডেকে বলল, "যাও ত, ছাগলটাকে ঘাস খাইয়ে নিয়ে এস। দেখো যেন খুব পেট ভরে খেতে পায়।"

গল্পটির নাম "দরজী আর তার ছাগল।" এর আরম্ভে নেই কোন ভুমিকা।

আবার গল্প এগিয়ে চলেছে——

পাহারাওয়ালা যেতে, হাঁসটি তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, "রাজা কি করছেন?"

পাহারাওয়ালা বলল, "ঘুমাচ্ছেন।"

"আমাদের খোকা কি করছে?"

"ঘুমাচ্ছে।"

তখন হাঁস "আমি কাল আসব" বলে চলে গেল।

[ভাই বোন]

অথবা—

—রাজাকে দেখে হাঁস বলল, 'রাজামশাই, রাজামশাই, আপনার তলোয়ারটি আমার মাথার চারিদিকে তিনবার ঘোরান।'

রাজা যেই তার মাথার চারিদিকে তিনবার তলোয়ার ঘুরিয়েছেন, অমনি সেই রাজহাঁসের জায়গায় তাঁর সত্যি রাণী এসে তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। রাজা আশ্চর্য হয়ে বললেন, "একি! তখন দুষ্টু ডাইনীর সব দুষ্টুমি ধরা পড়ল। রাজা ত রেগে তলোয়ার নিয়ে তখনি ডাইনী আর তার মেয়েকে কাটেন আর কি! রাণী পায়ে ধরে বললেন, মারবেন না। হাজার হোক আমার সৎমা সৎ বোন ত। তবে ওকে বলুন যে আমার ভাইকে আবার মানুষ ক'রে দিতে হবে।

* * * *

বুনোর ভয়ে বনের ভিতর দিয়ে আর লোক যাওয়া-আসা করতে পারে না। কাঠুরেদের কাঠ কাটা বন্ধ, রাজার শিকার বন্ধ, মহা মুস্কিল। রাজা দেশের বড় বড় পালোয়ানদের ডেকে বললেন "যে বুনোকে মেরে আনতে পারবে, তাকে আমি দশ হাজার টাকা বকশিশ দেব।" পালোয়ানেরা তা শুনে মুখ চাওয়া চাওয়ি করে, কারও যেতে সাহস হয় না। তখন ইন্দ্র জোড়হাতে বলল, "মহারাজ, আমাকে হুকুম দিন, আমি যাব।" রাজা বললেন, "তুমি যাবে?—আচ্ছা যাও।" (চন্দ্র ও বুনো)

সুখলতা রাও তাঁর গল্পে জীবজগতের প্রায় সব প্রাণীকেই সাদর আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর রাজপুত্র বা রাজকন্যা দুঃখে বিপদে পেয়েছে গরীবের কুঁড়ের একটু আশ্রয়। কখনও বা মিলেছে ঠিক পথের সন্ধান। তাঁর ডাইনীগুলো শেষ পর্যন্ত উচিত শাস্তি পেয়েছে। আর ভুত মুহূর্তে মিলিয়ে গিয়ে কান্না জুড়ে বিদায় নিয়েছে। তাঁর বোতলভুত ও অন্যান্য ভুত প্রথমে ভয় দেখালেও পরে বেশ জব্দ হয়েছে। ডাইনীর মত তাঁর অসংখ্য জাদুবিদ্যা-পারঙ্গম যাদুকর বুড়ো আছেন। তাদের যাদুমন্ত্রে আমরা নিমেষে পৌঁছে যাই স্বপ্নপুরীতে। আবার বাঘ ভাল্লুক, খরগোস, শেয়াল—সকলে সহজেই অসাধ্যসাধন করেছে।

তাঁর গল্পগ্রন্থের মধ্যে "সোনার ময়ুর," "নানান দেশের রূপকথা," আরও গল্প," "গল্প আর গল্প" "হিতোপদেশের গল্প," "ঈশপের গল্প," "অজিভুজির দেশে." "পথের আলো" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

"সোনার ময়ূর" সোনার স্বপ্নে গড়া এক অপূর্ব সুন্দর কাহিনী।

সুখলতা তাঁর শিশুদের রূপকথার একরাজ্যে হাত ধরে নিয়ে গিয়েছেন। সেখানে অসম্ভব, অবাস্তব বলে কিছু নেই।

দরজীর ছেলে তাঁতির কাছে পেল অত্যাশ্চর্য এক চাদর। চাদরকে যা হুকুম করা যায় সেই সব জিনিষই সে এনে হাজির করে।

মণিমালা গরীবের কুঁড়েতে বসে সাদা বেড়ালকে হুকুম করতেই সে রাজবাড়ী থেকে ভাল ভাল খাবার এনে হাজির করল। দুর্গম অজ্ঞব পাহাড়ের দৈত্যের মাথা থেকে তিনগাছা সোনার চুল আনা দুখীর মত সাধারণ মানুষের পক্ষে যে কিছুমাত্র অসম্ভব নয় তা শিশু ভাল করেই জানে; আর এইখানেই শিশুর সঙ্গে বড়োর প্রভেদ। শিশুর কল্পনাকে কল্পরাজ্যে কিছুটা ছাড়া না দিলে চলে না। রূপকথার সোনার পুরীতে যে তাকে পৌঁছতে হবেই! কাজেই কোন বাধাই সেখানে টিকতে পারে না। রূপকথা বাস্তবের রাজ্য ছাড়িয়ে গেলেও তার সম্বন্ধ কিন্তু এই মাটির সঙ্গে বাঁধা—মাটির মানুষই পাথরের ঘুম ভাঙিয়েছে, দৈত্যকে বধ করেছে, অন্ধকার পাষাণপুরীতে আলো এনেছে; মৃত স্তব্ধ পুরীতে এনেছে প্রাণ চঞ্চলতা। সুখলতা রাও বিভিন্ন বিদেশী কাহিনী থেকে উপাদান সংগ্রহ করে আমাদের ঘরের শিশুদের উপযোগী করে তা পরিবেশন করেছেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার তাঁর সোনার কাঠী, রূপোরকাঠির ছোঁয়ায় যে রূপকথা এদেশের শিশুকে উপহার দিয়ে গিয়েছেন—ঠাকুরমা, ঠাকুরদাদার সেই ঝুলিতে আরো কিছু কাহিনী এনে জড় করলেন সুখলতা। তাঁর গল্পে আছে সোনারকাঠির ছোঁয়া। তাঁর প্রত্যেকটি গল্পই ঠিক যেন এক একটি মুক্তো। তাঁর 'ভাই বোন', "পাঁশকুড়ানি ইলা," "দুখি," "দরজী আর তার ছাগল", "লক্ষ্মী," ময়ূরদের রাজা", "গৌরী", "লালুভুলু," "রাজা নাকেশ্বর"—প্রত্যেকটি গল্পই চিত্তাকর্ষক। এসব গল্প পাঠে ছোট বড় সবারই দেখি সমান কৌতূহল। তাঁর 'আরো গল্প' বা "গল্প আর গল্প" বইখানি হয়তো ছোটদের পড়ার টেবিলে পড়ে আছে। কতবার দেখেছি বড়রা কথা বলতে বলতে বইটি টেনে নিয়ে তাতে তন্ময় হয়ে গিয়েছেন। অনেকবার ডেকে তবে তাদের একথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয় যে তিনি অন্য কাজে এসেছেন। ছোটদের তো কথাই নেই। তাঁর এসব লেখা পেলে তারা আর সব ভুলে যায়। এসব গল্পে তাঁর নিজের আঁকা ছবিগুলো থাকায় তা আরও লোভনীয় হয়ে উঠেছে।

"হিতোপদেশের গল্প" ও "ঈশপের গল্প" বই দুটিও কম আকর্ষণীয় নয়। শিশুসাহিত্য সংসদ পরমযত্নে ছবিতে ছাপায় গ্রন্থদ্বয়কে মনোহরণ করে তুলেছেন। এসব গল্প শুধু শিশুকে আনন্দই দেয় না, তাকে কিছু শেখায়ও। 'হিতোপদেশের গল্পে' প্রকাশকের নিবেদনের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করি—"ভারতের গৌরব বিষ্ণুশর্মা বিশ্বসাহিত্যে জয়তিলক অর্জন করেছে বিষ্ণু শর্মার এই নীতিমূলক গল্পগুলি। ...বঙ্গ ভাষায় এর অনুবাদ প্রচলিত আছে। বোধ করি, বর্তমান সমাজে গল্পের মাধ্যমে বিষ্ণুশর্মার নীতিকথাগুলির প্রচার বিশেষ করে শিক্ষাব্রতী শিশুদের কাছে একান্ত প্রয়োজনরূপে দেখা দিয়েছে। সমাজ চলে শিশুর পায়ে ভর দিয়ে।"

হিতোপদেশের গল্পে বিষ্ণুশর্মা রাজপুত্রদের শিক্ষাদানের জন্য গল্পের কৌশল অবলম্বন করে অনেককিছু শিখিয়েছেন। বস্তুতঃ এসব গল্পে আছে বুদ্ধির পরীক্ষা, রাজার কর্তব্যের ইঙ্গিত। 'হিতোপদেশের গল্প' অবশ্য অপরাপর দুএকজনও লিখেছেন। সুখলতার গল্প শিশুর একেবারে কাছের জিনিষ হতে পেরেছে।

ঈশপের গল্পও জীবজন্তুকে নিয়েই। বাস্তবের যুক্তিরাজ্যের বাইরের জগতে বাস করে এরা। অনন্ত প্রসারিত এই কল্পরাজ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন গ্রীস দেশের ঈশপ। মানুষের স্বভাব নিয়ে তাঁর জীবজন্তুরা চলেছে—কথা বলেছে। শৈশব থেকেই এসব গল্প শিশুকে গড়ে তুলতে করেছে সাহায্য—মানুষ গড়তে আজও এদের প্রয়োজন অপরিহার্য। লেখায় রেখায় ঝলমল করে বইটির পাতায় পাতায় ছবি। ঈশপের একটি বিখ্যাত চিত্রও এতে আছে।

"হিতোপদেশের গল্প" ও "ঈশপের গল্পে" লেখিকা সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন। বোধ করি স্বাভাবিক কারণেই তা করেছেন। প্রাচীন রচনার ঐতিহ্যরক্ষায় সাধুভাষাই যেন অধিকতর উপযোগী।

"পিঁপড়ারা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি শরৎকালটা কি করিয়া কাটাইলে? খাবার সংগ্রহ করিয়া রাখ নাই?"

ফড়িং বলিল, শরৎকালে আমি ঘাসের ডগায় বসিয়া গান গাহিয়া ও বাজনা বাজাইয়া দিন কাটাইয়াছি।"

"ওহো, শরৎকালটা গান গাহিয়া কাটাইয়াছ? তবে শীতকালটা নাচন নাচিয়া কাটাইয়া দাও।"

(পিঁপড়া ও ফড়িং)

'চাষীর ধন' গল্পটিতে চাষী ছেলেদের বলিতেছে, "বাছারা আমি চলিলাম। আমার জমিতে অনেক ধন লুকানো আছে; তোমাদের জন্য রাখিয়া গেলাম।

ছেলেরা মনে করিল, "বাবা বলিলেন, জমিতে অনেক টাকাকড়ি পোঁতা আছে।"

এখানে সাধুভাষার ব্যবহারের মধ্যেও লেখিকা প্রথমে "ধন" ও পরে 'টাকাকড়ি" শব্দ ব্যবহার করে শিশুর গ্রহণক্ষমতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছেন। এই বিশেষ দৃষ্টি তার শিশুর জন্য রচিত অপরাপর গ্রন্থেও সমানভাবে আছে।

শিশুদের শিক্ষা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানোচিত উপায়ে হওয়া আবশ্যক। বিদ্যাসাগর তা ভাল করে জানতেন। তাই বর্ণবোধ, বর্ণপরিচয়ে শিশুর বয়স অনুযায়ী উচ্চারণ-ক্ষমতা বিচার করে পাঠ সাজিয়েছেন। বিদ্যাসাগরের সে বর্ণ-পরিচয় পাঠ একপ্রকার উঠেই গেছে বলা যায়। অবশ্য যুক্তাক্ষর হ্রাস বা বর্জনের নীতি গ্রহণের ফলে এর মূল্য কমে গেছে। কিন্তু এখনও যে এসব গ্রন্থের প্রয়োজন কত তা এ কালের উঁচু ক্লাসের শিক্ষার্থীর বানান ভুলের বহরের দিকে তাকালেই সুস্পষ্ট হবে।

সুখলতা রাও বিদ্যাসাগর যোগীন্দ্রনাথ সরকারের ছোটদের শব্দ ও উচ্চারণ ও প্রকাশরীতি শিখিয়েছেন। তাঁর প্রথম শ্রেণীর শিক্ষার্থীর উপযোগী "নিজে পড়" ও দ্বিতীয় মানের উপযোগী "নিজে শেখ' গ্রন্থ প্রথম শিক্ষার্থীদের উপযোগী সার্থক দুটি বই। বহুবিদ্যালয়ে এ বই আজ পাঠ্য হয়েছে। বিদ্যালয়ের বাইরে ও বাড়ীতে বসে মা নিজেই এ থেকে সুন্দর শেখাতে পারেন শিশুকে "নিজে পড়"র প্রথম পৃষ্ঠায় আছে ত, অ ও তাদের সঙ্গে 'া' কার যোগ ক'রে অপরাপর অক্ষর লেখা শেখা। ত থেকে অ, অ থেকে আ আবার 'তা' থেকে আতা আর সব শেষে "অত আতা।" মুরগীর ডিমে তা দেবার একটা ছবি ও অনেকগুলো আতার ছবি এতে আছে। এরপর ব থেকে ক, র, বক, কাক, তারা— সব শেষে "কত বক আর কাক" ছবি সমেত এই শিক্ষা পদ্ধতি বড়োই মনোরম। এক অক্ষর থেকে অপর অক্ষর করবার সময় নূতন সংযোজিত অংশগুলি ভিন্ন-রঙে ছাপা। দু অক্ষর—তিন অক্ষর পর পর শিক্ষার পাঠ চলেছে। এগিয়ে প্রত্যেকটি শব্দের উপরে রঙিন ছবি। ঘন বনের ফাঁকে একটি কুটীরের ছবি—
তার পাশে লেখা—

ঘন বন
পথ কই
ওই পথ
ঘর ওই।

মজার কথাও অনেক।

'গাধা ডাক ছাড়ল"
দরজা দাও।
জানালা দাও।
কান ঝালাপালা হল।
আবার—

"একজন লোক ভারি ভোলা ছিল। একদিন সে লাঠি নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়িয়ে ফিরে সে নাকি লাঠিটাকে বিছানায় শুইয়ে দিল। আর নিজে ঘরের কোণে খাড়া হয়ে রইল ভুলে।"

দিয়েছেন। 'নিজে পড়' ও 'নিজে শেখ' বই দুইটিতে এমনি অনেক ছড়া আছে। সে কথায় পরে আসছি। 'নিজে শেখ' বইটিতে কয়েকজন লেখকের লেখাকে এক অংশে ছোটদের মত ক'রে সংকলন করে স্থান দিয়েছেন, অপর দিকে তাঁর নিজের লেখা রয়েছে। সমুদ্র মন্থনের কাহিনীটি তিনি সুন্দর করেবলেছেন। ঝর্ণা, পরীর ছোঁয়া; 'দার্জিলিং' 'মশা', প্রভৃতি লেখাগুলি সংক্ষিপ্ত অথচ কত স্পষ্ট! কত সহজ কথা অথচ আমরা তা বলতে গিয়ে কত কঠিন করে ফেলি। সহজ কথা সত্যিই সহজে বলা কঠিন। এই কঠিন কাজের দায়িত্ব শিশুর জন্য নিয়েছিলেন মুষ্টিমেয় লেখক-লেখিকা। বিদ্যাসাগর ছোটদের বন্ধু উপেন্দ্রকিশোর, যোগীন্দ্রনাথ সরকার এই কাজে নিজেদের সম্পূর্ণ নিয়োজিত করে ছিলেন। সুখলতার New Steps ইংরাজী বইখানি সুন্দর। ইংরেজী শব্দের নীচে বাংলা বানানে কথাগুলি লেখা রয়েছে। নতুন শব্দ ও সেই শব্দের অর্থ শেখাবার সুন্দর আয়োজন। Nursery Rhyme সংগ্রহ করে ও নিজে তৈরী করে খুব যত্ন নিয়ে তিনি এ গ্রন্থ রচনা করেছেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে সুখলতা রাও ছোটদের প্রথম শিক্ষা গ্রহণোপযোগী পুস্তক রচনায়ও আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ছোটদের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে তাকে ভাবতে হয়েছে। সত্যিকার অন্তর দিয়ে তিনি ছোটদের ভালবেসেছিলেন বলেই এইসব গ্রন্থ তাঁর পক্ষে রচনা করা সহজসাধ্য হয়েছে। এবার তাঁর কবিতা, ছড়া, নাটিকা, ইত্যাদির কথায় আসা যাক। কবিতা ছড়া রচনায় সুখলতা ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

আগেকার দিনের সিনেমার কথা বলতে গিয়ে "ছবির গল্প" কবিতায় তিনি বলছেন ষাট বছরেরো আগে—

ছেলেমেয়ে মিলতাম,
ছায়াবাজি দেখতাম,
সাদা টানা পর্দায়
কত ছবি আসে যায়,
নদী মাঠ ঘর বাড়ী
লোকজন ঘোড়া গাড়ি
তারা কিছু করত না,
নড়ত না চড়তনা।
সেই কথা মনে জাগে।"

ছন্দেরও বৈচিত্র্য আছে —

আজ সকালে গাছের ডালে,
পাতার জালে, হাওয়ার তালে,
দুলছে বাসা টুনির বাসা ছানায় ঠাসা।
জাগল আশা

চাঁদের আলোর সঙ্গে দখিন হাওয়ার বিবাদটি উপভোগ্য—

দখিন হাওয়া বিষম রেগে
ধমকে বেজায়, বলে,
তুই কেন রস চেয়ে?
পাহারা দিস আমায়, বলি
কার বা হুকুম পেয়ে!

পিঠে তৈরীর ছন্দের রূপবৈচিত্র্য কমউপভোগ্য নয়

"আটা মেখে, ছানা আর
গুড় দিয়ে মিঠে,
গিন্নিরা ভাজলেন
থালা ভরা পিঠে।"

কিন্তু ভাজলে কি হবে! জানালা দিয়ে বা বাঁদর ভিতরে হাত গলিয়ে

"পিঠে আনে,
অন্যেরা মজা করে খায়।

'বুদ্ধ ও সুজাতা' কবিতায় ছন্দে (৭+৭+৮) একটা সুপ্রাচীন রীতি দেখি

"মুরতি মনোহর কে গো এ মুনিবর?
মগন গভীর ধ্যানে,
বিমল শুচি ঠাম নয়ন অভিরাম,
আনন উজল জ্ঞানে।"

জোনাকির প্রতি শিশুর অনন্ত কৌতূহল।

?ার প্রশ্ন——

জোনাকিরা এক সাথে,
টর্চ বাতি নিয়ে হাতে,
ঝোঁপে ঝোঁপে জঙ্গলে
কাকে খোঁজে একরাতে ?
কারো কেউ হারিয়েছে ?
কেউ কোথা পালিয়েছে ?
সবেমিলে দলে বলে
তারে খোঁজে গাছে পাতে ?

গদ্যধর্মী ছন্দকে অনায়াসে ব্যবহার করেছেন তিনি "বিয়ে বাড়ী" কবিতাটিতে—

"কটক শহর
থেকে, গাড়ি চড়ে,
ভুবনেশ্বর
নতুন শহরে
গেছি বিয়ে বাড়ী,
বন্ধুর সাথে;
ভারি হাওয়া গাড়ি,
চারজন তাতে।"

তাঁর শেষ জীবনের রচনা গুলিতে ভাবের প্রগাঢ়তা আমাদের বিস্মিত করে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে অপার বিস্ময় ও কৌতুহল নতুন করে তিনি উপলব্ধি করেছেন।

এ পৃথিবী কৈশোরে
রয়েছিল গায়ে প'রে
সাগর নীল শাড়ি,
আর মাঝে মাঝে দ্বীপ,
যেন চন্দন টিপ
আঁচলে আঁকা তারি।
ছিলনা পতঙ্গ পাখী
পশু অরণ্যানী শাখি,
না ছিল মানুষেরা।

* * * *

"কোথাথেকে এল প্রাণ ?
দিল কোথা লুকিয়ে,
পৃথিবীর জল মাটি
দিল তারে ফুটিয়ে।"

আবার স্রষ্টার প্রতি প্রাণের অভিনন্দন।

সকলে বাঁচবে,
সুখে থাকবে ব'লে, এত
যতন ক'রল কেবা !
ভাবনা কার এত !

রায় পরিবারের কথাবার্তা—আলাপ-ব্যবহারে ছড়া কাটবার রেওয়াজ বহুদিনের।

উপেন্দ্রকিশোরের ঠাকুর্দা লোকনাথের ভাই ভোলানাথ কথায় কথায় ছড়া কাটতেন। গল্পকে ছড়ায় পরিবেশনের এক মজার খেলা খেলতেন এই পরিবারের প্রায় সকলে।

উপেন্দ্রকিশোর একবার কোন এক বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেয়ে এসে ছেলেমেয়েদের কাছে লিখলেন—

মাগো আমার সুখলতা,
টুনী, মণি, খুসী, তাতা,
কাল আমি খেয়েছি শোন
কি ভয়ানক নেমন্তন্ন

* * * * *

জল থেকে একটা জন্তু,
দেখতে ভয়ানক কিন্তু !
মাছ নয় কুমীর নয়,
করাত আছে, ছুতার নয়,
লম্বা লম্বা দাড়ি রাখে
লাঠির আগায় চোখ থাকে,
তার যে কতগুলো পা
ঢের লোকেতো জানেই না।
দুটো পা যে ছিল তার
বাপরে সে কি বলব আর !
চিমটি কাটত তা দিয়ে যদি,
ছিঁড়ে নিত নাক অবধি" !

চিঠিতে চিংড়ি মাছের একটা ছবিও এঁকে দিয়েছিলেন।

সুখলতা রাও, সুকুমার ও অন্যান্য সকলে ছড়া, কবিতা মুখে মুখেই রচনা করতে অভ্যস্ত ছিলেন। সুখলতার ছড়াগুলি বেশ মিষ্টি—

আয় বিষ্টি হেনে,
কাকুড় দেব মেনে;
আয় বিষ্টি কাজিতলা
তোকে দেব রাঙ্গা কলা।

* * *

আয় বিষ্টি ধনেখালি
তোকে দেব গুড় পাটালি।

* * *

মেঘ ডাকল গড়গড়িয়ে
বিষ্টি এল চড়বড়িয়ে।

আবার—

জিয়ল চিতল,
কাঁসা পিতল,
মুড়কি মোয়া বোতল বোতল,
খোলনা বোতল খোলনা,
মুঠোয় মুঠোয় তোলনা।

চাঁদে মানুষ পা দিলেও শিশুর কল্পনার চাঁদকে কেউই কেড়ে নিতে পারবে না। সুখলতা লিখেছেন—

কি আছে ওই চাঁদে?
কি পাব চাঁদে গেলে?
এত আরামভরা
এই পৃথিবী ফেলে?
কী আছে চাঁদে
জানতে পাব গেলে।

চাঁদের বুড়ির কথা শিশু কোনদিনই ভুলবে না—

চাঁদের মাঠে, আলোর হাটে,
চাঁদের বুড়ি আনলো ঝুড়ি,
ভরলো তাতে আপন হাতে
জোছনামাখা তুলো।
সে তুলো নিয়ে, চরকা দিয়ে
কাটলো সুতো, অনেক সুতো,
কাটলো যত, উড়লো তত।
সেসব তুলোগুলো
হাওয়ার ভরে, নীল সাগরে
ভাসলো তারা চাঁদনি পারা,
নামলো এসে মেঘের দেশে,
মেঘের গায়ে গুলো।

সুখলতা রাওয়ের শেষ বয়সের কয়েকটি লেখা 'কিশোর-গ্রন্থাবলী' নামে সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। এতে 'অনুসন্ধান' নামে একটি উপন্যাস, ঘুলঘুলি ও 'অপার রহস্য নামে ছুটি গল্প, যাত্রাপথে এবং পাষাণী নামে ছুটি নাটিকা ও কিছু ছড়া-কবিতা স্থান পেয়েছে।

'অনুসন্ধান' স্বল্পায়তন এক কিশোর উপন্যাস। কাহিনীটি চিত্তাকর্ষক। "ঘুলঘুলি" একটি সার্থক গল্প। একে ছোটগল্পও বলা চলে। একটি পরিত্যক্তপ্রায় বাড়ীর ঘুলঘুলি দিয়ে রাতের অন্ধকারে দেখা যায় আলো জ্বলছে। কিসের কান্না—আওয়াজ ভেসে আসে—রহস্য উদ্‌ঘাটন করল একটি নির্ভীক সেবাপরায়ণা মেয়ে। বেশ এ্যাডভেঞ্চার আছে গল্পটিতে। আবার স্বাভাবিক স্নেহমমতার স্পর্শও গল্পটিতে আছে।

সুখলতা রাও পরিণত বয়সেই (৮৩) পরলোকগমন করেছেন। তাঁর দেবার হয়তো আরো ছিল। কিন্তু আমরা সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলাম। সুখলতা শিশুসাহিত্যে যা দিয়ে গেলেন তার পরিমাণ কম নয়। তাঁর বহু লেখা এখনও অপ্রকাশিত আছে। সব প্রকাশিত হলে তার পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব হবে।

সুখলতা স্বভাব-শিল্পী। শান্ত, ধীর সরল এই মানুষটি যেন নরম মাটি নিয়ে ব'সে নিপুণ হাতে সুন্দর এক একটি পুতুল তৈরী করেছেন। তাঁর তুলির টান স্বতঃস্ফূর্ত। বর্ণসমারোহে উজ্জ্বল তাঁর লেখা। সুখলতা যে ভাষায় লিখেছেন তা অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ভাষা। এভাষা লেখার ভাষা নয়, বলার ভাষা। তাঁর সাহিত্যকর্ম বাংলা-সাহিত্যের পরম সম্পদ। শিশুর মনের মণিকোঠায় তা চিরদিন মণির মতই উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

উজ্জয়িনী

রামপদ মুখোপাধ্যায়

পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম।
স্বল্পীভূতে সুচরিত ফলে স্বর্গিনাং গাং গতানাং শেষৈঃ
পুণ্যৈ হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকং ॥

ভারতবর্ষে সাতটি নাম করা পুরীর কথা আমরা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি সেগুলি সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি, আর পুরাণকথা ও ইতিহাসে যুগের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত।

অযোধ্যা মথুরা মায়া (হরিদ্বার) কাশী কাঞ্চি অবন্তিকা আর দ্বারাবতী। এর মধ্যে কলিযুগে সমধিক খ্যাত অবন্তিকা-- যার অন্য নাম উজ্জয়িনী। গৌতম বুদ্ধের কাল থেকে এই নগরী খ্যাতির উচ্চশিখরে সমারূঢ়—এবং বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে ভারত-রাজ্যের মুকুটমণি। বিক্রমাদিত্যের শৌর্যবীর্যের খেতাবে যত না হোক-- তাঁর সভাপণ্ডিতদের সাংস্কৃতিক মণিদ্যুতিতে এর ললাট অতিশয় প্রোজ্জ্বল। এর মধ্যে সর্বোত্তম মণি হলেন মহাকবি কালিদাস—খ্যাতি দেশ-সীমা অতিক্রম করে সর্ব্বকালে প্রসারিত। তাঁর অমর কাব্য—মেঘদূতের মধ্যে উজ্জয়িনীর প্রাসাদ-ভবন, পুরস্ত্রীদের রূপপ্রসাধন বৃত্তান্ত, বেগবতী প্রভৃতি নদী, সমৃদ্ধজনপদ, জম্বুবন ছায়াঘেরা প্রান্তর…রাম-গিরির রম্য শিখর আর সজল কাজল মেঘের ছায়ায় নীপ শাখার শোভা সমারোহ আর উতলা কলাপী শিখিপুচ্ছে ইন্দ্রধনুর বর্ণবিভ্রম—চিরকালের সৌন্দর্য্য স্মৃতিকে সজাগ করে রেখেছে। বর্ণগৌরবময় সেই আবার তীর্থফলের সর্ব্বোত্তম সহায় এবং বিদগ্ধ চিত্তের প্রসাদ-পুষ্ট কলশ্রুতি সুনির্ম্মল আনন্দ-উৎস। কল্পনা এর স্পর্শে দিশাহারা—নিত্যনব ঊর্ণজালে বর্ণ প্রলেপে ছবির পর ছবি তৈরী ক'রে যায়—মানবচিত্ত নিখিলের মাঝখানে পদচারণা করতে করতে স্বর্গ সীমানার ইঙ্গিতে পুলক বিহ্বল—আনন্দ-রস-মগ্ন হয়।

একালের কবি আক্ষেপ ক'রেছেন, হায়রে—কালিদাসের কাল। উজ্জয়িনী পৌঁছে সেই আক্ষেপবাণী বারেবারেই মনে হল। স্বাবেই সে চিত্র কল্পলোকের কমনীয় রূঢ় বাস্তব কল্পনাচ্যুতির দুঃখবেদনায় ভারাক্রান্ত।

বর্ত্তমান কালের উজ্জয়িনী—সে কেমন? কোন পথে কতটুকু সময়ে তার নাগাল পাওয়া যায়? ইতিমধ্যে হাওড়া থেকে আমরা ভুপাল পৌঁছেছি। সেখান থেকে সাড়ে চার ঘণ্টার পথ উজ্জয়িনী। রেলপথের দুধারে অতি বিস্তীর্ণ রুক্ষ প্রান্তর মরু-ভূমির ইঙ্গিত বহন করছে। ইঙ্গিতটা পাওয়া গেল মাঝখানের একটি বড় মত ষ্টেশনে এসে। ষ্টেশনে জলের কল আছে—জল নাই। পিপাসার্ত্ত যাত্রীদের জলপাত্র হাতে ছুটোছুটি দৌড়ঝাঁপের সে এক প্রাণান্তকর দৃশ্য। শরৎকালের দুপুর খর ময়ূখ-জালে পীড়িত না হলেও-- ভ্রমণক্লান্ত যাত্রীদের পক্ষে নিতান্ত সুখদায়ক নয়। অপরাহ্ন বেলাতেও উচ্চাবচ প্রান্তরের রূপটা কোমল হয়নি। এখন পিতৃপক্ষ চলছে- প্রথম রাতে চাঁদের আলোয় ভুবন মায়াময়

হয়ে উঠবে না জানি—তবু যতই অবন্তীরাজ্যের কাছাকাছি আসছিলাম—মেঘদূতের ছবিগুলি কল্পনাকে রঙীন করে তুলছিল—এবং আশা করছিলাম……কিন্তু আশা যে মরীচিকাবৎ তা ষ্টেশনের বাহিরে পা দিয়েই বুঝলাম। ষ্টেশনের সামনে ধুলো-ওঠা রুক্ষ একফালি জমি—তার ওধারে নাতিপ্রশস্ত রাজপথের ধারে পানভোজনের দোকানগুলিতে উগ্র আধুনিক সজ্জা—ও শব্দ সংঘট্ট অচিরাৎ মনকে পীড়িত করে তুলল। রাজপথে যানবাহনের ভিড়—কোলাহল বিশৃঙ্খল জনতার চাপে- যেন কোন বড় শহরের ঝাঁঝালো রুচির অনুকৃতি—প্রাচীন কালের গৌরব-সমৃদ্ধিকে এক মুহূর্তে ধূলিসাৎ করে দিল। মাত্র এক ফার্লং দূরে প্রাসাদোপম একটি ধর্মশালায় আশ্রয় পেয়ে খানিকটা স্বস্তিবোধ করলাম। স্বস্তিবোধ করলাম—যে হেতু ধর্মশালার বিস্তীর্ণ অঙ্গনে যাত্রীর ভিড় ছিল না—দিব্য শান্ত গম্ভীর পরিবেশ যা অতীত স্মৃতি রোমন্থনের উপযোগী। কিন্তু প্রথম দর্শনে উজ্জয়িনী যে নিদারুণ আঘাতে কল্পনাকে শূন্যলোকে উধাও করে দিয়েছিল, এখন তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা গেল। এখানে কল্পনা আবার চিত্রপটে বর্ণরেখাপাত করতে সুরু করে দিল। মনে মনে আবৃত্ত করলাম পুনীং শ্রী।

উজ্জয়িনীর দুটি অংশ—একটি মহাকালমার্গ ধরে শিপ্রানদীতীর পর্য্যন্ত প্রসারিত। এটিকে পুরাতন কালের শহর বলা হয়। তা বলে সেটা বিক্রমাদিত্যের কালকে স্মরণ করার সহায়ক নয় আদপেই। কালিদাসের কাব্যবর্ণিত সামান্য কোন ইঙ্গিত এই পুরাতন পথের কোথাও চোখে পড়ে না। বরং মনে হয় পশ্চিমের মাঝারি ধরণের যে কোন একটি শহরকে উজ্জয়িনী বলে চিহ্নিত করা সহজ। দিনের বেলায় লাঞ্ছিত টানাটানি খাদ্য পানীয়ের পীড়নে উজ্জয়িনী র‍্যাশন-শাসিত ভারতবর্ষের অচ্ছেদ্য অংশ কিন্তু সন্ধ্যার পর বিদ্যুৎ বাতি বিলসিত—এর পথ প্রাসাদ, বিপণীশ্রেণী যেন কাব্য বর্ণিত অলকাপুরী অলকাপুরী অবশ্যই সর্বকালের মানবচিত্তের আদর্শের রূপ দিয়েই তৈরী। তা হোক সন্ধ্যাকালের উজ্জয়িনী আর একটি অংশ—যা আধুনিক কালের রুচি রীতি অনুযায়ী রূপবতী, তাকে ভালই লাগল। এখানে কাব্যের কথা মিলিয়ে নেওয়ার অবকাশ থাকে না। অপরিচিত পথের জনতাও আলোকসজ্জার মাঝখানে পথ চলার নেশা মনকে পেয়ে বসে। পথ চলতে ভাল লাগে। কোথায় কতদূরে পায়ের তলাকার পথ শেষ হয়েছে—কোন লক্ষ্যে চলেছি সে হিসাব তুচ্ছ হয়ে যায়। এমনি করেই উদ্দেশ্যহীন ভাবে আমরা পথ চলছিলাম। না কথাটা ঠিক হোল না—উদ্দেশ্য একটা ছিল বইকি, রাত্রির সুবেশী উজ্জয়িনী দেখব বলে বেরিয়েছিলাম। অতি প্রশস্ত পথ মাঝে মাঝে চৌমাথায় এসে আরও মনোরম হয়েছে—কোন উদ্যানে ছেলেদের খেলবার কিছু সরঞ্জাম আছে—কোনটি বা কোন নামী ব্যক্তির মর্মর মূর্ত্তি নিয়ে গৌরবান্বিত, কোনটি চারধারের যানবাহন নিয়ন্ত্রণের ছাড় বহন করেছে। রূঢ় বাস্তবের মাঝখানে কোমল একটু ছন্দের সংযোগের মত।

একজন পথিককে শুধোলাম এ পথ কোথায় গেছে? উত্তর হল, গোপাল মন্দির।

গোপাল মন্দির! এখানেও কি ব্রজের আলো এসে পড়েছে? এই মহাকাল স্থানে—বৃন্দাবনের লীলাভাস? শিব পীঠে শক্তির স্বরূপ প্রকাশ সহজভাবেই ধরা যায়, কিন্তু বৈষ্ণবের সাধন মহিমা—কোন উৎস থেকে উৎসারিত হল? সে তথ্য জানার অবকাশ এই মুহূর্তে ছিল না। আমরা ওই ঠিকানা ধরে লক্ষ্যপথে চলতে লাগলাম।

হঁ, শহর এখানে পূর্ণ উদ্যমে কর্মচঞ্চল। যানবাহন ও পথচারীর ভিড়ে পথ প্রায় রুদ্ধ, দুপাশের বিপণীতে নিয়ন আলোর ছটা পণ্যসম্ভার নানা পদের খাদ্য সামগ্রী উপচে পড়ছে, বিপুল কলাহলে কোন শব্দই অর্থবহ নয়, তার উপরে কান ফাটানো স্বরবর্দ্ধক যন্ত্রে সঙ্গীত স্রাব: হৈ হৈ-হট্টগোলের স্রোতে সর্বাঙ্গ সমর্পণ না করে উপায় কি? বিপর্য্যস্ত লক্ষ্য স্বন্ধ সম্পূর্ণ অনবহিত হয়েই আমরা গোপালমন্দিরের বিশাল দুয়ারের সামনে

পৌঁছলাম। এবং স্রোতের অঙ্গ হয়েই গোপালদেবের সামনে এসে আছড়ে পড়লাম।

আমাদের বাংলার পরিচিত গোপাল মূর্ত্তি এ নয়। এঁর কটিতটে পীতধরা হাতে পাঁচনবাড়ী কিংবা মোহন বেণু, শিরে শিখিপুচ্ছ নাই, নগ্ন-নীলকান্ত-দ্যুতি আলিম্পিত দেহসুষমাই বা কোথায়? এই মূর্ত্তির সঙ্গে দ্বারকায় রণছোড়জির মূর্ত্তির বড় আশ্চর্য্য মিল। সেই মহার্ঘ্য বসন মণিরত্ন অলঙ্কার ঐশ্বর্য্য শুধু সর্ব্বাঙ্গে নয়—মন্দিরের সর্ব্বত্র ঝলমল করছে। রত্নসিংহাসনে রাজাধিরাজ মূর্ত্তি গোপালের, বিশ্বের পালকরূপী বিষ্ণুই ইনি। ঐশ্বর্য্যের প্রকাশে যাত্রীর চিত্ত বিহ্বল বিবশ হবে সে আর বেশী কি।

নাটমন্দিরের একাংশে বসেছে কীর্ত্তনের আসর, সম্ভ্রান্ত ঘরের অন্তঃপুরিকারা বসিয়েছেন আসর। দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে এঁদের মুখ ঢাকা কিন্তু কণ্ঠস্বরে সলজ্জ অর্দ্ধস্ফুট নয়। কারো হাতে করতাল, কারো কোলে মৃদঙ্গ, করতালি ধ্বনিতেও নাটমন্দির প্রতিধ্বনিত। সুরটি মিষ্ট—বাণী অস্পষ্ট। বাংলার কীর্ত্তনে ভক্তিরসধারার সঙ্গে অবেগ যে পরিমাণে মিলিত হয়, দরদর অশ্রুধারায় ও উদ্দণ্ড নৃত্যতালে যে মহাভাব দর্শক চিত্তকে আকুলিত উন্মথিত করে, এখানে তা অনুভূত হল না। অপরিচিত অক্ষরের পানে আজও মানুষ যেমন অবাক হয়ে চেয়ে থাকে আমরাও তেমনি খানিক্ষণ গোপালমন্দিরে বসে থেকে বার হয়ে এলাম। মন্দির দেখলাম, দেবমূর্ত্তিও দেখলাম কীর্ত্তনের সুরও কানে গেল, কিন্তু ঠিকমত হৃদয়ের সংযোগ যেন ঘটল না।

কেন? এইপ্রশ্ন মন মাঝে মাঝে করে। বিস্ময়করকে দেখতে বহু ক্লেশ সহ্য করে দূর দূরান্তর থেকে ছুটে এসেও কেমন তেমন করে বিস্মিত হতে পারি না! আশ্চর্য্য বস্তু দর্শনের কল্পনা কৌতূহলকে বাড়ায় অথচ সামনে এলে কখনো কখনো সেই কৌতূহল স্তিমিত হয়ে পড়ে কেন? দর্শন কি কয়েকটি শুভ মুহূর্ত্তের যোগফল মাত্র? মন সব সময়ে প্রস্তুত থাকে না বলেই কি ভূমিকাটুকুই উজ্জ্বল থাকে-বিষয়বস্তু রস পুষ্ট হয় না? অথবা পরিবেশই এর জন্যে দায়ী। পথে এসে মনে হল—এইটাই গোপাল-মন্দিরের চেয়ে ভাল লাগছে। এই চলমান জনস্রোত আলোকউদ্ভাসিত যানবাহন পণ্য বিপনী প্রাসাদ-কোলাহল। এরা বার্ত্তা বয়ে আনছে। এই স্রোতের মধ্যে আমি মিশে আছি—আমারও অংশ আছে। আমি আছি বলেই কি পথ সুন্দর—প্রাণ পরিপূর্ণ?

পথের শেষাংশ এমন কলরবমুখর ছিল না। তখন রাত বেড়েছিল, দোকানপসারের আলো নিভে ঝাঁপ বন্ধ হয়েছিল—পথে যানবাহন বিরলপ্রায়; তবু ভাল লাগছিল। এই নৈশযাত্রার প্রথম অংশে উজ্জয়িনীর যৌবন দিনের ইঙ্গিতটা যেন ধরা পড়ল—আর শেষাংশে মহাকালের স্বরূপটি। পরিতৃপ্ত চিত্তে দীর্ঘপথ অতিবাহিত করে ধর্ম্মশালায় পৌঁছালাম। ধর্ম্মশালার সদর দরজাটি এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ছোট্ট কাটা দরজাটি শুধু খোলা ছিল, সেটিও বন্ধ হয় হয়—এমন সময়ে আমরা পৌঁছলাম। দ্বারী আমাদের সতর্ক করে বলল, রাত এগারোটার মধ্যে ফিরে আসা নিয়ম।

পরের দিন সকালে মহাকালমার্গ ধরে সিপ্রাতীর ও মহাকাল মন্দিরে চলেছিলাম। মাইলখানেক পথ—যান বাহনের অভাব ছিল না এখানে নতুন একধরণের অশ্বযান লক্ষ্য করছি। অনেকটা টমটমের মত মুখোমুখি চারজনে বসবার চারটি আসন—পিছনে ঠেস দেওয়ার জন্য চারটি বালিশ,আসন সঙ্কীর্ণ,মাপসই তক্তটি কোনক্রমে বিন্যস্ত হলেও হাঁটুতে হাঁটু ঠেকিয়ে অন্তরঙ্গ না হয়ে উপায় নাই; কলেবরধারীরা সেই আসন দেখলে অবশ্যই শঙ্কিত হবেন। তবু এ গাড়ীতে সওয়ার হয়ে টাঙ্গা চড়ার মত অস্বস্তিবোধ হয় না। আমরা হেটেই চলেছিলাম—দুধারের বাড়ীঘর লোকজন দেখতে দেখতে। অচেনা একটি স্থানকে এইভাবে চেখে চেখে দেখলে দেখার আনন্দটি ঠিকমত অনুভব করা যায়। কিন্তু আনন্দ-উপভোগের বিঘ্নটুকু আমরা এড়াতে পারলাম না। আমাদের চলন চালনি ও বেশবাস দেখে আমরা যে ভিনদেশী মানুষ এবং স্নানার্থী—সুতরাং তীর্থকৃত্যাদিতে শ্রদ্ধাসম্পন্ন,এটি অনুমান করে নিয়ে একজন পথিক অন্তরঙ্গ হতে চাইলেন বাবুজী কোন দেশ থেকে আসছেন? কোন জেলা?

প্রশ্নে মনে হল—উজ্জয়িনী সপ্তপুণ্য পুরীর অন্যতম, এখানেও দ্বাদশ বৎসর অন্তে কুম্ভমেলার যোগাযোগ ঘটে, স্নান এখানে শুধু নদী জলে অবগাহন নয়—পিতৃপুরুষের কিছু কৃত্যও সেই সঙ্গে অবশ্য করণীয়। তা ছাড়া এখন তো পিতৃপক্ষ চলছে—তর্পণের পর্বও আছে। প্রয়াগের মত মস্তকমুণ্ডন না হোক গোদান ভোজ্যদান ব্রাহ্মণ ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলিও নিশ্চয় প্রচলিত।

জেলার নামটি বলে সবিনয়ে জানালাম, তীর্থে এসেছি ঠিকই স্নান করব এবং পিতৃগণকে তর্পণও, কিন্তু ওগুলি অন্যের সাহায্য ছাড়া নিজেই করে নিতে পারব। আপনার সাহায্য দরকার নেই। সুতরাং

ব্যস, ওই ইঙ্গিতটুকুতেই উনি পাশটিতে এসে আরও ঘন হয়ে চলতে চাইলেন।

সেকি বাবুজী, এতদূর থেকে এসেছেন—বার বার তো আসবেন না, পিতৃপুরুষের কাজ একবারই তো করবেন ইত্যাদি নানা কথার ফাঁদে আমাদের কায়দা করতে চাইলেন।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই—আমরা নীরবে পথ চলতে লাগলাম। লাভ একেবারেই যে হয়নি তা নয়—ওঁর গতিপথ অনুসরণ করে আমরা মহাকাল মার্গ ছেড়ে অনায়াসে সংক্ষিপ্ত আঁকা বাঁকা পথ ধরে সিপ্রা তীরে পৌঁছতে পারলাম—অপর জনকে গন্তব্য স্থান সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদের প্রয়োজন হল না। এখন চোখ মেলে অন্বেষণ করছিলাম, পুরাতন উজ্জয়িনীর কোন চিহ্ন আছে কিনা। পথটি হাল আমলের তৈরী বাড়ী ঘর দোকান পাট ইত্যাদিতেও নাতিআধুনিক ও আধুনিককালের সংমিশ্রণ, কিন্তু ভাঙ্গা-চোরা ইমারৎ এঁদো গলি—নোংরা আবর্জ্জনার স্তূপ দেখে পঞ্চাশবাট বছরের আগেকার আমাদের গ্রামের কথা মনে হল। ওই ভাঙ্গাচোরা ইমারতের জটলায় একটা সেকেলে ধরনের প্রকাণ্ড দরজা দৃষ্টি আকর্ষণ করল—ওর গায়ে গায়ে পুরাতত্ত্বের রিফু করা চাদরখানা যেন চাপানো রয়েছে।

সঙ্গী বললেন, রাজা বিক্রমাদিত্যের প্রাসাদের সিংদরজা। তাই নাকি! ওই ধ্বংসস্তূপটা কি প্রাসাদের স্মৃতিচিহ্ন। কিন্তু সিংদরজার গঠন নৈপুণ্যে গুপ্ত যুগের কি মোগল যুগের চিহ্ন রয়েছে সেটা ঐতিহাসিক বলতে পারবেন—আমাদের সন্দেহ হল এর বয়স চার পাঁচশোর বেশি নয়। কালিদাসের কাল তো কোনমতেই নয়। তবুও স্বস্তি—এতক্ষণে যাহোক পুরাতন একটু চিহ্ন ওই পুরাণ-বর্ণিত শহরে মিলল।

সিপ্রাতীরে এসে আর একবার স্বপ্নভঙ্গ হল। এই সিপ্রা? এত মাহাত্ম্যকথন ছন্দগতির বিন্যাস—এত পুলক রহস্য রোমাঞ্চ ঘনীভূত? সিপ্রার সঙ্গে শীর্ণকায়া চূর্ণী নদীর সাদৃশ্য অদ্ভুত, তার স্নানঘাট যদিও বাঁধানো—কাশীর মত বিস্তীর্ণ ও গম্ভীর মহিমা কই? ওপারের পঞ্চায়েৎ আখড়ার ঘাটটি বরং নয়ন-লোভন। বড় জোর পঞ্চাশ ষাট হাত বাঁধানো ঘাট—সামান্য পর্বদিনে স্নানার্থী সমাবেশ কল্পনার আনন্দেশ্বাসরুদ্ধ হয়, না জানি কুম্ভমেলায় কি মহামারী ব্যাপারই ঘটে! প্রয়াগে বা হরিদ্বারে কুম্ভমেলা বসে তার চেহারা ও চরিত্রই স্বতন্ত্র। নাসিকের স্নানঘাট দৈর্ঘ্যে-প্রস্থে এর চেয়েও বহুগুণ বিস্তৃত তবু কুম্ভস্নানে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাবেশ হলে কি অবস্থা হয় এই কথা সাশ্চর্য্যে জিজ্ঞাসা করেছিলাম পণ্ডিতজীকে। উনি হেসে বলেছিলেন—লক্ষ লোক তো একদিনেই স্নানে আসে না একমাস ধরে তারা স্নান করে। প্রয়াগের ভিড়টা একদিনের বলেই অমন মারাত্মক মনে হয়। একমাসে ওটার চেহারা ঢের বেশী সুস্থ—সারা শ্রাবণ মাসই তো কুম্ভস্নানের মাস। কিন্তু উজ্জয়িনীর ব্যবস্থা কি ভাবে হয় জিজ্ঞাসা করতে সময় হয়নি। হয়তো ওই রকমই কিছু ব্যবস্থা আছে। তবে প্রয়াগ বা হরিদ্বারের মত প্রচণ্ড ভীড় যে এখানে হয় না—এটি নিশ্চিত।

সঙ্গের লোকটি বিধিমতে তীর্থমাহাত্ম্য-কীর্ত্তন করতে লাগলেন, আমরা স্নানের উদ্যোগ করতে লাগলাম। আরাম করে স্নান করার উপায় এখানে নাই। জল পরিষ্কার—নদী বহতা, কিন্তু প্রকাণ্ড-কায় কূর্মপ্রবরেরা সেখানে পুত্রকলত্রাদি নিয়ে স্বচ্ছন্দ বিহারে রত। এখন কোন মতে একটা ডুব দিয়ে উঠতে পারলে আরাম বোধ হয়।

স্নানঘাটে বিদেশীর ভিড় দেখলাম না। সত্য বলতে কি, একজন তীর্থকামীকে দেখলাম না যিনি পাণ্ডা কর-কবলিত হয়ে পুণ্যসঞ্চয়ে মনোনিবেশ করছেন। অথচ এটি পিতৃপক্ষ। আমরা স্নান-তর্পণ সেরে আর একবার সিপ্রার দুটি তীরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলাম। হায়রে কালিদাসের কাল—কবেই কালান্তরিত হয়েছে।

এবার ভিন্ন পথে ফিরে আসছি। পথে একটি মন্দির পড়ল হর্ষমুখার মন্দির। মন্দিরের বয়স খুব বেশি-দিনের নয়। দেবী মূর্তির বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। অদ্ভুত হাস্যময়ী দেবী—বালিকাসুলভ অতি সরল হাসিটিতে মুখখানি অতিশয় জীবন্ত—মোটেই সুন্দরী নন দেবী, আমাদেরই সংসারের পাঁচি-পাঁচি চেহারার একটি মেয়ে, কৌতুকে বালচাঞ্চল্যে কি অদ্ভুত ভঙ্গিতে মুখ বাঁকিয়ে হাসছেন। সেই অদ্ভুত হাসিটিই তাঁকে সৌন্দর্য্যময়ী করেছে—দেহের সমস্ত অলঙ্কার দেবী মহিমার সমস্ত লাবণ্য আত্মসাৎ হাসিটিতে। এবং তাতেই মনে হচ্ছে এ মেয়ে যদিও সাধারণ তবু অসামান্য। একবার দেখেও মূর্তিকে বার বার দেখতে হয়।

মূল মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে একটি রুদ্ধদ্বার মন্দিরের মধ্যে আলো জ্বলছে। লোকে বলে অনির্বাণ জ্যোতির সঙ্কেত রয়েছে প্রদীপটিতে। কিন্তু ওটি মাত্র একবারই জ্বালা হয়নি, প্রতিদিনে জ্বালাবার ব্যবস্থা রয়েছে। এই মন্দিরের পথ ধরে সোজা গেলে মানমন্দিরে পৌঁছানো যায়। কিন্তু সব চেয়ে অবাক করা দৃশ্য হল, এই পথের নীচের মহাকাল মন্দিরে আসার পথে একটা বিস্তীর্ণ খাদ। এটি যে এককালে বহতা নদীর গর্ভদেশে ছিল সে বিষয়ে এক পলকেই নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। এই মরা খাত কি কবি কালিদাসের 'মেঘদূতবর্ণিত নদী গন্ধবতী—যার কূলে ছিল মহাকাল মন্দির, গন্ধবতী সিপ্রার নাতিবৃহৎ শাখানদী।

সেই বিস্তীর্ণ খাদটি পেরিয়ে নগরীর মধ্যভাগে মহাকাল মন্দির। শিব-পুরাণোক্ত দ্বাদশ শিবলিঙ্গের অন্যতম। সংস্কৃত নাটকে মহাকালের অন্যনাম কাল-প্রিয়নাথ। এই নামানুসারে উজ্জয়িনীর অন্য নাম মহাকালবন।

আসার সময় বার বার মনে হল পুরাতন দিনে সিপ্রা কি এই পথেই প্রবাহিত হতো, এরই কূলে কূলে ছিল গগনস্পর্শী সৌধশ্রেণী এবং মহাকালের মন্দির। মহাকাল মন্দির এখনও বিদ্যমান—কিছু অধুনা কালের সৌধও দৃষ্টিগোচর হয় কিন্তু বিক্রমাদিত্যের শাসন-মহিমাকে তারা নিশ্চয় প্রচার করে না। তা না করুক। মহাকাল মন্দিরের আয়তন-সীমায় সেই কালের স্পর্শ এখনও লেগে রয়েছে এই কি?

এই পথে আসতে বিরাট একটি গণেশমূর্তি দেখলাম। তাকে আধুনিক-রীতিতে দৃষ্টিলোভন করে তুলবার প্রয়াসটাই উগ্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু মহাকাল-মন্দির নিজ গৌরবে আকর্ষণীয়! ভূগর্ভে বিরাট লিঙ্গ-মূর্তির উল্লেখ না করেও মন্দিরের চত্বরে যে প্রাচীন উজ্জয়িনীর রূপাবশেষ অনুভব করা যায় এটি কেনা স্বীকার করবেন? অন্তত মন্দিরচত্বরে সংরক্ষিত প্রাচীন পাষাণ-মূর্তিগুলির পানে চেয়ে সেই যুগের শিল্পকীর্তিকে কে না সাধুবাদ দেবেন! এটি পুরাকীর্তি সংগ্রহশালাই তবে পরিচয়লিপি প্রতিটি শিল্পকীর্তির সঙ্গে সংযুক্ত নয়। নাই হোক, মূর্তিপরিচয় অল্পবিস্তর জানাই আছে। যান-বাহন আয়ুধ-আভরণে এবং হস্তপদ বদনের বাহুল্য ও ভঙ্গিতে মনোযোগ দিলে দেবদেবীর পরিচয় সুস্পষ্ট হয়।

এখন মন্দির নতুন করে তৈরী হচ্ছে। বিস্তীর্ণ তার অঙ্গন। অঙ্গনের একধারে বৃহৎ নাটমন্দির অন্যধারে একটি নাতিবৃহৎ জলাশয়। সেই জলে স্নান করে দেব-দর্শন বিধি কিনা জানি না—অতিশয় পঙ্কিল সবুজবর্ণের জল। মন্দিরচত্বরে ধূপ-দীপ পুষ্প-মাল্য পূজা উপচারের আয়োজন—ত্রিপুণ্ড্র শোভিত নগ্নদেহ পুরোহিতরা ব্যস্ত-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন—যাত্রী আসছেন দলে দলে। তাঁদের নিয়ে টানাটানি ছেঁড়াছিঁড়ির দৃশ্য অনুপস্থিত। কালিঘাটের কথা স্মরণে এলো। ভূগর্ভে জাগ্রত দেবতা—এক পথে প্রবেশ, ভিন্ন পথে নির্গমন। মন্দিরগর্ভ খুব

প্রশস্ত নয়.কিছু ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়ি যে হয় না তা নয়—সকলেই দেবদেহ স্পর্শ করে পূজা প্রার্থনা করে, প্রণাম করে তৃপ্ত মুখে ফিরে আসছেন। সেখানেও দেহি দেহি রব নাই। ইনি যেন পুরোহিতের দেবতাই নন—সকলকারই সম্পত্তি। এঁর মাথায় খুশিমত জল ঢাল, ফুল বেলপাতা চাপাও, যেমন তেমন করে মন্ত্র বল স্পর্শ কর প্রদক্ষিণ কর কেউ কর্ত্তা সেজে নিষেধবাণীর প্রাচীর তুলবে না। ভারতবর্ষের দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম হলেন মহাকাল। এর মহিমা এখানে সবদিক দিয়েই অক্ষুণ্ণ।

মন্দিরটি দ্বিতল—যেদিকে নাটমন্দির ও প্রাঙ্গণে সেই দিকের গর্ভগৃহে মহাকালের প্রমাণসাইজ যে লিঙ্গ মুর্ত্তিটি দেখা যায় ওটিকে বহু যাত্রীই ভুল করে আসল মূর্ত্তি মনে করেন। প্রথমে আমরাও এই ভুল করেছিলাম। সেটিকে যথারীতি অর্চ্চনা করতে বসে কেমন যেন সন্দেহ হল—এমন নামী মূর্ত্তির সামনে যাত্রীর ভিড় নাই কেন—পুরোহিতদলই বা কেন অনুপস্থিত। মাত্র একজন সেবক মূর্ত্তির সামনে উপবিষ্ট। অর্চনার শেষে সেবক আমাদের একটি ঘুলঘুলির কাছে নিয়ে এসে বললেন, নীচের চেয়ে দেখ।

সেই সঙ্কীর্ণ ছিদ্রপথে দৃষ্টিক্ষেপ করতেই প্রজ্জ্বলিত দীপশিখা, ব্যোম ব্যোম শব্দের মিশ্রগুঞ্জন. চন্দন-অগুরুর সুগন্ধ একই সঙ্গে সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে সম্মোহিত করে তুলল। বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম কি এ?

সেবক উত্তর দিলেন, মহাকাল।

মহাকাল তাহলে উপরের এই মূর্ত্তি—?

ইনিও মহাকাল. ওই নীচের গর্ভগৃহে যিনি রয়েছেন তাঁরই প্রতিচ্ছবি।

পাগলের ওই মহাকালই কি আসল?

সেবক হাসলেন। এখানে সবই আসল-উপরে নীচে-বামে-দক্ষিণে মাত্রই তো তিনি। এক অখণ্ড জ্যোতির্লিঙ্গ।

আমাদের ভ্রম বুঝতে পারলাম। প্রাঙ্গণের প্রান্তে এসে—একটি সিঁড়ি পেলাম সামনে। নেমে গেলাম নীচেয়। সেখানে যাত্রী ও পূজক ও পাণ্ডার ভীড়। লোকেরা ব্যস্তসমস্ত ভাবে একটা সকীর্ণ পথে সারি বেঁধে চলেছে আরও নীচেয়। আঁকা-বাঁকা ঘোরা পথে সেই লাইনটাকে অনুসরণ করে আমরাও পাতালে মহাকালের সামনে পৌঁছলাম। গর্ভমন্দির খুব প্রশস্ত নয়—তার প্রায় সমস্তটা জুড়ে রয়েছেন বিরাট লিঙ্গমূর্ত্তি-মহাকাল। গৌরী পট্ট বেষ্টন করে রয়েছে রৌপ্যনির্মিত প্রকাণ্ড এক অজগর—তার পাশে ত্রিশূল ডমরু ইত্যাদি আয়ুধ বাদ্যযন্ত্র। ব্যোম ব্যোম নাদে পরিপূরিত গর্ভগৃহ ঘিয়ের প্রদীপ জলছে, অগুরু চন্দন ফুল আর পোড়া ঘিয়ের গন্ধ অপার্থিব পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। উপরে আরও একটি তলা—যেখানে প্রতিকৃতিস্বরূপ ক্ষুদ্রলিঙ্গ মূর্ত্তিটি স্থাপিত। সেটিও রীতিমত নিত্য পূজা অর্চা পেয়ে থাকেন।

দ্বিতীয় মূর্ত্তিটি কি পূর্ব্বদিনে লোক সংঘট্টের কথা স্মরণ করে সংস্থাপিত? এমনটি পরে দেখেছিলাম সোমনাথে অহল্যাবাঈ শিবমন্দিরে।

মহাকাল মন্দির থেকে ফিরবার পথে একটি দৃশ্য চোখে পড়ল। পথের এক জায়গায় একটি অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য ঘিরে বহু লোকে জল্পনা কল্পনা করছে। তাদের কারও হাতে ফুলের মালা—,কেউ কেউ বা হাত জুড়ে উদ্দেশে প্রনাম জানাচ্ছে। দেখতে দেখতে বেশ ভিড় জমে গেল সেখানটায় এবং মালা ও পয়সা ছোড়ার ধুম পড়ে গেল। কি ব্যাপার? ভিড় ঠেলে উঁকি মেরে দেখি, একটি বানর পাঁচীলের কোণ ঘেঁসে কাত হয়ে শুয়ে আছে—প্রাণশূন্য দেহ। পাঁচীলের ওপিঠে একটি বেলগাছ সম্ভবত তারই উচ্চশাখাচ্যুত হয়ে কপিটি মরলীলা সংবরণ করেছে। এই দেশে রামভক্ত হনুমান দেবতুল্য, তার মৃতদেহ ফুলের মালায় ভরে উঠবে সে আর আশ্চর্য্য কি। ওই স্তূপাকার পয়সার গতিও কি ভাবে হয়েছিল সেটি পরের দিন সকালে প্রত্যক্ষ করেছিলাম। একটা ঠেলাগাড়ী ফুল লতাপাতায় সাজিয়ে...স্তূপাকার ফুলের মালার সঙ্গে মহাবীরের নশ্বর দেহটি তার উপর চাপিয়ে—বাজনা বাদ্যি করে যে শোভাযাত্রা বা'র করেছিল ওরা—তা সম্পন্ন গৃহস্থের বিয়ের শোভাযাত্রার সঙ্গেই তুলনীয়। ত্রেতাযুগে

স্মৃতিকে এঁরা শ্রদ্ধাবসরে সুপ্রতিষ্ঠিত করে রেখেছেন—ও প্রভুভক্তির নিদর্শন।

উজ্জয়িনীর আশে পাশে আরও কয়েকটি দ্রষ্টব্য স্থান আছে তার মধ্যে মাণ্ডু সুলতানের বিলাস-প্রাসাদের নামটি সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। উজ্জয়িনী থেকে ধারা নগরি হয়ে মাণ্ডু যাবার বাস পাওয়া যায়। মাণ্ডুতে দর্শনযোগ্য হল বজবাহাদুরের প্রাসাদ—জাহাজ মহল। ইতিহাস কি বলে জানিনা কিন্তু কবি বজবাহাদুর আর রূপমতীকে নিয়ে একটি সুন্দর প্রণয়-উপাখ্যান প্রচলিত আছে। রাণী দুর্গাবতীর সময়কার ইতিহাসের সঙ্গে বজবাহাদুরকে যুক্ত করার প্রবণতা সব দেশের সাহিত্যেই দেখা যায়। বাংলাতে একটি নাটকেও এই কাহিনীর সামান্য উল্লেখ যেন ছিল মনে পড়ছে।

প্রাচীন ধারানগরী এখন লুপ্তমাণ্ডু একটি ক্ষুদ্র গ্রাম কিন্তু সেই বসতি বিরল স্থানে বজবাহাদুরের জাহাজী মহল প্রাসাদ রূপমতীর মহল এখনও বিদ্যমান। বহু পর্য্যটককে তা আকর্ষণ করে। আরও একটি স্থানের মহিমায় ধারানগরীর পথে পর্য্যটকের পদধূলি পড়ে। বাঘগুহা—বিখ্যাত বাঘগুহা দর্শনার্থীরা ধারানগরী না ছুঁয়ে বাঘগুহায় পৌঁছতে পারবেন না। কিন্তু বাঘগুহা আরও দুর্গম স্থানে। বাস থেকে পায়ে হাঁটাপথে ২।৩ মাইল পাহাড় জঙ্গল পার হয়ে তবে সেখানে পৌঁছতে হয়। ঐ নামেরই ছোটমত পল্লী ওখানে আছে আশ্রয়ও হয়তো সেখানে মিলবে, তবু সঙ্গে একটি দল থাকলে ভাল হয়—এবং সরাসরি মোটরে আসাই সবচেয়ে সুবিধাজনক।

সবশেষে একটা কথা জানিয়ে রাখি—বাঘগুহা থেকে মাণ্ডু যেতে হলে ইন্দোর হয়ে গেলে পথটা আরও সংক্ষিপ্ত, যাতায়াতের সময় ও কষ্টের লাঘব হয়।

রাগ সঙ্গীতে বাঙ্গালী

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার [১৮৬৬-১৯৩০]

আলোচ্য পর্বে ভাগলপুরের সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার একজন গুণী গায়ক ছিলেন। রাগসঙ্গীতে যথার্থ শিল্পী তিনি।...

বিহারের ভাগলপুর শহরে আদমপুর অঞ্চল। সেখানে যে মজুমদার-পরিবারে সুরেন্দ্রনাথের জন্ম, তা সঙ্গীতচর্চার জন্যে ভাগলপুরে সুপরিচিত ছিল। শ্যামরতন মজুমদারের ছয় পুত্রই ছিলেন অল্পবিস্তর সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতবিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁর দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা মণীন্দ্র ও কৃষ্ণচন্দ্রও ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক। সুরেন্দ্রনাথের তৃতীয় ভ্রাতা রাজেন্দ্রনাথের মধ্যে যে সঙ্গীতপ্রতিভা ছিল, রীতিমত সাধনা করলে হয়ত তা সার্থক হয়ে উঠতে পারত। রাজেন্দ্রনাথ একাধিক যন্ত্র বাজাতেন এবং বেহালাবাদনে তাঁর ছিল মিষ্ট হাত। তা ছাড়া, তিনি বাঁশী, তবলা ও ও হারমোনিয়ম ভাল বাজাতেন। কিন্তু

দুরন্ত স্বভাবের বশে এবং ভাগ্যের বিচিত্র গতিতে তিনি প্রথম যৌবনে গৃহত্যাগ করে যান নিরুদ্দেশ-যাত্রায়। সুতরাং তাঁর সঙ্গীতজীবনও অপূর্ণ থেকে যায়।

কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম জীবনে উক্ত মজুমদার-পরিবার বিশেষ রাজেন্দ্রনাথের যোগাযোগের কথা এখানে উল্লেখনীয়। কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে কিশোর বয়সে শরৎচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব হয়েছিল। তাঁর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের অন্তরঙ্গতা দেখা যেত মজুমদার-বাড়ীতে, আদমপুর ক্লাবে, খেলার মাঠে, ভাগলপুরের গঙ্গার চরে এবং ডিঙিতে। সেই অত্যন্ত জীবন্ত চরিত্র রাজেন্দ্রনাথ ওরফে রাজুকে পরবর্তীকালের ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের অপূর্ব মহিমায় চিত্রিত করে ইন্দ্রনাথ নামে শ্রীকান্ত প্রথম পর্বে অমরত্ব দিয়েছেন। শ্রীকান্ত ও ইন্দ্রনাথের যুক্তপ্রসঙ্গে বর্ণিত হৃদয়গ্রাহী ঘটনাবলীর অনেকাংশই বাস্তব উপাদানে গঠিত।

ভাগলপুরের মজুমদার-পরিবারের বিশেষত রাজেন্দ্রনাথের কাছেই শরৎচন্দ্র সঙ্গীতচর্চার জন্য উপকৃত ছিলেন। রাজেন্দ্রনাথের কাছেই শরৎচন্দ্র একাধিক যন্ত্রবাদন শিক্ষা করেছিলেন প্রথম জীবনে। তার মধ্যে বাঁশী ও তবলা উল্লেখ্য। শরৎচন্দ্র যে সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন সে বিষয়েও মজুমদার-বাড়ীর সাঙ্গীতিক পরিবেশের প্রভাব ছিল। মজুমদার-গৃহ ছিল শরৎচন্দ্রের মাতুলালয়ের (তাঁর তৎকালীন বাসস্থান) নিকটবর্তী। সেখানে সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি প্রায়ই গানের আসর বসাতেন এবং শরৎচন্দ্র সঙ্গীতের আকর্ষণে উপস্থিত হতেন। সুরেন্দ্রনাথের গান সে সময়ে খুবই শুনতেন শরৎচন্দ্র। রাজেন্দ্রনাথের সঙ্গে শরৎচন্দ্রের সঙ্গীতচর্চা ভিন্ন নাট্যাভিনয়ের সহযোগিতা ছিল। দুজনেই ছিলেন আদমপুর ক্লাবের উৎসাহী সভ্য এবং ক্লাবের নাট্যপ্রচেষ্টায় অগ্রণী। ক্লাবের নাটকাভিনয়ে রাজেন্দ্রনাথ গানের ভূমিকায় এবং শরৎচন্দ্র নায়িকার চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিতেন। যথা—'বলিদান' নাটকে রাজেন্দ্রনাথ: পাগলিনী এবং শরৎচন্দ্র: চিন্তামণি; 'মৃণালিনী'তে রাজেন্দ্রনাথ: গিরিজায়া এবং শরৎচন্দ্র: মৃণালিনী। (১)...

রাজেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার অল্প বয়স থেকে সঙ্গীতে আসক্ত হন ও সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ করেন। উত্তরজীবনে তাঁর সঙ্গীতখ্যাতি ভাগলপুরে সীমাবদ্ধ ছিলনা এবং তিনি সমসাময়িক বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হন, যদিও তিনি একান্তভাবে সঙ্গীতচর্চাকেই জীবনের অবলম্বন করেননি। কর্মজীবনে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের গুরুতর কার্য নিযুক্ত থেকেও বরাবর তিনি অব্যাহত রেখেছিলেন কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চা। সত্যকার শিল্পী-মনোভাবসম্পন্ন গায়ক ছিলেন তিনি। সঙ্গীতের আসরে তিনি সাধারণত টপ্‌খেয়াল ও টপ্পা গান পরিবেশন করতেন। কিন্তু কীর্তন ও অন্যান্য বাংলা গানও তিনি গাইতে ভালবাসতেন এবং গাইতেনও বন্ধুবান্ধবদের মজলিসে ও সাহিত্যের আসরাদিতে। সাহিত্যিকরূপেও সুরেন্দ্রনাথ যশ অর্জন করেছিলেন এবং কলকাতায় সাহিত্যিক-সমাজের সঙ্গে তাঁর প্রীতিরবন্ধন ছিল।

সাহিত্যিক-গায়ক নলিনীকান্ত সরকার তাঁর একটি লেখায় (২) সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের গানের কথা উল্লেখ করেছেন। সে আসর হয়েছিল কলকাতায় কবি যতিন্দ্রমোহন বাগচীর বাড়ীতে এবং সেখানে উপস্থিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

স্বনামপ্রসিদ্ধ দিলীপকুমার রায় উচ্ছ্বসিতভাবে সুরেন্দ্রনাথের অনেক সঙ্গীতপ্রসঙ্গের স্মৃতি কাহিনীর বিবরণ দিয়েছেন।

(৩) মজুমদার মহাশয়ের আত্মীয় (দ্বিজেন্দ্রলালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হরেন্দ্রলাল রায় ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের ভগিনীপতি) ও স্নেহের পাত্ররূপে অনেকদিন তাঁর গান শোনবার সুযোগ পেয়েছিলেন দিলীপকুমার। তাছাড়া প্রথম জীবনে তিনি সুরেন্দ্রনাথের নিকটে সঙ্গীতশিক্ষাও করেছিলেন। তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডের বিখ্যাত মুঠো মুঠো রাঙা জবা কে দিল তোর পায় গানখানি তিনি পান সুরেন্দ্রনাথের নিকট। ওই একই গান মজুমদার মহাশয়ও আগে রেকর্ড করেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ হিন্দী টপ্‌খেয়াল ও টপ্পা যেমন গাইতেন তেমনি বাংলা টপ্পাও। কীর্তন ভিন্ন অন্যান্য বাংলা গান তিনি রাগের ভিত্তিতে এবং টপ্পার ধরণে গাইতেন। রবীন্দ্রনাথের গানও তাঁকে গাইতে শোনা গেছে। রবীন্দ্রনাথ একবার ভাগলপুরে জ্যেষ্ঠা কন্যার স্বামীগৃহে উপস্থিত হলে তাঁকে সুরেন্দ্রনাথের গান শোনাবার ব্যবস্থা হয়। ভাগলপুরের সেই আসরে রবীন্দ্রনাথকে সুরেন্দ্রনাথ শুনিয়েছিলেন দুখানি রবীন্দ্রসঙ্গীত: 'আমার পরাণ যাহা চায় তুমি তাই তুমি তাই গো' ও 'মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাইনা।'

(দেশবন্ধু) চিত্তরঞ্জন দাশের একবার ব্যারিষ্টাররূপে ভাগলপুরে আগমন হলে তাঁকে সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার একটি ঘরোয়া আসরে কীর্তন শুনিয়েছিলেন। তার বিবরণ এবং সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গীত-জীবনের আরো নানাপ্রসঙ্গ অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে।(০)

ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কর্মসূত্রে সুরেন্দ্রনাথকে নানা স্থানে বিভিন্ন সময়ে বাস করতে হত, সেই জন্যে কলকাতায় তিনি কর্ম জীবনে বেশি অবস্থান করতে পারেননি। কর্মের দায়িত্বে মফস্বলে ও নানা প্রশাসনিক কেন্দ্রে জীবনের অনেক সময় অতিবাহিত করার জন্যে তাঁর সঙ্গীতগুণের যোগ্য খ্যাতিমান তিনি হননি সাধারণ্যে। তাঁর সব কর্মস্থলে সঙ্গীতজ্ঞসমাজ কিংবা সঙ্গীতের উপযুক্ত পরিবেশও ছিলনা। কিন্তু তিনি যেখানেই বাস করেছেন সঙ্গীতচর্চা সঞ্জীবিত রেখেছেন অন্তরের প্রেরণায়। তবে বৃহত্তর সঙ্গীতপ্রিয়সমাজ অনেক সময় বঞ্চিত থেকেছে তাঁর সঙ্গীতের অস্বাদন থেকে।

সুরেন্দ্রনাথের পদ্ধতিতে সঙ্গীতশিক্ষা সম্পর্কে একাধিক গুণীর নাম পাওয়া যায়। প্রথম জীবনে তিনি যে কলাবতের শিষ্য ছিলেন তাঁর নাম দেবী সিং। তারপর, প্রসিদ্ধ মনোহর ঘরাণার ওস্তাদ রাজকুমার মিশ্রের (লছমীপ্রসাদ মিশ্রের পিতা) কাছেও তাঁর শিক্ষার কথা শোনা যায়। তা ছাড়া তিনি বিখ্যাত ধ্রুপদগুণী মুরাদ আলী খাঁর অন্যতম কৃতী শিষ্য কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায়ের নিকটেও সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন বলে প্রকাশ। কলকাতা নিবাসী উক্ত কিশোরীলাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন যুগান্তর বিপ্লবীদলের অন্যতম নেতা ডঃ যাদুগোপাল এবং আমেরিকাপ্রবাসী স্বনামধন্য সাহিত্যিক ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়ের পিতা। কিশোরীলাল ব্যবহারজীবীরূপে কর্মসূত্রে মেদিনীপুরের তমলুকে অনেকদিন বাস করেছিলেন এবং সেখানে তাঁর ও তাঁর ওস্তাদ মুরাদ আলি খাঁ এবং অন্যান্য গুণীদের উপস্থিতিতে সঙ্গীতচর্চার একটি উচ্চশ্রেণীর পরিবেশ গড়ে উঠেছিল। সেখানে সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গীতশিক্ষা সম্পর্কে কিশোরীলালের পুত্র ডঃ যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায় তাঁর অগ্নিযুগের স্মৃতিচারণ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন: "সুবিখ্যাত গায়ক ভাগলপুরের বাবু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। তিনি তমলুক এবং মেদিনীপুরে বাবার কাছে গান শিখতেন। অবশ্য তাঁর ওস্তাদ অন্য লোক ছিলেন"। (৫)···

সুরেন্দ্রনাথ দায়িত্বপূর্ণ সরকারী কর্মের অবসরে আজীবন সঙ্গীতের ও সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিবেদিত ছিলেন। শেষজীবনে তিনি ভাগলপুরে অতিবাহিত করেছিলেন এবং সেখানেই তাঁর ৬৪ বছর বয়সে মৃত্যু হয়।

তাঁর সঙ্গীতকৃতির কিছু নিদর্শন গ্রামোফোন রেকর্ডের 'মুঠো মুঠো রাঙা জবা' (গানটি নাট্যাচার্য্য গিরিশচন্দ্র রচিত) 'বাল্‌মা প্রহরওয়া জাগিরে' (আশাবরী) ইত্যাদি গানে রক্ষিত আছে।

লালচাঁদ বড়াল (১৮৭০—১৯০৭)

সেকালের বাংলার অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ টপখেয়াল গায়ক ছিলেন লালচাঁদ বড়াল। ওজস্বী সঙ্গীতকণ্ঠ এবং তানকর্তবে কুশলতার জন্যে তিনি সঙ্গীতজগতে বিশিষ্ট আসন অধিকার করেছিলেন। তাঁর সেই বলশালী কণ্ঠে ক্ষিপ্রগতি তানবিহার আলোড়ন জাগিয়েছিল বাংলার সংগীতক্ষেত্রে। তাঁর তান-বৈচিত্র্য যেমন বিপুল তেমনি নবীন রীতির জন্যে

চিহ্নিত হয়েছিল। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে পশ্চিমা কলাবন্তদের শিক্ষাধীনে বিধিবদ্ধ সাধনা করে তিনি বাংলা গানের মধ্যেই প্রদর্শন করে গেছেন নতুন ধরণের তানলীলা। তাঁর বিশিষ্ট তান-সমৃদ্ধ টপ-খেয়াল সেযুগের বাংলা রাগভিত্তিক গানে এক অভিনব জীবনীশক্তির সঞ্চার করেছিল।

শুধু টপখেয়াল নয়, সঙ্গীতের নানা বিভাগে লালচাঁদের শিক্ষা ও অধিকার ছিল। এমন কি ইউরোপীয় সঙ্গীতও তাঁর অভিজ্ঞতার বহির্ভূত ছিলনা। ভারতীয় সঙ্গীতের একাধিক অঙ্গ উপযুক্ত গুণীর শিক্ষাধীনে রীতিমত সাধনা করে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন তিনি। সাধারণতঃ তিনি টপ্‌খেয়াল গায়করূপে সুপরিচিত থাকলেও ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল গান এবং পাখোয়াজ সঙ্গতযন্ত্রের চর্চা ভালভাবে করেছিলেন। সঙ্গীতশিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল উদার। যাঁর নিকটে যা ভাল বস্তু বলে বুঝতেন, তা যথাসম্ভব আয়ত্ব করে নিতে সচেষ্ট হতেন।

সঙ্গীতে অনুরাগ তাঁর প্রকৃতিদত্ত। বালক বয়স থেকেই তিনি গান গাইবার প্রেরণা অনুভব করতেন; যদিও তাঁর পিতার আদৌ ইচ্ছা ছিল না যে পুত্র সঙ্গীতচর্চা করেন। অপরদিকে লালচাঁদের পিতামহের সময় থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ীর সঙ্গে তাঁদের পরিবারের যোগাযোগ ছিল। লালচাঁদের পিতামহ প্রেমচাঁদ বড়াল ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুগামী এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত। সেই সূত্রেই হয়ত লালচাঁদ অল্প বয়সে সমাজমন্দিরে ব্রহ্মসঙ্গীত গাইতেন। উক্ত প্রেমচাঁদ বড়ালের নামাঙ্কিত একটি পথ তাঁর স্মৃতিরক্ষা করছে মধ্য কলকাতায়।

প্রেমচাঁদের পুত্র নবীনচাঁদ প্রতিষ্ঠাবান এাটর্ণি ছিলেন এবং তখনকার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি। বিখ্যাত 'হিতবাদী' প্রকাশক (উক্ত নামধারী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথ) প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অংশীদারও ছিলেন নবীনচাঁদ। তাঁর একমাত্র পুত্র লালচাঁদের ১৮৭০ খৃঃ জন্ম হয়। লালচাঁদের জননী ছিলেন স্বনামধন্য ধনী ও বদান্য সমাজসেবক সাগরলাল দত্তের কন্যা।

অল্প বয়স থেকেই লালচাঁদ সঙ্গীতশিক্ষার জন্যে আগ্রহী হন। কিন্তু পিতার বিরাগের জন্যে প্রকাশ্যে সঙ্গীতচর্চা সম্ভব হতনা স্বগৃহে। সম্ভবত সেই কারণেই অর্থাৎ বাড়ীতে কণ্ঠসাধনার সুযোগের অভাবে, তিনি যন্ত্রসঙ্গীতে প্রথমে রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। সঙ্গতযন্ত্র পাখোয়াজকে মাধ্যম করেই তিনি অগ্রসর হন সঙ্গীতচর্চায়। সেকালের বাংলার প্রবীণ পাখোয়াজগুণী মুরারিমোহন গুপ্তের নিকটে তিনি পাখোয়াজবাদন শিক্ষা করতে থাকেন। কিশোরবয়সী লালচাঁদ তখন হিন্দুস্কুলের ছাত্র।

পিতার লক্ষ্য এড়িয়ে পাখোয়াজ-সাধনার জন্যে তিনি এক কৌশল করেছিলেন। হিন্দুস্কুলের কাছা-কাছি এক মুদির দোকানে রাখা থাকত তাঁর পাখোয়াজযন্ত্রটি। স্কুলে যাতায়াতের পথে এবং সুবিধামতন সময়ে দোকানের নিভৃত অংশে বসে পাখোয়াজবাদনের অভ্যাস করে যেতেন। কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে দোকানের মালিক এই সংগীতচর্চার সুবিধা দেন তাঁকে। গোপন সঙ্গীতশিক্ষার যাবতীয় ব্যয় তিনি জননীর কাছে পেতেন, পিতা এসম্পর্কে কিছুই অবগত ছিলেন না।

এইভাবে মুরারিমোহন গুপ্তের শিক্ষাধীনে লালচাঁদ পাখোয়াজবাদক হন প্রথম জীবনে। পরবর্তীকালেও হয়ত তিনি পাখোয়াজী রূপেই সঙ্গীত-সমাজে পরিগণিত থাকতেন ,যদি না একটি ঘটনায় তাঁর সঙ্গীতজীবনের মার্গ পরিবর্তিত হত।

তাঁর সঙ্গীতচর্চার এই গতি পরিবর্তনের উপলক্ষ্য হন ধ্রুপদগুণী অঘোরনাথ চক্রবর্তী। একদিন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতসভায় অঘোরনাথের গানের সঙ্গে লালচাঁদের পাখোয়াজ বাজাবার ইচ্ছা হয়। তিনি নিজের পাখোয়াজযন্ত্র নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন যথাসময়ে। কিন্তু

কি কারণে চক্রবর্তী মহাশয় সেদিন গান গাইলেন না। লালচাঁদ পরের দিন আবার গেলেন যতীন্দ্রমোহনের ভবনে। কিন্তু সেদিনও অঘোরনাথের গান হলনা। তারপরের দিনও ঘটল তার পুনরাবৃত্তি। উপর্যুপরি তিনদিন এমনিভাবে বিফল-মনোরথ হয়ে ফিরে আসবার পর তাঁর মনে আত্মগ্লানি জাগে। তিনি চিন্তা করে দেখেন এই পরনির্ভর সঙ্গতযন্ত্র বাজাবার জন্যেই আসরে অনুষ্ঠানের ব্যাপারে তাঁকে নির্ভর করতে হয় গায়কের মর্জির ওপর। তিনি স্বয়ং গায়কশিল্পী হলে স্বাধীনভাবেই আসরে সঙ্গীত পরিবেশন করতে পারতেন, একথাই তাঁর মনে প্রত্যয় হল।

এ প্রসঙ্গে কয়েকবছর পরবর্তী একটি আসরের কথা উল্লেখনীয়। তখন লালচাঁদ কণ্ঠসঙ্গীতে কৃতবিদ্য হয়ে সেই আসরে গান করেন অঘোরনাথেরই সামনে। চক্রবর্তী মহাশয় তাঁর গান শুনে বিশেষ সন্তুষ্ট হন এবং তাঁকে আশীর্ব্বাদ করেন। তখন লালচাঁদ তাঁকে নিজের গানশিক্ষার ইতিবৃত্তের কথা বলেছিলেন। অবশ্য সে পূর্ব ঘটনা বিস্মৃত হয়েছিলেন অঘোরনাথ।

যাই হোক, চক্রবর্তী মহাশয়ের গানের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাতে যাবার সেই উপলক্ষ্য থেকে লালচাঁদ পাখোয়াজ ত্যাগ করে ঐকান্তিক আগ্রহে আরম্ভ করলেন কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চা, যা তাঁর প্রথম জীবনেও চিত্ত আকর্ষণ করত। তখন থেকে বিভিন্ন কলাবতের শিক্ষাধীনে রীতিমতভাবে বিভিন্ন অঙ্গের গানের সাধনা করতে লাগলেন তিনি। তাঁর প্রথম জীবনে সঙ্গীতচর্চার একটি পরিবেশের কথা এখানে উল্লেখ করে রাখা যায়। তাঁর গৃহে সেসময় পিতার অনীহার জন্যে সঙ্গীতের আবহ ছিলনা বটে, কিন্তু তিনি যাতায়াত করতেন এন্টালি অঞ্চলের বনিয়াদী বংশ দেবপরিবারের ভবনে। সেই 'দেবগৃহ' বাংলার ও পশ্চিমাঞ্চলের বহু গুণীর সঙ্গীতানুষ্ঠানের জন্যে সঙ্গীতসমাজে খ্যাতিমান ছিল। যত পশ্চিমা কলাবতের কলকাতায় আগমন ঘটত তাঁদের প্রায় সকলেরই আসর হ'ত এন্টালির 'দেবগৃহে'। বাংলার গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, অঘোরনাথ চক্রবর্তী প্রমুখ নানা গুণীই এখানে অনেকবার সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। পরিবারের ব্রজেন্দ্রনারায়ণ দেব প্রমুখ কেউ কেউ সঙ্গীতের চর্চাও করেন রীতিমতভাবে-পরিবারের কর্তৃপক্ষ বহুদিন যাবৎ সঙ্গীতসজ্জনের উদার পৃষ্ঠপোষকরূপে সুপরিচিত ছিলেন। এই গৃহেই প্রতিবেশী তরুণ গায়ক হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অঘোরনাথ চক্রবর্তীর কাছে সঙ্গীতশিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। লালচাঁদ বড়াল ছিলেন উক্ত হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাল্যবন্ধু। তাঁর মতন অল্প বয়স থেকেই লালচাঁদ দেবগৃহে উপস্থিত হয়ে নানা গুণীর সঙ্গীতানুষ্ঠান উপভোগ করতেন এবং উচ্চমানের সঙ্গীতধারার সঙ্গে পরিচিত হন। পরবর্তী জীবনে যাঁদের নিকটে তিনি সঙ্গীতশিক্ষা করেন তাঁদের মধ্যে কোন কোন শিল্পীকে প্রথম দেখেছিলেন দেব-পরিবারের আসরে।

কণ্ঠসঙ্গীতে বিভিন্ন রীতি শিক্ষার জন্যে লালচাঁদ চার জন কলাবতের শিষ্য হয়েছিলেন। তিনি নানা অঙ্গের সঙ্গীতের সাধনা করলেও বিশেষভাবে চিহ্নিত ছিলেন টপখেয়াল গানের জন্যে। কারণ আসরে তিনি টপ-খেয়াল গায়করূপেই সুপরিচিত ছিলেন এবং এই রীতির গানই গাইতেন। তাঁর গ্রামোফোন রেকর্ডেও এই রীতির গান আছে কয়েকখানি। তাঁর উক্ত টপখেয়াল পদ্ধতির গান ওস্তাদ রমজান খাঁর নিকটে শিক্ষা লাভের ফল।

বারাণসীর বিখ্যাত টপ্পাগুণী রমজান খাঁ। তাঁর জননী ইমাম বাদীর শিক্ষায় টপ্পা গায়ক হয়েছিলেন এবং সঙ্গীত-জীবনের অধিকাংশ কাল বাংলাদেশে, বিশেষ কলকাতায় অতিবাহিত করেন। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় যে, রাণাঘাটের সঙ্গীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য টপ্পা সঙ্গীতে ইমাম বাদীর একমাত্র বাঙ্গালী শিষ্য ছিলেন। রমজান খাঁর সঙ্গে সেই সুবাদে নগেন্দ্রনাথের একটি প্রীতির সম্পর্ক ছিল সঙ্গীতবিষয়ে। যাই হোক, রমজান খাঁ দীর্ঘকাল বাংলাদেশে অবস্থানের ফলে তাঁর এক কৃতী বাঙ্গালী

শিষ্যমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বাংলার সঙ্গীতসমাজে বিখ্যাত হন সুমধুর টপ্পাগায়ক-রূপে। রমজান খাঁর শিষ্যদের মধ্যে লালচাঁদ বড়াল ভিন্ন চন্দননগর-তেলিনীপাড়ার বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারের কালোবাবু নামে বিখ্যাত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হাওড়া-শিবপুরের নিকুঞ্জবিহারী দত্ত ও ফণীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়, এন্টালির হৃষীকেশ বিশ্বাস, খিদিরপুরের শরৎচন্দ্র দাস, পেশাদার গায়িকা আখতারি বাঈ (সেকালের) ওস্তাদ গিরিবালা প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য।

লালচাঁদের কণ্ঠসঙ্গীতে দ্বিতীয় ওস্তাদ ছিলেন বারাণসীর আর এক প্রসিদ্ধ গায়ক বিশ্বনাথ রাও। তিনি ধ্রুপদ ধামার গায়করূপে দীর্ঘকাল কলকাতায় অবস্থান করেছিলেন এবং তাঁরও একটি কৃতী বাঙালী শিষ্যগোষ্ঠী গঠিত হয়েছিল। তিনি কলকাতায় সঙ্গীত-সমাজে ধামারগায়করূপে এমন জনপ্রিয় হন যে তাঁর নাম হয়ে যায় বিশ্বনাথ ধামারী। মূলত তিনি ধ্রুপদী হলেও তাঁর বাঁটের বৈচিত্র্যপূর্ণ ধামার গান বাংলার আসরে সেযুগে অভিনব বোধ হয়েছিল এবং ধামারের চর্চা বাঙালী সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে বিশেষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাঁর নিকটে ধামার ও সার্গমের তালিম নিয়েছিলেন লালচাঁদ। বিশ্বনাথ রাওয়ের অপর শিষ্যবৃন্দের মধ্যে অমরনাথ ভট্টাচার্য, সতীশচন্দ্র দত্ত (দানিবাবু), বিনোদ মল্লিক (পাখোয়াজগুণী গোপালচন্দ্র মল্লিকের পুত্র), নাটোরের কুমার যোগীন্দ্রনাথ রায় প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

লালচাঁদের অপর সঙ্গীতগুরু ছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী। সেকালে চক্রবর্তী মহাশয় ছিলেন একজন দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ এবং ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা এই তিন রীতিতেই সিদ্ধ। অতি সুরেলা কণ্ঠের অধিকারী গোপালচন্দ্র সমসাময়িক কালের অন্যতম নেতৃস্থানীয় গায়করূপে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উক্ত তিন অঙ্গেই তিনি গাইতেন আসরে। তারমধ্যে খেয়াল গানে তিনি নিজস্ব এমন একটি শৈলী গড়ে তুলেছিলেন, যে জন্যে তাঁর গান শ্রোতাদের পক্ষে অতি চিত্তাকর্ষক হত। গানের মধ্যে বিশেষ বিশেষ সময়ে তিনি চমৎকার তেলেনা প্রয়োগ করতেন এবং এমন সুন্দর করে সেসব তেলেনার সন্নিবেশ ঘটাতেন যে গানের সৌন্দর্য বহুগুণ খুলে যেত অভাবিত পথে। ফলে, এক অপ্রত্যাশিত আনন্দের অভিজ্ঞতায় শ্রোতৃমণ্ডলী অভিভূত হয়ে পড়ত এবং তাঁর গানও সুরের কারুকর্মে জমাট বাঁধত। চক্রবর্তী মহাশয় ছিলেন একজন সত্যকার সৃজনশীল শিল্পী।

বাংলা সাহিত্যের বীরবল প্রমথ চৌধুরী গোপালচন্দ্রের একেবারে শেষ বয়সে তাঁর গান শুনেছিলেন। তবু তা কত উচ্চাঙ্গের ছিল তার বর্ণনা করে লেখেন—তাঁকে 'বৃদ্ধ বয়সে আমি দেখেছি। তখন তাঁর গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোত না। তিনি আমার এবং আমার খুড়শ্বশুর মহাশয় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুরোধে ফিস্ ফিস্ করে' একটি গান গাইলেন। আমি অবাক হয়ে গেলাম। কি মিষ্টি তাঁর তান। কি দরদী তাঁর মিড়। আর বুঝলাম যে যখন এঁর গলা ছিল, তখন ইনি একটি অসাধারণ গাইয়ে ছিলেন।' (৬)

চক্রবর্তী মহাশয়ের সঙ্গীতজীবনের নানা প্রসঙ্গ এবং আসরে গানের বিবরণ অন্যত্র বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে। (৭)

লালচাঁদ বড়াল ভিন্ন তাঁর অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় নিম্নলিখিতদের নাম: খেয়াল ও টপ্পাগুণী সাতকড়ি মালাকর, বিষ্ণুপুরের বহুমুখী গুণী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতারণ সান্যাল আলাউদ্দিন খাঁ (প্রথমজীবনে) প্রভৃতি।

লালচাঁদের উক্ত তিনজন ভিন্ন আর এক সঙ্গীতগুরু ছিলেন কাশীনাথ মিশ্র। তাঁর কাছে তিনি ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন।

এমনি বিভিন্ন ধারায় শিক্ষা ও সাধনার ফলে গঠিত হয়েছিল লালচাঁদের সঙ্গীতজীবন। তাঁর গুরুকরণের তালিকা থেকে ধারণা করা যায় যে টপখেয়াল পদ্ধতির গায়করূপে তাঁর প্রধান পরিচিতি থাকলেও কণ্ঠসঙ্গীতে ভিন্ন ভিন্ন রীতিতে তিনি সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন।

কলকাতার সঙ্গীতের আসরে সে যুগে তিনি যথে

প্রসিদ্ধিলাভ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর যশ ও প্রতিষ্ঠা অর্জনের প্রধান বাহন ছিল গ্রামোফোন রেকর্ড। গ্রামোফোনের প্রথম যুগে লালচাঁদ বড়াল প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী জনপ্রিয় গায়ক ছিলেন বললেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁর গানের রেকর্ডের তুল্য এত অধিক চাহিদা ও বিক্রয় আর কারো ছিল না সে-যুগে। গ্রামোফোন কম্প্যানিতে তাঁর গায়করূপে যোগদানের পূর্বে সেই সংস্থা ব্যবসায় হিসাবে আশাপ্রদভাবে চলছিল না। তারপর তাঁর গানের রেকর্ড একটির পর একটি প্রকাশিত হয়ে সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিদের পরে পরে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং ক্রমে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় গ্রামোফোন কম্প্যানীর ব্যবসায়। গ্রামোফোনের কর্তৃপক্ষ সেজন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞবোধ করতেন এবং সেখানে তাঁর অতি সম্মান ও মর্যাদার আসন ছিল। তাঁর প্রতি প্রীতি-শুভেচ্ছার নিদর্শন-স্বরূপ গ্রামোফোন কর্তৃপক্ষ তাঁকে একটি মোটরগাড়ি উপহার পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় তা তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পরের দিন এসে পৌঁছেছিল তাঁর গৃহে।

তাঁর ২৮ খানি গানের রেকর্ড হয়েছিল। তারমধ্যে দুটি ছিল হিন্দী গান: 'এ হো রাজা যাতি হায়' (খুবট) ও 'ইঁকি আইয়ে ম্যয়' (শ্যাম)। দুখানি কীর্তন: 'যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনে প্রবাহিনী' ও 'মরিব মরিব সখি নিশ্চয় মরিব।' অবশিষ্ট ২৪ খানি গান বাগেশ্রী, ভৈরবী, ভূপালি, শঙ্করা, বেহাগ, রামকেলি, কাফি-সিন্ধু ইত্যাদি বিভিন্ন রাগের বাংলা গান। তারমধ্যে কয়েকটি গানের আবেদন কালের ব্যবধান পার হয়ে সঙ্গীত-রসিকদের প্রাণে আজো সাড়া জাগায়। বিশেষ এই দুখানি গান শুনলে বুঝা যায়, তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত গীত-শিল্পী: 'এ কি রূপ হেরি হরি তুমি ধরেছ যোগীর বেশ' (বাগেশ্রী) ও 'আমার সাধ না মিটিল, আশা না পূরিল' (ললিত-গৌরী)।·····

সঙ্গীতক্ষেত্রে সবিশেষ যশ ও প্রতিষ্ঠার মধ্যে লালচাঁদের জীবন দীপ অকালে নির্বাপিত হয়। তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩৭ বছর। একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর সময় নবীন চাঁদ জীবিত ছিলেন।

লালচাঁদের মৃত্যুর ২০ বছর পরে তাঁর পুত্রত্রয় কিষণচাঁদ, বিষনচাঁদ ও রাইচাঁদ পিতার স্মৃতিরক্ষাকল্পে 'লালচাঁদ উৎসব' নামে একটি বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন তাঁদের প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীটের পৈত্রিক ভবনে। বাংলাদেশে আধুনিককালে এবং দর্শনীর বিনিময়ে আয়োজিত সঙ্গীত-সম্মেলনগুলি প্রবর্তনের পূর্বে 'লালচাঁদ উৎসব' বাংলার সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট স্থান গ্রহণ করেছিল। সর্বভারতীয় গুণীদের দ্বারা তিনদিন-ব্যাপী দীর্ঘ অধিবেশনগুলিতে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি গান এবং সেতার, সরদ ইত্যাদি যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশনে উচ্চমানের সঙ্গীতানুষ্ঠান হত লালচাঁদ উৎসবে। সমকালীন কলকাতায় অনুষ্ঠিত অপর দুটি বার্ষিক সম্মেলন, দুর্লভচন্দ্র ভট্টাচার্য পরিচালিত তাঁর পাখোয়াজ-গুরু মুরারিমোহন গুপ্তের স্মৃতিতে 'মুরারি সম্মেলন' এবং দীননাথ হাজরা ও নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'শঙ্কর উৎসবে' প্রধানত বাংলার গুণীরা অংশ গ্রহণ করতেন।

লালচাঁদ বড়ালের উক্ত তিনপুত্রই সঙ্গীতজ্ঞ। বিশেষ কনিষ্ঠ রাইচাঁদ ওস্তাদ মসিদ খাঁর শিক্ষাধীনে তবলাচর্চা করেন এবং বাংলার অন্যতম কৃতী তবলাবাদকরূপে পরিগণিত হন। উপরন্তু তিনি পিয়ানোবাদক এবং চলচ্চিত্রের সঙ্গীত-পরিচালকরূপেও প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

---

(১) শরৎচন্দ্র, প্রথম খণ্ড ৩০ পৃষ্ঠা। গোপালচন্দ্র রায়।

(২) শ্রদ্ধাস্পদেষু, পৃষ্ঠা ১৫—নলিনীকান্ত সরকার।

(৩) স্মৃতিচারণ, প্রথম খণ্ড—দিলীপকুমার রায়।

(৪) সঙ্গীতের আসরে, পৃষ্ঠা, ১৭৯—১৯০—দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।

(৫) বিপ্লবী জীবনের স্মৃতি পৃষ্ঠা ১৫৫—যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়।

(৬) আত্মকথা—প্রমথ চৌধুরী।

(৭) সঙ্গীতের আসরে, পৃষ্ঠা ২৬-৩৩। দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।

বাংলা ও বাঙালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পিতৃ-তর্পণ

(১৮-১১-৬৯)

মহাত্মা গান্ধী ছিলেন জাতির জনক। সকল ভারত-বাসী, ছোট বড়, ধনী-দরিদ্র, সরকারী-বেসরকারী চাকুরে এবং দেশের বেকারসমাজও মহাত্মার সন্তান, পুত্রকন্যা স্থানীয়, কাজেই পিতৃ (বা জনক) তর্পণ করিবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে এবং এই অধিকার-বলেই মহাত্মার জন্মশতবার্ষিকীতে, তাঁহার সুপুত্র এবং কুপুত্র সকলেই নিজ নিজ ধ্যানধারণা মত "পিতৃ" তর্পণ করিতেছে এবং আরো কিছুকাল ধরিয়া করিতে থাকিবে।

সাধারণত দেখা যায়, কুপুত্ররাই হয় ধনবলে গরীয়ান। সুপুত্ররা দীনভাবেই তাহাদের অভাবজড়িত কষ্টকর জীবন যাপন করে। জাতির জনকের তর্পণের ক্ষেত্রেও ইহাই দেখা যাইতেছে। ইহা বলা আবশ্যক এই প্রসঙ্গে যে বিত্তবান মহাত্মা 'পুত্র' সকলেই কুপুত্র নহেন। কিছু কিছু ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। উচ্চমার্গবিহারী বিত্তবান 'গান্ধীপুত্র' মহাশয়ব্যক্তিগণ পরম ঘটা এবং লোক জড় করিয়া পিতৃতর্পণ করিলেন এবং করিতেছেন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে এমন কয়জন আছেন যাঁহারা বছরে একবারও গান্ধীনাম স্মরণ করেন—বিনা প্রয়োজনে, নিছক মহাত্মা ভক্তির কারনে? বর্ত্তমান সরকারের বিশেষ করিয়া কেন্দ্র সরকারের মন্ত্রীমহাশয়গণ, একান্ত দায়ে না পড়িলে, গান্ধীজীর নাম স্মরণ করেন কি? লোক-মাতা 'কেন্দ্রীয় মন্ত্রী-পরিবারের কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে বাদ দিয়া একথা বলা হইতেছেনা।

বিভিন্ন রাজ্যের কংগ্রেসী মন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং অকংগ্রেসী রাজ্যের দুচারজন মন্ত্রী গান্ধী জন্মশতবার্ষিকীতে গান্ধীজিকে প্রচুর 'প্রশংসাপত্র' দান করিতেছেন, কোন প্রকার সঙ্কোচবোধ না করিয়া অবশ্য কোন কিছুতে সঙ্কোচ কিংবা লজ্জাবোধ করিবার মত দুর্ব্বলতা শতকরা ৯৯ জন মন্ত্রীর প্রায় নাই। বিদ্যা না থাকিলেও যাঁহারা অবিদ্যা এবং প্রভুভক্তির কারণে আজ মন্ত্রীর পদমর্য্যাদা অর্জ্জন করিয়াছেন, এবং জীবনে যাঁহারা কখনও গান্ধী নামও হয়ত শোনেন নাই, শতজন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সেই সকল মহাপুরুষগণও—পরম গান্ধীভক্ত রূপ ধারণ করিয়া অধম জনগণকে গান্ধী মাহাত্ম্য সম্পর্কে অশ্রুতপূর্ব্ব জ্ঞান দান করিতেছেন, জীবনে হয়ত এই সর্ব্বপ্রথম শুভ্র মিহি খদ্দরের অঙ্গবাস ধারণ করিয়া গান্ধী মরিয়া বাঁচিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার বিদেহী আত্মাকে এখন নিষ্ঠুর ভাবে কেন যন্ত্রনা দেওয়া হইতেছে জানি না। যেভাবে পিতৃতর্পণ করা হইতেছে, তাহাকে পিতৃতর্পণ না বলিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ বলাই ঠিক হইবে। আমরা বিমুগ্ধনেত্রে অবলোকন করিতে থাকিব এই জাতীয় শ্রাদ্ধ কত দূর গড়াইবে এবং সেই সঙ্গে মহাত্মার, দেহহীন আত্মাকে আর কতজন কতভাবে ক্রমান্বয়ে 'হত্যা' করিতে থাকিবে!

গডসে নামক ব্যক্তি মহাত্মাজীকে রিভলভারের গুলিতে একবার মাত্র হত্যা করে অত্যন্ত করুণাবশত, কিন্তু আজ মহাত্মার তথাকথিত সন্তানগণ তাঁহাকে

বারবার ভোঁতা বর্ষার আঘাতে ক্ষতবিক্ষত করিতেছে পরম ঘটা এবং মহা আনন্দের সঙ্গে।

প্রভু যীশু বলেন—ভগবান ইহাদের তুমি ক্ষমা কর, ইহারা কি করিতেছে তাহা ইহারা জানে না—আমরা মহাত্মার আত্মার কাছে করজোড়ে নিবেদন করিতেছি, "মহাত্মাজী তুমি তোমার অবোধ দুষ্টবুদ্ধি সন্তানদের যদি পার ক্ষমা করিও। ইহারা জানে ইহার কি মিথ্যাচার অম্লানচিত্তে করিতেছে! তুমি এই সকল জ্ঞানপাপীদের দয়া করিয়া ক্ষমা কর!"

গান্ধী-স্মরণে সাফাই

(-২০-১১-৬৯)

পশ্চিমবঙ্গে গান্ধীজন্মশতবার্ষিকী উৎসব সূচনা হয় রাজ্যপাল এবং অন্যান্য কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মহাজনদের ঘণ্টাখানেকের জন্য নূতন সুদৃশ্য সম্মার্জনী লইয়া কলিকাতার কোন এক বস্তিঅঞ্চলে উপস্থিতি দ্বারা! ধোপদুরস্ত খদ্দরের পোষাক পরিধান করিয়া তাঁহারা বস্তির পথঘাটে পাহাড়প্রমাণ আবর্জ্জনা ঝাঁটাইয়া দূর করিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিবার মানসে এই টোকেন 'সাফাই' ব্রত পালন করেন। বৃহৎ ব্যক্তিদের পথঘাট ঝাঁট দিবার দৃশ্যটি অবশ্যই নাটকীয় এবং সর্ব্বজন-অনুকরণযোগ্য। এই অভিনব দৃশ্যের ফটোগ্রাফ হয়ত কোন কোন প্রেস-ফটোগ্রাফার তুলিয়াছেন, কিন্তু এই জনমনহরণ দৃশ্যের কোন ফিল্ম তোলা হইয়াছে কি না জানি না, তোলা হইয়া থাকিলে অবশ্যই উত্তম কার্য হইয়াছে, এবং সপ্তাহে একদিন করিয়া বাঙ্গলা দেশের প্রতি চিত্রগৃহে তিনবার করিয়া এই ছবি দেখাইবার ব্যবস্থা সরকারী ভাবে করা অবশ্য কর্ত্তব্য। আর ফিল্ম যদি না-তোলা হইয়া থাকে তবে তাহা অতীব গর্হিত হইয়াছে এবং এই ভুল সংশোধনের জন্য কলিকাতার কোন ফিল্ম স্টুডিওতে 'সাফাই' উদ্বোধনী দৃশ্যের পুনরাভিনয় করাইয়া অনতিবিলম্বে ফিল্ম তোলা অবশ্য কর্ত্তব্য। আশা করি আমাদের এই কাতর আবেদন বৃথা যাইবে না!

কলিকাতার পথেঘাটে মাঠে হাটে জঞ্জাল জমিয়া জমিয়া পাহাড়প্রমাণ হওয়াটা কলিকাতাবাসীদের এখন সহজ সহনীয় হইয়াছে, এখন পথেঘাটে স্তূপীকৃত জঞ্জাল না দেখিলেই পথচারীদের কাছে তাহা এক বিরাট শূন্যতার মত মনে হয়। এবার রাজ্যপালের 'সাফাই' দ্বারা কাজের কাজ কতখানি হইবে, জানি না, কিন্তু রাজ্যপালমহাশয় নিশ্চয়ই জনশ্রদ্ধা অর্জ্জন করিবেন। সমগ্র রাজ্যে রাজ্যপাল মাত্র একজন এবং তিনি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সাড়ে চারকোটি লোকের প্রতিভূ, এবং আমরা বিশ্বাস করি সাড়ে চারকোটি এই অলস রাজ্যবাসীর অবহেলিত কর্ত্তব্য, অবশ্য পালনীয় কর্ত্তব্য, একজন মাত্র আদর্শপ্রাণ কর্ম্মঠ রাজ্যপালের পক্ষেই সাধন করা সহজ সম্ভব! বহু অনুধাবনের পর রাজ্যপাল যে পথে ধাবিত হইতেছেন, তাহা সত্যই একজন বিচক্ষণ, আত্মস্থ ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব!

আশা করা যাইতেছে রাজ্যপালের 'সাফাই' ব্রত উদ্বোধনের পর, কলিকাতার শহরবাসী, করদাতা এবং করের ৮।১০ কোটি টাকা শ্রাদ্ধ করিয়া যেসকল পৌরপিতা (এবং মাতা) আমাদের সেবা তথা শ্রাদ্ধের প্রকৃষ্ট ব্যবস্থা মুক্ত হস্তে করিয়া থাকেন, তাঁহারা সকলেই ঝাঁটা হস্তে রাজপথে আবির্ভূত হইবেন, রাজ্যপালের প্রদর্শিত মার্গে ধাবিত হইবার জন্য।

প্রসঙ্গক্রমে বলিব, খাদি প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত মহাশয় মহাত্মাজীর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে বিশিষ্টতম একজন। মহাত্মাজী-প্রদর্শিত কণ্টকময় পথে চলিবার জন্য তিনি স্বার্থত্যাগ বড় কম করেন নাই, বেঙ্গল কেমিক্যালের রাজকীয় চাকরী ছাড়িয়া দেন অগ্রপশ্চাৎ এবং নিজের স্বার্থ বিবেচনা না করিয়া। এই সতীশচন্দ্র কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বেলেঘাটা অঞ্চলে বস্তি সাফ করিবার কাজে কয়েকজন অনুচর সঙ্গে লইয়া দিনের পর দিন অতিবাহিত করেন, বস্তির পায়খানা এবং রাস্তার নোংরা ড্রেনগুলিকেও তিনি নিজ হস্তে অনুচর সহ দিনের পর দিন পরিষ্কার করিতেন। বলাবাহুল্য এই সামান্য জনসেবার কাজের

সাক্ষী রাখিবার জন্য সংবাদপত্র-রিপোর্টার কিংবা প্রেস-ফটোগ্রাফারদের ব্যাকুল আহ্বান তিনি জানান নাই, যাহা করেন তাহা নীরবে এবং একমাত্র জনসেবার অনুপ্রেরণাতেই। কিন্তু আজ যাহা হইতেছে তাহা নিছক লোক-দেখানো ব্যাপার—ইহাতে আন্তরিকতার কোন প্রশ্নই নাই বলিয়া মনে হইতেছে।

ইংরেজিতে একটা কথা আছে—নকল বা জাল মুদ্রা আসল মুদ্রাকে অপসারিত করে (Counterfeit coins push out real ones from circulation)। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ তথা সমগ্রভারতে আজ দেখা যাইতেছে, বাজারে জালমুদ্রার রাজত্ব, ফলে সাচ্চা মুদ্রা অদৃশ্য হইয়াছে। এখানে জাল মুদ্রা বলিতে আমরা কেবল মুদ্রাই নহে, মানুষের কথাও মনে করিতেছি। সৎ, আদর্শগত প্রাণ, স্বার্থলেশহীন, দেশের এবং জাতির কল্যানে নিবেদিত প্রাণ দেশসেবকেরা আজ লোকচক্ষে হীন এবং কোনপ্রকার মর্যাদা তাঁহাদের কেহই দেন না, ইহাদের স্থান আজ 'বোকার' দলে!

কেবল 'সাফাই-এ' কি হইবে?

(২০-১১-৬৯)

পশ্চিমবঙ্গের জাতীয় জীবনে কেবল টোকেন সাফাই-ব্রত পালন করিয়া কতটুকু কাজের কাজ কি হইবে জানি না। সাফাইব্রতের পরিবর্তে এখন প্রয়োজন 'রাম-ধোলাই'-এর সর্ব্বস্তরে। বেয়াড়া ধোলাই আজ পথে ঘাটে অহরহ ঘটিতেছে এবং যাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে নিরীহ জনসাধারণকে। 'ধোলাই' প্রয়োজন যাহাদের, তাহারাই দিতেছে ধোলাই, জনসাধারণ নীরবে সব সহ্য করিতেছে। আজ বাঙ্গলার সেই নির্ভীক, 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য' যুবক কোথায় গেলেন? একদিন যে যুবকসমাজ ইংরেজ রাজ-শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন, ব্রিটিশ সিংহের গর্জ্জন যাঁহারা অগ্রাহ্য করেন, আজ সেই আদর্শ যুবসমাজ কি সারমেয় দলের ভোঁতা নখ-দন্ত এবং আস্ফালনে ভীত সন্ত্রস্ত? মিথ্যা এবং দেশ ও জন-অহিতকর বিদেশী আদর্শে 'অনুপ্রাণিত' ক্ষিপ্ত এই সারমেয়দলকে ঠাণ্ডা করিবার মত শক্তি কি বাঙ্গলার যুবসমাজের লোপ পাইয়াছে? আমরা বিশ্বাস করি লোপ পায় নাই, ক্ষণেকের জন্য দেশের সুস্থ যুবসমাজ হয়ত দিশেহারা হইয়াছে, কিন্তু এ-ভাব যথাকালে কাটিয়া যাইবে এবং অন্তকার দেশভক্ত স্বার্থ-বুদ্ধিহীন বাঙ্গালী যুবসমাজ অচিরে আত্মপ্রকাশ করিয়া, কেবল সাফাই নহে, দেশব্যাপি 'মহা ধোলাই' আন্দোলন সুরু করিবে। এ-ধোলাই যদি সর্বব্যাপী হয়, তাহা হইলে বর্ত্তমান ক্ষিপ্ত হিংস্র সারমেয়দলকে ঠাণ্ডা করিতে বেশী সময় লাগিবে না। একটা কথা সকলের মনে রাখা দরকার, আজ যাহারা পথে ঘাটে জনগনের উপর বিনাকারণে অকথ্য অত্যাচার বা ধোলাই চালাইতেছে, তাহারা কাপুরুষের দল, ইহাদের তথা-কথিত শক্তির উৎস দল, এই দলকে ছত্রভঙ্গ করিতে প্রয়োজন একবার মাত্র মৃদু ধোলাই এর। এই দেশদ্রোহী ক্ষিপ্ত হিংস্র সারমেয়র দল, পিছনে হইতে আঘাত হানিতে জানে, কিন্তু সামনাসামনি দাঁড়াইবার শক্তি এবং সাহস তাহাদের আছে বলিয়া মনে হয় না। দেশের বর্ত্তমান অবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে হইলে সারমেয়-দলপতিদের ধোলাই ব্যবস্থা সর্ব্বপ্রথম, এবং অবিলম্বে প্রয়োজন।

'তোমরা লইবে বল কেবা' মহাধোলাইয়ের মহৎ কর্ত্তব্য-সেবা?

গান্ধী শততমজন্মবার্ষিকী উৎসব বর্জ্জন!

(২১-১১-৬৯)

গত কয়েক মাস ধরিয়া মহাত্মার শততম জন্ম বার্ষিকী ভারত এবং বিশ্বের অন্যান্য বহু বিদেশী শহরে প্রতিপালিত হইতেছে যথোচিত ঘটা এবং শ্রদ্ধার সহিত। পশ্চিম বঙ্গে এই উৎসবে একটা জিনিষ বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবে এবং তাহা এই যে, পশ্চিম বঙ্গে কম্যুনিস্ট দুইটি এবং তাহাদের সহিত আর এস পি, এস, ইউসি প্রভৃতি দলের কোন সদস্যই এ-উৎসবে যোগদান করেন নাই—এক কথায় বলা চলে যে, এই রাজনৈতিক দলগুলি

গান্ধীজীর শতবার্ষিকী জন্ম উৎসব বয়কট অর্থাৎ বর্জ্জন করেন। বিদেশী মহাজন যেমন লেনিন, কার্লমার্ক্স, মাও সে তুঙ্গ, হো চি মিন প্রভৃতির পুণ্যনাম স্মরণে এবং তাঁহাদের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ্যদানে যে রাজনৈতিক বিকৃত নীতিধারী দলগুলি সদা তৎপর, সেই দলগুলি নিজের দেশের বিশ্বপূজ্য মাহামানবের প্রতি সামান্য শ্রদ্ধা জ্ঞাপনে কেন এত কৃপণ তাহা সাধারণ ভদ্রমানুষেরপক্ষে অনুধাবন করা কঠিন।

কিছুকাল পূর্ব্বে লণ্ডন সহরে গুরু নানকের পঞ্চশততম জন্মবার্ষিকী উৎসব পালন করা হয় এবং সেখানকার শিখ-নেতারা কয়েকজন ব্রিটিশ মন্ত্রীকে এই উৎসবে যোগ দিবার জন্য সাদরে নিমন্ত্রণ করেন কিন্তু ব্রিটিশ মন্ত্রীগণ এ-নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেন। এই প্রসঙ্গে আমাদের জনদরদী রাজ্যপাল শ্রীধাবন মন্তব্য করেন যে, যাহারা গুরু নানকের ৫০০তম জন্ম উৎসবে যোগদানের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখান করেন তাঁহারা লিট্‌ল মেন (Little men) সহজ বাঙ্গলায় ইহাদের "ছোট লোক" বলা অসঙ্গত হইবে না। মহাত্মাজীর পুণ্য জন্ম শতবার্ষিকী উৎসবে দেশের লোককে নিমন্ত্রণ করার কথা উঠে না, এ-উৎসব সকল ভারতবাসীর এবং উৎসবপ্রাঙ্গণে সকলের জন্যই সদা উন্মুক্ত। কিন্তু ভারতীয় হইয়াও যাহারা বর্ত্তমান কালের ভারতীয় তথা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মানবের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারিল না, আমাদের প্রজাপালক রাজ্যপাল তাহাদের সম্পর্কে এখনো কোন মন্তব্য করিতে কেন বিরত আছেন? এই শ্রেণীর দলগুলি এবং তাহাদের নেতাদের রাজ্যপাল কোন্ বিশেষ শ্রেণীর গোষ্টিভুক্ত করিবেন?

শ্রমিকদরদী রাজ্যপাল

(২১-১১-৬৯)

কিছুকাল পূর্ব্বে ব্যারাকপুরে এক ভাষণপ্রসঙ্গে আমাদের রাজ্যপাল মন্তব্য করেন যে, যাহারা শ্রমিকসমাজকে 'ভাল' দিনের জন্য অপেক্ষা করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন তাঁহাদের পরামর্শ বাস্তববর্জিত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই পরামর্শদাতাদের কঠোর সমালোচনাও করেন। রাজ্যপাল বলেন এখানের শ্রমিক সমাজ অবহেলিত, অভাবদুঃখ জর্জ্জরিত। আর্থিক সুখ সুবিধা অর্জ্জনের জন্য শ্রমিকসমাজ পরিশ্রম করিয়া উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়তা করিলেও, তাহাদের অবস্থা সেই একই প্রকার। শ্রমিকসমাজ বহুকাল ধরিয়া প্রতীক্ষা করিয়াছি, কিন্তু প্রতীক্ষা করা হইয়াছে বিফল। শ্রমিকদের প্রায় কৃতদাস বলা চলে।—এবংপ্রকার জ্ঞানগর্ভ হিতকথা বলিবার পর রাজ্যপাল বলেন "I hate to be a Governor of a state of slaves, though I have all the comforts and luxuries that went with the high office"-অর্থাৎ আমি কৃতদাসদের রাজ্যের রাজ্যপাল হইতে ঘৃণাবোধ করি, যদিও এই উচ্চপদের দৌলতে আমার আরাম বিলাসের সকল সুযোগই রহিয়াছে! (মাসিক কয়েক হাজার বেতনের কথাটা শ্রীধাবন উহ্য রাখিয়াছেন। আমরা সত্যই মুগ্ধ হইয়াছি রাজ্যপালের ভাষণ পাঠ করিয়া। কিন্তু তাঁহার মন্তব্যও কি বাস্তববর্জ্জিত নহে? কথায় কথায় ঘেরাও, ধর্ম্মঘট, অফিসার ঠেঙ্গানো (যাহা অহরহ ঘটিতেছে এই রাজ্যে।) প্রভৃতি ক্রিয়াকর্ম্ম কি রাজ্যপালের দিব্য-দৃষ্টি এড়াইয়া গেল? তিনি কোন্ বিশেষ রাজনৈতিক দলের বা দল গুলির জন্য এসব কথা বলিলেন? এই সঙ্গে যদি তিনি শ্রমিকদের নিজেদের কর্ত্তব্যপালনেও অবহিত হইতে বলিতেন, ভাল হইত। শিল্পপতিদের হাজারো দোষ থাকিতে পারে। কিন্তু শ্রমিকসমাজ কি নিরীহ শিশুর মত অপাপবিদ্ধ, পরম অহিংস? গত দুই তিন বছরে শ্রমিকদের যে প্রকার বেতন এবং ভাতাদি বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা ফেলিবার মত নহে। এ বিষয়ে গরীব কেরানীকুলই অবহেলিত বলা যায়।

রাজ্যপালের মন অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছে শ্রমিকদের দুঃখদুর্দ্দশা দেখিয়া কিন্তু আমাদের কাতর নিবেদন তিনি যেন হঠাৎ দুঃখের চাপে রাজ্যপালগিরী ছাড়িয়া না দেন, ইহাতে নিজেরও যেমন ক্ষতি হইবে, তেমন হইবে বাঙ্গলার শ্রমিকসমাজের, কারণ পশ্চিম বাঙ্গলা

একাধারে রাজ্যপাল এবং শ্রমিকনেতা এমন তারা কখনও পাইবে না! কিন্তু সব কিছু সত্ত্বেও, রাজ্যপালের প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া একটা কথা বলা অশোভন হইবে না। রাজ্যপাল পশ্চিম বঙ্গে শুধু পদার্পণ করিয়াই যে প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিতেছেন, তাহা একটু বে-মাত্রা হইতেছে কি না তাহা তিনি স্বয়ং বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

আর একটি কথা, এ-রাজ্যের শ্রমিক এবং অভাব-দুঃখ-নিপীড়িতজনের প্রতি তাঁহার গভীর সমবেদনা (আন্তরিক না উচ্ছ্বাস তাহ. জানি না) প্রকাশ করিয়া নিজ অন্তর-বেদনা এবং দাহ প্রশমিত করিবার জন্য হিমালয়ের উপর দার্জিলিঙ্গ প্রস্থান করিলেন। তিনি এবং তাঁহার পরিবারবর্গ অবশ্যই আকাশযানে গেলেন, কিন্তু তাঁহার লাগেজ বহন করিবার জন্য একটি স্পেশাল ট্রেনের প্রয়োজন হইল! **'A state of slaves**—ক্রীতদাসদের রাজ্যে রাজ্যপালের এ-রাজকীয় ব্যবস্থা শোভা পায় কিনা জানি না! আমাদের সন্দেহ হইতেছে যে—

> রাজ্যপাল পশ্চিম বঙ্গের শ্রমিক তথা দরিদ্র অভাব-দুঃখ-নিপীড়িত, জনগণের দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিতে বোধহয় পরিতেন না সেইজন্যই তিনি হয়ত এ-দুঃখের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া মানস সরোবরে বসবাস করিবার মানসেই তাঁহার নিজস্ব তৈজসপত্রাদি কলিকাতার রাজভবন হইতে সরাইয়া লইলেন, অবশ্য একটি স্পেশাল ট্রেনে সব মালপত্র সরানো হয় নাই, অনতিবিলম্বে হয়ত আরো দশ-বারোটি স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা করা হইবে। অবশ্যই ক্রীতদাসদের রাজ্যের ক্রীতদাসদের হাড়গুঁড়ানো মাসপোড়ানো টাকাতেই রাজ্যপালের সংসার সরাইবার সব খরচা মিটানো হইবে।

কিন্তু রাজ্যপালের মনোবাসনা পূর্ণ হইবে কি? রাজ্যপালরূপে পশ্চিম বঙ্গে শুভপদার্পণ করিয়াই শ্রীধাবন সি পি এম মুখ্যমন্ত্রীকে যে বিষম প্রশংসাসূচক সার্টিফিকেট দেন তাহাতে একদিকে যেমন তাঁহার মহানুভবতা প্রকাশ পায়, অন্যদিকে তেমনি তিনি পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত-ফ্রন্ট (নামতঃ) সরকারের 'বড় ভাই' শরিকদের পরম সমাদর তথা সর্ব্ব সহযোগিতার পথও পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছেন। প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রীধর্ম্মবীরের মত হঠকারিতা তিনি প্রকাশ করেন নাই। শ্রীধাবনের কেবল বুদ্ধি নহে, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিও আছে স্বীকার করিব।

ভাবিতে দুঃখ হয়, এ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় গান্ধী আদর্শে বিশ্বাসী হইয়াও আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রাজ্যপালের নিকট হইতে কোন বিশেষ প্রশংসা-পত্র বা সার্টিফিকেট লাভ করেন নাই। বর্ত্তমান মন্ত্রীসভা (ফ্রন্ট) যদি ভাঙ্গে উপমন্ত্রী নিশ্চয়ই দ্বিতীয় মন্ত্রীসভার গঠক হইবেন!

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর বিলম্বিত স্বীকারোক্তি

(২৯-১১-৬৯)

অমরা বিগত ছয়মাস ধরিয়া বর্ত্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার এবং রাজ্যের সর্ব্বস্তরে সর্ব্ববিষয়ে প্রশাসনিক যে ভয়াবহ অবনতির বিষয়ে ক্রমাগত উল্লেখ করিয়া আসিতেছি, প্রথম দিকে অস্বীকাব করিলেও আজ আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর শ্রীমুখ হইতে সত্য যাহা, অনস্বীকার্য যাহা তাহাই বাহির হইল। কিছুকাল পূর্ব্বে বাঙ্গলা কংগ্রেসের বাঁকুড়া সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী প্রকাশ্য সভায় বলেন:

> "এবারে যুক্তফ্রন্ট পূর্ব হতে বত্রিশ দফা কর্মসূচী প্রণয়ন করে নির্বাচনে নেমেছিল। নির্বাচনের পর মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন করে বিপুল উৎসাহে এই কর্মসূচী রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করেছিল। অল্পকালের মধ্যে অসামান্য সাফল্যলাভ করেছিল। তারপর এল এক অচিন্তিত অবাঞ্ছিত বিপদ। স্বীকার করতে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায় যে, যুক্ত-ফ্রন্টের যে দলগুলি গলা জড়াজড়ি করে নির্বাচন পার হয়ে এসেছিল, তাদেরই মধ্যে কোন কোন দল অপর দলের প্রভাব খর্ব করে আপন দলের শক্তিবৃদ্ধির জন্য বাধিয়ে চলল মারামারি, হানাহানি, নারীর অপমান, গৃহদাহ, লুঠতরাজ, নরহত্যা! দিকে দিকে ফুটে উঠল বর্বর জঙ্গলী

জীবনের নির্লজ্জ বীভৎস রূপ। যদিও এই সব ব্যাপার সারা প্রদেশে খুব ব্যাপক হয়ে ওঠেনি, তথাপি দিকে দিকে জনগণের মনে একটা অরাজকতার এবং নিরাপত্তার অভাববোধের আতঙ্ক ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ল।

বাঙ্গলা কংগ্রেসের এই স্পষ্ট চার্জশীটের প্রবল প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। রাজ্যের তথাকথিত ফ্রন্ট শরিকদলগুলির কোন কোন দল, বিশেষ করিয়া 'বড়ভাই' সি পি এম বাঙ্গলা কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ করিল, কোন কোন দল আংশিক বা প্রায় পুর্ণ সমর্থন জানাইল বাঙ্গলা কংগ্রেসের চার্জশীটকে। জনসাধারণের মধ্যে এবং সংবাদ পত্রে ইহা লইয়া প্রবল আলোচনাও হইতে থাকে। কিন্তু বাংলা কংগ্রেস ইহাতে দমিয়া না গিয়া, তাহাদের উথাপিত প্রত্যেকটি অভিযোগের উপযুক্ত এবং অনস্বীকার্য প্রমাণ দাখিল করিল।

ইহার ফলে যুক্তফ্রন্টে আবার দুদিনে তিনটি অধিবেশন হল, অবশেষে "মধুরেণ সমাপয়েৎ" হল। কংগ্রেসের অভিযোগগুলি মোটামুটি স্বীকার করে নিয়ে ভবিষ্যতে শান্তিতে কাজ করতে পারে সেই সম্বন্ধে বিস্তৃত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিতে গৃহীত হল। এখন এগুলিকে আন্তরিকভাবে কার্যকর করার দায়িত্ব ফ্রন্টের সকল দলের উপর।" বাঁকুড়া সম্মেলনের সমাপ্তির পূর্ব্বে এই "শ্বাসরোধ-কারী পরিবেশে বাংলা কংগ্রেস জনগণের প্রতি তার কর্তব্য ও দায়িত্ববোধে নানা অত্যাচার ও অবিচারের একটি তালিকা দিয়ে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাস করল যাতে প্রতিকারের ও ইঙ্গিত ছিল।"

বাঙ্গলা কংগ্রেস বলেন—

"আমাদের বাংলা কংগ্রেসেরও অনেক দায়িত্ব আছে। যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসুচীকে রূপ দিতে হবে। জনগণের মনে আশা ভরসা জাগাতে হবে, তাঁদের যতদূর সম্ভব মঙ্গল করতে হবে তার জন্য আমাদের আদর্শকে দিকে দিকে প্রচার করতে হবে। আমাদের প্রতিষ্ঠানকে ব্যাপকভাবে শাখা-প্রশাখায় ছড়িয়ে দিতে হবে। সকল দলের সঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে। কোথাও কোন আঘাত পেলে প্রতিঘাত না করে অহিংস-প্রতিরোধ করতে হবে এবং প্রতিকারের জন্য বাংলা কংগ্রেস প্রাদেশিক কার্যালয়কে সবিস্তারে জানাতে হবে।

"এই সবের জন্য একটি শান্তিফৌজ গড়ে তোলা হল। তার কাজ হবে আরও সুদূরপ্রসারী। সব সময় মনে রাখতে হবে—আমাদের বাংলা কংগ্রেস গান্ধীজীর আদর্শ গ্রহণ করে তাঁরই নির্দেশিত পথে চলতে চায়। যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফার মধ্যে তার সকল প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ থাকবে না"।

বলা বাহুল্য—রাজ্যের বিষম অবস্থার উন্নতি না হইয়া শান্তি, আইন শৃঙ্খলা আরো খারাপের দিকেই গড়াইতেছে, হামলা, মারামারি, খুনখারাপি, লুঠতরাজ এখন বৃদ্ধি পাইতেছে। জনগণও আজ সর্ব্ববিষয়ে নিরাপত্তার অভাব বোধ করিতেছে। মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু ইহা বারবার স্বীকার করিতেছেন এবং প্রকাশ্যভাবে বলিয়াছেন, আজ পশ্চিমবঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক কোন প্রশাসন নাই—সমস্ত রাজ্যে জঙ্গলী শাসন চলিতেছে। ফ্রন্টশরিকদের দু-একটি দল ছাড়া অন্য সব দলই রাজ্যের জঙ্গলী শাসনের জন্য এক বাক্যে দায়ী করিতেছেন 'বড় ভাই' দলকে। ৬৯

শ্রীজ্যোতিবসু এবং রাজ্যপুলিশ দপ্তর—

(২৯-১১-৬৯)

গত কিছুকাল হইতে ফ্রন্টশরিকদের মধ্যে সোচ্চার অভিযোগ উঠিয়াছে যে উপমুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপুলিশকে নিজের এবং নিজদলের স্বার্থে নিয়োজিত করিতেছেন। অন্য একটি দলের নেতা দাবি করেন যে, জ্যোতিবসুকে পুলিশদপ্তর ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করা হউক। শ্রী জ্যোতি বসু ইহার জবাবে বলেন যে—রাজ্যপুলিশ-দপ্তর কাহারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। সত্য কথা স্বীকার করিব। কিন্তু জ্যোতিবাবুকে আর প্রশ্ন করা যায়—তিনি কি রাজ্যপুলিশ দপ্তরকে এবং রাজ্য ও

কলিকাতা পুলিশকে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত তাঁহার নিজস্ব সম্পত্তি বা জমিদারীর মত যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেছেন না? কিছুকাল পূর্ব্বে জ্যোতিবাবু কয়েক দিনের জন্য ছুটিতে বাহিরে যান সেইসময় তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ না করিয়া, এমন কি তাঁহাকে কিছু না জানাইয়াই (অনুমতি লওয়া ত দূরের কথা) তাঁহার দলের 'রামবল গোঁয়ারের' হাতে পুলিশ-দপ্তরের ভার দিয়া তাহাকে অস্থায়ী কর্ত্তা করিয়া যান নাই? মুখ্যমন্ত্রী কি কেবল নামকা ওয়াস্তে? একজন নিম্নস্থ মন্ত্রীর এমন 'স্বাধীনতা' স্বেচ্ছাচারিতা কোন ভদ্ররাজ্যে হইতে পারে না, 'জঙ্গলী' রাজ্যেই ইহা সম্ভব।

উপমুখ্যমন্ত্রী যতই প্রতিবাদ এবং অস্বীকার করুন, পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ যে তাঁহার করতলগত এবং তাঁহারই অঙ্গুলীসঙ্কেতে পুলিশের সকল ছোটবড় কর্ত্তা এবং সাধারণ পুলিশ কনষ্টেবল্ও চলিতে বাধ্য হইতেছে বা তাঁহাদের বাধ্য করা হইতেছে, একথা ফ্রন্টের দুইটি শরিকদল ছাড়া অন্য সবাই স্বীকার করিতেছেন। মিথ্যাকে চোখ রাঙ্গাইয়া সত্যে পরিণত করার চেষ্টা অপচেষ্টা মাত্র

প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা বলা কর্ত্তব্য—রাজ্যের সাধারণ মানুষ এবং ফ্রন্টের বারোটি শরিকদলই যখন জ্যোতিবসুর হাতে পুলিশদপ্তর রাখার বিরোধী, সেই-ক্ষেত্রে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তাঁহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া উপমুখ্যমন্ত্রীর হস্ত হইতে পুলিশ-দপ্তর কাড়িয়া লইয়া তাঁহার নিজের হাতে কেন লইতেছেন না? কেন্দ্রে যদি প্রধানমন্ত্রী তাঁহার খুশী এবং খামখেয়ালমত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদপ্তর হইতে কয়েকজন মন্ত্রীকে বিনা দোষে এবং বিচারে অপসারিত করিতে দ্বিধা না করেন তখন সত্য-অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য (বা প্রধান) মন্ত্রী কেন একজন মন্ত্রীকে অপসারিত করিতে এত দ্বিধা করিতেছেন? এ-রাজ্যের 'বড়ভাই' শরিক-দলকে তিনিও কি ভয় করেন? যদি করেন, তবে তাহার আত্মসম্মান এবং আদর্শ বজায় রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী হয় পদত্যাগ আর না হয় মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দিন।

পরের সংবাদে জানা গেল জ্যোতিবসু মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি নিজেকে অসভ্য সরকারের মন্ত্রী বলিয়াও মনে করেন না। সভ্যতার মান সকলের এক নহে।

মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবুর স্বীকৃতি—

—(২২-১১-৬৯)

কয়েকদিন পূর্ব্বে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অজয়বাবু স্বীকার করেন যে—

"ধান আদায় করা, ঘেরাও করা, পিটিয়ে দেওয়া, খুন জখম প্রভৃতি নিগ্রহ "রুটিন মাফিক" চলতে থাকায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে—পল্লী অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্ক ও নিরাপত্তার অভাব বোধ দেখা দিয়েছে"।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব সরকারের। এরকম অবস্থা কখনই চলা বাঞ্ছনীয় নয়। যেখানে এরূপ চলে, সেখানে "সভ্য সরকার আছে বলে মনে হয় না"।

প্র: সরকারের কি জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার বিশেষ দায়িত্ব নেই?

মুখ্যমন্ত্রী হাসতে হাসতে জবাব দেন "আমি অসভ্য চীফ মিনিষ্টার"।

মুখ্যমন্ত্রীর এমন সরল স্বীকৃতির উপর মন্তব্য করিবার কিছুই নাই। অজয়বাবু যদি নিজেকে অসভ্য চীফ মিনিষ্টার বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে তাঁহার কর্ত্তব্য হইতেছে, আর বিলম্ব না করিয়া পশ্চিমবঙ্গের পরম সভ্য মন্ত্রীসভা হইতে বাহির হইয়া আসা; কিছু দেরী হইলেও অজয়বাবু গত কিছুদিন হইতে মুখ খুলিয়াছেন, এবং তাঁহার নিকট হইতে এমন প্রকার মন্তব্যাদি (ফ্রন্টশরিক এবং মন্ত্রীমণ্ডলী সম্পর্কে) বাহির হইতেছে যাহাতে তাঁহার মানসিক অস্বস্তি এবং দাহ প্রকাশ পাইতেছে।

এখন আমরা এইটুকু আশা করিতে পারি যে, যে অজয় মুখোপাধ্যায়কে, আমরা ১৫।২০ বৎসর পূর্ব্বেও

জানিতাম চিনিতাম, সেই আদর্শনিষ্ঠ, গান্ধীভক্ত স্বার্থলেশহীন দেশসেবক অজয়বাবুকে আবার জনজীবনে ফিরিয়া পাইব। পশ্চিমবঙ্গের বিকৃত এবং সত্য আদর্শ এই জনজীবনকে তিনি হয়ত আবার সত্যের পথে চালিত করিয়া সুস্থ সবল স্বাভাবিক করিতে পারিবেন।

পশ্চিমবঙ্গে 'দলবাহিনীর দুষ্ট আবির্ভাব'!

গত কিছুকাল হইতে পশ্চিমবঙ্গে বিবিধ রাজনৈতিক দলগুলি প্রত্যেকেই একটি করিয়া দলীয়বাহিনী গঠন করিতে মনোনিবেশ করিয়াছে। সি পি এম, সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, এস এস পি, আর এস পি প্রভৃতি দলগুলির বাহিনী গঠিত হইয়াছে, শেষ পর্যন্ত বাঙ্গলা কংগ্রেসও অবস্থা দেখিয়া 'শান্তিসেনা' গঠন করিয়াছে। সি পি (এম) এর দলীয় বাহিনীতে ৫০,০০০ কিংবা তাহারও বেশীসংখ্যক "সৈন্য" আছে। সি পি আই এর বাহিনীতে ঠিক কত সৈন্য আছে বলা যায় না। তবে ৩০।৪০ হাজারের কম নহে। ফরোয়ার্ডব্লকের (বর্তমানে নেতাজী প্রতিষ্ঠিত এই ব্লকের—নেতাজীর আদর্শের প্রতি কোন শ্রদ্ধা বা আনুগত্য নাই বলা বাহুল্য,) বাহিনীর পল্টনের সংখ্যা অন্তত পক্ষে ২০।২৫ হাজার হইবে। বাঙ্গলা কংগ্রেসের শান্তিসেনার সংখ্যা জানা নাই, তবে ইহা ৩০।৪০ হাজারের কম হইবে না। পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সভাপতিও ঘোষণা করেন যে, হিংসার প্রতিরোধ হিংসার দ্বারাই করিতে হইবে, এবং ইহার জন্য কংগ্রেসও একটি বাহিনী গঠন করিতেছেন। সব রাজনৈতিক দলীয় বাহিনীর মহৎ উদ্দেশ্য দেশে গণতন্ত্রের সঙ্গে সাধারণ মানুষের স্বার্থ রক্ষা করা—দলীয় মতলব হাসিলের জন্য নহে! সব কিছু দেখিয়া ২০।২২ বছর পূর্ব্বের চীনের ওয়ারলর্ডদের পথই মনে হইতেছে।

এবার কি বিশ্বভারতীর পালা? (১৮-১১-৬৯)

সংবাদে প্রকাশ শান্তিনিকেতনে সি পি আই এর 'অধীন' কর্ম্মী এবং সি পি এম কর্ত্তৃত্বাধীন অধ্যাপক-সমিতির সভ্যগণ তাঁহাদের বিবিধ দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন তথা বিক্ষোভ সুরু করিবেন যদি ৩০।১১।৬৯ তারিখের মধ্যে তাহাদের দাবী মিটানো না হয়। পশ্চিম বঙ্গের শিল্প-বাণিজ্য, সাধারণ নিরাপত্তা, স্কুল-কলেজের শিক্ষার প্রায় পুর্ণ শ্রাদ্ধ করিয়া, এবার রাজ্যের মধ্যে কলিকাতা এবং বাহিরে যে কয়টি প্রতিষ্ঠান তাহাদের নিজ নিজ আদর্শমত ছাত্রদের শিক্ষাদানব্রতে লিপ্ত রহিয়াছে, সেগুলিকেও লালে লাল করিয়া সর্ব্বত্র লাল বাতি জ্বালিবার সাধু প্রকল্প রাজ্যের দুইটি কম্যু পার্টি—গ্রহণ করিয়াছে। আমাদের মনে হইতেছে, পশ্চিমবঙ্গে মানুষের মধ্যে এখনো যতটুকু সততা, সভ্যতা, আদর্শবোধ, কর্ম্মে নিষ্ঠা এবং অন্যপ্রকার মানবীয় গুণাবলী অবশিষ্ট আছে, সেগুলির পূর্ণলোপ অর্থাৎ শ্রাদ্ধ না করিয়া পশ্চিম বঙ্গের কমিউনিষ্টপার্টিদুইটির আশা পূর্ণ হইবে না। দলীয় রাজনীতির বাহিরে এখনো যাহারা এবং যে কয়টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কোনরকমে আত্মরক্ষা করিয়া আছে, সেইসব মানুষ এবং নগণ্যসংখ্যক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে (বিশ্বভারতী যাহার অন্যতম) পুরাপুরি গ্রাস না করিয়া কম্যুদের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধার নিবৃত্তি হইবে না।

দেশের শিক্ষাব্যবস্থাকে একেবারে নষ্ট না করিলে বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সুনিদ্রা হইবে না। ইহার প্রধান কারণ বোধহয়, ছাত্র তথা যুবসমাজের মধ্যে প্রকৃত শিক্ষার প্রসার হইলে তাহাদের দৃষ্টি উদার, প্রসারিত এবং ভালোমন্দ বিচার করিবার মত বুদ্ধিও জাগরিত হইবে এবং ছাত্র তথা যুবসমাজে এই গুণগুলির উন্মেষ—বামপন্থী দলগুলির বিশেষ করিয়া ভারতীয় জাতীয়তা এবং আদর্শে অবিশ্বাসী দুইটি কমিউনিষ্টপার্টির বিষাক্ত এবং হিংসাত্মক প্রচার তথা দলীয় বাহিনী গঠনে বিশেষ বাধার সৃষ্টি হইবে। অশিক্ষিত কিংবা অল্প ও কুশিক্ষিত যুবসমাজই কম্যুদের শক্তির প্রধান উৎস, দলের সভ্য (?) সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের ও জাতির পক্ষে ক্ষতিকর, এমন কি মারাত্মক অপ-আদর্শে যুবসমাজকে বিভ্রান্ত করাও

সহজ হইবে। পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রসমাজ কি কম্যুরাখাল-দের গোপালে পরিণত হইবে?

শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে দেশব্যাপী এই মহা মহামারীর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার উপায় কি কেহ জানে না। শুনিলাম আমাদের প্রোগ্রেসিভ প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা বিশ্বভারতীর বর্ত্তমান সমস্যা সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং একটি অনুসন্ধানী কমিটিও নাকি নিযুক্ত করিয়াছেন। ভাল কথা। কিন্তু এখন দুইটি কম্যুদলই ত প্রধান মন্ত্রীকে প্রায় সর্ব্বভাবে সমর্থন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত। দেশমাতা ইন্দিরাজী কি তাঁহার নূতন বন্ধুদের বিশ্বভারতী তথা সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হইতে দূরে থাকিতে অনুরোধ করিলে কোন ফল হইবে না? দেশের সকল হিতবুদ্ধি-সম্পন্ন ব্যক্তিদেরও এবার সচেতন হইতে হইবে, যদি বাঁচিবার ইচ্ছা থাকে।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের আত্মা বাঁচিয়া গেলেন!

(২০-১১-৬৯)

গত ৩রা নভেম্বর ছিল দেশবন্ধুর শততম জন্মদিবস। পরম আনন্দের কথা, এই শততম জন্মোৎসব পালন করিবার জন্য পশ্চিম বঙ্গে কোন প্রকার সামান্য অনুষ্ঠানও কোথাও হয় নাই। এই প্রকার অনুষ্ঠানে এক শ্রেণীর তথাকথিত নেতা, স্বর্গত আত্মার উদ্দেশ্যে, যাহা অনুভব করেন না, যাহা বিশ্বাস করেন না, যাহা জানেন না—সেই সব কথাই বলেন এবং স্বর্গত মহাজনের আদর্শমত চলিতে নিরুপায় জনগণকে আহ্বান করেন! এইখানেই নেতামহাশয়দের কর্ত্তব্য শেষ হয়। দেশবন্ধুর অমর আত্মাকে জ্বালাতন না করিয়া আমরা একটি অতি মহৎ কর্ম্ম করিয়াছি।

এই প্রসঙ্গে দেশবন্ধু দৌহিত্র শ্রীমান সিদ্ধার্থ রায়ের সম্পর্কে কিছু বলা অসমীচীন হইবে না। দেশবন্ধু তৎকালীন কংগ্রেসের সহিত নীতিগত পার্থক্যের জন্য—কংগ্রেসের মধ্যেই স্বরাজ্যপার্টি স্থাপন করেন। স্বর্গত মতিলাল নেহরু (ইন্দিরা গান্ধীর পিতামহ) দেশবন্ধুর সহযোগী ছিলেন এই ব্যাপারে। আমরা আশা করি সিদ্ধার্থ রায়ও তাঁহার মাতামহের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অবিলম্বে পশ্চিম বঙ্গে বিগত স্বরাজ্যপার্টির মত কিছু একটা গঠন করিয়া বাঙ্গলার ইতিহাসে তাঁহার নাম চির উজ্জ্বল রাখিবেন। সিদ্ধার্থ রায়ের প্রতাপের নিকট অন্য কোন প্রতাপই টিকিতে পারিবে না! আমরা ভবিষ্যতের দিকে পরম আশাভরা চোখে তাকাইয়া রহিলাম। আমাদের বিশ্বাস স্বর্গত মতিলাল নেহরুর পৌত্রী, দেশবন্ধুর দৌহিত্রকে সকল বিষয়ে সর্ব্বসুযোগ ও সাহায্য দানে কার্পণ্য করিবেন না!!

ছেলেধরা

(গল্প)

সীতা দেবী

সনতের সঙ্গে সাধারণ বাঙালী যুবকের একটু তফাৎ ছিল। বয়স নিতান্ত কম নয় আঠাশ উনত্রিশ ত হবেই। পড়াশুনো শেষ করে বেশ ভাল কাজ করছে। বাবা মা বেঁচে আছেন কিন্তু তাঁরা সনৎকে অবলম্বন করে নেই, দেশে তাঁদের বাড়ীঘর আছে, জমি জমাও বেশ কিছু আছে। তাঁদের জন্যে ছেলেকে কিছুই করতে হয়না আর্থিক দিক দিয়ে, তাঁরাই বরং সনৎকে এটা-ওটা সারাক্ষণই পাঠাতে থাকেন। ক্রমাগত ছেলেকে চিঠি লেখেন, ছুটীর দিনগুলো গিয়ে তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে আসতে। একটি ত ছেলে, তাও বারমাস বিদেশে কাটাবে আর তাঁরা বুড়ো বুড়ী একলা ঘরে বসে খালি কড়িকাঠ গুণবেন এ কি ভাল লাগে? তা সনৎ বড় বড় ছুটিগুলোয় যায় সর্ব্বদাই, তবে ছোটখাট ছুটিছাটা কলকতাতেই কাটায় বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে। মাসী পিসীও দু-চারটে আছে এধারে ওধারে নিতান্ত মুখ বদলাবার দরকার হলে সে সব জায়গায়ও ঘোরা-ফেরা করে। কিন্তু আজ অবধি প্রেমে পড়েনি, বিয়ের সম্বন্ধ এলেও খালি ঝেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। ওদিকটায় যেন তার মনই যায়না। বন্ধু বান্ধবরা কেউ বিশ্বাস করে না। সাধারণ সুস্থ পুরুষ মানুষ, অথচ প্রেমের ভাবনা ভাবেনা পূর্ণ যৌবনে এ কি একটা কথা হল? কেউ তাকে "শুকদেব গোস্বামী," কেউ বলে বিড়াল তপস্বী। সনতের মা ত প্রায় কাঁদতেই বাকি রেখেছেন। তাঁরা কি নাতি-নাতনীর মুখ দেখবেন না নাকি? তাঁর জানাশোনা যে যেখানে আছে সবাইকে তিনি ক্রমাগত চিঠি লেখেন, যদি কেউ কোন মতে ছেলেটাকে পটাতে পারে। সুন্দরী মেয়ে কোথাও আছে শুনলেই চেষ্টা করে ধরে বেঁধে কোনমতে তাকে ছেলের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে, যদিই ছেলের মন ফেরে। কিন্তু এ পর্য্যন্ত ত কোনো ফল হয়নি।

এবার কোন এক আত্মীয়ার বাড়ী মেয়ের বিয়ে, কর্ত্তা গিন্নী ত কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। সনৎ টাকাকড়ি যথেষ্টই উপার্জ্জন করে, কাজেই পাদাগাদি করে মেসে থাকার তার কোনো প্রয়োজন হয় না। ছোট একটা ফ্ল্যাট নিয়ে সে থাকে। একটা চাকর আছে সে নিজের ইচ্ছামত সংসার চালায়। সনতের বাবা মা এইখানে এসেই উঠলেন। তাঁরা ত কতদিন পরে ছেলেকে দেখে মহা খুশী, ছেলেরও অবশ্য বেশ ভালই লাগল। অখুশী শুধু চাকর মুরারি, কারণ তার কাজ বেড়ে গেল এবং রোজগার কমে গেল। সনৎ বেরিয়ে গেলেই সে মনিবের বিছানাটা পেতে বেশ এক ঘুম ঘুমিয়ে নিত, তারপর বাবু আসবার আগে সবঝেড়ে ঝুড়ে পরিষ্কার করে রাখত। সনতের ভাল কাপড় জামাগুলোও তার প্রায়ই কাজে লাগত।

প্রথম দুটো দিন ত কেটে গেল ক্রমাগত বিয়ে বাড়ী ছোটাছুটি করতে ও তাদের সঙ্গে হৈ চৈ করতে। কনে বিদায় হয়ে যাওয়ার পর সনতের মা একটু সুস্থির হয়ে তাকাতে পারলেন। বিয়েবাড়ীতে বসে বসেও অবশ্য তাঁর অনেক কথা হয়েছে আত্মীয়াদের সঙ্গে। অনেক-গুলি সুপাত্রীরও সন্ধান পেয়েছেন। এ পাড়াতেই নাকি একটি বেশ সুন্দরী মেয়ে আছে। বেশ ভাল ঘরের, বি-এ পাশও করেছে। দরিদ্রের মেয়ে নয়, বেশ মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। সনতের মা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাহলে এতদিন বিয়ে হয়নি কেন? উত্তরে শুনেছিলেন মেয়ের মা বাবা কিছুটা আধুনিক পন্থী, অল্প বয়সে বিয়ে দেওয়ায় বিশ্বাস করেন না, তাঁদের বড় মেয়েরও এই অবধি

আগেই বিয়ে হয়েছে, এখন ছোটটির জন্যে পাত্র খুঁজছেন। শুধু যে অল্প বয়সে বিয়ে দেবেন না তাই নয়, পণও দিতে চাননা। এই জন্যে বেশ উঁচু ঘরের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও চট্ করে ভাল পাত্র পাওয়া যাচ্ছে না।

এত কথা শুনে সুলোচনা দেবী, অর্থাৎ সনতের মা আর স্থির থাকতে পারলেন না। রাত্তিরে খেতে বসে ছেলেকে বললেন "সোনাদির কাছে ভারি একটা ভাল পাত্রীর সন্ধান পেয়েছি রে।"

মাছের কাঁটা বাছতে বাছতে ছেলে বল্ল "তা বেশ ত।"

মা উৎসাহিত হয়ে বললেন বলিস ত ওদের সঙ্গে কথাবার্তা সুরু করি।

সনৎ বলল "কি যে তুমি বল মা! মেয়ে থাকলেই অমনি ছুটে গিয়ে কথা বলতে হবে? কি রকম ঘরের মেয়ে, কি রকম শিক্ষা দীক্ষা, কিছুই ত জানিনা।

মা বললেন "খুব ভাল মেয়ে। বেশ ভাল ভদ্র-ঘরের মেয়ে। দেখতে নাকি খুব সুন্দর। তুই দেখতে চাইলে আমি এখনই ব্যবস্থা করতে পারি।"

সনৎ বলল "মা তোমাকে কতবার বলেছি যে শুধু বিয়ে করবার খাতিরে ঝপ্ করে আমি বিয়ে করতে চাইনা। বেশ ত আছি, অত তাড়া কিসের? আমি ত আর জলে পড়ে নেই?"

মা এইবার চোখ মুছতে আরম্ভ করলেন, "ঝপ্ করে কি রকম? তোর বয়স কম হয়েছে নাকি? আমি কি কোনোদিন বৌ নাতি নাতনীর মুখ দেখব না? তোর সমবয়সী যারা, তারা সব ঘর ভর্ত্তি বৌ ছেলে পিলে নিয়ে ঘর করছে আর আমি একলা ঘরে বসে খালি আকাশের তারা গুণছি।"

মায়ের চোখের জল ফেলাটা সনতের একবারে ভাল লাগত না। সে বলল "আমি ত আর ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা করে বসে নেই যে কোনোদিন বিয়ে করব না? তেমন যোগাযোগ হলে দেখা যাবে। তবে বিয়ে পাগলা হয়ে দৌড়ে বেড়াবার আমার ইচ্ছে নেই।"

সুলোচনা বললেন "তা সবাই হাত পা গুটিয়ে বসে থাকলে যোগাযোগটা হবে কি করে? আচ্ছা যদি মেয়েদের দিক থেকে কোনো প্রস্তাব আসে, তাহলে তুই দেখতে যেতে রাজী আছিস্?"

মায়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে সনৎ বলল "আচ্ছা, সে দেখা যাবে এখন।" বলেই খাওয়া শেষ করে উঠে পড়ল।

যা একটু নিমরাজী হয়েছে তাও হয়ত থাকবে না বেশী দেরী করলে। তিনি গ্রামে ফিরে গেলে আর ছেলে মত করবে না, তিনি যতই চিঠি লিখুন না কেন। এখানে থাকতে থাকতেই একটা ব্যবস্থা করে যেতে হবে। পরের দিন ছেলে অফিসে চলে যাওয়া মাত্র সুলোচনা নাওয়া খাওয়া সেরে নিয়ে মুরারীকে দিয়ে ট্যাক্সি ডাকিয়ে সোনাদির বাড়ী রওয়ানা হলেন। কর্ত্তা বাড়ী আগলে রইলেন, কারণ গিন্নি ত আর একলা যেতে পারেন না? মুরারী গেল তাঁকে পৌঁছে দিতে।

সোনাদির সঙ্গে অনেক পরামর্শ হল সুলোচনার প্রস্তাব একটা সনতের কানে তুলতে হবে। তার পর চাপ দিয়ে তাকে রাজী করতে হবে মেয়ে দেখতে যেতে। সুলোচনা বারবার জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন "মেয়ে খুব সুন্দর ত সোনাদি? যা মাথা পাগলা ছেলে আমার, আবার নাক তুলে চলে না আসে।"

সোনাদি ঠোঁট উল্টে বললেন, "প্রতিমাকে দেখে আর কাউকে নাক তুলতে হবে না। নামেও প্রতিমা কাজেও প্রতিমা। খুব ভাল দেখতে, ছেলেমানুষ মেয়ের পক্ষে একটু যেন গম্ভীর। তা বলে গোমড়ামুখী নয় একেবারে। আমি কাল সকালেই ওদের বাড়ী একটা খবর পাঠাব। তুই আর আছিস ক'দিন এখানে?"

সুলোচনা বললেন "সে যতদিন দরকার আমি থাকব এখন। লেগে পড়ে না থাকলে ও ছেলে বিয়ে করবে নাকি? কোথা থেকে এমন অনাছিষ্টি স্বভাব পেল জানিনা বাপু। বাপ খুড়ো কেউ ত এমন ছিল না। সবাই সময় মত বিয়ে থা করেছে, কাউকে দুবার বলতে হয়নি। আমারই বয়স কম ছিল বলে বাবা বছর দুই দেরী করতে বলেছিলেন, তা এঁরা শোনেননি।"

"তা তুমি যা ক্ষীরের পুতুলটির মত দেখতে ছিলে,

দেরী করতে গিয়ে হাত ছাড়া হয়ে যেতে যদি? আমার বোনাই কেমন সুবুদ্ধি, সে এমন ঝুঁকি নেবে কেন?” সুলোচনা তাঁকে এক ঠেলা দিয়ে বললেন “যা, যা, কাজলামি করতে হবে না। ক্ষীরের পুতুল না হাতী।

সোনাদি হেসে বললেন “হাতী এখন হয়েছ তখন ত আর ছিলে না?”

সুলোচনা বললেন “নাও বাপু, এখন তোমার রসিকতা রাখ। আমি এখন হাতীই হই কি ঘোড়াই হই, তাতে কার কি এসে যাচ্ছে? আমার ত আর একবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে হবে না? এখন ছেলেটার বিয়ে মানে মানে হয়ে গেলে বাঁচি। তুমি বাপু খবর পাঠাও তাড়াতাড়ি ওদের বাড়ী। ওরা রাজী হলে সামনের রবিবারেই মেয়ে দেখার ব্যবস্থা করব।”

সোনাদি বললেন “তা পাঠাচ্ছি খবর। ওরা যদি ছেলের ফোটো দেখতে চায়? আছে ত তোর কাছে? ওদের সুন্দরী মেয়ে, ওরা চাইবে জামাইও সুশ্রী হোক।

সুলোচনা বললেন “তা আছে। আমি মুরারীকে দিয়ে পাঠিয়ে দেব এখন। “আরো দুচার কথার পর সুলোচনা বাড়ী ফিরে গেলেন। কর্ত্তা তখন উঠে বসে সকালের খবরের কাগজগুলো আবার পড়ছেন। গিন্নিকে দেখে বললেন” হল তোমাদের? বাবাঃ, ঝাড়া তিন ঘণ্টা ধরে কি এত কথা বললে? সুলোচনা বললেন “তা লাখ কথা ছাড়া ত বিয়েই হয়না। তোমার আবার যা ট্যাটা ছেলে ওর বিয়ে দিতে অন্ততঃ দুলাখ কথা ত বলতে হবে?

কর্ত্তা বললেন “তা বল বাপু তোমরা। ভালও লাগে তোমাদের কথা বলতে। নাও, এখন মুরারীকে তাড়া দিয়ে চা টা একটু চটপট করাও ত। চা খেয়ে একটু ঘুরে আসব ভাবছি। সকাল থেকে শুধু এক জায়গায় বসে বসে পাগুলো অচল হয়ে আসছে। কোন্ সুখে যে লোকে এ শহরে থাকে”।

গিন্নী বললেন “তা যাও বেড়াওগে। ওকে কাল একটু বাড়ীতেই বসে থাকতে হবে। যে মেয়েটির কথা নিয়ে এত আলোচনা করছি, তাদের বাড়ী থেকে কাল একটা ঘটক ঘটকী কিছু ঠিক আসবে। মেয়েমানুষ হলে না হয় আমি কথা কইতে পারি, কিন্তু বেটা ছেলে হলে আমি কিছু তেড়ে গিয়ে কথা বলতে পারব না। আর যা গুণের ছেলে তোমার, হয়ত ও হুট্ করে তাড়িয়েই দেবে। তুমি থাকলে অতটা করবেনা। আর কোন জ্ঞান না থাক, ভদ্রতা জ্ঞানটা ত আছে?

কর্ত্তা বললেন “তাই থাকব না হয়। আমার ছেলে হয়ে বেটা কেমন করে এমন কলির ভীষ্ম হল তা ত বুঝতে পারিনা। বাপ মা সময়মত বিয়ে দিচ্ছেন না দেখে আমরা ত রেগে মাথার চুল ছিঁড়তাম।

সুলোচনা বললেন “কে জানে বাপু, আমি অত বুঝতে পারিনা। যাই দেখি মুরারীটা কি করছে। ঘুমোতে পেলে হতভাগা আর কিছু চায়না”। মুরারীকে তুলে ত সুলোচনা উনুনে আগুন দিতে পাঠালেন। কর্ত্তা বাইরে যাবার জন্য তৈরি হতে লাগলেন। সুলোচনা নিজের ট্রাঙ্ক খুলে ছেলের ছবি খুঁজতে বসলেন। মুরারীর কাজ হয়ে গেলেই তাকে তিনি আবার সোনাদির বাড়ী পাঠাবেন সনতের ছবি দিয়ে আসার জন্য। বাকি দেওয়া থোওয়ার কাজ না হয় তিনিই করবেন।

অনেক খুঁজে একখানা ভাল ছবি পাওয়া গেল। ছেলে দেখতে ত ভালই, অপছন্দ করবার মত মোটেই নয়। খুব নধরকান্তি নয়, কিন্তু সেটাও শোনা যায় আজকাল সবাই পছন্দ করেনা।

মুরারী চা তৈরি করে ফিরে এল। কর্ত্তা গিন্নী চা খেতেখেতে গল্প করতে লাগলেন। অতঃপর ভদ্রলোক পুরোন বন্ধুদের সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। গিন্নী অতি অনিচ্ছুক শ্রোতা মুরারীকে রান্নার বিষয়ে উপদেশ দিতে লাগলেন। এক সময় তার রান্না শেষও হয়ে গেল। তখন ট্রামের পয়সা নিয়ে সে ধীরে ধীরে গন্তব্যস্থানে চলল। ইচ্ছা কাজকর্ম খাওয়া দাওয়া সব শেষ হওয়ার পর আবার হেঁটেই ফিরবে। ট্রামের পয়সা ক'টা তার উপরি লাভ হল।

সোনাদি ছবি পেয়ে আর দেরি করলেন না।

পরদিন সকালে যাবেন বলেছিলেন, তার বদলে সন্ধ্যার পরেই ভাবী কনে প্রতিমাদের বাড়ী যাত্রা করলেন।

প্রতিমার মা ত প্রায় হাতে চাঁদ পেলেন। তাঁরা পণ দিতে চাননা শুনে এত সুযোগ্যা পাত্রী হওয়া সত্ত্বেও প্রতিমার ভাল সম্বন্ধ বিশেষ আসছে না। পাত্রের বাপ মায়ের দলের এ হেন প্রস্তাবে বেশী উৎসাহ করবার বেশী কারণ থাকে না। ছেলেদের কান অবধি কথাটা অনেক সময়ই পৌঁছায়ওনা। পৌঁছলে অবশ্য অন্যরকম প্রতিক্রিয়া হতেও পারত। যাহোক এ ক্ষেত্রে পণের জন্য নাও আটকাতে পারে শুনে ত তাঁরা মহাখুশী। প্রতিমার মা বললেন, "আমরা রবিবারে স্বচ্ছন্দে মেয়ে দেখাতে পারব ভাই। তুমি খালি আমাদের জানিয়ে দেবে শনিবারে যে কজন লোক আসবে। আমি বড়মেয়েকেও অমনি আনিয়ে নেব, ও না এলে সাজাবে কে?

সোনাদি বললেন "নিশ্চয় জানিয়ে দেব। ছেলে সকল দিকেই ভাল, ঐ এক খেয়াল, বিয়ে করতে চায়না। তোমার মেয়ের বরাত জোর থাকে ত তার ভাগ্যে জুটে যাবে। ঘটকমশায়কে তবে আমি কালই পাঠিয়ে দেব"।

ঘটকমশায়ও এমন ভাল পাত্রপাত্রীর খোঁজ সব সময় পাননা। তিনিও প্রায় সেই রাত্তিরেই যেতে রাজী। ধরে বেঁধে তাকে তখনকার মত থামান হল।

কর্তা গিন্নীরা ত সব মহাব্যস্ত, তবে ভাবী পাত্র ও পাত্রী বিশেষ খুশী হলেন না। সনৎ বাড়ী ফিরে মায়ের কাছে খবর শুনে বিরক্তই হয়ে গেল। বলল "মা তোমার" কি খেয়ে কর্মে কাজ নেই? কাদের সুন্দর মেয়ে আছে ত তোমার কি? আর সুন্দর হলেই কি সব হ'ল? বৌ কি ঘর সাজাবার আসবাব নাকি? দেখতে ভাল হলেই চলবে, আর কিছু জানবার নেই?"

মা বললেন "আমি কি তাই বলছি? চোখের দেখাটা চট্ করে দেখা যায়, তাই দেখতে বলছি। অন্য সব খবর ত নেবই। পড়াশুনোয় ভাল তা ত জেনেছি, ভদ্র ভাল বংশের মেয়ে তাও শুনলাম, আর আর যা জানবার আছে জানব। তুই বন্ধু বান্ধব কাউকে সঙ্গে নিবি ত বলে রাখ।"

সনৎ বলল "ও সব দরকার নেই। বিয়ে আমি করব, আমি দেখলেই ঢের হবে, বড়জোর বাবা যাবেন সঙ্গে। তুমি কিন্তু বাবাকে বলে রাখবে যে মেয়ের সঙ্গে আমিও কথা বলতে পারি। আমারও ত কিছু জিজ্ঞাস্য থাকতে পারে।"

সুলোচনা বললেন "আচ্ছা বাপু আচ্ছা। সব বলে রাখব, এখন তাদের বাড়ীর লোক ব্যাজার না হয়। সব বাড়ীতে ত আবার এসব পছন্দ করে না।"

"অত গেঁয়ো হলে আমি সেখানে বিয়ে করব কিনা? বি, এ পাশ অত বড় মেয়ে একটা কথার জবাব দিতে পারবে না? তোমার বৃথা ভয় মা। কলকাতার আধুনিকাদের তুমি চেন না। আমি এক কথা বললে সে দশ কথা শুনিয়ে না দেয়।"

সুলোচনা গালে হাত দিয়ে বললেন "ওমা, সেকি? এ রকম বেহায়া হয় নাকি ভদ্রঘরের মেয়ে?"

"ওটা বেহায়ামি হল কোন কারণে? মানুষ কি কাঠের পুতুল যে কথার উত্তরও দিতে পারে না? যাই হোক সে ভাবনা পরে ভাবা যাবে। কাল আমি ভোরেই একটু বেরোব, কাজ আছে। বাবাকে বলে রেখো কাল যদি ঘটক সত্যিই আসে, ত তার সঙ্গে বেশী কথা যেন না বলেন। রবিবারে আমরা মেয়ে দেখতে যাব, এইটুকু বলে দিলেই হবে। আর গুচ্চের লোকজন ডেকে মহা হৈ হল্লা তাঁরা যেন না করেন। আমরাও দুজনের বেশী যাব না।"

সুলোচনা একটু হতাশ হয়ে বললেন "সব দিকেই কি তোমার নূতনত্ব কলান চাই? এসব সময় ত আত্মীয় স্বজনকে ডেকে আমোদ-আহ্লাদ সবাই করে। যাই হোক যেমন বলছ তেমনই আমি সোনাদিকে বলে দেব, তিনি মেয়েদের বাড়ী জানিয়ে দেবেন। তুমি বিয়ে করলেই বাঁচি আমি এখন। আমোদ-আনন্দ করবে কি ডাক ছেড়ে কান্না জুড়বে, সে তোমরাই বুঝ এখন।"

প্রতিমাও বিশেষ খুশী হলনা ব্যাপার শুনে। বলল

"আবার ত সেই সং সেজে একপাল লোকের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে? কি বিদকুটে নিয়ম বাবা! আমি কি মানুষ না গরু ঘোড়া? ওরা কি আমায় কিনতে আসছে?"

তার মা বললেন "তার আর এখন কি করা যাবে বাপু? যেমন যে দেশের নিয়ম। আমরা ত আর সাহেব নই যে স্বয়ংবর করে বিয়ে দেব? কেন, তোর দিদি ত কোনো আপত্তি করেনি? তারও ত বড় বয়সে বিয়ে হয়েছে, বি, এ, পাসও সে করেছিল।"

প্রতিমা বলল "তার যা ভাল লাগবে আমারও তাই ভাল লাগতে হবে?"

ঘটকমশায় সনৎদের বাড়ী গিয়ে পরদিন খুব যে একটা সাদর অভ্যর্থনা পেলেন তা নয়। তবে ফিরিয়েও তাঁকে কেউ দিল না। অনেক ভাল ভাল কথা তিনি রিহার্সাল দিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেগুলো প্রয়োগ করতে না পেরে একটু ক্ষুব্ধ হলেন। প্রতিমার একখানা সদ্য তোলা ছবি নিয়ে এসেছিলেন সেটা কর্তার হাতে দিয়ে চলে গেলেন।

কর্তা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছবিখানা দেখতে লাগলেন। ভারি চমৎকার দেখতে ত! ছবিটা নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর হাতে দিয়ে বল্লেন "এই নাও গো ভাবী বৌয়ের ছবি। দেখতে খাসা, বেটার মুণ্ডু ঘুরে গেলেও যেতে পারে।"

সুলোচনা বললেন "সত্যি ভারি মিষ্টি দেখতে। অত যে পাস টাস করেছে তা কে বল্‌বে? কেমন নরম সরম চেহারা, এমন না হলে কি মানায়?"

কর্তা বললেন, "তোমার বুঝি ধারণা পাস করলেই তাড়কা রাক্ষুসীর মত দেখতে হয়ে যায়, আর হ্যাবা গঙ্গারাম হয়ে ঘরে বসে থাকলেই পরমাসুন্দরী হয়?"

সুলোচনা চটে বললেন "ঐ হ্যাবা গঙ্গারাম দেখেই ত গড়াতে গড়াতে এসেছিলে।"

কর্তা বললেন, "আরে রাম! হ্যাবাগঙ্গারাম আবার কোন্ খানে? রীতিমত Royal Reader Part II পড়ে ফেলেছিলে তখন।"

মুরারী এসে এই সময় বাজারের পয়সা চাওয়াতে সুলোচনাকে উঠে যেতে হল।

সকালে লম্বা এক পাক ঘুরে আসা সনতের নিয়ম। সে আসতেই সুলোচনা প্রতিমার ছবিখানা নিয়ে ছুটে এলেন, "ওরে দ্যাখ্। ওরা মেয়েটির ছবি দিয়ে গেছে। কি চমৎকার দেখতে!"

মনে মনে খানিকটা উৎসাহ বোধ করলেও চেষ্টা করে মুখের ভাবে খানিকটা উদাসীনতা এনে ছেলে বলল "দাও দেখি, না দেখিয়ে যখন ছাড়বে না।" ছবিখানা নিয়ে সে ধীরে সুস্থে দেখতে লাগল। আশান্বিতা হয়ে সুলোচনা জিজ্ঞাসা করলেন "খুব সুন্দর না?" সনৎ বল্‌ল "ছবিখানা সুন্দর বটে, তবে মেয়ের নিজের গুণ কি ফোটোগ্রাফারের গুণ তা কি করে বলব?"

সুলোচনা বললেন "যাঃ, তা কেন হতে যাবে? সেজদিরা হরদম দেখছে, তারা তাহলে এই ছবি পাঠাতে দিত নাকি? এই সব ছুতো চলবেনা বাপু। বলা হয়েছে রবিবারে মেয়ে দেখতে যাওয়া হবে, তা যেতেই হবে।"

সনৎ বলল "আমি কি বলছি যাব না?"

রবিবারে বিকালে বাবা আর ছেলে ত তৈরী হল কনে দেখতে যাবার জন্য। প্রতিমাদের বাড়ীর লোকেরাও প্রস্তুত। তবে কাউকে ডাকা যাবেনা, হৈ হল্লা কিছুই করা যাবেনা শুনে বাড়ীর অল্প ছেলেমেয়েরা একেবারেই মুষড়ে গেল। এ রাম, এ আবার কোন দেশী মেয়ে দেখা? প্রতিমার দিদি প্রতিভা বল্‌ল, "তোলো হাঁড়ি মুখ করে বসে আছিস্ কেন? গা ধুবি না, চুল বাঁধবি না? প্রতিমার মুখের ভাব কিছু বদলাল না। বলল "আমার কিছু করতে ইচ্ছা করছে না।

"তা কি এইরকম পেত্নী সেজে যাবি নাকি? যে কেউ বাড়ীতে এলেই ত মানুষ একটু সাফসুতরো হয়, ভুত সাজে আর কে?" দিদির সঙ্গে ঝগড়া করার ইচ্ছাটা প্রতিমার ছিলনা। সে গা ধুয়ে এল, চুলও বাঁধল। তবে সাজ সজ্জা নিয়ে আবার দিদির সঙ্গে খানিক খিটিমিটি করে মাঝামাঝি একটা রফায় উপনীত হল। মাকে বল্‌ল "আমি বাপু জলখাবার পান এ সব কিছু নিয়ে যেতে পারবনা, ওসব তুমি অন্য লোক দিয়ে পাঠিও। আমি শুধু একবার গিয়ে দেখা দিয়ে আসব।"

মা বললেন "যা খুশি কর বাপু। তবে কথাবার্তা যা

জিজ্ঞাসাপাতি করবে তার জবাবটা দিও। মনে না করে যে এ মেয়ের শিক্ষা সহবৎ কিছু হয়নি।"

প্রতিমা বলল "আহা, তাও যেন আমায় শিখিয়ে দিতে হবে। কিছু জানতে চাইলে আমি ঠিকই জানিয়ে দেব।"

মা বললেন "বেশী বেশী ডেঁপোমী করিসনা যেন। সাদাসিদে ভাবে কথার উত্তর দিবি।"

যথাকালে পাত্র ও পাত্রের বাবা এসে উপস্থিত হলেন। প্রতিমার বাবা সাদরে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করে এনে বসালেন এবং কথাবার্ত্তা কইতে লাগলেন। সনৎকে দেখে তিনি খুশীই হয়েছেন বোঝা গেল। কিছুক্ষণ পরে বাড়ীর একটি ছোট মেয়ে ও একজন চাকর মিলে জলখাবার আর চা নিয়ে এল। অতিথিরা তখন খাওয়ার দিকে মন দিলেন। খাওয়াটা বেশ ভালই হল, তখন গৃহস্বামী বললেন "দিদিমণিকে একবার এ ঘরে আসতে বল্।"

অনতি বিলম্বে প্রতিমা এসে উপস্থিত হল। সনতের বাবাকে প্রণাম করল, সনতের দিকে ফিরে একটা নমস্কার করল। সনতের বাবা মহা উৎসাহে প্রতিমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, বললেন "মা লক্ষীর সব পরিচয়ই আগে পেয়েছি, চোখে না দেখলেও ছবি দেখেছি। তবু আমাদের দেশের নিয়ম একবার দেখতে আসা তাই এলাম। "প্রতিমার বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন" আপনার মত সজ্জনের সঙ্গে আলাপ হয়ে খুব খুশী হলাম। মেয়ের নামধাম গুণাবলি সবই জানা, জিজ্ঞাসা করে জানবার আর কিছু বাকি নেই।"

সনৎ এতক্ষণ প্রতিমাকে বেশ ভাল করে দেখে নিচ্ছিল, অবশ্য ভদ্রতা বাঁচিয়ে যতটা দেখা যায়। মেয়েটি দেখতে সত্যই খুব ভাল, একে বিয়ে করবার সম্ভাবনা মনে মনে এলে একটুখানি পুলকের সঞ্চার মনে না হয়েই পারে না। কিন্তু সনৎ ত মনকে চোখ রাঙিয়ে বসে আছে আগের থেকে যে বঙ্কিমবাবুর বাণীকে সে ব্যর্থ প্রতিপন্ন করবে। "সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্র," এটা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ঠিক হলেও দু চারটে ব্যতিক্রমও ত থাকতে পারে?

নিজের বাবার অবস্থা দেখে ও কথা শুনে ত সে চটেই গেল। ভাল লেগেছে, লেগেছে। তা বলে এত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠার কি দরকার? মেয়েটার মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছে বেশ নাক তোলা হবে। এই রকম কথাবার্ত্তা শুনলে আরো ফুলে উঠবে। সনৎ হঠাৎ প্রতিমার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল "বি,এ তে আপনার কি কি subject ছিল? অনার্স ছিল নাকি?"

প্রতিমা তার দিকে ফিরে বলল "ইংলিশে অনার্স ছিল।

হিষ্ট্রী আর সংস্কৃত ছিল তা ছাড়া!"

সনৎ বলল" এম, এ পড়বেন না?

প্রতিমার গলার স্বরটা সামান্য একটু তীক্ষ্ন হল, বল্ল "ইচ্ছা ত আছে।"

সনৎ বলল "তা হলে apply করেন নি এখনও?"

প্রতিমা সংক্ষেপে বল্ল "না।"

সনৎ বল্ল "Apply না করলে সময়মত, জায়গা ত সব সময় পাওয়া যায় না। Apply করেননি কেন?

প্রতিমা বলল "M. A. পড়বই যে তা ত একেবারে স্থির হয়নি, তাই করিনি।"

"আপনি ত মন স্থির করেছিলেন, বললেন?"

"আমি প্রায় করেই ছিলাম তবে আমার অভিভাবকরা করেননি।"

এবার একটা যেন দাঁও পেলে সনৎ, বল্লে "নিজে যা ভাল বুঝবেন, সেই মতো চলবেন, এটা তাহলে আপনার মত নয়?"

প্রতিমা একবার স্থিরদৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে জবাব দিল" সব সময়ে নয়। আমার যেমন মত দরকার তেমনি ওঁদেরও মত দরকার।"

"আপনি এ সব দিকে বেশ রক্ষণশীল দেখছি।" প্রতিমা বলল "তা হতে পারে। যতদিন মা বাবার ঘরে আছি এবং তাঁদের দ্বারা প্রতিপালিত হচ্ছি, ততদিন তাঁদের মত না নিয়ে আমি কিছু করতে চাই না।"

উভয় পক্ষের পিতারা এতক্ষণ হাঁ করে এই অভিনব আলাপ শুনছিলেন। হঠাৎ সনতের বাবা বলে উঠলেন, "আজ আমরা তবে উঠি দেখুন। বাড়ীতে ওঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে আপনাকে সমস্ত জানাব। আপনি অনুগ্রহ

ক'রে সকালে একটা লোক পাঠিয়ে দেবেন, তার হাতে চিঠি দিয়ে দেব। বলেই উঠে পড়লেন। সনৎকেও অগত্যা উঠে পড়তে হল এবং প্রতিমা উঠে ভিতরে চলে গেল।

ট্যাক্সিতে উঠে বসে সনতের বাবা বললেন "এটা আবার কি ধরনের ব্যবহার হল? তোমরা খুবই আধুনিক বটে কিন্তু আধুনিক ভদ্রতা কি মেয়ে দেখতে গিয়ে debating club খুলে বসার অনুমোদন করে?"

সনৎ গোঁজ মুখ করে বলল "আমি ত আগেই বলেছিলাম যে আমি মেয়ের সঙ্গে কথা বলব।"

তার বাবা বললেন "কথা বলা এক আর তর্ক করা এক। তোমাকে ওরা নিশ্চয়ই খুব অভদ্র ভেবেছে।"

সনৎ বলল "তা ভাবলে আর কি করব? বেশী জড়-পুঁটলি মেয়ে আবার আমার মোটে ভাল লাগে না।"

"তোমাদের সব বিচিত্র পছন্দ। ঘরের লক্ষ্মীরা সব শান্ত হয়ে ঘরে থাকবেন এই ত লোকে চায়। তা না, তোমাদের দরকার সব বাঁধন ছেঁড়া গরু, যাঁদের পিছনে সারাক্ষণ পাঁচনবাড়ী নিয়ে ছুটে বেড়াতে হবে।" সনৎ এর উত্তরে কিছু বলল না।

বাড়ীতে নেমেই কর্ত্তা অপেক্ষমানা স্ত্রীকে বললেন, "এই নাও গো, তোমার গুণের ছেলে ফিরিয়ে নিয়ে এলাম। অমন চমৎকার মেয়ে ওঁর পছন্দ হল না।"

সুলোচনা একেবারে "হায় হায়" করে উঠলেন। ছেলের দিকে তাকিয়ে ঝাঁঝাল গলায় বললেন" তুই ভেবেছিস্ কিরে? আট শ টাকার চাকরি করিস বলে সাপের পাঁচ পা দেখেছিস? অমন মেয়ে অপছন্দ করে এলি? অমন বৌ তোমাদের চোদ্দ পুরুষের ঘরে কোনোদিন এসেছে?"

সনৎ চারদিকের নিন্দার আবহাওয়ায় আরো যেন বিগড়ে গেল।" বলল "অপছন্দ করেছি কখন বললাম? আমি ওর মতামতগুলো জেনে নিচ্ছিলাম, তাতে দোষ হয়েছে কি? আমাকেই ত চিরজীবন ঘর করতে হবে?"

তার বাবা বললেন "আর করেছ ঘর? তোমাকে আর ওরা মেয়ে দিচ্ছে আর কি? যা ভদ্রতা দেখিয়ে এলে। ভদ্রলোকের মুখ যদি দেখতে। মেয়েটিও উঠে হনহনিয়ে ভিতরে চলে গেল। আমি বাপু আর তোমার সাতে পাঁচে নেই। তোমার খুশি হলে বিয়ে কোরো না হয় কোরোনা। আমি ওঁদের চিঠি লিখে জানিয়ে দিচ্ছি, এখন বিয়েতে ছেলের মত হল না। কিছুকাল পরে আবার খবরাখবর নেওয়া যাবে।"

গৃহিণী সেইখানেই ধপ্ করে বসে পড়ে বললেন "দেখ দেখি কি গেরো গো। এখন সোনাদিকে আমি কি বলি? চল বাপু আমরা নিজেদের জায়গায় ফিরে যাই। এই ছেলের থেকে আমাদের কোনো উপকার হবে না। বংশটা লোপই পেয়ে যাবে। ও হতভাগা বিলেতে গিয়ে মেমসাহেব বিয়ে করুক।"

তাড়াতাড়ি স্নানাহার সেরে সনৎ ত অফিস্ চলে গেল। একটু পরে সুলোচনাকে মুরারী এসে খবর দিল "মা দাদাবাবু বলে গেল যাবার সময় যে তার ফিরতে দেরি হবে। তোমরা চা টা খেয়ে নিও।"

সুলোচনা বললেন 'তা নেব খেয়ে, আর এক দিনের মামলা ত? কালকের দুপুরের ট্রেনে ত আমরা চলেই যাচ্ছি।"

এ হেন অপ্রত্যাশিত সুসংবাদে মুরারীর প্রায় নেচে উঠবার অবস্থা হল। কোনোমতে নিজেকে সম্বরণ করে বলল "এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে মা? দাদাবাবুর বিয়ে তবে এখন হলনা?"

সুলোচনা বললেন "কই আর হচ্ছে।" এই বলেই তিনি আর দাঁড়ালেন না।

রাত্রে খেতে বসে সনৎ মা বা বাবা কাউকেই দেখতে পেলনা। মুরারীকে জিজ্ঞাসা করল, "মা বাবা শুয়ে পড়েছেন নাকি?" মুরারী বলল "কাল সারাদিন রেল-গাড়ীর ধকল যাবে ত তাই আজ সকাল সকাল শুয়েছেন।"

সনৎ ভ্রুকুটি করে বলল "কালই যাচ্ছেন তা হলে?"

মুরারী বলল "তাইত বললেন।"

সকালে প্রতিমাদের বাড়ী থেকে কেউ এলনা। বাড়ীর একমাত্র চাকরটা রাত্রে কি সব চুরি করে

জেগেছে। এই গণ্ডগোলে প্রতিমার বাবা তখনই লোক পাঠাতে পারলেন না। এদিকে সুলোচনারা ধরে নিলেন লোক না পাঠান মানে মেয়ের বাবা এ বিষয়ে আর অগ্রসর হতে চান না। তাঁরা পরদিন সত্যই যাত্রা করলেন। যাবার আগে সুলোচনা সোনাদিকে মস্ত একটা চিঠি লিখে পাঠালেন, অনেক দুঃখের কাহিনী গেয়ে। তাঁর স্বামীও একটা সংক্ষিপ্ত চিঠি লিখলেন প্রতিমার বাবার কাছে। তাঁর বক্তব্য যে ছেলে ঠিক এখনই বিয়ে করতে রাজী নয়। কন্যা পড়াশুনো চালিয়ে যান, কিছুকাল পরে আবার যোগাযোগ করা যাবে।

চিঠি শেষ করে নিজেই বললেন, "ওরা আর করেছে যোগাযোগ। কি যে গাধা ছেলে।"

সুলোচনা বললেন "আহা এমন মেয়েটা হাতছাড়া হয়ে গেল, এ দুঃখ আমার মরলেও যাবে না।"

যাই হোক যাবার আগে আর ছেলের সঙ্গে এ বিষয়ে কোনো কথা হলনা। ছেলেও অভিমানভরে চুপ করে রইল। বাবা মা একেবারে তার দিকটা দেখলেন না, এটাই কি তাঁদের উচিত হল?

তাঁরা ত যা হয় করেছেন কিন্তু সে নিজেই কি ঠিক কাজ করল? আগেভাগেই মেয়েটিকে ও রকম খোঁচা দিয়ে কথা বলার কি দরকার ছিল? প্রথমে ভাবসাব করে নিয়ে ক্রমে ক্রমে বলা যেত। যোগাড়যন্ত্র করে তাকে এম-এ ক্লাশে ভর্তিও করে দেওয়া যেত। চেনা-লোকও অজস্র আছে তার ও সব বিভাগে? মেয়েটি সত্যই বড় সুন্দর দেখতে। একটু যে বিরক্ত হয়েছিল, তাতে যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছিল। জড়পুঁটলি সে একেবারেই নয়। বেশ সুস্পষ্ট মতামত আছে তার সব বিষয়েই। বন্ধুরা শুনলে ত তাকে দশমুখে "দুয়ো" দেবে, কাজেই কাউকে বিশেষ বলতেও পারল না। বাবা মাও দেশে পৌঁছে গিয়ে একখানা অতি সংক্ষিপ্ত পোষ্টকার্ড পত্র ছাড়া আর কিছু পাঠালেন না।' সনতের দিনগুলো অতি ছন্নছাড়া ও লক্ষ্যহীন ভাবে কাটতে লাগল। একটি মানবীর মুখ যে মানুষের জীবনে এতটা গোলমাল বাধাতে পারে তা আগে হলে সনৎ বিশ্বাস করত না।

মাসখানেক ত এইরকম ভাবে কেটে গেল। হঠাৎ একদিন সনতের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটল। সে মুরারীকে বলল "দেখ আজ অফিস্ নেই, আমি সোনামাসীর বাড়ী বেড়াতে চললাম, বিকেলে আমার জন্যে চা করিস না, একেবারে রাত্রে এসে খাব"।

মুরারী সানন্দে বলল "আচ্ছা দাদাবাবু, ঠিক আছে"। সোনামাসীর বাড়ী অনেকদিন যাওয়া হয়নি। গেলেই খানিকটা কথা শুনতে হবে অবশ্য। তা আর কি করা যাবে, মানুষের মুখ না দেখে ত আর থাকা যায়না? মা বাবার খবরও কিছু পাওয়া যাবে, কারণ মা অবশ্যই সোনামাসীকে চিঠিপত্র লিখছেন, সেটা না করেই তিনি পারেন না।

সোনামাসীর বাড়ীটা কিছু দূরে। পৌঁছতে পৌঁছতে বেলা পড়ে এল। সোনামাসী তাকে দেখেই বললেন, "কিগো কলির শুকদেব, কেমন আছ? ঘর সংসার ত করলেই না, এখন কি আত্মীয় স্বজনেরও মুখ দেখবেনা বলে ঠিক করেছ"?

সনৎ একটু অপ্রস্তুতভাবে বলল "সেরকম কিছুই ঠিক করিনি। সময় পাইনা, অফিসের কাজের চাপ বড় বেড়ে গিয়েছে। তোমরাও ত খোঁজ নিতে পার? একলা মানুষটা রয়েছি, অসুখবিসুখও ত করতে পারে? সোনামাসী একটু লজ্জা পেয়ে বললেন "এই আজ সকালেই হাবুকে বলছিলাম একবার গিয়ে তোমার খবর নিয়ে আসতে। কাল তোমার মায়ের চিঠি পেলাম একখানা। ব্যস্ত হয়েছে তোমার খবরের জন্তে অথচ কিসব ঝগড়াঝাঁটি করেছ তোমরা, তোমার কাছে চিঠিও লিখবেনা। তা হাবু কি আর যায় এখন, হেনারা এসেছে অনেকদিন পরে, বোন ভগ্নীপতির সঙ্গে আড্ডা দিতেই ব্যস্ত'।

সনৎ বলল, "হেনা এসেছে নাকি? কই দেখছিনা ত"?

সোনামাসী বললেন "এবারে এসে তার ভাসুরের বাড়ী উঠেছে। আজ বুঝি তাদের কোথায় নেমন্তন্ন আছে তাই খুকিটাকে আমার এখানে পাঠিয়ে দিয়েছে।

বড় দস্যি মেয়ে রাখা শক্ত। আমাকে চেনেও না ত তত? এরি মধ্যে দু চার বার "মা মা" করেছে। বেশী চেঁচালে মুস্কিলে পড়ব।

এই সময় একটি বছর দুইয়ের বাচ্চামেয়ে কোলে করে একজন ঝি বাড়ীতে ঢুকল। খুকীর মুখ চোখ লাল,গাল দিয়ে জল গড়াচ্ছে। সোনামাসীকে দেখেই সে সড়াৎ করে ঝির কোল থেকে নেমে পড়ে তাঁর কাছে ছুটে এল। মুঠো করে তাঁর শাড়ী চেপে ধরে বলল "মা যাব"।

সোনামাসী বললেন "এই রে সেরেছে। সন্ধ্যের মুখে এখন 'মা যাব' সুরু করলে মায়ের কোলে না উঠলে আর থামবেনা। হেনা এতক্ষণে নিশ্চয় ফিরেছে কিন্তু এইটুকু মেয়ে আমি পাঠাব কার সঙ্গে? ওদের যা কাণ্ড! হয়ত একেবারে রাত দশটায় নিতে আসবে"। খুকীর স্বর তীব্রতর হল, 'মা যাব'! সোনামাসীর বিপন্ন মুখের দিকে তাকিয়ে সনৎ জিজ্ঞাসা করল, "হেনার ভাসুর থাকেন কোথায়"?

"এই ত তোদের পাড়াতেই।—নং বাড়ীতে, তোদের পরের রাস্তায়। নিয়ে যাবি বাবা ট্যাক্সি করে? আর ত বাড়ীতে এখন কেউ নেই যে পৌঁছে দেবে। ও বেশী চেঁচালে আমার রক্তের প্রেশার বেড়ে যাবে। আজকাল খুব সাবধানে থাকতে হয় আমাকে";

নিরুপায় হয়ে সনৎ বলল "তাই দাও না হয়, যেরকম চেঁচাচ্ছে মেয়ে. এরপর দমবন্ধ হয়ে যাবে; তুমিও বিছানা নেবে"।

বাড়ীর চাকর দৌড়ে গিয়ে একটা ট্যাক্সি ডেকে নিয়ে এল। সোনামাসী খুকীকে সনতের কোলে তুলে দিয়ে বললেন "যাও ত লক্ষ্মীখুকু, মামার সঙ্গে যাও। ও নিয়ে যাবে তোমাকে মায়ের কাছে"।

খুকী আপ্যায়িত মুখ করে বলল 'মা যাব'। সনৎ তাকে কোলে নিয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে বসল।

কিন্তু সেদিন শুভলগ্নে যাত্রা করেনি সনৎ। মাইল-খানিক যেতে না যেতেই দুম্ করে একটা শব্দ হল, একটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে গাড়ীটা দাঁড়িয়ে গেল।

চালক নেমে পড়ে গাড়ী পরীক্ষা করতে গেল। [illegible] গাড়ীর দরজাটা খুলে বলল 'নেমে পড়তে হবে স্যার। পিছনের টায়ারটা একেবারে গেছে। এ গাড়ী আবার চালু হতে এখন দু ঘণ্টা"।

অগত্যা নেমে পড়ে ভাড়া চুকিয়ে দিতে হল। গোটাকয়েক কুলী যেন মন্ত্রবলে সেখানে এসে হাজির হল এবং গাড়ীটাকে ঠেলে নিয়ে চলল। খুকী গগনভেদী আর্তনাদ করে উঠল 'মা যাব,' গাড়ী যাব"।

সনৎ ব্যস্ত হয়ে বলল 'যাবই ত, এখনি নূতন গাড়ী আসবে'।

কে শোনে কার কথা? খুকীর কণ্ঠস্বর আরো এক গ্রাম উঁচুতে উঠল "মা যাব ."

পাশ দিয়ে যেতে যেতে এক ভদ্রলোক বললেন "হল কি মশায়? মেয়ে নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়েছেন দেখছি।"

সনৎ বলল "ট্যাক্সিটা মাঝ পথে টায়ার ফাটিয়ে ত বিপদে ফেলল।"

ভদ্রলোক বললেন "আপনার মেয়ে?"

সনৎ বলল "আমার নয়, এক আত্মীয়ের মেয়ে"।

কলকাতার রাস্তায় ভীড় জমে যেতে দুমিনিটের বেশী সময় লাগেনা। এরই মধ্যে চোঙ্গা পাৎলুন ও বুশশার্ট পরা গোটাকয়েক ছেলে এসে দাঁড়িয়ে গেছে। একজন বলল "কেমন যেন fishy লাগছে রে। বাচ্চাটা ত ওকে চেনে বলে মনে হচ্ছেনা?

আর একজন বলল "নিয়ে পালাচ্ছে নাকি কে জানে? শুনতে পেয়ে সনতের ত চোখ কপালে উঠবার জোগাড়। সে বলল "মশায়রা অকারণ আমাকে harass করছেন কেন? আমি ভদ্রলোকের ছেলে, কাউকে নিয়ে পালাবার আমার প্রয়োজন নেই। দরকার বোধ করেন ত আমাকে পুলিশে দিতে পারেন, ভাল হয় সব চেয়ে যদি একটা ট্যাক্সি ডেকে দেন এবং আমার সঙ্গে যান দু একজন। তাই হলেই বুঝবেন আমি মেয়ে নিয়ে পালাচ্ছি কিনা"।

পিছন থেকে একটা ছেলে বলল "ইঃ শালা হুকুম করছে দেখ। আমাদের কি বাপের দরোয়ান পেয়েছে নাকি"?

"দে না দুঘা লাগিয়ে"।

"Suit এর বাহার দেখনা। সব শালা চোর বদমাস আজকাল ভাল ভাল বরকৎআলির বাড়ির স্যুট্ পরতে সুরু করেছে।

"মেয়েটা ফুটফুটে সুন্দর দেখছিস না, লোভ সামলাতে পারেনি ব্যাটা"।

এ হেন নাটকীয় পরিস্থিতিতে সনৎ সম্পূর্ণ কিং-কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে গেল। কি করবে সে এখন। নিজের ত সমূহ বিপদ, বাচ্চাটাও না এই ভিড়ের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে যায়। চেঁচিয়ে ত গলা ফাটিয়ে ফেলছে।

এমন সময় এই নরকের মধ্যে কোথা থেকে যেন একটা অদৃশ্য স্বর্ণবীণা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল। মধুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কে অদূরে বলে উঠল "একি সনৎদা, কি কাণ্ড! কি হয়েছে? এরা সব এমন চীৎকার চেঁচামেচি করছে কেন?"

প্রতিমা! এখানে কোথা থেকে এল? হঠাৎ দাদা পাতিয়ে ফেলল কেন? কিন্তু কেন যে তাত বোঝাই যচ্ছে। তাকে বাঁচাতে চায়। সনৎকেও এখন তার সঙ্গে সমানে অভিনয় করতে হবে। বলল "কি জানি ভাই এঁদের কি মতলব। এঁরা suggest করছেন যে আমি হেনার মেয়ে নিয়ে পালাচ্ছি"।

প্রতিমা বলল "দেশ আমাদের এখন Don Quixote এ ভর্তি। সবাই Windmill এর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। না মশায়রা, ইনি ছেলেধরা নন, নিজের ভাগ্নী নিয়ে বাড়ী পৌঁছে দিতে যাচ্ছেন। একজন একটু দয়া করে একটা ট্যাক্সি ডেকে দেবেন? বাচ্চাটা যে চেঁচিয়ে মারা যাবার যোগাড় হল। এস ত খুকু, মাসীর কোলে এস, আমরা সবাই মা যাব। গাড়ী এল বলে"।

খুকীর একটু ভাবান্তর দেখা গেল। প্রতিমার সামনে দুহাত তুলে বলল "কোলে"। প্রতিমা তাকে তাড়াতাড়ি কোলে তুলে নিল।

পিছনের যুবকরা তখন সুর পালটেছে। একজন বলল "এ বেটিও ছেলেধরা কিনা জানিনা, তবে বেড়ে দেখতে মাইরি"। আর একজন বলল "ও যে ছেলেকে ধরবে সে ত বর্তে যাবেরে"। তৃতীয় এক ছোকরা বলল "দূর, ছেলেধরা হতে যাবে কেন? ও ত চেনা মেয়ে, ডাকসাইটে মেয়ে, আমাদের পাড়ার কাছেই ওদের বাড়ী। পথে ঘাটে কত দেখেছি ওকে"।

ওদের মধ্যে সর্দার গোছের একজন বলল "ধাঃ শালা, একটা ট্যাক্সি ডেকে দে। দেখছিসনা অতবড় ধুমসী খুকিটাকে নিয়ে হাঁপিয়ে পড়েছে"।

ভোঁ করে একজন ছুটে চলে গেল এবং অবিলম্বে ট্যাক্সিও এসে গেল। প্রতিমা খুকীকে কোলে নিয়ে উঠে বসল গাড়ীতে।

হতবুদ্ধি সনৎ এতক্ষন পরে কথা বলল। ঘেরাওকারী যুবকদের দিকে তাকিয়ে বলল "আপনারা কেউ আমাদের সঙ্গে আসতে চান ত আসুন। বাড়ী দেখে যেতে পারবেন"।

কেউ তার ডাকে সাড়া দিলনা। দেখতে দেখতে ভীড় পাতলা হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। ট্যাক্সি চলতে আরম্ভ করল।

সনৎ বলল "আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে, অজস্র ধন্যবাদও দিতে হবে। কোনটা আগে করব বুঝতে পারছিনা"।

প্রতিমা বলল "একটাও করতে হবেনা। বাঙালী মানুষে অত কথায় কথায় ধন্যবাদ দেয়না, ক্ষমাও চায়না। আর ক্ষমা চাওয়ার হয়েইছে বা কি"?

সনৎ বলল "সেদিন আপনাদের বাড়ী গিয়ে বড় অভদ্রতা করেছিলাম"।

প্রতিমা বলল "অভদ্রতা আবার কি? আপনার মত আপনি বললেন, আমার মত আমি বললাম"।

সনৎ বলল "কিন্তু বাবা মা ত রাগ করে তারপর দিন দেশে চলে গেলেন, বললেন আমার কোনো কথায় আর থাকবেন না"।

প্রতিমা বলল "ওমা তাই বুঝি"।

সনৎ বলল "তাঁদের কি ফিরে আসতে লিখব? বলব যে মতের অমিল আর আমাদের নেই? আপনি অভয় দেন ত লিখতে পারি"।

প্রতিমা একটু হেসে বলল "তা লেখা যেতে পারে বোধ হয়"।

গ্রাম বাংলার পাঁচালি

মৃণালকান্তি দত্ত

এক্ষুণি একটা ওমলেট খেলাম, খেয়েই লিখতে বসেছি। দুঘণ্টা আগে নাজমাকে আবিস্কার করেছি পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের হারিয়ে যাওয়া নাজমা। পানিহাটি বাজারে নাজমার স্টলে দুগণ্ডা আণ্ডা কিনেছি আজ সকালে। পরে দুটো ডিম আমার বাজারের থলের তুলে দিয়ে নাজমা বলেছে ওদুটো আমার বিবির জন্য উপহার। স্ত্রীকে একথা বলিনি, এখনও।

সাগরদীঘি রেলষ্টেশন থেকে মেঠো পথে আড়াই ক্রোশ দূরে আমার গ্রাম। বোর্ডের রাস্তা ধরে গেলে তিন ক্রোশেই দাঁড়াবে। শনিবার বিকেল চারটে নাগাদ ট্রেন থেকে নামতাম, স্কুল-হোস্টেল থেকে মায়ের কাছে যেতাম। যদিও মা হারিয়ে থাকতেন বিরাট যৌথপরিবারের হাঁড়ি—কড়াই—চালডাল—আলুপটলের মাঝিয়ে, তবুও প্রায় প্রতিসপ্তাহেই যেতাম। শীতকালে হাঁটতে হাঁটতে রাত হয়ে যেত। একলা অন্ধকার মাঠের পথে ভয় পেলে চেঁচিয়ে গান গাইতাম, নজরুলের কি রবিবাবুর বিশেষ কয়েকটা গান। ভয় ভাঙত।

এক বোশেখের বিকাল বেলা ইস্কুলের-শেষ কেলাসে-পড়া চতুর্দ্দশবর্ষীয় এই আমি ষ্টেশনে নেমে হাঁটাপথে পাড়ি মারছি। ঠ্যাঙাড়ের মাঠ পার হয়ে অমৃতকুণ্ড—বর্দ্ধিষ্ণু মুসলমান প্রধান গ্রাম। কালবৈশাখী ভেঙে পড়ার আগেই পড়ি কি মরি করে আনোয়ারদের বাহির বাড়িতে উপস্থিত হলাম। বার বাড়িতে শুধু নাজমা বসে পেয়ারা চিবুচ্ছিল আর তালগাছগুলো ঝড়ের দাপটে কতটা নুয়ে পড়ে লক্ষ্য করছিল। আমার বন্ধু আনোয়ারউদ্দিনের বোন নাজমা। বাহির বাড়ির পরে মস্ত উঠান যেখানে ধানের পালা দেওয়া হয়, ধানের দুটো গোলা দুপাশে, একটুদূরে ভিতর বাড়ী, পাশে গোয়াল। এক্রাম চাচার একটা মহিষার এসে আমাদের দেখে গেল, বোধ হয় আমিনা-মাসী মেয়ের সন্ধানে পাঠিয়েছিলেন। একটু পরে সাতভালী বাঁশের পাটির ছাতা মাথায় দিয়ে চাকরটি আমাকে এক গেলাস গরম দুধ দিয়ে গেল। আমিনা-মাসী দুধ ছাড়া এই হিন্দু সন্তানকে কিছুই খেতে দিতেন না। আনোয়ার কিংবা কালু থাকলে তার রসুইঘরের নমুনা নিশ্চয়ই কিছু পাওয়া যেত।

নাজমার তখন বয়স কত? তের কি চৌদ্দ মাত্র কিন্তু তখনই তার সাদী চুকে গিয়েছে। মোড়গ্রামের এক সম্পন্ন ব্যক্তির তৃতীয় পত্নী তখন নাজমা। নাজমা কিছু-তেই, কিছুতেই তার বরের কাছে যাবে না। "দেখে নিও ভিকু ভাই, ওরা আমাকে আটকাতে পারবে না, কিছুতেই না। তার সেই উদ্ধত ভঙ্গিটি এখনও আমার মনে আছে।

নাজমার চেহারাটা ছিল অদ্ভুত ধারালো। টাটকা ডিমের কুসুমের মত রং, চুলগুলোও প্রায় লালচে। বাবার এক-খানা ওমর খৈয়াম ছিল, কার অনুবাদ মনে পড়ছেনা। তাতে মধ্যপ্রাচ্য ললনাদের যে তীক্ষ্ণ ছবিগুলো ছিল, তাদের সঙ্গে নাজমার মিল খুঁজে পেতাম। কৈশোরের ভাঙা-ভাঙা গলায় যখন আবৃত্তি করতাম এইখানে এই তরু-তলে—তোমায় আমায় কুতূহলে-এ জীবনের যেকটা দিন কাটিয়ে যাব প্রিয়ে ইত্যাদি, তখন আমার নাজমার কথাই মনে পড়ত। চৌদ্দ-পনের বছর বয়সে এরকম হয়। অনেকদিন হয়ে গেল আনোয়ার তার সম্পত্তির ভাগ

বিক্রয় করে ভিন্-দেশের নাগরিক হতে চলে গেছে, আর এই কঘণ্টা আগে নাজমার সঙ্গে দেখা হল। এর আগের বার দেখা হয়েছিল সাগরদীঘি ষ্টেশনে। পর্দা-ফেলা গরুর গাড়ীর ছইয়ের ফাঁক দিয়ে নাজমাকে কাঁদতে দেখেছিলাম। একটি দশালই উত্তর-ত্রিশ ভদ্রলোককে এক ঠোঙ্গা মিষ্টি কিনে নিয়ে আসতে দেখেছিলাম। বুঝেছিলাম, নাজমা স্বামীগৃহে যাচ্ছে। অক্ষম আক্রোশে দূরে সরে গিয়েছিলাম। কল্পনা করেছিলাম, পনের বছর যেমনভাবে, মরুভূমির এক বেদুইন সর্দার জোর করে নাজমাকে নিয়ে যেতে চাইছে, আমি নাঙ্গা তলোয়ার ত ঘোড়া টগবগিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নাজমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

কিছুদিন পরেই শুনেছিলাম নাজমা পতিগৃহ ত্যাগ করেছে। একদল বিহারী মুসলমান মিস্ত্রি তার পতিগৃহে একটা নূতন দালান তুলছিল। সুঠাম, সুদেহী, প্রাণবন্ত সর্দার যুবকটির হাত ধরে সে চলে যায়। আজ বুঝেছি নাজমা ঘর বেঁধেছিল—ভালবাসার ঘর, তার নিজের ঘর।

আজ উত্তর-চল্লিশে নাজমার সঙ্গে আবার দেখা হল। একটি ডিমের ও একটি আলুর ষ্টলের মালিকান সে আজ। প্রায় দুবছর আগে ইউনুস সাহেবকে মাটি দিয়েছে। পুত্রকন্তারা টিটাগড়ে নিজের বাড়িতে বাস করে। বড় ছেলেই এমন ব্যবসাপত্র দেখাশোনা করে, কখন কখন নাজমা দোকানে নিজেও আসে। নাজমা অনেক খবর নিল, অনেক খবর দিল। নাজমার একটা কথা মনের মধ্যে বারবার আসছে। "জান, ভিকু-ভাই, আজ আর তোমাকে বলতে কোন লাজ নাই, আমার পুরুষটি না, কতকটা তোমার মত দেখতে ছিল, আর তার চুলগুলো পেছন দিকে কেমন উল্টে যেত, তোমার মত।" ভাবছি কে যেন কবে কি দিতে চেয়েছিল, দেওয়া হয় নি। আমিও হয়ত কিছু চেয়েছিলাম, তবু পাওয়া হয় নি।

চরৈবেতি

কানাইলাল দত্ত

চরৈবেতি মানুষের ধর্ম। বহুবিধ বাধা নিষেধ আচার বিচার ও অভাব অভিযোগের শৃঙ্খলে আজ মানবজীবন শৃঙ্খলিত হলেও তার মনটা এখনও যাযাবর সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারেনি। তাই তো অবকাশ পেলেই আমরা ছুটে চলি সমুদ্রে, শৈলে, বনে, প্রান্তরে বা গঞ্জে তীর্থে। যাদের সে সৌভাগ্য হয় না তারা দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাই। কেউ রেলের সময়সূচিতে ইষ্টিশনের নাম পড়ি, কেউ পড়ি ভ্রমণ সাহিত্য। দিনগত পাপক্ষয়ের জীর্ণ ও পঙ্কিল আবর্তে ক্লিষ্ট মানুষ এ দুটি জিনিসের মধ্যে গভীর সান্ত্বনা পেয়ে থাকে।

অন্ধজনকে ক্ষীর কেমন তা বোঝাতে কৃষক ভাই বলেছিলেন 'সাদা'। 'সাদা' কেমন? এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান 'বকের পালকের মতন', অবশ্যম্ভাবী তৃতীয় প্রশ্ন: "বকের পালক কি রকম"? কৃষক ভাইয়ের হাতে সদ্য পালিশ করা চকচকে সাদা একখানা হেসো ছিল, তিনি সেটা উঁচু করে ধরে বললেন 'এই আমার হাতের হেসোর মত'। অন্ধজন স্পর্শ করে দেখলেন তবে খানিকটা মালুম করতে পারলেন। তিনি হাত বাড়ালেন। হেসোয় তার হাত কেটে গেল। তিনি বেদনাবিদ্ধ কণ্ঠে বল্লেন—ভাই, ক্ষীরে বড় ধার।

ভ্রমণ সাহিত্য আর ক্ষীরে ধার গল্পটির মধ্যে কোথায় যেন অদৃশ্য যোগ আছে। পাহাড়ের বনানীর শান্ত সৌন্দর্য, রূপোগলা নৃত্যপরা গিরি-নির্ঝরিণীর খল খল হাসি, সমুদ্রের কলকল্লোল, তীর্থে তীর্থে ভক্তমানুষের ব্যাকুলতা এ কি বই পড়ে হৃদয়ঙ্গম করা যায়? নানা লেখায় ছবিতে অপরের বোধগম্য করে এ প্রকার করা যায় না।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ বলে আর একটা কথা আছে। এই কলকাতায় আমরা যারা দিনের পর দিন বছরের পর বছর কাটাচ্ছি ক'জন তার এখানকার শিক্ষাকেন্দ্রগুলির খোঁজ রাখি? কলকাতায় লাখো লাখো দর্শনার্থী আসেন। এর কত শতাংশ সিনেমা থিয়েটার, ফুটবল ক্রিকেট, মিছিল ঘেরাও অথবা কালীঘাট দক্ষিণেশ্বরের আহ্বানে আসেন তার একটা হিসাবনিকেশ হওয়া দরকার। একজন ভ্রমণবিশারদ বলেছিলেন কলকাতা থেকে বছরে যত লোক বাইরে বেড়াতে যান তার চেয়ে অনেক বেশি লোক কলকাতায় বেড়াতে আসেন? কি আছে এই জঞ্জালে উপচে পড়া পাষাণপুরীতে? কিসের আকর্ষণে তাঁরা আসেন? সাধারণ মানুষ ঘুম ভেঙেই দেখে কলকাতা কর্মচঞ্চল, যখন সে ঘুমোতে যায় তখনও সে চঞ্চলতা অব্যাহত। নিজেকে কখন যে সেই প্রবহমান চঞ্চল মানুষের স্রোতে মিশিয়ে দেই তা আমরা কেউ জানি না। অতএব কতটুকু জানি এই শহরের? ভ্রমণ কাহিনী পড়তে গিয়ে জীবনের মধ্যাহ্নকালে হঠাৎ এই ভাবনা মাথায় ঢুকলো। চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে নিত্য দেখেও যাকে চিনতে পারিনি—লোকে দুদিন দশদিন ঘুরে গিয়েই তার উপর লম্বা লম্বা বই লিখে ফেলেন, একদিন চিড়িয়াখানা বিড়লা মিউজিয়ম একত্রে দেখে শিক্ষামূলক ভ্রমণ শেষ হয়।

এর চেয়ে টাইম-টেবল ভাল। নিজের মনের কল্পনা মিশিয়ে যা খুশি তাই ভাবা যায়। পূজার অব্যবহিত পূর্বে রেলের সময়সূচী বেরোয়। দু তিনখানা টাইম-টেবল না কিনলে কলকাতা থেকে দিল্লী বা বোম্বাই অথবা মাদ্রাজের সকল স্টেশনের নাম পাবার উপায় নেই। টাইম-টেবল পাঠকের উপর রেলের এটা একটা অত্যাচারই বলে আমি মনে করি। নতুন টাইম-টেবল হাতে দেখলে সহযাত্রীরা একবার দেখতে চাইবেনই। অতএব দমদম ষ্টেশনের ৪নং প্লাটফর্মের নিরিবিলি

শিলাসনটিতে গিয়ে বসলাম। সামনে অনেকগুলি রেল-বর্ত্ম—কোথায় জড়াজড়ি করে কোথায়ও সরল রেখায় প্রসারমান। এরাই নবজীবনের গঙ্গা মন্দাকিনী। এই রেলপথ ছুঁয়ে আছে ভারতবর্ষের সর্বতীর্থভূমি। একে স্পর্শ করলে কন্যাকুমারিকা থেকে পাঠানকোট বোম্বাইয়ের সমুদ্র-সৈকত থেকে আসামের গিরিবর্ত্ম স্পর্শ করা হয়। এই বিচারেই তো একদিন গঙ্গা পতিতপাবনী বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। রেলপথকে নমস্কার করলাম।

সময়সূচি পড়লেই মনে তর্কের ঝড় উঠবেই। পাটনা হয়ে বোম্বাইয়ের পথ সুবিধাজনক, হলোই বা ভায়া নাগপুরের চেয়ে দূরত্ব একটু বেশি। আবার মন বলছে, আরে নাগপুর হয়ে না গেলে গান্ধীতীর্থ ওয়ার্ধার বাতাসে নিঃশ্বাস নেওয়া হবে না। এ সমস্যার সমাধান হবার পূর্বেই একটি মহিলার আর্ত চিৎকারে আমাকে ফিরে তাকাতে হলো। প্লাটফরমের ছাউনির তলায় কয়েকটি সর্বহারা পরিবার আশ্রয় রচনা করেছে। মলিন কাপড়ের পর্দা টাঙিয়ে নিজ নিজ সীমানা সুরক্ষিত। পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তু, দক্ষিণ ভারতের কেরলী, হিন্দী ভারতের দেহাতি পাশাপাশি আছে। জনৈক পুরুষ রন্ধনরতা কেরলী স্ত্রীলোকটিকে দমাদম লাথিপেটা করছে। এগিয়ে যেতে সাহস পেলাম না। ঔচিত্য-বোধের বিচারে মনকে চোখ ঠারলাম। ওরা নাকি খুবই ভয়ংকর, কথায় কথায় গলায় ছুরি বসিয়ে দেয়। আমরা যেমন জ্যান্ত মাছ কুটি ওরাও তেমনি মানুষ কাটে। দেহাতি লোকটা এগিয়ে এলো। সে আসতেই লাথি বন্ধ হয়ে গেল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। না ছুরি বসালো না। বৌটার মুখে যেন খৈ ফুটছে। তীব্র কর্কশ স্বরে অনর্গল সে কি সব বলছে। একবর্ণও তার বুঝতে পারি না। হাবভাব দেখে মনে আশংকা হচ্ছে পুরুষটা এবার বোধ হয় ছুরি হাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে। ভয়ে কাঠ হয়ে যাচ্ছি আমি। বৌটার পরে খুব রাগ হলো। বাপু একটু চুপ কর না এখন। সময় বুঝে শোধ তুলে নিও। এখন আর হাঙ্গামা বাধিয়ে রক্তারক্তি কাণ্ড করা কেন? এও বোধ হয় এক বিচিত্র মান-অভিমানের পালা।

বৌটা মুখে কথা কইছে বটে, কাজেরও তার বিরাম নেই। কোলের ছেলেটিকে মধ্যে বেশ জোরেই ছুটো থাপ্পড় লাগিয়েছে। ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর বিদ্যাটা কেরলের লোকও জানে দেখছি। না এখানে আর বসা সমীচীন নয়। উঠে পড়লাম।

ওদের পাশ দিয়ে আমাকে যেতে হবে। চারিদিকে নোংরা জঞ্জাল। বিশ্রামঘরের দেওয়ালটি ঝুলকালি-ল্যাঞ্ছিত। তিনটি ইটের টুকরো দিয়ে তৈরি বিচিত্র এক উনুনে এরা রাঁন্না করছে ; তাতে আগুনের চেয়ে ধোঁয়াই বেশি। একদিকে ছেঁড়া কাগজের ছোটখাট একটি পাহাড়। একটি অগ্নিকণা কোনপ্রকারে তার স্পর্শে এলে নিমেষে সারাদিনের সব সঞ্চয় ছাই হয়ে যেতে পারে। মনটা শঙ্কিত হলো। হে ভগবান, এমন দুর্দৈব এদের যেন না হয়। দক্ষিণভারতের সমুদ্রতীরের প্রসন্ন বেলাভূমিতে ঢেউয়ের তালে তালে যারা একদা নৃত্যশীল ছিল দুর্ভিক্ষ তাদের ঘরছাড়া করেছে। আর পূর্ব-বাংলার ঐ যে উদ্বাস্তু পরিবারটি? উদরান্নের নিশ্চিত নির্ভরতা তার ছিল। কিন্তু ছিল না বেঁচে থাকার অধিকার। অপরাধ তার, সে মুসলমান নয়। আর ঐ দেহাতি? স্বাধীনতার আগে তারা "ঘোড়ার বিষ্ঠা সংগ্রহ করেছে।...বিষ্ঠার মধ্যে কিছু কিছু ছোলা থেকে যায় ; সেগুলি ধুয়ে মানুষের আহার করবার জন্য সঞ্চয় করেছে।" কলকাতার কঠিন বুকে যে এত স্নেহ সঞ্চিত রয়েছে সে কথা আগে কখন উপলব্ধি করতে পারি নি।

ধীরে ধীরে পারাপারের ব্রিজের দিকে এলাম। এ পুলটিতে সিঁড়ি ভেঙে উঠবার শ্রম নেই। কাঠের এক-খানি বিরাট পাটাতন যেন ফেলে রাখা হয়েছে। হেঁটে চলে গেলেই হলো। চমৎকার। সব ষ্টেশনে এমন থাকে না কেন? পুলের উপরের হাওয়াটা বেশ মনোরম। শরতের স্নিগ্ধ হাওয়ার শান্ত স্পর্শ চোখে মুখে সর্বাঙ্গে যেন আনন্দ জাগিয়ে দিল। দাঁড়িয়ে রইলাম বিভোর হয়ে। পুলের এই প্রান্তটি জনবিরল। এখানে

়ট দাঁড়ালে ধাবমান মানুষের ক্রুদ্ধ দৃষ্টির শিকার হতে ়া।

কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি খেয়াল নেই। "নমস্কার জি।" এই আহ্বানে যেন ধ্যানভঙ্গ হলো। ়াদের জমাদার বাবুলাল ভাই। টেরিলিনের জামা ়ট-পরা সুবেশ পুরুষ। সকালবেলায় যে বাবুলাল ়া সাফ করতে যায় তার সঙ্গে এ বাবুলালের মিল ় পাওয়া কঠিন। বাবুলাল বরাবরই একটু স্বতন্ত্র। ়ীন মানুষ সে। সে যত্ন করে টেরি কাটে, সোনা ়র দাঁত বাঁধায়। তবু ওর আজকের পোষাক আমাকে ়ক দিয়েছিল। চমকটা কাটিয়ে ওঠার আগেই মুখ ়কে বেরিয়ে গেল: "আরে বাবুলাল ভাই, একদম ়বু বন গিয়া যে।" মুখের কথা আর হাতের ঢিল ়বার বেরিয়ে গেলে ফিরিয়ে আনা যায় না বলে একটা ়বাদ আছে। জীবনে প্রয়োজনের বেলায় এটিকে ়মালুম ভুলে গেলাম। চৈতন্য হতেই তাড়াতাড়ি প্রতি ়স্কার করলাম। সে ত্রস্ত পদে চলে গেল। ওর চেহা- ়য়ও কুণ্ঠা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম 'বাবু বন ়য়া' কথাটা কেন মনে এলো? টেরিলিন পরলেই কি ়লাক বাবু হয়? নইলে, স্বীকার করতেই হবে আমার ়থাটার মধ্যে শ্লেষ ছিল। বাবুলালের সঙ্গে আমার ়নেক কালের আলাপ পরিচয়। গান্ধী মহারাজের কথা ়নতে ওর খুব আগ্রহ। একটু দারু না পিলে ঠিক মত কাজ করা যায় না তাইতো মদটা এখনও ওরা ছাড়তে পারে নি, নইলে ওরা তো গান্ধী মহারাজেরই লোক। এই জন্য বাবুলালকে আমি ভালবাসতাম খুবই। তাই তার কুণ্ঠিত চেহারা আমাকে পীড়িত করেছিল। আজও আমি নিঃসংশয় হতে পারি নি, মানুষের ব্যক্তিত্বের কত- টুকু তার পোষাক আসাক, কতটুকু বিদ্যাবুদ্ধি আর কতটুকুই বা কর্মকৃতি। তৃতীয়শ্রেণীর মানুষকে দামী পোষাকের জোরে প্রথম শ্রেণীর আসনে জাঁকিয়ে বসতে দেখেছি, দারোয়ানের সেলাম, টিকেটে অগ্রাধিকার এসব অনেক গরমিলের এও একটি। একটা আর্ত কোলাহলে চিন্তাসূত্র ছিন্ন হলো।

এই মাত্র একটি গাড়ি কয়েক 'শ' নরনারী শিশু ও নানাবিধ মালপত্র উদ্গীরণ করে দিয়েছে। তারা বুদ- বুদের মত চারিদিকে সব ফেটে পড়েছে। সবাই যেন হন্যে হয়ে ছুটছে। রেলষ্টেশনে এলে লোকজন বোধ হয় প্রকৃতিস্থ থাকে না। কয়েকটি স্ত্রীলোক আঁচলের আড়ালে বেশ ভারি বোঁচকা নিয়ে ভীত চকিত হয়ে সোজা রেললাইনের উপর দিয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। অতবড় বোঝা নিয়ে কি ছোটা যায়? প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে এই বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সকলেই আমরা জানি ওরা আঁচল ঢাকা দিয়ে ঐ চাল কটি আনে বলেই বহুজনে অনাহারে থাকার দুর্ভাগ্য থেকে রক্ষা পায়। আপ শান্তিপুর লোকালটা তখন বিদ্যুৎবেগে আসছিল ঐ পথে। মেয়েগুলি এই বুঝি গাড়ির তলায় পড়ে! ও দৃশ্য দেখা যায় না। চোখ বন্ধ করে রইলাম। ভগবান! ওদের যেন কোন বিপদ না ঘটে। গাড়িটা কোন অঘটন না ঘটিয়েই চলে গেল। স্বস্তি পেলাম। ওরা এ পথে চলতে অভ্যস্ত। উঁচু রেলের বাঁধ থেকে খাড়াই পায়ে- চলার পথ ধরে তারা নেমে গেল তরতরিয়ে অদ্ভুত অনায়াসে।

একনম্বর প্লাট ফরমে নামছি। একটি লোক ত্বরিৎ- পদে উপরের দিকে উঠছে। হাফপ্যান্ট-পরা ধাবমান এই ব্যক্তিটি রোজই অন্ধ বলে গাড়িতে ভিক্ষা করে। হাফপ্যান্ট এবং চিৎকার করে বলার একটা বিচিত্র ধরনের জন্য দৈনিক যাত্রী প্রায় সকলেই তাকে বিরক্তি- ভরে চিনে রেখেছে। ওর অন্ধত্ব নকল বলে জনরব। মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি এল। ওর পথ রোধ করে চল্লাম। সে অনায়াসে পাশ কাটিয়ে চলে গেলে। ভিক্ষার সময়ে ওর অন্ধজনের অভিনয় আমার কাছে নিখুঁত বলে মনে হোত।

ব্রিজের নীচেই বেশ একটা ছোট্ট জটলা। একটি মলিন চেহারার মানুষ বক্তৃতার ভঙ্গিতে কিছু বলছেন! স্কুল মাষ্টার কথাটা কানে যেতে এগিয়ে গেলাম। —

রোগাক্রান্ত। আমি আপনাদের সাহায্য প্রার্থনা করি। থেকে থেকেই বাংলা ইংরেজি ও হিন্দী তিন ভাষাতেই মুখস্থ বলার মত বলছেন। কেউ কেউ কিছু দিলেন। আমার মন বিশ্বাস করতে চাইল না। চলে এলাম।

একনম্বর প্লাটফরমের দক্ষিণতম প্রান্তটা মনোরম। আমার ট্রেনের তখনও কয়েকমিনিট দেরি আছে। অতএব দক্ষিণাভিমুখী হলাম। 'হ্যাঁ বাবা একটা পয়সা দাও'। জীর্ণবৃদ্ধাটি এমনি করেই ভিক্ষে চাইত এতদিন চশমা কিনবার জন্য। চশমা সে কিনেছে। তবু ভিক্ষে করা ছাড়েনি। 'আচ্ছা বুড়িমা, তোমার চশমা কেনা হয়ে গেছে, এখন আর ভিক্ষে কর কেন?' একটু অন্তরঙ্গ সুরে প্রশ্ন করলাম। কেনে উত্তর দিল না। বিড় বিড় করে আপন মনে কি সব বলতে বলতে তার মোটা লাঠিটা 'একটু বেশ জোরে ঠুকে ঠুকে অন্যদিকে চলে গেল। পানওয়ালা পণ্ডিত পানটা দিতে দিতে বললে— লোভ পেয়ে গেছে বাবু। স্রেফ লোভ! ওর ছেলেপিলেরা এসে রাত্রে ধরে নিয়ে যায়। এই তো ঐ রিফুজি কলোনিতে বাড়ী। ছেলেরা আর রোজগারও নেহাৎ কম করে না। চুনটা নেবার সময় পণ্ডিতের মুখটা ভাল করে লক্ষ্য করবার চেষ্টা করলাম। রিফুজি বলে বানিয়ে বানিয়ে বলছে না তো?

দক্ষিণতম প্রান্তে প্লাটফরমের তলা দিয়ে চলে গেছে দমদম রোড। সামনে বাজার। বাজার তখন উপচে রেলের জমি ও রাস্তা দখল করে নিয়েছে। বাজারের কোলাহল কলরব, বাস ট্যাক্সি লরি রিকশার মিলিত ঐকতান সব মিলিয়ে এক বিচিত্র অনুভূতি। চোখ বুজে শুনলে একেই কি সমুদ্রগর্জন মনে করা যায় না? ঘুঘুডাঙ্গায় তখন ঘুঘুর ডাক ছাড়া আর সবই আছে। ঘুঘুডাঙ্গা নামটি কেমন করে হলো। নিশ্চয়ই একসময় ওখানে অনেক ঘুঘু ছিল। সেসব ইতিহাস সহজে মেলে না। এই দমদম রোডের উপরেই নাকি হিন্দুকলেজের বিখ্যাত অধ্যক্ষ মেজর ডি, এল, রিচার্ডসন তার ভারতীয় স্ত্রী নিয়ে বসবাস করতেন। বড়লাট বেথুনের চোখে সেটা খুবই বিসদৃশ লাগে। তিনি রিচার্ডসনের কৈফিয়ৎ তলব করলেন। রিচার্ডসন কৈফিয়ৎ চিঠির বদলে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। হিন্দু স্ত্রীর জন্য সাহেব চাকরি ছেড়েছেন এমন দ্বিতীয় নজীর কলকাতার ইতিহাসে সুলভ নয়।

বিচিত্র ঘুঘুডাঙ্গার বিচিত্রতম কথাটি এই মাত্র শুনলাম। ধূপ চাই ধূপ, সততা। কাঠকয়লার গুঁড়ো আর সেন্ট দিয়ে তৈরি ধূপকাঠি হাতে একটি যুবক-হকার সামনে দাঁড়িয়ে। একটা ধূপ কিনলাম। সততা নাম দিয়েছেন কেন? তিনি সহাস্যে বললেন "আমার ধূপ নবযুগের প্রতীক, তাই এর নাম দিয়েছি ঐ সততা"। এযুগে সততার সংজ্ঞা সত্যিই বুঝি বদলেছে। তাড়াতাড়ি মাথাটা উঁচু করে আকাশটাকে একবার দেখে নিলাম—না, ওখানে কোন বদল ঘটেনি। আমার আকাশ আজ অনেক বেশি নীল নির্মল, অনেক উজ্জ্বল। আমার গাড়ী এসে গেছে। এবার পজিশন নিয়ে দাঁড়াতে হবে। আমার আগে কেউ না উঠতে পারে।
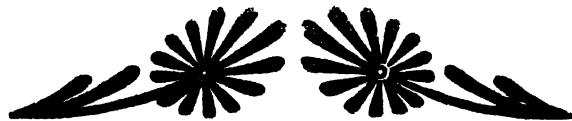
বাংলার খাদ্যসঙ্কট নিরসনে সরকারী বাধা

বিধুভূষণ জানা

বহুদিন হইতে দেশে খাদ্যাভাব চলিতেছে। সম্প্রতি চ্চ ফলনশীল ধান ও গমের প্রচলন ভারতবর্ষকে খাদ্যে াত্মনির্ভর করিবার সহায়ক হইয়াছে। সরকারী ব্যবস্থা । নীতি প্রতিকূল না হইলে উপযুক্ত পরিমাণ জল, সার ও নির্বিরোধ পরিচর্য্যার দ্বারা এক বিঘা জমি হইতে এক ৎসরে ৩৬-৩৭ মণ খাদ্য-শস্য পাওয়া যাইতে পারে। ত বৎসরে হরিয়ানা ও পাঞ্জাবে গমের এই ফলনে প্রমাণ রিয়াছে, ভারতের খাদ্যে আত্মনির্ভর করা সম্ভব। াংলা দেশেও প্রতিবৎসর পর্য্যাপ্ত পরিমাণ ফসল বৃদ্ধি রা সম্ভব হইবে যদি সরকারী ব্যবস্থা নিছক াজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত না হয়।

যুক্তফ্রন্ট সরকার তিন বৎসরের মধ্যেই বাংলাদেশকে খাদ্যে আত্মনির্ভর করিবার সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন। আমরা কিন্তু দেখিতেছি বাংলার এই সবুজ বিপ্লবকে দমন করিবার জন্য ইতিমধ্যে কোন কোন দলীয় রাজনীতি তাহার পরিপন্থী হইয়াছে। এই রাজ্যে কৃষিতে ও শিল্পে দুর্বার গতিতে অশান্তি,বিরোধ,সংঘর্ষ ও সন্ত্রাস সৃষ্টির চেষ্টা চলিতেছে। দেশে পরস্পরের মধ্যে শান্তি ও সহযোগিতার লেশমাত্র দেখা যাইতেছে না। কাহারও কোন অবস্থার নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা নাই। প্রাকৃতিক অবস্থার অনুকূলে বর্তমান বৎসর অধিকাংশ এলাকায় এখন পর্যন্ত কৃষির যে সুস্থ অবস্থা লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহার উপর প্রাকৃতিক বিড়ম্বনা ব্যতীতও রাজনৈতিক বিড়ম্বনা অবধারিত হইয়াই আছে। সুতরাং ফসলবৃদ্ধি করিবার উৎসাহ স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাইবে। সরকারী ব্যবস্থায় যে "কৃষি" তাহার উৎপাদন ব্যয় ৪-৬ গুণ বেশী, ঐ হারে খাদ্য উৎপন্ন হইলে তাহা জনগণের "আলেয়া" বিশেষ প্রতিপন্ন হইয়াছে, অর্থাৎ বাংলার খাদ্যাভাব যেন অনিবার্যভাবেই দেখা দিয়াছে। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয় করণের ফলে অন্য রাজ্যের কৃষককুল হয়ত উপকৃত হইবে; কিন্তু বাংলার ভূমি-নীতির যে পরিণতি দেখা দিয়াছে তাহাতে কে কৃষক, কে ভূমির মালিক, কে ঋণ গ্রহণ করিবে, তজ্জন্য কে-কাহার সম্পত্তি জামিন রাখিবে —তৎসমুদয় বৈধ কিনা, না হইলে ঐ ঋণের টাকা আদায় হইবে কিনা তাহা এক জটিল বিচারের প্রশ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। ইতিমধ্যেই বাংলার কৃষককুল সর্বস্বান্ত হইয়াছে—অন্যের নিকট আর্থিক সাহায্য ব্যতীত অথবা দুর্নীতির পথ ব্যতীত তাহারা কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত থাকিবার সৎপ্রবৃত্তি ও স্বনির্ভরতা হারাইয়াছে। এই চরমপরিণতিকে সামান্য রাজস্ব রেহাই ও শ্লোগান দিয়া সান্ত্বনা দেওয়া যাইবেনা। আমরা মনে করি কৃষিতে ন্যায়সঙ্গত স্থিতাবস্থা, নিরাপত্তা ও শান্তিই যথার্থ সমাধান।

ভূমিসংস্কার সম্পর্কে বহুদিনের একটা ভ্রান্তি ও মিথ্যাচার এখনও অব্যাহত গতিতে চলিতেছে—এখন এই মিথ্যাচার অথবা ভ্রান্তির স্বরূপ উদ্ঘাটনের বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। কয়েকটি শ্লোগানের কথা—"ভূমিহীনকে ভূমি দাও", "লাঙল যার জমি তার" "বেনামী জমি দখল কর" প্রভৃতির অর্থ ও উদ্দেশ্য বুঝা দুষ্কর। ভূমিহীনকে ভূমি দিলে অথবা টাকাহীনকে টাকা দিলে যদি দেশের সমস্যা মিটিয়া যায় এবং ভূমিও টাকা অর্জ্জনের দায়িত্ব হইতে দেশবাসী মুক্তি পায় তাহা হইলে ইহা অবশ্য করণীয়। অথবা লাঙল যার জমি তার (ট্রাক্টর যার জমি তার) বা "কর্নিক যার বিল্ডিং তার" —এই নীতিই মানিতে হয়। "বেনামী জমি দখল কর"

জন তার "রাজ্যের" জমির মালিক হইবে "জনতা" —একটি "রবার ষ্ট্যাম্প" মালিকানা রাখিতে উহাও দখলকর—যেহেতু উহাও ত "বেনামী"।

যে কোন ভাগচাষীর জমিতে পুরুষানুক্রমে অধিকার যদি থাকে তবে যে কোন সরকারী বা বেসরকারী কর্মচারীর ঐ পদে পুরুষানুক্রমে দখল বা অধিকার থাকিবেনা কেন? এইভাবে দেশ কতদিন চলিতে পারে তাহা একবার ভাবিয়া দেখা দরকার। বাংলাকে খাদ্য-আত্মনির্ভর করিবার আন্তরিক সংকল্প যদি কোন সরকারের হয়, তাহা হইলে দুইটি বাস্তব অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন হইবে।

প্রথমটি পর্য্যালোচনার বিষয় এই যে—পাঞ্জাব ও হরিয়ানার গমের ফলন বৃদ্ধি কেমন করিয়া সম্ভব হইল? প্রধানত, কাহাদের ভূমিকায় এই সাফল্য লাভ করা সম্ভব হইল? এই বিষয়ে যুগান্তরে মূল্যবান তথ্যপূর্ণ একটি প্রবন্ধ প্রকাশ হইয়াছিল (১৮।৬৮)। আমরা ঐ প্রবন্ধে জানিতে পারি "এই কাজে একদল শিল্পপতি এবং অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারি-কৃষিতে তাঁহাদের অর্থ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা ও আধুনিকতম প্রযুক্তিবিদ্যা প্রয়োগ করিয়াছেন, ক্ষেতমজুর পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কৃষিকার্য্যে সহযোগিতা করিয়াছে। উদ্বৃত্ত ফসল ভারতবর্ষের প্রত্যেক গ্রামে পৌঁছাইয়াছে। এই সকল রাজ্যে "লাঙ্গল যার জমি তার" "বেনামী জমি দখল কর," "জোতদারের জমি কেড়ে নাও" প্রভৃতি শ্লোগানকে কার্য্যকরি করা হয় নাই—তাঁহারা পরস্পরের সহযোগিতায় ফসল বাড়াইবার দিকেই নজর দিয়াছেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, জোতগুলিকে টুকরা টুকরা করিয়া বাংলা রাজ্যে কৃষি মজুরদের মধ্যে বিলি করিবার যে বৈপ্লবিক ও সন্ত্রাসপূর্ণ নীতি গ্রহণ করা হইয়াছে এবং যাহা আজ ২০-২৫ বৎসর যাবৎ একটা শ্রেণী-সংগ্রামে পরিণত হইয়াছে—তাহা উৎপাদন বৃদ্ধির কাজে কতটা সার্থক হইয়াছে, সংজ্ঞা অনুসারে যে নূতন "কৃষক" বা "ভূমিসেনা" সৃষ্টি হইতেছে তাহাদের উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার সামর্থ ও শিক্ষা কতটা, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করার ফলে কোন কোন রাজনৈতিক দলের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছে সত্য; কিন্তু ইহাদের অদৃষ্টে স্থায়ী ব্যবস্থার কোন নিশ্চয়তা নাই—পরন্তু দুর্নীতির পথ দুর্নিবার হইয়া গিয়াছে। ইহাদ্বারা তথাকথিত রাজনৈতিক গণবিপ্লব ঘটান সম্ভব; কিন্তু কৃষিবিপ্লব সম্ভব নয়।

এবিষয়ে বিহারের প্রাক্তন ডিরেক্টর অব এগ্রিকালচার শ্রীভূতনাথ সরকার মহাশয় তাঁহার বিখ্যাত এবং মূল্যবান তথ্যপূর্ণ—"Share cropping in Eastern India" নামক প্রবন্ধে স্বয়ং ষ্ট্যালিন লিখিত "Problem of Leninisn" নামক গ্রন্থের ২০৬—২০৭ পৃষ্ঠায় লিখিত কোন অংশের একটি উদ্ধৃতি দিয়াছেন তাহা এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ১৯১৭ সালের রাশিয়ার বিখ্যাত অক্টোবর বিপ্লবের পর জমিদার ও কুলাকদের নিকট হইতে জমি কাড়িয়া লইয়া ছোট ছোট বহু সংখ্যক কৃষক সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ইহার ফলে ১৯২৮ সালেই রাশিয়া এক খাদ্যসংকটের মধ্যে পড়িয়াছিল। সেই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ষ্ট্যালিন লিখিয়াছেন :—

"The underlying cause of our grain difficulties is that the increase in the production of grain for the market is not keeping pace with the increase for the demand for grain. The reason is primarily and chiefly the change in the structure of our agriculture brought about by the October revolution—The change from large scale Landlord farming and large scale Kulak farming which provided the largest proportion of marketed grain to small and middle peasant farming which provides the smallest proportion of marketed grain. Take for instance, the collective farms and state farms, they market 47·2./· of the gross output of their grain, but what about the small and middle peasants they market only 11·2./· of the grass output of their grains. The difference is striking.

১।১১।৬৭ তারিখে "ষ্টেটসম্যান" পত্রিকায়, "A new

class rises in rural India" নামে Mr. Danial Thorner লিখিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়, তাহার পরের দিনও ঐ পত্রিকায় "গ্রামাঞ্চলে prestige এর মোহ পরিবর্তন নামে আর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে লেখক সমস্ত ভারত ঘুরিয়া গ্রামাঞ্চলে কৃষি-প্রতিযোগিতার যে চিত্র দেখিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত পরিচয় দিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন শত শত অবসরপ্রাপ্ত ষ্টেশন মাষ্টার, প্রফেসর, হেডমাষ্টার, আই, সি, এস ও আই, এ, এসদের অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কৃষিতে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে একই জমি হইতে বৎসরে দুইবার প্রতি হেক্টরে ৫০ কুইণ্টাল গম ও ৬৫ কুইণ্টাল ধান উৎপন্ন করিতেছেন। এখন প্রশ্ন আমাদের বাংলাকে খাদ্যে আত্মনির্ভর করিতে রাজনৈতিক শ্লোগানকে ধরিয়া থাকিব—না, এই বাস্তব ব্যবস্থাকে গ্রহণ করিয়া বাংলার ক্ষুধা মিটাইব।

আজ নানা দিক দিয়া বাংলাদেশ দ্রুত ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইতেছে। ঘেরাও মন্ত্রী বন্ধুবর শ্রী সুশীল ধাড়া ঘেরাও হইতে মুক্তিলাভ করিয়া একটি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন—"মালিক মরিলে শ্রমিকও বাঁচিবেনা' আমরাও এই প্রসঙ্গে একটি কথা বলিব প্রকৃত উৎপাদক, অর্থাৎ যাহারা ভূমিতে মূলধন নিয়োগ করিয়া তাহার উৎপাদনকে প্রধান জীবিকা বলিয়া উহাতেই একান্ত নির্ভরশীল, তাহারা মরিলে কৃষি শ্রমিকও থাকিবেনা—দেশেরও সর্বনাশ ঘটিবে। শ্রমিকদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের স্থায়ী ব্যবস্থা অবশ্যই চাই—সেই সঙ্গে উৎপাদকগোষ্ঠির নিরাপত্তার ব্যবস্থাও চাই। ইহারা উভয়ে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং শ্রমিকরা মূলতঃ ইহাদেরই পোষ্য। সরকার-অনুমোদিত শ্রেণী-সংগ্রাম সকলশ্রেণীর দুঃখদুর্দশা বৃদ্ধি করিয়াছে।

জমির সিলিং প্রথা একটি অনাচারমূলক ব্যবস্থা। উর্বরা অনুর্বরা নির্বিচারে বাড়ীতে ১৮ জন লোক পোষ্য থাকিলেও ৭৫ বিঘা এবং দুজন থাকিলেও ৭৫ বিঘা। সংবিধানে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা থাকিলেও তাহার নিশ্চয়তা এখন আদৌ নাই। এতদিনে প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের কৃষিশাখা একটি সর্বসম্মত মত ব্যক্ত করিয়াছেন—সেটা "সিলিং প্রথার অবসান চাই। লেভি, প্রকিওরমেণ্ট অধিক উৎপাদনের অন্তরায়"। সকল জেলার ভূমিভিত্তিক একই হারে যে লেভি ধার্য্য হয়, তাহা সম্পূর্ণ অবাস্তব। উৎপাদনের পরিমাণ ও তাহার কি প্রয়োজন এবং এলাকাবিশেষে উৎপাদনের ব্যয় অনুপাতে ফসলের মূল্য কত হওয়া উচিত তাহার ন্যায়বিচার পাইবার জন্য সমগ্র বাংলার উৎপাদকদের কোর্ট-কাছারি করিয়া হয়রাণ পাইতে বাধ্য হয় এবং ক্ষতি হয় বলিয়া ক্রমেই কৃষিতে অনেকের অবহেলাও প্রকাশ পাইতেছে। ফুড কর্পোরেশন উৎপাদকদিগকে কম মূল্যে ফসল ক্রয় করিয়া দ্বিগুণ মূল্যে বিক্রয় করিয়া দুই প্রকারে অর্থ শোষণ করিতেছে। অতীতের সমাজব্যবস্থায় এরূপ ছিলনা।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীই দেশের প্রাণ। তাহারাই গ্রামের আলো অনির্বাণ রাখিতে স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল সেবাশ্রম, ধর্মশালা, বাঁধ, ঘাট, পুল পাঠাগার আদি শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছে। স্বাধীনতা অর্জনের সময় তাহারা কম নির্য্যাতনভোগ করেন নাই। আজ সাধারণভাবে বাংলাদেশে জাপানের মত শিল্পে ও কৃষিতে দেশকে গ্রামকে সমৃদ্ধ করিয়া তুলিবার জন্য এই সমাজকে সুযোগ দেওয়া হয়, অর্থাৎ সরকারের নিকট জোত-জমিদারদের খেসারৎ বাবদ পাওনা টাকা সরকার মিটাইয়া দেয় তাহা হইলে দেখা যাইবে এই রাজ্য বৈপ্লবিক গতিতে সমৃদ্ধির পথে গড়িয়া উঠিতেছে, শ্রমিক-কৃষকদের যে দুর্দ্দশা বৃদ্ধি হইতেছে তাহাও নিবারিত হইতেছে। ইহাতেও নিশ্চিত প্রমাণিত হইবে—এই কাজের পুরোধা হইয়াছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কিন্তু এই শ্রেণীকে ধ্বংশ করিবার জন্য শ্লোগান পরিচালিত নানারকমের পরিকল্পনা রচিত হইতেছে। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যাও বাড়িয়া যাইতেছে এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি নিছক অশান্ত হইয়া উঠিতেছে। এখন বাংলার কৃষক বা উৎপাদক পরিবারগুলিও বেকার হইতে বসিয়াছে। দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ অন্যতম একটি বিবরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

শ্রীগোপালের বয়স ৮০।৮২ বৎসর। পুত্র ৪জন, কন্যা ৫ জন। জমি ছিল ১৩০ বিঘা। বর্ত্তমান আইনে ৭৫ বিঘা জমি পাইয়াছিল। গোপালের মৃত্যুর পরে পুত্র কন্যা প্রত্যেকে ৮ বিঘা করিয়া পাইয়াছে, ৫ কন্যা তাহাদের অংশ বাস্তু বাড়ী পুকুরের অংশ ও বিভিন্ন ব্যক্তিকে বিক্রী করিয়া দিয়াছে। কাহারও বেশী লেখাপড়া নয়, কারণ একমাত্র জমিতে মূলধন নিয়োগ করিয়া, ঐ জমিকে অবলম্বন করিয়া কৃষকে প্রধান জীবিকা করিয়া কর্মজীবন আরম্ভ করিয়াছিল। এখন সরকার যে ৫৫ বিঘা জমি দখল লইয়াছে, তাহার খেসারৎ এখনও দেয় নাই এবং ১২ বৎসরের বেশী ঐ জমির ফসলও পায় নাই, সুতরাং সম্বলহীন অবস্থায় মাত্র ৮ বিঘা জমিতে চাষ করিবার জন্ত গরু রাখা, শ্রমিক রাখা, চাষখরচার সঙ্কুলান করা প্রত্যেকের পক্ষে দুঃসাধ্য ব্যাপার দাঁড়াইয়াছে। ৪ ভাই একত্রে থাকিয়া যৌথভাবে সংসার করিবার উপায়ও নাই কারণ যৌথসংসার বলিয়া প্রমাণ হইলেই আয়কর ও লেভি অন্যায় হইলেও, তাহা আদায় দিতে হইবে এবং ৮ বিঘার মালিক হিসাবে 'খ' 'গ' শ্রেণীর সরকারী র‍্যাশান আদি পাওয়ার যে সুবিধা আছে, তাহা একান্নবর্ত্তীর ফলে জমির অঙ্ক বাড়িয়া গেলেই (চরম অনাটন ঘটিলেও) তাহা হইতে বঞ্চিত হইবে। সুতরাং এই অনিবার্য্য দুর্বিপাকের মধ্যে এই সন্তানদের ১১ বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে। এখন এই সন্তানদের প্রত্যেকের ৩ পুত্র ও ৩ কন্যা মোট ৬ জন। দুই ভ্রাতা ইতিমধ্যেই ইহলোক ত্যাগ করিয়াছে। প্রত্যেকের ঐ ৮ বিঘা সম্পত্তি এখন ৬ জন ভাই ভাগিনী ও মায়ের মধ্যে ৭ ভাগে ভাগ হইয়াছে, প্রত্যেকে এক বিঘার কিছু বেশী অংশ পাইয়াছে। ইহাদের পুত্রকন্যার ভাগ্যে হয়ত শূন্য ভূমি দাঁড়াইবে। পরন্ত ঐ যে ৫৫ বিঘা জমি সরকার অন্যায়ভাবে দখল লইয়াছে তাহা দ্বারাও এই প্রকার ছিন্নমূল ভূমিহীন কৃষক উপকৃত হয় নাই। পরিনতিটি এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে যাঁহারা মূলধন নিয়োগ করিয়া শ্রমিকদের প্রতিপালন করিতেন তাঁহারা আজ নির্ধন ও বেকার, যাঁহারা বেকার ছিলেন তাঁহারাও বেকার আছেন, অধিকন্ত তাঁহারা দুর্নীতিপরায়ণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছেন। যথার্থ বিচারে সরকার শ্রেণী-সংগ্রামকে প্রশ্রয় দিয়া কোন শ্রেণীর কল্যাণ করিতে পারেন নাই। দলীয় সরকার এই অপযশ চাপা রাখিবার জন্ত একটি শ্রেণীকে ও শিক্ষিত বেকারদের বিপথে পরিচালিত করিবার জন্ত ক্রমাগত ভ্রান্ত শ্লোগানের দ্বারা উত্তেজনা বৃদ্ধি করিতেছেন। সমস্ত কিছু রাষ্ট্রীয়করণ করিবার পরিকল্পনা আরও মারাত্মক কারণ সেই প্রকার উপযুক্ত নেতৃত্ব, চরিত্র, শিক্ষা ও নিরপেক্ষ বিচারবুদ্ধি কোথায়?

বাংলার খাদ্যসমস্যা এবং বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক এই সকল সমস্যার বিষয়ে বাংলার সুধী সমাজের ও বাংলার, তথা ভারত সরকারের এখনও ভাবিয়া দেখা উচিত।

প্রাচীন ভারতে সর্পবিদ্যার মূল্যায়ন

অবণীভূষণ ঘোষ

আজ থেকে কম বেশী দেড় হাজার-বছর আগেও আমাদের পূর্বপুরুষরা সাপ—বিষধর সাপ নিয়ে বিধিবদ্ধ পর্যালোচনা করে গেছেন। তাঁদের এই আলোচনায় স্বভাবতঃই অনেক দোষ ত্রুটি রয়েছে; কিন্তু সমগ্রভাবে চিন্তা করলে তখনকার কালের এই পর্যালোচনায় বুদ্ধিদীপ্ত মনের অনেক সত্য তথ্য তাঁরা জানতে পেরেছিলেন পরিচয় পাওয়া যায়। সর্পবিদ্যার পৃথক কোন বই পাওয়া যায়নি; তবে আয়ুর্বেদ ও পুরাণে বিধিবদ্ধ সর্পবিদ্যা স্থান পেয়েছে।

সুশ্রুত সংহিতায় সমস্ত বিষধর (দংষ্ট্রাবিষ) সাপকে তিনটি দলে ভাগ করা হয়েছে: দর্বীকার, মণ্ডলী ও রাজিমৎ। দর্বীকরের কথা আছে, মণ্ডলীর গায়ে চাকা চাকা দাগ থাকে আর রাজিমতের গায়ে লম্বা-ডোরা দেখা যায়। দেহের উপরি উপরি লক্ষণ দেখে এই ভাগ করা হয়েছে সুতরাং আজকের বিজ্ঞানসম্মত বিভাগের সঙ্গে এই বিভাগের মিল থাকতে পারেনা। তবে কাছাকাছি সদৃশ সম্পর্কের কথা বলছি। দর্বীকর সাপ আজকের গোখরো কেউটে আদি চক্রধর (cobra) প্রজাতির সমতুল্য; মণ্ডলী সাপ আজকের চন্দ্রবোড়া (viper) গণের সমতুল্য; রাজিমৎ সাপ কালাচ, শাঁখামুটি আদি করেত (Krait) গণ, প্রবাল (coral) গণ ও সামুদ্র সাপের (Sea-snake) সমতুল্য। উপরি উপরি লক্ষণ দেখে ভাগ করা হলেও পণ্ডিতপ্রবর সুশ্রুত ও তাঁর শিষ্যেরা বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষণ করেছিলেন, এই বিভাজ্য থেকে তা বোঝা যায়। আমাদের দেশের সব মারাত্মক বিষধর সাপ এ তিনটি দলে ধরা পড়েছে। এ বড় কম কৃতিত্বের কথা নয়।

সুশ্রুত সংহিতায় এসব সাপের আরও পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দর্বীকরের কথায় যা গায়ে চক্র, লাঙল, ছত্র, স্বস্তিক, অঙ্কুশ আকৃতির চিহ্ন থাকে; এ সাপ দিনে বিচরণ করে এবং অপেক্ষাকৃত দ্রুত চলে। মণ্ডলীর দেহমোটা, এ সাপ রাতে বিচরণ করে এবং ধীরে ধীরে চলে। রাজিমতের দেহের রং উজ্জ্বল; এ সাপও রাতে চলাফেরা করে। এ সব তথ্যের প্রত্যেকটি সত্য। প্রসঙ্গক্রমে সুশ্রুত দর্বীকরকে কৃষ্ণসর্প, মণ্ডলীকে গোনস রাজিমৎকে রাজিল ও দীপক নামেও অভিহিত করেছেন।

বিষধর ছাড়া বিষহীন সাপের কথাও সুশ্রুত বলেছেন। বিশালকায় অজগর যে বিষহীন সাপ, তা তিনি বলেছেন: অজগর সাপ সমস্ত দেহ গ্রাস ক'রে ফেলে বলে দেহ ও প্রাণ বিনষ্ট হয়—বিষহেতু প্রাণী মরেনা। অন্ধসর্পও (পুঁয়েসাপ) বিষহীন বলে তিনি জানতেন। তবে তিনি প্রচলিত সংস্কারের কাছে দুর্বলতা প্রকাশ করেছেন, যখন তিনি বলেছেন: 'কারও কারও মতে অন্ধসর্প দংশন করলে অন্ধত্ব উপস্থিত হয়'।

বৈকরঞ্জ নামে আর একদল সাপের কথা আয়ুর্বেদ-কার বলেছেন, এরা সংকর জাতি। কিন্তু সাপের রাজ্যে সংকর জাতি নেই। সম্ভবতঃ বৈকরঞ্জ দ্বারা তিনি পশ্চাৎ বিষদন্তী কালনাগিনী (Ornate snake), কাঁড (common Indian cat snake) লাউডগা ইত্যাদি সাপের কথা বলতে চেয়েছেন।

সুশ্রুত সংহিতায় যেমন অগ্নিপুরাণেও বিষধর সাপকে তিনটি দলে ভাগ করা হয়েছে—ফণী, মণ্ডলী ও রাজিল। আয়ুর্বেদকার যাকে বলেছেন দর্বীকর, পুরাণকার তাকে বলেছেন ফণী; মণ্ডলী নাম দুজনেরই এক; আর

আয়ুর্বেদক'র সাধারণভাবে যাকে বলেছেন রাজিমৎ, পুরাণকার তাকে বলেছেন রাজিল। এ পর্যন্ত বুঝতে অসুবিধা নেই। কিন্তু সংকরজাতি সাপকে আয়ুর্বেদকার বৈকরঞ্জ ব'লে অ'ভহিত করেছেন, পুরাণকার তা' বোঝাতে দর্বীকর নাম ব্যবহার করেছেন। এখানেই গণ্ডগোল। ফণী ও দর্বীকর—দুয়েরই ব্যুৎপত্তিগত অর্থ যার ফণা আছে।' সুতরাং সংকরজাতি সাপ বোঝাতে পুরাণকার কেন দর্বীকর শব্দ ব্যবহার করলেন? কথাটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। চক্রধর সাপের প্রসারিত ফণা দেখলে তা' চিনতে ভুল হয় না। কোন কোন সাপ আছে যারা ঠিক ফণা ধরতে না পারলেও দংশনের সময় চক্রধরের মত দেহের সম্মুখভাগ বেশ খানিকটা উঁচু ক'রে দাঁড়ায়। গাঁয়ের সাধারণ লোকে একেও সাপের ফণা ধরা বলে। আমার মতে এসব সাপ বোঝাতেই অগ্নিপুরাণে দর্বীকর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বৈকরঞ্জ বলতে আয়ুর্বেদকার কালনাগিণী, কাঁড়, লাউডগা ইত্যাদি পশ্চাৎ বিষদন্তী সাপ বুঝেছেন, আমাদের এই প্রস্তাবের সঙ্গে দর্বীকরের এই অর্থ সুসমঞ্জস। কারণ দংশনের সময় দেহের সম্মুখভাগ কিছুটা উঁচু করার অভ্যাস এসব সাপের আছে। এদের ঠিক ফণা নেই, অথচ চক্রধরের মত দংশনের সময় এরা কিছুটা মাথা উঁচু করে দাঁড়ায়, এ হিসাবে সংকরজাতিও (বৈকরঞ্জ) বটে। আর একটি কারণেও আয়ুর্বেদকার এ সব সাপকে সংকরজাতি মনে করতে পারেন। এরা বিষধর, কিন্তু এদের বিষ এত উগ্র নয় যে তাতে মানুষ মারা যেতে পারে; বিষধর হয়েও এদের বিষে অপকর্ষ রয়েছে।

তখনকার প্রচলিত বর্ণাশ্রম অনুসারে আয়ুর্বেদকার ও পুরাণকার—দুজনেই সমস্ত সাপকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রে ভাগ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই বিভাগ ভিত্তিহীন।

আয়ুর্বেদকার চরকের মতে আষাঢ় মাসে স্ত্রী পুরুষ সাপের মিলন হয় এবং কার্তিক মাসে স্ত্রী সাপ প্রায় ২৪০টি ডিম প্রসব করে। ভবিষ্যৎ পুরাণের মতে জ্যৈষ্ঠ বা আষাঢ়ে স্ত্রী পুরুষ সাপের মিলন হয় এবং পরবর্তী বর্ষার কয়েক মাস গর্ভধারণের পর কার্তিকে স্ত্রী সাপ ২৪০টি ডিম প্রসব করে। অগ্নিপুরাণের মতে আষাঢ়াদি তিন মাসে স্ত্রী সাপের গর্ভ হয় এবং চার মাস গর্ভ ধারণের পর ২৪০টি ডিম প্রসব করে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে বছরের যে কোনও সময় সাপ মিলনে রত হতে পারে—যদিও অধিকাংশ সময় বর্ষার প্রারম্ভেই তাদের মিলিত হতে দেখা যায়। সুতরাং প্রাচীনেরা এ ব্যাপারে যা' বলেছেন, তা' ঠিকই। স্ত্রী পুরুষ সাপ মিলিত হলেই তাদের গর্ভাধান হয় না, বহু'দিন পরেও গর্ভাধান হতে পারে। সুতরাং সাপের গর্ভধারণ কাল ঠিক ক'রে বলা সহজ নয়। যা' হ'ক, অন্তত সাপ সাধারণতঃ চার থেকে আট সপ্তাহের মধ্যে ডিম প্রসব করে। কিন্তু প্রাচীনদের মতে গর্ভধারণের কাল কম বেশী চার মাস। সব সাপ একই সংখ্যক ডিম পাড়ে না; প্রজাতি হিসাবে ডিমের সংখ্যা বাড়ে বা কমে। সুতরাং আয়ুর্বেদকার ও পুরাণকার—উভয়েই কেন ২৪০ সংখ্যার কথা বলেছেন, তার কারণ অনুমান করা কঠিন। ভবিষ্যপুরাণের মতে প্রায় দু'মাসে এবং অগ্নিপুরাণের মতে এক মাসে সাপের বাচ্চা ডিম থেকে বের হয়। এ ব্যাপারে দুজনেই ঠিক বলেছেন বলা যায়। সাধারণতঃ সাত-আট সপ্তাহে সাপের বাচ্চা ডিম থেকে বের হয়। কিন্তু এই সময় ক'মে তিন সপ্তাহ হতে পারে। সাপটি দেরীতে ডিম পাড়তে পারে এবং সেক্ষেত্রে পেটের মধ্যেই ডিমের প্রাণ কতকটা পুষ্টিলাভ করে।

লিঙ্গভেদে আয়ুর্বেদকার পুরুষ, স্ত্রী ও নপুংসক—তিন প্রকার সাপের কথা বলছেন। নপুংসক সাপের কল্পনা আয়ুর্বেদকারের কেন হ'ল তা বোঝা সহজ নয়। অন্যান্য উন্নত শ্রেণীর মত নপুংসক সাপ নিছক ব্যতিক্রম। পুরাণকারও এই তিনপ্রকার সাপের কথা বলেছেন। পরন্তু অগ্নিপুরাণের মতে মা-সাপ পুরুষ ও নপুংসক বাচ্চাদের খেয়ে ফেলে--মাত্র স্ত্রী বাচ্চাদের রেখে দেয়। আমাদের দেশের সাপুড়েরা অনেক সময় বলে থাকে, সব সাপ সাপিনী। পুরাণকার কার্যত এই কথাই বলছেন। এই চিন্তাধারার পিছনে কি যুক্তি থাকতে পারে? পুরুষ সাপের ইন্দ্রিয় সাধারণ অবস্থায় অবসাদী—ছিদ্রের মধ্যে লুকান থাকায় আপাতদৃষ্টিতে স্ত্রী

-পুরুষ সাপ পার্থক্য করা সহজ নয়—মনে হয় সব বুঝি স্ত্রী সাপ। এ থেকেই বোধ হয় পুরাণকারের ধারণা হয়েছিল, স্ত্রী বাচ্চা বাদে আর সব বাচ্চা মা-সাপ খেয়ে ফেলে।

ভবিষ্য পুরাণের মতে সর্পশিশুর বিষদাঁতে তিন সপ্তাহে বিষ উৎপন্ন হয়। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখা উচিত বিষধর সর্পশিশু তার পূর্ণাঙ্গ বিষদাঁত ও বিষগ্রন্থি নিয়েই ডিম থেকে বের হয়। ছয় মাসে সর্পশিশু খোলস ত্যাগ করে—পুরাণকারের এই অভিমতও ঠিক নয়। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই সর্পশিশু খোলস ছাড়ে।

পুরাণকারের মতে বিষধর সাপ প্রায় ১২০ বছর বাঁচে, আর বিষহীন সাপ বাঁচে প্রায় ৭০ বছর। বর্তমান কালের সর্পবিদ কিন্তু এই মতে সায় দিতে পারবেন না। সাপ এতদিন বাঁচে না বলেই মনে হয়।

সাপের দেহে বিষের অবস্থান সম্পর্কে সুশ্রুত বলেছেন: 'সাপের বিষ তার সারা দেহ ব্যেপে থাকে; রাগলেই বিষ সারা দেহ থেকে প্রচ্যুত হয়ে তার বড়িশবৎ দংষ্ট্রাতে এসে সংযুক্ত হয়ে থাকে'। বলা বোধ হয় বাহুল্য, প্রাচীন আয়ুর্বেদকারের এই ধারণা ঠিক নয়। বিষদাঁতের পিছনে স্থিত বিষগ্রন্থিতে সাপের বিষ উৎপন্ন হয়। অগ্নিপুরাণের মতে বিষধর সাপের মোট দাঁত বত্রিশটি, তার মধ্যে চারিটি—দুটি ক'রে দুদিকে—বিষদাঁত। এ তথ্য অস্পষ্ট, বিভ্রান্তিকরও বটে।

দংশন করার কারণ হিসাবে সুশ্রুত বলেছেন: 'সর্প পদদলিত হলে অথবা দুষ্টস্বভাব হলে অথবা রাগান্বিত হলে অথবা গ্রাসার্থী হলে মহাক্রুদ্ধ হয়ে দংশন ক'রে থাকে। কোন্ সাপের দংশন সাধারণতঃ মারাত্মক হয় না, সে সম্পর্কে আয়ুর্বেদকার বলেছেন: 'নকুলাকুলিত সাপ বাচ্চা সাপ, জলাবগ্রহতসাপ, কৃশ সাপ, বুড়ো সাপ খোলস ছেড়েছে এমন সাপ এবং ভীত সাপের অল্পবিষ হয়ে থাকে'। এ উক্তিতে একভাবে বা অন্যভাবে কিছুটা সত্য যে লুকিয়ে আছে, তা' বোধহয় বলাই বাহুল্য। আয়ুর্বেদকার চরক সর্পবিনাশক পাখি, দাবাগ্নি ইত্যাদি দ্বারা ভীত সাপও অল্পবিষ হয়ে থাকে বলেছেন।

মহাপ্রাজ্ঞ চরক একটি অভিজ্ঞতালব্ধ কল্যাণকর উপদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: 'রাতে ও দিনে ছাতা অথবা ঝরঝর শব্দ ক'রে এমন কোন জিনিস হাতে নিয়ে যাতায়াত করবে। কারণ সাপ ছাতার ছায়া দেখে অথবা ঝরঝর শব্দ শুনে ভয়ে পালাবে'। ছাতার ছায়া দেখে সাপ পালাবে; কদাচিৎ কোন সাপ কল্পনাপ্রসূত অত্যধিক ভয়ে ছাতার ছায়াতেই ছোবল দিতে পারে। তবে ঝরঝর শব্দকারী জিনিসটা সম্বন্ধে একটি কথা বলার আছে। সাপ সম্পূর্ণ কালা; বাতাসে ভেসে আসা কোন শব্দ তার পক্ষে শোনা সম্ভব নয়। ঝরঝর শব্দ সে শুনতে পারে না, সুতরাং ভয়ে পালাবার কোন প্রশ্নই উঠে না। সাপ কিন্তু মাটির কম্পন সহজেই অনুভব করতে পারে। ঝরঝর শব্দ করতে জিনিসটাকে যদি মাটিতে ঠুকতে হয়, তবে অবশ্য সাপ মাটির কম্পন অনুভব ক'রে দূরে পালাতে পারে।

গুরু নানক ও শিখধর্ম

যোগনাথ মুখোপাধ্যায়

পাঁচশ বছর আগে, ১৪৬৯ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর, শিখধর্মের প্রবর্তক ও প্রথম গুরু নানক পাঞ্জাবের লাহোর জেলায় তালবন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নানকের নামানুসারে পরে গ্রামটির নাম হয় নানকানা। এখন স্থানটি পাকিস্তানের অন্তর্গত।

নানক মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। পিতা কালু ছিলেন জাতিতে ক্ষত্রিয়। বৃত্তিতে বণিক। তিনি চেয়েছিলেন পুত্র তাঁরই বৃত্তি অবলম্বন করুন এবং সেকারণে অল্প বয়সেই নানক একটি দোকানের ভারপ্রাপ্ত হন ও বিশবছর বয়সে তাঁর বিবাহ হয়। অনতিবিলম্বে তিনি দুটি সন্তানের পিতাও হন। কিন্তু বাল্যকাল থেকেই ধর্মপরায়ণ-নানকের সংসারের প্রতি বৈরাগ্য বাড়তে থাকে এবং সাতাশ বছর বয়সে তিনি গৃহত্যাগ করেন। তারপর শুরু হয় তাঁর দীর্ঘ প্রব্রজ্যা। তিনি ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে যান, এবং শিখসমাজে সুপ্রচলিত বিশ্বাস যে, নানক পারস্য, তুর্কিস্তান, ইরাক, এমন কি মক্কা পরিদর্শন করেন। অবশেষে মুলতানপুরের কাছে বোহারি নামক বনে দীর্ঘ তপস্যার পর তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। নানকের ধর্মমত ছিল উদার, সহজবোধ্য ও সর্বধর্ম সমন্বয়ের চিন্তায় অনুপ্রাণিত। বিভিন্ন স্থানে তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার ক'রে বেড়াতেন এবং অসঙ্কোচে নির্ভয়ে সব ধর্মীয় কুসংস্কার, সামাজিক অন্যায় ও রাজনৈতিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেন। পানিপথের যুদ্ধে [১৫২৬] জয়ী হওয়ার পর বাবর যখন পাঞ্জাবের বিভিন্নস্থানে প্রচণ্ড অত্যাচার শুরু করেন তখন গুরু নানক তার প্রতিবাদ জানান। ফলে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং বন্দীশালায় কঠোর শ্রমের মধ্যে তাঁর দিন কাটতে থাকে। কিন্তু শীঘ্রই মোগল সম্রাট বাবর ধর্মগুরু নানকের মহত্ত্ব উপলব্ধি করেন ও তাঁকে মুক্তি দেন। ১৫৩৮ খৃষ্টাব্দে ৬৯ বছর বয়সে নানকের মৃত্যু হয়।

গুরু নানক শিখধর্মের আদিগুরু হলেও ঐ ধর্মের প্রথম বা শেষ কথা তাঁর মুখনিঃসৃত নয়। তাঁর ধর্মচিন্তায় রামানন্দ ও কবীরের প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রব্রজ্যাকালে বহু মুসলমান সাধকের সংস্পর্শেও তিনি আসেন এবং ইসলামের সাম্য ও বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের আদর্শ নিঃসন্দেহে তাঁকে প্রভাবিত করে। শিখধর্মে রামানন্দ, কবীর ও মুসলমান সাধকদের প্রভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ, শিখ ধর্মগ্রন্থ গ্রন্থসাহিব-এ তাঁদের ভক্তিস্তোত্রের স্থানলাভ।

কিন্তু হিন্দু, মুসলমান ও সমন্বয়বাদীদের চিন্তাধারা গুরু নানককে প্রভাবিত করলেও গুরু নানক যে ধর্মমত প্রচার করেন তা ঋজুতায়, স্পষ্টতায় ও স্বতন্ত্র চিন্তাধারায় অনন্য। তিনি নিজেকে ঈশ্বরের অবতার, ঈশ্বরপ্রেরিত দূত বা ঐ ধরনের কোন কিছু ব'লে প্রচার করেন নি, বা ঈশ্বরের কোন বাণী স্বকর্ণে শোনারও দাবী জানাননি। আসলে ভগবান ও মানুষের মধ্যে কোন মধ্যস্থের অস্তিত্ব বা প্রয়োজনীতাই তিনি স্বীকার করেননি। তিনি বলেছেন, মানুষমাত্রেই ভগবানের সন্তান, এবং সেই মহাস্রষ্টা সর্বদা মানুষের মধ্যে ত তাঁর সকল সৃষ্টির মধ্যে অবস্থান করছেন। তাই তাঁকে পাওয়ার জন্য তপস্যা বা সন্ন্যাসের প্রয়োজন নেই, তীর্থদর্শন বা পুণ্যস্নানেও যেতে হ'বেনা, তাঁকে অন্তর থেকে স্মরণ করলেই তাঁর কল্যাণময় অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যাবে। কর্তব্যপরায়ণ, সত্যনিষ্ঠ, সদাচারী মানুষমাত্রেই জানেন, ভগবান আছেন তাঁর অন্তরে।

দশ গুরু

গুরু নানক যে ধর্মমত প্রচার করেন তা পরবর্তী দুই শতাব্দীকালে আরও নয়জন শিখগুরুর প্রচার বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যায় পূর্ণ পরিণতি লাভ করে এবং তাঁদের সকলের স্তব স্তোত্র ও গান গ্রন্থসাহিবে স্থান পায়। একারণে শিখ ধর্মকে দশগুরুর ধর্মও বলা হয়।

গুরু নানক মৃত্যুর আগেই তাঁর দুই পুত্রের দাবী অগ্রাহ্য ক'রে অনুগত গৃহী শিষ্য অঙ্গদকে দ্বিতীয় গুরু মনোনীত করেন। অঙ্গদ গুরু ছিলেন ১৫৩৮ থেকে ১৫৫২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত। তিনি গুরুমুখি লিপির প্রবর্তক এবং ঐ ভাষায় গুরু নানকের বাণীগুলি তিনিই প্রথম সঙ্কলন করেন। শিখদের একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়রূপে সংগঠনের কাজে তিনি অগ্রণী হন।

তৃতীয় গুরু অমর দাস ১৫৫২ খৃষ্টাব্দে অঙ্গদের মৃত্যুর পর গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন ও ১৫৭০ খৃঃ পর্যন্ত সে দায়িত্ব পালন করেন। জাতিভেদপ্রথা লোপের উদ্দেশ্যে তিনি সর্বজনীন ভোজনাগার লঙ্গরখানার প্রবর্তন করেন। শিখধর্ম প্রচারের জন্য তিনি বাইশজন ধর্মযাজককে বিভিন্ন স্থানে পাঠান।

গুরু অমরদাসের মৃত্যুর পর চতুর্থগুরু হন তাঁর জামাতা রামদাস। তিনি সাতবছর ঐপদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মোগল সম্রাট আকবর গুরু রামদাসের প্রতি শ্রদ্ধাবশত তাঁকে ১৫৭৭ খৃষ্টাব্দে একটি পুকুর সমেত একখণ্ড জমি দান করেন। সেইখানে রামদাস গ'ড়ে তোলেন রামদাসপুর শহর ও পুকুরটিকে বড় ক'রে তার নাম দেন অমৃতসর। পরে ঐ পুকুরের নাম থেকেই রামদাসপুর শহরটি অমৃতসর নামে পরিচিতি লাভ করে। অমৃতসরের মধ্যস্থলে হরমন্দির সাহিব [স্বর্ণমন্দির] নির্মাণের কাজও গুরু রামদাসের সময়ে শুরু হয়। গুরু রামদাসের সময়ে শিখদের সঙ্গে মোগলদের সৌহার্দের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

স্বর্ণমন্দির ও গ্রন্থসাহিব

স্বর্ণমন্দির নির্মাণের কাজ শেষ করেন গুরু রামদাসের পুত্র, পঞ্চমগুরু অর্জনমল। ঐ সময় থেকে অমৃতসর হয় শিখদের প্রধান তীর্থক্ষেত্র ও আত্মরক্ষার বৃহত্তম ঘাঁটি [আমেদশাহ আবদালি ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে অমৃতসর শহরটি ধ্বংস করেন এবং বারুদের সাহায্যে স্বর্ণমন্দিরটি ধ্বংস ক'রে পুকুরটি ভরাট ক'রে দেন। তারপর স্থানটি কলুষিত করার উদ্দেশ্যে সেখানে গোহত্যা করেন। কিন্তু পরের বছর শিখরা শিরহিন্দের যুদ্ধ জয়ী হয়ে পুকুরটির সংস্কার করেন ও সেখানে স্বর্ণমন্দিরের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়]। অর্জনমলের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি 'আ'দ গ্রন্থ' সঙ্কলন, যা গ্রন্থসাহিব-এর আদিরূপ। তাঁর সময়ে শিখদের ক্ষমতা ও সম্পদ বৃদ্ধি পায় এবং ভারত ও ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অর্জনমল নিজেকে শিখদের-লৌকিক ও আধ্যাত্মিক গুরু বলে ঘোষণা করেন। গুরুর মর্যাদা অনুসারে পোষাক পরিচ্ছদ রাজকীয় করার দিকেও তিনি দৃষ্টি দেন। অর্জনমলের খ্যাতি ও ক্ষমতাবৃদ্ধি সম্রাট জাহাঙ্গিরকে ঈর্ষান্বিত করে এবং মোগল দরবার থেকে শিখগুরু ও তাঁর শিষ্যদের নানাভাবে হায়রানি শুরু হয়।

১৬০৬ খৃষ্টাব্দে অর্জনমলের মৃত্যু হ'লে তাঁর একমাত্র পুত্র হরগোবিন্দ ষষ্ঠগুরু মনোনীত হ'ন। তিনি ১৬৪৫ খৃঃ পর্যন্ত ঐ পদে আসীন থাকেন। তাঁর সময়ে গুরুর পোষাক পরিপূর্ণ রূপ নেয়। তিনি আধ্যাত্মিক (ফকিরি) ও লৌকিক (আমির) শক্তির প্রতীকরূপে দুটি তরবারি বহন করেন। তাঁর সময়ে মোগলদের সঙ্গে শিখদের প্রথম সংঘর্ষ হয়।

গুরু হরগোবিন্দের মৃত্যুর পর গুরুপদে অধিষ্ঠিত হন তাঁর পৌত্র হররায়। তাঁর সঙ্গে সম্রাট শাহজাহানের জ্যেষ্ঠপুত্র দারাসিকোর সৌহার্দের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সম্রাট আরংজেবের সঙ্গে তাঁর কয়েকবার সংঘর্ষ হয়। সম্রাটের সঙ্গে সন্ধির উদ্দেশ্যে গুরু হরগোবিন্দের পুত্র রামরায় মোগল দরবারে গেলে সেখানে বন্দী হন। সেকারণে ১৬৬১ খৃষ্টাব্দে গুরু হররায়ের মৃত্যু হ'লে তাঁর দ্বিতীয় পুত্র হরকৃষণ মাত্র পাঁচ বছর বয়সে অষ্টম গুরু নির্বাচিত হন। তাঁকেও দিল্লীতে মোগল দরবারে ডেকে পাঠানো হয় এবং সেখানে আট বছর বয়সে হরকৃষণের মৃত্যু হয়।

১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে তেগবাহাদুর নবম গুরু নির্বাচিত হন। সেসময় শিখদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হয়ে ওঠে। কিন্তু তেগবাহাদুর শুধু যে শিখদের ঐক্যবদ্ধ রাখেন তাই নয়, তাঁর সময়ে শিখধর্ম অনেক বিস্তার লাভ করে। এই জন্য সম্রাট আরংজেব তাঁর প্রতি বিরূপ হন এবং ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে তেগবাহাদুরকে হত্যা করা হয়। তেগবাহাদুরকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু তিনি ধর্মত্যাগ অপেক্ষা জীবনত্যাগ শ্রেয় বলে মনে করেন।

তেগবাহাদুরের মৃত্যুর পর শিখদের দশম ও শেষ গুরু মনোনীত হন তাঁর পুত্র গুরুগোবিন্দ সিংহ। শিখ-গুরুদের মধ্যে গুরুত্বের দিক থেকে নানকের পরেই গুরু গোবিন্দ সিংহের স্থান। ১৬৬৬ খৃষ্টাব্দে পাটনায় তাঁর জন্ম এবং তিনি গুরুপদ লাভ করেন মাত্র নয় বছর বয়সে।

খালসা বাহিনী

গোবিন্দ সিংহ যখন গুরুপদ গ্রহণ করেন তখন গুরুর প্রাধান্য হ্রাসের ফলে শিখদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রবল হয়েছে, নানা প্রতিযোগী সম্প্রদায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে, বংশ ও জাতিভেদ আবার বিধ্বংসীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। সর্বোপরি মোগল শাসকদের উৎপীড়নে শিখদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার অবস্থা। এই অনিশ্চিত অবস্থার প্রতিকার করতে ও পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গুরুগোবিন্দ সিংহ ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে বিশ সহস্র তরুণ নিয়ে গড়ে তোলেন 'খালসা' বাহিনী। খালসা শব্দটি আরবিভাষা উদ্ভূত, যার অর্থ পবিত্র, স্বাধীন।

খালসাদের মধ্যে কোন জাতিভেদ রইল না, সকলেই কৌলিক উপাধি ত্যাগ ক'রে গুরুর নির্দেশে 'সিংহ' উপাধি নিলেন। তামাক সেবন নিষিদ্ধ হল। প্রত্যেক শিখ—কেশ, কচ্ছ, কৃপাণ, কঙ্কন ও কংগা (চিরুনি) এই পঞ্চ 'ক' ধারণ করলেন। লাঙল, তন্ত ও লেখনী ত্যাগ ক'রে শিখরা অসি ধারণ করলেন, একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় রূপান্তরিত হ'ল সামরিক সম্প্রদায়ে। সেবার পুরাতন রীতি বিনয় ও প্রার্থনার পরিবর্তে ভগবান তরবারির উপর আস্থা স্থাপন করা হ'ল। গুরুজী বললেন, তরবারিই ভগবান, ভগবানই তরবারি। শুরু হ'ল সৈন্য-বাহিনী সংগঠন, কুচকাওয়াজ ও পার্বত্য দুর্গ নির্মাণ। খালসাদের ধ্বনি হ'ল—'ওয়া গুরুজীকা খালসা, ওয়া গুরুজী কা ফতহ।' গুরু একাত্ম হয়ে গেলেন শিষ্যদের মধ্যে, সমগ্র সম্প্রদায় পেল গুরুর মহিমা। গুরুর প্রয়োজন আর রইলনা। গুরুগোবিন্দ তাই ঘোষণা করলেন, তিনিই শেষ গুরু। গুরুর স্থান নিল দশ গুরুর উপদেশসমৃদ্ধ গ্রন্থসাহিব।

শিখধর্ম ও সমাজজীবনের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন যাঁদের পছন্দ হ'লনা তাঁরা শিখসম্প্রদায় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলেন। গুরুগোবিন্দও অনেক অবিশ্বাসী ও ভিন্ন মতাবলম্বীকে বহিস্কৃত করলেন। এইভাবে গুরুগোবিন্দের নেতৃত্বে শিখসম্প্রদায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপ পরিগ্রহ করলো। খালসাবাহিনী মুখ্যত সামরিক বাহিনীরূপে গঠিত হয়েছিল। কিন্তু খালসাদের জীবনরীতি, পঞ্চ 'ক' ও গুরুমন্ত্র অচিরে সমগ্র শিখসম্প্রদায় গ্রহণ করায় 'শিখ' ও 'খালসা' সমার্থক হয়ে গেল।

শিখধর্মের স্বার্থে গুরুগোবিন্দের দুই পুত্র শহিদ হন, গুরুজী নিজেও সীমাহীন দুঃখ কষ্ট সহ্য করেন। শোনা যায়, গুরুগোবিন্দের একটি কবিতা পাঠ ক'রে মোগল সম্রাট আরংজেব মুগ্ধ হন ও তাঁকে দাক্ষিণাত্যে ডেকে পাঠান। সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রে গুরুগোবিন্দ দাক্ষিণাত্য যাত্রা করেন। পথেই তিনি আরংজেবের মৃত্যু সংবাদ পান। সম্রাটের পুত্রদের উত্তরাধিকারের সংগ্রামে গুরুগোবিন্দ মোয়াজ্জেমকে সমর্থন করেন, যিনি শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়ে বাহাদুর শাহ [শাহ আলম] নাম নিয়ে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। ঐ সময়ে ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদে নানদেদ নামকস্থানে এক পাঠান গুরুগোবিন্দকে ছুরিকাঘাতে নিহত করেন।

গুরুগোবিন্দ গুরুপদের অবসান ঘটালেও বান্দাকে শিখসম্প্রদায়ের সামরিক-নেতা নিযুক্ত করেন। আর শিখসম্প্রদায়কে আধ্যাত্মিক পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন পাঁচজন শিখ ধর্মনেতার উপর।

শিখ ধর্ম ও গুরুর উপদেশ

'শিখ' কথাটির উদ্ভব 'শিষ্য' থেকে। গুরু-শিষ্য সম্পর্কের মধ্য দিয়ে শিখধর্মের উদ্ভব ও পূর্ণ পরিণতি। গুরুনানক থেকে গুরুগোবিন্দ পর্যন্ত যা বলেছেন তা সবই সন্নিবিষ্ট আছে 'গ্রন্থসাহিব' গ্রন্থে, এবং শিখ মাত্রেরই তা অবশ্য পালনীয়।

নানক ঈশ্বরের বর্ণনায় বলেছেন, তিনি নির্গুণ, আবার তিনিই সগুণ। সৃষ্টির পূর্বে ঈশ্বর যখন আত্মস্থ ছিলেন তখন তিনি ছিলেন নির্গুণ; তখন স্বর্গ-নরক-পৃথিবী কিছুই ছিল না, শুধু তিনি ছিলেন; তখন পাপ-পুণ্য ছিলনা, বেদ ছিলনা, ছিলনা অন্য কোন ধর্মগ্রন্থ। তারপর ধীরে ধীরে বহুরূপে প্রকাশ হ'ল ঈশ্বরের, তি'নি হলেন সগুণ।

সেই মহাস্রষ্টা ঈশ্বর এক, অবিভাজ্য, অদ্বিতীয়, অনাদি, অনন্ত। তিনি নিত্য আছেন তাঁর সব সৃষ্টির মধ্যে, তাই অবতাররূপে নররূপ ধারণ ক'রে তাঁর বারে বারে পৃথিবীতে আসার প্রশ্নই ওঠেনা। তাঁর কোন দূতও কেউ জগতে আসেননি, কারণ তাঁর অস্তিত্ব উপলব্ধির জন্য কারও সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। সব মানুষ তাঁর সন্তান, তিনি সকলের পিতা। পিতা-পুত্রের সম্পর্কের মাঝে অন্যের স্থান কোথায়? প্রয়োজনই বা কি?

ঈশ্বরকে গুরুনানক হরি, রাম, গোপাল, আল্লা, খোদা, সাহিব প্রভৃতি নানা নামে অভিহিত করেছেন, কিন্তু সর্বদা বলেছেন, ঈশ্বর এক, অবিভাজ্য, অদ্বিতীয়। সর্বজীবে সর্বভূতে তিনি অসীম। একদিন মাঠের মাঝে এক গাছতলায় ঘুমিয়ে আছেন নানক, ঘুম ভাঙল এক কাজীর ভর্ৎসনায়: মসজিদের দিকে পা করে শুয়ে আছো, জাননা ভগবান আছেন ওখানে? গুরুনানক স্মিতহাসি হেসে বললেন—বেশ ত, ভগবান কোনদিকে নেই বল, সেদিকে না হয় পা দুটো রাখবো।

হিন্দুর পাথরপুজো দেখে নানক বললেন—যে পাথর নিজেই জলে ডুবে যায়, সে আমায় ভবসাগর পার করাবে কেমন ক'রে?

তীর্থদর্শন, পুণ্যস্নান, উপবাস, কৃচ্ছ্রতা সবই নাকচ করলেন গুরুনানক। তিনি বললেন, সাধুর পুণ্যস্নানের প্রয়োজন নেই; আর পাপী যে, শত স্নানেও পাপস্খালন হবেনা। চারিদিকে প্রলোভন, চারিদিকে ছলনা, কি করে আত্মরক্ষা করবে? সব সময় তাঁর নাম নাও, তাঁকে স্মরণ ক'রো। তাঁকে স্মরণ না করে যে নিঃশ্বাস নেওয়া হয় সে নিঃশ্বাস ব্যর্থ।

নারীর সম্মান ও মর্যাদার দিকেও শিখধর্মের সজাগদৃষ্টি। গুরুনানক বলছেন—যারা সকল রাজা ও ধর্মগুরুর জন্মদাত্রী, তারা কার চেয়ে ছোট? নরনারী উভয়েই ঈশ্বরের কৃপাধন্য ও সকল কাজের জন্য ঈশ্বরের কাছে সমভাবে দায়ী। গুরু হরগোবিন্দ বলেছেন—নারী পুরুষের বিবেকবুদ্ধি। গুরু অমরদাস সতীদাহের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছেন, যখন সম্রাট আকবরেরও দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট হয়নি।

শিখধর্ম গৃহীর ধর্ম, তাতে সন্ন্যাসের স্বীকৃতি নেই। এইজন্যই গুরুনানক তাঁর সংসার-বিমুখ পুত্রদের বাদ দিয়ে গৃহী শিষ্য অঙ্গদকে পরবর্তী গুরু মনোনীত করেন। সন্ন্যাসির মতো ভিক্ষাবৃত্তিও শিখধর্মে নিষিদ্ধ, এইজন্য কোথাও কখনো কোন শিখকে ভিক্ষা চাহিতে দেখা যায় না। শিখগুরুদের নির্দেশ, উপার্জন ক'রে জীবনের প্রয়োজন পূরণ করতে হবে, এবং উপার্জনের একাংশ দান করতে হবে অন্যের প্রয়োজনে। সে অর্থ ব্যয় হবে লঙ্গরখানায়, গুরুদ্বারা সংরক্ষণে, বিপন্ন ও দুর্গতের সেবায়। ধর্মের নির্দেশ কি ভাবে একটি জাতির চরিত্র গ'ড়ে তোলে তা শিখদের দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

আকালী ও উদাসী সম্প্রদায়—

পরিশেষে আকালী ও উদাসী সম্প্রদায়ের কথা ব'লে এই রচনা শেষ করছি। গুরুনানক প্রচারিত ধর্মমতকে কেন্দ্র ক'রে অনেকগুলি সম্প্রদায় ও সংস্থার উদ্ভব হয়। তাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ্য আকালী ও উদাসী সম্প্রদায়।

গুরুগোবিন্দ সিংহ শিখসম্প্রদায়ের মধ্যে যে সামরিক চেতনা সঞ্চারিত করেন তারই প্রতিক্রিয়ারূপে আকালীদের উদ্ভব। আকালী শব্দের অর্থ ঈশ্বরে নিবেদিত যোদ্ধা। তাদের পাগাড় নীলবর্ণের, কৃপাণ নিত্যসঙ্গী এবং তারা সকল পার্থিব কর্তৃত্বের বিরোধী। অষ্টাদশ শতকে শিখসম্প্রদায়ের উপর আকালীদের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাদের উদ্দামতা ও রণোন্মাদনা ক্রমে শিখসম্প্রদায়ের পক্ষে সমস্যা হ'য়ে দাঁড়ায়। আকালীদের ইংরেজ-বিদ্বেষ মহারাজ রণজিৎ সিংহের মতো পরাক্রমশালী নৃপতিকেও বিব্রত করে এবং তিনি আকালীদের প্রভাব বিনাশে সচেষ্ট হন। শতদ্রু নদী পেরিয়ে আকালীরা যাতে বৃটিশশাসিত এলাকায় গিয়ে হামলা করতে না পারে তার জন্ম রণজিৎ সিংহ শতদ্রু নদীর তীরে সৈন্ম পাহারার ব্যবস্থা করেন।

আকালীদের লুঠতরাজ ও অন্যান্য সমাজ-বিরোধী কার্যকলাপ শিখ শক্তির পতনের অন্যতম কারণ। শিখসাম্রাজ্য ভেঙে যাওয়ার পর আকালীরা ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাদের কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ রাখে।

উদাসী শিখধর্ম থেকে উদ্ভূত আর একটি সম্প্রদায়। নানক পুত্র শ্রীচন্দ ঐ সম্প্রদায়টির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন ব'লে তাদের 'নানক পুত্র'ও বলা হয়। উদাসী সম্প্রদায়ের সকলে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী। তাঁদের কথা, নানক তাঁর শিষ্যদের সংসার-বিরাগী হতেই বলেছিলেন। উদাসীদের এই যুক্তির প্রতিবাদে বলা হয়, নানক নিজে সংসারী ছিলেন এবং পুত্ররা সংসারবিমুখ হওয়ায় তিনি তাঁদের বাদ দিয়ে তাঁর গৃহী-শিষ্য অঙ্গদকে পরবর্তী গুরু মনোনীত করেন।

তৃতীয় গুরু রামদাস ঘোষণা করেন যে, সংসারত্যাগী উদাসী একটি স্বতন্ত্র সম্প্রদায়, গৃহী ও কর্মপরায়ণ শিখদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। উদাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে পরে হিন্দুদের সম্পর্ক নিকট হয়। কিন্তু ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস বাদ দিলে উদাসী সম্প্রদায়ের সঙ্গে শিখদের পার্থক্য সামান্যই থাকে। তারা জাতিভেদ-বিরোধী ও একেশ্বরবাদী এবং গ্রন্থসাহিবই তাদের ধর্মগ্রন্থ। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে এখনও উদাসী সম্প্রদায়ের লোকদের দেখা যায়।

"আবার তোরা মানুষ হ"

জিতেন্দ্রনাথ পাল

বেশ কিছুদিন হতে কলকাতার রাজপথের দুপাশের দেওয়ালে কতকগুলি বিশেষ লেখা দেখা যাচ্ছে, যথা—"বাঙালী বাঙলা বাঁচাও", "৯০% কর্মপ্রার্থী বাঙালীর চাকুরী চাই", "বঙ্গভঙ্গই, বাংলার অধঃপতনের কারণ", "বাঙালী, জাগো" ইত্যাদি। Bengal National Volunteer Party ওরফে B.N.V.P এই বুলিগুলি লিখেছেন বলে' প্রকাশ। এই লেখাগুলি পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের দুজন বড় কর্মচারীকে কিছুটা অস্বস্তিতে ফেলেছিল বলে খবরের কাগজের রিপোর্টে দেখা গিয়েছিল। সম্ভবতঃ তাঁরা এই বুলিগুলির মধ্যে প্রাদেশিকতার গন্ধ পেয়েছিলেন। কিছুদিন আগে ষ্টেট্স্‌ম্যান্‌ পত্রিকায় এই পার্টি ও বুলিগুলির সম্বন্ধে একটা সুদীর্ঘ রিপোর্ট বেরিয়েছিল। তা দেখে রাইটার্স বিল্ডিংএর কর্তারা আশ্বস্ত হয়েছেন বলে মনে হয়। এই রিপোর্টে বলা হয়েছিল, B.N.V.P কোন রাজনৈতিক দল নয় এবং এই বুলিগুলির কোন রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই।

B.N.V.P কি উদ্দেশ্যে এই লেখাগুলো লিখেছেন তা সঠিক না জানলেও একথা বলা বোধহয় ভুল হবে না যে, এই বুলিগুলির পিছনে পশ্চিমবাংলার কিছু সমস্যার ইঙ্গিত রয়েছে এবং সে সমস্যাগুলি অবাস্তব নয়। পশ্চিম বাংলার দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও দুর্নীতি যে রকম ভয়াবহ গতিতে বেড়ে উঠেছে তাতে যে কোন চিন্তাশীল বাঙালীকে ভাবিয়ে তুলবে।

পশ্চিমবাংলার প্রাণকেন্দ্র কলকাতা আজ যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছে তার কথা একটু চিন্তা করলে পশ্চিমবাংলার বর্তমান অবস্থা খানিকটা বোঝা যাবে।

ধনীরা যে অংশে বাস করেন সে অংশ ছাড়া কলকাতার আর সকল জায়গার রাস্তাঘাট আবর্জনায় ভরা। কলকাতার এবং আশে পাশের শিল্পগুলি ক্ষয়ের পথে। আসানসোল অঞ্চলে কিছু নতুন শিল্প গড়ে' উঠলেও পশ্চিম বাংলা এখন আর শিল্পে ভারতের প্রথম রাজ্য নয়। মহারাষ্ট্র ও গুজরাট্ শিল্পে ভারতের পশ্চিম বাংলাকে ছাড়িয়ে গেছে বলে' শোনা যাচ্ছে, অথচ প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে পশ্চিমবাংলাই শিল্পে ভারতের সকল রাজ্যের শীর্ষে ছিল।

কলকাতা ভারতের প্রধান বন্দর ছিল কিন্তু এখন আর তার সে গৌরব নেই। এই বন্দর ক্রমশঃ বুজে আসছে। ফরাক্কা প্রকল্প সফল হলেও কলকাতা বন্দর হিসাবে তার আগেকার জায়গা ফিরে পাবে বলে' মনে হয় না।

বঙ্গভঙ্গের পর পূর্ববঙ্গ হতে কলকাতায় বাস্তুহারাদের যে অবিরাম স্রোত বইতে সুরু হয়েছে তার শেষ এখনও হয়নি। এই বাস্তুহারাদের কোন সুষ্ঠু পুনর্বাসন এ পর্যন্ত সম্ভব হয়ে উঠেনি। পূর্ববঙ্গের বাস্তুহারা ছাড়াও পশ্চিমবাংলার গ্রামাঞ্চল হতে এবং বাংলার বাইরের ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্য হতেও বহুলোক জীবিকা অন্বেষণে কলকাতায় এসেছে ও আসছে। এই ত্রিমুখী জনপ্রবাহের চাপে কলকাতার আজ নাভিশ্বাস উঠেছে। এর রাস্তাঘাট বিপর্যস্ত, পরিবহন ব্যবস্থা পর্যুদস্ত ও জনস্বাস্থ্য বিকৃত।

পশ্চিমবাংলার প্রাণকেন্দ্র ও প্রধান নগর এই কলকাতায় বাঙালীর স্থান ক্রমশঃই সংকীর্ণ হয়ে আসছে। বাঙালীরা খাস কলকাতা হতে ক্রমশঃই অপসারিত হচ্ছে এবং বস্তী অঞ্চলে ও সহরতলীতে আশ্রয় নিচ্ছে।

ইম্প্রুভমেণ্ট্ ট্রাষ্ট কলকাতার যেসব উন্নতি করছেন তাতে সাধারণ বাঙালীরা কতখানি উপকৃত হচ্ছে?

পুরোনো ভাঙা বাড়ী ভেঙে ফেলে জমির উন্নতি করে' সেই জমি ট্রাষ্ট নীলামে বিক্রী করছেন কিন্তু তার দাম এত বেশী উঠছে যে সাধারণ বাঙালীদের পক্ষে সে জমি কেনা সম্ভব হচ্ছে না। এক দিকে উত্তর ও মধ্য কলকাতার জমির আদিম মালিক বাঙালীরা উৎখাত হচ্ছেন, অন্যদিকে তাঁরা খাস কলকাতায় উঁচু দরে জমি কিনে পুরোনো বাড়ীর বদলে নতুন বাড়ী তৈরী করতে পারছেন না—ফলে, হয় তাঁরা বস্তীতে নয়, সহরতলীতে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। পূর্ববঙ্গ হতে যেসব বাঙালীরা এসেছেন বা আসছেন তাঁদের বেশীর ভাগই বস্তী অঞ্চল ও সহরতলীতে বাস করছেন। খাস কলকাতা হতে বাঙালীরা এইভাবে ক্রমশঃই হটে যাচ্ছেন।

গ্রামাঞ্চলের অবস্থা যে বিশেষ ভাল তা বলা যায় না। কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়নে অনেক খরচ করা হয়েছে বটে, কিন্তু উপকৃত হয়েছে মুষ্টিমেয় ধনী কৃষকেরা। গরীব চাষী, ভূমিহীন কৃষক ও কৃষি মজুরেরা বিশেষ কিছু উপকৃত হয়েছে বলে মনে হয় না। এদের অনেকে এখনও বছরের অনেক সময় দুবেলা পেট ভরে, খেতে পাচ্ছে না।

এখনও রাজ্যের বহুস্থানে কৃষির জন্য জলের সুব্যবস্থা নেই। কৃষি এখনও বৃষ্টির উপর নির্ভরশীল। অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি এখনও কৃষির মস্ত সমস্যা। কৃষি-উৎপাদন এই কারণে মোটেই যথোপযুক্ত নয় এবং এখনও এই রাজ্যে অন্নসমস্যা একটা প্রধান সমস্যা।

এই রাজ্যে নিরক্ষরের সংখ্যা এখনও শতকরা ৬০-৬৫ জন। শিক্ষার প্রসার সেরকম কিছু হয় নি। স্কুল কলেজ কিছু বেড়েছে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা কিছুই নয়। তা ছাড়া, শিক্ষার মান কিছুই বাড়েনি এবং শিক্ষা সময়োপযোগীও হয়নি। যারা শিক্ষা পাচ্ছে তারা আবার অনেকেই কাজ পাচ্ছে না—ফলে, শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে এবং এতে সমাজে নানারকম দুরারোগ্য ব্যাধির সৃষ্টি হচ্ছে।

বাঙালীর প্রধান খাদ্য—ডাল, ভাত, মাছ, দুধ-এর কোনটারই বাংলাদেশে প্রাচুর্য নেই। কলকাতার বাজারে কিছু কিছু মাছ পাওয়া গেলেও তার যা দাম তা দিয়ে সাধারণ বাঙালীর পক্ষে মাছ খাওয়া সম্ভব নয়। কলকাতায় অবশ্য সরকার বিজ্ঞাপন দিয়ে এবং আগাম দাম নিয়ে দুধ বলে' একটা সাদা জলীয় পদার্থ খাওয়াচ্ছেন পাড়াগাঁয়ে তাও দুর্লভ।

যা খেয়ে মানুষ শরীরে বল পায় এবং রোগকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে, তার কি অবস্থা?—বস্তাপচা চাল, দূষিত ঘি, দুর্মূল্য ও ভেজাল দুধ, দুর্লভ মাছ এবং বিষাক্ত তেল। এই খেয়ে বাঙালীরা শক্তিশালী হবে কি করে'? আমাদের "সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা" বাংলায় আজ অন্ন নেই, স্বাস্থ্য নেই, আনন্দ নেই এবং চারদিকের যা হালচাল, তাতে ভবিষ্যতের কোন ভরসাও নেই।

B. N. V. P. যদি রাজনৈতিক দল হোত, তাহলে এই সব সমস্যার একটা সহজ সমাধানের কথা তারা শোনাতে পারত—তারা বলত—"আমাদের পাটিকে ভোট-দিয়ে গদিতে বসাও, দেখবে সব সমস্যার সমাধান হয়েছে।" এই পার্টি রাজনৈতিক দল নয়, তাই সমস্যার ইঙ্গিত দিয়েছে মাত্র, তার সমাধানের কথা কিছু বলেনি।

আজকালকার রাষ্ট্র পুলিশ-রাষ্ট্র নয়—জনহিতকর রাষ্ট্র। জনসাধারণ তাই রাষ্ট্রকেই সকল সমস্যার জন্য দায়ী করে। রাষ্ট্র বলতে আমরা বুঝি মন্ত্রীদের, তারপর রাজকর্মচারীদের, তারপর অন্যান্য কর্তৃত্বাধিকারী ব্যক্তিদের। সেইজন্য আমাদের জাতীয় জীবনে কোন কিছু অঘটন ঘটলেই আমরা এঁদের দায়ী করি এবং বলি এঁরা সব অপদার্থ।

কিন্তু এঁরা সব কারা? এঁরা ত কেউই বিলেত হতে আসেননি—এঁরা আমাদের অর্থাৎ জনসাধারণেরই একাংশ। তাই এঁরা যদি অপদার্থ হন তাহলে এঁরা যাদের মধ্য হতে এসেছেন সেই আমরাও অপদার্থ। আসল কথাটাই এই—আমরা বাঙালীরা এখনও ঠিক মানুষের মত মানুষ হতে পারিনি—আর এইটেই বাংলা দেশের সমস্ত দুর্দশার মূল কারণ। কথাটা হয়ত অপ্রিয়, কিন্তু সত্যি। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কিছু বিষয় আলোচনা করলেই এর সত্যতা বোঝা যাবে।

দেশ শুধু একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ড নয়। যে স্থানে আমরা জন্মগ্রহণ করেছি, সে স্থানকে আমরা আমাদের সম্মিলিত শক্তি দিয়ে যেভাবে গড়ে' তুলেছি, সেই আমাদের গড়ে' তোলা জন্মস্থান আমাদের দেশ। আমাদের দেশ আমাদের সৃজনীশক্তির প্রতিমা।

আমরা আমাদের বাংলাদেশকে কিভাবে সৃষ্টি করছি? কলকাতার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুন—বাংলা দেশের এই প্রধান শহরকে আমরা কি রকম আঁস্তাকুড় বানিয়েছি। শুধু কি কলকাতা?—যে কোন জেলা শহরে যান—হাওড়া, কৃষ্ণনগর, বর্ধমান, মেদিনীপুর—সর্বত্র সেই একই জিনিষ দেখবেন—নোংরা, জঞ্জাল ও আবর্জনার স্তূপ। পাড়াগাঁয়ে যান—সেখানেও তাই। আমরা মানুষ হলে' আমাদের চারিদিককার এই শ্রীহীনতা আমাদের চোখে লাগত এবং এই কদর্যতা দূর করবার জন্য আমরা প্রাণপণ করতাম।

কলকাতা কর্পোরেশনের ত্রুটির অন্ত নেই তা আমরা জানি; কিন্তু কলকাতার নাগরিক হিসেবে আমাদের প্রত্যেকের কি কোনও কর্তব্য নেই? আমাদের সকলের যদি কিছুমাত্র পৌরবোধ থাকত তাহলে কর্পোরেশনের হাজার ত্রুটি সত্ত্বেও কলকাতাটা এতখানি আঁস্তাকুড়ে পরিণত হত না। আমি এইখানে একটা ছোট দৃষ্টান্ত দিচ্ছি যেটা আমাদের নোংরা অভ্যাসের একটা প্রতীক হিসেবে নেওয়া যেতে পারে।

রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে লালদীঘির দিকে একবার তাকান। লালদীঘির উত্তর পাড়ে সরকারী গ্যারেজ—এই গ্যারেজের ঠিক পশ্চিমে এবং গ্যারেজসংলগ্ন একটা ফুটপাথ দেখতে পাবেন। এই ফুটপাথটা ডালহৌসী স্কোয়ারের ট্রামরাস্তা হতে মানুষ যাতায়াতের পথ হিসেবে তৈরী হয়েছিল, কিন্তু এটাকে আমরা কি ভাবে ব্যবহার করছি? এই ফুটপাথটাকে আমরা একটা প্রস্রাবখানায় পরিণত করেছি। ডালহৌসী স্কোয়ারের উত্তর পশ্চিমে কোণ দিয়ে চলবার সময় প্রয়োজন বোধ করলেই আমরা এই ফুটপাথে বসে' বা দাঁড়িয়ে মূত্রত্যাগ করে' আমাদের গন্তব্যস্থানে যাই। ফলে, এই ফুটপাথটি প্রত্যহ অগণিত লোকের মূত্রে প্লাবিত হয়ে' একটা নরককুণ্ড হয়ে' দাঁড়িয়েছে—অথচ লালদীঘির দুকোণে দুটো শৌচাগার আছে। এখানেও কি সরকারকে আমাদের পৌরবোধ শেখাবার জন্য লাঠি হাতে এক পুলিশ কনেষ্টবলকে মোতায়েন করতে হবে? এই ব্যাপারটি লিখতে আমি খুব অস্বস্তিবোধ করছি এবং এটা পড়ে পাঠক পাঠিকারা হয়ত লেখকের রুচিবোধ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করবেন, কিন্তু আমরা আমাদের সামাজিক ও জাতীয় জীবনে প্রত্যহ এত রুচিবিগর্হিত কাজ করে, যাচ্ছি যে এটাকে তার একটা প্রতীক হিসেবে লেখা প্রয়োজন মনে করলাম। পাঠক-পাঠিকারা আমাকে ক্ষমা করবেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য—বর্তমান মন্ত্রীপরিষদ যেদিন শপথ গ্রহণ করেছিলেন সেদিন এই ফুটপাথটাকে পরিষ্কার করতে দেখেছিলাম; ভেবেছিলাম, এই মন্ত্রীরা অনেক জঞ্জাল পরিষ্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, এবং হয়ত তাঁদের প্রতিশ্রুত জঞ্জাল সাফ্ হতে সুরু হ'ল, কিন্তু আমাদের সে আশা ফলবতী হয়নি—কারণ ঐ ফুটপাথটা এখনও সেই অবস্থাতেই আছে।

আমরা নিজেদের খুব বুদ্ধিমান বলে' মনে করি তাই কাজ না করে' ফাঁকি দিয়ে, শুধু কথার জোরে কাজের ফল পেতে চাই, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে যে কিছুই পাওয়া যায় না এই পরম সত্যি কথাটা আমরা এখনও শিখতে পারিনি। আমরা কাজের দিকে মোটেই তাকাই না যেমন আমরা নিজেদের দিকে তাকাই। সুস্থ বুদ্ধি, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায় ও কর্মনিষ্ঠা আমাদের মধ্যে আদৌ নেই। অনেকে মিলে একসঙ্গে আমরা মোটেই কাজ করতে পারি না। ফলে সম্মিলিতভাবে, যৌথভাবে আমরা যে কাজ করতে যাই সেই কাজেই আমরা ব্যর্থ হই। তাই আমাদপুরের চিনির কল আমরা চালাতে পারলাম না, কল্যাণীর সূতাকল প্রায় মেরে এনেছি, কলকাতার ষ্টেট্ ট্রান্সপোর্ট প্রায় যাব যাব করছে, দুর্গাপুর প্রকল্পগুলির প্রাণ ধুক ধুক করছে এবং আমাদের শাসনযন্ত্রও—জ্যোতিবাবু যাইই বলুন না কেন, প্রায় বিকল হয়ে উঠেছে। আমরা যেখানেই কাজ করি, রাইটার্স বিল্ডিংএর সরকারী অফিসে, কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ে, বিধানসভায়, কলকাতা কর্পোরেশনে, স্কুলে, কলেজে, কলকারখানায়—সেখানেই অনাবশ্যক সংঘর্ষ বাধিয়ে তুলি এবং সময় ও উদ্যমের অযথা অপব্যয় করি। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট হতে আমরা আমাদের সকল প্রতিষ্ঠানই নিজেরা চালনা করবার সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু কিভাবে চালনা করছি? বিরোধ, শৈথিল্য, শ্রমবিমুখতা ও আত্মসর্বস্বতা এই আমাদের মূলধন; তাই আমরা যাতেই হাত লাগাচ্ছি, তাইই ছারখার হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের বই এ পড়েছিলাম—প্রায় ৬০ বছর আগে রবীন্দ্রনাথকে একজন জাপানী ভদ্রলোক বলেছিলেন "তোমরা নিঃশব্দে দৃঢ় এবং গূঢ় ধৈর্য্যের সঙ্গে কাজ করতে পার না কেন? কেবলই শক্তির বাজে খরচ করা তো উদ্দেশ্য সাধনের উপায় নয়।" আজ ৬০ বৎসর পরে যদি সেই জাপানী ভদ্রলোক বেঁচে থাকতেন, তাহলে তিনি আমাদের সম্বন্ধে ঐ একই কথা আরও অনেক জোরের সঙ্গে বলতেন। গত বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি ও জাপান প্রায় বিধ্বস্ত হয়েছিল, কিন্তু তারা আজ সামরিক শক্তি ছাড়া আর সকল বিষয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শক্তিগুলির সমকক্ষ হয়ে' দাঁড়িয়েছে। প্রাক্-স্বাধীনতাযুগে আমাদের যে অবস্থা ছিল, বিপ্লবের আগে রাশিয়া ও চীনের অবস্থা তার চেয়ে খারাপই ছিল কিন্তু তারা আজ সকল বিষয়ে পৃথিবীর তিনটি শ্রেষ্ঠ শক্তির মধ্যে স্থান করে' নিয়েছে: তার একমাত্র কারণ এইসব দেশের মানুষরা সত্যিকারের মানুষ, তারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তাদের দেশকে সৃষ্টি করে' চলেছে, আর আমরা শুধু কথার জোরে দেশ সৃষ্টি করার অলীক স্বপ্ন দেখে চলেছি তাই আমাদের এই দুর্দশা।

অজয়বাবু ও জ্যোতিবাবু সরকারী কর্মচারী হতে আরম্ভ করে' সকল প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মিকেই ট্রেড ইউনিয়ন ও গণতান্ত্রিক অধিকার দিয়েছেন, কিন্তু আমরা সেই অধিকার কিভাবে ব্যবহার করছি? আমরা সময় নেই, অসময় নেই কলকাতার প্রধান রাজপথ দিয়ে দীর্ঘ শোভাযাত্রা নিয়ে যাচ্ছি এবং দীর্ঘ সময় যানবাহন চলাচল বন্ধ করে' অসংখ্য জনসাধারণের দৈনন্দিন কাজকর্ম সাময়িকভাবে ব্যাহত করে' তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করছি। আমরা যখন-তখন রেলরাস্তার উপর বসে' ট্রেন চলাচল বন্ধ করে' কত লোকের কত ক্ষতি করছি তা একবার চিন্তাও করছি না। গণতান্ত্রিক অধিকার মানে কি কেবল মত্তত্তা? অধিকারের সঙ্গে কি কর্তব্য ও সংযম জড়িত নেই? অধিকার কি শুধু নেওয়া, কিছু দেওয়া নয়? কর্মি হিসেবে আমরা নানারকম অধিকার চাচ্ছি এবং পাচ্ছিও কিছু কিছু, কিন্তু দিচ্ছি কি? কর্তব্যে অবহেলা, অসংযম, অশালীনতা, শৈথিল্য ও আলস্য। এ কথা কি প্রায়ই শুনি না যে একজন চীনা বা জাপানী কর্মি একদিনে যে কাজ করে আমাদের একজন কর্মিকে সে কাজ করতে হলে' তার অন্ততঃ পাঁচদিন সময় লাগে? আমরা কখনও ত বলি না যে আমরা ৫ গুণ বেশী পরিশ্রম করে দেশের ধন উৎপাদন ৫ গুণ বাড়াব এবং সেই বাড়তি উৎপাদন দ্বারা আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত আর্থিক মান উন্নত করব। এটা বড়ই দুঃখের কথা, কিন্তু কথাটা সত্য যে ২২ বৎসর স্বাধীনতার পর আজ আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারছি যে আমাদের চরিত্র বলতে কিছু নেই; আর জাতির চরিত্রই যদি গেল, ত তাকে গড়ে' তুলবে কে?

অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, কর্মনীতি, প্রভৃতি নানারকম নীতির কথা বই এ পড়ি, কিন্তু যে নীতি আমাদের চোখের সমনে সব সময়ে দেখি, সেটা হচ্ছে দুর্নীতি। আর একটা নীতি আমাদের রাজ্যে খুব চলে—সেটা হচ্ছে রাজনীতি, তবে সেটা দুর্নীতিরই নামান্তর। দুর্নীতি আমাদের ব্যক্তিগত ও সমাজিক জীবনে এমন গভীরভাবে প্রবেশ করছে যে এর থেকে কোন দিন নিস্তার পাব তার কোন লক্ষণ দেখছি না। সরকারী অফিস্ হতে আরম্ভ করে, যেখানেই জনসাধারণের সুবিধে অসুবিধে নিয়ে কিছু ব্যাপার আছে সেখানেই প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ঘুষের যে ক্যালাও কারবার চলছে তা এর পূর্বে কখনও দেখা যায় নি। শুধু কি এই ঘুষ? নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য আমরা দেশের লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করতে একটুও দ্বিধা বোধ করি না। আমরা

সরষের তেলে শেয়ালকাঁটার তেল মেশাই, আটার সঙ্গে তেঁতুলবীচির গুঁড়ো মেশাই, ঘীয়ের সঙ্গে সাপ ব্যাঙের চর্বি মেশাই, বস্তাপচা অব্যবহার্য চাল ভাল চালের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রী করি, মশলার সঙ্গে মাটির গুঁড়ো মেশাই, দুধের সঙ্গে নানা জিনিসের ভেজাল দিই, আর যখন-তখন খাদ্যদ্রব্যের একটা কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে, তার দাম বাড়িয়ে নিজের মুনফাকে গগনস্পর্শী করি। তার উপর—বিদেশের হাটে আমরা যে চা পাঠাই তার সঙ্গে চামড়ার গুঁড়ো মিশিয়ে দিই, পাটের সঙ্গে অন্য জিনিসের আঁশ মিশিয়ে দিই, আর আকরিক লোহা ও ম্যাঙ্গানীজের সঙ্গে আজেবাজে পাথরের কুচো ভরে দিই—আর সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানি বাড়ছে না বলে' কেঁদে আকুল হই। এ ছাড়া, বোঝার উপর শাকের আঁটি হিসেবে কলকাতার রাস্তার ইলেকট্রিক বাল্ব চুরি করি, ইলেকট্রিক রেল-লাইনের তামার তার চুরি করি, এমনকি রাস্তায় পার্কের রেলিং পর্যন্ত চুরি করে বেচে দেই। হায় বাংলা! এই কি বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, চিত্তরঞ্জন ও সুভাষচন্দ্রের বাংলা?

লোভ, ক্রোধ আর শুধু "আমি"—এই নিয়ে আমাদের জীবন, আর এই দিয়ে আমরা আমাদের দেশ সৃষ্টি করতে চলেছি। এদিয়ে যে কিছুই সৃষ্টি হয় না, এ যে ধ্বংসের পথ—এই শিক্ষাটাই আমাদের প্রথম পাওয়া দরকার। রাস্তায়, ঘাটে, স্কুলে, কলেজে, বিশ্ববিদ্যালয়ে, সরকারী অফিসে, বিধান সভায়, কর্পোরেশন অফিসে, কলকারখানায় সর্বত্র যে জিনিসটা চোখে পড়ে সেটা হচ্ছে ক্রোধ ও ক্রোধের তৃপ্তিসাধন। এই ক্রোধের তৃপ্তিসাধনের জন্য স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্মানিত ব্যক্তিদের ঘেরাও করে, অপমান করা হচ্ছে, এইসব প্রতিষ্ঠানের অনেক মূল্যবান আসবাবপত্র মায় ল্যাবোরেটরীর যন্ত্রপাতি পর্যন্ত ভেঙ্গে পুড়িয়ে নষ্ট করা হয়েছে, ট্রাম বাস পোড়ান হয়েছে, বিধানসভায় হট্টগোল ও ঘুঁসাঘুঁসি করা হচ্ছে, কর্পোরেশন অফিসে চেয়ার ছোঁড়াছুঁড় লেগে রয়েছে এবং রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মারামারি ও নরহত্যার হিড়িক পড়ে গেছে। কোন রাজনৈতিক দল হয়ত এই সব উন্মত্ততার মধ্যে বিপ্লবের গন্ধ পেয়ে আনন্দিত হচ্ছেন, আমার মত লোকেরা কিন্তু আমাদের দেশ কিভাবে অনিবার্য ধ্বংসের পথে এগিয়ে চলেছে তা দেখে শঙ্কিত হয়ে উঠছে।

সমস্যার কথা অনেক লিখলাম, কিন্তু সমাধান কি? সমাধান আমাদের নিজেদের মধ্যে—সমাধান বাইরে নেই। বিশ্বের দরবারে নতজানু হয়ে' সাহায্য ভিক্ষা নিয়ে আমাদের কোন সমস্যার সমাধান গত ২২ বছরে হয়নি এবং পরেও হবে না। আমাদের নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেদেরই করতে হবে। আমাদের সব সমস্যার সমাধান তখনই হবে যখনই আমরা সকলে সত্যিকারের মানুষ হতে পারব। আমাদের মনে রাখতে হবে, আমরা অসীম শক্তির অধিকারী, কিন্তু সেই শক্তি স্বয়ংক্রিয় নয়—সে শক্তিকে নিজেদের চেষ্টায় জাগাতে হবে—যে সকল দেশ সে শক্তিকে জাগাতে পেরেছে তারা অসাধ্যসাধন করছে—তার জন্য চাই—অপরিমিত অধ্যবসায় ও প্রবল কর্মনিষ্ঠা। তাই মানুষ হওয়াই আজ আমাদের প্রথম, প্রধান ও শেষ কথা। আমাদেরই এক কবি বহু দিন আগে গেয়েছিলেন—"গিয়েছে দেশ দুঃখ নেই, আবার তোরা মানুষ হ" আসুন, সেই মহান কবির সুরে সুর মিলিয়ে আজ আমরা আবার গাই—"আবার তোরা মানুষ হ।" আমরা মানুষ হতে পারলেই দেশ গড়ে' উঠবে -তা না হলে' কিছুতেই কিছু হবে না।

নবকুমারের নবজন্ম

(গল্প)

অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়

পরেশদের বাড়ীতে রাত দুপুরে বেজায় হৈ-চৈ। তাদের ঘরের পিছনে নবাকে পাওয়া গেছে অচৈতন্য অবস্থায়। তার মুখ থেকে একটা গোঁ গোঁ আওয়াজ বার হচ্ছিল। মুখে মাথায় জল দিয়ে, বাতাস করে ঘণ্টাখানেক পরে জ্ঞান হয়, তুলে রোয়াকে শোয়ান হ'ল! তার কিছু পরে স্বাভাবিক অবস্থায় এসেছে মনে হ'ল। পাড়ার অনেক লোক জড় হয়ে অনেক কথাই জিজ্ঞেস করছিল, কিন্তু নবা কোন উত্তর দেয় না। ব্যাপারটা যে ভৌতিক কিছু,—সেইটাই সকলের বদ্ধমূল ধারণা হয়ে গেল। নবার বৌ ও মেয়েও এসেছে,—দেখে শুনে তারাও কান্না জুড়ে দিল। শেষে নবা কথা বলল; বলল;—আমি বাড়ী যাব। তাতে কারুরই বিশেষ আপত্তি নেই মনে হ'ল এবং দু একজন সাহায্য করতেই সে রোয়াক থেকে নামল। তারপর আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল। পাঁচ মিনিটের রাস্তা ১০-১২ মিনিটে হেঁটে নবা, তার বৌ, মেয়ে আর পাড়ার দু চারজন লোক নবার বাড়ী পৌঁছল। নবা বাড়ী পৌঁছেই একেবারে বিছানায় শুয়ে পড়ল, শীত লাগছে বলে একটা কাঁথাও মুড়ি দিল। তার বৌকে বলল "আমার কাছে বস, আমার ভয় করছে"। খানিক পরেই সে ভালভাবেই ঘুমিয়ে পড়ল। বাইরে দুচারজন লোক তখনও বসে ছিল, নবার বৌ এসে তার ঘুমাবার খবর জানাতে তারাও যে যার বাড়ী চলে গেল।

বাকি রাতটুকু কাটতেই আবার লোকজনের আনাগোনা। নবকুমার ততক্ষণে দাওয়ায় এসে বসেছে। কারও কথার উত্তর বিশেষ দিচ্ছে না। নিজেই যেন একটা হেঁয়ালির মধ্যে পড়ে গেছে। একটা ভয়, একটা দুশ্চিন্তার ছাপ তার মুখে স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। ওদিকে পরেশদের বাড়ীও সকাল হ'ল। রাত্রে যারা এসেছিল তাদের কেউ কেউ এসে হাজির হ'ল, আরও অনেকে খবর পেয়ে একে একে আসতে লাগল। এখান থেকে যা জানা গেল তা এই যে পরেশের মা একটা শব্দ শোনেন তাতে তাঁর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি পরেশের বাবা অবনীবাবুকে ডেকে তোলেন। অবনীবাবুও শব্দটা শোনেন; তাঁদের ঘরের পিছনে বাগানের মধ্যে একটা গোঁঙানির শব্দ। টর্চ´এর আলো ফেলে জানলা দিয়ে দেখে মনে হ'ল একটা লোক পড়ে আছে। তখন তিনি ভাই মোহিতকে ডাকলেন, তারপর বাগানে গিয়ে নবাকে পড়ে থাকতে দেখলেন। তখন চেঁচামেচি-ডাকাডাকি করতেই অনেক লোক জড় হ'ল। নবা যে কেন ওখানে এসেছিল আর কেনই বা মূর্চ্ছা গেল তার কোনও কারণ কেউই বুঝতে পারলেন না।

যে জায়গায় নবাকে পাওয়া গিয়েছিল সেই জায়গাটা একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান হয়ে উঠল। সকলেই আসে, বাগানে ঘোরাঘুরি করে, নবার মাথাটা কোন্ দিকে ছিল, পাটা কোন্ দিকে ছিল, উপুড় হয়ে পড়েছিল কি চিৎ হয়ে পড়েছিল, ইত্যাদি নানা রকম প্রশ্ন করে, কিন্তু রহস্যের কোনও কিনারা হয় না। হালদারমশাই, মিত্তিরমশাই সকলেই একে একে ঘুরে গেলেন। বিজ্ঞ লোকেরা সকলেই বললেন এ অপদেবতার কাণ্ড।

দুপুরের দিকে এক নূতন আবিষ্কার হ'ল। পরেশদের বাড়ীর ওপাশে সাঁতরাদের বাড়ী। তাদের বাড়ীতে এখন কেউ নেই। চার পাঁচদিন হল ওরা কাশী গেছে, বেড়াতে। পরেশদের বাগান থেকেই দেখা গেল সাঁতরাদের উত্তর দিকের ঘরের দেওয়ালে একটা গর্ত, নীচের মাটিতে কতকগুলো ভাঙা ইট ছড়িয়ে আছে।

সিঁদেল চোরের কাণ্ড তা বেশ বোঝা যায়। পরেশদের বাগান থেকেই সকলে বেশ স্পষ্ট দেখতে পেলেন। সাঁতরাদের জমিতে যাওয়ার দরকার হ'ল না। তাছাড়া যাওয়ার আগ্রহও কারও দেখা গেল না। তবে পরামর্শ করে স্থির হল সে থানায় একটা খবর দেওয়া দরকার, কাজও সেইমত হল। বিকালে দারোগাবাবু আসলেন, পাড়ার দুচারজন মাতব্বর লোকের সঙ্গে সাঁতরাদের বাড়ীর চারপাশ ঘুরে দেখলেন। সতীশবাবুদের বাড়ী সাঁতরাদের বাড়ীর চাবি ছিল কিন্তু দারোগাবাবু বাড়ীর ভেতরে যাওয়া উচিত মনে করলেন না। সতীশবাবুকে বললেন তার ক'রে সাঁতরাদের জানাতে যে তাদের বাড়ীতে চুরি হয়েছে, খবর পাওয়ামাত্র যেন তাঁরা চলে আসেন।

নবার খবরটাও দারোগাবাবু শুনলেন। তাকে ডেকে আনা হল। নবার একটু দুর্নামও এ বিষয়ে ছিল, কাজেই এই সিঁদ দেওয়ার ব্যাপারে—তাকে অনেকেই সন্দেহ করতে লাগল। দারোগাবাবু তাকে অনেক জেরা করলেন, ধমক লাগালেন, কিন্তু তার এক জবাব, সিঁদ দেওয়ার কথা সে কিছু জানেনা, কিন্তু আর কি করে সে নিজে পরেশদের বাগানে এসেছিল তাও সে বুঝতে পারছে না। দারোগাবাবু অত সহজে ছাড়বার পাত্র নন। সিঁদকাটার জায়গায় হাতের ছাপ পায়ের ছাপ সবই রয়েছে, সুতরাং ওটা নবার কি আর কোনও লোকের তা জানা যাবে সহজেই। এই রকম মন্তব্য করে তিনি নবাকে বিদায় দিলেন।

তারপর দারোগাবাবু বললেন,—সিঁদকাটা জায়গাটা পাহারা দেওয়া দরকার। কিন্তু এইখানে একটু অসুবিধা দেখা দিল। রাত্রে কোনও চৌকিদার সেখানে থাকতে চায় না। চোখের উপর নবার অবস্থা দেখে সকলেই ভয়ে পিছিয়ে যায়। শেষে পাড়ার লোকও রাত্রে পাহারা দেবে, চৌকিদারও থাকবে, সব মিলিয়ে জনাচারেক লোক রাত্রে জাগবে এই রকম ব্যবস্থা করে দারোগাবাবু স্থান ত্যাগ করলেন।

ততক্ষণে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। পাড়ার দুচারজন ছোকরা পরেশদের বাগানে বাঁশ, হোগলা, নারকেল পাতা যোগাড় করে একটা চালা তৈরী করে ফেলল। একটা হারিকেন ও গোটা দুই টর্চ আনা হল। তাস চায়ের সরঞ্জামও এসে পড়ল। তাসখেলা, চা খাওয়া আর পাহারা দেওয়া সব একসঙ্গেই চলল। রেডিওর গানও চলল কিছুক্ষণ। তরুণ ও যুবকদের নিয়ে দুটো দল গড়া হল, তারা পালা করে সেখানে থাকল আর সাঁতরাদের বাড়ীর সিঁদদেওয়া জায়গাটা পাহারা দিল। পরদিন রজনী সাঁতরাকে তার-বার্তা পাঠান হ'ল। দিনের বেলা চৌকিদারই পাহারা দিল। দারোগাবাবু একজন কনেষ্টবলকেও পাঠিয়েছিলেন। রাতে আগের মতই পাহারা থাকল। এইভাবে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও কাটল। এদিকে নবকুমার তার কাজ কর্মে মন দিয়েছে। তার পেশা হ'ল ঘরামির কাজ। চাষের কাজে দিনমজুরিও করে থাকে। সেদিনের ঘটনা সম্বন্ধে সে কারও কাছে উচ্চ-বাচ্চ করেনা এবং এ পর্য্যন্ত কেউ তার কাছ থেকে এ সম্বন্ধে কোনও কথা বার করতে পারে নি।

এদিকে পাহারা দেবার লোকেদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ে গেছে। চতুর্থদিন সকালে পাড়ার জনকয় লোক দারোগাবাবুর কাছে গিয়ে জানাল যে রাত্রে পাহারা দেওয়ার বড়ই অসুবিধা। তিনি যদি অন্য বন্দোবস্ত করেন তাহলে ভাল হয়। দারোগাবাবু আবার অকুস্থলে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন এবং দুইজন কনেষ্টবল নিয়ে পাড়ার লোকদের সঙ্গেই সেখানে এলেন। দারোগাবাবু এসেছেন শুনে আরও দুচারজন লোক এসে জড় হ'ল। দারোগাবাবু বললেন, "আমার একজন পুলিশ ঐ গর্ত্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকবে। সে যে ঘরের কোনও জিনিষ নিয়ে নিচ্ছে না সেটা দেখার জন্য দুচার-জন সাক্ষী দরকার। আপনাদের মধ্যে থেকেই সাক্ষী বেছে নেব।" স্থানীয় লোকেরা রাজী হওয়ায় চার-জনের নাম সাক্ষী বলে লিখে নেওয়া হল। দারোগাবাবু একজন পুলিশকে টর্চ নিয়ে সেই সিঁদের গর্ত্তের ভেতর দিয়ে ঘরে ঢুকতে বললেন। একজন জওয়ান হামাগুড়ি দিয়ে আধখান শরীর ভেতরে ঢুকিয়ে

টর্চের আলো ফেলেই "আরে বাপ" বলে বেরিয়ে এল।, সকলেই কি হ'ল করে উঠল। সে বলল "একটা মড়া ঝুলছে।" দারোগাবাবু থেকে সকলেই "সে কি" বলে চিৎকার করে উঠলেন। দারোগাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক করে বল কি দেখলি?" সে বলল, গলায় দড়ি বেঁধে একটা লোক ঝুলছে।" সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়। একটু চিন্তা করে দারোগাবাবু সেই কনেষ্টবলকে বললেন, "তুমি আবার ভেতরে ঢোক, ভাল করে দেখ; মড়া থাকলেই বা ভয়ের কি আছে।" সে আবার গর্ত্ত দিয়ে খানিকটা গেল, গিয়েই বেরিয়ে এল। এসে বলল, "কেউ গলায় দড়ি দিয়ে মরেছে, তাতে আর ভুল নেই। এখন কি করব বলুন"। দারোগাবাবু বললেন, "বড়ই মুস্কিল হ'ল। বাড়ীর লোক কেউ নেই। তারাও সকলেই চলে গেছে। এখানে বাইরের লোক এসে গলায় দড়ি দেবে তা কি করে হবে! যে রাতে সিঁদ কাটা হয়েছে বলে মনে হয় তারপর থেকে পাহারা বসানো হয়েছে; এত লোকের নজর এড়িয়ে কেউ এর ভিতর ঢুকেছে তা হতে পারেনা। তাহলে দড়িতে যে ঝুলছে সে কি বাড়ীরই লোক? তবে সিঁদ কাটলই বা কে, আর নবাই বা রাতদুপুরে কিসের জন্য এদিকে এসেছিল! তা ছাড়া আজ চার দিন হয়ে গেল, লাশের ত কোনও দুর্গন্ধ বের হচ্ছেনা! কি করা যাবে আপনারা একটা পরামর্শ দিন"। মিত্তিরমশাই বললেন "যে লোকটা মরেছে সে কে তা সনাক্ত হওয়া উচিত"। দারোগোবাবু বললেন, "ঠিক কথা। স্থানীয় লোক একজন ভিতরে যাক। আপনাদের মধ্যে একজন এগিয়ে আসুন"। কেউই কিন্তু রাজী হয় না। শেষে দারোগাবাবু স্থানীয় চৌকিদার রমানাথকে বললেন, "তুমি ত এখানকার লোক, সকলকেই তুমি চেন। তুমিই ভিতরে যাও, ভাল করে দেখ লোকটা কে। তুমি দেখলেই চিনতে পারবে। "রমানাথ বললে" আমি যাচ্ছি। তবে আমার সঙ্গে একজন পুলিশও আসুক। তাই হল, রমানাথ আর একজন পুলিশ ভেতরে গেল। তারপরই রমানাথের গলা শোনা গেল। "আরে আরে এ ত মানুষ নয়। পুতুল—মডেল"। পুলিশও চেঁচিয়ে উঠল "মানুষ নয়", মানুষ নয়, কাপড় দিয়ে করেছে"। তারপর তারা একে একে বের হয়ে এল। বললে "কাপড় দিয়ে একটা মানুষের মত করেছে, সেটাই ঝুলিয়ে রেখেছে শুনে দারোগাবাবু বললেন, "এঁ্যা বল কি? দেখ কাণ্ড বাড়ির মালিক চোর তাড়াবার জন্যে করেছে। এ লোকটার কি বুদ্ধি! আর আমাদের চোরও ঐ ফাঁদে পড়েছে"। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে এখন অনেকে ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছুক। দারোগাবাবুরও আপত্তি নেই জেনে অনেকেই গেল ভেতরে। জানা গেল রজনী সাঁতরা দরজির কাজ করেন। তিনিই বোধহয় এই পুতুলটি তৈরী করেছেন আর ঐ ভাবে বাড়ি পাহারার কাজে লাগিয়েছেন। যাইহোক নবকুমারকে ডেকে আনতে বললেন। সকলের অনুমান হ'ল নবা সিঁদ কেটে ভেতরে ঢুকেছিল, তারপর মাথার উপর হঠাৎ ঐ গলা দেড়েকে দেখে ভয়ে ঐ কাণ্ড বাধিয়েছিল। খানিকপরে চৌকিদারের সঙ্গে নবকুমার হাজির হ'ল। তাকে সব ব্যাপারটা ভাল ক'রে বলতে সে মাথা নীচু ক'রে রইল। দারোগাবাবু বললেন "এখন নবাকে ফাটকেই রাখতে হবে, বাড়ীর মালিক ফিরলে তখন ওকে চালান করা যাবে। আর আপাততঃ পাহারা দেবে আমার কনেষ্টবল আর চৌকিদার"। তারপর তিনি নবকুমারকে নিয়ে থানায় চলে গেলেন।

সেদিনই রজনী সাঁতরা কাশী থেকে এসে পড়লেন। সমস্ত ব্যাপারটা পাড়ার লোকের কাছে শুনলেন; তারপর পাড়ার দু-চারজন লোককে নিয়ে থানায় দারোগাবাবুর কাছে গেলেন। দারোগাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "মশাই আপনার বুদ্ধির তারিফ করি। তবে নবা যদি মরে যেত তাহ'লে ব্যাপারটা অন্যরকম দাঁড়াত। যাক, এখন আপনি ডাইরি লেখান, আমরা কেস করে দিই"। এদিকে নবার বৌও সকলের সঙ্গে থানায় এসেছে আর সবার পায়ে মাথা কুটছে। তার কান্নায় অনেকেরই মন নরম হয়েছে মনে হ'ল। রজনীবাবু আর ঝঞ্ঝাটের মধ্যে যেতে চাননা। এমন কি দারোগাবাবুও ডাইরি করার বিশেষ ইচ্ছুক নয় বোঝা গেল। শেষে তিনি বললেন, আপনাদের সকলের ইচ্ছা হ'লে এ যাত্রা নবকুমারকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে"। তখন নবকুমারকে আনা হ'ল। দারোগাবাবু বললেন, "সকলের সামনে নাকে খৎ দিয়ে বল আর কখনও চুরি ডাকাতি করবিনা"। নবা দ্বিরুক্তি না করে দারোগাবাবুর হুকুম তামিল করে বৌ এর সাথে ঘরে ফিরল।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

মহৎ, বৃহৎ তুমি, একাই একটা প্রতিষ্ঠান,—
জাতি দেশ ভুলিবেনা যে মাহাত্ম্য করিয়াছ দান।
বেশে বাক্যে ব্যবহারে জাতিকে করেছ তুমি শুচি,
অকুৎসিত করে নিলে বহু দিবসের রূঢ় রুচি।
তুমি যে নৈষ্ঠিক ব্রাহ্ম, মহামনা ব্রাহ্মণ উদার।
সবাকার মধ্যে ছিলে একেবারে সবাকার বীর।
পার্থের শরের মত নিশিত সুতীক্ষ্ণ ছিল ভাষা,
ভাবিতে শিখালো সবে এনে দিল আকাঙ্ক্ষা ও আশা
চাওনি প্রতিষ্ঠা তুমি সে যে কাছে আসিয়াছে নিজে।
স্বাধীনতা-হীনতায় আঁখি তব উঠিত যে ভিজে।
সত্য শিব সুন্দরের তুমি ছিলে নিত্য উপাসক,
এক সাথে প্রবর্ত্তক, সংস্কারক আর সম্পাদক
চাহিয়াছ শিবেতরে চিরদিন করিবারে দূর।
দুর্লভের প্রার্থী তুমি—চাওনি যা আপাতমধুর।
সারাদেশ জাতি চাহে আজি যে তোমার মত লোক।
যে তপস্বী দিতে পারে অমৃত ও নূতন আলোক।

——

-সন্তোষ-

যতীন্দ্রপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য

(Robert Green. 1560 (?)—1592)

মধুর হয় সে-চিন্তা সন্তোষের স্বাদ যাতে রয় ;
রাজমুকুটের চেয়ে শান্ত মন বেশী মূল্যবান ;
সে-রাত্রি মধুর হয় নিরুদ্বেগ ঘুমে হ'লে লয় ;
ক্ষুদ্র বিত্ত ঘৃণা করে সৌভাগ্যের রোষাগ্নি নবাব।
এই তৃপ্তি, এই মন, এই নিদ্রা আনন্দ মধুর
রাজপুত্র নাহি পায়, ভোগ করে ভিক্ষুক আতুর।
সাদাসিধে গৃহ যেথা আছে মহাশান্তির বিশ্রাম ;
শোক অথবা চিন্তা যে-কুটীর ক'রে না প্রদান ;
পল্লীগানে সর্ব্বাধিক যাহাদের পূরে মনস্কাম ;
আমোদ, গানের সঙ্গী যাহাদের হয় প্রিয় প্রাণ ;
আঁধার জীবন হয় সুগভীর আনন্দপ্রতীক,
রাজা আর রাজ্য দুই-ই, যাহাদের মন দুই ঠিক।

মানবতা চির অনির্বাণ

॥ শান্তশীল দাশ ॥

মানবতা মরে নাক সে চিরদিনের,
সে শাশ্বত, অনির্বাণ দীপশিখা তার ;
আপন ঐশ্বর্য নিয়ে যুগে যুগান্তরে
চলেছে সে, যাত্রা তার কখনো থামে না।

মাঝে মাঝে নেমে আসে কত না আঘাত ;
অন্ধকার চারিদিকে, গুপ্ত ঘাতকের
হত্যালিপ্সা, সুনিপুণ শাণিত ছুরিকা
হয়তো বা কিছু ম্লান করে দেয় দ্যুতি।

তবু সে অম্লান থাকে, মরেনা, মরে না।
অন্ধকার দূরে যায়, পরাভূত হয়
ঘাতকের তীক্ষ্ণ অস্ত্র, হার মানে যত
অশুভ শক্তির দম্ভ ; চির অনির্বাণ
দীপ্তি নিয়ে সে ভাস্বর আপন গৌরবে—
মানবতা মরেনাক,' সে চিরদিনের।

॥ দ্বন্দ্ব ॥

পূর্ণেন্দুপ্রসাদ ভট্টাচার্য

ঈশ্বরেও দ্বন্দ্ব আছে : অনন্ত চৈতন্য যাঁর মান,
স্বেচ্ছায় মূর্ছিত হয়ে জড়ের জড়তা হয়ে যান ;
মর্ত্যে হয়ে যান স্থূল, যদিও সূক্ষ্ম তিনি অণোরণীয়ান ;
যদিও আদিতে এক, জগতে তিনিই খান খান।
কেননা তিনি যা নন, তা হতে পারার
সক্ষমতা আয়ত্ত তাঁর।
বিরুদ্ধ প্রকৃতি নিয়ে তিনি পরা, তিনিই অপরা ;
আয়নায় আপন ভঙ্গি যেন বিপরীত ক'রে ধরা।

জগতেও দ্বন্দ্ব আছে। অতি স্থূল অপরা জগতে
প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে পরাশক্তি হতে
ব্যষ্টি আর বিশ্বের বিরুদ্ধ-বোধ
দ্বন্দ্ব-বিরোধ
সত্তার গভীরে কাজ করে।
সে-বিরোধ গতি দেয়, ক্রমাগত গড়ে
ব্যষ্টিগত আমি থেকে পল্লীগত, ভাষাগত, দেশগত আমি
এবং এমনি ক'রে বিশ্বগত আমি সত্তবামি।
সীমা থেকে অসীমায়, ক্ষর থেকে অক্ষরে কী সুন্দর
সেতুবন্ধ হয় ;
এবং মর্ত্য-সীমা ছাড়িয়ে স্বর্গের সিঁড়ি [illegible]

ওঁচা

(গল্প)

জ্যোতির্ম্ময়ী দেবী

বেশ বড় স্কুল নামকরা। মাষ্টারমশাইরা সব বিদ্বান। স্কুল-প্রতিষ্ঠাতা মহাশয় একেবারে সাধু মহাত্মার মত, লোকে বলে। দেশবিদেশ থেকে ছেলেরা পড়তে আসে। বড় বড় লোকের ছেলে।

গরমের ছুটির বিকালবেলা। ছেলেরা মাঠে খেলা করছিল। একটা শ্যামবর্ণ দশ-এগারো বছরের বালক তার জামার পকেট থেকে কি একটা বস্তু গোলমতন, নারকোলনাড়ু তিলেরনাড়ু যাইহোক বের করে নিয়ে মুখে পুরল।

'কি খাচ্ছিস ভাই'? একটী ছেলে জিজ্ঞাসা করল।

সে বললে 'নাড়ু'।

আমাকে একটা দে না

তাকে একটা সে দিল। নিজেও আর একটা খেতে লাগল। আরো দু একটা ছেলে এসে পাশে এসে জড় হ'ল নাড়ু খেতে। কিন্তু আর নেই। একটা ছেলে খেলার মাষ্টারকে ডেকে বললে, 'মাষ্টারমশাই, দেখুন সুবল কি খাচ্ছে একলা একলা, আমাদের দিচ্ছেনা'।

সুবল তখনো মুখে সেটা চিবোচ্ছে। গিলে ফেলতে পারেনি।

মাষ্টারমশাই খেলার ও নীতিপাঠেরও মাষ্টার। এলেন। বললেন কি খাচ্ছ সুবল?

সুবল সহজ মুখে বললে 'নারকেল নাড়ু'। তখনো চিবোচ্ছে।

'কোথায় পেলে?

'বাড়ী থেকে আসবার সময় এবারে ঠাকুমা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন খিদে পেলে একটা-দুটো খাস্'।

মাষ্টারমশাই কঠিন হয়ে দাঁড়ালেন। 'কোথায় রেখেছ নাড়ু?

সুবল ভীত হল এবারে। বললে 'আমার বাক্সতে আছে'।

মাষ্টারমশাই বললেন 'চলো দেখি'।

ছেলেদের থাকবার ঘরে ছোটছোট সরু সরু শোবার তক্তপোষের নিচে বাক্সগুলো থাকে।

মাষ্টার মশাই ঘরে এলেন।

খেলা বন্ধ হয়ে গেছে। সব ছেলের দল পিছনে পিছনে আসছে। এসেছে।

মাষ্টারমশাই কঠিনমুখে বাক্সটা খুললেন।

একটা এ্যালুমিনিয়মের ডিবেতে কাগজে মোড়া-মোড়া মুড়ির মোয়া নারকোলনাড়ু, তিলেরনাড়ু কয়েকটী করে সযত্নে রাখা আছে।

মোড়কগুলো মাষ্টারমশাই খুলে দেখলেন। বললেন তুমি একলা খাও রোজ এসব?

এইবারে সুবলের মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। সে বললে'ঠাকুমা বলেছিলেন খিদে পেলে খাবি'।

মাষ্টারমশাই ব্যাঙ্গের সুরে বললেন 'ঠাকুমা বলেছিলেন খিদে পেলে খাবি! আর লুকিয়ে লুকিয়ে খাবি!

মোড়কগুলো খোলা হল। তারপর মোয়া নাড়ুগুলো সমবেত সব ছেলেদের হাতে হাতে দিয়ে দিলেন। বললেন, 'খিদে পেলে এইরকম করে সবাইকে দিয়ে খেতে হয়। জানলে? বুঝেছ খোকা? ঠাকুমাকে গিয়ে বলবে মাষ্টারমশাই বলেছেন। খিদে সবারই পায়'।

ভয়ে লজ্জায় ঘেমে গিয়ে মাথা নিচু করে সুবল দাঁড়িয়ে ছিল।

একজন অন্য মাষ্টার মৃদুস্বরে বললেন, 'মাষ্টারমশাই

ওকে দেবেননা একটু' ?

মাষ্টারমশাই কঠোর মুখে বলবেন, 'না। ওর শিক্ষা হোক। নিজে একলা খাওয়ার জন্ত 'শিক্ষা' দিলাম এটা'।

ভিড় সরে গেল। কেউ কেউ নাড়ু মোয়া তখুনি খেয়ে ফেলল। ঘর প্রায় খালি। সবাই চলে গেলে ঐ মাষ্টার মশাইয়ের একটী ভাইপো আর একটী অন্ত ছেলে তার সমবয়সী, তাদের হাতের নাড়ু আর মোয়া থেকে ভেঙে নিয়ে ওকে বললে, 'আয় ভাই সুবল, আমরা খাই।'

সুবলের চোখ থেকে জল পড়তে লাগল। সে মাথা নাড়লে। নিলনা।

* * * *

ত্রস্ত বালক আর পড়া বলতে পারেনা। ভাল করে পড়ে, কিন্তু মাষ্টারমশাইদের রাগ-রাগ মুখ দেখে উত্তর দিতে গেলেই থতমত খেয়ে যায়। হয় চুপ করে যায় নয় উত্তর ভুল হয়।

আর মাষ্টারমশাই হরিশবাবু দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলেন, 'পড়া পারবে কেন? লুকিয়ে লুকিয়ে খাবার খেতে শিখিয়েছে বাড়ীতে। পড়তে ত শেখায়নি। মাথাটিতে একেবারে 'গোবর'—গোবর ভরা'।

কোন মাষ্টার চুপ করে থাকেন। কেউ বা সায় দেন। ওপর তলায় হেডমাষ্টারমশাই কিংবা প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতার কানে কথা পৌঁছলেও তাঁরা ধরে নেন, ছেলেটা খারাপ বোকা। এইটাই হওয়া উচিত অথবা ঠিক কাজ।

'গোবর ভরা মাথা' ক্লাসের খেলার মাঠের সঙ্গীরাও শোনে। মজা ও কৌতুকের হাসিতে ভেঙে পড়ে। ক্রমে তাকে 'গোবর গণেশ' 'ওরে গোবরা' গোবর্দ্ধনবাবু যা মনে আসে। সুবল আর কিছু বলেনা।

যতদিন যায় ঠাট্টা ব্যঙ্গের ভারে বালক আরো হতবুদ্ধি হয়ে যায় পড়াশোনায়।

আর সব ক্লাসের সব মাষ্টারমশাই ওর বোকা, ভীত, নিরীহ মুখের দিকে চেয়ে বিকট উৎকট বিরক্তিতে ওর ভুল ধরেন। যেন ওর পড়াশোনা সবটাই ভুল। বলেন, 'একেবারে অপদার্থ'। হরিশমাষ্টার বলেন, 'দেখছেন তো একেবারে ঔঁচা, ঔঁচা ছেলে। আমাদের এত বড় ইস্কুলে এমন ঔঁচা ছেলে কখনো আসেনি'। এবং সমস্ত ক্লাসের সব ছেলে 'ঔঁচা', 'গোবর'ও বলে তাকে। তারা ভেবে নিয়েছে তাদের খুব বুদ্ধি, তারা খুব ভালো ছাত্র।

পূজার ছুটি এসে পড়ল। সুবলের বাবা নিতে এলেন। খুব একটা নামকরা বিদ্বান বা বড় চাকুরেও নয়। মাঝারি সেকেলে ধরনের গেরস্থ মানুষ। যাঁর ভারি আশা ছিল, ছেলেকে ভাল স্কুলে পড়ানোর। এই স্কুলটার 'নাম ডাক' ছিল।

হরিশ মাষ্টারমশাই এবং অন্ত মাষ্টারমশাইরা তিন মাসের খাতা খুলে নম্বর দেখিয়ে এবং বাক্যে তাঁকে জানালেন যে, তাঁর ছেলেটি অপদার্থ, ঔঁচা, গোবরগণেশ।

বিনা প্রতিবাদে সাধারণ মানুষ পিতা নীরবে সব শুনলেন। ছেলেও ছলছল চোখে মাথা নিচু করে বাপের পাশে দাঁড়িয়ে নিজের অযোগ্যতার কাহিনীর বিশদ ব্যাখ্যা এবং বাক্সখুলে মোয়া নাড়ু খাওয়ার, বাড়ী থেকে কুশিক্ষা পাওয়ার গল্পটা এবং তাঁদেরই ওকে এইসব 'কুশিক্ষা' দেওয়ার কাহিনীও আবার শুনল।

পিতা আরও শুনলেন ওকে আর পড়িয়ে কি হবে। নিয়ে যান। কারুর দোকানে টোকানে বসিয়ে দিন, মুদিখানা বা দরজী অথবা অন্ত কিছুর।

পুত্রের অযোগ্যতায় দুঃখিত ও হতবুদ্ধি পিতা পুত্রকে নিয়ে নীরবে চলে এলেন। ছেলের কোন বিশেষ বন্ধু ছিলনা। তবু যেন কিছু ছেলের মনে দুঃখ হ'ল। দু একজন কাছে এসে দাঁড়াল একটু বিমর্ষ-ভাবে। যেন ঐ অপমান তাদেরও মনে বেজেছিল।

* * *

অনেক বছর তারপর কেটে গেছে।

বহুবাজারে একটি দরজীর দোকানের সামনে হরিশ মাষ্টারমশাই এসে দাঁড়ালেন।

লোকমুখে শুনেছেন ছাঁট-কাট ভাল এ'দোকানটার।

হয়ও কম। তাঁদেরই নাকি কোন্ ছাত্র দোকান করেছে এখানেই। এইটেই নাকি?

তাঁদের ছাত্র? কোন্ ছাত্র? হবে কোনো ছাত্র। তা পড়েশুনে ভাল চাকরী না করে দরজীর দোকান দিতে বসল কোন্ ছাত্র? হ্যাঁ, তাঁদের ছাত্র? বাজে কথা! যাই হোক এখন ষাট প্রায় বয়স, বৃদ্ধ মাষ্টারমশাই রিটায়ার করে কলকাতার কাছে শহরতলীতে একজায়গায় আছেন। ছাত্র অনেক। কেউ কৃতী। কেউ মাঝারি। দেখা হলে চিনতে পারে মাত্র। কেউ পারে না। সরে পড়ে—তিনি আশীর্বাদ করার আগেই বা নিজেদের ছাত্র বলে গর্বিত হবার আগেই।

দোকানে ঢুকলেন। একটুখানি জায়গায় দোকান। তবে পরিষ্কার। একটী মুসলমান দরজী একটা সেলাইয়ের কলে কাজ করছে একটা জামা না ফতুয়া। মাটীতে জাজিমে বসে আর দু-তিনটি ছেলে হাতে টেঁকে দিচ্ছে সার্ট, হাফপ্যাণ্ট, ব্লাউজ। আর অন্য একদিকে দুটি মেয়ে—মেয়েদের আর শিশুদের জামায় সেলাইয়ের 'কারু কাজ 'ফুল কাজ' করছে।

২৭।২৮ বয়সের দোকানী যুবক বসে বসে কি পড়ছিল। তিন দিকের তাকে নানারকম ভালো মন্দ খেলো দামী ছিটের এবং সাদা কাপড়ের থান। লোকটির সামনে গন্ধ-কাঠি দিতে। আর কিছু বই যেন পাঠ্যপুস্তক একটা শেল্‌ফে। তার টেবিলেও।

সে বৃদ্ধকে দেখে উঠে এলো। বললে, 'কি চাই'?

হরিশ মাষ্টার চারদিকে তাকিয়ে দেখছিলেন, বললেন 'তৈরী পোষাক পাওয়া যাবে?'

তৈরীতে সস্তা, এবং মজবুত হবে, না, করিয়ে নিলে ভালো হবে?

সে তাঁর চেয়ে অনেক ছোট। কিন্তু সত্যি কি কোনো ছাত্র, চিনতে তো পারছেন না। ছাত্র হলে কিছু সুবিধা দরের কথা বলা যেত। এবং দামও কেলেটেলে রাখা চলত। আপনি বা তুমি কি বলে এখন কথা বলা যায়?

দোকানী তার দোকানের একটী ছেলেকে—যারা দরজীর সেলাই টেঁকে দিচ্ছিল—বললে, 'নীলু ওঁকে তৈরী জমা আর জামার কাপড় সব দেখাও তো। আমি দর বলে দিচ্ছি।'

হরিশ মাষ্টার টেবিলের কাছে একটা ক্রেতাদের বসবার বেঞ্চিতে বসে পড়লেন।

দোকানীর টেবিলের বইগুলোতে নজর পড়ল। কমার্সের পাঠ্য বই। কে পড়ে? দোকানী? ততক্ষণে তৈরী সার্ট জামার থান ছিট সব তাঁর সামনে এসে পড়েছে। দোকানী নেমে বসেছে দেখাবার জন্য। তিনি একবার তার নম্র শান্ত মুখের দিকে চাইলেন।

তারপর জামার কাপড় এবং তৈরি জামার দরের জিজ্ঞাস্য বিষয় জেনে নিলেন। জামাও পছন্দ করলেন। এবং ফাঁকে ফাঁকে দোকানীর মুখ দেখেন। বেশ ভদ্র সংযত ধীর ছেলেটা। ওঁদের স্কুলের ছাত্র বলে চিনতে তো পারছেন না। তা কমার্সের বইটা কে পড়ছে? ওই নাকি? দোকানীর পড়ার সখ আছে।

কিছুটা ছিটও কিনলেন বাড়ীর ছেলেমেয়েদের জন্য। দোকানী বিল দিল।

টাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে এবার জিজ্ঞেস করলেন, পরিচয় নেবার কৌতূহলে—কতদিন দোকানটা চলছে? আপনারই দোকান? আপনার নামটী কি?

'দোকানটা প্রায় পনের ষোল বছর চলছে। আমার বাবা আমাকে দোকানটা করে দিয়েছিলেন।' একটু থামল, 'যেখানে পড়তাম সেখানকার মাষ্টারমশাইরা বাবাকে বলেন ওর মাথা-টাথা নেই পড়ায়। কিছু হবে না—তাই—আবার থামল।

'আমার নাম সুবলচন্দ্র ঘোষ।'

সেই কঠিন হরিশমাষ্টারের পা পাথর হয়ে গেলো। পা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। মনে হল চলে যান। কিন্তু পারলেন না। কিন্তু মন আর মুখে সেই আগের কঠিনতা দেখা গেল না। একটু বিব্রত হলেন।

তারপর বিব্রতভাবে বললেন 'পড়াশোনা আর করা হয় নি? তবে এই বইগুলো কে পড়ছে?'

'না, একটু পড়েছিলাম ম্যাট্রিক অবধি।'

'তুমি' বলে ফেললেন এবারে "পাশ করেছিলে?" মনে ভাবছেন নিশ্চয় পাশ করে নি। মাথা তেমন ছিল

কি? ছিল না তাঁরা জানতেন তো।

দোকানী বললে 'হ্যাঁ পাশ করেছিলাম।'

'পাশ করেছিলে? কোন ডিভিশনে?'

'সেকেণ্ড ডিভিশনে।'

'সেকেণ্ড ডিভিশনে? তা আর পড়লে না কেন? মনে একটু কাঁটা খচ্ খচ্ করে।

পড়ার খুব ইচ্ছে ছিল কিন্তু বাবা বল্লেন কোনওরকম করে বেরিয়ে গেছ বোধহয়। এখন কাজ কর। তোমার কি আর মাথা আছে বেশী পড়বার মত। বিশ্ববিদ্যালয়ের মত? একটু থেমে বললে 'অঙ্কে খুব ভাল নম্বর পেয়েছিলাম কিন্তু তাই ভারি পড়ার ইচ্ছে হয়েছিল! ও বইগুলো আমার। সন্ধ্যের পর কমার্স ক্লাসে এখন এই একবছর পড়ছি। প্রায় ৮ বছর তো পড়াশোনা করা হয়নি। পারব কিনা কে জানে।

কমার্স পড়ছে। হরিশবাবু নীরব। সেই ওঁচা ছেলে। কিন্তু ছেলেটা শান্ত আর ভদ্র ছিল......। অবাধ্য ছিল না। একটু স্খলিত এলোমেলোভাবে বললেন 'তা' তোমাদের সেই স্কুলটার নাম কি।' তাঁর হয়ত ভুল হয়েছে। একনাম হলেই যে একমানুষ হবে তার কোনো মানে নেই।'

দোকানী সেই বিখ্যাত স্কুলের নামটা বললে। আপনি জানেন নাকি স্কুলটা?'

জানেন কিনা? মাষ্টারমশায় নীরব। সব মনে আছে তাঁর। অস্পষ্ট করে বল্লেন। 'হ্যাঁ কিছু'দিন ওখানে একসময়ে ছিলাম।

ছিলেন?' দোকানী সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল সেই 'মোয়ার ভাগ নিতে আসা বন্ধুদুটির কথা। আপনি সেখানে সতীশ মিত্তিরকে চিনতেন?

হরিশমিত্র মাষ্টারমশাইয়ের ভাইপো? আর কেষ্ট গোপাল ভট্টাচার্য্যি?'

হ্যাঁ হ্যাঁ চিনতাম বৈকি।' একটু থামলেন, কেষ্ট বেশ ভালো কাজ করছে দিল্লীতে।' আবার থামলেন 'সতীশ' ভাইপো বললেন না। পরিচয় দিলেন না।

'সতীশ কম বয়সেই মারা গেছে।' তিনিও শুনেছিলেন কার কাছে তার মোয়া দেবার কথাটা। যদিও দোকানী সে কথা বলল না।

দোকানী 'আহা!' বলে নীরব হল। সেই মুঠো-করা হাতে নাড়ুটা নিয়ে' আর ভাই আমরা খাই' বলা। মনে আছে। মনে আছে।

হরিশবাবু উঠলেন। সেই ওঁচা ছেলে! সেই তার বাক্স থেকে নাড়ু বার করে অন্যদের দিয়ে দেওয়া। সেই শিশুকে বালক শিশুর আশা আনন্দ-উৎসাহময় সরল মনকে 'মুচড়ে মুচড়ে' ছোট করে দেওয়া! মানুষ হতে না দেওয়া সবাইমিলে। হ্যাঁ মানুষ হতে না দেওয়াই তো।' তাঁর কতখানি ইতর নিষ্ঠুর হাত তাতে ছিল?

দোকানী এসে নমস্কার করতে গিয়ে কি ভেবে প্রণাম করে বললে, 'আমি তারপরেই চলে আসি। কারুকেই আর মনে নেই। আপনাকে হয়ত দেখেছিলাম।' নাম জিজ্ঞাসা করতে সঙ্কোচ হল অল্পবয়সী মানুষের।

মাষ্টারমশাই সিঁড়ি দিয়ে নামলেন। পরিচয় দিতে পারলেন না। বলতে পারলেন না। 'দেখেছ। দেখেছ আমাকে। খুবভাল করেই দেখেছিলে। এবং দেখছি এখন আমার ছেলেও অন্যকারুর জন্য আমার জন্যও কিছু তুচ্ছ বড় ভাল জিনিষ রাখেনা। একলাই সব ভোগকরে। 'মানুষ' হয়েছে। তা হয়েছে।

লেখাপড়া শিখেছে? একটু হাসির রেখা মুখে জাগল। তা' শিখেছে! কিন্তু শিক্ষা? তাকে 'শিক্ষা' দিতে পারেননি। হরিশবাবু রাস্তায় নেমে গেলেন।

যেন বিভ্রান্তভাবে মনেমনে বলতে লাগলেন আর আসব না? না, আসবে না, আসতে পারবো না। না, না, আসতে হবে। পরিচয় দিতে হবে। বলে যেতে হবে আমিই তোমাকে মুচড়ে ভেঙে দিয়েছি।

তোমাকে শিক্ষা দিচ্ছি ভেবেছিলাম—। এখন কমার্স পড়ে মানুষ হওয়ার সময় আছে কি?

কিন্তু তাকি মনে করলেই আসা যায়, না, পরিচয় দেওয়া যায়। এবং মানুষের মত মানুষ হয়েছে এমন কোনো ছাত্রের কথা মনে পড়ল না তাঁর মনের ইতিহাসে।

একটি রহস্যজনক কাহিনী

যোগেশচন্দ্র মজুমদার

আমার এই বৃদ্ধ বয়সে (বর্ত্তমানে ৮৮ চলিতেছে) জীবনে দুইবার রহস্যময় ঘটনার সম্মুখীন হইতে হয়। ইহার মধ্যে একটি ঘটনার আমি উল্লেখ করিব। এই রহস্যময় ঘটনাটির রহস্যের আমি আজও সমাধান করিয়া উঠিতে পারি নাই। অনেক বন্ধুবান্ধবের নিকট ইহা বিবৃত করিয়াছি কিন্তু কেহই এই ঘটনার রহস্যচক্র ভেদ করিতে না পারিয়া নির্ব্বাক হইয়াছেন। পাঠক পাঠিকারা ইহার উপর কোনও আলোকপাত করিতে পারিবেন কি না জানিনা। এই ঘটনাটি বিবৃত করিবার পূর্বে একটি পট-ভূমিকার প্রয়োজন হইবে। উহা হইল নিউদিল্লীর পত্তন এবং উহার ক্রম-বিবর্দ্ধন। যথাস্থানে উহা উল্লিখিত হইবে।

সে আজ প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বের কথা।

সুদীর্ঘ তেত্রিশবৎসর কেন্দ্রীয় সরকারী অফিসে আমাকে অতিবাহিত করিতে হয়। ১৯০৭ সালে শিমলায় আমি কর্মে যোগদান করি। সারা বৎসর শিমলা থাকিতে হইত না। শীত পড়িলে কলকাতায় পাঁচ মাস কাটাইতে হইত। ১৯১২ সালে রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইলে উহা শিমলা-দিল্লী হইয়া দাঁড়ায়। নূতন দিল্লী না গড়িয়া উঠা পর্য্যন্ত শিমলায় কর্ম্মচারীদের থাকিবার ব্যবস্থা হয়। ১৯৩৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকার শিমলার পাট চুকাইয়া শেষবারের মত দিল্লী নামিয়া আসেন। ইহার পরবৎসর আমার কর্ম্ম হইতে অবসর লইবার কথা। এই বৎসরের জন্য রেডিং রোডের (বর্ত্তমান মন্দির মার্গ) উপর যে কয়টি বাংলো ছিল তাহার মধ্যে একটি আমার বাসের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়। পদমর্যাদা অনুসারে বাসভবনগুলির ব্যবস্থা হইত।

সু-উচ্চ দেওয়াল-ঘেরা বৃহৎ কম্পাউণ্ডের মধ্যে এই বাংলোটি অবস্থিত। বাড়ির ভিতরে দুই দিকে উঠান। একটি এত বড় ছিল যে উহাতে অনায়াসে ব্যাডমিন্‌টন্ খেলিতে পারা যাইত। ইহারই এক কোণে একটি ছোট পাকা গোয়ালঘর ছিল। পূর্ব্বে যেসব কোয়ার্টার্সে থাকিয়াছি তাহার তুলনায় এই কোয়ার্টারটি বেশ প্রশস্ত বলিয়া মনে হইল। স্বতন্ত্র প্রশস্ত বৈঠকখানায়, তিনটি বড় শয়নঘর এবং দুইটি ante-roomও ছিল। উপযুক্ত furniture এ বাড়ীটি সজ্জিত। দরজা, জানালায় খসখসের টাটি। প্রশস্ত রান্না, ভাঁড়ার ঘর ও পাচক-ভৃত্যদের জন্য out-house ছিল। দুইটি প্রশস্ত স্নানঘর দুইটি বারান্দার শেষপ্রান্তে অবস্থিত ছিল। কিন্তু বাড়ীটির সংস্থান একটু বিচিত্র বলিয়া মনে হইল। বাংলোটি রেডিং রোডের উপর অবস্থিত হইলেও ইহার প্রবেশ দ্বার উহার উল্টা দিকে অবস্থিত। বাড়ীর পিছন দিকটি রেডিং রোডের উপর। এ ব্যবস্থা কেন করা হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারি নাই। প্রবেশঘরের সম্মুখে একটি সুদীর্ঘ তৃণাচ্ছাদিত সুন্দর Lawn ছিল। উহারই পাশাপাশি কয়েকটি বাংলো। বাড়ীটি পছন্দ হইল বটে কিন্তু একটি ব্যাপার দেখিয়া মন অপ্রসন্ন হইয়া উঠিল, আমার বাড়ীটির অতি নিকটেই একটি ভগ্নপ্রায় মসজিদ ছিল। প্রায় সংশ্লিষ্ট বলিলেও চলে। উহার ভগ্নাবস্থা, মেরামত করিয়া চুণকাম করিয়া নূতনত্ব দিবার একটা প্রয়াস ছিল। এই স্থান হইতে একটি সরুগলি আমার বাড়ীর পাশ দিয়া Reading Road-এ গিয়া মিশিয়াছে। বাসস্থানের এত নিকটে মসজিদ থাকাতে মনে যে অপ্রসন্নতা জাগিয়া উঠে তাহার

একটি কারণ বর্ত্তমান ছিল। প্রায়ই দেখিয়াছি যে মসজিদের কাছে কবর দেওয়া হইয়া থাকে। ইহার প্রমাণও পাইলাম পূর্ব্বে যে সুদৃশ্য Lawn এর কথা বলিয়াছি ইহার ঠিক মধ্যস্থলে অযত্নাবস্থায় রক্ষিত দুইটি কবর বর্ত্তমান। Lawn-এর সম্মুখে একটি বড় রাস্তা। উহার অপর পারে Haig Square এ কবর-সংশ্লিষ্ট কয়েকটি বাড়ীও চোখে পড়িল। কোনও কবরটি সুরক্ষিত ছিলনা। উহারা সব আগাছায় পরিপূর্ণ হইয়া দৃষ্টিকটু হইয়া বিরাজ করিত।

আমার বাসভবনটিও হয়ত কোনও কবর অপসারিত করিয়া তাহার উপর নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এ সন্দেহ কেন মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল তাহা বলিতে পারিনা। ইহার প্রমাণও পরে কিছু কিছু পাই। রান্নাঘরের পাশে যে খাবারের ঘরটি ছিল উহাতে প্রায়ই অজস্র কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ার আবির্ভাব হইত। উহাদের সংখ্যা এত অধিক হইত যে এক এক সময় মনে হইত ঘরের মেঝেটি কম্বলে আবৃত। বৃহদাকার কাঁকড়া ও তেঁতুলেবিছাও মাঝে মাঝে দেখা দিত। ইতিপূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, ভগ্ন ও অযত্নরক্ষিত কবরগুলি এই সব কীট পতঙ্গের আবাসভূমি হইয়া থাকে। মাঝে মাঝে আহারের অন্বেষণে উপরে উঠিয়া আসে।

এই সম্পর্কে আবার কয়েক বৎসরের পূর্ব্বের একটি ঘটনা মনে পড়িল। ১৯২১ সালে নভেম্বর মাসে আমাদের অপিস হঠাৎ শিমলা হইতে দিল্লীতে কয়েক মাসের জন্য নামিয়া আসে। বিলম্বে আমার যোগ্য কোনও কোয়ার্টার পাওয়া সম্ভব হইল না। যাহাহোক অবশেষে একটি ছোট কোয়ার্টার বন্দোবস্ত হইয়া গেল। বৈঠকখানা ব্যতীত আরও দুইটি শয়নঘর ছিল। ভাঁড়ার ঘর ছিল না। পাচক ভৃত্যদের থাকিবার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। আমার পরিবারটি তখন ক্ষুদ্র, স্ত্রী ও তিনটি শিশু সন্তান লইয়া কোনভাবে তিন চারি মাস কাটাইয়া দিতে পারিব ভাবিলাম। দুইটি শয়নঘরের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড় সেই ঘরটিতে আমি শয়নের ব্যবস্থা

ভ্রাতাও সে সময়ে আমার সঙ্গে ছিল। সে বৈঠক-খানাটিকে Bed-sitting room করিয়া লইল। অন্য ঘরটি প্রায় খালিই পড়িয়া রহিল। আমার সঙ্গে একটি ঘাড়োয়ালি চাকর আসিয়াছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে সে মেসোপোটেমিয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে ফিরিয়াছে। যুবক দৃঢ় শক্তিশালী দেহ। স্বভাব শান্ত হইলেও কথাবার্ত্তায় একটু উগ্রতার ছোঁয়াচ ছিল। তাহার জন্য স্বতন্ত্র কোন ঘর না থাকায় সে অসন্তুষ্টির ভাব প্রকাশ করিল। তাহাকে অতঃপর আমি খালি ঘরটি অধিকার করিতে বলিলাম। এই ব্যবস্থা হওয়ায় সে খুব খুসী হইয়াছে বলিয়া মনে হইল। নিজের বাক্স ও বিছানাপত্র এই ঘরটিতে গুছাইয়া লইল। অতঃপর বাড়ীর ভিতরে যে ক্ষুদ্র উঠানটি ছিল তাহা দেখিতে গিয়া যাহা চোখে পড়িল তাহাতে মনে অত্যন্ত অস্বস্তি জাগিয়া উঠিল। দেখি যে উঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বেশ বড় কবর—অযত্নরক্ষিত। পাশেই একটি বেশ বড় ঝাঁকড়া কুল গাছ। বাড়ীতে ছোট শিশু, কে কখন গিয়া তাহার উপরে উৎপাত বা অপকর্ম করিয়া বসিবে সেজন্য ভাবিত হইলাম। গৃহিণী ও ভৃত্যকে এ বিষয়ে সাবধান করিয়া দিলাম। সমস্তদিনে বাড়ীটি গুছাইয়া লওয়া হইল। রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে ভৃত্যকে সাবধান করিয়া দিলাম, সে যেন শয়ন করিতে যাইবার পূর্ব্বে খিড়কি দরজা ও অন্যান্য দরজাগুলি বেশ ভাল করিয়া অর্গল বন্ধ করে। কারণ সে সময়ে নিউ দিল্লীতে চুরি, ডাকাতি এমন কি খুন পর্য্যন্ত হইতে দেখা যাইত।

নিশ্চিন্ত মনে শুইতে গেলাম। আমার খুব ভোরেই শয্যাত্যাগ করা অভ্যাস। পরদিন প্রাতে যখন ঘর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছি, দেখি যে ভৃত্য যে-ঘরটিতে শুইয়া ছিল উহার দ্বার উন্মুক্ত। ভৃত্যকে ঘরের ভিতর দেখিতে পাইলাম না। সে এত ভোরে কোথায় গেল ভাবিতেছি হঠাৎ তাহার ঘরটির পাশে যে একটি ক্ষুদ্র গলির মত জায়গা ছিল সেখানে আমার দৃষ্টি পড়িল। দেখিলাম ভৃত্যটি একটি কম্বল মুড়ি দিয়া সেখানে ঝিমাইতেছে। চুল উস্ক-খুস্ক, চোখ দুইটি আরক্ত, মুখ

বলিল তাহাতে মনে বিস্ময় জাগিয়া উঠিল। সে যাহা বলিল তাহা এইরূপ : সব কাজ করিয়া যখন সে সেই ঘরটিতে আলো নিভাইয়া নিজের বিছানায় শুইয়া পড়িয়াছে ও তন্দ্রাগত হইয়াছে মাত্র এমন সময় সে দেখে, ঘরটি আলোকিত হইয়াছে এবং একজন দাড়িওয়ালা মুসলমান বৃদ্ধ অপদেবতার (চুড়ৈল) আবির্ভাব হইয়াছে। সে ভৃত্যটিকে তর্জনগর্জন করিয়া বলে যে, সে কেন তাহার কবরের উপর শুইয়াছে এবং শীঘ্র সেই স্থানটি ত্যাগ করিতে বলে, নতুবা তাহার সমূহ বিপদের সম্ভাবনা। অতঃপর ভৃত্যটি তাহার শয্যা ত্যাগ করিয়া সমস্ত রাত্রি তীব্র ঠাণ্ডায় বাহিরে আসিয়া রাত্রি কাটাইয়াছে। ঘুমাইতে সে পারে নাই। অবশেষে বলিল যে এ বাড়ীতে তাহার কাজ করা সম্ভব হবে না। আমাকে অন্য বাড়ীর সন্ধান করিতে বলিল। অবশেষে অনেক করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া বলিলাম যে উহা সম্ভব নহে কোনও ক্রমে তিন চার মাস কাটাইয়া সিমলা ফিরিয়া যাইব। সে কাজে নিযুক্ত রহিল বটে তবে প্রাণান্তে সেই ঘরটির সীমানায় যাইত না। রান্না ঘরে তাহার শুইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।

উপরি-উক্ত ঘটনার কিছুদিন পরে একটি নূতন সংবাদ কানে আসিয়া পৌঁছে, তাহাও বেশ বিস্ময়জনক। আমার সহকর্মী একজন মুসলমান বন্ধু ছিলেন। শান্তশিষ্ট স্বভাব, বুদ্ধিমান। অবিবাহিত ছিলেন বলিয়া তাহার জন্য একটি ছোট কোয়ার্টার নির্দিষ্ট হয়। তাঁহার উদ্যান করিবার সখ ছিল। নূতন বাড়ীতে আসিয়া তিনি উঠানের এক কোণে একটি ছোট বাগান করিবার উদ্দেশ্যে মালী নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু মাটী খুঁড়িতে গিয়া এক নরকঙ্কাল বাহির হইয়া পড়ে। বাগান করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিতে হইল। দুঃখের বিষয় এই ঘটনার কিছুদিন পরেই হঠাৎ তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। এই ঘটনাটি লইয়া সেসময় খুব আন্দোলন ও আলোচনা হয়।

অনেকের হয়ত জানা নাই, বর্ত্তমানে যে স্থানে নিউ দিল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে, এই স্থানে উহা হইবার কথা ছিল না। পঞ্চম জর্জ ১৯১১ সালে ভারতবর্ষে আসিয়া দিল্লীতে যে বৃহৎ দরবার করেন উহা Civil Lines এর অন্তর্গত টিমারপুর পল্লীর শেষ প্রান্তে যে বিশাল মাঠ ছিল, সেইখানে অনুষ্ঠিত হয়। এই দরবারে তিনি রাজধানীর পরিবর্ত্তন ঘোষণা করেন এবং প্রকাশ করেন যে তিনি যে স্থানে দরবার করিয়াছেন সেইস্থানে নূতন রাজধানী স্থাপিত হইবে। বিপুল আড়ম্বরের মধ্যে তিনি নূতন রাজধানীর ভিত্তি-প্রস্তর সেইস্থানে স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই বিশেষজ্ঞেরা অভিমত প্রকাশ করেন যে সম্রাট যে স্থানটি নির্ব্বাচন করিয়া গিয়াছেন তাহা নূতন রাজধানী হইবার পক্ষে আদৌ উপযুক্ত নহে।

ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব হইবার সম্ভাবনা ও যমুনা নদী অতি নিকটবর্ত্তী থাকায় প্রবল বন্যায় নগরের ক্ষতি হওয়া সম্ভব বলিয়া এই স্থানটি পরিত্যক্ত হয়।

অতঃপর স্থির হয় যে নূতন রাজধানী অন্যত্র না গড়িয়া উঠা পর্যন্ত টিমারপুরে একটি অস্থায়ী রাজধানী করা প্রয়োজন। কলিকাতার মার্টিন কোম্পানীকে এই কার্যের ভার দেওয়া হয় এবং অচিরকাল মধ্যেই বড়লাট ভবন, সেক্রেটারিয়েট ভবন ও একটি সুদৃশ্য পল্লী (Colony) গড়িয়া উঠে। এই অঞ্চলে পুরাতন সমাধি বড় একটা দেখিতে পাই নাই। চমৎকার পরিবেশের মধ্যে অবস্থিত এই কলোনীটি দেখিলে মনে আনন্দ জাগিয়া উঠিত। প্রায় শতাধিক কোয়ার্টার নির্মিত হয়। বালক-বালিকাদের জন্য স্বতন্ত্র বিদ্যালয়, খেলিবার জন্য প্রশস্ত মাঠ, একটি ছোট হাসপাতাল, পোষ্টাপিস এবং একটি ছোট বাজারের বন্দোবস্ত হয়। এই কলোনিটী তখন Bengali Quarters বলিয়া খ্যাত হয়। টিমারপুর কলোনির প্রবেশপথে উহা একটি প্রস্তর ফলকে উৎকীর্ণ করিয়া স্থাপিত করা হইয়াছিল।

নিকটেই যমুনাতীরে আরাবল্লী পর্ব্বতের যে ক্ষুদ্র শাখাটি প্রসারিত উহার এক স্থানে একটি সমতল প্রস্তরের উপর একটি মানুষের পায়ের ছাপ দেখিতে পাওয়া যায়। উহা আকারে সুবৃহৎ। ইহা "ভীমের পা" বলিয়া প্রসিদ্ধ। এই পদচিহ্নটির উৎপত্তির কথা কেহ বলিতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন যে মহাভারতে এই স্থানটিকে "বিষ্ণুপাদগিরি" বলিয়া উল্লিখিত করা হইয়াছে। দিল্লীর একজন রইস্ এই স্থানটি পরিষ্কার করিয়া, fencing দিয়া ভাল করিয়া বাঁধাইয়া দিয়া, একটি মর্ম্মর প্রস্তর ফলকে ইহার একটি ছোট ইতিহাস উৎকীর্ণ করিয়া স্থাপন করেন। উহার বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ জানি না, তবে অনেক ভ্রমণকারীরা এই স্থানটি পরিদর্শন করিতে যান। ইহার কিছু দূরে যমুনাতীরে একটি ছোট গুরুদ্বার দেখিতে পাওয়া যায়। দিল্লীর যতগুলি গুরুদ্বার আছে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। সিকন্দর লোদির আমলে ১৫১০ খৃষ্টাব্দে গুরু নানকজী যখন দিল্লীতে প্রথম আসেন, যমুনাতীরে তিনি এই স্থানটিতে আসিয়া বিশ্রাম করেন। ইহার নিকটে মজনু-কা-টিল্লা। অতি নির্জ্জন স্থান। এই স্থানে একটি সুফি সাধক বাস করিতেন। গুরু নানক ইহার কথা শুনিয়া এই স্থানটিতে আসিয়া বিশ্রাম করেন। দুইজনের মধ্যে ধর্ম্মালোচনা হইত এবং তাহার ফলে সুফি সাধকটি গুরুনানকজীর শিষ্যত্ব পরে গ্রহণ করেন।

টিমারপুরে অস্থায়ী রাজধানী যখন গড়িয়া উঠে—সেই সময় লর্ড হার্ডিং রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। নূতন নগরীর জন্য উপযুক্ত স্থান নির্ব্বাচনের জন্য তিনি ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। কতিপয় অনুচর লইয়া স্বয়ং ঘোড়ায় চড়িয়া দিল্লীর চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী বহু স্থান দেখিয়া অবশেষে অধুনা যে উচ্চভূমিতে রাষ্ট্রপতি ভবন বর্ত্তমান সেই স্থানটি নির্বাচন করেন। এই সংবাদ জানিতে পারিয়া কলিকাতায় একটি ইংরাজি সংবাদপত্রে উল্লিখিত হয় যে, যে-স্থানটি নির্ব্বাচন করা হইয়াছে উহা একটি বহু পুরাতন পরিত্যক্ত বিস্তীর্ণ সমাধিভূমি। শত সহস্র (হয়ত লক্ষও হইতে পারে) সমাধিতে উহা আকীর্ণ। বস্তুতঃ ৪৫ বর্গ মাইলব্যাপী একটি huge graveyard. এই স্থানটিতে রাজধানী স্থাপন করিতে হইলে সমাধিগুলি অপসারিত করিবার প্রয়োজন হইবে। স্বাস্থ্যের কথা ছাড়িয়া দিলেও, উহাতে হৃদয়হীনতার যে পরিচয় দেওয়া হইবে উহা একান্ত বাঞ্ছনীয় নহে। মৃতের সমাধির সরকারকে অন্যত্র সমাধি-শূন্য আকাট জমি নির্ব্বাচন করিবার অনুরোধ করা হয়। কর্তৃপক্ষ উহাতে মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নাই।

পূর্ণোদ্যমে নূতন নগরীর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। পঞ্চম জর্জ নূতন নগরীর ভিত্তি-প্রস্তর যাহা মহাসমারোহের মধ্যে টিমারপুরে স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, সেস্থান হইতে উহা অপসারিত করিয়া একদা নূতন নির্ব্বাচিত স্থানে বিনা আড়ম্বরে স্থাপন করা হয়। শুনিতে পাই এ কার্য্যটি P. W. D.-র একজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী কর্তৃক নিষ্পন্ন হয়। কলিকাতার ইংরাজি সংবাদ পত্রে উল্লিখিত হয় যে "The foundation stone of the new city has been laid by one of the subordinates of the P. W. D."

নূতন নগরীর পরিকল্পনা ও উহার নির্মাণ কার্যের জন্য বিলাত হইতে Edwin Lutyens এবং Herbert Baker-কে উচ্চ পারিশ্রমিকে আনয়ন করা হয়। বর্ত্তমানে যে ভূমির উপর "আকাশ-ভবন" বর্ত্তমান সেই স্থানে একটি সুবৃহৎ কারখানা প্রথমে স্থাপিত হয়। Alexander Rouse সেই সময়ে P. W. D.-র Chief Engineer ছিলেন। তিনি গর্ব্বভরে ঘোষণা করেন যে, উহা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ stone-yard. ইহা ২০০০ ফুট দীর্ঘ ছিল ও সমগ্র স্থানটীর আয়তন ছিল ৬৬ বিঘা। রাজস্থানের বিভিন্ন স্থান হইতে নানা প্রকার প্রস্তর আনিবার জন্য খানগুলি পর্য্যন্ত রেলওয়ে বিস্তৃত করিতে হয়। ২০০ মাইল দূর হইতে প্রস্তর বোঝাই গাড়ী সোজা ফ্যাকটরীতে আসিয়া পৌছিত। কিছু পরিমাণ প্রস্তর গয়া হইতেও আসিয়াছিল। রাষ্ট্রপতি ভবনের জন্য ইটালী হইতে Rosso Ponforico নামক রক্তাভ প্রস্তর আনয়ন করা হয়। ঐরূপ প্রস্তর ভারতবর্ষে পাওয়া যাইত না। কারখানায় প্রত্যহ ২০০০ রাজমিস্ত্রী কাজ করিত। যন্ত্রচালিত ষ্টীলের করাত দিয়া প্রস্তরগুলি যথাযোগ্য আকারে কাটিয়া বাড়ী নির্মাণের উপযোগী করা হইত। মজুরের (স্ত্রী ও পুরুষ) সংখ্যার সীমা ছিল না।

নূতন নগরীর জন্য যে স্থানটি নির্ব্বাচিত হয়ে উহা

কিম্বদন্তী যে একদা উহা পৃথ্বীরাজের সেনানিবাস ছিল। কারখানাটির নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইলে এই স্থানটি "আরা মেসিন" বলিয়া খ্যাত হইয়া উঠে। দিবা-রাত্র এই কারখানার কার্য্য হইত। যে প্রচণ্ড শব্দ জাগিয়া উঠিত উহা কেবল ভূমিকম্পের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বহু দূর হইতে এই শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইত। সেই সঙ্গে ভূগর্ভস্থ প্রস্তর ডাইনামিট দিয়া বিদীর্ণ করিবার শব্দও নিরন্তর উঠিত। নূতন নগরীর নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এই কারখানাটি চালু ছিল। বাটী নির্ম্মাণের মালপত্র বহন করিয়া লইবার জন্য একটি ছোট গেজের রেলপথের (Imperial Delhi Railway) আবির্ভাব হয়। সমস্ত নগরীর সীমার মধ্য উহা নানা শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত ছিল। কয়েকটি সুবৃহৎ 'কপিকল' (crane)ও কারখানার কাজের জন্য স্থাপিত হয়।

ক্রমশঃ কেন্দ্রীয় কর্ম্মচারীদিগের জন্য বাসভবনগুলি নির্মিত হইয়া উঠিতে লাগিল। পুরাতন সমাধিগুলি এ জন্য অপসারিত করিবার প্রয়োজন হয়। পাছে হাঙ্গামা জাগিয়া উঠে সে জন্য এ কার্য্যটি রাত্রে নিষ্পন্ন করা হইত। শুনিয়াছি তবে যে সমাধিগুলি নিতান্ত লোক-চক্ষুর সম্মুখে বিরাজ করিত অথবা অপেক্ষাকৃত নূতন তাহাতে হাত দেওয়া হইবে না। মসজিদ যে কয়টি ছিল তাহা অক্ষত রহিল। সমাধিগুলি বর্ত্তমান রহিল, উহা সুরক্ষিত করিবার কোনও উপায় অবলম্বন করা হয় নাই। এই সময়ে হিন্দুদের একটি ছোট মন্দির আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা পায়। সে কাহিনী শুনিয়া বিস্মিত হই। ১৯১৮ সালে যখন নূতন নগরীতে প্রথম বসতি আরম্ভ হয় সে সময়ে সৈন্যবিভাগের কয়েকটি অপিসের কর্ম্মচারীদের জন্য এই বাসভবনগুলি নির্দিষ্ট হয়। আমি তখন Indian Mutitions Board এ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম। আমাকেও সেই সময়ে এই স্থানে বাস করিতে হয়।

একদিন প্রাতে বেড়াইতে বাহির হইয়া দেখি যে, বাটীর অনতিদূরে একটি নূতন রাস্তার পার্শ্বে একটি বহু পুরাতন ক্ষুদ্র মন্দির তালাবদ্ধ অবস্থায় বর্ত্তমান। উহার প্রাচীরগাত্রে গেরি-মাটি দিয়া খুব বড় বড় অক্ষরে বাঙ্গলায় লেখা ছিল, "ওঁ, হরিবোলের মন্দির"। ইহা ভাঙ্গিয়া না ফেলার জন্য কোনও নির্দেশ ছিল কিনা মনে পড়িতেছে না। কাহার দ্বারা এই মন্দির স্থাপিত হইয়াছিল এবং কাহার কর্ত্তৃত্বাধীনে উহা ছিল জানিতে পারি নাই। পরে একদিন শুনিলাম না পুরাতন দিল্লী নিবাসী একটি বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই মন্দিরটি ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা জানিতে পারিয়া ঐ কথাগুলি মন্দির গাত্রে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহাকে মন্দিরের চাতালে উপবিষ্ট দেখা যাইত। এই কথা জানিতে পারিয়া একদিন আমি আমার এক আত্মীয়ের সঙ্গে তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাই। তাঁহার নয়ী সড়কে (Egerton Road) একটি কবিরাজী দোকান ছিল। তথায় গিয়া তাঁহার নিজ মুখ হইতে এই মন্দিরটি কি করিয়া রক্ষা পায় তাহা শুনি। পরে এই মন্দিরটি সংস্কার ও পুনর্গঠিত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করে। ইহা এখন ছোট কালী বাড়ী নামে খ্যাত। অধুনা ইহা Birla Trust এর অন্তর্গত।

নূতন নগরীতে আসিতে হইলে পুরাতন দিল্লী হইতে কুতব রোড হনুমানজীর মন্দির পর্য্যন্ত আসিতে হইত। এই স্থান হইতে একটি পুরাতন ধূলিসমাচ্ছন্ন রাস্তা পশ্চিম দিকে পুরাতন ছাউনির দিকে চলিয়া গিয়াছে। পথটির নাম ছিল Old Cantonment Road. (অধুনা Irwin Road ও Willingdon Crescent) উহাই তখন নূতন নগরীর মধ্যে একমাত্র রাস্তা ছিল। নূতন রাস্তাগুলি পরে নির্মিত হইয়া উঠে। হনুমানজীর মন্দিরের নিকট হইতে কর্ম্মচারীদের বাসগুলি আরম্ভ হইয়াছে। প্রায় শতাধিক বাসভবন ছিল। কিরূপ পরিবেশের মধ্যে কর্ম্মচারীদের দিন কাটাইতে হইত তাহা লিখিলে গল্পের মত তাহা এখন শুনাইবে। শুধু এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে তখন কোনও প্রকার দোকান বা বাজার হাট, ডাক্তার, হাসপাতাল ও যানবাহনের কোনওরূপ ব্যবস্থাই ছিল না। প্রয়োজন মিটাইবার জন্য তিন চারি মাইল দূরে পুরাতন দিল্লী হইতে সংসারের যাবতীয় দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া আনিতে হইত। এক্কা, টাঙ্গাওয়ালারা সহজে আসিতে চাহিত না। দ্বিগুণ অথবা ততোধিক ভাড়া দিতে হইত। রাস্তার অবস্থা শোচনীয় ছিল।

অধিকন্তু, পথে আলোর কোনও বন্দোবস্ত ছিল না বলিলেই চলে। বাড়ীগুলিতেও আলো ছিল না। কলে জল সামান্যক্ষণের জন্য আসিত। এমন কি কখনও কখনও দুই তিন দিন জল পাওয়া যাইত না। বাধ্য হইয়া পুরাতন অব্যবহার্য্য কূপের জল ব্যবহার করিতে হইত।

বাড়ীগুলিও অদ্ভুত প্ল্যানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। শুনিলে সকলে বিস্মিত হইবেন, কোনও ঘরেই জানালা রাখা হয় নাই। বিশেষজ্ঞেরা নাকি স্থির করিয়াছিলেন যে, দিল্লীর প্রচণ্ড গ্রীষ্ম ও শীত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঐ ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। অন্ধ-কূপের মধ্যে দিন রাত্রি কাটাইতে হইত। রান্নাঘরটি ঠিক বৈঠকখানার পার্শ্বেই! বাড়ীর প্রাচীর মাত্র পাঁচ ফুট ছিল। চোরেদের ভিতরে আসিবার কখনও অসুবিধা হইত না। ইহার উপর সৈন্যদের উৎপাতও ছিল। নূতন নগরীর মধ্যে কয়েকটি সৈন্য নিবাস (Barrack) ছিল। তথায় কয়েক সহস্র পাঠান ও বেলুচ সৈন্য বাস করিত। ইহারা পথিকদের উপর প্রায়ই অত্যাচার করিত ও টাকা পয়সা কাড়িয়া লইত। পুলিশের কোনও বন্দোবস্ত ছিল না, সুতরাং কোনও প্রতিকারের উপায় ছিল না।

ইহার কিছুকাল পরে সরকারী কয়েকটি বৃহৎ ভবনের যথা, দুইটি সেক্রেটেরিয়েট, কাউন্সিল হাউস (বর্ত্তমানে পার্লামেণ্টহাউস) নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। ইহারাও ত্রুটি মুক্ত ছিল না। এই সময়ে একটি কৌতুকজনক ব্যাপার ঘটে। কাউন্সিল হাউসটি নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে ইহার ভারপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়রেরা সগৌরবে ঘোষণা করেন যে ইহার গম্বুজটি এত উচ্চ করা হইবে যে নূতন নগরীর যে কোনও স্থান হইতে উহা দৃষ্টিগোচর হইবে। কিন্তু অদৃষ্টের কী নিদারুণ পরিহাস। গম্বুজটির নির্ম্মাণকার্য শেষ হইল, দেখা গেল যে উহা নগরের কোনও কোনও স্থান হইতে দেখা যাইলেও অন্য কোনও স্থান হইতে ইহা চোখে পড়ে না। এই সম্পর্কে সংবাদপত্রে নানা মন্তব্য প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, সরকারের নিকট উহা অপ্রীতিকর হইয়া দাঁড়ায়। সেই সেই সময়ে সার ভুপেন্দ্রনাথ মিত্র পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশে ভবনটির আরও একটি তলা নির্ম্মিত হইল ও গম্বুজটি লোক-লোচনের অন্তরালবর্ত্তী করিয়া দেওয়া হইল। তদবধি উহা পর্দ্দানশীনরূপে বিরাজ করিতেছে! পূর্ব্বে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছিল, নূতন তলাটি নির্ম্মাণ করিতে আরও ২৫ লক্ষ টাকা পড়িল। দুইটি সেক্রেটেরিয়েট ভবন (North Block & South Block) এর প্রত্যেকটি নির্ম্মাণ করিতে এক কোটি টাকা ব্যয় হয়। রাষ্ট্রপতি ভবনটি করিতে সম্ভবতঃ দুই কোটি টাকা ব্যয় হইয়া থাকিবে।

এই নূতন নগরীটি গড়িয়া উঠিতে প্রায় কুড়ি বৎসর সময় লাগিয়াছিল। ১৯৩১ সালে লর্ড আরউইন নূতন নগরীর নাম "নিউ দিল্লী" ঘোষণা করেন এবং এই উপলক্ষে তিনি কেন্দ্রীয় সমগ্র কর্ম্মচারীদের জন্য মোঘল উদ্যানে প্রচুর ভোজ্য ও নানাবিধ পানীয়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি কয়েকটি অনুচর সহ সুবৃহৎ নিমন্ত্রণ সভাটি পরিদর্শন করিয়া যান ও একটি ক্ষুদ্র মনোজ্ঞ বক্তৃতা দেন। তাঁহার সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে সকলে প্রীতিলাভ করেন।

আমাদের কর্ম্মস্থল ছিল সাত আট মাইল দূরে টিমারপুরে। সরকার যাতায়াতের জন্য কয়েকটি Bus এর ব্যবস্থা করেন ইহার পূর্ব্বে Bus এর প্রচলন দিল্লীতে ছিল না। অফিসে যাইবার সময় Bus এর কর্ম্মচারীদের মধ্যে নানা বিষয় আলোচিত হইত। চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি যাহা প্রত্যহ ঘটিত তাই সময়ে জানা যাইত। ভৌতিক ব্যাপার যাহা ঘটিত তাহা উল্লেখ করিয়া উহা যে সমাধি অপসারণের ফল তাহা কেহ কেহ ব্যক্ত করিতেন।

অতঃপর রেডিং রোডস্থ আমার ভবনে যে রহস্যপূর্ণ ব্যাপার ঘটিয়াছিল তাহা সংক্ষেপে উল্লেখ করিব।

এপ্রিল মাস। দারুণ গ্রীষ্ম যাইতেছে। "লু' (উত্তপ্ত বায়ু) চলিবার পূর্ব্ব-সূচনা দেখা দিয়াছে। নূতন বাড়ীতে সবে উঠিয়া আসিয়াছি। প্রতিবাসীদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিবার ইচ্ছা মনে জাগিয়া উঠিল তবে শুনিলাম যে পাশের বাংলোটী খালি পড়িয়া

—শীঘ্রই একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আসিবার কথা আছে।

বৈকাল বেলা। সূর্য্যাস্তের পর বাংলোর প্রবেশ-দ্বারের সম্মুখে যে তৃণাচ্ছাদিত 'লন' ছিল সেখানে একটি ইজিচেয়ারে বসিয়া একাকী বিশ্রাম করিতেছি। নির্জ্জন পরিবেশ। হঠাৎ দেখিলাম যে, পাশের বাংলো যাহা খালি পড়িয়াছিল তাহার প্রবেশদ্বার হইতে একটি আধাবয়সী পাঞ্জাবী ভদ্রলোক বাহির হইয়া আসিলেন। বুঝিলাম ইনিই নূতন প্রতিবাসী। আমাকে দেখিয়া আমি যেস্থানে বসিয়াছিলাম সেইদিকে পা বাড়াইলে নিকটে আসিয়া আমাকে অভিবাদন জ্ঞাপন করিলে আমিও প্রত্যভিবাদন করিলাম এবং উঠিয়া দাঁড়াইলাম। সামান্য পরিচয়াদি হইবার পর ভদ্রলোকটি বলিলেন যে, প্রথম পরিচয়েই একটি বিশেষ অপ্রীতিকর ব্যাপার আমার গোচরে আনিতে বিশেষ সঙ্কোচ বোধ করিতেছেন। ইংরাজিতেই কথাবার্ত্তা হইতেছিল। ব্যাপার কি জানিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিলাম। তিনি ব্যক্ত করিলেন যে, কয়দিন হইল নূতন বাড়ীতে আসিয়া উঠিয়াছেন। গত দুই রাত্রিতে তাঁহার বাড়ীর ভিতর অনবরত পাথর, ঢিল বর্ষিত হইয়াছে এবং তাঁহার দৃঢ় ধারণা যে আমার পাচক ও ভৃত্য তাহাদের বন্ধুদের এই কাজ। আমার বাড়ীর ছাদ হইতে ঐ দ্রব্যগুলি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তাঁহার এই ধারণার কি কারণ হইতে পারে তাহা আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন যে, বাংলোটি অনেকদিন খালি পড়িয়াছিল সে সময় উহাদের এবং উহাদের বন্ধুদের ইহাতে জুয়ার আড্ডা সম্ভবতঃ ছিল। বর্ত্তমানে তাহাতে ব্যাঘাত উপস্থিত হওয়াতে তাহারা তাঁহাকে এ বাটী হইতে সরাইবার চেষ্টায় আছে। তাঁহার এই কথা শুনিয়া আমি সমধিক বিস্ময় প্রকাশ করিলাম এবং বলিলাম যে, আমি যত দূর জানি আমার পাচক ও ভৃত্য উভয়েই সৎস্বভাবাপন্ন। তবে আপনি যদি এসম্বন্ধে উহাদের কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে হয়ত ভদ্রলোকটি বেশ উষ্মভাবেই উহাদের নানা প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাদের উত্তরে তিনি প্রসন্ন হইয়াছেন কিনা বুঝিতে পারিলাম না, আমার সহিত আর কোনও কথাবার্ত্তা না কহিয়া নিজের বাড়ী ফিরিয়া গেলেন।

অভ্যাসমত পরদিন বৈকালে আমি 'লনে' আসিয়া বসিয়াছি। কিছু পরে দেখি যে পাশের বাংলোর ভদ্রলোকটি আমার দিকে পুনরায় আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া একটু উগ্রস্বরেই জানাইলেন যে, গত-রাত্রে তাঁহার বাড়ীতে আরও উৎপাত বৃদ্ধি পাইয়াছে। বড় বড় পাথর ও ঢিল সজোরে বর্ষিত হওয়ায় ঘরের দরজা ও জানালার কাঠগুলি চূর্ণ করিয়া দিয়াছে। জেদ প্রকাশ করিয়া আমাকে তাঁহার বাড়ীর দিকে লইয়া চলিলেন। ভিতরে প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে হতবাক্ হইতে হইল। অজস্র পাথরের বড় বড় টুকরা বারান্দায় জড় করা রহিয়াছে ও কাচের টুকরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। সব দেখা শেষ হইলে ভদ্রলোকটি কহিলেন যে অতঃপর তিনি পুলিশে খবর দিতে বাধ্য হইবেন এবং তাহার ফলে আমাকে হয়ত উৎপীড়িত হইতে হইবে. পুলিশে যে কিছু করিয়া উঠিতে পারিবে সে বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল এই কথা বলিয়া প্রস্তাব করিলাম যে তিনি যদি ইহার পরিবর্ত্তে বাড়ী পাহারা দিবার জন্য দুইজন চৌকিদার নিযুক্ত করেন ত বেশী সুফল পাইতে পারেন।

পরদিন আর ভদ্রলোকটির সহিত দেখা হয় নাই। পরে একদিন আমার ভৃত্যের নিকট শুনিলাম যে পাশের বাড়ী বাহিরে ও ভিতরে পাহারা দিবার জন্য দুইটি চৌকিদার নিযুক্ত করা হইয়াছে। আন্দাজ করিলাম যে ঐ বাড়ীতে পাথর পড়া বন্ধ হইয়া গিয়া থাকিবে। তবে কে যে এই কার্য্য করিত উহা বুঝা গেলনা।

ইহার পরে আমার বাংলোয় যে ব্যাপার ঘটিল তাহা যেমনই অদ্ভুত তেমনিই অবিশ্বাস্য। ইহার

দিবসের উত্তাপ কমিলে আহার করিতে বসিতাম। রান্নাঘরের পাশেই যে ঘরটি ছিল, বাড়ীর সকলে মিলিয়া একত্রে আহার শেষ করিতাম। যে দিনের কথা বলিতেছি, সেদিন আহার শেষ হইয়া আসিয়াছে। ঘরটির যে দুইটি জানালা রেডিং রোডের দিকে উন্মুক্ত ছিল তাহার একটির নিকট বাহির হইতে কর্ণপটাহ বিদারণকারী শব্দ হঠাৎ জাগিয়া উঠিল। শব্দটি ক্রমশঃ উচ্চগ্রামে পৌঁছিলে প্রায় ধৈর্য্যচ্যুতি হইবার মত হইল। শীঘ্র আহার করিয়া উঠিয়া পড়িলাম। কোঁচার খুঁটটি গায়ে জড়াইয়া খিড়কি দরজা দিয়া, পাশে যে ছোট গলিটি ছিল তাহা ধরিয়া রেডিং রোডে, বাড়ীর পিছনে গিয়া উপস্থিত হইলাম। শব্দটি তখনও হইতেছিল। উহার শব্দ Rattle (স্থানীয় ভাষায় ঝুনঝুনা) এর শব্দের ন্যায়। শিমলায় থাকিতে Durand Football Tournament এ ইংরাজ সৈনিকদিগকে ইহা বাজাইতে দেখিয়াছি। প্রতিপক্ষকে নিরুৎসাহ করিবার জন্য ইহা সজোরে বাজাইয়া মাঠের চারিদিকে ঘুরিত।

জানালার কাছে গিয়া পৌঁছিলাম। কিন্তু কোনও লোক দৃষ্টিগোচর হইল না। দৃষ্টিবিভ্রম হইয়াছে ভাবিয়া নিকটে গিয়া চতুর্দ্দিক ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় কাহাকেও দেখিতে পাইলামনা। শব্দটি অতিরিক্ত হইয়া চলিয়াছে অথচ কে যে বাজাইতেছে বুঝিতে পারিলামনা। একবার মনে হইল উহা হয়ত অন্যত্র বাজিতেছে তাহারই প্রতিধ্বনি হয়ত এখানে আসিয়া পৌঁছিতেছে। ব্যাপারটি সত্য সত্য কি তাহা জানিবার জন্য পাশের বাংলোবাড়ির দিকে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম যে শব্দটিও আমাকে অনুসরণ করিতেছে। আমার আগে আগে বাজিয়া যাইতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর দেখি যে, পাশের বাড়ীর বাংলোর পিছনে দুইটি লোক রাস্তার ধারে একটি অশ্বত্থগাছের নীচে বসিয়া আছে। হাতে তাহাদের দীর্ঘ বাঁশের লাঠি। আমি তাহাদের নিকটে গিয়া তাহারা এই সময়ে এখানে কি করিতেছে ও তাহারা কে জানিতে চাহিলাম। তাহারা একটু ভীত হইয়াই উত্তর দিল যে, তাহারা এই বাড়ীর চৌকিদার নিযুক্ত হইয়াছে। সমস্তরাত্রি পাহারা দিতে হয়। তাহাদের সঙ্গে যখন কথা বলিতেছি, শব্দটি আমাদের কাছে আসিয়া সজোরে বাজিতে লাগিল। লোক দুইটিকে আমি এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলাম, তাহারা সন্তোষজনক কোন উত্তর দিতে পারিল না। বলিল যে তাহারা এই শব্দটি অনেকক্ষণ শুনিতেছে কিন্তু কে যে উহা বাজাইতেছে সে বিষয়ে অজ্ঞতা জানাইল। কেবল এইমাত্র বলিল যে, উহা কোনও অদৃশ্য হাত বাজাইতেছে। ইহা যে অপদেবতার কাজ হইতে পারে তাহারও ইঙ্গিত করিল।

আমি তাহাদের উত্তরে সন্তুষ্ট হইতে পারিলাম না। একবার ventriloquism এর কথা মনে জাগিল। কলেজে পড়িবার সময়ে একবার একজন প্রসিদ্ধ বিলাতী ম্যাজিসিয়ানকে উহা করিতে দেখিয়াছিলাম। তিনি মুখ বন্ধ করিয়া ইহা প্রদর্শন করিতেছিলেন মনে আছে। মুখ আরক্ত বর্ণ হইয়া উঠিত। লোক দুইটির মধ্যে হয় উহার একজন ইহা করিতেছে এ সন্দেহ মনে জাগিল কিন্তু যখন দেখিলাম দু জনেই আমার সঙ্গে বেশ কথা কহিতেছে তখন সে সন্দেহ দূর হইয়া গেল। অতঃপর আমি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া রেডিং রোড ধরিয়া যদি আরও কাহারও দেখা পাই, সেই উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইলাম। দেখি যে শব্দটি আমার সম্মুখে বাজিতে বাজিতে চলিয়াছে। নির্জ্জন নিশুতি পথ কেবল বাজনাটি বাজিতেছে। দেখিতে দেখিতে প্রায় পুলিশ-ষ্টেশনের নিকট আসিয়া পৌঁছিলাম। তখন মনে হইল বাটী হইতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি আরও অধিক দূর একাকী অগ্রসর হওয়া ঠিক হইবে না। বাজনাটি এতক্ষণ আমার সম্মুখে বাজিয়া চলিয়াছে পরে দেখিলাম উহা আমাকে ছাড়িয়া দিয়া পাহাড়গঞ্জ বাজারের দিকে আগাইয়া যাইতেছে। মনে মনে ভাবিলাম, যাক্ আপদ দূর হইল। কিন্তু যেমন বাড়ী ফিরিবার জন্য পা বাড়াইয়াছি দেখি যে, সেই শব্দটি তীব্র গতিতে আমার দিকে ফিরিয়া আসিতেছে এবং পূর্ব্বে যেমন তাহা আমার

সম্মুখেই শুধু বাজিতেছিল তাহা না করিয়া আমাকে যেন উত্যক্ত করিবার জন্য চারিদিক ঘুরিয়া বাজিতে লাগিল। কখনও পাশে, কখনও মাথার, কখনও পায়ের কাছে সজোরে বাজিতে লাগিল। কি করিয়া এই আপদ দূর হইবে সেজন্য মনে একটা দুশ্চিন্তা জাগিয়া উঠিল। যাহা হউক, ধীরে ধীরে বাড়ীর দিকে ফিরিয়া চলিলাম। বাজনাটিও চারিদিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজিতে বাজিতে চলিল।

বাড়ীর নিকট আসিয়া দেখি যে পূর্ব্বোক্ত দুইটি লোক সেই স্থানে তখনও বসিয়া বসিয়া গল্প করিতেছে। তাহারা আমাকে ফিরিয়া আসিতে ও বাজনাটি তখনও বাজিতেছে দেখিয়া একটু অসহ্য বোধ করিল। তাহারা এখনও কেন রোঁদে বাহির হয় নাই জিজ্ঞাসা করিলে বলিল একটু পরেই তাহারা নিজের কাজে বাহির হইবে। তাহাদের সঙ্গে কথা বলিতেছি সে সময়ে দেখিলাম যে, বাজনাটি আমাকে ও তাহাদের চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাজিতে লাগিল। লোক দুইটি বেশ ভয় পাইয়াছে বুঝিতে পারিলাম।

অতঃপর সেই স্থানটি ত্যাগ করিয়া আমি নিজের বাংলোর দিকে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম তখন বাজনাটি সেই স্থানটি ত্যাগ করিয়া আমাদের পিছনে পিছনে আসিতেছে। পূর্ব্বোক্ত ছোট গলিটি, যাহা মসজিদ পর্য্যন্ত গিয়াছে, তাহাতে প্রবেশ করিলাম। বাজনাটিও আমার পিছনে পিছনে আসিতেছে। নিজ বাড়ীর খিড়কীর দরজার নিকট যখন পৌঁছিয়াছি দেখি যে, বাজনাটি আমাকে আর অনুসরণ না করিয়া সোজা মসজিদের দিকে চলিয়া গেল ও মসজিদের ভিতর কয়েকবার উচ্চ শব্দ করিয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলে দেখি যে, সকলেই খুব উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়াছেন। আমাকে নিরাপদে ফিরিতে দেখিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিলেন। ব্যপার কি ঘটিয়াছিল তাহা শুনিয়া সকলে নির্ব্বাক হইলেন কিছু বলিতে পারিলেন না। ভৃত্য ও পাচক নিকটে দাঁড়াইয়া আমার নিশীথ রাত্রের অভিযান মনোযোগের সহিত শুনিতেছিল। তাহারা ইহা যে অপদেবতার কাজ এই মন্তব্য করিয়া শুইতে চলিয়া গেল।

রহস্য যে রহস্যই রহিয়া গেল।

রামমোহন রায় লিখিত ফার্সী পুস্তক

শ্রীদিলীপকুমার বিশ্বাস "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় রাজা রামমোহন রায় ও ফার্সী ভাষায় লিখিত পুস্তক জবাব-ই-তুহ্‌ফাৎ-উল্-মুওহাদিন্ সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা করিতেছেন তাহার কিছুটা উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইতেছে।

রামমোহনের নামের সঙ্গে জড়িত 'জবাব্-ই-তুহ্‌ফাৎ-উল্-মুওহাদিন্' নামক ফার্সী মুদ্রিত পুস্তিকাখানি (পুঁথি নয়) সম্পর্কিত প্রবন্ধের প্রথম অংশ ছাপাখানায় যাওয়ার পর এ বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলীতে স্বতন্ত্রভাবে কিছু আলোচনা হয়েছে ও বর্তমান লেখকের তা শুনবার ও তাতে অংশগ্রহণ করবার সৌভাগ্য হয়েছে। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে কলিকাতায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত প্রাচ্য বিদ্যাসম্মেলনের অধিবেশনে শিলচর জি, সি, কলেজের অধ্যাপক মেহ্‌রার্ আলি লস্কর এই পুস্তকাখানি সম্পর্কে এক প্রবন্ধ পাঠ করেন। সভায় বর্তমান লেখক উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক লস্করের বক্তব্য থেকে জানা গেল, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন শ্রীঅসীমকুমার দত্ত মহাশয় ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে পুস্তিকাখানির আলোকচিত্রলিপি সংগ্রহ করেন ও তার থেকে অধ্যাপক লস্কর এটি অনুশীলন ও অনুবাদ করবার সুযোগ পেয়েছেন। অধিবেশনে তিনি পুস্তিকাখানির সম্পূর্ণ ইংরেজী অনুবাদ পাঠ করেছিলেন। এই উদ্যমের জন্য শ্রীঅসীমকুমার দত্ত ও অধ্যাপক লস্কর সমগ্র পণ্ডিত-সমাজের ও বিশেষ করে রামমোহন-বিশেষজ্ঞগণের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। পুস্তিকাখানি সম্পর্কিত আলোচনার দ্বিতীয় কিস্তি শুরু করবার পূর্বে অধ্যাপক লস্করের প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা বিষয়ে আমার বক্তব্য সংক্ষেপে নিবেদন করি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আলোচনা-সভাতেও এই প্রসঙ্গ আমি উত্থাপন করেছিলাম।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রাচ্যবিদ্যা-সম্মেলনের বিভিন্ন শাখায় পঠিত প্রবন্ধগুলির যে সার-সংকলন মুদ্রিত হয়ে এই উপলক্ষে বিতরিত হয়েছে তাতে অধ্যাপক লস্করের প্রবন্ধটির সংক্ষিপ্তসার স্বভাবতঃ স্থান পেয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, এর পূর্বে (সাহিত্য-সাধক চরিতমালাতে প্রকাশিত) ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রামমোহন রায়' গ্রন্থেই একমাত্র আলোচ্য ফার্সী পুস্তিকাখানির উল্লেখ আছে। এই উক্তি ঠিক নয়। পূর্বসংখ্যাতেই আমি বলেছিলাম যে পুস্তিকা-খানির উল্লেখ সর্বপ্রথম পাওয়া যায় ই-এডওয়ার্ড্‌স্ রচিত ও ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত A Catalogue of Printed Persian Books in the British Museum গ্রন্থের ৬২৩ পৃষ্ঠায়। এর পর এটিকে উল্লিখিত হতে দেখি ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন-মৃত্যু-শতবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রীঅমল হোম সংকলিত Rammohun Roy—the Man and his Work (Centenary Publicity Booklet—No 1, June 1933) নামক পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত রামমোহন গ্রন্থতালিকায় (উক্ত পুস্তক, পৃঃ ১৪৭)। অবশ্য শ্রীযুক্ত হোমকে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ই এর সংবাদ দিয়েছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বকথিত 'রামমোহন রায়' গ্রন্থে (চতুর্থ সং পৃঃ ৮১, পাদটীকা) এই গ্রন্থের উল্লেখ করেছেন এড্‌ওয়ার্ডসের catalogue থেকে, কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি এড্‌ওয়ার্ডসের নাম করেন নি। বর্তমান লেখক যখন শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় সোফিয়া ডবসন কলেট

কৃত Life and Letters of Raja Rammohun Roy গ্রন্থ সম্পাদনা করেন তখন সম্পাদকদ্বয় টিকাটিপ্পনির মধ্যে ও শেষে সংযোজিত রামমোহনের গ্রন্থতালিকাতে এই পুস্তিকার উল্লেখ করেছিলেন। (দ্রষ্টব্য, Life and Letters of Raja Rammohun Roy. 3rd ed. pp. 36, 525)। সুতরাং আলোচ্য পুস্তিকাখানি অজ্ঞাতপূর্ব অশ্রুতপূর্ব এমন ধারণা করা সঙ্গত হবে না। অবশ্য একথা স্বীকার্য, পূর্বে যাঁরাই এ পুস্তিকার উল্লেখ করেছেন তাঁরা ধরে নিয়েছেন, এটি রামমোহনের রচনা হওয়াই সম্ভব। বর্তমান লেখকও তার ব্যতিক্রম নন। পুস্তিকার বিষয়বস্তু অনুশীলন করে এ সম্পর্কে আমার ধারণা যে পরিবর্তিত হয়েছে—তা 'তত্ত্বকৌমুদী'র পূর্বসংখ্যাতেই জানিয়েছি।

কলেট-কৃত রামমোহনজীবনী প্রকাশিত হবার পর (১৯৬২) বর্তমান লেখক কৌতূহলী হয়ে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে এই পুস্তিকাখানি সম্পর্কে যোগাযোগ স্থাপন করি ও তাঁরা ঐ বৎসরই পুস্তিকাখানির মাইক্রোফিল্ম সংস্করণ আমাকে পাঠানা। দিল্লীস্থ National Physical Laboratory-র থেকে আলোকচিত্রিত হয়ে এটি মূল মাইক্রোফিলম্-সংস্করণ সহ আমার হস্তগত হয়। ডঃ যতীন্দ্রকুমার মজুমদার মহাশয়ের সৌজন্যে দিল্লীর এক বিদগ্ধ মৌলভীর সাহায্যে প্রস্তুত এর এক ইংরাজী অনুবাদ পাবার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে—একটি বাঙলা অনুবাদ আমি স্বয়ং করেছি যেটি প্রকাশ করবার ভূমিকাস্বরূপ আমাকে এই কথাগুলি বলতে হল। শ্রী অসীমকুমার দত্ত আনীত আলোকচিত্রলিপির সাহায্যে যে ইংরেজ অনুবাদ অধ্যাপক লস্কর করেছেন—এক হিসাবে তার মূল্য অধিকতর। কেন না অধ্যাপক লস্কর ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত—মূল থেকে তিনি অনুবাদ করেছেন। আমি ফার্সী জানি না। আমাকে অপর একজন ফার্সীবিদ্‌কৃত ইংরেজী অনুবাদের উপর নির্ভর করতে হয়েছে। অধ্যাপক লস্করের অনুবাদটি শুনে আমার এই উপকার হয়েছে যে আমার অনুবাদটি তাঁর সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ মিলিয়ে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছি, দিল্লীর মৌলভীসাহেব ফাঁকি দেননি—তাঁর কৃত অনুবাদটিও যথাযথ এবং সেটির ভিত্তিতে বঙ্গানুবাদ করলে তাতে বিশেষ ত্রুটি থাকবার সম্ভাবনা নেই।

আর একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করে ভূমিকা শেষ করব। পূর্বসংখ্যায় আমি অনুমান প্রকাশ করেছিলাম, পুস্তিকাখানি অসম্পূর্ণ। এড্‌ওয়ার্ড্‌সের তালিকায় এর পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়া হয়েছে ষোল (pp. 16)। অধ্যাপক লস্করের সঙ্গে আলোচনা করেও মনে হল যে পুস্তিকাখানি সম্পূর্ণ কিনা এ বিষয়ে তিনি এখনও মনস্থির করতে পারেননি। আমার নিজের মাইক্রোফিলম্ সংস্করণটি বার বার পরীক্ষা করে আমার ধারণা হয়েছে পুস্তিকাখানির মুদ্রণের মধ্যে কিছু রহস্য আছে। প্রথম ষোলখানি পৃষ্ঠা অতি পরিচ্ছন্ন ভাবে মুদ্রিত এবং এই পর্যন্তই পাঠোদ্ধার করা যায়। তার পরে একখানি পাতা সম্পূর্ণ খালি (blank); এর পরেও একটি পৃষ্ঠা আছে যেটিতে সম্ভবতঃ অত্যন্ত অস্পষ্ট ও অপরিচ্ছন্ন ভাবে কয়েকটি পঙ্‌ক্তি মুদ্রিত (?) হয়েছিল যার পাঠোদ্ধার করা প্রায় অসম্ভব। অধ্যাপক লস্করের আলোকচিত্র লিপিটিতেও; যা অতিশয় সৌজন্যসহকারে তিনি আমাকে দেখিয়েছেন—এই সাদা (blank) পৃষ্ঠাও অস্পষ্ট কয়েক পঙ্‌ক্তি সংবলিত পরবর্তী পৃষ্ঠার ছবি দেখেছি। কোন সুবিজ্ঞ ফার্সী লিপিবিশারদ যদি এই শেষ দুই পৃষ্ঠার রহস্যোদ্‌ঘাটন করতে পারেন তাহলে সম্ভবতঃ বা এই পুস্তিকার অসম্পূর্ণত্ব ঘুচতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটি প্রশ্ন জাগে ব্রিটিশ মিউজিয়মের তালিকাকার পুস্তিকাটিকে ষোল পৃষ্ঠাসংবলিত বলে বর্ণনা করলেন কেন? শেষ দুখানি পৃষ্ঠা কি তিনি লক্ষ্য করেননি বা পাঠোদ্ধার সম্ভব নয় বলে হিসাব থেকে বাদ দিয়েছেন? সর্বশেষে উল্লেখযোগ্য অধ্যাপক লস্করের প্রামাণ্য অনুবাদ মূল ও টিকা-টিপ্পনি সহ যথাশীঘ্র প্রকাশিত হলে পণ্ডিতসমাজ উপকৃত হবেন। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা সর্বাংশে অভিনন্দনযোগ্য।

প্রধানমন্ত্রী কোন্ পথে চলিবেন?

"যুগবাণী" সাপ্তাহিকে সম্পাদকীয় মন্তব্যে দেখা যায় যে ঐ পত্রিকার মতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দেশ শাসন শক্তি যতটা ভাবা যায় ততটা নাই। ঐ সম্পাদকীয় মন্তব্যটি নীচে তুলিয়া দেওয়া হইল।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁহার বিজয় লাভের মুখেই একটি প্রচণ্ড ধাক্কা খাইয়াছেন। তিনি যে দলের নেতা, লোকসভায় সে দল নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নাই, উহা মাইনরিটি দলে পরিণত হইয়াছে। এখন তাঁহার সম্মুখে দুইটি পথ খোলা আছে। হয় তাঁহাকে অন্যান্য দলের সঙ্গে একত্রে কোয়ালিশন সরকার গঠন করিতে হইবে, নতুবা অন্যান্য দলের সমর্থনে মাইনরিটি সরকার পরিচালনা করিতে হইবে—যেমন ইতিপূর্বে কেরলে ...হুপিল্লাই ও পশ্চিমবঙ্গে প্রফুল্ল ঘোষ করিয়া গিয়াছেন। ...ইটি পথই বিপদসঙ্কুল। গত দুই তিন বছরে বিভিন্ন ...জ্যে বহু কোয়ালিশন সরকারের অভিজ্ঞতা আমাদের ...ইয়াছে—সে অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। লোকসভায় ...ধিবেশন সুরু হইবার পূর্বেই দল ভাঙাভাঙির খেলা ...রু হইয়াছে। স্বতন্ত্র পার্টির তিনজন এম. পি. দল ...গ করিয়া ইন্দিরা-গোষ্ঠীতে যোগ দিলেন আর ঘণ্টা ...য়ক পরই তাঁদের মধ্যে একজন স্বতন্ত্র পার্টিতে ফিরিয়া ...গেলেন। অর্থাৎ সেই আয়ারাম গয়ারামদের খেলা ...ার কেন্দ্রেও সুরু হইয়াছে—দলত্যাগীরা সরকার ...কে একবার মেজরিটি আর একবার মাইনরিটিতে ...ণত করিয়া দিতে কসুর করিবে না। ইন্দিরার পক্ষে ... সকল অনুগামীকে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হইবে না—...ণ সকলকেই তো মন্ত্রী বা আধা-মন্ত্রী করা যায় না। ...কারণে বিভিন্ন রাজ্যে কোয়ালিশন সরকারগুলির ...ন ঘটিয়াছে কেন্দ্রের কোয়ালিশন কিংবা বহু দল-নির্ভর ...ারও সেই কারণেই টিঁকিতে পারিবে না। গত ১৬ই ...ম্বর কলিকাতা ময়দানে শ্রীযুক্ত ডাঙ্গের বক্তৃতা আমরা ...রা শুনিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন ইন্দিরাকে নিঃশর্ত ...ন তাঁহারা দল দিবে না। কোনো জনবিরোধী ... ইন্দিরা গ্রহণ করিতে গেলে কমিউনিষ্ট পার্টি সমর্থন ...াহার করিয়া লইবে। অথচ ইন্দিরা গান্ধী বলিতেছেন যে একসঙ্গে বেশি প্রগতিশীল কাজ করিতে গেলে কোনো কাজই করিয়া ওঠা যায় না। অর্থাৎ বিস্তর বাধার সম্মুখীন একবারে হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু আসল কথাটা তিনি চাপিয়া গিয়াছেন। কায়েমী স্বার্থের প্রতিনিধিরা তাঁর পক্ষভুক্ত হইয়া বসিয়া আছেন—তাঁদের চটানো তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। যেমন, ইন্দিরা গান্ধী রাজন্যভাতা বিরোধী বিল আনিতে পারিবেন না, কারণ রাজা দীনেশ সিং, রাজা ভানুপ্রতাপ সিং প্রভৃতি তাঁর দলের বড় বড় চাঁই। শহর এলাকায় সম্পত্তির সীমা নির্ধারণ করিয়া বিল আনাও তাঁর পক্ষে কঠিন, কারণ খাস দিল্লীতেই ফকরুদ্দিন আলি আমেদ যে বাড়ি করিয়া বসিয়াছেন তার মূল্য কয়েক লক্ষ টাকা হইবে। আয়কর ফাঁকি দাতাকে শাস্তি বিধান করার সামর্থ্যও ইন্দিরাজীর হইবে না—কারণ তাঁর বড় সমর্থক বাবু জগজীবন রাম দশ বছর আয়কর ও সম্পত্তিকর ফাঁকি দিয়া চুপচাপ বসিয়া থাকার পর হঠাৎ ধরা পড়িয়া গিয়াছেন। ইন্দিরার আর একজন বড় সমর্থক শ্রীবিজু পট্টনায়েক এক কোটি টাকার উপর আয়কর ফাঁকি দেওয়ায় এখন আদালতে সোপর্দ হইয়াছেন। ইন্দিরাজীর আর এক বড় সমর্থক শ্রীযশোবন্তরাও চ্যবন পি, ডি, অ্যাক্টের সাহায্য ছাড়া স্বরাষ্ট্র-দপ্তরের দায়িত্ব নিয়াছে সক্ষম নন, অথচ কলিকাতা ময়দানে ডাঙ্গে আমাদের বলিয়া গিয়াছেন যে পি, ডি, অ্যাক্টের অবসান না ঘটাইলে তিনি ইন্দিরা সরকারকে সমর্থন করিবেন না। বহু বিরোধী দল ও দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে পড়িয়া প্রধানমন্ত্রী কাহার মনস্তুষ্টি সাধন করিবেন জানি না—শেষ পর্যন্ত তিনি কাহারও মন জোগাইতে পারিবেন কি? না পারিলে, কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়িত্ব বিচলিত হইতে কতক্ষণ লাগিবে?

আর একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক সম্ভাবনার সৃষ্টি হইয়াছে ইন্দিরাপন্থীদের উগ্র আচরণের ফলে। পার্লামেণ্ট ভবনের সামনে প্রধানমন্ত্রীর সমালোচক তারকেশ্বরী সিংহকে অপমান ও প্রহার করা হইয়াছে। স্বর্গত লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পুত্র হরিকিষণ এম. পি-কে বাড়ি যাইয়া প্রহারের ভয় দেখানো হইয়াছে ও অতি অভদ্র ভাষায় তাঁর বিরুদ্ধে উক্তি করা হইয়াছে। কংগ্রেস

ভবনের সামনে নিজলিঙ্গাপ্পা প্রভৃতিকে প্রহার করা হইয়াছে। সংযম বিজয়ী পক্ষের প্রধান অস্ত্র হওয়া উচিত কিন্তু জয়ের মুহূর্তেই ইন্দিরার অনুগামীরা অসংযত হইয়াছেন। ইন্দিরা এই অসংযত আচরণের নিন্দা করেন নাই। আঘাত প্রত্যাঘাতকে ডাকিয়া আনে—দিল্লী অঞ্চলে জনসঙ্ঘ প্রভৃতি দলের সমর্থকরা যদি প্রত্যাঘাত হানিতে সুরু করে তবে ইন্দিরার বান্ধবী সুভদ্রা যোশী নেতৃত্বে পরিচালিত উগ্রপন্থী ইন্দিরাপন্থীরা ধোপে টিকিতে পারিবে না। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন পুলিশ লেলাইয়া দিতে পারেন, কিন্তু দিল্লীতে তাহা হইলে চরম বিশৃঙ্খলা ও হিংসাত্মক কাজকর্ম দেখা দিবে। হিংসার পথে যাহাতে স্বীয় অনুগামীরা না যায় প্রধানমন্ত্রীর তাহা দেখা উচিত। নতুবা কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াইবে তাহা বলা শক্ত।

প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সবচেয়ে সম্মানজনক যে পথ খোলা আছে তাহা হইল লোকসভায় আস্থাসূচক ভোটের মারফৎ নিজের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের পর বর্তমান লোকসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া। নূতন নির্বাচনের মারফৎ প্রধানমন্ত্রী যদি নূতন কর্মসূচীর ভিত্তিতে নূতন দল লইয়া জনসমর্থন আদায় করিয়া নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লইয়া লোকসভায় প্রবেশ করিতে পারেন তবেই তাঁহার পক্ষে স্থায়ী সরকার গঠন করা সম্ভব হইবে। দলত্যাগীদের লইয়া তিনি বর্তমানে যে ভাবে দল ভারী করিতেছেন ইহা গণতন্ত্রের পক্ষে মারাত্মক। যাঁহারা অন্য দলের প্রার্থীরূপে নির্বাচনে জিতিয়াছেন তাঁহারা দলত্যাগ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর দলে আসিতে চাহিলে লোকসভার সদস্যপদ ত্যাগ করিয়া পুনরায় উপ-নির্বাচনের সম্মুখীন হওয়া উচিত এবং যদি তাঁহাদের নির্বাচকমণ্ডলী তাঁহাদের দলত্যাগ সম্পর্কে পার্লামেন্টের সর্বদলীয় কমিটি যে সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে লইয়াছেন প্রধানমন্ত্রী নিজ স্বার্থে নিজেই যদি তাহা বানচাল করিয়া দিতে প্রশ্রয় দেন তবে দলত্যাগ নামক দুধারওয়ালা অস্ত্রটি বুমেরাং হইয়া একদিন তাঁহাকে আঘাত করিবেই এবং গণতান্ত্রিক কাঠামোকেও চূর্ণ করিয়া দিবে। এজন্য লোকসভা ভাঙিয়া নূতন মধ্যবর্তী নির্বাচন হওয়াই বাঞ্ছনীয়। অবশ্য উহাতে কয়েকটি বিপত্তি আছে; প্রথমত, ইন্দিরা গান্ধী বর্তমান লোকসভা ভাঙিয়া দিবার পরামর্শ দিলেই রাষ্ট্রপতি সে পরামর্শ মানিয়া লইবেন এমন কোনো বাধ্য বাধকতা নাই। ইন্দিরা গান্ধী সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকার চালাইতে না পারিলে রাষ্ট্রপতি স্থায়ী সরকার গঠন করিতে অন্যান্য দলকে আহ্বান করিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি গোড়াতেই বলিয়া রাখিয়াছেন যে তিনি রবার ষ্ট্যাম্প রাষ্ট্রপতি হইবেন না—সকল ব্যাপারে তিনি নিজের মত অনুসারে কার্য করিবেন। এই এক বিপদ, তদুপরি ইন্দিরাপন্থীদের সকলেই যে লোকসভা ভাঙিয়া দিয়া নূতন নির্বাচনের মুখোমুখি হইতে রাজি আছে তা নয়। জগজীবন রাম নিজেই বলিয়াছেন, এখনই তিনি কোন নির্বাচন চান না। দুই কমিউনিষ্ট পার্টি, ডি এম কে, স্বতন্ত্র সদস্যগণ ইন্দিরার সমর্থক—এঁরাও নূতন নির্বাচন চান না। তাছাড়া ইন্দিরাপন্থীদের নির্বাচনে দাঁড়াইতে হইলে নূতন করিয়া দল গঠন করিতে হইবে, সেই দলের শাখা প্রশাখা দেশের সর্বত্র বিস্তার করিতে হইবে। সেজন্য সময়ের প্রয়োজন। কংগ্রেস সংগঠন এখনও সিণ্ডিকেট-পন্থীদের হাতে। অতুল্য ঘোষ নির্বাচনে দলকে চিরকাল পরিচালনা করিয়াছেন, তাঁর সে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা আছে; কিন্তু সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বা বিজয়সিং নাহার বা তরুণকান্তি ঘোষ হঠাৎ মাঠে নামিয়া নির্বাচনী আসর জমাইয়া ফেলিবেন ও নির্বাচনী বৈতরিণী পার হইবার পক্ষে আবশ্যকীয় কূট ব্যবস্থা সম্পন্ন করিয়া ফেলিবেন ইহা আশা করা যায় না সব রাজ্যেই এই একই সমস্যা দেখা দিবে। প্রধানমন্ত্রী কলিকাতায় বা অন্যত্র জনসভা ডাকিলে প্রচুর ভিড় হইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু জনসভায় লোক সমাগম ঘটিলেই নির্বাচনে জয়লাভ করা যায় না। জাল ভোট হইতে শুরু করিয়া আরও বহুপ্রকার বন্দোবস্ত সেজন্য করিতে হয়। অনভিজ্ঞদের পক্ষে সহসা তাহা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নূতন দলের শাখা-প্রশাখা ভারতের তাবৎ গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তার করিতে হইলে সময় লাগিবে। এখনই নির্বাচন হইলে কম্যুনিষ্ট দলসহ বহু সুপরিচিত দলেরই লাভ হইবে বেশী—ইন্দিরাপন্থীদের ততটা হইবে কিনা সন্দেহ। এই সব কারণে বিজয়িনী প্রধানমন্ত্রী তাঁহার চরম সাফল্যের মুহূর্তেই বহু জটিল সমস্যার মধ্যে জড়াইয়া পড়িয়াছেন—এই সব সমস্যার সমাধান খুব সহজ হইবে না।

সাময়িকী

চাঁদে কাচের মত ফোসকা

চাঁদে না কি মাটির উপরে বহু স্থলে বড় বড় ফুলে ওঠা ফোসকার মত কিছু একটা দেখা গিয়াছে। এই ফোসকাগুলি মনে হয় যেন কাচের বা তজ্জাতীয় কোন বস্তুর দ্বারা গঠিত। বৈজ্ঞানিকদিগের মতে এইরূপ ফোসকার উদ্ভব হইতে মনে হয় যে, চাঁদে ঐ সকল স্থানে টাইটেনিয়াম নামক ধাতু বর্ত্তমান আছে। ইহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে চাঁদে যাওয়া পরে লাভজনক হইতে পারে। কারণ টাইটেনিয়াম বহুমূল্যবান খনিজ বস্তু ও পৃথিবীতে তাহার চাহিদা প্রচুর থাকিলেও সরবরাহ যথেষ্ট নাই। টাইটেনিয়াম ১৭৯১ খৃঃ অব্দে গ্রেগর নামক ব্যক্তির দ্বারা আবিষ্কৃত হয় ও উহা অমিশ্রিতভাবে পাওয়া যায় ১৯১০ খৃঃ অব্দে। এই ধাতু রং এর জন্য ও অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয় ও ইহা আগ্নেয় প্রস্তরাদির মধ্যে বর্ত্তমান থাকিলেও ইহা সহজলব্ধ নহে। টাইটেনিয়াম অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন উভয় বাষ্পের ভিতরে থাকিলেই জ্বলিয়া উঠিতে পারে। অপর কোন ধাতুকে নাইট্রোজেনের মধ্যে জ্বলিতে দেখা যায় না। চাঁদে যদি টাইটেনিয়াম অমিশ্রিতভাবে প্রচুর পরিমাণে ও সহজে পাওয়া যায়, তাহা হইলে চাঁদ হইতে তাহা পৃথিবীতে আমদানি করিলে পৃথিবীর মানুষের সুবিধা হইবে। চাঁদে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যাওয়ার ইহাতে একটা লাভের দিক খুলিয়া যাইতে পারে।

কংগ্রেসের দুই মুখ।

প্রাচীন রোমানদিগের প্রধান দেবতা ছিলেন জেনাস। ইনি সকল জ্ঞানের কেন্দ্র ছিলেন ও ইঁহার চিহ্ন সকল গৃহের প্রবেশপথের উপরে অঙ্কিত থাকিত। জেনাস ছিলেন প্রজ্ঞার প্রতীক, সুবিবেচনা বুদ্ধির আধার। রক্ষণশীলতা ও প্রগতির কারণ এবং বন্ধন উন্মোচন নিয়ন্তা। এই মহাশক্তিমান দেবতার দুই মুখ ছিল ও ইঁহার মন্দিরে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে, দুইটি দ্বার থাকিত; কারণ ইনি ভূত ও ভবিষ্যৎ, অগ্র ও পশ্চাৎ উভয় দিকেই দৃষ্টি রাখিয়া মানবজীবনের সর্ব্বতোমুখী' উপদেষ্টা ও রক্ষক হইয়া বর্ত্তমান থাকিতেন। জেনাস অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনার আশ্রয় ও সকল মঙ্গল কার্য্যের আরম্ভকারী দেবতা ছিলেন এই কারণে বৎসরের প্রথম মাসের নাম তাঁহার নামের সহিত মিলাইয়া জানুয়ারী দেওয়া হয়।

দুই মুখ হওয়ার পাশ্চাত্য ঐতিহ্য তাহা হইলে বিশেষ পর্য্যালোচনার বিষয় ও একান্তভাবে গর্হিত নহে। আমাদিগের দেশেও উভয় দিকে মুখ ফিরাইবার ক্ষমতা থাকা নিন্দনীয় নহে। সুতরাং মূর্খলোকে যাহাই বলুক কংগ্রেস যে ক্রমে বহুমুখ হইয়া উঠিতেছে তাহাতে আক্ষেপ করিবার কিছু নাই। কারণ রোমান দেবতার যদি দুই মুখ ছিল; আমরাও দেবতার মুখের সংখ্যা কম করি নাই। ব্রহ্মা চতুর্মুখ ও শিব পঞ্চমুখ। আমরা সর্ব্বদাই বলি প্রতিভা বহুমুখী। সুতরাং কংগ্রেসের প্রতিভার পূর্ণ বিকাশের এই শুধু আরম্ভ মাত্র। অপরাপর যে সকল রাষ্ট্রীয় দল আছে সেগুলিও আমাদের জাতীয়তারই অঙ্গ। আমাদের রাষ্ট্রীয় গুণ তাহা হইলে বহুমুখেই ব্যক্ত হইতেছে নিঃসন্দেহে।

নিজলিঙ্গাপ্পা বলিয়াছেন শ্রীমতী গান্ধী কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইলেন। শ্রীমতী গান্ধী নিজলিঙ্গাপ্পাকে বহিষ্কৃত করিয়াছেন। একই ধর্ম্মে যেমন সিয়া-সুন্নি, শৈব-বৈষ্ণব, ক্যাথলিক-প্রটেষ্টান্ট ও মহাযান-হীনযান হইতে পারে;

আজ কংগ্রেসও সেইরূপ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইতিপূর্ব্বে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বাংলা কংগ্রেস গঠন করিয়াছিলেন। সেই কংগ্রেস অপর বিচিত্র মতবাদী রাষ্ট্রীয় দল সমূহের সহিত মিলিত হইয়া সংযুক্ত দল গঠন করিতে কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই। মন্ত্রীত্ব ভাগ বাট লইয়া কিছু দর কষাকষি হইয়াছিল কিন্তু তাহা সহজেই সর্ব্বজনসম্মতিতে মীমাংসিত হইয়া যায়। রাষ্ট্রীয়কার্য্য এখন একটা ব্যবসায়ে দাঁড়াইয়াছে এবং যৌথ কারবারের মতই এই ব্যবসায় এখন চলে। ইহাতে মতদ্বৈধ হইলে তাহার নিষ্পত্তি ব্যবসার নীতি ও রীতি অনুসারে করা হইয়া থাকে—কোনও অসুবিধা হয় না। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করিয়া যদি চাষের উন্নতি বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সাহায্য করা হয়, ত ব্যাঙ্ক জাতীয় না করিয়াও সেই কার্য্য সরকারী জামিনদারীতে অনায়াসে করা চলিত। অর্থাৎ এখন যত কর্জ্জা দেওয়া হইবে তাহার শেষ দায়িত্ব থাকিবে ভারত সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের স্কন্ধে। সরকার যদি জামিন হইয়া ঐভাবে কর্জ্জা দেওয়াইতেন তাহা হইলে ব্যক্তিগত অধিকারে চালিত ব্যাঙ্কগুলিও একইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে টাকা ধার দিতে পারিতেন। জাতীয়করণের ফলে যদি অসাবধানভাবে টাকা ধার দেওয়া আরম্ভ হয় তাহা হইলে লোকসানটাও সবিশেষভাবে "জাতীয়" হইবে। বীমাপ্রতিষ্ঠান জাতীয় করার ফলে যতটা শোনা যায় বীমা কর্ম্মীদিগের কোন লাভ হয় নাই এবং বীমা ক্রেতাগণও তুলনামূলকভাবে অধিক মূল্যে অল্পমূল্যের বীমাপত্র ক্রয় করিতেছেন। উপরন্তু কোন লোকই রসিদ প্রভৃতি ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট যথা সময়ে পাইতে সক্ষম হ'ন না। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় করিয়া যদি জাতির কাহারও কোন লাভ না হয়; তাহা হইলে শুধু সমষ্টিবাদের অভিনয় করিবার জন্য জাতীয়করণের কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। একটা কথা সকল ভারতবাসী এখন বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা হইল সুশাসনের অভাব। কংগ্রেস যখন পূর্ণ মিলিত ছিল তখন ভারতের কোন সুশাসন প্রাপ্তি ঘটে নাই। পরে অপরাপর দলের ও কংগ্রেসের ভাঙ্গা টুকরা রাষ্ট্রীয় গণ্ডির দ্বারাও সুশাসন কার্য্য সাধিত হয় নাই। কারণ রাষ্ট্রক্ষেত্রে সকল নেতাই এখন পেশাদার। স্বার্থরক্ষা ও পরার্থপরতার অভাব পেশাদারীর একটা বড় লক্ষণ। রাষ্ট্রীয়কর্ম্মীরা যে পেশাদারীর এই স্বভাব অনুগতভাবেই চলিতেছেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আমলাগণ অবশ্য পেশাদারী ব্যতীত অপর কিছুই বোঝেন না। কংগ্রেসের অনেক লোক আজকাল প্রায়ই কম্যুনিষ্ট বা অন্যান্য দলের সহিত মিলিতভাবে কাজ করিবার কথা বলিয়া থাকেন। কংগ্রেস যদি ঐ সকল দলের সহিত একত্র কাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে নিজেদের মধ্যে কংগ্রেসের বিভিন্ন গণ্ডির লোকেরা কাজ করিতে পারেন না কেন?

বাড়ী চড়াও করিয়া "ঘেরাও"

সম্প্রতি "ঘেরাও" নামধারী বে-আইনী উৎপাতের একটা নূতনরূপ দেখা দিয়াছে। এখন আরম্ভ হইয়াছে লোকের বাড়ী চড়াও করিয়া বাড়ীর লোকদিগকে বাহিরে যাইতে না দেওয়া ও বাহির হইতে কাহারও বাড়ীতে প্রবেশ নিবারণ করা। একটা বড় রাস্তার উপরে একটা বৃহৎ বাড়ীতে দেখা যাইতেছে বহুসংখ্যক লোক ঢুকিয়া বসিয়া রহিয়াছে ও মধ্যেমধ্যে তারস্বরে নিজেদের মনের কথা উচ্চারণ করিতেছে। এইভাবে কোন লোকের বাড়ী চড়াও করা সাক্ষাৎভাবে বে-আইনী একথা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা দেশের বর্ত্তমান শাসকগণ ইহাকে ট্রেডইউনিয়নের স্বাভাবিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়া ইহাতে কোন বাধা দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছেন না। কিন্তু ইহা যদি **Collective Bargaining** (সমবেতভাবে দরকষাকষি) বা **Bipartite Negotiation** (দ্বিদলীয় চুক্তি চেষ্টা) বলিয়া আইনতঃ গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে যদি কর্ম্মীদিগের গৃহে লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে মালিকপক্ষের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাও আইনত গ্রাহ্য হইবে

বলিয়া আশা করা যায়। তাহা হইলে মালিক ও শ্রমিক পরস্পরের উপর জোরজুলুম করিয়াই সকল মতদ্বৈধের মীমাংসা করিতে সক্ষম হইবেন। আইন আদালতের অথবা লেবর কমিশনারের দফতরের আর আবশ্যক থাকিবে না। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ডিসপিউটস্ অ্যাক্টেরও কোন প্রয়োজন থাকিবে না। পশুমহলে যে-ভাবে ঝগড়ার মীমাংসা হয়, মানবসমাজেও তাহাই হইবে। বাংলার মন্ত্রীমহলে বর্ত্তমানে সকল বিষয়েই ডাইরেক্ট অ্যাকশন বা সাক্ষাৎভাবে হাতাহাতি করিয়া বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হইতেছে। কাহারও কোন ধান্যক্ষেত্রে দাবি থাকিলে সে ছুরি ছোরা লইয়া গায়ের জোরে ধান কাটিয়া লইয়া নিজের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লয়। আদালতে যাইবার প্রয়োজন হয় না। কোন দলের কোন স্থানীয় নেতা যদি অপর দলের মতলবসিদ্ধিতে কোন বাধার সৃষ্টি করে তাহা হইলে সেই বাধা সৃজন-কারীকে বুকে ছুরি বসাইয়া যথাশীঘ্র নিষ্ক্রিয় করিয়া দেওয়াও বাংলার রীতি অনুগত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মপদ্ধতি অনুযায়ী হয়। রাষ্ট্রীয় দলের অথবা কর্ম্মীদের অর্থকষ্ট হইলে তাহাও ডাকাইতি, লুঠ, ছিনতাই ইত্যাদি সাক্ষাৎ কার্য্যনিষ্ঠতার সাহায্যে ঠিক করিয়া লওয়া হয়। এই সকল কার্য্যেও শাসকগণ প্রবলভাবে কোন বাধা দিবার ব্যবস্থা করেন নাই। সুতরাং ধান কাটিয়া লওয়া, মাছের ভেড়ি দখল করা, খুন জখম করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার অপসারণ এবং লুঠপাট করিয়া অর্থসংস্থান করিয়া লওয়া—সকল কিছুই এখন সাময়িকভাবে বাংলাদেশের প্রচলিত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইন বলিয়া এখন বাংলাদেশে যাহা আছে তাহা কার্য্যকরীভাবে প্রযুক্ত নহে! সুতরাং যে কেহ দলবদ্ধ হইয়া যাহা কিছু করিলেই তাহা সমাজতন্ত্র অনুগত বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্য এখন অবধি এই সকল কার্য্য একতরফাভাবে হইতেছে। অন্যপক্ষও যদি ঐভাবে আইনভঙ্গ করিতে আরম্ভ করে ও তাহাতে যদি সমাজতান্ত্রিকদিগের অসুবিধা হয়, তাহা হইলে বাংলা সরকার তাহা কি নজরে দেখিবেন বলা যায় না। একথা অবশ্য মানিতেই হইবে যে ইহা আর অধিককাল একতরফা থাকিবে না। অপরপক্ষ এখন বুঝিয়া লইয়াছে যে আক্রমণ যেমন আইনের কথা বিচার না করিয়া চালিত হইয়াছে; প্রত্যাক্রমণও সেইরূপ বে-আইনী-ভাবেই চালাইতে হইবে। অর্থাৎ বাংলাদেশে এখন সকলের সহিত সকলের যুদ্ধ চলিবে। বাংলা সরকার থাকিবেন শুধু দর্শক হিসাবে।

কথা হইতেছে তাহা হইলে মানুষ রাজস্ব দিয়া মরিবে কেন? নিজের বাড়ীতে যদি অপরে ঢুকিয়া আসিয়া উৎপাত করিলে কেহ পুলিশের সাহায্য না পায়; চুরি ডাকাইতি, খুন, মারপিট, লুঠপাটের বিরুদ্ধে যদি পুলিশ ক্রিয়াশীল না হয়, তাহা হইলে রাজস্ব দিবার কোন অর্থ থাকে না। অরাজ যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে অরাজের মালিকদিগের কোন রাজস্ব পাওনা হইতে পারেনা। সকল রাজকার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইল সুশাসন, জনসাধারণের উন্নতির বিবিধ প্রচেষ্টা দেশের সুনাম ও প্রতিষ্ঠাসংরক্ষণ ইত্যাদি। যদি কোন শাসনপদ্ধতির পন্থা হয় অরাজকতার ও বিশৃঙ্খলতার এবং যদি সেই পদ্ধতির অনুষ্ঠানকর্ত্তারা জনসাধারণের উন্নতি ও দেশের প্রতিষ্ঠাবিষয়ে উদাসীন এমন কি সক্রিয়ভাবে বিরুদ্ধবাদী বলিয়া বিবেচিত হয়েন তাহা হইলে সেই শাসনপদ্ধতি ও তাহার প্রবর্ত্তকদিগকে কোন দেশের মানুষই অধিককাল বরদাস্ত করিবে না। বাংলার অবস্থা এখন যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় মহাপরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে ও তাহা অতিশীঘ্রই হওয়া আবশ্যক।

আজ কংগ্রেসও সেইরূপ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। ইতিপূর্ব্বে শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কংগ্রেস হইতে বহিষ্কৃত হইয়া বাংলা কংগ্রেস গঠন করিয়াছিলেন। সেই কংগ্রেস অপর বিচিত্র মতবাদী রাষ্ট্রীয় দল সমূহের সহিত মিলিত হইয়া সংযুক্ত দল গঠন করিতে কোন দ্বিধাবোধ করেন নাই। মন্ত্রীত্ব ভাগ বাট লইয়া কিছু দর কষাকষি হইয়াছিল কিন্তু তাহা সহজেই সর্ব্বজনসম্মতিতে মীমাংসিত হইয়া যায়। রাষ্ট্রীয়কার্য্য এখন একটা ব্যবসায়ে দাঁড়াইয়াছে এবং যৌথ কারবারের মতই এই ব্যবসায় এখন চলে। ইহাতে মতদ্বৈধ হইলে তাহার নিষ্পত্তি ব্যবসার নীতি ও রীতি অনুসারে করা হইয়া থাকে—কোনও অসুবিধা হয় না। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করিয়া যদি চাষের উন্নতি বা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের সাহায্য করা হয়, ত ব্যাঙ্ক জাতীয় না করিয়াও সেই কার্য্য সরকারী জামিনদারীতে অনায়াসে করা চলিত। অর্থাৎ এখন যত কর্জ্জা দেওয়া হইবে তাহার শেষ দায়িত্ব থাকিবে ভারত সরকার বা প্রাদেশিক সরকারের স্কন্ধে। সরকার যদি জামিন হইয়া ঐভাবে কর্জ্জা দেওয়াইতেন তাহা হইলে ব্যক্তিগত অধিকারে চালিত ব্যাঙ্কগুলিও একইভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে টাকা ধার দিতে পারিতেন। জাতীয়করণের ফলে যদি অসাবধানভাবে টাকা ধার দেওয়া আরম্ভ হয় তাহা হইলে লোকসানটাও সবিশেষভাবে "জাতীয়" হইবে। বীমাপ্রতিষ্ঠান জাতীয় করার ফলে যতটা শোনা যায় বীমা কর্ম্মীদিগের কোন লাভ হয় নাই এবং বীমা ক্রেতাগণও তুলনামূলকভাবে অধিক মূল্যে অল্পমূল্যের বীমাপত্র ক্রয় করিতেছেন। উপরন্তু কোন লোকই রসিদ প্রভৃতি ঐ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের নিকট যথা সময়ে পাইতে সক্ষম হ'ন না। অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান-সমূহ জাতীয় করিয়া যদি জাতির কাহারও কোন লাভ না হয়; তাহা হইলে শুধু সমষ্টিবাদের অভিনয় করিবার জন্য জাতীয়করণের কোন বিশেষ প্রয়োজন থাকে না। একটা কথা সকল ভারতবাসী এখন বোধ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাহা হইল সুশাসনের অভাব। কংগ্রেস যখন পূর্ণ মিলিত ছিল তখন ভারতের কোন সুশাসন প্রাপ্তি ঘটে নাই। পরে অপরাপর দলের ও কংগ্রেসের ভাঙ্গা টুকরা রাষ্ট্রীয় গণ্ডির দ্বারাও সুশাসন কার্য্য সাধিত হয় নাই। কারণ রাষ্ট্রক্ষেত্রে সকল নেতাই এখন পেশাদার। স্বার্থরক্ষা ও পরার্থপরতার অভাব পেশাদারীর একটা বড় লক্ষণ। রাষ্ট্রীয়কর্ম্মীরা যে পেশাদারীর এই স্বভাব অনুগতভাবেই চলিতেছেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কিছু নাই। আমলাগণ অবশ্য পেশাদারী ব্যতীত অপর কিছুই বোঝেন না। কংগ্রেসের অনেক লোক আজকাল প্রায়ই কম্যুনিষ্ট বা অন্যান্য দলের সহিত মিলিতভাবে কাজ করিবার কথা বলিয়া থাকেন। কংগ্রেস যদি ঐ সকল দলের সহিত একত্র কাজ করিতে পারেন, তাহা হইলে নিজেদের মধ্যে কংগ্রেসের বিভিন্ন গণ্ডির লোকেরা কাজ করিতে পারেন না কেন?

বাড়ী চড়াও করিয়া "ঘেরাও"

সম্প্রতি "ঘেরাও" নামধারী বে-আইনী উৎপাতের একটা নূতনরূপ দেখা দিয়াছে। এখন আরম্ভ হইয়াছে লোকের বাড়ী চড়াও করিয়া বাড়ীর লোকদিগকে বাহিরে যাইতে না দেওয়া ও বাহির হইতে কাহারও বাড়ীতে প্রবেশ নিবারণ করা। একটা বড় রাস্তার উপরে একটা বৃহৎ বাড়ীতে দেখা যাইতেছে বহুসংখ্যক লোক ঢুকিয়া বসিয়া রহিয়াছে ও মধ্যেমধ্যে তারস্বরে নিজেদের মনের কথা উচ্চারণ করিতেছে। এইভাবে কোন লোকের বাড়ী চড়াও করা সাক্ষাৎভাবে বে-আইনী একথা বুঝাইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু বাংলা দেশের বর্ত্তমান শাসকগণ ইহাকে ট্রেডইউনিয়নের স্বাভাবিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিয়া ইহাতে কোন বাধা দেওয়া প্রয়োজন মনে করিতেছেন না। কিন্তু ইহা যদি Collective Bargaining (সমবেতভাবে দরকষাকষি) বা Bipartite Negotiation (দ্বিদলীয় চুক্তি চেষ্টা) বলিয়া আইনতঃ গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে যদি কর্ম্মীদিগের গৃহে লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে মালিকপক্ষের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে বাধ্য করিবার চেষ্টা করা হয়, তাহাও আইনত গ্রাহ্য হইবে

বলিয়া আশা করা যায়। তাহা হইলে মালিক ও শ্রমিক পরস্পরের উপর জোরজুলুম করিয়াই সকল মতদ্বৈধের মীমাংসা করিতে সক্ষম হইবেন। আইন আদালতের অথবা লেবর কমিশনারের দফতরের আর আবশ্যক থাকিবে না। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ডিসপিউটস্ অ্যাক্টেরও কোন প্রয়োজন থাকিবে না। পশুমহলে যে-ভাবে ঝগড়ার মীমাংসা হয়, মানবসমাজেও তাহাই হইবে। বাংলার মন্ত্রীমহলে বর্ত্তমানে সকল বিষয়েই ডাইরেক্ট অ্যাকশন বা সাক্ষাৎভাবে হাতাহাতি করিয়া বিবাদ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা হইতেছে। কাহারও কোন ধান্যক্ষেত্রে দাবি থাকিলে সে ছুরি ছোরা লইয়া গায়ের জোরে ধান কাটিয়া লইয়া নিজের দাবি সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া লয়। আদালতে যাইবার প্রয়োজন হয় না। কোন দলের কোন স্থানীয় নেতা যদি অপর দলের মতলবসিদ্ধিতে কোন বাধার সৃষ্টি করে তাহা হইলে সেই বাধা সৃজন-কারীকে বুকে ছুরি বসাইয়া যথাশীঘ্র নিষ্ক্রিয় করিয়া দেওয়াও বাংলার রীতি অনুগত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মপদ্ধতি অনুযায়ী হয়। রাষ্ট্রীয় দলের অথবা কর্ম্মীদের অর্থকষ্ট হইলে তাহাও ডাকাইতি, লুঠ, ছিনতাই ইত্যাদি সাক্ষাৎ কার্য্যনিষ্ঠতার সাহায্যে ঠিক করিয়া লওয়া হয়। এই সকল কার্য্যেও শাসকগণ প্রবলভাবে কোন বাধা দিবার ব্যবস্থা করেন নাই। সুতরাং ধান কাটিয়া লওয়া, মাছের ভেড়ি দখল করা, খুন জখম করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার অপসারণ এবং লুঠপাট করিয়া অর্থসংস্থান করিয়া লওয়া—সকল কিছুই এখন সাময়িকভাবে বাংলাদেশের প্রচলিত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আইন বলিয়া এখন বাংলাদেশে যাহা আছে তাহা কার্য্যকরীভাবে প্রযুক্ত নহে! সুতরাং যে কেহ দলবদ্ধ হইয়া যাহা কিছু করিলেই তাহা সমাজতন্ত্র অনুগত বলিয়া বিবেচিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। অবশ্য এখন অবধি এই সকল কার্য্য একতরফাভাবে হইতেছে। অন্যপক্ষও যদি ঐভাবে আইনভঙ্গ করিতে আরম্ভ করে ও তাহাতে যদি সমাজতান্ত্রিকদিগের অসুবিধা হয়, তাহা হইলে বাংলা সরকার তাহা কি নজরে দেখিবেন বলা যায় না। একথা অবশ্য মানিতেই হইবে যে ইহা আর অধিককাল একতরফা থাকিবে না। অপরপক্ষ এখন বুঝিয়া লইয়াছে যে আক্রমণ যেমন আইনের কথা বিচার না করিয়া চালিত হইয়াছে; প্রত্যাক্রমণও সেইরূপ বে-আইনী-ভাবেই চালাইতে হইবে। অর্থাৎ বাংলাদেশে এখন সকলের সহিত সকলের যুদ্ধ চলিবে। বাংলা সরকার থাকিবেন শুধু দর্শক হিসাবে।

কথা হইতেছে, তাহা হইলে মানুষ রাজস্ব দিয়া মরিবে কেন? নিজের বাড়ীতে যদি অপরে ঢুকিয়া আসিয়া উৎপাত করিলে কেহ পুলিশের সাহায্য না পায়; চুরি ডাকাইতি, খুন, মারপিট, লুঠপাটের বিরুদ্ধে যদি পুলিশ ক্রিয়াশীল না হয়, তাহা হইলে রাজস্ব দিবার কোন অর্থ থাকে না। অরাজ যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা হইলে অরাজের মালিকদিগের কোন রাজস্ব পাওনা হইতে পারেনা। সকল রাজকার্য্যের প্রধান উদ্দেশ্য হইল সুশাসন, জনসাধারণের উন্নতির বিবিধ প্রচেষ্টা দেশের সুনাম ও প্রতিষ্ঠাসংরক্ষণ ইত্যাদি। যদি কোন শাসনপদ্ধতির পন্থা হয় অরাজকতার ও বিশৃঙ্খলতার এবং যদি সেই পদ্ধতির অনুষ্ঠানকর্ত্তারা জনসাধারণের উন্নতি ও দেশের প্রতিষ্ঠাবিষয়ে উদাসীন এমন কি সক্রিয়ভাবে বিরুদ্ধবাদী বলিয়া বিবেচিত হয়েন তাহা হইলে সেই শাসনপদ্ধতি ও তাহার প্রবর্ত্তকদিগকে কোন দেশের মানুষই অধিককাল বরদাস্ত করিবে না। বাংলার অবস্থা এখন যাহা দেখা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় মহাপরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইয়াছে ও তাহা অতিশীঘ্রই হওয়া আবশ্যক।

দেশ বিদেশের কথা

ভিয়েৎনাম হইতে সৈন্য অপসারণ

কিছুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভিয়েৎনামে আমেরিকার সৈন্যবাহিনী ক্রমশ: আকারে ক্ষুদ্রতর করিয়া শীঘ্রই পূর্ণ-অপসারণের কথা হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু কার্যত: বিশেষ কিছু করা হয় নাই। আমেরিকা পরের দেশে নিজের রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশের আয়োজন করিয়া পৃথিবীর লোকের নিকট হেয় প্রতিপন্ন হইতেছিল। কিন্তু এশিয়াতে চীনের প্রতিপত্তি যাহাতে না বাড়িতে পারে এবং কম্যুনিজম্ এর বিস্তার যাহাতে না হয় তজ্জন্য আমেরিকা নিজের নাম খারাপ করিতে কখনও কার্পণ্য করে নাই। হঠাৎ এই সৈন্যঅপসারণ কার্য্য আরম্ভ হইয়া যাওয়াতে লোকের মনে কিছুটা বিস্ময়ের সঞ্চার হয়। ইহার কারণ কি কোন কারণে আমেরিকার বিবেক নূতনভাবে প্রতিক্রিয়াশীল হইয়া উঠিয়াছে; অথবা আমেরিকার জনসাধারণ নিক্সনকে নূতনপথে চলিতে বাধ্য করিয়াছে। এ কথা অবশ্যই মানিতে হইবে যে আমেরিকা ভিয়েৎনাম যুদ্ধ চালনার ফলে চরিত্রগতভাবে অবনতির পথেই ক্রমশঃ আরো নামিয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি আমেরিকান সৈন্যগণ ভিয়েৎনামের একটি গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা নির্ব্বিশেষে সকল বাসিন্দাকে যেরূপ নৃশংশভাবে হত্যা করিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে; তাহাতে আমেরিকার জনমত ভিয়েৎনামযুদ্ধ সম্বন্ধে আরো কঠোর নিন্দার পথে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভিয়েৎনামের মানুষ যাহাতে কম্যুনিষ্ট না হয় সেইজন্য আমেরিকার মানুষকে পশুর অধম হইতে হইবে, এইরূপ ব্যবস্থার সমর্থন আমেরিকার জনসাধারণ কখনও করিবেনা। তাই মনে হইতেছে যে অতঃপর আমেরিকাকে ভিয়েৎনাম হইতে নিজসৈন্যবাহিনী সত্যই সরাইয়া লইতে হইবে। শুনা যায় যে ৬০০০০ সৈন্য চলিয়া গিয়াছে এবং আরো ৫০০০০ শীঘ্রই চলিয়া যাইবে।

ইংলণ্ডে ব্যক্তিকে সমাজ কি দেয়

ইংলণ্ড সমষ্টিবাদী দেশ নহে। সেখানে রাজা রাণী আছে। ধনী গরীব আছে, ব্যক্তিগত সম্পদ, সঞ্চয়, সুদে টাকা খাটান, সঞ্চিত অর্থ দিয়া সম্পত্তি ক্রয় করা ইত্যাদি সকল বুর্জ্জোয়া বদ অভ্যাসই পূর্ণ মাত্রায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু ইংলণ্ডের মানুষ অপর দেশের তুলনায় কিছুমাত্র অসহায় নহে। বিপদে আপদে তাহাকে রাস্তায় দাঁড়াইতে হয়না, খাদ্যের, বস্ত্রের ঔষধের অভাবে মরিতে হয়না এবং অভাব ঘটিলে সমাজই তাহাকে রক্ষা করে। শুধু একটা বিষয় আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে ইংলণ্ডে (বৃটেনে) সমষ্টিবাদ না থাকিলেও মানুষ কতভাবে সামাজিক সাহায্য লাভ করে। ইহা হইল ঐ দেশের জাতীয় ব্যাপক বীমাআইন যাহা ১৯৪৮ খৃঃ অঃ হইতে প্রচলিত আছে। এই আইন অনুসারে যাহা যাহা মানুষকে দেওয়া হয় তাহা হইল (১) বেকার ভাতা (২) অসুস্থতা ভাতা (৩) মাতৃত্ব ভাতা (৪) বৈধব্যভাতা (৫) অভিভাবকের ভাতা (৬) শিশুর বিশেষ ভাতা (৭) অবসর গ্রহণ করিলে অর্থ সাহায্য ও (৮) মৃত্যু ঘটিলে সাহায্য।

বেকার ও অসুস্থতা ভাতার পরিমাণ হইল সপ্তাহে 4½ পাউণ্ড (৮১৲টাকা)। ইহার উপর দেওয়া হয় পরিবারস্থ পূর্ণ বয়স্ক পোষ্যদিগকে মাথাপিছু সপ্তাহে ২ পাউণ্ড ১৬ শিলিং, সন্তানদিগের প্রথমটিকে সপ্তাহে ১ পাঃ ৮ শিঃ সপ্তাহে। অর্থাৎ এক ব্যক্তির যদি দুইজন পূর্ণ বয়স্ক পোষ্য ও তিনটি সন্তান থাকে তাহা হইলে

তাহাকে বেকারভাতা দেওয়া হয় সপ্তাহে মোট ২২৩৲টাকা।

মাতৃত্ব ভাতা দেওয়া হয় প্রথমতঃ সন্তান পিছু ২২ পাউণ্ড। ইহা ব্যতীত সাপ্তাহিক 4½ পাউণ্ড অবধি মাতৃত্বভাতা দেওয়া হয়।

বৈধব্যভাতা প্রথমতঃ ২৬ সপ্তাহ ৬ পাউণ্ড ৭ শিলিং হারে দেওয়া হয় (পোষ্যগণ আলাদা টাকা পায়) পরে অবস্থা বিচার করিয়া সাহায্য করা হয়।

সামাজিক সাহায্য কার্য্যে বৃটেন বৎসরে প্রায় ৫০০ কোটি পাউণ্ড ব্যয় করে (৯০০০৲ নয় হাজার কোটি টাকা) বৃটেনের জনসংখ্যা ভারতের $\frac{1}{10}$ অংশ মাত্র। ক্যানাডার জনসংখ্যা ভারতের $\frac{1}{24}$ অংশ অপেক্ষাও কম। বৃটেন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া বিত্তশালী হইয়াছিল বলা ও সেই কারণ দেখাইয়া তাহার ঐশ্বর্য্যের অর্থ করিবার চেষ্টা করা যাইতে পারে। ক্যানাডার কোন রাজ্য কখন ছিলনা। ও ক্যানাডার মানুষ শুধু নিজেদের পরিশ্রমেই ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। এই ক্যানাডায় জনসাধারণকে সামাজিকভাবে যে সকল সাহায্য দেওয়া হয় তাহার মোট পরিমাণ হইল বার্ষিক ১১০০ কোটি টাকারও অধিক। ভারতবর্ষে কোন মানুষ সরকারী সাহায্যে বেকারত্বের দুঃখকষ্ট হইতে রক্ষা পায়না। বৃদ্ধ বৃদ্ধা, বিধবা, পিতৃমাতৃহীনশিশু বা অপরাপর সাহায্য-যোগ্য কেহ কোন সাহায্য ভারতবর্ষে পায়না। অথচ ভারতে রাজস্ব আদায় হয় অপর দেশের তুলনায় বহুগুণ। এইভাবে রাজস্ব আদায় করিয়াও ভারতসরকার কোন কাজের জন্যই যথেষ্ট টাকা পান না। কারণ ভারতের সাধারণ দারিদ্র্য। ঐ দারিদ্র্যের কারণ উৎপাদনী কাজ না করা। শতশত লক্ষলোক যদি বৎসরে আটমাস শুধু বসিয়া থাকে তাহাহইলে কোন জাতির অবস্থা ভাল হইতে পারেনা। কর্ম্মের উদ্যম এ দেশে নাই। শুধু আছে কথা ও পরমুখাপেক্ষি আলস্য। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন হওয়া একান্ত আবশ্যক।

ভারতে 'প্রাণি সংগ্রহশালা' প্রসারের ইতিহাস

ত্রিদিবরঞ্জন মিত্র

ভারতের "প্রাণি-সংগ্রহশালা'র ইতিহাস ভারতের অন্যান্য দ্রষ্টব্য বিষয়ের সংগ্রহ শালার ইতিহাসের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। কারণ, ভারতে সংগ্রহশালা-আন্দোলনের প্রথমভাগে প্রদর্শনযোগ্য সকল প্রকার দ্রব্যই বহুমুখী সংগ্রহশালায় রাখা হইতো। কোন বিশেষ শ্রেণীর কৌতূহলোদ্দীপক বস্তুর জন্য কোন বিশেষ সংগ্রহশালা ছিল না। ফলে বিপরীতধর্মী দ্রব্যগুলিও একই সংগ্রহশালায় রাখা হইতো। যাহাই হোক, আধুনিক ভারতবর্ষে সংগ্রহশালা-আন্দোলন শুরু করেন রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের নেতৃবৃন্দ। স্যার উইলিয়ম জেম্‌সের নেতৃত্বে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত এই সোসাইটির প্রথমদিকে সংগ্রহশালা স্থাপনের কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তবে কলিকাতার নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে সোসাইটির শুভানুধ্যায়ীগণ নানারকম কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু প্রেরণ করায়, ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির নেতৃবৃন্দ স্থির করিলেন যে ঐগুলির সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিবেন। তবে ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সোসাইটির নিজস্ব গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ঐগুলি সংরক্ষণের বিশেষ চেষ্টা করা সম্ভবপর হয় নাই। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকটবর্তী বোটানিক্যাল গার্ডেনের কর্মচারী ডঃ নাথানিয়েল ওয়ালিচের বিশেষ চেষ্টায় কলিকাতায় একটি বহুমুখী সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়। ইহাই আধুনিক ভারতের প্রথম সংগ্রহশালা। সংগ্রহশালা স্থাপনের সময় ডঃ ওয়ালিচ সোসাইটিকে প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি অবৈতনিক অধ্যক্ষের কাজ করিবেন ও তাঁর নিজস্ব কিছু সংগ্রহশালায় দান করিবেন। নূতন সংগ্রহশালার দুইটি বিভাগ ছিল; (১) পুরাতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, কারিগরী সংক্রান্ত এবং (২) প্রাণীবিজ্ঞান ও ভূবিজ্ঞান। ডঃ ওয়ালিচ দ্বিতীয় বিভাগটির অধ্যক্ষ ছিলেন। ডঃ ওয়ালিচ প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ছিলেন বলিয়াই প্রকৃতি-বিজ্ঞান বিভাগটি দ্রুত উন্নতিলাভ করে। তাঁহার পরবর্তী দুইজন অধ্যক্ষ ডঃ পিয়ার্সন ও ডঃ ম্যাকক্লিল্যাণ্ডও প্রকৃতি-প্রেমিক ছিলেন। তবে অর্থাভাব হেতু সোসাইটি অল্পবেতনে কোনদিনই উপযুক্ত অধ্যক্ষ পায় নাই। তবে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানী কিছু অর্থসাহায্য মঞ্জুর করায় ডঃ এড্‌ওয়ার্ড ব্লিথ নামে এক বিশিষ্ট প্রাণি-বিজ্ঞানীকে অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করা সম্ভব হয়। ডঃ ব্লিথের উৎসাহে সোসাইটির সদস্যগণ প্রকৃতিবিজ্ঞানে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন এবং এত বেশী কৌতূহলোদ্দীপক বস্তু সংগ্রহ করেন যে, সোসাইটির কর্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানী ও ইংলণ্ডস্থিত ভারতের ভাগ্য-বিধাতাগণকে সোসাইটির সংগ্রহকে কেন্দ্র করিয়া একটি সংগ্রহশালা স্থাপনের জন্য অনুরোধ জানান। যাই হোক, তদানীন্তন ভারত সরকার সোসাইটির সাহায্যে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে ইম্পিরিয়াল ম্যুজিয়ম নামে এক সংগ্রহশালা স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির আন্দোলনে দেশের অন্যান্য সংস্কৃতি-পরিষদগুলিও যোগদান করে। এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ম্যাড্রাস লিটারারি সোসাইটি মাদ্রাজে ছয়টা সংগ্রহশালা স্থাপনে সাফল্যলাভ করে। সম্ভবতঃ ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের বিখ্যাত প্রদর্শনী এবং ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের উৎসব, তদানীন্তন ভারত সরকার করদ রাজ্য, বিভিন্ন সংস্কৃতি-পরিষদ সমূহকে সংগ্রহশালা স্থাপনের ও প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিতে বিশেষ উৎসাহ দান করে। ইহার ফলে ১৯০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে ছাব্বিশটা বহুমুখী সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়। তবে

নিম্নলিখিত সংগ্রহশালাগুলিতেই প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ ছিল।

(১) গবর্ণমেণ্ট মুাজিয়াম (মাদ্রাজ—১৮৫১), (২) ভিক্টোরিয়া এ্যাণ্ড এ্যালবার্ট মুাজিয়ম (বোম্বাই—১৮৫৭) (৩) গবর্ণমেণ্ট মুাজিয়ম (ত্রিবান্দ্রাম—১৮৫৭), (৪) সেণ্ট্রাল মুাজিয়ম (নাগপুর—১৮৬৩), (৫) স্টেট্ মুাজিয়ম (লক্ষ্ণৌ—১৮৬৩), (৬) ইম্পিরিয়াল মুাজিয়ম (কলিকাতা—১৮৬৬), (৭) গবর্ণমেণ্ট মুাজিয়ম (মহীশূর—১৮৬৬), (৮) ফৈজাবাদ মুাজিয়ম (ফৈজাবাদ—১৮৭১), (৯) এ্যালবার্ট মুাজিয়ম (জয়পুর—১৮৮৫), (১০) মহন্ত ঘাসিদাস মেমোরিয়াল মুাজিয়ম (রায়পুর—১৮৮৫), (১১) স্টেট্ মুাজিয়ম (ত্রিচুর—১৮৮৫), (১২) ভিক্টোরিয়া হল মুাজিয়ম (উদয়পুর—১৮৮৭), (১৩) ওয়াট্‌সন মুাজিয়ম (রাজকোট—১৮৮৮), (১৪) ষ্টেট্ মুাজিয়ম এ্যাণ্ড পিকচার গ্যালারী (বরোদা—১৮৯৪) (১৫) এস্, পি, এস্ গবর্ণমেণ্ট মুাজিয়ম (কাশ্মীর—১৮৯৮)। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে লর্ড কার্জন ভারতের বড়লাট হইয়া আসেন ও ভারতের সংগ্রহশালা আন্দোলন বিশেষভাবে জোরদার হওয়ায় কিছু সরকারী সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়। এই সময় ভারত সরকার, সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও তাহাদের পরিচালনার জন্য একটি শক্তিশালী স্থায়ী সংস্থার অভাববোধ করেন। ইহারই ফলে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে তদানীন্তন ভারত সরকারের অর্থনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সংবাদ সংগ্রাহক জর্জ ওয়াটকে বলা হয় সারা ভারতের সংগ্রহশালাগুলি পরিদর্শন করিয়া তাহাদের উন্নতির জন্য কিছু মতামত দিতে। জর্জওয়াট ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার অভিজ্ঞতা ও মতামত ব্যক্ত করেন। কিন্তু ওয়াটের কোন উপদেশই গ্রাহ্য হয় নাই; ইহার পর ১৯০৭খৃষ্টাব্দে ভারত সরকারের শিল্প ও বাণিজ্য-দপ্তর হইতে, বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধি, করদ রাজ্যের প্রতিনিধি, ইম্পিরিয়াল মুাজিয়মের অছিপরিষদের প্রতিনিধিদিগকে এক সম্মেলনে আহ্বান করা হয়। ঐ সম্মেলনের আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল, বিভিন্ন স্থানীয় সংগ্রহশালাগুলির উন্নতি, ইম্পিরিয়াল মুাজিয়মের সংগে অন্য সংগ্রহশালাগুলির সহযোগিতা এবং সংগ্রহশালাগুলি সম্পর্কে সরকারের ভবিষ্যত নীতি। উক্ত সম্মেলনে, বিভিন্ন সংগ্রহশালাগুলির মধ্যে সহযোগিতা, গুরুত্বপূর্ণ দ্রব্যের আদান প্রদান, অন্যান্য সংগ্রহশালাগুলির কাজের সুবিধার জন্য ইম্পিরিয়াল মুাজিয়মে ত্বকসংস্থাপন (Taxidermy) বিষয়ক শিক্ষার ব্যবস্থা, নিয়মিতভাবে রেকর্ড রক্ষা করা, গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করা, অধিক সংখ্যায় সংগ্রহশালা স্থাপনের জন্য বৎসরে তিনটি সম্মেলন এবং সংগ্রহশালা সংক্রান্ত বিষয়ের জন্য একটি স্থায়ী সংস্থা তৈরী প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে, পূর্ব্বের সম্মেলনের একই উদ্দেশ্যে, ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাদ্রাজে আরও একটি সম্মেলনের ব্যবস্থা করেন। ঐ সম্মেলনে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, সরকারী কৃষিদপ্তর, এশিয়াটিক সোসাইটি, বোম্বে ন্যাচারাল হিষ্ট্রি সোসাইটি প্রভৃতির প্রতিনিধিরা ছাড়া সিংহল,মালয়,সারাবকের সরকারী প্রতিনিধিগণ যোগদান করেন। বর্তমান সম্মেলন, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের সম্মেলনের সকল প্রস্তাবকেই সমর্থন জানায় এবং সরকারের অর্থ সাহায্য ও স্থায়ী সংস্থার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। ভারত সরকার এই সম্মেলনের প্রত্যেকটি প্রস্তাবকে গুরুত্ব দেন এবং প্রাদেশিক সরকারগণকেও অনুরূপ কাজ করিবার জন্য আদেশ দেন। বলাবাহুল্য যে, বিটিশ সরকারের এই আনুকুল্য প্রদর্শনের ফলে ভারত স্বাধীন হইবার আগে প্রাণি প্রদর্শন প্রকোষ্ঠ সহ নিম্নলিখিত ১৫টি সংগ্রহশালা স্থাপিত হয়।

(১) জুনাগড় মুাজিয়ম (জুনাগড়-১৯০১), (২) গ্যাস্ ফরেষ্ট মুাজিয়ম (কোয়েম্বাটুর-১৯০২), (৩) ন্যাচারাল হিষ্ট্রি মুাজিয়ম (দার্জিলিঙ—১৯০২), (৪) ভুরিসিং মুাজিয়ম (চম্বা—১৯০৮), (৫) সদর মুাজিয়ম (যোধপুর—১৯০৯) (৬) গবর্ণমেণ্ট মুাজিয়ম (পুদুকোট্টাই—১৯১০), (৭) স্টেট্ মুাজিয়ম (গোয়ালিয়র—১৯১০) (৮) ফরেষ্ট রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট মুাজিয়ম (দেরাদুন—১৯১৪), (৯) পাটনা মুাজিয়ম

(পাটনা—১৯১৭), (১০) স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন মুজিয়ম (কলিকাতা—১৯২১), (১১) প্রিন্স অব ওয়েলস্ মুজিয়ম (বোম্বাই—১৯২১—১৯২৩), (১২) লেডি উইলসন মুজিয়ম (ধরমপুর—১৯২৪), (১৩) মিউনিসিপ্যাল মুজিয়ম (এলাহাবাদ—১৯৩১), (১৪) ষ্টেট্ মুজিয়ম (ভরতপুর—১৯৪৪), (১৫) মুজিয়ম অব এ্যান্টিকুয়্যাটস্ (জামনগর—১৯৪৬) তবে পরাধীন ভারতে স্থাপিত সংগ্রহশালা গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত সংগ্রহশালা ভারতে ও ভারতের বাহিরে খ্যাতিলাভ করিয়াছে।

পূর্বে ইহার নাম ছিল ইম্পিরিয়াল মুজিয়ম। ইহা ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় জাতীয় সংগ্রহশালা। সংগৃহীত প্রাণীর সংখ্যায় এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম সংগ্রহশালাগুলির অন্যতম। এই সংগ্রহের কিছু অংশ আসিয়াছে এশিয়াটিক সোসাইটির নিকট হইতে, বিভিন্ন প্রকৃতি প্রেমিকদের সংগ্রহ হইতে। সামুদ্রিক জীবের সংগ্রহ আসিয়াছে রয়্যাল ইণ্ডিয়ান মেরিন সার্ভের ষ্টীমার "ইনভেষ্টিগেটরের" কর্মীদের সংগ্রহ হইতে। কিছু ক্রয় করা হইয়াছে। তবে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া স্থাপিত হইবার পর হইতে প্রাণিবিজ্ঞান বিভাগ ইহার তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে এবং বর্তমানের সকল সংগ্রহই হইতেছে এখানকার কর্মীদের দ্বারা। এই সংগ্রহশালায় ২টি স্তন্যপায়ী কক্ষ, ১টি পাখী, সরীসৃপ ও উভচর কক্ষ, ১টি মৎস্য, ১টি অমেরুদণ্ডী* ও ১টি পতঙ্গ*কক্ষ আছে। এই সকল কক্ষে ভারতের ও অন্যান্য দেশের বিভিন্ন প্রাণীগোষ্ঠির প্রাণী রাখা হইয়াছে। কিছু বিশেষজ্ঞদের গবেষণার জন্য সংরক্ষিত আছে।

প্রিন্স্ অব ওয়েলস্ ম্যুজিয়ম,—বোম্বাই।

বোম্বে ন্যাচারাল হিষ্ট্রি সোসাইটি এই সংগ্রশালার প্রাণীবিজ্ঞান শাখার তত্ত্বাবধায়ক। এশিয়ার মধ্যে শ্রেষ্ঠ সংগ্রশালাগুলির মধ্যে অন্যতম। সংগ্রহ প্রদর্শনীর আধুনিকতম সকলপ্রকার ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন প্রাণিগোষ্ঠি তাহাদের প্রাকৃতির পরিবেশে কিরূপ অবস্থায় থাকে তাহা প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে।

গবর্ণমেণ্ট ম্যুজিয়ম এ্যাণ্ড ন্যাশনল আর্ট গ্যালারী,—মাদ্রাজ।

বিভিন্ন অমেরুদণ্ডী ও মেরুদণ্ডী প্রাণীদের আধুনিকতম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা অনুযায়ী করা হইয়াছে।

ন্যাচারাল হিষ্ট্রি ম্যুজিয়ম,—দার্জিলিঙ্।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দ হইতে বেঙ্গল ন্যাচারাল হিষ্ট্রি সোসাইটি ইহাকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছে। এখানে পাখী, স্তন্যপায়ী, পাখীর ডিম, সরীসৃপ, উভচর, মৎস্য, পতঙ্গ এবং বিভিন্ন অমেরুদণ্ডী প্রাণী প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্টেট্ ম্যুজিয়ম,—লক্ষ্ণৌ।

প্রকৃতিবিজ্ঞান বিভাগে বিভিন্ন অমেরুদণ্ডী, মৎস্য, সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী, পাখীর সংগ্রহ রহিয়াছে। তবে পাখীর সংগ্রহ বিশেষভাবে বিখ্যাত।

গবর্ণমেণ্ট ম্যুজিয়ম,—ত্রিবান্দ্রাম

এখানে অন্যান্য শ্রেণীর প্রাণীর সঙ্গে ত্রিবাঙ্কুরের পাখী বিশেষ ভাবে দেখানো হইয়াছে।

গবর্ণমেণ্ট ম্যুজিয়ম,—মহীশূর।

প্রাণিতত্ত্ব বিভাগে অন্যান্য শ্রেণীর প্রাণীদের সঙ্গে মহীশূরের পাখীই বিশেষভাবে দেখানো হইয়াছে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহযোগিতায় অনেকগুলি বহুমুখী সংগ্রহশালা স্থাপিত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রভিনশিয়াল ম্যুজিয়ম (পাতিয়ালা-১৯৪৮), গিরিধর ভাইচিলড্রেন্স মুজিয়ম (আমরেলি-১৯৫৫), চন্দ্রধরি মুজিয়ম (দ্বারভাঙ্গা-১৯৫৬), মিউনিসিপ্যাল মুজিয়ম (আহমেদাবাদ-১৯৫৭) প্রভৃতিতে প্রাণি প্রদর্শন ব্যবস্থা আছে। এইগুলি ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার গ্রামের অধিবাসীদের

* বর্তমানে কিছুকাল যাবৎ কক্ষদুটি বন্ধ আছে।

শিক্ষার জন্ত বিভিন্ন ব্লকে একটি করিয়া অনেকগুলি বিজ্ঞানমন্দির স্থাপন করিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকটিতে প্রাণি বিজ্ঞান শাখা আছে। ইহাছাড়া প্রাণি বিজ্ঞান গবেষণায় নিযুক্ত বিভিন্ন সরকারী দপ্তর, কলেজ, বিশ্ববিভালয় প্রভৃতির প্রত্যেকটিতে একটি করিয়া ম্যুজিয়ম আছে। উদাহরণস্বরূপ, জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার বিভিন্ন আঞ্চলিক শাখায় গবেষকদের সুবিধার্থে, একটি করিয়া ম্যুজিয়ম রহিয়াছে। ইণ্ডিয়ান এগ্রি-কালচারাল রিসার্চ ইন্সটিট্যুটের নতুন দিল্লীতে কৃষি-বিদ্যায় প্রয়োজনীয় পতঙ্গদের একটি সংগ্রশালা আছে। সেণ্ট্রাল মেরিন ফিসারিজ ডিপার্টমেণ্ট ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে মান্দাপামে মৎস্যবিভা সংক্রান্ত বিষয়ের একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করিয়াছে। বিশ্ববিভালয় গুলির মধ্যে নিম্ন-লিখিত বিশ্ববিভালয়গুলির প্রাণি-সংগ্রহশালা খুবই উন্নত।

কলিকাতা বিশ্ববিভালয়, বোম্বাই বিশ্ববিভালয়, মাদ্রাজ বিশ্ববিভালয়, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, বারাণসী হিন্দুবিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা বিশ্ব-বিশ্ববিদ্যালয়, ওসমানিয় বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্ণৌবিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়, অন্ধ্র বিশ্ব-বিদ্যালয়, আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি। অদূর ভবিষ্যতে ভারতে ন্যাশনাল ম্যুজিয়ম অব ন্যাচারাল হিষ্ট্রী স্থাপিত হইবে এবং ভারতে প্রাণিসংগ্রহশালা আর একটি বাড়িবে। এই স্থানে মনে রাখা উচিত বর্তমানে সব কয়টা সংগ্রহশালাতেই বিভিন্ন প্রাণিগোষ্ঠির বিভিন্ন প্রজাতিক সাজান আছে। কিন্তু কোন প্রাণি কি ভাবে মানুষের উপকার বা অপকার করে এবং অপকারী প্রাণিকে কি ভাবে দমন করা যায় তাহা দেখাইবার বিশেষ কোন ব্যবস্থা নাই। সুতারাং ম্যুজিয়ম কর্তৃ-পক্ষদের উচিত প্রতিটি ম্যুজিয়ম যাহাতে দেশের সংস্কৃতির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নতিতে সাহায্য করে আহার ব্যবস্থা করা।

•• **হিন্দু মেলার ইতিবৃত্ত:** শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল, প্রাপ্তিস্থান: জিজ্ঞাসা, ১৩৩ এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—২৯। মূল্য আট টাকা।

তখন ইংরেজিয়ানার যুগ। ভারতীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা তাহার শিল্প, সাহিত্য, শিক্ষা-দীক্ষা যাবতীয় সম্পদ এই প্রভাবে পড়িয়া লোপ পাইতেছিল। জাতির রক্ষাকল্পে তখন প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল একটি সুসংবদ্ধ ঐক্য। দেশের চিন্তাশীল মনীষিদের চিন্তার ফলেই এই জাতীয়মেলার উদ্ভব। ইংরেজী শিক্ষার ফলে যে মোহাচ্ছন্ন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল হিন্দুমেলা দেশকে সেই অবস্থা হইতে রক্ষা করিয়াছে। দেশানুরাগে উদ্বুদ্ধ করাই এই মেলার উদ্দেশ্য ছিল। মেলার প্রচলন আমাদের দেশে বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। জাতির নিজস্ব ভাবধারা প্রচারের ইহাই ছিল তখন একমাত্র উপায়। দেশীয় শিল্পের প্রসার এইভাবেই আমাদের দেশে হইয়াছে।

যে হিন্দুমেলার কথা বলা হইতেছে, তাহার উদ্দেশ্যই ছিল "স্বজাতীয়দিগের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা ও স্বদেশের উন্নতি সাধনা করা"। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল হিন্দুমেলার অনুষ্ঠান হইতেই বাংলাদেশে জাতীয় সঙ্গীতের উৎপত্তির কথা বলিয়াছেন। একথা অনস্বীকার্য যে ভারতীয়দের মনে স্বাজাত্যবোধ ও স্বাবলম্বন-বৃত্তির উন্মেষে এই হিন্দুমেলার কৃতিত্ব অসামান্ত।

গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন—"এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, হিন্দু জাতিকে একত্রিত করা। এইরূপ একত্র হওয়ার ফল যদ্যপি আপাততঃ কিছুই দৃষ্টি গোচর হইতেছে না, কিন্তু আমাদের পরস্পরের মিলন এবং একত্র হওয়া যে কত আবশ্যক ও তাহা যে আমাদের পক্ষে কত

উপকারী তাহা বোধ হয় কাহারও অগোচর নাই। একদিনে কোনো এক সাধারণ স্থানে একত্রে দেখা-শুনা হওয়াতে অনেক মহৎকর্ম সাধন, অনেক উৎসাহ বৃদ্ধি ও স্বদেশের অনুরাগ প্রস্ফুটিত হইতে পারে। যত লোকের জনতা হয় ততই ইহা হিন্দুমেলা ও ইহা হিন্দুদিগেরই জনতা এই মনে হইয়া হৃদয় আনন্দিত ও স্বদেশানুরাগ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্ম্মকর্ম্মের জন্ত নহে, কোন বিষয়সুখের জন্য নহে, কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্ত নহে, ইহা স্বদেশের জন্ত—ইহা ভারতভূমির জন্ত।

ইহার আরও একটি মহৎ উদ্দেশ্য আছে, সেই উদ্দেশ্য আত্মনির্ভর। এই আত্মনির্ভর ইংরাজ জাতির একটি প্রধান গুণ। আমরা সেই গুণের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার চেষ্টায় মহৎকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া এবং তাহা সফল করাকেই আত্মনির্ভর কহে।"

এই আত্মনির্ভরতা-শিক্ষা মেলার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য।

প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই দ্বিতীয় সংস্করণে তাহার অনেকখানি রদ-বদল হইয়াছে, পরিবর্ধিত এবং পরিবর্জিতও হইয়াছে। যোগেশবাবুর ঐতিহাসিক এই তথ্য বহুল গ্রন্থখানি অনেক পাঠকেরই কৌতূহল উদ্রেক করিবে। ইতিহাস হিসাবে ইহার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

THE LONESOME PILGRIM by—Atulananda Chakrabarty. With a Foreword from Hugh Tinker Published by Allied Publishers Ltd. 278 page : Price Rs. 20/-

গান্ধী যতগুলি আদর্শ তুলে ধরেছিলেন তার একটাও টিকৃতে পারল না; তাঁর কোন বাণীই তেমন রূপ নিল না। তবুও তিনি যে প্রয়াস করে গেছেন তার জন্য জগতের ইতিহাসে তিনি অবিস্মরণীয় মানুষের মধ্যে একজন অমর।

গান্ধী বিষয়ে অগণিত পুস্তক রচিত হ'লেও বিচার খুব কমই হয়েছে। তাঁর বিশাল প্রভাবে প্রায় সকলেই আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। তা'ছাড়া, আমাদের নেতাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে গান্ধী সম্পর্কে ভক্তি নিবেদন করেছেন। তাঁদের ভক্তিতে উচ্ছ্বাস আছে, আন্তরিকতা নেই। নেতৃত্বের একটি উপায় ভাবেই গান্ধীভক্তি বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হয়েছে।

তাই কার্যতঃ দেখা যায় গান্ধীর ব্যর্থতা। খাদি গরীবের দুঃখ দূরের উপায়ত' হয়ইনি, জাতির ও স্বাধীনতার প্রতীক হয়নি। যে জওহরলাল আলঙ্কারিক ভাষায় খাদিকে জাতীয় পোশাক ও স্বাধীনতার পরিচিতি বলে ব্যাখ্যা করেছিলেন, স্বাধীনতা লাভের সঙ্গে সঙ্গে তিনিই চরখাকে জাতীয় পতাকা থেকে তুলে দেন। অস্পৃশ্যতা দূর হয়নি। সত্যের প্রতিষ্ঠা হওয়া দূরের কথা, দুর্নীতি ও ভণ্ডামির প্রতিবাদে কয়েকবার গান্ধী সাময়িকভাবে কংগ্রেস থেকে সরে' দাঁড়িয়েছিলেন। আর গান্ধী নিজেই বলেছেন অনেকবার—তবে বলেছেন মাত্র স্বাধীনতার প্রাক্‌কালে—যে 'আজ তাঁর চোখ খুলেছে, তিনি দেখতে পাচ্ছেন এতদিন অহিংসার কথা চলেছে কিন্তু আসলে অহিংসা দিয়ে এই স্বাধীনতা আমরা লাভ করিনি।' এইযে স্বাধীনতা তাও লাভ হয়েছে তাঁর বিপরীত পন্থায়। সেজন্য তিনি স্বাধীনতার উৎসবে যোগ দেন নি। তিনি বলেছেন, এ স্বাধীনতা আধ্যাত্মিকতার অপমৃত্যু। অবশ্য ভক্তরা তাঁকেই এই স্বাধীনতার নির্ম্মাতা বলে বন্দনা করতে ত্রুটি করেননি। প্রকৃতির এ বড় নির্মম পরিহাস!

এই পরিহাসের আবরণ উন্মোচন করে স্বাধীনতার ও গান্ধী ভক্তির সত্যকার রূপ উদ্ঘাটন করেছেন অতুলানন্দ চক্রবর্তী তাঁর **The Lonesome Pilgrim** (নিঃসঙ্গ তীর্থযাত্রী) গ্রন্থে। আগেও অনেক মূল্যবান গ্রন্থ লিখে ইনি বিদগ্ধলেখক বলে স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। তাঁর এক গ্রন্থ হরিজন পত্রিকায় গান্ধী স্বয়ং উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন ও তাঁর পন্থাকে দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছিলেন। এমনকি, জিন্নাহ্‌র সঙ্গে আলোচনার জন্যেও এঁকে বিশেষ নির্দেশ দিয়েছিলেন। লেখক প্রগাঢ় গান্ধী ভক্তি নিয়ে গান্ধীর সমালোচনা করেছেন এবং হিন্দু-মুসলিম মিলনের ব্যর্থতার জন্য নেহরুকে এবং, নেহরুকে সমর্থন করার জন্য, গান্ধীকেও দায়ী করেছেন।

এসব তথ্য সাধারণতঃ পড়তে পাওয়া যায় না। **The Lonesome Pilgrim** গ্রন্থ নির্ভীক ও সরল সমালোচনায় সমৃদ্ধ; রচনা নৈপুণ্যেও সেগুলি একাধারে প্রামাণ্য ও সুখপাঠ্য। সংক্ষেপে এ একখানি অনবদ্য, অনন্যসাধারণ রচনা, আর আজকের কৃত্রিমতা-কলুষিত গান্ধী ভক্তির দিনে একটি সত্যকারের পথপ্রদর্শক। **The Lonesome Pilgrim** গান্ধী সমালোচনা সাহিত্যে একটি একক ও বলিষ্ঠ গ্রন্থ। এই বইয়ের বঙ্গানুবাদের প্রতীক্ষায় রইলাম।

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৯শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

মাঘ, ১৩৭৬

৪র্থ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ জন্ম-শতবার্ষিকী

চার্লস্ ফ্রিয়ার এণ্ড্রুজ কর্ম্মজীবনের অধিকাংশ-কাল ভারতবর্ষে কাটাইয়াছিলেন। তিনি খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ছিলেন ও প্রথমে দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন কলেজে ইতিহাসের শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া ভারতে প্রেরিত হইয়াছিলেন। তখন বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ ও ১৯০৪ খৃঃ অব্দের যুগপরিবর্ত্তনকারী ও মহাবিস্ময়কর এক যুদ্ধের সূচনা হইয়াছে। এই যুদ্ধে জাপান বিশাল রুষ সাম্রাজ্যকে বিধ্বস্ত করিয়া প্রমাণ করিয়াছিল যে ক্ষুদ্র দেশ হইলেও বীরত্ব, ত্যাগ ও সংহতি থাকিলে এশিয়ার কোন জাতির পক্ষে মহাপরাক্রমশালী এক ইয়োরোপীয় জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করা অসম্ভব নহে। ঐতিহাসিক এণ্ড্রুজ ভারতে সেই সময়েই আসিলেন যখন হাটে, বাজারে, গ্রামে, শহরে শিক্ষিত অশিক্ষিত সকল ব্যক্তিই এক কথাই আলোচনা করিতেছে: গভীর আগ্রহ ও মহা উত্তেজনার সহিত। পূর্ব্ব দেশের মানুষের প্রাচীন গৌরব ও শৌর্য্য নবজীবন প্রাপ্ত হইয়া আবার কি তাহাকে পৃথিবীতে উচ্চ আসনে উঠাইয়া বসাইয়া দিবে? পাশ্চাত্যের অত্যাচার ও শোষণের এইবার কি শেষ হইবে? দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ খৃষ্টধর্ম্মের সারমর্ম নিজ অন্তরে চিরজাগ্রত রাখিয়া চলিতেন। রাজশক্তির সাহায্য লইয়া রাজধর্ম্ম প্রচার করার অহমিকা তাঁহার মধ্যে ছিল না। ঈশ্বর দীনদরিদ্র অবহেলিত অসহায় মানুষের ঈশ্বর। ঐশ্বর্য্য ও প্রবল পরাক্রম যাহার তাহার প্রতি সৃষ্টিকর্তার প্রতিপালন ও সহায়তার বিশেষ দৃষ্টি আছে বলিয়া সত্যধর্ম্মাশ্রয়ীগণ মনে করেন না ও সেইজন্যই খৃষ্টধর্ম্মে দীনদরিদ্রজনের সেবা ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ অঙ্গ বলিয়া গ্রাহ্য হয়। অবশ্য সম্রাট যেখানে ধর্ম্মের রক্ষক বা Defender of the Faith বলিয়া স্বীকৃত সেখানে ধর্ম্মের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদীদিগেরও একটা উচ্চ স্থান দেওয়া রীতি ছিল। কিন্তু দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ বৃটিশ রাজকর্ম্মচারিদিগের সহিত যেটুকু সম্বন্ধ রাখিয়া চলিতেন

তাহার উদ্দেশ্য ছিল ভারতে বৃটিষ-শাসন পদ্ধতিতে সত্য, ন্যায় ও সুনীতির প্রতিষ্ঠা করা এবং অত্যাচার, উৎপীড়ন ও শ্বেতকায় প্রাধান্য দূরীকরণ চেষ্টা। তিনি মৃত্যুকাল অবধি যতদিন ভারতবর্ষে সমাজসেবা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, সর্ব্বদাই উচ্চ রাজকর্ম্মচারীদিগের মনে ধর্ম্ম ও সুনীতি জাগ্রত করিবার জন্য দিল্লী, সিমলা গমনাগমন করিতেন। কখন কখন ইহাতে ভারতীয় জনসাধারণের কিছু সাহায্য হইত; যদিও অধিকাংশ সময়েই বিশেষ কোন লাভ হইত না। তিনি উত্তমরূপেই বুঝিতেন যে তাঁহার ভারতপ্রীতি বৃটিষ রাজকর্ম্মচারীগণ সুনজরে দেখেন না! কিন্তু তাহা হইলেও বৃটিষ শাসকগণ তাঁহার স্বজাতি বলিয়া তাঁহার মনে ক্ষোভের ও অনুশোচনার সৃষ্টি হইত এবং তিনি সেই কারণে আজীবন চেষ্টা করিয়া গিয়াছিলেন যাহাতে বৃটিষ-জাতির এই মহাপাপের শীঘ্র অবসান হয়।

১৯০৪ খৃঃ অব্দে তিনি দিছুদিনের জন্য সেণ্ট স্টিফেন কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক ছিলেন। তৎপরে তিনি শরীর অসুস্থ হওয়াতে পাহাড়ে চলিয়া যান ও সামরিক বিভাগের ধর্ম্মযাজকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকেন। এই সময় তাঁহার ভারতীয় উর্দ্ধশিক্ষকের সহিত একত্রে প্রকাশ্য রাজপথে পদব্রজে ভ্রমণ করিবার কথা লইয়া শ্বেতাঙ্গমহলে সমালোচনা আরম্ভ হয়। তিনি তাহা অগ্রাহ্য করেন। পরে সেণ্ট ষ্টিফেন কলেজে যখন অধ্যক্ষের পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার কথা হয় তিনি তখন সহকর্ম্মী শ্রীযুক্ত রুদ্র মহাশয়কে ঐ পদে নিয়োগ করার জন্য আলোড়ন করেন ও শ্রীযুক্ত রুদ্র ঐ পদে নিযুক্ত হয়েন। এই প্রথম খৃষ্টীয় কলেজে কৃষ্ণকায় অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হইল।

এই সময় স্বদেশী আন্দোলনের আরম্ভ হয় ও শ্রীযুক্ত এণ্ডরুজ ক্রমে ক্রমে গোখলে, লাজপত রায়, গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি জাতীয় নেতাদিগের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইয়া যান। গোখলে তখন ভারতীয় শ্রমিকদিগকে প্রায় ক্রীতদাসের মতই দেশের বাহিরে প্রেরণ-রীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইতেছিলেন। গোখলের মৃত্যুর পরে এণ্ডরুজের চেষ্টাতেই এই ইণ্ডেঞ্চার রীতির অবসান ঘটে। গান্ধীর সহিত তিনি আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদিগের কৃষ্ণকায় দমন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালান ও এই কারণে তাঁহার জীবনও বহুবার বিপন্ন হয়। এণ্ডরুজ বারেবার ভারতর্ষ হইতে অপরাপর দেশে গমন করিয়া শ্রমিকশোষন ও কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের অপমানকর রাষ্ট্রীয়ও সামাজিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া জগতে সকল মানবের সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। ১৯১২ খৃঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ডে রবীন্দ্রনাথের সহিত বিশেষভাবে পরিচিত হইবার সুযোগ লাভ করেন ও তখন হইতে জীবনের শেষদিন অবধি তিনি বিশ্বকবির সহিত সাহচর্য্য রক্ষা করিয়া চালয়াছিলেন। শান্তিনিকেতনই তাঁহার নিজের নিবাসস্থল হইয়াছিল এবং রবীন্দ্রনাথকে তিনি একান্ত নিজের বন্ধু ও গুরুস্থানীয় বলিয়া মনে করিতেন। শান্তিনিকেতনে আশে পাশের সকল দরিদ্র ও দুঃখী-লোকের তিনি ছিলেন পরম বন্ধু; কাহারও অভাব দেখিলে ছুটিয়া যাইতেন তাহার সাহায্যের জন্য। তাঁহার দীনবন্ধু নাম এই জন্য সার্থক হইয়াছিল।

১৯৪০ খৃঃ অব্দে ৫ই এপ্রিল তাঁহার দেহান্ত ঘটে এবং সেই দিন ভারতের বহু দীন দুঃখী এই মহাপ্রাণ ইংরেজ সাধুর জন্য অশ্রুবর্ষণ করিয়াছিল। তাঁহার বন্ধু ও ভক্তদিগের মধ্যে বহু উচ্চ শিক্ষিত ও আভিজাত-বংশীয় লোকও ছিলেন এবং তাঁহারা এণ্ডরুজের পরলোক-গমনে মহাশোকে মুহ্যমান হইয়া পড়েন। আজ প্রায় ৩০ বৎসর হইয়াছে তিনি এই জগতে নাই কিন্তু তাঁহার ভক্ত ও বন্ধুগণ তাঁহার স্মৃতি হৃদয়ে চিরজাগ্রত রাখিয়াছেন ও তাঁহার জন্মশতবার্ষিকী যাহাতে উত্তম-রূপে অনুষ্ঠিত হয় সেই চেষ্টা করিতেছেন। ভারতে বহুস্থলে অনুষ্ঠান ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ হইবে। অনুষ্ঠানকারীদিগের ইচ্ছা যে দীনবন্ধু এণ্ডরুজের স্মৃতি রক্ষার জন্য এমন কিছু করা হইবে যাহাতে দেশের দরিদ্রলোকের উন্নতি ও মঙ্গল হয়। একটা কথা

হইয়াছে যে শ্রমিকদিগের ভিতর মদ্যপান, জুয়াখেলা ও অন্যান্য দোষাবহ কার্য্যের বিরতি চেষ্টার ব্যবস্থা করিলে স্মৃতিরক্ষা উপযুক্তভাবে করা হইবে। তাঁহার একটি জীবনী ইংরেজী, বাংলা, হিন্দী ও তামিলভাষায় প্রকাশ করা হইবে। সর্ব্বভারতীয় সি, এফ, এণ্ড্রুজ শতবার্ষিকী সভার বিবরণ অপর স্থলে পূর্ণতরভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

হত্যার আসর

নরহত্যা ও মানুষের উপর পাশবিক অত্যাচারের জন্য বর্ত্তমান ইয়োরোপ ও আমেরিকা মহাদেশের সামরিক ও অসামরিক নেতাগণ বহুকাল হইতে চূড়ান্ত অখ্যাতি অর্জ্জন করিয়া আসিয়াছেন। বিজ্ঞান ও কৃষ্টির কেন্দ্র যে সকল দেশ সেই সকল দেশেই এই পশুভাব প্রবলতমভাবে দেখা গিয়াছে। দশ হাজার অথবা দশ লক্ষ মানুষকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করা হইল এইরূপ কথা আজকালকার ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লিখিত দেখিলে আমরা আশ্চর্য্য হই না; কারণ সামরিক অথবা যুদ্ধবর্জ্জিত হত্যাকাণ্ড মানবসভ্যতা বিরুদ্ধ বলিয়া আমরা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করিতে শিখি নাই। সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইল বিজ্ঞানের প্রগতি এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষের ধনৈশ্বর্য্য ও প্রাণনাশ করা ক্রমাগতই হইতেছে ও সেই ধ্বংসলীলা বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত ক্রমে ক্রমে আরও বিরাট আকারে দেখা দিতেছে। বিজ্ঞান আমেরিকা ও ইয়োরোপেই বিশেষ করিয়া বর্দ্ধনশীল ও বর্ত্তমানকালে সভ্যতার কেন্দ্র জার্ম্মানীতে হিটলারের বহুলক্ষ ইহুদির উপর অমানুষিক অত্যাচার ও তাহাদিগকে নির্ম্মমভাবে হত্যা করার কথা কেহ এখনও ভুলিতে পারে নাই। আমেরিকা জাপানের সহিত যুদ্ধে আনবিক অস্ত্রের সাহায্যে হিরোসিমা নাগাশাকি ধ্বংস করিয়া বিজ্ঞানের পাশবিক ব্যবহারের আর একটা নীতিজ্ঞানহীন উদাহরণ দেখাইয়াছে। ইয়োরোপের অন্যান্য দেশে নরহত্যা ব্যতীত রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠা প্রায় অসম্ভব বলিলে কোন অত্যুক্তি করা হয় না। আদর্শ প্রচারের ও প্রতিষ্ঠার জন্য রুশিয়া, জার্ম্মানী, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশে কত মানুষের উপর নির্য্যাতন, এমনকি কত মানুষের প্রাণনাশ করা হইয়াছে তাহার হিসাব বহু দীর্ঘ হইবে।

ইয়োরোপ-আমেরিকার অনুকরণে চলিবার চেষ্টা এশিয়ার বহুদেশে দেখা গিয়াছে এবং তাহার ফলে মানুষের দুঃখকষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে, কমে নাই। চীন রুশদেশের অনুকরণে কম্যুনিজমের আদর্শ স্থাপন চেষ্টায় এখন অবধি নিজদেশে ও পরের দেশে কত লক্ষ লোকের প্রাণনাশের কারণ হইয়াছে তাহা বলাও কঠিন। শুধু তিব্বতেই শুনা যায় বৌদ্ধধর্ম্মের পরিবর্ত্তে কম্যুনিজম স্থাপন করিবার জন্য লক্ষাধিক লোক কোতল হইয়াছে। এশিয়াতে কম্যুনিজমসংক্রান্ত মতবিরোধের জন্য কোরিয়া, ভিয়েৎনাম, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়ায় কতলক্ষ লোক প্রাণ দিয়াছে তাহার সংখ্যা অজানা।

ভারতবর্ষে এখনও হত্যার আসর উপযুক্ত পাশবিকতার সহিত বসান হয় নাই। ইহার কারণ ভারতে প্রায় ৫০।৬০ বৎসর ধরিয়া রাষ্ট্রীয় মতবাদ কেহ হিংস্র ও ব্যাপকভাবে ব্যক্ত করে নাই। বরঞ্চ অনেক বৎসর ধরিয়াই, এই দেশে অহিংস-নীতির প্রচার প্রবলভাবে চালিত হওয়ায় রাজনৈতিক আবহাওয়া কিছু শান্তিপূর্ণই রহিয়া গিয়াছে। ইংরেজ কোথাও কোথাও বহু লোককে গুলি করিয়া মারিয়াছে, বৃটিষ রাজকর্ম্মচারীরা কিছু কিছু গুলি বা বোমাতে হতাহত হইয়াছে, সাম্প্রদায়িক কলহে দেশ বিভাগের কারণে বহুলোক প্রাণ দিয়াছে, কিন্তু ঠিক ইয়োরোপ আমেরিকা চীন জাপানের সমাপ্তিহীন নরমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান ভারতে বহু শতাব্দীর ভিতর হয় নাই। কিন্তু আজকাল দেখা যাইতেছে ভারতের কোন কোন প্রদেশে রাষ্ট্রীয় দৃষ্টিভঙ্গী অন্যান্য দেশের অনুকরণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। কিছু কিছু খুনখারাপি রক্তারক্তি একটা নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং ক্রমাগত প্রচার চলিতেছে যাহাতে মারামারি কাটাকাটি আরও প্রসারিত হয়। মানবজীবনের পবিত্রতা অস্বীকার করিয়া জোর যার মুলুক তার নীতিতে শাসনপদ্ধতি গঠন করার চেষ্টা গভীর

আবেগের সহিত চলিতেছে। সমষ্টিবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তির প্রাণ যদি মূল্যহীন হইয়া দেখা দেয় তাহা হইলে মানুষ তাহাই মানিয়া লইবে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে বলি দিয়া সমাজ নামক দেহমন বর্জ্জিত দানবকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে। এই নূতন বিকৃত মনোভাব সময় থাকিতে যদি দমন করা না হয় তাহা হইলে অদূর ভবিষ্যতে ভারতের সর্ব্বত্রও রক্তস্রোত বহিতে আরম্ভ করিবে সন্দেহ নাই।

বাংলায় বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি যাহা তাহাতে দেখা যাইতেছে এই দেশের পুলিশ পাহারা, যাহা কোনও দিনই কর্ম্মকুশলতার জন্য বিখ্যাত ছিল না, তাহা আরও নিষ্কর্ম্মা হইয়া পড়িয়াছে। যানবাহন চালনার নিয়ম কার্য্যকরীভাবে প্রয়োগ করা হইতে আরম্ভ করিয়া মানুষের প্রাণ বা ধনসম্পত্তি রক্ষা, কোন বিষয়েই বাংলার পুলিশ আর অল্পমাত্রও সক্ষম নাই। যে ব্যক্তি এইকথা লইয়া যতই তর্ক করুন না কেন; কিম্বা তাঁহার মতবাদ যতই মূল্যবান হউক না কেন; বর্ত্তমান অবস্থার অবসান না হইলে বাংলার মানুষ সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারিবে না একথার সত্যতা সর্ব্বজনস্বীকৃত। ইউ এফ রাজ একটা বিরাট অভিনয়ের পালা হইয়া দাঁড়াইয়াছে; তাহার শাসন-মূল্য এক পয়সাও নাই। এবং বাংলার মানুষ এই দল-সমষ্টির নেতৃত্বে সভ্যতার একটা অতি অবনত স্তরে ক্রমশঃ আসিয়া দাঁড়াইতেছে। ইহার চরম পরিণতি হইবে পথে ঘাটে ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্র খুন জখম ও লুঠপাট অব্যাহতভাবে চালিত হইয়া। কোন নেতা হয়ত ইহার উত্তরে একটা দীর্ঘ বক্তৃতা দিবেন সামাজিক ন্যায় ও মানব-সাম্য অথবা মজুর শাসনতন্ত্রের আবশ্যকতা সম্বন্ধে। কিন্তু যে নেতাদিগের একটা ক্ষুদ্র প্রদেশে শাসনযন্ত্র চালিত রাখিবার ক্ষমতা নাই, তাঁহারা বৃহৎ বৃহৎ সমাজ-সংস্কারে সক্ষম হইবেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস হয় না। তাঁহাদের এবং তাঁহাদের দলের অপরাপর পাণ্ডাদিগের সহিত আমরা লেনিন, ষ্টালিন বা মাওৎ টুঙ্গের বিশে সাদৃশ্য দেখিতে পাইতেছিনা। নিজ জাতির সাধারণ মানুষের পারস্পরিক হত্যাসাধনে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয় বলিয়া আমরা মনে করি না।

আরব-ইসরাইল দ্বন্দ্বে রুশ-আমেরিকার সাহায্য

কিছুদিন পূর্ব্বে শুনা গিয়াছিল যে ইসরাইল যাহাতে আর আরবদেশগুলির উপর বিমান আক্রমণ না চালাইতে পারে সেইজন্য রুশিয়া আরবদিগকে অস্ত্র-সরবরাহ করিতেছেন এবং ইসরাইলকে ধমকি দিতেছেন। কিন্তু অপরদিক হইতে আমেরিকা ইসরাইলকে একশত জেট বিমান পাঠাইয়া তাহার আকাশ-আক্রমণের ক্ষমতা বাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া রুশের ধমকির উত্তর দিবার সুবিধা করিয়া দিতেছেন। অর্থাৎ বরাবরই দেখা যাইতেছে যে রুশিয়া আরবদিগকে যতটা যুদ্ধের মাল-মশলা পাঠাইয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করিয়া দিতেছেন, আমেরিকাও ইসরাইলকে আরও কিছু অধিক পরিমাণে সামরিক সাহায্য করিয়া রুশিয়ার মতলব হাসিল করা অসম্ভব করিয়া তুলিতেছেন। সম্প্রতি রুশিয়ার সাহায্যে মিশর ইসরাইলের উপরে কিছু হামলা করিতে সক্ষম হইলে পর ইসরাইলও মিশরের বহু অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া বোমা বর্ষণ করিয়া মিশরকে বুঝাইয়া দিল যে বিষয়টা মিশরের পক্ষে লাভজনক হইবে না। তাহাতে রুশিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কিছু গরম গরম কথা বলিলেন; কিন্তু পৃথিবীর কোন লোকই ইহাতে রুশিয়া যে ইসরাইল আক্রমণে অবতীর্ণ হইবেন এরূপ কথায় বিশ্বাস করিলেন না। কারণ আরবদেশের সাহায্যে রুশের সৈন্য প্রেরণা সহজ হইতে পারে না। চতুর্দ্দিকে আমেরিকার সহায়ক জাতিগুলি অস্ত্রসজ্জিতভাবে উপস্থিত এবং এইখানে যুদ্ধ হইলে আমেরিকান "ব্লক" রুশিয়াকে অনায়াসেই বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইবে। সুতরাং রুশিয়া এই স্থলে কখনও আমেরিকার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে না। ইহা ব্যতীত বাহিরে যে যাহাই ভাবুক, রুশিয়া কখনও দূরপথে গিয়া অপর দেশের জন্য যুদ্ধে নামিবে না। কারণ রুশিয়া এখনও এতটা শক্তিশালী হয় নাই যে তিনটি চারটি সীমান্ত রক্ষা করিয়া লড়াই চালাইতে পারে। চীনের

সীমান্তে যুদ্ধের সম্ভাবনা রহিয়াছে মঙ্গলিয়া ও সিংকিয়াংএ। ইয়োরোপে "নেটো" শক্তি সমূহ আমেরিকার নেতৃত্বে রুশিয়াকে আক্রমণ করিলে, রুশিয়ার সকল শক্তি নিয়োগ করিয়া সেইখানে আত্মরক্ষা করিতে হইবে। এই অবস্থায় রুশিয়া একটা তৃতীয় সীমান্ত সৃষ্টি করিয়া বিপর্য্যস্ত হইতে চাহিবে বলিয়া কেহ মনে করে না। রুশিয়া তাহা হইলে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধে নামিবে বলিয়া সামরিক পণ্ডিতরা মনে করেন না। আমেরিকা জানেন যে ইসরাইলকে যথাযথভাবে অস্ত্র সরবরাহ করিলেই সেই জাতির সৈন্যগণ আরবশক্তিকে বিধ্বস্ত করিতে সক্ষম হইবে। আরবদিগের সৈন্যগণ অধিকাংশ অশিক্ষিত ও যন্ত্র-প্রধান যুদ্ধে অক্ষম। এ ক্ষেত্রে তাহাদিগের জন বল অধিক হইলেও ইসরাইলকে পর্যুদস্ত করিতে আরবশক্তি কখন পারিবে না। এক্ষেত্রে আমেরিকাকে সৈন্য পাঠাইয়া পশ্চিম এশিয়ায় আর একটি ভিয়েৎনাম গঠন করিতে হইবে না। রুশিয়াও এখানে সৈন্য পাঠাইবে না। সুতরাং এই যুদ্ধ হঠাৎ হঠাৎ আক্রমণ প্রত্যাক্রমণের যুদ্ধই থাকিয়া যাইবে বলিয়া মনে হয়।

সপক্ষ-বিপক্ষ বিচার

সাধারণতন্ত্রে শাসনকার্য্য চলে জনসাধারণের প্রতিনিধিদিগের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠদলের মতানুসারে। সংখ্যায় যাহারা অল্প, তাহারা শাসন কার্য্যভার প্রাপ্ত দলের বিপক্ষে থাকিয়া শাসনকার্য্যের সমালোচনায় নিযুক্ত হয়। অর্থাৎ শাসনকার্য্যে সরকারের সপক্ষ ও বিপক্ষ এই দুই দল থাকা আবশ্যক ও তাহা ঠিকভাবে থাকিলে ও নিজ নিজ কার্য্য করিলে সাধারণতন্ত্র পূর্ণশক্তিতে চলিতে পারে। কিন্তু প্রতিনিধি-সভায় যদি বহুদল হইয়া যায় ও শাসন কার্য ভার লইতে হইলে যদি একাধিক দলের সমবেত ও মিলিত উপস্থিতির প্রয়োজন হয়; এবং ঐ রাষ্ট্রীয়দল সমষ্টি যদি অন্তরে অন্তরে পরস্পর বিরোধী হয়; তাহা হইলে সাধারণতন্ত্র উপযুক্তভাবে চলিতে পারে না। সাধারণতন্ত্র যদি না চলে এবং তাহার চিরপ্রচলিত রীতি অনুসরণে যদি সপক্ষদল ও বিপক্ষদল না থাকিয়া সকলদলই সরকার সমর্থক ও সরকার সমালোচক হইয়া দাঁড়ায়; তাহা হইলে লোক দেখাইবার জন্য জনসাধারণের অর্থ অপব্যয় করিয়া সাধারণতন্ত্রের অভিনয় করার কোন প্রয়োজন থাকে না।

বাংলা দেশে এখন যাহা হইতেছে তাহা একপ্রকার "ফ্যাশিষ্ট" শাসনপদ্ধতি। শুধু একজন "ফ্যাশিষ্ট" নেতা না হইয়া কয়েকজন নেতা যথেচ্ছাচার করিয়া রাজ্য শাসন করিতেছেন। এই সকল সেচ্ছাচারী জনউৎপীড়ক কে কে তাহা সকলেই জানেন। এবং ইঁহাদিগের একছত্র (বহুছত্র ?) একাধিপত্যের যাহাতে শীঘ্র অবসান ঘটে তাহার জন্য বাংলার জন সাধারণ উৎসুকভাবে অপেক্ষা করিতেছেন।

ভারতবর্ষে যখন সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইল তখন সাধারণতন্ত্র স্থাপনের উদ্দেশ্য নির্দ্দেশ করা হইয়াছিল যে তদ্দ্বারা ভারতীয় মানবের সামাজিক, আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিচারপ্রাপ্তি ঘটিবে; চিন্তায়, মনোভাব প্রকাশে, বিশ্বাসে ও ধর্ম্মানুষ্ঠানে স্বাধীনতা লাভ হইবে; জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে ও সকল সুবিধায় সাম্য প্রতিষ্ঠিত হইবে; ব্যক্তির মানসম্ভ্রম রক্ষাতে ও জাতীয় একতার বিষয়ে ভ্রাতৃত্বভাব সুরক্ষিত হইবে। ইত্যাদি

ঘেরাও; ইষ্টক, বোতল ও বোমা নিক্ষেপ, মিছিল বাহির করিয়া যাতায়াত বন্ধ; বাজার দোকান বন্ধ করিয়া গৃহে গৃহে রন্ধন অসম্ভব করা; যথা ইচ্ছা খুনখারাপি, দাঙ্গা লুঠ ইত্যাদি করিয়া সকল মানবের জীবনযাত্রা দুর্ব্বিসহ করিয়া দেওয়া; উপরোক্ত সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যসিদ্ধিতে সাহায্য করে বলিয়া মনে হয় না। সুবিচার, স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাতে ঐ অরাজকতা সাহায্য করে বলিয়াও কেহ স্বীকার করিবেন না। সুতরাং বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় স্বৈরাচারপ্রসূত অরাজকতা আমাদের দেশে সাধারণতন্ত্রকে অচল করিয়াছে বলিলে তাহা সকলেই মানিয়া লইবে। সাধারণতন্ত্র যদি না চলিতেছে, তাহা হইলে কিছু কিছু স্বেচ্ছাচারী মানুষকে সাধারণতান্ত্রিক মন্ত্রী সাজাইয়া দেশবাসীর জীবন অসহ্য করিবার ব্যবস্থা কখনও ন্যায্য হইতে পারে না। সেই-

জন্ম দেখা আবশ্যক, অপর কোন শাসনব্যবস্থা করিলে দেশবাসীর অবস্থা উন্নততর হইতে পারে কি না।

মুখ্যমন্ত্রীত্ব আছে কি নাই

বাংলায় যে কথা কাটাকাটি চলিতেছে তাহাতে মনে হয় যে চতুর্দ্দশদলীয় শাসনপদ্ধতি স্থাপনের সময় শুধু শাসনকার্য্য ভাগ করিয়া লওয়া হয় নাই মুখ্যমন্ত্রীত্বও ভাগ হইয়া গিয়াছিল । কারণ শ্রীজ্যোতি বসুর মতে মুখ্য মন্ত্রীত্ব আইনতঃ থাকিলেও প্রকৃত ভাবে দেখিতে হইবে যে এক এক দল এক একটি বা ততোধিক শাসন-বিভাগ নিজস্ব করিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন ও সেই জন্ম মুখ্য মন্ত্রীর ঐ সকল বিভাগের উপর কোন শাসন-অধিকার আর নাই। অর্থাৎ দলের নেতাগণ যে যাহার শাসন-বিভাগের শুধু মন্ত্রী নহেন মুখ্যমন্ত্রীও তাঁহারাই, শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় শুধু লাট দরবারে যাতায়াতের যন্ত্র মাত্র। অজয়বাবুর মতের কোন ওজন পুলিশ বা শিক্ষা-দফতরে নাই, কেননা তিনি অপর দলের প্রাপ্ত অধিকারে কি করিয়া হস্তক্ষেপ করিতে পারেন ? পৃথিবীর সাধারণতন্ত্র-চালিত দেশগুলির ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখা যাইবে যে অনেক দেশেই অনেক সময় কোয়ালিশন অথবা মিলিত রাষ্ট্রদল কর্ত্তৃক চালিত শাসনপদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রেই একজন প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়া অপর মন্ত্রীদিগকে নিয়োগ করিয়া শাসনসভা বা ক্যাবিনেট গঠন করিয়াছেন। কেহ কোথাও কখন বলে নাই যে বহুদল মিলিত হইয়া শাসকসভা গঠন করিলে সেই শাসকদের সকলেই প্রধান মন্ত্রীর প্রাধান্যের বাহিরে পূর্ণ শক্তিতে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীজ্যোতি বসুর মতের তাহা হইলে সাধারণতন্ত্রের দিক হইতে কোন মূল্য নাই। তিনি যে সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাসী তাহা অবশ্য সকল নিয়ম রীতিনীতি পদ্ধতির উর্দ্ধে। অর্থাৎ রাষ্ট্র অপেক্ষা পার্টি বা রাষ্ট্রীয় দলই বড় এবং দলপতি যাহা করিবেন তাহাই সর্ব্বজনসম্মত বলিয়া প্রচার করা হইবে। বাস্তবক্ষেত্রে সর্ব্বজনসম্মত কিনা তাহা কেহ জানিবে না; কারণ সর্ব্বজনের মুখ উত্তমরূপে বাঁধা থাকিবে এবং কেহ কিছু বলিবে না। যদি কোনএক দলপতিকে অপর কোন নেতা গায়ের জোরে অপসৃত করিতে পারেন তাহা হইলে দ্বিতীয় দলপতি হইবেন সর্ব্বজনের মুখপাত্র ও তিনি যা বলিবেন তাহাই হইবে সর্ব্বসম্মত জনমত। এইভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা অতি সহজ, সরল ও মতদ্বৈধহীনভাবে সচল এবং প্রাণবান। শুধু ইহা সাধারণতন্ত্র নহে।

শ্রীজ্যোতি বসু ও তাঁহার সহচরগণ সাধারণতন্ত্রে বিশ্বাস করেন না। এই শাসনপদ্ধতিকে ভিতর হইতে ভাঙ্গিয়া দিবেন বলিয়াই তাঁহারা সাধারণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনে নামিয়াছিলেন। এখন তাঁহারা বাংলা দেশে সাধারণতন্ত্রকে অচল ও অব্যবহার্য্য করিয়া ফেলিয়াছেন। সুতারাং এখন দেশবাসীকে দেখিতে হইবে তাঁহারা সাধারণতন্ত্র চাহেন কি না। যদি ঐ শাসনতন্ত্র চালান বাঞ্ছনীয় হয় তাহা হইলে দেশবাসীর কর্ত্তব্য হইবে শ্রীজ্যোতি বসুর দলকে শাসন-ক্ষেত্র হইতে অপসৃত করা। নয়ত প্রদেশ ও কেন্দ্রীয় শাসকদিগকে ক্রমে ক্রমে কম্যুনিজম মানিয়া লইতে হইবে। নিয়মকানুন না থাকা রাষ্ট্রীয় স্থিতি ততটা অস্থির ও টলায়মান করিয়া দেয় না, যতটা করে নিয়মাদি অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিয়া, অবহেলা করিয়া দেশের কাজ নেতার যথেচ্ছাচারের উপর চালাইলে। আজ বাংলা দেশের শাসনপদ্ধতি ও নিয়ম রক্ষকগণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছেন কোথায় কতভাবে আইন অমান্যকর কার্য্য হইতেছে। তাঁহাদিগকে মন্ত্রী হুকুম দিয়াছেন শ্রমিক, বেতনভোগী ও ছাত্রদিগের আইন না মানা একটা অধিকার বলিয়া ধরিতে হইবে এবং যদি তাহারা কোনভাবে অপরের উপর জোর জুলুম করে তাহা হইলে দেশ-শাসকগণ কোনও ভাবে উৎপীড়িত পক্ষের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন না। দেশের চির প্রতিষ্ঠিত সামাজিক রাজনীতিকে লোকচক্ষে হেয় করিবার এরূপ উদাহরণ ইতিপূর্ব্বে কখনও দেখা যায় নাই। পুলিশ-মন্ত্রী সাধারণতন্ত্র ভাঙ্গিতেছেন ও মুখ্যমন্ত্রী শুধু নানাভাবে বিলাপ করিতেছেন ! এই ব্যবস্থার নাম অরাজতা বা মন্ত্রীর স্বৈরাচার।

পৃথিবীকে মানবজীবন ধারণের অনুপযুক্ত করণ

পৃথিবীতে মানব সভ্যতা বহু দীর্ঘকালের নহে। মানুষ কিন্তু অপর সকল জীবজন্তুকে মারিয়া কাটিয়া ও নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া বর্ত্তমানে সর্ব্বত্রই নিজ প্রভাব বিস্তার করিয়া মানব-আধিপত্য স্থাপন করিয়া লইয়াছে। ইহা হইতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে মানুষ অনন্তকাল পৃথিবীতে নিজ অধিকারে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিবে। কিন্তু দেখা যাইতেছে যে মানুষ নানা ভাবে যে সকল প্রাকৃতিক অবস্থা না থাকিলে তাহার জীবনধারণ সম্ভব হয় না সেই সকল অবস্থা উত্তরোত্তর নষ্ট করিয়া পৃথিবীকে নিজ বাসের অনুপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে। প্রথম প্রকৃতির দান হইল হাওয়া। পরিষ্কার হাওয়া না থাকিলে মানুষ শ্বাসগ্রহণে অক্ষম হয় ও বাঁচিতে পারে না। মানুষ চিমনি, চুলা, গাড়ী, রেল ইঞ্জিন, কারখানা ও অপরাপর প্রতিষ্ঠানজাত ধোঁয়া ও বাষ্পে ক্রমশঃ পৃথিবীর হাওয়া নিশ্বাস-গ্রহণের অনুপযুক্ত করিয়া তুলিতেছে। এইভাবে যদি হাওয়া বিষাক্ত করা ক্রমবর্দ্ধনশীল হইতে থাকে তাহা হইলে পাঁচ বা দশ হাজার বৎসরে মানুষের পক্ষে আর পৃথিবীতে থাকা চলিবে না। এই অবস্থা যাহাতে না হয় তাহার জন্য এখন হইতে বিশেষ চেষ্টা না করিলে ঐ নিদারুণ পরিণতি ঠেকাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না। চুলা চিমনি গাড়ী ইঞ্জিন ও কারখানার ধোঁয়া নিবারণ চেষ্টা অবিলম্বে আরম্ভ করা অবশ্য প্রয়োজনীয়।

দ্বিতীয় প্রকৃতির দান জল। মানুষ আজ সর্ব্বত্র ময়লা ও বিষাক্ত পরিবর্জ্জিত বস্তু জলে ঢালিয়া দিয়া নদীর, হ্রদের ও সমুদ্রের জল মৎস্য ও অপরাপর জলচরদিগের বাসের অনুপযুক্ত করিয়া তুলিয়াছে। এই ভাবে চলিলে অদূর ভবিষ্যতে কোথাও আর মৎস্য দেখা যাইবে না ও যে সকল মানুষ মৎস্য খাইয়া দেহ ধারণ করে তাহাদিগের একটা প্রধান খাদ্যবস্তু আর পাওয়া যাইবে না। পরে ক্রমশঃ পানীয় জলও পাওয়া কঠিন হইবে এবং মানুষ পরিষ্কার জল না পাইয়া মৃত্যুমুখে পড়িয়া শেষ হইয়া যাইবে। সুতরাং এখন হইতে মানুষের কর্ত্তব্য হইবে সহরের ও কারখানার পরিত্যক্ত জল শোধন করিয়া তবে তাহা পৃথিবীর জলময় নদ নদী হ্রদ সমুদ্র প্রভৃতিতে ছাড়িয়া দিবার ব্যবস্থা করা। বহু দেশে আইন প্রণয়ন করা হইতেছে যাহাতে হাওয়া ও জল অধিক বিষাক্ত ও অপরিষ্কার না হয় তাহার ব্যবস্থার জন্য। ভারতবর্ষে সেরূপ আয়োজন কেহ এখনও করিতেছেন না; কিন্তু করা অত্যাবশ্যক। কারণ ভারতে চিমনির ও কারখানার নালির সংখ্যা অল্প হইলেও, চুলার সংখ্যা অগুণতি বিদ্যুৎ ব্যবহারে রন্ধন ব্যবস্থা করিলে ভারতের হাওয়া পরিষ্কার থাকিবে এবং যাহাতে অল্প ব্যয়ে সেই ব্যবস্থা হইতে পারে তাহার জন্য ভারতীয় জননেতাদিগের অবিলম্বে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

তৃতীয় প্রাকৃতিক দান মাটি; ফসল শাকসব্জি ও পালিত পশুর খাদ্যউৎপাদন ক্ষেত্র। আজকাল কীট ও জীবাণুনাশক ঔষধ ব্যবহারে মানুষ ও পশুর খাদ্য বিষাক্ত হইয়া উঠিতেছে। আমেরিকার মানুষ দেখিয়াছে মাতৃদুগ্ধও ডি ডি টি বিষে বিষাক্ত হইতেছে। সুইডেনে ডি ডি টি ব্যবহার আইনবিরুদ্ধ করা হইতেছে এবং অন্যান্য ঔষধ সম্বন্ধেও রাষ্ট্রের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষিত হইতেছে। ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়।

রামমোহন রায়ের জন্মদ্বিশতবার্ষিকী

ভারতের নব জাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায় দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে নিজ প্রাচীন গৌরব ফিরাইয়া পাইবার জন্য তিনিই উদ্‌বুদ্ধ করেন ও সামাজিক জীবনে ন্যায়, সুনীতি, শিক্ষা ইত্যাদির প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি অশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রাচীন ভারতে নারীদিগের স্থান সম্মানের ছিল। তাঁহারা দর্শন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পুরুষের সহিত সমান আসনে স্থান পাইতেন। কিন্তু বহুশত বর্ষের বিদেশী প্রাধান্যের ফলে নারীজাতির অবস্থা ভারতবর্ষে অতি শোচনীয় হইয়াছিল। নারী হইয়া জন্মগ্রহণ করা একটা দারুণ অভিশাপের মতই প্রতীয়মান হইত। রাজা রামমোহন রায়ের চেষ্টায়

এই অবস্থার পরিবর্ত্তন আরম্ভ হয় ও ভারতীয় সমাজে ক্রমে ক্রমে নারীগণ হারাণ অধিকার ফিরাইয়া পাইতে আরম্ভ করেন। বর্ত্তমান যুগে ভারতীয় নারীগণ যে উন্নত স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছেন তাহার ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁহার জন্মের দ্বিশতবার্ষিকী যাহাতে উপযুক্ত সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয় সেই ব্যবস্থা ভারত-সরকার করিবেন বলিয়া ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। ইহা করা আমাদিগের জাতীয়ভাবে কর্ত্তব্য এবং আমরা আশা করি এই কার্য্যে ভারত-সরকার অথবা দেশের জনসাধারণ কোনও কার্পণ্য করিবেন না। ভারতীয় মহাজাতির ইংরেজ রাজত্বের আরম্ভকালে যে কৃষ্টি ও জাতীয়তাবোধের ক্ষেত্রে নবজন্মলাভ হয় রামমোহন রায় ছিলেন তাহার মূলে। তিনি খৃষ্টান ধর্ম্মযাজকদিগের অন্যায় সমালোচনার প্রতিবাদ করিবার জন্য হিব্রু, গ্রীক, ল্যাটিন, আরবি, ফারসি, ইংরেজী প্রভৃতি বহুভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত ও বাংলার জ্ঞানও প্রগাঢ় ছিল। তিনি তিব্বতে গিয়া মহাযান বৌদ্ধধর্ম্মের চর্চ্চা করেন। ইংলণ্ডে গমন করিয়া তিনি তত্রস্থ বিদ্বানসমাজে ও দরবারে বিশেষভাবে আদৃত হ'ন। সতীদাহ নিবারণ তাঁহার সমাজ-সংস্কারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য। ধর্ম্মের ক্ষেত্রে শাস্ত্রের মূল সত্যের পুনরুদ্ধার এবং দর্শন ও জ্ঞানমার্গের কথা ভুলিয়া শুধু আচারপদ্ধতিতে নিবিষ্ট থাকার বিরুদ্ধে প্রচার করিয়া রাজা রামমোহন রায় ভারতীয় চিন্তার ধারাকে আবার পূর্ণ স্রোতে বহমান করিয়া তুলিয়াছিলেন। ভারতের বর্ত্তমান যুগের ইতিহাসে এই মহাপুরুষের স্থান অতি উচ্চে এবং যাহাতে তাঁহার স্মৃতিরক্ষা যথাযোগ্যভাবে করা হয় তাহার ব্যবস্থা করা সকল ভারতবাসীর কর্ত্তব্য।

পশ্চিম বাংলা হইতে ব্যবসা অপসারণ

কিছুকাল হইতে পশ্চিম বাংলা হইতে নানান ব্যবসা উঠিয়া অন্য প্রদেশে চলিয়া যাইতেছে। কাহারও কাহারও মতে অন্যান্য প্রদেশের শাসকগণ নিজেদের লোক পাঠাইয়া পশ্চিম বাংলার ব্যবসাদারদিগকে নানা প্রকার লোভ দেখাইয়া নিজেদের প্রদেশে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করিতেছেন। অন্যমত এই যে বাংলাদেশে ব্যবসা চালান ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে বলিয়া ব্যবসাদারগণ নিজ হইতেই অপর প্রদেশে চলিয়া যাইতে চাহিতেছেন। কারণ যাহাই হউক ব্যবসা যে কিছু কিছু এদেশ ছাড়িয়া অপর দেশে যাইতেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং বাংলাদেশের শাসকদিগের কর্ত্তব্য যাহাতে এ দেশের ব্যবসাগুলি উঠিয়া না যায় তাহার জন্য সচেষ্ট হওয়া। যেসকল কারণে ব্যবসাদারগণ বাংলা দেশ ত্যাগ করিতেছেন সেই সকল কারণ যাহাতে আর না থাকে সে চেষ্টাও করিলে দেশের মঙ্গল হইবে। আর একটা দিকেও লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। কেন্দ্রীয় সরকার যেসকল বিভাগের পরিচালক; যথা আয়কর, আমদানী রপ্তানী মাশুল ও রাজস্ব নির্দ্ধারণ, বিদেশী অর্থ, লাইসেন্স, পারমিটদান প্রভৃতি কার্য; সেই সকল বিভাগের কার্যকলাপের উপর নজর দেওয়া আবশ্যক। এই সকল বিভাগ এমন দুর্ব্যবস্থা করিতে পারে যাহাতে ব্যবসাদারগণ বাংলা দেশ ত্যাগ করে।

চলেছে মানব যাত্রী

[শ্রীঅরবিন্দের The Ideal of Human Unity অবলম্বনে]

সমর বসু

পশ্চিমের একজন বিদগ্ধ মানুষ বলেছেন,—"of all the earthly creatures only man is a dissatisfied being." অপর একজন পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন,—"Man is the brightest product of our Universe."

আপাতবিচারে মন্তব্য দুটিকে অনন্যবিরোধী বলে মনে হয়। কিন্তু একটু গভীরভাবে এদের তাৎপর্যটিকে ধরবার চেষ্টা করলেই বোঝা যাবে বিশ্বজগতে অভাবনীয় কিছু একটা ঘটাবার জন্যে মানুষের মধ্যে যে তীব্র অভীপ্সানিয়ত ক্রিয়মান, তা'ই তাকে সবসময় অস্থির করে রেখেছে। বাহ্য জীবনের কোনও কিছুতেই সে তাই সন্তুষ্ট থাকতে পারেনা। তাই সে সবসময় dissatisfied; এবং এই অভাবনীয় ঘটনাটি যেহেতু মানুষ ছাড়া অন্য কোনও প্রাণী কিম্বা বস্তুর দ্বারা ঘটানো সম্ভব নয়, সেই হেতু মানুষই হল brightest product.

কিন্তু এই অভাবনীয় ঘটনাটি যে কি তা এখনও মানুষের বুদ্ধির গোচরে আসেনি তার রূপ-রেখা কখনও 'Idea' হয়ে কখনও বা 'Ideal' হয়ে মানুষের ধ্যানের মধ্যে ধরা দেয় বটে, কিন্তু বাস্তবে তাকে কি করে যে রূপায়িত করা যাবে সে সম্বন্ধে মানুষ এখনও নিঃসংশয় হতে পারেনি। বর্তমান অবস্থায় তার পক্ষে নিঃসংশয় হওয়া সম্ভবও নয়। কেননা মানুষ যে-মনের অধিকারী তার বিচারণার ক্ষেত্র একটা বিশেষ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। তবুও মানুষকে এই 'Universe' এর 'brightest product বলা হয়েছে এই জন্যে যে, তার আপন মনঃসীমা অতিক্রম করে—Universal mind এর অধিকারী হবার সম্ভাবনা মানুষের মধ্যেই নিগূঢ় হয়ে রয়েছে। এবং Universal mind বা 'বিশ্বমনের' অধিকারী না হতে পারলে সেই অভাবনীয় ঘটনাটির সম্যক পরিচয় লাভ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমানের মানুষ, বিশেষ করে প্রতীচ্যের মানুষ—মানুষী-মনের ওপারে (beyond mind) কোনও কিছু আছে বলে স্বীকার করেন না বা করতে চান না। দৃশ্যমান জগতের যে পরিচয় তাঁরা পেয়েছেন এবং বুদ্ধির সাহায্যে বিশ্ব-প্রকৃতির যে প্রভূত শক্তির সন্ধান তাঁরা লাভ করেছেন তার মধ্যেই তাঁদের ধ্যানধারণা, চিন্তা-চেতনাকে তাঁরা আবদ্ধ করে রাখতে চান, বিশ্বাতীত অর্থাৎ বিশ্বে এখনও অভিব্যক্ত হয়নি [Unmanifested] এমন কোনও শক্তি বা চেতনাকে তাঁরা স্বীকার করেন না। অন্যদিকে প্রাচ্যের মানুষেরা বলেন,—এই উচ্চতর চেতনাকে লাভ করতে হলে, জড়জীবনের সব কিছুকেই পরিত্যাগ করতে হবে। জড়জীবনের মধ্যেই যে তাকে পাওয়া যায় এ-কথা মানতে তাঁরা রাজী নন।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর মহান গ্রন্থ 'The Life Divine' এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মানুষের এই অস্বীকারোক্তির যুক্তিকে বিশ্লেষণ করে বলেছেন—মানুষের এই অস্বীকারের মূলে রয়েছে Universal Instinct". এই অস্বীকারের ফল ভারতে যেমন শুভপ্রদ হয়নি পশ্চিমেও তেমনি হ'য়েছে বিপুল অসন্তোষের কারণ। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায়,—

"In Europe and in India, respectively the negation of the materialist and the refusal of the ascetic have sought to assert themselve s as the sole truth and to dominate t heconcep-

tion of life. In India, if the result has been a great heaping up of the treasuries of the spirit,—or of some of them,—it has also been a great bankruptcy of Life; in Europe, the fullness of riches and the triumphant mastery of this world's powers and possessions have progressed towards an equal bankruptcy in the things of the spirit. Nor has the intellect, which sought the solution of all problems in the term of Matter, found satisfaction in the answer that it has recieved."

মানুষ স্বীকার করুক আর নাই করুক, যে অনিবার্য গতিতে তার কর্ম-ধারা প্রবহমান তার থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, মানুষ ক্ষ্যাপার মত কেবলই পরশ পাথরের সন্ধানে ফিরছে। নিজের অজ্ঞানতাবশতঃ তাকে চিনতে পারছেনা, বুঝতে পারছেনা। একটা কিছুকে পেয়ে ভাবছে—সব পেয়েছি। তাকেই আশ্রয় করে কিছুকাল অতিবাহিত করছে, পরে তাকে একান্ত মূল্যহীন আবর্জনা মনে করে ত্যাগ করছে। এই ভাবে মানুষ বিভিন্ন বিধি-বিধান, রীতিনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে এগিয়ে চলেছে। এগিয়ে চলেছে যে লক্ষ্যের পানে,—সে লক্ষ্য কিন্তু এখন দূর-অস্ত। তা হোক, এগিয়ে যাওয়া যখন থামেনি তখন সে লক্ষ্যে সে একদিন নিশ্চয়ই পৌঁছুবে।

নানা পথ ঘুরে ঘুরে মানুষের এই অভিযাত্রা কখনও এক জায়গায় অস্থির হয়ে থেমে থাকেনি। একটা পথ ছেড়ে অন্য পথ সে ধরেছে। একদল মানুষ অপর দলের উপর কখনও প্রভুত্ব করে কখনও বা তাকে নিঃশেষে গ্রাস করে সামনের দিকে এগোবার পথ তৈরী করে নিয়েছে। আপন জন্মভূমির ভৌগোলিক সীমার মধ্যে আবদ্ধ টুকরো টুকরো মানবগোষ্ঠী এইভাবে এক-একটি জাতিতে পরিণত হয়েছে। এক-একটি জাতি নিজেকে শক্তিশালী করে অপর জাতিকে আক্রমণ করেছে, তাদের সম্পদ লুণ্ঠন করে নিজে স্ফীত হবার চেষ্টা করেছে। এইভাবে পারস্পরিক সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে মানুষ। চলতে চলতে এখন সে বুঝতে পেরেছে—আর সংঘাত-সংঘর্ষ নয়, বিরোধ-বিদ্বেষ নয়, এবার নতুনদিকে মোড় ফিরতে হবে। নতুন পথ ধরে চলতে হবে। মানুষের যে চেতনা ক্রমশঃ উন্মীলিত হচ্ছে সেই চেতনাই তাকে ঐক্যের পথে চলবার প্রেরণা দিচ্ছে। এ পথের প্রয়োজন যেমন অনস্বীকার্য তেমনি এ-পথেও রয়েছে নানা বিপত্তি। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'The Ideal of Human Unity গ্রন্থে মানুষের এই অভীপ্সা এবং তার মধ্যে ক্রিয়াশীল প্রকৃতি তাকে কি ভাবে পরিচালিত করছে তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন,—আমাদের জীবনের যেটা বাহিরের দিকে অর্থাৎ surfaces of life, তার রীতি নীতি, গতি-প্রকৃতি বৈশিষ্ট এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি—আমরা অনায়াসে বুঝতে পারি, কেননা সেগুলো সবসময় আমাদের হাতের কাছে রয়েছে। কিন্তু বহিজীবনের ঐ সব ক্রিয়াপদ্ধতির সাহায্যে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। বাইরে আমরা যে কাজ করি তাই দিয়ে স্ব-ভাব অথবা স্ব-রূপকে আমরা ধরতে পারিনা। এবং সেই জন্যে আমাদের জীবনের যেসব দুরূহ সমস্যা রয়েছে তার সমাধান করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা। জীবনের গভীরে যেসব গোপন রহস্য, যা প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী, সেসব গোপনই রয়ে গিয়েছে। তার নাগাল আমরা পাইনা। সেই অতলান্ত গভীরতা পরিমাপ করাও আমাদের সাধ্যাতীত। সেইসব অস্পষ্ট অনির্ণেয় গতিধারা নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে লীলা করছে। আমাদের মন সেই অতলে ডুব দিতে চায়না; চায়—বাইরের জীবনের আলো-ঝলমলে উচ্ছলতার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে থাকতে, সেই খেলায় যোগ দিতে।

আমরা যদি জীবনকে পরিপূর্ণভাবে জানতে চাই—তাহলে জীবনের গভীরে যেসব অদৃশ্য শক্তিরাজী নিয়ত ক্রিয়াশীল তার রহস্যকে অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে। ('Yet it is these depths and their unseen forces

that we ought to know if we could understand existence'—Sri Aurobindo)। বাইরের জীবনে আমরা যা পাই তা কিন্তু প্রকৃতির মৌলনীতি কিংবা বিধি-বিধান নয়। তা হল নিতান্ত গৌণ—ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনীয় রীতি-নীতি সব। তা আমাদের সাময়িক ভাবে বাধা-বিপত্তি দূর করতে সাহায্য করে বটে কিন্তু তার দ্বারা প্রকৃতির মধ্যে যে নিরবচ্ছিন্ন পরিবর্তনধারা প্রবহমান তার রহস্য উপলব্ধি করা যায় না। সুতরাং বাইরে যে-জীবন আমরা যাপন করি তার থেকে আমাদের মধ্যে প্রকৃতি কিভাবে কাজ করছে তা হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। তাই মানুষ যে-শক্তিরই পরিচালনাধীন হোক অথবা যে-আদর্শই অনুসরণ করে চলুকনা কেন সে তার আপন সম্প্রদায়গত বা গোষ্ঠীগত জীবন সম্বন্ধে প্রায় অজ্ঞ হয়েই থাকে। বুদ্ধি দিয়ে যে-টুকু সে বুঝতে চেষ্টা করে তা নিতান্তই নগণ্য। সমাজবিজ্ঞানও এ বিষয়ে আমাদের কোনও সাহায্য করে না। সাহায্য করার ক্ষমতাও তার নেই। সে শুধু আমাদের দেয় কতকগুলি Information—অতীতের কাহিনী এবং বাহ্যিক অবস্থা বা পরিস্থিতির মধ্যে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ কি করে বেঁচে বর্তে থাকে তার মোটামুটি একটা পরিচয়।

ইতিহাসের কাছ থেকেও এ-বিষয়ে আমরা এতটুকু সহায়তা পাইনি। কেননা ইতিহাস থেকে আমরা শুধু আহরণ করি—ব্যক্তি বিশেষের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা-পঞ্জী অথবা নিত্য পরিবর্তমান প্রতিষ্ঠান সমূহের একটা বিচিত্র দৃশ্যচিত্র।

কালের খাত বেয়ে মানুষের যে জীবনধারা নানা পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে নিরন্ত ধাবমান—তার প্রকৃত অর্থ আমরা উপলব্ধি করতে পারি না। যা আমরা গ্রহণ করি তা হল—বর্তমানে পুনঃ পুনঃ ঘটছে এমন সব ঘটনা-বলী এবং তাকেই অবলম্বন করে মোটামুটি একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করে নিই। এবং একপেশে একটা ধারণাও গড়ে তুলি। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রতন্ত্র সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে আমরা মুখর হয়ে উঠি। গণতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, স্বৈরতন্ত্র, গোষ্ঠীবাদ, ব্যষ্টিবাদ, রাষ্ট্র ও সঙ্ঘ, ধনিক ও চকিতে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে বসি। তারপর সেই সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন কর্মে বৃত হই। আজ যে বিধি-ব্যবস্থাকে আমরা সর্বান্তঃকরণে বরণ করে নিই, —আগামীকাল তাকে ভুয়া বা অকেজো বলে পরিহার করি। উদ্দীপনা আর উত্তেজনার প্রভাবে আমরা এমনই অভিভূত হয়ে থাকি যে, কোনও ব্যবস্থারই সম্যক পরিচয়লাভের চেষ্টা আমরা করি না। তাই আজ যাকে অবলম্বন করে আমরা বিজয়ী হতে চাই, অচিরেই তা-ই আমাদের নিরাশ করে। ফলে এমনও হয় যে, অতীতে যে-নীতি বা ব্যবস্থা আমরা প্রভূত কষ্ট স্বীকার করে ত্যাগ করেছিলাম, বর্তমানে তাকেই আবার গ্রহণ করবার জন্যে উদ্যোগী হই। একটা শতাব্দী ধরে নিরবচ্ছিন্ন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভেতর দিয়ে কোনও দেশ হয়তো স্বাধীনতা অর্জন করল, পরবর্তী শতাব্দীতে সেই স্বাধীনতা ভোগ করতে গিয়ে বুঝতে পারল—স্বাধীনতা না পেলেই বোধ হয় ভাল হত। এই বোধ আবার আরও পরে আপাতঃ কিছু সুবিধার বিনিময়ে দেশের স্বাধীনতাকে বিক্রয় করে দিতেও কুণ্ঠিত হল না।

আমাদের চিন্তাভাবনার মধ্যে এই যে বিপর্যয় ঘটে তার একমাত্র কারণ হল—সমষ্টি জীবনের গতি-প্রকৃতি অনুধাবন করার মত শক্তি আমাদের নেই। অতি সংকীর্ণ বাহ্য জীবনের পরিচয়ের উপর ভিত্তি করে আমরা যাবতীয় ধারণা গড়ে তুলি। সুদৃঢ়, সুগভীর এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানের উপর আমাদের ধারণা প্রতিষ্ঠিত নয় বলেই এমনটি ঘটে। অবশ্য এই মন্তব্য থেকে এমন ধারণা করা ঠিক হবে না যে, মানুষের ঐসব উৎসাহ-উদ্দীপনা এবং আদর্শ-পরায়ণতা নিতান্ত অর্থহীন। তবে এইসব প্রচেষ্টার সঙ্গে যেটা একান্ত প্রয়োজন তা হল,—মানব-জীবনের এইসব পরিবর্তনধারা যে নীতির দ্বারা পরিচালিত তার সম্যক জ্ঞান ও সত্য পরিচয় লাভ করা।

বর্তমানে মানুষ চাইছে এমন একটি ঐক্যের আদর্শ যাকে অবলম্বন করে বিশ্বমানুষ পারস্পরিক মতদ্বৈততার অবসান ঘটিয়ে, বিরোধ ও বিভেদ দূর করে ফেলে একটি পরিপূর্ণ মানবগোষ্ঠীতে পরিণত হতে। জাগতিক

জাগ্রত করে তুলেছে। বিশেষ করে বিজ্ঞানের নব নব জয়যাত্রা আমাদের এই পৃথিবীকে এত ক্ষুদ্র করে ধরেছে যে, বৃহত্তম শক্তি-গোষ্ঠীর আবাসভূমি বৃহত্তম রাজ্যগুলিকে মনে হয় যেন একটি বিশাল দেশের এক একটি প্রদেশ।

জাগতিক যে পরিবেশ মানুষের মধ্যে বর্তমানে এই ঐক্যবোধের অভীপ্সাকে জাগিয়ে তুলেছে,—সেই পরিবেশই আবার এই আদর্শের বিরুদ্ধতা করে তাকে ব্যর্থ করে দিতে পারে। কেননা বাস্তব পরিবেশ যখন বিশাল বা মহান পরিবর্তনের অনুকূল হয়, তখন মানুষের আন্তর-জীবন অর্থাৎ হৃদয়ক্ষেত্র যদি সেই আনুকূল্য গ্রহণে সমর্থ না হয়, তাহলে সুযোগ সেখানে দুর্যোগে পরিণত হয়। পরিণামে ঐক্যের বদলে পারস্পরিক সংঘাতপ্রবণতা আরও ভীষণ আকার ধারণ করে।

প্রকৃতি-বিজ্ঞানের কল্যাণে মানুষের বুদ্ধিবৃত্তি এখন এমন যান্ত্রিক হয়ে উঠেছে যে মানুষ যান্ত্রিক উপায়ে রাজনৈতিক ও সমাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার প্রবর্তনের মাধ্যমে সমাজজীবনে ঘটাতে চায় একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন। কিন্তু এইভাবে রাষ্ট্রের কিংবা সমাজের কাঠামো বদলে সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করা সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে এ কথা অবশ্যই স্মরণীয় যে, বৃহত্তর সামাজিক অথবা রাষ্ট্রিক ঐক্য সবসময় আপনা থেকেই শুভপ্রদ হয়ে ওঠে না। সুতরাং সামাজিক অথবা রাষ্ট্রিক কাঠামো বদলে সমাজ-মানুষের যতটুকু উন্নতি করা সম্ভব ততটুকু আমরা অবশ্যই চেষ্টা করে দেখব। কেননা বলিষ্ঠতর জীবনের দিকে এইভাবেই অগ্রসর হতে হয়।

কিন্তু এ যাবৎ মানুষ যে-অভিজ্ঞতা অর্জন ক'রেছে তার সাহায্যে সে এইটুকু শিক্ষা অন্তত লাভ করেছে যে, কঠোর শাসনে নিয়ন্ত্রিত ঐক্যবদ্ধ বিপুল জনসমষ্টির পক্ষে সমৃদ্ধতর ও বলিষ্ঠতর জীবনের আস্বাদ লাভ করা সম্ভব নয়। বরং সহজ সরল সংগঠনের মধ্যে সুসংহত ক্ষুদ্রায়তন জীবনই লাভ করতে পারে স্বচ্ছন্দ জীবনের সহজ সাবলীলতা। সে-জীবন যেমন বৈচিত্র্যপূর্ণ তেমনি ফলপ্রসূ।

ইতিহাস সেই সাক্ষ্যই দেয়। মানবজাতির অতীত ইতিহাস (যা আমাদের অধিগত হয়েছে) পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, মানুষ যে-যুগে কিম্বা যে-দেশে একটা অখণ্ড একত্বের মধ্যে নিজেদের হারিয়ে না ফেলে, পরস্পর নির্ভরশীল ক্ষুদ্রক্ষুদ্র কেন্দ্র-গোষ্ঠী রচনা করে বসবাস করত,—সেইসব যুগ অথবা সেইসব দেশ প্রভূত ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হয়েছিল। এবং তার বহুমূল্যবান স্বাক্ষরও রেখে গিয়েছে।

এইভাবে বিচার ক'রে আমরা দেখতে পাই যে, মানব-ইতিহাসের তিনটি পরম সুযোগ আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার অন্তত দুই-তৃতীয়াংশের জন্য দায়ী। প্রথম সুযোগ এসেছিল ইজরায়েল নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভিন্ন ভিন্ন কতকগুলি গোষ্ঠী ও পরে ইহুদী জাতির ধর্মজীবনের মাধ্যমে। দ্বিতীয় সুযোগের প্রকাশ দেখি গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রিকনগরের বহুমুখী জীবনধারার মধ্যে। এবং তৃতীয় সুযোগের পরিচয় পাই—কিছুটা অধিক নিয়ন্ত্রিত—অনুরূপ রাষ্ট্রিক কাঠামোয় গড়ে ওঠা শিল্প-কলায় ও বিদ্যাবত্তায় সমৃদ্ধ মধ্যযুগের ইতালীতে।

ভারতবর্ষের ইতিহাসেও সেই একই ছবি। ভারতবর্ষ যখন কতকগুলি খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল,—(যাদের সীমানা আধুনিককালের একটি জেলার সীমানা অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত ছিলনা) তখন ভারতবর্ষে এমনসব ক্রিয়াবলী ঘটেছিল এবং কালজয়ী এমন বলিষ্ঠ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছিল যা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ইতিহাসের সেই-সব স্বর্ণযুগে অপূর্ব সার্থকতায় এবং পরিপূর্ণ প্রাণ-প্রাচুর্য্যে জীবন ভরে উঠেছিল। তারপর অপেক্ষাকৃত কম সমৃদ্ধ-যুগ এল—বিশালতর রাজ্য ও জাতির জীবনে—। ঐ সব রাজ্য বা জাতি আজকের যে কোনও রাজ্য অথবা জাতির তুলনায় অবশ্য সব দিক দিয়েই ক্ষুদ্রতর ছিল—। ইতিহাসের পাতায়—তারা পল্লব চালুক্য, পাণ্ড্য চোল ও চেরা নামে আখ্যায়িত হয়ে আছে। এদের তুলনায় পরবর্তীকালে যে-সব বিরাট-বিরাট সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান ও পতন ঘটেছে তাদের কাছ থেকে সম্পদ

হিসাবে ভারতবর্ষ কিছুই লাভ করতে পারেনি। উদাহরণ স্বরূপ মৌর্য, গুপ্ত ও মোঘল সাম্রাজ্যের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এদের কাছ থেকে ভারতবর্ষ যা পেয়েছে তা হল রাষ্ট্রনৈতিক ও প্রশাসনিক সংগঠন ব্যবস্থা এবং কিছু শিল্পকলা ও সাহিত্য যার মান তেমন উচ্চস্তরের নয়। এছাড়া প্রেরণাদায়ী কিছু মৌলসৃষ্টি গড়ে তোলার চেয়ে কি করে শাসন ও সংগঠন ব্যবস্থাকে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে পরিচালিত করা যায় সেই দিকেই তাদের লক্ষ্য ছিল বেশী।

এখানে লক্ষণীয় এই যে, বৃহত্তর বা বিপুলাকায় রাষ্ট্র অপেক্ষা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগোষ্ঠীদের মধ্যে ছিল প্রচণ্ডতর প্রাণশক্তি। এর থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, যৌথজীবনের পরিধি যদি মাত্রাতিরিক্ত ভাবেবিস্তৃতি লাভ করে তার সৃজন-ক্ষমতার শক্তিও যেন হ্রাস পায়। Collective life is diffusing itself in too vast spaces seems to loose intensity and productiveness. তথাপি এই সব ক্ষুদ্রক্ষুদ্র রাষ্ট্রের মধ্যে এমন কতকগুলি দুর্বলতা ছিল যার জন্ম পরবর্তীকালে তারা সংঘবদ্ধ হয়ে বিরাট রাজ্য গড়ে তুলতে উদ্যোগী হয়েছিল। তাদের দুর্বলতার প্রধান কারণ ছিল অতিকায় রাষ্ট্রকর্তৃক আক্রমণের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অভাব। এবং পর্য্যাপ্ত সম্পদের অভাবে বাস্তবজীবনকে সমৃদ্ধশালী করে তোলার অসম্ভাব্যতা। এই দুর্বলতা দূর করার প্রয়োজনে পরের যুগে ঐসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগোষ্ঠী একত্র সংবদ্ধ হয়ে এক একটি জাতি, রাজ্য এবং সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। এখানেও আমরা দেখতে পাই, বৃহত্তর সাম্রাজ্য অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তনবিশিষ্ট সংঘবদ্ধ রাজ্যগুলির মধ্যে জীবনধারা সুসংহত। গোষ্ঠীজীবন বিস্তৃত পরিসরে যদি ছড়িয়ে পড়ে তাহলে স্বাভাবিককারণেই তার সংঘবদ্ধতা শিথিল হয়ে আসে। এবং তার ফলে জাতিগত সৃজনীশক্তি হ্রাস পায়।

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস্, স্পেন, ইতালী ও জার্মান প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের থেকেই সমগ্র ইউরোপ আহরণ করেছে তার প্রাণশক্তি; রোম কিংবা রাশিয়ার মত বিশাল সাম্রাজ্যের থেকে নয়। আরও একটু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, ঐসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের প্রাণকেন্দ্রগুলি অর্থাৎ রাজধানীগুলিই বিশেষভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে দেশের সামগ্রিক উন্নতি-সাধনে সক্ষম হয়েছে। এইভাবেই প্রকৃতি কাজ করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘবদ্ধ গোষ্ঠীর বিদ্যাবত্তা ও সৃজনশীল প্রতিভার সাহায্যে সমগ্রজাতিকে সমৃদ্ধ করে তোলে। কিন্তু এর একটা অশুভ দিকও আছে, অতি পরিপুষ্ট নগর-জীবনের পাশাপাশি অমার্জিত পল্লীজীবন বিশেষভাবে ঘৃণ্য ও অসম্মানীয় হয়ে পড়ে। নগরজীবনের অত্যুজ্জ্বল জীবনচর্চার পাশেই অন্ধকার পল্লীকে নিতান্ত বেমানান বলে মনে হয়। রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এই লক্ষণটি অত্যন্ত পরিস্ফুট। নগরজীবনকে পরিপুষ্ট করে তুলতে গ্রামজীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে যে আত্মদান করেছিল, তার ফলে সৃজনীপ্রতিভার সর্বক্ষেত্রেই সে ক্রমশ দেউলিয়া হয়ে পড়েছিল। তার জীবনের সহজ সাবলীল গতিধারা ব্যাহত হয়েছিল পরিশেষে পঙ্গুত্ব প্রাপ্ত হয়ে মৃত্যুকে সে বরণ করেছিল। তাই প্রভূত সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের শিখরে ওঠার পরই দেখি রোম্যান সাম্রাজ্যের মহতী বিনষ্টি।

সমগ্র মানবগোষ্ঠীকে যদি প্রশাসনিক যন্ত্রের সাহায্যে রাষ্ট্রিক ঐক্যে আবদ্ধ করে রাখা হয়, নগর অথবা অঞ্চলের স্বাধীন জীবন বিসর্জন দিয়ে ব্যক্তিকে যদি জড়যন্ত্রের জড়অঙ্গে পরিণত করা হয়, প্রশাসনিক যন্ত্রের চাপে জীবন যদি হারায় তার বর্ণবিলাস, স্বাতন্ত্র, বৈচিত্র এবং নবসৃষ্টির অর্জিত প্রেরণা' তাহলে তার ফল কিরূপ বিষময় হয় বা হতে পারে রোম্যান সাম্রাজ্যের ঐ মহতী বিনষ্টির মধ্য থেকেই তা আমরা সহজে অনুমান করতে পারি।

সমগ্র মানব জাতিকে প্রশাসনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করতে হলে যে প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন সংগঠনের প্রয়োজন, তার বিপুল প্রভাবে প্রতিটি ব্যক্তি এবং আঞ্চলিক সমষ্টিগত জীবন নিষ্পিষ্ট হবে, সংকুচিত হয়ে হারাবে তাদের অনাবিল স্বাধীনতা,

মুক্তির আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে আলো-জল-বাতাসহীন অবরুদ্ধঘরে তরুরাজির মত সে-জীবন ক্রমশ জীর্ণ হতে হতে একসময় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে।

মানবজাতির পক্ষে এই ধরনের ব্যবস্থায় (অর্থাৎ প্রশাসনিক সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক সংগঠনের মধ্যে একীভূত হয়ে থাকায়) ফল হবে অত্যন্ত বিষময়। গোড়ার দিকে আনন্দোচ্ছল কর্মপ্রবাহের মধ্যে অনেকেই আনন্দবোধ করবে, কিন্তু পরে সুদীর্ঘ যুগব্যাপী চলবে শুধু অর্জিত সমৃদ্ধির সংরক্ষণের চেষ্টা আর ক্রমবর্দ্ধমান নৈষ্কর্ম ও নিশ্চেষ্টতা এবং পরিশেষে সম্পূর্ণ বিনষ্টি।

তবুও প্রকৃতি পরিণামের কর্মসূচীর অন্তর্গত হওয়ায় মানবজাতির ঐক্যসাধন একান্তই অবশ্যম্ভাবী। তবে তা সংঘটিত হবে এমন পরিবেশ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার মধ্যে যেখানে সমগ্রজাতির জবনীশক্তির মূল থাকবে অটুট এবং। তা একত্ব না হারিয়েও বহুধা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে। ভবিষ্যৎ মানবজাত সেই পথেই এগিয়ে চলেছে।

ছাব্বিশে জানুয়ারী

শান্তশীল দাশ

ওদিকে অনেক আলো, উৎসবের ঘটা,
রাজধানী আনন্দ মুখর;
কত লোক, সাজসজ্জা, বর্ণ সমারোহ,
আড়ম্বর নানা ভাষণের।
একটি বিশেষ দিন,কত আলোচনা,
আগামী দিনের প্রতিশ্রুতি
অনেক অনেক; তার শব্দের সম্ভার
ভেসে আসে আমার কানেও
শুনি, বেশ ভাল লাগে, বুঝি কিছুক্ষণ
ভুলে যাই এখানের কথা;
মনেতে চমক লাগে, রঙিন আলোর
কিছু রঙ ছড়ায় বা মনে।
সেই রাঙা মন নিয়ে এদিকে তাকাই,
কই, কোথা সে রঙের ছটা?
এতটুকু নেই, নেই, নেইকো এখানে,
একই মতো এখানে জীবন।
সেই ওঠা ভোরবেলা গতানুগতিক,
একটু অলস দুটি চোখ,
আর কিছু নয়, শুধু ছুটির আমেজ
সেই চোখে, ক্লান্তির ছায়া
কম বুঝি কিছুটা বা, ছুটোছুটি—নেই,
তাড়া নেই অফিসে যাবার—
এইটুকু, শুধু এই, আর কিছু নয়,
সব সব সেই পুরাতন।
ওখানে অনেক আলো, অনেক উৎসব,
এখানেতে কিছু তার নেই;
শুধুই বিরাম কিছু ছুটোছুটি থেকে,
অবকাশ একটি দিনের।

বিজাতীয়

(গল্প)

তরুণ গঙ্গোপাধ্যায়

সকালে ঘুম ভাঙলেই আমার সবচেয়ে আগে মনে হয় আমার এই মস্তিষ্কটা যা সারাদিন নানা রকম চিন্তা-ভাবনায় ব্যতিব্যস্ত থাকে, এতক্ষণ কোন কিছু চিন্তা না করে বিশ্রামরত ছিল কেমন করে! ঘুম ভাঙতেই, তখনও হয়ত বিছানাই ছাড়িনি, যত রাজ্যের চিন্তাভাবনা-গুলো ছুটোছুটি করে এসে আবার জায়গা দখল করে নেয়। কোনটাই যেন সমাধানযোগ্য নয়, তার প্রত্যাশাও রাখেনা।

আজ সকালে উঠে গত সন্ধ্যার ঘটনাটাই আগে মনে পড়ে গেল। সন্ধ্যার ট্রেনে অফিস থেকে বাড়ি ফিরছি। ইদানীং একটু আর্থিক স্বচ্ছলতা হওয়ায় এবং ভীড়ের চাপ একটু সামলে চলার বাসনায়, প্রথম শ্রেণীর টিকিট কেটেছি। হাওড়া স্টেশনে প্রথম শ্রেণীতে উঠে বসেছি! একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক এসে বসলেন পাশে। দাড়িগোঁফ কামান নেই, ট্রাউজার সার্টটাই সবই যেন কতকাল আগের—ঢিলেঢালা বেমানান।

বলাবাহুল্য, ভদ্রলোককে দেখে আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল। মফঃস্বলে ষ্টেশনে চেকিং-এর বালাই কম। তাই প্রথম শ্রেণীতে অনধিকারী যাত্রীরাও গায়ে গা মিলিয়ে দিব্যি পার পেয়ে যায়। একটা সন্দেহ ও অস্বস্তি নিয়ে অল্পক্ষণ চুপচাপ বসেছিলাম। ভদ্রলোক আমার কাছে দেশলাই চাইলেন, দিলাম, ঐ সুযোগে সাবধানে মৃদু স্বরে বললাম—ফার্ষ্ট ক্লাশে এই সময় আপনাকে দেখিনাতো কোনদিন!

—হোয়াট?

—মানে, এটাতো ফার্ষ্ট ক্লাশ। তাই বলছিলাম—ভদ্রলোক উৎকট গন্ধ ছড়িয়ে কি একটা সিগারেট ধরালেন। গলার টাই-এর ফাঁসটা একটু আলগা করে নিয়ে আমার দিকে তেরছা চেয়ে বললেন, আই নো।

কথা মিটে গেল। আর কিছু কথা থাকে না। অন্যমনস্কভাবে যদি উঠেই থাকেন, তাই মনে করিয়ে দেওয়া, তাও নিতান্ত ভদ্রভাবে, কিন্তু উনি যখন জেনে শুনেই উঠেছেন, তখন কথা মিটে গেল নিশ্চয়ই।

কিন্তু না মেটেনি। আজকের যুগে সমস্যা অত সহজে মেটেনা। গাড়ী ভর্ত্তি হয়ে যাবার পর যখন ছাড়ল, ভুরু কুঁচকে তিনি আমায় প্রশ্ন করলেন আমার চেহারা দেখে কি মনে হয়েছিল আমি প্রথম শ্রেণীর যোগ্য নই?

আমি তো অবাক। কি যে বলব ভেবে পাচ্ছিনা। বললাম, এতক্ষণ পরে আপনার যে হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা?

ওসব ছাড়ুন। আমার কথার জবাব দিন। গলার স্বর চেহারা একেবারে পালটে গেছে ভদ্রলোকের। রাগে সর্ব্বাঙ্গ আমার জ্বলছিল। তখন লোক কম ছিল বলেই কি উনি কিছু বলেন নি? তাই যদি হয়, উনি কি ধরে নিয়েছেন, উপস্থিত সব লোকই ওঁর সমর্থনে উঠে দাঁড়াবে। যাই হোক, মাথা গরম না করে বললাম, মানুষ ভুলতো করে। ভুল করেওতো উঠে আসতে পারেন।

কতদিন ফার্ষ্ট ক্লাসে ট্র্যাভেল করছেন? যদি ভুল করেই থাকি, আপনি মনে পড়িয়ে দেবার কে? তার জন্যে সরকারি ব্যবস্থা আছে? আপনার চেহারা সাজপোষাকই কি শুধু ফার্ষ্ট ক্লাশ যাত্রীর উপযুক্ত, আর আমার নয়? এই ধরনের প্রশ্নজর্জরিত কথার

আস্ফালনে উনি একেবারে মাতিয়ে তুললেন সারা গাড়ীটা।

তর্ক কিছুক্ষণ করেছিলাম। উদ্দেশ্যটা যে আমার সৎ ছিল, এবং আমার কথাগুলো যে মোটেই অশোভন ও অসম্মানজনক ছিল না এ কথা গাড়ির সকলকে বুঝিয়ে বলার মত মনের জোর আমার ছিল। বেশ কিছু যুক্তিবাদী ভদ্র সমর্থকও যে পাইনি তা নয় কিন্তু দুজনের দুটি কথায় আমি সবিনয় ক্ষমা চেয়ে চুপ করে গেলাম। একজন বললেন—উনি বিনা টিকিটে চলুন, থার্ডক্লাশ টিকিট নিয়ে চলুন, আপনার তাতে কি? আপনি কি ওঁর গার্জেন? আর একজন বললেন—এভাবে কোশ্চেন করা অত্যন্ত অভদ্রতা। অন্য কোন দেশ হলে চেহারা পালটে দিত আপনার।

কথাগুলো বেশ নাড়া দিয়েছিল। তাই ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই গত সন্ধ্যার ঘটনাটাই মনে পড়ে গেল। বর্তমান যুগে সবকিছুর ওপর একটা আস্থাহীনতা বা বিতৃষ্ণা যেন আমাদের অস্তিত্বটাকেই বিপন্ন করে তুলেছে। কাউকে কিছু বলার উপায় নেই। যে যার নিজেরটাই বুঝে নেবার দায়িত্ব বোঝে। আর কোন কিছু দোষের হলে, সে যেন আমাদের দেশ বলেই ঘটে, অন্য দেশ হলে ঘটতনা।

উঠে পড়লাম। স্ত্রী তাগাদা দিচ্ছেন। ঝি এসেছে ঘর দোর পরিষ্কার করবে। সে কয়েকটা বাড়িতে কাজ করে। যে সময়টা সে নির্দ্দিষ্ট করে রেখেছে আমাদের বাড়িতে কাজ করার জন্যে, সেই সময়টার মধ্যে তাকে কাজ করে নেবার সুযোগ করে দিতে হবে। টাইমের ব্যাপার টাইমের প্রতি আনুগত্যের আদর্শটাও বোধ করি বাইরে থেকে এদেশে আমদানি। যদিও প্রায়ই ঝি-এর মুখে শুনি, সকালে উঠতে দেরি হওয়ার জন্যে তড়াতাড়ি সব বাড়ি কাজ সারতে গিয়ে সব বেটাইম বেতাল হয়ে পড়ে।

তাড়াতাড়ি মুখ ধুয়ে চা খেয়ে বাজারে যাব, স্ত্রী এসে বললেন পাড়ার এক বধূ দেখা করার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করছেন। পরের বিপদে আপদে যথাচিতভাবে সাহায্য করতে যাবার একটা বদ স্বভাব ছোটবেলা থেকেই ছিল—ঘা খেয়ে খেয়ে অনেক কমে এসেছে। তবু দুর্নামটা একেবারে ঘুচে যায়নি।

ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। ঠিক চিনতেও পারলাম না। অল্পবয়সী বধূ। চোখে জল, মুখে বেদনার ছাপ। কি ব্যাপার বলুনতো? স্বামীর নাম করতে চিনলাম। পরিচিত। বছর ছয়েক আগে রেজেস্ট্রি করে বিয়ে করে এ পাড়ায় আছে দুজনে। স্ত্রীর প্রতি নাকি প্রায়ই অত্যাচার চলছে কিছুদিন ধরে গোপনে। এবার নাকি মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। রাত্রে বাড়ির বাইরে বের করে দিয়েছে। সারারাত বধূটি বাইরে ছিলেন, সকাল হতেই···।

সব শুনে বললাম—আমি কি করতে পারি? আইন আছে, আদালত আছে। সেখানে যান।

—সে সবইতো প্রমাণ, সাক্ষী না হলে···। তার চেয়ে যে পাড়ায় বাস, সে পাড়ার লোক বুঝিয়ে বললে হয়ত—!

—দেখি কি করা যায়—এই কথা মুখে বলে বিদায় দিলাম। স্ত্রী আড়াল থেকে সামনে এসে বললেন—তোমার বাপু ওসব ব্যাপারে নাক গলিয়ে কাজ নেই। পাশের বুড়িমামী, সেদিন বলতে গিয়েছিল বুঝিয়ে ভদ্রলোককে। আচ্ছা করে শুনিয়ে দিয়েছে। আমার স্ত্রীর ব্যাপার আমি বুঝব। আপনারা কোন্ অধিকারে আমার ঘরোয়া ব্যাপারে···।

হক কথা। আমরা যখন কেউ নই ওদের, তখন আমাদের কোন অধিকারও নাই। অথচ বধূটির পাড়ার লোকেদের কাছে কিছু প্রত্যাশা আছে। অর্থাৎ একটা সামাজিক চাপ—তার মিলিত শক্তির প্রতি তার শেষ ভরসা আছে। প্রতিকারের আশা রাখে। অথচ, এদেরের প্রয়োজনকে, অস্তিত্বকে তারা গ্রাহ্য করেনি, কিছুদিন আগে তারা যখন স্বাধীনভাবে বিয়ে করেছিল আইনের সুযোগ নিয়ে। আইন আজ তাদের ভরসার স্থল নয়। সমাজ, ও তার মিলিত শক্তির কাছে আর্জি জানিয়েছে। যাকে আমরা ব্যক্তিস্বার্থ ও আত্মকেন্দ্রিকতার যূপকাষ্ঠে প্রতিনিয়ত বলি

দিয়ে বেড়াচ্ছি পশ্চিমা আদর্শের ধ্বজাধারী হয়ে।

বাজার সেরে খাওয়াদাওয়া করে গাড়ি ধরবার জন্যে ষ্টেশনে ছুটলাম। ষ্টেশনে ঢোকার আগেই দেখলাম একটা ষ্টিম ইঞ্জিনের মেল ট্রেন ষ্টেশন থেকে কিছুটা দূর এগিয়ে এসে দাঁড়িয়ে হাঁপাচ্ছে। তার মানেই কিছুটা অঘটন ঘটেছে। কাছে এগিয়ে গিয়ে দেখলাম, বেশ ভীড়, জটলা। কি ব্যাপার। ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন সকাল থেকেই বন্ধ। কোথায় তার চুরি গেছে। মেল ট্রেনকে দাঁড়াতে বলা হয়েছিল। দাঁড়ায়নি। কে বা কারা ট্রেনটাকে ঢিল মেরে দাঁড় করিয়েছে। ড্রাইভার আহত। সে আর গাড়ি চালাবে না। যাত্রীরা অনুনয়-বিনয় করে বোঝাচ্ছে—কয়েকজন অপরিণামদর্শীর কাজের জন্য তাদের অফিস কামাই-এর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে কেন? অনেকক্ষণ বচসার পর ড্রাইভার রাজি হল। গাড়ি ছাড়ল। তাড়াতাড়ি সামনের বগিটায় চাপলাম। কখন তার জোড়া লেগে আবার স্বাভাবিকভাবে ট্রেন চলবে কে জানে।

গাড়ির মধ্যে বচসা চলছে। যারা এ গাড়িতে আগে থেকেই আছে বসে এবং দূর থেকে আসছে, তাদের রাগটাই বেশী। ট্রেন লেট হয়েছে—তাছাড়া ঢিলতো তাদের গায়েও লাগতে পারত। পাশ থেকে কয়েকজন ধমক দিয়ে উঠল হঠাৎ ওদের—। —আপনাদেরই শুধু আফিস করতে হবে, আমদের আফিস নেই? কি রকম সরকারি মেজাজে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে যাচ্ছিল। ঢিল না মারলে দাঁড়াত?

গাড়িতে বসে ভাবছিলাম—আমরা আমাদের কোন কিছুকেই আর আপন মনে করতে পারছি না। আমাদের অভাব, অভিযোগ, সমস্যা যে একান্ত নিজেদেরই এবং তা পারস্পরিক সহিষ্ণুতা, আত্মনির্ভরশীলতার মধ্যে দিয়েই কাটিয়ে উঠতে হবে, একথা ভাববার মন গেছে আমাদের বিভ্রান্ত হয়ে। আমাদের অতৃপ্ত আকাঙ্খা, আশেপাশের সমস্ত পরিবেশটার বিরুদ্ধে আমাদের বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে, সেটাকে পর করে দিয়েছে। আমাদের নিজের বলতে কিছু নেই সব পর হয়ে গেছে।

আফিসে এসে বসেছি, কিন্তু কাজে মন বসাতে পারি না। নানা সমস্যা। কাজ যাদের করার কথা, তারা খুসি নয়। যাদের করিয়ে নেবার কথা, তারাও নয়। তাছাড়া নিজের সুবিধেটুকু গুছিয়ে নেবার জন্য প্রত্যেকেই তৎপর বলে নিজেদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব লেগেই আছে।

মাগ্‌গীভাতা বাড়াবার দাবী নিয়ে একটা আন্দোলন চলছে। আসছে সোমবার একদিনের ধর্ম্মঘট। জোর তর্ক চলছে নিজেদের মধ্যে। ওদিকটায় বেশ ঝগড়াঝাঁটি জমে উঠেছে। এসব আরও জমিয়ে তোলে এ আফিসের উগ্রপন্থী বলে পরিচিত শক্তি-সামন্ত; তাদের কাটা কাটা কথা সর্ব্বজনপরিচিত। একদল বলছে—একদিনের ধর্ম্মঘট করে কিছু হবে না। আগের বারের মত শুধু মাইনে কাটা যাবে। বার বার মাইনে কাটান সম্ভব নয়। আর একদল বলছে—ইউনিয়নকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে তার নির্দেশমত আন্দোলন করে যেতে হবে।

—পরিণতি না ভেবেই?

—হ্যাঁ, পরিণতির কথাটা আপেক্ষিক।

আন্দোলন চাই।

—যে ইউনিয়ন কাটা মাইনে উদ্ধার করতে পারে না বা কাটা বন্ধ করতে পারে না, সেই ইউনিয়নের মৃত্যু হয়েছে। আনুষ্ঠানিক ঘোষণাটা বাকি—সেটা স্বীকার করার সৎসাহস কারুর নেই। বেশ দৃঢ়ভাবে শক্তিসামন্ত বলে গেল কথাটা।

শক্তি সামন্তকে সকলে একটু এড়িয়ে চলে। উস্কোখুস্কো চুল' তীব্র তীক্ষ্ণ চাউনি। বছর তিনেক হল কাজে ঢুকেছে। সভাসমিতি নিয়মশৃঙ্খলা কিছুই সে মানতে চায় না। একদিন তাকে নিভৃতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম—সব ব্যাপারেই প্রতিবাদ করে ওঠ, কোন কিছুই মানতে চাও না, কি চাও ভাই তুমি? সে বলেছিল—সেটাতো বুঝতে পারিনা দাদা। তবে যেভাবে যা কিছু চলছে, আমার মনোঃপুত নয়। কখনও কখনও মনে হয় বৃটিশরা আরও কিছুকাল এখানে রাজত্ব করলে পারত। আর নয় অন্য কোন দেশের

অধীনতায় আমাদের বেশ কিছুদিন থাকা উচিত। অবাক হয়ে বললাম—সে কি? সে বললে—হ্যাঁ দাদা দুশো বছর পরাধীনতা করে আপনাদের মত দাদারা স্বাধীনতা বলতে ঠিক কি বোঝায়, আমাদের কিছু বোঝাতে পারেননি।

বলার কিছুই নেই। চুপ করেছিলাম।

আফিস শেষে ময়দানে সভা। এ আফিসের মিছিল ওখানে অন্যান্য আফিসের মিছিলের সঙ্গে একত্রিত হবে। মিছিলের সঙ্গে হাঁটছিলাম। ভাবছিলাম, আমরা কোথায় চলেছি। এ মিছিলের গতিও কি উদ্দেশ্যহীন? শক্তি সামন্ত আমার পেছনে লাইনে আছে। এতক্ষণ যে আছে এই আশ্চর্য্য। কিন্তু বেশীক্ষণ রইলনা। লাইন ছেড়ে এলোমেলোভাবে পাশে হাঁটছে। অন্যমনস্ক। তার মানে এই মিছিলের শৃঙ্খলা তার কাছে নিষ্প্রাণ। পেছিয়ে পড়তে পড়তে সে প্রায় মিছিল থেকে একেবারে তফাৎ হয়ে পড়েছে। আমিও বেরিয়ে এসে তার পাশে দাঁড়ালাম। ও থমকে দাঁড়াল, হাঁসল, বললে—কি দাদা চলে এলেন যে? উলটো প্রশ্ন করলাম—তুমি চলে এলে কেন? বললে—কি হবে ওসব করে? ওসব বড় এক ঘেঁয়ে মনে হয়। ভাল লাগেনা।

নিঃশব্দে দুজনে পাশাপাশি ভীড়ের মধ্যে হাঁটছিলাম। হঠাৎ নজরে পড়ল, একটা চলন্ত ভ্যানে কয়েকজন পশ্চিমা শ্বেতাঙ্গ মূর্তি ক্যামেরা তুলে কাদের যেন ছবি তোলবার চেষ্টা করছে। ভ্যানের গতিটা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। লক্ষ্যস্থলে চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম—অর্দ্ধউলঙ্গ কালো-কালো পাঁচ ছয়টি ছেলে টিনের কৌটা হাতে পথচারীদের কাছে সুর করে গান করে ভিক্ষা চাইছে। রাস্তার লোক মজা দেখবার জন্যে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছে। ছবি তোলবার সুবিধে করে দেবার জন্যে কয়েকজন আবার সামনের লোকেদের সরিয়ে দিচ্ছে। হতভাগ্য ভারতের জীবন্ত ছবি। শক্তি সামন্তকে ব্যাপারটা দেখাবার জন্যে পাশে চেয়ে দেখি সে নেই। ওদিকে ভ্যানের কাছে আর একটা গোলমাল। ছুটে কাছে গিয়ে দেখি, শক্তি সামন্ত ভ্যানের পাদানিতে দাঁড়িয়ে শ্বেতাঙ্গর ক্যামেরার মুখটা দুহাতে থাবা মেরে ধরেছে। টানাটানি। ক্যামেরা-ম্যান বিহ্বল এবং বিভ্রান্ত। ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে সে বার বার বলছে, ছবি সে তোলেনি। তোলবার সময়ও দেয়নি শক্তি সামন্ত। শেষ পর্য্যন্ত রিলশুদ্ধ ফিলিম্ হস্তগত করে তবে ছেড়ে দিল। ভ্যান মুহূর্তে উধাও।

ভীড়ের মধ্যে ছুটে গিয়ে শক্তি সামন্তকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম আপনজনের মত।

আনন্দে উল্লাসে শক্তি সামন্ত তখনও থর থর করে কাঁপছে, বললে—এরকম কয়েকটা কাজের মত কাজ পেলে মনে হয় আমরা এখনও বেঁচে আছি।

রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে বস্তুনিষ্ঠা ও আদর্শ সাধনার সমন্বয় কুশলতা

সুখরঞ্জন চক্রবর্ত্তী

রবীন্দ্রনাথ আধুনিক বাংলা ছোটগল্পের মুক্তিদাতা। আধুনিক ছোটগল্প বলতে যা' বোঝায় রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম তা' আমদানি করলেন। তিনি ছোটগল্প রচনা শুরু করেছেন "কড়ি ও কোমল" পর্ব্ব থেকেই। কিন্তু ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দ থেকেই প্রকৃতপক্ষে তাঁর ছোটগল্পের উৎসমুখ উন্মুক্ত হয়। সাপ্তাহিক "হিতবাদীর" পাতায় এক সময় তিনি অনেকগুলি ছোটগল্প লিখে-ছিলেন। তারপর "সাধনা", "ভারতী" এবং "সবুজপত্রে" তাঁর একাধিক ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। ত্রিশ বছর বয়স থেকেই তাঁর ছোটগল্প রচনার রীতিমত সূচনা। কিন্তু তারও কয়েক বছর পূর্ব্ব থেকেই তার ভূমিকা রচনা আরম্ভ হয়।

রবীন্দ্রনাথের গল্পপাঠকদের মনে কতকগুলি প্রশ্ন অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই জেগে উঠে, তাঁর প্রায় কবিতার মতন মৃত্তিকার স্পর্শহীন, অবস্তুনিষ্ঠ গল্পগুলি কিনা, তাঁর গল্পে তাঁর বাস্তববুদ্ধি বড় হয়েছে না আদর্শ-সাধনা বড় হয়েছে, না দুটোরই আপেক্ষিক পরিমাণ ও সমন্বয় রক্ষায় রবীন্দ্রনাথ বিশেষ কুশলতার পরিচয় দিতে পেরেছেন? এইসব নানারকমের প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের গল্পপাঠকদের মনে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই উদয় হয়।

।২।

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এবং ছোটগল্পের মধ্যে ক্ষেত্রের প্রভেদ লক্ষ্য করবার মতন। উপন্যাসগুলির ক্ষেত্র নাগরিক জীবন, প্রধান পাত্র-পাত্রী প্রায় সকলেই নাগরিক নর-নারী। কেবলমাত্র বৌঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষির সম্পর্কে একথা খাটে না। আর তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পের ক্ষেত্র পল্লীজীবন—প্রধান অপ্রধান প্রায় সকলেই পল্লীবাসী। শেষ জীবনের ছোটগল্পে অবশ্য কিছু ব্যতিক্রম আছে (তিনসঙ্গী)।

পল্লীবঙ্গই তাঁর ছোটগল্পের যথার্থক্ষেত্র। যে সময় থেকে তিনি নিয়মিত ছোটগল্প লেখা সুরু করলেন তখন থেকেই পল্লীবাংলার সাথে তাঁর স্থায়ী পরিচয়ের সূত্রপাত। তাঁকে তাঁর পৈত্রিক জমিদারী তদারকের সুকঠোর কর্ত্তব্য পালন করবার জন্য যেতে হলো পল্লীবাংলার স্থানে স্থানে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার লিখেছেন—

"বিলাত হইতে ফিরিবার কয়েক মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে জমিদারীর কার্যভার গ্রহণ করিয়া উত্তরবঙ্গে যাত্রা করিতে হইল।···ইতিপূর্ব্বে রবীন্দ্রনাথকে জীবনের কোন কঠিন দায় বা দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হয় নাই। সাহিত্যজীবনের বিচিত্র মাধুর্য্যের মধ্যে হঠাৎ আসিয়া পড়িল বিপুল জমিদারী তদারকের কাজ। কিন্তু কবি হইলেও তাঁহার সহজবুদ্ধি এত প্রখর ছিল যে, তিনি আশ্চর্য নিপুণতার সঙ্গে মানাইয়া লইলেন; শুধু মানাইয়া লইলেন না, তাহাকে নিপুণভাবে সুসম্পন্ন করিতে লাগলেন। যেমন নিজের পারিবারিক জীবনের প্রত্যেকটি ছোটখাটো খুঁটিনাটি কাজকর্ম করিতেছিলেন, তেমনভাবেই। জীবনের দিক হইতে এই ঘটনাটি খুব বড়। বাস্তবকে প্রকৃতির সহিত জীবনে মিলাইয়া এমন নিবিড়ভাবে পাইবার সুযোগ ইতিপূর্ব্বে হয় নাই। প্রকৃতি ও মানুষে মিলিয়া বিশ্বের সৃষ্টিসৌন্দর্য সম্পূর্ণ হইয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতে প্রকৃতিকে অন্তরঙ্গভাবে জানিতে সুযোগ লাভ করেন নাই। জমিদারী পরিদর্শন ও পরিচালনা করিতে আসিয়া বাংলার অন্তরের সঙ্গে তাঁহার যোগ হইল—মানুষকে তিনি পূর্ণদৃষ্টিতে দেখিলেন। তাঁহার কাব্যের মধ্যে হৃদয়াবেগের আতিশয্য এযুগে বহুল পরিমাণে মৃদু হইয়া আসিল; পদ্মা তাঁহার কাব্যে ও অন্যান্য রচনায় নূতন রস, নূতন শক্তি, নূতন সৌন্দর্য দান করিল।"

উল্লিখিত জীবনীর অংশ থেকে বোঝা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ এ সময়টাতে পল্লীজীবনের সঙ্গে বাস্তব সম্পর্ক স্থাপন করবার একটা অক্ষয় সুযোগ লাভ করেছিলেন এবং তার ফলস্বরূপ তাঁর ছোটগল্পগুলিও বাস্তবানুগ হবার স্বাভাবিকত্ব লাভ করেছে। ছোটগল্পের জন্য যে-ধরনের দেখার প্রয়োজন—দূর থেকে নম্র নেত্রপাত, তার সম্পূর্ণ সুযোগ এসময়টাতে রবীন্দ্রনাথের মিলেছিল। প্রসঙ্গতঃ কবি সমালোচক প্রমথনাথ বিশী মহাশয়ের বক্তব্য স্মরণীয় বলে মনে হয়—"রবীন্দ্রনাথ ধনী জমিদার এবং বাইরের লোক। কাজেই তথাকার পল্লীজীবনের সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশিবার উপায় ছিল না। পল্লীজীবনের মধ্যে মিলিত হইবার ইচ্ছা যতই প্রবল হোক; বাধা দুর্লঙ্ঘ্য; ফলে তাহাকে দূর হইতে, বাহির হইতে দেখিতে হইয়াছে।...ইহাই সত্যকার ছোটগল্পের দেখা। এখানকার অভিজ্ঞতা অবিচ্ছিন্ন ধারায় তাঁহার মনে আসে না, আসে খণ্ডশ। সে খণ্ডগুলি এমন ব্যাপক নয় যে, তাহার উপরে উপন্যাসের ইমারত গাঁথা চলে; সে টুকরাগুলি ছোটগল্প রচনার মাপে সংকীর্ণ।"

রবীন্দ্রনাথের পল্লীপ্রকৃতির সঙ্গে যে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তার অক্ষয় নিদর্শন ছড়ানো আছে "ছিন্নপত্র" গ্রন্থখানির বিভিন্ন পত্রে। ছিন্নপত্রকে রবীন্দ্রসাহিত্যের বহুমুখী ধারার প্রাথমিক উপাদান বলা যায়। এই ছিন্নপত্রেরই একখানি পত্র :—

"আপনি কোনরকম ঐতিহাসিক বা ঔপদেশিক বিড়ম্বনায় যাবেন না—সরল মানবহৃদয়ের মধ্যে যে গভীরতা আছে এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখ দুঃখপূর্ণ মানবের দৈনন্দিন জীবনের যে চিরানন্দময় ইতিহাস তাই আপনি দেখবেন। শীতল ছায়া, আম কাঁঠালের বন, পুকুরের পাড়, কোকিলের ডাক, শান্তিময় প্রভাত এবং সন্ধ্যা-এরি মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে, তরল কলধ্বনি তুলে, বিরহমিলন হাসিকান্না নিয়ে যে মানব জীবনস্রোত অবিশ্রান্ত প্রবাহিত হচ্ছে তাই আপনি আপনার ছবির মধ্যে আনবেন।...আমাদের এই চিরপীড়িত, ধৈর্যশীল স্বজন-বৎসল, বাস্তুভিটাবলম্বী, প্রচণ্ড কর্মশীল পৃথিবীর এক নিভৃত প্রান্তবাসী শান্ত বাঙালীর কাহিনী কেউ ভাল করে বলে নি।"

এই পত্রাংশ থেকেই বাংলা কথাসাহিত্য সম্পর্কে কবির মনোভাবের একটা সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। এই পত্রে রবীন্দ্রনাথ পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীমানুষের কথাই বলেছেন। আর এই পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীর জনপদ জীবনই গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির প্রাণ।

একদা রবীন্দ্রনাথ বন্ধুবর লোকেন্দ্রনাথ পালিতকে লিখেছিলেন, "যতই আলোচনা করছি ততই অধিক অনুভব করছি যে, সমগ্র মানবকে প্রকাশের চেষ্টাই সাহিত্যের প্রাণ। তাই তুমি যদি একটি টুকরো সাহিত্য তুলে নিয়ে বলো 'এর মধ্যে সমস্ত মানুষ কোথা' তবে আমি নিরুত্তর। কিন্তু সাহিত্যের অধিকার যতদূর আছে সবটা যদি আলোচনা করে দেখ তাহলে আমার সঙ্গে তোমার কোনো অনৈক্য হবে না। মানুষের প্রবাহ হু হু করে চলে যাচ্ছে; তার সমস্ত সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্খা, তার সমস্ত জীবনের সমষ্টি আর কোথাও থাকছে না—কেবল সাহিত্যে থাকছে; সঙ্গীতে চিত্রে বিজ্ঞানে দর্শনে সমস্ত মানুষ নেই। এই জন্যই সাহিত্যের এত আদর। এই জন্যই সাহিত্য সর্ব্বদেশের মনুষ্যত্বের অক্ষয়-ভাণ্ডার।"

এই পত্রের রচনাকাল আষাঢ় ১২৯৯ বঙ্গাব্দ। গল্পগুচ্ছের প্রথম দুটি গল্পের (ঘাটের কথা ও রাজপথের কথা) রচনাকাল ১২৯১ বঙ্গাব্দ। পরবর্ত্তী তেইশটি গল্পের (দেনাপাওনা থেকে দান প্রতিদান) রচনাকাল ১২৯৮-'৯৯ বঙ্গাব্দ।

সবটা মিলিয়ে দেখলে দেখা যায় "মানবসঙ্গ-ব্যাকুলতাই" রবীন্দ্রসাহিত্যের মৌলপ্রেরণা এবং গল্প-

গুচ্ছের প্রেরণা উৎস। গল্পগুচ্ছের মূল সুর ভালবাসার —একে ঘিরেই প্রসন্নতার স্বর্ণচম্পক দীপ্তি। আবার একে ঘিরেই সূক্ষ্ম নীলাভ সুন্দর ব্যথা। রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির মধ্যে মানবসঙ্গলাভের দুর্বার অভীপ্সা চালিত ব্যকুলতাকেই অভিব্যক্ত করেছেন। একদা ঐকতান কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন— "জীবনে জীবন যোগ করা, নাহলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।"

এই জীবনের সঙ্গে জীবন যোগ করবার এক সুগভীর বাসনা আছে গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির মধ্যে। গল্পগুচ্ছের কাহিনীর মানুষগুলি তাই বাস্তবের মৃত্তিকার উপরেই প্রতিষ্ঠিত, রবীন্দ্রনাথের কোন অসাধারণ ধ্যান বা কল্পলোকের অধিবাসী নয়।

শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন,— "গল্পগুচ্ছের পটভূমি মানবজীবনের প্রবহমান মানবজীবনের পটভূমি। আর সেইসঙ্গে তা' বিশ্বপ্রকৃতির পটভূমিকায় প্রসারিত। বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে যে চিরন্তনতা, বৈচিত্র্য নিত্য পরিবর্তনশীলতা ও নিত্য নবীনতা বর্তমান, তা' গল্পগুচ্ছেও বর্তমান।" (প্রবন্ধ পত্রিকা :: গল্পগুচ্ছের পটভূমি।। পৌষ সংখ্যা ১৩৫১)

শ্রী মুখোপাধ্যায়ের এই বক্তব্যের সঙ্গে আমার মতের যথেষ্ট ঐক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির মধ্যে ব্যক্তি ও বিশ্বের অপূর্ব্ব সমন্বয় সাধন করে বস্তুনিষ্ঠা ও আদর্শ সাধনার এক আপেক্ষিক পরিমাণ রক্ষা করেছেন।

।। ৩ ।।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অন্যান্য রচনার মতন ছোটগল্পে অন্ততঃ অভাবনীয়ের কচিৎ কিরণে দীপ্ত এক অদেখা স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করেননি। খুবই বাস্তবানুগ পাঠকের রবীন্দ্রসাহিত্য সম্পর্কে যে বিরূপতা দেখা যায় ছোটগল্পগুলি পড়লে পরে তা' নিশ্চিত হ্রস্ব হবে। দ্বন্দ্ব সংঘাত, অন্তর্জ্বালা ও বৃহত্তর দেশকালের নির্দেশ রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের ভিত্তিমূল রচনা করেনি। কিছু গল্পে অবশ্য ব্যতিক্রম আছে। গল্পগুচ্ছের গল্পগুলির মধ্যে বাঙলাদেশের বাস্তবচিত্র অথচ দুর্লভ ছবি প্রকাশিত। পদ্মালালিত বাংলার জনপদজীবন, শস্যরিক্ত ও শস্যপূর্ণ প্রান্তর, ঋতুরূপের বৈচিত্র্য, গ্রাম্য নদী ও গ্রাম্য-ললনার কল্যাণস্নিগ্ধ রূপ বাঙলার পরিবার ও সমাজের ছবি রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিতে অক্ষয়রূপ লাভ করেছে। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে বিশ শতকের প্রায় চল্লিশ বছর—এই সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর বাঙলাদেশ তার রূপকে আর কারো রচনাতে এমন অকপটভাবে উন্মুক্ত করেনি। তাই রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পগুলিকে গীতিধর্মী, লিরিক অপবাদ দিয়ে নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। গোটা বাঙলাদেশের এমন বাস্তবচিত্র আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ! আর এই লিরিক অপবাদ খণ্ডনের জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন,—

।।…আমার অবাক লাগে, তোমরা যখন বল যে, আমার গল্পগুলি গীতিধর্মী। এক সময়ে ঘুরে বেড়িয়েছি বাংলার নদীতে নদীতে, দেখেছি বাঙলার পল্লীর বিচিত্র জীবনযাত্রা। একটি মেয়ে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ী চলে গেল, তার বন্ধুরা ঘাটে নাইতে নাইতে বলাবলি করতে লাগলো, আহা! যে পাগলাটে মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গিয়ে ওর না জানি কি দশা হয়! কিম্বা ধরো একটা ক্যাপাটে ছেলে সারা গ্রাম দুষ্টুমির চোটে মাতিয়ে বেড়ায়, তাকে হঠাৎ একদিন চলে যেতে হলো শহরে তার মামার কাছে। এইটুকু চোখে দেখেছি, বাকিটা নিয়েছি কল্পনা করে। একে কি তোমরা গান জাতীয় পদার্থ বলবে? আমি বলবো, আমার গল্পে বাস্তবের অভাব কখনো ঘটেনি। যা কিছু লিখেছি, নিজে দেখেছি, মর্মে অনুভব করেছি, সে আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। গল্পে যা' লিখেছি, তার মূলে আছে আমার অভিজ্ঞতা, আমার নিজের দেখা। তাকে গীতিধর্মী বললে ভুল করবে। …ভেবে দেখলে বুঝতে পারবে, আমি যে ছোটগল্পগুলি লিখেছি, বাঙালী সমাজের বাস্তব জীবনের ছবি তাতেই প্রথম ধরা পড়ে।"

[রবীন্দ্ররচনাবলী ১৪শ খণ্ড, গ্রন্থপরিচয় পৃষ্ঠা ৫৩৮—৫৩৯]

সবুজপত্রের যুগথেকে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির রূপ ও রীতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই পর্বের গল্পগুলির মধ্যে সমসাময়িক সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনা আরো সুস্পষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশের সংকীর্ণ ও গণ্ডীবদ্ধ সমাজজীবনের মধ্যেই পরমাশ্চর্য বৈচিত্র্যের সন্ধান করেছেন। তাকে আবিষ্কার করেছেন। তাকে আমাদের পারিবারিক জীবনের সম্পর্কগুলির মধ্যে স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষদিকের চেয়ে তিনি অপেক্ষাকৃত গৌণ-সম্পর্কের মধ্যেই বৈচিত্র্যের খোঁজ করেছেন। খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন, কাবুলিওয়ালা, পোষ্টমাষ্টার প্রভৃতি গল্পে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি কেন্দ্র থেকে গল্পরস আবিষ্কার করেছেন, যা সত্যই অভিনব। রতন, তারাপদ, ফটিক, রাইচরণ, মিনি, কাবুলিওয়ালা—এরা আমাদের বাস্তব-জীবনের নিত্য-দেখা চরিত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এদের কোন সম্পর্কই বাঙালীর সামাজিকজীবনের মুখ্য সম্পর্কের মধ্যে আসেনা। রবীন্দ্রনাথের যে আদর্শ-সাধনা ব্যক্তিমাত্রকেই বিশ্বে উপস্থাপিত করেছে, মানুষ ও জীবমাত্রকেই প্রকৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করেছে সেই আদর্শসাধনাই অপূর্ব কুশলতার ফলে বস্তুনিষ্ঠার সঙ্গে সমপরিমাণে সমন্বিত হয়ে এদেরকে বিশ্ব প্রকৃতির অঙ্গীভূত করেছে। শুধু কি তাই? 'বিশ্বপ্রকৃতির নিত্য নবীনতা'—ক্ষণে শুভ্রতা--ক্ষণে রুক্ষতা ও চিরগতিশীলতার উপলব্ধিও তাই এই ছোট গল্পগুলিতে আশ্চর্যভাবে উপস্থিত হয়েছে।

গীতা ও উপনিষদের যে নিগূঢ় উপলব্ধি কবি রবীন্দ্রনাথ আমরণ চিত্তে ধারণ করেছিলেন তা'থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে ছোটগল্পের জগতে সমাসীন হতে পারেন নি। না পারাটা অস্বাভাবিক নয়। এর ফল খারাপ না হয়ে ভালই হয়েছে। ঘাটের কথা থেকে পোষ্টমাষ্টার গল্পের বিচিত্র সাহিত্যলোক এরই ফলশ্রুতি। পোষ্টমাষ্টার গল্পের শেষাংশে কবি যে লিখেছেন,—

"তখন পালে বাতাস পাইয়াছে, বর্ষার স্রোতে খরতর বেগে বহিতেছে, গ্রাম অতিক্রম করিয়া নদীকূলের শ্মশান দেখা দিয়াছে এবং নদীপ্রবাহের ভাসমান পথিকের উদাস হৃদয়ে এই তত্ত্বের উদয় হইল, জীবনে এমন কত বিচ্ছেদ, কত মৃত্যু আছে, ফিরিয়া ফল কি! পৃথিবীতে কে কাহার?" এর থেকে নির্মম বাস্তবতা কল্পনা করা যায় না। এই গল্পে নিঃসন্দেহে গল্পকার রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির ঘটেছে অনিন্দ্য সুন্দর Sublimation

তারপর খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন গল্পে তিনি নিরাসক্তভাবে পদ্মার উদাসীন ব্যবহারের কথা বলেছেন। একটি মানবশক্তির মৃত্যু বৃহৎ বিশ্বপ্রকৃতির কাছে কিছু নয়, এই ভাবটি এখানে প্রধান হয়ে উঠেছে। মেঘ ও রৌদ্র গল্পে প্রকৃতির এই নির্মম উদাসীনতার কথাই অভি-ব্যক্ত হয়েছে। Hart leap well কবিতাতে Wordsworth প্রকৃতিকে মৃতা হারণীর জন্য দুঃখে পাণ্ডুর হয়ে যাবার কথা বলেছেন। প্রকৃতি সেখানে সহানুভূতিশীলা, মাতৃরূপিণী কিন্তু তাই কি সত্য? প্রকৃতির একটা প্রলয়ঙ্করীভাবও তো আছে। তার রুদ্রাণীভাব, মেঘ ও রৌদ্র গল্পে রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতির এই রুদ্রাণী-রূপের চিত্রই অঙ্কিত করেছেন। শাস্তি গল্পেও অনুরূপ উপলব্ধি কার্যকরী হয়েছে। চন্দরার দুঃখের পটভূমিকায় প্রকৃতির যে আনন্দরূপ বর্ণনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাতে একটা বিরাট বৈপরীত্য ফুটে উঠেছে। এইখানেই কবি রবীন্দ্রনাথ ও গল্পকার রবীন্দ্রনাথের পার্থক্যের সীমাটিকে স্পষ্ট করে দেখতে পাই। কবি রবীন্দ্রনাথ মূলতঃ কল্পনাচারী। গল্পকার রবীন্দ্রনাথ নিষ্ঠুর নির্মম বাস্তববাদী। তাইতো পৃথিবী বন্দনায় কবি রবীন্দ্রনাথ লেখেন,—

> "জীবপালিনী, আমাদের পুষেছ
> তোমার খণ্ডকালের ছোট ছোট পিঞ্জরে;
> তারই মধ্যে সব খেলার সীমা,
> সব কীর্তির অবসান।"

গল্পকার রবীন্দ্রনাথ বলেন,—

"কিন্তু চন্দ্র বাঁকিয়া কেউ উত্তর দিল না, দুষ্টামি করিয়া কোন শিশুর কণ্ঠ হাসিয়া উঠিল না; কেবল পদ্মা

ছল্‌ছল্‌ খল্‌খল্‌ করিয়া ছুটিয়া চলিতে লাগিল, যেন সে কিছুই জানে না, এবং পৃথিবীর এই সকল সামান্ত ঘটনায় মনোযোগ দিতে তাহার যেন এক মুহূর্ত সময় নাই।”

এই নিষ্ঠুর জীবনসত্যের প্রতিষ্ঠাকেই বাস্তবনিষ্ঠা বলতে হয়। এর অন্য কোন সংজ্ঞা নেই নাম নেই। অর্থ নেই।

॥৪॥

আশাবাদ ও ঔদার্যবাদের আদর্শ—এই দুই প্রত্যয়ের অমৃত রবীন্দ্রনাথ আকণ্ঠ পান করেছিলেন। ফলে জগৎ ও জীবনকে দেখবার একটি বিশিষ্ট সুন্দর ভঙ্গি আশৈশবেই তাঁর আয়ত্তাধীন ছিল। তাঁর মধ্যে Sense of the evil অত্যন্ত বিরাট ভাবেই অনুপস্থিত ছিল। কিন্তু evils-দের নিয়েও যে তাঁর লেখনী দিগন্ত-পরিভ্রমণে সক্ষমতার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন চতুরঙ্গ, চোখের-বালি, নষ্টনীড়, ঘরেবাইরে, ল্যাবরেটরী, রবিবার এবং শেষ দশ বছরের কাব্যে এবং চিত্রকলায়। তাঁর শেষ বয়সের রচনাকে তথাকথিত puritan পাঠকেরা “বার্ধক্যোচিত বুদ্ধিবৈপ্লব্য” বলে অভিহিত করলেও, আমরা যারা রবীন্দ্রনাথের আধুনিকপাঠক তারা এই অভিযোগটির স্থির নিশ্চয়তাই মনেমনে পোষণ করি। দরকার হলে গলাবাজি করতেও ছাড়িনা।

“সমন্বয়ের আদর্শই হলো শ্রেষ্ঠ শিল্পাদর্শ, আর আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে এ আদর্শের যেরূপ সার্থক অভিব্যক্তি ঘটেছে এমন বোধ করি আর কোন কালের কোন দেশের শিল্পীর মধ্যে ঘটে নি। রবীন্দ্রনাথ যাকে বলে all along the line সমন্বয়েরই সাধক ছিলেন।” তাঁর ছোট গল্পে এই সমন্বয়ের আদর্শই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে॥
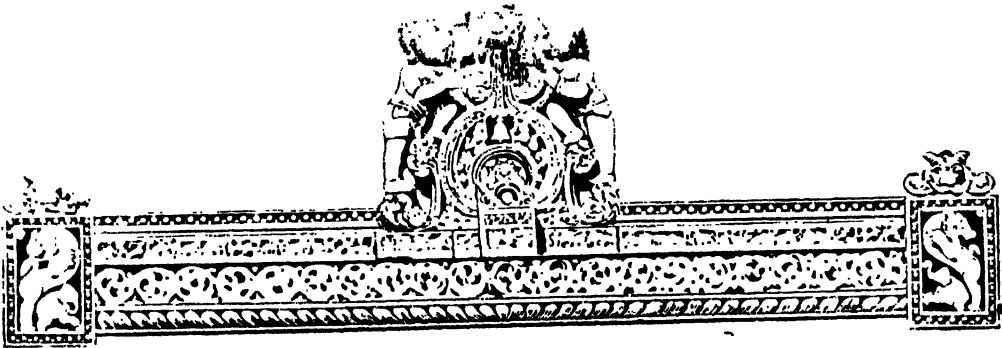
রাগ সঙ্গীতে বাঙ্গালী

রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭১-১৯২৭)

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

বিষ্ণুপুরের গুণী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সঙ্গীতজগতে একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিষ্ণুপুরের সুপরিচিত সঙ্গীতজ্ঞ বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবারের সন্তান। উক্ত বংশীয়গণ সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে বিষ্ণুপুর ঘরাণার অন্তর্ভুক্তরূপে প্রসিদ্ধ। বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদ সাধনার সম্প্রদায় স্থাপনকর্তা অর্থাৎ ঘরাণায় প্রবর্তক ছিলেন রামশঙ্কর ভট্টাচার্য। তাঁর শেষবয়সের অন্যতম শিষ্য অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। ধ্রুপদ গায়ক ও গীতরচয়িতা অনন্তলালের [১৮৩০-১৮৯৬] সঙ্গীতজীবন বিষ্ণুপুরেই অতিবাহিত হয়েছিল এবং তাঁর শিষ্যরা সকলেই বিষ্ণুপুর নিবাসী ছিলেন। কিন্তু তাঁর তিন পুত্রই—রামপ্রসন্ন, গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথ সর্বশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে বৃহত্তর বাংলার সঙ্গীতজগতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ধ্রুপদীরূপে তাঁরা তিনজনই বিষ্ণুপুর ঘরাণা বা বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদরীতি ও ধারার স্বীকৃত প্রবক্তা।

উক্ত তিন ভ্রাতার মধ্যে জ্যেষ্ঠ রামপ্রসন্ন অপেক্ষাকৃত অল্পায়ু ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গীতজীবন কলকাতা থেকে অনেক দূরে অতিবাহিত হয়েছিল। নচেৎ তিনি যে সঙ্গীতগুণের অধিকারী ছিলেন তাতে অধিকতর খ্যাতিমানরূপে কীর্তিত থাকতেন বাংলাদেশের সঙ্গীতক্ষেত্রে। তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভাও বহুমুখী ছিল। তিনি ছিলেন একাধারে ধ্রুপদ ও টপ্পাগায়ক এবং সুরবাহার সেতার, বীণা, এসরাজ, পাখোয়াজ, তবলা প্রভৃতি যন্ত্রের বাদক উপরন্তু তিনি ব্রজভাষা ও বাংলার গান রচয়িতা এবং বিভিন্ন বিষয়ক সঙ্গীতগ্রন্থের লেখকও ছিলেন। তাঁর রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে স্বরলিপি-সম্পন্ন ধ্রুপদাদি গীতাবলীর বিপুল সংকলন 'সঙ্গীত মঞ্জুরী' অতি মূল্যবান।

১২৭৮ সালের ২৭ আষাঢ় তারিখে রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষ্ণুপুরে জন্ম হয়। শিশু বয়স থেকেই তাঁর সঙ্গীতানুরাগ প্রকাশ পায় এবং পিতার নিকটে সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করেন ৫ বছর বয়সে। প্রকৃতিদত্ত শক্তি এবং নিয়মিত সঙ্গীতচর্চার ফলে তরুণ বয়সেই তিনি সুকণ্ঠ গায়ক হয়েছিলেন।

বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী অযোধ্যা গ্রামের জমিদারের আনুকুল্যে এবং তাঁরই সঙ্গে রামপ্রসন্ন প্রথম কলকাতায় এসেছিলেন। তখন তাঁর বয়স ১৬ বছর। কলকাতায় তিনি 'সুধাসিন্ধু'র আবিষ্কারক ড: প্রিয়নাথের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন সঙ্গীতগুণের জন্যে। তারপর প্রিয়নাথবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় সঙ্গীতশিক্ষার জন্যে রামপ্রসন্ন অবস্থান করেন। সেসময় তাঁর সঙ্গীতগুরু হন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের প্রধান সভাগায়ক গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী। তাছাড়া যতীন্দ্রমোহনের অন্যতম সভাবাদক ও সুরবাহার শিল্পী নীলমাধব চক্রবর্তীর নিকটে রামপ্রসন্ন সুরবাহার, সেতারও শিক্ষা করেন।

কলকাতায় কয়েক বছর যাবৎ সঙ্গীতশিক্ষার পর রামপ্রসন্ন ফিরে আসেন বিষ্ণুপুরে। অতঃপর তিনি বিষ্ণুপুরের নিকটস্থ কুচিয়াকোল রাজবাড়ীতে সঙ্গীতজ্ঞরূপে নিযুক্ত হন। বিষ্ণুপুর রাজবংশীয় রায় যোগেন্দ্রনাথ সিংহ দেব বাহাদুর ও তাঁর ভ্রাতা রজনীনাথ সিংহ দেবও এসময় অনেকদিন সঙ্গীতশিক্ষা করেন রামপ্রসন্নের কাছে।

কয়েক বছর পরে রামপ্রসন্ন নাড়াজোল রাজ নরেন্দ্রলাল খাঁর দরবারী সঙ্গীতশিল্পীর পদে বৃত হন। রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ তাঁকে কলকাতায় সঙ্গীতাচার্যরূপে নিযুক্ত রাখেন এবং তাঁর নিকটে গান ও সেতার শিক্ষা করতে থাকেন। কলকাতার নাড়াজোল রাজভবনে

সেসময় অনেক আসর করেছিলেন রামপ্রসন্ন। রাজবাড়ীতে উৎসবাদি উপলক্ষ্যে অন্যান্য গায়কদের সঙ্গে তিনিও আসরে যোগ দিতেন এবং কলকাতার সঙ্গীত-সমাজে সুপরিচিত হন।

সংস্কৃতিবান রাজা নরেন্দ্রলাল খাঁ শুধু তাঁর সঙ্গীতশিষ্য ছিলেন না; তিনি রামপ্রসন্নের শ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষকও। নাড়াজোল রাজ তাঁর বৃহৎ গ্রন্থ 'সঙ্গীত মঞ্জুরী [১৯০৭ খৃঃ প্রথম মুদ্রিত] প্রকাশের ব্যয়ভার বহন করেছিলেন। রাজা নরেন্দ্রলাল স্বয়ং 'পরিবাদিনী শিক্ষা' নামে সেতার-যন্ত্রবাদন সম্পর্কে পুস্তিকামালা প্রণয়ন করেন। 'পরিবাদিনী শিক্ষা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ তিনি প্রকাশ করেছিলেন। তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ রচনা সম্পূর্ণ করে প্রকাশনার ব্যবস্থা করবার সময় আকস্মিকভাবে পরলোকগত হন।

রামপ্রসন্ন অনেকদিন বসবাস করেন নাড়াজোলে। সেসময় তিনি অন্যান্য সঙ্গীতযন্ত্রের মধ্যে বীণা, এসরাজ, পাখোয়াজ ও সুরবাহারেরও বিলক্ষণ চর্চা করেছিলেন।

১৯১৮ খৃঃ রামপ্রসন্ন আর দুখানি সঙ্গীতগ্রন্থ প্রণয়ণ করেন—'মৃদঙ্গ দর্পণ' ও 'তবলা দর্পণ'। পাখোয়াজ ও তবলা শিক্ষা বিষয়ক উক্ত পুস্তক দুটি প্রকাশের পর তিনি এসরাজ যন্ত্রবাদন শিক্ষার উপযোগী 'এসরাজ তরঙ্গ, নামে আর একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতজ্ঞগণের মধ্যে প্রথম এসরাজ-বাদক ছিলেন সঙ্গীতগুরু রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের তৃতীয় পুত্র ধ্রুপদ গায়ক রামকেশব ভট্টাচার্য [আঃ ১৮০৯-আঃ ১৮৫০ খৃঃ]। রামকেশব বিষ্ণুপুরের প্রথম এসরাজী এবং তাউস [এসরাজ যন্ত্রেরই ঈষৎ অলঙ্কৃত ও বৃহত্তর সংস্করণ ময়ূরমুখী এসরাজ। তাউস অর্থ ময়ূর] যন্ত্র পশ্চিমাঞ্চল থেকে শিক্ষালাভ করে এসে বিষ্ণুপুরে প্রথম প্রচলন করেন। রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় উক্ত 'এসরাজ তরঙ্গ' পুস্তকে রামকেশব ভট্টাচার্যের কয়েকটি গৎ [বেহাগ, বাহার, ছায়ানট] প্রকাশ করেছেন।(১)

রাজা নরেন্দ্রলালের অকাল মৃত্যুর পর রামপ্রসন্ন তাঁর পুত্র কুমার দেবেন্দ্রলাল খাঁকে কয়েক বছর সঙ্গীতশিক্ষা দানের পর অবসর নেন নাড়াজোল দরবার থেকে। তারপর বিষ্ণুপুরে প্রত্যাবর্তন ক'রে পিতার প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতবিদ্যালয়টিকে পুনর্জীবিত করে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতশিক্ষা দিতে থাকেন। কণ্ঠসঙ্গীতে ও যন্ত্রে খানে কয়েকজন ছাত্রের সঙ্গীতজীবন গঠিত হয় তাঁর শিক্ষাধীনে।

মধ্যম ও কনিষ্ঠ অনুজ গোপেশ্বর ও সুরেন্দ্রনাথকেও রামপ্রসন্ন বিশেষভাবে সঙ্গীতশিক্ষা দিয়েছিলেন।

জীবনের শেষপর্যন্ত বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতাচার্যরূপে অবস্থান করে রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৫৭ বছর বয়সে মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরে ১৯২৫ খৃঃ তাঁর বিখ্যাত 'সঙ্গীত মঞ্জুরী' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

রামপ্রসন্নের পুত্র অশেষ বন্দ্যোপাধ্যায় এসরাজ-বাদকরূপে সুপরিচিত এবং সুদীর্ঘকাল যাবৎ শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতজ্ঞরূপে যুক্ত।

ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী (১৮৭৩-১৯৫৭)

ময়মনসিংহের গৌরীপুরের ভূম্যধিকারী ব্রজেন্দ্র-কিশোর রায় চৌধুরী নানা সদগুণের আধার ছিলেন। বদান্য, দেশহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী, জাতীয় শিক্ষা ও দেশীয় শিল্পায়নের পৃষ্ঠপোষক ইত্যাদি রূপে বহির্জীবনে যশস্বী ছিলেন তিনি। সেই সঙ্গে স্বয়ং সঙ্গীতজ্ঞ এবং সঙ্গীতগুণীদের মুক্তহস্ত পৃষ্ঠপোষকরূপেও তাঁর একটি বিশিষ্ট পরিচয় ছিল। সঙ্গীতবিষয়ে তিনি ছিলেন প্রধানত তাত্ত্বিক। সঙ্গীতশাস্ত্রাদি নিয়ে তন্নিষ্ঠ আলোচনা, মূল গ্রন্থাদির ভাষ্য ও টীকা রচনায় তাঁর বৈদগ্ধ প্রকাশ পায়। ভারতীয় সঙ্গীতের তত্ত্ববিষয়ে বহু রচনা তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ 'ভারতবর্ষ', 'সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা' প্রভৃতি পত্রিকায় মুদ্রিত করেছিলেন, যদিও পুস্তকাকারে কিছুই প্রকাশিত করেননি। তাঁর রচনাবলীর মধ্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য হল পণ্ডিত অহোবলের 'সঙ্গীত পারিজাত' গ্রন্থের টীকা ও ভাষ্য যার বেশির ভাগই সঙ্গীত-বিজ্ঞান প্রবেশিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত মাসিক পত্রিকাতে ধারাবাহিক মুদ্রিত 'রাগসঙ্গীতের ব্যাকরণ' তাঁর আর একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা। তেমনি শার্ঙ্গদেবের

'সঙ্গীত রত্নাকর' গ্রন্থের অনুবাদ 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় কয়েক সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু তাও সম্পূর্ণ হয়নি। দেশ ও সমাজহিতৈষণার নানা কর্মে ব্যাপৃত থাকায় তাঁর উক্ত রচনাবলী অসম্পূর্ণ থেকে যায়। তিনি যথোপযুক্ত অবকাশ লাভ করলে তাঁর পাণ্ডিত্যের ফলে বাংলায় সঙ্গীতবিষয়ক সাহিত্য সমৃদ্ধ হত, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। তা ছাড়া তাঁর আরো নানা সাঙ্গীতিক আলোচনা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর যতখানি পাণ্ডিত্য ও তত্ত্বজ্ঞান ছিল সে অনুপাতে রচনাকার্য তিনি করে উঠতে পারেননি। তবে তাঁর সঙ্গীতজ্ঞানের ফলে অনেকেই উপকৃত হন তাঁর নিকটে আলোচনা তথা শিক্ষাদির জন্যে। এইভাবে সঙ্গীতচর্চায় ক্ষেত্রে তাঁর শিষ্যস্থানীয়দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী, জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী, হরিহর রায়, বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী (দৌহিত্র), গোপীনাথ ভট্টাচার্য, বিমল রায় প্রভৃতি।

ব্রজেন্দ্রকিশোর সঙ্গীতবিষয়ে একান্তভাবেই যে তাত্ত্বিক ছিলেন, তাও নয়। সঙ্গীতের ক্রিয়াংশেও তিনি মধ্যজীবন পর্যন্ত কিছু কিছু চর্চা করেছিলেন। একাধিক সঙ্গীতগুণীর কাছে, কণ্ঠসঙ্গীতে না হলেও, বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীতের অনুশীলন করেছিলেন কিছুকাল। এই শিক্ষাপর্বে প্রথম জীবনে তিনি মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তের নিকটে পাখোয়াজবাদন শিক্ষা করেন। সুরের যন্ত্রের মধ্যে তাঁর প্রিয় ছিল এস্রাজ। এ সম্পর্কে তাঁর ওস্তাদ ছিলেন সরদী পিতা-পুত্র আবদুল্লা খাঁ ও আমীর খাঁ, হনুমান সিং (গয়া) প্রভৃতি। তা ছাড়া, স্বনামপ্রসিদ্ধ যন্ত্রী, ব্লু রিবণ অর্কেস্ট্রার প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ও সঙ্গীততত্ত্বজ্ঞ দক্ষিণাচরণ সেনের নিকটে ব্রজেন্দ্রকিশোর ঔপপত্তিক বিষয়ে এবং হারমোনিয়ম বাদনেও শিক্ষার্থী ছিলেন। বিখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ, ক্ল্যারিওনেট প্রভৃতি যন্ত্রবাদক এবং স্বামী বিবেকানন্দের জ্ঞাতিভ্রাতা অমৃতলাল দত্তের (হাবু দত্ত) সঙ্গীতসান্নিধ্যও অনেকদিন লাভ করেছিলেন। সেই সঙ্গে, তাঁর দীর্ঘ জীবনের বিভিন্ন সময়ে নানা কলাবতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন উদার হৃদয়ে। তাঁর আনুকূল্যপ্রাপ্ত গুণীদের মধ্যে তানসেনের পুত্রবংশীয় রবাবী মহম্মদ আলী খাঁ, সরদী করামতুল্লা খাঁ, পূর্বোল্লিখিত পিতাপুত্র আবদুল্লা ও আমীর খাঁ, তানসেনের কন্যাবংশীয় উজীর খাঁর পুত্র সগীর খাঁ, সেতারী এনায়েৎ খাঁ, সরদী আলাউদ্দিন খাঁ, বহুমুখী গুণী মেহেদী হোসেন খাঁ, এস্রাজী শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সরদী হাকিম আলী খাঁ, বীণ্‌কার ও ধ্রুপদী দবীর খাঁ প্রভৃতির নাম উল্লেখ্য। ব্রজেন্দ্রকিশোরের পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত উক্ত কলাবতবর্গের সান্নিধ্যে তিনি সঙ্গীতবিষয়ে আরো অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন এবং তাঁর একমাত্র পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর উল্লিখিতদের নিকটে শিক্ষা করে কৃতী সঙ্গীতজ্ঞ ও বীণকার সুরশৃঙ্গারবাদকরূপে প্রখ্যাতনামা হন।...

সমগ্রভাবে বলা যায় যে, সঙ্গীতের ঔপপত্তিক বিষয়ে অনুশীলন, সঙ্গীতচর্চা এবং বহু গুণীর সঙ্গলাভের ফলে সুসমঞ্জস ছিল ব্রজেন্দ্রকিশোরের সঙ্গীতজীবন তথা সঙ্গীতদৃষ্টি। ভারতীয় সঙ্গীতের তত্ত্বজ্ঞ এবং প্রেমী পৃষ্ঠপোষকরূপে তাঁর নাম স্মরণীয় থাকবে।......

রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বলিহারে ব্রজেন্দ্রকিশোরের ১৮৭৩ খৃঃ জন্ম হয়। তাঁর পিতা হরপ্রসাদ ভট্টাচার্য ছিলেন বলিহার রাজার পুরোহিতবংশীয়।

ময়মনসিংহের গৌরীপুর জমিদারীর তৎকালীন সত্বাধিকারী রাজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর অকালমৃত্যুতে তাঁর পত্নী বিশ্বেশ্বরী দেবী ব্রজেন্দ্রকিশোরকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ব্রজেন্দ্রকিশোরের তখন ৫ বছর বয়স তাঁর কোষ্ঠী বিচার বিবেচনা করে বিশ্বেশ্বরী দেবী তাঁকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেছিলেন।

উত্তরকালে ব্রজেন্দ্রকিশোর নানা সদনুষ্ঠানের জন্যে সম্মানিত হন সমাজজীবনে। সেসবের বিবরণ বর্তমান প্রসঙ্গে অবান্তর। তাঁর জীবনের অধিকাংশই কলকাতার অতিবাহিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত 'ভারত সঙ্গীত সমাজের' তিনি একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। অভিনয় কলাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল এবং ভারত সঙ্গীত সমাজে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কোন কোন নাটকে অবতীর্ণও হয়েছিলেন।

৮৫ বছর বয়সে ব্রজেন্দ্রকিশোরের জীবনাবসান হয় তাঁর বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়িতে।

তাঁর পুত্র বীরেন্দ্রকিশোর সঙ্গীতজগতে স্বনামপ্রসিদ্ধ গুণী।

মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯১৯)

পাথুরিয়াঘাটা নিবাসী ধ্রুপদগুণী মহীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এক জন প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতশিল্পী ছিলেন। এমন কণ্ঠমাধুর্যের অধিকারী দুর্লভ ছিলেন গায়ক-সমাজে। ধ্রুপদগান পরিবেশন করেও যে জনপ্রিয় শিল্পী হওয়া যায় তিনি তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ধ্রুপদ চর্চার ক্ষেত্রে মহীন্দ্রনাথ বাংলার অন্যতম বিশিষ্ট গৌরব। সেকালের সর্বভারতীয় সঙ্গীতজগতে যে মিষ্টত্বের জন্যে বাংলার ধ্রুপদের অর্থাৎ বাঙালীর কণ্ঠে গীত ধ্রুপদের সুনাম ছিল, মহীন্দ্রনাথ ছিলেন তার এক শ্রেষ্ঠ প্রতিভূ। সেই অ-মাইক যুগের বহু-জনপূর্ণ আসরে সকলকে তৃপ্তি-দান করত তাঁর উদাত্ত-মধুর ধ্রুপদগানের অনুষ্ঠান। তাঁর দরাজ অথচ সুমিষ্ট কণ্ঠে জোয়ারিদার জৌলুস ছিল। সে জন্যেই তার ললিত মাদকতায় মন্ত্রমুগ্ধ হত শ্রোতৃমণ্ডলী। আসরে তাঁর গানের পর অন্য গায়কের পক্ষে শ্রোতাদের মনোরঞ্জন করা অতি কঠিন দেখা যেত।

একবার কাসিমবাজারে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর সঙ্গীতসভায় বাংলা ও পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকজন গুণীর সমাগম হয়েছিল গানের জন্যে। আচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী তখন সেখানে ছিলেন এবং তাঁর আহ্বানে মহীন্দ্রনাথ সে আসরে যোগ দেন। মহীন্দ্রনাথের গান যে রাত্রে হল, কোন ওস্তাদ আর গান গাইলেন না তাঁর পরে। মহীন্দ্রনাথের মোহিনী সুরে আচ্ছন্ন শ্রোতারা আর কারো গান সেদিন শুনতে সম্মত হননি।

কলকাতায় একদিন ডঃ মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের আপার সার্কুলার রোডের বাড়িতে (ডঃ এম. এন. চ্যাটার্জী চক্ষু চিকিৎসা কেন্দ্র তাঁরই নামাঙ্কিত) তাঁর গান শোনেন স্বনামপ্রসিদ্ধ ঠুংরিগায়ক মৌজুদ্দিন। মহীন্দ্রনাথের গানের পরে মৌজুদ্দিন তাঁকে বলেন, 'আপনার এমন গলা। আমার বড় ইচ্ছা—আমার কাছে কিছু ঠুংরি নেবেন ?'

মহীন্দ্রনাথ অসম্মত হন। খাঁ সাহেবকে সবিনয়ে জানান যে, গোঁসাইজী (রাধিকাপ্রসাদ) ভিন্ন আর কারো কাছে কোন গান নেন না তিনি।

বাস্তবিক রাধিকাপ্রসাদ ভিন্ন অপর কোন কলাবতের কোন প্রকার শিক্ষা বা সাহায্য তিনি সঙ্গীতবিষয়ে গ্রহণ করেননি। এক গুরুর অধীনে একনিষ্ঠভাবে সুদীর্ঘকাল সঙ্গীতশিক্ষা করেন মহীন্দ্রনাথ। মাত্র ১৩'১৪ বছর বয়স থেকে গোস্বামী মহাশয়ের কাছে গান শিখতে আরম্ভ করেছিলেন এবং ৩০ বছর যাবৎ নিজেকে তাঁর শিষ্যরূপে গণ্য করতেন। রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গে তাঁর ছিল আদর্শ গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক। শিক্ষার্থীরূপে যেমন মহীন্দ্রনাথের একাগ্র সাধনা, সঙ্গীতগুরুর প্রতি তেমনি ছিল তাঁর ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস। আর সেই গুরুভক্তি রাধিকাপ্রসাদের নিত্য পরিচর্যাতেই শুধু প্রকাশ পেতনা। গোঁসাইজী যেবার প্রাণসংশয় মারীগুটিকা-রোগে আক্রান্ত হন, মহীন্দ্রনাথ নিজের জীবন বিপন্ন করে তাঁকে নিরাময় করেছিলেন সেবায়, যত্নে। অপরপক্ষে, রাধিকাপ্রসাদের তিনি ছিলেন প্রিয়তম (এবং ধ্রুপদে শ্রেষ্ঠতম) শিষ্য। গোস্বামী মহাশয় তাঁকে সম্পূর্ণ পুত্রবৎ স্নেহ করতেন।......

পাথুরিয়াঘাটা অঞ্চলে লালমাধব মুখার্জী লেনের বাড়িতে ১৮৭৩ খৃঃ মহীন্দ্রনাথের জন্ম হয়। এই গলির ১৭।২ সংখ্যক বাড়িটি তাঁর জন্মস্থান ও সারা জীবনের বাসস্থল। এ অঞ্চলের তাঁরা ৪।৫ পুরুষের অধিবাসী ছিলেন—তাঁদের পূর্ববর্তী নিবাস ছিল হাওড়া জেলার বলুহাটি গ্রামে। যে ডঃ লালমাধব মুখার্জীর নামে তাঁদের কলকাতার বাড়ির পথটির নামকরণ, তিনি প্রতিপত্তিশালী চিকিৎসক এবং কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ প্রতিষ্ঠায় ডঃ রাধাগোবিন্দ করের সহযোগী ছিলেন। বিহারীলাল মুখোপাধ্যায় ছিলেন উক্ত লালমাধবের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং মহীন্দ্রনাথ হলেন বিহারীলালের একমাত্র পুত্র।

বাল্যকাল থেকেই মহীন্দ্রনাথের সঙ্গীতে আসক্তি ও পটুত্ব প্রকাশ পায়। মেট্রোপোলিটান স্কুলের বড়বাজার শাখায় ক' বছর পাঠ করলেও লেখাপড়ায় তাঁর আদৌ মনোযোগ ছিল না। ছেলেবেলাতেই তাঁর গানে অনুরাগ দেখা যায় হাফ আখড়াই, পাঁচালি ইত্যাদিতে। তৎকাল প্রচলিত সেইসব রীতির গানের আসর তাঁদের বাড়িতে এবং স্থানীয় অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হ'ত।

মহীন্দ্রনাথের কণ্ঠস্বর স্বভাবতই মিষ্ট ছিল এবং এই সমস্ত গান তিনি সুন্দরভাবে অনুকরণ করে' গাইতেন। তাঁর রাগসঙ্গীত শিক্ষায় সুযোগ আসে অপ্রত্যাশিতভাবে এবং এক কৌতুককর পরিবেশে।

সেসময় রাধিকাপ্রসাদও ওই অঞ্চলে ৩, ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটে একখানি ঘর নিয়ে সেইখানে সঙ্গীতচর্চা করতেন। তখনো তিনি কলকাতার সঙ্গীতসমাজে খ্যাতিমান ও প্রতিষ্ঠিত হননি, সাধনার পর্ব চলেছে একান্তে। তাঁর সঙ্গীতসাধনস্থল সেই ৩ সংখ্যক ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটের ঘরখানি ছিল বাড়িটির পূর্ব দিকে এবং লালমাধব মুখার্জী লেনে অবস্থিত মহীন্দ্রনাথের বসতবাড়ির পশ্চিমেই। অর্থাৎ রাধিকাপ্রসাদের ঘরটি এবং মহীন্দ্রনাথের বাড়ি গলির মধ্যে ঠিক সামনাসামনি—মাঝে ৫ ফুট পথের ব্যবধান মাত্র।

মহীন্দ্রনাথের বয়স তখন বছর ১৩ এবং তিনি বড় দুরন্ত প্রকৃতির ছিলেন। রাধিকাপ্রসাদ যখন সেই ঘরে কণ্ঠ সাধনা করতেন, মহীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্বভাববিশিষ্ট এক জ্ঞাতিভাইয়ের সঙ্গে মিলে উৎপাত আরম্ভ করতেন গোস্বামী মহাশয়ের জানলায় এসে। তিনি গান গাইলেই কোথা থেকে বালক দুটির আবির্ভাব ঘটত আর তাঁর গানকে নিয়ে হাসি তামাশা আরম্ভ হয়ে যেত। জ্বালাতন এড়াবার জন্য জানালা বন্ধ করে দিতেন রাধিকাপ্রসাদ। কিন্তু তাতেও নিষ্কৃতি নেই।

একদিন মহীন্দ্রনাথ জানালাটি জোর করে খুলে দিয়ে সোজাসুজি জিজ্ঞেস করলেন—'অমন হা-আ-আ-আ করে এসব কি গান'?

রাধিকাপ্রসাদ সকৌতুকে বললেন, 'কেন, কি গান গাইব তবে'? 'এইরকম বাংলা গান কেন গাননা'? বলে মহীন্দ্রনাথ তাঁর শোনা একটি বাংলা গান গাইলেন—'হীনজনে দয়া করো, দয়াল প্রভু' ইত্যাদি।

গোঁসাইজি বালকের গান ও ব্যবহারে কৌতুকবোধ করলেও তার গানের গলা শুনে বিস্মিত ও চমৎকৃত হলেন। ছেলেটির স্বভাবদত্ত সুকণ্ঠ।

তিনি হেসে বললেন, 'আচ্ছা শোন ত, এই গানটা কেমন লাগে'? বলে, মালকোশ রাগে 'দীনতারিণী তারা' গানখানি গেয়ে শোনালেন।

সমস্ত চাপল্য স্তব্ধ হয়ে গিয়ে মহীন্দ্রনাথ মন্ত্রমুগ্ধের মতন শুনলেন রাধিকাপ্রসাদের সেই সুরেলা গান।

গান শেষ হবার পর বললেন, 'আপনি এমন সুন্দর গাইতে পারেন, এত ভাল গান জানেন! আমাকে ওইরকম গান শিখিয়ে দেবেন'?

নিরভিমান গোঁসাইজি সম্মত হলেন—'বেশ ত, শেখাব'।

সেইদিন থেকে মহীন্দ্রের উৎপাত বন্ধ হয়ে গেল এবং এমনি ভাগ্যক্রমে রাধিকাপ্রসাদের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ হল।

গোঁসাইজী প্রথমে পর পর দুখানি বাংলা গান শেখালেন তাঁকে। তারপর যখন ছাত্র সুরের প্রতি বিশেষ রকম আকৃষ্ট হলেন, তখন ক্রমে ক্রমে সার্গম সাধা আরম্ভ করলেন।

প্রথমে দিলেন ইমন কল্যাণের একটি তেলেনা—'উদানা দ্রিম দিম তানু। তানা দেরে না। তানা দেরে না'। যেমন উত্তম আধার, তেমনি উপযুক্ত আচার্য্য।

মহীন্দ্রনাথের সহজাত সঙ্গীত-প্রতিভা উত্তরোত্তর বিকশিত হতে লাগল। মন প্রাণ দিয়ে তিনি আরম্ভ করলেন সাধনা।

রাধিকাপ্রসাদ পরে ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটেরই অন্য একটি বাড়ীতে গান শিক্ষা দেবার স্কুল স্থাপন করলেন। সেখানে গিয়ে প্রায় সারা দিন ধরে রেওয়াজ করতেন মহীন্দ্রনাথ। বাড়ি আসতেন শুধু আহার ও শয়নের সময়।

এইভাবে তিনি সঙ্গীত-সাধনায় অগ্রসর হয়ে চলেন। তারপর উত্তরকালে লব্ধপ্রতিষ্ঠ গায়ক হবার পরও তিনি

গোঁসাইজির কাছে গান নেওয়া বন্ধ করেননি। পরে রাধিকাপ্রসাদ যখন মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর সঙ্গীত বিত্তালয়ের ভারপ্রাপ্ত হয়ে বহরমপুরে বাস করতে যান, তখনো কলকাতায় মাঝে মাঝে এলেই ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটে অবস্থান করতেন, এবং মহীন্দ্রনাথের শিক্ষাও থাকত অব্যাহত। রাধিকাপ্রসাদের অনুপস্থিতিতে ও পরবর্তীকালে মহীন্দ্রনাথ স্কুলটিতে শিক্ষা দিতেন। মহীন্দ্রনাথের সঙ্গীত-জীবন এইভাবে গোস্বামী মহাশয়ের হাতে গঠিত।

রাধিকাপ্রসাদের সঙ্গীতজীবনের সঙ্গেও বিশেষ তাঁর প্রতিষ্ঠালাভের প্রথম যুগে, মহীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। মাইক লাউডস্পীকার ব্যবহারের সেই পূর্ববর্তী যুগের উন্মুক্ত আসরে যদি বলিষ্ঠ কণ্ঠের অভাবে রাধিকাপ্রসাদের গান কোনদিন না জমত, তারপরে উদাত্ত কণ্ঠে গান শুনিয়ে মহীন্দ্রনাথ শিষ্যরূপে গুরুর মুখোজ্বল করতেন। আর এক প্রকারের কাজও তিনি করতেন গুরুভক্তি প্রণোদিত হয়ে। বড় বড় অবাঙালী ওস্তাদের আসরে গোঁসাইজি যাতে নিরুপদ্রবে গুণপনা প্রদর্শন করতে পারেন সেবিষয়ে মহীন্দ্রনাথের অতিশয় আগ্রহ ও উৎসাহ ছিল। এ-বিষয়ে একাধিক কাহিনী প্রচলিত আছে সঙ্গীত-সমাজের শ্রুতিস্মৃতিতে। এমন একটি আসরে ওস্তাদ কৌকব খাঁর সামনে তাঁর গান করার কৌতূহলদ্দীপক বিবরণ অন্যত্র প্রকাশিত হয়েছে। (২)

রাধিকাপ্রসাদ যখন মহারাজা মণীন্দ্র নন্দীর আহ্বানে তাঁর স্থাপিত সঙ্গীত-বিত্তালয়ের অধ্যাপকরূপে বহরমপুরে গমন করেন, মহীন্দ্রনাথ তখন পূর্ণ পরিণত ধ্রুপদগায়ক। তখনকার কলকাতার উচ্চমানের সঙ্গীতাসরে মহীন্দ্রনাথ যথার্থ গুণীর সম্মান তখনই লাভ করেছিলেন।

কিন্তু বাংলাদেশের বাইরের সঙ্গীতক্ষেত্রে কখনো তিনি যোগ না দেওয়ায় সর্বভারতীয় সঙ্গীতজগতে পরিচিত হননি এবং বাংলার ধ্রুপদচর্চার এক অত্যুজ্বল নিদর্শন অজ্ঞাত থেকে যায় বৃহত্তর সঙ্গীতজগতে। তাছাড়া বার বার অনুরুদ্ধ হয়েও তিনি গ্রামোফোন রেকর্ডে কণ্ঠদান করতে অসম্মত হওয়ার ফলে ভাবীকালের সঙ্গীত-রসিকদের জন্মে তাঁর সঙ্গীতস্মৃতিও রক্ষিত হলনা।

মহীন্দ্রনাথের গানের আসর বেশি হ'ত নিম্নলিখিত স্থানে: পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীটে 'হরকুটির' (পূর্ববর্তী যুগের অন্যতম ধ্রুপদগুণী ও বীণকার হরপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামাঙ্কিত বনিয়াদী ভবন) ও প্রদ্যুম্ন মল্লিকের গৃহ; পোস্তার কুঞ্জবিহারী মল্লিক ও দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীটের যদু দত্তের আবাস; আপার সার্কুলার রোডে ডঃ এম, এন, চ্যাটার্জীর বাড়ি ইত্যাদি। তাছাড়া মৃদঙ্গাচার্য দুর্লভচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত-পরিচালিত 'মুরারি সম্মেলন', এবং মৃদঙ্গগুণী দীননাথ হাজরা প্রবর্তিত 'শঙ্কর উৎসব' সেকালের বাংলার এই দুটি বার্ষিক সম্মেলনে মহীন্দ্রনাথ শ্রোতৃবর্গকে ধ্রুপদগানে পরিতৃপ্ত করতেন।

পাথুরিয়াঘাটার উক্ত 'হরিকুটিরে' মহীন্দ্রনাথের একটি সার্থক আসরের কথা জানা যায়। সেখানে অনুষ্ঠিত একটি আসরে স্বনামধন্য ধ্রুপদ-ধামারগায়ক বিশ্বনাথ রাওয়ের গানের পরই আসর মাৎ করেন মহীন্দ্রনাথ। তখন তাঁর কণ্ঠমাধুর্যের অপ্রতিরোধ্য আবেদনের প্রতি লক্ষ্য করে বিশ্বনাথ রাও জনান্তিকে বলেছিলেন—হাম্ কেয়া করে গা, উও তো গলে সে মার দিয়া।'

আসরে মহীন্দ্রনাথের গানের সঙ্গে প্রায়স সঙ্গত করতেন সমকালীন দুই নেতৃস্থানীয় পাখোয়াজ-গুণী নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও দুর্লভ ভট্টাচার্য। তাঁর প্রথম জীবনে ঘরোয়া গানের সময় সঙ্গতকাররূপে নগু মুখোপাধ্যায় ও প্যারীমোহন দাসকে দেখা যেত। কী শীত কি গ্রীষ্ম মহীন্দ্রনাথ আসরে গান গাইতে যেতেন একটিমাত্র পাঞ্জাবী গায়ে, কখনো বা একখানি চাদর।

কৌশিকী কানাড়া ও দরবারী কানাড়া রাগে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। ওই দুই রাগে যথাক্রমে 'সো গুণ সোহাবন' ও 'প্রথম সমুঝ ওয়াড়ি বিদ্যা' ইত্যাদি গানে তিনি সুরের ইন্দ্রলোক সৃজন করে যে কোন ভাল আসর সফল করে তুলতেন। সেই সঙ্গে কেদারা, ইমন কল্যাণ, বাগেশ্রী ও বসন্ত রাগও তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল এবং প্রথোক্ত দুটির মতন এইগুলি পরিবেশন করেও সম্মোহিত করে রাখতেন তাঁর শ্রোতাদের।

রাধিকাপ্রসাদ প্রতিষ্ঠিত ব্রজদুলাল ষ্ট্রীটের গানের স্কুলে এবং অন্যত্র তিনি নিয়মিত সঙ্গীতশিক্ষা দান করতেন এবং

কালে তাঁরও একটি কৃতী শিষ্যমণ্ডলী গঠিত হয়। তিনি যখন আসরে গান গাইতে যেতেন, তাঁর সঙ্গী হতেন তাঁর শিষ্যগোষ্ঠি। মহীন্দ্রনাথের শিষ্যদের মধ্যে কয়েকজন বাংলার শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদীদের মধ্যে গণনীয়। যথা ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তর-কালের বাংলার অন্যতম ধ্রুপদগুণী ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও প্রথম জীবনে মহীন্দ্রনাথের শিষ্য ছিলেন। অনুপম কণ্ঠ-সম্পদের অধিকারী ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ধ্রুপদগায়ক গঠিত হয়েছিলেন মহীন্দ্রনাথের হাতে। ধ্রুপদগুণী যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বেশ কয়েক বছর গুরুগৃহে বাস করে তাঁর কাছে রীতিমতভাবে সঙ্গীতশিক্ষা করেন ও সঙ্গীতজীবনে অগ্রসর হন। উক্ত শিষ্যবৃন্দ ভিন্ন কার্তিক সেন, ননী চট্টোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্র দত্তও সঙ্গীত-শিক্ষা করেছিলেন মহীন্দ্রনাথের কাছে।

তাঁর চার পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ললিতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পিতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। ললিতচন্দ্রের অপরূপ কণ্ঠমাধুর্য তাঁর পিতার মধুকণ্ঠের কথা স্মরণ করিয়ে দিত। উত্তরজীবনে ললিতচন্দ্রও বাংলার কৃতী ধ্রুপদ-গুণীদের অন্যতমরূপে গণ্য হয়েছিলেন। স্মরণীয় গায়ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীর সঙ্গে ললিতচন্দ্রের যুগলবন্দী ধ্রুপদগানের অনুষ্ঠান শ্রোতাদের পরম উপভোগ্য হত এক-কালের সঙ্গীতাসরে।

পিতার নিকটে ললিতচন্দ্রের সঙ্গীতশিক্ষা সম্পূর্ণ হবার আগেই মহীন্দ্রনাথের জীবনাবসান হয়। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৬ বছর। সুতরাং একরকম অকালমৃত্যু বলা যায়। মহীন্দ্রনাথের তুল্য অসাধারণ সুকণ্ঠ গায়ক ও সঙ্গীতশিক্ষকের মৃত্যুতে সেসময় ধ্রুপদগানের চর্চা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বাংলাদেশে।

রাধিকাপ্রসাদ তারপর আরো ৭ বছর জীবিত ছিলেন। মহীন্দ্রনাথের মৃত্যু ঘটলে তাঁর বেশির ভাগ শিষ্যই রাধিকাপ্রসাদের শিষ্য হন—যথা, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এবং ললিতচন্দ্রও। পরবর্তীকালে তাঁরা সকলেই রাধিকা-প্রসাদের শিষ্যরূপে সঙ্গীতসমাজে পরিগণিত হয়েছিলেন।

ললিতচন্দ্র কলকাতা বেতারকেন্দ্রেও ধ্রুপদ গানের অনুষ্ঠান করতেন। পিতার মতন তিনিও একান্তভাবেই ধ্রুপদ-রীতির সাধনাতেই মগ্ন থাকেন। বাংলাদেশে ধ্রুপদসঙ্গীতের ঐতিহ্য বহনকারী শেষ যুগের ধারক তাঁরা।

দুঃখের বিষয় ১৯৪৪ খৃঃ ললিতচন্দ্রও পিতার মতন ৪৬ বছর বয়সেই পরলোকগত হন।

যেমন মহীন্দ্রনাথের তেমনি ললিতচন্দ্রেরও সঙ্গীতকণ্ঠ গ্রামোফোন রেকর্ডে রক্ষিত হয়নি। তবে ললিতচন্দ্রের টেপ-রেকর্ড কলকাতা বেতার কেন্দ্রে গৃহীত হয়েছিল বলে কথিত আছে।

১। এসরাজ তরঙ্গ, পৃঃ ৩৬—
রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। সঙ্গীতের আসরে পৃঃ ১৬৯-১৭২—
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

মাষ্টারমশাই ৺রমেন্দ্রনাথ

নীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রোত্তর যুগে ভারতীয় ললিতকলা-ক্ষেত্রে ৺ আচার্য্য নন্দলালকে বাদ দিয়ে প্রথমেই যার নাম 'স্মরণীয়' তিনি নন্দলাল ছাত্র-শিষ্য ৺ শিল্পী রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী।

উনিশ শ' পঞ্চান্ন-ছাপ্পান্ন সালের মাঝামাঝি রমেন্দ্র-নাথের হঠাৎ লোকান্তর ঘটে। আশ্চর্য, বিগত দশসালের মধ্যে এই বরেণ্য শিল্পীর কর্মজীবনের তেমন বিস্তৃত পর্য্যা-লোচনা বা তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থা হয়নি।

অবশ্য, চিত্রশিল্পীরা সর্ব্ব দেশ ও দশের কাছে চিরদিনই অবহেলিত। ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর যদিও-গুণী জ্ঞানীদের প্রতি সরকারী সুদৃষ্টি পড়েছে এবং একদিন হয়তো সরকারীভাবে রমেন্দ্রনাথের স্বর্গত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি-তর্পণ ব্যবস্থাও ঘটবে, কিন্তু এক-দিন রমেন্দ্রনাথকে যারা বিশেষভাবে জেনেছেন বা তাঁর বহুবিধ কার্যের প্রশংসা করেছেন, তাঁদেরও কি এত-দিনের মধ্যে রমেন্দ্রনাথের শিল্পকার্যের আলোচনা বা তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোন ব্যবস্থার কথা মনেও হয়নি?···

আমি তাঁর অনুরাগী ছাত্র-শিষ্য।

বর্তমান নিবন্ধে তাঁর স্মরণে কিছু পুষ্পাঞ্জলি দেবার চেষ্টা করলেও তাঁর শিল্পকার্যের সমালোচনা আমি করব না (অন্যত্র পরে হয়তো করতে পারি) করব শুধু মানুষ রমেন্দ্রনাথকে বিচার।

এ ক্ষেত্রে মালা গাঁথতে যদি অজান্তে ফুলকীট ঢুকে যায় ত সে ত্রুটি মার্জ্জনীয়।·········

'মাস্টারমশাই'

মাষ্টারমশাইয়ের (রমেন্দ্রনাথ) সঙ্গে পরিচয় ঘটে আমার উনিশ শ' পঁয়ত্রিশে। তখন গভর্ণমেণ্ট কলেজ অব আর্টস্ এণ্ড ক্র্যাফ্টস্ নয়—স্কুল অব আর্টস্। প্রিন্সিপ্যাল, মুকুলচন্দ্র দে মহাশয়। স্কুল যখন, তখন হেডমাষ্টার একজন চাই। এই হেডমাষ্টারের পোষ্টেই ছিলেন মাষ্টারমশাই রমেন্দ্রনাথ।

এ্যাডমিশান নিয়েছিলাম 'ইণ্ডিয়ান পেন্টিঙ সেক্‌শনে'। ক্লাশ-শিক্ষক শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়। পূর্বে 'ইণ্ডিয়ান পেন্টিঙ সেক্‌শনে'র শিক্ষকতার ভার ছিল৺ঈশ্বরীপ্রসাদের। ঈশ্বরীপ্রসাদ শুধু'মিনিয়েচার পেন্টার' ছিলেন, কিন্তু ৺নন্দলাল ছাত্র-শিষ্য সত্যেন্দ্রনাথ এসে 'ইণ্ডিয়ান পেন্টিঙ সেকশনে'র আমূল পরিবর্তন-সাধন করলেন। অবশ্য, নেপথ্যে রইলেন দুই কর্ণধার—মুকুলচন্দ্র দে মহাশয় ও মাষ্টারমশাই রমেন্দ্রনাথ।

আমূল পরিবর্তনের অর্থ, চিত্রাংশ পদ্ধতির ধারা-বাহিকতা প্রচলন।

অর্থাৎ আউটডোর স্কেচিঙ, ইনডোর ষ্টীল এণ্ড ফিগার ষ্টাডি, বর্ণপ্রয়োগের রীতি-কৌশল, 'কম্পোজিশন' প্রস্তুত, 'ওয়াশ সিষ্টেম' এবং টেম্পারা'।

সপ্তাহের প্রায় দিনেই ক্লাশে আসতেন মাষ্টারমশাই। আর এসেই কোন ছাত্রের পাশে বসে পড়ে ড্রয়িং বা কম্পোজিশনে হাত লাগাতেন। কোন কোন দিন ঘণ্টার উপর বসে চিত্রের সংশোধন করতেন। কিন্তু একটা জিনিষ তিনি করতেন না, সেটি হচ্ছে, ছাত্রের কম্পোজি-শানের মৌলিকতাকে নষ্ট করা বা খর্ব করা। কম্পো-জিশান যেখানে দুর্বল বোধ করতেন, শুধু সেখানেই কোথাও ঘসে, কোথাও বা আঁচড় লাগিয়ে দিতেন মাত্র। মৌলিকতা গেলে ছবির বিশেষত্ব রইলো কি?—উনি বলতেন।......

পুরা পাঁচটি বছর ওর সান্নিধ্য লাভ করেছি। ছবি আঁকা শেখার জীবনে এই পাঁচবছর কিছু নয়। শুধু প্রয়োগ-রীতিবোধ জানা মাত্র। পরের অনাগত পথ আরো জটিল আরো দুর্গম।

মাষ্টারমশাই শুধু বলতেন: স্কেচ্ করে যাও, ড্রয়িং জানো। তবেই সব জটিলতার অবসান ঘটবে, বুঝলে? কথাটা যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, পরে বুঝতে পেরেছি। তাই, ওঁর কথায় বিশ্বাস রেখে একটি স্কেচিং-বুক প্রায় সর্বক্ষণের জন্যে কাছে রেখেছি, আর প্রত্যক্ষ দৃষ্টির সামনে যা পেয়েছি, তাকেই মুহূর্তে পেন্সিলের আঁচড়ে তুলে নিয়েছি। 'যত স্কেচ্, হাত তত চালু',—মানে যাকে বলে 'ফ্রি-হ্যাণ্ড'। মাষ্টার মশাই নিজেও ছিলেন এই পথের পথিক।

উনিশ শ' চল্লিশ সালে স্কুলের সার্টিফিকেট লাভের পর পুরো তিনটি বছর মহানগরীতে থেকে নিজের শিল্পী-জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছি। এই তিন বছর মাষ্টারমশাইয়ের ব্যক্তিগত জীবনের সংস্পর্শে আসতে পেরেছি আরো ঘনিষ্ঠভাবে।

উনি তখন ডোভার লেনের পাঁচ নম্বর বাড়ীতে। যখনই ওঁর বাড়ী গিয়েছি, দেখি উনি ঘরে নেই, আউটডোর স্কেচিংয়ে বেরিয়েছেন। কখনো বা দেখি, ক্যানভাসের সামনে তুলি হাতে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে মিষ্টি হেসে ওঁর আঁকা ছবির ভাল মন্দের মতামত জিজ্ঞেস করতেন আমাকে। জবাব ঠিক দিতে পারতুম না; কারণ, অভিজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টি আমার তখন হয়নি।

তবে মাষ্টারমশাইয়ের আঁকা ছবির কম্পোজিশান, বর্ণবিন্যাস একান্তভাবেই ছিল ভারতীয়। একটা স্নিগ্ধ মধুর পরিবেশের স্পর্শ লেগে থাকতো সব ছবিতেই। অকারণ বর্ণোচ্ছাসের সমারোহ দেখিনি কোথাও।

মনে আছে, মাষ্টামশাই তখন হিমালয়ের কিছু নৈসর্গিক দৃশ্য এঁকেছিলেন তেলরঙে। এই আঁকার ভেতর যে স্নিগ্ধতার সুর ছড়িয়ে ছিল, নদীমাতৃক গ্রাম-বাংলাকে কেন্দ্র করে বিস্তৃত যে জীবন-চিত্র উনি এঁকেছিলেন, সেখানেও দেখেছি সেই মধুরতার আবেদন।

মাষ্টারমশাই ছবি আঁকতেন বিভিন্ন মিডিয়ামে। তেলরঙ জলরঙ ছাড়াও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন 'উডকাট' লিনোকাটে।' উডকাট তিনি তিনচারটি রঙ নিয়ে নিরীক্ষা পরীক্ষা করেছেন। শিখেছিলেন অবশ্য শান্তি-নিকেতনের কলাভবনের ছাত্র থাকতেই।

(এ' বিষয়ে বর্তমানে কলাভবনের বিশ্বরূপ বসু (৺নন্দলালের ছেলে) সমগ্র বাংলা তথা ভারতে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারেন: জাপানে কিছুদিন থেকে তিনি এই বিশেষ শৈলী শিখে এসেছিলেন।) মাষ্টার-

মশাই লিখোও করেছেন প্রচুর। অনেক পরে শিখে-ছিলেন এচিঙ' ও ড্রাই পয়েন্ট এচিঙ।

এইসময় একটি উপকার করেছিলেন মাষ্টারমশাই।

পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন পুলিনবিহারী সেনের সঙ্গে। পুলিনবাবু ছিলেন মাষ্টারমশাইয়ের শান্তিনিকেতন-সতীর্থ উনি তখন প্রবাসী মডার্ণ রিভিয়ুর সহকারী সম্পাদক। পুলিনবাবুর সঙ্গে পরিচয় ঘটতে পরপর কিছু ছবি আমার প্রবাসী মডার্ণরিভিয়ুতে প্রকাশিত হতে পেরেছে।...

মহানগরী কলিকাতা ত্যাগ করে কিছুকালের জন্য বোম্বাই প্রবাসী হতে হয় আমাকে। ফিরে যাই আবার ছে-চেল্লিশ সাতচল্লিশের মাঝামাঝি।

মাষ্টারমশাই তখন কলকাতায় নেই। দিল্লী পলি-টেকনিকের প্রিন্সিপল হয়ে গিয়েছেন। সেই সময় আমাকে অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। নিদারুণ অর্থকষ্ট ঘটে। সুকবি নরেনদার (দেব) সঙ্গে এই সময় হঠাৎ পরিচয় ঘটতে তাঁরই কথায় গুরুদাস পাব-লিকেশনের কিছু কাজ আমার হাতে আসে। গুরুদাসের স্বত্বাধিকারী ৺হরিদাস চট্টোপাধ্যায় তখন বালিগঞ্জ রাসবিহারী এ্যাভিনিয়ু-র বাড়ীতে। আমাকে যেতে হোতো তাঁর কাছে।

কয়েকমাস ধর্মতলার ইণ্ডিয়ান আর্টস্কুলেও শিক্ষকতা জুটেছিল। কিন্তু স্কুলের আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল ছিল না। আর ডিসিপ্লিন ও ছিল না কিছু। কাজেই, অল্পকালেই স্কুলের সংশ্রব কাট্‌লো।

স্বাধীনতা লাভের কয়েকদিন আগে একটা ইণ্টার-ভিয়ু-র 'কল' পেলাম দিল্লী থেকে। মিনিষ্ট্রী অব ইন্‌ফর-মেশান ও ব্রডকাষ্টিঙ পরিচালিত কোন এক পত্রিকার জন্যে দু'জন আর্টিষ্ট নেয়া হবে।

সেবার আমার প্রথম দিল্লী যাওয়া। কয়েকজন পরিচিত আর্টিষ্ট বন্ধু ছিলেন এই ভরসা। আর ছিলেন মাস্টারমশাই। কিন্তু কারো ঠিকানাই জানা ছিল না,-শুধু নাম জানা ছিল, দিল্লী পলিটেক্‌নিক স্কুল—কাশ্মিরী গেট্‌।'

দিল্লী পৌঁছেই কিন্তু বিপদে পড়েছিলাম। ট্রেন থেকে নামতেই খোয়া গিয়েছিল স্যুটকেশটি। সঙ্গী 'হিসাবে যে বাঙালী পরিবারটি ছিলেন, তাদের সঙ্গে গেলাম পাহাড়-গঞ্জের বাসায়। রাত কাটিয়েসকালে এলাম কাশ্মীর গেটে -পলি টেকনিকে।

কিন্তু খেয়াল ছিল না,-সেদিন হোলো রবিবার। ছুটির দিন।

সম্পূর্ণ আপরিচিত যায়গা : বিপদ গণ্‌লুম।

হঠাৎ বরাৎক্রমে একজন বাঙালী পুজারী ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। উনি জানালেন যে, রমেন্দ্র চক্রবর্তীকে চেনেন।

ওঁরই সঙ্গে গেলুম মাষ্টারমশাইয়ের দরিয়াগঞ্জের বাসায়।

গিয়ে দেখি, মাষ্টারমশাই অসুস্থ।

আমাকে দেখে কিন্তু খুসীই হলেন।

অবস্থার কথা জানাতে তিনি কিছু ভাবিত হলেন। শেষে বললেন, ঠিক আছে, তুমি কমল সেন ও রতন-ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করো, ওরা সব বন্দোবস্ত করে দেবে।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেখানেই হোলো।

ফিরোজ শা' কোট্‌লায় কমল সেন ও রতন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হোলো সেদিন বিকালে। ওরা দলবেঁধে পিকনিকে এসেছে।

পুষাতে রতনঠাকুরের বাসাতে রইলুম কয়েকদিন।

পার্লামেণ্ট হাউসে গিয়ে যথারীতি ইণ্টারভিউ দিয়ে এলাম একদিন। দিলাম সত্যি, কিন্তু বুঝতে পেরেছিলাম, এ' নিরর্থক। আমার এখানে হবে না।

লাভের মধ্যে মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা আর দিল্লীদর্শন।

আর জানতে পারলাম, অল্প কয়েকদিনের মধ্যে মাষ্টারমশাই দিল্লী শিল্পীমহলে প্রচুর সুনাম অর্জন করেছেন। কিন্তু মাষ্টারমশাই আমাকে, জানালেন যে, তিনি দিল্লী প্রবাসী হ'য়ে মোটেও সুখী নন্‌। বাংলা-দেশেই ফিরে যেতে ওঁর বাসনা। এখানে ছবি-আঁকার সুযোগ সুবিধাই পাচ্ছেন না নাকি কাজের চাপে।...

ফিরে এলাম কলকাতায়।…

উনিশশ' আটচল্লিশে উত্তরবঙ্গের কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা নিয়ে চলে যাই। কিছুদিন বাদে জানতে পারি, মাষ্টারমশাই দিল্লীর চাকুরিতে ইস্তোফা দিয়ে কলকাতায় ফিরে এসেছেন। তাহলে কথা রক্ষা করেছেন।

বছর দু'বাদে উত্তরবঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গের বার্নপুর চলে আসি শিক্ষকতা নিয়ে।

এখানে আসার পরই জানতে পারি, গভর্ণমেণ্ট স্কুল অব আর্টসের নাম পরিবর্তিত হয়ে হয়েছে গভর্ণমেণ্ট কলেজ অব আর্টস্ এণ্ড ক্রাফটস—মাষ্টারমশাই যার প্রিন্সিপ্যাল।

শুনে বড়ো আনন্দ হলো।

কলেজ হোলো শুধু মাষ্টারমশাইয়ের প্রচেষ্টার ফলে।

দেখা করতে গিয়ে দেখ্‌লুম, 'মাষ্টারমশাই' নূতন এ্যাড্‌মিনিস্ট্রেশান নিয়ে খুব বিব্রত। নূতন-নূতন পদ সৃষ্টি হয়েছে। অল্পকাল পরেই সেসব পদের জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপিত হবে।

ব্যস্ততার মধ্যে দেখ্‌লুম, মাষ্টারমশাইয়ের হাতের নূতন কাজ,—নূতন 'কম্পোজিশান।'

ইতিমধ্যে মাষ্টারমশাইয়ের দু'বার পশ্চিমযাত্রা ঘটে গেছে।

প্রথমবার গিয়ে তেলরঙের অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিলেন, আর দ্বিতীয়বার এলেন 'এচিঙ্' বা 'ড্রাই পয়েণ্ট এচিঙ্' শিখে।

এবার ওদেশের কিছু কাজকর্ম দেখালেন আমাকে। বেশীরভাগই তেলরঙে আঁকা। কিন্তু আশ্চর্য, কোথাও পাশ্চাত্যের প্রগলভ বর্ণবিন্যাসের ছাপ পড়েনি। তেমনি মিষ্টি-কোমল রঙের আশ্চর্য স্পর্শ!…

Longmans Green & Co, Ltd কর্তৃক প্রকাশিত একটি চিত্রের বই দিলেন উনি আমাকে। বইটির নাম Sketches of Europe before the War,—যার সমস্ত Sketch-ই মাষ্টারমশাইয়ের আঁকা। এই সময় পোষ্টকার্ডের উপর নিজের আঁকা একটি ছবিও দিয়েছিলেন আমাকে। এ'দুটি জিনিষ অক্ষয়স্মৃতি হিসেবে রয়েছে আমার কাছে। মনে আছে, এইসময় বর্ত্তমান যুগের Contemporary Art সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলাম মাষ্টারমশাইকে।

জবাবে খুব বেশী কিছু বলেননি মাষ্টারমশাই।

শুধু বলেছিলেন সময়ের নিয়মেই সব কিছু নিয়ন্ত্রিত হয়। গতানুগতিক রুচির পরিবর্তনের জন্যেও এমনি হ'তে পারে। তবে সবই contemporary,…নানাছন্দে রঙতুলির খেলামাত্র। বস্তুতঃ, একটা কথা জেনে রেখো যে, কোনো ক্লাসিক শিল্পের মৃত্যু নেই; আমি নিজেও তাতে বিশ্বাসী। যাই কিছু করো, একদিন ক্লাসিকেই ফিরে আস্‌তে হবে।

মনে হয়, মাষ্টারমশাই আমৃত্যু এ'আদর্শেই বিশ্বাসী ছিলেন।

কলেজ সৃষ্টিতে যেসব পদের সৃষ্টি হ'য়েছিল, তারজন্যে Interview-'কল' পেয়েছিলাম। Interview হ'য়েছিল রাইটার্স বিল্ডিঙে। অনেক পরিচিত শিল্পীবন্ধুর দেখা পেয়েছিলাম সেদিন।

না, Interview-এ কৃতকার্য হ'তে পারিনি। তবে তার জন্যে আফ্‌সোশের কিছু ছিল না।

তারপর বছর তিনেক আর মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ঘটেনি।

কারণ; উনিশ'শ' তেপ্পান্নশালে আমাকে বোম্বাই প্রবাসী হ'তে হয় আবার।

ঋতুপর্যায়ে কালের রথচক্র আবর্তিত হয়। বছর ঘুরে আসে। প্রবাসী-জীবনে আসে স্থিতিশীলতা।

একদিন বোম্বাইপ্রবাসী চিত্রশিল্পী জ্যোতিরিন্দ্র রায় আমাকে অফিসের ফোনে জানালেন: কী সরকারী কাজে রমেন্দ্রচক্রবর্তী বোম্বাই আস্‌ছেন; যদি দেখা করার প্রয়োজন বোধ হয়তো ভি, টি, ষ্টেশনে যেয়ে দেখা করতে পারি!

মাষ্টারমশাই আস্‌ছেন। খুশীর আবেগে চঞ্চল হয়ে উঠ্‌লুম।

শুধু জিজ্ঞেস করলুম, কবে কখন আসছেন মাষ্টারমশাই ?

দিনক্ষণ জানিয়ে দিলেন জ্যোতিরিন্দ্র রায়।

ভি,টি, না গিয়ে যথাসময়ে আমি গেলুম দাদার ষ্টেসনে মাষ্টারমশাইয়ের সম্বর্ধনে। সেদিন ঘণ্টাখানেক লেট ছিল গাড়ী।

গাড়ী পৌঁছতে ছুটে গেলুম ফার্ষ্টক্লাশ কম্পার্টমেণ্টের দিকে।

দেখলুম দরজার মুখে দাঁড়িয়ে মাষ্টারমশাইয়ের এক-মাত্র ছেলে। আমাকে দেখে ও বললো: আপনি উঠে আসুন···বাবার শরীর ভাল নেই।

খুসিতে একরূপ লাফিয়েই উঠলুম কম্পার্টমেণ্টে। দেখলুম, নির্জ্জীবের মত বসে আছেন মাষ্টারমশাই। আমাকে দেখে চিরাচরিত হাসি হেসে বললেন: এসো নীহার,···ভালো আছ ত ?

প্রত্যুত্তরে ওঁর পা ছুঁয়ে প্রনাম করলুম আমি।

মাষ্টারমশাই বললেন: বেশ কিছুদিন ভুগে উঠলুম। এখনো বেশ দুর্বল। সরকারী দরকার বলেই আসতে হোলো। জ্যোতিরিন্দ্রের সঙ্গে দেখা হয়ত ?।

হঁা।

গাড়ীর সময় পাঁচমিনিট। মনে হোলো এক নিঃশ্বাসে ফুরিয়ে গেল।

সিটি বাজতে গাড়ী থেকে নেমে পড়লুম।

পেছন থোক মষ্টারমশাই ডেকে বললেন, দু'দিন আছি। সময় পাও ত আবার দেখা করো।

না, দেখা করা আর হয়নি। আর হোলো-ও না। সেইখানেই ইতি।

অথচ তখন কি বুঝতে পেরেছিলাম, মাষ্টারমশাইয়ের সঙ্গে এই দেখা শেষ দেখা হবে।

বোম্বে থেকে ফেরার মাত্র কয়েকমাসই জীবিত ছিলেন মাষ্টারমশাই।

যে শিল্পবিদ্যানিকেতনকে এত ভালোবাসতেন উনি, সেইখানেই ওঁর শেষ নিঃশ্বাস পড়েছে।···

আজ বাংলা তথা ভারতবর্ষে মাষ্টারমশাইয়ের ছাত্রের হয়তো অভাব নেই। হয়তো এমন অনেকেও আছেন যাঁরা আমার চেয়েও বেশী ঘনিষ্ঠতর হয়ে মিশে-ছিলেন মাষ্টারমশাইয়ের জীবনে। হয়তো তাঁদের অভিজ্ঞতা আমার চেয়েও বেশী।

তবু ব্যক্তিগতভাবে যেটুকু আমি জেনেছি মাষ্টার-মশাইকে, তাতে নিঃসন্দেহে এটুকু বলতে পারি যে, কর্মীশিল্পী হিসাবে মাষ্টারমশাইয়ের তুলনা নেই। সময় এবং নিজের পারিপার্শ্বিকতাকে তিনি ছবি-আঁকার আনন্দে ভরিয়ে রেখেছিলেন। সময়ের এতটুকু অপব্যবহার করেননি কখনো।···

———

ইন্দোর

রামপদ মুখোপাধ্যায়

উজ্জয়িনী থেকে ইন্দোর মাত্র ৩৫ মাইল। ট্রেনে আড়াই ঘণ্টার পথ। ছোট বড় দুরকম রেল ছাড়া বাসেও যাওয়া যায়। একেবারে শহরের গায়ে লাগানো রেল ও বাস ষ্টেশন। প্রথম দর্শনেই চমৎকার একটি সেতু-পথ দৃষ্টি আকর্ষণ করে—আর ষ্টেশনের কাছেই নিত্য নূতন গজিয়ে উঠা হোটেল, রেস্তোরাঁ। খানাপিনার অস্থায়ী ষ্টল, ফল ফুলুরীর দোকান। যানবাহনেও আদি ও আধুনিক কালের সংমিশ্রণ। বেশ জমজমাট শহর। অথচ এই শহরের ভাগ্যে রাজধানী তিলক এঁকে দেয়নি মধ্যপ্রদেশ।

ভারত ইতিহাসের অনেকখানি পাতা জুড়েই রয়েছে ইন্দোরের অস্তিত্ব। খ্যাতি-অখ্যাতির নানা উপকরণে সেই লেখাগুলি কখনো উজ্জ্বল কখনো বা মসী-ম্লান। ভারতবর্ষের নানা তীর্থভূমিতে ইন্দোরের গৌরব পরিয়ে দিয়েছেন রাণী অহল্যাবাঈ—আবার আধুনিক কালেও বাঙলা হওয়ার নেপথ্য নায়ক হোলকার কুলতিলকও রূপজীবিনী মমতাজকে নিয়ে রোমান্স-রহস্যের কৌতূহল জমিয়েছেন। এই সব কীর্ত্তি-অকীর্তি মণ্ডিত কাহিনীর সঙ্গে সকলেই অল্পবিস্তার পরিচিত। এই সহরের পথে ঘাটে পার্কে, প্রাসাদে—মন্দিরে শিক্ষায়তনে রাজবংশের রুচি-সংস্কৃতির ছাপটি ফুটে উঠেছে—আবার আধুনিক যুগের উপসর্গও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এখানে কলেজ ও ইস্কুল মিলিয়ে ছোট বড় মাঝারি বহু বিদ্যায়তন আছে—আছে বিশ্ববিদ্যালয়। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, মেডিকেল কলেজ, আইন, কলা, সঙ্গীত, কৃষি-কোন্ শিক্ষালয়টি নাই? এ ছাড়া আছে আকাশবাণীর অফিস। রবী ভদ্রবন, গান্ধী ভবন, একক্রুড়ির কাছাকাছি সিনেমা হাউস। কাপড়ের কলের জন্যও ইন্দোরের খ্যাতি আছে।

ষ্টেশন থেকে বার হয়ে প্রথমেই শ্রুতিকে স্পর্শ করল স্বরবর্দ্ধক যন্ত্রের সঙ্গীত শাসন বাণী; ষ্টেশনের বিপরীত দিকে যশোবন্ত রোডের একটি চিত্রগৃহে একটি নূতন চিত্র উদ্বোধনীর ঘোষনা—আর একটু এগিয়ে এসে সামনে পড়ল হাতা ঘেরা—সুবিন্যস্ত-সুসজ্জিত একটি শিক্ষাভবন—ক্রিশ্চিয়ান কলেজ। বহুদূর বিস্তৃত এর প্রাঙ্গণ—পরিপাটিভাবে সাজানো। এই কলেজ-প্রাঙ্গণে একটি টাওয়ার ক্লক রয়েছে—সেটা সব সময়েই অর্দ্ধঘণ্টার ঘোষণা করছে। আমাদের জৈন-নিবাসের বিশ্রামকক্ষের একেবারে মুখোমুখি ওই ঘড়ি-ঘড়টা; একটি মাত্র ধাতব আওয়াজ তুলে—প্রতি আধ ঘণ্টা অন্তর বেজেই চলেছে।......ঘড়িটা যেন একটি মাত্র কথাই ওর বলার আছে—সময় নাই, সময় নাই। শহরের পানে চাইলে ওই সাবধান-বাণীর মর্ম্মটি হৃদয়ঙ্গম করতে বিলম্ব হয় না। পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ যেখানে বাস করে—শতাধিক ইস্কুল কলেজ আর আট দশটি বড় কল ও কারখানা যেখানে চলছে—মধ্যপ্রদেশের মধ্যমণি সেই শহর যে গতির বেগে কালের তালে পা ফেলে ছুটবে সে আর আশ্চর্য্য কি। ভূপালে এই স্রোত মন্দিভূত—উজ্জয়িনী অপেক্ষাকৃত চঞ্চল - ইন্দোরে এসে কলকাতা দিল্লী না হোক—অন্তত উত্তর প্রদেশের কোন কোন দ্রুত চলমান প্রতিচ্ছবি দেখতে পেলাম। ভাল লাগল কি ভাল লাগল না—প্রশ্ন তা নয়, ইতিহাস পড়া মানুষের কাছে অন্তত মনে হবে প্রাণবন্ত শহরের এইটিই যোগ্য রূপ। এই জনস্রোত কোলাহল—বাহুমুখীন কর্ম্মপ্রচেষ্টা শহর শরীর রচনায় যথাযোগ্য উপাদান।

আমরা যে জৈন-বিশ্রামাগারটিতে আশ্রয় পেয়েছিলাম—সেটি এখানকার এক নামী পুরুষের স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত। দানবীর শেঠ হুকুমচাঁদের নাম জানে না এমন লোক

ইন্দোরে নাই—মধ্যপ্রদেশেও কম আছেন। এখানে একটি প্রশস্ত রাজপথও এঁর নামের চিহ্নে চিহ্নিত। তার মূল একটি সৌধ রংমহল এবং একটি ঝিলের খ্যাতি। ইনি স্মৃতিপথারূঢ়। কিন্তু সেসব তো কালের তরঙ্গে সদা দোদুল্যমান, এক সময়ে না এক সময়ে মুছেই যাবে—যা মুছেও মুছেনা এমনি একটা লেখ ইনি মানুষের মনে রেখে দিয়েছেন, নিকট ও দূর কালের মানুষেরা সেই মহিমাকে পুলক রোমাঞ্চে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে কখনো না কখনো বরণ করেই থাকে। পরদুঃখে কাতর সমবেদনাতুর একটি বৈষ্ণবমন তাঁর ছিল—যাকে কবিতার আখরে টানা যায়।

বৈষ্ণবজন তো তেনে কহই—যো পীত পরাই জানেরে। এখানে এসে সকলের মুখে এই নামটি শুনতে পেলাম। বিশ্রামশালার প্রশস্ত অঙ্গনে—একটি জৈন মন্দির, একটি বিদ্যায়তন, একটি হোটেল আর অনেকগুলি বিশ্রামঘর তাঁর স্মৃতিকে নিত্য শ্রদ্ধান্বিত করছে। অথচ বীর্য্যবান হোলকার রাজবংশের গৌরব এখন পরিম্লান। শহরের মাঝখানে সাততলা পুরাতন রাজপ্রাসাদটি দর্শকচিত্তকে আকৃষ্ট করে বিস্ময়ান্বিত করছে বিরাট এর আকৃতি। কিন্তু অতীত গৌরবের কোন চিহ্নই এই অঙ্গলাবণ্যে খুঁজে পাওয়া যায় না। সরকারী দপ্তরের নীরস নিয়মবিগাঢ় আষ্টেপৃষ্ঠে এটি বাঁধা পড়েছে। রাজারা নতুন লালবাগ ও মাণিকবাগ প্রাসাদে স্থান নিয়েছেন—আধুনিক কালের বাস্তুকৃতিতে এই দুটি প্রাসাদ আর পাঁচটি প্রাসাদোপম অট্টালিকার সমগোত্রজ। এর চেয়ে শেঠহুকুমচাঁদের কাচ-মন্দিরটি ভাল লাগে। আর ঘন্টাঘর সমেত ওঁর ইন্দ্রভবন প্রাসাদটি। হোলকার কলেজে যাবার রাস্তায় নৌলেখা উদ্যানটি দ্রষ্টব্যের তালিকায় থাকলেও হাল আমলের নেহেরু উদ্যানটি ইন্দোরের নন্দন কানন বললেও অত্যুক্তি হয় না। কেয়ারী করা মরসুম্য ফুলের লন—গোলাপ বাগিচা, সাঁতার-সেতু, বালি উদ্যান, মেহেদি বেড়ার হাতি উট-পাখী আরামকেদারা ইত্যাদির রূপসজ্জা বোম্বাইয়ের কমলা নেহেরু পার্ক অর্থাৎ ঝুলন্ত উদ্যানের কথা মনে করায়। এ উদ্যানের চারধারে সমুদ্রের বেড়া নাই কিন্তু শহরের একান্তে চমৎকার একটুকরো নিভৃতি একে ঘিরে আছে। মধ্যাহ্নবেলাকার নির্জ্জন পরিবেশে এ যেন ইন্দোরের নতুন ইতিহাসের পাতাগুলি সন্তর্পণে জুড়ে দিচ্ছে। নেহেরু-স্মৃতি আজকাল যে কোন শহরেরই একটা ফ্যাসন হয়ে দাঁড়িয়েছে—ভূপালের উজ্জয়িনীতে, উদয়পুরে মাউণ্ট আবুতে আমাদের ভ্রমণ-তালিকাভুক্ত প্রায় সব কয়টি শহরেই এর চিহ্ন দেখেছি। এক সময়ে পরাধীন ভারতবর্ষের বড় বড় শহর সম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিভারে ভাবগ্রস্ত হয়েছিল—তার হীরক জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে। সে ছিল বিদেশী রাজার শাসন শৌর্যের আনন্দ প্রতীক—আমাদের কাছে দুঃখস্মৃতির নামান্তর। জহর-স্মৃতির অন্তরালে বিয়োগ-বেদনার নিঃশব্দ স্রোতধারা প্রবাহিত অথচ শোকের শুচিতার সঙ্গে একটি মহৎ জীবনের কীর্তিকথাই বিঘোষণের আয়োজন। এর মধ্যেও বিয়োগ-বেদনার দুঃখ অপর্য্যাপ্ত—কিন্তু সেই সঙ্গে গৌরব আনন্দের অংশত অপ রঙ্গিত।

এর পূর্বে তৈরী হয়েছিল গান্ধী-স্মারক সৌধ। ভারতবর্ষের প্রায় প্রতিটি শহরে নগরে স্বাধীন ভারতের মুক্তি সন্ধানী দলে এই নামটি সর্ব্বাগ্রগামীদের সারিতে রয়েছে। জাতির জনক কথাটি অত্যুক্তি কিনা এ গবেষণার ভার ঐতিহাসিকের থাকুক, আমাদের জীবৎকালে তাঁর নেতৃত্ব যে আমাদের জাড্যভার অপনোদন করে সংগ্রামী মনোভাব গড়ে তুলেছিল, এ কথা আমরা নিঃসন্দেহে স্বীকার করি। অহিংস সংগ্রামের মহত্তর রূপটি এবং পাবনী অগ্নিশিখার অথবা দুর্ব্বার নদী-স্রোতের অপ্রতিরোধ্য শক্তিকে তিনি যে আমাদের মধ্যে সঞ্চারিত করে স্বাধীনতার লক্ষে সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন—সে কথা কে অস্বীকার করবে। তাঁর স্মৃতিচিহ্ন পথে হোক, সৌধ হোক, সেবায়তনে হোক, মূর্তিতে হোক যে কোন শহরের ললাটেই উপযুক্ত গৌরব তিলকের মত। ইন্দোরের গান্ধী হলে—নগরের বহু সাংস্কৃতিক সভার আয়োজন হয়ে থাকে, বহু মানবহিতকামী প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাদিবস উদ্‌যাপিত হয়। তবে এক কালে যতটা নিষ্ঠা ও শ্রমের স্থায়ী

এই সৌধের চারিধারে উদ্যান রচনা করা হয়েছিল—অধুনা যেন তা বহুল পরিমাণে শিথিল হয়েছে। এই উদ্যম নিষ্ঠা এখন নবতর ক্ষেত্রে প্রবাহিত। আমাদের স্মৃতি পূজার মর্ম্মমূলে ভাবপ্রবণতার আধিক্যই কি এই পরিণাম নিরাশের হেতু।

ইন্দোর যে গতাগতির স্রোতধারায় সর্ব্বদা উন্মুখ রয়েছে সে তার পরিবহন ব্যবস্থায় উত্তমরূপে বিজ্ঞাপিত। ইন্দোর থেকে বোম্বাই যাবার বায়ু পথটি প্রতিদিনই সচল-রেলপথের কথা আগেই বলেছি। পরিবহন ব্যবস্থায়—বাসে করে আমেদাবাদ, ভূপাল, বিদিশা, গোয়ালিয়র চম্বল ধারাবতী, মাণ্ডু, খাণ্ডোয়া, বুরহানপুর, মহেশ্বর কোথায় না যাওয়া সম্ভব! বিখ্যাত বাগগুহা যাওয়ার সুব্যবস্থা ইন্দোর থেকে করে নেওয়াই সুযুক্ত।

আর এক অর্থে ইন্দোর যে চলমান শহর সেটি আমাদের জওবারি বাগের বিশ্রামগৃহ থেকে দেখা গেল। এই সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্ব রাজ্যে যে আন্দোলনটি অতিশয় প্রবল হয়ে উঠছে—সেই ছাত্র-আন্দোলনের বেগধারাটি এখানে লক্ষ করা গেল। কি অশান্ত উদ্দাম তার রূপ! সব কিছুকে বিশৃঙ্খল বিপর্য্যস্ত করার অস্থিরতা তার মধ্যে প্রকট। একটি নিয়ম নীতিকে (!) স্থিত করার আবেগে—অনেককালের স্মৃতিসঞ্চিত শ্রদ্ধাঞ্জলিকে শিথিল করার প্রয়াস। উদ্দাম আবেগ একদিন প্রশমিত হবেই, কিন্তু শ্রদ্ধা স্মৃতির চূর্ণ বিচূর্ণ পাত্রটিকে আর পূর্ণ করা চলবে কি? ক্রীশ্চান কলেজের গেটে তার উদ্দাম রূপ দেখলাম—পুলিশী তাণ্ডবও কিছু লক্ষ করা গেল। এখানেও দিনকয়েক আগে নাকি সান্ধ্য-আইন জারি হয়েছিল ২৪ ঘণ্টার জন্য এখনও ১৪৪ ধারার জের মেটেনি। যাত্রার প্রথমপাদে জব্বলপুর স্টেশন-সীমায় কয়েক ঘণ্টা ট্রেন লেটের মাধ্যমে ঝড়ের সঙ্কেত পাওয়া গিয়েছিল। ভূপালে ইন্দোরে উজ্জয়িনীতে আন্দোলনের কয়েকটি ঢেউ যে বয়ে গেছে—এবং আরও কয়েকটি ঢেউ আসতে পারে এই সম্ভাবনা লোকের মুখে-মুখে ফিরছে—এবং এই স্রোত নাকি আসন্ন নির্ব্বাচন-পর্ব্ব শেষ না হওয়া পর্যান্ত প্রবাহিত হতে থাকবেই কিন্তু সারা ভারতরাজ্যব্যাপী কেন এই আন্দোলন? এ কি বিশুদ্ধ রাজনীতি মণ্ডিত বস্তু? নিখিল ভারতব্যাপী কোন সংগঠনী শক্তির ক্রিয়া এ তো নয়, এর কাণ্ডমূল কোন অলক্ষ্য আধারে বর্দ্ধিত ও প্রসারিত। দেশব্যাপী অন্ন-কৃচ্ছ্রতা অভাব অনটন, ক্ষুধা পীড়া, ব্যর্থ আশা, ক্ষোভ, লালসা, নীতি-রীতির মর্মবেদনা সব কিছুই পরিপুষ্ট করছে আন্দোলনকে। বিশ বছরের স্বাধীনতা যে আশা জাগিয়ে, যে উল্লাস তরুণ-জীবনকে উদ্দীপ্ত করেছিল তা মায়া-মরিচীকাবৎ মনে হচ্ছে বলেই কি এমন গভীর ক্ষোভ সেই সর্ব্বস্তর ব্যাপী ক্ষোভের অদৃশ্য সুতোয় বাঁধা পড়েছে ভারতবর্ষের সর্ব্ব প্রান্তের তরুণ দল? ক্ষোভে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে প্রতিটি তরুণজীবন গলিত, লাভা-স্রোতে শুধু বিস্ফোরণের অপেক্ষায় ছিল—সময় সুযোগ খুঁজছিল ইন্ধন যেমন একটি প্রান্তে দীপশলাকা প্রজ্জলিত হয়ে উঠে—তমনি লক্ষ লক্ষ মনে তা প্রসারিত হয়ে গেল। আগুন তো ছিলই মনে, সঞ্চিত হচ্ছিল তিলে তিলে। এখন সেই অদৃশ্য ইন্ধনই সর্ব্বব্যাপী অগ্নি-তরঙ্গে সব কিছুকে ভস্মসাৎ করে দেবার উন্মত্ততায় তাণ্ডব নৃত্য সুরু করেছে। এ তোমার ও আমার পাপ—বিদ্রোহের বহ্নিতরঙ্গে এই গুরু পাপ ভস্মীভূত হবে কি?

প্রধূমিত ইন্দোরের মধ্যে আটকে পড়বার ভয়ে আমরা তৃতীয় দিনেই রাজস্থান অভিমুখে যাত্রা করলাম, আরও একটি কারণে যাত্রাটিকে ত্বরান্বিত করতে হল। আমাদের বিশ্রামভবনের প্রাঙ্গণটি বিস্তারে খুবই দীর্ঘ। বাসগৃহ থেকে শৌচাগারে বা স্নানাগারে আসতে হলে সিকি কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়, কিন্তু পথের শেষেই বা সান্ত্বনা কোথায়? কলজলের খুবই অভাব। রাজস্থানের লোকেরা স্নান পান শৌচকর্ম্মে জল সম্বন্ধে এতটাই মিতব্যয়ী—বাংলার মানুষের পক্ষে কল্পনাতীত। একটা মাত্র ইঁদারায় এবং একটি মাত্র কলে লাইন লাগিয়ে এক বালতি জল সংগ্রহ করতে প্রচুর সময় অপব্যয়িত হয়, এটি আমাদের কাছে পীড়াদায়ক মনে হয়েছে। রাজস্থান মরুভূমির দেশ। এটা আমরা মনে রাখতে পারিনি। রেল স্টেশনে সারি সারি কল বসানো দেখেছি—একফোঁটা জল তাতে পাইনি—বালির রাজ্যে কলের বদলী স্নান পান ছাড়া বালিই যা নাস্ত্যেব গতিরন্যথা—এ দৃষ্টান্ত যত্র তত্র। ঢুটি দিন কাক-স্নানে কাটিয়ে স্বস্তি পাচ্ছিলাম না—সুতরাং ইন্দোর ত্যাগে ত্বরা স্বাভাবিক।

কালিদাস সাহিত্যে সমুদ্র

রঘুনাথ মল্লিক

সাধারণ মানুষের ধারণা সমুদ্র এক বিরাট, এক অসীম লবণ জলের আধার। মহাকবিও তাঁহার সাহিত্যের স্থানে স্থানে সমুদ্রকে লবণ সমুদ্র বলিয়াছেন—

"আভাতি বেলা লবণাম্বুরাশে
ধারা নিবদ্ধেব কলঙ্করেখা॥ [রঘু ১৩.১৫]

দূর হইতে 'লবণ সাগরের' সৈকতভূমি দেখাইতেছে যেন, রথচক্রের লোহার কাল পাতটি।

লবণ সমুদ্র ছাড়া আরও কয়েক রকম সমুদ্রের বর্ণনা ও উপমা মহাকবির সাহিত্যে পাওয়া যায়।

'ক্ষীর সমুদ্রের' উপমা রঘুবংশে পাওয়া যায়—

"দিলীপ ইতি রাজেন্দু রিন্দু ক্ষীর নিধাবিব।
[রঘু ১।১২]

ক্ষীর সমুদ্র হইতে উৎপন্ন চন্দ্রের মত (বৈবস্বত মনুর বংশে) জন্মিয়াছিলেন নৃপশ্রেষ্ঠ দিলীপ।

ক্ষীর সাগরের তরঙ্গ-বিন্দুর উপমাও রঘুবংশে পাওয়া যায়।

বীরবর রঘু যখন দিগ্বিজয়ে বাহির হইতেছিলেন, তখন :—

"অবাকিরণ বয়োবৃদ্ধাস্তং লাজৈঃ পৌরযোষিতাঃ।
পৃষতৈর্মন্দরোদ্ধূতৈঃ ক্ষীরোর্মির ইবাচ্যুতম্॥
[রঘু-৪।২৭]

সমুদ্রমন্থনের সময় মন্দর পর্বতের আলোড়নে উৎক্ষিপ্ত ক্ষীর সাগরের তরঙ্গবিন্দু যেমন শ্রীবিষ্ণুকে পরিব্যাপ্ত করিতেছিল, পুর-বাসিনী বর্ষিয়সী মহিলাগণ রঘুর দেহের উপর সেইরূপে খৈ বর্ষণ করিতেছিলেন।

'বিষ-সাগরের' উল্লেখ কুমার সম্ভবে পাওয়া যায়।

রুদ্রের নিষিক্ত বীর্য অগ্নি যাহা বহন করিতে অসমর্থ হইয়া গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই বীর্য যখন স্নান-রতা ছয়জন কৃত্তিকার দেহে সংক্রামিত হইল, তাঁহাদের মনে হইল, তাঁহারা যেন বিষের সমুদ্রে নিমজ্জিতা হইয়া গেলেন।

'বিষ-সাগরের' মত ধূলীজলধির উপমা কুমার সম্ভবে পাওয়া যায়।

দেব সৈন্যগণের সুমেরু পর্বতের উপর হইতে পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত অসুরদের দেশ আক্রমণ করিতে আসার সময় মহাকবি বলেন—

"ঘণ্টৈঃ কণৎ কাঞ্চনকিঙ্কিনীকুলৈ
রমজ্জি ধূলীজলধৌ নভোগতে॥ [কু-১৪.৪৬]

স্বর্ণনির্মিত ঘণ্টার শব্দে মুখরিত লক্ষ লক্ষ পতাকার অংশুকগুলি আকাশে উত্থিত ধূলি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়া গেল।

'দুঃখাম্বুধি'—দুঃখ সমুদ্রের উপমা অসুররাজ তারকের যুদ্ধযাত্রার বর্ণনায় পাওয়া যায়—

"অগাধ-দুঃখাম্বুধি মধ্যমজ্জনী
বভুব বোৎপাত পরম্পরাবত॥ [কু ১৫.১৩]

যুদ্ধযাত্রার সময় নানা প্রকার অশুভ-উৎপাত দেবারি তারককে অগাধ দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করার জন্য আবির্ভূত হইতে লাগিল।

'চমূ-মহার্ণব'—সৈন্য মহাসাগরেরও উপমা কুমার সম্ভবে পাওয়া যায়।

"পুরোগতং দৈত্যচমূ-মহার্ণবং
দৃষ্টাপরং চুক্ষুভিরে মহাসুরাঃ ॥ [কু-১৫·৪৯]

সম্মুখে মহাসমুদ্রের মত অসীম দৈত্যসৈন্য সমাবেশ দেখিয়া নেতৃস্থানীয় দেবতারা ক্ষুব্ধ হইয়া পড়িলেন।

'রাক্ষস-সমুদ্রের' উল্লেখ রঘুবংশে পাওয়া যায়।

দেবতারা শ্রীবিষ্ণুকে নিবেদন করিতেছেন—

"ভয়মপ্রলয়োদ্বেলাদাচখ্যুর্নৈঋতোদধেঃ ॥

[রঘু-১০·৩৪]

প্রলয়কাল না হইলেও প্রলয়কালীন বেলা অতিক্রম-কারী রাক্ষসরূপ মহাসাগরের ভয়ে আমরা আকুল হইয়া পড়িয়াছি।

বেলা অতিক্রমকারী (প্রলয়কারী) প্রলয়কালীন তরঙ্গের উপমা রঘুবংশে পাওয়া যায়।

স্বর্গের অপ্সরা হরিণী মর্ত্যে আসিয়া তৃণবিন্দু মুনির তপস্যার বিঘ্ন করার চেষ্টা করাতে—

"অশপত্তব মানুষীতি তাং
শম-বেলা প্রলয়োর্মিণাভুবি ॥" [রঘু ৮.৮০]

প্রলয়কালীন উত্তাল তরঙ্গ যেমন শান্ত বেলাভূমিকে অতিক্রম করিয়া যায়, শান্তস্বভাব মুনির ক্রোধও তেমনি হৃদয়ের শান্তভাব অতিক্রম করিয়া অপ্সরাকে অভিসম্পাত দিল "তুই মানবী হইবি।"

রঘুবংশের চতুর্থ সর্গে সমুদ্রের সহিত বিরাট বাহিনীর উপমা দিয়াছেন মহাকবি—

"তস্যানীকৈর্বিসর্পদ্ভিরপরান্তরগোচরৈঃ
রামাস্ত্রোৎসারিতোপ্যাসীদ্ সহ্যলগ্ন ইবার্ণবঃ ॥

[রঘু-৪।৫৩]

অপর নৃপতিদিগকেও জয় করার জন্য রঘু যখন বিরাট বাহিনী লইয়া সহ্যপর্বতের নিকট আসিলেন, দেখাইল যেন পরশুরামের অস্ত্রাঘাতে সমুদ্র দূরে সরিয়া গেলেও এইবার বুঝি সহ্যপর্বতের সহিত মিলিত হইতে আসিয়াছে।

মহাপ্রলয়ের সময় দুইটি সমুদ্রবেলা অতিক্রম করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিতেছে, এই দৃশ্যটিকে উপমান করিয়া মহাকবি দেব ও দৈত্যসেনার পরস্পরকে আক্রমণ করিতে আসার দৃশ্য বর্ণনা করিতেছেন—

"সংগ্রামং প্রলয়ায় সন্নিপততো বেলামতিক্রামতো।
গীর্বাণাসুর সৈন্যসাগর যুগস্যাশেষ দিগ্ব্যাপিনঃ ॥

[কু-১৫·৫৩]

দেবসৈন্য ও অসুরসৈন্যরূপ দুইটি সমুদ্র যেন তাহাদের বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করার জন্য মহাকোলাহল করিতেছে।

মহাকবি 'রঘুবংশের' প্রথম সর্গে সমুদ্রকে 'দুস্তর' বলিয়াছেন—

"তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্ ।"

[রঘু·১·২]

আমি মোহের বশীভূত হইয়া দুস্তর সমুদ্রকে ভেলায় চড়িয়া পার হইতে ইচ্ছা করিয়াছি। অথচ অন্যান্য কয়েক-স্থানে সমুদ্রকে তিনি সামান্য পরিখা বলিতেও ইতস্তত করেন নাই। মহারাজ দিলীপের রাজ্য যে কত সুবিশাল ছিল বুঝাইবার জন্য মহাকবি বলিতেছেন—

"স বেলা প্রবলয়াং পরিখীকৃত-সদারাম্ ।" [রঘু-১·৩০]

তিনি সমুদ্রকে তাঁহার সে সুবিশাল সাম্রাজ্যের পরিখা এবং বেলাভূমিকে প্রাচীর করিয়াছিলেন।

সমুদ্রকে পরিখা করার উপমা আরও কয়েকস্থানে পাওয়া যায়—

লঙ্কায় গিয়া হনুমান্ যখন সীতার একটি আভরণ আনিয়া রামের হাতে দিল, তখন মহাকবি বলেন—

"শ্রুত্বা রামঃ প্রিয়োদন্তং মেনে তৎসঙ্গমোৎসুকঃ।
মহার্ণব পরিক্ষেপং লঙ্কায়াঃ পরিখালঘুম্ ॥"

[রঘু-১২·৬৬

প্রিয়ার সকল কথা শুনিয়া তাঁহার সহিত মিলন আকাঙ্খা রামের এতো বেশী হইল যে, মহাসমুদ্রকে তাঁহার লঙ্কারাজ্যের সামান্য একটা পরিখা বলিয়া ম হইতে লাগিল।

রামের চোখে মহাসমুদ্র দুস্তর নয়, সামান্য পরিখার মত সুগম, যাহা তিনি অনায়াসে পার হইয়া যাইবেন।

মহাসমুদ্রকে মহাকবি পরিখা বলিয়াই ক্ষান্ত হয়েন নাই, অভিজ্ঞান শকুন্তলে তিনি সমুদ্রকে বিশাল সাম্রাজ্যের রসনা বা মেখলা বলিয়া বর্ণনা দিয়াছেন—

'পরিগ্রহ বহুত্বেঽপি দ্বে প্রতিষ্ঠে কুলস্য মে।
সমুদ্র রসনা চোর্ব্বী সখীব যুবয়োরিদম্॥"

(শকু-৩য় অঙ্ক)

পত্নী আমার অনেকগুলি আছেবটে, তবু জানিয়া রাখ আমার বংশের মাত্র দুইটি প্রতিষ্ঠা, একটি সমুদ্র যাহার মেখলা সেই পৃথিবী, দ্বিতীয়টি তোমাদের এই সখী। মহাকবি সমুদ্রকে শকুন্তলায় বলিলেন, পৃথিবীর মেখলা আর রঘুবংশের নিম্নলিখিত—শ্লোকে বলিলেন দক্ষিণদিগ্‌বধুর মেখলা।

স্বয়ংবর সভায় সুনন্দা রাজকুমারী ইন্দুমতীকে বলিতেছেন—

"রত্নানুবিদ্ধার্ণব-মেখলায়াঃ
দিশঃ সপত্নী ভব দক্ষিণস্যাঃ।" (রঘু-৬।৬৩)

রত্নখচিত (রত্নপূর্ণ) সমুদ্ররূপ মেখলায় পরিবৃতা দাক্ষিণদিকরূপ বধুর সপত্নী হইতে পারিবে।

মহাকবি বহুস্থানে রাজাকে পতি ও রাজ্যকে তাঁহার পত্নী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এখানেও বলিতে চাহেন দক্ষিণদিকের পাণ্ড্য রাজ্যের অধিপতিকে রাজকুমারী যদি বরণ করেন পতিরূপে তাহা হইলে তিনি দাক্ষণদিকরূপ রাজার বধুর সপত্নী হইবেন। কেবল দক্ষিণদিগ্‌ধুর সপত্নী হও ব'লতে বুঝাইতেছে পাণ্ড্যরাজ অবিবাহিত।

কেবল পরিখা নয়, মেখলা নয়, মহাকবি চারিটি সমুদ্রকে গোরূপধরা মেদিনীর চারিটি স্তন বলিয়াও বর্ণনা করিয়াছেন—

"পয়োধরীভূতচতুঃসমুদ্রাং
জুগোপ গোরূপধরামিবোর্ব্বীম্॥" [রঘু-২।৩]

রাজা দিলীপ চারিটি পয়োধররূপ চারি সমুদ্র সমেত বসুন্ধরাকে রক্ষা করার ন্যায় কামধেনু নন্দিনীকে রক্ষা করিতে লাগিলেন।

মহাকবি রঘুবংশের দ্বিতীয় সর্গে যেমন গরুর চারিটি বাঁটের চারিটি সমুদ্রের সহিত উপমা দিয়াছেন, তেমনি তৃতীয় সর্গে উপমা দিয়াছেন চার সমুদ্রের সহিত চারি বিদ্যার—

"ধিয়ঃ সমগ্রৈঃ স গুণৈরুদারধীঃ
ক্রমাচ্চতস্রশ্চতুরর্ণোবপমাঃ।" [রঘু-৩।৩০]

অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন রঘু নিজগুণে চারিটি সমুদ্রের মত চারিটি বিদ্যায় পার হইয়া গেলেন।

সমুদ্র চার বলিয়া মহাকবি কয়েক জায়গায় উপমা দিয়াছেন, কিন্তু রঘুবংশের দশম সর্গে তিনি বলিয়াছেন

"সপ্তার্ণব জলে শয়ান্" (রঘু ১০।২১)

তুমি, শ্রীবিষ্ণু. সাত সাগরের জলে শয়ন করিয়া থাক।

সমুদ্রগর্ভে যে রত্ন পাওয়া যায় মহাকবি সে কথা কুমার সম্ভবে বলিয়াছেন—

"রত্নাকরে যুজ্যত এব রত্নম্" (কু-১১।১১
রত্নাকরে—সমুদ্রেই-রত্নের উৎপত্তি হয়।

সমুদ্রের রত্নরাজি যে অসংখ্য, গণনা করা যায় না, এই তথ্যকেও মহাকবি উপমা করিয়াছেন—

শ্রীনারায়ণের স্তব করিতে করিতে দেবতারা বলিতেছেন—

"উদধেরিব রত্নানি তেজাংসীব বিবস্বতঃ।
স্তুতিভ্যো ব্যতিরিচ্যন্তে দূরাণি চরিতানি তে॥"

(রঘু-১০।৩০)

সমুদ্রের রত্নরাজির এবং সূর্য্যের কিরণ সমূহের যেমন সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না, তেমনি তোমারও অপ্রমেয় গুণাবলীর অনন্তকাল ধরিয়া কীর্তন করিতে থাকিলেও শেষ করিতে পারা যায় না।

ময়নের পূর্বে রত্নরাজিপূর্ণ সমুদ্রের সহিত পুত্রলাভের পূর্বে রাজাদশরথের উপমা পাওয়া যায়—

"অভিন্নদ্ প্রত্যয়াপেক্ষ সন্ততিঃ স চিরং নৃপঃ।
প্রাঙ্ মন্থনাদভিব্যক্ত রত্নোৎপত্তি রিবার্ণবঃ ॥

[রঘু-১০.৩]

মন্থনের পূর্বে রত্নরাজি পরিপূরিত সাগরের মত রাজা দশরথ তাঁহার পুত্রোৎপত্তি বিশেষ কোনও কার্য্যের উপর নির্ভর করিতেছে ভাবিয়া বহুকাল অতিবাহিত করিলেন।

সমুদ্রের নির্ঘোষ যে রাজাদের 'বিজয়-দুন্দুভির' কাজ করিতে পারে একথাও মহাকবি রাজা দশরথের যুদ্ধজয়ের ব্যাপারে জানাইতে চাহিয়াছেন—

"বিজয়-দুন্দুভিতাং যযুরর্ণবাঃ ঘনরবা নরবাহন সম্পদঃ"

[রঘু-৯।১১]

সমুদ্রদিগের উচ্চ নিনাদ শুনাইত যেন কুবেরের মত বিত্তশালী রাজা দশরথের রণ-দামামার মত জয় ঘোষণা করিতেছে।

সমুদ্রের গুরুগম্ভীরধ্বনি কেবল রণ-দুন্দুভির কাজ করিতে পারে তাহা নহে, মহাকবি বলেন, তটের সন্নিকটে অবস্থিত প্রাসাদে সুপ্ত নৃপতির 'ঘুম ভাঙানি গানের'ও কাজ করিতে পারে—

"প্রাসাদ বাতায়ন-দৃশ্যবীচিঃ
প্রবোধয়ত্যর্ণব এব সুপ্তম্ ॥" [রঘু-৬.৫৬]

প্রাসাদের গবাক্ষ হইতে তিনি সমুদ্রের তরঙ্গলীলা দেখেন, যাহার মৃদু মন্দ ধ্বনি রাজার ঘুমভাঙানি গানেরও কাজ করিয়া দেয়।

রাজা অতিথির গুণ বর্ণনায় মহাকবি সমুদ্রের একটি মহৎগুণকে উপমান্ করিয়াছেন—

"অপমেন প্রববৃত্তেন জাতুপচিতোঽপি সঃ।
বৃদ্ধৌ নদীমুখেনৈব প্রস্থানং লবণাম্ভসঃ ॥"

[রঘু-১৭।৫৪]

সমৃদ্ধি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও তিনি কখনও বিপদগামী হয়েন নাই, লবণ সাগরের জল উদ্বেলিত হইলেও একমাত্র নদীর মধ্য দিয়াই প্রবাহিত হয়।

সমুদ্রের জল বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া লোকালয়ে প্রবেশ করিয়া উচ্ছৃঙ্খলভাবে জনপদ ভাসাইয়া দেয় না।

সমুদ্রের এই মহত্ত্বকে মহাকবি আরও একস্থানে উপমান করিয়াছেন। রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতি পুত্রেরা ভিন্ন রাজ্যের রাজা হইলেও তাঁহারা কখনও নিজ নিজ রাজ্য-সীমা অতিক্রম করিয়া পররাজ্যে প্রবেশ করিবেন না।

"অন্যান্য দেশ প্রবিভক্ত সীমাং
বেলাং সমুদ্রা ইব ন ব্যতীয়ুঃ ॥" [রঘু-১৩৷২]

তাঁহারা এক এক জনে বিশাল বিশাল রাজ্য-সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন বটে, তবু সমুদ্র যেমন বেলাভূমি অতিক্রম করিয়া যায় না, তাঁহারাও তেমনি নিজ নিজ রাজ্যসীমা কখনও অতিক্রম করিতেন না।

সমুদ্রের মহিমা ও গুণরাজির বর্ণনায় মহাকবি বলেন—

"গর্ভং দধনর্কমরীচিচয়োস্মাদ্
বিবৃদ্ধি মত্রাশ্নুবতে বসূনি।
আবিন্ধনং বহ্নিমসৌবিভর্তি
প্রহ্লাদনং জ্যোতিরজন্যনেন ॥" [রঘু ১৩।৪]

এই সমুদ্র হইতে জল লইয়া সূর্য্যের কিরণরাজি জলধর গর্ভ ধারণ করে, ইহাতেই জলের মধ্যে রত্নসমূহ বৃদ্ধিলাভ করে, এবং যে বাড়বানল জলকেও কাষ্ঠ প্রভৃতি ইন্ধনের মত দগ্ধ করে সমুদ্র তাহাকেও ধারণ করিয়া থাকে, আর এই সমুদ্র হইতে লোকের আনন্দদায়ক চন্দ্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

মহাকবির কল্পনায় সমুদ্র বড় যে সে বস্তু নয় বরং শ্রীবিষ্ণুর সহিত সমুদ্রের তুলনা দেওয়া চলে—

"তাং তামবস্থাং প্রতিপদ্যমানং
স্থিতং দশ ব্যাপ্য দিশো মহিম্না।
বিষ্ণোরিবাস্যানবধারণীয়
মীদৃক্তয়া রূপমিয়ত্তয়া বা ॥" (রঘু-১৩।৫)

শ্রীবিষ্ণুর বিরাট স্বরূপের ধারণা করা বা পরিসংখ্যা করিতে যাওয়া যেমন জীবের অসাধ্য, তেমনি এই সমুদ্রেরও প্রকৃত রূপের ধারণা করা বা পরিমাণ করিতে যাওয়া মানবের সাধ্যের অতীত।

সমুদ্রের একটি সংকীর্তির কাহিনী মহাকবি জানাইয়া দিতেছেন—

"পক্ষচ্ছিদা গোত্রাভিদাত্তগন্ধাঃ
শরণ্যমেনং শতাশঃ মহীধ্রাঃ ।।" (রঘু-১৩।৭)

ইন্দ্র যখন পর্বতদের পক্ষ ছেদন করিয়া দিতেছিলেন তখন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত রাজারা যেভাবে ধার্মিক ও নিরপেক্ষ ভূপতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে শত শত অবমানিত পর্বত সেইভাবে মহাসাগরের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন।

রঘুবংশে মহাকবি শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্যের সহিত সমুদ্রের উপমা দিয়াছেন, আর মালবিকাগ্নিমিত্রে সমুদ্রের নব নব ভাবের সহিত রাজার উপমা দিয়াছেন। রাজাকে বহুবার দেখিলেও আবার দেখার সময় নাট্যাচার্য বলিতেছেন—

সলিল নিধিরিব প্রাতক্ষণং মে ভবতি স এব নবো নবোয়েমঙ্কেচ।"

সমুদ্রকে যেমন যখনই দেখা যায় তখনই নূতন বলিয়া মনে হয়, তেমনি রাজাকেও যতবার দেখি নূতন বলিয়া মনে হয় (নূতন দেখায়)

সমুদ্রের সহিত রাজার উপমা রাজা দিলীপের জীবনীতেও পাওয়া যায়—

"ভীমকান্তৈর্নৃপগুণৈঃ স বভুবোপজীবিনাম
অধৃষ্য শ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরত্নৈরিবার্ণবঃ ।।"
(রঘু-১।১৬)

সমুদ্রের মধ্যে যেমন ভীষণ ভীষণ জলজন্তু থাকে বলিয়া সমুদ্রকে ভয়ঙ্কর মনে হয়, অথচ তাহার মধ্যে রত্নরাজি থাকে বলিয়া লোকে তাহার জলের মধ্যে প্রবেশও করে, তেমনি রাজা দিলীপের মধ্যে অপূর্ব তেজস্বিতার সঙ্গে দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণরাজির অবস্থিতির জন্য প্রজারা তাঁহাকে যেমন ভয় করিত তেমনি তাঁহার আশ্রয়ও কামনা করিত।

'পুত্রেষ্টি সমাপনের সময় রাজা দশরথের অগ্নির ভিতর হইতে আবির্ভূত দিব্যপুরুষের হস্ত হইতে পায়সচরু গ্রহণ মহাকবি সমুদ্রের উপমা দিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—

"প্রজাপত্যোপনীতং তদন্নং প্রত্যগ্রহীন্নৃপঃ।
বৃষেব পয়সাং সারমাবিষ্কৃতমুদন্বতা ।।"
(রঘু-১০।৫২)

দেবরাজ ইন্দ্র যেমন মহাসমুদ্র কর্তৃক প্রদত্ত অমৃত গ্রহণ করিয়াছিলেন, রাজা দশরথও তেমনি প্রজাপতি কর্তৃক প্রেরিত পুরুষের হস্ত হইতে অন্ন (পায়সচরু) গ্রহণ করিলেন। রঘুবংশের ত্রয়োদশ সর্গে সমুদ্রের একটি সুন্দর দৃশ্যের বর্ণনা পাওয়া যায়—

প্রবৃত্তমাত্রেণ পয়াংসি পাতুমাবর্ত-বেগাদ্ ভ্রমতা ঘনেন
আভাতি ভূয়িষ্ঠময়ং সমুদ্রঃ প্রমথ্যমানো গিরিণেব ভূয়ঃ।।" (রঘু-১৩।১৪)

সমুদ্রের জল পান করার জন্য মেঘ নীচে নামিয়া আসিয়া ঘূর্ণীবায়ুর আবর্তে পড়িয়া ঘুরপাক খাইতেছে, দেখাইতেছে আবার যেন মন্দার পর্বতকে আনিয়া সমুদ্রমন্থন করা হইতেছে।

এলোমেলো ঝড় বহিতে থাকাকালীন্ সমুদ্র তরঙ্গেরও ও উপমা পাওয়া যায়।

ইন্দুমতীকে বিবাহ করিয়া রাজকুমার অজ অযোধ্যায় ফিরিতেছিলেন, পথে বিপক্ষ রাজারা একজোট হইয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন, সে সময়কার যুদ্ধ বর্ণনায় মহাকবি বলিতেছেন—

ব্যূহাবুভৌ তাবিতরেতরস্মাদ্—
ভঙ্গং জয়ং চাপতুরব্যবস্থম্।
পশ্চাৎ পুরো মাতরয়োঃ প্রবৃদ্ধৌ—
পর্য্যায়বৃত্ত্যেব মহার্ণবোর্মী ।" (রঘু-৭।৫৪

সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রবল ঝড় বহিতে থাকিলে সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন একবার এদিকে, একবার ওদিকে আবার অপর দিকে চালিত হয়, তেমনি দুইপক্ষে যুদ্ধ চলিতে থাকার সময় কখন এক পক্ষ আগাইয়া যায়, অপর পক্ষ পিছাইয়া থাকে, আবার কখন বা বিপরীত পক্ষ আগাইয়া যায়, ও প্রথম পক্ষ পিছু হটিতে বাধ্য হয়।

বরাহরূপধারী শ্রীবিষ্ণুর মহাপ্রলয়কালীন্ সমুদ্রের

অত্যুচ্ছ্বাসিত বারিরাশি রোধ করার উপমা পাওয়া যায়—

"নিবারয়ামন মহাবরাহ
কল্পক্ষয়োদ্বৃত্তমিবার্ণবাম্ভঃ ॥" (রঘু-৭।৫৬)।

যেভাবে মহাবরাহরূপধারী শ্রীবিষ্ণু মহাসমুদ্রের প্রলয়কালীন্ উত্তাল তরঙ্গরাশি রোধ করিয়াছিলেন, রাজকুমার অজও সেইভাবে একাকী বহু শত্রুরাজার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিতে লাগিলেন।

দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে রঘু যখন সমুদ্রের তটে আসিয়া পড়িলেন, ও স্থানীয় রাজা তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করিয়া কর দিলেন, তখন মহাকবি বলিতেছেন—

"অবকাশং কিলোদম্বান্ রামায়াভ্যর্থিতো দদৌ
অপরান্ত মহীপাল ব্যাজেন রঘবে করম্ ॥"
(রঘু-৪।৫৮)

যে সমুদ্র পরশুরামের প্রার্থনায় (কৃপা করিয়া) খানিকটা সরিয়া গিয়াছিলেন, রঘু যখন সেই সমুদ্রের তটে আসিলেন, এবং সেখানকার নরপতি বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কর দিলেন, দেখাইল যেন স্বয়ং সমুদ্র রঘুকে কর দিলেন।

মহাকবি এখানে বলিতে চাহেন, পরশুরাম যাহাকে প্রার্থনায় সন্তুষ্ট করিয়া সামান্ত কিছু পাইয়াছিলেন, বীরবর রঘু সেই সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইবামাত্র, সমুদ্র যেন ভয়ে উপযাচক হইয়া রাজার ছদ্মবেশে দিগ্বিজয়ীকে কর দিয়া সম্মানিত করিলেন। পরশুরামের অপেক্ষা রঘুর সম্মান যে অতুলনীয়ভাবে বেশী, ইহাই কালিদাস জানাইয়া দিলেন।

রঘুবংশের দশম সর্গে শ্রীহরির সমুদ্রশয়নের উল্লেখ পাওয়া যায়—

"তে চ প্রাপুরুদম্বন্তং বুবুধে চাদিপূরুষঃ ॥"
(রঘু-১০।৬)

দেবতারা যেসময় সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন, ঠিক সেই সময় আদি পুরুষের যোগনিদ্রা ভঙ্গ হইল।

শ্রীভগবানের কণ্ঠস্বরের অপূর্বতা বর্ণনা করিতে গিয়া মহাকবি বলিতেছেন—

"অথ বেলা-সমাসন্ন শৈলরন্ধ্রানুনাদিনা।
স্বরেণোবাচ ভগবান্ পরিভূতার্ণব ধ্বনিঃ ॥"
(রঘু-১০।৩৫)।

শ্রীভগবানের কণ্ঠস্বর সমুদ্রস্থিত পর্বতের গুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া মহাসমুদ্রের গুরুগম্ভীর মন্দ্রধ্বনিকেও পরাভূত করিল।

সার্থক দৃষ্টান্ত

রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

'ছোট একটি প্রশ্ন আর ছোট একটি উপদেশ'—এই দুই এর-মধ্যেই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, তিনটি সম্ভাবনাময় জীবন। এই নিয়েই আজকের এই গল্পের অবতারণা।

একজন ভদ্রলোক মাঠে দাঁড়িয়ে ছেলেদের দৌড় সম্বন্ধে শিক্ষা দিচ্ছিলেন। ভদ্রলোক ছিলেন তখনকার দিনের একজন বিখ্যাত কোচ। কোথা থেকে এক তরুণ কিশোর তার কাছে এসে প্রশ্ন করল "আচ্ছা কি করে জগৎখ্যাত দৌড়বীর হওয়া যায়?" ভদ্রলোক সস্নেহে তাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন "হওয়া যায়, যদি তুমি হাঁটু খুব উঁচুতে তুলে পা দুটোকে পিষ্টনের মতন সামনের দিকে এগিয়ে দিতে পার।" তারপর ছেলেটির সঙ্গে আর কয়েকটি কথা বলে তিনি নিজের কাজে মন দিলেন।

কিশোরটির সেইদিন থেকেই সাধনা শুরু হয়ে গেল। এরপর এমনদিন এল যখন "Charley Paddock" ক্রীড়া-জগতের এক অবিস্মরণীয় নাম। শোনা যায় দৌড়বার সময় হাঁটু বুকে ছুঁইয়ে পা দুটিকে তিনি তীব্রগতিতে সামনে এগিয়ে দিতেন। দৌড়ের শেষ সীমানার ৪।৫ গজ দূর থাকতে তিনি ভূমির সংস্পর্শ ত্যাগ করে বাতাসের মধ্যে পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে দৌড় শেষ করতেন। এক-সময় দৌড়ের চারিটি বিভিন্ন বিভাগে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন এই "Charley Paddock".

১৯২০ সালে এ্যান্টোয়ার্প (বেলজিয়াম) অলিম্পিকে ১০০ মিটার দৌড়ে বিজয়ীর সম্মান নিয়ে দেশে ফিরলেন চার্লি। উত্তেজনা, উদ্দীপনা ও উৎসাহে দেশ তখন মুখরিত হ'য়ে উঠল। দিকে দিকে তাঁকে জানানো হল আবাহন ও অভিনন্দন। চার্লি ছিলেন একজন ভাল বক্তা। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ওহা ওয়োর ক্লীভল্যাণ্ড নামক স্থানে এইরকম এক সভায় তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়। এর উত্তরে চার্লি তার ভাষণশেষে বলেছিলেন, "কে জানে সামনে উপবিষ্ট আজকের এই শিশুদের মধ্যেই হয়ত লুকিয়ে আছে আগামীদিনের কোন এক অজানা চ্যাম্পিয়ন?" চার্লি হয়ত বুঝতেও পারেন নি তাঁর এই ভাষণ কতখানি সত্য।

সভাশেষ হলো। উপস্থিত কিশোরদের মধ্য থেকে বেরিয়ে এল এক শীর্ণকায় নিগ্রো বালক। দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে চার্লিকে প্রশ্ন করে সে "আচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী মানুষ হতে গেলে আমার কি করা কর্ত্তব্য?" জবাবও মিলল সেই এক। তিনি বললেন "খোকা, আমিও আমার ট্রেনারকে ঐ একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তারই প্রদত্ত উত্তর আমি তোমাকে শোনালাম। চেষ্টা কর নিশ্চয়ই হবে।

শক্ত ধাতুতে গড়া এই বালক। শুধুই প্রশ্ন আর উপদেশ নয়। শুরু হল তার অনুশীলন মুহূর্তের সেই উৎসাহ আর বালকের নির্ভরতার পরীক্ষা চলল। সে এক ক্লান্তিহীন অনুশীলন। চ্যাম্পিয়ন তাকে হতেই হবে।

১৯৩৬ সাল—বার্লিন অলিম্পিক। অতীতের সেই শীর্ণকায় কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরকে দেখা গেল এক ক্ষিপ্র, বলশালী, প্রাণচাঞ্চল্যে পূর্ণ যুবকরূপে। জগৎকে স্তম্ভিত করে এই কৃষ্ণাঙ্গ যুবক জাত্যাভিমানী বলদর্পী হিটলারের দেশ থেকে চারিটি স্বর্ণপদক ছিনিয়ে সেইখানে রেখে এলেন কৃষ্ণজাতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ।

কে এই যুবক? জগতের সর্ব্বকালের শ্রেষ্ঠদের মধ্যে অন্যতম, ক্রীড়া-জগতের অমর নাম J. C Wanes—এক দীন দরিদ্র ঘরের ছেলে।

কিন্তু এইখানেই এ প্রশ্নের শেষ নয়, বোধহয় আরম্ভ।

অলিম্পিক সম্রাট ওয়েল্স বহুজয়ের মুকুট মাথায় নিয়ে দেশে ফিরলেন। দেশে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। দিকে দিকে লেগে গেল বিজয়ীকে অভিনন্দন ও আপ্যায়নের পালা। এমন এক অভিনন্দন-সভায় আবার এক কৃশকায় কৃষ্ণাঙ্গ বালক ছুটে এল ওয়েল্সের কাছে। অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে সে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর সাহস করে ওয়েল্সকে জিজ্ঞাসা করে—ওয়েল্সেরই সেই 'পরম জিজ্ঞাসা", মহাশয় কি করে পৃথিবীর সেরা দৌড়বীর হওয়া যায়? উত্তরও নির্দেশিত হলো সেই একই পথে—যা নির্দেশ করেছিলেন Charley Paddock ওয়েল্সকে তার প্রথম জীবনে।

এবারও শুরু হল সেইরকম একাগ্র সাধনা। এবাকার অলিম্পিকের আসর বসল লণ্ডনে, সালে ১৯৪৮। বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের সঙ্গে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেল এক সুঠাম, দীর্ঘদেহী, কৃষ্ণাঙ্গ যুবককে। অনিশ্চয়তার মধ্যে শুরু হল দৌড় আর শেষ হল প্রবল উত্তেজনার মধ্যে। বিজয়ীর নাম ঘোষিত হল। কি সেই নাম? হ্যারিসন ডিলার্ড, জে. সি. ওয়েল্সের মন্ত্রশিষ্য।

এইখানেই তার কৃতিত্ব নয়। তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব এই যে, সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি বিভাগে প্রতিযোগিতা করে বিশ্বরেকর্ডের সামনে সময় করে বিজয়ীর সম্মান লাভ। ডিলার্ডের নিজস্ব-বিভাগ ছিল হার্ডল রেস। তিনি এই বিভাগে বিশ্বরেকর্ডের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু নিজের দেশে অলিম্পিক ট্রায়ালে অনুমোদন না পাওয়ায় তিনি ঐ বিভাগে দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। অতপর তিনি সম্পূর্ণ অপরিচিত এক বিভাগে (১০০ মিটার দৌড়) নেমে, দেশকে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার অর্জন করে ঐ বিভাগে বিশ্বরেকর্ডের সমান সময়ে প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরবে মহিমান্বিত হন।

যত আঁধার তত আলো

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

কেষ্ট সাহার বাজারের সবটাই বাজার নয়। এক তলাটা বাজার। দোতলা আর তিন তলায় মানুষের হাট। রকমারি মানুষের বিচিত্র সমাবেশ।

বিঘা দশেক জমির উপর প্রকাণ্ড একখানি বাড়ী। রাস্তামুখো একতলার ঘরগুলিতে সারি সারি দোকান। ভিতরের অংশে বাজার। দোতলা আর তিনতলায় মানুষের ঘরবসতি। অন্তত শ' খানেক পরিবারের বাস। এদের সঙ্গে আবার একটি হিন্দু হোটেল, লণ্ড্রি, আর দরজীর দোকানও তালিকাভুক্ত হয়েছে।

প্রত্যেকখানি ঘরই স্বয়ং সম্পূর্ণ। একখানির সঙ্গে অপরখানির কোন সম্বন্ধ নেই অথচ একের পর এক পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। তবে একেবারেই যোগাযোগ নেই একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। রাস্তার উপরকার প্রশস্ত গাড়ীবারান্দা এবং ছাদ সকলের জন্য। এখানে কোন পৃথক অস্তিত্ব নেই। সর্ব্বজাতি এবং সকল শ্রেণীর মিলনকেন্দ্র, প্রাণ কেন্দ্র।

এই বারান্দার একটি বিশেষ অংশে এক এবং দুনম্বর ঘরের বাসিন্দা জগন্নাথ চৌধুরী তাঁর দাবা খেলার সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় আসর জমিয়ে বসেন। প্রাণ কেন্দ্রে প্রাণের সঞ্চার হয়। এক এক করে বহুর আগমন ঘটে। কেউ খেলায় যোগদান করেন, কেউ উপদেশ বর্ষণ করেই ক্ষান্ত থাকেন। কেউ কেউ নির্ব্বাক দর্শকরূপে বিরাজ করেন।

খেলার মাঝে জগন্নাথ কখনও হাঁক দেন, মনোরমা আমার তামাক—কখনও হুকুম করেন চায়ের।

এক নম্বর ঘরের পরদার আড়াল থেকে মনোরমা কখনও বার হয়ে আসে তামাক নিয়ে কখনও আসে চা নিয়ে।

বছর ছাব্বিশ বছরের মেয়েটি। ছিপছিপে গড়ন। টুকটুকে গায়ের বর্ণ। ডাগর দুটি চোখ, সে চোখে কুতূহল এবং বেদনার অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ। মেয়েটি বিধবা। এই মেয়েটিকে নিয়েই জগন্নাথের সংসার। ঠাকুর্দ্দা আর নাতনী। এ বাড়ীর প্রথম ভাড়াটে। সকলেই তাঁকে খাতির করে' সমীহ করে। এমন কি বাড়ীর মালিক সাহামশাই পর্য্যন্ত।

কথাটা জগন্নাথ সমারোহের সঙ্গে প্রকাশ করে থাকেন। বলেন, সাহামশাই ব্যবসাদার মানুষ। তিনি লোক চেনেন। খাতির এমনি করেন না, কুড়িটি বছর তিনি এই হাটের মধ্যে বাস করছেন। নেহাত গোড়া পত্তন তাঁকে দিয়ে হয়েছিল তাই নইলে এখানে কি কোন ভদ্র-লোক বাস করতে পারে।

কথাটা হয়তো সকলের ভাল লাগে না। আপত্তি ওঠে। কথাটা ঠিক হলো না। আসল কথা হলো দেশ বিভাগের ফলে প্রচণ্ড গৃহ-সমস্যা। নইলে এই শুয়োরের আস্তাবলে কোন মানুষ বসবাস করতে আসত না।

জগন্নাথ একটু হেসে বলেন, এই আস্তাবলে বাস করবার উপযুক্ত লোক বিশ বছর আগেও কিন্তু ছিল নইলে আমাকে আজ তোমরা এখানে দেখতে না। আর সাহামশাইর মাথায়ও এই ধরনের বাড়ী করবার বৈষয়িক বুদ্ধি দেখা দিত না। তবে হ্যাঁ, এ কথা অবশ্যই মানতে হবে যে আজকের দিনের গৃহসমস্যা সে দিনে ছিল গৃহের মালিকের সমস্যা। তবুও জগন্নাথ চৌধুরী সুরু থেকে এ বাড়ীর একজন আদি এবং অকৃত্রিম ভাড়াটে।

জগন্নাথ থামলেন। খানিক নিঃশব্দে তামাক সেবন করে পুনরায় সুরু করেন, পিতৃদত্ত জমিদার পদবিটা আজও নামের সঙ্গে জুড়ে আছে বটে কিন্তু ওর অপর আর কোন

মোহ নেই। থাকবে কি করে…অর্থভাণ্ডার যে একেবারে খাঁ খাঁ করছে। তাই বাড়ীর সঙ্গে আর ভাড়ার সঙ্গে একটা সমন্বয় রেখে চলেছি। কিন্তু এটা হল আজকের দিনের কথা, আমি যখন এ বাড়িতে প্রথম এসেছিলাম তখন সহরে বাড়ীর আকাল পড়েনি।

প্রশ্ন হল, তাহলে এসেছিলেন কেন?

জগন্নাথ জবাব দিলেন এটা তোমাদের স্থায্য প্রশ্ন, কিন্তু জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সহজ নয়—কারণ আমি নিজেই জানি না। তবে মনে হয় এসে পড়াটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা—

এবারে প্রশ্ন করেন হরেন চাটুয্যে, কিন্তু তার পরে বিশটি বছর এ বাড়ীর দুখানি ঘরে বসবাস করাটা নিশ্চয়ই আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়?

জগন্নাথ প্রসন্নকণ্ঠে বললেন, না তা নয়। ওটাকে বোধ হয় মোহ বলা যেতে পারে চাটুয্যে মশাই। ছাড়তে চাইলেও ছাড়াটা সহজ নয়।

রামনাথ সরকার বলে, তবুও যদি এটা আপনার নিজের বাড়ী হ'ত ঠাকুর্দা।

জগন্নাথ বারকয়েক মাথা নেড়ে বললেন, ভেবে নিলেই ত সব ল্যাঠা চুকে যায় ভাই। আমার ভাবতে পারলেই আমার, নইলে সবই ফাঁকি। আমারটাও ফাঁকি, তোমারটাও ফাঁকি। জগন্নাথ পুনরায় তামুক সেবনে মন দিলেন। আজকের খেলাটা কিছুতেই জমে উঠছে না। ওদের আজ কথায় পেয়েছে।

সহসা ছগনলালের আবির্ভাবে সকলের দৃষ্টি সেইদিকেই আকৃষ্ট হল। ছগন বলল, জবর খবর আছে বাবুজি—

জগন্নাথ মুখ থেকে নলটা নামিয়ে তাকালেন, চোখে তাঁর প্রশ্ন।

ছগন বলল ন' নম্বর খাঁচার চিড়িয়া উড়ে গেছে—

জগন্নাথ জিজ্ঞেস্ করেন, কে ছিল সে ঘরে ছগন ভায়া?

প্রশ্নটা ছগনলালকে করা হলেও জবাব দিল রামনাথ, বলল, সেই যে একজোড়া নতুন বর-বৌ ঠাকুর্দা। আপনার চন্দ্রনাথ আর সুচরিতা।

জগন্নাথ মুখে একপ্রকার অদ্ভুত শব্দ করে পুনরায় প্রশ্ন করলেন, তা ওরা এমন না বলে-কয়ে পালিয়ে গেল কেন বলতে পার ছগন ভাই? আমাদের রামনাথের ভরে নয়তো? ভায়ার আবার নতুনের উপর বড্ড আকর্ষণ কিনা।

জগন্নাথ মুখ টিপে টিপে হাসতে থাকেন। সেই সঙ্গে আরও অনেকে।

রামনাথ কিন্তু এসব হাসি-তামাসা গায় না মেখে বলল, ও অভ্যেস রামনাথের একটু আছে ঠাকুর্দা কিন্তু তা স্বীকার করতে সে ভয় পায় না।

জগন্নাথ পুনরায় পরিহাস-তরল কণ্ঠে বললেন, ভয়, না লজ্জা নাতি—রামনাথ জবাব দিল, দুটোই ঠাকুর্দা?

জগন্নাথ তেমনি হাসিমুখেই বলেন, দুকান কাটার তাই হয় ভাই, কিন্তু আমাদের ছগন ভায়ার কতটাকা লোকসান হল?

ছগনলাল অকারণেই লাল হয়ে উঠল। কতকটা শঙ্কিত দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বোকার মত হে হে করে হেসে বলল, তা বাবুজি, ব্যবসা করতে গেলে সবসময় মুনাফা হয় না।

রামনাথ সহসা সজাগ হয়ে উঠল। বলল, দাঁড়াও… দাঁড়াও…টাকার উপর এমন বৈরাগ্য ছগনলালের… ব্যাপারটা খুব সহজ বলে মনে হচ্ছে না। যোদ্দা আসল কথাটি খুলে বল দেখি ছগনলাল…তোমার ত আবার আসলের চেয়ে সুদের উপর নজর বেশী।

জগন্নাথ নলটা পুনরায় তুলে নিয়ে গোটাদুই লম্বা টান দিয়ে ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলতে থাকেন, কথাটা রামনাথ মন্দ বলেনি ছগনলাল। কিন্তু ছোঁড়াটা ত দিনরাত বাইরে বাইরেই কাটাত—

ছগনলাল উৎসাহিত হয়ে বলল, ঠিক ঠিক বাবুজি—

জগন্নাথ বলতে থাকেন, আর মেয়েটা খেল কি, না খেল তার পর্য্যন্ত একটা খোঁজ নেয়নি। অথচ রাত দুপুরে ফিরে এসে হাসিমুখে ভাতের থালা নিয়ে গিলতে তার লজ্জা করে না। কোথা থেকে এল পয়সা…কেমন করে এল জিনিষপত্র কি দরকার অত খোঁজ-খবরে। আচ্ছা ছগনলাল, পাখী দুটো এক সঙ্গেই উড়ে গেল বুঝি? বুদ্ধি কত এক হাট লোকের মধ্যে এসেন বাসা বাঁধতে।

রামনাথ হেসে উঠল। বলল, ঠাকুর্দা দেখছি অনেক খবর রাখেন।···রাত দুপুরে ভাতের থালা নিয়ে গিলবার দৃশ্যটিও দৃষ্টি এড়ায়নি।

জগন্নাথ প্রসন্ন হেসে বললেন, তোমার ঘরের মধ্যে কি হচ্ছে না হচ্ছে তাও কিন্তু আমার চোখে পড়ে ভায়া। মন্থুষের জিব রকমারি নতুন রান্নার স্বাদ নিতে ভালবাসে তা বলে খুনের খবর সবসময়ই থাকবে রামনাথ। আমাদের ছগনভায়ার কথাটা আরও ভাল করে জানা দরকার।

ছগনলাল বলল, এ কথা কেন বলছেন বাবুমশাই?···

জগন্নাথ মুখ টিপে হেসে বললেন, কথা দিয়েই কাজকে কুখতে হয় কিনা···তাই বলছিলাম ছগনলাল।

ছগনলাল চলে যাবার জন্ত পা বাড়াতেই জগন্নাথ পিছু ডাকলেন, এরই মধ্যে চলে যাবে! তোমার শ' নম্বর ঘরের চিড়িয়ার গল্পটা ত এখনও শেষ হল না ভায়া।

প্রশ্নটা ছগনলালকে করা হলেও জবাব দিল রামনাথ, ঠাকুর্দা যে একেবারে 'বঙ্কিমি' শেষ দেখতে চাইছেন। উড়ে যাওয়াতেও কি শেষ হয় নি?

জগন্নাথ হাসিমুখেই বললেন, ওরা যে আফিং খাওয়া পাখী রামনাথ, তাই উড়ে গেছে জেনেও ফিরে আসার পথ চেয়ে আছি ভাই। অবশ্য পথে যদি আর কেউ আটক করে না থাকে। কথাটা কিছু মিথ্যে বলেছি ছগনলাল?

ছগনলাল চঞ্চল কণ্ঠে বলল, আপনার কথা আমি বুঝতে পারি না বাবুজি।

জগন্নাথ সহসা গম্ভীর হয়ে উঠলেন, বললেন, বুঝতে খুবই কি কষ্ট হচ্ছে ছগনভাই? তুমি কি বল রামনাথ, কথাটা খুব শক্ত মনে হচ্ছে কি?

রামনাথ বলল, কিন্তু ঠাকুর্দা, ওদের নেশার বস্তু ত সঙ্গেই রয়েছে তবু একথা আপনার মনে এল কেন?

জগন্নাথ বলেন, প্রশ্নটা আমারও তাই রামনাথ, তবে মনে হয় ছগনভাই ইচ্ছে করলে আমাদের কৌতূহল মেটাতে পারে।

ছগনলাল রাগ করে চলে গেল। জগন্নাথের মুখে অর্থপূর্ণ হাসি।

রামনাথ বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলল, এ আপনার কেমন ব্যবহার ঠাকুর্দা? আমাদের নিয়ে কারণে অকারণে ঠাট্টা করেন তার একটা মানে বুঝি, কিন্তু ছগনকে নিয়ে এ ধরনের—

তাকে থামিয়ে দিয়ে জগন্নাথ বললেন, ঠাট্টা নয় বলেই ছগন পালিয়েছে রামনাথ। এবারে হয়ত এখন এক নম্বর ঘরের পাখীও উড়ে যাবে।

রামনাথের বিস্মিতকণ্ঠ থেকে বেরিয়ে এল, একথার মানে ঠাকুর্দা?

জগন্নাথের মুখে কেমন একপ্রকারের হাসি। তিনি বলতে থাকেন অত জানিনা রামনাথ—কথাটা মনে এল তাই বলে ফেললাম। ও নিয়ে মিথ্যে তোমরা মাথা ঘামিও না। তাছাড়া তোমাদের যদি ঠাট্টা করতে পারি ছগনকেই বা পারব না কেন?

হরেন চাটুর্য্যে এতক্ষণ শুনছিলেন, এবারে মুখ খুললেন, এটা আপনি যথার্থ বলেছেন ঠাকুর্দা, কিন্তু আপনার কোন্ কথাটা আমরা সত্য বলে ধরে নেব?

জগন্নাথ হেসে উঠলেন, বললেন, চাটুর্য্যে, তুমি ওকালতি ছেড়ে স্কুল মাষ্টারী বেছে নিলে কেন ভায়া?

হরেন চাটুর্য্যে জবাব দিলেন, পসার হল না বলে ঠাকুর্দা।

জগন্নাথ পরিহাস করে বললেন, তা নয় চাটুর্য্যে। আসলে তোমার ধৈর্য্য নেই।

রামনাথ বলল, কথাটা ঠিক হলনা ঠাকুর্দা, ধৈর্য্যের অভাব থাকলে কেউ কখনও স্কুলমাষ্টার হ'তে পারে না।

হরেন চাটুর্য্যে বললেন, আপনারাই বলুন রামনাথ বাবু—

জগন্নাথ হাসিমুখেই জবাব দেন, কতদিন ধরে মাষ্টারী করছ চাটুর্য্যে? সবে শুরু করেছ, না?

একনম্বর ঘরের পর্দাটা বারে বারে সরে যাচ্ছিল, সেদিকে কারুর দৃষ্টি পড়ছে না।

ছগনলালের ঘর থেকে ভেসে এল একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। ছগনের স্ত্রী কি জানি কেন ক্ষেপে উঠেছে। সেই সঙ্গে এখানে উপস্থিত সকলেই জেগে উঠেছে। জগন্নাথের মুখে অর্থপূর্ণ হাসি। তাদের খেলা না জমলেও

ওদিকের আসর বেশ জমে উঠেছে। ছগন সশব্দে তার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিল।

রামনাথ চলে গেল। সেই সঙ্গে হরেন চাটুর্য্যে এবং আরও অনেকে। জগন্নাথ একা বসে আছেন।

এক নম্বর ঘরের পর্দ্দাটা সরে গেল। মনোরমা দেখা দিয়েছে। কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে বলল, তোমার কাজ বাড়ল দাদু। এবারে ওঠো।

জগন্নাথ উঠে দাঁড়ালেন, বললেন, এক পাক ঘুরে আসছি দিদি, তুই এগুলোর ব্যবস্থা করিস।

মনোরমা বলল, এই মুহূর্ত্তে একপাক ঘুরে না এলেই কি চলে না দাদু?

জগন্নাথ হেসে বললেন, ঠাণ্ডা হলে অরুচি দেখা দিতে পারে ভাই।

মনোরমা বল্লে, ঠাণ্ডা খাবারে কিন্তু তোমার খুব রুচি দাদু!

জগন্নাথ এগিয়ে যেতে যেতে বললেন, শুধু একটা পাক দিদি—

মনোরমাও আর দাঁড়ায় না। ঘরে চলে যায়।

২

ঘুমিয়ে পড়েছে কেষ্ট সাহার, বাজার বাড়ী। এক নজরে তাই মনে হবে। মনোরমা বসে বসে ঢুলছে আর দোরের পর্দ্দাটা হাওয়ার স্পর্শে অল্প অল্প দুলছে। জগন্নাথ তখনও ফিরে আসেনি। ছগনের, রুদ্ধ দুয়ারের অন্তরালে কি ঘটেছে তা ওঁর অজানাই রয়ে গেল। কিন্তু হরেন চাটুর্য্যের ঘরের পাশে এসে তাঁকে থামতে হল। হরেন ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে তখন রাজা জয় করছেন। ছেলে মানুষ বৌটাকে লম্বা লম্বা বক্তৃতায় সম্ভবত অভিভূত করে ফেলেছেন।

হরেন চাটুর্য্যে বলছিলেন, সাধ করে কি আর ওকালতি ছেড়েছি—ওতে মনুষ্যত্ব থাকে না রমা। মিথ্যাকে সত্য আর সত্যকে মিথ্যা দিনের মধ্যে হাজার-বার করতে হয়।

রমা উত্তর দিল, তাই বুঝি স্কুলমাষ্টারী বেছে নিয়েছ।

হরেন চাটুর্য্যের হাসি শোনা গেল। তিনি জবাব দিলেন, তুমি ঠিক ধরেছ রমা। ইচ্ছে থাকলেও হ্যাঁকে না ক'রবার উপায় নেই। তখুনি মনে হবে যে, আমি শিক্ষক। আমার কাজ ছুটো কথার মানে বলে দেওয়া কিংবা খানিকটা রিডিং করতে বলা নয়। তার চেয়ে ঢের বড় দায়িত্ব আমাদের। একটা জাতির ভবিষ্যতের গোড়াপত্তনের ভার আমাদের হাতে।

রমা বলল, তবে যে লোকে বলে স্কুলমাষ্টার জন্মায় উপোস করবার জন্যে।

হরেন উচ্চহাস্য করে উঠলেন, বললেন, নিশ্চয় কেউ তোমার কান ভাঙিয়ে গেছে।

রমা হরেনের হাসিতে যোগ না দিয়ে বলল, কান ভাঙাতে হবে কেন যা সবাই জানে তা আবার নতুন করে বলতে হবে কেন?

হরেন একথার কোন জবাব দিলেন না।

রমা বলল, রাগ হ'ল বুঝি? আচ্ছা আচ্ছা ঘাট হয়েছে। স্বীকার করে নিচ্ছি যে আমাদের মাষ্টার-মশাইও কেউ-কেটা নন্, একজন কেষ্টবিষ্টু হবেন। আর তার স্ত্রীও......

রমা থামল—মুখে তার দুষ্টামীর হাসি দেখা দিল। বলল, নিজের কথাটা আর বলতে চাই না ওটা তোমার জন্ত তোলা রইল। বলেই খিল খিল করে হেসে উঠল।

জগন্নাথের কানে আসছিল স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথন। সময়ের জ্ঞান থাকে না তাঁর। একটা অকারণ পুলক আর বেদনা তাঁর বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে থাকে। বহু দূর থেকে একটা বাঁশীর সুর ভেসে আসতে চায়, স্মৃতির দীর্ঘ কতকগুলি বছর পার হয়ে।

জগন্নাথ অন্যমনস্কভাবে এগিয়ে চলেছিলেন, পুনরায় থমকে দাঁড়ালেন। ছগনলালের চাপা গর্জ্জন তাঁর কানে এল। সে তার স্ত্রীকে ধমকাচ্ছে, খুন করে ফেলব

তোকে হারামজাদী। আমার খাবে আমার পরবে আর আমারই সর্ব্বনাশ করবে।

ছগনের স্ত্রীর ব্যঙ্গমিশ্রিত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, ফের গালাগাল দেবে ত মুখে তোমার আগুন জেলে দেব। চুপ করে থাকি বলে আস্পর্দ্ধা তোমার অনেক বেড়ে গেছে।

ছগন পুনরায় একটা অশ্লীল গালাগাল দিয়ে সম্ভবত কিছু বলতে উদ্যত হয়েছিল। ছগনের বউ ফেটে পড়লো, তোকে নিয়ে যে ঘর করছি তাই তোর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি। ফের যদি একটা কথা বলবি হাটের সব লোক জড় করব তা জেনে রাখিস। তোর খাই তোর পরি··· তোর পয়সা রোজগারের মুখে আগুন জালিয়ে নিজের গায় আগুন দেব আমি। তোর পাপ ব্যবসার ষোল কলা পূর্ণ করে দেব···

ছগনলাল তার বৌয়ের মুখ চেপে ধরে। চোখে না দেখা গেলেও জগন্নাথ বুঝতে পারেন। কথায় কথায় গায় হাত দিতেও ওর আটকায় না কথায় কথায় পায়ে হাত দিতেও বাধে না।

জগন্নাথ আবার চলতে শুরু করেন।

যোগেন আচার্য্যের ঘর থেকে তেরছাভাবে একফালি উজ্জ্বল আলো এসে টানা বারান্দার একাংশ আলোকিত করে রেখেছে। আচার্য্যমশাই একরাশ বই আর পুরান সংবাদপত্রের মধ্যে চিত হয়ে শুয়ে আছেন। চোখ দুটি বোঁজা। একপাশে ছড়ান খাতা, ঝর্ণা কলম আর কালির দোয়াত।

জগন্নাথের গতিরোধ হল দরজার পাশে এসে। হেসে জিজ্ঞেস করলেন, কি হ'চ্ছে আপনার যোগেন বাবু ?......

যোগেন আচার্য্য ধীরে সুস্থে উঠে বসে সহাস্যে বললেন, টিকিন করছিলাম চৌধুরীমশাই।

টিকিন! জগন্নাথের কণ্ঠে বিস্ময়।

যোগেন আচার্য্য হো হো করে হেসে উঠলেন, টিকিন, ও জানেন না বুঝি আপনি ? আচার্য্য মশাইর কণ্ঠস্বর খাদে নেমে এল, টিকিন জোটাতে পারি না তাই বিশ্রামের নতুন নামকরণ ক'রে একটু আনন্দ পাবার চেষ্টা করি।

জগন্নাথের মুখেও হাসি ফুটে উঠল কিন্তু তার ধরন আলাদা। বললেন, ভাল ব্যবস্থা···কিন্তু এতসব কাগজপত্র আর বই নিয়ে ক'রছিলেন কি ?

যোগেন আচার্য্য জবাব দিলেন, নিত্যকর্ম্মের মহড়া দিচ্ছিলাম। রক্ বটম্ কাকে বলে জানেন ত ? সেখানে পৌঁছবার চেষ্টা করছিলাম। আমরা হলাম কাঠ সাহিত্যিক—আপনাদের রসরাজ ভক্তের মত রস-সাহিত্যিক ত নই মশাই। এসব হ'ল গিয়ে ঐতিহাসিক প্রবন্ধ। তলায় না পৌঁছাতে পারলে মুক্তার সন্ধান প'ওয়া যায় না

যোগেন আচার্য্য পুনরায় হেসে উঠলেন। কথায় কথায় উচ্চহাস্য করা তাঁর স্বভাব।

জগন্নাথ চুপ করে থাকেন।

যোগেন আচার্য্য বললেন, অসাধারণ হবার উপায় নেই। ঠিক আপনার দাবা খেলার মত। অসাবধান হ'য়েছ কি মরেছ। নিজের ব'লে চালাবার যো নেই। চতুর্দ্দিকে সব ওঁৎ পেতে বসে আছে।

হঠাৎ কথা থামিয়ে আচার্য্য মশাই জগন্নাথ চৌধুরীকে বসবার জন্য অনুরোধ জানালেন।

জগন্নাথ বললেন, এই বেশ আছি। বসলে আবার উঠতে মন চাইবে না। কিন্তু আপনি মশাই বাড়ীর দুপ্রান্তে দুখানা ঘর নিয়েছেন কেন ?

যোগেন আচার্য্য হাসিমুখে জবাব দিলেন, একটা হ'ল আমার স্ত্রীর মহল আর একটা আমার। ইচ্ছে থাকলেও একে অপরকে বিরক্ত করবার উপায় নেই। এই ত ভাল মশাই। অনেক দুর্ভাগ্যকে ঠেকিয়ে রাখবার অভিনব পন্থা।

ঐতিহাসিক সত্য··· জগন্নাথ বললেন।

যোগেন আচার্য্য মাথাটা একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে হেলিয়ে জবাব দেন, কথাটা মন্দ বলেননি চৌধুরী মশাই। দুপয়সা সের দুধ, দুটাকা মণ চাল কিংবা বারটি সন্তানের জননী হ'তে পারাটা আজ ঐতিহাসিক সত্য

বলেই আমাদের মনে হয়। বর্তমানকালের নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটাও হয়ত' একদিন ঐতিহাসিক মর্য্যাদা পাবে। অভাব থেকেই এই শব্দটির উৎপত্তি। অভাবের জন্যই এর প্রয়োজন—প্রয়োজনের জন্যই এত আয়োজন।

যোগেন আচার্য্য পুনরায় হেসে উঠলেন এবং মুহূর্তেই হাসি থামিয়ে মাদুরের একাংশ বেশ করে ঝেরে ঝুরে পুনরায় জগন্নাথকে বসবার অনুরোধ জানালেন।

বললেন, দয়া করে যখন এসেছেন তখন বসুন দুটো ভালমন্দ সুখদুঃখের কথা শুনি। পুরান কাগজ আর প্রামাণ্য পুঁথি ঘেঁটে ঘেঁটে মনটা আমার একেবারে কাঠ হয়ে গেছে।

জগন্নাথ হাসিমুখে বললেন, কিন্তু কথাবার্ত্তা ত আপনার বেশ রস-ঘন মশাই।

যোগেন আচার্য্য সহসা গম্ভীর হয়ে ওঠেন। বলেন, আপনি নিজে রসিক তাই কংক্রিটের মধ্যেও রসের সন্ধান পেয়েছেন।

আচার্য্য মশাই সহসা যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেন।

জগন্নাথ বলেন, কিছু লিখছিলেন বুঝি?

মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন যোগেন আচার্য্য, তোড়-জোড় করছিলাম। বড় পরিশ্রম চৌধুরী মশাই। স্রষ্টা সাহিত্যিক নই কিনা…মন, হাত পা সব বাঁধা। একটু এদিক ওদিক হবার যো নেই। সঙ্গে সঙ্গে টান পড়বে।

জগন্নাথ হেসে বলেন, স্রষ্টা সাহিত্যিক হতে বাধা কি?

যোগেন আচার্য্য জবাব দিলেন, বাধা অনেক। প্রথম এবং প্রধান হ'ল অক্ষমতা।

কথাটা শেষ না করেই আচার্য্য মশাই হেসে উঠলেন। বললেন, বড় মজার কথা তাই আগেই হেসে নিলাম। জানেন চৌধুরী মশাই, আমার এই অক্ষমতাও নাকি একদিন ঐতিহাসিক সত্য বলে প্রমাণিত হবে। আমার স্ত্রীর মতে আমি তার অক্ষম স্বামী। পুরান পুঁথি ঘেঁটে ঘেঁটে আমার দেহে মনেও মরচে ধরে গেছে বলে তাঁর বিশ্বাস।

জগন্নাথ চুপ ক'রে থাকেন।

যোগেন আচার্য্য বলতে থাকেন, কিন্তু দোষ আমার স্ত্রীর নয়। সরস্বতীর সাধনা করতে গিয়ে লক্ষ্মীর ঝাঁপি সবসময় শূন্যই পড়েই থাকে। তার উপর…কথাটা শেষ না করেই তিনি থেমে যান।

জগন্নাথ প্রশ্ন করেন, তার উপর কি আচার্য্য মশাই?

যোগেন আচার্য্য প্রশান্তকণ্ঠে ব'লতে থাকেন, ঐ যে মরচে ধরে যাওয়ার কথা আপনাকে ব'লছিলাম… একদিক মেজে ঘষে চকচকে করতে গিয়ে আর একদিকে আবার মরচে ধরে যায়। অভিযোগ আর অনুযোগের উকো দিয়ে ঘষে ঘষেও সেখানে জেল্লা ধরাতে পারেন না।

জগন্নাথ প্রশ্ন করেন, এ অক্ষমতা কার যোগেন বাবু?

যোগেন আচার্য্য শান্ত হেসে বলেন, কেন আমার… আর কার হ'তে পারে…

জগন্নাথ কিন্তু হাসতে পারেন না গম্ভীর হ'য়ে ওঠেন। বলেন, আমি বলি তাঁর।

যোগেন আচার্য্য সোজা হ'য়ে বসেন। তাঁর দুই চোখে একরাশ বিস্ময়। তিনি বার বার মাথা নাড়তে নাড়তে বলেন, আপনি আজ নতুন কথা শুনালেন চৌধুরী মশাই। ভাববার কথা। তিনি বলেন আমার…আমিও ভাবি আমার…আপনি ব'লছেন তাঁর…

জগন্নাথ পুনরায় বলেন, পুরান পুঁথি আর রক্ত মাংসের মানুষকে আপানরা এক পর্য্যায়ে এনে ফেলেছেন আচার্য্য মশাই। কিন্তু রক্তমাংসের উত্তাপ যদি মানুষকে না গলাতে পারে সে অপরাধ কার? অক্ষম কে? পুরান পুঁথি নিশ্চয়ই নয়।

যোগেন আচার্য্য মাথা চুলকাতে থাকেন, বলেন, কিন্তু ওর মধ্যে প্রচুর রস আছে চৌধুরী মশাই। আঁজলা ভরে পান করুন নেশায় ডুবে যাবেন। আপনা-দের ঐ মদের নেশার মত।

জগন্নাথ বলেন, মদের নেশা কিন্তু সচরাচর রক্ত-মাংসের কথাটাই মনে করিয়ে দেয়।

যোগেন আচার্য্য বিহ্বলদৃষ্টিতে জগন্নাথের মুখের পানে চেয়ে থাকেন। তাঁর কথাগুলি ভালভাবে

বুঝবার চেষ্টা করেন। বলেন, ভেবে দেখবার কথা শোনালেন চৌধুরী মশাই। এ পথে আপনার মত ক'রে আমি কোন দিন চিন্তা করিনি। তবু ত আমার মনে হয় সব নেশাই মানুষকে একই পথে টেনে নেয় না।

জগন্নাথ হেসে উঠলেন, এবং যোগেন আচার্য্যের কথাটা একপ্রকার মেনে নিয়েই বললেন, তা হয়ত' নেয় না কিন্তু ঐ মদ শব্দটারই বোধ হয় একটা মোহ আছে।

যোগেন আচার্য্য কথাটা একপ্রকার মেনে নিয়েই বললেন, তা হয়ত' আছে নইলে কাষ্ঠ রসের অবতারণা ক'রতে গিয়ে আদি রসের মধ্যে এসে পড়ব কেন চৌধুরী মশাই।

কথাকটি শেষ করেই সহসা তিনি উৎকর্ণ হ'য়ে উঠলেন এবং ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত কাগজপত্র গোছাতে শুরু করলেন।

জগন্নাথ প্রশ্ন করেন, লেখাপড়ার কাজ আজ আর হবে না বোধ হয়?

যোগেন আচার্য্য মৃদুকণ্ঠে জবাব দিলেন, কেমন ক'রে হবে বলুন—আজ শনিবার, আমার মনে ছিল না। ওদের আবার নাচ-গানের দিন। ওদেরও সেই একই সমস্যা। আদি এবং অকৃত্রিম।

জগন্নাথ অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়লেন। খানিক নিঃশব্দে কাটিয়ে শান্তকণ্ঠে বললেন, সমস্যা থাকলেই সমাধানের পথ আবিষ্কার হয় কিন্তু তার জাতও একটা নয়, পথও একটাই নেই।

যোগেন আচার্য্য বলেন, এ কথা ব'লতে পারেন।

জগন্নাথ শান্ত গলায় জবাব দিলেন, এ আমার মুখের কথা নয় আন্তরিক বিশ্বাস।

যোগেন আচার্য্য খানিক চিন্তা করে বললেন, এই ধরনের বিশ্বাস শুধু দুঃখই দেয় চৌধুরী মশাই, সেই জন্যেই আমি এড়িয়ে চ'লতে চাই।

জগন্নাথ একটুখানি হেসে জবাব দিলেন, আপনি ভয় পেয়ে গর্তে মুখ লুকাতে চাইছেন যোগেন বাবু। এতে মুখ বাঁচলেও দেহটা অক্ষত থাকবে না।

কথাকটি বলতে বলতে জগন্নাথ ঘরের বাইরে চলে এলেন এবং ধীরে ধীরে চলতে শুরু ক'রলেন।

জগন্নাথ চলে যাবার অল্পক্ষণের মধ্যেই আচার্য্য-গৃহিণী লঘুপদে এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। তার হাতে একটি কাঁচের গ্লাশ—তাতে খানিকটা দুধ।

যোগেন আচার্য্য একটু নড়েচড়ে সোজা হ'য়ে ব'সতেই স্ত্রী রাধারাণী হাতের গ্লাশটি মাটিতে রেখে নিঃশব্দে দরজাটি বন্ধ ক'রে দিয়ে স্বামীর মুখোমুখী হ'য়ে ব'সলেন।

যোগেন আচার্য্য কতকটা বিস্মিতকণ্ঠে বললেন, তুমি এমন অসময় রাধারাণী?

রাধারাণী উষ্ণকণ্ঠে জবাব দিলেন, আজ পর্যন্ত কি তার সন্ধান তুমি দিয়েছ?

যোগেন আচার্য একটু থতমত খেয়ে বললেন, তুমি কিসের কথা বলছ?

রাধারাণী মৃদু অথচ স্পষ্টকণ্ঠে জবাব দিলেন, তোমার সময়ের কথা বলছি। শুধু ইতিহাসের সময় তারিখের কাদা ঘেঁটেই গেলে। মানুষের জীবনেও যে সময় বলে একটা বস্তু থাকতে পারে তা তুমি বোঝ না।

হেসে উঠে স্ত্রীর অভিযোগকে উড়িয়ে দিতে চাইলেন যোগেন আচার্য্য। রাধারাণী ধমক দিয়ে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, সব কথা এভাবে উপেক্ষা করতে চেও না।

যোগেন আচার্য্য ভীরু কণ্ঠে জবাব দিলেন, তোমার কোন্ কথাটা আমি উপেক্ষা করেছি রাণী!

রাধারাণীর কণ্ঠস্বর খাদে নেমে এল। তিনি ফিস ফিস করে বললেন, উপেক্ষা কর কিনা সেকথা তুমিই জান কিন্তু একথাটা কেন বুঝতে চাও না যে, তোমার এই অকরুণ অনাসক্তি আর একজনার জীবনকে অপূর্ণ করে রেখেছে।

গভীর দৃষ্টিতে খানিক স্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে থেকে যোগেন আচার্য্য বলেন, সব জেনে শুনেও তুমি একথা বলতে পারবে এ আমি ভাবতেও পারি না রাধারাণী।

কেন বলব না তুমি···রাধারাণী উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, সবদিকে তোমার দৃষ্টি থাকলে আজ নির্লজ্জের মত একথা আমাকে বলতে হত না। তোমার সাধনা

আমাকে যাতনা দেয়। তুমি যখন ডুবে থাক, আমি পাগলের মত ছটফট করি। মুখ ফুটে কিছু চাই না বলেই আমার কোন আকাঙ্খা থাকতে নেই একথা তুমি ভাবতে পারছ কেমন করে!

রাধারাণী ভেঙে পড়লেন।

বিব্রতকণ্ঠে যোগেন আচার্য্য বললেন, তোমার কি শরীর ভাল নেই—

তীক্ষ্ণ চাপা কণ্ঠে রাধারাণী বললেন, শরীর আমার খুব ভাল আছে বলেই কথাটা তোমাকে আজ বলতে পেরেছি। বলতে পার তুমি বিয়ে করেছিলে কেন?

যোগেন আচার্য্য বলেন, তুমি আজ এত উত্তেজিত হয়ে উঠেছ কেন রাধারাণী।

রাধারাণী আপন খেয়ালেই বলে চলেছেন, তোমার অনেক বাজে ওজুহাত আমি শুনেছি কিন্তু, ভাল লাগে না আর। আমি সাধারণ মানুষ—তাদের মত করেই বাঁচতে চাই আমি।

যোগেন আচার্য্য সখেদে বললেন, মরা মানুষ কখনও বাঁচে না রাধারাণী।

রাধারাণী জোর দিয়ে ব'ললেন, আমি আশাবাদী।

যোগেন আচার্য্য জবাব দিলেন, সেত দেখতেই পাচ্ছি, নইলে তোমার মনে আজ এ রাগ-অনুরাগের খেলা দেখা যেত না। কিন্তু এ সব কথা থাক, তার চেয়ে তোমার উদ্দেশ্যটা কি বলো।

রাধারাণী রাগতকণ্ঠে বললেন, অজ্ঞতার ভান করে তুমে পাশ কাটাতে চাইলেও আমি আর চুপ ক'রে থাকতে রাজী নই। মরেও মানুষ বেঁচে থাকে নইলে এই বাজারবাড়ীর ঘরে ঘরে হাসি-কান্নার সাক্ষাৎ মিলত না। তুমি ভীরু, তুমি কাপুরুষ তাই বড় বড় কথার আড়ালে নিজের অক্ষমতাকে চেপে রাখতে চাও। নিজের উপর বিশ্বাস নেই ব'লেই...

রাধারাণী...যোগেন আচার্য্য গর্জ্জন করে উঠলেন। তাঁর ভিতরের ঘুমন্ত পুরুষ অকস্মাৎ জেগে উঠেছে। চোখে দেখা দিল আগুনের শিখা। রাধারাণী ভয় পেলেন না। হাসিমুখে এগিয়ে গেলেন। সেই আগুনের শিখায় ঝাঁপিয়ে প'ড়ে কৃতার্থ হলেন।...

রাধারাণী দুধের খালি গ্লাসটি হাতে করে এগিয়ে চলেছেন। চোখে মুখে তাঁর জয়ের আনন্দ।

ও পাশের ঘরে নৃত্য-গীতের ঝড় বয়ে চলেছে। যোগেন আচার্য্য তাঁর ছেঁড়া মাদুরের উপর চিত হ'য়ে শুয়ে আছেন। সর্ব্বাঙ্গ তাঁর ঘামে ভিজে গেছে। ঠোঁটের কোণে কেমন একপ্রকারের হাসি। হয়ত আর একবার নতুন ক'রে তাঁর নিজের কথাটাই মনে পড়েছে। এ প্রান্তে আমার মহল ও প্রান্তে স্ত্রীর। অনেক দুর্ভাগ্যকে ঠেকিয়ে রাখবার এ এক অভিনব পন্থা।...

নৃত্যগীত পুরোদমে চলেছে। যোগেন আচার্য্য চোখ বুজে শুনছেন। এই মুহূর্তে তাঁর নেহাত মন্দ লাগছে না। এত পরিশ্রম ক'রে লেখা প্রবন্ধের খান-কয়েক পাতা একটা দমকা হাওয়ার ঘরের এ পাশ থেকে ও পাশে উড়ে গেল খর খর শব্দ করে। যোগেন আচার্য্যের কানে গেল। নৃত্যের তালে তালে ঘুঙুর কথা বলে চলেছে। উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে সারওয়াগী। বাহবা দিচ্ছে তার সেক্রেটারী। উচ্ছ্বাসে আর চপল-হাস্যে ফেটে প'ড়ছে কবিতা আর মায়া সিনহা। ওরা দু বোন। বুড়ো বাপ ব্রজ সিনহার কাশির শব্দটাও মাঝে মাঝে শোনা যায়। হাঁপানীতে শয্যাশায়ী। একমাত্র ভাই কুঞ্জ ট্যাক্সি চালায়। পয়সা পায় কিন্তু নিজের প্রয়োজন মিটিয়ে কোন সময়ই অবশিষ্ট কিছু থাকে না। কাউকে নিয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় না। নিজের কাজের কৈফিয়ৎ দিতে না হ'লেই সে খুশী। রাতে প্রায়ই বাড়ী ফেরেনা। প্রথম প্রথম কবিতা বাধা দিয়েছে—সংসার খরচের জন্য দাবি জানিয়েছে। কিন্তু পায়নি। বহুদিন বড় দুঃখে কেটেছে বুড়ো বাপকে নিয়ে। একে বুড়ো তায় হাঁপানীর রোগী। শেষপর্য্যন্ত একটা পথ ওরা পেয়েছে। কবিতার কণ্ঠ আর মায়ার চরণযুগল ওদের বাঁচার পথ দেখিয়েছে।

সারওয়াগী রসিক লোক। ওরা তাঁরই আবিষ্কার। সপ্তাহে দুটি সন্ধ্যা তিনি এখানে কাটান। ওদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত তিনিই দিয়ে থাকেন। ব্রজ সিনহার চিকিৎসার ব্যবস্থারও কোন ত্রুটি রাখেনি সারওয়াগী। এক কথায় এই পরিবারটির সুখ দুঃখ

ভাল মন্দ সব কিছুর দায় এবং দায়িত্ব সে নিজের মাথায় তুলে নিয়েছে।

কবিতা মাঝে মাঝে বলে, সারওয়াগী সাহেব আমাদের জন্ত এত বেশী কেন করেন। লোকে যে ভাল চোখে দেখে না।

সারওয়াগী হাসিমুখে জবাব দেয়, ওটা লোকের দোষ নয়—আমারই দোষ।

কবিতা বল্লে, ভাল বুঝলাম না।

সারওয়াগী বলে, আমি যে কেন এত দাদন দিচ্ছি কথাটা ওদের জানিয়ে দিলে আর কোন কথা ভাববে না। আমি ব্যবসাদার লোক—হিসেব আমার কিছু কিছু জানা আছে। লাভ লোকসান আমি ভাল বুঝি।

মায়া বলল, আমাদের জন্ত এত খরচ ক'রছেন কোন্ লাভের আশায় সারওয়াগী সাহেব?

সারওয়াগী খুব খানিক হেসে নিয়ে বলল, ব্যবসায় সবসময় লাভ হয় না মায়া বহিন। একদিকের লোকসান আর একদিকে পুষিয়ে দেয়।

ব্রজ সিনহার কাশিটা হঠাৎ মাত্রাধিক বেড়ে উঠেছে, সারওয়াগী খানিক কান পেতে শোনে। কবিতার পানে দৃষ্টি ফিরিয়ে বলে, তোমার বাবাজির কাশিটা খুব তেজী হ'য়ে উঠেছে—বড়িটা কি ফুরিয়ে গেছে কবিতা সিনহা?

প্রশ্নটা কবিতাকে করা হলেও জবাব দিল মায়া, না ফুরায়নি, কিন্ত বড়িতে আর কাজ হ'চ্ছে না। বিশেষ ক'রে রাতের দিকে কাশিটা বাড়তেই থাকবে।

সারওয়াগী দুঃখিত হ'য়ে বলল, খুব আফশোসের কথা মায়া বহিন। এই কাশিটা বড় তকলিপ্ দেয়। আমার বাবার ছিল। তা আমি বলছিলাম কি… দাওয়াইটা ডবল্ করে দিলে কেমন হয়?

এ প্রশ্নের জবাব দিল কবিতা, কিন্ত আপনার ঐ দাওয়াইটা ডাক্তারসাহেব বেশী খেতে নিষেধ ক'রেছেন, নিতান্ত অসহ্য না হ'লে…

সারওয়াগী বার বার মাথা নেড়ে জবাব দেয়, আমার পিতাজিকেও ডাক্তার ঐ কথাই বলতেন। কিন্ত তিনি শুনতেন না।

ব্রজ সিনহার কাশির শব্দে, ওদের আলোচনা পুনরায় থেমে গেল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বের নৃত্য-গীতের মিষ্টি রেশ এইমুহূর্ত্তে আর খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কঠিন বাস্তবের একঘেয়ে শ্রীহীন ঘং ঘং শব্দটাই সকলের কানে প্রতিধ্বনিত হ'তে থাকে।

সারওয়াগীর মাত্রাবোধ আছে। রূপপিপাসু মন তার উন্মাদ নয়—নিয়ম মেনে চলে। সে বলল, মায়া বহিন্ তোমার ঘুঙুর খোল আর কবিতা সিনহা তোমার তানপুরা তোল। তোমাদের পিতাজির এখন আরাম দরকার।

ব্রজ সিনহা সম্ভবত ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। এ ঘরে কারুর মুখে আর কথা নেই। শুধু খুলে ফেলবার সময় মায়ার পায়ের ঘুঙুর বারকয়েক আর্ত্ত প্রতিবাদ জানাল। তানপুরাটা ততক্ষণে খোলের মধ্যে আশ্রয়লাভ করেছে।

সারওয়াগীর সেক্রেটারী ভ্রূ কুঞ্চিত করে উঠে গেল। তার জুতার শব্দ মিলিয়ে যেতে কবিতাকে কাছে ডেকে সারওয়াগী এক গোছা নোট তার হাতে গুঁজে দিল। বলল, তোমাদের এক সপ্তাহের খরচ এতেই চলে যাবে কবিতা সিনহা। কাল সকালে আমি ডাক্তার পাঠাব তোমার পিতাজিকে দেখে যাবার জন্ত।

কবিতা নোটগুলি হাতে নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। মায়া ঘুঙুরগুলি অকারণে ছুঁড়ে ফেলে দিল। পা থেকে হাতে উঠেছিল হাত থেকে আবার ঘরের কোণে আশ্রয় পেল।

শব্দে কবিতার তন্ময়তার ঘোর কেটে গেল। সে ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলল, আমি যে মরমে মরে যাচ্ছি সারওয়াগী সাহেব।

সারওয়াগী একটু হেসে বলল, আমি তোমাদের মরণের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি কবিতা সিনহা। তুমি কি বল মায়া বহিন!

মায়া বলল, কেউ মরবার জন্তে বাঁচে আবার কেউ

মরে বাঁচে। মায়া খিল খিল করে হেসে উঠল।

সারওয়াগী বলে, তোমার কথাগুলো বড্ড ঘোরাল আর ধারাল মায়া বহিন।

মায়া ভ্রুভঙ্গী করে জবাব দেয়, কেটে দু'টুকরো ক'রে ফেলবার আগে টের পাওয়া যায় না—

কবিতা ধমক দেয়, বাজে বকিস না মায়া—

সারওয়াগী ক্ষুণ্ণ হ'য়ে বলে, আমি কিন্তু মরবার জন্ম তোমাদের বাঁচাতে চাইছি না।

কবিতা মৃদুকণ্ঠে বলল, সেইজন্যই আমার এত সঙ্কোচ। আপনি মায়ার কথায় কান দেবেন না।

সারওয়াগী বলল, তোমরা ত ভিক্ষে নিচ্ছ না কবিতা সিনহা। মেহনৎ করে পারিশ্রমিক নিচ্ছ। এতে লজ্জা কিংবা সঙ্কোচের কিছু নেই।

ব্রজ সিনহার কাশিটা আবার দেখা দিয়েছে।

মায়া ভ্রু কুঞ্চিত করে বলল, বাবা বোধ হয় তোমাকে ডাকছেন দিদি—

কবিতা অকারণে রাঙা হ'য়ে উঠল।

সারওয়াগী বিদায় নিয়ে চলে গেল। কবিতা স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সারওয়াগীর দেওয়া টাকাগুলি তার হাতের মুঠার মধ্যে। পাশে দাঁড়িয়ে মায়া। পাশের ঘরে তার বাবা ব্রজ সিনহা। যার কাশিটা সময় বুঝে বেড়ে যায়।

মায়া ফিস ফিস করে বলে, অত ভাবছ কি দিদি। সারওয়াগী সাহেব টাকা দিয়েছেন তোমাকে, তুমি দিয়ে এস বাবাকে। তোফা আছি আমরা। তুমি গান গাও আমি নাচি। আমাদের দাদা গাড়ী চড়ে বেড়ায়।...

কবিতা চাপাকণ্ঠে ধমক দেয়, চুপ কর মায়া—

মায়া চুপ করল বটে কিন্তু তার দুচোখ কেটে জল আসতে চাইছে। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলল, কোন কথাই যদি ব'লতে দেবেনা তাহলে বুক ফেটে মরে যাব যে দিদি ভাই।

এবারে আর কাশি না। স্পষ্ট আহ্বান। আমার ওষুধটা দিয়ে যাও কবিতা। হাঁপানির টানটা বড় বেড়েছে।

কবিতা একবার হাতের টাকাগু'লি দেখে নিল। এগুলি ভিক্ষালব্ধ নয়। রীতিমত রোজগার ক'রেছে তারা। তার কণ্ঠ, মায়ার চঞ্চল দুখানি পা আর সারওয়াগী সাহেবের রসপিপাসু মন এই তিনের একত্র সমাবেশ তাদের অর্থাগমের পথ খুলে দিয়েছে। আজ আর কোন অভাব নেই তাদের। কিন্তু এই নোটগুলির মধ্যে কোথাও কি কালির ছিটে লাগেনি?

মায়া কবিতার চিন্তান্বিত মুখের পানে খানিক চেয়ে থেকে গম্ভীরকণ্ঠে বলল, যখন নিতেই হচ্ছে তখন আর ভেবে লাভ কি। সত্যি বলছি দিদিভাই, তোমাদের কারুকেই আমি ঠিক বুঝতে পারি না।

ব্রজ সিনহার কণ্ঠস্বর আর এক পর্দা উপরে উঠল, সবাই কি কানে তুলো গুঁজে আছ?

তুলো গুঁজবো কেন? সাড়া দিয়ে কবিতার পরিবর্তে মায়া এগিয়ে গেল। কি চাই তোমার বল?

ব্রজ সিনহার মুখে কথা যোগাল না। মনে হ'ল তিনি হাঁপাচ্ছেন।

মায়া আরও কিছু সময় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে পুনরায় ফিরে এল। মৃদুকণ্ঠে কবিতাকে উদ্দেশ ক'রে বলল, কি এত ভাবছ দিদিভাই?

কবিতা ক্লান্ত হেসে বলল, ভাববার সত্যিই কিছু নেই মায়া?

মায়া বেজে উঠল, ছাই আছে। আমাদের প্রয়োজন —ওদের উদ্বৃত্ত। ওরা দিচ্ছে আমরা নিচ্ছি—

কবিতা অন্য প্রসঙ্গ তুলে বাধা দিল, বাবা ডেকেছিলেন কেন, বললিনা ত'?

মায়া একটু হেসে জবাব দিল, পুরাণ কথা নতুন করে মনে করিয়ে দেবার জন্য। তোমার হাতের টাকাগুলো এখনও যথাস্থানে পৌঁছে যাওনি কেন তার জবাব দিয়ে এস। কিন্তু আমার কথাটার ত' কোন জবাব দিলেনা দিদি।

কবিতা ম্লান হেসে বলল, থাকলেই কি সকলে দেয় মায়া? আর দিলেই সবসময় তা নেওয়া চলে? ভাবছিলাম আর কতদিন এভাবে চলবে।

মায়া বলল, যতদিন আমরা দিতে পারব ততদিনই

চলবে দিদিভাই। আগে থেকে মিথ্যে ভেবে লাভ নেই।

কবিতা বলল, তোর কি কান অথবা মন বলে কোন পদার্থ নেই মায়া? ওদের কথায় আমার যে সর্ব্বাঙ্গে ঘা হ'য়ে গেল :...

মায়া বলল, যারা কাজ করে না তারাই কথা বলে। ওদের কথায় কান দিতে গেলে আমাদের মত দুঃখীদের চলে না।

কবিতা একটা জবাব দেবার জন্যে মুখ তুলেই সহসা চমকে উঠল। জবাব দেওয়া হ'ল না।

কুঞ্জ ততক্ষণে টলতে টলতে ঘরে প্রবেশ করেছে। কবিতা ভাইকে দেখে টাকা লুকাতে গিয়ে ধরা পড়ল।

কুঞ্জ টেনে টেনে হাসতে থাকে। বলে, লুকাচ্ছিস কেন রে। বেশ ত' রোজগার ক'রেছিস আজ। মাইরি খাসা রোজগার করেছিস ভাই...

মায়া চিৎকার করে উঠল, দাদা—

কবিতা ওর মুখ চেপে ধরল; বলল চুপ কর মায়া, ওর কি জ্ঞান আছে।

জ্ঞান নেই?...কুঞ্জ তেমনি টেনে টেনে হাসতে থাকে, আলবৎ আছে। শুধু টাকা নেই। নিজের কামিজের পকেটগুলো উল্টে-পাল্টে দেখিয়ে পুনশ্চ জড়িত কণ্ঠে বলতে থাকে, একদম গড়ের মাঠ...শূন্য...পাখীর মত ডানা মেলে উড়ে গেছে। দে বোন...তোর টাকাগুলি একবার আমার হাতে দে...দেখবি কেমন ডানা গজিয়ে উঠবে...হাঃ হাঃ হাঃ ...

কুঞ্জ আরও কয়েক পা এগিয়ে আসতে কবিতা তাকে চাপা ধমক দিল, তোমার লজ্জা করে না—

কুঞ্জ আর একদফা হেসে ওঠে বলে, লজ্জা! লজ্জা ক'রবে কেন? তোর আছে...আমার নেই...আমার দরকার আমি নেব...এতে আবার লজ্জা কি? দে বোন ...টাকা কটা আমায় দিয়ে দে...আমি আর টু শব্দটি ক'রব না। এক্ষুণি চলে যাব...বাগী অনেকক্ষণ পথ চেয়ে বসে...

মায়া পুনরায় গর্জন করে উঠল, নির্লজ্জ বেহায়া... তুমি এত দূরে নেমেছ...

কুঞ্জ রুখে দাঁড়াল, খবর্দ্দার খেন্তি ...ছোট মুখে ফের বড় কথা ব'ললে তোর দাঁত ভেঙে দেব। হু...আমার নাম কুঞ্জ সিংহি...আমি অধঃপাতে গেছি, না তোরা গেছিস। তুই খেন্তি আর ঐ বুড়ো শয়তানটা।

গোলমাল শুনে দেওয়াল ধরে ধরে ব্রজ সিনহা উঠে এসেছিলেন, সহসা তিনি চিৎকার করে উঠলেন, হারামজাদা দূর হ'য়ে যা...

কুঞ্জ একটা কুশ্রী ইঙ্গিত করে পুনরায় বলল, বেশ ব'লেছ বাবা...খাসা ব'লেছ বাবা। তোমার ত' ছেলে কত আর ভাল হব। লজ্জায় আর ঘেন্নায় আমারই যে কান্না পাচ্ছে...কুঞ্জ হাত আর মুখ নেড়ে কান্নার অভিনয় করতে থাকে। তারপরে মুখ ভেঙিয়ে বলে, আমি নচ্ছার... আমি হারামজাদা...আর তুমি তুমি কি বুড়ো শয়তান? ...নিজের মেয়েদের দিয়ে রোজগার করিয়ে...

মাটির উপর পড়ে থাকা ঘুঙুর আবার হাতে উঠল। হাতে উঠেছে মায়ার। তার পরেই তা ছুটে গেল কুঞ্জর দিকে কিন্তু কুঞ্জকে তা আঘাত না করে ক'রল দেওয়ালে টাঙান তানপুরাটাকে। একটা বেসুরো আর্ত্তনাদ উঠল। তার ছিঁড়েছে তানপুরার।

কুঞ্জর কোনদিকে খেয়াল নেই। তার দৃষ্টি কবিতার হাতের টাকার প্রতি। সে একবার সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার চেষ্টা ক'রল। তারপর টলতে টলতে কবিতার দিকে এগিয়ে চলল। ভাল কথায় দিবিনে দেখছি...খুব সাহস বেড়েছে...আমিও কুঞ্জ সিংহি—

মায়া ছুটে দুজনার মাঝে এসে সোজা হয়ে দাঁড়াল। তীব্র শ্লেষ করে বলল, মদ খেয়ে মাতাল হয়ে এসে আবার অপরের কাজের সমালোচনা করা হচ্ছে। বুড়ো বাপ আর দুটো অসহায় বোনের দায়িত্ব নেবার কথা কার? সে দায়িত্ব কেন পালন করনি? কেন বুড়ো বাপের যথাসর্ব্বস্ব ঠকিয়ে নিয়েছ?

মায়া উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে—কাঁপছে তার দুখানি পাতলা ঠোঁট। আগুন ঠিকরে পড়ছে তার দুচোখ থেকে।

কবিতা নড়ছেও না, কথাও বলছে না। অচল কাঠের মত দাঁড়িয়ে আছে।

কুঞ্জ ক্যাক ক্যাক করে হাসতে থাকে। বলে, ইরি বলছি খেপ্তি তুই সরে যা…আমি দিব্যি গালছি াকটা পেলেই চলে যাব। সরে যা বলছি…

এতক্ষণে কবিতা সামলে নিয়েছে। সে সোজা হয়ে ড়াল—দৃঢ় কঠিনকণ্ঠে বলল, তুই সরে যা মায়া, ওর য্য থাকে আমার কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাক।

কুঞ্জ বলতে থাকে, হ্যাঁ…হ্যাঁ…তুই সরে যা খেপ্তি। ম্তি তোর মত অত বেরসিক নয়। দে…দে…বোন কা কটা ছাড়…আমি লক্ষ্মীছেলের মত সুড় সুড় করে স্তানায় ফিরে যাই…

দিচ্ছি…কবিতা গর্জন করে উঠল, তার আগে গন্নাথ দাদুকে দিয়ে থানায় একটা খবর পাঠিয়ে দিয়ে াসছি।

কবিতা চোখের পলকে ঘর থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

কুঞ্জ এতক্ষণে কিছুটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বলল, া বাব্বা…এরা সবাই বড় বেয়াড়া বোল তুলতে সুরু করেছে। ভদ্দর লোকের বাড়ীতে আবার থানা পুলিশ-কেন বাবা…

ব্রজ সিনহা এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। কুঞ্জর শেষ কথায় সহসা তিনি হুঙ্কার ছাড়লেন, হারামজাদা পাজী, বংশের কুলাঙ্গার—তুই জানিস নে কেন তোর পেছনে পুলিশ ঘুরছে। আসুক পুলিশ আমি নিজে হাতে তোকে বালা পরিয়ে দেব।…তিনি হাঁপাতে থাকেন।

কুঞ্জ বিকৃতকণ্ঠে বলল, সে বালা তুমি নিজের হাতে পরো শয়তান। যা বাব্বা এখানেও পুলিশ গন্ধ পেয়েছে। কুঞ্জ টলতে টলতে প্রস্থান করল।

ধীরে ধীরে দরজা ঠেলে ঘরে প্রবেশ করলেন জগন্নাথ। মনোরমা খাবার আগলে চুপ করে বসে আছে।

সাড়া পেয়ে মুখ তুলে সে বলল, আজকের ডিউটি একেবারে শেষ করে এসেছো ত' দাদু? না আবার বেরুতে হবে?

জগন্নাথ মৃদু হেসে জবাব দিলেন, মনে হচ্ছে আর বেরুতে হবে না দিদি। আজকের মৌতাতটা বেশ জোর হয়েছে ভাই। দে দেখি কি খেতে দিবি।

মনোরমা অনুযোগ দিয়ে বলে, হাত মুখ ধুয়ে নেবে, তবে ত খেতে দেব। কিন্তু তার আগে একটা কথা শুনে রাখ। কাল থেকে সত্যিই আমি আর তোমার জন্যে বসে থাকব না। তুমি বড় অবুঝ দাদু।

এই একটা কথা আর কতবার বলবি দিদি? জগন্নাথ জিজ্ঞেস করেন।

মনোরমা হেসে ফেলে জবাব দেয়, যতদিন না তোমার অভ্যাস পালটায়।

পালটাবে দিদি পালটাবে…একদিন সত্যিই পালটাবে। জগন্নাথ হাসতে হাসতে বলেন, সেদিন কিন্তু আফশোস করবি। এই বুড়োর উপর যত উপদ্রব করেছিস তার জন্যে ব্যথা পাবি।

মনোরমা নিরীহকণ্ঠে বলল, এ তোমার অঙ্কশাস্ত্র নয় দাদু। একের পরে সব সময় দুই হয় না দাদু। তোমার আগে আমিও সরে পড়তে পারি।

জগন্নাথ হঠাৎ চমকে ওঠেন, দিদি—

মনোরমা বলে, তোমার উপর আমি বুঝি উপদ্রব করি দাদু?

জগন্নাথ বলেন, তা একটু করিস ভাই। এই বুড়োর ওপর অত নজর দেওয়া মানেই উপদ্রব করা। একটু কম করে যত্ন করিস। দুদিন আগে যেতে পারব।

মনোরমা মাত্রাধিক গম্ভীর হয়ে বলল, এটা তোমারই উপযুক্ত কথা। তারপরে মনোরমা যে হোক এক হতভাগার হাত ধরে পথে নেমে পড়ুক। কিন্তু একটা কথা আজ তোমাকে আমি জানিয়ে রাখছি দাদু, যদি তেমন দিন কখনও আসে তবে সেখানে গিয়েও যাতে শান্তি না পাও তার ব্যবস্থা আমি এখানে থেকেও করব।

জগন্নাথ হাসিমুখে বলল, রাগ করলি বুঝি দিদি?…

না, খুশীতে বুক আমার একেবারে ভরে উঠেছে। মনোরমা জলে উঠে বলে, দিন দিন তুমি কি হ'চ্ছ দাদু!

জগন্নাথ খানিক চোখ বুজে থেকে একসময় ধীরে ধীরে বলতে থাকেন, ভাবলে কথাটা ত' মিথ্যে নয় ভাই। তুমি রাগ অথবা দুঃখ করলেও বয়েসটা আমার কিছুতেই থেমে থাকবে না। কিন্তু যাকগে ওসব কথা, দেখি কি অমৃত দাদুর জন্যে সাজিয়ে রেখেছ।

মনোরমা আর দ্বিতীয় কথা না বলে জগন্নাথের খাবার এগিয়ে দিল।

জগন্নাথ দ্রুত হাত মুখ ধুয়ে এসে খেতে বসলেন এবং একাগ্রচিত্তে আহারে প্রবৃত্ত হলেন।

মনোরমা সেইদিকে খানিক চেয়ে থেকে একসময় মৃদু হেসে বলল, খুব খিদে পেয়েছে বুঝি দাদু?

জগন্নাথ খেতে খেতে মুখ তুলে তাকালেন। বললেন, হঠাৎ একথা কেন?

মনোরমা হাসিমুখে বলে, নইলে কাঁচকলার তরকারী কেউ অমন করে চেটে পুটে খায় না।

জগন্নাথ হো হো করে হেসে উঠলেন।

মনোরমা বিস্মিতকণ্ঠে বলল, অমন করে হাসছ কেন দাদু?

জগন্নাথ সহসা গম্ভীর হয়ে উঠে বললেন, সত্যি কথা বললে তুমি সবসময় উড়িয়ে দাও তাই বলি না। নইলে এই থোড়ের ডালনা, কাঁচকলার তরকারী আর আলু পটলের—

কথার মাঝে বাধা দিয়ে থামিয়ে দেয় মনোরমা। তারপর নিজেই কথাটাকে সমাপ্ত করে। বলে, আর সোনা মুগের ডালটির তুলনা হয় না।

জগন্নাথ বলেন, সত্যিই তুলনা হয় না দিদি। তোমার এই দাদুটির জিভ বহু দেশের নানা রকমের রান্নার স্বাদ নিয়েছে কিন্তু আমাদের একমাত্র শুক্তনির সঙ্গেও তাদের তুলনা হয় না।

জগন্নাথ একটু থেমে পুনরায় বললেন, ঐ সব পশ্চিমিদের খানাপিনার নামগুলোরই যা বাহারী, যেমন—

মনোরমা হেসে বলল, যেমন ফিস্ ওরলে—অর্থাৎ ব্যাসন দিয়ে মাছ ভাজা। বেনানা ফ্রিটার্স কিনা কলার পিঠে। কি বল দাদু—

জগন্নাথ হাসিমুখে বললেন, উঁহু, মাত্র দুটো নাম করেই পুরো নম্বর পাওয়া যায় না দিদি। বল, ইটালিয়ান স্প্যাগাটি, ম্যাকরনি উইথ টমাটো সস্, গ্যাটো মোকা, সুইস্ রোল্। তারপরে ধর, আইরিসস্টু, ব্রাউনস্টু, ডেভিলড্ ডাক, স্প্রিং চিকেন, পোর্ক লয়ন চপ, সিপ্ টাং মাসে, ভিনডালু কারি, কুফ্তা কারি।

মনোরমা খিল খিল করে হেসে উঠল, বলল, কোন হোটেলের খানসামা ছিলে তুমি দাদু? নামগুলো ত' বেশ মনে করে রেখেছ।

জগন্নাথ মাথা দোলাতে থাকেন, দুনিয়াটা বড় আজব জায়গা দিদি। সুযোগ মত দু চারটে বড় বড় কথার নাম আউড়ে যাও দেখবে, তেমন তেমন লোকের চোখেও তুমি জাতে উঠে যাবে। তা তুমি তোমার দাদুকে বাবুর্চিই বল আর খানসামাই বল।

মনোরমা মৃদু মৃদু হাসতে থাকে।

জগন্নাথ দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, হাসির কথা নয় ভাই। একদম খাঁটি সত্যি। ঐ যে তোমার ঐ হতভাগা সাহিত্যিকটা—কোনদিন কিছু হবে মনে করেছ ওর। অন্ধকার ঘরে বসে দিন রাত কলম ঘষে ঘষেই মরতে হবে। না হবে প্রতিষ্ঠা—না চোখে দেখবে দুটো পয়সা। ওকে বাইরে যেতে বল—দল গঠন করতে বল। নিজের বিজ্ঞাপন নিজেকে—

বাধা দিয়ে মনোরমা বলল, এ তোমার গায়ের জোরের কথা দাদু। তাঁর লেখায় যদি ধার এবং ভার থাকে তাহলে একদিন তাঁর সমাদর হবেই। সাধনাই সিদ্ধি নিয়ে আসবে।

জগন্নাথ মাথা নেড়ে বলেন, কিন্তু তার আগেই ধার "ওকে কেটে টুকরো ক'রবে আর 'ভার' দেবে মাটি চাপা। ওকে আলোয় আসতে হবে। ভিতরে কিছু থাক না থাক মুখে বড় বড় কথা ব'লতে হবে। বাছাবাছা বিদেশী লেখকদের শ'খানেক নাম কণ্ঠস্থ করে সুযোগমত আউড়ে যাও--কিছু বোঝ আর না বোঝ তর্কের ঝড় তুলে প্রতিবাদ কর। সুবিধে আপনি আদায় হবে। ওসব সাধনা-টাধনা স্রেফ ধাপ্পাবাজি আজকের দিনে। আসলে হল বিজ্ঞাপন। নিজের বিজ্ঞাপন নিজেকেই করতে হবে। অপরের অত সময় কোথায়—

মনোরমা ধমক দিয়ে বলল, আগে তোমার আহারপর্ব্বটা শেষ করে নাও দাদু! আমাকেও এর পরে খেতে হবে।

জগন্নাথ লজ্জিত হ'য়ে বললেন, বয়েস হলেই মানুষের বুদ্ধিটা ঢিলে হ'য়ে যায় ভাই।

সহসা তিনি অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে আহারে প্রবৃত্ত হলেন। এবং দ্রুত আহার-পর্ব্ব শেষ করে উঠে পড়লেন।

মনোরমা পান-তামাকের ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজে খানদুই রুটি নিয়ে বসতেই জগন্নাথ বললেন, তোর খুব কষ্ট হয় বুঝি দি'দি কিন্তু কি জানিস ভাই, যাবার আগে দুপাক ঘুরে না এলে খিদেটা তেমন জুতসই হয় না। এই যে এতখানি বয়েস হ'য়েছে আমার, পারিস আমার সঙ্গে খাওয়ায় পাল্লা দিতে? পারবিনে। আমার মত দুপাক ঘুরবার অভ্যেস কর দেখবি—

বাধা দিয়ে মনোরমা বলে, তার পর তোমার সঙ্গে মাথা ঠোকাঠুকি ক'রে মরি আর কি! তাছাড়া তোমার হেঁসেল আগলাবে কে শুনি?

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে জগন্নাথ নিঃশব্দে তামাক খেতে লাগলেন।

মনোরমা একটু হেসে বলল, কি দাদুভাই একেবারে থেমে গেলে যে—

জগন্নাথ ব'ললেন, থামিনি ভাই, ভাবছিলাম ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে। সংসার ত তোমার একটি নয় দিদি। আমি রেহাই দিলেও তুমি রেহাই পাবে কি? ভেবেচিন্তে বরং আর এক সময় কথাটা আমায় জানিয়ে দিও। দেখি, ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূরণ করা যায় কি না।

কিছুমাত্র না দমে মনোরমা জবাব দিল, তা বলে তোমার মত অকারণে মাথা ঘামাতে চায় না মনোরমা। মানুষ বিপদে পড়লে মানুষেই তার পাশে দাঁড়ায়।

জগন্নাথ বলেন, সব কাজের পেছনেই একটা কারণ থাকে দিদি ভাই। তোর দাদুও কিছু মিথ্যেটহল দিয়ে বেড়ায় না।

মনোরমা বলল, তোমার কিন্তু এটা একটা নেশা।

কথাটা মেনে নিয়ে জগন্নাথ জবাব দিলেন, সত্যি কথা কিন্তু সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কাজের পেছনে নেশা আছে বলেই কাজ এগোয়। নইলে পৃথিবী অচল হ'য়ে পড়তো।

মনোরমা কথা বলতে ব'লতেই খাওয়াটা প্রায় শেষ ক'রে এনেছিল।

জগন্নাথ ব'লে চ'ললেন, তবে এ কথা তুমি বলতে পার দিদি এই নেশার আলাদা আলাদা জাত আছে।

মনোরমা হেসে বলে, সেইজন্যেই কেউ নেশার বশে আফিং খায় আবার কেউ পরের সেবা ক'রতে ভালবাসে।

জগন্নাথ কিছু বলবার জন্যই মুখ তুলেছিলেন। সহসা ভেজান দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে যেতে তিনি সেই দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। মৃদুকণ্ঠে সাড়া দিলেন, কে ওখানে?

আমি বাবুজি—বলেই ঘরে প্রবেশ ক'রল ছগনের স্ত্রী এবং কারুর কোন কথার অপেক্ষা না রেখে নিঃশব্দে দরজায় খিল তুলে দিল।

মনোরমা একবার তার দাদুর একবার ছগনের স্ত্রীর মুখের পানে চেয়ে দেখে থালা-বাসনগুলি তুলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

ছগনের স্ত্রী পুনরায় বলল, আপনাকে দিক ক'রতে এলাম।

জগন্নাথ সহজ কণ্ঠে বললেন, সেত দেখতেই পাচ্ছি কিন্তু তুমি অমন করে হাঁপাচ্ছ কেন?

ছগনের স্ত্রী জ্বালাভরা কণ্ঠে বলল, সেই কথা জানাবার জন্যেই এসেছি। দুষমণটা আমার গলা টিপে মারবার ফিকির করেছিল। আমি পালিয়ে জান বাঁচিয়েছি বাবুজি।

জগন্নাথ একটু নড়েচড়ে বসে মৃদুকণ্ঠে বললেন, তোমাকে মেরে তার লাভ?

ছগনের স্ত্রীর কণ্ঠস্বর একটা অব্যক্ত ব্যথায় ভেঙে পড়ল, আমি তার পথের কাঁটা। আমি বাঙালীর মেয়ে —বামুনের মেয়ে—

জগন্নাথ একটু যেন চমকে উঠলেন। তুমি বাঙালীর মেয়ে! আর ছগন তোমার স্বামী!

ছগনের স্ত্রীর দুচোখ চক চক করে উঠল। সে

ধীরে ধীরে মাথা নত করে মৃদুকণ্ঠে জবাব দিল, আমি আপনাকে মিথ্যে বলিনি।

জগন্নাথ আস্তে আস্তে ব'লতে থাকেন, কেমন যেন গোলমাল হ'য়ে যাচ্ছে—হিসেব মেলাতে পারছি না ত'।

মনোরমা পুনরায় দেখা দিয়েছে। বলল, তোমার তামুকটা পালটে দেব দাদু?

জগন্নাথ অন্যমনস্ক ভাবে জবাব দিলেন, তাই দে ভাই। হয়তো একটা সহজ সমাধান খুঁজে পাব।

মনোরমা কলকেটি তুলে নিয়ে অদৃশ্য হ'য়ে যেতেই ছগনের স্ত্রী পুনরায় বলল, আমার জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। অথচ সেইটেই সবচেয়ে সত্য হ'য়ে উঠল।

জগন্নাথ মাথা নাড়তে থাকেন, হুঁ। মনে হচ্ছে তুমি মিথ্যে বলোনি। তোমার কথার মধ্যে এতক্ষণে খাঁটি সুর দেখা দিয়েছে মা।

ছগনের স্ত্রীর চোখে জল দেখা দিল। সে বেদনার্ত কণ্ঠে বলল, যে প্রশ্ন আজ আপনার মনে দেখা দিয়েছে এ প্রশ্ন রোজই আমি নিজেকে করি। কিসের লোভে এই শ্রেণীর একটি লোকের হাত ধরে আমি পথে নামলাম এ প্রশ্নের জবাব আছে—যুক্তিও আছে, কিন্তু আমার প্রথম পদস্খলনের জন্য নিজের কাছেও কোন জবাবদিহি ক'রতে পারিনি। আর সেই স্খলনের লজ্জা ঢাকতে গিয়ে দিন দিন আরও অতলে তলিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ডুবতে বসেও আমি জ্ঞান হারাইনি তাই ছগনকে আশ্রয় করেও ভেসে উঠবার প্রাণপণ চেষ্টা করেছি।

জগন্নাথ মৃদু কণ্ঠে বলেন, তোমার কথা আমি বুঝতে পারছি না ছগনের বৌ।

ছগনের স্ত্রী ম্লান হেসে বলল, আমি হয়তো ঠিক গুছিয়ে বলতে পারিনি। আমি একটা বড় সর্বনাশকে ঠেকাতে গিয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট সর্বনাশকে মাথায় তুলে নিলাম। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে যে, এর চেয়ে যদি আমার চরম সর্বনাশও হত তাও আমি সহ্য করতে পারতাম। আমার বর্তমান জীবন এমন অসহ্য হয়ে উঠেছে।

জগন্নাথ তাঁর মাথাটি একবার ডাইনে থেকে বাঁয়ে হেলিয়ে ধীরে ধীরে বললেন, ছগন তোমাকে সমীহ করে চলতো বলেই আমি বিশ্বাস করতাম—

ছগনের স্ত্রী ক্ষুব্ধ কণ্ঠে জবাব দিল, করতো কিন্তু আর কোনদিন করবে না।

ঠিক বুঝলাম না, জগন্নাথ বললেন।

ছগনের স্ত্রী উত্তেজিত কণ্ঠে বলল, ও ভেবেছিল আমাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করে সর্বরক্ষা হবে। ওর সব অন্যায়কে আমি মুখ বুজে সহ্য করে যাব, কিন্তু তার সে ভুল আজ আমি একেবারে ভেঙ্গে দিয়েছি। তাই সমীহ করার কথা আর ওঠে না। জীবনে না বুঝে অনেক ভুল করেছি কিন্তু বুঝে ভুল করতে আর চাই না।

জগন্নাথ শান্ত কণ্ঠে বললেন, তুমি বড় উত্তেজিত হয়ে উঠেছো মা। এ অবস্থায় কেউ ভাল মন্দর বিচার করতে পারে না। ভুল করবার অবকাশ থাকে।

ছগনের স্ত্রীর মুখে একটুখানি হাসির রেখা ফুটে উঠল। সে হাসি চোখে পড়তে জগন্নাথ চমকে উঠে সোজা হয়ে বললেন। বললেন, আমাকে তুমি ভুল বুঝোনা মা। ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, কিংবা বিপদে পড়ে হোক ছগনকে যখন স্বামী বলে একবার স্বীকার করে নিয়েছো তখন তার ভাল মন্দর কথা তোমারই চিন্তা করা উচিত। এ নইলে সংসারের চেহারা কখনও সুন্দর হতে পারে না।

ছগনের স্ত্রীর মুখে আবার নতুন করে ঠিক তেমনি এক ঝলক হাসি দেখা দিল। সে রুদ্ধকণ্ঠে বলল, সংসারের আসল চেহারা দেখতে চেয়েছিলাম বলেই আমার অদৃষ্টে এতবড় বিড়ম্বনা দেখা দিয়েছে।

জগন্নাথ মাথা নেড়ে বললেন, না ছগনের বৌ তোমার একথাটা বোধহয় ঠিক হলো না। বিড়ম্বনাটা সম্ভবত অন্যপথে দেখা দিয়েছে।

খানিক চুপ করে থেকে কিছু চিন্তা করে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে ছগনের স্ত্রী বলল, আমরা দুজনেই সত্য কথা বলেছি। সংসারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলাম বলেই ওকে বিয়ে করবার কথা আমি ভাবতে পেরেছিলাম। নইলে পয়সা আমি কুড়িয়ে কুল পেতাম

না। ঝোঁকের বশে আর বুদ্ধির দোষে আমি পথে নামলেও ঘরকে যে আমি কত ভালবাসতাম তা বাইরে পা দিয়েই বুঝতে পারলাম, তাই ফিরে যাবার জন্ম যাকে সামনে পেলাম তাকেই আঁকড়ে ধরলাম. এ ছাড়া আমার আর অন্য কোন উপায়ও ছিল না।

একটু থেমে সে পুনরায় বলতে থাকে, আপনি ভাল-মন্দর কথা বলছিলেন। ভাল করবো আমি কার? আমার কাছে যা কিছু ভাল ওর কাছে সেইগুলোই হলো সব চেয়ে মন্দ। আমার কাছে যেটা ন্যায় তার কাছে সেইটেই ঘোরতর অন্যায়। মানুষ ওর কাছে পণ্য সামগ্রী। এত বড় পাপের ভিতের উপর তাই আমি শেষ পর্যন্ত সংসারের পাকা ইমারত তুলতে দিইনি। আরম্ভ আর শেষ যেন ওর একলার জীবনেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ছগনের স্ত্রীর চোখ দুটি জ্বলছে আর ঠোঁট দুখানি থর থর করে কাঁপছে।

জগন্নাথের দুচোখে বিস্ময়। চুপ করে থেকে তিনি শান্তকণ্ঠে বললেন, স্থির হও ছগনের বৌ। বড় বেশী উত্তেজিত হয়ে উঠেছো তুমি। তুমি নিজেই হয়তো বুঝতে পারছো না কি কথা এতক্ষণ ধরে আমায় বললে।

ও ঘর থেকে এ ঘরে এল মনোরমা। ওদের মধ্যে সব কথাই সে শুনেছে। জগন্নাথের শেষ কথাগুলির সূত্র ধরে সে বলল, কি যে তুমি বলো দাদু—এর পরেও মানুষ উত্তেজিত না হয়ে পারে!

জগন্নাথ তাকে বাধা দিয়ে বললেন, আমার কথাটা ঠিক বুঝতে পারনি দিদি। উত্তেজনার সময় চুপ করে থাকাই যুক্তিযুক্ত। নইলে এমন অনেক কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে যার জন্ম পরে অনুতপ্ত হতে হয় দিদিভাই।

ছগনের স্ত্রী পুনরায় বলল, সেই জন্তেই এতদিন চুপ করে থেকে আমার শক্তি আর সামর্থ দিয়ে তাকে ফেরাতে চেষ্টা করেছি।

জগন্নাথ বার বার মাথা নাড়তে থাকেন, তোমার সে চেষ্টায় গলদ ছিল ছগনের বৌ। কোন বস্তুর বিনিময়ে তুমি তাকে ফেরাতে চেষ্টা করেছো তা একবার ভেবে দেখেছো কি?

ছগনের স্ত্রীর মুখে কথা যোগালো না। শুধু বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। কথা বলল মনোরমা, কি আবোল তাবোল ব'কছো দাদু!

জগন্নাথ ধীরে ধীরে ব'লতে থাকেন, তুমি কি তাই মনে করো ছগনের বৌ? ছগনের স্ত্রী নিরুত্তর।

জগন্নাথ যেন আপন মনে কথা কয়ে চলছেন এমনি ভাবে ফিস ফিস করে বলতে থাকেন, একটুকু তুমি ছগনকে দিতে পেরেছো মা? তুমি সংসারকে চেয়েও তাকে গ্রহণ ক'রতে পারনি। ভয়ে পিছিয়ে গেলে। সাহস করে এগিয়ে গেলে আমার মনে হয় এতবড় ব্যার্থতার লজ্জা তোমোকে এভাবে পাগল করে তুলতে পারতো না। তোমার মনের আর দেহের সৌন্দর্য্য দিয়ে কিছুই তুমি সৃষ্টি করতে পারছো না। কিছুই তুমি দিতে পারলে না।

মনোরমা উত্তেজিত কণ্ঠে ডাকল, দাদু!

জগন্নাথ থামতে পারেন না বলতে থাকেন, তোরা যতই আমায় বাধা দিস ভাই এ আমার শুধু মুখের কথা নয় আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ছগনকে যদি কেউ ফেরাতে পারত সে তার সন্তান—সন্তানের মায়ের দেহটা নয়। ও বস্তুতে যে তার কতখানি লোভ সে কথা ছগনের বৌ সকলের চেয়ে বেশী ক'রে জানে মনোদিদি,।

ছগনের বৌ চমকে উঠল। মনোরমা স্তম্ভিত। তার দাদুর এ আর এক রূপ। যার সঙ্গে ইতিপূর্ব্বে আর কোনদিন তার সাক্ষাৎ ঘটেনি।

খানিক চুপ ক'রে থেকে মনোরমা একসময় মৃদু কণ্ঠে ডাকল, দাদুভাই—

জগন্নাথ সাড়া দিলেন, কি দিদি?

মনোরমা বলল, সব ফুলে ত' সব দেবতাকে তুষ্ট করা যায় না দাদু।

জগন্নাথ জবাব দিলেন, ফুলটা উপকরণ দিদি। আসল হ'লো ডাকতে জানা। দুর্ব্বলতা সব মানুষের মধ্যেই আছে তাই দুনিয়াটা আজও লোপ পেয়ে যায় নি। তাছাড়া ছগনের বৌ ফুলও দেয়নি ডাকতেও ত্রুটি করছে। সেইজন্তই বারে বারে ও শুধু শয়তানের দেখাই পেয়েছে।

এতক্ষণে ছগনের বৌ কথা বলল, অমি ব্যর্থ হয়েছি ব'লেই কি প্রতিকার হবে না?

মনোরমা সায় দিল।

জগন্নাথ গম্ভীর হ'য়ে বললেন, যুক্তি বিচারের কথা এখানে না তোলাই ভাল না। তাহলে তুমি নিজেই তলিয়ে যাবে। নিজের কাজের সমর্থন খুঁজে পাবে না। চোখ বুজে আবেগকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন ব'লেই আজকের এই সঙ্কটের মুখোমুখি হ'য়েছো।

ছগনের বৌ মাথা নিচু ক'রল।

মনোরমা উষ্ণ হ'য়ে উঠল, তুমি অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ছো দাদু।

জগন্নাথ মৃদু কণ্ঠে বললেন, অন্ধকার হবে কেন মনোদিদি ছগনের বৌ যে আমায় আলো দেখালে, সত্যি মিথ্যে না হয় একবার জিজ্ঞেস ক'রে দেখ দিদি।

ছগনের বৌ একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ ক'রে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মনোরমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে তার হাতে একটা কাগচের মোড়কে দিয়ে চুপি চুপি কি ব'লে নিঃশব্দে মন্থর গতিতে ঘর থেকে চলে গেল।

জগন্নাথ চোখ বুজে আপন মনেই কথা কয়ে উঠলেন, আপিংএর নেশাটা আজ আর জমবে না দেখছি।···

ক্রমশঃ

গ্রাম বাংলার পাঁচালী

মৃণালকান্তি দত্ত

অগ্রহায়ণের শেষ কি মাঘের সুরু ঠিক মনে নেই। আমার গ্রামের বাড়ী সরগরম। আমি বাড়ী থেকে চলে যাচ্ছি। গ্রামে ইস্কুল নেই, কাছাকাছি কোন ভাল বিদ্যাপীঠ নেই। পিতৃদেব আমাকে নলহাটী ইস্কুলের বোর্ডিং এ রেখে আসবেন। লেখাপড়া করে মানুষ হতে হবে তো! তখন আমার বয়স মাত্র দশ পেরিয়েছে; আমি ইংরেজী ১৯৩৯ সালের কথা বলছি।

সেই শীতের প্রত্যূষে স্নান করেছি। মা পাশে বসে খাইয়ে দিয়েছেন। জ্যেঠিমা ধমক দিয়েছেন এত কম খেলে কি করে চলবে। জ্যেঠতুত বড় বৌদি যিনি তখন বাড়ীর একমাত্র বধূ, দুধভাতে খাবার জন্য আখের গুড় এগিয়ে দিয়েছেন। পরিমাণটা খুব বেশী। আহ্‌হা একটু বেশীই থাকনা! ট্রেনের অনেক দেরী, তবু তাড়াতাড়ি বেরুতে হবে। পাঁজী খুলে শুভযাত্রার ক্ষণ ঠিক করা হয়েছে। পুণ্য মুহূর্তে যাত্রা করতে হবে। মা দৈ-হলুদের কৌটা দিলেন। ওরা সব চোখের জল ফেললেন। আমি কাঁদিনি। দাদা বলতে তখন যে ইমেজটা আসত সেটা আমার জ্যেঠতুত বড়দার। অন্য দাদারা বাইরে পড়ালেখা করে; ছুটিতে আসে; আদ্দির পাঞ্জাবী পরে, কাঁচি সিগারেট খায়। ওরা যেন বাইরের ভদ্রলোক, দুদিন বেড়িয়ে যান। বড়দা আমাকে বাড়ীতে পড়িয়েছেন। সাহস দিয়ে বললেন, ভর্তির জন্য ইস্কুলে যে পরীক্ষা দিতে হবে তাতে যেন ঘাবড়ে না যাই। ঘাবড়াই নি।

বাবা নূতন ট্রাঙ্ক কিনে দিয়েছেন। জামা কাপড় সামান্যই, তবে সবই নূতন। মনে আছে ট্রাঙ্কে একেবাক্স সাবান ছিল; তিনটে 'বঙ্গলক্ষ্মী'। দুটো ফুলকাটা রুমাল ছিল। শিবতলায় প্রণাম করে গরুর গাড়ীতে উঠলাম। ছোট গ্রাম; ক'ঘরই বা লোক ছিল তখন, অনেকেই দেখতে এসেছিল। ক্ষুদিরাম বীরবংশী এসে দাঁড়িয়ে ছিল। আমারই প্রায় সমবয়সী। ক্ষুদুর বাবা কবিগান করতো যা আজ উৎপত্তি স্থলে শুষ্ক, যদিও

কলকেতার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে টবভর্তি কবিগানের ফুল ফোটানোর অপূর্ব প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের "কালচার" বাড়ছে। ক্ষুদু ডোম ঐ বয়সেই মারাত্মক একটা গান গাইত যার প্রথম কয়েকটা লাইন হল

আমার কত সাধের বো (বৌ)

মরে গেল গো

মরণকালো কিছু বলে গেল না ইত্যাদি।

কথা ছিল আমার পিতৃদেব তার পুত্রের পুনর্বাসন লক্ষ্য করবার জন্য সপ্তাহ দুয়েক নলহাটীতে থাকবেন: এবং তিনি তাই করেছিলেন। আমরা যারা গ্রামীন পটভূমিকায় বড় হয়েছি তারা বোধয় জননীর থেকে জনকের বেশী অনুরক্ত। আমি পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় গড়ে ওঠা মানবিকতার কোন গূঢ় বিদগ্ধজনোচিত বিশ্লেষণে যাচ্ছি না। নাগরিক সমাজে যেখানে পিতৃকুলদিনের (এবং কখনো কখন রাত্রির) অধিকাংশ সময় ঘরের বাইরে কাটাতে হয় সেখানে শিশুকাল থেকে মাকেই ছেলেরা বেশীঘিরে থাকে। পিতা "প্রভোইডার মাত্র। আমার সহর তলীর বাসস্থানের উল্টাদিক এক কি দেড়কামরার সরকারী ফ্ল্যাটের শিশুটির কি বালকটির পিতাঠাকুর সকাল ৮টা নাগাদ পান চিবুতে চিবুতে বৈদ্যুতিক রেল কামরায় অধিষ্ঠিত হন। রাত্রে ফেরেন ক্লান্ত, বিরক্ত একটি মানুষ। এখানে অপ্রাপ্ত বয়স্কদের জগৎ শুধু মাকে ঘিরে। গ্রামে দেখুন, চাষীর ছেলে জমি আলে ঘুরছে, বাপ তার জমিতে কাজ করছে। দুর্য্যোধন বীরবংশী বাঁশের ঝুড়ি গড়ছে; ব্যাটা তার আশে পাশেই আছে, এটা ওটা এগিয়ে দিচ্ছে, বাপকে সাহায্য করছে। মা তার ধান সেদ্ধ করছে; করুক। সে তার বাপের সঙ্গে দোকানে তেল নুন কিনতে যাবে,পুকুরে নাইতে যাবে। কোন গভীর বিশ্লেষন-ধর্মী আলোচনা করবার ক্ষমতা আমার নেই। তবে মনে হয় ভবিষ্যতে মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা ফিরে আসতে পারে। চাকাটা পুরো ঘুরে আসতে কিছু দেরী, এই আর কি।

সেই বয়সেই জেনেছি বাবা রিক্তবিত্ত। জেনেছি মা-বাবার চাপা চাপা আলোচনায়। অগ্রজদের শিক্ষাদীক্ষা, আদ্দির পাঞ্জাবী এবং কাঁচি সিগারেটে তাঁর সব ফুঁকে গেছে। জমিগুলো পড়ে আছে মাত্র। তবু আমার জন্য নূতন ট্রাঙ্ক এসেছিল, এসেছিল, বঙ্গলক্ষ্মী সাবান। রুগ্ন পিতা ললাটেশ্বরীর প্রসাদ খেয়ে পনের দিন কাটিয়ে দিলেন। তারপরও প্রায় প্রতি রবিবারে দেখতে যেতেন তার কনিষ্ঠপুত্র ছাত্রাবাসে মানিয়ে নিয়েছে কিনা। এই দেখতে যাওয়ার অর্থ সকাল ছটায় বেরিয়ে আড়াইক্রোশ হেঁটে সাগরদীঘি, ট্রেন, নলহাটি, প্রত্যাবর্তনে আরো আড়াই ক্রোশ এবং সারাদিন অস্নাত, অভুক্ত থাকা। তখন তিনি কট্টর হিন্দু, কোথাও জলগ্রহণ করতেন না। আমার বাবার অনাহারক্লিষ্ট মলিন, রুগ্ন দশা দেখে বুকটা টনটন করত কিন্তু মুখফুটে কোন দিন বলিনি "বাবা, আপনাকে আসতে হবেনা আমাকে দেখতে, আপনার বড় কষ্ট হয়। বাবা না গেলে কেমন কান্না কান্না আসত।

ধরা যাক, এই আমি যদি তাঁর আত্মত্যাগে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ও উচ্চবিত্ত হতাম; যদি আমার পুত্রকন্যারা গাড়ী চড়ে, চকোলেটের স্লাব চিবুতে চিবুতে ফিরিঙ্গি স্কুলে যেত, তাহলে তারা তাদের জন্মদাতা সম্বন্ধে কি মনোভাব পোষণ করত। পিতার আপাতগ্রাহ্য কোন ত্যাগ না থাকায় তারা নিশ্চয়ই তাদের জন্মদাতা সম্বন্ধে গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল হত না। সংস্কার অনুযায়ী হয়ত মানতো কিন্তু তার বেশী? ত্যাগ না থাকলে বোধহয় প্রকৃত শ্রদ্ধা" অর্জন করা যায় না। সমাজ যত এ্যাফ্লুয়েন্ট হবে, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ তত বিলুপ্ত হবে।

সেই শীতের সকাল গরুর গাড়ীতে কেটে গেল। ষ্টেশনে পৌঁছে গেলাম। গাড়ীর দেরী ছিল। দুরুদুরু বুকে নূতন সতরঞ্চিতে বাঁধা বিছানায় বসে ছিলাম। আমার নুতন বাক্সের উপরে বেশ একটা ছবি ছিল। ওরকম বাক্স আজকাল আর দেখা যায় না। ছবিটা দেখছিলাম। বাবা কাপড়ের দোকানে গেছেন। যে চাকরটা গাড়ী নিয়ে এসেছিল সে বলদজোড়াকে জল দেখাতে পুকুরে নিয়ে গেছে। আমি একা বসে আছি। আশে-পাশে ভকত-দের অনেক মিষ্টির দোকান। মিষ্টির দোকানগুলোতে বোলতার বড় উপদ্রব। হলদে রং এর উপর কাল কাল ডোরা; বাঘের মত সব বোলতা। কখন জানিনা একটা বোলতা আমার নূতন হাফ-প্যান্টের ভেতর ঢুকছে; ঠিক হাঁটুর ওপরটায় হুল ফুটিয়ে দিল। সে কি জ্বালা, বাবাকে বলিনি। সেজ্বালা আমার সর্বক্ষণ ছিল, ট্রেনে, স্কুলে, হোষ্টলে। সে হুলের জ্বালায় আজো যেন, এই উত্তর-চল্লিশেও, জ্বলছি। জ্বলবও।

মণীন্দ্রনারায়ণ স্মরণে

কানাইলাল দত্ত

মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন মানুষের আচার-আচরণ দ্বারা আমি বিপুলভাবে প্রভাবিত হয়েছি, স্বর্গত মণীন্দ্রনারায়ণ রায় তাঁর অন্যতম। তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটে ১৯৫৫ সনে। তিনি তখন কলকাতার হিন্দুস্থান ষ্ট্যানডার্ড পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। প্রথম দেখা করি ঐ অফিসে। ঘরে ঢুকে দেখি তিনি প্রবন্ধ রচনা করছেন। একহাতে কলম অন্যহাতে একটি জ্বলন্ত বিড়ি, সামনে ধূমায়িত এক কাপ চা। লেখার বিঘ্ন ঘটল দেখে আমি একটু সংকুচিত হলাম। তিনি সেটা অনুভব করতে পেরেই বোধ হয় বলেছিলেন—'বসুন আপনারটাও তো কাজ। কলমটা বন্ধ করে রাখলেন। লেখার বিঘ্ন ঘটিয়েছি বলে সামান্য একটু বিনীত গৌরচন্দ্রিকা করে আসল কথাটা পেশ করবার উদ্যোগ করতেই তিনি বল্লেন—'দেখুন আমরা যারা খবরের কাগজের লোক তাদের কোন অসুবিধা বোধ থাকলে চাকরি করাই চলে না। চিরকাল আমাদের হাটের মধ্যেই কাজ করতে হয়। কাগজের প্রয়োজনে আমরা লিখি। অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে লেখার প্রতি তো বটেই নিজের প্রতিও সেজন্য প্রায়ই সুবিচার করতে পারি না।' বাধা দিয়ে আমি বলি বিদগ্ধজনেরা হিন্দুস্থান ষ্ট্যানডার্ডের সম্পাদকীয় নিবন্ধগুলির সুখ্যাতি করে থাকেন। তিনি বলেন—নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও দু' চারটা লেখা আপনা থেকেই ভাল হয়ে যায়। মূল বক্তব্যের ভিত্তি ও লক্ষ্য তো নির্দিষ্ট, যেমন করেই লেখা হোক না কেন সমপ্রাণ লোকের নিকট একটা আবেদন থাকেই। ইতিমধ্যে আমার জন্য চা এসে গেল।

মণীন্দ্রবাবু একটু বেশীই চা খেতেন। দিনে ক' কাপ চা খান পরে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলাম—। বলেছিলেন, পনের বিশ কাপ হবে—ওর কোন হিসেব নেই। একটু ভাল চায়ের প্রতি তাঁর যে অদ্ভুত আকর্ষণ ছিল তা তিনি অকপটে লিখেছেনও। কেদারবদ্রী ভ্রমণের ফসল 'বহুরূপে'তে তিনি লিখেছেন—"ভাল খাদ্যের প্রতিশ্রুতির চেয়েও অবিলম্বে সুপেয় চা পাবার সম্ভাবনা ঢের বেশী প্রীতিপ্রদ আমার কাছে।' মণীন্দ্রনারায়ণের সস্নেহ প্রশ্রয়ে অল্পদিনেই পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল। কাজে অকাজে তাঁর বাড়ী অবধি ধাওয়া করতাম। বাড়ীতেও চায়ের একটা সদা-প্রস্তুত আয়োজন থাকত। আর সে চা তিনি নিজের হাতেই করতেন। অপ্রতিম মানুষ, অকৃত্রিম শ্রদ্ধাভক্তি করি, তিনি চা করবেন আর আমি বসে বসে খাব—এটা কিছুতেই সহজে গ্রহণ করতে পারতাম না। কখন যে হিটারের সুইচটা দিয়ে জল বসিয়ে দিতেন সবদিন বুঝতেও পারতাম না। একদিন আমি বল্লাম 'চা আমি করব—আমি থাকতে আপনি চা করবেন তা হতেই পারে না।' বাদ প্রতিবাদ না করে থালাটা এগিয়ে দিয়ে বল্লেন—'তুমি যদি চা-টা ঢেলে নিলে খুসি হও তবে তাই নাও।' এই অবস্থা থেকে মুক্ত হবার জন্যই চা খাওয়া ছেড়ে দেব এমনও ভাবতে সুরু করেছিলাম। দাদাকে বলেছিলাম আচার্য রায়, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখেরা চা পান ক্ষতিকর বলে বর্জনের উপদেশ দিয়েছেন।' তিনি বল্লেন—ডাঃ মেঘনাথ সাহা বলেছেন—এতে কোন ক্ষতি করে না, বরং উপকার হয়।' কোথায় বলেছেন, কি উপকার হয় এত সব জিজ্ঞাসা করতে সাহস হয়নি। কিন্তু চা পান ত্যাগের যে বাসনা মনে মনে জাগ্রত হচ্ছিল তা ঐ ক্ষীণদেহ মানুষটির প্রত্যয়সিদ্ধ কয়েকটি শব্দে উবে গেল।

কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে মণীন্দ্রনারায়ণ পাটনার

ইণ্ডিয়ান নেশন কাগজে আত্মজীবনী লিখছিলেন বলে শুনেছি। কতটা কি লিখেছিলেন তা জানি না। ভেবেছিলাম আজ হোক কাল হোক বই আকারে বেরোলে একখানা তো পাব, তখন ভাল করে পড়া যাবে। নিজের কথা তিনি সর্বদাই সযত্নে এড়িয়ে যেতেন। তবু দুই চারটা খুচরো কথা নানা কথার মধ্যে তাঁর মুখ থেকে শুনেছি। কিন্তু সামান্য এক-আধটা ছাড়া লিখবার মত কোন কথা মনে নেই। তিনি নিজের সম্পর্কে খুব কম কথা বলতেন; কিছুই বলতে চাইতেন না বললে অত্যুক্তি হয়না। একবার আমাকে কথায় কথায় বলেছিলেন, সজনীকান্ত দাসের জন্য দিতে পারি না এমন কোন জিনিস ছিলনা। কি প্রসঙ্গে বলেছিলেন তা মনে নেই। সজনীকান্ত বিতর্কিত মানুষ। কিন্তু একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শ সামনে রেখে তিনি সাধনা করে গেছেন। মণীন্দ্রনারায়ণের সঙ্গে কোথায় তার যোগ তা যাঁরা জানেন তাঁরাই ঐ উক্তি যথার্থ অনুধাবন করতে পারবেন।

'বহুরূপে' বইখানা ভ্রমণ কাহিনী হলেও এর মধ্যে মণীন্দ্রনারায়ণ অনেক নিজের কথা বলেছেন। পরিণত বয়সে বার্ধক্যের প্রান্তসীমায় এসে তিনি কেদার বদরি ভ্রমণে যান। দীর্ঘদিন সযত্নপালিত ইচ্ছা পূরণের মুহূর্তে একটি আর্তকুলীর সেবার জন্য ভ্রমণ ও দেশ দর্শনের পুণ্যার্জন অসমাপ্ত রেখে তিনি ফিরে এসেছিলেন। মণীন্দ্রনারায়ণের পক্ষেই এটা সম্ভব, অন্য কোন লোক এমন করেছেন বলে জানি না। ঐ বইতে আছে—"অতীতে আমি যে ছেলে-ছোকরাদের নাচিয়ে বেড়িয়েছি আরামের গৃহ থেকে টেনে এনে দুর্যোগের রাত্রে দুর্গম পথে তাদের ঠেলে দিয়েছি তা তো আমার অস্বীকার করবার জো নেই।" মণীন্দ্রনারায়ণ নিজেও স্বাধীনতা আন্দোলনের দুর্গম পথের যাত্রী ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামের নির্যাতন ও কারাবাস প্রচুর পরিমাণেই জুটেছিল তাঁর ভাগ্যে। শুনেছি কারান্তরালে থাকার সময়ই তাঁর স্ত্রী ও একমাত্র কন্যা অকালে পরলোক গমন করেন। যে বন্ধুবর কারাবাসের সময় তাঁর স্ত্রী ও কন্যাকে দেখতেন তিনিও অকস্মাৎ স্ত্রী ও একটি পুত্র রেখে মারা যান। মণীন্দ্রনারায়ণ স্বেচ্ছায় স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এদের ভার গ্রহণ করেন। ঐ বহুরূপেতে আক্ষেপ করে বলেছেন—যাকে ভরসা করে যাওয়া সেই তার কাঁধে চেপে পড়ে। মণীন্দ্রনারায়ণের জীবনের অনেক ঘটনার মধ্যে এই আক্ষেপটি নির্মম সত্য হয়ে রয়েছে। নিরক্ষর বন্ধুপত্নীকে বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা করে হাসপাতালে সেবিকার চাকরি করে স্বাবলম্বী করে দিয়েছেন। তার পালিত পুত্রকে ধীরে ধীরে মানুষ করেছেন। রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ের মত সুখ্যাত প্রতিষ্ঠানে রেখে পড়িয়ে তাকে শিক্ষিত করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছেন। সমবায় পল্লী নবব্যারাকপুরে এদের একটি বাড়ীও করে দিয়েছেন। এই বাড়ী করার ব্যাপার নিয়েই তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়। প্রতিটি পয়সার তিনি হিসাব রাখতেন। ন্যায্য পাওনা থেকে এক-পয়সাও কম দিতেন না। সমস্ত কাজের মধ্যে একটা অনুকরণীয় পরিচ্ছন্নতা ও শৃঙ্খলা ছিল। কাজ ছোট হোক, বড় হোক তা করার নিপুণতার মধ্যেই মানুষের বুদ্ধি ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। এই খুঁটিনাটি হিসাব রাখা নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত কাজ করা আমাদের স্বভাবে নেই। এজন্য তিনি বকাঝকা করতেন। তাতে আমার লাভ হয়েছে। শৃঙ্খলাহীন জীবনে অনেকটা শৃঙ্খলা এসেছে। তাঁর কাছে আবার সময় নির্ধারণ করা থাকলে দেরী করে যাবার সাহস হতো না। এই ব্যক্তিত্ব তিনি অর্জন করেছিলেন তিল তিল করে। কাছের মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে দিতে পারতেন।

কেন জানিনা, আমার একটা ধারণা ছিল খবরের কাগজের লোকেরা একটু বেপরোয়া বেহিসেবি হয়, আর রাজনীতির লোকেরা হন বোহেমিয়ান। কিন্তু মণীন্দ্রনারায়ণের সব ব্যাপারটি ছিল ছকে-বাঁধা ছবির মত সুন্দর। কেদার বদরি যাবেন অনেকটা দুর্গম পথ পায়ে হেঁটে যেতে হবে—মণীন্দ্রনারায়ণ কেডস্ পরে গড়ের মাঠে হাঁটা অভ্যাস করতে সুরু করলেন। সকালে উঠতে তাঁর সাধারণতঃ একটু দেরী হ'তো—কিন্তু ঐ অনুশীলনের সময় অনেক সকাল সকাল তিনি উঠতেন। যখন যে

কাজ হাতে নিতেন তা কখন আলগাভাবে করতে তাঁকে দেখিনি।

কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তা থেকে তাঁকে বিচ্যুত করা যেত না। পরবর্তী জীবনে শরীর যখন অপটু হয়ে পড়েছে তখনও না।

নববারাকপুর থেকে আমরা একখানা ছোট্ট কাগজ বের করতাম 'বোধন'। পুজোর সময় একটি বিশেষ সংখ্যা বই-আকারে প্রকাশিত হ'তো। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল ও মণীন্দ্র নারায়ণের স্নেহ থাকার ফলে বিনা দক্ষিণায় অনেক নাম-করা লেখকের লেখা পেতাম তাঁরা নিজেরা তো লিখতেনই। স্নেহের প্রশ্রয় পেয়ে পেয়ে এমন হয়ে পড়েছিলাম, যে আমি ফরমায়েস করতাম কোন্ বিষয়ে লেখা দিতে হবে। মণীন্দ্রনারায়ণের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের উপর লেখাটি এইরকম একটি ফরমায়েসী রচনা। কিন্তু তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন, বোধ হয় সংবাদপত্রসেবী সংঘের পক্ষ থেকে—বিনা দক্ষিণায় কোন লেখা দেবেন না।

নির্দিষ্ট দিনে লেখা আনতে গিয়েছি, লেখাটি আমার হাতে দিয়ে মণীন্দ্রনারায়ণ বললেন—'একটা টাকা দাও লেখার দক্ষিণা'। আমি হকচকিয়ে গেলাম, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি মনে করলেন আমার কাছে বোধহয় টাকা নেই; তাই বললেন—'আচ্ছা এখন যাও পরে দিও'। কিছুই না বুঝে বোকার মত লেখাটি নিয়ে চলে এলাম। পরে ব্যাপারটা ভুলেই গিয়েছিলাম। কিন্তু বিজয়ার প্রণাম করতে যেতেই আবার তাগিদ দিলেন ঐ এক টাকার। 'কি তুমি তো আমার টাকাটা দিলে না? তোমরা পত্রিকা প্রকাশের জন্য কাগজ ছাপা বাঁধাই সর্বত্র অর্থব্যয় করতে পার, কেবল টাকা থাকেনা তোমাদের লেখককে দক্ষিণা দেবার সময়। লেখা যাদের জীবিকা তারা লেখার বিনিময়ে টাকা না পেলে খাবে কি? তাই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি কেউই বিনা দক্ষিণায় লেখা দেব না। দক্ষিণার টাকার অঙ্ক নির্ধারিত হয়নি তাই তোমাকে এক টাকায় লেখা দিতে পারলাম'। এক টাকা সেদিন তাঁকে দিয়েছিলাম। টাকাটা নিয়ে তিনি বলেছিলেন—'আমি আমার পুত্রকে লেখা দিলেও এ টাকা নিতাম'। জীবনে একটি মহৎ শিক্ষা নিয়ে ফিরে এলাম।

নববারাকপুর সমবায় পল্লী নানাভাবে মণীন্দ্র নারায়ণের নিকট কৃতজ্ঞ। আমাদের রেল-ষ্টেশনের আবেদন নানা আইনের জটিলতায় প্রথমে ফলপ্রসূ হয়নি। মণীন্দ্রবাবু ১০ই জানুয়ারী ১৯৫৫ তারিখে তাঁর কাগজের (Hindusthan Standard) সম্পাদকীয় স্তম্ভে এ সম্পর্কে লিখলেন—পুরানো আইনের নজীর দেখিয়ে জীবন্ত মানুষের সমস্যা উপেক্ষা করা অসমীচীন। প্রয়োজন হলে আইন বদল করে নিউ ব্যারাকপুরের দাবী ও সব উদ্বাস্তুদের অনুরূপ দাবি স্বীকার করে নেওয়া হোক। এর দিন দুয়েকের মধ্যে তদানীন্তন উপ-রেলমন্ত্রী শা নওয়াজখান নিউ ব্যারাকপুরে আসেন এবং একটা অসম্ভব কাজ নব বারাকপুর হল্ট্ স্থাপন সম্ভব হয়।

পণ্ডিত জহরলাল যখন জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মণীন্দ্রনারায়ণ তখন অফিস সম্পাদক। কংগ্রেস সোসালিষ্ট দলের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা তথা সহকারী সভাপতি। নির্যাতীত স্বাধীনতা সংগ্রামী ও পাটনার সদাকত আশ্রমের আশ্রমিকরূপে তিনি ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্র-প্রধানদের প্রায় সকলেরই সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত ছিলেন। তাঁর আদর্শনিষ্ঠ আচরণ ও নির্লোভ ব্যবহারের জন্য জহরলাল সমেত সকলেরই সানুরাগ শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন।

কিন্তু সে জন্য তিনি প্রয়োজনমত দৃঢ়ভাবে সরকারী রীতির বিরুদ্ধতা করতে দ্বিধাগ্রস্ত হননি। কলকাতায় সাংবাদিকদের উপর পুলিশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে ও সংবাদপত্র ও সাংবাদিকদের স্বাধিকার রক্ষার জন্য মণীন্দ্রনারায়ণের সংগ্রাম সোনার অক্ষরে লিখে রাখার মতই।

নববারাকপুরের জনজীবন নিরাপদ করার জন্য সেখানে একটা পৌরসভা স্থাপন করা প্রয়োজন এটাও প্রথম অনুভব করেন মণীন্দ্রনারায়ণ। প্রথম আবেদন পত্রখানি তাঁর রচনা। উঁচুতলার লোক হয়েও অত

কাজের মধ্যেও একটা উদ্বাস্তু কলোনির সুবিধা-অসুবিধা এমন ঘনিষ্ঠভাবে ভাবতে আর কাউকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তিনি নিজে উদ্বাস্তু ছিলেন। ঢাকার সুবিখ্যাত ধামরাইল গ্রামে তাঁর বাড়ী ছিল। এ বঙ্গে মাহেশের রথের যে খ্যাতি, ও বঙ্গের ধামরাইলের রথেরও তদ্রূপ খ্যাতি। ছিল উদ্বাস্তু-জীবনের গ্লানি এর আনন্দ-বেদনা তিনি উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়েছিলেন তাই অজস্র ধারায় তাঁর সাহায্য দুর্দিনের অন্ধকার দিনগুলিতে আমাদের বহুক্ষেত্রে পথের দিশা দিয়েছে।

সাহিত্যসাধনা ও সংবাদপত্র-সেবা ছিল মণীন্দ্রনারায়ণের জীবিকা—জীবনধারণ ও জীবনবিকাশের উপায়। তাঁর সমগ্র রচনার হদিশ আমার জানা নেই। গল্প সংগ্রহ গ্রন্থ পঞ্চপ্রদীপ ও উপন্যাস প্রধূমিত বহ্নি ও ভস্মাবশেষ প্রতিটি দেশপ্রেমী মানুষের নিকট অবশ্যপাঠ্য বলে বিবেচিত হবে। তাঁর ভাষার মাধুর্য্য ও রচনাশৈলীর পূর্ণ বিকাশ 'বহুরূপে'। বহু রচনা তাঁর ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। কলকাতার লিবার্টি ও পাটনার সার্চলাইটেও তিনি সম্পাদকতা করেছেন। আমাদের কয়েকজন সাংবাদিক বন্ধু সমবায় সমিতি করে একটি জাতীয়তাবাদী বাংলা সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হন। মণীন্দ্রনারায়ণ তখন হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড থেকে অবসর নিয়েছেন। কেবল উৎসাহের দ্বারা এখনকার সংবাদপত্র চালানো যায় না। তাই মণীন্দ্রনারায়ণের সন্দেহ ছিল 'সন্ধ্যা'র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে। তথাপি তিনি এর প্রধান সম্পাদক হতে স্বীকৃত হন। ১৯৬৮ সনের ১৫ ই আগষ্ট এই কাগজটি আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ কার লেখা জানি না। তবে 'স্বাধীনতার প্রসাদ' শীর্ষক মণীন্দ্রনারায়ণের একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ রচনার প্রথম কিস্তি সেদিনকার 'সন্ধ্যায়' প্রকাশিত হয়েছিল।

মণীন্দ্রনারায়ণের যোগ সত্ত্বেও 'সন্ধ্যা' দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এ যে স্বল্পায়ু হবে তা তিনি জানতেন। তথাপি শুভ সংকল্প নিয়ে কেউ এগিয়ে যেতে চাইলে তিনি তাকে চিরকাল সর্ব্বতোভাবেই উৎসাহ দিতেন, সাহায্য করতেন। উৎসাহ উদ্দীপনা, আশ্রয় ও অভয়ের এই নিরন্তর উৎসটি আজ রুদ্ধ হয়ে গেছে। একটি জীবন —যা সফলতার সহস্রদল পদ্মে বিকশিত হয়ে ইতিহাসের পাতায় আপনার স্থান করে নিতে সমর্থ হতো তা লোক-চক্ষুর অন্তরালে আদর্শের প্রদীপখানি অনির্ব্বাণ রাখবার সাধনায় নিঃশেষ হয়ে গেল। দেশ ও দশের জন্য তিল তিল করে এই জীবন উৎসর্গ কখনো ব্যর্থ হতে পারে না। মণীন্দ্রনারায়ণের ন্যায় মানুষ সমাজে আছেন বলেই পৃথিবী এখনো বাসযোগ্য আছে। এঁরাই প্রকৃত প্রস্তাবে সল্ট অব দি আর্থ বা পৃথিবীর লবণ।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

কংগ্রেসে 'মহিষাসুর মর্দ্দিনী'র আবির্ভাব

কথিত আছে মহিষাসুরের অত্যাচারে মানুষ যখন ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়িতেছিল, ঠিক সেই সময় দেবীর আবির্ভাব হইল মহিষাসুর মর্দ্দিনী রূপে। আমাদের দেশে এই পাপময় কলিযুগে আবার তাহাই ঘটিল। হঠাৎ শুনা গেল কংগ্রেসের পুরানো কর্ত্তাদের অত্যাচার, অনাচার এবং স্বেচ্ছাচারে দেশ এবং জাতি নাকি নিশ্চিত ধ্বংসের পথে চালিয়াছে, দেশ এবং জাতিকে বাঁচাইতে হইলে কংগ্রেসের মহিষাসুররূপী বৃদ্ধ কর্ত্তাদের নিধন করা একান্ত কর্ত্তব্য। এই কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন একমাত্র আমাদের নবাবিভূর্তা দেশমাতা, তাই পরম করুণাময়ী হঠাৎ আবিভূ্ত হইলেন সংহারমূর্ত্তি ধরিয়া! দেবীর জয় হউক!

কিছুদিন পূর্ব্বে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তাঁহার এক ভাষণে বলেন:

"I have the power to silence my opponents any moment, but I have deliberately restrained myself from doing so."

দেশমাতা প্রধান মন্ত্রীর মুখেই এমন কথা শোভা পায়! তাঁহার অসীম দয়া যে তিনি এতদিন তাঁহার বিরুদ্ধবাদীদের আত্মরক্ষা করিবার অবকাশ দান করেন, কিন্তু মূর্খের দল যখন কিছুতেই সুবুদ্ধির আশ্রয় লইল না, তখন দেশমাতা দেখিলেন বিরুদ্ধবাদীদের নিকাশ করিবার সেই 'any moment' আর ঠেকাইয়া রাখা যায় না—অতএব তাঁহাকে নেহাত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার বিরোধী পক্ষকে ধ্বংস করিবার পবিত্র কর্ম্মে অবতরণ করিতে হইল। প্রধান মন্ত্রীর একটা কথা লক্ষ্য করা দরকার, তিনি জোর দিয়া **my opponents** (আমার বিপক্ষ দলকে) এই কথাটি বলিয়াছেন বারবার। তাঁহার এই বাক্যের মধ্যে দেশ বা জাতির কোন উল্লেখ নাই—'আমি এবং আমার'ই প্রাধান্য! প্রধান মন্ত্রী স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই তাঁহার বিরোধী কাহারা, কোন নির্ব্বুদ্ধি পাষণ্ডের দল। তিনি নিজের মুখেই বারবার প্রকাশ করিয়াছেন যে দেশের শতকরা ৯৫ মানুষই তাঁহার পক্ষে। তাই যদি হয়, তাহা হইলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না যে শতকরা ৯৫ জনের অপেক্ষা শতকরা বাকী ৫ জনই অধিকতর শক্তি রাখে। দেশমাতা এখন এই নগণ্য শতকরা পাঁচ জনকেই বেশী ভয় করেন? সে যাহাই হউক, আমাদের বক্তব্য এই যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রধান মন্ত্রীর গদিতে বসিয়া যেভাবে এবং যে সুরে গত কিছুকাল ধরিয়া কথা বলিতেছেন বা হুমকী দিতেছেন তাহাতে মনে হয় তিনি নিজেকে রাশিয়ার ষ্টালীন কিংবা জার্ম্মানীর হিটলারের সমগোত্রীয় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। বলা প্রয়োজন—উক্ত দুইজন ডিক্‌টেটার তাঁহাদের বিপক্ষ কিংবা বিরুদ্ধবাদীদের সমূলে উৎপাটিত করেন। ইন্দিরা গান্ধী মুখে অহরহ গণতন্ত্রের গুণগান সহ শ্লোগানও ছাড়িতেছেন, কিন্তু ব্যবহারে প্রমাণ করিতেছেন যে, তিনি গণতন্ত্র অপেক্ষা গানৃতন্ত্রেরই ভক্ত! (একজন মন্তব্য করিয়াছেন যে রাশিয়ান প্রধান মন্ত্রীর সহিত অহরহ এবং অতি দহরম-মহরমই বোধ হয় শ্রীমতীজীর চিত্তবিভ্রম ঘটাইয়াছে।) মনের এই বিভ্রান্তি তাঁহার চিত্তে এই অবাস্তব ধারণা বদ্ধমূল করিয়াছে যে—বর্ত্তমান ভারতে একমাত্র তিনি-ই তাঁহার বুদ্ধিমত (তাঁহার বুদ্ধির গভীরতা এবং ব্যাপকতা সম্পর্কে যদিও অনেকের বিশেষ সন্দেহ

আছে) যখন যাহা খুসী করিতে পারেন এবং এ-অধিকার তাঁহাকে দিয়াছে দেশের শতকরা ৯৫ জন অতি ভক্তের দল!

শুভক্ষণে শুভকর্ম্মের সূচনা!

মহাত্মা গান্ধীর শততম জন্মবৎসরে কংগ্রেসের শেষকৃত্য অনুষ্ঠান আরম্ভ করা অতি সমীচীন কার্য্য হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধী ১৯৪৮ সালে কংগ্রেসী পণ্যশালার ঝাঁপ বন্ধ করিয়া কংগ্রেসী-নেতাদের তাঁহাদের কারবার গুটাইবার পরামর্শ দেন, কিন্তু গদি‌তে বসিবার বিষম লোভে তাঁহারা তখন প্রায় অন্ধ—তাই মহাত্মা নামক ক্ষুদ্র ব্যক্তির পরামর্শ তাঁহারা অগ্রাহ্য করিলেন। জবাহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল, রাজা গোপালাচারী, মৌলানা আজাদ এবং তৎকালীন কংগ্রেসী 'সিণ্ডিকেট' ভারতের গদি দখল করিবার জন্য এতই ব্যগ্র যে দুইজন 'টপ্' কংগ্রেসী নেতা পাঞ্জাব এবং বাঙ্গলা প্রদেশ দুটিকে পুরাপুরি ছাঁটিয়া দিয়া নূতন কর্ত্তিত ভারত গঠন করিতেও প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু আমাদের ভাগ্যগুণে লর্ডমাউন্ট বেটনের করুণাবশত পাঞ্জাব এবং বাঙ্গলা প্রদেশের অংশ'শেষ অর্থাৎ এক তৃতীয়াংশ পরিমাণ আন্দাজ ভারতে রহিয়া গেল, রাজাজী এবং সর্দ্দার প্যাটেলের একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও!

আজ নেহেরুকন্যা পিতার আরব্ধ কর্ম্ম সমাপন করিতে ভারতীয় কংগ্রেসী রঙ্গমঞ্চে, আবির্ভূতা হইয়া, সর্ব্বপ্রথম তাঁহার একচ্ছত্র 'রাণীত্বের' প্রধান বাধা কংগ্রেসের বয়স্ক এবং 'নট-সো-প্রোগ্রেসীভ' এবং 'রিঅ্যাক্‌সেনারী' নেতৃত্বকে ঝাঁটাইয়া বিদায় দিবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ক্রিয়াকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই পবিত্র কর্ম্মে প্রাসদলোভী ভক্তের দল জুটিতে বিশেষ বিলম্ব হইল না এবং শেষপর্য্যন্ত শ্রীমতীজী সেই কংগ্রেস, যাহার দৌলতে এবং কৃপায় তিনি আজ দেশের প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করেন, সেই প্রতিষ্ঠানকেই ভাঙ্গিয়া দুইটুকরা করিতেও কোন দ্বিধা করিলেন না। দেশমাতার অনুষ্ঠিত এই পবিত্র শ্রাদ্ধবাসরে তাঁহার প্রধান সহায় হইল ক্ষমতালাভী অভুক্ত ভিক্ষুকের দল।

ইন্দিরাজী পুরাতন কংগ্রেসকে বেআইনীভাবে বাতিল করিয়া তাঁহার অন্ধ ভক্তের দলকে লইয়া নূতন কংগ্রেস গঠন করিয়াছেন। এই নূতন কংগ্রেসের কর্ত্তা-স্থানীয় ব্যক্তিরা সকলেই ইন্দিরার অতি ভক্ত - অন্ধ ভক্ত এবং যাহাদের বিচারবুদ্ধি কোন্ পথে এবং কি নীতিতে চলিবে তাহা দেশমাতাই পূর্ব্ব হইতে নির্দ্ধারণ করিয়া দিতেছেন। 'নূতন' কংগ্রেস গঠিত হইবার পর কংগ্রেসের 'নূতন' সদস্য এবং সভ্যদের সম্বোধন করিয়া বলেন 'সজল' চক্ষে—

> তাঁহারা "(নূতন কংগ্রেসের সভ্যবৃন্দ) যে পথে চলিতে যাইতেছেন তাহা কুসুমাস্তীর্ণ নহে, বিপদসঙ্কুল, সুতরাং তাঁহাদের দেহ, মন এবং অর্থ সব কিছুর ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকিতে হইবে!"

লক্ষ্য করিবেন, 'দেহ, মন, অর্থ' ত্যাগের কথা দেশ-মাতার কণ্ঠ হইতে নির্গত হইল এবং সবই অন্যদের সম্পর্কে, কিন্তু 'ক্ষমতা' (তাঁহার নিজের এবং ভক্তদের) ত্যাগ করবার কথা তাঁহার মনে একবারও উদয় হইল না। যে ক্ষমতার লড়াইএর ফলে আজ কংগ্রেসের এই দারিদ্র্য এবং শোচনীয় সংকটময় কাহিল অবস্থা, সেই ক্ষমতার অমৃত ফলটি হস্তচ্যুত করিবার কথা ক্ষমতাদৃপ্ত এই ভদ্রমহিলার মুখ দিয়া একবারও বাহির হইল না। যথাসময়ে, হঠাৎ দেশ-মাতা ইন্দিরাজী যাহাকে অমৃত ফল বলিয়া মনে করিতেছেন, সেই অমৃতফল বিষফলে পরিণত হইবে এবং এই পরিণতির অন্তিমদৃশ্য কি হইবে, তাহা চিন্তা করিতেও ভয় হয়।

নূতন, কংগ্রের সভা আরম্ভের সময় পুরাতন কংগ্রেস-ওয়ার্কিংকমিটি কর্ত্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার কথা বলিবার সময় ইন্দিরাজীর চক্ষুদিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছিল! দুঃখের কথা—কিন্তু ঐ দিনের ঐ সভায় এবং ঐ সময়ের ফটোগ্রাফ যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমরা দেখিয়াছি, চোখ দিয়া অশ্রুর প্রবাহ নহে, ইন্দিরাজীর চক্ষুদিয়া বাহির হইতেছে অগ্নি-প্রবাহ তাঁহার ক্রুদ্ধ দৃষ্টি দিয়া যেন তিনি সব দগ্ধ করিবেন এই এই ভাবে।

কংগ্রেসকে লইয়া এত কথা কেন !

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহিত বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর বহুকিছু জড়িত আছে সেই কারণে কংগ্রেসকে লইয়া কিঞ্চিত মাথা ব্যথা আমাদেরও আছে এবং আমরাও আমাদের সামান্য বুদ্ধি-বিবেচনা মত কিছু মন্তব্য অবশ্যই করিতে পারি। ইন্দিরা গান্ধী নাকি ভারতে নূতন এক অভিনব সোসালিজ্‌ম্‌ প্রবর্ত্তন করিতে চলিয়াছেন এবং এই নবযুগের সূচনা করা হইয়াছে ১৪টি বেসরকারী ব্যাঙ্ক্‌ জাতীয়করণের দ্বারা। এই কাজটি যে কত মহৎ এবং কত বৈপ্লবিক এবং শ্রীমতিজীই যে ইহার প্রবর্ত্তক, আজ পথে-ঘাটে, প্রাসাদের 'ফাটক-সভায়,' দিনে-রাতে তিনি স্বয়ং ইহা বারবার প্রচার করিতেছেন। তাঁহার এই প্রচার দেখিয়া মনে হইতেছে, তাঁহার পূর্ব্বে অন্যকেহ, বিশেষ করিয়া ঘৃণ্য সিণ্ডিকেট-পন্থীরা কেহই ইহা কোনদিন স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন নাই এবং এই ১৪টি ব্যাঙ্ক সরকারের করতলগত করিয়া ইন্দিরা-মার্কা সোসালিজ্‌ম্‌ এক লাফে শত বৎসরের পথ অতিক্রম করিল এবং এই পবিত্র কর্ম্মের দ্বারা ভারতের ৫৩০ কোটি নিপীড়িত (সিণ্ডিকেট কর্ত্তৃক) সাধারণ মানুষ নূতন এবং বহু ইপ্সিত এক স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অধিকার লাভ করিল, একমাত্র নেহরু-কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরার দয়াতে! ব্যবস্থাটি খুবই উত্তম হইয়াছে। এবং ইহাতে ইন্দিরা যে কত বিদ্যা এবং বুদ্ধি ধরেন, তাহাও প্রমাণিত হইল। ১৪টি বেসরকারী ব্যাঙ্কে গচ্ছিত, আমানতকারীদের কোটি কোটি টাকা যেমন ইচ্ছা বেপরোয়া গঙ্গা-যমুনার জলে নিক্ষেপ করিবার অবাধ ক্ষমতা ভারত সরকারের প্ল্যানিং-মাষ্টারের দল লাভ করিলেন। গৌরী সেনের টাকার সু-ব্যয়ের ইহা অপেক্ষা সুব্যবস্থা আর কি হতে পারে?

শ্রীমতীজী আজকাল সোস্যালিজ্‌ম সম্পর্কে অহরহ এবং নিত্যনূতন ফতোয়া এবং ব্যাখা দিতেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের সকল স্তরের বিশেষ করিয়া বঞ্চিত জনগণের দুঃখ দারিদ্য দূর করিবার প্রয়াস পদ্ধতি সম্পর্কে নানা অভিনব প্রেস্‌ক্রিপ্‌সনও দান করিতেছেন। প্রধান মন্ত্রীর নিও-সোসালিষ্টিক প্রোগ্রাম এবং জনগণের প্রতি তাঁহার অতি মূল্যবান উপদেশাবলী অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতকেও অতিক্রম করিয়াছে। এমন কি মাও-সে-তুঙ্গও পিছাইয়া পড়িয়াছেন। এখন এ বিষয়ে আমাদের একটি বিনীত নিবেদন শ্রীমতীর শ্রীচরণে নিবেদন করিব।

১। প্রথম নিবেদন :

ইন্দিরা গান্ধীর উপদেশাবলীর সংখ্যা এবং পরিমাণ এত বিশাল এবং সীমাহীন যে মানুষের পক্ষে তাহা মনে রাখিয়া কর্ত্তব্য পালন এবং 'পথচলা' অসম্ভব। কাজেই ভারতের (অন্য দেশেরও) উপকারার্থে আমরা' প্রস্তাব করি যে, 'Thoughts of Mao' এর মত 'থট্‌স্‌ অব ইন্দিরা' "[Thoughts of Indira]" পুস্তকাকারে(অবশ্যই করদাতাদের খরচে) অবিলম্বে প্রকাশ করা হউক (প্রতি সপ্তাহে এই পুস্তকের নব নব সংস্করণও বাহির করা প্রয়োজন কারণ যতদিন যাইবে ইন্দিরা গান্ধীর থট্‌স্‌ অর্থাৎ 'চিন্তা প্রবাহ' ততই বৃদ্ধি পাইবে।) ইহাতে আমরা যেমন পরম উপকৃত হইব দেশমাতাও তেমনি খানিকটা রেহাই পাইবেন পথে ঘাটে লোক 'জড়' করিয়া (এবং গেট্‌ মিটিংএও) প্রত্যহ অনর্গল বক্তৃতাদানের বিষম কর্ত্তব্য হইতে।

২। দ্বিতীয় নিবেদন :

'থট্‌স্‌ অব ইন্দিরা' পুস্তকাবলী স্কুল কলেজের পাঠ্যক্রমে অবশ্যপাঠ্য বলিয়াও ঘোষণা করা হউক! এই পরম অমূল্য এবং জনকল্যাণকর পুস্তিকাবলী অবশ্যই বিনা মূল্যে সকলকে বিতরণ করা হইবে ৫০।৬০ কোটি টাকা মাত্র খরচ করিয়া। এই সামান্য অর্থ আমরাই যোগাইব। ইহা চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম নম্বর আইটেমও করা যাইতে পারে।

৩। তৃতীয় নিবেদন :—

সর্ব্ববিদ্যাধরী শ্রীমতী ইন্দিরা তাঁহার চিন্তাধারায় সোস্যালিজম বলিতে তিনি কি বুঝেন এবং কি-ভাবে তাহার বাস্তবরূপ দেওয়া হইবে, তাহার

বিশদ ব্যাখ্যা এবং বর্ণনা দিয়া আর একটি মাত্র শ ছয়েক পৃষ্ঠার পুস্তিকা প্রচারের ব্যবস্থাও আশু প্রয়োজন। ইহাতে আমরা বুঝিতে পারিব ইন্দিরা গান্ধীর আবিষ্কৃত এবং 'সর্ব্ব স্বত্ব সংরক্ষিত' অভিনব কিন্তু দুর্ব্বোধ্য সমাজবাদ কি এবং তাহা আগামী দুচার শতাব্দীর মধ্যেই বাস্তবে রূপায়িত হইবে কি না।

ইন্দিরাজীর সোস্যালিজ্‌ম্ তিনি স্বয়ং ছাড়া অন্য কেহ ব্যাখ্যা কিংবা বাস্তবরূপ দিতে পারিবেন না। কাজেই লোকসভায় অবিলম্বে একটি আইন পাশ করিয়া ইন্দিরা গান্ধীর ইহলোক ত্যাগের তারিখ অন্তত · তিন শতাব্দীর হতে পিছাইয়া দেওয়া হউক। আইন করিয়া তাঁহার "মৃত্যু নিষিদ্ধ" করিতেই হইবে—এমন কি দেশমাতা ইহাতে আপত্তি করিলেও আমরা তাহা অগ্রাহ্য করিব।

পশ্চিমবঙ্গের শান্তি-শৃঙ্খলা অতি স্বাভাবিক।

যুক্ত ফ্রণ্ট সরকারের সরিকদের মধ্যে সি পি এম এবং সহ ধর্ম্মী দু তিনটি পার্টি ছাড়া অন্য সব দলই এক বাক্যে স্বীকার করিতেছেন যে রাজ্যের শিল্পমহলেই কেবল নহে প্রায় সর্ব্বত্রই বিষম এক অরাজকতার সৃষ্টি হইয়াছে। সাধারণ মানুষের মনে নিরাপত্তার ভাবও আজ আর নাই, সকলের মনে সদা "কি হয় কি হয়" ভাব। রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া সংবাদপত্রে যে বিবৃতি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিতেছেন যে ১৯৬৮ সালের তুলনায় এ বৎসর শিল্প উৎপাদন অনেক কমিয়া গিয়াছে। শিল্প সম্প্রসারণ বন্ধ, নূতন নিয়োগ নাই, চাকুরীর সংখ্যাও ক্রমশঃ কমিয়া যাইতেছে—সব কিছু মিলিয়া পশ্চিমবঙ্গে অবস্থা আজ অসহনীয় হইয়াছে।

শ্রীধাড়া আরও বলেন যে ইণ্ডিয়া সাইকেল, বেঙ্গল ল্যাম্প, আলামোহন দাস গ্রূপ অব্ ইণ্ডাস্ট্রিজ, বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিল প্রভৃতি আরো বহু কারখানার কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদের সংস্থাগুলির পরিচালনার দায়িত্ব সরকারকে লইবার জন্য কাতর অনুরোধ জানাইয়াছেন। অন্যদিকে কাঁচা মালের অভাবে স্যাক্সবি ফারমার কারখানার অবস্থাও প্রায় অচল। রাজ্যের প্রকৃত অবস্থা আজ যাহা, শ্রীধাড়া তাহার পূর্ণ রূপ প্রতিফলিত করেন নাই, ফ্রণ্ট সরকারের প্রতি মায়াবশত কিঞ্চিৎ কমই বলিয়াছেন। এ রাজ্যে ঘেরাও এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সঙ্গে ধর্ম্মঘট এবং অন্যবিধ হিংস্র শ্রমিক-বিক্ষোভও কম নহে। কারখানা-মালিকদের ঘরেও শান্তি নাই, দাবী আদায়ের কারণে কারখানা ছাড়িয়া শ্রমিকদল এবার শিল্পপতিদের বসতবাটী ঘেরাও করিয়া তাহাদের পরিবারবর্গকেও বিবিধ প্রকারে নির্যাতীত করিতেছে। বাড়ীর পরিবার-বর্গ, নারী এবং বালক বালিকা শিশুরাও দীর্ঘকালের জন্য খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইতেছে 'ঘেরাও' ওয়ালাদের বিক্রম-বিক্ষোভের কারণে। এ বিষয়ে বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই, সংবাদপত্র পাঠকমাত্রেই প্রত্যহ প্রাতে কাগজ খুলিয়াই প্রথম পৃষ্ঠা হইতেই শ্রমিকদের গণ আন্দোলনের নিত্য নব নব অজস্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইবেন।

বিপদগ্রস্ত নির্যাতীত মানুষ পুলিসের সাহায্য পাইবে না, যদিও পুলিসবাহিনীর সকল ব্যয় সাধারণ মানুষের দেয় টেক্স হইতেই নির্ব্বাহিত হইবে। দিব্যদৃষ্টি-সম্পন্ন পরম জ্যোতির্ময় পুরুষ মাননীয় উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় সোজা বলিয়া দিয়াছেন, তাঁহার (ব্যক্তিগত নহে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত) পুলিশবাহিনী শ্রমিকদের গণ-আন্দোলনে (অর্থাৎ মালিক পিটাইয়া কলকারখানা তছনছ করিয়া এবং অন্য প্রকার হাঙ্গামা করিয়া দাবি আদায়ের প্রয়াস-প্রচেষ্টা সব কিছুই শ্রমিকদের যুক্তিসঙ্গত গণ-আন্দোলন (!) তথা গণতন্ত্রসম্মত বিক্ষোভ প্রভৃতিতে) কোন প্রকার বাধার সৃষ্টি করিবে না, হস্তক্ষেপ ত দূরের কথা!

পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থায় বাঙ্গলার সাধারণ ব্যক্তিমাত্রেই আজ ভীত, আতঙ্কিত, কিন্তু বিষম দিব্য দৃষ্টিধর জ্যোতিবসু বর্ত্তমানে পরম আনন্দে রহিয়াছেন। জ্যোতিবাবুর চোখে এ-রাজ্যে সবই স্বাভাবিক, এমন কিছুই এখানে ঘটে নাই বা ঘটিতেছে না, যাহাতে কাহারো মাথা ব্যথা করিবার কোন হেতু

আছে। অর্থাৎ কিনা ভারতের অন্য বহু রাজ্যের বহু ব্যক্তি পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপার দেখিয়া যখন চিন্তিত, শঙ্কিত, সেই অবস্থাতেও জ্যোতি বসু, বাঙ্গলার ব্রেজনেভ প্রমোদ দাসগুপ্ত, রামবল গোঁয়ার এবং অন্যান্য কট্টার ঘোর লাল কম্যুর দল আনন্দে দিন যাপন করিতেছেন, খোস মেজাজে, বহাল তবীয়তে। তাঁহাদের মনে হইতেছে, তাঁহাদের আশা আকাঙ্খা এবার পূর্ণ হইবার পথে, দেশ লাল, পতাকায় এবং লাল রক্তপ্রবাহে লালে লাল হইয়া যাইবে। যে বিশ্বধ্বংসী নৈরাজ্যের স্বর্গীয় স্বপ্নে তীব্র লাল কম্যুর দল আজ বিভোর, সেই সকল সুস্থনীতি এবং আদর্শের বিলোপ এবার পশ্চিমবঙ্গ হইতেই সারা বিশ্বে ব্যাপ্ত হইবে ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই !!

বাঙলার ব্রেজনেভের ভাষ্য—

পশ্চিমবঙ্গের সি-পি-এম সদা যুদ্ধং দেহী নেতা, আসলে এ-রাজ্যে রাশিয়ার 'ব্রেজনেভের' প্রতিমূর্ত্তি—এক ভাষণে স্পষ্ট ঘোষণা করিয়াছেন যে আমাদের দেশের সংবিধান, আইনকানুন এবং সেই সঙ্গে আদালত কোর্ট-কাছারি সব কিছুই রচিত হইয়াছে জমিদার, শিল্প-পতি এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের স্বার্থরক্ষার জন্যই! সং-বিধানে তথা ভারতীয় আইন-কানুনে, মেহনতী মানুষের স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থাই নাই। যতদিন এই সংবিধান এবং একদেশদশা আইন-কানুন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া ওয়েষ্ট-পেপার বাস্কেটে নিক্ষেপ করিয়া, নূতন করিয়া ভারতীয় সংবিধান এবং আইন কানুন (সি পি এম নেতাদের দ্বারা) রচিত না হইতেছে, ততদিন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতে হইবে—ইহা ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নাই! প্রমোদ বাবু অমিত শক্তির ধারক এবং দেশের জনকল্যাণের নীতির বাহকও বটেন। যেভাবে তিনি দেশের বর্ত্তমান সংবিধান এবং আইন-কানুন এবং কোর্ট-কাছারির (ইহার মধ্যে আদালতের জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট এমন কি সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরাও আছেন) শ্রাদ্ধ করিয়াছেন কাঁচা ভাষায়, তাহা "আদালত অবমাননার" আওতায় পড়ে কিনা, আইন এবং কেন্দ্রীয় সরকার, তথা লোকসভা, তাহার বিচার করিবে, কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে এইটুকু বলা অবশ্যই যায় যে, বাঙলার ব্রেজনেভ পরম শক্তিধর পুরুষ হইলেও তাঁহাকে আদালতে হাজির করা যায়, বর্ত্তমান আইনের জোরেই। কিন্তু একাজ অতিশয় সমীচীন হইলেও, এই গুরু-দায়িত্ব কে পালন করিবে, কাহার নির্দ্দেশে দেশ এবং সমাজদ্রোহীর বিচার ব্যবস্থা হইবে ?

এই কর্ত্তব্য আমাদের প্রধান মন্ত্রীর (যে প্রধান মন্ত্রী নিত্য নব অনুশাসন প্রচার করিয়া দেশ এবং জাতিকে স্তম্ভিত, অভিভূত করিতেছেন!)—কিন্তু তিনি ইহা করিবেন না, করিতে-ভরসাও করিবেন না, কারণ সংসদে এখন কংগ্রেস-বিরোধী শক্তি এবং দলগুলি তাহার প্রধান সহায়! কমিউনিষ্ট এবং সহমতাবলম্বী দলগুলি জানে অসহায় ইন্দিরা গান্ধীর দুর্ব্বলতা কোথায় এবং প্রধান মন্ত্রীর 'প্রধান'—দুর্ব্বলতার সুযোগ তাহারা লইবে। আত্মরক্ষায় [অর্থাৎ নিজের গদি] প্রয়োজনে তিনি দরকার হইলে পলিট-ব্যুরোর মিটিংএ ভাষণ দিতেও দ্বিধা করিবেন না—ইহাতে কিছু হাততালিও তাঁহার উপরি লাভ হইবে। এ দৃশ্য শীঘ্রই দেখিব আশা করি।

এক রামে রক্ষা নাই—সুগ্রীব দোসর

একদিকে পশ্চিম বঙ্গের সি-পি-এম-ব্রেজনেভ অহরহ ভারতীয় সংবিধান এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশের প্রচলিত আইন-কানুন কোর্ট-কাছারি তথা সর্বপ্রকার সৎ এবং সুনীতিসম্মত আচার-ব্যবহার বরবাদ করিয়া মার্ক্সবাদের নামে অ-মার্ক্সীয় কদাচার চালু করিবার প্রতিজ্ঞা করিতে-ছেন, অন্যদিকে পশ্চিম বঙ্গের সি পি এম 'কোসিগীন' জ্যোতি বসু মহাশয় হুমকী ছাড়িয়াছেন, এ-রাজ্যে যদি সি পি এম দলকে বাদ দিয়া অন্য কোন মিনি-ফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়, এমন কি গঠন করিবার অপবিত্র-প্রচেষ্টাও হয়, তাহা হইলে সি পি এম পশ্চিম বঙ্গে ভীষণ এক বিপর্যয় ঘটাইবে, যাহার ফলে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা, শিল্প-বাণিজ্য, কলকারখানা এবং প্রায় সর্ব্ববিধ সংস্থার সঙ্গে স্কুল-কলেজ কোর্ট-কাছারির কার্য্যকলাপ বন্ধ

হইয়া যাইবে। পশ্চিম বঙ্গের প্রশাসনিক হেড্ কোয়াটার্স ডালহাউসি স্কোয়ার সি পি এম বাহিনীর দ্বারা ঘেরিত হইবে! এক কথায় জ্যোতি বসুর সি পি এম বাহিনী পশ্চিম বঙ্গকে ভিয়েৎনামে পরিণত করিবে। সি পি এমের এই গণতান্ত্রিক যুদ্ধবিগ্রহে পশ্চিম বঙ্গের জনগণ সর্ব্ব সক্রিয় সহযোগিতা অবশ্যই দান করিবে—অর্থাৎ জনগণ নিজেদের শেষ শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা নিজেরাই করিবে —সি পি এমের পৌরোহিত্যে!

উপ-মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে বসিয়া এখন হুমকী এবং বেপরোয়া 'যুদ্ধ ঘোষণা' ভদ্রজনোচিত কি না জানি না কিন্তু পশ্চিম বঙ্গের এখন যে অবস্থা, যেভাবে নরহত্যা, চুরি ডাকাতি, ছিনতাই, দলীয় সংঘর্ষের ফলে হাজার হাজার লোকের জীবন এবং সহায়-সম্পত্তির বিষম ক্ষতি প্রত্যহ হইতেছে, পুলিশকে যে প্রকার নির্লজ্জভাবে জ্যোতি বসু তাঁহার বরকন্দাজ-বাহিনীতে পরিণত করিয়াছেন, সরকারী পুলিশ যে-রাজ্যে জ্যোতিবাবুর হুকুম ছাড়া রাজ্য-মন্ত্রীদেরও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিতে পারে না বা করে না,—এক কথায় যে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা, শাসন এবং সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা বলিয়া কিছুই নাই, সেই রাজ্যে জ্যোতি বসু নূতন আর কি করিতে পারিবেন জানি না। জ্যোতি বাবু কি মনে করেন তিনি বিধান সভার ৮৩ জন সিপি এম সদস্য এবং ৫০,০০০ সি পি এম 'সৈন্য লইয়া বাংলা দেশ জয় করিবেন? তিনি ভুল করিতেছেন। বাঙলা দেশে সি পি এম বিরোধী মানুষ এবং দলের কিছু কমতি নাই এবং ইহারা সি পি এম হুমকী এবং যুদ্ধ প্রচেষ্টাকে বাধা দিতেও প্রস্তুত, হিংস্রতায় যাহা সি পি এমের অপেক্ষা কোন অংশেই কম হইবে না। জ্যোতিবাবু একটু বুঝিয়া চলুন, মাত্রা ছাড়াইয়া যাইবেন না, ইহাতে তাঁহার বিপদ ঘনাইয়া আসিবে এবং বিপদটা যে কি তাহার সঙ্কেত তিনি ইতিপূর্ব্বে পাইয়াছেন বলিয়া শুনিয়াছি। 'সরকারী বডি-গার্ড' মানুষকে কতদিন রক্ষা করিবে?

শ্রীজোতি বসু এবং শ্রীপ্রোমোদ দাসগুপ্ত যেভাবে এবং ভাষায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা ফ্রন্টসরকারের অন্য শরিকদলগুলিকে চোখ রাঙ্গাইয়া হুমকী দিতেছেন, এই বলিয়া যে কেউ অসভ্য সরকারের মুখ্যমন্ত্রী থাকিতে পারেন না: সি পি এম কে বাদ দিয়া সরকারের স্বপ্ন অলীক "ইত্যাদি, তাহাতে মনে হয় যেন জ্যোতি প্রমোদ এই দুই মহাপুরুষই পশ্চিমবঙ্গের যুক্ত-অধীশ্বর এবং তাঁদের কথা এবং হুকুম মতই সকলকে চলিতে হইবে। এই দুই জনের বাধ্যতা স্বীকার যাহারা করিবে না, তাহাদের ফ্রন্ট সরকারে থাকা চলিবে না! অতএব সি পি এম সহ অন্য একটি লেঙ্গটি দলের হাতে রাজ্যের সকল শাসন ক্ষমতা অর্পণ করিয়া সকলে বানপ্রস্থ গ্রহণ করুন। অবাক হইয়া দেখিতেছি, ফ্রন্ট সরকারের অন্য শরিকরা কি করিয়া সি পি এমের সহিত এমন বিষম অবমাননাকর অবস্থায় একই ঘরে বসবাস করিতেছে!

সুন্দারাইয়ার বজ্র নিনাদ!

ভারতীয় সি পি এম পার্টির জেনারল সেক্রেটারী শ্রীমৎ সুন্দরাইয়া কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় প্রকাশ্য-ভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে রাজ্যের ফ্রন্ট সরকার হইতে বিগ্ ব্রাদার সি পি এম কে যদি ছাঁটিয়া দেওয়া হয় এবং যে দিন এই অঘটন ঘটিবে তাহার পরদিন হইতেই রাজ্যের পথেঘাটে পবিত্র মুক্তি যুদ্ধ' আরম্ভ হইবে! এই ঘোষণার সোজা অর্থ এই দাঁড়ায়, যে পশ্চিম বঙ্গে, প্রয়োজন হইলে সি পি এম বাহিনী এবং তাদের সমর্থক সকল জন অভূত-পূর্ব্ব "জন (তথা মুক্তি) যুদ্ধ" আরম্ভ করিবে এবং এই জনযুদ্ধে তাদের জয় অবধারিত! কথায় মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ১১৩ জনই সি পি এমের তাঁবে এবং সি পি এম সেনাপতিদের নির্বাক আজ্ঞাবহ।

প্রকাশ্যভাবে উপরি উক্ত প্রকার ঘোষণা এবং হুমকী অপরাধজনক এবং দণ্ডনীয় কি না, তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের বিচার্য্য হইলেও, বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের গৃহকর্ত্রী এবং তাঁহার অধীন অন্যান্য কর্ত্তারা এখন এমন এক অবস্থায় পড়িয়াছেন যাহাতে তাঁহারা সি পি এম এবং সি পি আই এই দুটি দলের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থাই লইতে পারিবেন না, কারণ এই দুটি দলের সমর্থন এখন কর্ত্তৃ-ঠাকুরাণীর পক্ষে অতীব, মূল্যবান। কেন্দ্রের বগা-সর্দ্দারও

হঠাৎ মেষশাবকের, ভেক লইয়াছেন! এই Strong Man হঠাৎ Unstrong হইয়া গেলেন কেন?

রাজ্য সরকারের নিকট কয়েকটি প্রশ্ন

১। রবীন্দ্র সরোবরের হাঙ্গামার তদন্ত কমিটির রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বাহাদুর তথা বাহাদুর-প্রধান উপমুখ্যমন্ত্রী কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন -?

২। বড়বাজারের দিনমজুরদের "বোনাস দাবী" কোন্ যুক্তিতে শ্রীজ্যোতি বসুর দল সমর্থন দিয়াছেন এবং পশ্চিমবঙ্গের ব্যবসায় কেন্দ্রের অচল অবস্থার স্থায়ী সমাধানে কি ব্যবস্থা লইয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে জিজ্ঞাস্য এই যে, বড় বাজারে প্রায় ২০,০০০ হাজার কুলি অর্থাৎ দিন-মজুর আছে। ইহারা কাহারো কিংবা কোনো ব্যক্তি বিশেষ বা মালিকের অধীনে চাকুরী করে না তবে কোন্ যুক্তিতে বোনাসের দাবী উঠিতে পারে? এই অঞ্চলের বিশ হাজার জন মজুরদের মধ্যে দুই চারিজনও বাঙ্গালী মজুর আছে কি না? যদি না থাকে কেন নাই? কারণ কি এই যে, হাওড়া এবং শিয়ালদহ ষ্টেশনে বাঙ্গালী কুলী কাজ করিতে গেলেও তাহারা বিষম সংখ্যা-গুরু অবাঙ্গালী শ্রমিকদের দ্বারা বিতাড়িত হয়।

৩। বড়বাজার অঞ্চলের মুটিয়াদের জনপ্রতি দৈনিক আয় ১০ হইতে ১৫ টাকার কম নহে এবং রোজগারের শতকরা ৯০্ টাকাই পশ্চিম বাঙ্গলার বাহিরে পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যগুলিতে চলিয়া যায় কিনা।

বাঙ্গালী শ্রমিক যেখানে ইচ্ছা এবং শক্তি থাকিতেও কাজের সুবিধা পায় না, বা বঞ্চিত হয় সেখানে অবাঙ্গালী শ্রমিকদের জন্য সি পি এমের এত দরদ কেন? এখানেও কি পার্টির স্বার্থই প্রধান বিবেচ্য বিষয়?

২। সি পি এমের এই পক্ষপাতিত্বের ফলে শেষ পর্য্যন্ত কি বাঙ্গালী-অবাঙ্গালী সংঘর্ষ বাধিবে না? ইহাই কি সি পি এম কর্ত্তাদের কাম্য? এবং যাহার ফলে 'শ্রেণী' সংগ্রামক্ষেত্র আরো প্রসারিত করিয়া কমিউনিষ্ট স্বর্গরাজ্যের গোড়াপত্তন সহজ হইবে? বারান্তরে আরো কয়েকটি প্রশ্ন করিব—অবশ্য জবাব পাইব না জানিয়াই!

তোতলাদের কথা

নলিনীমোহন মজুমদার

বয়স্ক তোতলাদের জন্য সান্ধ্যক্লাসের অনুষ্ঠান বহুবৎসর ধরে লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিল করে আসছে। সেখানে বিশেষজ্ঞগণ এই অস্পষ্ট বাকশক্তিসম্পন্ন অবহেলিত ব্যক্তিদের প্রতি নজর দিয়েছেন।

বেশ কিছুদিন যাবৎ আমাদের দেশে "ইণ্ডিয়ান স্পিচ্ এ্যাণ্ড ষ্ট্যামার এসোসিয়েশন" এ বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দিয়েছেন। সম্প্রতি এসোসিয়েশনের এই মহান উদ্দেশ্যের শুভ প্রচেষ্টার কার্য্যধারাকে সাফল্যের সঙ্গে আরো বিস্তৃত আকারে তোতলাদের সুবিধার জন্য ছড়িয়ে দিতে তাঁরা দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করেছেন।

১২ বৎসর হইতে ৫৫ বৎসর পর্য্যন্ত তোতলাদের নিয়ে দল (Group) গঠিত হয়। বয়সের এই বিস্তৃত পরিধি ছাড়াও জাতিগত, সামাজিক ও শিক্ষাগত বিভিন্ন পটভূমিকায় লোক রয়েছেন। আদর্শ চিকিৎসাধীন দল (Group) ৮ জন নিয়ে গঠিত হয়।

এই চিকিৎসাপদ্ধতি একটি ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই ধারণা ক্রমশ বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আজ ইহা অনেকের কাছেই সুস্পষ্ট হয়ে গেছে যে, এই চিকিৎসাপদ্ধতি একটিমাত্র বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহা এই যে, তোতলারা "স্বাভাবিক ব্যক্তি" তাদের স্বাভাবিক বাচনভঙ্গি আছে। তবে তাদের বাচনভঙ্গির যোগাযোগে কিছু বিশৃঙ্খলা আছে।

আমরা যদি একটু তলিয়ে দেখি তা হ'লে দেখতে পাব যে, প্রধানত: সমস্যার সমাধানের পদ্ধতি দুইটি : প্রথমত তোতলাদের সম্পর্কে আমাদের মনোভাবের পদ্ধতি পরিবর্তন। আমাদের সাধারণ স্বাভাবিক মানুষের তাদের প্রতি আরো সহানুভূতিশীল হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইহা আমাদের সামাজিক দায়িত্ব। দ্বিতীয়ত: বাচনভঙ্গির সংস্কার। কিন্তু বাচনভঙ্গি সংস্কারের সময় একটি কথা মনে রাখতে হবে যে-চিকিৎসা তোতলাদের সম্পর্কে মনোভাবের পরিবর্তন না ঘটিয়ে শুধুমাত্র বাক্পটুতা পরিবর্তনে সাহায্য করে সেই চিকিৎসা পদ্ধতি কম ফলপদ হয়, অথবা তাহার ফল ক্ষণস্থায়ী হয়। তাই বাচনভঙ্গির সংস্কারের মনোভাবের পরিবর্তন বিশেষ প্রয়োজন। তারপর বাচনভঙ্গি সংস্কার। এ বিষয়ে "ইণ্ডিয়ান স্পিচ্ এ্যাণ্ড ষ্ট্যামার এসোসিয়েশন" এর কার্য্যধারা সত্যই প্রশংসনীয়। তারা প্রয়োজনবোধে বিশেষক্ষেত্রে পৃথক ও ব্যক্তিগতভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকেন।

মূলত তোতলামি রোগ নয়। তাহারা সাধারণ মানুষের মত ভাবপ্রবণ এবং বাক্শক্তি ও শ্রবণশক্তির অধিকারী। ইহারা যে বাধ বাধ কথা বলে তাহার কারণ শ্বাসযন্ত্রের গোলযোগ, যাহার জন্য স্নায়ুর কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে না, সহজেই উত্তেজিত ও ভীত হইয়া পড়ে, ফলে শ্বাসনালীর কাজ ব্যাহত হয়। স্বাভাবিকভাবে শ্বাসকার্য্য চলিতে পারে না এবং মনের কথাগুলি ধ্বনিরূপে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হয়, তখন কথাগুলি অস্পষ্ট হইয়া বাহির হয়। ইহাকেই তোতলা আখ্যা দেওয়া হয়। এই তোতলামি দুরারোগ্য ব্যাধি নয়। কোন অভিজ্ঞ শিক্ষকের অধীন থাকিয়া সাংকেতিক অভিজ্ঞার সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত অভ্যাসের দ্বারা শ্বাসনালীর কাজ স্বাভাবিক অবস্থায় উন্নীত হইয়া কথা সাধারণের বোধগম্য হইবে ও উচ্চারণ সুস্পষ্ট ও স্বাভাবিক হইবে। স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাসের দ্বারাই আমাদের মনের কথাগুলি ধ্বনিরূপে প্রকাশ পায়।
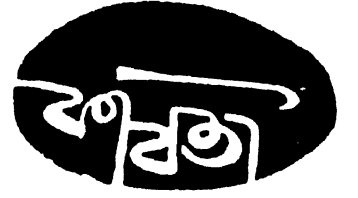
ইতিবৃত্ত

ডাঃ নন্দলাল পাল

উন্মুক্ত গবাক্ষ পথে ঘরে ঢুকে ভোরের আলোক
দূরে ঋজু দেবদারু কী যেন কী বলে। প্রতি ডালে
সকালের মিঠে রোদে কচি পাতা করে ঝলমল,
কোন সে অজানা পাখি শিষ দেয় পাতার আড়ালে।
নীচে ওই পীচ্‌ঢালা রাস্তাটার বুকের উপরে
ট্রামের কঠিন চাকা কী দারুণ দাগ কেটে যায়;
কল কোলাহলময় জীবনের শ্রমের সঙ্গীত
কান দিলে হৃৎপিণ্ডের টিপ টিপ শব্দে শোনা যায়।
সূর্যের চিকণ আলো কাঁপে যেন পাতায় পাতায়,
নেমে আসে এইটুকু উঠানের কচি কচি ঘাসে;
পিঙ্গল সোনালী-আভা অনিরুদ্ধ সৃষ্টির ব্যথায়
ধোঁয়াটে আকাশ গায়ে মুমূর্ষু রোগীর মত হাসে।
পাথরের ফাঁকে ফাঁকে গুমরিয়ে নিরুদ্ধ নিশ্বাসে,
দধীচির অস্থিমালা লিখে চলে সৃষ্টির নবীন ইতিহাসে।

ভেসে আসে

সুধীর গুপ্ত

ভেসে আসে দিন রাত শুধু ভেসে আসে
অনেক—অনেক দূরের যুগের কথা,
বুক ভরা প্রেম—প্রাণ ভরা আকুলতা;
সীমায়িত জীবনের সীমা তা'রা নাশে
যা'রা সব দেখেছিলো হেথা এই ঘাসে
সবুজের সমারোহ—নিত্য নবীনতা;
ভেদ করি' অতীতের স্তব্ধ নীরবতা
মনে হয় কথা কয় যেন ব'সে পাশে।
হারায় না -ফুরায় না কিছু তো জীবনে,
জুড়ায় না কোন ভাবে জীবনের তাপ;
যা'রা যায়, বাসা বাঁধে কোটি কোটি মনে;
কে করিবে জীবনের হেথা পরিমাপ!
ভেসে আসে—ভেসে আসে শুধু ক্ষণে ক্ষণে,
জীবন ক্ষণিক—ক্ষুদ্র কে করে বিলাপ!

নিজেকে সে বলে না কৃতঘ্ন

মনোরমা সিংহরায়

কৃতঘ্ন হৃদয় যদি কখনো তোমার দ্বারে এসে
হার্দ্য প্রগলভতা দেয় অভাবিত সন্দেহ কেবল
আপনিই বাসা বাঁধে, বলো কী বলে ফেরাবে শেষে।
অভ্যর্থনা আপনি মুখর প্রত্যহের অবসাদ নিয়ে ।।
নিষ্ঠুর আঘাতে সত্তা বার বার আলোড়িত হয়।
প্রেমের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারিত হলেও আবার
বিস্মরণে শেষ হয়। তবুও সে করে অভিনয়
অন্তিম দৃশ্যের জন্য অপেক্ষায় থাকে বন্ধু বেশে ।।
নিজেকে সে বলে না কৃতঘ্ন। পরিচয় প্রেমিক সুজন
অথচ মিতালি তার নির্বিরোধ ছলনাই আনে।
নাটক তখন জমে যখন পঞ্চম অঙ্কে মন
অবসাদে ক্লান্ত হয়ে অপমানে ধুলায় ধূসর ।।

স্বাধীনতার পাদপীঠে

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

পৃথিবীতে যাহা-কিছু শুভ বলে মানি
তাদের সবার উৎস স্বাধীনতা জানি।
যত মত তত পথ—যুগের বারতা!
তোমার সৃষ্টিতে হেরি সবই বিচিত্রতা।
ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের দীপ্ত, পবিত্র স্বাক্ষর
নিজ-হস্তে রেখে দিলে তুমিই ঈশ্বর
প্রতিটি সত্তায়! তাই স্বধর্মে নিধন—
সেও ভালো। আত্মহত্যা পরানুকরণ।
আপনারে দিয়ে তাই অন্যের বিচার—
বিশ্ব-জোড়া এ ভ্রান্তির নহি অংশীদার—
রুচিতে, বিশ্বাসে আমা হ'তে ভিন্ন যারা—
নিঃসংশয়ে আরও প্রিয় মোর কাছে তারা।
এজগতে কে যে তব বার্তাবহ নয়?
মহাপাপী—তাহাতেও রেখেছো প্রত্যয়।

শেষ সূর্য

(গল্প)

অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

সেনট্রাল এ্যাভিন্যুর মোড়ে এয়ারলাইন্‌সের গাড়িটা দাঁড়িয়ে পড়লো। বিরাট এক মিছিল আসছে উলটো দিক থেকে। সেনট্রাল এ্যাভিন্যু ধ'রে। মিছিলের শেষ দেখা যায় না। বিরক্ত হয় সুবীর। হাতঘড়িটা একবার দ্যাখে। নির্ঘাৎ দেরী হবে গাড়িটার এয়ারপোর্টে পৌছুতে। বোয়িং ৭০৭-ও দেরী করে ছাড়বে। এতক্ষণ বেশ কল্পনায় মশগুল ছিল সুবীর। মেঘের সমুদ্রের ওপর দিয়ে উড়ে চলেছে বিশাল বোয়িং ৭০৭ প্লেনটা। ওপরে নীল আকাশ। বেইরুট···রোম··· ফ্রাংকফর্ট···লণ্ডন। তারপর নিচে সীমাহীন আটলান্টিক। এক মুহূর্তে বোয়িং এর উদ্ধত গর্জনকে স্তব্ধ করে দিতে মুখব্যাদান করে আছে।

গাড়ীটা আমার সংগে সংগে—আজব শহর কলকাতার বিচিত্র পরিবেশ।

নেহেরু কলকাতাকে বলেছিলেন মিছিল নগরী। বিশেষণটা যে কত বড় সত্য এই মুহূর্তে আরও বেশী করে বুঝতে পারছি। বহুপরিচিত কলকাতা ছেড়ে যাবার যে বেদনা এতক্ষণ সুবীরের মন থেকে আমেরিকা যাবার আনন্দটুকু বিস্বাদ করে দিচ্ছিল, মিছিলের প্রতিবন্ধকতা আবার তাকে কোথায় তাড়িয়ে নিয়ে গেল।

মিছিলের ধ্বনি ক্রমশঃ এগিয়ে আসছে। নেমে পড়লো সুবীর। সেই পরিচিত ফেস্টুন, দৃশ্য। গতানুগতিক। কিশোর-কিশোরী তরুণ-তরুণী প্রৌঢ়-প্রৌঢ়া বৃদ্ধ-বৃদ্ধা। সচেতন শৃঙ্খলার অভাব। মালবিকার কথা মনে হয় সুবীরের। মাথায় ক্ষণিকের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ খেলে যায়। একটু অন্যমনস্কও হয়ে পড়ে। উদাসভাবে তাকিয়ে থাকে চলমান মিছিলটার দিকে। মালবিকাকেই খুঁজতে থাকে। হয়তো মালবিকাও আছে মিছিলে। এতবড় মিছিলে থাকাটাই স্বাভাবিক। অন্ততঃ মালবিকার পক্ষে। আমেরিকা যাওয়া ঠিক হওয়া থেকে আগের মুহূর্ত পর্যন্ত একবারও মনে হয়নি মালবিকার কথা। কিন্তু এই মিছিলটাই সব গোলমাল করে দিল। কেননা মিছিল বলতে মালবিকা। অন্ততঃ সেদিনের।

সেদিনটাও অনেক পেছনে ফেলে এসেছে সুবীর। আজকের দূরত্ব অনেক। না—আজ আর ভাবা যায় না মালবিকার কথা। ভাবা উচিতও নয়। সেদিনের মালবিকা মৃত। হ্যাঁ মৃত ছাড়া আর কি সুবীরের কাছে। দৈহিক মৃত্যুই তো চরম সত্য নয়। তার চেয়েও বেশী কিছু থাকতে পারে। সুবীরের ক্ষেত্রে মালবিকাও তাই। মালবিকাকে নিয়ে কোন দিন দিবাস্বপ্ন রচনা করেনি সুবীর। দৃঢ় বাস্তববাদী সুবীরের মনটা। মরবিডিটির ঠাঁই ওর মনে কোন দিন হয়নি। মরবিডিটির জন্মস্থানে যেন একটা পাথর বসিয়ে রেখেছিল। মালবিকার সংগে ডিভোর্সও হয়েছে অনেক দিন। এর মধ্যে মনের মধ্যে মালবিকার জন্য ন্যূনতম জায়গায়ও রাখেনি। যখনই উঁকি দেবার উপক্রম হয়েছে বাস্তবের শক্ত চাবুক নিয়ে রুখে দাঁড়িয়েছে।

আজ সেই পাথরটার মধ্যে সূক্ষ্ম চিঁড় ধরেছে কিনা বুঝতে পারছেনা সুবীর। কলকাতার আকাশ-বাতাসে বিদায়ের বিষণ্ণতা। গগনচুম্বী বাড়ির ফাঁক দিয়ে হেলে পড়া বিকেলের রোদে বর্ষশেষের পাণ্ডুরতা।

(বুঝতে পারছেনা সুবীর রূপসী কলকাতার ছলনা কিনা।)

একটা সিগারেট ধরালো। মোটরে উঠতে যাচ্ছিল বিষণ্ণতা থেকে নিজেকে আড়াল করতে। ওঠা হ'লোনা। সুবীরের ধারণাই ঠিক। মালবিকাই আসছে ওর দিকে। অপ্রত্যাশিত মনে হয়না সুবীরের। মালবিকাকে সুবীর ভালভাবেই জানে। ওর পক্ষে অন্যকিছুর মতো মিছিল থেকে বেরিয়ে সুবীরের কাছে আসাও বিচিত্র নয়। সব কিছুই যেন ওর কাছে বিরাট ছেলেখেলা।

'প্যান্ এ্যামেরিকান' এর গাড়িতে কোথায় চললে? মালবিকা বললো।

মনে মনে হিসেব করে সুবীর। ডিভোর্সে'র পর ঠিক পাঁচ বছর চলে গেছে। ডিভোর্সে'র পরদিন থেকে এ পর্যন্ত কেউ কারও খবর রাখেনি। মালবিকারই ইচ্ছায় এবং ব্যবস্থায়। কোর্টে ডিভোর্স সার্টিফিকেটে সই করার সময়ই মালবিকা সুবীরের কাছ থেকে আইনানুগ মাসোহারা প্রত্যাখ্যান করেছিল।

সিগারেটটা পায়ের তলায় চেপে ধরলো সুবীর।

'আপাতত লণ্ডন হ'য়ে এ্যামেরিকা।' সুবীর বললো।

কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করেনা সুবীর মালবিকার মুখে। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মালবিকা। পুঁজিবাদী এ্যামেরিকার নাম শুনলে কানে আঙুল দিত।

'বেড়াতে না চাকরি নিয়ে?'

'আমাদের মত লোকের এ্যামেরিকা বেড়ানো···! চাকরিই একটা পেয়ে গেলাম মালু!'

একটু চমকে ওঠে মালবিকা। সুবীরও। উভয়ের কাছেই বহুদিন পর ওই পরিচিত ডাকটা কিনা।

'প্রফেসরি ছেড়ে দিয়ে যাচ্ছো তবে?'

সুবীর নীরবে আরেকটি সিগারেট ধরায়।

'ওসব ছাইপাশ আবার কবে থেকে খাচ্ছো?'

'ডিভোর্সের পরদিন থেকে। নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে হলে এর সাহচর্য খুবই দরকার।'

'কয়দিনের জন্য যাচ্ছো?'

'আপাততঃ দশ বছরের জন্যে। তারপর···

কি যেন ভাবতে থাকে মালবিকা।

'পিংকুকে কোথায় রেখে গেলে?'

'পিংকু···!'

ছোট্ট একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সুবীর এতক্ষণ বেশ স্বাভাবিক হয়েছিল যদিও মালবিকা আজ তার নয়। মালবিকার ওপর কোন দাবী আর অধিকারও সুবীরের নেই। পিংকুর প্রসঙ্গ স্বাভাবিকতার ওপর পূর্ণচ্ছেদ টানলো।

মোটরের পা-দানির দিকে ঘুরে দাঁড়ালো সুবীর।

'প্রথমে রোগটা ধরা পড়েনি। যখন ধরা পড়লো করার কিছুই ছিল না। তবু চেষ্টার ত্রুটি করিনি মালু। কিন্তু······ব্লাড্ ক্যান্সারের চিকিৎসা আমাদের দেশে এখনো হ'চ্ছেনা মালু।'

খানিকক্ষণ উভয়ে নীরব। মিছিল প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। গাড়ির হর্ণ বাজছে। হর্ণের শব্দে কেমন একটা কারুণ্য। অন্যদিনের মতো মেজাজ বিগড়ে দিচ্ছেনা। সুবীর প্রস্তুত হয় গাড়িতে উঠতে। নীরবতাও ভাঙ্গে সুবীরই।

'মিছিল শেষ হয়ে এলো। গাড়ি এবার ছাড়বে। তোমাদের সাফল্য কামনা করি।'

গাড়ি ছাড়লো। মিছিলের শতকণ্ঠের ধ্বনি ক্রমশঃ দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। সবাইকে ছাপিয়ে মালবিকার গলাই যেন সুবীরের কানে বাজতে থাকে। মালবিকার বজ্রমুষ্টি যেন দেশের একেকটি অব্যবস্থাকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে চাইছে।

মালবিকা বলেছিল, 'তুমি বড় কন্‌জারভেটিভ্ সুবীর। অনেকটা বুর্জোয়াদের মতো।' জোর গলায় প্রতিবাদ করেনি সুবীর মালবিকার কথার। প্রতিবাদের জোর এবং প্রবৃত্তি দুই-ই হারিয়ে ফেলেছিল। কেন হারিয়েছিল কোনদিন বলেনি মালবিকাকে। শুধু দুজনের মাঝে একটা কুয়াশার আবরণ দিয়ে রেখেছিল।

সুবীর আস্তে বলেছিল, 'হয়তো তাই মালু। কিন্তু

আমাদের পরিবারের পক্ষে প্রত্যেক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার অসুবিধে অনেক।'

'আসল কথা তোমরা সমাজটাকে একটা ষ্টেটিক্ পজিশনে রাখতে চাও? বেশ ক্ষুব্ধ গলায় বললো মালবিকা, 'যেভাবে চলছে সেভাবে চললেই তোমাদের ভালো। এগিয়ে যাবার পথটাকে তোমরা চিনলেইনা।'

খুব জোরে হাসতে ইচ্ছে হয়েছিল সুবীরের মালবিকার কথায়। কথাগুলো নতুন নয়। বহুদিনের পরীক্ষার কষ্টিপাথরে যাচাই করা নিরেট সত্য। হাসেনি। একটা কথাও বলেনি। সেদিনও নিজের কথাই মনে হয়েছিল। আজও তাই হচ্ছে। সেদিন নিজের ফেলে আসা জীবনের বীতশ্রদ্ধ অভিজ্ঞতার সংগে মালবিকার কথাগুলোর মিল খুঁজতে চাইছিল। কোন সামঞ্জস্য পায়নি সুবীর।

আজ অনেকবার মনে পড়লো সেই অভিজ্ঞতার কথা। গাড়ি এগিয়ে চলেছে ভি, আই, পি, রোড ধরে। আর আধ ঘণ্টার মধ্যেই দম্ দম্ এয়ার পোর্ট। তারপর বোয়িং ৭০৭। আমেরিকা। সেদিনের ইতিহাস ধূসর নয়।

স্কুল···কলেজ···ইউনিভার্সিটির জীবনে রাজনীতির তপ্ত হাওয়ার হলকা। ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্ব। সামনে স্থবির সমাজ আর দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সজীব আদর্শ। তারপর প্রত্যেক রাজনীতিতে ঝাঁপ দেওয়া। রাজদ্রোহী। হাজতবাস। এ পর্যন্ত গতানুগতিক। তারপরের টুকু আর ভাবতে ইচ্ছা করে না। হ্যাঁ, একেকবার মনে হয়েছে মালবিকার স্বপ্নালু নীতিবাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে খানখান করে দেয় এই ইতিহাসের হাতুড়ি দিয়ে। দলের মধ্যে নানা মতভেদ। স্বার্থের লোভ, নেতৃত্বের মোহ। আদর্শের বুলি দিয়ে সরল মানুষের মনোবৃত্তিকে পঙ্গু করে দেওয়া। এগিয়ে চলার নামে বর্তমানকে হারাবার ভয়।

নিজেকে অনেকটা নির্বাসিতই করেছিল সুবীর মফঃস্বল কলেজে চাকরিটা নিয়ে। কলকাতার বিষাক্ত আবহাওয়ায় হাঁপিয়ে উঠেছিল। আদর্শের বিফলতায় হতাশাকে ঢাকতে সেদিন ওর পক্ষে নির্জনতাই হয়েছিল বড় প্রয়োজন। এনে দিয়েছিল কলকাতা ছেড়ে পালানো। সুবীর বলেছিল, 'সমাজ কখনো ষ্টেটিক থাকে না মালু। ডায়ালেক্‌টিক্যাল্ মেটিরিয়ালিজ্ম্ তো তাই বলে। তাকে এগিয়ে নেওয়ার লোকেরও অভাব হয় না।'

'অভাব হয়না ঠিক। তবে আমাদেরও দূরে থাকা উচিত নয়। শিক্ষার অভিমানে পারিবারিক আভিজাত্যকে আঁকড়ে থাকা মানে বৃহৎ সামাজিক নীতিকে বিসর্জন দেওয়া।' এবারও প্রতিবাদ করেনি সুবীর। সুবীরেরও একদিন এই মানসিক স্তরই ছিল যে অবস্থায় আদর্শের কাছে বিপরীত যুক্তির স্রোত ধাক্কা খায়।

সুবীর শুধু বলেছিল, 'সব নীতিই কি বাস্তবে প্রযুক্ত করা যায় মালু?'

আসানসোলে দলীয় সমাবেশ। মালবিকার চলে যাওয়াটাই সুবীরের কাছে সবচেয়ে ব্যাখ্যাহীন ব্যাপার হয়ে আছে আজো। পৌষের কনকনে শীত। চার-বছরের পিংকু জ্বরে অচৈতন্য। মাথায় আইসব্যাগ। নিয়মমত ঔষধ খাওয়ানো। রাত বারোটা। পিংকুর মাথার কাছে বসে সুবীর। বাইরে জমাট কুয়াশার আস্তরণ। একটা গুমোট নীরবতা।

মালবিকা বেরিয়ে যেতে যেতে বললো, 'আসানসোল থেকে আসছি। কালকেই ফিরব। ডঃ মিত্র সকালেই আসবেন বলেছেন।' কোন কথা বলেনি সুবীর। নীরবে পিংকুর মাথার আইসব্যাগ পালটে দিয়েছিল। ওদের কথাবার্তা নিচে নেমে গেল। বাইরে জি. টি. রোডে ওদের গাড়ী দাঁড়িয়ে। কাঁচের জানলাটা একটু ফাঁক করে দাঁড়াল সুবীর। খানিকটা কুয়াসা এসে যেন ওকে সাপের মতো পেঁচিয়ে ধরলো। একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে জি. টি. রোডের ঘন কুয়াশায় গাড়িটা মিলিয়ে গেল। জানলা আস্তে বন্ধ করলো। ছোট্ট একটা নিঃশ্বাসও বেরুলো! নীরবে পিংকুর বগলে থার্মোমিটার লাগালো।

বোয়িং ৭০৭-এ যাত্রীদের ওঠার ঘোষণা হ'য়ে গেছে।

বিশাল প্লেনটা সামনেই দাঁড়িয়ে। এক্ষুনি এতগুলো মানুষকে পেটে পুরে নিয়ে দৈত্যের মতো আকাশ-পথে পাড়ি দেবে। অনেকে উঠেছে, উঠছে। যাত্রীদের বিদায় জানাতে অনেকে হাজির। পরিচিত কোন মুখ নেই সুবীরের। একটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে।

'সুবীর··· ?'

দাঁড়িয়ে পড়লো সুবীর। বিশ্বাস করতে পারছেনা এ কোন্ মালবিকার গলা। হ্যাঁ মালবিকাই। ডানদিকে বোয়িংএর পাশে দাঁড়িয়ে।

'আমি জানি দেশে আর ফিরবেনা তুমি।'

সুবীর নীরবে বোয়িং প্লেনটার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'তাই···তোমাকে আরেকটু বিরক্ত করতে এলাম। তোমার ঠিকানাটা আমাকে একটু দিয়ে যাবে কি ?'

এবারও অবাক হয় না সুবীর। এও যেন সেই আগের মালবিকা যার পক্ষে সবই সম্ভব।

'ডিপার্টমেন্ট অব ইন্দো-এ্যামেরিকান কালচার, মিচিগান য়্যুনিভার্সিটি, সুবীর ঠিকানাটা বললো।

'সুবীর··· ।'

'কিছু বলবে মালবিকা ?'

'আমি মালবিকা নই সুবীর। আমি মালু। আর···আমি যেন বড্ড হাঁপিয়ে উঠেছি সুবীর। নীতি আর বাস্তব···

ঘোষকের মাইক্রোফোনটা আবার চেঁচিয়ে উঠলো, প্যাসেঞ্জার্স অব বোয়িং ৭০৭ আর রিকোয়েস্টেড টু বোর্ড দ্য ক্যারেজ ভেরি সুন্। ইট্ উইল্ ফ্লাই টু ন্যু-ইয়র্ক ভায়া বেইরুট রোম ফ্রাংকফার্ট এ্যাণ্ড লণ্ডন উইদিন্ এ ফিউ মোমেন্টস।

মালবিকার দু'চোখে দু'ফোঁটা জল। চিক্ চিক্ করছে শিশিরবিন্দুর মত। বহুদিন পর মালবিকার মুখের দিকে ভালো করে তাকালো সুবীর। মালবিকার বয়সটা যেন হঠাৎ বেশ খানিকটা বেড়ে গেছে। কপালের কাছে কয়েকটা চুল বেখাপ্পাভাবে পাক ধরেছে। গালে ভাঁজ পড়েছে। মালবিকাকে আয়না করে নিজের দিকে তাকাতে চেষ্টা করে সুবীর। সেদিনই আয়নায় দেখেছে দু'কানের পাশে পাকা চুলের ঔদ্ধত্য ; যৌবনের শেষ সূর্য যে অনেকদিন আগেই অস্তমিত আজ যেন একেবারে পরিষ্কার হলো। আকাশটা এই মুহূর্তে যেন বড় বেশী চকচকে। হেলেপড়া সূর্যের রঙিন আলো আকাশের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে। খানিকটা এসে পড়েছে মালবিকার মুখে। মুখের ক্লান্তির ছাপ মুছে দিতে চাইছে।

বোয়িং এর এঞ্জিন গর্জন করে উঠলো।

সুবীর নীরবে এগিয়ে গেল। একেকটা সিঁড়ির ধাপ অতিক্রম করলো জীবনের একেকটা বছরের মতো।

বোয়িং এর দরজা বন্ধ হ'য়ে গেলো।

কালান্তরের গদ্যরীতি

সুচিত্রা বন্দ্যোপাধ্যায়

কালান্তরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শেষ ২৭ বছরের গদ্য আছে। কালান্তর রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন সময়ের লেখার সংকলন। কালান্তরের গদ্য রীতির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বিশিস্ট তিনটি পর্বের গদ্যরীতির সমাবেশ হয়েছে—সবুজ পত্রের গদ্যরীতি এবং রবীন্দ্রনাথের শেষ দশকের গদ্যরীতি।

সবুজ পত্রের অব্যবহিত পূর্বের যে গদ্যরীতি সাধুভাষা থেকে চলতি ভাষায় আসবার গদ্যরীতি। ঢংটা সাধু কিন্তু তার মেজাজটা চলতি ভাষার। এ যেন বৈশাখের মেঘ, বর্ষার আবহাওয়াকে বর্ষার আভাসকে বহন করে এনেছে কিন্তু বর্ষা তখনো নামেনি। এ ভাষার বাঁধন খুব দৃঢ়, চতুরঙ্গের ভাষাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। "বিবেচনা ও অবিবেচনা" "লোকহিত" "লড়াইয়ের মূল" প্রভৃতি প্রবন্ধগুলি এই পর্যায়ের।

প্রবন্ধগুলির গদ্যরীতি যেন ইস্পাতের ফ্রেমের উপর তৈরী করা। শব্দ পেশল হওয়া সত্ত্বেও এ ভাষা নুয়ে পড়ে না—ঋজুতা এবং বলিষ্ঠতাই এ ভাষার সম্পদ। এ ভাষাকে খাঁটি ক্লাসিকাল রীতির ভাষা বলা চলে। কোথাও ঢিলেঢালা বা অগোছালো নয়, সর্বত্রই একটা দৃঢ় সংহত বাঁধুনিতে গাঢ়বদ্ধ। এখানে কল্পনা ও আবেগপ্রবণতার স্থলে আছে স্পষ্টতা এবং তীক্ষ্ণতা।

সবুজপত্র যুগের ভাষা চলতি। সাধুভাষার সঙ্গে এ চলতি ভাষার পার্থক্য শুধু ক্রিয়া ও সর্বনামেরই। এখানে আছে সচেতন শিল্পপ্রয়াস। শ্লেষ ব্যঙ্গ বিদ্রূপের ছড়াছড়ি। ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ কখনো প্রত্যক্ষভাবে কাউকে আক্রমণ করেননি। দ্বিজেন্দ্রলাল কবিকে নানাভাবে আক্রমণ করলেও কবি তার উত্তর দিয়েছেন সহজ রমণীয়তা ও প্রশংসনীয় সহনশীলতার সঙ্গে, কিন্তু কালান্তরে কবি সভ্যতার শত্রু ইংরেজদের প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করেছেন—প্রতাপের মদের নেশায় যারা মত্ত, ভারতের দরিদ্র পীড়িত নিরক্ষর নরনারীর উপর যারা নির্বিচারে অত্যাচার চালাচ্ছে তাদের উপর কবির ঘৃণা বর্ষিত হয়েছে। তাই এ যুগের ভাষাও জীবন স্মৃতি যুগের স্বপ্নমোহ আবেগচ্ছন্নতা ত্যাগ করে তীক্ষ্ণ বলিষ্ঠ তরবারির ন্যায় শাণিত। এ ভাষা যেন বাড়ীর পেছনের ঘোরানো লোহার সিঁড়ি।

এ যুগে তিনি সচেতনভাবে কথ্যরীতি ব্যবহার করেছেন। এর পেছনে আছে প্রমথ চৌধুরীর প্রত্যক্ষ প্রভাব। এ যুগের ভাষায় সচেতন শিল্পপ্রয়াস লক্ষণীয়। প্রমথ চৌধুরীকে যদি পার্থ বলি রবীন্দ্রনাথকে বলতে হয় পার্থসারথী। কালান্তরের বেশীর ভাগ প্রবন্ধই এই যুগের।

কালান্তর গ্রন্থে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ও প্রবন্ধকার রবীন্দ্রনাথের সমন্বয় হয়েছে। এখানে তিনি দূরদ্রষ্টা রাজনীতিবিদ। একটি যুগের পরিবর্তনকে দার্শনিক দূরদৃষ্টির সাহায্যে প্রত্যক্ষ করেছেন তাই এ যুগের ভাষাতেও মন্ত্রের মত একটি সংহত গভীরতা লক্ষণীয়।

কালান্তরের কিছু কিছু প্রবন্ধে যেমন 'সভ্যতার সঙ্কট' 'কালান্তর' প্রভৃতি প্রবন্ধের মধ্যে পাই তার শেষ যুগের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট। এটি সবুজপত্রের পরবর্তী যুগের গদ্যরাতি। সবুজপত্র যুগের গদ্যরীতিতে ঔজ্জ্বল্য এবং মননশীলতা থাকলেও সচেতনতার বাড়াবাড়ির জন্যই হয়তো কৃত্রিম বলে মনে হয়। শেষ যুগের গদ্যরীতিতে এই কৃত্রিমতা নেই, তা অত্যন্ত স্বাভাবিক। এ যুগের গদ্যরীতিতে বরং কিছুটা শৈথিল্য এসেছে "আজ পারের

দিকে যাত্রা করেছি,পেছনের ঘাটে কি দেখে এলুম কি রেখে এলুম ইতিহাসের কি অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের কি পরাকীর্ণ ভগ্নস্তূপ।" এখানে সবুজ পত্রযুগের বৈদ্যুতিক গতি নেই, কিছুটা ক্লান্তি কিছুটা স্তিমিতভাব এসেছে। সবুজপত্র যুগের গদ্যে দীপ্তি ও দাহ দুইই আছে। শেষ যুগের গদ্যরীতিতে দাহের প্রাধান্য।

রবীন্দ্রনাথের এই যুগের গদ্যকবিতার মধ্যেও এই শৈথিল্য লক্ষণীয়। তিনি নিজেও এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। "রোগশয্যায়" এর একটি কবিতাতে কবি বলেছেন—

"সুরলোকে নৃত্য উৎসবে যদি ক্ষণকাল তরে ক্লান্ত উর্ব্বশীর তালভঙ্গ হয় দেবরাজ করে না মার্জ্জনা পূর্বার্জিত কীর্তি তার অভিসম্পাত তলে হয় নির্বাসিত।

মানবের সভাঙ্গনে ;
সেখানেও জেগে আছে স্বর্গের বিচার,
তাই মোর কব্যকলা রয়েছে কুণ্ঠিত,
তাপতপ্ত দিনান্তের অবসাদে,
কি জানি শৈথিল্য যদি
ঘটে তার পদক্ষেপতালে।"

কিন্তু বার্ধক্যজনিত এই শৈথিল্যের এই স্খলনের মধ্যে একটি art আছে। তীর্যক অম্লমধুর ব্যঙ্গ বিদ্রূপ আছে। অস্তগামীসূর্যের শেষ দীপ্তির একটি ছায়াচ্ছন্ন-ভাব, করুণ বিষণ্ণতায় সঞ্চারিত হয়ে আছে।

কালান্তর যদিও রাজনৈতিক প্রবন্ধের সমষ্টি, তবু নীরস ও বস্তুনিষ্ঠ হয়ে ওঠেনি। তাঁর এই গদ্যরীতি উপভোগ্য হয়ে উঠেছে প্রসন্নসূক্ষ্ম হাস্যরসিকতায় ও উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষার প্রয়োগে।

"য়ুরোপীয় চিত্তের জঙ্গমশক্তি আমাদের স্থাবর মনের উপর আঘাত করল যেমন দূর আকাশ থেকে আঘাত করে বৃষ্টিধারা মাটির পরে।" বিদেশের প্রতি বিরাগ নয়, স্বদেশের প্রতি অনুরাগই যে আমাদের স্বরাজ-সাধনার পাথেয় হবে এ প্রসঙ্গে কবি বলেছেন—"আমার একহাত ইংরেজদের টুঁটিতে আর একহাত ইংরেজদের পায়ে অর্থাৎ কোনো হাতই বাকী ছিল না স্বদেশের জন্য। এই টুকরো টুকরো প্রসন্ন হাস্য রসিকতার জন্য এগুলি রাজনৈতিক প্রবন্ধ হয়েও কোথাও নীরস হয়ে যায় নি।

এখানে তিনি অভাব দৈন্য কাপুরুষতা দুর্ব্বলতার কথা বলেও একটি অপূর্ব্ব কলা কৌশলে তাকে অভিজাত করে তুলেছেন। এ রবীন্দ্ররচনারই বৈশিষ্ট্য। কবির ভাষায়—"যত কথা মোর হৈল কবিতা শব্দ হৈল গান।"

বারাসতের অবস্থা

সাপ্তাহিক বারাসত বার্তা বলিতেছেন: অর্থ-নৈতিক যে সংকট চলছে তার প্রথম আঘাতে গ্রামাঞ্চলের ছোট ছোট দোকানের ব্যবসায়ী শ্রেণীর নাভিশ্বাস উঠেছে। দোকান আছে ক্রেতা নেই, আবার দোকানে ক্রেতা আছে তো মাল নেই। বছর দুই তিন পূর্ব্বে যে সকল দোকান মোটামুটি ভাল চলছিল তাদের সম্মুখে আশার আলো নিভে গেছে—লোকসানের অন্তরালে রয়েছে কারবারের সামান্য মূলধন পুঁজি-পাটা ভেঙে খাওয়া। যখন শেষ স্তরে দোকান নেমে আসছে ঘরভাড়া প্রচুর জমে উঠেছে দোকান বিক্রি করা ভিন্ন অন্য উপায় আর থাকছেনা। ঋণ কর্জ্জে ছোট দোকানদারশ্রেণী ডুবে গেছে। ছোট ব্যবসায়ী দোকানদারদের সাহায্যের জন্য ব্যাঙ্কগুলিতে ঋণদানের যে পরিকল্পনা করা হয়েছে অধিকাংশ ছোট দোকানদারের সাহায্য গ্রহণ অসম্ভব পর্য্যায়ে রয়ে গেছে। কেননা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ গ্রহণের জন্য যেরূপ জামিন রাখার নিয়ম করা হয়েছে ছোট ছোট দোকানদারদের পক্ষে জামিন রাখার উপায় নেই। অধিকাংশ ছোট দোকানদারদের ব্যবসা চলে খদ্দেরদের সঙ্গে ধার বাকী দিয়ে। গ্রাহকদের কাছে ধারবাকী ওয়াশীল কঠিন সমস্যার বিষয় হয়ে উঠেছে। বারাসাত মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে অনেক দোকান হাতবদল হয়ে গেল। প্রসাধন, জামা-কাপড়, অসুধের দোকানের মালিকেরা সাংঘাতিক বিপর্য্যয়ের সম্মুখীন হয়েছেন।

বীরভূমের চাষের কথা

বীরভূমের ময়ূরাক্ষী সাপ্তাহিকে বাহির হইয়াছে: গত ২৬শে ডিসেম্বর শ্রী নিকেতন কমিউনিটি হলে বীরভূম জেলার ৩০০ চর্চামণ্ডলের আহ্বায়কগণ সমবেত হন। বিভিন্ন চর্চামণ্ডলের কৃষি বিষয়ের আলোচনা শোনার জন্য কেন্দ্রিয় সরকার প্রদত্ত ২৫০ টি রেডিও কম দামে বিতরণ করা হয়। বিতরণ করেন রাজ্যের কৃষিমন্ত্রী কানাইলাল ভট্টাচার্য্য। স্বাগত ভাষণে জেলার মুখ্য কৃষি অফিসার শ্রীশম্ভুনাথ গঙ্গোপাধ্যায় জানান এ রাজ্যে একমাত্র বীরভূম ও বর্দ্ধমান জেলার কেন্দ্রিয় সরকারের সহায়তায় চর্চামণ্ডল গঠিত হয়েছে। প্রগতিশীল চাষীরা যাতে 'কৃষি কথার আসরে' অংশ নিতে পারেন তারই জন্য রেডিও দেবার ব্যবস্থা হয়েছে।

বীরভূমের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রী এস-এল-বসু সভার উদ্বোধন করে বলেন—কৃষি উৎপাদন বাড়াবার জন্য চর্চামণ্ডল কাজ করবে। উচ্চ ফলনশীল শস্যে নতুন পদ্ধতিতে ভূমিপরীক্ষা, সারের সঠিক ব্যবহার, নতুন তথ্য-সমস্যার আলোচনা হবে। এতে 'সবুজ বিপ্লবে' নতুন সুযোগ এনে দিয়েছে। তিনি চাষীদের আহ্বান জানিয়ে বলেন ব্যাঙ্কের সাহায্য নিয়ে—কৃষি বিষয়ে আধুনিক জ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা অভিজ্ঞতা কাজে লাগান, এতে নিশ্চয় আমরা ব্যর্থ হব না।

কৃষি বিশেষজ্ঞ ডঃ এ-টি সেন বলেন কৃষি বিষয়ে আলোচনা করার জন্য সারা বীরভূম ঘুরেছি, চাষীদের সঙ্গে চর্চা করেছি, দেখেছি চাষীর ঐক্যই বীরভূমকে সারা বাংলায় অগ্রণী করেছে। পুরান রেকর্ডে জানা যায় ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে বীরভূম থেকে ৫৫ হাজার টন শষ্য রপ্তানি হত, কিন্তু ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ তে বীরভূম বছরে ২ লক্ষ টন খাদ্যের রপ্তানি করেছে। অন্য কোন জেলায় এ রেকর্ড নাই। গমও আশাতীত হচ্ছে। এতে যেমন চাষী টাকা

পাচ্ছে তেমনি কৃষির সহিত জড়িত ব্যবসায় অনেক টাকা রোজগার করেছে। প্রগতিশীল চাষীদের কাছে আবেদন সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে চর্চার মাধ্যমেই প্রতি জমিতে ২।৩টি ফসল তুলুন।

দেশের অর্থনীতি

শ্রী অনিলবরণ রায় সম্পাদিত সত্য যুগ প্রচারপত্রে উপরোক্ত বিষয়ে লিখিত হইয়াছে :

একটি পত্রে শ্রীদীপ বসু বর্দ্ধমান হইতে লিখিয়াছেন, "আমি .Mining and Allied Machinery Corporation এর একজন কর্ম্মী এবং সেজন্য আমাকে একটি ইউনিয়ানের সভ্যও থাকতে হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে শ্রমিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিও লক্ষ্য করেছি। মনে হয়েছে অনেক কিছু করেও আমরা কিছু করতে পারছি না। দারিদ্র্য মেটাতে গিয়ে অনেক আন্দোলন করেও দারিদ্র্য ঘুচল না। লাভের মধ্যে আমরা কিছুটা সুবিধা পেয়েছি। তবে, অর্থনৈতিক সংকট দিন দিন ঘনীভূত হচ্ছে, দারিদ্র্য বাড়ছে, বেকারী সমস্যা বাড়ছে, অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যাও বেড়ে চলেছে"।

এই একখানি পত্র হইতেই বুঝা যায় কম্যুনিষ্টরা মেহনতী জনগণের কাছে গেছেন, তাদিকে সংঘবদ্ধ করেছেন, তাদের পক্ষ সমর্থন করিয়া তাদের ভোট সংগ্রহ দ্বারা নিজেরা গদি দখল করিয়াছেন, কিন্তু জনগণের অবস্থার বিশেষ কোন উন্নতিই তারা করিতে পারেন নাই, পারিবেনও না—এটা যে আজ জনগণ বুঝিতে পারিয়াছে, এইটিই আশার কথা। বাংলা কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ উপলক্ষে যুক্তফ্রন্টের দলগুলি পরস্পরকে যেরূপ জঘন্যভাবে আক্রমণ করিতেছে—সে সম্বন্ধে শ্রীমতী কুন্তলা দত্ত একটি পত্র লিখিয়াছেন—"যাহোক নেতাদের ঝগড়ার ফলে জনসাধারন আসল ব্যাপার বুঝে ফেলেছে—ঝুলির বেড়াল বের হয়ে পড়েছে। বহু ঢক্কানিনাদিত কৃষক-জোতদার সংগ্রামের প্রচার সত্বেও এটাই নির্ম্মম সত্য যে. কৃষকে-কৃষকে সংঘর্ষে গরীব কৃষকই নিগৃহীত ও নিহত হয়েছে।" এই দুইখানি পত্র হইতেই বুঝা যায় যে, কম্যুনিষ্টরা শ্রমজীবিগণকে সংঘবদ্ধ করিয়াছে, শ্রেণী-সংগ্রাম বাধাইয়া তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিয়াছে, এই-ভাবে তাহাদের বন্ধু সাজিয়া তাদের ভোটের জোরে গদি দখল করিয়া নিজেরা মজা লুটিতেছে, কিন্তু মেহনতি মানুষের কোন উন্নতিই হয় নাই। জ্যোতি বসু ত স্পষ্টই বলিয়াছেন. গদি রাখিবার জন্যই তাহাদিগকে শ্রেণী-সংগ্রাম চালাইতে হইবে—বিপ্লব, সমাজবাদ, সাম্য এসব ফাঁকা বুলি মাত্র। এই শ্রেণী-সংগ্রামের ধুয়ায় দেশে সর্ব্বক্ষেত্রে হিংসাত্মক ঘটনা ভয়াবহভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশের যুব-সমাজ যে এ দিকে সচেতন হইতেছেন, বাঁধাবুলির মায়া তাহাদের কাটিয়া যাইতেছে, ইহা খুবই সুলক্ষণ। তবে তাহারা যে নিজেরাই জটিল রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সামাজিক-সমস্যা সকলের সমাধান বাহির করিবার চেষ্টা করিতে-ছেন এবং তদনুসারে কাজ করিবার জন্য সঙ্ঘ গঠন করিতেছেন—এটা ঠিক হইতেছে না। আধুনা দেশে এইরূপ বহু যুবসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছে—তাহাদের কাহারও সহিত কহারও মিল নাই, অনেক ক্ষেত্রে দলাদলি রেষারেষি জঘন্য হাতাহাতিতে পরিণত হইতেছে। দেশের সেবা করিবার যুবকদের আগ্রহ, আদর্শের জন্য সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ ও নির্য্যাতন স্বীকার করিতে তাহাদের উৎসাহ খুবই প্রশংসনীয়। কিন্তু বিভিন্ন মতবাদ ও আদর্শের দ্বন্দ্ব মীমাংসা করিয়া—ঠিক পথটি আবিষ্কার করা তাহাদের পক্ষে সম্ভব নহে, সেজন্য যে গভীর জ্ঞান ও ব্যাপক অভিজ্ঞতা প্রয়োজন যুবকদের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে—এইটি তাহারা বুঝুন এবং নিজেরাই ঠিক পথ বাহির করিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিন—এ-বিষয়ে বৃদ্ধ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের পরামর্শ তাহাদিগকে গ্রহণ করিতেই হইবে। অতএব বৃদ্ধদিগকে বাতিল করার যে উৎসাহ আজ তরুণদের মধ্যে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে দেশের বৃহত্তম কল্যাণের জন্য সেটা সংযত করিতেই হইবে। তবে কাহাকেও অন্ধভাবে অনুসরণ করিতে বলি না—বিভিন্ন মতবাদ ও আদর্শের মধ্যে কোনটা বুঝিবার মত বুদ্ধি তাহাদের আছে—যদি তারা ধৈর্য্যের সহিত বিচার

করিয়া দেখেন—গড্ডালিকাপ্রবাহে গা ভাসাইয়া না দেন।

বাংলাকে প্রতারনা

কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাকে নানা ভাবে প্রতারনা করিয়াছেন। সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রতারনা হইয়াছে বাংলার কয়েকটি জেলা বিহারে জুড়িয়া রাখাতে। কিন্তু তাহার কোন নিস্পত্তি কোনদিন হইবে বলিয়া মনে হয় না। যুগবাণী পত্রিকায় অপর প্রতারনার প্রবন্ধে বলা হইয়াছে:

কেন্দ্রে ও রাজ্যে ঘোলাটে রাজনীতির বলি হইতেছে বিশেষভাবে বাংলা ও বাঙালী। লোকসভায় ইন্দিরা গান্ধীর দুর্বল অবস্থার সুযোগ লইতে পারিয়াছে তামিলনাড়ু, কারণ তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য নিজস্ব রাজনৈতিক পার্টি আছে। আকালী দলও পাঞ্জাবের স্বার্থরক্ষা করিতে পারিবে। বোম্বাইয়ে ইন্দিরাপন্থী কংগ্রেসের অধিবেশন বসিবে, শিবসেনা উহা আক্রমণ করিয়া ভাঙিয়া দিতে পারে এই ভয়ে প্রথমে বোম্বায়ের সান্তাক্রুজ বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা নিজে শিবসেনার নেতা বাল থ্যাকারেকে একটি লম্বা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন ও এখন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ভি পি নায়েকের মারফত সেই একই কথা বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে শিবসেনা এখন চুপচাপ থাকিলে মহীশূরের যে অংশ মহারাষ্ট্র বহুদিন যাবত দাবী করিতেছে সেই অংশ মহারাষ্ট্রকে উপঢৌকন রূপে দেওয়া হইবে। আসামে সম্প্রতি অসমীয়াদের দাবীর ভিত্তিতে গণআন্দোলন পরিচালিত হইয়াছিল, প্রধানমন্ত্রী সেই দাবীগুলি মোটামুটি মানিয়া লইয়াছেন। বাংলা দেশে পলিটিক্সের চর্চা বেশি তাই বাঙালীর হইয়া দাবী জানাইবার কেহ নাই—এখানে দ্বন্দ্বটা চলিতেছে বিভিন্ন পার্টির স্বার্থসিদ্ধির প্রোগ্রামকে কেন্দ্র করিয়া। কেন্দ্র এখন যথেষ্ট দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও বাংলার দাবীগুলিকে ফু দিয়া উড়াইয়া দিতেছে। কলিকাতায় গঙ্গার উপর একটি নতুন সেতু নির্মাণের ব্যাপারে কেন্দ্র বাঙালীকে ঠকাইয়াছে। সেতুটি হইতেছে গোটা উত্তর ও পূর্ব ভারতের অর্থনৈতিক স্বার্থে, কিন্তু ঐ সেতু নির্মাণের সমস্ত ব্যয় বহন করিতে হইবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে। কেন্দ্র টাকাটা ঋণ হিসাবে অগাম দিবেন, কিন্তু সুদে আসলে উহা শোধ করিতে হইবে। কেন? যার ফলভোগ করিবে বিহার, ওড়িশা, উত্তরপ্রদেশ এবং কেন্দ্র নিজে, তার দায় ভোগ একা পশ্চিমবঙ্গ কেন করিবে এ প্রশ্ন সংশ্লিষ্ট দপ্তরের মন্ত্রী সোমনাথ লাহিড়ী তোলেন নাই। তারপর ঐ সেতু নির্মাণের সমস্ত বড় কট্রাক্ট পাইতেছে অবাঙালীরা, দিতেছেন কেন্দ্রীয় সরকার। টাকার ভার বহিবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কিন্তু কার্য পরিচালনার অধিকার তার নাই। সোমনাথ লাহিড়ীর হাত দিয়া বাংলা দেশের প্রতি এই অবিচারের ব্যবস্থাটি পাকা হইতে পারিয়াছে, কারণ তিনি অন্তর্জাতিক রাজনীতি লইয়া মাথা ঘামান, বাংলার স্বার্থরক্ষার কথা ভাবা ঘৃণ্য প্রাদেশিকতা বলিয়া মনে করেন।

কেন্দ্রীয় সরকার আর একটি বিষয়ে আমাদের সঙ্গে প্রতারণায় নামিয়াছেন। কলিকাতার উন্নয়ন লইয়া বহু বড় কথা তাঁরা এ যাবৎ বলিয়াছেন। উন্নয়নের জন্য প্লানের বাহিরে ৪২ কোটি টাকা সাহায্য দেওয়া হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। এখন তাঁরা বলিতেছেন যে ঐ পরিমাণ টাকা তাঁরা দিবেন না—বড়জোর ৩৪ কোটি টাকা নাকি তাঁরা দিতে পারেন। এই প্রতারণা কেন? উত্তরবঙ্গে গত বছর যে বিপুল বন্যা হইয়াছিল সে সময় কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রধানমন্ত্রী নিজে বলিয়াছিলেন যে বন্যা প্রতিরোধ ও দুর্গতদের সেবায় টাকা যত লাগে তাঁরা দিবেন। শেষে বহু টালবাহনার পর সামান্য কিছু টাকা তাঁরা দিয়াছেন—অথচ ডি এম কে দলকে খুশি করার উদ্দেশ্যে এক কথায় মাদ্রাজে বন্যার নামে ২৫ কোটি টাকা তাঁরা খয়রাতি দিয়াছেন। উত্তরবঙ্গে ও মেদিনীপুর জেলায় বন্যার স্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা পাকা করার জন্য কেন্দ্র টাকা দিতে গররাজি হইয়াছেন। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্যও তাঁরা হাত উপুড় করিবেন না।

মারফত বক্তব্য প্রচার করিতেছেন, তাঁদের পক্ষে জনসমর্থন গড়িয়া তুলিতেছেন। একে ষড়যন্ত্র বলা যায় না—কারণ এর মধ্যে কোন গোপনতা নাই। তাঁরা মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে মুক্ত আকাশের নিচে দাঁড়াইয়া রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ জানাইতেছেন—এর উত্তরে মার্ক্সবাদীরা শুধু ঘৃণা, ক্রোধ ও প্রচারের বদলে যদি শক্তিমানের মতো রাজনৈতিক উপায়েই মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হন, আমরা তাঁদের ধন্যবাদ দিব। শুধু বুর্জোয়ার দালাল বলিলে অজয় মুখার্জীকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, বিলম্বে হইলেও জ্যোতি বসু তাহা বুঝিয়াছেন। তিনি সাফ বলিয়া দিয়াছেন যে অজয় মুখার্জী বুর্জোয়া নন, বুর্জোয়ার দালালও নন। তবে তিনি কী? জনসাধারণের প্রতিভূ? নির্বাচক মণ্ডলী নিশ্চয়ই সেই রায়ই দিয়াছিল, জ্যোতি বসুর পার্টিও তাহা স্বীকার করিয়াই তাঁর নেতৃত্ব মানিয়া লইয়াছেন। আজও সে নেতৃত্ব যদি তাঁরা মান্য করেন, তবে বাংলা কংগ্রেসের সত্যাগ্রহীকে একা পাইয়া আহত করা বা হনুমান সাজানোর (বর্ধমানে ইহা ঘটিয়াছে) মনের জ্বালা হয়তো মিটিতে পারে কিন্তু রাজনৈতিক যুক্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় না। জ্যোতি বসু প্রাণের ভয়ে চব্বিশ ঘণ্টা শ'-খানেক পুলিশ প্রহরার মধ্যে বাস করেন, অথচ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জী নির্ভয়ে, অতি অল্প পুলিশ লইয়া বা পুলিশ ছাড়াই যত্রতত্র ভ্রমণ করিতেছেন —কার নৈতিক শক্তি বেশী এতেই সে প্রমাণ মিলিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে দেশ নেতাদিগের অবস্থা কি দাঁড়াইয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে এইভাবে ঝগড়া করিয়াও এই নেতাগণ নিলর্জ্জ আবেগে মাসের পর মাস দেশবাসীর কষ্ট অর্জ্জিত অর্থ শোষণ করিয়া নিজ নিজ মাসহারা লইতেছেন ও নানাভাবে দলের বহুলোককে খাওয়াইয়া পরাইয়া বাঁচাইয়া রাখিতেছেন। দেশের সাধারণের অবস্থা ক্রমশঃ আরই শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইতেছে; কিন্তু আমরা শুনিতেছি যে মার্ক্‌স্‌, লেনিন, সুভাষচন্দ্র, অথবা মাও এর মাহাত্ম্য এতদ্বারা আরও গভীর ভাবে দেশের অন্তরতম মানস কেন্দ্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিতেছে। খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষা প্রভৃতি হাওয়ায় মিলাইয়া যাইলেও আদর্শের স্বর্গে সকলের স্থান সংরক্ষিত রহিবে। পূর্ব্বযুগের মানুষ আধ্যাত্মিক লাভের আশায় বা মোক্ষলাভ করিবার জন্য বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা করিয়া চলিত। ফলে তাহাদিগের অশেষ দুর্গতি হইত। বিজ্ঞান বলিত এই আধ্যাত্মিকতা নির্ব্বোধের মরীচিকা অনুসরণ। ইহাও শুনিয়াছি ঈশ্বরের কথা শুনাইয়া শোষকগোষ্ঠী শোষিত সাধারণকে যেন আফিং এর নেশায় বিভোর রাখেন। এখনকার যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের কপচানি ও যাহা আওড়াইয়া দেশের লোককে লুঠিয়া খাওয়া হইতেছে তাহাই বা কি ভাবে বাস্তব সত্যের আকর। আধ্যাত্মিক অহিফেন কিম্বা রাষ্ট্রীয় ভুয়োদর্শনের গঞ্জিকা কোনটিই জীবনযাত্রার পথের খোরাকি জোগাইতে পারিবে না।

অপরাপর সংবাদপত্রের মধ্যে দেখিতেছি সাপ্তাহিক বারাসত বার্ত্তা বলিতেছেন:

লোকাল ট্রেনের যাত্রী মধ্যবিত্ত শিক্ষিতমহল থেকে দূর গ্রামের নিরক্ষর বাঙালী সমাজের মুখে মুখে জিজ্ঞাসা ঘুরে চলেছে—'আর কত দিন'। জিজ্ঞাসাটা রাজনীতিক—পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন বর্ত্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার আর কতদিন চলবে।

বছর ঘুরে নাই, আমরা দেখেছি নির্ব্বাচন প্রাক্কালে যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে উত্তর ২৪ পরগণার সাধারণ মানুষের মধ্যে সে কি উদ্দীপনা, সে কি আশা আকাঙ্ক্ষা আর সে কি প্রাণচাঞ্চল্য! সে উদ্দীপনা চাঞ্চল্য হঠাৎ বিজলী বন্ধ হওয়ার পর মোমবাতির মত মিট মিট করছে, নিভে যাচ্ছে সাধারণ মানুষের আশা আকাঙ্খা কেন এমন হ'ল? প্রশ্নটা অনেক কথার অনেক তর্কের এবং অনেক চিন্তা তথা রাজনৈতিক তথ্যের বিষয়। সাধারণ মানুষ শুধু জেনেছে যুক্তফ্রন্টের চোদ্দ দলের মধ্যে ঐক্য নেই, সে এক কুরুক্ষেত্র চলেছে ফ্রন্টের চোদ্দ দলের মধ্যে। বড় আকাঙ্খার সেই ৩২ দফা গঙ্গার জলে ডুবে গেছে সেটা এখন বঙ্গোপসাগরে ভেসে যাওয়ায় মাত্র ক'দিন রয়েছে। সাধারণ মানুষ ফ্রন্ট সরকারের কাছে চেয়েছিল সস্তা দামে খাদ্য, বস্ত্র এবং বাঁচার মত রোজগার। গত এক বছর ধরে সাধারণ মানুষ সংসার নির্ব্বাহে যত কষ্ট পেয়েছে এত কষ্ট পূর্ব্বে পায়নি।

জোতদার কে ?

জোতদার কথাটা আজকাল প্রায়ই শুনা যায়। যাহাদের আইন অনুযায়ী ভাবে রাখিবার অধিক জমি আছে তাহাদের বলা হয় জোতদার। এবং তাহাদের জমি কাড়িয়া লওয়া প্রয়োজন বলা হয়। কিন্তু সাপ্তাহিক ময়ূরাক্ষী পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছেন, মার্কিষ্ট কম্যুনিষ্ট পার্টির 'পিপলস্ ডেমোক্রেসী' নামক পত্রিকার ৭ই ডিসেম্বরের তালিকা হইতে ২৪ পরগণা জেলার কতিপয় জোতদারের নাম প্রকাশিত হইতেছে। ইঁহাদের ন্যূন পক্ষে ৫০ একর জমি আছে। এস্-ইউ-সি পার্টি ইঁহাদিগকে নিজেদের সমর্থক বলিয়া দাবী করেন।......

নাম ও গ্রামের নাম	অধিকৃত জমি (একরে)
১) ধীরেন্দ্রনাথ পাল, মজিবপুর	৬০০
২) মন্মথ মিত্র, মৈদহ	৫০০
৩) মোবারক গাজী, জৌখিয়া	১৫০
৪) গোপাল মোল্লা, বৈদ্যেরচক	১০০
৫) মোক্তার মোল্লা, পাতপুকুর	৬০
৬) জব্বর নস্কর, মণিতলা	৫০
৭) রসিক রায় মণ্ডল, বেলেদুর্গানগর	৫০
৮) গদাধর হালদার, পদ্মরাহ	৫০
৯) গয়ারাম হালদার পদ্মরাহ	৫০
১০) পুলিনবিহারী পুরকায়স্থ ছুপ্রিঝেরা (এস-ইউ-সি এম এল-এ প্রবোধ পুরকায়স্থের-পিতা)	৫০
১১) বিজয় মণ্ডল ছুপ্রিঝেরা	৮০
১২) মতি গায়েন এ্যাণ্ড ব্রাদার্স রাধাবল্লভপুর	৮০
১৩) লুৎফর রহমান লস্কর, কোয়াবাতি	৬৭

১৪) হাজি আবদুল মজিদ এ্যাণ্ড
আদার্স কোয়াবাতি ১০০

১৫) গোলাম মুস্তফা লস্কর, কোয়াবাতি ৬৫

১৬) রতিকান্ত সরদার এ্যাণ্ড ব্রাদার্স
কোয়াবাতি ৮৩

১৭) খগেন সোরি এ্যাণ্ড আদার্স
দিঘীরপাড় বকুলতলা ২০০

১৮) স্বর্গীয় অবনী মাইতির উত্তরাধিকারী
দিঘীরপাড় ৩০০

১৯) ভূষণ দাস, কৌতলা ১০০

২০) রবিন মজুমদার এ্যাণ্ড আদার্স কোয়াতলা ১০০

২১) ধনঞ্জয় কয়াল এ্যাণ্ড আদার্স বাতিশ্বর ১০০

সোস্তালিষ্ট ইউনিটি সেণ্টার এর পত্রিকায় ১২ই জানুয়ারী (১৯৭০) ৩ পৃষ্ঠায় সি-পি-এম দলভুক্ত জোতদার-দের নাম প্রকাশিত হয়েছে এঁরা সবাই ২৪ পরগণা জেলার।

সকলের অবগতির জন্ত চাংলা গ্রামের কিছু ব্যক্তির নাম ও জমির পরিমাণ উল্লেখ করছি, যাদের কংগ্রেসী আইনের ভিত্তিতে বেনামী জমির মালিক ও জোতদার বলা চলে। কিন্তু হয়তো সি-পি-এম দলভুক্ত হওয়ার ফলে এদের শ্রেণীচরিত্র পালটে গেছে বলে মা: কম্যুনিষ্টরা তাদের জোতদার নয় বলে দাবী করতে পারেন।

নাম	জমির পরিমাণ
১) বিভূতিভূষণ পুরকাইত	১৫০ বিঘা
২) অমূল্যনিধি পুরকাইত	১১৯ „
৩) অভিমন্যু মণ্ডল	১২৫ „
৪) হরিপদ মণ্ডল	১২৪ „
৫) নকুল মণ্ডল	২০০ „
৬) গৌরমোহন গায়েন	১২৫ „
৭) রসময় মণ্ডল	১৬০ „
৮) বিরাজকৃষ্ণ মণ্ডল	১৩০ „
৯) শরৎচন্দ্র প্রামাণিক	১৬০ „
১০) ধনঞ্জয় বৈরাগী	২০০ „
১১) রায়মোহন গায়েন	১১৫ „
১২) নরেন চন্দ্র ভাণ্ডারী	১৬০ „
১৩) শৈলেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৩৯ „
১৪) ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার	১৩০ „
১৫) শচীন্দ্রনাথ মজুমদার	১২৫ „
১৬) রবীন মজুমদার	১০০ „
১৭) নন্দলাল মজুমদার	১১০ „
১৮) নারায়ণ চন্দ্র হালদার	১৬০ „

(মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন)

সাময়িকী

যুক্ত ফ্রন্টের অবসান

যুগজ্যোতি পত্রিকায় বলা হইয়াছে : পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পটপরিবর্ত্তন আসন্ন হইয়া আসিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় মার্ক্সিষ্ট কমুনিষ্ট দলকে চোর ডাকাত নারীধর্ষণকারীর দল বলিয়া অভিহিত করিলেও বারে বারেই এতদিন বলিয়া আসিয়াছেন যে যুক্তফ্রণ্ট তাঁহারা ভাঙ্গিবেন না। কিন্তু গত রবিবার পি, এস পির সহযোগে গণ অনশন সত্যাগ্রহ আরম্ভের পূর্ব্বে জনসভায় তিনি ঘোষণা করিয়াছেন যে চোর ডাকাতদের তাড়াইবার জন্ত ফ্রণ্ট ভাঙ্গিবার প্রয়োজন দেখা দিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন—"হয় আপনারা তৎপর হয়ে অরাজকতা বন্ধ করুন না হয় আমাকে ছেড়ে দিন। তখন যেন আমাকে দোষ দেবেন না কেন যুক্তফ্রণ্ট ভাঙলেন? বাংলাদেশে আজ ওদের রাম রাজত্ব নয় হনুমানের রাজত্ব চলছে। গলায় লাল রুমাল বেঁধে ইনকিলাব বলতে পারলেই খুন জখম, লুঠ, নারীনির্য্যাতন সব দোষ মাপ। এ অবস্থা অসহ্য। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখে অত্যাচার করে। অফিসারদের মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে শুধু দলবাজী করা হচ্ছে।......আমরা যুক্তফ্রণ্ট ভাঙতে চাই না। তবে যুক্তফ্রণ্ট ওদের আয়ত্তে আনতে পারবে না। ওরা হয়তো কিছুদিন চুপচাপ থাকতে পারে, কিন্তু লুটপাট ডাকাতি করে পার্টি ফণ্ডে লক্ষ লক্ষ টাকা আসছে কাজেই ঐ সব ওরা বন্ধ করবে না।"

বাংলা কংগ্রেসের অপর প্রধান সুশীল ধাড়া বলেন—"আমরা যুক্তফ্রণ্ট ভাঙতে চাইছি বলে শ্রী জ্যোতি বসু বলে বেড়াচ্ছেন। নিজেদের দুষ্টুমি ঢাকবার জন্ত আসলে ওরাই যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভাঙতে চাইছে। তাই ওরা লুঠতরাজ করে এমন অবস্থা সৃষ্টি করতে চাইছে যাতে অন্ত দলগুলি যুক্তফ্রণ্ট ছাড়তে বাধ্য হয়।··· পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকার থাকবেই। তবে সি, পি, এমকে বেরিয়ে যেতে হতে পারে। কেরলে যা হয়েছে এখানেও তা ঘটতে পারে।" মার্ক্সিষ্ট কমুনিষ্ট নেতা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোতিবসু ইউ এন আইয়ের প্রতিনিধির নিকট মন্তব্য করিয়াছেন যে সুশীল ধাড়া যে বক্তব্য রাখিয়াছেন, সেই ধরণের কোন চেষ্টা যদি হয় তবে তাহা শুধু কংগ্রেসের সহায়তায়ই হইতে পারে এবং তাহা নিশ্চয়ই জনগণের অভিপ্রেত নয়। তিনি আরও বলেন—"বাংলা কংগ্রেসের এই খেলা নূতন কিছু নয়। ১৯৬৭ সালেও ওই দলের প্রায় ১৭ জন এম, এল-এর দল ত্যাগের ফলে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রী সভার পতন ঘটে। এবারও ঐ দল সেই পুরাণো খেলা শুরু করেছেন। এ থেকে জনগণকে শিক্ষা দিতে হবে।"

বাস্তুহারাদিগের জমির দাবী

ভারত বিভাগের পরে যখন বহু বৎসর ধরিয়া পূর্ব্ব বাংলা হইতে হিন্দু বিতাড়ন চলিতে থাকে তখন আমরা বারে বারে বলিয়াছিলাম যে বিতাড়িত হিন্দুদিগের পুনর্ব্বাসন সম্পন্ন করিবার জন্ত ভারত সরকারের উচিত হইবে পাকিস্থানের নিকট হইতে ঐ পুনর্ব্বাসনের জন্ত উপযুক্ত পরিমাণ জমি দাবী করা। অন্ততঃ কয়েকটি জেলা পশ্চিম বাংলায় যুক্ত করিলে ঐ সমস্যার সমাধান হইতে পারিত। কিন্তু জমিত পাওয়া যায়ই নাই, উপরন্তু হিন্দু বিতাড়ন পূর্ব্বের ন্যায়ই চলিতে থাকে। করিমগঞ্জ [আসাম] হইতে প্রকাশিত "যুগশক্তি" পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নলিখিত সংবাদটি পাঠ করিয়া আমরা সবিশেষ আনন্দিত হইয়াছি।

গত ২০শে ডিসেম্বর শিলচর, নরসিংটোলা ময়দানে এক জনসভায় সম্প্রতি মৌলানা ভাসানীর আসাম পাকিস্থানের জন্ত চাই-ই এই দাবীর প্রত্যুত্তরে, পূর্ব্ববঙ্গ

হইতে যে লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আসামে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন তাহাদের পুনর্ব্বাসনের জন্য পূর্ব্ব-বঙ্গের শ্রীহট্ট জেলা সহ বাগে কমিশনে প্রাপ্য শ্রীহট্ট জেলার বারোটি থানা এবং পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম জেলা প্রত্যর্পণের জন্য পাকিস্থান সরকারের নিকট দাবি জানান হয়। এই দাবি আদায়ের জন্য সভায় ভারত সরকারকে সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। সভায় আরও দাবি করা হয় পাকিস্থান সরকার নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে হিন্দুরা প্রতিদিন নিরাপত্তার অভাবে নিজেদের বাস্তুভিটা ত্যাগ করিয়া আসিতেছে। ইহা যদি অবিলম্বে পাকিস্থান সরকার বন্ধ না করেন তবে ভারত সরকারকে পূর্ব্ববঙ্গ দখল করার জন্য সভা দাবি জানায়।

শিলচরের বিশিষ্ট নাগরিক কবিরাজ শ্রীহরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় বক্তৃতা করেন সর্ব্বশ্রী তারাশঙ্কর পুরকায়স্থ, সুসিত দত্ত এবং পরিতোষ পাল চৌধুরী।

গুরু নানক ও ব্রাহ্মধর্ম্ম

গুরু নানক প্রবর্ত্তিত একেশ্বরবাদী ধর্ম্মমতের সহিত রামমোহন রায় প্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের বিষয় "তত্ত্বকৌমুদী" পত্রিকায় যে সম্পাদকীয় আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা প্রবাসীর পাঠকদিগের জন্য উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

গুরু নানক-পঞ্চশত বার্ষিকী (১৪৬৯—১৯৬৯): ভারতবর্ষে যুগে যুগে যে সকল ধর্মাচার্য জন্মিয়াছেন শিখ-সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক তাঁহাদিগের অন্যতম প্রধান রূপে গণ্য হইয়া আসিতেছেন। বর্তমান বৎসরে এই মহাপুরুষের জন্ম-পঞ্চশত-বার্ষিকী পালন করিয়া আমরা ধন্য হইয়াছি। পাঁচ শতাব্দী পূর্বে পাঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোরের নিকটবর্তী তলবন্দি (বর্তমানে নানকানা) গ্রামে যখন নানকের জন্ম হয়, ভারতের ধর্ম-জগতে তখন এক অন্ধকার যুগ চলিতেছিল। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হইবার পর এই দেশে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মদ্বয় যথাক্রমে বিজিত ও বিজেতার ধর্মরূপে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল। এই পরিচয়ের প্রথম পর্বটি সংঘাতের। পরস্পরকে শত্রু মনে করিয়া উভয় সম্প্রদায় উভয়কে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিত ও শাসক সম্প্রদায়ের পক্ষ হইতে অধিকন্তু ছিল হিন্দুদিগের উপর ধর্মীয় কারণে অত্যাচার ও নিপীড়ন। গুরু অর্জুনের সহযোগী ভাই গুরুদাসের রচনা হইতে আমরা জানিতে পারি নানকের আবির্ভাবের পূর্বে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব যে মূলতঃ এক ইহা বিস্মৃত হইয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসিগণ, যোগী, জঙ্গম, দিগম্বর, ষড়দর্শনের অনুবর্ত্তিগণ, ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ (যাঁহারা বেদ বা পুরাণের অর্থ বুঝিতেন না)—সকলেই পৃথক পৃথক পন্থা অবলম্বন করিয়া চলিতেন ও মন্ত্রোচ্চারণ ও বাহ্য হোমপূজাদি ভিন্ন গভীরতর কোন কিছুর সংবাদ রাখিবার প্রয়োজন অনুভব করিতেন না। এই সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ মনোভাব মুসলমান সমাজকেও অধিকার করিয়াছিল। পীর, ফকীর ও আউলিয়াগণ নিজ নিজ সংকীর্ণ মার্গ অনুসরণ করিতেন। ভক্তিরসশূন্য আধ্যাত্মিকতালেশহীন আচারসর্বস্বতা মুক্তির পরিবর্তে বন্ধনের কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অহংকার, আত্ম-ভরিতা প্রকৃত আধ্যাত্মিক মূল্যবোধকে অপসারিত করিয়াছিল। এই সংকীর্ণতা, বিদ্বেষ ও সংঘাতের পরি-প্রেক্ষিতে আবির্ভূত হইয়া গুরু নানক সুনির্মল উদার ও গভীর অধ্যাত্ম-অনুভূতির আলোকস্নাত অন্তরে উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন—হিন্দু ও মুসলমান বলিয়া কোনও স্বতন্ত্র সম্প্রদায় নাই—সকল মানুষই এক পরমেশ্বরের সন্তান। এই পবিত্র মন্ত্রোচ্চারণের লগ্নটি ভারতবর্ষের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। সেদিন অধ্যাত্ম রাজ্যে আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীকে গুরু নানকের তপস্যা আধ্যাত্মিক প্রগতির এক নূতন পথ দেখাইয়াছিল। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও সংঘাতের মধ্যে ধর্মরাজ্যে প্রেম, মৈত্রী ও সমন্বয়মূলক একেশ্বরবাদের এক নূতন যুগের সূত্রপাত হইল। আর এই যুগের প্রবর্তক রূপে বিবদমান উভয় সম্প্রদায়ের অন্তর্গত প্রকৃত ধর্মপিপাসুগণ গুরু নানককেই স্বীকার করিয়া লইয়া বলিলেন—'গুরু নানক সাহ, ফকীর—হিন্দুকা গুরু মুসলমান কা পীর।' তাঁহার

আধ্যাত্মিক শিক্ষার মধ্যে জটিলতা নাই। পবিত্রজীবন-যাপন ও নামসাধন—এই দুইটিই তাহার বৈশিষ্ট্য। যোগী ভাঙরনাথের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন—সত্য নাম ব্যতীত অধিকতর অলৌকিক কিছু নাই [বাজহু সচ্চা নাম দে হর করামাৎ অসাথে নাহী]। এই সাধন-সম্পদ্ তিনি রাখিয়া গিয়াছেন সর্বকালের সর্বমানবের জন্য। দেশ-কাল-সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ সীমানার বহু উর্ধে তাঁহার স্থান; তিনি মানবজাতির শীর্ষ স্থানীয় অধ্যাত্মগুরুগণের অন্যতম।

এই সূত্রে আমরা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সহিত ব্রাহ্মধর্মের ইতিহাসের প্রথমযুগ হইতে ইহার সহিত নানকের শিক্ষার যোগাযোগের প্রসঙ্গও স্মরণ করিতেছি। আধুনিক যুগে একেশ্বরবাদের প্রবর্তনের কালে রাজা রামমোহন পরম-শ্রদ্ধার সহিত নানক-সম্প্রদায়ের নিকট আধ্যাত্মিক ঋণ স্বীকার করিয়া বলিয়াছিলেন: "দশনামা সন্ন্যাসিদের মধ্যে অনেকে এবং গুরু নানকের সম্প্রদায় ও দাদূপন্থী, কবীরপন্থী এবং সন্তমতাবলম্বি প্রভৃতি এই ধর্মাক্রান্ত হয়েন; তাঁহাদের সহিত ভ্রাতৃভাবে আচরণ করা আমাদের কর্তব্য হয়।" এই সকল সম্প্রদায়ের উপাসনা হইতে ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্তিত উপাসনার দুইটি বিশেষত্ব রামমোহন আহরণ করিয়াছিলেন; তাঁহার ভাষায়; 'ভাষাবাক্যই কেবল তাঁহাদের অনেকের উপাসনার দ্বার এবং ভাষাগানাদি উপাসনার উপায় হইয়াছে।" [প্রার্থনাপত্র ১৮২৩]। অতএব এক ঈশ্বরের উপাসনা ব্যতীত উপাসনার মাধ্যম রূপে লৌকিক ভাষাকে গ্রহণ ও ইহার অঙ্গরূপে সঙ্গীতের ব্যবহার—এই দুই বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজ অপরাপর ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে গুরু নানকের সম্প্রদায়ের নিকট অনেকাংশে ঋণী। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের 'আত্মজীবনী' পাঠে জানা যায় কি ভাবে তিনি অমৃতসর-প্রবাস কালে শিখমন্দিরে যাইয়া সেখানে সমবেত ভজন-গানে যোগ দিতেন ও ভজনানন্দে মগ্ন হইতেন। গুরু নানক রচিত ভজনসঙ্গীত "গগনময় থাল রবিচন্দ্র দীপক বনে" মহর্ষির এত প্রিয় ছিল যে সেটি পরবর্তী কালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক বাঙলায় অনূদিত হইয়া ব্রহ্মসঙ্গীতে স্থান পাইয়াছে। ব্রহ্মসঙ্গীতের রবীন্দ্রনাথ রচিত অপর একটি বিখ্যাত গান 'বাজে বাজে রম্যবীণা বাজে' বিখ্যাত শিখ-ভজন 'বাদে বাদে রম্যবীণ বাদে'র অনুকরণে রচিত। শিখ সম্প্রদায়ের আর একটি অনুপম ভজন সঙ্গীত 'এ হরি সুন্দর-এ হরি সুন্দর' ব্রাহ্মসমাজের উৎসবাদিতেও সমাদরের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে প্রথম যুগে প্রতিষ্ঠিত আধ্যাত্মিক আলোচনা সভার নামও শিখ সম্প্রদায়ের অনুকরণে রাখা হইয়াছিল 'সঙ্গত-সভা'। পরবর্তীকালে গুরু নানকের জীবন-চরিত ও ধর্মমতের সশ্রদ্ধ আলোচনায় মহেন্দ্রনাথ বসু, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তগণ অগ্রণী হইয়াছিলেন। মহাত্মা নানকের জন্ম পঞ্চশতবার্ষিকীর শুভলগ্নে আমরা ব্রাহ্ম-সমাজের সহিত তাঁহার ও তাঁহার সম্প্রদায়ের ঐ সকল ভাবধারার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের কথা স্মরণে রাখিয়া তাঁহার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমাদের প্রিয়তম বন্ধু চার্লস এণ্ডরুজের গতপ্রাণ দেহ আজ এই মুহূর্তে সর্বগ্রাসী মাটির মধ্যে আশ্রয় নিল। মৃত্যুতে সত্তার চরম অবসান নয় এই কথা বলে শোকের দিনে আমরা ধৈর্যরক্ষা করতে চেষ্টা করি, কিন্তু সান্ত্বনা পাইনে। পরস্পরের দেখায় শোনায় নানাপ্রকার আদান-প্রদানে দিনে দিনে প্রেমের অমৃতপাত্র পূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। আমাদের দেহাশ্রিত মন ইন্দ্রিয়বোধের পথে মিলনের জন্য অপেক্ষা করতে অভ্যস্ত। হঠাৎ যখন মৃত্যু সেই পথ একেবারে বন্ধ করে দেয় তখন এই বিচ্ছেদ দুর্বির্ষহ হয়ে ওঠে। দীর্ঘকাল এণ্ডরুজকে বিচিত্র-ভাবে পেয়েছি। আজ থেকে কোনোদিন আর সেই প্রীতস্নিগ্ধ সাক্ষাৎ মিলন সম্ভব হবে না একথা মেনে নিতেই হবে কিন্তু কোনোরূপে তার ক্ষতিপূরণের আশ্বাস পেতে মনব্যাকুল হয়ে ওঠে।

যে মানুষের সঙ্গে আমাদের প্রয়োজনের সম্বন্ধ তার সঙ্গে যখন বিচ্ছেদ ঘটে তখন উদ্বৃত্ত কিছুই থাকে না। তখন সহযোগিতার অবসানকে চরম ক্ষতি বলে সহজে স্বীকার করতে পারি। সেইরকম সাংসারিক সুযোগ ঘটানো দেনাপাওনার সম্বন্ধ মৃত্যুরই অধিকারগত। কিন্তু সকল প্রয়োজনের অতীত ভালোবাসার সম্পর্ক অসীম রহস্যময়, দৈহিক সত্তার মধ্যে তাকে তো কুলোয় না। এণ্ডরুজের সঙ্গে আমার অযাচিত দুর্লভ সেই আত্মিক সম্বন্ধই ঘটেছিল। এ বিধাতার অমূল্য বরদানেরই মতো। এর মধ্যে সাধারণ সম্ভবপরতার কারণ খুঁজে-পাওয়া যায় না। একদিন অকস্মাৎ সম্পূর্ণ অপরিচয়ের ভিতর হ'তে এই খ্রীষ্টান সাধুর ভগবদ্ভক্তির নির্মল উৎস থেকে উৎসারিত বন্ধুত্ব আমার দিকে পূর্ণ বেগে প্রবাহিত হয়ে এসেছিল, তার মধ্যে না ছিল স্বার্থের যোগ, না ছিল খ্যাতির দুরাশা, কেবল ছিল সর্বতোমুখী আত্মনিবেদন। তখন কেনোপনিষদের এই প্রশ্ন আপনি আমার মনে জেগে উঠেছে, কেনেষিতং প্রেষিতং মনঃ, এই মনটি কার দ্বারা আমার দিকে প্রেরিত হয়েছে, কোথায় এর রহস্যের মূল। জানি এর মূল ছিল তাঁর অসম্প্রদায়িক অকৃত্রিম ঈশ্বরভক্তির মধ্যে। সেইজন্যে এর প্রথম আরম্ভের কথাটা বলা চাই।

তখন আমি লণ্ডনে ছিলুম। কলাবিশারদ রটেন-ষ্টাইনের বাড়িতে সেদিন ইংরেজ সাহিত্যিকদের ছিল নিমন্ত্রণ। কবি ইয়েট্স্ আমার গীতাঞ্জলির ইংরেজি অনুবাদ থেকে কয়েকটি কবিতা তাঁদের আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক কোণে ছিলেন এণ্ডরুজ। পাঠ শেষ হলে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার বাসায়। কাছেই ছিল সে-বাসা। হ্যাম্পষ্টেড হীথের ঢালু মাঠ পেরিয়ে চলেছিলুম ধীরে ধীরে। সে-রাত্রি ছিল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। এণ্ডরুজ আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে তাঁর মন পূর্ণ ছিল গীতাঞ্জলির ভাবে। ঈশ্বর-প্রেমের পথে তাঁর মন এগিয়ে এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে। এই মিলনের ধারা যে আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে নানা গভীর আলাপে ও কর্মের নানা সহযোগিতায় তাঁর জীবনের শেষ পর্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলবে সেদিন তা মনেও করতে পারিনি।

শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিতে তিনি প্রবৃত্ত হলেন। তখন আমাদের এই দরিদ্র বিদ্যায়তনের বাহ্য-রূপ ছিল যৎসামান্য এবং এর খ্যাতি ছিল সংকীর্ণ। সমস্ত বাহ্যদৈন্য সত্ত্বে তিনি এর তপস্যাকে বিশ্বাস করেছিলেন এবং আপন তপস্যার অন্তর্গত বলে স্বীকার করে নিয়ে-

ছিলেন। যাকে চোখে দেখা যায় না তাকে তাঁর প্রেমের দৃষ্টি দেখেছিল। আমার প্রতি ভালোবাসার সঙ্গে জড়িত করে তিনি শান্তিনিকেতনকে মন প্রাণ দিয়ে ভালো-বেসেছিলেন। সবল চারিত্রশক্তির গুণ এই যে কেবল কোথা থেকে তিনি যে একে যথেষ্ট অর্থদান করেছেন তা জানতেও পারিনি। অন্যের কাছে কতবার ভিক্ষা চেয়েছিলেন, কখনো কিছুই পাননি, কিন্তু সেই ভিক্ষা উপলক্ষ্যে অসংকোচে খর্ব করেছেন যাকে সংসারের

এগুরুজ
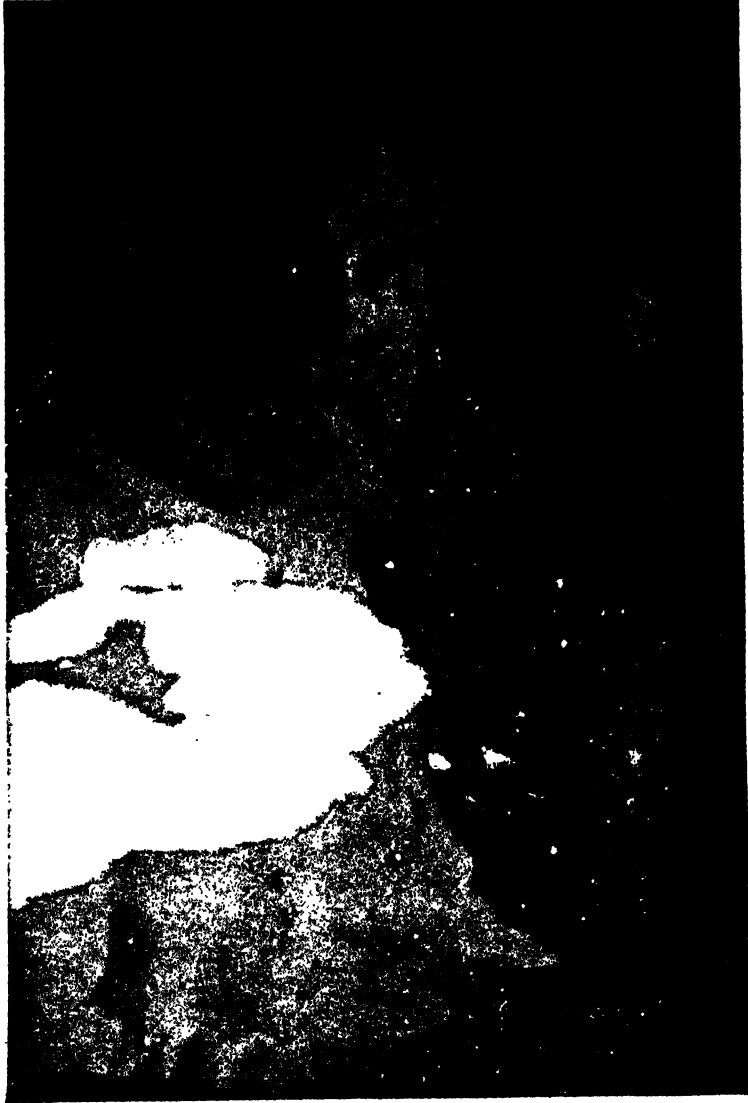
ভাবাবেগের উচ্ছ্বাসের দ্বারা সে আপনাকে নিঃশেষ করে না, সে আপনাকে সার্থক করে দুঃসাধ্য ত্যাগের দ্বারা। কখনো তিনি অর্থ সঞ্চয় করেন নি, তিনি ছিলেন অকিঞ্চন। কিন্তু কতবার এই আশ্রমের অভাব জেনে আদর্শে বলে আত্মসম্মান। নিরন্তর দারিদ্র্যের ভিতর দিয়েই শান্তিনিকেতন আপন আন্তরিক চরিতার্থতা প্রকাশের সাধনায় নিযুক্ত ছিল এতেই বোধ করি বেশি করে তাঁর হৃদয় আকর্ষণ করেছিল।

আমার সঙ্গে এণ্ডরুজের যে প্রীতির সম্বন্ধে ছিল সেই কথাটাই এতক্ষণ বললুম কিন্তু সকলের চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় ছিল ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর একনিষ্ঠ প্রেম। তাঁর এ নিষ্ঠা দেশের লোক অকুণ্ঠিতমনে গ্রহণ করেছে কিন্তু তার সম্পূর্ণ মূল্য কি স্বীকার করতে পেরেছিল? ইনি ইংরেজ, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রিধারী। কী ভাষায় কী আচারে কী সংস্কৃতিতে সকল দিকেই এঁর আজন্মকালের নাড়ীর যোগ ইংলণ্ডের সঙ্গে। তাঁর আত্মীয়-মণ্ডলীর কেন্দ্র ছিল সেইখানেই। যে ভারতবর্ষকে তিনি একান্ত আত্মীয় বলে চিরদিনের মতো স্বীকার করে নিলেন, তাঁর দেহমনের সমস্ত অভ্যাসের থেকে তার সমাজ-ব্যবহারের ক্ষেত্র ছিল বহুদূরে। এই একান্ত নির্বাসনের পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি প্রকাশ করেছেন তাঁর বিশুদ্ধ প্রেমের মাহাত্ম্য। এ দেশে এসে নির্লিপ্ত সাবধানিতার সঙ্গে দূরের থেকে ভারতবর্ষকে তাঁর প্রসাদ বিতরণ করেন নি, অসংকোচে তিনি এখানকার সর্বসাধারণের সঙ্গে সবিনয় যোগ রক্ষা করেছেন। যারা দীন, যারা অবজ্ঞাভাজন, যাদের জীবনযাত্রা তাঁদের আদর্শে মলিন শ্রীহীন নানা উপলক্ষ্যে সহজ আত্মীয়তায় তাদের সহবাস অনায়াসেই তিনি গ্রহণ করেছেন। এদেশের শাসক-সম্প্রদায় যাঁরা তাঁর এই আচরণ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁরা আপনাদের রাজপ্রতিপত্তির অসম্মান অনুভব করে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন তাঁকে ঘৃণা করেছেন তা আমরা জানি, তবু স্বজাতির এই অশ্রদ্ধার প্রতি তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করেন নি। তাঁর যিনি আরাধ্য দেবতা ছিলেন তাঁকে তিনি জনসমাজের অভাজনদের বন্ধু বলে জানতেন তাঁরই কাছে থেকে শ্রদ্ধা তিনি অন্তরের সঙ্গে প্রার্থনা করেছেন। এই ভারতবর্ষে কী পরের কী আমাদের নিজের কাছে যেখানেই মানুষের প্রতি অবজ্ঞা অবারিত সেখানেই সকল বাধা অতিক্রম করে তিনি আপন খ্রীষ্টভক্তিকে জয়যুক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে এ কথা বলতে হবে অনেকবার আমাদের দেশের লোকের কাছে থেকেও তিনি বিরুদ্ধতা ও সন্দিগ্ধ ব্যবহার পেয়েছিলেন, সেই অন্যায় আঘাত অম্লানচিত্তে গ্রহণ করাও যে ছিল তাঁর পূজারই অঙ্গ।

যে-সময়ে এণ্ড্রুজ ভারতবর্ষকে আপন আমৃত্যু-কালের কর্মক্ষেত্ররূপে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন সেই সময়ে এ-দেশে রাষ্ট্রীয় উত্তেজনা ও সংঘাত প্রবলভাবে জেগে উঠেছিল। এমন অবস্থায় এ দেশীয়দের মধ্যে আপন সৌহৃদ্যের আসন রক্ষা ক'রে টিঁকে থাকা ইংরেজের পক্ষে কত দুঃসাধ্য সে-কথা সহজেই অনুমান করা যায়। কিন্তু দেখেছি তিনি ছিলেন অতি সহজে তাঁর আপনস্থানে, তাঁর মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল না। এই যে অবিচলিতচিত্তে কঠিন পরীক্ষার মধ্যে জীবনের লক্ষ্য স্থির রাখা, এতেই তাঁর আত্মিক শক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়।

যে এণ্ডরুজকে আমি জানি দুই দিক থেকে তাঁর পরিচয় পাবার সুযোগ আমার হয়েছে, এক আমার অত্যন্ত কাছে, আমার প্রতি সুগভীর ভালোবাসায়। এমনতরো অকৃত্রিম অপর্যাপ্ত ভালোবাসাকে আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যের মধ্যে গণ্য করি। আর দেখেছি দিনে দিনে নানা উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষের কাছে তাঁর অসামান্য আত্মোৎসর্গ। দেখেছি তাঁর অশেষ করুণা এ-দেশের অন্ত্যজদের প্রতি। তাদের কোনো দুঃখ বা অসম্মান যখনি তাঁকে আহ্বান করেছে তখনি নিজের অসুবিধা বা অস্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য না রেখে সকল কাজ ফেলে ছুটে গিয়েছেন তাদের মধ্যে। এই জন্যেই তাঁকে স্থিরভাবে আমাদের কোনো নির্দিষ্ট কাজে বেঁধে রাখা অসম্ভব ছিল।

এই যে তাঁর প্রীতি এ যে সংকীর্ণভাবে ভারতবর্ষের সীমাগত সে-কথা বললে ভুল বলা হবে। তাঁর খ্রীষ্টধর্মে সর্বমানবের প্রতি প্রীতির যে অনুশাসন আছে ভারতীয়দের প্রতি প্রীতি তারই এক অংশ। একদা তারই প্রমাণ পেয়েছিলুম যখন দক্ষিণ আফ্রিকার কাফ্রি অধিবাসীদের সম্বন্ধে তাঁর উৎকণ্ঠা দেখেছি, যখন সেখান-কার ভারতীয়েরা কাফ্রিদেরকে আপনাদের থেকে স্বতন্ত্র ক'রে হেয় ক'রে দেখবার চেষ্টা করেছিল, এবং য়ুরোপীয়দের মতোই তাদের চেয়ে আপনাদের উচ্চাধি-কার কামনা করেছিল। এণ্ডরুজ এই অন্যায় ভেদবুদ্ধিকে

সহ্য করতে পারেন নি,—এই সকল কারণে একদিন এণ্ড্রুজকে সেখানকার ভারতীয়েরা শত্রু ব'লেই কল্পনা করেছিল।

আজকের দিনে যখন অতিহিংস্র স্বাজাত্যবোধ অসংযত ঔদ্ধত্যে উদ্যত হয়ে রক্তপ্লাবনে মানবসমাজের সমস্ত ভদ্রতার সীমানা বিলুপ্ত ক'রে দিচ্ছে তখনকার যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ সর্বমানবিকতা। কঠিন বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়েই আসে যুগবিধাতার প্রেরণা। সেই প্রেরণাই মূর্তি নিয়েছিল এণ্ড্রুজের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের যে-সম্বন্ধ সে তাদের স্বাজাত্য ও সাম্রাজ্যের অতি কঠিন ও জটিল বন্ধনের। সেই জালের কৃত্রিমতার ভিতর দিয়ে মানুষ-ইংরেজ আপন ঔদার্য নিয়ে আমাদের নিকটে আসতে পদে পদে বাধা পায়, আমাদের সঙ্গে অহংকৃত দূরত্ব রক্ষা করা তাদের সাম্রাজ্যরক্ষার আড়ম্বরের আনুষঙ্গিকরূপে উত্তুঙ্গ হয়ে রয়েছে। সমস্ত দেশকে এই অমর্যাদার দুঃসহ ভার বহন করতে হয়েছে। সেই ইংরেজের মধ্য থেকে এণ্ড্রুজ বহন করে এনেছিলেন ইংরেজের মনুষ্যত্ব। তিনি আমাদের সুখে দুঃখে উৎসবে ব্যসনে বাস করতে এলেন এই পরাজয়-লাঞ্ছিত জাতির অন্তরঙ্গরূপে। এর মধ্যে লেশমাত্র ছিল না উচ্চমঞ্চ থেকে অভাগ্যদের অনুগ্রহ করার আত্মশ্লাঘা সম্ভোগে। এর থেকে অনুভব করেছি তাঁর স্বাভাবিক অতি দুর্লভ সর্বমানবিকতা। আমাদের দেশের কবি একদিন বলে-ছিলেন—

সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই—

প্রয়োজন হ'লে এই কবিবচন আমরা আউড়িয়ে থাকি কিন্তু আমরা এই সত্যবাক্যকে অবজ্ঞা করবার জন্যে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িক সম্মার্জনীকে যে-রকম ব্যবহার ক'রে থাকি এমন আর কোনো জাতি করে কিনা সন্দেহ। এইজন্যে বিদ্রূপ সহ্য করেই আমাকে বলতে হয়েছে আমি শান্তিনিকেতনে বিশ্বমানবের আমন্ত্রণস্থলী স্থাপন করেছি। এইখানে আমি পেয়েছি সমুদ্রপার থেকে সত্যমানুষকে। তিনি এই আশ্রমে সমস্ত হৃদয় নিয়ে যোগ দিতে পেরেছেন মানুষকে সম্মান করার কাজে। এ আমাদের পরম লাভ এবং সে লাভ এখনো অক্ষয় হয়ে রইল। রাজনৈতিক উত্তেজনার ক্ষেত্রে অনেক বার অনেক স্থানে তিনি আপনার কর্মশক্তি নিয়োগ করেছিলেন, কখনো কখনো তার আলোড়নের দ্বারা আবিল করেছিলেন আমাদের আশ্রমের শান্ত বায়ুকে। কিন্তু তার ব্যর্থতা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হয়নি, এবং রাষ্ট্রীয় মাদকতার আক্রমণে শেষ পর্যন্ত আশ্রমকে বিপর্যস্ত হতে দেন নি। কেবলমাত্র তাঁর জীবনের যা শ্রেষ্ঠ দান তাই তিনি আমাদের জন্য সকল মানবের জন্যে মৃত্যুকে অতিক্রম করে রেখে গেলেন —তাঁর মরদেহ ধূলিসাৎ হবার মুহূর্তে এই কথাটি আমি আশ্রমবাসীদের কাছে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে জানিয়ে গেলাম।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ

বিধুশেখর ভট্টাচার্য

শান্তিনিকেতনকে যে কয়জন অসাধারণ ব্যক্তি শান্তিনিকেতন করিয়া তুলিয়াছেন এণ্ডরুজ সাহেব তাঁহাদের অন্যতম। সেখানে আমি বহু লাভ করিয়াছি, যাহা না হইলে আমার জীবনের গতির এমন হইবার সম্ভাবনা ছিল যাহা আমার বস্তুত কল্যাণের জন্য হইত বলিয়া মনে করিতে পারি না। আমার ঐ সমস্ত লাভের একটি প্রধান হইতেছে এণ্ডরুজসাহেবের সঙ্গ। শান্তিনিকেতনে না থাকিলে ইহা আমার হইত না। ইহা আমার পরম সৌভাগ্যের ফল।

এণ্ডরুজসাহেব ছিলেন সমগ্র ইংরেজ জাতির সদ্‌গুণ-সমূহের মূর্তি। তাঁহার দিকে তাকাইলে ইংরেজ জাতির প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয় আনত হয়। তিনি ইংরেজ জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি ছিলেন তাহার অতীত। যদি কোন জাতির নামে তাঁহার জন্মের কথা উল্লেখ করিতে হয়, তবে বলিতে হয় তিনি বিশ্বমানব জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

আমাদের শাস্ত্রে বৈষ্ণবের লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, যেমন বৈষ্ণব হইবেন নিজে অমানী, কিন্তু মানদ, শান্ত, তিতিক্ষু, কারুণিক, ধীর ইত্যাদি। ইহাই যদি হয়, তবে আমি বলিব এণ্ডরুজসাহেব ছিলেন ভারতবর্ষের পরম বৈষ্ণব।

অপর দিকে তিনি ছিলেন পরম খ্রীষ্টান। লাহোরে জালিয়ানবালাবাগের ভীষণ কাহিনী এখনও সকলের মনে স্পষ্ট রহিয়াছে। সেইসময়ে পঞ্জাবে কি ঘোর অত্যাচার হইয়াছিল তাহাও জানা কথা। তখন সেখানে লোকেরা ভয়ে সর্বদা থরহরি কম্পমান। পঞ্জাবের বাহিরেও কেহ সাহস করিয়া কিছু প্রতিবাদ করিবার সাহস পায় নাই। একাকী রবীন্দ্রনাথ তখন সরকারের দেওয়া 'স্যার' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে সরকারী অনুসন্ধান আরম্ভ করা হয়। স্বতন্ত্রভাবে এণ্ডরুজসাহেবও গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া অনুসন্ধান করিতে-ছিলেন। ঐসময়ে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন আমার শ্রদ্ধেয় ও স্নেহাস্পদ বন্ধু, আমার প্রিয় 'ভজনানন্দ ভাই সাহেব' করাচীর শ্রীগুরুদয়াল মল্লিক মহাশয়। গ্রামের লোকেরা এতই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছিল যে, তাঁহাদিগকে কেহ কিছু বলিবার সাহস করিত না। তাঁহাদিগকে যৎসামান্য কিছু খাইবারও দিতে পারিত না। একদিন কোনগ্রামে একজন শিখ এণ্ডরুজসাহেবের অনুরোধে নিজের প্রতি অত্যাচারের কথা আর গোপন রাখিতে না পারিয়া কেবল নিজের দেহখানিকে নগ্ন করিয়া দিল। এণ্ডরুজ-সাহেব তাহার দেহে আঘাতের চিহ্ন দেখিয়া তাহার পায়ে লুটাইয়া পড়িলেন, আর জোড়হাতে তাহাকে বলিতে লাগিলেন, "আমি সমস্ত ইংরেজ জাতির হইয়া প্রার্থনা করিতেছি, তুমি ক্ষমা কর, তুমি সমগ্র ইংরেজ জাতিকে ক্ষমা কর।" একথা উক্ত মল্লিক মহাশয় আমাকে বলিয়াছিলেন।

এণ্ডরুজসাহেব বিশ্বের কল্যাণের জন্য নিজেকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। নিজ-পর বুদ্ধি তাঁহার ছিলনা। তাঁহার ছিল "বসুধৈব কুটুম্বকম্।" সত্য ও ন্যায়ের জন্য তিনি অপ্রিয় করিয়াও আত্মীয়ের উপকার করিতেন, যদিও আত্মীয়েরা তাহা বুঝিত না। একটা ঘটনার উল্লেখ করি। ভারতের বাহিরে ভারতীয়দের কল্যাণের জন্য এণ্ডরুজ সাহেব এত চিন্তা, এত কাজ করিয়া গিয়াছেন যে, বলিবার নহে। আমার মনে হয়, স্বয়ং ভারতীয়দের মধ্যে এমন কেহ এ পর্যন্ত করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। এই কার্যেরই উদ্দেশ্যে তিনি একবার পূর্ব আফ্রিকায় গিয়াছিলেন। সেখানকার প্রবাসী ইউরোপীয়েরা একজোটে কোন কোন বিষয়ে

এমন ব্যবস্থা করিতেছিলেন যে,তাহাতে সেখানকার আদিম অধিবাসী ও ভারতীয়দের নিতান্ত ক্ষতি হইত। এণ্ড্রুজসাহেব সেখানে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ইহাতে সেখানকার ইংরাজেরা এণ্ড্রুজ সাহেবের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। তাঁহার নিজের কাছে আমি শুনিয়াছি এই সময়ে এগার-বার দিন ধরিয়া দিবারাত্র তিনি রেলগাড়ীতে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। ক্রুদ্ধ ইংরেজেরা তাঁহাকে গাড়ীতে এই সময়ে নানারূপে অপমান ও নির্যাতন করিয়াছিল, কেহ কেহ গাড়ীতে উঠিয়া তাঁহার দাড়ি ধরিয়া টানিয়াছিল। কিন্তু খ্রীষ্টান এণ্ড্রুজ তাহাতে একটুও বিচলিত হন নাই, কোনও প্রতিবাদ করেন নাই, নিঃশব্দে তাহা সহ্য করিয়াছিলেন। এ ঘটনা সেই সময়ে খবরের কাগজে প্রকাশিত হইয়াছিল। তিনি শান্তিনিকেতনে ফিরিয়া আসিলে আমি যখন তাঁহার কাছে ইহা উল্লেখ করি, তখন তিনি একটু হাসিয়া বলিয়াছিলেন, উহা কিছুই নহে।

এণ্ড্রুজ সাহেবের সত্য, দম, তপ, তিতিক্ষা, ত্যাগ ইত্যাদি দেখিয়া আমি তাঁহাকে যথার্থ ব্রাহ্মণ বলিয়া মনে করিতাম। ব্রাহ্মণ দুইরকমের, বর্ণব্রাহ্মণ বা জাতিব্রাহ্মণ, আর গুণব্রাহ্মণ। যাঁহারা কেবল বর্ণে বা জাতিতে অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন, তাঁহারা বর্ণব্রাহ্মণ বা জাতিব্রাহ্মণ। সমাজে ইহারা খুব হেয়। এখনও অনেককে বর্ণব্রাহ্মণ বলা হয়, যদিও যাঁহারা অন্যকে বর্ণব্রাহ্মণ বলিয়া অবজ্ঞা করেন তাঁহারা কম বর্ণব্রাহ্মণ নহেন। ইঁহাদিগকেই ব্রহ্মবন্ধু বলা হয়। ব্রহ্মবন্ধু শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, নিজে অর্থাৎ নিজের গুণে ব্রহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ নহে, কিন্তু কোন বস্তুত ব্রাহ্মণ তাহার বন্ধু বা জ্ঞাতি, কোন বস্তুত ব্রাহ্মণকে যে নিজের বন্ধু বা জ্ঞাতি বলিয়া পরিচয় দেয় সেই ব্রহ্মবন্ধু। বুদ্ধদেব ইহাদিগকে ভো বা দী বলিতেন। অর্থাৎ যাহারা নিজের গুণে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হইতে না পারিয়া লোকজনকে ডাকিয়া বলে যে "ওহে আমি ব্রাহ্মণ" তাহারা ভো বা দী। এণ্ড্রুজ সাহেব ছিলেন গুণব্রাহ্মণ, বস্তুত ব্রাহ্মণ, আমার চোখে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণ। তাই আমি তাঁহার পায়ের ধুলি লইয়া প্রণাম করিতাম। আমি ইহা সকলের সামনেই করিতাম, গোপনে নহে। এণ্ড্রুজ সাহেবের মহত্বই আমাকে ইহা করাইয়াছিল। আমি অতি সংকোচে উল্লেখ করিতেছি, আমরা উভয়েই উভয়কে পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতাম। হঠাৎ একদিন দেখি এণ্ড্রুজ সাহেব আমার পায়ে হাত দিয়াছেন। আমি বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া হাত ছাড়াইয়া লইলাম। কিন্তু হৃদয়ে তাঁহার মহত্বের একটা গভীর রেখাপাত হইল। আমি থাকিতে পারিলাম না। আমারও হাত তাঁহার পদস্পর্শ করিল। সেই হইতে আমাদের নমস্কার পদ্ধতি এইরূপ হইয়াছিল।

এণ্ড্রুজ সাহেবের চরিত্রের মহত্ব ও মাধুর্য্য কত গভীর ছিল তাহা যে একবার তাঁহার সংস্পর্শে আসিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। তাঁহার হৃদয় করুণায় ও প্রেমে ভরা ছিল। যেখানে দুঃখ-দারিদ্র্য-কষ্ট সেইখানেই এণ্ড্রুজ—জাতিব্যক্তিনির্বিশেষে। তিনি সকলকেই কোল দিতেন, বড়-ছোট, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র এ ভেদ তাঁহার কাছে ছিল না। তাঁহার কাছে যে ব্যক্তি যে-কাজ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে তাহারই তিনি তাহা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তা তাহা খুব বড়ই হউক আর খুব ছোটই হউক। এজন্য আবশ্যক হইলে বড়লাটকে পর্য্যন্ত তিনি ধরিতেন।

ভারতবর্ষ তাঁহাকে দীনবন্ধু বলিয়া তাঁহার চরিত্রের একটা দিককে উপযুক্তরূপে প্রকাশ করিয়াছে। ভারতে দীনের সংখ্যা কম নহে। তাহারা তাঁহার মধ্যে বস্তুতই এক বন্ধুকে পাইয়াছিল। এণ্ড্রুজ সাহেবের অভাব সমগ্র বিশ্ব অনুভব করিবে। আমাদের সৌভাগ্য তাঁহাকে আমরা নিকটে পাইয়াছিলাম, আমাদের দুর্ভাগ্য তাঁহাকে আমরা হারাইলাম।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

মহামতি এণ্ডরুজ

ক্ষিতিমোহন সেন

হঠাৎ বেতার-যোগেই খবর পেলাম মহামতি এণ্ডরুজ পরলোক কাল-প্রয়াণ করেছেন। অনেকদিন তিনি শয্যাগত। তবু শেষের দিকে ক্রমে ভাল হচ্ছিলেন তাই খবরটা মনে হ'ল যেন আকস্মিক।

জীবনে মানুষকে তাঁর খুঁটিনাটির মধ্যে দেখি। মৃত্যুতে মানুষকে দেখতে পাই তার অখণ্ডতায়। জীবনীর খুঁটিনাটি খবর আজ তো আমার হাতে নেই তাতে ক্ষতি কি? মৃত্যুর দূরত্বের মধ্য দিয়ে আজ তাঁর জীবনের সমগ্রটাই দেখতে চাই। অসীম আকাশ দূরে আছে ব'লেই সূর্যচন্দ্রের গোলত্বটা চোখে পড়ে।

প্রায় সাতাশ-আঠাশ বছর আগে মহামতি এণ্ডরুজ ও পিয়ার্সন সাহেব দুইটি বন্ধু শান্তিনিকেতন আশ্রমে এলেন। তখন আশ্রম খুবই ছোট। আয়োজন অতি যৎসামান্য। তার আগে তাঁর লেখা কিছু কিছু পড়েছি, এবার ব্যক্তিটিকে প্রত্যক্ষ দেখলাম! দেখলাম কি সহজ সরল মানুষটি। প্রীতিতে, ভদ্রতায় সৌজন্যে একবারে ভরা। ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর যেভাব সেখানে কোথাও একটু ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা বা অবজ্ঞা উপেক্ষা কিছু নেই। এই বিষয়ে তিনি খ্রীষ্টের সাচ্চা ভক্ত। কাজেই ভৌগোলিক সীমায় বা জাতি-পংক্তিগতভেদে তাঁর প্রীতি বা মৈত্রীর কোনপ্রকার বাধা হ'ত না।

সত্যকার খ্রীষ্টীয় ভক্ত-পরিবারে তাঁর জন্ম। তাঁর মায়ের কোলে ব'সে তিনি খ্রীষ্টের যে জীবন শুনেছেন তাতে তাঁর হৃদয়ে এমন গভীর রেখাপাত করেছে যে কিছুতেই তিনি তা ভুলতে পারেননি। এবারও খ্রীষ্টোৎসবে তাঁর সঙ্গে একসঙ্গে মন্দিরে উপাসনা করতে গিয়ে তাঁর সেই খ্রীষ্টজন্মকথা শুনেছি।

ঐ খ্রীষ্টের চরিত্রই তাঁর জীবনকে সকল বাধাবন্ধ ও ক্ষুদ্রতা হ'তে মুক্তি দিয়েছে। যাঁরা যথার্থই খ্রীষ্ট-ভক্ত তাঁদের মধ্যে কেন দেশগত কারণে উচ্চনীচতার হিসেব থাকবে? দিল্লী কলেজে তিনি স্বর্গীয় সুশীল রুদ্রকে এক সময় প্রধান অধ্যাপক করেন, তাঁর অধীনে তিনি সেখানে আত্মনিয়োগের দ্বারা আপন মহত্ত্বেরই পরিচয় দিয়েছেন। সুশীল রুদ্র তাঁর পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁর ছেলেপিলেদেরও তিনি নিজ সন্তানের মত দেখেছেন।

সাদাসিধা ছিল তাঁর জীবন। ভারতীয় প্রাচীন মহত্ত্বের প্রতি ছিল তাঁর শ্রদ্ধা অপরিসীম। ক্রমে আমি তাঁর সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছি। ভারতের নানাবিষয় আলাপ হ'ত। তবু অন্য নানা কথা বললেও ভারতের ভক্তদের কথা বলতাম না। এজন্যই বলিনি যে এসব কথা তাঁর ভাল লাগবে কি না লাগবে কেমন ক'রে বুঝব।

একদিন তিনি আমাকে চেপে ধরলেন—বললেন, "ইউরোপ ভারতের কাছে যদি ঐহিক সম্পদই চায় তবে সে কিছুই পেলে না। হায় হায়, সে তার সোনা, তার কয়লা, তার লোহা খুঁজেই জীবনপাত করল। কিন্তু তার সংস্কৃতি জ্ঞান, প্রেমভক্তির সন্ধান পেলই না।' তারপর তাঁকে দেখেছি ভারতীয় প্রাচীন সাধক ও মধ্যযুগের ভক্তদের কথা কি গভীর প্রীতির সঙ্গে পড়েছেন ও তাঁদের ধ্যানে তিনি নিজের ধ্যানকে প্রতিদিন গভীর ও পবিত্র ক'রে তুলেছেন।

তাঁর প্রেম শুধু ধ্যান ক'রে বা ভালবেসে তৃপ্ত নয়। তাঁর প্রেমের মধ্যে ছিল বলিষ্ঠ কর্ম ও সেবার ভাব। তিনি বারবার খ্রীষ্ট-ভক্ত কন্যা মেরী ও মার্থার কথা বলতেন। তাঁর মধ্যে উভয়েরই ভাব দেখেছি, মেরীর মত গভীর অনুরাগ অথচ মার্থার মত গভীর সেবা-পরায়ণতা উভয় ভাবকে অন্তরের মধ্যে যুক্ত করতে না পারলে তিনি কিছুতেই তৃপ্তি পেতেন না। ভারতকেও যখন তিনি ভালবাসলেন তখন তার জন্য দুঃখময় সেবা-ব্রতকেও তিনি স্বীকার করলেন।

উৎসর্গ করতে পেরেছেন? পিয়ার্সন সাহেবের সঙ্গে তিনি শান্তিনিকেতনের সেবাতে লাগলেন।

সেখানকার শিক্ষকেরা যে রকম কুটীরে বাস করেন, যেভাবে তাঁদের খাওয়া-দাওয়া হয় সেই সবই তাঁরা গ্রহণ করলেন। তাঁদের স্বাস্থ্য তাতে বার বার ভেঙেছে। তার জন্য পিয়ার্সন সাহেব জীবনের শেষভাগে খুব অসুস্থ থাকতেন, যদিও তিনি মারা গেলেন একটা দৈব দুর্ঘটনায়। সেইসব নানা কারণে ও পরবর্তী নানা সময়ে ভারতের জন্য নানা সেবাকর্মে এণ্ড্রুজ সাহেব স্বাস্থ্য

এণ্ড্রুজ
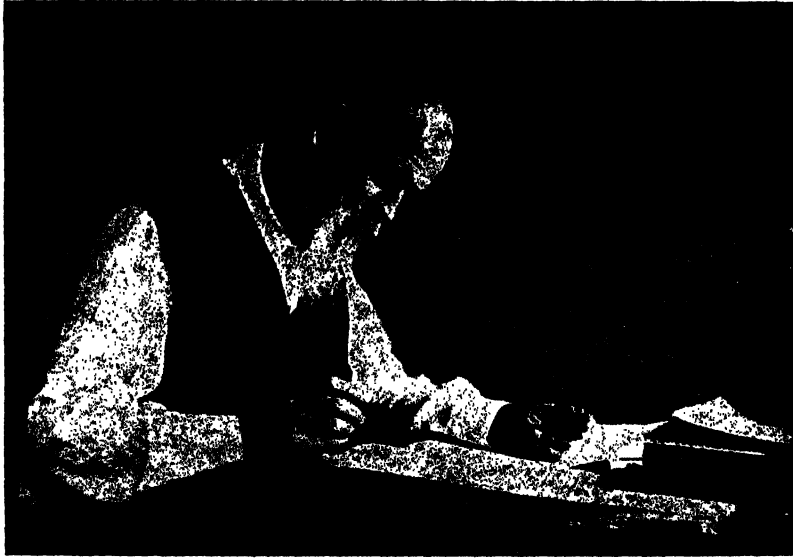
রবীন্দ্রনাথকে তিনি সত্যি সত্যি শ্রদ্ধা করতেন, তাই তাঁর আশ্রমের জন্য সর্ব্ববিধ সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করলেন। প্রায় সাতাশ-আঠাশ বৎসর আগে এই ব্রতের কাছে তিনি নিজকে উৎসর্গ করেছিলেন।

তখন শান্তিনিকেতনের বয়স অল্প, তার পরিবার ও বাহ্য উপকরণ সবই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। এমন অবস্থায় খুব অল্পলোকেই তার প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থা রাখতে পারত। তিনি যে শুধু বিশ্বাস করলেন তা নয় তিনি তাঁর জীবনের পরিপূর্ণ অর্ঘ্যটি তার কাছে উৎসর্গ করলেন। এমন ক'রে এ-দেশের কয়জন লোকই বা আপনাকে এমন কাজে

হারালেন। যখন মানুষের কোন দুঃখদুর্গতির কথা তিনি শুনতেন তখন নিয়মপালন ক'রে সুস্থভাবে কাজ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব হ'ত। তিনি আমাদের মধ্যে বাস করেছেন, আমাদের ছেলেপিলেদেরও নিজের সন্তানের মত দেখেছেন।

আমাদের সুখ দুঃখকে তিনি আপন করে নিয়েছেন। সেসব কথার খুঁটিনাটি আজকে লেখা সম্ভব নয়। মানব-প্রেমের গভীরতাবশতই যেখানে যখন যার প্রতি অত্যাচার হয়েছে তখন তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারেন নি। ফিজি প্রভৃতি দ্বীপে ভারতীয় দরিদ্র শ্রমিকদের উপরে যে

অবিচার হয়েছে তার জন্য তাঁর শ্রমের অবধি ছিল না। দক্ষিণ-আফ্রিকায় তিনি এ-জন্ত বহু নির্যাতন ও অপমান সহ্য করেছেন। সে এত পরিমাণ যে বলা যায় না। নিঃশব্দে সহ্য করেছেন, কিন্তু কাউকে কিছু বলেন নি। এই মৌনভাবে সহ্য করার মধ্যে যে বলিষ্ঠ পৌরুষ আছে তার মর্যাদা কি সকলে বোঝেন? ভারতবর্ষের মধ্যেও দেখেছি কোথাও যে কাউকে বিনা কারণে অপমান সহ্য করতে হচ্ছে সে ছিল তাঁর অসহ্য। এজন্য দক্ষিণ-ভারতের অস্পৃশ্যতা তাঁকে বড়ই দুঃখ দিত। বার বার সেই দুঃখ তিনি আমাদের বলতেন।

অনেকদিন পরে মহাত্মাজীর রাজনীতি-আন্দোলন যখন আরম্ভ হয় তখন যে অস্পৃশ্যতা দূর করাও তার মধ্যে গৃহীত হ'ল সেটা প্রথমে মহাত্মার কার্যক্রমের মধ্যে ছিল না। এণ্ডরুজ সাহেব প্রভৃতি আরও দু-একজনের এই বিষয়ে একটু হাত আছে এ-খবর সকলে রাখেন না। মহাত্মাজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় দক্ষিণ-আফ্রিকায়। তারপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মহাত্মাজীর পরিচয় সাধন করিয়ে দিলেন মিঃ এণ্ডরুজ। মহাত্মাজী তাঁর ফিনিক্স বিদ্যালয় নিয়ে একটু বিপদে পড়েছিলেন। তিনি দক্ষিণ-আফ্রিকা ছেড়ে চলে আসবেন, তাঁর বিদ্যালয় কি করবেন? মিঃ এণ্ডরুজের কাছে শুনে কবি রবীন্দ্রনাথ বিদ্যালয়টিকে নিজ আশ্রমের অতিথি ভাবে রাখতে চাইলেন। এতেই হ'ল দুইজনের মধ্যে পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা।

তারপর যখন মহাত্মাজী ও রবীন্দ্রনাথের কোন কোন বিষয়ে মতভেদ হয়েছে তখন কত এদেশীয় লোক তো ছিলেন কেউ সেই ভেদকে মিটিয়ে দেবার কথাও মনে করেন নি, মহামতি এণ্ডরুজ সাহেবের তখন দিবারাত্রি চেষ্টা ছিল কিসে ভারতের এই দুইজন মহাপুরুষের ভেদ মেটে। সবারমতী ও শান্তিনিকেতনের মধ্যে তিনি ছিলেন নিত্যযোগসেতু।

কোথাও দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প প্রভৃতি দুর্গতির কথা শুনলেই তাঁর কি ব্যাকুলতা দেখা যেত! আসাম-বেঙ্গল রেলের ও আসামের কুলিদের ধর্মঘট তিনি বার বার নিষেধ করেছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে প্রার্থনা করেছিলেন যে ঐ ধর্মঘট যেন না হয়, কারণ এর ভবিষ্যৎ যে কি ভয়ঙ্কর তা তিনি জানতেন। কিন্তু তাঁর নিষেধ কেউ শুনলেন না, শেষে তাদের অবর্ণনীয় দুঃখ তিনি প্রাণপণে মেটাতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর নিষেধ মানেনি ব'লে রাগও করেননি। বিহারের দুর্ভিক্ষ প্রভৃতিতেও তাঁর মহৎ চেষ্টা দেখেছি।

কোনো কল্যাণব্রতের সহায়তা করতে তাঁর আর আলস্য ছিল না। তাঁর সঙ্গে এইসব কাজে কখনও কখনও গুজরাট, কাথিওয়ার, সিন্ধু প্রভৃতি দেশে ছুটেছি। দিন নেই রাত্রি নেই, খাওয়া-দাওয়া নেই, শুধু চা আর সরবৎ খেয়ে দিন যাচ্ছে—দারুণ গ্রীষ্ম—কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। এতে স্বাস্থ্য ক-দিন থাকে? লোহার শরীরও ভেঙে যায়। চীন দেশেও তাঁর সঙ্গে ঘুরেছি, সেই একই কথা। তখন তিনি রবীন্দ্রনাথের সহায়তার জন্য চীনে গিয়েছিলেন।

প্রেমের জোর তাঁর যে কত ছিল তার প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের বড়ভাই মহাদার্শনিক দ্বিজেন্দ্রনাথকেও তিনি আপন ক'রে নিয়েছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ অতি প্রাচীন ধরণের ভারতীয় মনীষী। সাহেবসুবা সইতে পারতেন না। এণ্ডরুজ সাহেব প্রভৃতি প্রথমে ঘেঁসতেই পারেননি। ক্রমে সেই মহাপুরুষকে প্রেমের দ্বারা এণ্ডরুজ সাহেব আপন করলেন। দিনের পর দিন তিনি ব্যর্থ হয়ে ফিরেছেন তবু হাল ছাড়েননি। তারপর দ্বিজেন্দ্রনাথ এই এণ্ডরুজ সাহেবকে নিজের ছোট ভাইটির মত স্নেহ করতেন। পশুপাখীর বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথকে এণ্ডরুজ ক্রমে জয় করলেন।

এণ্ডরুজ সাহেবের সাহিত্যিক শক্তি ছিল অসাধারণ। কি সুন্দর সহজভাষায় তিনি বলতেন ও লিখতেন। কিন্তু দুর্গতদের দুর্গতির নানা কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে তিনি এই সব দিকে তেমন মনোযোগ দিতেই পারেননি। পত্র লিখে, দেখা ক'রে, কাজ করে, দেশের দুর্গতির নানা ব্যবস্থা ক'রে তাঁর আর সময় থাকত না। এর মধ্যে কত জায়গায় কত সেবকদের তিনি টাকা-পয়সা দিয়েও সাহায্য করতেন তা বলে শেষ করা যায় না।

আজ তিনি পরলোকে। তাঁকে বিশেষ কোনও দেশের লোক ব'লে যদি আজ শ্রদ্ধা জানাই তবে তাঁর আত্মার প্রতি অবমাননা হবে, জাতীয়তার অনেক উর্দ্ধের লোক তিনি। কারণ তা নইলে কি তিনি ইংরাজ হ'য়ে ভারতীয়দের জন্য এমন ক'রে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে পারতেন। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যে জাতীয়তা ছাড়িয়ে বিশ্বমানবতার দিকে ধাবিত হ'ল তার প্রত্যক্ষ দুইটি কারণ মিঃ এণ্ড্রুজ ও মিঃ পিয়ার্সনের চরিত্র। জাতীয়তা-বাদীরা তাঁদের এত সম্মান করেন, কিন্তু তাঁরা যদি জাতীয়তাবাদীই হতেন তবে তাঁদের কাছে আমাদের জাতীয়তাবাদীরা আসতেন কি ক'রে?

তিনি কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন না, খ্রীষ্টের মতই ভগবানের লোক—সেই সূত্রে প্রাচীন আধুনিক সকল দেশের সকল ভক্তেরই অনুরাগী। খ্রীষ্টের নামে তাঁর হৃদয় নিত্য প্রণত, খ্রীষ্টভক্তদের চরিত-কথা বলতে বলতে তিনি তন্ময়। অথচ হিন্দুসাধকদের কথা তিনি গভীর শ্রদ্ধাসহ শুনেছেন। ভারতীয় সাধনার প্রতিমূর্তি দ্বিজেন্দ্রনাথের চরণতলে তিনি আসীন, মুসলমান-সাধক জাকাউল্লাসাহেব তাঁহার পরম শ্রদ্ধার মানুষ। এমন লোককে বিশেষ কোনো সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে চিহ্নিত করতে গেলে ভুল হবে।

কিছুদিন হতেই তাঁর শরীর একেবারে ভেঙে পড়েছিল। শান্তিনিকেতনে এই শরীর নিয়েও তিনি দিনরাত্রি দেখেছি লিখছেন, কত কত লোকের পত্রের উত্তর দিচ্ছেন, দেশ-দেশান্তরের দুঃখ দুর্গতি মোচনের চেষ্টা করেছেন। তারপর এবার খ্রীষ্টোৎসবে তিনি মন্দিরে কি সুন্দর ক'রে খ্রীষ্টের জীবনী তাঁর সরল অপূর্ব ভাষায় বর্ণনা করলেন, তখনও বুঝতে পারিনি ভিতরে ভিতরে যে তাঁর এতটা শরীর ভেঙেছে।

হঠাৎ তিনি কলকাতা গেলেন। শুনলাম তাঁর পেটেরই মধ্যে পীড়া। তারপর তাঁর অস্ত্রোপচার হ'ল। তারপর তাঁর অসুখের যথার্থ খবর শুনে তাঁর বন্ধুবান্ধবেরা বিষম উদ্‌গ্রীব হলেন, মহাত্মাজী স্বয়ং বার বার দেখা করলেন, সব ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু যিনি আপনার প্রাণ মানবের হিতযজ্ঞে উৎসর্গ করেই দিয়েছেন তাঁর পক্ষে জীবন-মরণ দুইই সমান।

ভগবানের প্রেমলোকের বার্ত্তা যে জীবনে শুনেছে সে কি আর মৃত্যুভয়ে জীবনকে আঁকড়ে থাকতে পারে? তাই যাঁর হাতে তাঁর জীবনটি পেয়েছেন তাঁরই প্রেমের নির্দেশে ভক্ত আপন সেই জীবনটি অমলিনভাবে তাঁরই হাতে উৎসর্গ ক'রে চলে গেলেন।

প্রবাসী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭

দীনবন্ধু চার্লস ফ্রীয়ার এণ্ডরুজ

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

চার্লস ফ্রীয়ার এণ্ডরুজ ইংলণ্ডের কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ উপাধিধারী এবং তথাকার পেম্ব্রোক কলেজের ফেলো ছিলেন। তিনি যৌবনেই খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারার্থ সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া দিল্লীর সেণ্ট ষ্টীফেন্স কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত হইয়া আসেন। তখন তিনি অন্যান্য পাদরীদের মত রেভারেণ্ড উপাধিভূষিত ছিলেন। পরে তিনি ঐ উপাধি ত্যাগ করেন। তাহা করিলেও তাঁহার চরিত্র ও জীবনের দ্বারা সত্য খ্রীষ্টীয় আদর্শ যেরূপ প্রচারিত হইয়াছে, অল্প পাদরী বা সাধারণ খ্রীষ্টিয়ানের দ্বারাই তাহা হইয়া থাকে। তাঁহার নামের তিনটি আত অক্ষর 'সী' 'এফ' এবং 'এ' "Christ's faithful Apostle" (খ্রীষ্টের বিশ্বাসী প্রেরিত পুরুষ) এই আখ্যারই আদ্য অক্ষরত্রয়, ইহা যিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ঠিকই বলিয়াছিলেন। কারণ, খ্রীষ্টের জীবন ও চরিত্র যে আদর্শের ছিল বলিয়া শ্রদ্ধাবান খ্রীষ্টিয়ান ও অ-খ্রীষ্টিয়ানগণ মনে করেন, এণ্ডরুজ সেই আদর্শ অনুসারে চলিবার চেষ্টা আমরণ করিয়া গিয়াছেন।

সেই আদর্শের একটি অংশ, যাহারা অবজ্ঞাত, উপেক্ষিত, নির্যাতিত, দীনহীন, তাহাদের সহায় হওয়া। এণ্ডরুজ এইরূপ সকল মানুষের বন্ধু ছিলেন। এই জন্য তাঁহাকে যে 'দীনবন্ধু' নাম দেওয়া হইয়াছিল তাহা সার্থক।

দক্ষিণ-আফ্রিকায়, ফিজিতে, এবং অন্যান্য উপনিবেশে দুর্গত ভারতীয়দের জন্য তিনি বহু পরিশ্রম করিয়াছিলেন, বহু দুঃখ ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন। এইসকল স্থানে ভারতীয়দের অবস্থার যদি কিছু উন্নতি হইয়া থাকে, তাহার প্রশংসার বহু অংশ এই সার্থকনামা দীনবন্ধুর প্রাপ্য। ব্রিটিশ গিয়ানা হইতে যে-সব ভারতীয় শ্রমিক ভারতে স্বাস্থ্য ও সুখশান্তি পাইবার আশায় ফিরিয়া আসিয়া নিরাশ হইয়া মাটিয়াবুরুজে দুঃখে দিনপাত করে, তাহাদের খবর পর্য্যন্ত ভারতীয়েরা অল্প লোকেই জানে, কিন্তু দীনবন্ধু তাহাদের নিমিত্ত পরিশ্রম করিতেন, বড় লাটসাহেব ও তাঁহার পারিষদদের নিকট দৌড়াদৌড়ি করিতেন।

বিহারের চম্পারণের নীলকরপীড়িত প্রজাদের সহায় তিনি ছিলেন, ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহারের তিনি কর্ম্মিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, বহুবার প্লাবন ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত উড়িষ্যার স্থায়ী দুঃখ-মোচন-ব্যবস্থার চেষ্টা তিনি করিয়াছিলেন। উত্তরবঙ্গের অবিস্মরণীয় প্লাবনপীড়নের সময়ও তিনি দুর্গতদের বন্ধুরূপে দেখা দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনচরিত লিখিতেছি না, সুতরাং তিনি যে কোথায় কি কি করিয়াছিলেন তাহা এখন লেখা যাইবে না। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে কত লোকের উপকার করিয়াছেন, তাহার ত কোন হিসাবই পাইবার জো নাই।

তিনি অনুগ্রাহক মুরুব্বিরূপে কিছু করিতেন না, কখন ভাই কখন বা সেবকরূপে করিতেন। প্রভুজাতি-সুলভ 'মুরুব্বিয়ানার ভাব বর্জন করিতে তিনি সর্বদা চেষ্টা করিতেন। যাহা করিতেন, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর আদেশে বা পরামর্শে করিতেছেন যথাসম্ভব এইরূপ বলিতে চেষ্টা করিতেন—সৎকার্য্যের প্রশংসা নিজে লইতে চাহিতেন না।

ইহা সুবিদিত যে, রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজীর মধ্যে কোন কোন প্রধান বিষয়েও মতভেদ আছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও উভয়েরই সহিত দীনবন্ধুর ঘনিষ্ঠতা ছিল; রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁহার 'গুরুদেব,' গান্ধীজী 'মোহন'। হৃদয়-মনের যে ঔদার্য ও বিশালতা তাঁহাকে এই উভয় পুরুষপ্রবরকে শ্রদ্ধাভক্তি দিতে সমর্থ করিয়াছিল, তাহারই প্রভাবে তিনি

...দেশের বহুলোকের বন্ধুত্ব লাভ করিতে ও ... সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন।

আজকাল সচরাচর পরিচিত লোকমাত্রকেই অনেক সময় বন্ধু বলা হয়। দীনবন্ধু তাঁহার অন্তিমবাণীতে তাঁহার প্রেম বিমুখ বা ভিন্নমুখ হইত না, ইহা বেদনা-মিশ্রিত প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে বলিতে পারি। এ-বিষয়ে তাঁহার অসাধারণ মহানুভবতা ও সদাশয়তা ছিল।

বয়োজ্যেষ্ঠের প্রতি তাঁহার ভক্তি ও স্নেহ অসামান্য

এণ্ড্রুজ
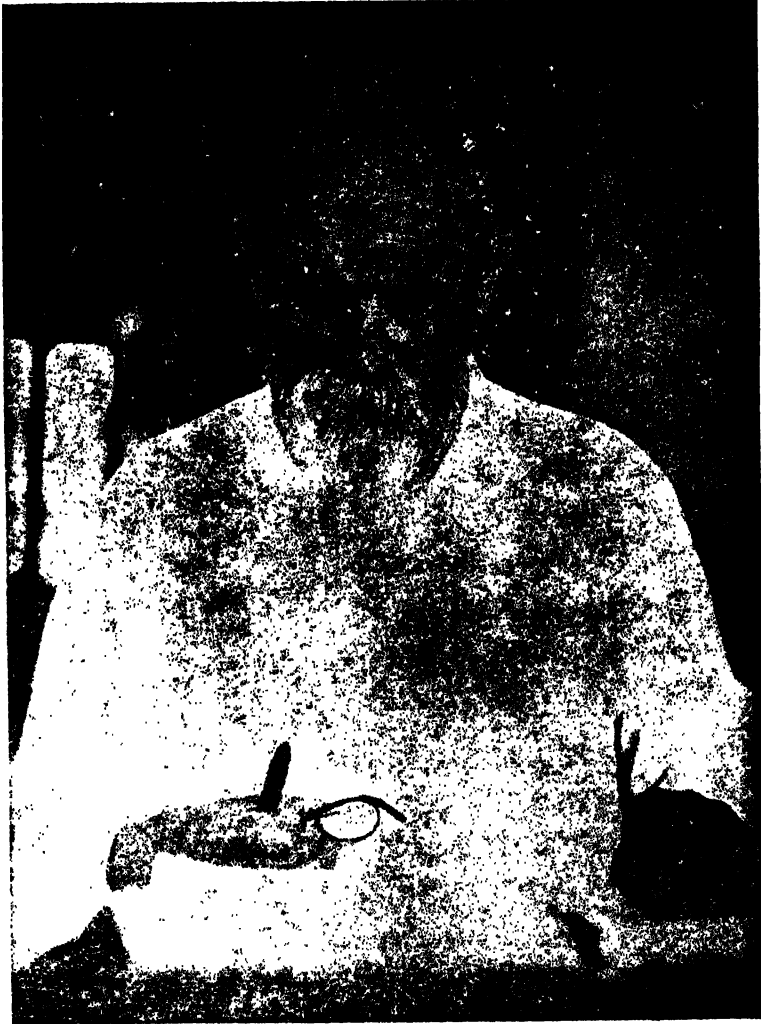
ভগবৎকৃপায় যে বহু বন্ধুলাভের সৌভাগ্যের কথা বলিয়াছেন, সে বন্ধুত্ব প্রকৃত বন্ধুত্ব। সে-সৌভাগ্য তাঁহার হইয়াছিল তাঁহার হৃদয়ের অগাধ প্রেমের অফুরন্ত ভাণ্ডারের গুণে। প্রেম দিতে তাঁহার কৃপণতা ছিল না। যাহাকে বন্ধু মনে করিতেন, এমন কেহ উপেক্ষা করিলে, ঔদাসীন্য দেখাইলে, এমন কি কঠোর আঘাত করিলেও, ছিল। মহামতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি বড় দাদা বলিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের জীবিতকালে যখনই এণ্ড্রুজ শান্তিনিকেতনে থাকিতেন, প্রত্যহ বড় দাদাকে দেখিতে গিয়া প্রণাম করিয়া পদধূলি লইতেন এবং তাঁহার সঙ্গে চা খাইতেন। বড়দাদার প্রতি তাঁহার ভক্তি ও স্নেহের কেবলমাত্র দুটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—অধিকস্থান ও সময়

নাই। একদিন, কি কারণে জানি না, দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভুজাতির উপর চটিয়া বসিয়া ছিলেন, এমন সময় এণ্ড্রুজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া ইংরেজীতে নিত্যকার প্রশ্ন করিলেন, "বড় দাদা, কেমন আছেন?" বড় দাদা ইংরেজীতে যে উত্তর দিলেন তাহাতে বৃদ্ধ স্বদেশভক্তের এই মতই প্রকাশিত হইল যে, প্রভুজাতির সব লোক ভারতবর্ষ হইতে বিতাড়িত না হইলে কোন সুখশান্তি নাই। এই ব্যাপারটির বর্ণনা করিতে গিয়া এণ্ড্রুজ দ্বিজেন্দ্রনাথের পৌত্র দিনেন্দ্রনাথকে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিলেন, "I say Dinoo, your grandfather is terrible"। আর একদিন এণ্ড্রুজের সহিত আমিও দ্বিজেন্দ্রনাথকে প্রণাম করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন তিনি, কি কারণে জানিনা, খ্রীষ্টিয়ান পাদরীদের উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন। আমরা উভয়ে প্রণাম করিবার পর, পাদরীদের হিন্দুধর্ম ও হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে অজ্ঞতার বিষয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ উদ্দীপনার সহিত অনেক কথা বলিলেন—ইহা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন যে, এণ্ড্রুজ এক-সময় কার্যতঃ এবং নামেও পাদরী ছিলেন এবং তখনও বস্তুতঃ পাদরী ছিলেন। পরে বড় দাদা আবার শান্তভাব ধারণ করিলেন। আমরা যখন ফিরিয়া আসিতেছিলাম, তখন পথে নানা কথাবার্তার মধ্যে এণ্ড্রুজ বেশ প্রসন্ন-ভাবেই বলিলেন, 'We had a very interesting talk from Bara Dada this evening !"

রবীন্দ্রনাথের প্রতি এণ্ড্রুজের ভক্তি ও প্রীতির প্রগাঢ়তা প্রাবল্য ও অচঞ্চল স্থৈর্য অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কেহ তাঁহা অপেক্ষা গুরুদেবের প্রিয়তর ও নিকটতর হয়, এই সম্ভাবনার চিন্তাও যেন তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। নারীসুলভ একনিষ্ঠ প্রেম এই বর্ষীয়ান চিরকুমারের হৃদয়ে বাসা বাঁধিয়াছিল।

সেণ্ট ষ্টীফেন্স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল স্বর্গত সুশীলকুমার রুদ্র দীনবন্ধুর অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। উভয়ে যেন আধ্যাত্মিক অভিন্নহৃদয় ছিলেন। রুদ্র মহাশয়ের একটি নাতনীর যখন জন্ম হয়, তখন এণ্ড্রুজ আমাকে স্পর্দ্ধার সহিত লিখিয়াছিলেন, "এখন আমিও ঠাকুরদাদা হয়েছি!" কারণ তিনি বোধহয় মনে করিতেন, আমার অনেকগুলি নাতনী আছে বলিয়া আমি অহঙ্কৃত! সে-বিষয়ে আমার কথঞ্চিৎ সমকক্ষতা এই স্পর্দ্ধিত উক্তির কারণ।

তিনি শান্তিনিকেতনে আগে অধ্যাপনা করিতেন। তিনি বিদ্বান, সুশিক্ষক এবং গদ্যে ও পদ্যে বহু পুস্তক ও সাময়িকপত্রের প্রবন্ধের সুলেখক ছিলেন। বালকেরা তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিত। বলাবাহুল্য, তিনিও তাঁহাদিগকে সাতিশয় স্নেহ করিতেন, এবং সকল বিষয়ে স্বাধীন ও নির্ভীক চিন্তা করিতে ও লোকহিতকর কাজ করিতে উৎসাহ দিতেন। তাহার দৃষ্টান্ত দিবার সামর্থ্য থাকিলেও দিতে পারিলাম না।

ভারতবর্ষের লোকদের সহিত অভিন্নতা স্থাপন করিবার চেষ্টা করা তাঁহার পক্ষে সহজ ছিল। সরকারী ইংরেজ রাজপুরুষদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করিবার সময় তিনি নিজের জাতীয় পোষাক পরিতেন। অন্য সবসময়ে তিনি দেশী পরিচ্ছদ—ধুতি পিরাণ চাদর ব্যবহার করিতেন। তাহাতে কোন পারিপাট্য ছিল না, গলার বোতাম খোলাই থাকিত। শান্তিনিকেতনের কঙ্করাকীর্ণ পথে মাঠে অনেক সময় খালি পায়েই চলিতেন, কখন কখন চটিজুতা পায়ে থাকিত।

এই লেখাটার গোড়ায় তাঁহার সন্ন্যাসগ্রহণের কথা বলিয়াছি। তাঁহার হৃদয়-মন ভারতমুখী না হইলেও হয়ত তিনি বিষয়াসক্তিহীন মানুষই থাকিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষকে—বিশেষতঃ বাংলাদেশকে স্বদেশ বলিয়া বরণ করিবার পর তিনি ভারতীয় অর্থেই সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। কোন আয় বা সম্পত্তির উপর তাঁহার আসক্তি ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একবার এণ্ড্রুজের সমক্ষে পরিহাস করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার যদি কোন জিনিষ হারাবার দরকার থাকে, তাহলে সেটা এণ্ড্রুজকে দেবেন"। এণ্ড্রুজ তাহা শুনিয়া প্রতিবাদচ্ছলে হাসিয়া বলিলেন, "No,no, Gurudev you are very mischievous," কিন্তু বাস্তবিকই কোন জিনিষ আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল।

তিনি উত্তর-ভারতে, বিশেষতঃ বাংলাদেশেই জীবনের বহু বৎসর কাটাইয়াছিলেন। শেষের দিকে দক্ষিণ ভারতেও কিছুকাল কাটাইয়া তাহার সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপন করিতেছিলেন।

তিনি ভারতীয় বহু সমস্যা মানবিকতার দিক হইতেই আলোচনা করিয়া সেই দিক হইতেই তাহার সমাধান-চেষ্টা করিতেন, সাক্ষাৎভাবে রাজনৈতিক বিষয়ের সহিত সম্পর্ক রাখিতেন না—যদিও রাষ্ট্রনৈতিক জ্ঞান ও বিচক্ষণতা তাঁহার খুবই ছিল। কিন্তু তিনি যে ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতাই চাহিতেন, তাহার প্রমাণস্বরূপ গত ফেব্রুয়ারী মাসের মডার্ণ রিভিয়ুতে লিখিত তাঁহার একটি প্রবন্ধ হইতে (পৃষ্ঠা ১৫৬) নিম্নমুদ্রিত বাক্যগুলি উদ্ধৃত করিতেছি :—

Every year that now passes in India, without removal of the foreign yoke, is undoubtedly an evil. It is likely to undo any benefit that may have been derived before. This was my main thesis in a series of articles which I wrote in 1921, called "The Immediate Need of Independence," where I emphasised the word "immediate," and I hold fast to every word which I then wrote.

Nearly twenty years have passed since that date and hope deferred has made the heart sick. Things in India have deteriorated, as Prof. Seeley prophesied, and the evil is rapidly increasing. This agony of subjection is eating like iron into the soul, and the strain must be relieved atonce.

এরূপ মানুষকে অধিকাংশ সাধারণ ইংরেজ—বিশেষতঃ ভারতপ্রবাসী ইংরেজরা—ভালবাসিতে পারে না। লর্ড বিশপ মহোদয় যে প্রত্যহ তাঁহাকে রোগশয্যায় দেখিতে যাইতেন এবং গির্জায় তাঁহার শ্রাদ্ধিক উপাসনা করিয়া সমাধিস্থান পর্যন্ত পদব্রজে গিয়া সেখানে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করেন ইহা তাঁহার (লর্ড বিশপের) বন্ধুপ্রেম, ধার্মিকতা ও মহানুভবতার প্রমাণ। গির্জাতে ও সমাধিস্থানে অ-পুরোহিত ইংরেজ অতি অল্পজনই উপস্থিত ছিলেন; অধিকাংশই ভারতীয়।

স্বাধীন দেশের লোকদের ইহা একটি সৌভাগ্য ও উচ্চ অধিকার যে, তাঁহাদের হৃদয় অন্যদেশের লোকদের দুঃখেও সক্রিয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হইতে পারে। দীনবন্ধু এই সৌভাগ্য ও উচ্চ অধিকারের যথোচিত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাধারণতঃ ভারতীয় ইংরেজরা তাঁহাকে ভালবাসিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহার মত স্বদেশ-প্রেমিক বিরল। তিনি জানিতেন, স্বাধীন ভারতের সহিত স্বাধীন ব্রিটেনের মৈত্রীর চেয়ে ব্রিটেনের পক্ষে (এবং জগতের পক্ষেও) অধিকতর কল্যাণকর অবস্থা আর কিছু হইতে পারে না। এই নিমিত্ত উভয় দেশের স্বাধীনতার ভিত্তির উপর নির্মিত মৈত্রীসৌধের স্থপতি তিনি হইতে চাহিয়াছিলেন। সৌধ নির্মিত হয় নাই। কিন্তু যদি কখনও হয়, দীনবন্ধুর বিদেহী আত্মা আনন্দিত হইবেন।

যে সকল ইংরেজ তাঁহাকে ভালবাসিতেন না, তাঁহারা জানেন না বুঝেন না, দীনবন্ধু এণ্ডরুজের মত প্রতিনিধি পাওয়া একটা জাতির কত বড় সৌভাগ্য। তিনি জাতিতে জাতিতে মৈত্রীর, বিশ্বমৈত্রীর অন্যতম অগ্রদূত ছিলেন। তিনি ভারতীয়দের ও ভারতের সম্পর্কে সব কাজ এইরূপভাবে করিতেন যেন নিজ জাতির সব দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। কিন্তু আমরা তাহা প্রায়শ্চিত্ত মনে করিব না, তিনি আমাদিগকে মৈত্রী ও হিতকারিতার অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহাই মনে করিব।

তাঁহার স্নেহভাজন পরলোকগত শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের সহিত মিলিত হইয়া তিনি এখন নবজীবনের ও নববর্ষের উৎসব করুন।

প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭

ভারতবন্ধু সি, এফ, এণ্ডরুজ

শ্রীমতী চিন্ময়ী বসু

"সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।"

ভারত-বন্ধু, মানব-দরদী সি, এফ., এণ্ডরুজ তাঁর জীবন ও কর্মধারার মধ্য দিয়ে ভারতীয় কবির এই অমূল্য উক্তির যেন সার্থক রূপ দান করে গেছেন। মানবজাতির সেবাকেই তিনি তাঁর আরাধ্য দেবতা যীশুকে সেবা করার প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলে মনে করতেন। সেখানে ছিলনা কোনও দেশভেদের সীমারেখা। সেখানে না ছিল জাতিভেদ, না ছিল বর্ণ-বৈষম্য।

সি. এফ. এণ্ডরুজ জাতিতে ছিলেন ইংরেজ, ধর্মে ছিলেন খৃষ্টান পাদ্রি, শিক্ষালাভ করেছিলেন খাস ইংলণ্ডে। কিন্তু ভারতীয় ভাবধারা ও সংস্কৃতিকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর আরাধ্য দেবতা যীশুখৃষ্ট এবং ভারতের উপাস্য দেবতা শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম-বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাপুরুষদের মধ্যে কোনও পার্থক্য তিনি দেখতে পেতেন না। ভগবান যীশুর দয়া ও ক্ষমা, শ্রীকৃষ্ণের ধৈর্য ও নিষ্কাম কর্ম, বুদ্ধদেবের সত্য ও অহিংসা—সর্ব আদর্শের সক্রিয় রূপায়ণে আত্মনিয়োগ করেছিলেন চার্লস্, ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ। যৌবনেই সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেছিলেন তিনি। একনিষ্ঠ হয়ে খ্রীষ্টের উপাসনা করা এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে সম্পূর্ণরূপে আত্মোৎসর্গ করাই ছিল তাঁর জীবনের লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে যখন নিজ দেশ ছেড়ে বিদেশে যাবার জন্য তাঁর মন আকুল হয়ে উঠেছিল তখন স্বয়ং ভগবান যেন তাঁর সামনে বহু আকাঙ্খিত সেই সুযোগ এনে দিলেন। এণ্ডরুজের সামনে ভারতবর্ষে আসার সুযোগ উপস্থিত হল। দিল্লীর সেণ্ট ষ্টিফেন্স্ কলেজের অধ্যক্ষের পদ খালি হওয়ায় কেম্ব্রিজ ক্রিশ্চিয়ান মিশন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে এণ্ডরুজকে ভারতবর্ষে পাঠালেন, উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করার জন্য। তাঁকে ভারতে প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মাধ্যমে অধ্যাপনা এবং সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার। তখন তিনি রেভারেণ্ড উপাধি ভূষিত ছিলেন।

এণ্ডরুজের ভারত-প্রীতির উৎসের সন্ধান আমরা তাঁর ভারতবর্ষে আগমনের শুরুতেই পাই। তিনি দিল্লীতে এসে দেখলেন সুশীলকুমার রুদ্র নামে একজন অভিজ্ঞ ভারতীয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী শিক্ষক সেণ্ট ষ্টিফেন্স্ কলেজের উপাধ্যক্ষরূপে কাজ করছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে। অধ্যাপক রুদ্রকে অধ্যক্ষের পদে উন্নীত না করে তাঁকে অধ্যক্ষ করে পাঠান এণ্ডরুজের কাছে ন্যায়সঙ্গত মনে হয়নি। তিনি অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। তাঁরই অনমনীয় মনোভাবে কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছিলেন সুশীলকুমার রুদ্রকে অধ্যক্ষপদে নিয়োগ করতে। এণ্ডরুজ অধ্যক্ষ রুদ্রের অধীনে কাজ শুরু করলেন। তখনকার দিনের বৃটিশরাজত্বে এরূপ ব্যবস্থা ছিল স্বপ্নেরও অগোচর। কোনও ভারতীয় নেটিভের অধীনে ইংরেজ কাজ করবে!! কিন্তু সে অভাবনীয় ঘটনাও সম্ভব হয়েছিল এণ্ডরুজের দৃঢ়তা ও মহানুভবতার গুণে। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি অধ্যক্ষ রুদ্রের পারিবারিক বন্ধুতে পরিণত হলেন। অধ্যক্ষ রুদ্রের সান্নিধ্যে থেকে থেকে তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে ক্রমে পরিচিত হতে লাগলেন। তখনই তিনি প্রথম জানতে পারলেন বৃটিশ-শাসকদের শোষণমূলক শাসনের ফলে ভারতবাসীদের কিরূপ অবর্ণনীয় দুর্দশায় দিন কাটাতে হচ্ছিল। পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খল কী ভাবে

ভারতবর্ষের প্রতিটি ব্যক্তির জীবন আষ্টেপৃষ্টে বেঁধে রেখেছিল তাও তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতীয় নেতাদের মুক্তি-সংগ্রামের কথাও তিনি জানতে পারলেন। ক্রমে এই সব ব্যাপারে তিনি আগ্রহান্বিত হয়ে উঠলেন।

মূলতঃ এণ্ডরুজ রাজনীতিবিদ ছিলেন না বা রাজনীতির কোনও দ্বন্দ্বে অংশ গ্রহণ করারও তাঁর অভিপ্রায় ছিল না। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনের ফলে পরাধীন ভারতের জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা তাঁকে যারপর নাই ব্যথিত করেছিল। তিনি মনে করতেন ভারতবাসী মাত্রেরই স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জনের নৈতিক অধিকার আছে। কোনও বিদেশী শক্তি তার সেই পবিত্র অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। তিনি ভারতের জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের কোনও বিরূপ সমালোচনা কখনই সহ্য করতে পারতেন না। এ জাতীয় কোনও সমালোচনা হলেই তিনি তীব্রভাবে তার প্রতিবাদ করতেন এবং ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নেতাদের পক্ষ অবলম্বন করতেন। বহু ভারতীয় সংবাদ পত্রে তিনি নির্ভীকভাবে এ বিষয়ে প্রবন্ধাদি লিখতে শুরু করলেন। এই সময়েই তাঁর পরিচয় হল বিখ্যাত সাংবাদিক ও সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সহিত। রামানন্দবাবুর প্রতি এণ্ডরুজের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা ছিল। তিনি বলতেন "তাঁকে আমি আমার জ্যেষ্ঠ ভাই-এর মত মনে করি"।

ভারতবর্ষে আসার অল্পদিনের মধ্যেই এণ্ডরুজ লালা লাজপৎ রায়, গোপালকৃষ্ণ গোখলে, তেজবাহাদুর সপ্রু প্রভৃতি স্বনামধন্য জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামীদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কলকাতার অধিবেশনে যোগ দিয়েছিলেন এবং ভারতের স্বাধীনতার দাবিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেছিলেন। ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি এণ্ডরুজের এই সহানুভূতিশীল মনোভাব ক্রমে সেণ্ট ষ্টিফেন্‌স্ কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের উপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবিতে ছাত্ররা সোচ্চার হয়ে উঠলেন। ছাত্র-আন্দোলনের আশঙ্কায় সরকারের পক্ষ থেকে "রিস্‌লি সার্কুলার" নামক এক ইস্তাহার প্রচার করে কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কোনরূপ রাজনীতির আলোচনা নিষিদ্ধ করে সম্ভাব্য ছাত্র-আন্দোলন প্রতিরোধের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু সরকারের সে-চেষ্টা ব্যর্থ হল। ভারতের নিজস্ব ঐতিহ্যকে ভিত্তি করে পূর্ণ জাতীয়-জীবন গঠনে ছাত্রদের এণ্ডরুজ উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এতে অসন্তুষ্ট হয়ে সরকার কলেজের ছাত্রদের উপর, এমনকি এণ্ডরুজের উপরও গুপ্তচরদের কড়া পাহারা বসালেন। এদিকে ভারতের অধিবাসীরাও সকলে এণ্ডরুজকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। তাঁরা তাঁকে "সরকারের গুপ্তচর" বলে সন্দেহ করতেন। কিন্তু মহানুভব এণ্ডরুজ তাতে ক্ষুণ্ণ হননি কখনও। উপরন্তু তিনি মনে করতেন যে তৎকালীন অস্বাভাবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতবাসীদের পক্ষে ঐরূপ আচরণ করাই স্বাভাবিক ছিল। ভারতীয়দের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা ও প্রীতি ক্রমে দৃঢ়তর হতে লাগল।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত এণ্ডরুজের পরিচয় হয় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে উইলিয়াম রটেন্‌ষ্টাইনের লণ্ডনের বাড়ীতে। সেখানে আইরিশ কবি ডবল্যু, বি, ইয়েট্‌স কর্তৃক গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদের আবৃত্তি শুনে এণ্ডরুজ মুগ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তিনি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হলেন। উক্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন, "সেই সন্ধ্যা আমার জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন এনে দিয়েছিল"। রবীন্দ্রনাথও তাঁদের এই প্রথম সাক্ষাতের একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা লিখে গেছেন। তিনি লিখেছেন, "তখন আমি লণ্ডনে ছিলুম। কলাবিশারদ রটেন্‌ষ্টাইনের বাড়ীতে সেদিন ইংরেজ সাহিত্যিকদের ছিল নিমন্ত্রণ। কবি ইয়েট্‌স্ আমার গীতাঞ্জলির ইংরেজী অনুবাদ থেকে কয়েকটি অনুবাদ তাঁদের আবৃত্তি করে শুনিয়েছিলেন। শ্রোতাদের মধ্যে এক কোণে ছিলেন এণ্ডরুজ। পাঠ শেষ হলে আমি ফিরে যাচ্ছি আমার বাসায়। কাছেই ছিল সে-বাসা। হ্যামষ্টেড্ হীথের ঢালু মাঠ পেরিয়ে চলেছিলুম ধীরে ধীরে। সে রাত্রি

ছিল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। এণ্ডরুজ আমার সঙ্গ নিয়েছিলেন। নিস্তব্ধ রাত্রে তাঁর মন পূর্ণ ছিল গীতাঞ্জলির ভাবে। ঈশ্বর-প্রেমের পথে তাঁর মন এগিয়ে এসেছিল আমার প্রতি প্রেমে। এই মিলনের ধারা যে আমার জীবনের সঙ্গে এক হয়ে নানা গভীর আলাপে ও কর্ম্মের নানা সহযোগিতায় তাঁর জীবনের শেষ পর্ব্ব পর্যন্ত প্রসারিত হয়ে চলবে সেদিন তা মনেও করতে পারিনি"। রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে গেছেন যে এণ্ডরুজের সঙ্গে ছিল তাঁর আত্মিক সম্বন্ধ—যা ছিল দুর্লভ ও অযাচিত। এ সম্বন্ধের মধ্যে কোনও স্বার্থের যোগ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ একে বলতেন "ভগবানের অযাচিত আশীর্ব্বাদ"। রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও প্রেমে আকৃষ্ট হয়েই এণ্ডরুজ শান্তিনিকেতনকেও মন-প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন। শান্তিনিকেতনকে বানিয়েছিলেন তাঁর "আবাস"। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর "গুরুদেব"। শান্তিনিকেতনে অধ্যাপকরূপে কাজ করার সময় ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর সহৃদয় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তিনি ছাত্রদের খুবই স্নেহ করতেন এবং ছাত্ররাও তাঁকে অতিশয় ভক্তি করতেন ও ভালবাসতেন। তিনি ছাত্রদের সর্ব্বদা নির্ভীকভাবে স্বাধীন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ করতেন এবং সৎ পথ অবলম্বনে অনুপ্রাণিত করতেন। শান্তিনিকেতনের কাজে সহায়তা করার জন্য এণ্ডরুজ সদাসর্ব্বদা ব্যগ্র হয়ে থাকতেন। শান্তিনিকেতনের আর্থিক বিপর্যয়ে তিনি যে কোথা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে এনে দিতেন তা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও জানতে পারতেন না। শান্তিনিকেতনকে গড়ে তুলতে যে কয়জন মনীষী অবদান রেখে গেছেন এণ্ডরুজ তাঁদের অন্যতম। গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারায় তিনি নিজেকে ধন্য মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ করে তিনি লিখেছিলেন, "আমার সমগ্র জীবনে আমি এমন আর কোনও ব্যক্তির সাক্ষাৎ লাভ করি নি যিনি রবীন্দ্রনাথের মত বন্ধুত্বের কোমল স্পর্শে, জ্ঞানের আলোকে, এবং আন্তরিক স্নেহ-প্রীতিতে মানুষের জীবনে এমন পূর্ণতা দান করতে পারেন। তাঁর উপস্থিতিই মানুষকে সর্ব্বদা অনুপ্রাণিত করত। যে কোনও গঠনমূলক কাজে তাঁর সঙ্গে থেকে তাঁর সাহচর্য লাভ করা, সে যে কতবড় সৌভাগ্য তাহা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। বস্তুতপক্ষে, আমার জীবনে আমি এই পরম সৌভাগ্য পূর্ণরূপে লাভ করেছিলাম"।

ভারতবর্ষের বাইরেও এণ্ডরুজ তাঁর ভারত-প্রীতির নিদর্শন রেখে গেছেন প্রভূত পরিমাণে। শান্তিনিকেতনে যোগদান করার প্রাক্কালেই তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় ছুটে গিয়েছিলেন সেখানকার নিপীড়িত ভারতীয়দের সেবার কাজে যোগ দিতে। দক্ষিণ আফ্রিকায় তখন ভারতীয়দের উপর নানারূপ নির্যাতন ও উৎপীড়ন চলছিল। গান্ধীজী তখন সেখানে উপস্থিত হয়ে এই সব নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন। এণ্ডরুজ গিয়ে তাঁর পাশে দাঁড়ালেন তাঁর কাজে সহযোগিতা করার জন্য। তিনি ফিজিতেও গিয়েছিলেন। সেখানে তখন চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের অবস্থা আরও শোচনীয়। ফিজিতে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য উপনিবেশে উৎপীড়িত ভারতীয়দের কল্যাণসাধনের জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেছেন। এজন্য তাঁকে অনেক দুঃখকষ্ট ও অপমান সহ্য করতে হয়েছিল। দিনের পর দিন তিনি রেলগাড়ীতেই কাটিয়ে দিতেন। কোন কোন সময় এমনও হত যে তাঁর পকেটে খাবার কিনবার পয়সা পর্যন্ত থাকত না। পূর্ব আফ্রিকায় বর্ণ-বিদ্বেষী ইয়োরোপীয়রা একবার এমন বর্ণ-বৈষম্য মূলক ব্যবস্থা করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন যে তাতে সেখানে বসবাসকারী ভারতীয় এবং স্থানীয় আদিম অধিবাসীদের যারপর নাই ক্ষতি হত। এণ্ডরুজ সেখানে গিয়ে উহার তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তাতে সেখানকার ইংরেজ অধিবাসীরা তাঁর উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। এসময় দিবারাত্র রেলগাড়ীতেই ঘুরে ঘুরে এগার বার দিন তিনি কাটিয়ে দিয়েছিলেন। ক্রুদ্ধ ইংরেজরা সেই সময় তাঁকে গাড়ীতে নানাভাবে নির্যাতন ও অপমান করেছিলেন। কেহ কেহ গাড়ীতে উঠে তাঁর দাড়ি ধরে পর্যন্ত টেনে দিয়েছিলেন। কিন্তু এণ্ডরুজ তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি।

বর্ণ-বৈষম্যের উগ্র নিষ্পেষণের হাত থেকে

ভারতীয়দের রক্ষা করার জন্য এণ্ডরুজ বহুবার দক্ষিণ-আফ্রিকায় ও কেনিয়াতে গিয়েছিলেন। আফ্রিকার চিনিকল, চা কল, কয়লাখনি প্রভৃতিতে চুক্তিবদ্ধ দাস হিসাবে শ্রমিক নিয়োগ প্রথা বাতিল করার জন্য তিনি কঠোর সংগ্রাম করেছিলেন। এই প্রথার বিলোপসাধন ছিল ভারতীয়দের প্রতি এণ্ডরুজের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। ব্রিটিশ গিয়ানায় ভারতীয় শ্রমিকদের প্রতি অত্যাচার উৎপীড়ন যখন চরমে উঠে তখন তারা ভারতবর্ষে ফিরে আসে। কিন্তু ভারতবর্ষে এসেও তারা কোনও সুব্যবস্থা পায়নি। নিরাশ হয়ে তারা কলকাতার কাছে মেটিয়া-বুরুজে যারপর নাই শোচনীয় অবস্থায় মধ্যে দিন কাটাতে থাকে। তখনও এণ্ডরুজ গিয়ে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে-ছিলেন তাদের উদ্ধারের জন্য। তাদের সুব্যবস্থার জন্য তিনি অনবরত তৎকালীন বড়লাটের কাছে দরবার করেছিলেন।

ভারতের অভ্যন্তরেও এণ্ডরুজ দুর্দশাগ্রস্ত ভারত-বাসীদের কল্যাণের জন্য অবিরাম চেষ্টা করে গেছেন। যারা দুর্দশাগ্রস্ত, নির্যাতিত, অবহেলিত, দীনহীন তাদের সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়াতেন পরম বন্ধুর মত অকৃত্রিম সহায়রূপে। তাঁর এই সহৃদয়তার অগণিত স্বাক্ষর রেখে গেছেন তিনি দুর্গত, নিপীড়িত ভারতবাসীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। বিহারের চম্পারন জিলার প্রজারা যখন নীলকর সাহেবদের নানা অত্যাচারে উৎপীড়িত হয়ে চরম দুর্দশার মধ্যে দিন কাটাচ্ছিল তখন তিনি তাদের সহায়রূপে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ভূমিকম্প-বিধ্বস্ত বিহারের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের সাহায্যার্থে তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের উদ্ধারকার্যে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। বন্যা ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উড়িষ্যার দুর্গতি মোচনের স্থায়ী ব্যবস্থা করার চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। উত্তরবঙ্গের বিধ্বংসকারী বন্যা ও প্লাবনের সময়েও তিনি দুর্গতদের পাশে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন তাদের ত্রাণকার্যে সাহায্য করার জন্য। কোথাও দুর্ভিক্ষ, মহামারী, ভূমিকম্প ইত্যাদি বিপর্যয়ের কথা শুনলেই তিনি বিচলিত হয়ে পড়তেন এবং দুর্গতদের উদ্ধারকার্যে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হতেন। পূর্ব বাংলার কলেরা মহামারীর সময়ে তিনি সেখানে ছুটে গিয়েছিলেন রোগাক্রান্তদের সেবার কার্যে। মাদ্রাজের কল-শ্রমিকদের দুর্গতি মোচনে, কেরালার অস্পৃশ্যদের দুর্দশা দূরীকরণে এণ্ডরুজ অকাতরে চেষ্টা করেছিলেন। আসাম-বেঙ্গল রেলের ও আসামের কুলিদের ধর্মঘট ফলপ্রসূ হবেনা এই আশঙ্কায় তিনি তাদের ধর্মঘট সমর্থন করতেন না। কিন্তু তাঁর কথা না শুনে ধর্মঘট করার পর কুলিদের যখন শোচনীয় দুর্দশার মধ্যে পড়তে হয়েছিল তখন তাদের সেই দুর্দশা মোচনের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করতে এণ্ডরুজ দ্বিধা করেননি।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে যখন এণ্ডরুজ দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়েছিলেন তখনই গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই পরিচয়ই পরবর্তীকালে তাঁদের বন্ধুত্বের অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করেছিল। এণ্ডরুজই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গান্ধীজীর পরিচয় করে দিয়েছিলেন। গান্ধীজীর স্বাধীনতা আন্দোলন এবং আফ্রিকার বসবাসকারী ভারতীয়দের জন্য সত্যাগ্রহ আন্দোলনে এণ্ডরুজ ছিলেন অত্যুৎসাহী সমর্থক এবং সহায়ক। কর্মের নীতি বা পদ্ধতি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে অনেক সময়ে মতানৈক্য দেখা দিলেও মনোমালিন্য হয়নি কোন দিনই। মানুষের প্রতি উভয়ের প্রেম ছিল একই ধারায় প্রবাহিত। এণ্ডরুজ বলতেন, "গান্ধীর সঙ্গে মতানৈক্যে আমি দুঃখিত হইনা, কারণ ইহা আমাদের পরস্পরের প্রতি ভালবাসাকে গভীরতর করে"। গান্ধীজী ছিলেন এণ্ডরুজের অতি আপনার "মোহন"। মানুষের প্রতি গভীর প্রেম ছিল বলেই গান্ধীজীর মত এণ্ডরুজও মানুষের উপর কোনও অত্যাচার বা নিপীড়ন সহ্য করতে পারতেন না। অস্পৃশ্যতা এবং বর্ণ-বৈষম্যমূলক আচরণের কথা ভেবে তিনি বড়ই দুঃখবোধ করতেন। সমাজ থেকে এই সব কুপ্রথা দূর করার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধীর রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে যে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়েছিল তার পেছনেও এণ্ডরুজের অবদান কম নয়।

ভারতবর্ষের সহিত এণ্ডরুজ একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। পোশাক-পরিচ্ছদেও তিনি খাঁটি ভারতবাসীতে পরিণত হয়েছিলেন। তিনি ধুতি চাদর পরতেন। দিনের বেশীর ভাগ সময়েই খালি পায়ে থাকতেন। কোন কোন সময়ে চটি পায়ে দিতেন। তিনি তাঁর দেশীয় পোশাক পরতেন তখনই যখন তাঁর কোন সরকারী ইংরেজ পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রয়োজন হত। ভারতীয় প্রথাঅনুযায়ী তিনি গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেন এবং তাঁদের পদধূলি গ্রহণ করতেন। এই ব্যাপারে তিনি স্বদেশীয়দের সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা হলেই এণ্ডরুজ নতজানু হয়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে কপালে ছোঁয়াতেন। তাঁকে ব্যঙ্গোক্তি করে আফ্রিকার একটি দৈনিক সংবাদপত্র লিখেছিলেন," এই মহিমময় ভদ্রলোক নতজানু হয়ে গান্ধীর পদধূলি গ্রহণ করে প্রভূত শ্রদ্ধা সহকারে শিরে ধারণ করেন"। নির্ভীক এই সব ব্যঙ্গোক্তিকে গ্রাহ্য করতেন না। তিনি ছিলেন উদার ও সহৃদয়। স্বীয় ঔদার্য ও সহৃদয়তা দ্বারা তিনি ভারতের সকল সম্প্রদায়ের অগণিত লোকের বন্ধুত্ব লাভ করেছিলেন। তাঁর বন্ধুত্ব ছিল অকৃত্রিম। যে কোন ব্যক্তিই একবার এণ্ডরুজের সংস্পর্শে এলে তাঁর চরিত্রের প্রেমময় মাধুর্যে ও মহান উদারতায় মুগ্ধ না হয়ে যেতেন না। কোনরূপ ধর্মীয় গোঁড়ামী ছিলনা তাঁর স্বভাবে। তাঁর ঘনিষ্ঠ ভারতীয় বন্ধুদের মধ্যে খৃষ্টান ছিলেন হিন্দু ছিলেন। ছিলেন মুসলমান, বৌদ্ধ, জৈন। প্রেম বিতরণে ছিলেন তিনি মুক্ত-হৃদয়। কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুও তাঁর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করলেও তিনি তাঁর প্রতি কখনও বিমুখ হতেন না। তাঁর হৃদয় ছিল প্রেম ও করুনায় ভরা। যেখানে দুঃখ-কষ্ট ছিল সেখানেই এণ্ডরুজ উপস্থিত সাহায্য দানের নিঃস্বার্থ সংকল্প নিয়ে। ছোট-বড়, উচ্চ-ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ ছিল না তাঁর কাছে। যে ব্যক্তিই কোন কাজ নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হক না কেন তিনি তা নির্দ্বিধায় করে দেবার চেষ্টা করতেন। এজন্য দরকার হলে তিনি বড়লাটকে পর্যন্ত ধরতেন।

ভারতবাসীদের প্রতি এণ্ডরুজের যে ব্যবহার ছিল সেখানে কোথাও বিন্দুমাত্র ঔদ্ধত্য, দাম্ভিকতা, বা অবজ্ঞা, উপেক্ষা ছিলনা। অনুগ্রাহক হয়ে কখনও তিনি কোনও সেবার কাজ করেন নি। নিতান্ত আপনার জন্য বা সেবকরূপেই নিজেকে উপস্থিত করতেন। কখনও প্রভু-জাতির লোক বলে কর্তৃত্ব করার চেষ্টা পান নি। যে কোনও সৎকর্মে সহায়তা দানে তাঁর কোনও আলস্য কৃপণতা ছিলেনা। এই কাজে কখনও কখনও তিনি ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত ছুটে বেড়াতেন। দিন নেই রাত্র নেই শুধু কাজ করে যেতেন। খাওয়া-দাওয়া ও অনেক সময় তাঁর ভাগ্যে জুটতনা। এমনও বহু সময় হত যে শুধু চা আর সরবৎ খেয়েই দিন কাটিয়ে দিতেন। ইংরেজ হয়েও এণ্ডরুজ এইরূপে ভারতীয়দের দুঃখ কষ্ট দূর করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন। বৃটিশ-শাসিত পরাধীন ভারতের গ্লানিকে তিনি নিজ দেশের গ্লানি বলেই মনে করতেন। যুক্তরাজ্যের মত ভারতবর্ষেরও স্বাধীন হবার অধিকার আছে—একথা তিনি বহুবার প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। তার অভিমত ছিল যে বিদেশী শাসনের কঠিন নিষ্পেষণ থেকে মুক্ত না হলে ভারতীয়দের কল্যাণ নেই। অবিলম্বে তিনি ভারতের মুক্তি কামনা করতেন। এণ্ডরুজ সাক্ষাৎভাবে ভারতীয় রাজনীতির সহিত যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়েছিলেন। এ বিষয়ে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে "দি ইমিডিয়েট্ নীড অব্ ইনডিপেনডেন্স" নাম দিয়ে তিনি কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। এজন্য ভারতে বসবাসকারী ইংরেজরা তাঁকে সুনজরে দেখতেন না। এণ্ডরুজকে তাঁর স্বদেশের স্বার্থ-বিরোধী বলে মনে করতেন। কিন্তু তাঁর মত স্বদেশ প্রেমিক ছিল বিরল। তিনি মনে করতেন, স্বাধীন ভারতের সহিত স্বাধীন ব্রিটেনের মৈত্রীর চেয়ে ব্রিটেনের পক্ষে অধিকতর কল্যাণকর আর কিছু হতে পারে না।

এণ্ডরুজ ভারতবর্ষ বা ভারতবাসীদের জন্য যা কিছু করতেন তাই স্বজাতির দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্তের জন্য করেছেন বলে মনে করে করতেন। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে লাহোরের জালিয়ান-ওয়ালাবাগে যে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ডের তাণ্ডবলীলা চলেছিল তাহা ভারতের ব্রিটিশ-শাসনের ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করে

রেখেছে। সেই সময়ে পাঞ্জাবে যে অমানুষিক অত্যাচার করেছিলেন ব্রিটিশ শাসকরা তাতে এণ্ডরুজ অত্যধিক বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন। পাঞ্জাবের অধিবাসীরা সদাসর্বদা আতঙ্কগ্রস্ত। ভয়ে যেন তারা এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করতেও ভুলে গিয়েছিল। এই বর্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ সরকার প্রদত্ত 'নাইট' উপাধি বর্জন করেছিলেন। ভারতের জনগণের ক্ষুব্ধ মনে সান্ত্বনার প্রলেপ দেবার জন্য এই মর্মান্তিক ঘটনার কিছুদিন পরে ইহার কার্য-কারণের অনুসন্ধান-পর্ব শুরু হল। এণ্ডরুজের স্বতন্ত্রভাবে পাঞ্জাবের গ্রামে গ্রামে ঘুরে অনুসন্ধান শুরু করলেন কিন্তু গ্রামের অধিবাসীরা ভয়ে তাঁকে কিছু বলত না। বহু পীড়াপীড়ির পর একজন শিখ মুখে কিছু না বলে তাঁর অনাবৃত দেহ-খানি দেখালেন সেই নির্মম অত্যাচারের জাজ্বল্যমান চিত্র হিসাবে এণ্ডরুজ তাঁর দেহের সর্বত্র নিষ্ঠুর আঘাতের চিহ্ন দেখে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়ে তাঁকে জোড়হাতে বললেন,"আমি সমগ্র ইংরেজাতির হয়ে প্রার্থনা করছি তুমি ক্ষমা কর, তুমি সমগ্র ইংরেজ জাতিকে ক্ষমা কর"।

এণ্ডরুজ ছিলেন প্রেম ও বিনয়ের প্রতিমূর্তি। ভারতবর্ষের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা তাঁকে পরম বৈষ্ণব বলতে পারি। কারণ প্রকৃত বৈষ্ণবের যে সকল বৈশিষ্ট্য থাকে এণ্ডরুজের মধ্যে তার সবই পূর্ণরূপে বর্তমান ছিল আমরা দেখতে পাই। ভারতের সুমহান ঐতিহ্য ও মহত্বের প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। ভারতের প্রাচীন সাধক ও মধ্যযুগের ভক্তদের কথা তিনি গভীর শ্রদ্ধা সহকারে পাঠ করেছিলেন এবং তাঁদের আদর্শ ও ধ্যানে নিজেকে সর্বদা ব্যাপৃত রাখার চেষ্টা করতেন। ভারতীয় আদর্শে দরিদ্র নারায়ণ-সেবাকেই তাঁর ভগবৎ-সেবার প্রকৃষ্ট পন্থা বলে গ্রহণ করেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে কত লোকের সেবা ও উপকার করে গেছেন তার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। প্রয়োজন হলে তিনি তাঁর শেষ কপর্দক পর্যন্ত দান করতে ইতস্তত: করতেন না। এ বিষয়ে একটি ঘটনা উল্লেখ না করে পারছি না। একবার এণ্ডরুজের এক বন্ধু তাঁর সিমলাতে গিয়ে ফিরে আসবার খরচ বাবদ তাঁকে দেড়শত টাকা দিয়েছিলেন। ষ্টেশনে যাবার পথে এণ্ডরুজের সঙ্গে কানাডা প্রত্যাগত এক ভারতীয় ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ হল। তিনি এণ্ডরুজকে জানালেন যে কানাডা থেকে এসে তিনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আশ্রয়হীনভাবে ষ্টেশনেই উপবাসে দিন কাটাচ্ছেন এবং তিনি কপর্দকশূন্য। এই কথা শোনামাত্র এণ্ডরুজ তাঁর সেই বন্ধুর দেওয়া দেড়শত টাকার সবটাই উক্ত ভদ্রলোককে দিয়ে দিলেন এবং বলেছিলেন যে তখনকার মত অধিক আর কিছু দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তবে পরে লিখে জানালে তিনি আরও কিছু করার চেষ্টা করবেন। টাকার অভাবে এণ্ডরুজের সেদিন আর সিমলা যাওয়া হয়নি।

ভারতবর্ষের প্রতি ছিল এণ্ডরুজের একনিষ্ঠ প্রেম। ভারতবাসীদের তিনি একান্ত আত্মীয় বলে গ্রহণ করে গিয়েছিলেন। অসংকোচে তিনি সকলের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হতে পারতেন। যে সময়ে এণ্ডরুজ ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখনকার রাজনৈতিক উত্তাপ-আবহাওয়ায় এবং রাষ্ট্রীয় উত্তেজনায় 'ভারতবাসীরা ইংরেজজাতির উপর স্বভাবত:ই যারপর নাই রুষ্ট ছিল। সেমত অবস্থায় একজন ইংরেজের পক্ষে ভারতবর্ষে এসে ভারতীয়দের মন জয় করা অভাবনীয় ছিল। কিন্তু এণ্ডরুজের ক্ষমা, তিতিক্ষা, এবং মহানুভবতার গুণে তা সম্ভব হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ একটি বক্তব্যে বলেছিলেন," "কঠিন বিরুদ্ধতার মধ্য দিয়েই আসে যুগবিধাতার প্রেরণা। সেই প্রেরণাই মূর্তি নিয়েছিল এণ্ডরুজের মধ্যে। আমাদের সঙ্গে ইংরেজের যে সম্বন্ধ সে তাদের স্বাজাত্য ও সাম্রাজ্যের অতি কঠিন ও জটিল বন্ধনের। সেই জালের কৃত্রিমতার ভিতর দিয়ে মানুষ-ইংরেজ আপন ঔদার্য নিয়ে আমাদের নিকট আসতে পদে পদে বাধা পায়, আমাদের সঙ্গে অহংকৃত দূরত্ব রক্ষা করা। তাদের সাম্রাজ্যরক্ষার আড়ম্বরের আনুষঙ্গিকরূপে উদ্ভূত হয়ে রয়েছে।... সেই ইংরেজের মধ্য থেকে এণ্ডরুজ বহন করে এনেছিলেন ইংরেজের মনুষ্যত্ব। তিনি আমাদের সুখে দুঃখে উৎসবে ব্যসনে বাস করতে এলেন এই পরাজয়-লাঞ্ছিত জাতির

অন্তরঙ্গরূপে। এর মধ্যে লেশমাত্র ছিলনা উচ্চমঞ্চ থেকে অভাগ্যদের অনুগ্রহ করার আত্মশ্লাঘা সম্ভোগের। এর থেকে অনুভব করেছি তাঁর স্বাভাবিক অতি দুর্লভ সর্বমানবিকতা"।

রোগ-শয্যায় শায়িত অবস্থায়ও এণ্ডরুজের ধ্যান-জ্ঞান ছিল ভারতের মঙ্গল এবং ভারতবাসীদের কল্যাণ-সাধন- ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রোগাক্রান্ত অবস্থায়ও দিল্লী হাসপাতালের রোগ শয্যা থেকে তৎকালীন ভাইসরয়কে তিনি চিঠি লিখেছিলেন সরকারী নীতিসমূহের সমালোচনা করে। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই ভাবনায় ব্যাকুল ছিলেন যে ভারতীয়দের কাঁধ থেকে পরাধীনতার যোয়াল কতদিনে নামবে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য এণ্ডরুজের মন যতটা উদ্বেগাকুল হয়েছিল ততটা আকুলতা এদেশীয় অনেক লোকেরই ছিল কিনা সন্দেহ। ভারতবর্ষের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব ও আত্মিক যোগকে তিনি তাঁর জীবনের পরম সম্পদ বিধাতার দানস্বরূপ মনে করতেন। তিনি তাঁর শেষবাণীতে বলে গেছেন, "স্নেহশীল বন্ধুলাভ সকল দানের শ্রেষ্ঠ এই দান এই জীবনে আমি ভগবানের কাছে পেয়েছি। যখন আমি আমার জীবন তাঁহারই হাতে সমর্পণ করছি, সেই মুহূর্তে ·····সেই শ্রেষ্ঠ দানের কথা আবার স্বীকার করব—ভারতবর্ষে এবং অন্যান্য দেশে ভগবান আমায় প্রকৃত বন্ধু মিলিয়েছেন।"

আজ ভারতবন্ধু দীনবন্ধু চার্লস্ ফ্রিয়ার এণ্ডরুজের জন্মশত-বার্ষিকীতে তাঁর 'গুরুদেব' কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একটি প্রশস্তি উদ্ধৃত করে আমরাও তাঁকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা ও নমস্কার জানাই—

"প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধারা
হে বন্ধু এসেছ তুমি, করি নমস্কার।
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার
হে বন্ধু গ্রহণ কর, করি নমস্কার।
খুলেছে তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার
হে বন্ধু প্রবেশ কর, করি নমস্কার।
তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
হে বন্ধু, চরণে তাঁর করি নমস্কার।"

ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি॥ মূল রচনা—শ্রীঅরবিন্দ। অনুবাদ—শ্রীসুরেন্দ্র নাথ বসু। প্রকাশক—শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি—পণ্ডিচেরী—২। মূল্য ১৪্ টাকা। (প্রাপ্তিস্থান--শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির, ১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট—কলি—১২)

আলোচ্য গ্রন্থটি শ্রীঅরবিন্দের-The Foundation of Indian Culture নামক পুস্তকের বঙ্গানুবাদ। অনুবাদ করেছেন, দৌলতপুর ব্রজলাল হিন্দু কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বসু। ইতোপূর্বে শ্রীযুক্ত বসু-মহাশয় শ্রীঅরবিন্দের মহানগ্রন্থ—The Life Divine এবং Synthesis of Yoga (1st Vol) বাঙলায় অনুবাদ করে বাঙালী পাঠকসমাজের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। সে-অনুবাদ সুধী ও বিদগ্ধজনের প্রশংসাও অর্জন করেছে।

শ্রীঅরবিন্দের সাহিত্যকর্মের অধিকাংশই ইংরাজীতে রচিত। সে-ইংরাজী ভাষাও নিতান্ত দুরূহ। ইংরাজী-জানা পাঠকদের পক্ষেও সেসব রচনার মূলভাব ও বক্তব্য

উপলব্ধি করা একান্তই আয়াসসাধ্য। দুরূহ বলে শ্রীঅরবিন্দকে জানবার বা বোঝবার চেষ্টা বঙালী বিদগ্ধ সমাজেও খুববেশী হয়েছে বলে মনে হয়না। সুতরাং বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করে শ্রীঅরবিন্দের সুদীর্ঘ তপস্যায় উপলব্ধ সত্য এবং সুগভীর মনীষায় অর্জিত জ্ঞানরাজি-সমন্বিত তাঁর বিশাল ও সুমহান সাহিত্যকর্মকে যদি সাধারণ বাঙালীপাঠকের কাছে উপস্থাপন করা যায় তাহলে বাঙালীমনের এবং শ্রীঅরবিন্দের চিন্তাচেতনার মধ্যে যে ব্যবধান রচিত হয়েছে তা অপসারিত হয়ে এমন একটা গূঢ় ও আন্তরিক সম্বন্ধ গড়ে উঠবে যার ফলে ভারতবোধ ও ভারত-ভাবনার হারিয়ে-যাওয়া মূল সূত্রটি উদ্ধার করে আধুনিক জড়বাদী ধ্যান-ধারনায় আচ্ছন্ন ও অপহৃতবুদ্ধি ভারতবাসীকে বাঙালী আবার নূতন পথের সন্ধান দিতে পারবে, যে-পথ আত্মিক ঐক্যের ও সংস্কৃতিক সুসঙ্গতির। সুতরাং শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে বাঙালীমনকে পরিচিত করে দেওয়ার এই প্রয়াস অবশ্যই প্রশংসার্হ এবং শ্রদ্ধেয়। শ্রীঅরবিন্দের জন্ম শত-বর্ষকে (১৫ই আগষ্ট ১৯৭২) উপলক্ষ করে এই প্রয়াসে ব্রতী হয়েছেন শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি। এই উপলক্ষে প্রকাশিতব্য শ্রীঅরবিন্দ সাহিত্য সংগ্রহের প্রথম দশখণ্ডের মধ্যে আলোচ্য গ্রন্থটি ১ম খণ্ড হিসাবে প্রকাশিত।

১৫ই ডিসেম্বর ১৯১৮ থেকে ১৫ই জানুয়ারী ১৯২১ এই সুদীর্ঘ দুই বৎসর ধরে 'আর্য্য' পত্রিকায় বিভিন্ন শিরোনামে প্রকাশিত শ্রীঅরবিন্দের নিবন্ধরাজি একত্র গ্রথিত করে The foundation fo Indian Culture গ্রন্থটি প্রকাশ করা হয়। উক্ত প্রবন্ধ গুলির রচনার পিছনে নাতিতুচ্ছ একটি ইতিহাস আছে। অনূদিত গ্রন্থেও সে ইতিহাস প্রকাশকের নিবেদনে' বিবৃত হয়েছে। প্রয়োজন বোধে সংক্ষেপে সে-ইতিহাস এখানে উদ্ধৃত হল।

মিঃ উইলিয়াম আর্চার নামক একজন সাংবাদিক ও সাহিত্যিক India and the Future" নামে একখানা গ্রন্থে সংস্কৃতি ও সভ্যতার সকলক্ষেত্রে ভারতীয়রা যে কত বর্বর অবস্থায় ছিল ও আছে, তাই বিবৃত করেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি তন্ত্রশাস্ত্রে পণ্ডিত ও প্রখ্যাত মনীষী স্যর জন্ উডরফ Is India Cvilised নামক গ্রন্থে মিঃ আর্চারের যুক্তিকে খণ্ডন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। এই দুই গ্রন্থের সমালোচনা করতে গিয়েই শ্রীঅরবিন্দ কয়েকটি নিবন্ধ রচনা ক'রে ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিত্তিমূলে যে সত্য নিহিত আছে তা-ই উদ্‌ঘাটন করেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি মোট সাতাশটি অধ্যায়ে বিভক্ত হলেও একাধিক অধ্যায়ে এক একটি বিষয় আলোচিত হয়েছে। মূল বিষয় হল তিনটি: (১) ভারত কি সভ্য? (মোট তিনটি অধ্যায়ে বিভক্ত) (২) ভারতীয় সংস্কৃতির এক যুক্তিবাদী সমালোচক—(মোট ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত)। (৩) ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন (মোটআঠারোটি অধ্যায়ে বিভক্ত)।

ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা সমস্ত রচনা গুলির মধ্যে নিবিড় ভাবে পরিব্যপ্ত হয়ে থাকলেও যে বিচার বিশ্লেষণের সাহায্যে সংস্কৃতির মূল্যায়ন তিনি করেছেন,—ঐ অকুণ্ঠও আন্তরিক শ্রদ্ধাবোধ কিন্তু সে বিচার বিশ্লেষণে তাঁকে এতটুকু প্রভাবিত করতে পারেনি। তাই সমগ্র রচনায় কোথাও প্রকাশ পায়নি এতটুকু গোঁড়ামি আধুনিক ভাষায় যাকে বলাযেতে পারে প্রতিক্রিয়াশীলতা কিংবা puritanism এবং বিচারও কোথাও হ'য়ে ওঠেনি একদেশদর্শী কিংবা অনুদার।

ভারতীয় সভ্যতার বৈশিষ্ট সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে ভারত কি সভ্য? এই নিবন্ধে শ্রীঅরবিন্দ জীবনে ভারত-ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব বিস্তারে ইউরোপীয়দের আগ্রহ যে কত গভীর এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত তা বিশদ-ভাবে বর্ণনা করে বলেন যে, ইউরোপ ও এশিয়ার মধ্যে সংস্কৃতিগত যে বিরোধ আছে তাকে অস্বীকার করা যায়না-এবং এই বিরোধের উপর ভিত্তি করেই ইউরোপীয়-পণ্ডিতগন ভারতবর্ষের উপর মাঝেমাঝে তাদের আক্রমণাত্মক অস্ত্র নিক্ষেপ করেন। যদিও ভারত সে-আক্রমণের প্রভাব থেকে নিজকে রক্ষা করার জন্যে সচেষ্ট, তবুও সে-চেষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই অপ্রচুর। তাই তিনি মিঃ আর্চারের মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রত্যাঘাত না করে মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনে যে মহান সত্য

সত্তত ম্রিয়মান তাকেই তুলে ধরে বললেন,-'আধ্যাত্মিকতা ভারতের একচেটিয়া সম্পত্তি নহে ;......আধ্যাত্মিকতা মানব-প্রকৃতির একটি অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু তফাৎ এই যে, কোথাও আধ্যাত্মিকতাকে বাহ্য ও আন্তর এই উভয় জীবনের চালক ও প্রধান নিয়ামকশক্তি করিয়া তোলা হয়, কোথাও বা দমিত রাখা হয়......তাহাকে বৃত্তিসমূহের রাজা বলিয়া মানা হয় না।'

... ...

'অতএব ভারত কি সত্য ইহা আর-প্রশ্ন নহে, প্রশ্ন এই যে, যে-প্রেরণা ভারতীয় সভ্যতাকে গড়িয়া তুলিয়াছে অথবা যে, প্রেরণা প্রাচীন ইউরোপীয় যুক্তিবাদ ও নব্য ইউরোপের জড়বাদকে সৃষ্টি করিয়াছে ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি মানবজাতিকে পরিচালিত করিবে ?'

এই প্রশ্নটি আনুপূর্বিক বিচার করে ইউরোপ এবং ভারতের সম্ভাব্য উত্তর কি হতে পারে তা আলোচনা করে শ্রীঅরবিন্দ বললেন যে, বাহ্যশক্তিরাজির দ্বারা ইউরোপীয় চিন্তাচেতনা গঠিত কিন্তু ভারতীয় ধ্যান-ধারণার ভিত্তিভূমি অধ্যাত্মসত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই উক্ত দার্শনিক প্রশ্নের বিচারে উভয়ের অভিমত পরস্পরবিরোধী হতে বাধ্য। সুতরাং পরস্পরবিরোধী মতামতের উপর নির্ভর না করে যুক্তি-বুদ্ধি দিয়ে সমগ্র প্রশ্নটি বিশদভাবে তিনি আলোচনা করেছেন—'ভারতীয় সংস্কৃতির এক যুক্তিবাদী সমালোচক" এই-শিরোনামের অন্তর্গত মোট ছয়টি অধ্যায়ে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ বলে থাকেন যে ভারতীয় সভ্যতা জীবনের কোনও মূল্য দেয়না, জাগতিক বিষয় ও কার্য থেকে বিরত থাকারই নির্দেশ দেয়। পার্থিব জীবনকে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে করে। যে তত্ত্বের উপর নির্ভর করে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের এইসব মতবাদ গড়ে উঠেছে তা হল ভারতীয় চিন্তাধারার মধ্যে বৌদ্ধগণের শূন্যবাদ ও শঙ্করের মায়াবাদের তত্ত্ব। ইউরোপীয়গণ আপন অভিমতকে যুক্তিগ্রাহ্য করার উদ্দেশ্যেই উক্ত মতবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। শিল্পে, সাহিত্যে, গণিতে রসায়নে চিকিৎসাশাস্ত্রে, শল্য-বিদ্যায় এবং অনুরূপ অনেক জাগতিক বিষয়ে ভারতের কৃতিত্ব যে কত মহান ছিল তার হিসাব নেবার প্রয়োজন মনে করেন না। তাই শ্রীঅরবিন্দ 'ভারতীয় সংস্কৃতির সমর্থন "শীর্ষক প্রবন্ধ নিচয়ের মধ্যে ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতা, ভারতীয় শিক্ষা, ভারতীয় সাহিত্য ও ভারতের রাষ্ট্রনীতি এই চারিটি বিষয় সম্বন্ধে মোট আঠারোটি অধ্যায়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন।

ভারতীয় সভ্যতাকে সঠিকভাবে বুঝতে গেলে তার কেন্দ্রগত যে-ভাবধারা তাকে পরিচালনা করে সর্বাগ্রে তাকে ভাল করে বুঝতে হবে। ভারতীয় সস্কৃতি আত্মাকে সত্তার সত্য বলে স্বীকার করে। আর জীবনকে অন্তরাত্মার উন্নতি ও পরিণতি হিসাবে মেনে নেয়। কেন্দ্রগত এই ভাবধারার উপর ভিত্তি করেই ভারতীয় শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প ও রাষ্ট্রনীতি গড়ে উঠেছে।

পশ্চিমী পণ্ডিতগণ ভারতীয় শাসনব্যবস্থা যে কত দুর্বল এবং নিম্নস্তরের ছিল সেই কথা উল্লেখ করে প্রায়শঃই বলে থাকেন—যে ভারত প্রায় এক হাজার বৎসর বর্বর বৈদেশিক আক্রমণ দ্বারা প্রপীড়িত হয়েছে, এবং প্রায় আর একহাজার বৎসর সে ধারাবাহিকভাবে বৈদেশিক প্রভুগণের দাসত্ব স্বীকার করছে।

ভারতের শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে পশ্চিমের এই অভিযোগের উত্তরে শ্রীঅরবিন্দ ভারতভাবনার মূল তত্ত্বটির কথা পুনরায় উল্লেখ করে বলেন যে, সামরিক শক্তির সাহায্যে অন্য রাজ্য জয় করা এবং আপন ভৌগোলিক সীমা প্রসারিত করা কিংবা লুণ্ঠনের ক্ষমতা প্রয়োগ করে অন্য দেশকে নিজদেশের অন্তর্বর্তী করে নেওয়া এবং তাকে শাসন ও শোষণ করাই যদি কোনও জাতির মহত্ত্ব ও মহান সংস্কৃতির নিদর্শন হয়, তাহলে অবশ্যই বলতে হয় ভারত সে-বিষয়ে সর্বনিম্নস্থান পাবার যোগ্য। ভারত নিজকে প্রসারিত করতে চেয়েছে যুদ্ধের মাধ্যমে নয়, সংস্কৃতির প্রসারের মাধ্যমে। কেননা ভারত বিশ্বাস করে আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যই একমাত্র ঐক্য বা স্থায়ী হতে পারে।

এইভাবে এই বিরাট গ্রন্থে (মোট ৪৭০ পৃষ্ঠা) শ্রীঅরবিন্দ ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা সম্বন্ধে বিশদ ও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। সাংস্কৃতিক সংকট-মোচনের উদ্দেশ্যে প্রসঙ্গতঃ যে পথের তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, তাঁর সেই অভিমত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত নারায়ণ পত্রিকায় বিশেষভাবে সমালোচিত হয়। সেই সমালোচনার উত্তরে তিনি "ভারতীয় সংস্কৃতি এবং বহিঃপ্রভাব "শীর্ষক যে নিবন্ধটি রচনা করেন তাও এই গ্রন্থে পরিশিষ্ট হিসাবে গ্রথিত হয়েছে। এই প্রবন্ধটির মধ্যেও পাঠক বহু তথ্যের ও তত্ত্বের সন্ধান পাবেন। গ্রন্থটি ভারতীয় ভাণ্ডারে তো বটেই বিশ্বসাহিত্যের ভাণ্ডারেও একটি বিশেষ মূল্যবান সম্পদ।

অনুবাদ কর্ম সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করবার আগে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রীযুক্ত বসুমহাশয় ১৯৪৭-৪৮ সালে কলিকাতায় শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দিরে এই গ্রন্থটির উপর কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। সুতরাং গ্রন্থটির বিষয়বস্তু তাঁর সম্পূর্ণ অধিগত ছিল। এবং সেইজন্য অনুবাদ কর্মটি তাঁর কাছে দুরূহ ছিলনা।

শ্রীঅরবিন্দকে অনুবাদ করা নানা কারণে বিশেষ কঠিন এবং আয়াস সাধ্য। কিন্তু ইতোপূর্বে 'The Life Divine ও Synthesis of Yoga প্রভৃতি কঠিনতর গ্রন্থের সার্থক অনুবাদ করে শ্রীযুক্ত বসুমহাশয় সে দুরূহতা কাটিয়ে উঠেছেন। অনুবাদ করতে গিয়ে যে-সাধু ভাষায় তিনি অনুসরণ করেছেন মূলগ্রন্থে বিধৃতভাব প্রকাশে সেই ভাষাই বাহন হিসাবে আদর্শ এবং গ্রহণীয়। শ্রীঅরবিন্দের রচনা-শৈলীর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট হল দীর্ঘ বাক্যের মাধ্যমে, ধ্রুপদী বিস্তারের সাহায্যে অন্তঃস্থভাবকে বিশ্লেষিত ও ব্যাখ্যাত করা; অনুবাদক শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের সেই বৈশিষ্ট যথাসম্ভব রক্ষা করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ছোট ছোট বাক্য রচনা করে ভাবটি প্রকাশ করলে বোঝাবার দিক থেকে হয়তো তা আরও সহজ হত কিন্তু সে কাজে সবসময় আপন মানসিকতা আরোপিত হবার অবকাশ থাকত তাই অনুবাদকে যথাসম্ভব বিশ্বস্ত (faithful) করবার চেষ্টা করেছেন অনুবাদক। শ্রীঅরবিন্দের রচনার আর একটি বৈশিষ্ট হল অনুচ্ছেদ বিভাজন। মূলরচনার ভাবব্যঞ্জনা প্রকাশ করতে গিয়ে অনুবাদক যদি স্বাধীনতার সুযোগ গ্রহণ করতেন তাহলে মূলরচয়িতার ঐ বৈশিষ্ট হয়ত ক্ষুণ্ণ হত। তাই তিনি সে-চেষ্টাও করেননি। তা না করেও অনুবাদ-কর্মকে মৌলরচনার পার্য্যায়ে উন্নীত করতে তিনি সক্ষম হয়েছেন। এবং এইখানেই অনুবাদ সার্থক হয়েছে।

মিঃ আর্চার রচিত গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়টি যে কত অসার এবং ভ্রান্তিমূলক তাই প্রমাণ করতে গিয়ে এবং ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার মূলে যে সত্য নিহিত তাই উদ্‌ঘাটন করবার উদ্দেশ্যে শ্রীঅরবিন্দ আলোচিত নিবন্ধগুলি রচনা করেন। কিন্তু রচনাগুলির মধ্যে মিঃ আর্চারের বিরুদ্ধে কোথাও এতটুকু ক্ষোভ বা বিদ্বেষ প্রকাশ পায়নি। শ্রীঅরবিন্দের মানসিকতায় তা সম্ভবও ছিলনা। স্থানে স্থানে বিদ্রূপাত্মক যেসব মন্তব্য তিনি করেছেন তাও এমন সাহিত্য-রস-সমৃদ্ধ হ'য়েছে যার তুলনা প্রবন্ধসাহিত্যে বিরল। অনুবাদকও এই ভাবটি যথাযথ বজায় রাখবার চেষ্টা করেছেন। সুরুতেই যে উচ্চমর্দার সুর বাঁধা হয়েছে আগা গোড়া সেই সুর সত্যিই রক্ষিত। অনুবাদেও এই ব্যঞ্জনা কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয়েছে সরস্বতী প্রেসে। মুদ্রণ ব্যাপারে যাদের খ্যাতি সুবিদিত। প্রচ্ছদ যেমন রুচিশীল, বাঁধাইও তেমনি মজবুত।

বাঙলার সুধীসমাজে গ্রন্থখানি নিশ্চয়ই সমাদর লাভ করবে।

মূলগ্রন্থখানি ভারতের অনুদিত গ্রন্থখানি বাঙলা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হিউম্যানিটিজ শাখায় স্নাতক বিভাগে পাঠ্য হিসাবে অনুমোদন করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।

সমর বসু
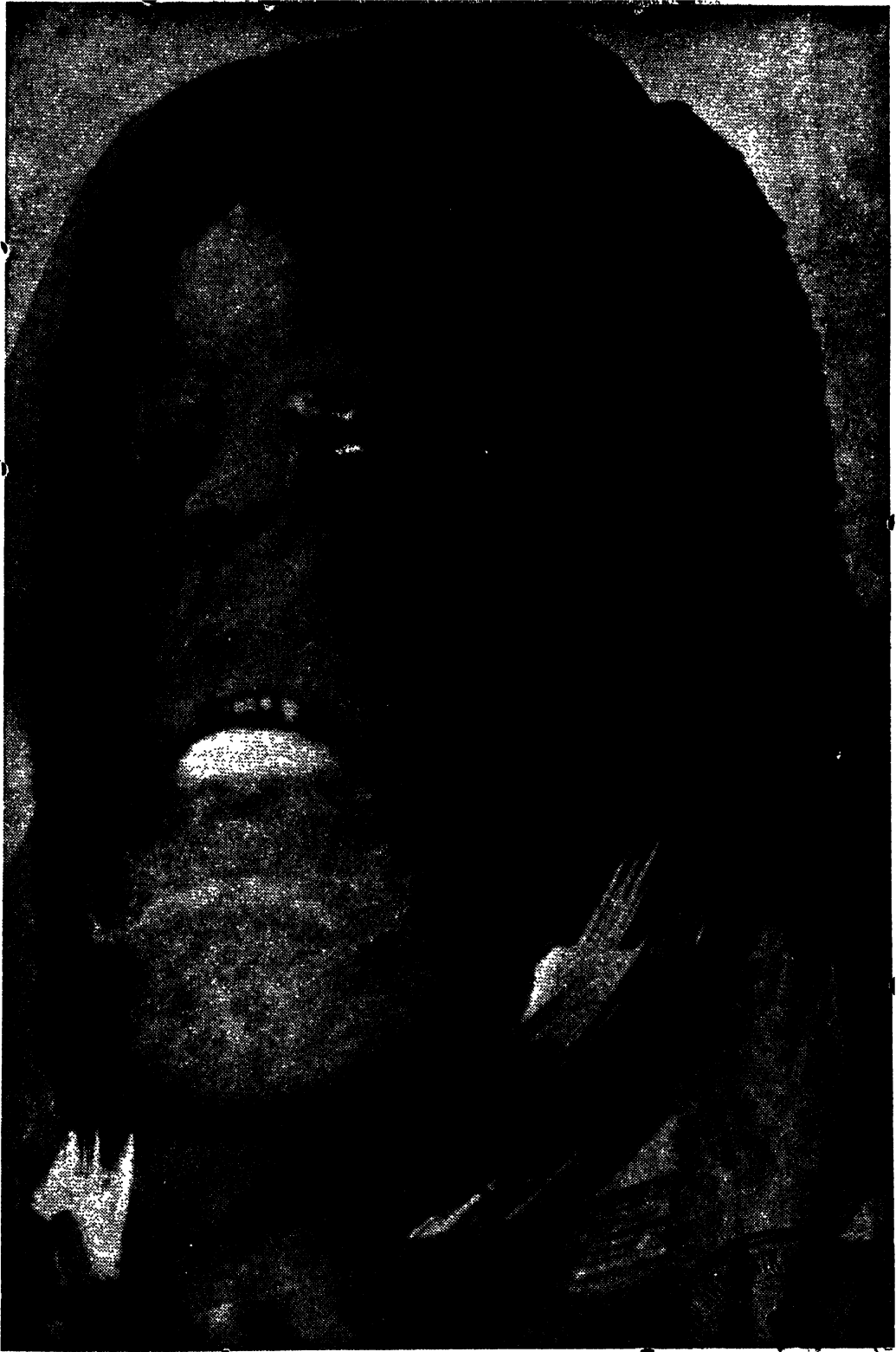
হেড ষ্টাডি

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৯শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

ফাল্গুন, ১৩৭৬

৫ম সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

অযোগ্য ও অক্ষমের ধর্ম্ম

দুর্ব্বলের শক্তির অভিনয় সর্ব্বদাই বিকৃতরূপ ধারণ করে। যাহার অন্তরে পাপস্পৃহা সদাজাগ্রত সে যদি নীতিবাদের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় তাহা হইলে তাহার নীতিবাদও বিকৃত আকারে ব্যক্ত হইয়া মিথ্যাকে সত্য, অন্যায়কে ন্যায় ও শোষণকে সেবা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করে। চুরি, ডাকাতি, দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব সেই সকল পরিবেশেই অধিক দেখা যায় যেখানে আত্ম প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রবল কিন্তু আত্মমর্য্যাদা বা আত্মগৌরবের কোন বাস্তব ভিত্তি নাই। অক্ষম নিজেকে উচ্চস্তরে উঠাইবার চেষ্টা করিলে সদাসর্ব্বদাই অন্যায়ের আশ্রয় গ্রহণ করে, কারণ ন্যায়তঃ তাহার পক্ষে উচ্চ আসনে আরোহণ করা অসম্ভব হয়। এই সকল কারণে দেখা যায় যে দুর্ব্বল ও অক্ষম প্রায়ই দল পাকাইয়া অন্যায়ভাবে সেই সকল অধিকার আহরণ করিবার চেষ্টা করিতেছে যে অধিকার তাহার প্রকৃতিদত্ত নহে ও যাহা সে ঘোর পরিশ্রমে, সাধনায় ও চেষ্টায় উপার্জ্জন করিয়া পাইতে ইচ্ছুক নহে। দুর্ব্বল ও অক্ষম সর্ব্বদাই সেই সকল অধিকার ও সম্পদ লাভ করিতে চাহে যেগুলি তাহার প্রাপ্য নহে অথবা যেগুলি সে উপার্জিতভাবে পাইবে না বলিয়া সে মনে মনে বুঝিতে পারে। এই কারণে অযোগ্য ও অক্ষম মানুষ উপার্জ্জন না করিয়া পরের সম্পত্তি চুরি করিয়া পাইবার চেষ্টা করে। সামনাসামনি না লড়িয়া অন্ধকারে ছুরি মারিয়া যুদ্ধজয় করিবার চেষ্টা

করে। দলবদ্ধ ভাবে লুঠপাট করিতে যায় এবং সুবিধা দেখিলে পঞ্চাশজন একত্র হইয়া এক বা অল্পসংখ্যক বিরুদ্ধবাদীকে দমন করিবার চেষ্টা করে। দলাদলি করার অভ্যাস দুর্ব্বল ও অক্ষমদিগের মধ্যেই প্রকট দেখা যায়। শক্তিমান ও বহুগুণের আধার যাহারা তাহাদিগের প্রচেষ্টার ক্ষেত্র অনন্ত বিস্তৃত ও তাহারা পরস্পরের ছিদ্রান্বেষণ করিয়া সময়ের অপব্যবহার করার কোনও আবশ্যকতা অনুভব করে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী ও গণ্ডিতে বিভক্ত মানব সমাজ সর্ব্বদাই দুর্ব্বল ও অক্ষম হয়। এই সকল সমাজে প্রায় সকল ব্যক্তিই অনুপার্জ্জিত সম্পদের আহরণে আত্মনিয়োগ করে: আত্মবিশ্বাসের অভাবে যাহা প্রয়োজন তাহা রোজগার করিয়া লইবার চেষ্টা কাহারও নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই সকল সমাজে যাঁহারা নেতৃত্ব করেন তাঁহারাও মানুষকে আত্মনির্ভরশীল হইতে বলেন না। সবকিছুই সকলের দৈব অধিকারে প্রাপ্য বলিয়া দলবৃদ্ধির চেষ্টাই নেতৃত্বের মূলমন্ত্র হিস'বে তাঁহারা ক্রমাগত উচ্চারণ করিয়া চলেন ও ফলে দলের সকল ব্যক্তির সমবেত উৎপাদনি শক্তি ক্রমশঃ হ্রস্বতার চরমে পৌঁছাইয়া এমন অবস্থায় আসিয়া পড়ে যখন সকল সম্পদ সমানভাবে বণ্টন করিয়া লইলেও কাহারও অভাব মোচন হয় না। তখন অপরের তুলনায় অধিক পাইবার চেষ্টা আরম্ভ হয় ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু শক্তিকেন্দ্র সৃষ্ট হইয়া জোর যার মুলুক তার নীতির পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইতে দেখা যায়।

মারাঠা রাজত্বের পতন হইলে পর মারাঠা দস্যুরাজ আরম্ভ হয় ও পিণ্ডারী নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেনাদল নিজ নিজ নেতার অধীনে লুঠপাট করিয়া দিনগুজরাণ করিতে আরম্ভ করে। পৃথিবীর ইতিহাসে যখন যেখানে সংহত ও সংযত রাজশক্তির অবসান ঘটিয়াছে প্রায় সর্ব্বত্রই পিণ্ডারী জাতীয় দলের সৃষ্টি হইতে দেখা গিয়াছে। পরে নানা দলের পারস্পরিক দ্বন্দ্বের পথেই নূতন ও বৃহত্তর শক্তির গঠন কখন কখন হইয়াছে; কখনও বা অতি-বিফক্ত জাতি বিদেশীর কবলে পড়িয়া পর-দাসত্ব মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছে।

বর্ত্তমান ভারতে বৃটিষের সাম্রাজ্যবাদের অবসানে দেশ প্রথমেই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। ইহা ঘটাইতে যে-সকল দাঙ্গা বহুকাল ধরিয়া করান হয়, তাহার মূলে ছিল বৃটিষের ষড়যন্ত্র ও তৎসঙ্গে রাজনৈতিক দলের আবির্ভাব ও অপ-প্রচার। বৃটিষ প্রথমে মুসলীম লীগ ও ভারতের জাতীয় কংগ্রেসদলের হস্তে রাষ্ট্রীয় শক্তি তুলিয়া দেয় কিন্তু এই দুই দল ক্রমে ক্রমে নিজেদের গঠনশীলতার অভাবে দেশের সকল মানুষের বিশ্বাস রাখিতে পারে নাই। এখন ভারতে ও পাকিস্থানে বহু রাষ্ট্রীয় দল হইয়াছে এবং সেই সকল দলের সবল হস্ত ন্যায় ও সুনীতির প্রতিষ্ঠায় ব্যবহৃত না হইয়া দুর্নীতি ও অন্যায়ের প্রশ্রয়ে নিযুক্ত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এখন দেখা যাইতেছে যে চোর, ডাকাইত, লুঠেড়া ও দাঙ্গাবাজদিগের সহিত রাষ্ট্রীয় দলের কোন কোন নেতা ও কিছু কিছু স্বেচ্ছাসেবকের সহায়তার সম্বন্ধ স্থাপিত হইতেছে। অনেকসময় কে সমাজ-সেবক ও কে সমাজ-দ্রোহী তাহাও জনসাধারণ ঠিক বুঝিতে পারিতেছেনা। সত্য সত্যই কোনও রাষ্ট্রীয়দলের সহানুভূতি সমাজদ্রোহী চোর ডাকাইত প্রভৃতির দিকে গিয়াছে কি না তাহা কেহ বলিতে পারে না, তবে অনেক চোর ডাকাতই পুলিশের দ্বারা ধৃত হয় না এবং পুলিশ চুরি, ডাকাইতি ও খুন জখম দেখিলে পূর্ণ উদ্যমে অপরাধী-দিগকে দমন করিতে ও সাজা দেওয়াইতে চেষ্টা করিতেছেনা বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস। এবং এই নিষ্ক্রিয়তার মূলে না কি রাষ্ট্রীয় দলপতিদিগের আনুকূল্য ও সোজাসুজি হুকুম চালানও কখন কখন হইয়া থাকে। স্বাধীন ভারতে দাঙ্গাহাঙ্গামা ও নরহত্যা সকল প্রদেশেই ১৯৪৭ খৃঃ অঃ হইতেই ঘটিয়া চলিতেছে ও তাহার মূলে রহিয়াছে শাসনক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে অপরাধদমন নীতির বিলোপও রাষ্ট্রীয় দলের দ্ব বিবাদ। সুতরাং যে দলের যতটা ক্ষমতা সেই দ ততটা পুলিশের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া নিজ নি দলের ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করে। বহু অপরাধ দেখিলে শাসনযন্ত্র সচল না হইয়া অপেক্ষা করিতে থাকে

ট্রক্ষেত্রের মহাপুরুষদিগের সেই সকল আইন ভাঙ্গা
য়ে মতামত কি প্রকার। অপরাধ দমন তখনই হয়
য় অপরাধীগণ রাষ্ট্রনেতাদিগের পোষ্য নহেন দেখা
। এই প্রকার অপরাধী-রক্ষা বিগত ২২ বৎসর
য়া ভারতের সর্ব্বত্র চলিয়া আসিতেছে।

পুলিশকে সকল প্রদেশেই নিষ্ক্রিয়তা শিক্ষা দেওয়া
াছে ও হইতেছে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই
ণে ভারতের অবস্থা ঘোরতর অশান্তিপূর্ণ তাহাও
জনসম্মত। শুধু দিল্লীতে বসিয়া কোন কোন
রথী মাঝে মাঝে প্রাদেশিক মন্ত্রীদিগের সাফাই
হলেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় না। বরঞ্চ ইহাতে
ারণের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয় যে কোথাও
া বৃহৎ অন্যায় সমাজকে বিদীর্ণ করিতেছে এবং ইহার
যাহারা অপরাধী তাহাদিগকে বাঁচাইবার চেষ্টায়
াই গাওয়া হইতেছে।

অপরাধ কোন সময় রাষ্ট্রীয় দলের সুবিধাজনক ও
 সময় তাহা নহে; এই বিচার করিয়া যদি আইন
াগ করা হয় তাহা হইলে অপরাধ বৃদ্ধি হইবেই এবং
 ক্রমশঃ রসাতলে যাইবে। যাইতেছেও। ভারতে
ক্রমে সুকৃষ্টি, সুনীতি ও সুবুদ্ধির কোনও মূল্য
তেছে না এবং হাল্লাহাঙ্গামা ও গুণ্ডাবাজিরই
র সংখ্যাবৃদ্ধি হইতেছে। ভারতবাসীর প্রতিভা আজ
ায় কেহ বলিতে পারে না। ভারতই বা কাল
ায় থাকিবে তাহাও কেহ জানে না।

বিহার প্রদেশে বহু বৎসর হইতেই আইনের মূল্য
 হইতে আরম্ভ করিয়াছে শুনা যায়; ঐপ্রদেশে যত
টিকিট না কিনিয়া ট্রেনে যাতায়াত করে অন্য
প্রদেশের টিকিটহীন যাত্রীদিগকে একত্র করিলেও
দের সংখ্যা ততটা হয় না। বহুকাল হইতে
র গাড়ী থামাইয়া লুঠ করা প্রচলিত রহিয়াছে।
ও অহিংসার শাসনপদ্ধতি যখন ঐ প্রদেশে প্রবল
ও গাড়ী থামাইয়া লুঠ করার কথা বহুস্থলে
যাইত। ঐ একই সময়ে উত্তর প্রদেশের রাজপথের
এক জনহীন স্থলে একটি টায়ার ফাটা গাড়ীর আরোহিণী
কোন শ্বেতাঙ্গিনীকে লুঠেড়াগণ হত্যা করে ও তাহা
লইয়া প্রচুর আলোচনা হইয়াছিল। রাজপথে ডাকাইতি
মধ্যপ্রদেশের একটি প্রচলিত পেশা ছিল। উত্তর
মধ্য ও বিহার প্রদেশের ডাকাইতদলে বহু সময়েই
সম্ভ্রান্তবংশীয় লোকেরা থাকিত ও তাহাদিগের
সুপারিশের জোর থাকায় কোন প্রকার শাস্তি
কখনও হইত না। ডাকাইতদিগকে চিনিতে
পারিলেও সাহস করিয়া কেহ কিছু বলিত না। এই
সকল পূর্ব্বযুগের কাহিনী হইতে বুঝা যায় যে, আইনের
শক্তির হ্রাস হইতে আরম্ভ হইয়াছে প্রায় ২৫ বৎসর
আগেই। বৃটিষ রাজত্ব থাকিবে না বুঝিয়া ভারতের
শ্বেতাঙ্গ প্রভুগণ অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদিগকে উস্কাইয়া দাঙ্গা
প্রভৃতি ঘটাইতেন ও তাহার ফলে সাধারণ অপরাধও
বৃদ্ধি পায়। বৃটিষের সুবিধার জন্য যে নরহত্যা বা লুঠ
দাঙ্গা ইত্যাদি করিতে প্রস্তুত হইত সে নিজের সুবিধা
দেখিলেও ঐ প্রকার কার্য করিত। পুলিশ যদি নরঘাতক-
দিগকে বৃটিষের হুকুমে ছাড়িয়া দিত, তাহা হইলে
নিজেরাও ঘুষ খাইয়া সকল অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে
প্রস্তুত থাকিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ
দুর্নীতির প্রশ্রয়দান অভ্যাস সামাজিকভাবে বড়ই মন্দ ও
তাহা যে একবার যে কারণেই হউক করে, সে বহুবার
করিতেও বিশেষ নারাজ হয় না। আইন ও সুনীতির
অবমাননা আরম্ভ হইলে ক্রমে ক্রমে তাহা বাড়িয়াই
চলে। রাজনৈতিক গুণ্ডাবাজি তাহা হইলে বৃটিষ যুগ
হইতেই আরম্ভ হইয়াছে এবং তাহা কংগ্রেসী আমলে
আরও ব্যাপকভাবে সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। বর্ত্তমানে
যে সকল প্রদেশে বহু রাষ্ট্রীয় দল আছে সে সকল প্রদেশে
গুণ্ডাবাজি বহুমুখী ও তাহার দমন সুবিধামত হয় অথবা
হয় না। অপরাপর ভাবে সুনীতি ও আইন উপেক্ষা
করিয়া চলাও সর্ব্বত্র দেখা যাইতেছে। জোর করিয়া
নিজমত প্রতিষ্ঠার চেষ্টাও সর্ব্বব্যাপী। ভারতের সংবিধান,
দণ্ডবিধি, সামাজিক রীতি নীতি অথবা কোনও
প্রতিষ্ঠানের নিয়মকানুন; কেহ মানিতে প্রস্তুত নহে।

সামান্য অসুবিধা হইলেই আন্দোলন, বিক্ষোভ, ঘেরাও, হরতাল ও ইষ্টক চালনা হইয়া থাকে। উদ্দেশ্য; শিক্ষা, সমাজ অথবা রাষ্ট্রনীতি পরিবর্ত্তন। শাসকদিগের কর্ত্তব্য যেখানে কোনও প্রবল আন্দোলন দেখা যাইবে সেখানে সমাজের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীদিগকে একত্র করিয়া তাঁহাদিগের মত লইয়া আন্দোলনের মীমাংসা করিয়া দেওয়া। কিন্তু তাঁহারা সচরাচর নিজ বুদ্ধিতে চলিয়া থাকেন ও তাহাতে গোলযোগ বাড়িয়া চলে।

আমাদিগের দেশের রাষ্ট্রনেতাদিগকে জ্ঞান বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠব্যক্তি বলিয়া জনসাধারণ মনে করেন না। ভোট সংগ্রহ করিয়া অথবা অপর উপায়ে তাঁহারা শাসনযন্ত্র করায়ত্ত করিতে সক্ষম হইলেও তাঁহারা জনসাধারণের বিশ্বাসভাজন নহেন। তাঁহারা যাঁহাদের শাসন, শিক্ষা, শ্রমিক নিয়োগরীতি প্রভৃতি নির্দ্ধারণ ভার দিয়া থাকেন তাঁহারা রাষ্ট্রনেতাদিগের অনুগত ব্যক্তি, এবং তাঁহাদের উপরেও সাধারণের বিশ্বাস নাই। সমাজে শ্রদ্ধাভাজন যাঁহারা তাঁহাদিগকে কলহবিবাদ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানে না আনিতে পারিলে ঐ সকল সমস্যার কোন সমাধান সম্ভব হইতে পারে না। ইয়োরোপ আমেরিকাতে আজকাল ওমবুডসমান নামধেয় যে সমাজের ও রাষ্ট্রীয় রীতিনীতি সংরক্ষক উচ্চ কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইতেছে ও যাহাদের কাজ হইল শাসকদিগের কার্য্যকলাপের সমালোচনা ও সংস্কার; ভারতবর্ষেও ঐ প্রকার সংরক্ষক সংশোধক ও সমালোচকের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছে। কারণ ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী যে প্রদেশের বা রাষ্ট্রদলেরই হউক, অন্যায় ও দুর্নীতির প্রশ্রয়দাতা হিসাবে তাহাদের তুলনা পাওয়া যায় না। দেশের লোক রাজস্ব দিয়া ও রাষ্ট্রীয় ঋণের বোঝা স্কন্ধে লইয়া প্রায় নিঃসম্বল হইয়া আসিতেছে; কিন্তু রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান উদ্দেশ্য যাহা, অর্থাৎ শান্তিরক্ষা, আইনের শক্তিনিয়োগ; শিক্ষা, চিকিৎসা, রাস্তাঘাট, নিবাস প্রভৃতির ব্যবস্থা করা এবং বেকারসমস্যা ও সামাজিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাপ্রতিষ্ঠা; কোন কিছুই রাষ্ট্রীয় দলপতিগণ করিতে সক্ষম নহেন। তাহা হইলে

ব্যক্তির সমাজবিরুদ্ধতার প্রকারভেদ

আধুনিক রাষ্ট্রীয় মতবাদের একটি বিশেষ লক্ষ্য হইল সমাজ ও জনসাধারণকে ব্যক্তি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিসমষ্টির দ্বারা শোষিত হইতে না দেওয়া। পৃথিবীর ইতিহাসে প্রায় সকল দেশেই এমন সময় গিয়াছে অথবা এখনও এমন অবস্থা কোথাও কোথাও বর্ত্তমান রহিয়াছে যখন বা যেখানে অল্প 'সংখ্যক মানুষ শক্তি ব্যবহারে কিম্বা সামাজিক নিয়মানুবর্ত্তনের দ্বারা বহু সংখ্যক মানুষকে ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর লাভের জন্য সকল ভোগ বা সুখের অবসর ভুলিয়া ঘোরপরিশ্রমে জীবন কাটাইতে বাধ্য করিয়াছে। যাহারা ক্ষেত্রে চাষ করিয়াছে, যুদ্ধে সেনার কার্য্যে অবতীর্ণ হইয়াছে অথবা রাজদরবারের ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্যসাধনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে; সকলেই উপার্জ্জন সম্বন্ধে অল্পে সন্তুষ্ট থাকিতে বাধ্য হইয়াছে। যাহারা উচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত অভিজাত ও শক্তিমান শুধু তাহারাই অতুল ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিয়া গিয়াছে। আর যাহারা প্রচুর সম্পদের অধিকারী ছিল তাহারা বাণিজ্য অথবা ধর্ম্মমন্দিরের পূজারী হিসাবে জনসাধারণকে উচ্চমূল্যে অল্প দ্রব্য বিক্রয় করিয়া অথবা মোক্ষলাভের পথ দেখাইয়া দিয়া দক্ষিণা আদায় করিয়া নিজেদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া লইত। রাজার সৈন্য, সওদাগরের নাবিক, মন্দিরগঠনের রাজমিস্ত্রি অথবা চাষী, কারিগর, শকটচালক ও পশুপালক; কেহই উচ্চ বেতন উপভোগ করিত না। ভরনপোষণ ও দুই এক টাকা বেতন পাইলেই তাহা যথেষ্ট বলিয়া বিচার করা হইত। দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে লক্ষ লক্ষ বিপন্ন লোকের জীবন নষ্ট হইত কিন্তু ঐশ্বর্য্যশালী যাহারা তাহাদের ভাণ্ডার কখন খালি হইত না। যুদ্ধে পরাজয় কিম্বা রাষ্ট্রবিপ্লবে কখন কখন শক্তিমানদিগকে ধর্ষিত হইতে দেখা যাইত কিন্তু তাহাতে দরিদ্রজনের কোন অবস্থার উন্নতি হইত না। এক প্রভুর প্রভুত্বের অবসানে অপর কোন নূতন প্রভুর পদতলে স্থান পাইয়া দরিদ্র যে সে দরিদ্রই থাকিয়া যাইত। রাজশক্তির, ধর্ম্মমন্দিরের ও ব্যবসাদারদিগের লাভের প্রাপ্য মিটাইয়া জনসাধারণের ভোগের জন্য

বিশেষ কিছু উদ্বৃত্ত থাকিত না। যদি কিছুবা থাকা সম্ভব হইত তাহা সামাজিকতার আবশ্যকে পরহস্তগত হইতে সময় লাগিত না। বিবাহ, শ্রাদ্ধ, তীর্থগমন প্রভৃতির খরচ মিটাইতে, সাধারণ লোক প্রায়ই ঋণ-গ্রস্ত হইয়া সুদ গুনিতে গুনিতে সর্ব্বস্ব হারাইত। ন্যায়বান ও শক্তিশালী রাজার রাজত্বে অপর প্রকার অত্যাচার ও অবিচার হয়ত থাকিত না; কিন্তু রাজা ন্যায়বান না হইলে বা তাঁহার রাজশক্তি বাহিরের শত্রু ও ভিতরের লুণ্ঠনকারীকে দমনক্ষম না হইলে প্রজার অবস্থা অনেক সময় অবর্ণনীয় দুর্দ্দশার চরমে পৌঁছাইত।

অষ্টাদশ শতাব্দির শেষেরদিক হইতে জনসাধারণের শোষণ কার্য্যে আর একটি নুতন গোষ্ঠীর আবির্ভাব হইল। ইহা শ্রমিক নিয়োগকারী কারখানার মালিকগোষ্ঠী। দরিদ্র শ্রমিক অভাবের তাড়নায় এবং পারস্পরিক প্রতি-যোগিতার চাপে এত অল্প পারিশ্রমিকে কার্য্যে নিযুক্ত হইত যে তাহারা কোন প্রকারে অর্দ্ধাহারে জীবনধারণ করিত। ১৪৯৬ খৃঃ অব্দে ইংলণ্ডে কয়লাখাদে স্ত্রীলোক-দিগকেকয়লার টব টানিয়া লইয়া যাইবার কার্য্যে নিয়োগ করা হইত দৈনিক ছয় পেনি হারে। ঐ সময় ইংলণ্ডে বহু ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির মাসিক আয় একহাজার পাউণ্ডের অধিক ছিল। অর্থাৎ কয়লাখাদের শ্রমিক স্ত্রীলোকদিগের তুলনায় তাহাদের আয় প্রায় চৌদ্দশতগুণ অধিক ছিল। মাসিক পাঁচ হাজার দশ হাজার পাউণ্ড আয়ও অনেকের ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পরে যখন বেতন-ভোগী বুদ্ধিমান লোকের, যথা শিক্ষক, অধ্যাপক, খাজাঞ্চি ও দফতরের কর্ম্মীদিগের বেতন ছিল বাৎসরিক ২০০।৪০০ শত পাউণ্ড; তখন বাৎসরিকএকলক্ষ পাউণ্ড আয় অনেকের ছিল। কোন কোন লোকের লণ্ডন সহরে শতাধিক বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ছিল যাহার এক-একটির ভাড়া উঠিত বৎসরে কয়েক হাজার পাউণ্ড। অর্থাৎ বহু মানবের নিদারুণ অভাবের পার্শ্বেই দেখা যাইত কিছু কিছু লোকের অনায়াসলব্ধ ঐশ্বর্যের পর্ব্বত প্রমাণ স্তূপের সারি। ইহার কিছু আসিয়াছিল পুরাকালের উত্তরাধিকারপ্রাপ্ত জমির খাজনা, গৃহের ভাড়া ও সঞ্চিত অর্থের সুদ হইতে, আর অবশিষ্টাংশ আসিত কারখানার লাভ অথবা উচ্চ পারিশ্রমিকের বিশেষজ্ঞের কার্য্য হইতে —যথা শতাধিক পাউণ্ড দক্ষিণার চিকিৎসক, ব্যারিস্টার, ব্যবসাক্ষেত্রের উপদেষ্টা প্রভৃতি। দোকানদারী ও বৈদেশিক বাণিজ্যেও বহু অর্থের আমদানি হইত; আর আসিত এশিয়া, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার চা, কফি, কোকো, রবার, চিনি, পশম, গম ও মাংসের কারবারের লাভ। জাহাজের কারবার আর একটা বৃহৎ ব্যবসায় ছিল। ইহার আমদানিও কিছু কিছু ব্যক্তিকে লক্ষ ও ক্রোরপতির আসনে বসাইতে সাহায্য করিত।

ভারতবর্ষে যাহারা মহা ঐশ্বর্য্যশালী ছিল তাহারা ঐ একইভাবে পূর্ব্বযুগের অধিকারলব্ধ অর্থে জন-সাধারণের তুলনায় অতি উচ্চ উপার্জ্জনের স্তরে অধিষ্ঠিত ছিল। বর্ত্তমানেও এই সকল রাজারাজড়া আমির ওমরাহ ও সঞ্চিত অর্থের মালিকগণ নানাভাবে হৃতবিত্ত হইয়াও বহু সম্পদের অধিকারী রহিয়াছে। ইহাদিগের পার্শ্বে যে নূতন ধনকুবেরদিগের আবির্ভাব হইয়াছে তাহারা অর্থ অর্জ্জন করিয়াছে কারখানা, কারবার, বাণিজ্য, দোকানদারী ও উচ্চ বেতনে ও পারিশ্রমিবে ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া। ইহারাও সঞ্চিত অ কারখানা প্রভৃতির অংশীদারীতে লাগাইয়া, গৃহ নির্ম্মা করাইয়া অথবা ব্যাঙ্কে রাখিয়া ঐশ্বর্য্য আরও বাড়াইবা ব্যবস্থা করিয়া লইয়া থাকে। বর্ত্তমানে যে ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তি দিগের বিরুদ্ধে একটা রাষ্ট্রীয় অভিযান চলিতেছে তাহা দুইটি দিক আছে। প্রথমটি হইল রাজস্ব আদায়ের দিক অর্থাৎ যাহাদের সম্পদ আছে তাহাদের নিকট অধি হারে রাজস্ব আদায় করিলে তাহাদের জীবন ধার অসুবিধা হয় না; সুতরাং রাজস্ব আদায় নীতি বিত্তবানের নিকট হইতে অধিক আদায়েই প্রকৃষ্টনী বলিয়া গ্রাহ্য। অপরদিকে রহিয়াছে ঐশ্বর্য্যশা ব্যক্তিদের ঐশ্বর্য্য আহরণপন্থার সমাজবিরুদ্ধতা ও তা প্রতিকার ব্যবস্থা। যেখানে ব্যক্তিগত ঐশ্বর্য্যলা পন্থা অনুসরনের ফলে জনগণের অভাব সৃষ্টি হইয়া থা

সেখানে ঐশ্বর্য্যলাভ সামাজিক দিক দিয়া দোষাবহ। বহু মানবের দুঃখ ও কষ্টের উপর যে ধনভাণ্ডার গড়িয়া উঠে সে ভাণ্ডারের উচ্ছেদ প্রয়োজন এবং সেই উচ্ছেদ-চেষ্টা ন্যায্য ও সামাজিক মঙ্গলকারক। আমাদের রাষ্ট্রীয় দলপতিদিগের এই দুই প্রকার ধনার্জ্জন যথাযথ-ভাবে বিচার করিয়া দেখিবার ক্ষমতার অভাব আছে মনে হয়। যে ধনার্জ্জন দরিদ্রকে আরও গভীর দারিদ্র্যে ডুবাইয়া দেয়না এবং রাজস্ববৃদ্ধি করে সেই ধনার্জ্জনে বাধা দিলে দরিদ্রের কোন লাভ হয় না এবং দেশের উৎপাদনি শক্তি হ্রাস হইয়া জাতির ক্ষতি হয়। রাজস্বও কমিয়া যায়। যেখানে কোন ধনী মানুষ ডাক্তারী, ওকালতি ইঞ্জিনিয়ারিং কিম্বা অপর বিশেষজ্ঞের কার্য্য করিয়া অর্থ সঞ্চয় করিয়াছে, তাহার নিজ বাসের গৃহ অথবা গাড়ী ছিনাইয়া লইলে দেশবাসীর কোন লাভ হইবে না। উপরন্তু দেশের কর্ম্মিষ্ঠ ব্যক্তিগণ কাজ করিতে উৎসাহ হারাইয়া দেশের দারিদ্র্যের সৃষ্টি করিবে। কিন্তু যে ব্যক্তি দুই পাঁচ হাজার টাকা লইয়া বস্তিতে বাস করিয়া মাসিক শতকরা দুই হইতে দশটাকা সুদে টাকা ধার দিয়া দরিদ্রের উৎপীড়নে আত্মনিয়োগ করে তাহার অসামাজিক অপরাধের কোন শাস্তির ব্যবস্থা রাষ্ট্র করিবে না; যেহেতু তাহার মোট মূলধন মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। যে দশটাকা ভাড়ায় এক কাঠা জমি বন্দোবস্ত লইয়া একহাজার টাকায় সেই জমিতে চারখানা খোলার ছাদের ঘর তুলিয়া তাহার জন্য মাসিক একশত টাকা ভাড়া আদায় করে সে নির্ব্বিবাদে নিজ কর্ম্ম করিয়া চলিবে, কারণ তাহার সমাজবিরুদ্ধতার মূল্যে মাত্র এক হাজার টাকা। কিন্তু যে ডাক্তার নিজগৃহে বাস করিয়া অপরের চিকিৎসা করে তাহার গৃহ বাজেয়াপ্ত হইতে পারিবে যদি তাহার তাহার মূল্য পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক হয়। এই জাতীয় ঐশ্বর্য্য-রোধের কোন অর্থনৈতিক ঔচিত্য নাই। কারণ কে তাহার সম্পদ কিভাবে রাখিবে তাহাতে অপর ব্যক্তির কিছু বলিবার থাকে না যদি সে সম্পদের অধিকারী অপরের কোন ক্ষতি না করে। বৃহৎ গৃহে যদি কেহ থাকে তাহাতে সহরের শোভা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি উন্নততর হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ ও বস্তি নির্ম্মাণ করিলে স্বাস্থ্যের ও সহরের সৌন্দর্য্যের হানি হয়। যদি কেহ বৃহৎ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া ন্যায্য ভাড়ায় অপরকে থাকিতে দেয় তাহাও কোন সমাজবিরুদ্ধ কার্য্য নহে। বস্তির কোটরের ভাড়া যাহাই হউক তাহা সমাজের লোকের ক্ষতিকর। যদি রাষ্ট্র সকল মানুষের বাসস্থান নির্ম্মাণ করিবার ভার গ্রহণ করে ও তাহার জন্য ভাড়া আরও অল্প হারে ধার্য্য করে তাহা হইলে তাহা ব্যক্তিগত ভাড়া বাড়ী অপেক্ষা সামাজিক দিক দিয়া উন্নততর ব্যবস্থা। কিন্তু যদি রাষ্ট্র কিছু না করে শুধু ব্যক্তিগত চেষ্টাতে বাধা দেয় তাহা বিশেষ সুবিধার ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয় না।

বর্ত্তমানে ব্যক্তিগত ধনসম্পদ সীমাবদ্ধ করিবার জন্য যেসকল প্রস্তাব আসিতেছে তাহার মধ্যে জন-সাধারণের অর্থনৈতিক সুবিধার কথা ভাবিয়া কেহ কিছু বলিতেছে বলিয়া মনে হয় না। দেশের সাধারণের যে আর্থিক দুঃখ কষ্ট তাহার কারণ ক্ষেত্রবিশেষে ব্যক্তিগত সম্পদের আধিক্য নহে। ভারতবর্ষের মানুষের প্রধান অভাব উৎপাদনিকার্য্য করিবার সুযোগ না থাকা। এই সুযোগ সৃষ্টি না করার ফলে ভারতে বহু কোটি ব্যক্তি পূর্ণ ও আংশিকভাবে বেকার। এই অবস্থার পরিবর্ত্তন বৃহৎ গৃহনির্ম্মাণ বন্ধ করিলে হইবে কি? ব্যাঙ্ক জাতীয় করিলেই বা কয়জনের কার্য্যের সংস্থান হইবে? বেকার জনসাধারণের শ্রমশক্তি ব্যবহারের ব্যবস্থা না করিয়া 'লোক দেখান' "সোসিয়ালিজম" এর অভিনয়ে মানুষের দারিদ্র্য দূর হইবে না। নির্ব্বোধ লোকের ভোট অবশ্য ইহাতে পাওয়া সম্ভব হইতে পারে।

কলিকাতার পথে ঘাটে যাহা দেখা যায় তাহা হইতে বিদেশী মানুষের ভারতের অর্থনীতি সম্বন্ধে কি ধারণা হয়? শত শত ভিক্ষুক; যাহাদিগের মধ্যে অধিকাংশই পেশাদার ও অবাঙ্গালী। অর্থাৎ বিদেশী পর্য্যটকগণ অনায়াসেই বুঝিতে পারে যে ভারতে পেশাদারী ভিক্ষাবৃত্তি রাষ্ট্র-অনুমোদিত এবং এই ভিক্ষাবৃত্তি দরিদ্রের

সাহায্য করে না, ইহা শুধু এক প্রকার সমাজ-বিরুদ্ধতা ও শ্রমশক্তির অপব্যবহার। কলিকাতায় পথে পথে লক্ষ লক্ষ লোক বাস করে। রন্ধন করিয়া খায়, স্নান করে ও নিদ্রা যায়। ইহার অর্থ, কলিকাতাবাসীর বহু লোকের বাসস্থান নাই। বস্তির ঘরভাড়া এতই অধিক যে তাহা দেওয়া অনেকের পক্ষেই অসম্ভব হয়। পাকাবাড়ীর কথা বলিবার প্রয়োজন হয় না। রাষ্ট্র যদি অল্পদূরে অনেক গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া তাহা উচিতহারে ভাড়া দিত এবং যাতায়াতের খরচও কম করিবার ব্যবস্থা করিত তাহা হইলে কলিকাতার পথ ঘাটে লোক শুইয়া থাকিত না। রাষ্ট্র নিজ কর্ত্তব্য করেনা বলিয়াই এই অবস্থা। ব্যবসাদারগণও কলিকাতায় পথে ঘাটে বসিয়া ও ঘুরিয়া মালপত্র বিক্রয়-চেষ্টা করে। ইহাতে বড় বড় রাজস্বদাতা দোকানদারদিগের ক্ষতি হয় এবং রাজস্ব-প্রাপ্তিতেও বাধা পড়ে। লাভ হয় শুধু যাহারা ঘুষ আদায় করিতে পারে তাহাদের। কেহ কেহ অনুমান করেন যে রাজস্ব ফাঁকির পরিমাণ ভারতবর্ষে বার্ষিক এক সহস্র কোটি টাকারও অধিক এবং তাহার প্রধান কারণ বিভিন্ন জাতীয় রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদিগের উৎকোচগ্রহণ অভ্যাস।

কলিকাতার ছাত্রগণ স্কুলে কলেজে যথাযথভাবে অধ্যয়ন না করিয়া অন্যত্র সময় কাটায়, কারখানার ও দফতরের কর্ম্মীগণ মিছিল বাহির করিয়া দাবি পেশ করে ও নিজকার্য্য করে না, লক্ষ লক্ষ লোক শুধু পথে বিচরণ করে, বাস ট্রামের ভিড় এতই অধিক যে তাহাতে উঠিতে পারা প্রায় অসম্ভব, ট্যাক্সির আরোহি থাকিলে তাহার গতি-বেগ অপরের পক্ষে মারাত্মক হয় নতুবা ট্যাক্সি মন্দগতিতে সকল যানবাহনের চলায় বাধা দিয়া ধীর মন্থরভাবে গড়াইতে থাকে। কলিকাতা সকল-ভাবেই রাষ্ট্রীয় নিষ্ক্রিয়তার একটি বিরাট উদাহরণ। এই নিষ্ক্রিয়তা রাস্তা মেরামতে, সাফাইকার্য্যে, আলোক ব্যবস্থায়, শিক্ষা ও চিকিৎসার আয়োজনে, শান্তিরক্ষায়, চুরি ডাকাইতি ও নরহত্যাদমনে, অবাধে ভেজাল খাদ্য-সরবরাহে, হাঙ্গা হাঙ্গামার প্রাচুর্য্যে ও অন্য বহু ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে। রাষ্ট্রমত সময় অনুযায়ী ও বহুরূপী কিন্তু নিষ্ক্রিয়তা চিরস্থায়ী।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আদর্শবাদ

নেতাজী বাঁচিয়া আছেন কিনা সে আলোচনা করিয়া কোন লাভের আশা দেখা যায় না। কারণ তিনি বাঁচিয়া থাকিলেও কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত নাই এবং সে অনুপস্থিতি ও বাঁচিয়া না থাকা প্রায় একই ধরনের বলা যায়। নেতাজী বাঁচিয়া থাকিলে নিশ্চয়ই প্রাণ পাত করিয়া চেষ্টা করিতেন যাহাতে ভারত-বিভাগ না হয় ও পরে ভারতীয় প্রদেশগুলির জাতীয়তাবিরুদ্ধ স্বার্থান্বেষণেও তিনি নিশ্চয়ই বাধা দিতেন। অহিংসা ভালো না স্বাধীনতাই জাতির প্রধান কাম্য একথার উত্তরে নেতাজী স্বাধীনতাকেই উচ্চ স্থান দিয়াছিলেন। তখন আমাদিগের কম্যুনিষ্ট ভ্রাতাগণ, নেতাজীকে ফ্যাশিষ্ট বলিয়া ইংরেজের সাহায্যে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বর্ত্তমানে দেখা যাইতেছে নেতাজী কম্যুনিষ্টদিগের প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়া আবার পঙক্তিতে স্থান পাইতে-ছেন। কিন্তু কম্যুনিষ্টদিগের ভারত স্বাধীনতার যে "আদর্শ" নেতাজী তাহাকে স্বাধীনতা অথবা তজ্জাত রাষ্ট্রীয় পরিণতিকে "মুক্তি" কখন বলিতেন না। সুতরাং কম্যুনিষ্টদিগের নেতাজীকে দলে টানিবার চেষ্টা নেতাজীর প্রকৃত ভক্ত ও বন্ধুগণ কখনও বরদাস্ত করিতে প্রস্তুত হইবেন না। এক মহা ভারতও এক মহাজাতি ইহাই ছিল নেতাজীর আদর্শ এবং সেই আদর্শে ভারত কোন বৃহত্তর বিশ্বরাষ্ট্রের অনুগত অংশ হিসাবে টিম টিম করিতে থাকিবে এইরূপ ষড়যন্ত্রের সহিতও নেতাজীর সহানুভূতি কদাপি থাকিত না। সুতরাং বর্ত্তমানে যাঁহারা নেতাজী নেতাজী করিয়া ভোটের বাজারে ভেজাল নেতৃত্ব বিক্রয়-চেষ্টা করিতেছেন তাঁহাদিগকে দেশবাসীর মধ্যে যে কয়জনের সত্যকথা বলিতে আগ্রহ আছে তাঁহাদের বলা প্রয়োজন যে নেতাজীর স্থান তাঁহাদিগের বহু উচ্চে ও কাহার নিজস্ব মতলবে অতীতের মহাপুরুষদিগের নাম উঠাইবার কোন প্রয়োজন নাই।

রাষ্ট্রনেতা বলিয়া আজকাল যে জাতীয় ব্যক্তিগণ সমাজে আদৃত তাঁহাদের সহিত একত্র পূর্ব্বযুগের দেশ-নেতাদিগের নাম করা চলেনা। দেশের লোক নিজেদের চরিত্র অনুযায়ী নেতৃত্ব চাহেন। সাধারণতন্ত্র অর্থে বুঝিতে হইবে যে বৃহত্তম সংখ্যাগুরু দলের মতে দেশ চলিবে। সে চলা মহাপাপ অথবা দেশদ্রোহিতা-দোষদুষ্ট হইলেও তাহাই চলিবে। কিন্তু মহাপাপ ও দেশদ্রোহিতা কাহাকে বলে তাহার অর্থ ভারত তথা কোন দেশের সংখ্যাগুরু গোষ্ঠীর বিচারে নির্দ্ধারিত হইবে না। সে বিচার হইবে যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া, মহাকালের দরবারে।

মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় সরকার ইত্যাদি

মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায় বলিতেছেন বাংলা দেশে অবাধে চুরি, ডাকাইতি, লুঠ, দাঙ্গা, নারীনির্য্যাতন প্রভৃতি চলিতেছে ও পুলিশ-মন্ত্রী ও মন্ত্রীর দলের লোকেরা তাহাতে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন না। বরঞ্চ ঐ অরাজকতার দ্বারা নিজেদের লাভের ব্যবস্থা করিতেছেন। অজয়বাবু এই অবস্থায় প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন যাহাতে ঐ দলের মনোভাবে পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু যদি তাহা না হয় তাহা হইলে তিনি এই মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দিবেন। পরিবর্ত্তন হইতেছে না, অজয়বাবু মন্ত্রীসভা ভাঙ্গিয়া দিতেছেন না, অবস্থা দিন দিন আরও খারাপ হইতেছে।

বাংলার রাজ্যপাল পুলিশ-মন্ত্রীর কর্মকৌশল দেখিয়া মুগ্ধ। তিনি বলেন, বাংলার মত সুশাসিত প্রদেশ দেখিলে চিত্ত পুলকিত হওয়া উচিত এবং রাজ্যপাল হিসাবে তিনি বাংলার শাসন-শৃঙ্খলাতে সমালোচনা করিবার কিছু দেখিতে পান নাই। রাজ্যপালের বাংলার অবস্থা বিচার ও মুখ্যমন্ত্রীর চক্ষে যাহা লক্ষিত হইয়াছে এই দুইয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য। কিন্তু রাজ্যপালের মতামত দিল্লীর দরবারে অধিক মূল্যবান বিবেচিত হয়। যদি কোন কারণে রাষ্ট্রপতির হস্তে পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার অর্পণ করা আবশ্যক হয় তাহা হইলে শুধু রাজ্যপালের কথাতেই তাহা হইতে পারে; মুখ্যমন্ত্রীর কথা শুনিয়া রাষ্ট্রপতি ঐরূপ কার্য্যভার গ্রহণ করিতে পারেন না। বাংলাদেশে যতই গোলমাল হউক না কেন; রাজ্যপাল যদি বলেন অবস্থা ভালই, তাহা হইলে রাষ্ট্রপতি রাজ্যপালের মতেই সায় দিবেন।

কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যপালের দৃষ্টিতেই বাংলা দেশের অবস্থা দেখিবেন। শ্রীমতী ইন্দিরা বাংলায় আসিয়া সব কিছু দেখিয়া যাইলেও; তাঁহার সরকারী মত বাংলার রাজ্যপালের কথা অনুসারেই গঠিত হইবে। সেই মতের পুর্ব্বাভাষ পাওয়া গিয়াছে শ্রী চ্যবনের বাংলার শাসন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত প্রশংসাবাণীতে। শ্রী চ্যবন বলিয়াছেন, বাংলায় কোন অপরাধপ্রবণতা লক্ষিত হইতেছে না। সব কিছুই শান্তিপূর্ণ ও সুশাসিত। কোন চুরি ডাকাইতি বৃদ্ধি হয় নাই। দাঙ্গা হাঙ্গামা খুন জখম যেমন হইয়া থাকে তেমনই হইতেছে। বাড়াবাড়ি কিছু হইতেছে না। অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার নেলশনের অনুকরণে কাণা চোখে দূরবীণ লাগাইয়া বাংলা পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। শাসক-কংগ্রেস দল বামপন্থীদিগকে খুসী রাখিয়া চলিতে চাহেন কারণ অদূর ভবিষ্যতে যে ধস্তাধস্তি হইবে তাহাতে শ্রীমতী ইন্দিরাকে নূতন নূতন সহায়কের সন্ধানে ঘুরিতে হইবে। এই অবস্থায়, বাংলায় কিছু কিছু অরাজকতা ঘটিলেও তাহা বাঙ্গালীকে উচ্চতর উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নিঃশব্দে হজম করিয়া যাইতে হইবে।

পরলোকে বারট্রাণ্ড রাশেল

বিশ্ববিখ্যাত অঙ্কশাস্ত্রবিদ, দার্শনিক ও নৈয়ায়িক বারট্রাণ্ড রাশেল (তৃতীয় আর্ল রাশেল) সম্প্রতি প্রায় ৯৮ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করিয়াছেন। বর্ত্তমান শতাব্দীর তিনি একজন অতিমানব বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্রক্ষেত্রে তাঁহার বিদ্যা অগাধ ছিল এবং দর্শনের ক্ষেত্রেও তাঁহার নাম ডেকার্ট, লাইবনিট্স,

ক, হিউম, কান্ট প্রভৃতির সঙ্গে উচ্চারিত হইয়া থাকে। তর্কশাস্ত্র বিষয়ে রাশেলের বিশ্লেষণ মতামত-বিচারপদ্ধতিকে নূতন আলোকে আলোকিত করিয়াছিল। মানুষ হিসাবে বারট্রাণ্ড রাশেল অসাধারণ ছিলেন। তিনি যুদ্ধবিরোধী বলিয়া কারাবদ্ধ হইয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কখনও যুদ্ধবিরুদ্ধতা হইতে নিবৃত্ত হ'ন নাই। স্ত্রীলোকের অধিকার লইয়া তিনি মহা আন্দোলন করিয়াছেন। আনবিক অস্ত্র বর্জ্জন সম্বন্ধেও তাঁহার প্রচার ও চেষ্টা প্রগাঢ় ও ব্যাপক ছিল। তিনি কম্যুনিজম এর সমালোচনা করিয়াও খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। বাল্যকালে রাশেল অতি অল্প বয়সে পিতৃমাতৃহীন হইয়া পিতামহীর নিকট লালিতপালিত হ'ন। তাঁহার শিক্ষার আয়োজন বহু অর্থব্যয় করিয়া করা হইয়াছিল। কেমব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রিনিটি কলেজে গিয়া তিনি অঙ্ক ও দর্শন দুই বিষয়েই প্রথম বিভাগে সসম্মানে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। পরে তিনি রয়াল সোসাইটির ফেলো নির্ব্বাচিত হ'ন। বৃটিষ রাজ্যের মহা সম্মানের অর্ডার অফ মেরিটে রাশেলকে ভূষিত করা হয় এবং সাহিত্যের জন্য তিনি নোবেল প্রাইজ পাইয়াছিলেন। এই সকল সম্মান ব্যতীত তিনি বহু পুরস্কার ও পদক পাইয়াছিলেন। তাঁহাকে যুদ্ধ-বিরুদ্ধতার জন্য একবার একশত পাউণ্ড জরিমানা দিতে ও অপরবার ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। কিন্তু ইহার পরে তিনি অর্ডার অফ মেরিট আহরণ করিয়া সকল সমালোচকদিগকে নির্ব্বাক করিয়া দেন। বারট্রাণ্ড রাশেল সকল দিক দিয়াই এক অত্যাশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী পুরুষ ছিলেন। ৭৭ বৎসর বয়সে তিনি নরওয়ে দেশে বক্তৃতা দিতে গিয়া ট্রণ্ডহাইম ফিয়র্ডে ঝড়ে বিমান ভাঙ্গিয়া সমুদ্রে পড়িয়া যান। কিন্তু তিনি যতক্ষণ না সাহায্য আসে ততক্ষণ সাঁতার দিতে থাকেন ও পরে ডাঙ্গায় পৌঁছিয়া নিজ বক্তৃতা যথাসময়ে দিয়া সর্ব্বসাধারণকে আশ্চর্য্যান্বিত করিয়া দেন। ৮০ বৎসর বয়সে রাশেল তাঁহার প্রথম উপন্যাস লেখেন। ৭৯ বৎসর বয়সে তিনি চতুর্থবার বিবাহ করেন। অঙ্ক দর্শন ও তর্কশাস্ত্রে মহা পণ্ডিত এই অসামান্য প্রতিভাশালী অভিজাতবংশীয় পুরুষ তর্কশাস্ত্রের কয়েকটি মূল নিয়মের দ্বারা গণিত শাস্ত্রের বহু সমস্যা অনায়াসবোধ্য ও সহজ করিয়া দিয়াছিলেন।

জীবনের শেষের অনেক বৎসর তিনি আনবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্বন্ধে জগতবাসীকে বুঝাইবার জন্য ও আনবিক অস্ত্র ব্যবহার নিবারণ করিবার চেষ্টায় ব্যয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে পৃথিবীতে মানবজাতির অস্তিত্বরক্ষাই জগতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মানবাকাঙ্খা। এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য প্রয়োজন আনবিক অস্ত্র উৎপাদন সক্ষম জাতি সকলের মিলিতভাবে ঐ সর্ব্বনাশা অস্ত্র পরিত্যাগ করা। বারট্রাণ্ড রাশেল আপ্রাণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন যাহাতে আনবিক অস্ত্র পরিহারে জগতের সকল জাতি মিলিত হইতে পারে। কিন্তু তাঁহার সে চেষ্টা সফল হইয়াছে কি না তাহা এখনও কেহ বলিতে পারে না। এই কথা শুধু বলা যায় যে বিশ্ববাসীর ব্যক্তিগত মতামতের ক্ষেত্রে আনবিক অস্ত্র ব্যবহারের সপক্ষে বিশেষ কোন সমর্থক দৃষ্ট হয় না। জাতিসংঘ রাশেলের কথা না শুনিলেও বিশ্বের সকল মানব তাহা শুনিয়াছে।

রাষ্ট্রের স্বরূপরক্ষার কর্ত্তব্য

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় স্বরূপ হইল ধর্ম্মনিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক। ভারতবর্ষের মানুষ নিজেদের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদিগের দ্বারা গঠিত মন্ত্রীসভার শাসনে বসবাস করে। অর্থাৎ ভারতের সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্র চালিত হইলে সেই রাষ্ট্রের প্রজাদিগের অধিকার অনধিকার ও বাধ্যবাধকতা সংবিধান নির্দ্দিষ্টভাবে বিচার্য্য হইবে —কোন জননেতার খামখেয়াল বা যথেচ্ছাচারের উপর নির্ভর করিবে না। যদি কোন ক্ষেত্রে এরূপ হয় যে ভারতের কেন্দ্রীয় অথবা প্রাদেশিক রাষ্ট্র-শাসনে রাজকর্ম্মচারীগণ সংবিধান অথবা ভারতীয় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন অগ্রাহ্য করিয়া কোন মন্ত্রীর যথেচ্ছাচারকেই উচ্চতম বিধান বলিয়া স্বীকার করিয়া লন, তাহা হইলে সেক্ষেত্রে মানিতেই হইবে যে ভারতের

ধর্ম্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র আর বহাল থাকিতেছে না। সেক্ষেত্রে যে রাষ্ট্র সক্রিয় রহিয়াছে দেখা যাইবে তাহা সংবিধানসম্মত নহে ও তাহা আইনত গ্রাহ্য নহে। অতএব সেই মন্ত্রীর স্বৈরাচার-অনুগত রাষ্ট্রকে খাজনা মাশুল বা রাজস্ব দিতেও আইনত: কেহ বাধ্য থাকিবে না। অথবা সেই রাষ্ট্রের আদেশ অমান্য করিলে তাহা দণ্ডনীয় হইবে না।

ভারতীয় মানুষকে যেসকল অধিকার সংবিধান ও নীতি-অনুযায়ীভাবে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে দেখা যায় যে তাহার স্বাধীনভাবে চলিবার ফিরিবার অথবা কাজ করিবার অধিকার আছে। যদি কোনক্ষেত্রে কোন মন্ত্রীর আদেশে তাহার ঐ স্বাধীনতা কোনভাবে কেহ খর্ব্ব করিলেও রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীগণ তাহাকে সেই অধিকার ফিরাইয়া দিতে নিশ্চেষ্ট থাকে তাহা হইলে উক্ত মন্ত্রী দেশের রাষ্ট্রের সংবিধানসম্মত স্বরূপ নষ্ট করিতেছেন বলিতে হইবে ও তাঁহাকে তখন মন্ত্রীপদ হইতে অপসৃত করাই রাষ্ট্রপতির কর্ত্তব্য হইবে। রাষ্ট্রের শক্তি ব্যবহার করিয়া রাষ্ট্রকে বিনাশ করিবার আকাঙ্খা যাঁহাদের অন্তরে আছে তাঁহাদের বুঝিতে হইবে যে তাঁহারা রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলে রাষ্ট্রও তাঁহাদের ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করিবে।

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব

অধ্যাপক শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের বর্ত্তমান শ্রীবৃদ্ধির যুগে সমালোচনার পদ্ধতিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে এখনও বাঙালি লেখকেরা ঠিক সাহিত্যবোধের দ্বারা অনেক সময়েই পরিচালিত হন না। ইংরেজি, ফরাসি প্রভৃতি উন্নত সাহিত্যে এ-ত্রুটি এখন আর দেখা যায় না; আর সংস্কৃতের তো কথাই নেই; সংস্কৃত সমালোচনা-সাহিত্য তথা অলংকারশাস্ত্র ও রসবিচার অতি গভীর উপলব্ধির ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত; সেখানে সাহিত্যবোধের বিনিময়-ক্ষেত্রে রাজনীতি বা ধর্মশাস্ত্রের উপদ্রব সহ্য করা হত না। বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে ইহুদি দার্শনিক কার্ল মার্কসের অনধিকার-চর্চ্চা ছাড়াও আর এক উপদ্রব দেখা যায়। তা হল ধর্মশাস্ত্র অর্থাৎ স্মৃতিশাস্ত্র ও তন্ত্রশাস্ত্রের তত্ত্বের ভিত্তিতে সাহিত্য-সমালোচনার প্রয়াস। এ-প্রয়াস তথাকথিত বড় সমালোচকদের রচনাতেও মাঝে মাঝে দেখা যায়। কিন্তু তা অপপ্রয়াস ছাড়া আর কিছু নয় এই জন্যে যে, এর ফলে পাঠক লেখকের রচনায় আনন্দ বা রস পরিবেশিত হয়েছে কি না তা না দেখে কোন বিশিষ্ট তত্ত্ব কতখানি বিকশিত হয়েছে, তাই খুঁজতে বসে। রচনায় মার্কসবাদ কতখানি প্রতিফলিত, পেতি-বুর্জোয়া মনোবৃত্তি কতটা আছে; আনন্দময় রসাবেশের ক্ষেত্রে সে প্রশ্নসমষ্টি যেমন অবান্তর, তেমনি অগ্রাহ্য এই জিজ্ঞাসাগুলিও যে, ভ্রমর ও সূর্যমুখীর

আচরণ হিন্দু নারীর সতীত্বের আদর্শের সঙ্গে সুসমঞ্জস কি না, প্রতাপ-চরিত্র নারী-প্রকৃতির করুণা-সফল কি না।

বাঙালি সাহিত্য-সমালোচকদের এই ত্রুটিগুলি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করায় তিনি লিখেছিলেন: "দুর্ভাগ্যক্রমে আমাদের দেশে অধিকাংশ সমালোচকের হাতে সাহিত্যবিচার স্মৃতিশাস্ত্রবিচারের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। এই সকল বিচার-প্রহসন আমাদের দেশে সাহিত্যবিচারের নাম ধ'রে নিজের গাম্ভীর্য বাঁচিয়ে চলতে পারে—জগতে আর কোথাও এমন দেখা যায় না। জগতে যা কোথাও নেই সেইটেই ভারতে আছে, এই হচ্ছে আধুনিক বাঙালির গর্ব। সাহিত্য তো বিজ্ঞান নয়; সাহিত্যে শ্রেণীর ছাঁচে নায়ক-নায়িকার ঢালাই হতেথাকলে সেটা পুতুলের রাজ্য হয়, প্রাণের রাজ্য হয় না। ···এমন কথা আমাদের দেশে প্রচলিত যে, অন্য দেশের সহিত ভারতবর্ষের কোনো অংশে মিল নাই, সেই অমিলটাকেই প্রাণপণে আঁকড়াইয়া থাকা আমাদের ন্যাশন্যাল সাহিত্যের লক্ষণ —অর্থাৎ ন্যাশন্যাল সাহিত্য কূপমণ্ডূকের সাহিত্য।" (সবুজপত্র, অগ্রহায়ণ, ১৩২২···প্রবাসী, চৈত্র, ১৩২৬)।

রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে এই যুগে ভারতের শিল্পবাণী নতুন মহিমায় আত্মপ্রকাশ করেছে। তিনি প্রাচীন ভারতের অন্তরতম রসোপলব্ধিকে নব যুগের উপযোগী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। তাঁর নিজের ভাষায়: "মানুষ নানা রকম আস্বাদনেই আপনাকে উপলব্ধি করতে চেয়েছে বাধাহীন লীলার ক্ষেত্রে। সেই বৃহৎ বিচিত্র লীলা-জগতের সৃষ্টি সাহিত্য। সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানা ভাবে নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস লিখিত অঙ্কিত হয়ে চলেছে।"

শ্রীঅরবিন্দও এক মনোভাব ব্যক্ত করেছেন এই সব কথায়: "শিল্পী কেবল তাঁর নিজেরই চেতনার ঐশ্বর্যকে নয়, পরন্তু যে-পরাচেতনা জগৎ সকল, জগতের অন্তর্গত বস্তুরাজি সৃষ্টি করেছে, তারও ঐশ্বর্য রূপায়িত ক'রে তোলেন।" শ্রীঅরবিন্দের অন্যতম প্রধান শিষ্য নলিনী-কান্ত গুপ্ত বলেছেন: "শিল্পকলায় মুখ্য প্রয়াস, তার নিভৃত প্রেরণা এই—পরম সত্তার চেতনার আনন্দের মধ্যে বিধৃত প্রস্ফুটিত যে-সৌন্দর্য, তাকে প্রকাশ করা, মূর্তি দেওয়া।"

রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ ও নলিনীকান্তের শিল্প-আলোচনায় যে পদ্ধতি অনুসৃত, তার মূল প্রকৃতিটি আধ্যাত্মিক এবং ভারতীয় শিল্পতত্ত্বের একান্ত অনুগামী। এই অধ্যাত্মভাবনা বৈদান্তিক নয়, ঔপনিষদও নয়; এই জীবনদর্শন তান্ত্রিকের। তন্ত্রের মূল তত্ত্ব এমন কৌশলে শিল্প-আলোচনায় প্রযুক্ত হয়েছে যে, অতি-আধুনিক তন্ত্রদ্বেষী উন্নাসিক সমালোচকও তাতে আপত্তির কিছু খুঁজে পাবেন না। বৈদান্তিক শঙ্করপন্থী ভিন্ন অপর কোন সাহিত্যরসিক বিভিন্ন সমালোচক-সমর্থিত তান্ত্রিক লীলাতত্ত্ব অস্বীকার করতে পারবেন না। ঐ সমালোচনা-পদ্ধতি ও তার সিদ্ধান্তসমূহের ভুল মাত্র তখনই ধরা যাবে যখন তান্ত্রিক জীবনদর্শনের ভুল প্রমাণিত হবে। তান্ত্রিকের মতে, জীবনের মূল সত্যটি পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বা বহিঃপ্রকাশের দিক থেকে এ তত্ত্বকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া চলে না। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত, সুধীরকুমার দাশগুপ্ত প্রভৃতি সমালোচকবৃন্দ তাঁদের কাব্যবিচারে জ্ঞানে বা অজ্ঞানে তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত লীলাতত্ত্বটি পূর্ণভাবে অনুসরণ ক'রে তন্ত্রের জীবনরস রসিকতা স্থূলতার আবরণমুক্ত যুগপোযোগী পরিচ্ছন্ন ভাষায় প্রকাশ করেছেন। সুরেন্দ্রনাথ, অতুলচন্দ্র এবং সুধীরকুমার সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের অনুগমনের দ্বারা লীলাতত্ত্বে উপস্থিত হয়েছেন।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে জীবনকে স্বীকার না করলে সাহিত্যকে স্বীকারের প্রশ্ন ওঠে না। আর জীবনকে স্বীকার করলে লীলাতত্ত্ব না মেনে উপায় নেই। সংস্কৃত আলঙ্কারিকরা এই জন্যে অলঙ্কারশাস্ত্রের চর্চাকালে তাঁদের কলাতত্ত্ব তান্ত্রিক লীলাতত্ত্বের ওপর স্থাপন করেছেন। আলঙ্কারিকগণ যে তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত শিবশক্তিতত্ত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তার বহু প্রমাণ আছে।

শব্দার্থের মধ্যে পার্বতী-পরমেশ্বর সম্পর্ক কল্পনা একটি প্রমাণ।

তন্ত্রের অবনতির যুগে যে ক্লিন্ন কদাচার তন্ত্রে প্রবেশ করেছিল সেগুলি তিরস্কারযোগ্য হলেও বাঙালি সমালোচকবৃন্দ জীবনরসপ্রীতির আকর্ষণে তন্ত্রের মূল তত্ত্বগুলি সাগ্রহে কাব্যসৃষ্টিতে ও সাহিত্য সমালোচনায় প্রয়োগ করেছেন। এ-বিষয়ে প্রথম কুণ্ঠাহীন স্বীকৃতি দেখা যায় মোহিতলাল মজুমদার মহাশয়ের রচনায়।

প্রকাশভঙ্গিতে যত তারতম্যই থাক, শিল্পতত্ত্বনির্দেশে মোহিতলাল রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে এক পথের পথিক—তাঁদের সকলের প্রেরণার উৎস একই লীলাতত্ত্ব। নলিনীকান্ত ও মোহিতলালের প্রকাশ-ভঙ্গিতে পার্থক্যের কারণ, শ্রীঅরবিন্দের শান্ত চেতনা নলিনীকান্তের শিল্পবোধকে স্পর্শ করেছে; মোহিতলাল একটু অসহিষ্ণু ও রুক্ষভাষী। উভয়ের তন্ত্রভক্তি যে এক-পর্যায়ভুক্ত, সমালোচনার কাজে পুরুষ প্রকৃতিতত্ত্বের প্রয়োগপ্রবণতা তার অভ্রান্ত প্রমাণস্বরূপ।

ভুল বোঝা পরিহার করার জন্যে ব'লে রাখা ভালো যে, পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্ব বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যে তন্ত্র থেকে গৃহীত হয়েছে, সাংখ্য থেকে নয়; সকলেই জানেন, নাস্তিকশিরোমণি সাংখ্যদর্শনকার কপিলের মতে পুরুষ প্রকৃতির মিলন অবাঞ্ছনীয়; কিন্তু তন্ত্রের মতে, শিব-শক্তির সংযোগই পরমানন্দের হেতু। এই তত্ত্বের প্রয়োগ সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের মতোই নলিনীকান্ত ও মোহিত-লালের মতো বহু বাঙালি সমালোচকের শিল্পালোচনার একটি প্রধান কথা। সংস্কৃত আলঙ্কারিকদের সমর্থক সুধীরকুমার এ-বিষয়ে লিখেছেন: "অর্ধনারীশ্বরের উপমা, এমন-কি ধর্মপতি ও ধর্মপত্নীর উপমাও সমধিক সার্থক। সেখানে উভয়ে ভিন্ন জাতি এবং দৃশ্যতও ভিন্ন, কার্যতও কেহই স্বয়ংস্বতন্ত্র ও পূর্ণ নহেন; উভয়ের মিলনে উভয়ে উভয়ের পরিপূরক হইয়া পরম ঐক্য ও পরম পূর্ণতা লাভ করে।" মোহিতলালের মতে: "বাঙালির দেহ-মন-প্রাণের পূর্ণ প্রস্ফুটনের ইতিহাস ঐ তন্ত্রসাধনাতেই মিলিবে। প্রকৃতি ও পুরুষের অভেদ-তত্ত্বের উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা। এই যে তন্ত্র-তত্ত্ব, ইহা আধুনিক "ফিলজফি" নয়—চির-যুগের জীবন-সত্য। নারীই পুরুষের অদৃষ্টচক্রের প্রধান কীলক। কাব্যের বহিরঙ্গে যেমনই হউক, তদ্দেশে তান্ত্রিক শিবশক্তিবাদের একটা অতি গূঢ় প্ররোচনা রহিয়াছে। প্রকৃতিরূপিণী নারীকেই পুরুষের জীবনে সিদ্ধি ও অসিদ্ধির হেতুরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখা যায়।" নলিনীকান্ত বলেন: "পুরুষ ও নারীর নিত্যসম্বন্ধ প্রয়োজন, মানুষ যাহাতে পূর্ণতা লাভ করিতে পারে। নারী হইতেছে প্রকৃতি—মূর্ত জীবন। পুরুষ ও প্রকৃতির সংযোগেই সৃষ্টি। পুরুষ একা অর্ধেক মাত্র, নারীও একা অর্ধেক মাত্র। পুরুষ ও নারী একত্রিত হইয়াই আপন আপন পূর্ণতা লাভ করিবে। জীবন যাহাতে হয় অন্তরাত্মার ভাগবত পুরুষের প্রকাশ, ভোগ যাহাতে হয় এই অন্তর্যামীরই রসানুভূতি, সেজন্য পুরুষকে নারীকে একটা সাধনার উপর ভর করিয়া চলিতে হইবে। নারী হইতেছে শক্তি—এই নারীশক্তির স্পর্শ বিনা পুরুষের পূর্ণ জাগরণ, অখণ্ড আত্মোপলব্ধি হয় না।"

উদ্ধৃতিসমূহ এ-সত্য প্রমাণ করে যে, তন্ত্রোক্ত পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্ব আধুনিক বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের তিনজন খ্যাতনামা সমালোচককে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে। মোহিতলাল লেখক-বিশেষের সাহিত্য সমালোচনাকালে ঐ তত্ত্বের দ্বারা কি প্রচণ্ডভাবে অভিভূত হয়েছেন, তার একটু নমুনা দেওয়া যাক:—

"কপালকুণ্ডলায় সর্বপ্রথম এই তত্ত্ব উঁকি দিয়াছে সেখানে নায়িকার প্রকৃতিমূর্তি অতিশয় সরল—স্বভাব উদাসীন। তাহার নারীরূপও অসম্পূর্ণ, তাই নায়ক কোন সাধনারই সুযোগ পাইল না। নগেন্দ্রনাথের শক্তি অনুকূলা হইলেও দুর্বলা, তাই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া কোনরূপে রক্ষা পাইল, প্রকৃতির দয়ায় প্রাণ পাইল মাত্র কিন্তু পৌরুষ রহিল না। গোবিন্দলালের শক্তি প্রতিকূলা, কিন্তু সে বীরাচারী সাধক বলিয়া শেষ পর্যন্ত জয়ী হইয়াছে।" নলিনীকান্ত এত দূর না গেলে বলেছেন: "আবাল ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী শঙ্করকে সাধনার পূর্ণতার জন্য জনৈক রাজার ভোগীর দেহ আশ্রয় করিয়া প্রেমের দীক্ষা লইতে হইয়াছিল—আর,

দীক্ষার বীজ দিয়াছিল উভয়ভারতী—একজন নারী।"

এখানে তন্ত্রের মূল তত্ত্ব নিয়ে অবান্তর আলোচনা না ক'রে কেবল এটুকু বলাই যথেষ্ট যে, এই দুই সমালোচকই নিজের নিজের থিওরি বা তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার অতিরিক্ত ব্যগ্রতার উৎকট যুক্তিহীনতার পরিচয় দিয়েছেন। নগেন্দ্রনাথ কোন রকমে রক্ষা পেয়েছেন আর গোবিন্দলাল জয়ী হয়েছেন, এ-কথা পাগলের কল্পনামাত্র। নগেন্দ্রনাথ আজীবন অনুতাপের বিষদাহে জলবেন আর গোবিন্দলাল সে-দাহ সহ্য করতে না পেরে হয় আত্মহত্যা করবেন নয় সন্ন্যাসগ্রহণে স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবেন—এই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের সুস্পষ্ট নীতি-নির্দেশ, মোহিতলালের বঙ্কিমচন্দ্র-পাঠ যে কিভাবে তত্ত্বের তাড়নায় বিপথগামী হয়েছিল, ঐ হাস্যকর মন্তব্যই তার প্রমাণ। তা ছাড়া নগেন্দ্রনাথের সূর্যমুখী-শক্তিটি মোটেই দুর্বলা ছিলেন না; গোবিন্দলালের ভ্রমর-শক্তি নারীহন্তা স্বামীকে পুনর্গ্রহণে অনিচ্ছুক হলেও তার অনুরোধেই মাধবীনাথ গোবিন্দলালকে ফাঁসীর হাত থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন। এই ব্যাপারে গোবিন্দলালের বীরাচারের কোন প্রমাণ নেই। আর নলিনীকান্ত শঙ্কর-জীবনীর যে-অপব্যাখ্যা করেছেন, তা লজ্জাকর মানসিক অসাধুতার সাক্ষ্য দেয়। শঙ্করাচার্য বৈদান্তিক সাধনার পূর্ণতার জন্যে ভোগী রাজদেহ গ্রহণ করেন নি—অথচ তাঁর সাধনা বলতে মায়াবাদী তপস্বীর সাধনাই বোঝায়, অমরু-শতকের সাধনা নয়। ঐ দেহান্তর গ্রহণের কল্পনাবিলাসী আখ্যানটি যদি নিখুঁত সত্য বলেও মেনে নেওয়া যায়, তা হলেও তার মধ্যে প্রেমের দীক্ষার প্রশ্ন কেমন ক'রে আসে আর সে-দীক্ষা উভয়ভারতীই বা দিলেন কখন? শঙ্কর স্বয়ং দেহান্তর পরিগ্রহ ক'রে যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, উভয়ভারতীর পরামর্শে নয়; সুতরাং উভয়ভারতীর দীক্ষাদানের কথা উঠতেই পারে না; তর্কেও তিনি বিনা যুদ্ধে শঙ্করের কাছে পরাজয় স্বীকার করেছিলেন, যে-গর্হিত মনোভাব নিয়ে উভয়ভারতী চিরকুমার ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী শঙ্করকে যৌনবিষয়ক প্রশ্ন করেছিলেন, তা কঠোরভাবে নিন্দনীয়। তত্ত্বের ছাঁচে সাহিত্য-সন্দেশকে ঢালতে গিয়ে এই দুই সমালোচক তাঁদের পাক নষ্ট ক'রে ফেলেছেন।

সংস্কৃত আলঙ্কারিকবৃন্দ থেকে মোহিতলাল পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক সমালোচক যে-শিল্পতত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, তার যথার্থতা নির্ভর করছে তন্ত্রশাস্ত্রের মূল সত্যের যাথার্থ্যের ওপর। সাম্প্রতিক কালে শশিভূষণ দাশগুপ্ত এই সমালোচক-গোষ্ঠী থেকে একটু সরে গিয়ে কড্ওয়েল-পন্থা গ্রহণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু মার্ক্সীয়-পন্থা সঙ্কীর্ণতর ও অযৌক্তিক যার জন্যে রবীন্দ্রনাথ সক্ষোভে বলেছিলেন: মার্কসিজ্মের কোন্ গোয়ঙ্খান আমার সম্মুখে? এখন আমাদের হয় তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত লীলাতত্ত্ব ও তার ওপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় তথা বাংলা কাব্যতত্ত্ব মেনে নিতে হবে, নয় অন্য কোন মুক্তদৃষ্টি সত্যসন্ধ সমালোচন-প্রক্রিয়া নির্ধারণ করতে হবে যার দ্বারা সাহিত্য ও সাহিত্যিকের স্বরূপলক্ষণ ও সৃষ্টিপ্রতিভা আরও ভালো করে ব্যাখ্যা করা যাবে।

পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্ব মেনে নিয়ে সমালোচনা করতে বসলে সমালোচককে বলতে হয়, কোন শিল্পী বড় লেখক, সঙ্গীতজ্ঞ, গায়ক, চিত্রকর ইত্যাদি হতে পারেন না যদি তিনি রমণীর প্রেরণা লাভ না করেন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ এ সম্বন্ধে অত্যন্ত কৌতূহল-উদ্দীপক কয়েকটি কথা বলেছেন:—

"স্ত্রী-পুরুষের সত্তা শুধু কেবল দেহকে নিয়ে তো নয়। তাদের মনঃশরীর আছে। এই মনঃশরীরের প্রকৃতিতে সাধারণত: যে একটি প্রভেদ আছে, তার সত্তা নির্ণয় না করেও তাকে বুঝতে বাধে না। মানব-সভ্যতাকে সৃষ্টি করে তোলা মুখ্যভাবে পুরুষের দ্বারা ঘটেছে। এই সৃষ্টিকার্যে মেয়েদের ব্যক্তিরূপের যে-প্রভাব, সে হচ্ছে পুরুষের চিত্তকে গৌণভাবে সক্রিয় করে তোলা। আমাদের দেশের জ্ঞানীরা স্ত্রী-পুরুষের মনোমিলনের এই রহস্যকে স্বীকার করেছেন, তাই মেয়েদের বলেছেন, শক্তি—অর্থাৎ জৈব-সৃষ্টিতে পুরুষের যে স্থান, মানস-সৃষ্টিতে সেই স্থান মেয়েদের। মেয়েরা যে-রহস্যময় আকর্ষণে পুরুষদের চিত্তকে টানে তাকে ইংরেজিতে

বলে চার্ম, বাংলায় তাকে বলা যেতে পারে হ্লাদিনী-শক্তি।" (তীর্থঙ্কর—দিলীপকুমার রায় বিরচিত, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১২৫-২৬ পৃষ্ঠা)।

রবীন্দ্রনাথ এই মন্তব্যের প্রয়োগ যদি মাত্র নিজের ও দুচার জন অনুগামীর ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাখতেন তা হলে কোন মতভেদের প্রসঙ্গ উঠতে পারত না। কেন-না, বহু পুরুষ যে নারীর কাছে প্রেরণা পাচ্ছেন ব'লে অনুভব করেন এ-কথা অপ্রতিপাদ্য। কিন্তু এ নিয়ে কোন সাধারণ নিয়মের অস্তিত্ব কল্পনা করা চলে না বা তার দ্বারা সাহিত্য-বিচারের মাপকাঠি নির্মাণ করা যায় না। রবীন্দ্রনাথ নারীর চার্ম বা হ্লাদিনী-শক্তির ব্যাপারটা ধর্মের ক্ষেত্র পর্যন্ত প্রসারিত ক'রে বিভ্রান্তি ও প্রমাদ সৃষ্টি করেছেন। তীর্থঙ্কর গ্রন্থে ও প্রবাসী ষষ্টিবার্ষিকী স্মারকগ্রন্থে দিলীপকুমার লিখিত রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমারের কথোপ-কথনে যে-সব চিত্তাকর্ষক মন্তব্য উল্লিখিত হয়েছে তা থেকে মাত্র এই সত্যটুকু উদ্‌ঘাটিত হয় যে, রবীন্দ্রনাথ ও দিলীপকুমার নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে নারী-সাহচর্যে প্রেরণা-উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। এ হল তাঁদের দুজনের একান্ত মন্ময় বা আত্মগত অভিজ্ঞতা যাকে ইংরেজিতে বলে Entirely subjective experience। এই মন্ময় উপলব্ধির ভিত্তিতে কোন সাধারণীকরণ চলতে পারে না; কারণ, এর কোন বাস্তব নজির নেই।

সবচেয়ে মারাত্মক সিদ্ধান্ত যা রবীন্দ্রনাথ নিয়েছেন তা হল এই :-

"নারী প্রকৃতি থেকে প্রবাহিত এই জীবনীধারার জন্যে পুরুষচিত্ত আপন সার্থকতার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করে একথা আমরা সব সময়ে জানি না। এরই অভাবে যে আমাদের কৃতিত্বের কৃশতা ঘটে সে-সম্বন্ধেও সব সময়ে আমরা সচেতন নই। কিন্তু এ-কথাটা আমরা ধ'রে নিতেই পারি যে, পুরুষচিত্তের সম্পূর্ণতার জন্যেই নারীশক্তির প্রভাব নিতান্তই চাই। এমন কি আধ্যাত্মিক সাধনাতেও।" (তীর্থঙ্কর, ১২৭ পৃষ্ঠা)

এই রকম মন্তব্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু প্রবন্ধে,পত্রে, কবিতায় বারবার করেছেন, কেবল দিলীপকুমারের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময়ে নয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্রে তো নয়ই, এমন কি শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রে এই ভ্রমপূর্ণ সিদ্ধান্ত মোটেই মানা চলে না কেন, তা দেখা যাক।

গৌতম উনত্রিশ বছর বয়সে সুন্দরী পত্নী ও শিশু পুত্রকে পরিত্যাগ ক'রে পথে বেরিয়ে আসেন। তন্ত্র মতে, তিনি তাঁর শক্তিকে অবহেলাভরে পরিত্যাগ করেন। দীর্ঘ বারো বছর কঠোর তপস্যার পর একচল্লিশ বছর বয়সে বুদ্ধত্ব বা সিদ্ধিলাভ করার পর তাঁর সেবা করার সুযোগ সুজাতা পেয়েছিলেন, তার আগে নয়। তপঃসিদ্ধির পূর্বে গৌতম সুজাতার সান্নিধ্যে স্থূল বা সূক্ষ্ম কোন ভাবেই আসেননি। খ্রীষ্ট সম্বন্ধেও স্মরণ রাখা চাই যে, খ্রীষ্টত্ব লাভের আগে কোন নারীর সান্নিধ্যে তিনি আসেননি—মেরি মার্থা তাঁকে ভক্তি নিবেদন ক'রে নিজে ধন্য হয়েছে, কিন্তু তাঁকে পূর্ণ করেনি। দীর্ঘ আঠারো বছরের অজ্ঞাতবাসের সাধনায় তিনি আগে থেকেই পূর্ণ হয়েছিলেন। সুতরাং বুদ্ধ ও খ্রীষ্ট সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যের মধ্যে কোন প্রমাণ বা যুক্তি নেই। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর দ্বিতীয়া পত্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে আদৌ সহ্য করতে পারতেন না, সন্ন্যাসগ্রহণের পর তিনি কখনও স্ত্রীর মুখদর্শন পর্যন্ত করেননি। স্ত্রী রক্ষণাবেক্ষণের কোন ব্যবস্থাও তাঁকে করতে দেখা যায়নি অথচ সাধনায় তিনি ব্যর্থ হয়েছিলেন, একথা কোন পাষণ্ডই বলবে না। সুতারাং তান্ত্রিকের শিবশক্তিতত্ত্ব এখানে ব্যর্থ। খ্রীষ্ট ও চৈতন্য, দুজনেই ব্রহ্মচর্য ও প্রকৃতিবর্জনের পক্ষপাতী ছিলেন, বিবেকানন্দ স্বামী ব্রহ্মচর্যের কত অনুরাগী ছিলেন, তা সকলেই জানেন। অবশ্য কর্মোপলক্ষে খ্রীষ্ট ও বিবেকানন্দকে নারী সান্নিধ্যে আসতে হয়েছে কিন্তু সে নারী শক্তিরূপিণী নয়। চৈতন্য আবার মেয়েদের ছায়াও মাড়াতেন না। শিষ্যদের সম্বন্ধেও তাঁর এ ব্যাপারে নিষেধ ছিল কঠোরতম। এরকম লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধর্মের সাধকদের ক্ষেত্রে আছে যেখানে নারীকে সর্বতোভাবে বর্জন করেই পুরুষ সিদ্ধিলাভ করেছে। বস্তুত এটাই সাধারণ নিয়ম। কারণ, অধ্যাত্মসাধনার পথ চিরকাল

"একেলার পথ"; এ পথে শুধু নারী বিবর্জিতা নয়, গুরুরও বেশি কিছু করার নেই; "সে বড় কঠিন ঠাঁই, গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।" অবশ্য এ-যুগের রেশমী গেরুয়া-পরা সৌখিন বামাসঙ্গী সাধুবাবাদের কথা স্বতন্ত্র যাঁরা বুঝতে চান না যে, সংসারে বিতৃষ্ণ হয়ে সব কিছু ছেড়ে সন্ন্যাস নেওয়া আর নারী-সাহচর্য না পেলে কৃতিত্বের কৃশতা ঘটবে বলে ধারনা ধরা সম্পূর্ণ পরস্পরবিরোধী ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথের মতো জগদ্বরেণ্য স্রষ্টার মুখে এমন তন্ত্রশাস্ত্রসম্মত কথা শুনে আধুনিক তন্ত্রদ্বেষীরা চমকে উঠবেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু বাংলাদেশে তথা বাংলা-সাহিত্যে এটাই স্বাভাবিক। শ্রীঅরবিন্দ ইউরোপীয় সংস্কৃতিরসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন এবং বাংলা-ভাষায় প্রায় কিছুই লেখেননি। কিন্তু তন্ত্রশাস্ত্রের প্রভাবে তাঁর বাঙালি মন লিখতে বাধ্য হয়:—

"তবে কামপ্রবৃত্তির বাহ্য শরীর ভোগ বাদ দিলেও কামের তত্ত্বটি দিব্যজীবনের পার্থিব ক্ষেত্র হতে বহিষ্কৃত করে রাখা যায় না। তাকে ছাড়া সৃষ্টি হতে পারে না। পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্বের অভিব্যক্তি হতে পারে না। পুরুষ-প্রকৃতি হল বিশ্বতত্ত্ব, সৃষ্টির জন্য উভয়ের প্রয়োজন। আবার উভয়ের পারস্পরিক সহযোগ বিনিময় প্রয়োজন অন্তঃকরণের ক্ষেত্রে সেই একই তত্ত্বের বিকাশের জন্য; এই যুগ্ম তত্ত্বেরই প্রকাশ জীব ও প্রকৃতি বিশ্বলীলার সমগ্র প্রক্রিয়ার মূলে রয়েছে যে দ্বৈত। দিব্য জীবনেও তাই এই শক্তিদ্বয়ের শরীর বিগ্রহ, অন্তত কোন প্রকার জাগ্রত সান্নিধ্য থাকা একান্ত আবশ্যক—তা না হলে নূতন সৃষ্টি সম্ভব হবে না।" এ মত রবীন্দ্র-নাথের মন্তব্যের অনুরূপ।

বাঙালির আত্মাপুরুষ গঠিত হয়েছে তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব যুগল প্রভাবের সম্মিলনে। মূলত শিবশক্তিতত্ত্ব আর রাধাশক্তি বা হ্লাদিনী শক্তিতত্ত্ব একই ভাব। বহু মনীষী ইতিপূর্ব্বে বলেছেন যে, বাঙালিকে বুঝতে বা চিনতে হলে তার অন্তঃপ্রকৃতি যে-দুই ধাতুতে নির্মিত, সে-ভাবধারা দুটিকে চিনতেহবে। যে বাঙালি হয়েও বলে যে, তন্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্র যা বলে তা মানা ঠিক নয়, এবং সে নাকি বাঙালিই নয় এবং বাঙালিও তাকে কখনও আপনার জন ব'লে ভাবতে পারে না। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নিপুণভাবে বিষয়টি বিভিন্ন প্রবন্ধে বারবার ব্যাখ্যা করেছিলেন। নিহার-রঞ্জন রায়ও তাঁর বিরাটকায় ইতিহাসগ্রন্থে বাঙালির বেদান্ত-বিদ্বেষ প্রসঙ্গে ঐ একই কথা বলেছেন। মোহিত-লাল এই মতের প্রধান প্রবক্তা। জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যে বাঙালি সাহিত্যিক নিজের রচনায় শিবশক্তিতত্ত্ব স্বীকার না করেছেন, তাঁর রচনার কোন ভবিষ্যৎ নেই। বাঙালির কাছে "ভোগো মোক্ষায়তে" ভিন্ন অন্য বৈরাগ্যপন্থী আধ্যাত্মিকতা অসহ্য। শ্রীচৈতন্যের বৈরাগ্য পছন্দ না হওয়ায় বাঙালি তাঁকে পত্নীপ্রেমিক দেখিয়ে অমিয় নিমাই চরিত লিখে কেবল ইতিহাসের আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন ক'রে। অভেদানন্দের "বৈরাগ্যমেবাভয়ম্" বাণী পছন্দ হল না সাংসারবিতৃষ্ণ দিলীপকুমারেরও। পুরুষ-প্রকৃতির মিলন-কাহিনী ও প্রণয়রহস্য-বিবর্জিত সাহিত্য বাঙালি পাঠকের কাছে নিতান্ত দুষ্পাচ্য। আমাদের বিখ্যাত সাহিত্য-সমালোচকেরা বহুদিন থেকে এই অভিমত প্রবলভাবে প্রচার করে আসছেন। রবীন্দ্রনাথ নারীবিবর্জিত জীবন-সাধনার প্রতি এত বিতৃষ্ণ যে, এমন কথাও বলেছেন: "পরকীয়া সাধনের তত্ত্বটা মিথ্যা নয়—তার মানেই হচ্ছে পরকীয়া নারী আমার বাধ্য নয় ব'লেই আমার 'পরে তার শক্তি এত প্রবল, তার প্রেমের এত মূল্য।" অর্থাৎ তাঁর মতে একক সাধনের চেয়ে পরকীয়া-সাধনও বাঞ্ছনীয়। নলীনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলেছেন: "আমাদের কেমন একটি ধারণা আছে সাধনা বুঝি একলাই ভালো হয়। এটি আমাদের মধ্যে সন্ন্যাস-বাদের সংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়।" প্রায় সমস্ত বাঙালী সাহিত্যিক ও সমালোচক বেদান্তবিরোধী ও শঙ্করবিদ্বেষী, যার কারণ, উত্তর ভারতের চেয়ে দক্ষিণ ভারতের ভক্তিধর্ম বাংলাদেশে বেশি প্রসারলাভ করেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, তন্ত্র ও বৈষ্ণবশাস্ত্রের মূল কথা পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব মেনে নিয়ে বাংলায় সাহিত্য ও

সমালোচনা-সাহিত্য গড়ে উঠছে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাত্মসাধনার অনুরাগী ছিলেন না। তিনি ঐ তত্ত্ব নিয়ে মাথা না ঘামিয়েও শ্রীকান্ত উপন্যাসে লিখেছেন, রমণীর ভালোবাসা পুরুষের পক্ষে ইঞ্জিনের পক্ষে আগুনের মতো। এ সব মন্তব্য ক্ষেত্রবিশেষে সুপ্রযুক্ত হতে পারে; কিন্তু এগুলির ভিত্তিতে সাধারণীকরণ সব সময়ে বিপজ্জনক; কারণ, বাস্তবে এমন অপদার্থ পুরুষ অনেক দেখা যায় প্রাণপণে ভালোবেসেও মেয়েরা যাদের পৌরুষ বা মনুষ্যত্ব সক্রিয় করে তুলতে পারে না; এমন তেজস্বী পুরুষেরও সন্ধান মেলে যদিও সংখ্যায় কম, যে স্বচ্ছন্দে বলে: রমণীতে নাহি সাধ, রণজয় গাও রে! সুতরাং পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব মাত্র জৈব-সত্য, তা কোন সুনিশ্চিত ভাবসত্যকে উপস্থিত করে না। পুরুষ ও প্রকৃতির মিলন ভিন্ন জীব-জন্ম সম্ভবপর নয় বটে, কিন্তু মানসসৃষ্টি বা ভাবস্ফুরণের জন্যে পুরুষ ও প্রকৃতির পারস্পরিক সাহচর্য মোটেই অপরিহার্য প্রয়োজন নয়।

বাংলা পৃথিবীর একমাত্র সভ্যদেশ নয়; অন্যান্য সভ্যদেশের সাহিত্যসমালোচক এবং জগদ্বিখ্যাত সাহিত্যিক-মনীষীরা পুরুষ-প্রকৃতিতত্ত্ব আদৌ স্বীকার করেন না। একমাত্র ইহুদি মনোবৈজ্ঞানিক সিগ্‌মুণ্ট ফ্রয়ড্‌ ছাড়া আর কেউ যৌন প্রেরণাকে প্রাতিভ সৃষ্টির কাজে বিশেষ মূল্যবান বলে মনে করেন না। পাশ্চাত্য সাহিত্যসমালোচক মাত্র একটি মতবাদ বা তত্ত্ব দিয়ে সাহিত্যবিচার করেন না। মনোরমা ও শ্রীর মতো দুটি রহস্যময়ী নারীচরিত্র পশুপতি ও সীতারামের মতো পুরুষ চরিত্রের শক্তি, এ কথা বলতে পারাই শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের রোমান্টিক প্রতিভার যোগ্য মর্যাদাদান, এমন কথা স্বীকার করা যায় না। তা ছাড়া ঐ তত্ত্ব যে মূলতঃ অন্তঃসারশূন্য তার প্রমাণ প্রচুর। বাল্মীকির মহাকাব্যের প্রেরণা কোন নারীচরিত্র নয়, রামের পুরুষচরিত্র; "মা নিষাদ" শ্লোকের উপজীব্যও ক্রৌঞ্চবিরহব্যথাতুর কবিচিত্তের করুণরস নয়, অকারণ পক্ষীহত্যায় ক্রুদ্ধ ঋষির রৌদ্রভাবসঞ্জাত উচ্ছ্বাস। রত্নাকরের বাল্মীকি হয়ে ওঠার মধ্যে ব্রহ্মা ও নারদের বুদ্ধিকৌশল এবং রাম নামের মহিমাই প্রতিভাত। মহাভারতের দুটি শ্রেষ্ঠ পুরুষচরিত্র ভীষ্ম এবং কর্ণ—নারীর প্রেরণার সাহায্য না নিয়ে চরিত্র দুটি কীর্তিতে ভাস্বর। তুলনায় অর্জুন অপদার্থ, লম্পট, দৈবানুগ্রহজীবী, দ্বিজেন্দ্রলালের মতো তেজস্বী সমালোচকের বিচারে জঘন্য চরিত্র পণ্ড। ইলিয়াদ মহাকাব্যে হেলেনের স্থান কতটুকু? গ্রিকজাতি যুদ্ধ করেছিল জাতীয় মানরক্ষার জন্যে। অদিসি মহাকাব্যে নারীর প্রাধান্য আরো কম। মহাভারত পাঠের পর কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, কর্ণ, দুর্যোধন—এই সব চরিত্রের কথা মনকে যতটা নাড়া দেয়, দ্রৌপদী, কুন্তী এমনকি গান্ধারীও তা পারেন কি? মহাদার্শনিক সোক্রাতেস, মহা নাট্যকার শেক্‌স্‌পিঅর, জর্মন জ্ঞানতপস্বী শোপ্‌ন্‌হাউঅর, নিট্‌শে, বাঙালি মহানায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র—এঁরা কেউ রমণীর অনুপ্রেরণার জোরে কীর্তিমান্‌ হননি। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের জীবনে কোন নারীর প্রভাব ছিল না। বরং এমনসব শিল্পীর সন্ধান পাওয়া যায় যাঁরা নারীদের দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে তা নিয়ে বিলাপ না ক'রে অনায়াস পৌরুষে স্থায়ী যশ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

স্ত্রীলোকদের প্রেরণাদানশক্তির সম্বন্ধে বিখ্যাত মনীষী-সাহিত্যিক এইচ, জি ওয়েল্‌স্‌ বলেছেন: "নারীর মন থেকে এই মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা একেবারে মুছে ফেলতে হবে যে, সে হতে পারে কোন পুরুষের জীবনের মুকুটমণি, তার কাজের অনুপ্রাণনা, তার প্রেরণা। বিশেষ ধরনের পুরুষদের পক্ষে মেয়েরা কর্মপ্রেরণাস্বরূপিণী হয়ে থাকতে পারে, কিন্তু তা হল স্বতন্ত্র বক্তব্য। মূলত কোন স্ত্রীলোকের জন্যে কখনও কোন পুরুষ কোন মহৎ সৃষ্টির কাজ করেনি—চমৎকার চিত্রণের কাজ, দার্শনিক বা পর্যটকরূপে কোন সূক্ষ্ম অনুসন্ধিৎসার চরিতার্থতা, কোন শিল্প-সংগঠন, রাজ্যে শৃঙ্খলাবিধান, যন্ত্র সমূহের উদ্ভাবন,

তাজমহল? তা হলে মনে করিয়ে দিতে হবে যে, দেওয়ান-ই-আম' দেওয়ান-ই-খাস, মোতি মসজিদ ইত্যাদি যে-প্রেরণায় শাহ্-এ-জাহান নির্মাণ করিয়েছিলেন, তাজমহলও তার দ্বারা স্থাপিত। ইতিহাস নির্মমভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, মমতাজের মৃত্যুর পর শাহজাহানের আচরণ ঠিক পত্নীবিয়োগবিধুর প্রেমিকের যোগ্য ছিল না।

তা হলে মানুষ প্রকৃত মহৎ সৃষ্টির কাজ করে কিসের জোরে? ওয়েল্‌স্ সে-প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন: "এ-সমস্ত কাজ পূর্ণভাবে এবং ভালো ক'রে কেবল তাদের নিজেদের জন্যেই করা যেতে পারে, ভেতর-থেকে-আসা এক সুনিশ্চিত তাগিদের জোরে। তারা প্রেরণা পায় সেই উর্ধ্বায়িত অহংবোধ থেকে আমরা যাকে বলি আত্মোপলব্ধি।"

এই আত্মোপলব্ধিই হল স্ত্রীপুরুষনির্বিশেষে সব মানুষের কর্মপ্রেরণার উৎস। এমনকি বংশরক্ষাও এর তাগিদেই করা হয়। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা—উক্তিটির অর্থও তাই, সুন্দরী ভার্যা সন্তান-জন্মদানে অসমর্থা হলে প্রেমিকপ্রবর তাকে তার প্রেরণার কোন তোয়াক্কা না রেখে তালাক দিতে একটুও ইতস্তত করে না—ইরাণের বাদশাহ কর্তৃক সুন্দরীশ্রেষ্ঠা সুরাইয়াকে পরিত্যাগ তার প্রমাণ। সন্তান জন্মের পর বহু রাজার কাছেই রাণীর চেয়ে বংশধরের মূল্য অনেক বেশি হয়ে গেছে। তার কারণ ঐ আত্মোপলব্ধির প্রেরণা। ফরাসি দার্শনিক-সাহিত্যিক আঁরি বের্গসঁ বলেছেন, সৃষ্টি-প্রতিভার মূলে আছে জীবনপুরুষের ধাক্কা—লেলাঁ ভ্যালাঁভ। আমরা বাঙালিরা জীবনকে বিরাটের পটভূমিকায় স্থাপন ক'রে দেখতে শিখিনা; তাই রমণীর প্রেমকে কেন্দ্র ক'রেই সাহিত্য গ'ড়ে ওঠে, নয় তো সে-সাহিত্য ভালো হয় না, এই আমাদের ধারণা। নিজেকে অতিক্রম করার চেষ্টাতেই মানুষ যুগে যুগে বড় হয়েছে—মাত্র যূপবদ্ধ পশুর মতো পুরুষ প্রকৃতিতত্ত্বের অনুবর্তন ক'রে নয়।

বাঙালি সাহিত্যিকের রচিত সাহিত্যবিচার করার সময়ে তাকে বোঝার জন্যে তন্ত্রের পুরুষপ্রকৃতিতত্ত্বের কথা স্মরণে আনতে হবে। কিন্তু একথাও মনে রাখতে হবে যে, এতকাল বাঙালি ঐ তন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে ব'লে বাংলাসাহিত্যে সবত্র পুরুষের ওপর প্রকৃতির আধিপত্য দেখা যায়। কিন্তু তার ফলে বাঙালির জীবনে পৌরুষের ভাগটা প্রণিধান-যোগ্যভাবে ক'মে গেছে। পাশ্চাত্যজগতে এমন সাহিত্য ও জীবন মোটে দুর্লভ নয়, যেখানে ঐ তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়। সে-সাহিত্য বুঝতে হলে বিশেষ কোন একটি মতবাদের দাসত্ব করা বাঙালি-সমালোচককে ছাড়তে হবে।

দীনবন্ধু চার্লস্ ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ

মিস্ মার্জ্জরী সাইক্স্

১৯০৬ খৃষ্টাব্দ

উত্তেজনাময় ভারতবর্ষে তখন মহা পরিবর্তনের সূচনা হচ্ছিল।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের "সিপাহী বিদ্রোহ" বা "স্বাধীনতা সংগ্রামের" পর প্রায় পঞ্চান্ন বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে। শিক্ষা, শিল্প, যান-বাহন প্রভৃতি সব ক্ষেত্রেই অগ্রগতির সূচনা হয়েছে। কিছু সংখ্যক শিক্ষিত ভারতবাসী ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েছেন। এ কাজে তাঁরা কিছু সহৃদয় ব্রিটেনবাসীর সক্রিয় সহযোগীতা লাভ করেছিলেন।

তারপর ১৯০৬ খৃষ্টাব্দ থেকে শুরু হল বর্ণ বৈষম্যের প্রভাব। ইংলণ্ডে "যুদ্ধ-বাজ" দুর্বার, স্বার্থপর রাজশক্তি প্রবল হয়ে উঠল। আর ভারতবর্ষে চলল "কাগজ কলমের" শাসন। সেখানে সরাসরি কোনও যোগাযোগ ছিল না শাসকের সঙ্গে শাসিতের। দেখা দিল বর্ণ বিভেদ—ইতি পূর্বে যা ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। ভারতবর্ষ এবং আফ্রিকা এই দুই দেশেই শিক্ষিত ভারতীয়দের পর্যন্ত রেল গাড়ীর প্রথম শ্রেণীর কামরায় আরোহণ বা ভ্রমণ করতে দেওয়া হত|না। অফিস সমূহে এবং নানাস্থানে প্রকাশ্যে তাঁদের নানাভাবে অপমান করা হত এবং সমস্ত "শ্বেত" স্থানে তাঁদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তদানীন্তন ভাইস্‌রয় সুদক্ষ লর্ড কার্জন বঙ্গ ভঙ্গের প্রস্তাব করে বাঙ্গালীদের ক্ষুণ্ণ করে অদূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। সুষিমার যুদ্ধে জাপানের হাতে রাশিয়ার পরাজয় উপলক্ষে যে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা হয়েছিল তাতে একটি কথাই প্রমাণিত হয়েছিল যে প্রাচ্যের কোন দেশও পাশ্চাত্যের কোন শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করতে সমর্থ।

বাস্তবিকই ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ ছিল উত্তেজনা-পূর্ণ। অসহযোগ, সন্ত্রাসবাদ, জাতীয় জাগরণ এবং সমাজতন্ত্রবাদের নিঃস্বার্থ সাড়া জেগেছিল। কিন্তু অধিকাংশ রাজপুরুষের মনে কেবলমাত্র সন্ত্রাসবাদের শঙ্কাই প্রবল আকার ধারণ করেছিল—ফলে তাঁরা আতঙ্কে হয়ে উঠেছিলেন দুর্ধর্ষ।

একজন লাহোরের একটি ইংরাজী সংবাদপত্রে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসন্তুষ্ট ব্যক্তির কাজ বলে আখ্যা দিয়েছিলেন এবং উচ্ছৃংখল বিদ্যালয়-বালকদের সহিত তাদের তুলনা করে ছিলেন। এই জাতীয় অপমান ভারতীয়দের কাছে এতই নগন্য মনে হত যে তাঁরা ইহাকে আমলই দিতেন না। কিন্তু কিছুদিন পরে এই সংবাদ পত্রেই অপর একজন 'সাহেবে'র প্রতিবাদ পত্র প্রকাশ করল। এই পত্রে উক্ত নির্দয় অবিচার ও দোষারোপের বিরুদ্ধে লেখক তীব্র প্রতিবাদ করে ভারতের জাতীয় নেতাদের প্রতি সসম্ভ্রম সমর্থন জানিয়েছিলেন। লেখক নিজের নাম ও আখ্যা প্রকাশ করে লিখেছেন, "সি, এফ্, এণ্ডরুজ, মিলিটারি চ্যাপ্‌লেন, সানবার, সিম্‌লা হিল্‌স।" লেখকের নাম ও আখ্যা ভারতবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কে এই বীরপুরুষ, যিনি এরূপ একটি দুর্গম স্থানে বাস করছেন?

আচ্ছা, কে তিনি?

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে চার্লস ফ্রিয়ার এণ্ডরুজ ভারতবর্ষে এসেছিলেন দিল্লীর সেণ্ট স্টিফেন্স কলেজের অধ্যাপক হয়ে। ইতিপূর্বে তিনি প্রভূত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। মেধাবী ছাত্র হিসাবে অধ্যয়ন শেষ করে তিনি লণ্ডনের বস্তী অঞ্চলে এবং উত্তর শিল্পাঞ্চলের দরিদ্র জনসাধারণের উন্নয়ন কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। কেম্ব্রিজের পেম্‌ব্রোক্ কলেজের সদস্য ছিলেন এবং ইতিহাসে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। তেত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত তাঁর রাজনৈতিক এবং সমাজ সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গী ছিল রক্ষণশীল। তিনি ছিলেন ঈশ্বরভক্ত কিন্তু তখন পর্যন্ত বিপ্লব ধর্মী ছিলেন না। জাতি ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের প্রতি ছিল তাঁর মানবিক প্রেম ও আন্তরিক স্নেহ। বিশেষ করে দুঃখী, নিঃসঙ্গ, অভাবগ্রস্ত হতভাগ্যদের প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর প্রীতি। এই প্রেম-প্রীতির মধ্যেই প্রকাশ হয়েছিল তাঁর ধর্মপ্রাণ হৃদয়ের।

ভারতবর্ষে এসে প্রথম সপ্তাহের মধ্যেই তিনি একজন বন্ধু লাভ করেছিলেন। তিনি হলেন সুশীলকুমার রুদ্র

বয়সে তিনি কয়েক বছরের বড় ছিলেন। স্বনামধন্য ভারতীয় জাতীয় খ্রীষ্টধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ছিলেন তিনি এবং সেন্ট ষ্টিফেন্‌স্ কলেজের উপাধ্যক্ষের কাজে রত ছিলেন তখন। রুদ্র মহাশয়ের সান্নিধ্যে এসেই এণ্ডরুজ প্রথম জাতীয় জাগরণের মর্ম উপলব্ধি করেছিলেন। ব্রিটিশ রাজত্বের কুপ্রভাবে দেশের জনগণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি রুদ্র মহাশয়ই তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে কিছুই জানতেন না। রুদ্র মহাশয়ের সহৃদয় বন্ধুত্ব তাঁকে "সিমলা সোসাইটির" বর্ণ বিদ্বেষের উর্ধে তুলেছিল। তাঁর উর্দু শিক্ষকের সঙ্গে দীর্ঘকাল মেলামেশা করেই তিনি সিমলা নীতি লঙ্ঘন করে প্রথম 'বিদ্রোহে'র সূচনা করেছিলেন। এই শিক্ষকই ছিলেন একমাত্র ভারতীয় যাঁর সঙ্গে সেখানে সাক্ষাৎ ঘটেছিল তাঁর।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দের গ্রীষ্মকালে অসুস্থ হয়ে পড়ায় এণ্ডরুজ দিল্লী ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি তখন সাময়িকভাবে সানবারে চ্যাপলেন নিযুক্ত হয়েছিলেন। সুশীল রুদ্র সেখানে তাঁর অতিথিরূপে কিছুদিন থাকার পর এণ্ডরুজ উপলব্ধি করলেন যে এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে তাঁর ব্রিটিশ সহকর্মীদের একজন এতই বিরূপ হয়ে উঠেছিলেন যে রুদ্রের পক্ষে সেখানে গিয়ে আবার থাকা সম্ভব নয়। বন্ধুর প্রতি এরূপ অপমানের জন্য এণ্ডরুজ যখন খুব লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ বোধ করছিলেন তখনই লাহোরের সংবাদপত্রে সেই অবমাননাকর চিঠি খানা পাঠ করেছিলেন। মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি এই চিঠির উত্তর লিখতে বসলেন।

সেই চিঠি এণ্ডরুজের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই চিঠি লেখার তিন মাসের মধ্যেই তিনি বহু সুপরিচিত ভারতীয় জাতীয়তা-বাদীদের সংস্পর্শে আসেন। লালা লাজপৎ রায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, তেজবাহাদুর সপ্রু এবং সর্বোপরি গোপালকৃষ্ণ গোখলের শ্রদ্ধা ও আস্থা অর্জন করতে পেরেছিলেন। বহু সংখ্যক সাময়িক পত্রে তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন নির্ভীকভাবে। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। কংগ্রেসের উক্ত অধিবেশনেই সভাপতি দাদাভাই নওরোজী সর্বসমক্ষে দাবি করেছিলেন যে, "যুক্তরাজ্যের মত আমাদেরও স্বরাজ চাই।" যে এণ্ডরুজ তাঁর যৌবনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কোন রকমের স্বায়ত্ব শাসন ক্ষমতা দানের বিরোধী ছিলেন তিনিই এখন সেই দাবিকে প্রকাশ্যে সমর্থন করলেন।

এইরূপে, ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভক্ত এণ্ডরুজ বিদ্রোহী এণ্ডরুজে পরিণত হলেন। যদিও মাঝে মাঝে রাজনৈতিক মতবাদের প্রকাশ হত কিন্তু এ বিদ্রোহ কোন রূপেই রাজনৈতিক বিদ্রোহ ছিল না। সর্বরূপে ইহা ছিল নীতিগত বিদ্রোহ। তাঁর বিদ্রোহ ছিল বর্ণ-গরিমার বিরুদ্ধে। বিদ্রোহ করেছিলেন তিনি জাত্যাভিমানের বিরুদ্ধে কারণ এগুলি মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধকে ক্ষুব্ধ করে। রাজনৈতিক সাম্য এবং স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়নি বলে তিনি বিদ্রোহ করেছিলেন। নিছক পাশ্চাত্যের অনুকরণে ভারতের মেকী আধুনিকতার বিরুদ্ধে ছিল তাঁর বিদ্রোহ কারণ এর প্রভাবে ভারতের বৈচিত্র্যময় জাগ্রত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা নষ্ট হচ্ছিল। যেখানে প্রচণ্ড দারিদ্র্য বর্তমান সেখানে তাঁর স্বজাতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিরাপত্তার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এবং পরবর্তী কয়েক বছর এণ্ডরুজের এই বিদ্রোহী মনোভাব সেন্ট ষ্টিফেন্‌স্ কলেজের উপর প্রচণ্ড প্রভাব বিস্তার করেছিল। ইংরাজ অধ্যক্ষ অবসর গ্রহণ করলে তিনি অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন এবং রুদ্রকে অধ্যক্ষ পদ দেবার জন্য জোর দাবি জানালেন। কলেজ কর্তৃপক্ষের রক্ষণশীল সভ্যদের সঙ্গে শুরু হল তাঁর সংগ্রাম। কিন্তু এণ্ডরুজ জয়লাভ করলেন। রুদ্রই প্রথম একটি খ্রীষ্টান কলেজের ভারতীয় অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন। তিনি একজন ভারতীয় উপাধ্যক্ষ নিযুক্ত করেছিলেন। তাঁর কাজে সাহায্য করার জন্য। এটি হল বর্ণগত সাম্যের জয়। এই জয়ের প্রভাব সেন্ট ষ্টিফেন্স কলেজের বাইরেও বহুদূর বিস্তার লাভ করেছিল। এণ্ডরুজ এবং রুদ্র উভয়ে মিলে অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় ছাত্রকে বর্ণগত সাম্যের স্বপক্ষে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

ওই বছরেই কলেজে শুরু হল শিক্ষা বিষয়ে স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের সংগ্রাম। ছাত্র আন্দোলনের আশঙ্কায় একটি সরকারী ইস্তাহার প্রচার করা হল যার নাম করা হয়েছিল "রিসলি সার্কুলার"। এতে সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ সমূহে কোনরূপ রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সেন্ট ষ্টিফেন্‌স্ কলেজ এই ইস্তাহার অগ্রাহ্য করল। পূর্ণ জাতীয় জীবন গঠনে এণ্ডরুজ যথাসম্ভব ছাত্রদের উৎসাহিত করেছিলেন এবং নিজেদের ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে সেই নব-ভারত গঠনের শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ভারত পুরাতনের যথার্থ মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। বিগত ষাট বছরে এণ্ডরুজের বহু ছাত্র দেশের মুক্তি-সাধনার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখে গেছেন।

এ কাজে সরকার অসন্তুষ্ট হলেন এবং কলেজের উপর সি, আই, ডির গুপ্তচরদের নজর পড়ল। স্বয়ং

এণ্ডরুজের পেছনেও গুপ্তচর নিযুক্ত করা হয়েছিল। একে অপরের উপর যাতে গোপন নজর রাখে সেজন্য ছাত্রদের প্ররোচিত করার চেষ্টা চলল। এই ব্যবস্থায় ছাত্রদের নৈতিক অবনতির আশঙ্কায় এণ্ডরুজ সঙ্কিত হয়ে উঠলেন। মানুষ যদি পরস্পরের উপর আস্থা স্থাপন করতে না পারে তবে ভারতবাসী ও ইংরেজের মধ্যে অথবা ভারতবাসীদের পরস্পরের মধ্যে প্রকৃত বন্ধুত্ব গড়ে উঠবে কি করে? পরবর্তীকালে বন্ধুত্ব ও প্রেমের বাণী প্রচার করে বিভিন্ন কাজে এণ্ডরুজ যখন ভারতবর্ষের নানা স্থান পরিক্রমা করে বেড়াচ্ছিলেন তখন তাঁকে "সরকারের গুপ্তচর" বলে অভিহিত করা হয়েছিল। তাহা তিনি নিরবে সহ্য করেছিলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে একজন জ্ঞানী এবং অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতবাসী কিরূপ তিক্ততার সহিত বলেছিলেন, "আমরা সোজা সরল হতে পারিনা—কারণ আমরা পরাধীন"। একথা এণ্ডরুজ সর্বদা মনে রাখতেন।

যে জাতীয় পরাধীনতা মানুষের পারস্পরিক বাস্তব সম্বন্ধের শক্তিকে বিনষ্ট করেছিল তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে গিয়েই এণ্ডরুজ প্রথম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সংস্পর্শে আসেন। তখন পর্যন্ত তিনি রবীন্দ্রনাথের কার্য্য সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। তিনি তাঁর লেখা রাজনীতি, সমাজ ও ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধাবলী পড়েছিলেন এবং দেখেছিলেন, স্বাধীনতা লাভের নৈতিক ও শক্তিশালী দাবির যে সুতীব্র অনুভূতি তাঁর হৃদয়ে জেগেছিল তাহাই যেন এই সব প্রবন্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ইংলণ্ডে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। সেই সময় থেকেই তিনি কবিকে গুরুদেব রূপে বরণ করে নিলেন এবং শান্তিনিকেতনের আশ্রম বিদ্যালয়কে তাঁর সাধনার ক্ষেত্র করে নিলেন। এণ্ডরুজকে কবি বিদ্রোহী ও ভক্ত এই দুই রূপেই চিনে নিলেন এবং ভালবাসলেন। যদিও এণ্ডরুজ ঘরছাড়া হয়ে পথের সন্ধানেই বেরিয়ে ছিলেন তথাপি রবীন্দ্রনাথের আদর্শের প্রতি তাঁর অত্যুৎসাহী অনুরাগ তাঁকে স্বাভাবিকভাবে ব্যাকুল করেছিল শান্তিনিকেতনে থেকে তাঁর বন্ধুকে সাহায্য করতে। বহুবার তিনি সেবাকার্য শেষ করে ফিরে এসে বলতেন, "এবার আমি সত্যি সত্যি এক জায়গায় স্থির হয়ে বসব"। কবি ভালভাবে জানতেন বলেই কপট গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে বলতেন "স্যার চার্লস, আমিও দেখব তোমার হাতে সর্বদা একখানা সদ্যপ্রকাশিত 'রেল-গাইড' বিরাজ করছে"।

ভারতবর্ষে আসার প্রথম দিকেই এণ্ডরুজ জি, কে, গোখলের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধান্বিত হয়েছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে এবং পরবর্তীকালে নাটালের নিপীড়িত ভারতীয় শ্রমিকদের স্বার্থে গোখলে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন তিনি গভীর অনুরাগের সহিত তার অনুগামী হয়েছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আন্দোলন করে গোখলে দক্ষিণ আফ্রিকায় সর্ব রকমের শ্রমিক নিয়োগ বন্ধ করে ছিলেন এবং ১৯১২—১৩ খৃষ্টাব্দে চিরদিনের জন্য এই প্রথা বন্ধ করার জন্য কঠোর চেষ্টা শুরু করলেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে বিভিন্ন অত্যাচারের প্রতিবাদে গান্ধীজী "ট্রান্স্‌ভাল্‌ যাত্রাভিযান" শুরু করলেন এবং গোখলে ভারতের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে গান্ধীজীর অভিযানের বার্তা প্রচার করলেন এবং সত্যাগ্রহের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন। এণ্ডরুজ তাঁর সমস্ত সঞ্চয় দান করতে চাইলেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তাঁর অন্তরের গুপ্ত বিদ্রোহী চেতনা অবশেষে আত্ম প্রকাশের পথ খুঁজে পেল। অধ্যক্ষ রুদ্র এবং ষ্টিফেনস কলেজের সহকর্মীরা বুঝেছিলেন যে বৃহত্তর কর্তব্য-সাধনে তাঁর ডাক এসেছে। সস্নেহে তাঁরা তাঁকে বিদায় দিয়েছিলেন। বাকী জীবনের পঞ্চাশটা বছর তিনি ছিন্ন মলিন বস্ত্রে ভারতের এবং পৃথিবীর সর্বত্র ব্যথিত চিত্তে কেবল ঘুরে বেড়িয়েছিলেন অত্যাচারিত, নিপীড়িত, অবজ্ঞাত হতভাগাদের দুঃখ দূর করার জন্য। অনেক সময় এমন হত যে তাঁর পকেটে খাবার কিনবার পয়সা পর্যন্ত থাকত না।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আফ্রিকায় যখন গেলেন তখনই এণ্ডরুজের সঙ্গে গান্ধীজীর আজীবনের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। তাঁরা প্রায় সমবয়সী ছিলেন এবং পরস্পরকে বন্ধু ও সমকক্ষ বলে মনে করতেন। কর্মসূচী ও পদ্ধতি সম্বন্ধে মত পার্থক্য থাকলেও তাঁদের সত্যনিষ্ঠা ও দরিদ্র-প্রীতি অনেক গভীর ছিল। এণ্ডরুজ একবার লিখেছিলেন "গান্ধীর সঙ্গে মতানৈক্যে আমি দুঃখিত হইনা কারণ ইহা আমাদের বন্ধুত্বকে দৃঢ়তর করে মাত্র"। মাত্র কয়েক সপ্তাহে নিপীড়িত চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের দুর্দশার অতি সামান্যাংশই এণ্ডরুজ দেখেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় আন্দোলনের নৈতিক তাৎপর্য উপলব্ধি করে তিনি যে ব্যক্তিগতভাবে সস্নেহ সমর্থন জানিয়েছিনে তাহাই গান্ধীজীর কাছে তখন এবং পরবর্তীকালেও যথেষ্ট সাহায্যকরী বলে মনে হয়েছিল।

এক বছরের মধ্যেই অতিরিক্ত পরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য হওয়ার ফলে গোখলের যখন মৃত্যু হল তখন চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের মধ্যে তাঁর অসমাপ্ত কাজের ভার এণ্ডরুজ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের সত্ব মোচন করার জন্য

সংগ্রাম করেছিলেন। একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ সরকারী কর্তাব্যক্তি মন্তব্য করেছিলেন, "চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক নিয়োগ প্রথার বিলোপ সাধন ছিল ভারতীয়দের প্রতি এণ্ডরুজের সর্বোত্তম অবদান"।

এ কাজ তিনি দক্ষিণ আফ্রিকাতে করেন নি—করেছিলেন সুদূর ফিজিতে ১৯১৫ এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে যে দুই বছর তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। দিনের পর দিন কারখানা সমূহে অভিযান চালিয়ে ধৈর্যসহকারে সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করে তার সত্যতা প্রমাণ করার পরই তিনি এ কাজ করতে সমর্থ হয়ে ছিলেন। এ কাজ করতে তাঁকে যেখানে সেখানে রাত কাটাতে হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে তাঁকে সরকারী বিবৃতিসমূহ এবং নথীপত্র সযত্নে পর্যালোচনা করতে হয়েছিল এবং সর্বোপরি নীতিগত প্রভাবের সাহায্যে তিনি নিশ্চিত ভাবে একে অগ্রাধিকার দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁকে তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বিরোধিতায় কেবলমাত্র ধনী চিনিকল মালিকরাই তাঁকে উস্কানিদাতা বলে নিন্দা করেন নি, একজন উগ্রপন্থী হিন্দুও তাঁর উদ্দেশ্যকে সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন এবং তাঁকে দ্বৈত ভূমিকাবলম্বী বলে অভিহিত করেছিলেন। কিন্তু দুর্দশাগ্রস্ত অর্ধভুক্ত লোকেরা তাঁকে চিনেছিল। ১৯১৭ খৃস্টাব্দে ফিজিতেই তাঁকে প্রথম আখ্যা দেওয়া হয় "দীনবন্ধু"—অর্থাৎ দীনের বন্ধু ও ভাই।

পরবর্তী বিশ বছর দীনবন্ধু সর্বত্রই বিরাজ করতেন। পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই ভয়ানক ঘটনার পর তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন এবং তাঁর স্বদেশবাসীকৃত অন্যায় ও অত্যাচারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। বর্ণ বৈষম্যের অবমাননা থেকে ভারতীয়দের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষার জন্য তিনি বহুবার দক্ষিণ আফ্রিকা ও কেনিয়াতে গিয়েছিলেন। কোন কোন সময়ে আপন প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে এ কাজ তাঁকে করতে হয়েছে। একবার ক্রুদ্ধ 'শ্বেতাঙ্গ'রা তাঁর দাড়ি ধরে টেনে মধ্য রাত্রে রেল গাড়ী থেকে বার করে তাঁকে প্রায় মেরে ফেলেছিল আর কি! ওদিকে অনেক ন্যায়তৎপর শ্বেতাঙ্গ একান্ত বন্ধুও ছিলেন তার। ভারতীয়দের কাছেও তিনি ন্যায়তৎপর হওয়ার জন্য আবেদন করতেন। দরিদ্র ব্যক্তির অভাবের সুযোগ নেবার জন্য তিনি ধনী ব্যবসায়ীদের শান্তভাবে ভৎর্সনা করতেন। তিনি রাজনৈতিক নেতাদের স্পষ্টই বলেদিয়েছিলেন যে আফ্রিকাবাসীদেরক্ষতি হয় এমন কোনও নীতির সমর্থন তিনি করবেন না।

তারপর যখন তিনি লণ্ডনে গিয়েছিলেন তখন কেনিয়ার ব্যাপারে উত্তেজিত ভারতীয় ছাত্রদের এক সভায় তিনি বলেছিলেন, "শত শত বছর ধরে আমরা ভারতবর্ষে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের চরম দুর্দশায় জীবন কাটাতে বাধ্য করেছি। এখন অপরে যদি আমাদের প্রতি তদ্রুপ ব্যবহার করেন তাতে কি আমরা অভিযোগ করতে পারি? মানুষ যে শস্য বপন করে তা তাকেই কাটতে হয়"।

তিনি ভারতবর্ষে দারিদ্র-নিপীড়িতদের নিয়েই দিন কাটাতেন। মাঝে মাঝে অবিবেচকের মত হলেও রেল কর্মচারীরা যখন তাদের দুঃসহ অবস্থার জন্য কর্মবিরতি করত তখনও তিনি তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। ওড়িয়্যায় বন্যায় গ্রামবাসীরা যখন গৃহহারা তখনও তিনি তাদের পাশে হাজির। পূর্ব বাংলার কলেরা নিরোধে, মাদ্রাজের কল-শ্রমিকদের মধ্যে এবং কেরালার অস্পৃশ্যদের সহায়তায়—সর্বত্রই তিনি সশরীরে উপস্থিত। যা প্রত্যক্ষ করতেন সর্বদা তিনি তার সঠিক বর্ণনা দিতেন। কিন্তু প্রায় সব সময়ই তিনি দুঃখ বোধ করতেন এই কারণে যে এই দুঃসহ অবস্থা দূর করার ক্ষমতা যাঁদের আছে তাঁরা নিজেরা কখনও এসে এই সব হতভাগাদের দুঃখ-কষ্ট প্রত্যক্ষ করার কষ্ট স্বীকার করতে চাইতেন না।

তারপর তিনি অনেক সময়ই গান্ধীজীর পাশে পাশে ছিলেন। তাঁর পীড়িত অবস্থায়, দীর্ঘ সত্যাগ্রহ অনশনে, লণ্ডনের গোলটেবিল-বৈঠকে, গান্ধীজীর এই সব বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে তিনি সর্বদাই তাঁর পাশে ছিলেন! একদা তিনি কিছুদিনের জন্য তাঁর "আবাস" শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেখানেও তাঁর বিশ্রামের অবকাশ ছিলনা-কারণ সেখানেও তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল নিঃসঙ্গ, বিপর্যস্ত, অভাবগ্রস্ত মানুষগুলি। যে গভীর অধ্যবসায় সুচতুর ব্যবস্থাপনা এবং নৈতিক শক্তির সাহায্যে ফিজিতে তিনি কার্য পরিচালনা করে ছিলেন সেরূপ আর একটি অভিযান তাঁকে করতে হয়েছিল ১৯২৪-২৫ খ্রীষ্টাব্দে আফিং এর চোরাই চালান বন্ধ করার জন্য। আরও বহু বহু ঘটনা আছে যার বর্ণনা দেবার স্থান এখানে হবে না।

১৯৪০ খৃষ্টাব্দে সত্তর বৎসর বয়সে কলকাতায় তিনি পরলোক গমনকরেন। তিনি "দরিদ্রতম, নিম্নতম, এবং সর্বহারা"দের সেবায় নিজেকে নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের যে কবিতাটিকে এণ্ডরুজ এত ভালবাসতেন সেই কবিতাটির উল্লেখ এখানে না

করলে আমরা কখনই এণ্ডরুজের আত্মিক শক্তির সম্যক উপলব্ধি করতে পারব না :

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে
সবার পিছে সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে"।

এণ্ডরুজ প্রকৃত ভক্ত ছিলেন বলেই বিদ্রোহী হতে পেরেছিলেন। উনিশ বছর বয়সে তাঁর এমন এক অভিনব ঐশ্বরিক অভিজ্ঞতা হয়েছিল যার প্রভাবে পরবর্তীকালে তিনি প্রভু যিশু খ্রীষ্টের 'ভক্ত'তে পর্যবসিত হয়েছিলেন। তারপর থেকেই তিনি দরিদ্রদের মধ্যে প্রভুর আসন দেখতে পেতেন এবং তাদের মুখেই দেখতেন তাঁর মুখের প্রতিচ্ছায়া। মানুষের লোভ অহঙ্কার, নির্যাতন দ্বারা মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে যখনই তিনি বিদ্রোহ করতেন তখনই নিজের পাশে খ্রীষ্টকে দেখতে পেতেন, তিনি বলতেন যে খ্রীষ্ট হলেন বিরাট নীতিবাদী বিদ্রোহী।

এণ্ডরুজ নিজের জীবন আলেখ্য রচনা করেছিলেন এবং তার নামকরণ করেছিলেন "হোয়াট্ আই অও টু ক্রাইষ্ট" অর্থাৎ "খ্রীষ্টের কাছে আমি কতভাবে ঋণী"। অল্পদিন পরে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে এটি যখন প্রকাশিত হয়েছিল তখন তিনি একটি সংবাদপত্রে নিম্নলিখিত কথা কয়টি লিখেছিলেন—

"খ্রীষ্ট স্বয়ং আমাকে যে জ্ঞান দান করেছিলেন আমি তাহাই প্রচার করার জন্য ব্যগ্র ছিলাম। ধর্মীয় অনুভূতির আনন্দ পরস্পর উপভোগ করলেই তা সম্ভব, জোর করে কোন ধর্মবিশ্বাস চাপিয়ে নয়। স্বীয় আত্মার অন্তর্নিহিত শক্তিকে এরূপ নির্মল রাখতে হবে যাতে সত্য তার আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হবে—এটাই চরম লক্ষ্য নয় কি? কোনও সত্যকেই শিক্ষার মাধ্যমে জানান যায়না—জীবনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়।"

প্রত্যেক দিন কঠিন কর্মসূচী আরম্ভের আগে অতি প্রত্যূষে এণ্ডরুজ তাঁর স্বর্গীয় বন্ধুর সান্নিধ্য উপলব্ধি করার জন্য নির্জনে চলে যেতেন। ফিজিতে অনেকেই তাঁকে দেখতেন সূর্যোদয়ের সময় তিনি বসে আছেন কোন পাহাড়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন হয়ে। অথবা জনবহুল আফ্রিকার কোনস্থানে প্রত্যূষের আগেই নক্ষত্রালোকে শান্তির সন্ধান করছেন।

কালের গতির সঙ্গে সঙ্গে সত্যের মহিমা ক্রমশঃ উজ্জ্বলতর হতে লাগল। সর্বশ্রেণীর লোকই ইহা উপলব্ধি করত। এণ্ডরুজ যখন কোনও ঘরে প্রবেশ করতেন তখন ছোট ছোট স্কুলের ছেলেরা পর্যন্ত চারিদিকে একটা পরিবর্তনের আবহাওয়া লক্ষ্য করত এবং বলত, "তিনি দেখতে যিশুর মত"। একজন উপনিবেশ-শাসক একবার লণ্ডনে এক ভোজসভায় এণ্ডরুজের সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন এবং এণ্ডরুজ যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন তিনি বলেছিলেন, "আমার মনে হচ্ছে যেন আমার প্রভুকে ভোজে আপ্যায়ন করে আমি ধন্য হলাম"।

শুধুমাত্র খ্রীষ্টানরাই যে কেবল এণ্ডরুজের মধ্যে খ্রীষ্টের প্রতিচ্ছবি দেখতে পেতেন তা নয়। একজন হিন্দু বন্ধু তাঁকে লিখেছিলেন, আমার ইচ্ছা আপনি সহজ ইংরেজী ভাষায় খ্রীষ্টের জীবন-চরিত লেখেন। এটাই হবে আপনার পক্ষে সর্বাপেক্ষা জরুরী কাজ। আপনিই কেবল এই পুস্তক রচনা করতে পারেন কারণ গত ত্রিশ বছর ভারতবর্ষে আপনি তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই জীবন অতিবাহিত করেছেন।

কিন্তু সে বই আর লেখা হয়নি। খ্রীষ্টের করুণার ডাক রূপে বহু কাজ এসে ভীড় করত এবং এণ্ডরুজের সময় ও শক্তি তাতেই ব্যয় হত। তিনি খ্রীষ্টান ধর্মের আদর্শের উপর অন্যান্য বই লিখেছেন। তাতেই প্রকাশ পেয়েছে পরিষ্কার ভাবে কোথায় এণ্ডরুজের অনুপ্রেরণার উৎস। অপর একজন হিন্দু মনে করতেন তিনি ছিলেন "সি, এফ্,এ—ক্রাইষ্টস ফেইথ্ ফুল্- এ্যাপোসল, অর্থাৎ খ্রীষ্টের বিশ্বস্ত অনুচর"।

মা

(গল্প)

স্নেহেন্দু মাইতি

ভরা দুপুর। উমা তখন বাসন মেজে সবে ঘাট থেকে এসেছে। দেখলে অনাথ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। হাতে একটা বড় লাঠি। উমা অনাথকে যমের মত ভয় করে। যা রাগী-গোঁয়ার মানুষ! লাঠি নিয়ে যখন যাচ্ছে তখন কারু সংগে নিশ্চিত দাঙ্গা হবে। দাদাকে উমা খুব ভয় করে। সেই ছোটবেলা থেকে উমা কত মারামারি দেখেছে। মারামারিতে মাথা ফাটিয়ে দিতে দেখেছে। অনাথ রাগলে যম। মায়া-দয়া বলে তখন তার কিছু থাকে না। এ সময়ে অনাথ কিছু বললে সে খাপ্পা হয়ে উঠবে, উমা এটা জানে। তবুও মারামারি হতে দিতে পারে না উমা। অনাথকে এইরকম লাঠি নিয়ে যেতে দেখে খুব ভয় হতে লাগল। একটু বাতাস হলেই ধান গাছ যেমনি কাঁপতে থাকে উমা তেমনি কাঁপতে লাগল। অনাথ ঘর থেকে বেরুবার সময়ে বললে, লাঠিটা সংগে করে নিয়ে আয়।'

উমা খুব ভয় পেয়ে গেল। ভয়ে সে কাঁপতে কাঁপতে জিগ্যেস করলে লাঠি ?'

'হু লাঠি। কানে কি তুলো দিইচিস্?' রেগে অনাথ বললে। তারপরে হন্ হন্ করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অনাথ চলে গেলে উমা যে কি করবে ভেবে পেলে না। লাঠি না নিয়ে গেলেও মুস্কিল। কারু সংগে যে মারামারি বাধবে সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। মনে হয় দাসেদের সংগে। একমাস যাবৎ অনাথ আর তার বাবার সংগে দাসেদের ঝগড়া চলছে। বারাম নিয়ে ঝগড়া। ঘর থেকে বেরুবার একটা খুব ছোট রাস্তা। দাসেদের নগেন ঐ জায়গাটা বিক্রি করে অন্য কোথায় বাস উঠিয়ে নিয়ে চলে গেল। ঐ জায়গাটা কিনে মহাদেব। অনাথের বাবা মহাদেব। মহাদেব অনাথের চেয়ে জেদী আর একরোখা। যতদিন থেকে উমা এই গ্রামে পা দিয়েছে, অনাথ আর তার বাবা সম্পর্কে রাশি রাশি কথা শুনেছে। মহাদেব কথায় কথায় মামলা ঠুকে দেবার ভয় দেখায়। জোর করে বাঁধ ছেঁটে জমি বাড়ায়। ঘরের পাশের সীমায় গাছ হলে বলে আমার গাছ। গ্রামের পঞ্চায়েৎ বাবুদের একজন মহাদেব। সামনা-সামনি মহাদেবকে কেউ কিছু বলতে সাহস করে না। কিন্তু আড়ালে বলে, 'ও মরলে, শকুনেও ছোঁবে না।' মানুষ তো নয়। পাপে ওর দেহ ভরে গেছে। শকুনের মাংসের চেয়ে ওর মাংস তেতো হয়েছে। শকুনে কখনো খেতে পারে ?'

সেই মহাদেব এখন সামান্য জায়গাটা কিনে মহা মুস্কিলে পড়েছে। কোনক্রমে নগেনের ভাই যোগেনকে বারাম থেকে হঠান যাচ্ছে না। যোগেন লোকটা বিশেষ চালাক চতুর নয়। কিন্তু তার বউ চারুবালা খুব শক্ত মেয়ে। মহাদেব অনাথ বাপবেটায় মিলে মামলার ভয় দেখিয়েছে। বলেছে, 'ভিটে মাটি চাটি করে ছেড়ে দেব।' কিন্তু চারুবালা অনড়। মামলা হয় সে মামলা করতে রাজি।

মহাদেব আর অনাথ এত বোকা নয় যে মামলা জুড়ে দেবে। তারা জানে বারাম বন্ধ করা সহজ নয়। তাই আইনে নয় গায়ের জোরে জায়গা দখল করতে হবে। মহাদেব সুযোগ পেলেই ছেলেকে বলে, 'লক্ষ্মী মাকে কাছে টানিস। অবহেলা করে যদি বলিস্, ওটুকু থাক্, তবেই হয়েছে। লক্ষ্মী মা বুঝবেন, তুই তাঁকে রাখতে পারবি না। তখন আপনা থেকে গুটি গুটি চলে যাবেন।'

উমা ঘর থেকে লাঠি বার করলে। কিন্তু যেতে তার পা উঠে না। কেমন করে সে যাবে! মারামারিকে

তার চিরকালই ভয়। দাসেদের যোগেন আজ আবার বাড়ি নেই। বাড়িতে থাকে কেবল যোগেনের বৌ আর দুটি ছেলে। মহাদেব যদি ঐ চারুবালার গায়ে হাত দেয়। মহাদেব ঠাকুর। তার গুরুজন। গুরুজনের নিন্দে করতে নেই। কিন্তু তবুও মেয়েমানুষের গায়ে যদি হাত তোলে খুব খারাপই বলতে হবে। ঠাকুর মা ছোট বেলায় দ্রৌপদীর গল্প, সীতার গল্প বলে বলেছে, 'জামলু, যে পুরুষ জোর করে, অন্যায় করে মেয়ের গায়ে হাত তুলেছে সে সবংশে পুড়ে মরেছে। পরস্ত্রীর গায়ে হাত দিতে নেই।'

উমা এবার বাইরে গোলযোগ শুনতে পেল। পা যেন তার মাটির ভিতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে। মা বসুমতী যেন দুটো পা টেনে রেখে বলছে, 'যাস্‌নি হতচ্ছাড়ি, যাস্‌নি—'

ভরা দুপুর। রাস্তাঘাটে কেউ নেই। পরিষ্কার দাসেদের বাড়িটি দেখা যাচ্ছে। উঃ কি পাষাণ হয়ে উঠেছে মহাদেব। তার ঠাকুর। মেয়েটার চুলের ঝুঁটি ধরে আছে এক হাতে। মেয়েটা চিৎকার করে কেঁদে বলছে 'ওগো কে কোথায় আছ, এসোগো। মেয়েমানুষের সব যায়, এসোগো এসো। গেরামে কি মানুষ নেই?

একধারে বসে চারুবালার দুটো ছেলেও কাঁদছে। মহাদেব চীৎকার করে বলছে, 'বল বল আর ঐ রাস্তার গাছ মাড়াবি? বল, বল,—'

রাস্তার বেশ কিছু দূরে লোক কাতার দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে। কেউ এগোতে সাহস করছে না। কে এগোবে? কার এমন বুকের পাটা?'

উমার বুক কামারবাড়ির হাপরের মত উঠানামা করে। একি অত্যাচার! একি ধর্মে সইবে? সইবে না। বুড়ি ঠাকুর মা কত গল্প করত। তার ছোট বুকে হাত দিয়ে বলত, 'তোর এই ছোট বুকটাতে বসেও ভগবান বিচার করে। তুই কি করিস আর না করিস্‌ সবার বিচার করে। ভগবানের আসন সকলের বুকে। এত অধর্ম! হায় ভগবান, তুমি অপরাধ নিয়ো না ঠাকুর। মনে মনে আকুল হয়ে উমা মিনতি জানায়।

'এই, দাঁড়ি' দাড়ি' মজা দেখছিস, না? চলে আয়। আয়। হয়তো—' দূর থেকে অনাথ দেখতে পেয়েছে, উমা ঠায় দাঁড়িয়ে এসব দেখছে। অনাথ রাগলে পরিত্রাণ নেই। উমার উপরে কম অত্যাচার হয়নি। লাঠি নিয়ে সে ছুটে যেতে চাইলে। কিন্তু পারলে না। কাপড়ে পা জড়িয়ে যায়। মাটি যেন খুব এবড়ো-খেবড়ো।

উঃ, মেয়েটা কি ভীষণ চীৎকার করছে। রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে। ওদের উপরে উমার ভীষণ রাগ ধরে। ওরা মানুষ, না কি! উমা আর যেতে পারছে না। হাঁপিয়ে উঠছে। উমা একবার চারুবালার দিকে তাকালে। দূরত্ব আর বেশি নয়। মিশি রং-এর শাড়ী পরা মেয়েটাকে যেন খুব চেনা-চেনা লাগছে। ঐ গলার স্বরও যেন খুব চেনা। দূরে দুটো ছেলেও যেন তার চেনা। প্রায় চিনতে পারছে। বেশি দিনের কথা নয়। তখন তার জ্ঞান হয়েছে। পরিষ্কার মনে পড়ছে। চুলের ঝুঁটি ধরে এমনি অত্যাচার। এমনি পরিত্রাহি চীৎকার। পরিষ্কার মনে পড়েছে তার মা। তার মায়ের কথা। বাবা কারখানায় কাজ করত। তিনি তখনও বেঁচে আছেন। মদে চুর হয়ে এসে মাকে ধরে ঠেঙাতেন। বিনা কারণেই ঠেঙাতেন। তখন উমার বয়স নয় কি দশ! মায়ের অবস্থা দেখে কাঁদত। হাত পা ছুঁড়ত। ঠিক ঐ দুটো ছেলের মত। কিন্তু বাবা তখন বেখাপ্পা। উমাকে আমলই দিত না। একদিনের কথা খুব মনে পড়ছে। ভীষণভাবে উমার মনে পড়ছে। সে ক্ষেপে গিয়েছিল। সেই ন'-দশ বছর বয়সেই তেড়ে এসেছিল মাকে বাঁচাতে। মাতাল বাবার গায়ে হাতে পায়ে কামড়ে, নখাঘাত করে বলেছিল, 'ছাড়, ছাড়, ছাড়!

হঠাৎ একটা প্রচণ্ড আঘাত পায় উমা। একেবারে পেটে। তুই এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদচিস্? মায়া দেখানো হচ্ছে, মর-মর-তুই মর—'

লাথির ধাক্কা সামলাতে পারে না উমা। একটা ঘুরপাক খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। শুধু মুখে একবার বলে, 'মা, মাগো—'

সমাজ ও মানুষ

(শ্রীঅরবিন্দের The Ideal of Human Unity অবলম্বনে)

সমর বসু

[···The rational collectivist idea of society has at first sight a powerful attraction. There is behind it a great truth, that every society represents a collective being and in it and by it the individual lives and he owes to it all that he can give it.—Sri Aurobindo]

একদিকে মানুষ একা, অন্যদিকে সে একটি সমাজবদ্ধ জীব। একদিকে তার ব্যক্তিসত্তা, অন্যদিকে সে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজদেহের অংশ মাত্র। ব্যক্তি ও সমাজের এই জীবনপ্রবাহের দুইটি ভিন্নমুখী ধারার মধ্যে সমতা-সামঞ্জস্যরক্ষার উপরই নির্ভর করে প্রকৃতির (nature) যাবতীয় কর্মপদ্ধতি। সমাজ যেমন ব্যক্তিকে লালন করে, পালন করে, তেমনি ব্যক্তিই সেই সমাজকে একটু একটু করে গড়ে তোলে। সুতরাং পরস্পরের মধ্যে যদি সামঞ্জস্য বা সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হয়, তাহলে প্রকৃতি তার কার্য সম্পাদন করতে পারে না।

অতএব সমাজ ও ব্যক্তির জীবনে এই দুই প্রান্তকোটির সমতা রক্ষা করার সাধনাই হল মনুষ্য-জীবনে পূর্ণতা-অর্জনের উপায় এবং পথ। ব্যক্তিজীবনকে পূর্ণ করে তুলতে পারে যে-সমাজ তাকেই যেমন বলা যেতে পারে সর্বাঙ্গসুন্দর (perfect) ঠিক তেমনি ব্যক্তির জীবনও সার্থকতায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তখনই যখন সে সমাজকে সর্বাঙ্গসুন্দর হতে সাহায্য করে। সমাজ ও ব্যক্তির এই অনন্ত নির্ভর সম্বন্ধটিকে ভালভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে—সমগ্র মানব-সমাজের সার্বিক কল্যাণের উপায় নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়।

কেননা প্রকৃতির কর্মধারার ক্রমগতি ব্যক্তি ও সমাজজীবনে এমনসব জটিলতার সৃষ্টি করে যার ফলে ব্যক্তিমানুষ,—সমগ্র মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে যে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত এই বোধ নিজের মধ্যে অনেক সময় জাগিয়ে তুলতে পারে না। একদিকে ব্যক্তি—অন্যদিকে পৃথিবীর বিরাট মানবগোষ্ঠী,—মাঝখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কত সমাজ,—তাদের মধ্যে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষাগত কত প্রভেদ,—এদেরই প্রভাবে ব্যক্তি, ঐ বিরাট মানবগোষ্ঠীর সঙ্গে তার নিজের যে-সম্পর্ক তা সব সময় উপলব্ধি করতে পারে না। অথচ এই সব ছোট ছোট গোষ্ঠী মানুষের সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন-অনুযায়ী আপনা থেকেই গড়ে উঠেছে। মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের গতিপ্রকৃতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায়—যে, মানুষের সীমাবদ্ধ সাংগঠনিক ক্ষমতা এবং বুদ্ধিশক্তির স্বল্পতা হেতু সভ্যতার আদিযুগে মানুষ যখন গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে সুরু করেছিল তখন সেইসব গোষ্ঠী ছিল নিতান্তই ক্ষুদ্র, পরে উন্নততর চিন্তা-চেতনার সাহায্যে মানুষ গোষ্ঠী-গুলোকে অপেক্ষাকৃত স্ফীতকায় করতে সক্ষম হয়েছিল। গোড়াতে মানুষ ছিল স্ব-স্ব পরিবারের মধ্যে আবদ্ধ, তারপর এল কুল, তারপর বংশ, জাতি—বিবিধ গোষ্ঠীর সমবায়ে গঠিত দেশ। মানুষের এই অগ্রগতি অব্যাহত ধারায় চলতে থাকবে, যতদিন না মানুষ বিশ্ববোধে প্রতিষ্ঠিত হয়। যতদিন না সে বুঝতে পারে যে, পরিবার, বংশ, কুল, জাতি কিংবা দেশগত মানুষের সঙ্গেই তার সম্পর্ক নয়,-বিশ্বগত মানুষও তার আত্মার আত্মীয়। কিন্তু এই বিশ্ববোধে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এখনও মানুষের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা কেননা প্রকৃতি এখনও তাকে সেই ভাবে প্রস্তুত করে তোলেনি।

বৃহত্তর গোষ্ঠীগুলি গড়ে ওঠবার সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুদ্রতর গোষ্ঠীগুলো যদি বিনষ্ট হয়ে যেত, তা হলে কোনও সমস্যা দেখা দিতনা। কিন্তু প্রকৃতির লীলা এইভাবে পরিচালিত হয়না। প্রকৃতি একবার যে জিনিস গড়ে তোলে তাকে সে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে ফেলেনা। ক্রম পরিণামের পথে যাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে যায় তাদের অস্তিত্বই শুধু লোপ পায়। অবশিষ্ট যা থাকে প্রকৃতি তাকে সযত্নচেষ্টায় বরং রক্ষা করে। বৈচিত্র ও বাহুল্যের প্রতি প্রকৃতির একটা ঐকান্তিক অনুরাগ আছে, সেইজন্যে সে যা-কিছু গড়ে তোলে তার সবই সে নষ্ট হতে দেয়না, তা ছাড়া ভবিষ্যতে তারই কাজে লাগতে পারে এই আশায় অনেক কিছুকে আবার সে রক্ষা করে থাকে। গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে যে ভেদরেখা থাকে ভবিষ্যতে সেগুলো অবশ্য একটু একটু করে লোপ পায়। গোষ্ঠীগত বিশেষ গুণাবলীও ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকে। এইভাবে বৃহত্তর একত্ব ক্রমশঃ গড়ে ওঠে।

ইতিহাসের পাতায় পাতায় প্রকৃতির এই লীলা-কাহিনী ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো আছে, অনেক সাফল্য ও ব্যর্থতার ইতিবৃত্ত যা আমাদের কাছে যথার্থই শিক্ষাপ্রদ।

বৃহত্তর গোষ্ঠীর প্রবর্ত্তনায় প্রকৃতির এই কঠিন প্রয়াস আমরা দেখতে পাই, ইহুদী ও আরব এই দুই সেমিটিক জাতির মধ্যে, যা সার্থক হয়নি। কেল্‌টিক জাতিগুলির মধ্যে কুলগত জীবনধারা সচেতন হয়ে যখন একটা সুসংবদ্ধ জাতিসত্তাকে গড়ে তুলতে চেয়েছিল, - আমরা দেখেছি—সে প্রয়াসও তাদের ব্যর্থ হয়েছে। আয়র্ল্যাণ্ড স্কট্‌ল্যাণ্ডের সম্মিলনও সম্ভব হয়নি। গ্রীসের ইতিহাসেও দেখি—নাগরিক রাষ্ট্র ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঞ্চলিক মানবগোষ্ঠী পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে একীভূত হয়ে উঠতে পারেনি। অথচ রোমক-ইতালীর সংগঠনের ব্যাপারে প্রকৃতির এই প্রয়াস আশ্চর্য্যভাবে সফল হয়েছে। আবার ভারতবর্ষের দুই হাজার বছরের ইতিহাসে দেখি প্রকৃতির চেষ্টা সাফল্যের তোরণ-প্রান্তে এসে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ভারতবর্ষের নানা-ভাষা নানা-মত নানা-পরিধানের সমবায়ে এক মহাজাতির মহা উত্থান তাই সম্ভব হয়নি,—যদিও প্রকৃতির পক্ষ থেকে চেষ্টার ক্রটি ছিলনা। এই জন্যে এ-কথা বলা যেতে পারে যে, প্রকৃতি ভারতবর্ষের সমাজজীবনের বৈচিত্র্যকে একত্বে উন্নীত করার প্রয়াসে যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে তা এত জটিল যে তার তুলনা নেই। কেননা প্রকৃতি এখানে যে-সব বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হয়েছে তা অপসারিত করতে পারলেই ভারতবর্ষে তার প্রয়াস ঋদ্ধিময় সাফল্যে উত্তীর্ণ হতে পারত। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা হলনা। এখানেও প্রকৃতি ব্যর্থ হল,—তাই শেষ চেষ্টা হিসাবে বৈদেশিক শাসনের জোয়াল ভারতবর্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে সে বাধ্য হল।

প্রকৃতির এই লীলাতত্ত্ব ভালভাবে উপলব্ধি করতে না পারলে,—দেশ বা জাতির মধ্যে যেসব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠী আপনার স্বাতন্ত্র বজায় রেখে বেঁচে থাকতে চায় বা বৃহত্তর গোষ্ঠীর মধ্যে হারিয়ে যেতে চায়না,—তার তাৎপর্যও হৃদয়ঙ্গম করা সহজ হয়না। আমরা দেখেছি, যেখানে দেশ বা Nation,—যথেষ্ট সংহতির মধ্যে গড়ে উঠেছে সেখানেও পরিপূর্ণ একত্ব অধিগত হয়নি। কেননা, সেখানে জাতি-ধর্ম-বর্ণ অথবা ভাষাগত কোনও বিভেদ না থাকলেও শ্রেণীগত বৈষম্য সর্বদাই থেকে গিয়েছে। তাই শ্রেণীগত সংগ্রাম সেখানে চলবেই। এর থেকেই আমরা বুঝতে পারি,—গোষ্ঠীর জীবনে যেমন, ব্যক্তির জীবনেও তেমনি, নিরন্তর যে-ক্রমবিকাশ সংঘটিত হচ্ছে তার মধ্যে প্রকৃতির শক্তি কতখানি ক্রিয়াশীল। প্রকৃতির এই বিধান যে কত প্রয়োজনীয় তা আমরা বুঝতে পারব যখন মানবজাতির সম্ভাব্য সামগ্রিক ঐক্যের সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব। এখানে শুধু এইটুকু বললেই হবে যে, প্রকৃতির অনিবার্য লক্ষ্য হল—ব্যক্তিকে পরিপূর্ণভাবে গড়ে তোলা—যাতে সমাজ ও বৃহত্তর মানবজাতি পরিপূর্ণ ও সর্বাঙ্গ-সুন্দর হ'য়ে ওঠে। (এখানে 'পরিপূর্ণ' শব্দটি অবশ্য তার আপেক্ষিক ও ক্রমবিকাশের অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে।)

এই প্রসঙ্গে এ-কথা অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে যে, একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত মানুষের অগ্রগতি একই-ভাবে বা সমানতালে হয়না। কেউ এগিয়ে যায়, কেউবা পিছিয়ে পড়ে। কেউবা যেখানে থাকে সেইখানেই থেকে যায়। এরফলে একই সমাজের মধ্যে এমন এক শ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব হয় যে অপর শ্রেণীর উপর প্রাধান্য বিস্তার করে। অগ্রগতির বেগ যদি সমান হত তাহলে এই ধরনের শ্রেণী গড়ে উঠতে পারতোনা। যে-শ্রেণী প্রধান হয়ে ওঠে প্রকৃতির প্রয়োজন-অনুসারে অগ্রগতির পথে হয় সে এগিয়ে চলে, নয় পিছিয়ে পড়ে। এগিয়ে যারা চলে তারাই যে সব সময় প্রাধান্য লাভ করবে এমন নয়; পিছিয়ে-পড়া শ্রেণীও প্রাধান্য লাভ করতে পারে। অতীত অথবা ভবিষ্যতের রীতিনীতি সমাজ-জীবনের উপর যেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারবে তদনুযায়ী 'পিছিয়ে পড়া' অথবা 'এগিয়ে যাওয়া' শ্রেণীর প্রাধান্য স্বীকৃত হবে। প্রকৃতি যদি চায় মানুষের চারিত্রিক শক্তি ও সামর্থকে বড় করে তুলে ধরতে, তাহলে সমাজে প্রধান হয়ে উদ্ভূত হবে অভিজাত-শ্রেণী। যদি সে চায় জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি, তাহলে প্রধান হয়ে উঠবে সাহিত্যিক বা বিদগ্ধ শ্রেণী; আর যদি প্রকৃতি চায় সাংগঠনিক দক্ষতা অথবা ব্যবহারিক নৈপুণ্য, তাহলে বুর্জোয়া অথবা বৈশ্য-শ্রেণী প্রাধান্যলাভ করবে। আইনজীবিরা শ্রেণী-হিসাবে তখন প্রাধান্য লাভ করে যখন প্রকৃতির লক্ষ্য হয় সাধারণের কল্যাণ সাধন। প্রকৃতির এই অভিপ্রায়-অনুযায়ী শ্রমিকের প্রাধান্যলাভও অসম্ভব নয়।

কিন্তু শ্রেণী-প্রাধান্যের পরিণাম স্থায়ী হয়না। স্বল্পকালের প্রয়োজনে এর উদ্ভব। প্রয়োজন শেষে একে অবশ্যই বিদায় নিতে হয়। কেননা কতিপয় মানুষের দ্বারা অধিক সংখ্যক অথবা অধিক সংখ্যক মানুষের দ্বারা সংখ্যালঘু মানুষ শোষিত হবে এ ব্যবস্থা প্রকৃতির লক্ষ্য হতে পারেনা। মুষ্টিমেয় লোকের উৎকর্ষলাভের জন্যে অধিক সংখ্যক লোক অজ্ঞানতার দাসত্বে শৃঙ্খলিত হয়ে থাকবে এ ব্যবস্থা হতে পারে প্রকৃতির সাময়িক কৌশল, কিন্তু স্থায়ী অভিপ্রায় কখনই না। এই কারণেই আমরা দেখতে পাই, এই সব আধিপত্য নিজেদের মৃত্যুবীজ নিজেদের মধ্যেই বহন করে চলে। এদের সামনে দুটি পথ খোলা :- হয় শোষক অংশটিকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলতে হবে, নয়তো সকলের সংমিশ্রণে সাম্য গড়ে তুলতে হবে। ইউরোপ ও আমেরিকায় এইভাবেই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর আধিপত্য নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। এখন শুধু দুটি একান্ত পৃথক শ্রেণী বর্তমান, একটি সম্পদশালী ধনিক-শ্রেণী, অপরটি সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণী। আধুনিক কালে মানব জাতির মধ্যে এই শেষ শ্রেণী-বিন্যাসের বিলোপ-সাধনের জন্যেই সংগ্রাম চলছে। যে অবিচল গতিপথে সমগ্র ইউরোপ প্রকৃতির ক্রমগতির একটি বিশেষ ধারা অনুসরণ করে চলেছে, তাহল সম্পূর্ণ সাম্যের দিকে গতি।

কিন্তু **absolute equality is surely neither intended nor possible, just as absolute uniformity is both impossible and utterly undesirable.** তবে একটা মৌল একত্ববোধ যা সত্যিকারের শ্রেষ্ঠকে ও তার পার্থক্যকে নির্দ্বিধায় স্বীকার করবে, মানব-জাতির কল্পনীয় পরিপূর্ণতার পক্ষে তা অবশ্যই প্রয়োজনীয়।

সুতরাং ক্ষমতা ও প্রাধান্যে প্রতিষ্ঠিত সংখ্যালঘু-শ্রেণীর পক্ষে শোষণ ও শাসনের চাপে সংখ্যাগুরু-শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখা আর সম্ভব হবেনা। সময় থাকতে এ বিষয়ে তাদের অবহিত হওয়া উচিত যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় এখন এসেছে। গুণাবলী এবং আদর্শ এতদিন তারা নিজেদের দখলে যেসব রেখেছিল— সমাজের বাকী অংশকে বঞ্চিত করে, সেই সব আদর্শ ও গুণাবলীর সাহায্যে এখন সমাজের বাকী অংশের (অন্তত: যারা প্রগতির জন্য প্রস্তুত তাদের) চেতনাকে সমৃদ্ধ করে তোলবার জন্যে তাদেরই উদ্যোগী হতে হবে। যেসব ক্ষেত্রে ক্ষমতাবানরা এই কাজে আপনা থেকেই উদ্যোগী হ'য়ে এগিয়ে এসেছে সেখানকার সমাজ প্রগতির পথে সহজভাবেই এগিয়ে গিয়েছে। সেখানে সংঘাত

অথবা সংঘর্ষের আঘাতে সমাজদেহ ক্ষত-বিক্ষত হয়নি। বিশৃঙ্খলায় সমাজ-জীবন বিপর্যস্ত হয়নি। অন্যথায় সমগ্র সমাজকে তীব্র অশান্তির মধ্যে দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যেতে হয়েছে। কেননা মানুষের 'অহং'—প্রকৃতির স্থির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করে দেবে প্রকৃতি তা কিছুতেই বরদাস্ত করবেনা।

ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত শ্রেণী যদি তাদের উপর প্রকৃতির দাবীকে অস্বীকার ক'রে এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয় তাহলে —সমাজগোষ্ঠীর হয় সমূহ বিপদ, (**The worst of destinies is likely to overtake the social aggregate**) এমনতর ঘটনা ভারতবর্ষেই ঘটেছিল।

আমরা জানি—একসময় ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ-সমাজ তথা অপরাপর বিশেষ সুবিধাভোগী ক্ষমতাপন্ন শ্রেণী অধিকাংশ অনুন্নত জনগণকে ঘৃণায়, অবহেলায় উপেক্ষা করে দূরে রেখে দিয়েছিল; নিজেদের সমান স্তরে তাদের তুলে ধরার যে-কোনও চেষ্টাকে তারা মর্যাদাহানিকর বলে মনে করত। পরিণামে ভারতবর্ষের সমস্ত সমাজব্যবস্থাই পঙ্গু হ'য়ে পড়ল। ভারতের সমাজ-জীবনের অধঃপতন ও অবক্ষয়ের মূল কারণই হল এই। এর থেকে এইসত্যই উদ্ঘাটিত যে,—**"For where her aims are frustrated Nature inevitably withdraws her force from the offending unit till she has brought in and used other external means to reduce the obstacle to a nullity."** অর্থাৎ—প্রকৃতির উদ্দেশ্য যেখানে বাধাপ্রাপ্ত বা ব্যাহত হয় সেখানে সমাজের সেই দুষ্ট অংশ থেকে প্রকৃতি তার সমস্ত শক্তি সংহরণ করে নেয়—যতক্ষণ অন্যান্য বাহ্য উপায়ের সাহায্যে সমস্ত বাধাবিপত্তি সম্পূর্ণভাবে নির্মূল না হয়। —এই হল প্রকৃতির অমোঘ বিধান। এর থেকে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজের যেমন পরিত্রাণ নেই, তেমনি মুক্তি নেই ব্যক্তিরও।

সুতরাং সামাজিক, সাংস্কৃতিক অথবা প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্যে সমাজ জীবনকে যতই বদ্ধ করে তোলা হোকনা কেন, ব্যক্তির প্রশ্ন সব সময়ই থেকে যায়। তর্কের খাতিরে অনেক সময় সমাজদেহকে মনুষ্যদেহের সঙ্গে এবং ব্যক্তিকে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অথবা কোষের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলা হয় যে, দেহের প্রয়োজনেই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সুতরাং মূলদেহকে সুস্থ, সবল ও কর্মক্ষম করে রাখাই হল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের একমাত্র কাজ। কিন্তু এ উপমা ভ্রমোৎপাদক। কেননা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনও অঙ্গ বা তার কোষ আপনাকে নিয়ে বেঁচে থাকতে পারে না, কিন্তু ব্যক্তি তা পারে। মানুষ ব্যক্তি হিসাবে যেমন আপনার মধ্যে বেঁচে থাকতে চায় তেমনি চায় আপন সীমা তথা পরিবার, কুল, শ্রেণী এমন কি জাতির সীমা ছাড়িয়ে আরও এগিয়ে যেতে একদিকে সে যেমন চায় স্বয়ংসম্পূর্ণ হ'তে অন্যদিকে তেমনি সে হতে চায় বিশ্বজনীন। এবং এই অভীপ্সাই হল তার পরিপূর্ণতা অর্জনের অত্যাবশ্যক উপাদান অতএব যেসব সমান গোষ্ঠীর ব্যবস্থা দাবী করে যে সমগ্র সমাজের কল্যাণে, অপরের উপর এক বা একাধিক শ্রেণীর আধিপত্যের বিশেষ প্রয়োজন আছে, সেইসব সমাজব্যবস্থার আশু পরিবর্তন নতুবা নিঃশেষ বিলুপ্তি যেমন অবশ্যম্ভাবী, ঠিক তেমনি, যেসব সমাজগোষ্ঠী ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে, ব্যক্তিকে একটা সীমাবদ্ধ ছকের মধ্যে অথবা সংকীর্ণ সংস্কৃতি বা তুচ্ছ শ্রেণীগত স্বার্থের ছাঁচে ঢেলে গ'ড়ে তুলতে চায়, তাদেরও দিন ঘনিয়ে এসেছে হয় তাদের ঐ সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে নতুবা করতে হবে তার সমূল উচ্ছেদ। প্রগতিশীল প্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য প্রবেগ এমনই অমোঘ।

রজনীকান্ত

সুনীল মুখোপাধ্যায়

রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ প্রমুখ কবিদের পর্যাপ্ত আলোচনা বাংলা সাহিত্যে হয়নি—এতে বাংলা সাহিত্যেরই ক্ষতি বলা যায়। সযত্ন-রচিত, সুসজ্জিত উদ্যানের টবে উৎফুল্ল পুষ্পরাশি সকলেরই দৃষ্টি ও সমাদর আকর্ষণ করে, কিন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে; দূর বনস্থলীতে অযত্নলালিত যে-ফুল আপন আনন্দে প্রস্ফুটিত হয়ে, আপনাতেই তুষ্ট হয়ে পরমতমের উদ্দেশ্যে হৃদয়ের সুরভি উৎসর্গ করে চলে—তার খবর সবাই রাখতে পারে না। রসিকসুজনের অভাব—সোজাসুজি একথা বলতে না পারলেও এটা বলা যায় যে, বড়র প্রতি, প্রতিষ্ঠিতের প্রতি আকর্ষণ অধিকাংশেরই। বাংলাদেশের সরস মাটীর স্বাদগন্ধযুক্ত, আপন স্বভাবসুন্দর, শুভ্র-পবিত্র কুসুমাঞ্জলি বঙ্গভারতীর বেদীতলে অর্পণ করেছেন আমাদের কান্তকবি রজনীকান্ত সেন। ইনি ১৮৬৫ সালের ২৭ শে জুলাই পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার ভাঙ্গাবাড়ী গ্রামে জন্ম-গ্রহণ করেন। পেশায় উকিল হলেও তিনি নেশায় ছিলেন কবি। পিতা গুরুপ্রসাদ কবিতাপ্রিয় ও সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন। রজনীকান্তে এই উত্তরাধিকার অতিশয় উৎকর্ষ লাভ করেছিল।

রজনীকান্ত কবি। অপূর্বভাব, প্রগাঢ় অনুভূতি, স্বাভাবিক অলঙ্কার ও ব্যঞ্জনার অনুপম প্রকাশে তাঁর কবিতাগুলি ললিত-মাধুর্য্য লাভ করেছে, আবার এই কবিতাগুলিই ভাব-ভক্তি সুরের শুদ্ধ নিষ্ঠায় গীতাঞ্জলি হয়ে উঠেছে। তথাকথিত আধুনিক কবিতার নিরিখে কান্তকোমল কবিতাবলীকে বিচার করলে অবিচার করা হবে। তাই মনে হয় রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ প্রমুখের কবিতা পাঠ ও উপলব্ধি করতে হলে কিছুটা মানসিক প্রস্তুতি ও ভক্তি অপরিহার্য। ইনি শুধু শিক্ষিত সাধারণের কবি নন—ইনি জনসাধারণের কবি। ইতর-ভদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল শ্রেণীর হৃদয়েই রজনীকান্ত আপন ভাবানুভূতিকে সঞ্চারিত করতে পারতেন— এই ব্যাপ্তিতেই তাঁর কৃতিত্বও অসাধারণ।

রজনীকান্তের রচিত গ্রন্থসংখ্যা মোট আটখানি, তার মধ্যে তিনখানি তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত। জীবিতকালে 'বাণী' (১৯০২), কল্যাণী (১৯০৫), অমৃত (১৯১০) এবং মৃত্যুর পরে আনন্দময়ী [১৯১০ অক্টোবর (মৃত্যু সেপ্টেম্বর)]; বিশ্রাম (১৯১০); অভয়া (১৯১০), সদ্ভাবকুসুম [১৯১৩] ও শেষদান [১৯২৭] প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে 'অমৃত' ও সদ্ভাবকুসুম শিশুপাঠ্য নীতিকবিতা—কবির স্বীকৃতি অনুযায়ী রবীন্দ্রনাথের কণিকার আদর্শে রচিত। আর অন্যান্য গ্রন্থের বারআনাই গান—আর এই স্বভাব-সম্পদেই বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে। 'তিনি কথা বলেন সুরে, কাঁদেন সুরে, হাসেন সুরে, দেশকে জাগান সুরে, ভগবানকে—জগন্মাতাকে ডাকেন তাও সুরে। তাঁর প্রায় সকল রচনাই সুরে গাঁথা'। আর এই সুরের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হোল যে, এতে আধুনিককালের মত প্রসাধন বা রতি নেই; আছে অন্তরের সাধন ও আরতি। পূর্বেই বলেছি আধুনিক কবিতার সঙ্গে কান্তকোমল কবিতাবলীর পার্থক্য বিস্তর। কৃত্রিমভাবের কষ্টবোধ্য ও জটিল প্রকাশভঙ্গি যেমন আধুনিক কবিতাকে সকলের করে তোলে না, তেমন কোন ভাবই রজনীকান্তে নেই। তাঁর কাব্যের ভিতর আমরা যেন একটা স্বতঃস্ফূর্ত মেঠোসুরের পরিচয় পাই—এই সুর শহরের বৈঠকখানায় পাওয়া যাবে না।

আর এই মেঠো সুরই দেশের অন্তরতম প্রাণের সুরটিকে জাগিয়ে তুলেছিল বলে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে অমন সাড়া জেগেছিল। তাঁর সমকালে এবং বোধ হয় পরবর্তীকালেও এমন সাড়া আর কোন কবিই জাগাতে পারেননি। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা আমাদের মনে রাখতে হবে যে, বিচার বা আলোচনার সময় আলোচ্য বিষয়ে কি হলে ভাল হোত তা না দেখে বর্তমানে কেমন হয়েছে লক্ষ্য করলে বোধ হয় অবিচার হবে না। কেননা বিশেষ করে কবিতা একটি বিশেষ মনের বিশেষ অনুভূতির স্বতঃনিঃসরণ—সেটা যত আকস্মিক হয় তত তার মূল্য। ফরমাস দিয়ে সার্থক বা যথার্থ কবিতা লেখানো যায় না, তা কবির মানসিক গঠন ও অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। যা লিখেছেন কবি, তাতে বরং প্রথমে তাঁর অনুভূতির প্রগাঢ়তা বা গভীরতা কতখানি এবং পরে তার প্রকাশ কতখানি সালংকার মার্জনা লাভ করেছে ও ভাবানুভূতির সঙ্গে সামঞ্জস্য লাভ করেছে তা বিবেচ্য। মণ্ডনকলায় সকলে যে উল্লাসী বা সচেতন হন না তার অনেক দৃষ্টান্তই বাংলা সহিত্যে রয়েছে। রজনীকান্ত সম্পর্কে এই সকল বিষয়ে সচেতন থাকলে মনে হয় তাঁর আকস্মিক অনুভূতির সাযুজ্য লাভ সহজ হবে।

পূর্বেই দেখেছি রজনীকান্তের সৃষ্টি বিপুল নয়। তাঁর স্বল্পজীবনকালের মধ্যে রচিত রচনাগুলিকে মোটামুটিভাবে শ্রেণীবিভাগ করে নিলে তাঁর মানস-প্রকর্ষ ও ভিন্নমুখিতার পরিচয় পাওয়া যাবে। আগেই বলেছি রজনীকান্তের রচনা মূলতঃ সুরে বাঁধা। কান্তকবি লিখেছেন—স্বদেশীগান, হাসির গান, নীতি-কবিতা এবং সর্ব্বোপরি ভক্তিমূলক গান। কবির মূল প্রবণতা ও সার্থকতা আসলে এই ভক্তিমূলক গানে, অন্যগুলিকে বৈচিত্রসম্পাদনী বললে অত্যুক্তি হবে না।

স্বদেশীগান বা কবিতা যখনই নিয়মরক্ষা করে লেখা হয়েছে তখনই দেখেছি তা বক্তৃতাধর্মী হয়েছে এবং চিরকালীনতা হারিয়েছে। এদিক থেকে [দ্বিজেন্দ্র লালের স্বদেশীগানের পরিণতি লক্ষণীয়] রজনীকান্তের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম হয়নি। তবে রজনীকান্তের স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি খাঁটী দেশভক্ত এবং দেশমাতৃকার একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। শুধুমাত্র আবেগ উচ্ছ্বাসেই তিনি স্বদেশী কবিতা লেখেন নি। দেশের জন্যে, দেশবাসীর জন্যে তাঁর একটা মৌলিক ও স্থায়ী প্রীতি ছিল। আর দেশ বলতে তিনি শুধু বঙ্গদেশকেই বুঝতেন না, সমগ্র ভারত তাঁর ধ্যানে ছিল। তাই প্রথমেই তিনি 'সুমঙ্গলময়ী মা'কে জাগিয়েছেন 'ভারতকাব্যনিকুঞ্জে'-বঙ্গকাব্যনিকুঞ্জে নয়, তিনি দেখেছেন 'চিরদুখশয়নবিলীনা ভারতকে', দুখিনী বঙ্গজননীকে নয়। কেবল সুজলা সুফলা মলয়জ শীতলা বঙ্গজননীর শ্যামল সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হননি, তিনি মুগ্ধ হয়েছেন 'যমুনা-সরস্বতী-গঙ্গা-বিরাজিত' ভারতকে দেখে যার কণ্ঠ—সিন্ধু-গোদাবরী মাল্য-বিলম্বিত; আর যার কিরীট—'ধূর্জ্জটি-বাঞ্ছিত হিমাদ্রি-মণ্ডিত; যে দেশ রাম-যুধিষ্ঠির-ভূপ অলঙ্কৃত এবং 'অর্জুন-ভীষ্ম শরাসন-টঙ্কৃত'। এমন দেশের গৌরবগাথা গেয়ে জননী জন্মভূমিকে বন্দনা করেছেন রজনীকান্ত। রজনীকান্ত ভারতমাতার সৌন্দর্যের উপাসক, তাঁর রূপের পূজারী।

স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গালীর দুঃখ দারিদ্র্য দূর করবার, তার অন্নবস্ত্র সমস্যার সমাধান আশার চিন্তায় তাঁকে ব্যস্ত হতে দেখা যায়। বিলাসোন্মত্ত বাঙ্গালীর সম্বিত ফেরাতে গাইলেন—

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নে রে ভাই'!—

সেদিন এ গান যে কি পরিমাণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল তা এখনো বোঝা দুষ্কর। তারপর—

'ভিক্ষার চালে কাজ নাই—সে বড় অপমান;
মোটা হোক—সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান
সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান।'

এমনি করে বাঙ্গালীকে তিনি উদ্বুদ্ধ করেছিলেন বাঙ্গালীকে জাগাতে তিনি লিখেছিলেন—

'জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান;
বিদেশে না যায় ভাই গোলারি ধান;

আমরা মোটা খাব ; ভাইরে পরব মোটা
মাখব না ল্যাভেণ্ডার চাইনে 'অটো'।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে
আমরা রব কি উপোসী ঘরে শুয়ে ?
হারাস নে ভাই রে আর এমন সুদিন ;
মায়ের পায়ের কাছে এসে যোটো'।

সেদিনে এগানের যে মূল্য বা উন্মাদনা আজ আর তা ঠিক বোঝা যাবে না। সেকালের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তা করলেই রজনীকান্তের দেশপ্রীতির গভীরতা সহজেই বোঝা যাবে। প্রসঙ্গতঃ একটা কথা সর্বদাই মনে হয় ; রবীন্দ্রনাথের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে ;' 'বাংলার মাটি বাংলার জল ;' বা 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে' প্রভৃতি স্বদেশী সঙ্গীতের মত চিরন্তনতা রজনীকান্তের গানে নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের মত রজনীকান্ত নন বলে দুঃখ করে লাভ নেই—রজনীকান্ত রজনীকান্ত। লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যে—ঈশ্বরগুপ্ত থেকে শুরু করে স্বদেশপ্রেমের কবিতার যে ধারা চলেছে সে ধারায় রজনীকান্ত ভাস্বর হয়ে আছেন। উচ্ছ্বাসের যুগে রজনীকান্তের নিরাভরণ সারল্য ও মিতভাষণ বিস্মিতই করে।

রজনীকান্তের "হাসির গানের" পরিচয় পেতে গেলে সর্বাগ্রে মনে রাখা দরকার যে, রজনীকান্ত হাসির গানে দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা অনুপ্রেরিত হয়েছিলেন, তবু কখনো প্যারডি লিখে রসসংহার করেন নি—অপূর্ব সংযমের পরিচয় দিয়েছেন হাস্যকাব্যে। হাস্যরস বা ব্যঙ্গরস সম্বন্ধে 'রোজনামচায়' তিনি লিখেছেন—"That splendid sort of comic with an exceptionally serious vein like the ফল্গুনদী। Comic element is not altogether useless in this world, provided it is covertly instructive" (যে হাস্যরসের মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুর ন্যায় অসামান্য গভীরভাবের স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহাই উৎকৃষ্ট হাস্যরস। হাস্যরস যদি প্রচ্ছন্নভাবে উপদেশমূলক হয়, তাহা হইলে হাস্যরস ইহজগতে কখনই সম্পূর্ণ অনাবশ্যক নয়।) হাস্যরস সম্বন্ধে তাঁর এই পরিচ্ছন্ন ধারণার সাক্ষী 'বাণী','কল্যাণী' 'বিশ্রাম' এবং 'অভয়ার' অনেক কবিতা। প্রসঙ্গত বরের দর, বেহায়া বেহাই, জাতীয় উন্নতি, বুড়ো বাঙ্গাল, ঔদরিক, পিতার পত্র, স্বর্গের খবর প্রভৃতি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে। ঝুটো-মেকীকে কখনো তিনি সহ্য করেন নি সত্য, কিন্তু কখনো তিনি কোন ব্যক্তিবিশেষের উপর বিদ্বেষ বা আক্রমণ চালান নি, বরং তাঁর হাসির গানকে হাসির ছলে কান্না বলা যায়—আর এখানেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য। শ্রীপ্রমথনাথ বিশীর উক্তি প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়—"দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যদি শুষ্ক শীতের বাতাস হয়, রজনীকান্তের হাসির গান বর্ষার জলভারাক্রান্ত পুবে বাতাস।" হাসির গানের দু'চারটি পঙক্তি নেওয়া যেতে পারে—

দেখ আমরা জলের Pleader
যত Public Movement-এ Leader,
আর Conscience to us is a marketable thing
(which) we sell to the highest bidder,
('উকিল'—কল্যাণী)

বা—

'বিষ্ণু নিয়ে লক্ষ্মীরাণী তুলে টিনের ঘর দু'খানি
বাস কচ্ছেন দালান কোঠা ছেড়ে।
আর গণেশের ঐ মুষিক বেটা ঘটিয়েছে বড় বিষম লেঠা
রাণীর রিডিংরুমে রাত্রে প্রবেশ করে
তাঁর Comparative Philology-র Manuscript এর
ভিতর বাহির কেটে দেছে টুকরো টুকরো করে।'
('স্বর্গের খবর'—বিশ্রাম)

রজনীকান্তের 'নীতি-কবিতাগুলি' রবীন্দ্রনাথের 'কণিকার' আদর্শে (কবি কর্তৃক স্বীকৃত) রচিত হলেও মৌলিকতায় ও সরসতায় উচ্চশ্রেণীর। (পূর্ব্বেই বলেছি) বড় কবিদের দাপটে ছোট কবির অনাদর ঘটে। রজনীকান্তের ক্ষেত্রেও তা ঘটেছে। অথচ তাঁর নীতি-কবিতাগুলি ('অমৃত' ; 'সদ্ভাবকুসুম') পাঠ করলে দেখা যাবে কবিতাগুলি বহুপরিচিত, সহজবোধ্য ও সরস। যেমন—

'বিজ্ঞ দার্শনিক এক আইল নগরে,—
ছুটিল নগরবাসী জ্ঞানলাভ তরে ;
সুন্দর গম্ভীর মূর্তি, শান্ত দরশন

হেরি সবে ভক্তি ভরে বন্দিল চরণ।
সবে কহে "শুনি তুমি জ্ঞানী অতিশয়,
দু'একটি তত্ত্বকথা কহ মহাশয়।"
দার্শনিক বলে, "ভাই কেন বল জ্ঞানী ?
কিছু যে জানি না আমি এই মাত্র জানি।"

বা—

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল,

তাঁর এই অবিচলিত মনঃশক্তির উৎস ঐ মহান্ আনন্দ-ধারা। রোগশয্যায় রবীন্দ্রনাথ কবিকে দেখতে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসে যে-চিঠি লেখেন তাতে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ বিশেষোক্তি প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয়। তিনি লিখেছিলেন—সেদিন আপনার রোগশয্যার পার্শ্বে বসিয়া মানবাত্মার একটি জ্যোতির্ময় প্রকাশ দেখিয়া আসিয়াছি।......সছিদ্র বাঁশির ভিতর হইতে পরিপূর্ণ সঙ্গীতের আবির্ভাব যে রূপ; আপনার রোগক্ষত, বেদনাপূর্ণ শরীরের অন্তরাল হইতে অপরাজিত আনন্দের প্রকাশও সেইরূপ আশ্চর্য।"

কোন তত্ত্ব বা দর্শনের জটিলতা নয়, সরল প্রাণের বিরল ভক্তি রজনীকান্তের কবিতায় বিধৃত। তিনি স্বভাবগুণে ধরেই নিয়েছেন যে তাঁর শ্রোতা বা পাঠকও ভক্তি-স্বভাবী। যেভাবে সেগুলি মণ্ডিত, তাতে অতি সহজেই সেগুলি প্রাণের তারে গিয়ে ঝঙ্কার দেয়। এই গানগুলিকে আবার দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রথম শ্রেণীতে পড়ে নশ্বর জীবনে অবিনশ্বর প্রেম ও ঈশ্বরের করুণা অনুসন্ধান এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর কবিতা হচ্ছে মন-শিক্ষা মূলক। একদিকে তিনি গাইছেন—

আজ শুধু মনে হয়, শুনিয়াছি লোকমুখে,
আছে মাত্র একজন চিরবন্ধু সুখে দুঃখে।
বিপন্নের ত্রাণকর্তা, নিরাশ প্রাণের আশা,

অপর দিকে তিনি মনকে বোঝাচ্ছেন—

'আর কেন মন মিছে ঘুরিস
হিমে মরিস, রোদে পুড়িস
প্রেম-গাছের তলায় বস মন
যাবে হৃদয় জুড়ায়ে।'

এমনি করে কান্তকবির অনুসন্ধান ও প্রস্তুতি চলে দিনের পর দিন তারপর মন আত্মসমর্পন করে বলে—

বাবুই পাখীরে ডাকি বলিছে চড়াই,
কুঁড়ে ঘরে থেকে কর শিল্পের বড়াই,

ইত্যাদি 'অমৃত'-এর অষ্টপদী কবিতা রজনীকান্তের ভূয়োদর্শন ও চিন্তার নিজস্বতা ও গভীর জীবনবোধের বাহন। ছোটকবির প্রতি অবহেলাবশতঃ তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলিও অনাদরে কুণ্ঠিত হয়ে রয়েছে।

পূর্বাহ্নেই বলা হয়েছে কবি রজনীকান্তের মূল প্রবণতা ও সার্থকতা তাঁর ভক্তিগীতিতে। সঙ্গীত-মন্দাকিনী মূলতঃ আনন্দ কৈলাস থেকে উৎসারিত আর আনন্দ—

বিশ্ব সাথে যোগে যেথায় বিহার
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।

এই বিশ্বসাথে যোগ থেকে নির্ঝরিত। রজনীকান্তের অধিমানসে সেই বিশ্বযোগবন্ধন রচিত হয়েছিল। তাই তাঁর আধ্যাত্মিক কবিতায় গভীর অনুভূতি ও সহজ বিশ্বাস ও ভক্তির নৈষ্টিক প্রকাশ দেখি। আর এখানেই রজনীকান্তের শক্তি ও নির্ভরতা। রবীন্দ্রনাথের জীবন-শেষের ক্ষীণতা ও মৃত্যুভীতি যেমন তাঁর পরম নির্ভর ঔপনিষদিক চেতনা দ্বারা বিজিত হয়েছিল, তেমনি দেখি রজনীকান্ত হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় পরম নির্ভরতায় ও অম্লানচিত্তে পরমেশ্বর ও কাব্যসরস্বতীর বন্দনা করে যাচ্ছেন অকুতোভয়ে। দারুণ রোগযন্ত্রণার মধ্যে ভগবদ্বিশ্বাসী কবি একদিনের জন্যও বিচলিত হননি; তিনি অকম্পিত হস্তে লিখেছেন –

আমায় সকল রকমে কাঙাল করেছ,
গর্ব করিতে চুর;
যশ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য,
সকল করেছ দূর। ইত্যাদি।
ঐ অভয়পদ হৃদয়ে ধরি
ভুলিব সব দুখ হে;
হেসে তোমারি দেওয়া বেদনা-ভার
হৃদয়ে তুলি লব হে।

কদাপি তাঁর দয়ার বিধানে সন্দিহান হয়ে 'হা ভগবান কি করলে, বলে আর্তনাদ করেন নি। এতেই তাঁর তৃপ্তি, এতেই তাঁর সিদ্ধি।

'তুমি নির্মল কর মঙ্গল কর মলিন মর্ম মুছায়ে
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক মোর মোহ-কালিমা ঘুচায়ে'

কবির প্রথম জীবনের এই আকুল প্রার্থনা শেষ জীবনে পূর্ণ হয়েছিল।

রজনীকান্ত ও রজনীকান্তের কাব্য একেবারে এক জিনিস—একেকে বোঝা গেলে অপরটিও বোঝা যাবে। তাঁর কবিতায় কোন কৃত্রিমতা নেই, কোন মিথ্যা নেই, কোন ধার করা কথা নেই—তিনি যা বুঝেছিলেন, প্রাণে প্রাণে যা অনুভব করেছিলেন তাকেই ভাষার ভিতর দিয়ে, গানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করে গেছেন। এমন কবি ও কাব্যের প্রতি আমাদের অনাদর ও ঔদাসীন্য যেন কেন বোঝা যায় না। জন্মশতবার্ষিকী সুযোগ এনে দিয়েছে বলেই আজ তাঁকে ও তাঁর কাব্যকে স্মরণ করতে পেলুম।

রাগ সঙ্গীতে বাঙ্গালী

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭—১৯৪১)

ধ্রুপদ গায়ক গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একজন চার্যস্থানীয় এবং দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর ন্য সুপণ্ডিত গুণী বিরল ছিল সঙ্গীতজগতে। তাঁর ঙ্গীতপ্রতিভা বহুমুখী। সঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগে, শেষ কণ্ঠসঙ্গীতের নানা রীতিতে তিনি অভিজ্ঞ লেন।

উত্তর জীবনে তিনি নেতৃস্থানীয় ধ্রুপদীরূপে সুপরিচিত লেন সঙ্গীতের আসরে। কারণ সচরাচর তিনি পদাঙ্গ ভিন্ন অন্য কোন পদ্ধতির গান আসরে পরিবেশন রতেন না। কিন্তু দীর্ঘকাল যাবৎ চর্চার ফলে ধামার, খয়াল. টপ্পা ও ভজন গানেও পারদর্শী ছিলেন তিনি। পরন্তু তিনি একজন উৎকৃষ্ট সঙ্গতকারও ছিলেন। াখোয়াজ, তবলা ও ঢোল এই তিনটি সঙ্গতের যন্ত্রেই ার নৈপুণ্য ছিল এবং প্রথম জীবনে তিনি সঙ্গতকার পেই সমধিক পরিচিত ছিলেন বাংলাদেশে।

সেসময় কলকাতার নানা আসরে তবলাবাদন করার লে তবলাবাদক হিসাবে সঙ্গীতজগতের অনেকেই াকে চিনতেন। বাংলাদেশে ধ্রুপদীরূপে তিনি ্যাতিমান হন অনেক পরে। তাই প্রসিদ্ধ টপ-খেয়াল ায়ক রমজান খাঁ প্রথম যখন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে ান গাইতে দেখেন, বিশেষ আশ্চর্য বোধ করেন। ারণ একটি আসরে তার আগে রমজান খাঁর গানের ঙ্গেই তবলাসঙ্গত করেছিলেন গোপালচন্দ্র। তারপর ী সাহেবের অন্যতম সুযোগ্য শিষ্য, মধুকণ্ঠ টপ্পাগায়ক জতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (তেলিনীপাড়ার ালোবাবু নামে সুপরিচিত) গৃহে গোপালচন্দ্রকে প্রথম পদ গাইতে শোনেন রমজান খাঁ এবং বিস্মিত হয়ে ইভাবে বলেন, 'আরে, এত বড় গুণী গাওয়াইয়া, আমার ঙ্গে আগে তবলা বাজিয়েছেন!'

সেদিন শুধু রমজান খাঁ নয়, আসরের অনেকেই বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের ধ্রুপদ গান শুনে চমৎকৃত হয়েছিলেন।

গোপালচন্দ্র যথার্থই সঙ্গীতাচার্য ছিলেন এবং রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর শূন্য আসন তিনিই সেই মর্যাদায় পূর্ণ করে রেখেছিলেন। সেই আচার্যের উপযুক্ত এক গুরুদায়িত্ব তাঁর প্রতি অর্পণ করেছিলেন তাঁর অন্যতম গুণগ্রাহী ও সঙ্গীতপ্রেমী ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ। পাথুরিয়াঘাটার বিখ্যাত ঘোষ পরিবারের উক্ত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ সেকালের কলকাতার উচ্চ মানের নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের (যা প্রকৃতপক্ষে সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনরূপে গণনীয় এবং এসম্পর্কে বাংলাদেশে পথপ্রদর্শকও) একজন প্রতিষ্ঠাতা-পরিচালক ছিলেন। সেই সঙ্গীতসম্মেলনের আনুষঙ্গিকরূপে অনুষ্ঠিত এবং তারই যোগ্য মানের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের সর্ববিভাগে গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধান বিচারকরূপে অবস্থান করতে হত ভূপেন্দ্রকৃষ্ণের অনুরোধে।

বস্তুত ভারতীয় সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে গোপালচন্দ্র বাংলার অন্যতম গৌরব এবং বিরাট পুরুষ ছিলেন। তাঁর সেই বিরাটত্বের মূলে ছিল সহজাত প্রতিভা, ঐকান্তিক সাধনা এবং কয়েক জন শ্রেষ্ঠ গুণীর নিকটে নানামুখী শিক্ষালাভের সুযোগ।

সঙ্গীতজগতে তিনি অবশ্য বৃহত্তর বাংলার অধিবাসী ছিলেন, বলা যায়। কারণ তাঁর বাংলাদেশে জন্ম ও সঙ্গীতশিক্ষালাভ হয়নি। ভারতবর্ষে সঙ্গীতচর্চার অন্যতম পীঠস্থান বারানসীতে তাঁর জন্ম। জীবনের প্রায় অর্ধাংশ অতিবাহিতও হয়েছিল সেই সঙ্গীতকেন্দ্রে। সেকারণে সঙ্গীতচর্চা ও সাধনার এক অপূর্ব সুযোগ তিনি লাভ করেছিলেন। তাঁর প্রায় সকল সঙ্গীতগুরুই

ছিলেন কাশী নিবাসী। তাঁর গুরুকরণের প্রসঙ্গ রীতিমত উল্লেখযোগ্য।

গোপালচন্দ্রের প্রধান তিনজন সঙ্গীতগুরু হলেন—(১) স্বনামধন্য বীণকার মিঠাইলাল। তিনি তানসেনের কন্যাবংশীয় বীনকার ও রবাবী সাদিক আলী খাঁর শিষ্য। মিঠাইলালের প্রধান শিষ্যদের মধ্যে ছোট ও বড় রামদাস বারানসী তথা উত্তর ভারতের সঙ্গীতক্ষেত্রে সুপরিচিত গুণী ছিলেন।

(২) স্বনামপ্রসিদ্ধ টপ্পাশিল্পী বাখর আলী। তিনি টপ্পারীতির অন্যতম প্রচলনকর্ত্তা শোরি মিঞার শিষ্য-পরম্পরার অন্তর্গত।

(৩) সেকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক ও সঙ্গীতাচার্য অঘোরনাথ চক্রবর্ত্তী। তিনি শেষ বয়সে কাশীবাসী হয়েছিলেন।

গোপালচন্দ্র উক্ত তিন গুণীর নিকটে নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষা লাভ করেন। মিঠাইলালের কাছে খেয়াল ও কিছু ধ্রুপদ বাখর আলীর কাছে টপ্পা ও ধামার এবং অঘোর-নাথের কাছে ধ্রুপদ ও ভজন।

তা' ভিন্ন, আরো একাধিক গুণীর নিকটে তিনি কণ্ঠ-সঙ্গীতের শিক্ষা পান ও গান সংগ্রহ করেন। তৎকালীন ভারতবিখ্যাত খেয়াল গায়ক হদ্দু খাঁর পুত্র, গোয়ালিয়রের খেয়ালগুণী রহমৎ খাঁর কাশীতে অবস্থান করবার সময় শেষোক্তের খেয়াল শিক্ষায়ও সুযোগ পান তিনি।

বারানসীর প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় এবং আর একজন বাঙালী ধ্রুপদগায়ক উপেন্দ্রনাথ রায়ের (তিনিও কাশী নিবাসী) কাছেও প্রথম জীবনে গোপালচন্দ্র ধ্রুপদশিক্ষা করেছিলেন।

তা' ছাড়া, খেয়াল ও টপ্পাগায়ক লক্ষ্মীকান্ত ভট্টাচার্যের (লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ গায়ক নথে খাঁর শিষ্য) কাছে তিনি খেয়াল ও টপ্পা সংগ্রহ করেন।

এমনিভাবে সমৃদ্ধ হয় গোপালচন্দ্রের নানা রীতিতে কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চা তথা রাগ-বিদ্যা শিক্ষা।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে তিনি সঙ্গতকার-রূপেও পারদর্শী ছিলেন এবং তবলা, পাখোয়াজ ও ঢোল-বাদন তিনি ভালভাবে অভ্যাস করে শিখেছিলেন। এ সম্পর্কে কয়েক বছর তিনি বিখ্যাত সঙ্গীতকেন্দ্র বেতিয়ায় ছিলেন সরকারীর শিক্ষানবীশ হয়ে। সেখানে ভারত-প্রসিদ্ধ পাখোয়াজগুণী কদৌ সিংহের শিষ্য যোধ সিংহের নিকটে তিনি তবলায় তালিম নেন। কাশীর নামী তবলাবাদক বিনায়ক মিশ্রও তবলাবাদন বিষয়ে ছিলেন তাঁর অপর গুরু।

গোপালচন্দ্রের বহুমুখী ও বিচিত্র সঙ্গীতশিক্ষার এই হল পটভূমি। সুতরাং ধারণা করা যায়, তাঁর সঙ্গীত-ভাণ্ডার কি পরিমাণ ঐশ্বর্যমণ্ডিত ছিল। কিন্তু সাধারণ্যে তাঁর উক্ত বহুধারায় গঠিত সঙ্গীত-জীবনের পরিচয় সুপরিজ্ঞাত ছিল না। সঙ্গীতজগতে এবং সঙ্গীতের আসরে তিনি ধ্রুপদীরূপেই সবিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন। কারণ আসরে তিনি কখনো খেয়াল বা টপ্পা গাইতেন না। ধ্রুপদ ভিন্ন কখনো কখনো শোনাতেন ধ্রুপদাঙ্গের ভজন।

প্রথম জীবনে তিনি একাধিক সঙ্গতযন্ত্রে সমধিক সাধনা করেছিলেন এবং সেসময়ে আসরে সঙ্গতকাররূপেই তাঁর পরিচিতি ছিল। জীবনের সেই প্রথম অধ্যায়ে তিনি ছিলেন বারানসী নিবাসী। সেখান থেকে ব্যবসায়-সূত্রে তিনি বছর কয়েকবার কলকাতায় আসতেন। তখনকার কলকাতার সঙ্গীতাসরে তিনি পরিচিত ছিলেন তবলাবাদকরূপে।

উত্তরজীবনে ধ্রুপদী হিসাবে গোপালচন্দ্রের খ্যাতি উত্তরভারতব্যাপী হয়েছিল। ওজস্বী কণ্ঠে বিশুদ্ধ স্বর এবং সুর ও তাল লয়ে অসামান্য অধিকার ছিল তাঁর সঙ্গীতক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য। রাগবিদ্যায় গভীর পাণ্ডিত্য তাঁর সঙ্গীতজীবনকে ভাস্বর করেছিল।

১৮৭৭ খৃঃ বারানসীতে তাঁর জন্ম। পিতা রাধানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে বেনারসী বস্ত্রের ব্যবসায়ের ফলে সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন। তাঁদের আদি নিবাস অবশ্য ছিল বাংলাদেশে, যশোর জেলায়। রাধানাথের পিতা যশোর থেকে কাশীতে এসে এখানকার বাস পত্তন করেছিলেন তা হল উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কথা।

বারানসীতে গোপালচন্দ্রের জন্মস্থান ও পৈত্রিক বাসস্থলের ঠিকানা ছিল ডি ২১।১৩৮ গণেশ মহল্লা।

বাঙ্গালীটোলা স্কুলে তাঁর ছাত্রজীবন আরম্ভ হয়েছিল। কিন্তু লেখাপড়ায় আগ্রহ না থাকায় বিদ্যাশিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয়নি। বাল্যকাল থেকেই বিদ্যাচর্চার চেয়ে শরীরচর্চা ও সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পায় সমধিক মাত্রায়। প্রথম যৌবনে স্বাস্থ্য ও ব্যায়ামে রীতিমত অনুশীলনের ফলে তিনি কাশীর এক পারদর্শী কুস্তিগীররূপে পরিগণিত হন। পরিণত বয়সেও তাঁর সেই সুগঠিত, দীর্ঘ শরীর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত সঙ্গীতাসরে।

তাঁর যখন ১৪।১৫ বছর বয়স তখন থেকেই তিনি সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ করেছিলেন। অন্তরের প্রেরণা উপযুক্ত সুযোগ লাভ করেছিল তৎকালীন বারানসীর সমৃদ্ধ সঙ্গীত-পরিবেশে। বহু গুণীর সমাবেশের ফলে কাশীতে তখন উচ্চ মানের সঙ্গীতচর্চা বর্তমান ছিল। গোপালচন্দ্র প্রথম থেকেই কৃতবিদ্য কলাবতকে পেয়েছিলেন সঙ্গীত-গুরুরূপে। সেই সঙ্গে নানা গুণীর সঙ্গীতানুষ্ঠান পর্যাপ্ত শোনবার ফলেও তিনি প্রভূত লাভবান হন।

তাঁর যে প্রধান তিন সঙ্গীতাচার্যের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে প্রথমে শিক্ষার সুযোগ পান বীণকার-গায়ক মিঠাইলালের নিকটে। তিনি গোপালচন্দ্রকে উপদেশ দিয়েছিলেন: 'আগে লয়ের কার্য ভাল করে শিখো।'

সেই নির্দেশ অনুসারে তিনি প্রথমে ঢোলবাদন ও পরে তবলার চর্চা রীতিমত ভাবে করেন। এইভাবে সঙ্গতের যন্ত্রে কৃতী হয়ে কাশীর তৎকালীন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-সংস্থা হিন্দু ইউনিয়ন ক্লাবের নিয়মিত সঙ্গতকার হন অল্প বয়সেই। সেসময়ে ইউনিয়ন ক্লাব শুধু বারানসীতে নয়, উত্তর ভারতের নানা স্থানে রাগসঙ্গীতে গঠিত ঐকতান বাজিয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন। গোপালচন্দ্র তখন ঢোল ও তবলাবাদকরূপে পরিচিত হন সঙ্গীতজগতে।

আচার্য মিঠাইলালের কাছে তিনি প্রথম জীবনে খেয়ালাদি কণ্ঠসঙ্গীতের তালিমও নিতে থাকেন। মিঠাইলালের স্নেহের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। অন্যান্য সঙ্গীতগুরুদের চেয়ে মিঠাইলালের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘকালব্যাপী ছিল এবং সেই যোগাযোগ অক্ষুণ্ণ থাকে আচার্যের জীবনের প্রায় শেষ পর্যন্ত।

গোপালচন্দ্রের দ্বিতীয় সঙ্গীতগুরু কাশীর টপ্পাগুণী বাখর আলী। উক্ত ওস্তাদ ধামার গানেও কৃতবিদ্য ছিলেন। বাখর আলীর কাছেও অনেকদিন টপ্পা এবং ধামার শিখেছিলেন তিনি। বাখর আলীরও তিনি সঙ্গীতগুণের জন্যে বিশেষ স্নেহের পাত্র হয়েছিলেন।

সঙ্গীতরত্নাকর অঘোরনাথ চক্রবর্তীকে তিনি গুরুরূপে পেয়েছিলেন শিক্ষাজীবনের শেষ পর্বে। চক্রবর্তী মহাশয় শেষ জীবনের বছরগুলিতে যখন কাশীবাস করতেন, তখন তিনি প্রতিদিন তাঁর কাছে শিক্ষার জন্যে উপস্থিত হতেন। সূর্যোদয়েরও অনেক আগে, প্রায় শেষ রাতে অঘোরনাথের নির্দেশ মতন তিনি সঙ্গীতশিক্ষা করতে যেতেন প্রতিদিন। এইভাবে গোপালচন্দ্র ধ্রুপদের সঞ্চয় প্রচুর পরিমাণে করেছিলেন।

আসরে তিনি অঘোরনাথের ধ্রুপদ (ও ভজন) ই সাধারণত গাইতেন এবং তাঁরই ধরনে গাইতেন। তবে প্রভেদ এইমাত্র ছিল যে, চক্রবর্তী মহাশয় আলাপচারি বিশেষ করতেন না, কিন্তু গোপালবাবু আলাপ ভালভাবেই করতেন প্রত্যেক গানের অনুষ্ঠানে।

বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ছায়ানট রাগে সিদ্ধ ছিলেন। অনেক আসর মাৎ করা তাঁর সেই ছায়ানটের বিখ্যাত 'শঙ্কর শম্ভু শিব মহেশ' গানখানি তাঁকে দিয়েছিলেন অঘোরনাথ।

চক্রবর্তী মহাশয়ের গানের সঙ্গে গোপালবাবুর যৌবনকালেই পরিচয় লাভ ঘটে। প্রথম জীবনে যখন তিনি কর্মসূত্রে মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন তখনই অঘোরনাথের গান শুনে মুগ্ধ হন। তাঁর কাছে রীতিমতভাবে সঙ্গীতশিক্ষার আগ্রহও তখন তাঁর হয়েছিল। সেসময় এবিষয়ে একবার এণ্টালির দেব-পরিবারের ভবনে (এখানে অনেক উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতানুষ্ঠান হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে এবং বাংলার ও পশ্চিমাঞ্চলের নানা গুণীর সমাগমের জন্যে দেব-গৃহ সঙ্গীতসমাজে চিহ্নিত আছে) কথা বলবার সুযোগ পান অঘোরনাথের সঙ্গে। তাঁর

কাছে গান শেখবার ইচ্ছা জানিয়েছিলেন। অঘোরনাথ সেসময় সম্মত হননি। তবে কথা দিয়েছিলেন যে যদি পরবর্তী জীবনে কখনো কাশীবাস করতে যান, তখন সেখানে শেখাবেন গোপালচন্দ্রকে।

সেই প্রতিশ্রুতির সূত্রেই বারানসীতে তাঁর কাছে গোপালবাবুর ভালভাবে শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল। অঘোরনাথের সেসময় শেষ জীবনে কাশীবাসের পর্ব। প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে তিনি এই শিষ্যকে সঙ্গীতশিক্ষা দিতেন। অঘোরনাথের পর গোপালবাবু আর কোন আচার্যের শিক্ষা গ্রহণ করেননি পদ্ধতিগতভাবে।

অঘোরনাথের কাছে শিক্ষার সময় এবং সঙ্গীত-সাধনার চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি অত্যধিক পরিশ্রম করতেন। একান্ত নিষ্ঠায় প্রতিদিন সঙ্গীতাভ্যাস করতেন ১৫।১৬ ঘণ্টা পর্যন্ত। এই সুদীর্ঘ সময় সাধনার কারণ অবশ্য শুধুই তাঁর কণ্ঠসঙ্গীতের চর্চা নয়। সেই পর্বে তিনি একাধিক সঙ্গীতগুরুর প্রসাদে লব্ধ বিভিন্ন রীতি গান (ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ভজন) এবং যুগবৎ পাখোয়াজ ও তবলাবাদনের অভ্যাস করে' যেতেন দিন রাতের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে।

তাঁর প্রথম জীবনের সেই অক্লান্ত কণ্ঠসঙ্গীতের সাধনা রাণাঘাটের সঙ্গীতাচার্য নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য কয়েকবার কাশীতে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অঘোরনাথের সুহৃদ নগেন্দ্রনাথ সকালে মাঝে মাঝে উপস্থিত হতেন বারানসীতে। অনেক পরবর্তীকালে, গোপালবাবু তখন সুপ্রতিষ্ঠিত ধ্রুপদী এবং অঘোরনাথ পরলোকে, একবার নগেন্দ্রনাথের আহ্বানে গোপালবাবু সঙ্গীতানুষ্ঠান করতে রাণাঘাটে আসেন। তখন নগেন্দ্রনাথ তাঁকে প্রথম জীবনের সেসব দিনের কথা স্মরণ করিয়ে আদরের সুরে বলেছিলেন, 'কাশীর বাড়ীতে ত' কাক চিল বসতে দিতে না।' অর্থাৎ সারাদিন তাঁর কণ্ঠসাধনা অব্যাহত থাকত।

গোপালবাবু তাঁর প্রথম জীবন থেকেই প্রতি বছর কলকাতায় দু' তিন মাস অবস্থান করতেন পৈত্রিক কাপড়ের ব্যবসায়সূত্রে। তখনো তাঁর পিতা জীবিত। [illegible] সহসা তাঁদের বস্ত্রপাতির নতুন এক ব্যবসায় করবার ফলে বিস্তর লোকসান হয়ে যায়। কাশীর বসত-বাড়িটি এবং কাপড়ের দোকান ভিন্ন আর সব সম্পদই হারাতে হয় তাঁদের। তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে তারপর কলকাতায় চলে আসেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় ৪৪ বছর। সঙ্গীতশিক্ষা তার কয়েক বছর আগেই সম্পূর্ণ হয়েছিল।

কলকাতায় এসে প্রথমে নানা অঞ্চলে বাস করবার পর ১৯২৩ সালের শেষভাগে বেলেঘাটায় একটি গৃহ নির্মাণ করে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন, ১৪৬ সংখ্যক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডে। এখানেই জীবনের শেষ ১৫ বছর তিনি অবস্থান করেছিলেন। মৃত্যুর কিছু-দিন মাত্র আগে তিনি প্রত্যাবর্তন করেন বারাণসীতে।

কলকাতায় বাসকালেও তিনি কয়লা, তামাক ইত্যাদি নানা রকম জিনিষের ব্যবসা অবলম্বন করেছিলেন। এইসব নানাপ্রকার অর্থকরী কায তিনি করতেন শুধু এই উদ্দেশ্যে, যেন সঙ্গীতকে কখনো জীবিকারূপে গ্রহণ করতে না হয়। সঙ্গীতকে তিনি শুধু সাধনার নয় নিরতিশয় শ্রদ্ধার সামগ্রীরূপে গণ্য করতেন, তাই তা পেশাহিসাবে অবলম্বন করতে চিরদিন বিরূপতা ছিল তাঁর। তিনি ধনী ছিলেন না এবং তাঁর তুল্য সঙ্গীতগুণী ইচ্ছা করলে ভাল অর্থোপার্জ্জন করতে পারতেন। কিন্তু সঙ্গীতকে জীবিকাস্বরূপ গ্রহণ না করে যথেষ্ট কৃচ্ছ্র ও ত্যাগ স্বীকার করতেন তিনি। তবু নিজের আদর্শনিষ্ঠা থেকে বিচ্যুত হননি। বাস্তবিক-পক্ষে তিনি ছিলেন সর্ববিষয়ে আদর্শবাদী। তাঁর কঠোর নীতিপরায়ণতার মূলেও ছিল সেই আদর্শবাদ। কোন প্রকার অন্যায়, কপটাচার, মিথ্যাচার, ফাঁকি বা বেচাল তিনি কোনদিন বরদাস্ত করেননি। এ বিষয়ে তাঁর স্বভাবের সঙ্গে আর এক সঙ্গীতাচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের চরিত্রে সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

সঙ্গীতশিক্ষাদান সম্পর্কেও গোপালবাবু একটি মহৎ আদর্শ পোষণ করতেন। শিষ্যদের কাছে তিনি আশা করতেন একাগ্র সাধনা এবং সঙ্গীতের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধার মনোভাব।

নানা কারণে তাঁর তুল্য গুণীর উপযুক্ত শিষ্য গঠিত হয়নি। তিনি সখেদে বলতেন, 'আমার দুঃখ এই যে, কলকাতায় কেউ আমার কাছে তেমন করে নিতে এলোনা। কারুর রীতিমত শেখবার আগ্রহ নেই। না হলে আমার অনেক কিছু দেবার ছিল।'

আবার সঙ্গীত-পরিবেশনের ব্যাপারেও তিনি শ্রোতাদের কাছে আশা করতেন আন্তরিক যোগ ও আগ্রহ। শ্রদ্ধাবান ও দরদী শ্রোতা পেলে তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা গান শোনাতে প্রস্তুত ছিলেন, যতক্ষণ পর্যন্ত ধরে শ্রোতারা শুনতে পারে। কিন্তু অপাত্রে সঙ্গীত পরিবেশনে তাঁর বিতৃষ্ণা ছিল। পাছে তাঁর গান অবাঞ্ছিত স্থানে অনুষ্ঠিত হয় সেই চিন্তায় বিশেষ অনুরোধ সত্বেও তিনি রেকর্ড করতে সম্মত হননি। বেতার-কেন্দ্রেও মাত্র একবার ভিন্ন গান করেননি উপযুক্ত পরিবেশের অভাবে। তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করতেন, 'আমার গানের পরে অমুকের আধুনিক গান হবে, কিংবা আমার গানের আগে অমুকের হালকা গান হবে—এরকম করে ধ্রুপদের আসর হয়না।

তাঁর এমনি ধ্যানধারণার জন্যে অনেকের মনে হত তিনি অহংকারী। কিন্তু তাঁর উক্তরূপ মনোভাবের মূলে ছিল ধ্রুপদ সঙ্গীতের মান সম্পর্কে তাঁর উচ্চ-বোধ। রাগসঙ্গীতের আদর্শ বিষয়ে তাঁর এমনি নিজস্ব মতামত ছিল এবং সেখানে তিনি ছিলেন অনমনীয়।

কিন্তু উপযুক্তক্ষেত্রে বিনয়ী হতে জানতেন এবং নিজের আচরণে তা প্রকাশও করতেন। এ বিষয়ে একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখনীয়। সে ১৯৩৬ সালে নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলনের কথা। তখনকার হ্যারিসন রোডে পূর্বতন এ্যালফ্রেড থিয়েটারে সেবার সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল। গোপালবাবু তাঁর অনুষ্ঠানে গেয়েছিলেন কল্যাণ রাগে ধ্রুপদ। বিশিষ্ট গুণীদের ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ (শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকরের অন্যতম সঙ্গীতগুরু) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে তাঁকে বলেছিলেন, 'বহু বছর এমন শুদ্ধ সুর শুনিনি।'

উত্তরে তিনি সবিনয়ে বলেন, 'একশ' বার গান্ধার (কল্যাণ রাগের বাদী স্বর) দিয়ে এসেছি, গেছি; কিন্তু খাঁ সাহেব, ঠিক ঠিক গান্ধার লাগাতে পারিনি।

আল্লাদিয়া খাঁ গোপাল বাবুর এই বিনয়েও মুগ্ধ হয়েছিলেন।

স্বনামধন্য গায়ক আবদুল করিম খাঁ ও ভারত-বিখ্যাত সরদবাদক ফিদা হোসেনও তাঁর গান শুনে জানিয়েছিলেন আন্তরিক অভিনন্দন। ফিদা হোসেন কাশীতে এবং আবদুল করিম খাঁ কলকাতায় তাঁর গান শুনেছিলেন।

সঙ্গীতচর্চায় আদর্শবাদের জন্য তিনি ত্যাগ স্বীকারও করেছেন। বেতার-কেন্দ্রে দ্বিতীয়বার যোগ না দেওয়ার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। তেমনি গ্রামোফোন রেকর্ডের প্রতিও তাঁর আস্থা ছিলনা এবং এক্ষেত্রে তার সময়ের স্বল্পতার জন্যে। তিনি ব্যঙ্গ করে বলতেন, 'তিন মিনিটে আবার গান কি হবে?

তেমনি সঙ্গীতাসরে তাঁর শিষ্টাচার ও সৌজন্যবোধ তাঁর চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল। যে আসরে তিনি উপস্থিত হতেন সেখানে শেষ মিনিট পর্যন্ত থাকতেন, তা অন্যান্য গায়ক যত অখ্যাত বা অপটু হোক। নিজের অনুষ্ঠানের সঙ্গেই তিনি আসর ত্যাগ করে আসতেন না, যেমন অনেকেই করে থাকেন।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ছায়ানট রাগে তিনি সিদ্ধ ছিলেন। এটি তাঁর অতি প্রিয় রাগও। ছায়ানটে তাঁর আর একটি প্রসিদ্ধ গান হল—'শঙ্কর বৃকধর চন্দ্রমা।' তাঁর অন্যান্য প্রিয় রাগগুলির মধ্যে হাম্বির, কেদারা, জয়জয়ন্তী, মল্লার, কামোদ, ভৈরব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তাঁর নিকটে অল্পবিস্তর সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন বিভূতিভূষণ ঘোষ, বাসুদেব চক্রবর্তী, কোটিরাম, হৃষিকেশ বিশ্বাস, জয়কৃষ্ণ সান্যাল প্রভৃতি।

তিনি শেষ জীবন পর্যন্ত সক্ষম কণ্ঠে সঙ্গীতজগতে বিদ্যমান ছিলেন। ১৯৪১ সালের ৪ঠা আগষ্ট, তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয় বারাণসীতে। কলকাতা থেকে সেখানে মাত্র ১৫ দিন আগে তিনি গিয়েছিলেন।

কাশীতে তিন দিন অরভোগের পর সঙ্গীতে জগতর এই বিরাট পুরুষের দেহান্ত ঘটে।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯৬৩)

বাংলার আর একজন সুপরিচিত ধ্রুপদী ছিলেন বিষ্ণুপুরের গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি তাঁর সুদীর্ঘ সঙ্গীতজীবনে বাংলায় ধ্রুপদ সঙ্গীতচর্চার একটি বিশিষ্ট ধারাকে অব্যাহত এবং সঞ্জীবিত রেখেছিলেন। তাঁর পরিণত বয়সে তিনি ছিলেন বিষ্ণুপুর ঘরাণার শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা। তাঁর সঙ্গীতসাধনা এবং শিষ্য গঠনের ফলে বাংলার এই একমাত্র ঘরাণার ধ্রুপদসঙ্গীত ধারা আধুনিক কাল পর্যন্ত উপনীত হয়েছিল।

বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ চর্চার ক্ষেত্রে বাংলা ধ্রুপদ গানের একটি বিশেষ স্থান আছে একথা সুপরিজ্ঞাত। এই সঙ্গীতসম্প্রদায়ের অন্যান্য নেতৃস্থানীয় গুণীদের মতন গোপেশ্বর বাবুও বাংলা ধ্রুপদকে মর্যাদার আসন দিয়েছিলেন। হিন্দী ধ্রুপদের পাশাপাশি বাংলা ধ্রুপদ গান সঙ্গীতক্ষেত্রে স্থান করে নেয় তাঁদের সঙ্গীত-জীবনের ফলে। হিন্দী ধ্রুপদের সাধনাও যে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতাচার্যগণ আজীবন করেছিলেন, একথা অবশ্য বলা বাহুল্য। তবে সেক্ষেত্রেও বিষ্ণুপুরের নিজস্ব চালের বৈশিষ্ট্য তাঁরা বরাবর রক্ষা করেছিলেন। তাঁদের ধ্রুপদ গানে গমক প্রায় বর্জিত থাকত, বলা যায়। সেই সঙ্গে মিষ্টত্ব অলঙ্কার বাহুল্যবিহীন একটি সরল সৌন্দর্যের জন্যে চিহ্নিত থাকত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখের পরিবেশিত সঙ্গীত।

গোপেশ্বরবাবু ধ্রুপদ ভিন্ন খেয়াল ও টপ্পা রীতির গানেরও চর্চা করেছিলেন। উপরন্তু সেতার প্রভৃতি যন্ত্রসঙ্গীতেও। কিন্তু তিনি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন ধ্রুপদ গানের জন্যে। সুমিষ্ট এবং উদাত্ত-কণ্ঠ ধ্রুপদীরূপে তিনি সঙ্গীতজগতে প্রখ্যাতনামা ছিলেন।

বিষ্ণুপুরের পূর্বাচার্যদের তুল্য তিনিও একজন গানরচয়িতারূপে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। বাংলা ও সঙ্গীতজীবনে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর বিভিন্ন স্বরলিপি গ্রন্থে মুদ্রিত হয়েছিল।

নানা স্বরলিপিপুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করা তাঁর সঙ্গীত-জীবনের আর একটি উল্লেখনীয় পরিচয়। "সঙ্গীতপ্রকাশিকা," 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা,' 'ভারতী' 'ভারতবর্ষ', 'সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা' প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তাঁর বহু গানের স্বরলিপি প্রকাশিত হয়েছিল।

'প্রবাসী'তে তাঁর 'রূপ ও আলাপ' নামে একটি ধারাবাহিক রচনাও প্রকাশ পেয়েছিল। একাধিক সঙ্গীতবিষয়ক পত্রিকার সম্পাদনা-কাজের সঙ্গেও তিনি যুক্ত ছিলেন বিভিন্ন সময়ে। প্রতিভা দেবী প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত সঙ্গীত সংস্থা 'সঙ্গীতসঙ্ঘ'র মাসিক মুখপত্র 'আনন্দসঙ্গীত পত্রিকা'র শেষ পর্য্যায়ে গোপেশ্বর বাবু সম্পাদক হয়েছিলেন। তারপর মাসিকপত্র 'সঙ্গীতবিজ্ঞান প্রবেশিকা'রও তিনি ছিলেন অন্যতম সম্পাদক।

তিনি স্বরলিপি সম্বলিত যেসব গানের গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাদের মধ্যে 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা' সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা'র প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ যথাক্রমে বাংলা ১৩১৬ ও ১৩২১ সালে প্রকাশিত হয়। তা'ছাড়া, 'গীতমালা' (১৩৩০ সন), 'তানমালা' (১৩৩২ সন), 'গোপেশ্বর গীতিকা', 'বহুভাষী গীত' (১৯৩৯ খৃঃ), 'গীতদর্পণ' (১৯৫২ খৃঃ), 'ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) প্রভৃতি স্বরলিপির গ্রন্থাবলীর তিনি রচয়িতা।

গোপেশ্বর বাবু নিজে যেসব বাংলা ও হিন্দী গান রচনা করেন তা অন্যান্য গায়করাও গাইতেন এবং তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গ্রামোফোন রেকর্ডে তা বিধৃত করেছেন। যথা, কে. মল্লিক।

ধ্রুপদ গায়করূপে গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু বাংলা দেশে নয়, পশ্চিমাঞ্চলেও সঙ্গীতানুষ্ঠান করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ, বারাণসী প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি ধ্রুপদ গান শুনিয়েছিলেন একাধিকবার।

তাঁর নিকটে রীতিমত শিক্ষালাভ করে যাঁরা সঙ্গীত

ধারকরূপে সুপরিচিত। যথা, তৃতীয় অনুজ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (রবীন্দ্র-সঙ্গীতের নির্ভরযোগ্য স্বরলিপিকার-রূপে এবং গুণী গায়করূপে সম্মানিত), সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও পুত্র রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সুকণ্ঠ গায়ক এবং রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত-বিভাগের ডীন ছিলেন মৃত্যুকাল পর্যন্ত)।

তা ছাড়া, গোপেশ্বর বাবু 'সঙ্গীত সঙ্ঘে'র সঙ্গীত শিক্ষক নিযুক্ত থাকার সময়ে অনেক ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা দিয়েছিলেন।

'প্রবাসী' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক এবং বিদগ্ধ মনস্বী অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রথম জীবনে কিছুকাল ধ্রুপদ গানের চর্চা করেছিলেন গোপেশ্বর বাবুর বিশেষ শিক্ষাধীনে, একথাও প্রসঙ্গত উল্লেখ্য।

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘকাল যাবৎ বর্ধমান মহারাজার সভাগায়করূপে বর্ধমানে অবস্থান করে-ছিলেন। সেখানে কার্যকালের শেষে তিনি কলকাতার সঙ্গীতক্ষেত্রেও যুক্ত থাকেন অনেকদিন। সেসময়ে তিনি প্রতিভা দেবী (হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও স্যার আশুতোষ চৌধুরীর পত্নী, ভারতীয় ও ইউরোপীয় সঙ্গীতে অভিজ্ঞা) পরিচালিত 'সঙ্গীতসঙ্ঘে'র একজন সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ একটি প্রশংসাপত্র এবং 'স্বরস্বরসতী' উপাধি দিয়েছিলেন গোপেশ্বর বাবুকে। তিনি একসময়ে শান্তিনিকেতনে সঙ্গীতশিক্ষকরূপে অবস্থানও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ধ্রুপদাঙ্গ গানের গায়করূপে তাঁকে অনুষ্ঠান করতে দেখা গেছে কলকাতায়।

কলকাতার সঙ্গীতসমাজে তিনি সুপরিচিত ছিলেন অবশ্য বিষ্ণুপুরী ধারার ধ্রুপদের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধি-রূপে। জীবনের অন্তিম পর্বে তিনি বিষ্ণুপুরেই বাস করেন।

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতজ্ঞ বন্দ্যোপাধ্যায়-পরিবারে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের প্রথমদিকে (বাংলা সন ১২৮৬, ২৫ পৌষ) গোপেশ্বরের জন্ম হয়। পিতা অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুরের সুপরিচিত গায়ক। বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের শেষবয়সের অন্যতম শিষ্যরূপে তিনি সমগ্র সঙ্গীতজীবন বিষ্ণুপুরে অতিবাহিত করেন। রামশঙ্করের মৃত্যুকালে (১৮৫৩ খৃঃ) তাঁর (অনন্তলালের) বয়স ছিল ২০।২১ বছর।

গোপেশ্বর বালক বয়স থেকে পিতার নিকটে সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ করেছিলেন। পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, সঙ্গীতগুণী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিক্ষাধীনেও সঙ্গীতচর্চা করেন তিনি।

তারপর যৌবনকালে তিনি সঙ্গীতশিক্ষার্থীরূপে কলকাতায় এসেছিলেন। বেতিয়া ঘরাণার বিখ্যাত ধ্রুপদ ও খেয়ালগায়ক গুরুপ্রসাদ মিশ্র (শিবনারায়ণ মিশ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা) তখন অবস্থান করতেন কলকাতায়। বিষ্ণুপুরের অন্যতম সঙ্গীতপ্রতিভা রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, খেয়াল টপ্পা প্রভৃতি অঙ্গে সুপ্রসিদ্ধা গায়িকা যাদুমণি প্রভৃতি গুরুপ্রসাদ মিশ্রের কাছে রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা করেছিলেন। গুরুপ্রসাদ ধ্রুপদের ঘরাণাদার হলেও প্রধানত পরিচিত ছিলেন খেয়াল-গুণীরূপে এবং ধ্রুপদের সঙ্গে তালিমও দিতেন খেয়ালে।

গোপেশ্বর বাবু তাঁর কাছে খেয়ালগানের শিক্ষালাভ করেন বলে প্রকাশ।

পরবর্তী জীবনে আসরে কিন্তু গোপেশ্বর বাবু খেয়াল গাইতেন না। ধ্রুপদ গায়করূপেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন সঙ্গীতাসরে এবং সঙ্গীতসমাজে।

তিনি ৮৪ বছরব্যাপী সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন এবং একেবারে শেষ পর্যন্ত সঙ্গীতচর্চায় অব্যাহত থাকেন। জীবনের অন্তিম পর্যায়েও শিক্ষার্থীদের সঙ্গীতের পাঠ দিয়ে গেছেন বিষ্ণুপুরে।

বিষ্ণুপুরেই তিনি পরলোকগত হন।

যত আঁধার তত আলো

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

৫

পঞ্চাশ আর একান্ন নম্বরের ঘর দুটিও খালি হ'ল। ঘরদুটি বহুদিন ধরে ছগনের অধিকারে ছিল।

রাতারাতি পালিয়েছে ছগন, আর তার বৌ কড়িকাঠে ঝুলে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। পরদিন সকালবেলা মনোরমাই সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কার করেছে।

কি জানি কেন একটা তীব্র অস্বস্তি তাকে সারারাত ঘুমাতে দেয়নি। জগন্নাথের আপিং-এর মৌতাত কিন্তু ভালই জমেছিল। মনোরমার ব্যাকুল আহ্বানে তিনি ধীরে সুস্থে উঠে বসে মৃদু কণ্ঠে বললেন, কি বললে মনোদিদি ? ছগনের বৌ মরে গেছে ?

মনোরমা বলল, আত্মহত্যা করেছে।

জগন্নাথ অন্যমনস্কভাবে ব'ললেন, আমি জানতাম। এ ছাড়া তার অন্য কোন পথও ছিল না। কিন্তু ছগনের বৌ একলা মরে হয়তো আর দশজনকে বাঁচিয়ে গেল।

মনোরমা বোকার মত খানিক তাঁর মুখের পানে চেয়ে থেকে সহসা দ্রুত পাশের ঘরে প্রবেশ ক'রল এবং ছগনের বৌর দেওয়া কাগজের মোড়কটি খুলে সেইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। গত রাতে তার এই ঘরে আবির্ভাব থেকে সুরু ক'রে আরও বহু কথা একের পর এক তার মনের কোণে ভীড় ক'রে দাঁড়াল, মনোরমা কতক্ষণ যে চুপ ক'রে বসে ছিল তা ওর হুঁশ নেই, সহসা জগন্নাথের উপস্থিতিতে সে চমকে উঠল।

জগন্নাথ প্রশ্ন ক'রলেন, তোমার হাতে ওটা কি মনোদিদি ?

মনোরমা মৃদু কণ্ঠে বলল, ছগনের বৌর দিনলিপি।

জগন্নাথ বললেন, ওটা নিয়ে তুমি কি করছিলে দিদি ?

দেখছিলাম, মনোরমা জবাব দিল।

জগন্নাথ ব্যস্ত কণ্ঠে ব'ললেন, না দিদি না, এসব ব্যাপারে বেশী কৌতূহল না থাকাই ভাল।

কৌতূহল ফুরিয়ে গেলেই মানুষের মৃত্যু হয় একথাতো তুমিই আমাকে শিখিয়েছো, এখন অন্যকথা বললে শুনবো কেন দাদু! মনোরমা জবাবে বলল।

জগন্নাথ ব'ললেন খুব অন্যায় কাজ করেছি ভাই এখন দয়া ক'রে তোর ঐ দিনলিপিখানা আমাকে দে-দেখি।

মনোরমা দৃঢ়কণ্ঠে ব'লল, এখন আমার কাছেই থাকবে। তোমার ভয় নেই আমি খুব সাবধানেই রেখে দিচ্ছি। তুমি বরং একবার ওদিকে যাও দাদু।

জগন্নাথ বললেন, সময় হলেই যাব ভাই—

জগন্নাথকে যেতে হ'য়েছিল বৈকি। শুধু যেতেই হয়নি। থানা পুলিশ থেকে শুরু করে পোষ্টমর্টম এবং শেষ পর্য্যন্ত ছগনের বৌয়ের শেষকৃত্য সমাপনেও তাঁর দৈহিক এবং আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হ'য়েছিল।

ছগন পালিয়ে আত্মরক্ষা ক'রেছে আর তার বৌ মরে বেঁচেছে।

জগন্নাথ হঠাৎ কেমন যেন থেমে গেছেন। কথা কমেছে—আপিং এর মাত্রা বেড়েছে।

মনোরমা বলে, তুমি কি ক্ষেপে গেলে দাদু?

জগন্নাথ অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন। বলেন, নারে দিদি বরং যাতে ক্ষেপে না যাই তার জন্যে সাবধান হচ্ছি।

মনোরমা অবাক হ'য়ে বলল, মাঝে মাঝে তুমি যে কি ব'লতে চাও তার একবিন্দু আমি বুঝতে পারি না।

জগন্নাথ বলেন, না বোঝার মত করে আমি ত' কোন কথা বলিনা মনোদিদি, তবু যদি তোমরা না বুঝতেপার তা হ'লে আর কি ক'রতে পারি। তাছাড়া সব কথা যদি না বোঝ তাতেই বা ক্ষতি কি। মনে করে নিও সব কথা সকলের জন্য বলা হয় না।

তাহলে তেমন কথা আমার সামনে বলো না দাদু, মনোরমা রাগ ক'রে বলল।

জগন্নাথ একটু হেসে বলেন, তুই রাগ করিস না ভাই। তোর দাদু মাঝে মাঝে তার নিজের কথা নিজেকেই শোনায়।

মনোরমা অবাক হয়ে দাদুর মুখের পানে চেয়ে রইল। কোন কথা বলল না।

জগন্নাথ বলতে থাকেন, অমন করে চেয়ে আছিস কেন দিদি? ভাবছিস তোর দাদু তোকে মিথ্যে বলছে?

মনোরমা বলল, আমি ভাবছিলাম তুমি কখন কি বলো তা তুমি নিজেই জান কিনা?

জগন্নাথ ঈষৎ হেসে বলেন, তাকি কখনও হয় মনোদিদি। বরং একটু বেশী করে জানি বলেই এত বেশী সাবধান হতে হয়। আর বেশী সাবধান হতে গিয়েই গোলমাল করে ফেলি। যত এগোচ্ছি ততই পেছনের দিকে আরও বেশী করে নজর পড়ছে। সেই জন্যেই ছগনের বৌয়ের মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করেও আমাকে আপিং এর মাত্রা বাড়াতে হয়েছে। ভাল কথা তোমার ঐ খাতাখানা আমায় একবার দিওতো ভাই।

মনোরমা কি জানি কেন এই মুহূর্তে আর কোন আপত্তি না করে খাতাখানি নিয়ে এসে জগন্নাথের হাতে দিল।

৬

খাতাখানি হাতে নিয়ে খানিক স্তব্ধভাবে বসে রইলেন জগন্নাথ। তার পরে ধীরে ধীরে পাতা ওল্টাতে লাগলেন। পরিষ্কার হস্তাক্ষর। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা লিখে রেখেছে ছগনের বৌ। একবার আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে নিয়ে পুনরায় তিনি আরম্ভে ফিরে এলেন।

দিনলিপির প্রথম পৃষ্ঠা:

অনেকদিন ধরেই নিজের কথা লিখে রাখবার ইচ্ছে আমার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। কিন্তু লিখতে বসে বারে বারেই পিছিয়ে গেছি। নিজের বোকামির লজ্জা আমার হাত চেপে ধরেছে।

আমার কথা শুধু কথা নয়—আগাগোড়া সত্য। আমার নির্বোধ সিদ্ধান্তের স্থূল পরিণতি—যা দিনের পর দিন আমাকে শুধু আঘাত দিয়েই চলেছে। এর জন্যে আমি দুঃখ করি না। দুঃখ করবার অধিকারও আমার নেই। আমার কর্মফল আমাকে ভুগতে হবে বৈকি।

আজ আমি ছগনলালের স্ত্রী। আমার যথার্থ পরিচয়। অথচ এর চেয়ে বড় পরিহাস আমার কাছে আর কিছু নেই। সত্য হলেও সম্ভব নয়। কিন্তু কেন? আজ এই কথাটাই আমার মনের উপর পাষান বোঝা হয়ে চেপে রয়েছে। বারে বারে শুধু একটা কথাই আমার সমস্ত সত্তাকে নাড়া দিচ্ছে। কিসের প্রলোভনে আমি অনিশ্চয়তার পথে পা বাড়ালাম যখন সংসারের উপর আমার এতবড় আকর্ষণ!

বাবা মার পরিচয় আমি দিতে চাই'না। তাঁরা আমার বুকের মধ্যেই থাকুন। আমার চতুর্দ্দিকের এত জঞ্জালের মধ্যে তাঁদের আর টেনে আনতে চাই না। অনেক দুঃখ, অনেক অপমান আমার জন্য তাঁরা সয়েছেন। সময় হয়তো সে বেদনার উপর খানিকটা পলিমাটি চাপা দিতে

সক্ষম হয়েছে। তাঁদের আরও আছে। বহুর জন্য একেকে ভোলা হয়তো সম্ভব কিন্তু আমি কি নিয়ে বাঁচব এইটেই আমার কাছে একমাত্র সমস্যা। কোন পথেই সমাধান খুঁজে পাচ্ছি না। আমার অন্তরাত্মা দিন রাত তাই আর্ত্তনাদ করে চলেছে।

দ্বিতীয় পৃষ্ঠা :

ভাবছিলাম এই পথে দশজনার চোখের সম্মুখে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার এই দুর্বার আকাঙ্খা আমার কেন হয়েছিল। বাবার মত আদর্শ চরিত্র মানুষের সন্তান হয়েও আদর্শকে আমি নির্বিবাদে বাদ দিলাম। চিত্র-তারকা হবার উগ্র বাসনায় পাগল হয়ে উঠলাম।

বাবার বাইরে প্রচুর খ্যাতি কিন্তু ঘরে তার চেয়েও বেশী আর্থিক অনটন। কিন্তু এই অভাব বাবাকে কোন দিন স্পর্শ করতে পারে নি। অন্ততঃ তাঁর মুখ দেখে একদিনের জন্যও একথা মনে হয়নি। সাধনার সিদ্ধিতেই তিনি তুষ্ট। আর্থিক দিকটা বড় হয়ে উঠতে পারেনি।

যে প্রাচুর্য্যের প্রতি বাবার এতখানি অনাসক্তি আমি কিনা সেইদিকে অন্ধের মত ঝুঁকে পড়লাম। আমার বিচার বুদ্ধি মোহগ্রস্থ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যে মোহ একটা মানুষকে এমন সুস্থ সাংসারিক পরিবেশ থেকে পথে নিয়ে এলো আর 'একটা সামান্য পরিচিত লোকের সামান্যতম আশ্বাস বাণীতে সামাজিক বন্ধনের বাইরে টেনে আনতে সক্ষম হলো এর মূল কোথায় এই কথাটাই আজ একটা জিজ্ঞাসা হয়ে আমাকে পীড়া দিচ্ছে। এ প্রশ্ন সেদিনে আমার মনে দেখা দেয়নি কেন?

তাইতো কথাটা নতুন করে ভাবতে বসে বড় দুঃখেও আমার শুধু হাসিই পাচ্ছে।

বাড়ীতে প্রচুর বই আমদানি হতো। নানা শ্রেণীর নানা রুচির। বাবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও তার প্রত্যেক-খানি বই গোগ্রাসে গিলেছি। নিজের পরিপাকের শক্তি কতটুকু তা পর্য্যন্ত একবার ভেবে দেখা দরকার মনে করিনি। মার মুখে মাঝে মাঝে বিরক্তি ফুটে উঠতো। বাবার কাছে এ নিয়ে অনুযোগ দিতেও শুনেছি কিন্তু বাবা মাকে হেসে থামিয়ে দিতেন। বলতেন, শুধু একটা দিকই তোমার চোখে পড়েছে—এর একটা ভাল দিকও আছে তা ভুলে যাও কেন?

তা হয়তো আছে নইলে আজ আমি নিজের কাছেই আমার কাজের সমর্থন পাচ্ছি না কেন। অবশ্য মন্দ দিকটাকেও অস্বীকার করা সম্ভব নয়। মোটকথা আমার জীবনে তাঁদের দুজনার যুক্তিই সমানভাবে প্রযোজ্য।

চোখ-ঝলসান সাড়ী আর গহনা···মনমাতান দেহ-ভঙ্গী···কথা নিয়ে কাব্য···কাজ নিয়ে কাহিনী আর কারণে অকারণে জীবনীর ছড়াছড়ি···এর মোহ থেকে মুক্তি পেলাম না। আমি মাতাল হয়ে উঠলাম। ধীরে ধীরে জ্ঞান হারালাম।

বাবার অর্থের প্রতি অনাসক্তি আর মার দারিদ্র্যের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে চলাকে আমি অক্ষমের আত্ম-সমর্পণ বলেই মনে করেছি। ভিতরে ভিতরে আমি বিদ্রোহী হয়ে উঠলাম। মনে মনে একটা যুক্তিও দাঁড় করালাম এই অন্তঃবিপ্লবের আর সুযোগ নিলাম বাবার উদার মনোভাবের। পথের একটি উজ্জ্বল ছবি মনে মনে এঁকে নিয়ে পা বাড়ালাম। ছবিটা আসলে পথ কিনা একথা একবার মনেও হলো না।

আমাকে সকলে সুন্দরী বলতো। আয়নায় নিজেকে নানাভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে মনে হতো কথাটা ঠিক নয়—ওরা কৃপণ তাই সত্য কথা সহজ করে বলতে পারেনি। অপরূপ সুন্দরী বলা ওদের উচিত ছিল। সকলের চেয়ে আকর্ষণীয় ছিল আমার মিঠে কণ্ঠস্বর। আজও সেই আমিই বেঁচে আছি কিন্তু কোথায় আমার সে রূপ আর কণ্ঠস্বর!

আয়নায় নিজের চেহারা দেখে আমি নিজেই চমকে উঠি আর কণ্ঠস্বর আমার নিজেরই কানে আগুন ঢেলে দেয়। আমাকে কোথাও খুঁজে পাই না। কিন্তু এসব কথা এখন থাক। আমার সৌন্দর্য্যের কথাই বলি। যে সৌন্দর্য্য একদিন বহুকে অনায়াসে মুগ্ধ করেছে···বহুকে নিরাশ করেছে। কিন্তু যাকে আমি আমার আলো দেখিয়েছিলাম সেই আমাকে নিরন্ধ্র অন্ধকারের

ধ্যে ঠেলে দিয়ে নিজে সে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। আমার অসহায় অবস্থার কথা বুঝতে পেরে প্রাণপণে হাতে সেই অন্ধকারকে ঠেলে সরিয়ে যখন আলোয় এসে দাঁড়ালাম তখন সর্ব্বাঙ্গ আমার কালো হয়ে গেছে।

চতুর্থ পৃষ্ঠা :

আমি গুমরে কেঁদে উঠলাম। আমার অতি লোভ এ আমাকে কোথায় টেনে নিয়ে এল। পৃথিবীর এ চেহারা কোনদিন আমি কল্পনা ক'রতেও পারিনি। সম্মুখে আমার অতলস্পর্শী গহ্বর। শিউরে উঠলাম। বাঁচবার জন্য যাকে কাছে পেলাম তাকেই শক্ত করে আঁকড়ে ধরলাম। ছগন আমার সে দৃঢ় বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রতে পারলে না। আমার ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ ক'রতে বাধ্য হলো। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে ভাবলাম, জীবনটা তো রক্ষা পেলো। তা পেয়েছিল ঠিকই। কিন্তু কিসের বিনিময়ে মৃত্যুকে ঠেকালাম এই প্রশ্নটাই ইদানিং সর্ব্বদা আমাকে পীড়া দিচ্ছে। এর নাম কি বেঁচে থাকা? এই বেঁচে থাকার মধ্যে সৌন্দর্য্য কোথায়···আনন্দ কোথায়? এই গ্লানিময় জীবনযাত্রা আর কতদিন চলবে? আমার অন্তরাত্মা চীৎকার করে বলে, আমি এক মৃত্যুকে ঠেকাতে গিয়ে বহুমৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছি। কিন্তু আমার এই দুর্ভাগ্যের জন্য শুধু কি আমি একাই দায়ি? অপরের কাজের সমালোচনা ক'রতে আমি চাই না—ক'রবার অধিকার আমার নেই তা আমি জানি তবুও মনটা আমার ঘুরে ফিরে অতীতের দিনে ফিরে যায়। নিজেকে মর্ম্মান্তিক ধিক্কার দিতে গিয়ে আর একটি ধনী এবং মানী লোকের কথা মনে পড়ে। তার অনেক টাকা। লোকে তাকে মান্য করে। সমীহ করে। অত্যন্ত মাজাঘষা ব্যবহার। একসময় বাবার ছাত্র ছিল। হঠাৎ একজন গুণগ্রাহী ভক্ত হ'য়ে উঠলো।···

পঞ্চম পৃষ্ঠা:

শুধুই কি গুণগ্রাহী হ'য়ে উঠলো। কারনে অকারনে বাবার পাশে এসে দাঁড়ায়। অভাবে সহানুভূতি জানায়। মুক্ত হস্তে সে অভাব মোচন ক'রতে এগিয়ে আসতে চায়। বাবা খুব হাসেন। বলেন, তোমার কথা আমার সবসময় মনে থাকবে বাবা। তোমার অনেক আছে তাই দিতে চাইছো কিন্তু তা নেবো কোন অধিকারে? আমার যা প্রাপ্য নয় তা গ্রহণ ক'রতে আমাকে অনুরোধ ক'রো না। এভাবে কোনদিন অভাব ঘোচে না বাবা।

আড়ালে দাঁড়িয়ে আমি শুনছিলাম। বাবা আবার ব'ললেন, তুমি দুঃখ করো না সুকুমার কিন্তু অপরের দয়া দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করার গ্লানিকে আমি কিছুতেই স্বীকার ক'রে নিতে পারবো না।

আমার কানে সুকুমারের কণ্ঠস্বর ভেসে এল। ও বলছিলো, আমার ভুল হ'য়েছে মাষ্টারমশাই। সব জিনিস সকলকে দেওয়া চলে না এ কথাটা আমার মনে ছিল না। আমাকে মাপ ক'রবেন। সুকুমার চলে গেল। পথে আমার সামনাসামনি পড়েও একবার মুখ তুলে তাকাল না।

বেশ কিছুদিন পরে আবার তাকে বাবার ঘরে দেখলাম! বাবার বিস্মিত কণ্ঠস্বর আমাকে সজাগ ক'রে তুললো।

তুমি বলো কি সুকুমার! পাঁচ হাজার দেবে আমার একটা সামান্য গল্পের জন্য? তুমি নিশ্চয়ই ভুল শুনেছো বাবা।

সুকুমারের একটুকরো হাসি আমার কানে এল। বড় মিষ্টি লাগল ধ্বনিটি। ও বলছিল, ভুল ক'রবো কেন মাষ্টারমশাই এ লাইনে যাকে দেয় তাকে এমনিভাবেই দিয়ে থাকে। আপনি এতেই আশ্চর্য্য হ'চ্ছেন—চিত্র-তারকারা এক একখানা বইয়ে কত টাকা পেয়ে থাকেন তা শুনলে আপনি হয়তো বিশ্বাস ক'রবেন না। পাঁচ দশ হাজার তাঁরা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেন না।

বাবার গলা শুনতে পেলাম, ওদের কথা তুমি ছেড়ে দাও সুকুমার। ওরা চিরদিনিই পেয়ে আসছে। কিন্তু আমার মত······

বাবাকে থামিয়ে দিয়ে সুকুমার বললে, আপনাদেরও দিন আসবে। সবসময় যথার্থ মূল্য পাওয়া যায় না এ-কথা

ঠিক কিন্তু সুযোগমত এগিয়ে দিয়ে সময়মত টেনে তুলতে পারলেই—কথাটা শেষ না ক'রে সুকুমার হাসতে থাকে।

ষষ্ঠ পৃষ্ঠা :

সুকুমারের সঙ্গে দেখা হ'লো। আজ আর সে পাশ কাটিয়ে চলে গেল না। আমি কৃতার্থ হ'লাম। উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলাম মুখের দুটো কথা শুনবার জন্য। মনে হ'লো আমার মনের কথা জানতে পেরেই সে উপেক্ষাভরে চলে গেল। নিজের উপর রাগ হ'লো। ধিক্‌কার দিলাম আমার যৌবনপুষ্ট অপরূপ দেহটাকে। একবার জানতেও পারলাম না যে, সে একদিকে দাক্ষিণ্যের জাল অপরদিকে উপেক্ষার ফাঁদ পেতেছে আমর এই রক্তমাংসের দেহটার জন্য। আমি উন্মাদ হ'য়ে উঠলাম। সুকুমার অত্যন্ত চাতুর্য্যের সঙ্গে বাবাকে আশ্রয় ক'রে আমাকে প্রশ্রয় দিতে লাগলো। আমি ডুবলাম একটা রঙিন আর সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের স্বপ্নরাজ্যে।

সুকুমার জানিয়েছে, দশ, পনের, বিশ হাজার টাকার কনট্রাক্ট বছরে পাঁচ সাতটা অনায়াসে সে আমার জন্য ব্যবস্থা ক'রে দেবে। আরও বলেছে, শিক্ষা, রূপ আর কণ্ঠস্বরের এমন অপূর্ব্ব সমন্বয় বড় একটা দেখা যায় না।

বাবাকে আমার অভিপ্রায়ের কথা সোজা ভাষায় জানালাম। তিনি কথাটা যেন বিশ্বাস ক'রতে পারছেন না এমনিভাবে আমার মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। তারপর একসময় অদ্ভুতভাবে' হেসে উঠে ব'ললেন, তোর মাথায় বড় চমৎকার মতলব দেখা দিয়েছে দেখছি। তোর বাবা লিখবেন ছায়াচিত্রের জন্য বই আর তুই করবি তাতে অভিনয়। তোদের বাবা যখন ছেলে মেয়েদের কোন সাধ-আহ্লাদই মেটাতে পারলেন না তখন নিজেরাই উদ্যোগী হ'য়েছিস। আমি আর কি ব'লতে পারি।

বাবার দৃষ্টি সহসা তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো। এত তীক্ষ্ণ যে আমি ভয় পেয়ে মাথা নামালাম·······

দাদু,···ডাক দিয়ে মনোরমা এসে জগন্নাথের পাশে দাঁড়াল। বলল, আর কতক্ষণ ঐ খাতাটা নিয়ে ব'সে থাকবে। এবারে ওঠো—চা খাও তারপর না হয় একবার টহল দিয়ে এসো। নইলে আবার খিদে হবে না তোমার।

মনোরমার সব কথা জগন্নাথের কানে গেছে কিনা বোঝা গেল না। তিনি অন্যমনস্কভাবে জবাব দিলেন, ছগনের বৌর বুদ্ধি ছিল, কিন্তু সেবুদ্ধিকে কাজে লাগাবার মত জ্ঞান ছিল না ব'লেই একটা জীবন কোন কাজে এলো না।

মনোরমা বলল, এই ধরনের মেয়ে কি আজ তোমার প্রথম চোখে প'ড়লো দাদু।

জগন্নাথ অল্প হেসে বলেন, এরা ত' খুব বেশী চোখে পড়ে না মনোদিদি। সাধারণের দৃষ্টির আড়ালেই এদের জীবন। সুরু থেকে শেষ। যেটুকু আমরা দেখি তা মেকআপ নেওয়া জীবন। রং-চং মেখে কাদাকে সোনার তাল তৈরী করে। বাইরে থেকে যারা দেখে তাদের চোখে পড়ে শুধু সোনার উজ্জ্বল রং।··· লোভে পড়ে এগিয়ে আসে—মেকি ধরা পড়লে পিছিয়ে যাবার পথ বন্ধ হ'য়ে যায়। তার পর কোথায় কোন অন্ধকারে হারিয়ে যায় দিদি ভাই, কেউ তার খোঁজ রাখে না।

মনোরমা ব'লল, অন্যায় ক'রলে তার ফল ভোগ ক'রতেই হবে দাদু।

জগন্নাথ হঠাৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, কিন্তু কে অন্যায় করে?

মনোরমা অনুত্তেজিত কণ্ঠে বলল, যে করে তারও, যে সাহায্য করে তাকেও সমান অপরাধী বলে আমি মনে করি।

জগন্নাথের মুখে বড় সুন্দর একটুকরো হাসি ফুটে উঠল। তিনি বার বার মাথা নেড়ে ব'লতে থাকেন আমি তোমার সঙ্গে একমত নই মনোদিদি। লোভ স মানুষের মধ্যেই আছে, কিন্তু সেই লোভকে জাগি তুলতে যারা রং তুলির সাহায্য নেয় তাদের আ মানুষের শত্রু বলেই মনে করি।

মনোরমা খানিক চুপ ক'রে থেকে বলে, কিন্তু ঘরে-বাইরে তোমার এই শত্রু তো নেহাত মুষ্টিমেয় নয় দাদুভাই।

কথাটা মেনে নিয়ে জগন্নাথ বলেন, অন্যায়প্রবণতা তাইতেই এমনি ক'রে দিন দিন বেড়ে চলেছে। কিন্তু এই বুড়োর একটা কথা তুই বিশ্বাস করিস ভাই—

বাধা দিয়ে মনোরমা ব'লল, আর একটি কথাও তোমাকে আমি বলতে দেব না দাদু। আগে চায়ের পেয়ালায় চুমুক দাও।

বাধ্য ছেলের মত চায়ের পিয়ালায় পর পর গোটাকয়েক চুমুক দিয়ে একসময় মুখ তুলে জগন্নাথ বললেন, হুকুম দাও তো কথা সুরু করি মনোদি-

ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রেখে মনোরমা সংক্ষেপে ব'লল, না। এবং পরমহূর্ত্তেই খাতাখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে দ্রুত পাশের ঘরে চলে গেল।

জগন্নাথ ওর চলার পথে দৃষ্টি রেখে বললেন, তোমার হুকুম তো তামিল ক'রেছি দিদি। খাতাখানা দয়া করে আর নিও না ভাই।

মনোরমা ইতিমধ্যে ফিরে এসেছে। বলল, খাতাটা আপাতত আমার কাছেই থাকবে। তুমি ছগনের বৌকে নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করছো দাদু।

জগন্নাথের বুক ভেদ করে একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস বার হ'য়ে এল। কোন জবাব না দিয়ে তিনি একদৃষ্টে মনোরমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। মনটা অতি দ্রুত-গতিতে একবার অতীত দিনের সুদীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ করে পুনরায় বর্ত্তমানে ফিরে আসতেই তাঁর মুখে-চোখে একটা ব্যথার ভার ফুটে উঠল।

দাদুর এই আকস্মিক ভাব পরিবর্ত্তনে মনোরমা খানিকটা বিস্মিত হলেও যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠেই প্রশ্ন করল, হঠাৎ অমন গম্ভীর হয়ে গেলে কেন দাদু ভাই?

৭

জগন্নাথ একটু হাসার চেষ্টা করে জবাব দিলেন, কৈ নাতো দিদি ভাই……

মনোরমার কাছ থেকে পুনরায় খাতাটি জগন্নাথ আদায় করে নিয়েছেন। মনোরমা ও ঘরে কাজে ব্যস্ত। জগন্নাথ খাতা খুলে বসেছেন—

দিনলিপির সপ্তম পৃষ্ঠা:

মাথা নীচু করে থেকে যে অব্যাহতি পাব না এবং এখানেই যে এই প্রসঙ্গের শেষ হবে না বা হতে পারে না তা আমি জানতাম। তাই শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম বাবার একটা জবাব শুনবার জন্য। একসময় একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তিনি বললেন, তোমরা বড়ো হয়েছ। নিজেদের বুদ্ধি আছে বলেও দাবি করে থাক—কাজেই আমার কিছু না বলাই ভাল। তাছাড়া আমার কথা তোমার এখন ভাল লাগবে না।

বাবা কতকটা উদভ্রান্তের মত ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। পরিষ্কার করে নিষেধও করলেন না—সহজ ভাবে অনুমতি ও দিলেন না। অনুমতি পাবার আশা নিয়ে আমার প্রস্তাব পেশ করিনি। কথাটা তাঁকে এক-বার জানান দরকার বলেই জিজ্ঞেস করেছি।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বাবা আবার ফিরে এলেন। ফিরে এলেন সুকুমারকে নিয়ে। দূর থেকে আমি লক্ষ্য রেখেছিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্য তার মুখে কিছুমাত্র চাঞ্চল্য দেখা গেল না। শান্তভাবে বাবার সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করল। আমি উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম বাবার কণ্ঠস্বরে। তিনি বলছিলেন, না সুকুমার তোমার কোন যুক্তিই আমি মেনে নিতে পারবো না। তোমার প্রডিউসারকে জানিয়ে দাও আমার কোন লেখা চিত্রে রূপান্তরিত হয় এ আমি চাই না। আমি মনোস্থির করে ফেলেছি। না টাকার কথা তুমি আর তুলো না। টাকা কোনদিন আমার ছিল না, ভবিষ্যতেও না হয় হবে না। এ প্রলোভনকে জয় করতেই হবে আমাকে।

সুকুমারের জবাবটাও আমি শুনতে পেলাম। হঠাৎ আপনার মত পরিবর্ত্তনের হেতু কি মাষ্টারমশাই? শুধু টাকাটাকেই আপনি বড় করে দেখছেন কেন। আত্ম-

প্রচারের এতবড় সুযোগ সবসময় পাওয়া যায় না। সব দিক ভালভাবে বিচার করে দেখা উচিত।

বাবা বললেন, সব উচিত কাজ সকলে করতে পারে না সুকুমার। আমি ভেবেচিন্তেই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি।

অষ্টম পৃষ্ঠা :

বহুক্ষণ আর কারুর কোন কথা আমার কানে এলো না। হঠাৎ চমকে উঠলাম সুকুমারের উত্তেজিত কণ্ঠস্বরে, আপনি বলেন কি মাষ্টারমশাই? শেষ পর্য্যন্ত আপনার মেয়ের মাথায় এই দুর্ব্বুদ্ধি দেখা দিয়েছে!

বাবার কণ্ঠস্বর ভেঙ্গে পড়লো, সুবুদ্ধি কি দুর্ব্বুদ্ধি তা আমি জানি না কিন্তু আমার মাথায় কোন বুদ্ধিই জোগাচ্ছে না সুকুমার।

সুকুমারের হাসির শব্দ কানে এলো। সেই ওর ব্যঙ্গ-মেশান কণ্ঠস্বর, করব বললেই সব কাজ পাওয়া যায় না করাও যায় না। গুচ্ছেরখানেক আজেবাজে বই পড়ে পড়ে মাথা গরম হয়েছে। যাক না কোথায় যাবে। পাঁচ দরজার মাথা ঠোকাঠুকি করে আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তখন আর জীবন গেলেও ও পথের ছায়া মাড়াবে না।

বাবা বললেন, তাইতেই আমার এতো ভয় সুকুমার।

সুকুমার তার কথার ধারা সঙ্গে সঙ্গেই পালটে ফেলেছে, আপনি বড় অল্পেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। সামান্য দুটো মুখের কথাকে অনেক বেশী মূল্য দিয়ে বসে আছেন।

বাবা বললেন, আমি বুঝি সুকুমার। তোমাকে চেষ্টা করে বোঝাতে হবে না। সব কাজেই আজকের দিনে মুরুব্বি থাকা চাই। ও যে কথাটা ভাবতে পেরেছে তা কাজে পরিণত করার পথে অনেক বাধা কিন্তু এই বাধাটা বড় কথা নয়—বড় কথা হচ্ছে আমার মেয়েও আজ এই পথে চিন্তা করতে সুরু করেছে। আমায় যে আজ লজ্জায় মরে যেতে ইচ্ছে করছে বাবা। আমার অক্ষমতার গ্লানি আমাকে পাগল করে তুলেছে।

আমি ধীরে ধীরে সরে পড়লাম। সুকুমারের কথাগুলি কেমন ধোঁয়াটে। আমাকে সে একরকম বুঝিয়েছে বাবার সঙ্গে আবার অন্য সুরে কথা কইছে!

নবম

আমি সরে গিয়েও চলে যেতে পারলাম না। আবার ফিরে আসতে হ'লো। আমার জন্য আরও বড় বিস্ময় লুকান ছিল। সুকুমার বাবাকে ব'লছিলো, আপনি দুঃখ পাবেন না মাষ্টারমশাই, আজকের এই পরিস্থিতির জন্য আপনি নিজেই দায়ী।

বাবার বিস্মিত কণ্ঠস্বর পুনরায় শুনতে পেলাম, এ সব তুমি কি ব'লছো সুকুমার? সুকুমার জবাব দিয়েছিল, আমি মিথ্যে বলিনি। সময় থাকতে আপনি শক্তহাতে শাসন করেন নি কেন? অভিনেত্রী হবার প্রস্তাব নিয়ে যখন আপনার কাছে এসেছিল তখন চাবুক মারতে পারেন নি?

আমার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে। সুকুমারের কি মাথার ঠিক নেই? আমাকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে এসে তারপর চাবুক মেরে ফিরিয়ে দেবার কথা ব'লতে ওর একটুও আটকাল না!

পুনরায় বাবার কণ্ঠস্বর কানে এলো, চাবুকে আমার বিশ্বাস নেই সুকুমার। ও আমি ভাবতেও পারিনে।

বাধা দিয়ে সুকুমার ব'ললো, যে রোগের যে দাওয়াই। ওটা ব্যবহার না করাই বরং অন্যায়। আমার ধারণা আপনি জেনেশুনেই আপনার মেয়েকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

এর পরে বহুক্ষণ কেউ কোন কথা বলে নি। আমি চলে যাবার জন্যে পা বাড়াতেই পুনরায় বাবার গলা শোনা গেল, হয়তো তোমার কথাই ঠিক কিন্তু আমি চেষ্টা ক'রেও শক্ত হ'তে পারি না। হিসেব ক'রতে বসে যাই—আর আমার হিসেব সবসময় আমাকেই অপরাধী ব'লে রায় দেয়।

সুকুমার বলে, আমার হিসেবও একই কথা বলে।

দশম পৃষ্ঠা :

বাবার সামনে বসে সুকুমার যেভাবে হিসেবের খাতা দেখিয়েছিল ওটা নাকি সঠিক হিসেব নয়। ওটা আয়কর ফাঁকি দেবার খাতা। আসল হিসেব আমাকেই নাকি সুকুমার দেখিয়েছিল। আমার বিস্মিত প্রশ্নের জবাবে সে এই কথাগুলিই বলেছিল। আরও বলেছিল, তোমার উকিল কোনদিন বেইমানি করেনি—ক'রবেও না।

আজ জীবনসংগ্রামে যথাসর্ব্বস্ব হারিয়ে তাইতো বারেবারেই শুধু মনে হচ্ছে, বুদ্ধির দোষে আর হিসেবের ভুলে নিজের কতবড় সর্ব্বনাশ আমি নিজের হাতে ক'রেছি।

বিশ্বাস করে সুকুমারের হাত ধরে পথে নামলাম—আত্মস্বার্থের যূপকাষ্ঠে সে নির্ব্বিচারে আমার ইহকাল আর পরকালকে বলি দিলে।

ছগনের হাতে আমি বন্দিনী হলাম…

জগন্নাথ আত্মগতভাবেই বলে উঠলেন—দুর্ভাগিণী…

মনোরমা তামাক নিয়ে এসেছিল। হুঁকোর নলটি জগন্নাথের হাতে ধরিয়ে দিয়ে ব'লল, তামুক খাও দাদু…

জগন্নাথ একটু হাসবার চেষ্টা করে গম্ভীরকণ্ঠে বললেন, ঠিক সময় ঠিক জিনিষ এগিয়ে দিয়েছিস ভাই। তুই না থাকলে আমার কি দুর্দ্দশাই না হ'তো দিদি।

মনোরমা ব'লল, এ আবার একটা কথা হ'লো নাকি?

জগন্নাথ ব'ললেন, ঠিক ব'লেছিস মনোদিদি এটা যদি একটা কথাই হবে তবে তোর মা মরেও আমাকে এতবড় একটি অবলম্বন দিয়ে যাবেন কেন…

মনোরমা জগন্নাথের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কোমলকণ্ঠে ডাকল, দাদু…

জগন্নাথ যেন অনেক দূর থেকে সাড়া দিলেন, কি দিদি।

মনোরমা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে মাঝে মাঝে আমার মনে হয় সবসময় কিছু একটা আমার কাছ থেকে তুমি লুকিয়ে রাখতে চাও।

জগন্নাথ চমকে মুখ তুলে তাকান। স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে থেকে কিছু খুঁজে বেড়ান। তারপরে মৃদু প্রতিবাদের সুরে বলেন, ঠিক মনে পড়ছে না কখন কোন কথা তোমাকে লুকোতে চেয়েছি। তবে তোমাকে কখনই আমার দুঃখের অংশীদার ক'রতে চাইনি একথা ঠিক। একে যদি তুমি লুকোন ব'লতে চাও তাহলে এ কাজ যতদিন আমি বাঁচব আমাকে ক'রতেই হবে দিদিভাই।

মনোরমা ডাকল, দাদু—

জগন্নাথ সাড়া দেন, কি দিদি?

মনোরমা বলল, আমি হ'লে কিন্তু একলা দুঃখের বোঝা ব'য়ে বেড়াতাম না? ভাগাভাগী ক'রে নিতাম।

জগন্নাথ বলেন, তোকে বড় বেশী ভালবাসি বলেই আমার ব্যথার অংশীদার করতে চাই না ভাই।

মনোরমা ব'লল, আমি কিন্তু উলটো বুঝি দাদু। যাকে ভালবাসি তাকেই মন খুলে দেখাবার জন্য ছটফট করি।

জগন্নাথের মুখে হাসি দেখা দেয়। তিনি বলেন, ওটা বোধহয় মেয়েদের ধর্ম্ম তাই এত ঠেকে আর এত ঠকেও তারা ওকে ত্যাগ ক'রতে পারে না মনোদিদি।

মনোরমা প্রতিবাদ জানাল, না দাদু তারা শুধু ঠকে না, তার চেয়ে অনেক বেশী আনন্দ পায়।

জগন্নাথ জবাব দেন, সব আনন্দের রূপ হয়তো এক নয় বলেই তোর কথা আমি মেনে নিতে পারছি না। তবে জেনে রাখ ভাই, আমার দুঃখের জাত আলাদা—সাধারণ দশজনার হিসেবের মধ্যে তা আসে না।

মনোরমা বলে, তোমার একটা কথাও আমার মাথায় ঢোকে না দাদু। গোলাপ টবে ফুটলেও গোলাপ, আস্তা-কুঁড়ের ফুটলেও গোলাপ। আমি চেহারার ইতরবিশেষের কথা ব'লছি না। জাতের কথাই বলতে চাই।

জগন্নাথ একটু যেন চমকে উঠলেন কিন্তু মুহূর্ত্তে সামলে নিয়ে বললেন, কথাটা বেশ গোলমেলে দিদি। আমারও ঠিক মাথায় ঢোকে না তাই মাঝে মাঝে দুঃখের মেঘ ভেসে এসে আমার আনন্দকে ম্লান করে ফেলে।

সহসা কথা থামিয়ে জগন্নাথ অদ্ভুতভাবে হাসতে থাকেন।

মনোরমা তাঁর মুখের পানে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে একসময় ঘর ছেড়ে চলে যায়। জগন্নাথের এই ধরনের হাসির সঙ্গে তার পরিচয় আছে। তিনি যে আর এক পা এগুতে চান না এটা তারই সংকেত।

॥ ৮ ॥

মনোরমা ঘর ছেড়ে চলে যেতেই জগন্নাথের একটি নিঃশ্বাস পড়ল। তিনি চোখ বুজে অন্যমনস্কভাবে তামুক টেনে চলেছেন।

সুখে-দুঃখে তাদের দিনগুলি একরকম কেটে যাচ্ছিল। ছগনের বৌয়ের মৃত্যু আর স্বীকার-উক্তিগুলি তাঁকে আবার নতুন করে নাড়া দিয়েছে। জগন্নাথ ভয় পেয়েছেন। বয়েস তাঁর বেড়ে চলেছে। মাটির সঙ্গে শিকড়ের যোগ দিন দিন ঢিলে হ'য়ে যাচ্ছে। লড়াই করবার শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। হয়ত একদিন বিনা নোটিশেই ভেঙে পড়বে। তারপর? এই তারপরের চিন্তাটাই জগন্নাথকে জোর করে অতীতের ফেলে-আসা দিনগুলির মধ্যে টেনে নিয়ে যায়। চতুর্দ্দিকে তাঁর দুশ্চিন্তার মহাসাগর উথলে ওঠে। জগন্নাথ হাবুডুবু খান। তাছাড়া আজকাল মনোরমার কথাবার্ত্তার মধ্যেও সবসময় একটা জিজ্ঞাসা ফুটে ওঠে...

তামাক পুড়ে ছাই হ'য়ে গিয়েছে বহুক্ষণ। এতক্ষণ জগন্নাথ খেয়াল করেন নি। সহসা টের পেয়ে হাঁক দিলেন, মনোদিদি কোথায় গেলে গো?

মনোরমা সাড়া দিয়ে হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়াতেই জগন্নাথের এতক্ষণের দুশ্চিন্তা ভারাক্রান্ত মনটা একটু হাল্কাবোধ করল। বিপরীত সংঘাতে মন তাঁর বিক্ষুব্ধ। চিন্তা তাঁর বিপর্য্যস্ত।

কেষ্ট সাহার বাজারবাড়ীর বিভিন্ন চরিত্রের মানুষগুলির সঙ্গে, এখানের কোলাহল, দলাদলি, গলাগলি, অভাব-অনটনের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে চলে ফিরে অতীত জীবনের প্রবেশ পথে তিনি সবসময়ই একখানি ভারি পর্দ্দা ঝুলিয়ে রেখেছেন। কিন্তু একটু জোরে বাতাস দিলেই পর্দ্দা সরে গিয়ে যে দৃশ্যগুলি তাঁর দৃষ্টিপথে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে তা জগন্নাথের বর্ত্তমান জীবনযাত্রাকে বিপর্য্যস্ত ক'রে তোলে। তিনি ব্যথা পান—শঙ্কিত হ'য়ে ওঠেন। অথচ এই প্রবেশপথটাকে কিছুতেই সুদৃঢ় কংক্রিটের দেয়াল তুলে একেবারে বন্ধ করে দিতে পারেন না। কোথায় যেন আত্মগোপন করে রয়েছে একটা মধুর বেদনা জড়ান স্মৃতি।

জগন্নাথের চিন্তার পথ বেয়ে আর একটি মেয়ে ধীরে ধীরে জগন্নাথের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়াল। মনোরমা মুছে গেছে। সেখানে দেখা দিয়েছে তার মা। জগন্নাথের একমাত্র সন্তান। প্রায় দু'যুগ পূর্ব্বে যে-মেয়েকে তিনি হারিয়েছেন। হারিয়েছেন ব'ললে হয়ত সবটা বলা হবে না। অভিমান ক'রে চলে গিয়েছে। মাত্র একটি দিনের সামান্যতম একটি মুহূর্ত্তের...

জগন্নাথ চমকে উঠলেন। জগন্নাথকে ডাকছে। মনোরমার মা নয় মনোরমা। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলছিল, সেই থেকে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছি অথচ কেন ডাকলে তা এখনও বলবার সময় হলো না দাদু।

জগন্নাথ মৃদু কণ্ঠে বললেন, সত্যিই বড় অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ছি আজকাল ভাই।

মনোরমা বলল, কথা বললে শুনবে না। তোমাকে শেষ পর্য্যন্ত ঐ খাতায় পেয়ে বসেছে দাদু।

কথাটা একপ্রকার স্বীকার করে নিয়ে জগন্নাথ বললেন, ছগনের বৌ নিছক উপলক্ষ্য দিদি কিন্তু আমার তামুকটা যে একেবারে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছে। কলকেটা বদলে দিবি ভাই।

কলকেটা তুলে নিয়ে মনোরমা মন্থরপদে চলে গেল। জগন্নাথ মুগ্ধ স্নেহে ওর দুখানি পায়ের চঞ্চল ওঠা পড়ার পানে চেয়ে থাকতে থাকতে একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। মনোরমার মাও ঠিক এমনি করেই চলাফেরা করতো। এমনি করেই কথায় কথায় রাগ করতো,

তিযোগ দিত, কেঁদে ভাসাতো। স্ত্রী বিয়োগের পর কেও তিনি এমনি করেই বুকে পিঠে করে মানুষ রেছিলেন। তাই তার রাগ-অভিমান-নালিশ-আবদার র কিছুই বাপকে সইতে হতো। মেয়েকে তিনি বাপের র্তব্য আর মায়ের স্নেহে মানুষ করে তুললেন। কত প্ন দেখেছেন সেই মেয়েকে নিয়ে…

তামুক দিয়েছি দাদু। সাড়া দিয়ে মনোরমা পুনরায় গন্নাথের পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, খাতা রেখে কবার না হয় আচার্য্যি কাকার কাছ থেকে ঘুরে এসো দু।

জগন্নাথ বললেন, যোগেন আচার্য্য কাজের লোক দি, তাকে যখন-তখন বিরক্ত করা উচিত হবে না াই।

মনোরমা বলল, না হ'য় অন্য কোথাও যাও তবু ভাবে—কথাটা শেষ না করেই সে অন্যপ্রসঙ্গে এল, মাকে একটা সত্য কথা ব'লবে দাদু?

এই আকস্মিক প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনে জগন্নাথ চমকে ঠলেন। তাঁর চমকটা এতই স্পষ্ট যে মনোরমারও তা দৃষ্টি এড়াল না। সে মৃদু কণ্ঠে ব'লল, অমন ভয় াওয়া মানুষের মত চমকে উঠলে কেন দাদু?

জগন্নাথ সামলে নিয়ে জবাব দিলেন, তাই হয় দিদি। মৃত্যু হবার আগেই যা কিছু ভয়। নইলে রনটা সত্যিই কিন্তু ভয়ের নয়। আমি প্রস্তুত নোদিদি।

মনোরমা চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে কিছু ভাবল তার পরে শান্ত হেসে ব'লল, তোমার ভয়টাই থাক দাদু আমার কৌতুহলটাই মরুক।

মনোরমা দ্রুত প্রস্থান ক'রল।

জগন্নাথ নলটি হাতে তুলে নিয়ে পাগলের মত শুধু টেনে চলেছেন। সমস্ত ঘরখানি ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে। সেইসঙ্গে যেন তাঁর বর্ত্তমানটাও তিনি স্পষ্ট অনুভব ক'রছেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছেন অমন অতীত জীবনের একটি সম্ভাবনাময় রূপ। আশা আকাঙ্খার হাল্কা ডানায় ভর করে সেদিনের জগন্নাথ চৌধুরী কত স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে চেয়েছিলেন। স্ত্রী পুত্র আত্মীয় পরিজন…

চোখ জ্বালা ক'রতে লাগল জগন্নাথের, তিনি হাঁক দিলেন মনোদিদি—

মনোরমা ঘরে ঢুকে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলল, তুমি তামুক খাচ্ছ, না উনুন ধরিয়েছো দাদু। এমনি ক'রে আবার কেউ তামুক খায় নাকি!

জগন্নাথ একথায় কোন জবাব না দিয়ে সহসা উঠে দাঁড়ালেন। ব'ললেন, তুই ঠিকই ব'লেছিস ভাই। একবার টহল দিয়েই আসি। নিয়মের ব্যতিক্রম বোধ হয় আমার সহ্য হচ্ছে না।

৯

জগন্নাথ বার হ'য়ে যেতেই মনোরমাও দ্রুত তার অসমাপ্ত কাজগুলি শেষ করে মলয়ের ঘরের সম্মুখে এসে উপস্থিত হ'ল। বন্ধ দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে বলল, আমি মনোরমা দরজটা একবার খুলুন।

সাড়া নেই।

টোকা আঘাতে পরিণত হ'ল। দরজা খুলে গেল। মনোরমা নিঃশব্দে ঘরে প্রবেশ ক'রে একবার চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস ক'রল, লিখছিলেন নাকি? কোন ক্ষতি ক'রলাম নাতো। দাদু টহলে বেরিয়েছেন। সময় কাটছিল না তাই গল্প ক'রতে এলাম।

মৃদু হেসে মলয় ব'লল, রান্না ক'রছিলাম। লিখছিলাম না। লেখা বন্ধ ক'রে উঠতে হ'য়েছে।

খানিক চুপ ক'রে থেকে মনোরমা বলে, আপনি এমনি ক'রেই প্রতিভাকে নষ্ট ক'রছেন।

মলয় খুব খানিকটা হেসে নিয়ে বলল, প্রতিভা থাকলে কেউ তাকে আটকে রাখতে পারে না। একসময় তা প্রকাশ পাবেই। ওর জন্য অপেক্ষা করা চলে কিন্তু পেট কোন যুক্তি মেনে চলে না মনোরমা!

কথাটা মেনে নিয়ে মনোরমা স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল, কি রান্না ক'রেছিলেন?

হাসি মুখে মলয় বলল, হবিষ্যান্ন। এই একটি বিষয় মন আমার যুক্তি মেনে চলে। কোনদিন অবস্থার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। কুকারে এই মাত্র চাপিয়ে দিলাম।

মনোরমা খানিক অদূরে অবস্থিত কুকারের পানে চেয়ে থেকে মৃদু কণ্ঠে বলল, রোজ রোজ সেদ্ধ খেতে আপনার ভাল লাগে?

মলয় তেমনি হাসিমুখেই জবাব দেয়, তোমাকে ত' বলেছি মনোরমা, ভাল না লাগাটাও আমার যুক্তি মেনে চলে। নইলে রোজই কখন ও জিনিষ ভাল লাগতে পারে না।

মনোরমা অকস্মাৎ ঘর ছেড়ে চলে গেল এবং খানিক বাদে ফিরে এসে কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, কিছু না ভেবে-চিন্তেই নিয়ে এলাম। আমরাও রোজ নিরামিষ খাই। ভাব'লে আপনার ঐ সেদ্ধ থেকে অনেক ভাল। খানিকটা লাউঘণ্ট আর মোচার ডালনা নিয়ে এলাম। যদি কিছু মনে না করেন···

মলয় খানিক চুপ করে থেকে বিগলিতকণ্ঠে বলল, তোমার ঐ ডালনা আর ঘণ্ট আমার কাছে রাজভোগ মনোরমা কিন্তু তুজনার ভাগথেকে তুলে এনেছো ব'লে আমি সঙ্কোচবোধ ক'রছি।

মনোরমা হেসে ব'লল আপনি ত' অঙ্কের অধ্যাপক নন—সাহিত্যিক। অত বেশী হিসাব নাইবা ক'রলেন।

মলয় তথাপি থামতে পারে না। ব'লে তোমার দাতু জানলে হয়তো—

তাকে বাধা দিয়ে মনোরমা ব'লল আমার দাতুকে আপনি জানেন না বলেই এ কথা ভাবতে পেরেছেন। জানলে তিনি রাগ ক'রবেন না বরং খুশী হবেন।

একটু চুপ ক'রে থেকে বলল, তাঠিক, অপরকে জানা সহজ নয়, মানুষ কি নিজেকেই সব সময় বুঝতে পারে?

বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে মনোরমা বলে, খুব সত্য কথা। এই দাতুকে নিয়ে একটু আগে অত বড় আশ্বাস দিলাম ওরই বা কতটুকু মূল্য।

মলয় মুখ তুলে তাকাল।

মনোরমা বলে, অমন ক'রে তাকাচ্ছেন কেন। আমার দাতু আপনাদের মতো সাধকদের তুচক্ষে দেখতে পারেন না সত্যি কিন্তু মানুষকে খাওয়াতে তিনি খুব ভালবাসেন একথা আমি জোর করে বলতে পারি।

মলয় বিস্মিতকণ্ঠে বলল, তোমার সব কথা বুঝলাম না মনোরমা।

মনোরমা হেসে জবাব দেয়, আপনার সম্বন্ধে দাতুর কি ধারণা জানেন? দাতু বলেন, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ ক'রে সাধনা করলে সিদ্ধিলাভ হয়তো একদিন ঘটতে পারে কিন্তু তার আগেই আপনার অস্তিত্ব লোপ পেয়ে যাবে।

মলয় অবাক বিস্ময়ে ব'লল, আমার সম্বন্ধে তোমার দাতুর এ অদ্ভুত ধারণা জন্মাল কি ক'রে? আমিতো কোনদিন তাঁর কাছে যাইনি, অথবা আমার লেখার কথা—

তাকে থামিয়ে দিয়ে মনোরমা ব'লল, সে দোষ আমার মলয়বাবু। আমার কাছ থেকেই দাতু পেয়েছেন। অপান আত্মপ্রকাশ করেন না কেন মলয়-বাবু। তার অভিযোগ তো সেইখানেই।

কতকটা ক্লান্ত কণ্ঠে মলয় জবাব দিল, বোধহয় দিনের আলো আমার সহ্য হয় না ব'লে। আলোকেই আমার সব চেয়ে বেশী ভয়।

মনোরমা বলল, এ সব সাহিত্যের কথা বড় ঘোরালো। ঠিক বুঝতে পারি না।

মলয় গম্ভীর কণ্ঠে বলে, মানুষের কথা নিয়েই সাহিত্য মনোরমা। জীবনটা আমাদের সহজ নয় বলেই হয়তো সবসময় তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। জন্ম আর মৃত্যুর মাঝখানের পথটা সহজ সরল নয় বলেই তা নিয়ে এত বড় বড় কাব্য সৃষ্টি হ'চ্ছে।

মনোরমা মৃদুকণ্ঠে বলে, জন্ম এবং মৃত্যুর মধ্যে জটিলতা কোথায়। বরং এর চেয়ে সহজ সরল সত্যি আর নেই।

মলয় বলল, আমি কিন্তু এই তুটোর মধ্যিখানের পথটার কথা ব'লছিলাম মনোরমা।

মনোরমা খানিক চুপ ক'রে থেকে বলে, একটু এঁকে-

কে চলতে হ'লেও সেটাও পথ মলয়বাবু। সহজ
তে দেখতে পারলেই সহজ।

এই বাল-বিধবা মেয়েটির মুখের পানে খানিক
দৃষ্টে চেয়ে থাকে মলয়।

মনোরমা বলে, কি দেখছেন?

মলয় অতি সাবধানে একটি নিঃশ্বাস চেপে মৃদুকণ্ঠে
লল, তোমার চোখ নিয়ে দেখলে আর মন নিয়ে
বতে পারলে সুখী হতাম কিন্তু আমার সঙ্গে সবসময়
টা দ্বিধা বাসা বেঁধে রয়েছে। তাইতো সবসময়
সেব ক'রতে বসি। জন্ম মৃত্যুর হিসেব ক'রতে বসি—
ঝের পথটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে চাই। কিন্তু
ব কথা থাক—

মলয় থামতে চাইলেও মনোরমা থামল না। সে
ল, জন্ম, মৃত্যু কিংবা মাঝের পথ এদের হাত থেকে
মানুষ অব্যাহতি পায় না। সেখানে তো আমাদের
ত নেই।

মলয় থেমে থেমে বলতে থাকে, তবুও মানুষ যে
লক্ষ্য একথা কোন যুক্তি দিয়েই অস্বীকার করা যায়
। জন্মাবার আগে পরে কোথাও না। সূচনা থেকে
ব পর্য্যন্ত।

মনোরমা বলে, এর মধ্যেইবা জটিলতা কোথায়
য়বাবু। ভাত রান্না ক'রতে হ'লে চালের দরকার।
ন জুটলে···পাত্র চাই···তারপরে চাই জল···

আরও অনেক কিছু চাই সে আমি জানি মনোরমা,
র বললে, এত অকুলান তবুও চাই। যার প্রয়োজন
ছেসেও চায়, যার নেই সেও চায়। কিন্তু আমার কথাটা
নয়। তুমি তোমার চলার পথকে দাদুর চোখ দিয়ে
খে আসছো বলেই আমার পথটা তোমার চোখে
ছে না। সে পথ বড় সুন্দর···বড় কুৎসিৎ···সেখানে
নন্দ আছে, বেদনা আছে···কিন্তু এসব কথা থাক।

মনোরমা বলে, আপনার আর আমার দাদুর মধ্যে
টা আশ্চর্য্য মিল দেখে আমি অবাক হয়ে যাই
য়বাবু। আপনারা দুজনেই অনেক কথা বলেন অথচ
চুই বলেন না। আমার চলা-ফেরার গণ্ডি সীমাবদ্ধ
ব'লেই হয়তো আপনাদের কাউকেই ঠিক বুঝতে পারি
না। তবুও মাঝে মাঝে আমার মন আর বুদ্ধি আমাকে
বিপরীত কথা বলে।

মনোরমার কথায় মলয় বিস্ময়বোধ করে। জিজ্ঞেস
করে, তোমার এ কথার অর্থ?

মনোরমা হঠাৎ অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে উঠল। বলল,
আমার মন বলে আপনারা সব সময় কিছু গোপন ক'রে
চলতে চান বলেই ঘোরা পথ বেছে নিয়েছেন।

মনোরমার শেষ কথায় মলয় চমকে উঠল। খানিক
স্নেহ-কোমল দৃষ্টিতে তার মুখের পানে চেয়ে থেকে
জিজ্ঞেস ক'রল, হঠাৎ এ পথ ধরে ভাবতে আরম্ভ ক'রলে
কেন মনোরমা?

মনোরমা স্পষ্ট জবাব দিল, কেন তা আমি জানি না।
কিন্তু দেখা দেয় একথা অত্যন্ত সত্য।

মলয় বলল, প্রত্যেক কাজ এবং কথার পেছনেই
একটা না একটা কারণ থাকে, আমার এ কথাটা তুমি
স্বীকার কর কি?

করি—মনোরমা জবাব দিল, এবং করি বলেই তো
পথ খুঁজে পাই না। আপনাকে যদিইবা খানিক বুঝি
কিন্তু দাদু আমার অতলসমুদ্র।

মলয় একটুখানি হেসে বলল, মানুষকে এভাবে বুঝতে
চাওয়ায় অনেকসময় সমস্যা দেখা দেয় মনোরমা। এতে
দুঃখ বাড়ে। তোমার চিন্তার নরম মাটি দিয়ে হয়তো
একটি সুন্দর দেবমূর্তি গড়ে রেখেছো, একদিন যদি দেখ
সেই দেবমূর্তিই রক্তমাংসের এক জীবন্ত দানব-রূপ নিয়ে
আত্মপ্রকাশ করেছে—তখন কি তা সহ্য ক'রতে পারবে
মনোরমা?

মনোরমা যেন নিজের মধ্যে তলিয়ে গেল। বহুক্ষণ
চুপ করে থেকে একসময় স্থিরকণ্ঠে বলল, দেব-দানবের
কথা কখনও আমার মনে আসেনি, কিন্তু মানুষ যেমন
দিনের আলোকে অভিনন্দন জানায় রাতের অন্ধকারকেও
সেই মানুষই কামনা করে মলয়বাবু।···

মলয় সহসা অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল, তুমি কতদূর
পড়াশুনা ক'রেছো মনোরমা?

মনোরমা শান্ত হেসে জবাব দিল, হাতেখড়ি হয়নি বললেও মিথ্যে বলা হবে না। আমার যা কিছু বলা যা কিছু শোনা সবই দাদুর কাছ থেকে ধার করা।

মলয় বলল, ও বস্তু সকলকেই ধার ক'রতে হয় মনোরমা। ধার করবার লজ্জায় যারা পিছিয়ে যায় তারা কিছু পায় না। শোধ করবার ক্ষমতা থাকলেই মানুষ ধার করে। আমি তোমার সেই ক্ষমতার কথাটাই জানতে চাইছিলাম।

মনোরমা হেসে জবাব দিল, সেটা মেপে দেখে আজও কেউ সারটিফিকেট দেয় নি। তাছাড়া আমার হলো প্রাণের দায়—ক্ষমতার কথা ভাববার অবকাশ পেলাম কোথায়।

তুমি সুন্দর কথা বলতে পার, মলয় প্রশংসাসূচক হাসল।

মনোরমা হেসে উঠল, বলল, আমার দাদু আবার উল্টো কথা বলেন। তাঁর মতে আমি শুধু ভাল রান্না করতেই পারি।

মলয় প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বলল, তাহলে খাওয়াটা আজ বেশ ভালই হবে মনে হচ্ছে।

মনোরমা লজ্জা পেল। এবং তা ঢাকবার জন্যই অন্য প্রসঙ্গে এল। বলল, সেই থেকে শুধু বকে যাচ্ছি, কিন্তু আপনার ভাতের কি দশা হয়েছে তা একবার—

বাধা দিয়ে মলয় বলল, কুকারের আগুন বেইমানী করবে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার।

মনোরমা তথাপি একবার উঠে গিয়ে কুকারটা দেখে এল। তার পরে প্রশ্ন করল, আপনি কখন লেখেন মলয় বাবু?

মলয় বলল, এই বাজারবাড়ী ঘুমিয়ে পড়লে। তাও কি সবসময় হয়!

মনোরমা প্রশ্ন করে, কেন?

মলয় হাসিমুখে বলে, যেমন ধরো লেখার প্রবল ইচ্ছে হয়েছে তখনই কানের পাশে হট্টগোল সুরু হ'লো। ভিতরে বাইরে ছট্‌ফট্ করছি কিছু লিখিবার জন্য কিন্তু পারলাম না। বসে গেলাম সংগ্রহ করতে।

মনোরমা বলল, এই যে বললেন রাত্রে লেখেন।

মলয় বলল, লিখি যদি তখন তাদের সঙ্গে অনুভূতির সংযোগ ঘটে।

মনোরমা প্রশ্ন করে, আপনার এ কথার মানে?

মলয় বলল, এমনি যোগাযোগ ঘটলে তবেই বুদ্ধি যোগায় রস—উৎসমুখ যায় খুলে। তা ব'লে এই হট্টগোলকেও অবজ্ঞা করো না। এর মধ্যেও প্রচুর পাওয়া যায়। বেছে নিতে পারলেই হয়। কিন্তু এই বাছাই করতে হয় অত্যন্ত সাবধানে নিভৃতে। সেইজন্যেই আর সকলে যখন ঘুমায় আমি তখন জেগে থাকি। প্রতিদিনের সংগ্রহকে এক জায়গায় জড়ো ক'রে বাছাই করতে সুরু করি। তারপরে চলে যাই অনেকদূরে··· পেছনে। দিন থেকে সপ্তাহে···সপ্তাহ থেকে মাসে··· তারপরে বছরে··তারপরে আরও অনেক দূর। আজকের সঙ্গে, অতীতের সঙ্গে একটা যোগসূত্র স্থাপন করে বুদ্ধির সঙ্গে, মনের সঙ্গে, হৃদয় বৃত্তির সঙ্গে বেমালুম মেখে ফেলে তাইতে তৈরী করি পুতুল। উপন্যাসের চরিত্র।

একটু থেমে আবার বলতে শুরু করল মলয়, বড় বিচিত্র যায়গা এই বাজারবাড়ী। শুধু এর বাসিন্দারা নয়। আমি নিচের তলার কথা বলছি মনোরমা। তোমাদের ঐ মাছওয়ালা, আলুওয়ালা, পটলওয়ালা। জীবনের বহু অমূল্য দিক······

মনোরমা সহসা খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

মনোরমার এই আকস্মিক হাসিতে মলয় অবাক হয়ে বলে, তুমি হাসছো?

হাসবো না? মনোরমা বলল, আপনি তো দিনরাত ঘরের দরজা বন্ধ করেই রাখেন। ওদের দেখবার আর জানবার চেষ্টা কোথায় আপনার।

মলয় কথাটা স্বীকার ক'রে নিয়েই পুনরায় ব'লল, কথাটা ঠিক মনোরমা কিন্তু দূর থেকে যতটুকু আমাদের চোখে পড়ে আমি শুধু তার কথাই তোমাকে বলে ছিলাম।

মনোরমা বলল, কিন্তু দূর থেকে দেখে কি অবিকল

ছবি আঁকা যায় মলয়বাবু? ফাঁকি দিয়ে কি রাজ্য জয় করা যায়?

খানিক চুপ ক'রে থেকে মলয় ব'লল বড় ভাল কথা বলেছো মনোরমা। কিন্তু আজ আর না। তোমার দাদু হয়তো ফিরে এসেছেন।

মনোরমা বলল, না ফেরেননি। সময় হ'লে আমি আপনিই চলে যাব। তার চেয়ে আপনার লেখাটা কতদূর এগোল শোনান।

মলয় একটি নিশ্বাস ত্যাগ ক'রে বলল, আর একটুও এগোতে পারিনি মনোরমা, বাকীটুকু এখনও অন্ধকারে। অনেক চেষ্টা করেও তাকে আলোয় টেনে আনতে পারিনি।

মনোরমা আশ্চর্য্য হয়ে বলল, এই একটা সপ্তাহের মধ্যেও সম্ভব হলো না!

মৃদুকণ্ঠে মলয় বলল, এক সপ্তাহ ত সামান্য কটা দিন। আমাকে হয়তো আজীবন অপেক্ষা করতে হবে।

মনোরমা বলল, মেয়েটার মুখ দিয়ে ছুটো সত্যি-মিথ্যে যাহোক বলিয়ে দিন না।

মলয়ের মুখে হাসি দেখা দিল। মাথা নেড়ে দৃঢ়কণ্ঠে বলল, তাতে সত্যিকারের ছবি আঁকা হবে না মনোরমা। আমি যে যথার্থই রাজ্যজয় করতে বেরিয়েছি। ফাঁকি দিয়ে ফাঁকে পড়তে আমি চাই না।

মনোরমা মৃদু হেসে বলল, আপনি কি আমার কথাই আমাকে ফিরিয়ে দিলেন?

মলয় এ অভিযোগ অস্বীকার করে জবাব দিল, না মনোরমা তা নয়। তুমি জাননা একটি সত্য ছবি আঁকবার জন্য অলিতে গলিতে, দোরে দোরে কত আমায় মাথা ঠুকতে হয়েছে।

মলয় কেমন যেন অন্যমনস্ক হ'য়ে পড়ল।

মনোরমা লক্ষ্য করল না। আপন খেয়ালেই বলল, তাহলে সে মহাভারত আর এ জীবনেও শেষ হবে না;......

মলয় চমকে উঠল।

মনোরমা বলতে থাকে, আপনার গল্পের মানসকন্যাকে আপনি বড্ড ভালবেসে ফেলেছেন তাই এগুতে গিয়ে এত বেশী ভয় পাচ্ছেন।

মলয় গম্ভীরকণ্ঠে বলল, তোমার অনুমান সত্য মনোরমা। ভালবেসে গ্রহণ করতে না পারলে সৃষ্টি কখনও সার্থক হয় না। আমার ভালবাসা যদি এগুবার পথে অন্তরায় হয় তাহলে বরং চিরদিনের জন্য থেমে থাকবো। তা বরং আমার সহ্য হবে তবু মিথ্যা ছবি আঁকবার চেষ্টা আমি করবো না।

মলয় থামল।

মনোরমা উৎকর্ণ হয়ে উঠল। ব্যস্তকণ্ঠে বলল, আপনার ভালবাসা জয়যুক্ত হোক মলয় বাবু। আমাকে এবারে পালাতে হচ্ছে।

চক্ষের পলকে মনোরমা অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

ক্রমশঃ

যোগীর শিল্পসৃষ্টি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

কথাটা এই যে, কোনো শিল্পী বা কবি যে-মুহূর্তে যোগপন্থী হয়, সে-মুহূর্তে তাকে কর্মফলাকাঙ্ক্ষা বর্জন করবার চেষ্টা করতেই হবে। পুরোপুরি কর্মফলের পুরস্কার অর্থাৎ স্বীকৃতি বা প্রশংসার নগদ বিদায় ছাড়া শক্ত। কিন্তু যোগী তো সংসারে আসে নি সহজ পথের পথিক হ'তে। তার আদর্শ—সর্বোচ্চ, মানবজীবনকে দেবজীবনে রূপান্তরিত করা। সে কর্ম করবে কর্ম-দেবতার পূজার অর্ঘ্য ব'লে, কর্মের ফলে সে ধনী মানী বা যশস্বী হবে ব'লে নয়, একথা যদি সে মনে না রাখে তবে সে স্বধর্মভ্রষ্ট হবেই হবে। তার মন্ত্র গীতার: কর্মণ্যেবাধি-কারস্তে মা ফলেষু কদাচন।

এ অতি কঠিন আদর্শ। কারণ আমাদের প্রত্যেকের অন্তরেই সব চেয়ে জোরালো প্রণোদনা যার তার একটি মাত্র নাম আমি: আত্মাদর, অহঙ্কার, মম-কার, অভিমান, অহমিকা এই নামেরই নানা উপনাম। প্রত্যেকটিরই ছন্দ আলাদা কিন্তু উদ্দেশ্য এক—ভগবানের দিক থেকে দৃষ্টি নামিয়ে নিজের 'পরে রাখা। এর ফল বড়ই শোকাবহ—বিশেষ ক'রে যোগীর পক্ষে। যোগী শিল্প-সৃষ্টি করবে না একথা কোনো মুনিঋষিই বলেন নি। করবে, কিন্তু কিসের তাগিদে বলব?

প্রথমত, সৃষ্টির আনন্দে;

দ্বিতীয়ত, সৃষ্টিও কর্ম এবং প্রতি কর্মই অর্ঘ্য, এই মন্ত্র জপ ক'রে;

তৃতীয়ত, কর্মের মধ্যে দিয়েই চিত্তশুদ্ধি হয় যদি সে-কর্ম নিষ্কাম হয়,—এই জন্যে।

সৃষ্টি ক'রে আনন্দ পেলাম এতে দোষের কিছু নেই, কিন্তু তার আদর না হ'লে দুঃখ পাওয়া মানবিক হ'তে পারে, কিন্তু যোগীর পক্ষে পদস্খলন। এই কথাটি বহু বর্ষ পূর্বে গুরুদেব আমাকে লিখেছিলেন। আমি বরাবরই মনে রাখতে চেষ্টা করেছি যদিও অনেক সময়েই সফল হইনি কার্যক্ষেত্রে। শ্রী অরবিন্দ আমাকে লিখেছিলেন:-

Every artist almost (there are rare exceptions) has got something of the public man in him, in his vital physical parts, which makes him crave for the stimulus of an audience, social applause, satisfied vanity, fame etc. That must go absolutely if he wants to be a yogi and his art a service not of man or of his own ego but of the Divine.

আমার মধ্যে অর্থলোভ ঠাঁই পায়নি কোন দিনই। একথা বলছি ভয়ে ভয়ে পাছে এ-সূত্রে অভিমান কের উঁকি দেয়। কিন্তু যশস্পৃহা ছিল খুব বেশি। এজন্যে আমাকে ঘা খেতে হয়েছে কম নয়। কিন্তু ঘা খেতে খেতে এর মূল শিথিল হ'লেও একেবারে লুপ্ত হয়নি আজো। তাই বুঝেছি হাড়ে হাড়ে আমাদের কিভাবে যশের মধ্যে দিয়ে খোরাক জোগাড় করে। বোঝার ফলে দৃষ্টি স্বচ্ছতর হয়েছে। কিন্তু কোন দুর্বলতা দেখতে পাওয়া আর তাকে জয় করা সমার্থক নয়। আমার কেবল মনে হয় আজকাল যে, এটুকু জ্ঞান ও চিত্তশুদ্ধি হয়ত হয়েছে যার ফলে বলতে পারি যে, ঠাকুরের কৃপায় মন চলেছে তাঁরই পায়—তাই সাহিত্যে বা সঙ্গীতে স্বীকৃতি পেলে আনন্দ হ'লেও সে-স্বীকৃতির লোভে আমি সৃষ্টি করি না—সৃষ্টি করি সৃষ্টির আনন্দে ও প্রতি কর্মই তাঁর পূজা এইভাবে করতে আন্তরিক চেষ্টা করি ব'লে।

এও আমার মনে হয় যে, যোগসাধনার প্রধান উপজীব্য কর্মই বটে; ধ্যানধারণাও জোর দেয়—কিন্তু তার ভর কর্মেই। একথা যদি সত্য হয় তাহলে বাঁচোয়া এইজন্যে যে, আমি চলেছি স্বধর্মপালনেই—কাজেই আমার দুর্গতি হ'তেই পারেনা। এটা অহঙ্কার নয়—

এইত ঠাকুরের কথা মেনে চলা—স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ। আর একটি কথা আমার মন নেয়—এক আরব যোগীর কথা: Work is love made visible : এ-মন্ত্রটির বাংলা আমি বহু চেষ্টা করেও করতে পারিনি। কিন্তু কর্ম সম্বন্ধে এর চেয়ে বড় মন্ত্র আমি পাইনি। স্বামী বিবেকানন্দের Work is worship ওরফে তন্ত্রের বাণী—যৎ করোমি জগন্মাতম্ তদেব তব পূজনম্—এর চেয়েও আমার মন সাড়া দেয় ঐ আরব যোগীর বাণীতে যে, প্রেম নিজেকে জানান দেয় কর্মের রূপেই—কারণ, কর্ম না থাকলে প্রেমকে সনাক্ত করতাম কী দিয়ে?

এ-কথার ভাষ্য এই যে, আমি আজকাল প্রাণপণেই চেষ্টা করি মনে রাখতে যে, আমি যে ঠাকুরকে ভালবাসি যেন কর্মসাধনার মধ্যে দিয়েই তার পূর্ণ প্রকাশ করতে পারি—নিখুঁত সুরে তালে ছন্দে ভাবে। এ যেদিন পুরোপুরি পারব সেদিন "আমাকে আর পায় কে" অবস্থা হবেই হবে—ওরফে জীবন্মুক্ত অবস্থা যার জন্যে সব ছেড়ে শরণ নিয়েছিলাম মহাযোগিগুরুর পায় প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে।

কিন্তু এর মানে এই নয় যে পাঠকের সাড়া কাম্য নয়। যা কিছু আপনা থেকে আসে, যা সুন্দর আন্তরিক সত্য, তাই পাঠকের দান। এই ভাবেই যোগী-শিল্পী কলা-রসিকের প্রীতি শ্রদ্ধাকে বরণ করেন একথা ষোল-আনা সত্য। তাই মামুলি বৈষ্ণব বিনয়ের সুরে বলব না যে, আমি অধমাধম—এ হেন প্রশস্তির অযোগ্য। বৈষ্ণব বিনয়কে আমার বরাবরই মনে হয়েছে ছদ্মবেশী অহঙ্কার—মানে, সাড়ে পনেরো আনা ক্ষেত্রে

জানি না ঝাপসা রয়ে গেল কিনা যা বলতে চাইছি। বলা শক্ত—চাই অথচ চাইও না দুইই সত্য—প্যারাডক্স—আর ভাষায় প্যারাডক্সের ভাষ্য করা দুরূহ কাজ বৈকি। আমার সৃষ্টিতে কেউ আনন্দ পেলেই আমি খুশি—কে আর কারুর লেখায় তার চেয়ে বেশি আনন্দ পেল বা কম, এ-ওজন করায় আমার মনের সায় নেই। তা ছাড়া কোন সত্যকীর্তিই অনাদৃত থাকতে পারে না—এ তাঁর বিধান যাঁর ইচ্ছায় মানুষ কীর্তিমান্ হয়। কাজেই কী যায় আসে কে কতটা নিল আর কতটা ফেলে দিল। সর্বোপরি আমার আনন্দ তো রইল—সৃষ্টির আনন্দ—কর্মের আনন্দ—সব চেয়ে বেশী ক'রে অর্ঘ্য সমর্পণের আনন্দ। তাকে মারে কে। গীতার কথাটা তো আর কথার কথা নয় যে, কর্মেই আমাদের অধিকার, কর্মফলে নয়।

আমার নাটক সম্বন্ধে বিরুদ্ধ সমালোচনা হলে তাতে আমি ক্ষুণ্ণ হব কেন? তবে একটা কথা: নাটক দুরকম আছে: শ' বলতেন। এক, যা পড়লে বেশি ভালো লাগে; আর এক, যা মঞ্চেই বেশি জমে। আমার মনে হয় প্রতি নাটককে মঞ্চস্থ ক'রে তবে তার মূল্য ধার্য করতে হবে এ সূত্রটিই নামঞ্জুর। শ'-র Man and Superman মঞ্চে কোনদিনই জমে নি। কিন্তু প'ড়ে অজস্র নাট্যরসিক আনন্দ পেয়েছেন। পাঠক যখন নাটক পড়েন তখন তিনি সত্যি রসিক হলে কল্পনানেত্রে দেখতে পেতে পারেন সহজেই—কোন্ চরিত্র মঞ্চে কী ভাবে কথা কইছে। সফোক্লিসের ঈডিপাস—অভিনয় হলে ক'জন পাত্তা দেবে? কিন্তু এর সংলাপ, চরিত্র-সৃষ্টি, নাটকীয় মহিমা ও ট্রাজেডির গভীর কারুণ্যরস কি তাই ব'লে কম! ভিখারিণী রাজকন্যা সব আগে পাঠ্য নাটক, যে কেউ দরদ নিয়ে পড়বে সে এর ভঙ্গিতে ভাষায় চরিত্রগৌরবে নাটকীয় সংঘাতে মুগ্ধ হবেই হবে যদি ক্রমাগত না ভাবে মঞ্চে জমবে কিনা। তাছাড়া মঞ্চে অনেক সময়েই খুব ভালো নাটকও জমে না। তাতে কী এল গেল? শ' তাঁর অনেক নাটক যখন পড়তেন বহু শ্রোতা মুগ্ধ হত। আমি মাঝে মাঝে Beggar Princess এর শেষ দুটি অঙ্ক প'ড়ে শুনিয়েছি—অনেকেই চোখের জল রাখতে পারে নি। এর কি কোন মূল্য নেই? আর মঞ্চে তো "সেতু"-ও জমল—রেকর্ড করলে তিন বৎসর চ'লে। তাই ব'লে বলব কি "সেতু" চমৎকার নাটক?

না, আমার নাটককে মন খুলে গাল দিলে আমি সত্যিই মনঃকষ্ট পাব না। কারণ, আমি স্বভাবে স্পর্শকাতর হলেও দাম্ভিক নই। কিন্তু নাটক সম্বন্ধে আমার কয়েকটি ধারণা আছে যা এখানে বলব।

প্রথম কথাটা এই যে, হৃদয়ের কথা ভাবাটা অবান্তর

নয়। আমার মনে হয়, উচ্চ হৃদয়বৃত্তি যখন মর্মস্পর্শী-ভাবে কোনো নাটকে ফুটে ওঠে তখন তার একটা বিশেষ মূল্য থাকে। একটা দৃষ্টান্ত দেই।

সম্প্রতি বহুদিন বাদে পিতৃদেবের সমস্ত নাটক পড়তে হয়েছে। দেখলাম একটি আশ্চর্য জিনিষ: সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, ভালো লাগলেও তেমন ভালো আর লাগল না। কিন্তু রাণা প্রতাপ প'ড়ে হৃদয়ে অশ্রুসাগর দুলে উঠল। কি অপূর্ব মহত্ত্ব-চিত্রণ অপূর্ব ভাষায়! রসিকতার পাশা-পাশি কি সংলাপ, কথাকাটাকাটি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, সর্বোপরি বড় আদর্শের জন্যে ছোট আদর্শকে ত্যাগের মহিমা। একথা খাটে মেবার পতন সম্পর্কেও। আমার মেবার পতন সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা বরাবরই ছিল, কিন্তু এবার মনে হয়েছে প্রতাপসিংহও কম নয়।

তবে আমার এ-মত সাহিত্যিকদের মধ্যে হয়ত আদৃত হবে না। কারণ, আমি মনে করি না যে, শুধু নাটকীয় উপাদান অনবদ্য হ'লেই বড় সৃষ্টি হয়। কিম্বা action—গতিবিধির প্রাদুর্ভাব হলেই নাটক মহনীয় হয়। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে সব আগে চাই মনের প্রাণের নানা স্বপ্ন, শ্রদ্ধা, প্রেম, দুরাশার ছবি। একথা উপন্যাসের সম্বন্ধেও সমান খাটে। জীবনে যা ঘটছে শুধু তাকেই দেখানো নয়—জীবনে যা প্রচ্ছন্ন আছে, যে-সৌন্দর্য যে-মহত্ত্ব সহজেই চোখ এড়িয়ে যায় তাকেও দেখানোই চাই। নইলে শুধু বাস্তবতা নিয়ে করব কি! ও তো আছেই—নীচতা ক্ষুদ্রতা হ্যাংলামি কপটতা ইত্যাদি—ওর জন্যে ঔপন্যাসিক বা নাট্যকারের কাছে ধর্ণা দেবার প্রয়োজন কি।

সম্প্রতি পাশাপাশি পড়লাম শেক্সপীয়রের দুটি নাটক ম্যাকবেথ ও জুলিয়াস সীজর। প্রথমটি পড়তে পড়তে বিতৃষ্ণায় মন ভরে গেল। কয়েকটি কবিত্বময় উক্তি বাদ দিলে এ-নাটকটির মধ্যে কী আছে যা মানুষের প্রাণ স্পর্শ করতে পারে? শুধু নীচতা আর বিশ্বাসঘাতকতা আর গুপ্ত হত্যা—একের পর এক।

পক্ষান্তরে জুলিয়াস সীজর পড়তে পড়তে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। মানুষের মহত্ব, ত্যাগের মহিমা, বন্ধুর আনুগত্য, নাটকীয় সংঘাত—সব জড়িয়ে একটি অপূর্ব নাটক। অথচ ক্রিটিকদের মতে ম্যাকবেথ—অনবদ্য। আমি একথা কোনোদিনই মানিনি আর কোনো দিনই মানব না যে অধমতার চিত্র নিখুঁত হলেই নাটক প্রথম শ্রেণীর হয়। তাই ম্যাকবেথকে আমি বরণ করতে পারি না বড় নাটক ব'লে। আর্ট ফর আর্ট'স সেক বর্গীয় অসার নীতির নায়কত্বের বিধানেই এ-নাটক মান পেয়েছে, নইলে পেত না কখনই।

ভালো উপন্যাসের মধ্যে অনেক উপন্যাসেই সংলাপের প্রাধান্য বেশি। কোন কোনটি তো আদ্যন্ত সংলাপের মধ্যে দিয়েই চলেছে ঘটনার বিবৃতির পসরা সাজিয়ে। এতে ক'রে কী হচ্ছে? হচ্ছে দুটি জিনিস:—

(১) নাটকই অভিনীত হচ্ছে মুখের কথার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসের ছলে। একটি চরিত্র ব'লে যাচ্ছে কোথায় কবে কি হল কী দেখেছিল কী শুনেছিল ইত্যাদি। নাটকের সংলাপেও তো ঠিক এই বিবৃতিই থাকে বহুস্থানে। অর্থাৎ বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপের মাধ্যমে বয়ে চলেছে যোগসূত্রবাহী নাটক।

(২) নাটকের মধ্যে দ্বিতীয় নাটক—Wheels Within Wheels—যথা. অঘটন আজো ঘটে উপন্যাসের মন্দিরা বা সতী বা কৃষ্ণদাস বা অমল চরিত্র ও তাদের কাহিনী। নায়ক অসিত শুনছে ও বলছে এটা গৌণ হয়ে উঠল—কী দেখল সেইটাই বর্ণনার মধ্যে দিয়ে নাটক হয়ে উঠল। নয় কি? অথচ অসিত যেন দ্রষ্টা হয়ে বর্ণিত সব ঘটনা বা অঘটনকে সুসমঞ্জস ক'রে দেখছে।

আমার বলা উদ্দেশ্য—আমরা অনেক ভাল উপন্যাসই রসিয়ে রসিয়ে পড়বার সময় ভুলে যাই যে, আমরা আসলে নাটকই পড়ছি—উপন্যাসের ছদ্মবেশে।

শিশির ভাদুড়ী আমাকে ভিখারিণী রাজকন্যা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু লিখেছিলেন: "মীরা অভিনয় করবে কে? যে গানেও চমৎকার অভিনয়েও চমৎকার এমন তারকা পাব কোন্ আকাশে?"

পারিপার্শ্বিক পরিষ্করণ

অশোক চট্টোপাধ্যায়

শুদ্ধ কি এবং কি নহে তাহা লইয়া ভারতের সকল সম্প্রদায়ই সর্ব্বদা মাথা ঘামাইয়া থাকেন। এইটি পবিত্র ঐটি অপবিত্র, এইটি হালাল ঐটি হারাম, এইটি চলে ঐটি চলে না ইত্যাদি বহুকথাই সদাসর্ব্বদা কথিত হইয়া থাকে ও ঐ সকল আলোচনা অনেকসময় শান্তি-ভঙ্গেরও সূচনা করে। কিন্তু স্বাস্থ্য ও শোভার দিক দিয়া যেসকল ক্ষতিকর ও কষ্টদায়ক পরিস্থিতি প্রায় সৃষ্ট হইতে দেখা যায়, ভারতের শুদ্ধতাকাঙ্খী জনসাধারণ তাহা অনায়াসে ও কোনও আপত্তি না করিয়াই সহ্য করিয়া দিনযাপন করিতে চিরাভ্যস্ত। গৃহের সম্মুখে আঁস্তাকুড়, যত্রতত্র নিষ্ঠিবন ও পানের পিচ ফেলা অথবা তাহা অপেক্ষাও নোংরা কাজ করা, ঘরের ঝুল না ঝাড়া দেওয়াল চুনকাম না করিয়া যেমন তেমন অবস্থায় রাখিয়া দেওয়া, ময়লা কাপড় পরিয়া বেড়ান, তেল চিট্‌চিটে বালিশ বিছানা ইত্যাদি রকমারী অপরিষ্কার ব্যাপার ভারতের জনসাধারণ জীবনযাত্রার ঘনিষ্ঠতম অঙ্গ হিসাবেই মানিয়া লইয়াছে। অর্থাৎ পরিষ্কার/অপরিষ্কার বিচার ভারতে বাস্তব অবস্থা দেখিয়া করা হয় না, মতামতের গতানুগতিক ধারাই তাহা নির্দ্ধারণ করে।

বর্ত্তমান জগতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক উন্নতির ফলে পারিপার্শ্বিক পরিষ্করণ বিষয়টি মানুষকে নূতন দৃষ্টিতে দেখিতে হইতেছে। পূর্ব্বে যখন পৃথিবীতে মানুষ ছিল এখনকার তুলনায় এক দশমাংশ শহরগুলি ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, রাস্তায় চলিত অশ্বচালিত যান ও কারখানা বা কয়লার ইঞ্জিন বলিয়া কিছু ছিলনা; তখন মানুষের বাসস্থানের পারিপার্শ্বিক ধুম্রাচ্ছন্ন, বিষাক্ত বাষ্প ও আবর্জ্জনাপূর্ণ ছিল না। এখন জনসংখ্যা হইয়াছে অতি বিরাট, রাস্তার লক্ষ লক্ষ মোটর গাড়ীর ধোঁয়ায় আকাশ বাতাস অন্ধকার, সহরের ড্রেনের জলের ময়লায় নদী সমুদ্র ঘোলাটে। কারখানার বিষাক্ত বাষ্পে হাওয়া শ্বাসগ্রহণের অনুপযুক্ত এবং কীট পতঙ্গ মারিবার ঔষধের ব্যবহারে পৃথিবীর বহুস্থল মানুষের বাসের অযোগ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই অবস্থায় অতি প্রগতিশীল ও উন্নত দেশগুলি এখন ভয়ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে যে এই-ভাবে পারিপার্শ্বিক বিষাক্ত ও অপরিষ্কার হইতে থাকিলে এমন দিন শীঘ্রই আসিবে যখন মানুষ আর জল, হাওয়া, মাটির অপরিষ্কার অবস্থার জন্য জীবনধারণে অক্ষম হইয়া উঠিবে। একজন বৈজ্ঞানিকের মতে পৃথিবীর হাওয়ায় পূর্ব্ব যুগের তুলনায় এখন কারবন ডায়কসাইড বাষ্প শতকরা দশভাগ বাড়িয়া গিয়াছে। মোটরগাড়ীর পরিত্যক্ত ধোঁয়ার মধ্যে কারবন মনক্সাইড বাষ্প থাকে তাহার মারাত্মক বিষ নিশ্বাসের সহিত ফুসফুসে টানিয়া লইয়া মানুষ ক্যানসার ও অপরাপর রোগে প্রাণ হারাইতেছে। কারখানা হইতে সালফার ডায়কসাইড ও অন্যান্য ক্ষতিকর বাষ্প ও বর্জ্জিত কাঁচামালের অপ্রয়োজনীয় বিষাক্ত অংশ হাওয়ার ও নর্দ্দমার জলের সহিত সর্ব্বব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়া আকাশের পাখী জলের মাছ ও ক্ষেতের ফসল নষ্ট করিয়া মানুষের দেহেও নানাপ্রকার বিষ সংক্রান্ত করিতেছে। সহরের ও কারখানার পরিত্যক্ত আবর্জ্জনা জমা হইয়া ও জলপথে সমুদ্রে পড়িয়া কি করে তাহার একটি ভাল উদাহরণ নিউইয়র্ক মহানগরীর ড্রেনের জল ও ফেলিয়া দেওয়া বস্তুনিচয়ের সমাবেশে ঐ সহর হইতে ১২ মাইল দূরে আলাস্তিক মহাসাগরের কুড়ি বর্গ মাইল জলক্ষেত্রের অবস্থা। বিমানপথে নিউ ইয়র্ক যাইতে ঐ মহা "আঁস্তাকুড়"টি সকলের চোখে পড়ে। মনে হয় নীলাভ হরিত জলবক্ষে হঠাৎ পাটকিলে কর্দ্দমের যেন চড়া পড়িয়া আছে। ঐখানে বিগত ৪০ বৎসর ধরিয়া নিউ ইয়র্কের নর্দ্দমার জল (শোধিত) ও আবর্জ্জনা নিক্ষিপ্ত হইয়া জমাট আকারে সমুদ্রের চেহারা বদলাইয়া দিয়াছে। ঐ জায়গাটিকে এখন আমেরিকানগণ

"ডেডসি" বা মৃতসাগর নাম দিয়াছে এবং ঐ সাগর এখন অতলান্তিকে ত মিলাইয়া যাইতেছেই না বরঞ্চ উহার গাদ ধুইয়া ধুইয়া মহানগরের সমুদ্রতটে উঠিয়া আসিতেছে। নিউ ইয়র্কের নর্দ্দমার শোধিত কাদার পরিমাণ বাৎসরিক পঞ্চাশ লক্ষ বর্গ গজ অর্থাৎ উহার আকার এক শত সত্তর গজ লম্বা, একশত সত্তর গজ চওড়া ও একশত সত্তর গজ মোটা। একটি পাঁচ শত ফুট উচ্চ ক্ষুদ্র পর্ব্বত প্রমাণ। চল্লিশ বৎসরে ঐ পর্ব্বতটি এতই বৃহদাকার হইয়া উঠিয়াছে যে এখন উহা উঠাইয়া আতলান্তিকের আরও গভীরে ঢালিয়া দেওয়া একটি প্রায় অসম্ভব কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং কেলিলেও তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে সামুদ্রিক প্রাণী-জীবন কিভাবে আক্রান্ত ও বিনষ্ট হইবে তাহাও চিন্তার বিষয়। পৃথিবীতে নিউইয়র্কের সহিত তুলনা করা যায় এইরূপ আরও অনেক সহর আছে। সকল সহরের ময়লা, আবর্জ্জনা প্রভৃতি শেষ পর্য্যন্ত আকাশে বাতাসে জলে গিয়া পড়িতেছে। সুতরাং মানবজাতিকে এখন দেখিতে হইবে যাহাতে তাহার নিজের দোষেই তাহার স্বজাতির সকল মানবের ও অপরাপর প্রাণীর জীবন বিপন্ন না হয়।

পারিপার্শ্বিক পরিষ্করণ বর্ত্তমান সভ্যজগতে এই কারণে একটা বিরাট সমস্যা হইয়া দেখা দিয়াছে এবং পৃথিবীর প্রধান প্রধান জাতিগুলি এই সমস্যার সমাধান চেষ্টায় বিশেষভাবে আত্মনিয়োগ করিতেছে। নিউইয়র্কের নিকটস্থ সমুদ্রবক্ষের মহা আঁস্তাকুড়ের ভিতরের ও কাছাকাছি স্থানের মৎস্য খাইলে সংক্রামক জনডিস রোগ হইবার সম্ভাবনা হয়। একথা চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন এবং ঐ মৃত সাগরের পাঁচ ছয় মাইলের মধ্যে মাছ ধরা নিষেধ করা হইয়াছে।

আমেরিকার রাষ্ট্রপতি নিক্সন পারিপার্শ্বিক পরিষ্করণ একটা মহা প্রয়োজনীয় রাষ্ট্রীয় কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ধূম্র, বিষাক্ত বাষ্প, অসতর্ক-ভাবে কীটপতঙ্গনাশক ঔষধ ব্যবহার, নর্দমার জল নিষ্কাশন ও আবর্জ্জনা নিক্ষেপ প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা করিয়াছেন ও এই সম্বন্ধে তাঁহার কর্ম্মসূচীর মধ্যে ২৩ টি আইন প্রণয়ণ ও ১৪ দফা শাসন দফতরের নিয়মাদি প্রবর্ত্তনের ব্যবস্থা হইতেছে। আকাশে বাতাসে যেহেতু প্রাদেশিক সীমানা টানিয়া রাখা সম্ভব নহে সেই কারণে তাঁহার পারিপার্শ্বিক পরিষ্করণসংক্রান্ত নিয়মাবলী বহুস্থলেই আমেরিকান কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণের অঙ্গ হইবে। রাষ্ট্রপতি নিক্সনের পারিপার্শ্বিক পরিষ্করণ কার্য্যপদ্ধতির বিচারে বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়াছেন যে মোটরগাড়ীর জন্যই অধিকাংশ বিষাক্ত বাষ্পের উৎপত্তি হয়। তাহার পরে আসে বিভিন্ন কারখানাগুলি। কারখানার আবর্জ্জনা ও নর্দ্দমার তরল ও বিষাক্ত বস্তুনিচয় কিভাবে ও কতটা নিকটস্থ নদী বা সমুদ্রে ঢালা চলিবে তাহার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট করা হইতেছে ও সীমা লঙ্ঘন করিলে দৈনিক ৭৫০০০ টাকা অবধি জরিমানার ব্যবস্থা করা হইতেছে। অপরিষ্কার জলে মিশ্রিত পরিত্যক্ত বস্তু নর্দমার জল শোধন করিয়া বাহির করিয়া লইয়া পৃথকভাবে সেগুলি নষ্ট করার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

এই সকল নির্দ্দেশ বিশেষ কড়াকড়ি করিয়া পূর্ণ প্রচলিত ও প্রযুক্ত হওয়া আবশ্যক বলিয়া রাষ্ট্রপতি নিক্সন সর্ব্বসাধারণের জ্ঞাপনার্থে ইস্তাহার জারি করিয়াছেন ও আমেরিকার সকল সংবাদপত্র ও অন্যান্য মাসিক ও সাপ্তাহিকে পারিপার্শ্বিক পরিষ্করণ মহাগুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলিয়া আলোচিত হইতেছে। এই প্রসঙ্গে বলা আবশ্যক যে অন্যান্য সভ্য দেশেও এই সম্বন্ধে একটা জাগরণ হইয়াছে ও অনেক দেশে নর্দমার জল শোধন, আবর্জ্জনা জ্বালাইবার ব্যবস্থা, মোটরগাড়ীর ও কারখানার ধোঁয়া ও বাষ্প কমাইবার অথবা শোধন-ব্যবস্থা লইয়া বহু আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। এই সকল বিষয়ে যাঁহারা বিশেষজ্ঞ তাঁহারা রাজকর্ম্মচারী-দিগকে যথাযথ নিয়মাদি প্রবর্ত্তনের কার্যে সদা সর্ব্বদা সাহায্য করিতেছেন। ফলে, এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইয়াছে যাহাতে সভ্যজগতের সকল মানুষ পারিপার্শ্বিক পরিষ্করণ সম্বন্ধে সজাগ ও বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। মোটরগাড়ীর ধোঁয়া সম্বন্ধে যেসকল

বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান হইয়াছে তাহা হইতেই কতকটা বোঝা যায় যে বিষয়টির গভীরতা কতদূর গিয়াছে।

১৯৭০ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী যেসকল মোটরগাড়ীর পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কয়েকটি বিষয়ই পারিপার্শ্বিক পরিষ্করণ অভিপ্রায় প্রণোদিত দেখা যাইতেছে। পেট্রোলে সীসক মিশাইলে গাড়ীর গতিবেগ বাড়ানো সম্ভব হয় বলিয়া বহুকালাবধি সীসকমিশ্রিত পেট্রোল দিয়া উচ্চ গতিশীল ইঞ্জিন তৈয়ার করা হইত। এই সীসকের উপস্থিতিতে গাড়ীর ধোঁয়া প্রাণী জীবনের পক্ষে অধিক ক্ষতিকর হইতেছে দেখা যাইতেছে ও সেইজন্য ইঞ্জিনের শক্তি হ্রাস করিয়া সীসকহীন পেট্রোল ব্যবহারের ব্যবস্থা হইতেছে। গাড়ীর গতিবেগ বাড়াইয়া গাড়ীচড়া আরও বিপজ্জনক হইতেছে, লাভ কিছু হইতেছে না। এই কারণও ইঞ্জিন গড়িবার পরিকল্পনাকে পরিবর্ত্তিত করিবার দিকে লইয়া যাইতেছে। এমন কি ১৯৭৫ খৃষ্টাব্দে এরূপ গাড়ীও গঠন করিবার চেষ্টা হইতেছে যাহাতে গাড়ী চালাইবার জন্য কোন প্রকার প্রজ্বলন পন্থাই অনুসৃত হইবে না। শুধু বিশেষ শক্তিশালী বৈদ্যুতিক ব্যাটারী ব্যবহারেই গাড়ী চলিবে অথবা অন্য কোনপ্রকার শক্তি ব্যবহৃত হইবে, এ কথার কোন পূর্ণতর মীমাংসা এখনও হয় নাই।

জন-সাধারণ এতাবৎকাল মোটর-গাড়ীর আকারে ও গতিতে যে আরোহীর মর্য্যাদা বৃদ্ধির কারণ দেখিতেন, বর্ত্তমানে সেই দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ঘটিতেছে। ইহার কারণ মোটরের ধোঁয়া ও সীসকজাত বিষাক্ত বাষ্প উৎপত্তি। জনসাধারণের প্রাণধারণের অন্তরায় হইয়া বৃহৎ বৃহৎ দ্রুতগামী মোটরগাড়ীর আর সেই অতীতের আভিজাত্য রক্ষা করা সম্ভব হইতেছে না। সুতরাং মানুষ ঐ সকল গাড়ীচড়া ছাড়িতে বাধ্য হইবে। মানবজাতির জীবন বিপন্ন করিয়া অল্পসংখ্যক মোটর-গাড়ীর মালিকগণ নিজ আত্মম্ভরিতা চরিতার্থ করিবেন, এরূপ পরিস্থিতি মানিয়া লওয়া যায় না। সুতরাং গতির উদ্দামতা স্থগিত রাখিয়া সমাজের কল্যাণকেই উচ্চতর স্থান দিতে হইবে। ইহা ব্যতীত ১৫০০০, হাজার টাকা মূল্যের গাড়ী যদি গ্যালনে ৩০ মাইল চলে; তাহা যে কোন সময় ৬০০০০ হাজারী গাড়ীর গ্যালনে ১৮ মাইল চলা অপেক্ষা অধিক বাঞ্ছনীয়। এই সকল কারণে বর্ত্তমানে নূতন ধরনের যেসকল মোটরগাড়ী তৈয়ারী হইবে বলিয়া পরিকল্পনা হইতেছে সেগুলির অধিকাংশই ছোট-ধরণের ও তাহাদের চালাইবার জন্য যে পেট্রোল ব্যবহার করা হইবে তাহাও সীসকবর্জ্জিত। ফলে দ্রুতগতি চলনক্ষম মোটর গাড়ী অতঃপর আর তৈয়ার হইবে বলিয়া মনে হইতেছে না। এবং কিছু-কাল পরে ব্যাটারী অর্থাৎ ১৯৭৫ খৃঃ অঃ অবধি, ব্যাটারী-চালিত গাড়ীর ব্যবহার আরম্ভ হইয়া যাইবে।

ভারতবর্ষে এখন পর্য্যন্ত পারিপার্শ্বিক পরিষ্করণ লইয়া কোনও কিছু করা হইতেছে না। কোনও আইন হইয়াছে বলিয়া আমরা শুনি নাই। ধূম্রাচ্ছন্ন আকাশ বাতাস পথঘাট যে হইতেছে তাহার মূলে রহিয়াছে অধিকভাবে সরকারী বাসগুলি। কেননা সেইসব বাসগুলির ইঞ্জিন ঠিকভাবে মেরামত করা হয় না বলিয়াই অত ধোঁয়া বাহির হয়। ধূম্রসৃজন নিবারণ করিবার জন্য যেসকল নিয়মকানুন ভারতে ইংলণ্ডের অনুকরণে কিছু কিছু প্রণয়ন করা হইয়াছিল সেগুলি অন্যান্য সামাজিক উপকারার্থে প্রণীত আইনের মতই অব্যবহৃতভাবে শুধু পুস্তকের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিয়া শোভা পাইয়া থাকে; সেই অনুসারে কোন কাজ হয় বলিয়া জানা যায় না। আমরা যতটা জানি ভারতবর্ষে কোন কারখানার নর্দ্দমার জল শোধন করা হয় না, বড় বড় সহরের ড্রেনের জলও শোধন না করিয়া নদীতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অপরাপর বিষাক্ত বস্তু ও বাষ্প যত্রতত্র যথাইচ্ছা নিক্ষিপ্ত ও উন্মুক্ত আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া হয় এবং কেহ তাহা নিবারণ চেষ্টা করে না। এক কথায় ভারতবর্ষে পারিপার্শ্বিক পরিষ্করণ লইয়া কাহারও মাথাব্যথা হইতেছে না যদিও ভারতে শুধু কয়লার উনানের সংখ্যাই কয়েক কোটি হইবে এবং মোটরগাড়ী ও কারখানার চিমনিও ক্রমবর্দ্ধনশীল। জাতির নজর এইদিনকে বিশেষভাবে আনয়নের ব্যবস্থা বর্ত্তমানে অতি প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে হয়।

মুখর মর্মর

বিভা সরকার

আগ্রার শূন্য দুর্গে ঘুরতে ঘুরতে দেওয়ানী আম-এ বিশ্রাম নিচ্ছিলুম আমি সেদিন সেই নিদাঘ মধ্যাহ্নে। তন্দ্রার মধ্যে হঠাৎ জীবন্তের কোলাহলে মুখরিত হয়ে উঠলো সে শূন্য পাষাণ প্রাসাদ। আমার চোখের সামনে জেগে উঠলো এক সকরুণ দৃশ্যপট বৃদ্ধ শাহজাহানের জীবনা নাট্যের।

বৃদ্ধ সম্রাট শাহজাহানের ইচ্ছা নয় যুবরাজ এই ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধে যান। তাঁর মন যেন অলক্ষ্যে বলছিলো এ যুদ্ধে সুফল নেই। যুদ্ধে জয়লাভ করার জন্য সবকিছু দারার করায়ত্ত হওয়া সত্ত্বেও। তাঁর তৃতীয় নয়ন বুঝি দিব্যদৃষ্টিতে ভবিষ্যতের অন্ধকার ছবিগুলি তাঁকে দেখাচ্ছিল। মানা করেছিলেন তিনি যুবরাজকে বারবার। নিজে যেতে চেয়েছিলেন তিনি সেই রোগজীর্ণ দেহ নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে, যাতে তাঁর বিদ্রোহী সন্তানেরা রণভূমে তাঁকে দেখে লজ্জা পেয়ে বশ্যতা স্বীকার করে কিন্তু তা হবার নয়! দারার ভাগ্যই যেন দারাকে তাঁর মর্মান্তিক পরিণতির পথে টেনে নিয়ে চললো। সে অদৃশ্যশক্তির পায়ে জ্ঞানবৃদ্ধ সম্রাট পরাজয়ে মাথা নত করলেন। দারার পক্ষে একচ্ছত্র রাজ্যপাটের লোভ সংবরণ করা কঠিন হল। যতই বেদান্ত উপনিষদ পাঠ ও সাধুসঙ্গ করুন না কেন তিনি। অথবা বিধির বিধান অলঙ্ঘনীয়, কে তা খণ্ডন করবে। দারার ভাগ্যই দারাকে বারবার বিপথগামী করলে। সেই অদৃশ্য হস্তের অমোঘশক্তিই তাঁদের তাঁর ইচ্ছার পথে সবলে পরিচালিত করে নিয়েছিলো। বৃদ্ধ সম্রাটের নয়নমণি যুবরাজ দারা যুদ্ধে চলেছেন।

সেদিনের সে বিদায়-দৃশ্যে জীবন্ত হয়ে উঠলো আমার চোখে শূন্য দেওয়ানী-আম। আসন্ন বিচ্ছেদের সম্রাটের দুনয়নে। আতুরকম্পিত হস্তে তিনি দৃঢ় আলিঙ্গনে বক্ষে বেঁধেছেন জীবনাধিক প্রিয় পুত্রকে—বহুক্ষণ পর আপনাকে সেই স্নেহপাশ মুক্ত করে দারা পিতৃচরণে বিদায় চাইলেন। মুসলমানের ইহকাল পরকাল পুণ্যভূমি মক্কার দিকে মুখ করে—সম্রাটের বিচ্ছেদবিধুর পীড়িত অন্তর খোদাতালার পায় প্রিয়তম পুত্রের জন্য বিজয় কামনা করলেন। দু-হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন তিনি। উদ্ধত রণমত্ত পুত্র আত্মগর্বে নাটকীয় ভঙ্গিতে বলে উঠলেন 'ইয়া তখ্‌ত ইয়া তবুত্‌'। তখন কি একবারও তিনি কল্পনা করেছিলেন তাঁর জন্য সম্মানিত তবুত্‌ও খোদাতালা দান করেন নি। রাজদণ্ডে রাজবেশে সুদর্শন দারা যুদ্ধে গেলেন রাজকীয় মহিমায় দর্শকজনের মন বিভ্রান্ত করে। শূন্য বক্ষে শূন্য কক্ষে কম্পিত হৃদয়ে সে দৃশ্য দেখলেন বৃদ্ধসম্রাট—আর আরও একজন সমান কম্পিত বক্ষে অন্দর মহালের প্রস্তর-গবাক্ষ পথে দেখলেন এই রণোন্মত্ত দৃশ্য। সেদিন কি জহানআরা ক্ষণতরেও ভেবেছিলেন রাজকীয় মহিমায় মহিমান্বিত; বিচিত্র আচ্ছাদনে সজ্জিত বিরাট রাজসৈন্য পরিবেষ্টিত পরম ভাগবন্ত দারা আর একদিন এই গবাক্ষপথেই উদিত হবেন দীনাতিদীন বেশে জীর্ণ-চির-মলিন দেহে কর্দমাক্ত হস্তীপৃষ্ঠে লাঞ্ছিত পরাজিত হয়ে! বিধির বিধান কে খণ্ডন করবে। জহানআরার আজ কত কথাই মনে পড়ছে। এই দারার মাতৃবিয়োগের পর জীবনসংশয় পীড়া হয়েছিল। কত যত্নে কত অক্লান্ত সেবায় তাঁরই মহলে কেটেছে তাঁর উৎকণ্ঠিত দিন। পিতার কত বিনিদ্র ব্যথাতুর রাত্রির নিরন্ত সাক্ষী সে। দারা যে সম্রাটের কণ্ঠমণি, তার চেয়ে এ কথা আর কে জানে। সেই দারা আজ চলেছে আপন সৌভাগ্য দুর্ভাগ্যের মীমাংসা করতে রণদুর্মদ একান্ত

প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। মোগল সাম্রাজ্যের সৌভাগ্য-লক্ষ্মী আজ কোন্ দিকে, বিজয় তিলক আজ কার ললাটে কে জানে! দুর্দান্ত উল্লাসে রণদুন্দুভি মত্ত রাজসৈন্য ধীরে ধীরে মিলিয়ে চলেছে দূরের পথে—জহানআরা পিতার সন্ধানে মহালে ফিরলেন।

দেখলেন শূন্য দরবারকক্ষে শূন্য বক্ষে নতজানু হয়ে প্রার্থনায় বসেছেন বৃদ্ধ অসহায় শাহজাহান্। সম্বিত ফিরে পেয়ে আমার স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দাঁড়ালুম আমি আকাশ বাতাস থমথম করছিল সে গ্রীষ্ম সায়াহ্নে-অনাগত আঁধির আভাসে।

* * * *

আগ্রাদুর্গের অলিন্দে বসে ঘনায়মান সন্ধ্যার বিষণ্ণতায় মনে জেগে উঠলো এক মহাপ্রাণা রাজকন্যার বিচিত্র-দর্শি জীবন-নাট্যের কথা। এক যুগনায়কের মহাকাব্যের মত বিচিত্রজীবনের সঙ্গিনী তিনি। মরজীবনের এক বেদনাঘন সত্যের জীবন্ত সাক্ষী তিনি। শুধু বিফলতা অবিচার দুঃখ-শোকই যে শেষ কথা নয়, তাঁর জীবনই ত তার অলন্ত সাক্ষর। অমৃতলোকের আভাস তিনি এ মরজীবনে পেয়েছিলেন। এক জরাজীর্ণ শোকদীর্ণ পরাজিত লাঞ্ছিত ভাগ্যবিড়ম্বিত জীবনের নির্বাক সাক্ষী হয়ে। তিনি দেখেছেন, লালন করেছেন পরম মমতায় এক বৃদ্ধ মহাশিশুকে, একদার শাহনশাহ মহাসম্রাটকে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় সামান্য একজোড়া পাদুকার জন্য নগণ্য কর্মচারীর হাতে লাঞ্ছিত হতে. বিশাল হিন্দুস্তাঁর অধিপতিকে ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তুচ্ছ দুটি বাদ্যযন্ত্র বা সামান্য কিছু প্রয়োজনেও বিমুখ হতে। কত বিফল যামিনীর শোকজর্জর মুহূর্তের একান্ত নিরুপায় সাক্ষী তিনি। মমতা ছাড়া, সেবা ছাড়া আর কি দিতে পেরেছিলেন সে মহাশিশুকে। পুত্র আওরংজীবের উপেক্ষিত, নপুংসক মৃতবদ নিপীড়িত, অবহেলিত, ভাগ্যবিড়ম্বিত সম্রাট বঞ্চনাকাতর কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে-পড়া শিশুর মতই কারাবাসে অভ্যস্ত অন্নপায় অভিযোগে নিরস্ত হয়ে কন্যা জহানআরার কল্যাণহস্তে শেষ সান্ত্বনার জন্য নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন।

অবাকবিস্ময়ে আমরা দেখি বিগলিত করুণার এই জহানআরাই বিপথগামী অত্যাচারী পুত্রের জন্য পিতার কাছে ক্ষমাভিক্ষা করছেন তাঁর মৃত্যুশয্যা পার্শ্বে। আবার এই মহিয়সী মহাপ্রাণই ছুটে গেছেন দুর্বিনীত ছোট ভাইয়ের সব উপেক্ষা সব অনাদর তুচ্ছ করে গৃহবিবাদ গৃহবিচ্ছেদ বন্ধ করতে। তাই আমরা দেখি সম্রাটের মৃত্যুর পর ছুটে এসেছেন অগ্রজার প্রতি সমাদর দেখাতে সিংহাসনে নিষ্কণ্টক হয়ে সম্রাট আলমগীর। শ্রেয়োকে উপেক্ষা করা যায় না, মহৎকে যায় না অপমান করা—সে অশ্রদ্ধা সে অপমান বিবেক দংশনে জর্জর হয়ে অপমান কারীর বুকেই যে ফিরে আসে। পিতাকে বন্দী করার পর কখনও পিতার সামনে আসেননি আওরংজীব—আপন মুখ দেখাননি তাঁকে। অলক্ষ্যে বিবেক বোধহয় তাঁর এ অন্যায়ের বিরুদ্ধাচরণ করতো তাই যেন মনে হয় তিনি আগ্রাদুর্গ থেকে দূরে পালিয়ে বেড়িয়েছেন। পিতার প্রতি অসৌজন্য দেখিয়েছেন, অন্যায় করেছেন রাজ্যের প্রলোভনে কিন্তু মূর্তিমতী পবিত্রতা মূর্তিমতী করুণা-রূপিণী অগ্রজার প্রতি তাঁর স্নেহ ও শ্রদ্ধার অন্ত ছিল না—প্রভাত সূর্যের মতই জহান্আরার জীবন চিরভাস্বর। যেখানেই ন্যায় সেখানেই তিনি যেখানেই অন্যায় বিনা দ্বিধায় সেই-খানেই তিনি তুলে ধরেছেন বজ্রকঠোর নিঃস্বার্থ প্রতিবাদ। পিতার মৃত্যুর পর ছুটে এসেছেন আওরংজীব তাঁকে তাঁর পিতৃদত্ত সম্রাট বেগমের গৌরবান্বিত পদে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু এই জহানারাকেই আমরা দেখি অকুতোভয়ে সম্রাট আলমগীরের অন্যায় জিজিয়া করের প্রতিবাদ করতে। সভাসদগণ নীরব। বড় বড় ক্ষমতাশীল ব্যক্তিরা রাজভয়ে স্তব্ধ। জহানারার কণ্ঠ কিন্তু নীরব নয়। গরীব প্রজাদের ব্যথায় কাতর সে কণ্ঠ কঠোর প্রতিবাদের ধ্বনিতে মুখরিত। অবাক বিস্ময়ে দেখি, আজন্ম সম্মানিতা সম্রাটদুহিতা প্রজাদুঃখকাতরতায় ছোট ভায়ের কাছে নতজানু হয়ে দুঃস্থ নিপীড়িতদের জন্য করুণা ভিক্ষা করছেন—ধন্য তুমি জাহনারা! ধন্য সেই কুল তোমার মত অসাধারণার আগমন যেখানে। জীবনের শেষ কটি দিন তোমার অমৃতময় মধুময় হয়ে উঠেছিলো ধর্মোপাসনায় আর পরহিতকারিতায়। দারা

ও মুরাদের অনাথা মেয়েরা তোমারই স্নেহছায়ায় লালিতা কিন্তু দারা ও নাদিরার কন্যা জহানজেববানু বা জানী বেগমই তোমার আদর্শ কন্যা,মানস-দুহিতা। ভ্রাতৃবিরোধে মোগলপরিবারে যে বিষকুম্ভ উঠেছিলো তাকে তুমি নিশ্চিহ্ন করতে অমৃতময় করতে চেয়েছিলে এই অনিন্দ্য কুসুমে আওরংজীবের তৃতীয় পুত্র আজমকে পরিণয়সূত্রে গেঁথে।

মোগল-মালঞ্চে অতুলনীয়া এই জানীবেগম তোমারই শিক্ষায় তোমারই আদর্শে। তাইতো আমরা অবাক বিস্ময়ে দেখি, কিন্নর কন্যার মত অনিন্দ্য বিদুষী-এ মোগল-দুহিতাকে, আপন রাজপুত জননীকে ধন্য করে বিজয়পুরের সমরক্ষেত্রে রণসাজে হস্তিপৃষ্ঠে আরূঢ়া রণোন্মত্ত' মহিষমর্দিনী রূপে। দেখি, তাঁকে হতাশাকাতর রাজসেনাদের নবজীবনের নতুন প্রেরণার প্লাবনে ভাসিয়ে দিতে। দারার জীবনের সমস্ত পরাজয়কে যেন এ বীরাঙ্গনা কন্যার বীরত্বের মহিমা মুছে দিলে। মোগল পরিবারে বহু বিদুষী কন্যা অসামান্যা রূপলাবণ্যময়ী অনেকেই ছিলেন কিন্তু এমন করে রণক্ষেত্রে বীরোন্মাদনায় উন্মত্ত রাজপুত-দুহিতাদের মত আর কোনও মোগল-মহিলার ইতিহাস আমরা জানিনা—এই অসামান্যা জানী-বেগম ছাড়া।

সেদিন সে রণ-ভূমি তাঁর কণ্ঠে বিজয়মাল্য দুলিয়ে দিয়েছিলো সগৌরবে—আর সে জয়মাল্য তোমারই জাহানারা।

* * *

গ্রীষ্মের পর বর্ষা; বর্ষার পর শরৎ এমনি করেই ছয়টি ঋতুর ভরা ডালায় বিশ্বপ্রকৃতি বন্দনা করেই চলেছে সেই বিশ্বরাজের, যাঁকে দিলে সব দেওয়ার সমাপ্তি, যাঁকে জানলে সব জানার শেষ, সেই পরমতমের বিশ্বরূপ অমৃতময়রূপ জলে স্থলে জীবনের স্তরে স্তরে অনুরণিত হয়ে চলেছে অনন্তকাল। বন্দনাময় সায়াহ্নের কোলে অস্তগামী সূর্য্যের শেষ রাগে রঞ্জিত আকাশের দিকে চেয়ে মন স্তব্ধ হয়ে যায় এ অপূর্ব্ব রূপে। যমুনার জলে ছায়া কাঁপে সে আগুনলাগা আকাশের। দিনেশ্বর কি সারাদিনের যত অন্যায় যত আবর্জনা যত কলুষ কালিমা সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে এই সৃষ্টিকে নির্ম্মল করে দিচ্ছেন? কে জানে? আকাশের অলসপথে ফিরে চলেছে পাখীর দল আপন আপন কুলায়। সন্ধ্যার আজান এ প্রসন্নতাময় মুহূর্ত্তটিকে যেন আরও সুষমামণ্ডিত করে দিলে। চারিদিক স্তব্ধ চারিদিক শূন্য! সেই সুন্দর দেবতা যেন তাঁর শিব-দৃষ্টি দিয়ে প্রসন্নহাস্যে তাকালেন এই পৃথিবীর দিকে সেই তুহীনশীতল হিমশীর্ষ হিমালয় থেকে। দেবতাত্মা হিমালয়ের আশীর্ব্বাদ যেন ছড়িয়ে পড়ল ধরিত্রীর দিকে। মন বুঝি সেই দূর আনন্দলোকের অমৃতলোকের ক্ষণ আভাস পেয়ে ধন্য হল! ধীরে ধীরে সব কিছুকে আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে হাল্কা কুয়াশার আস্তরণ। অনন্ত শূন্যতার মধ্যে শূন্য ছাদে এসে দাঁড়িয়ে আছি আমি একা! শ্মশানশূন্যতায় প্রেতিনীর মত খাঁ খাঁ করছে এ শূন্য ভগ্ন দূর্গ। মন থমথম করে উঠলো। এই রাজপুরীর কক্ষে কক্ষে কত বিচিত্র জীবননাট্যের ইতিহাস কত সুখ দুঃখ বেদনা ভাবনার কথা জড়িয়ে আছে। কত মোহমদির আনন্দ উচ্ছল রাত্রির নির্বাক দর্শক এ। আবার কত অভাগিনীর বুককাটা কান্নার মর্মনিপীড়িত ব্যথার ইতিকথা এর অঙ্গে অঙ্গে জড়ানো। কত ছোট ছোট হাসি কান্নার ফুলঝুরি বারবার ঝলকে উঠেছে এর ফাঁকে ফাঁকে। বিচিত্র জগতের বিচিত্রতম জীবনাট্যের রঙ্গমঞ্চ এই স্তব্ধতার প্রতিমূর্ত্তি মর্ম্মরপ্রাসাদ। হে নীরব অতীত! হে নির্বাক পাষাণ, একবার কথা কও, শোনাও তোমার বিচিত্র জীবন-অভিজ্ঞতার কথা! তুমি দেখেছ মানুষকে সম্মান প্রতিপত্তির উচ্চতম শিখরে উঠতে, আবার দেখেছো তার দীনাতিদীন দশা! তোমার বুকে বিচরণ করেছে সাধু, সুফী,মরমী। আবার হীনতম কুচক্রী হিংসার করাল মূর্তি। দেখেছ তুমি গৃহদাহের লেলিহান অগ্নিশিখা। পত্নীপ্রেমের বাৎসল্যের অমৃত নির্ঝরও ঝরতে দেখেছো তুমি। অনেক দেখার অভিজ্ঞতায় আজ তুমি বেদজ্ঞ আজ তুমি জ্ঞানী। শোনাও তোমার বিচিত্র জীবনবেদ কানে কানে গোপনে। কতো রাজার রাজ্যপাট, কত রূপসীর প্রেমলীলা—কত জীবন-মৃত্যুর ভাঙাগড়া, কতো জীবনের ওঠাপড়া! হে নীরব পাষাণ! একবার মুখর হও, শোনাও তোমার অসাধারণ অভিজ্ঞতার কথা! হে নীরব মর্ম্মর স্তব্ধতার যবনিকা সরিয়ে একবার প্রাণচঞ্চল হও!

অপরাধ দমন রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক দায়ীত্ব

শোনা যায় "ঠগী" সম্প্রদায়ের ফেঁসুড়ে ডাকাইতগণ কালীর উপাসক ছিল ও নরহত্যা করিয়া তাহারা মহাশক্তির পূজা সম্পূর্ণ করিত। অর্থাৎ তাহাদিগের ধর্ম্মের আদর্শ মনুষ্যত্ব ও মানবীয় সুনীতিবিরুদ্ধ ছিল কিন্তু ঠগীদিগের সেই কারণে কোন আধ্যাত্মিক অনুশোচনা হইত না। বরঞ্চ নরনারী বালক বালিকা শিশু নির্বিশেষে তাহারা জনসাধারণের গলায় ফাঁসি লাগাইয়া, তাহাদিগকে শ্বাসরোধ করিয়া হত্যা করিয়া কাটিয়া পুঁতিয়া ফেলিয়া নিজেদের ধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা করিত। ঠগীদিগের যে অপরাধপ্রবণতা তাহা মানবীয় বিচারে মহাপাপ বলিয়া ধরা হইত ও তাহা আইনের কঠিন হস্তে দমন করিয়া ঐ নির্ম্মম ধর্ম্মান্ধ পিশাচদিগকে পৃথিবী হইতে নিশ্চিহ্ন করা হইয়াছিল। ঐ জাতীয় অন্য অনেক মহাপাপও পৃথিবীতে অতীত-কালে অনুষ্ঠিত হইতে দেখা গিয়াছে। সতীদাহ তাহার একটি নিষ্ঠুরতম উদাহরণ। অসহায়া বিধবাদিগকে জীবন্ত অবস্থায় পুড়াইয়া মারা ও মরিবার সময় তাহাদিগের করুণ আর্ত্তনাদ তাহাদিগকে বাঁশ পিটাইয়া ও খোলকরতাল বাজাইয়া নিবৃত্ত করার কথা শুনিলে এখনও আমাদিগের মনে মহাকষ্ট ও ক্রোধ জাগ্রত হয়। ইয়োরোপে কোন সময়ে ধর্ম্মের নামে মানুষকে বন্যপশু দিয়া খাওয়ান, পুড়াইয়া মারা, চাকায় পিষিয়া মারা প্রভৃতি অমানুষিক অপরাধ করা হইত। তথা-কথিত ডাইনীদিগকে পুড়াইয়া বা জলে ডুবাইয়া মারার কথাও অনেকস্থলে শুনা গিয়াছে। আমাদিগের দেশে গঙ্গাসাগরে শিশু বলিদান, নরবলি ইত্যাদিও ধর্ম্মের আদর্শ অনুগত অধর্ম্মের উদাহরণ।

মানুষ যখন অমানুষ হয়, তখন তাহার মনের অর্দ্ধচেতনার কেন্দ্রে এক মহা আত্ম-গ্লানির উদ্ভব হয় যাহাতে তাহার নিজের সম্বন্ধে একটা ঘৃণা জাগিয়া উঠা সম্ভব হইতে পারে। এই জন্য মানুষ অন্যায় করিলে নিজের অপরাধের সাফাই নিজের নিকট গাহিবার জন্য অপরাধের একটা উচ্চাঙ্গের দোষমোচনের কারণ অনুসন্ধান করে। এই কারণ ধর্ম্মের আশ্রয়ে যদি পাওয়া যায় তাহা অপেক্ষা সুবিধার কথা আর কি হইতে পারে? সুতরাং অপরাধী মনোবৈজ্ঞানিক পন্থায় না বুঝিলেও বুঝিতে চাহে যে তাহার পাপ পাপ নহে, ধর্ম্মাদর্শ প্রনোদিত সৎকর্ম্ম ও তাহা করিয়া ধর্ম্মের আদর্শ রক্ষা করিতেছে। সে মনে মনে আর অপরাধবোধজনিত ক্ষোভ অনুভব করে না; ভাবে তাহার মোক্ষলাভের পথ খুলিয়া গেল।

আজকাল ধর্ম্মের যুগ আর প্রবলভাবে সক্রিয় নাই। ধর্মযুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক কলহ থাকিলেও; ক্রুসেড ও জিহাদ জ্ঞানবুদ্ধির আসরে আর তেমন জাগ্রত-ভাবে দেখা যায় না। ইহুদি ও আরবের যুদ্ধ, কিম্বা পাকিস্থানির লুণ্ঠন স্পৃহার দোহাই দিলেও কেহ সেই-সকল কার্য্যের মূল ধর্মে নিহিত দেখে না; আসল কারণ যাহা, অর্থাৎ পররাজ্য দখলের প্রলোভন, তাহাই সকলে দেখিতে ও বুঝিতে পারে। কিন্তু আধুনিককালে আর এক নূতনপ্রকারের ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে। ইহা হইল অতি বাস্তব ও পার্থিব আগ্রহপ্রসূত। প্রাচীন ধর্ম ছিল স্বর্গীয় এবং তাহার উদ্দেশ্য ছিল মোক্ষলাভ; আজকালকার নিরীশ্বর বস্তুতান্ত্রিক ধর্ম হইল সামাজিক সম্পদ ও ঐশ্বর্য্যের ভাগবাট লইয়া। পুরাকালে যাহারা যাহা পাইত বর্ত্তমানে তাহাদিগের সেই পাওনা আর প্রায় হইতেছে না। এখন অর্থনৈতিক ন্যায়ের বিচারে পরিশ্রমলব্ধ ঐশ্বর্য্যের অধিকার কাহারও থাকিবে না ধরা হইতেছে। নিজশ্রমলব্ধ সম্পদও সীমা

বন্ধ করা হইবে এবং সকলের সকল আমদানীর অধিক অংশ রাষ্ট্র পাইবে বলিয়া ধার্য্য হইতেছে। রাষ্ট্রের অন্তর্গত ব্যক্তি অথবা ব্যক্তিগোষ্ঠীতে কে বা কাহারা থাকিবে ও যাহারা থাকিবে তাহারা কোন শ্রমের কার্য্য করিবে অথবা করিবে না এই সকল কথার আলোচনা এখনও আরম্ভ হয় নাই। পরিশ্রমজীবি যাহারা তাহাদিগের মধ্যে রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা ও পুরোহিতদিগকে ধরা হইবে কি না এবং বাস্তব স্বভাবগতভাবে ঐ সকল দলপতিদিগের ও আধুনিক কোম্পানীও অপর প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষদিগের মধ্যে কি পার্থক্য আছে সে কথাও কেহ এখনও বিচার করিতেছে না। এখন শুধু আওয়াজ উঠিতেছে শ্রেণী-সংঘাতের এবং অধিক পাওনার দাবির।

ধরা যাউক যে ঐ সকল কথাই সুবিচারসঙ্গত এবং রাষ্ট্রীয় সংস্থিতি অতি আবশ্যক। কিন্তু কালীপূজা অত্যন্তই উচ্চ আদর্শের কথা মানিয়া লইলেও যেমন ঠেঙ্গাড়েদিগের নরহত্যার কোন নৈতিক সমর্থন করা চলে না তেমনি কোন রাষ্ট্রীয় আদর্শ খুবই ন্যায়সঙ্গত বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেও সেই রাষ্ট্রীয় দলের লোকেদের নরহত্যা, নারীনির্য্যাতন ও লুঠের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় বলিয়া কেহ মানিবে না। কোন তরুণীর গলার হার ছিনাইয়া লওয়া যে অপরাধ তাহার বিচার করিতে হইলে কেহ দেখিবে না ঐ তরুণীর গলার হার পরশ্রমলব্ধ কি না। রুশ, চীন কিম্বা আমেরিকা, কোন দেশেই কেহ কাহার হার ছিনাইয়া লইলে সেই অপরাধদমনে পুলিশ কখনও গাফিলি করিবে না। হার ছিনান, দোকান লুঠ বা জোর করিয়া ফসল কাটিয়া লওয়া কোন প্রকার রাষ্ট্রেই চলে না; সে সমাজতন্ত্রই হউক আর রাজতন্ত্র কিম্বা সমষ্টিবাদী রাষ্ট্রই হউক। অতি বড় দস্যুকেও কেহ ছুরি মারিয়া হত্যা করিতে পারে না; যদি না সে দস্যু হাতিয়ার হস্তে দস্যুতায় নিযুক্ত থাকে।

তাহা হইলে মানিতেই হইবে যে যদি কোন রাষ্ট্রে এমন কোন শাসনপদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হয় যে তাহাতে কোন অপরাধ করিলে কোন অপরাধীকে দমন করিবার ব্যবস্থা থাকিবে না, তাহা হইলে সেই রাষ্ট্র অরাজকতার কেন্দ্র বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। অরাজকতা কোন প্রকার শাসনপদ্ধতিই নহে; শাসনপদ্ধতির অভাবের নামই অরাজকতা। রাষ্ট্রীয় দলের অরাজকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্য শুধু বিপ্লব ঘটাইবার চেষ্টা অথবা রাষ্ট্রের সর্ব্বনাশ করা। এইরূপ উদ্দেশ্য যাহাদের তাহাদের কোন রাষ্ট্রীয় অধিকারের দাবি থাকতে পারে না। রাষ্ট্রকে ভাঙ্গিয়া দিবার অধিকার যাহাদের অন্তরের কামনা; তাহাদের দলকে ভাঙ্গিয়া দেওয়ার অধিকারও তেমনি সকল রাষ্ট্রেরই পূর্ণরূপে থাকে। রাষ্ট্রীয় দল ব্যতীত অপরাধপ্রবণ এমন বহু লোক আছে যাহারা অরাজকপরিস্থিতি কামনা করে; যাহাতে তাহাদের লুঠপাট করিবার সুবিধা হয়। এই জাতীয় ব্যক্তির ও রাষ্ট্রের আশ্রয়লাভের কোন ন্যায্য দাবি থাকিতে পারে না। যে কোন রাষ্ট্র এই জাতীয় ব্যক্তিদিগকে উচ্ছেদ করিয়া দেশের শান্তিরক্ষা করিতে ন্যায়তঃ অধিকারী। রাষ্ট্রে অপরাধ বৃদ্ধি ও অরাজকতার প্রাদুর্ভাব-তাহা হইলে কখনও কোন সুগঠিত রাষ্ট্রমতানুগত হইতে পারে না। এই কারণে কোন রাষ্ট্রের শান্তিরক্ষকগণই নিরপেক্ষতা বা অপর কোন দোহাই দিয়া অপরাধের প্রশ্রয় দিতে পারেন না। অপরাধ দমন করিতে তাহারা ন্যায়তঃ বাধ্য এবং কোন বিপরীত আদেশ বা নির্দ্দেশ দিবার কাহারও কোন ন্যায়সঙ্গত অধিকার থাকিতে পারেনা ও নাই।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম বঙ্গ কোন্ পথে ?

এ রাজ্যের মন্ত্রিসভা অর্থাৎ 'যুক্ত-ফ্রন্ট' যে-ভাবে, যে-পরম ভদ্র এবং সুনীতির সঙ্গে রাজকার্য্য অর্থাৎ প্রশাসন কর্ম্ম পরিচালনা করিতেছেন তাহাতে বাঙ্গালী জনসাধারণের এবং সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যের অবস্থা অতি দ্রুত স্বর্গলাভের পথে চলিয়াছে! জনগণ যুক্ত ফ্রন্টের শরিক-দলগুলির একের সহিত অন্যের পরম প্রেম প্রীতি এবং সহযোগিতারভাব অবলোকন করিয়া পরমাপুলকে শিহরিয়া উঠিতেছে। সুখী পরিবার বলিতে যাহা বুঝায়, তাহার পূর্ণ পরিচয় আমাদের 'যুক্ত-ফ্রন্ট' মন্ত্রিমণ্ডলীতেই অতি উত্তম ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। বিশেষ করিয়া মুখ্য এবং উপ-মুখ্য মন্ত্রীর মধ্যে ভাই ভাই সম্পর্ক রামায়ণ বর্ণিত রাম-লক্ষণের মতই! সত্যই এমন একাত্মা এবং একের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধার ভাব না থাকিলে হয়ত যুক্ত-ফ্রন্ট একদিনেই ভাঙ্গিয়া টুকরাটুকরা হইয়া যাইত। বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর পরম সৌভাগ্য যে জাতির এই সঙ্কটকালে এমন বিচক্ষণ এবং জনদরদী মুখ্য এবং উপমুখ্য মন্ত্রীর সেবা ধন্য হইয়াছে! এই দুইজন মন্ত্রীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান অতি স্পষ্ট এবং কোথাও কোন প্রকার গোপনতার লেশমাত্র দেখা যায় না। যেমন দেখুন অজয়বাবু ফ্রন্টের বড় শরিক তথা "বড় ভাই' সি পি এম সম্পর্কে স্পষ্ট ভাষায়—

সি পি এম দলের লোক এবং সমর্থকদের দ্বারা গুণ্ডামী, লুটপাট, খুন, নারী-নিগ্রহ ইত্যাদি কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করে শ্রীমুখার্জী বলেন যে "পার্টির যদি এসবে সায় না থাকে, তাহলে পার্টি ঐ সব অপরাধীদের প্রকাশ্যে লাথি মেরে বের করে দেয় না কেন? তাহলে বুঝতাম পার্টি ভাল, ঐ লোকগুলোই খারাপ, কিন্তু তা হয় নি। দেখা যায় ঐ সব অপরাধীরা গলায় লাল রুমাল বেঁধে নাচানাচি করছে, নেতাদের গলায় মালা পরাচ্ছে। তাই বোঝা যায় এরা প্রশ্রয় পাচ্ছে পার্টি-নেতাদের কাছ থেকেই।"- (যুগান্তর,২৫-১২-৬৯)।

বলা বাহুল্য ঐশ্বরিক জ্যোতি বিভাসিত উপমুখ্য মন্ত্রী অজয়বাবুর স্পষ্ট এবং সহজ 'প্রশংসায়' মনে দুঃখ পাইয়াছেন এবং পরম দুঃখের সঙ্গেই প্রকারান্তরে মুখ্য-মন্ত্রীকে অসত্যভাষী বলিতেও দ্বিধাবোধ করেন নাই। এইরকম নানাভাবে এবং নানা ভাষায় (ভদ্র কিনা লোকে বিচার করিবে) একে অন্যকে বিভিন্ন উপায়ে আপ্যায়িত করিতেছেন! ফলে ফ্রন্টে ৩২ দফা প্রতিশ্রুতির দফারফা অর্থাৎ পূর্ণ শ্রাদ্ধ প্রায় হইয়া গিয়াছে। ৩২ দফা কার্য্যসূচী এখন বিগত কালের কংগ্রেসের বহু হিতকর প্রতিশ্রুতির মতে প্রতিশ্রুতিতেই আবদ্ধ রহিয়াছে!

আমরাও আজ সি পি এম দলের বড়কর্ত্তাদের বোল্-চালে বিভ্রান্ত হই না। বাংলার শ্রী'ব্রেজনেভ, দাসগুপ্ত এবং শ্রী'কোসিগিন' বসু নানাভাবে প্রায়ই চমকপ্রদ হুমকী ছাড়িতেছেন, যাহাতে বাহিরের লোকে মনে করিবে এই দুইজন ব্যক্তির উপরেই বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যত নির্ভর করিতেছে। এইদুইজন মহাশক্তিশালী বীর ইচ্ছা করিলেই যুক্তফ্রন্ট

সরকারের পুঁটিমাছ সদৃশ শরিকদের এক মূহুর্তেই নস্যাৎ করিয়া দিয়া রাজ্যের সকল প্রশাসন-কর্ম্ম সি পি এম পার্টির হাতে অর্পণ করিতে পারেন। এই দুই কট্টর মহানেতার কথায় মনে হয়, ইঁহারা একান্ত কৃপা করিয়াই শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গলার মুখ্য মন্ত্রীর পদ দান করেন, এই আশা করিয়া যে অজয়বাবু তাঁহাদের ইঙ্গিতে উঠা-বসা করবেন! এত অনুগ্রহপ্রাপ্ত অজয়বাবু আজ অন্যভাবে কথা বলিতেছেন এবং জ্যোতি বসুর কিছু কিছু প্রশাসনিক নির্দ্দেশাদিও বাতিল করিয়া পরম ধৃষ্টতা দেখাইতে সাহস পাইতেছেন! ইহা নিশ্চয় ফ্রন্ট বিরোধী এবং পাপী কংগ্রেসী এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীলদের গোপন প্ররোচনার ফলেই হইতেছে। প্রতিক্রিয়াশীল বলিতে সি পি এম নেতারা অবশ্যই কংগ্রেসী এবং বিগ্-বিজিনেস ওয়ালাদেরই মনে করেন। এই প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে সি পি এম সেনাপতিরা ঘোষণা করিয়াছে সর্ব্বাত্মক সংগ্রাম!

সাবধান বাণী!—

সর্ব্বশ্রী শ্রীজ্যোতি বসু, প্রমোদ দাসগুপ্ত এবং 'রামবল' গোয়ার' এই ত্রয়ী নেতা যে-ভাবে অজয়বাবুকে ধমক দিতেছেন, তাহাতে মনে হয় মুখ্যমন্ত্রীর 'সময় হয়েছে নিকট'! ভাব দেখিয়া মনে হয় যুক্ত ফ্রন্টের বন্ধনরর্জ্জু সি পি এম! এবং ইচ্ছা হইবামাত্র সি পি এম সেনাপতিরা এই বন্ধনরজ্জু কাটিয়া দিয়া তাঁহারা নিজেরাই বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ দায়িত্ব লইবেন! ১৪ ইয়ারীর যুক্ত-ফ্রন্টের ১০টি ইয়ার বাঙ্গলা কংগ্রেসের নীতির সহিত একমত—অন্যদিকে সি পি এমের সহিত গাঁটছড়া বাঁধা আছে ফ্রন্টের তিনটি শরিক। এই তিনটি ক্ষুদ্র শরিকের সহিত সি পি এম মিনি-ফ্রন্ট গঠন করিয়া মেজর ফ্রন্টকে কোণঠাসা করিবার বাসনা পোষণ করেন এবং ইহা সম্ভব না হইলে, সি পি এমকে যদি বাঙ্গলার মন্ত্রীসভা ত্যাগ করিতে হয়, তাহা হইলে রাজ্যের পথে ঘাটে রক্তের স্রোত বহিবে, এমন সম্ভাবনার কথাও জ্যোতি-প্রমোদ-সুন্দারাইয়া সোজাসুজি জানাইয়া দিতে কোন দ্বিধা বা শঙ্কা বোধ করেন নাই!

এই ভাবে 'রক্তাক্ত, বিপ্লবের হুমকী কোন সাধারণ লোক দিলে হয়ত তাহার বিরুদ্ধে আইনসঙ্গত ব্যবস্থা অবশ্যই গ্রহণ করা হইত, কিন্তু আমাদের ভাগ্যবিধাতা, সাধারণ মানুষের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা—জ্যোতি-প্রমোদ-কোঙার-সুন্দারাইয়া রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের হুমকী দিলেও তাঁহাদের বিরুদ্ধে কে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে জানি না! কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী 'একদা-লৌহ-মানুষ' বলিয়া খ্যাত বর্গীবীর শ্রীচৌহান ইন্দিরা প্রসাদলোভী হইবার পর হইতেই দেখা যাইতেছে হঠাৎ মেকুরে পরিণত হইয়াছেন! খুব সম্ভবত ইন্দিরা নীতি সমর্থক (হইতে পারে) সি পি এম এবং সি পি আই এই দুই দলের বিরুদ্ধে যথাযথ কারণ থাকা সত্ত্বেও দেশ-মাতা ইন্দিরা ঠাকুরাণীর নির্দ্দেশমত কোন প্রকার প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা লইতে ভরসা করিবেন না। কারণ? লোকসভায় উক্ত দুইটি পার্টি+ডি এমকে+আরো দু-একটি ক্ষুদ্র রাজনৈতিকদলের ভোটের উপরেই দেশ-মাতার হারজিত তথা ইন্দিরার প্রধান মন্ত্রিত্ব একান্ত ভাবে নির্ভর করিতেছে! সে-কথা যাউক।

এদিকে কলিকাতায় কিছুদিন পূর্ব্বে মহাকরণের সামনে একটি 'গণ-আদালত অনুষ্ঠিত হয়। এই গণ-আদালতের বিচারের রায় এই "যুক্তফ্রন্ট শুধু সরকারী যোগ্যতা হারায়নি, তাদের সামাজিক স্বীকৃতিও নেই।"

রায়ে আরও বলা হয়েছে, "উপমুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু, ভূমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার, শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী সত্যপ্রিয় রায় তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন নি এবং এটি বগার সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার এবং বাদশাখানের কাছে প্রস্তাব দিয়ে বলা হয় তাঁরা যেন গণ-আদালতের রায় অনুযায়ী এই তিন মন্ত্রী সহ খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রভাস রায় এবং 'খেলোমন্ত্রী শ্রীরাম চ্যাটার্জিকেও, ভারতের বাহিরে নির্ব্বাসন দেন। কারণ কারোরই যোগ্যতা নেই!"

"রাজ্যে না আছে আইন শৃঙ্খলা, না আছে নারীর মর্য্যাদা, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষের দামও আকাশ-ছোঁয়া।"

পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রপরিষদের আয়োজিত এই গণ-আদালতে আসামী করা হয় বাঙ্গলার কোসিগিন জ্যোতি বসু, রামবল গোঁয়ার এবং শিক্ষা মন্ত্রী শ্রী(-)সত্যপ্রিয় রায়কে। এই এই গণ-আদালতের রায় বর্ত্তমানে কার্যকর করা যাইবে না, কিন্তু এই সামান্য ঘটনাকে ভবিষ্যতের 'দেওয়ালের লিখন' বলিয়া গ্রহণ করা বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। সামান্য হইতেই বৃহতের উদ্ভব হইতে পারে এবং হইবেও। সি পি এম প্রশাসকবৃন্দ যে প্রকার বেপরোয়াভাবে বাঙ্গালী এবং বাঙ্গলাকে সকল দিক হইতে ধ্বংস করিয়া সমগ্র রাজ্যে চরম অরাজকতা সৃষ্টির প্রয়াস চালাইয়া যাইতেছে, তাহার ফলভোগ তাহাদের অবশ্যই করিতে হইবে আজ না হয় কাল। ইতিপুর্ব্বে আমরা পশ্চিম বাঙ্গলার সখের বিপ্লবীদের ফরাসী মহা বিপ্লবের কথা স্মরণ করিতে বলিয়াছিলাম। ঐ-বিপ্লবে নেতাদের কি ভাবে একের পর এককে গিলোটিন করা হয় গণ-আদালতের বিচারে, অদ্যকার ইনক্লাব জিন্দাবাদী নেতাদের সেই দৃশ্যের কথা আবার একবার মানসচক্ষুতে অবলোকন করিতে কাতর অনুরোধ করিতেছি। দেশের প্রতি, সাধারণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা এবং সর্ব্বপ্রকার নারকীয় অনাচার অত্যাচারের, বিকৃত-বিদেশী-আদর্শ এবং ভাবে অনুপ্রাণিত নেতারা এবং তাঁহাদের ক্যাম্প-ফলোয়ারের দল চালাইতেছে, সে সবকথা বাঙ্গলার মানুষ ভুলিবে না এবং সকল অপরাধের চরম প্রায়শ্চিত্ত এই নেতাদের করিতেই হইবে। ভবিষ্যতের সেদিনের দৃশ্য আমরা কল্পনা করিতেও ভয় পাই!

জার্ম্মানির নাৎসি পার্টির সহিত সি পি এম-এর সাদৃশ্য?

'To the rank and file of the S. A. (Brown shirts) [হিটলারের সমর্থক Rochm এর নেতৃত্বে গঠিত বাহিনী] the triumph of January 1933 was meant to carry with it the fundom to pillage not only the jews and profiteers ;but also the well-to-do established classes of Society. "Winston Churchill লিখিত The second world war, The Gathering Storm (Vol 1) গ্রন্থে এই তথ্য পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গে সি পি এম সম্পর্কেও ঠিক এই কথা প্রযোজ্য কি না পাঠক বিচার করিয়া দেখিবেন। গত কিছুকাল হইতে সি পি এম নেতৃত্ব এবং সি পি এম বাহিনীর কার্যকলাপে স্পষ্টই বুঝা যায় যে এই রাজনৈতিক দল, রাজ্যের সুখ শান্তি, আইন শৃঙ্খলা, বাঙ্গালী জাতির মানবিক চেতনা এবং আদর্শ প্রভৃতি সমূলে উৎপাটিত করিয়া বিকৃত এবং বিজাতীয় আদর্শের ছাঁচে নূতন করিয়া এক কিম্ভূত সমাজ গঠন করিতে চায়; যে সমাজে সাধারণ মানুষের এবং শ্রমিকের কোন প্রকার স্বাধীনতা থাকিবে না। চীন এবং সোভিয়েট রাশিয়াতেও ইহা ঘটিয়াছে এবং ঐ দুইটি তথাকথিত কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে মাত্র জনকয়েক ঝুনো শয়তানী-বুদ্ধি অতি চতুর ক্ষমতাপ্রিয় নেতাদের হাতে! এই দুইটি এবং ইহাদের তাঁবে ক্ষুদে রাষ্ট্রগুলিতেও সাধারণ মানুষের কোন প্রকার অধিকার নাই, এমন কি স্বাধীন-ভাবে নিজেদের মত ব্যক্ত করিতেও কেহ পারে না। মানুষের স্বাধীন চিন্তাধারাকেও এই সব বিকৃত-আদর্শ এবং কুনীতিধারী দেশে সর্ব্বপ্রকারে মাত্র কয়েকজন ক্ষমতা-দখলকারী নেতার তাঁবে করিয়া রাখা হইতেছে এক কথায় বলা যায় কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রে সাধারণ মানুষকে বিরাট এক যন্ত্রের নাট্-বোল্টের মতই ব্যবহার করা হইতেছে। ছাগল ভেড়া গবাদি পশুর যেটুকু স্বাধীনতা এই সব দেশ আছে সেটুকু স্বাধীনতাও ঐসব দেশের লোকের নাই। মানুষকে মনুষ্যত্ব হীন করিয়া তাহাকে কয়েকজনের ডিক্‌টেশন্ মত উঠা বসা করিতে বাধ্য করা হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গে বিধান সভায় গত নির্ব্বাচনে মাত্র ৮৩টি

আসন দখল করিয়া সি পি এম পোলিটব্যুরো নিজেদের এ রাজ্যের মালিক বলিয়া মনে করিতেছে। নিজেদের এবং পার্টির হীন মতলব হাঁসিল করিতে হেন অনাচার নাই যে এ রাজ্যে ইহারা না করিতেছে। অজয়বাবু স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন "রাজ্য অনাচার বন্ধ করিবার জন্য পুলিশ মন্ত্রী জ্যোতিবসু বোধ হয় "ইচ্ছে করেই এসব অরাজকতার প্রশ্রয় দিতেছেন - কিংবা তিনি নিরুপায়! রাজ্যে শ্রমিক, কৃষক ও নারী নির্য্যাতন অবাধে চলছে।"

সি পি এম বর্ত্তমান ফ্রন্ট সরকার ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচন চান। এবং এই নির্ব্বাচন যদি ঘটে, তাহা হইলে সি পি এম সমগ্র রাজ্যে এখন অতি হিংস্র সন্ত্রাসের সৃষ্টি করিতে পারে যাহাতে অন্য কোন পার্টির কোন প্রার্থী নির্ব্বাচন-কেন্দ্রে উপস্থিত হইতে পারিবে না। এমনও হইতে পারে যে অন্য রাজনৈতিকদলের কিংবা নির্দ্দলীয় কোন প্রার্থী নির্ব্বাচনে দাঁড়াইতেও ভরসা করিবে না, যেমন হিটলার করেন জার্ম্মানীর ১৯৩৩ সালের তথাকথিত সাধারণ নির্ব্বাচনে। হিটলারের প্রচণ্ড প্রতাপ এবং মারণঅস্ত্রের কাছে জার্ম্মাণ জনসাধারণ হিটলারপন্থীদের পক্ষে ভোট দিতে বাধ্য হয়, হিটলারী-চোট হইতে নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য!

হিটলার এই নির্ব্বাচনে ক্ষমতার শিখরে আরোহণ করেন। তাহার পর বৃদ্ধ প্রেসিডেণ্ট ফন্ হিণ্ডেন্‌বার্গের মৃত্যুর পর নিজেকে সমগ্র জার্ম্মান দেশ এবং জাতির ভাগ্যনিয়ন্তার আসনে বসাইতেও সক্ষম হন! সি পি এম নেতৃত্বও এই পথে চলিতেছে। সময় থাকিতে দেশ ও জাতি যদি সাবধান না হয় এবং অবস্থার গতি ফিরাইবার বা থামাইবার জন্য সচেষ্ট না হয়, তাহা হইলে ভগবান আমাদের রক্ষা করিবেন কি জানি না!

প্রসঙ্গক্রমে একথা মনে রাখা দরকার যে হিটলার সব কিছু করিয়া এবং সব কিছু পাইয়াও ১৯৪৫ সালের মধ্যেই আত্মবিলোপ করিতে বাধ্য হয়েন! স্বেচ্ছাচারী ডিক্‌টেটারের পরিণতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র এক রকম এবং আমাদের দেশে ডিমোক্র্যাসীর আলখাল্লা-পরিহিত সি পি এম ডিকটেটারদের কপালের লিখন কি জানি না, কিন্তু 'দেওয়ালের লিখন' অতি স্পষ্ট! পাকিস্থানের আয়ুব খাঁর রাজত্ব মাত্র দশ বছরেই শেষ হইল। এই আয়ুবের ভবিষ্যত এখন বিপদসঙ্কুল!

পশ্চিম বঙ্গ সরকার—The most civilised under the sun.

অর্থাৎ "পশ্চিম বঙ্গ সরকার পৃথিবীতে সূর্য্যের নীচে শ্রেষ্ঠ সভ্য সরকার"—এই কথা শ্রী জ্যোতি বসু বলেন—৭।৮ জানুয়ারী (৭০)। মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয় মুখোপাধ্যায় কিছুদিন পূর্ব্বে রাজ্যের ফ্রণ্ট সরকারকে জঙ্গলী সরকার বলিয়া অভিহিত করিতে দ্বিধা করেন নাই এবং আজ পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রীর পশ্চিম বঙ্গ সরকার সম্পর্কে এ-মত এবং ধারণার কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। আমাদের এই পরম 'সভ্য' সরকারের দুইজন প্রথম সারির বিজ্ঞ প্রশাসকের এমন মত-পার্থক্যের কারণ কি তাহা বলা শক্ত। এ বিষয়ে এইমাত্র বলা যায় যে সভ্যতা এবং অসভ্যতার মান সকলের এক নয়। আফ্রিকার গভীর অরণ্যে কোন কোন জাতির নারী এবং পুরুষেরা সারা অঙ্গ নগ্ন রাখিয়া কোমরে মাত্র একটি সরু হাড়ের বা অন্য কোন বস্তুর বন্ধনী মাত্র জড়াইয়াই নিজেদের সুসজ্জিত এবং পরম সভ্য বলিয়া মনে করে, দেহের উর্দ্ধ এবং নিম্ন অঙ্গগুলি কোনপ্রকারে আবরিত করিবার কোন প্রয়োজন আফ্রিকার এই আদি অরণ্যবাসীরা বোধ করে না। আবার অন্যদিকে দেখুন - আমাদের ভারতবর্ষেই দেখুন, কোন কোন অঞ্চলের লোকেরা সর্ব্বাঙ্গ সর্ব্বভাবে বস্ত্রাবৃত করিয়াও মনে করে 'যথেষ্ট হইল না'—এবং এই মনে করিয়া দেহকে আবার একটা শাল, র‍্যাপার কিংবা বড় চাদর দিয়া ঢাকিয়া ফেলে। বোরখার কথা ত আপনারা সকলেই জানেন। জ্যোতি বসু কোন দলের জানা নাই, কিন্তু মনে হইতেছে প্রত্যহ দুই চারিটা নরহত্যা, ডজন-খানেক লুটপাঠ, রাহাজানি, বিশ পঁচিশটা ধর্ম্মঘট এবং ঘেরাও, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পসংস্থার মালিক এবং অফিসার

ঠেঙ্গানো, পঁচিশ তিরিশটা অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম্ম প্রভৃতি একমাত্র সভ্য অর্থাৎ সিভিলাইজড্ সরকারকারেই ঘটিতে পারে। 'অসভ্য' সরকারের প্রজাদের রাজনৈতিক শিক্ষার অভাবের জন্য তাহারা খায়, ঘুমায় আর নিজেদের সাধারণ কাজকর্ম্ম লইয়াই ব্যস্ত থাকে। বৈপ্লবিক কোন কিছু ভাবা এবং কাজে তাহা প্রকাশ এই সকল (জ্যোতিবাবুর মতে) অসভ্য সরকারের শাসনাধীন লোকেরা কখনও করিতে পারে না।

জ্যোতি বসুর নবাবিষ্কৃত 'পৃথিবীর সভ্যতম রাষ্ট্রে আজ আমরা কি দেখিতেছি ?—

পশ্চিম বঙ্গে আজ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও পুলিশ অফিসার এবং বহু উচ্চপদস্থ সরকারী অফিসার, জনতা, বিশেষ করিয়া সি পি এম ধর্ম্মী বাহিনী-কর্ত্তৃক যত্রতত্র 'ঘেরিত' এবং নানাভাবে নিগৃহীত হইতেছেন, ফাউ হিসাবে প্রহারও কোথাও কোথাও লাভ করিতেছেন, রাজ্যপুলিশ (যাহা জ্যোতিবাবু উত্তরাধিকারসূত্রে পাইয়াছেন) সি পি এম বাহিনীর অনাচার অত্যাচার এবং হামলাকারী জনতার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা লইতেছে না, ব্যবস্থা লইতে ভরসাও করে না চাকুরী খোয়াইবার ভয়ে। জনতার হাঙ্গামা যত ভীষণই হউক না কেন, জ্যোতি বাবুর নির্দ্দেশ এবং হুকুম না পাইলে পুলিশ বেকার বসিয়া থাকিবে, মানুষের উপর হামলা, গুণ্ডাবাজী ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে কেবলমাত্র অবলোকন করিতে থাকিবে! হিটলারের সহকর্ম্মী প্রখ্যাতনামা গোয়েরিং অপেক্ষাও অধিকতর শক্তিশালী আমাদের উপ-মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যাইবার, এমন কি সামান্য প্রতিবাদ বাক্যও উচ্চারণ করিবার দুঃসাহস রাজ্য-পুলিশের কাহারও নাই।

আর একদিকে দেখুন সি পি এম সমর্থক পল্টনভুক্ত 'সৈন্যেরা' পথে ঘাটে, মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া, গলায় লাল ন্যাকড়া বাঁধিয়া, ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এই অসম সাহসী সি পি এম 'সৈন্যেরা' রাজ্যপুলিশকেও তাহাদের আজ্ঞাবহ করিয়া রাখিয়াছে—এমন কি মুখ্যমন্ত্রীর প্রতি প্রস্তর, বোতল, বোমা প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হইলেও পুলিশ উপ-মুখ্যমন্ত্রীর হুকুম না পাওয়া পর্য্যন্ত বেকার বসিয়া থাকিবে। প্রকাশ্য স্থানে বিবিধপ্রকার মারাত্মক অস্ত্রাদিও বিক্রয় হইতেছে, বিশেষ করিয়া কোন কোন গ্রামাঞ্চলে। 'পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সভ্য সরকারের' অধীন এই পশ্চিম বঙ্গে প্রত্যহ সংবাদপত্রে অজস্র যে সকল খুন-জখম, লুঠপাট, শ্রমিক-অত্যাচার, রাহাজানি ডাকাতির সংবাদ প্রকাশিত হইতেছে, জ্যোতিবাবু তাহা বিশ্বাস করেন না। চোখে না দেখিলে চোখ থাকিতেও কানা এই মহাশয়ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার সংবাদ অসত্য বলিয়া মনে করেন।

পশ্চিম বঙ্গে "কুসংস্কার" লোপ—।

সি পি এম-ফ্রন্ট-সরকারের বড়-তরফ। এই বড় তরফের নিষ্ঠা এবং প্রাণপণ প্রচেষ্টার ফলে এ-রাজ্য হইতে ক্রমে সততা, মানুষের প্রতি মানুষের স্নেহ প্রেম ভালবাসা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, দেশের প্রতি আনুগত্য, যুগ যুগ ধরিয়া প্রচলিত আদর্শ, সর্ব্ব জীবে সমভাব, অহিংসা, চরিত্র, মানবীয় গুণাবলী-প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার আদর্শ এবং বিশ্বাস অবলুপ্তির পথে চলিয়াছে। কারণ এতদিন আমরা যাহা কিছু মানুষের গুণ এবং কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করিতে অভ্যস্ত ছিলাম, তাহা আসলে কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নহে!

সামান্যসংখ্যক এক-শ্রেণীর লোক এই সকল কুসংস্কার 'জীবন্ত' রাখিয়া বৃহত্তর সংখ্যক মানুষকে ঠকাইবার যন্ত্র হিসাবেই ব্যবহার করিতেছিল। এবার আর মানুষকে প্রবঞ্চনা করা চলিবে না। এবার কুসংস্কারমুক্ত বাঙ্গালী নবতর এক সভ্যতার সংগ্রামে লিপ্ত হইবে এবং পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সভ্য সরকারকে "একেবারে পর্ব্বত শিখরে ঠেলিয়া তুলিবে। কিন্তু তাহার পর কি ?

ইতিহাসে দেখা যায়, বিগতকালে বহু রাষ্ট্র সভ্যতার চরম শিখরে আরোহণ করিবার পর ক্রমশ নীচের দিকে গড়াইতে গড়াইতে অতলে তলাইয়া যায়! আমাদের

'শ্রেষ্ঠতম সভ্য সরকার' আজ পশ্চিম বঙ্গকে কি এই ঐতিহাসিক পরিণতি অথা ঃ অবলুপ্তির পথেই লইয়া যাইতেছে? ভগবান বুদ্ধ নির্ব্বাণের কথা বলেন, কিন্তু তিনিও বোধহয় একটা জাতির সকল মানুষের এমন সঙ্ঘবদ্ধভাবে এবং দলবাঁধিয়া নির্ব্বাণের পথে মহাযাত্রার কথা কল্পনাও করিতে পারেন নাই!

ফ্রণ্ট সরকারের বিষম কীর্ত্তি—

মালিক সম্প্রদায় শ্রমিকদের খাটাইয়া বিত্তসঞ্চয় করে কিন্তু সেই বিত্তের ন্যায্য অংশ শ্রমিকদের কখনও দেওয়া হয় না! আমাদের বর্ত্তমান শ্রমিকনেতা এবং ফ্রণ্ট সরকারের মুখপাত্রদের মত এবং ধারণা এই প্রকার এবং সেইজন্য শ্রমিকদের প্রতি ন্যায়বিচার করিবার মহান উদ্দেশ্য লইয়া তাঁহারা একযোগে—শ্রমিক সাধারণ অর্থাৎ ইউনিয়াননেতারা যখন যাহা দাবি করিতেছেন শিল্প-সংস্থার মালিকদের বিনা প্রতিবাদে সেই দাবি মিটাইয়া দিবার ঢালা হুকুম দিতেছেন। এখানে কোন শিল্পসংস্থার শ্রমিক-দাবি মিটাইবার সামর্থ্য আছে কি না তাহা কর্ত্তাদের বিচার্য্য নহে। যেমন করিয়া এবং যে-ভাবেই হউক, শ্রমিকদের একান্ত অসম্ভব এবং অন্যায় দাবিও মালিক পক্ষকে হাসিমুখে স্বীকার করিয়া তাহা মিটাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বলা বাহুল্য শ্রমিক-মালিক দেনা-পাওনা এবং দাবীদাওয়ার ব্যাপারে মালিকপক্ষের দাবী কিছু থাকিতে পারে না। শ্রমিকদের দাবিপূরণ মালিকের পক্ষে অবশ্য-করণীয়, কিন্তু বেচারা মালিক শ্রমিকদের নিকট হইতে টাকার বিনিময়ে ন্যূনতম কাজ আদায়ের কথাও বলিতে পারিবেন না। মালিকের কর্ত্তব্য শ্রমিকদের সর্ব্ববিধ দাবি মিটানো, কিন্তু নিয়মিত কাজ করা অর্থাৎ প্রোডাকসন বৃদ্ধি করা বা না-করা, করিলে কতটুকু করা, কি ভাবে করা, তাহা একান্তভাবে নির্ভর করিবে শ্রমিক অর্থাৎ শ্রমিক ইউনিয়ানের নেতাদের উপর। এ-বিষয় শিল্পসংস্থার মালিকদের কোন কথা বলা বা শ্রমিকদের নিকট হইতে কিছু দাবি করা হইলে তাহা চুক্তিবিরুদ্ধ মহা অপরাধের পর্যায়ে পড়িবে!

এখন মালিকদের অবস্থা এমনই এক বিষম পর্য্যায়ে আসিয়াছে যে তাঁহারা পশ্চিম বঙ্গ হইতে ঘটিবাটি গাঁট-গাটরা লইয়া অন্য রাজ্যে আশ্রয় খুঁজিতে বাধ্য হইয়াছেন! আমরা বিগত বহুদিন হইতে পশ্চিমবঙ্গের এই শিল্প-সঙ্কটের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে প্রয়াস করিতেছি—কিন্তু বিন্দুমাত্র সফলতা লাভ করিতে পারি নাই কিন্তু আজ রাজ্য সরকারের কর্ত্তাব্যক্তিদের টনক নড়িয়াছে-এবং এতদিন শিল্পের ক্ষেত্রে "রাজ্যের অবস্থা ঠিক আছে—ব্যবসা বাণিজ্য ক্রমশ অগ্রগতির পথেই চলিতেছে, চিন্তার কোন কারণ নাই প্রভৃতি স্তোকবাক্যে আত্ম এবং জনসাধারণকে প্রতারণা করিবার চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া আজ দায়ে পড়িয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন অবশেষে, যে পশ্চিমবঙ্গ হইতে ক্রমশ বৃহৎ শিল্পসংস্থাগুলি অন্যরাজ্যে পলায়ন করিতে বাধ্য হইতেছে। কর্ত্তৃপক্ষ স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেন নাই, (হয়ত লজ্জার কারণে)-কতগুলি শিল্পসংস্থা বিগত কয়েক মাসে এ-রাজ্য ত্যাগ করিয়াছে। আমাদের যাহা সংবাদ তাহাতে বলা যায় যে অন্তত ছয়টি বৃহৎ সংস্থা ইতি-মধ্যেই চলিয়া গিয়াছে এবং আরো চারিটি বৃহৎ সংস্থা অন্যরাজ্যে তাহাদের কলকারখানা স্থাপনের উদ্যোগপর্ব্ব প্রায় শেষ করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বোধহয় তিনটি বড় বড় বাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানও আছে।

পশ্চিমবঙ্গে তাঁহারা কারবার হয়ত একেবারে বন্ধ করিতে পারিবেন না, কিন্তু কোনপ্রকারেই এরাজ্য স্থিত কারবারে শিল্পপতিরা লোকসান দিবার জন্য নূতন কিংবা প্রয়োজনমত আর কোন মূলধন নিয়োগ করিবেন না। সোজা কথায় পশ্চিমবঙ্গে কারবার চলুক আর না চলুক, শিল্পপতিরা তাহা লইয়া আর মাথা ঘামাইতে রাজী নহেন! ভারতের অন্য রাজ্যগুলি যেসময় নানাভাবে বিবিধ সাহায্য এবং সহযোগিতার আশ্বাস দিয়া শিল্পপতিদের নিজ নিজ এলাকায় নূতন নূতন শিল্প স্থাপনের নিমন্ত্রণ করিতেছে, ঠিক সেইসময় আমাদের সরকার এবং শ্রমিক-ইউনিয়নের রাজ-চক্রবর্ত্তীগণ এরাজ্য হইতে শিল্প খেদাইবার পন্থা অবলম্বন

করিয়াছেন—এবং এই প্রয়াস অবশ্যই শ্রমিক-কল্যাণের মহত প্রেরণার কারণেই ঘটিতেছে !

এ কথা পুর্ব্বে আমরা বলিয়াছি যে পশ্চিমবঙ্গে যে লক্ষ লক্ষ অবাঙ্গালী শ্রমিক কলকারখানায় কাজ করে, শিল্প অপসারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহারা এ-রাজ্যের বাহিরে নূতন নূতন কলকারখানায় অন্য রাজ্যে অবশ্যই কাজ পাইবে, কিন্তু এখানে কলকারখানায় নিযুক্ত যে কয়েক হাজার বা দু-এক লক্ষ বাঙ্গালী শ্রমিক আছে তাহারা রাজ্যের বাহিরে কোথাও কাজ পাইবে কি? না। রাজ্যের বাহিরে বাঙ্গালী শ্রমিকের কোন স্থান নাই, কোন শিল্পসংস্থা তাহাদের নিযুক্ত করিবে না, করিতে ভরসা পাইবে না। অর্থাৎ বাঙ্গালী শ্রমিকের নিশ্চিত ভবিষ্যত চির বা দীর্ঘস্থায়ী বেকারী !!

বেকার অবস্থায় এই বাঙ্গালী শ্রমিকদের এবং তাহাদের স্ত্রীপুত্রপরিবারবর্গকে, আশা করি শ্রমিক-ইউনিয়নের শ্রমিক-দরদী এবং অতিচতুর নেতারা (বিশেষ করিয়া সর্ব্ব শ্রী যতীন চক্রবর্ত্তী, মনোরঞ্জন রায়, কালী মুখার্জি, মাইকেল জন প্রভৃতি) খাওয়াইবার পরাইবার পুর্ণ দায়িত্ব লইবেন ! একটা বিষয়ে বিপদ ঘটিতে পারে –, পশ্চিমবঙ্গ হইতে শতকরা ৭০।৮০ জন শ্রমিক চলিয়া গেলে ইউনিয়ন রাজ চক্রবর্ত্তীদের রাজত্ব ় ভাবে চলিবে এবং নেতাদের 'রাজকীয়' বসবাসের রচাই বা কোথা হইতে আসিবে, কে দিবে? আশা রি পরিষদবিষয়ক মন্ত্রীচাতুর্য্যে-চাণক্য সমান শ্রী যতীন ক্রবর্ত্তী রাজ্য বিধানসভায় বেকার শ্রমিকপালনের ন্য একটা আইন পাশ করাইয়া লইতে পারিবেন। কা ? কেন্দ্রের নিকট দাবী করিলেই প্রধান তথা র্থমন্ত্রী, দেশমাতা ইন্দিরা গান্ধী অবশ্যই ৫৫০ কোটি কা এই খাতে দান করিতে ক্ষণমাত্র বিলম্ব করিবেন । বর্ত্তমান অবস্থায় আদি কংগ্রেস বিরোধী দলগুলিকে শমাতা ইন্দিরাজি তাঁহার স্বপক্ষে রাখিতে সর্ব্বপ্রকার চ্চ-নীচ কলাকৌশলের আশ্রয় লইতে বাধ্য ইয়াছেন। নিজপক্ষীয়দের অর্থ দান করিতেও তাঁহার পক্ষে বাধা কিছুই নাই, কারণ কেন্দ্র সরকারের অর্থকোষ ত তাঁহারই হাতে।

পশ্চিম বাংলার অন্তিম-দশা।

রাজ্যের প্রশাসন ব্যবস্থা বলিতে কিছুই নাই। যুক্ত (?) ফ্রন্টের সরকারের মন্ত্রী মহাশয়গণ বর্ত্তমানে, রাজকার্য্য অপেক্ষা দলীয় এবং সেই সঙ্গে যতটা সম্ভব নিজ নিজ স্বার্থ এবং ব্যক্তিগত ক্ষমতা বজায় রাখিতে সদা ব্যস্ত রহিয়াছেন। একমাত্র মুখ্যমন্ত্রীকে এই অভিযোগ হইতে বাদ দেওয়া চলে, কিন্তু নামত 'মুখ্য' হইলেও উপ-মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় এবং তাঁহার দলের প্রায় সকলেই অজয়বাবুকে ঠুটো জগন্নাথ করিয়া রাখিতে চান। জ্যোতিবাবুর পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর উপর হামলা ঠেকাইতেও ভয় পায়, জ্যোতি বসুর স্পষ্ট হুকুম না পাইলে, রাজ্য-পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশও অবহেলা করিতেছে। এ সাহস তাহাদের কে দিতেছে? বলা বাহুল্য, শ্রীল শ্রীযুক্ত পরম দেশভক্ত জনদরদী জ্যোতি বসু মহাশয়ই পুলিশের সর্ব্বপ্রকার "বেকারত্বের" প্ররোচক। আজ রাজ্যপুলিশ আদালতের, এমন কি হাইকোর্টের আদেশ নির্দেশও অবজ্ঞা করিতে বাধ্য হইতেছে রাজ্যের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের পরম প্রতাপশালী মন্ত্রী মহাশয়ের নির্দেশে।

রাজ্যে এই অবস্থা চলিতে থাকিলে হঠাৎ একদিন দেখা যাইবে পশ্চিম বঙ্গ লালে লাল হইয়া গিয়াছে এবং রাজ্যবাসীদের জীবন-মরণ সবই নির্ভর করিতেছে সি পি এম দলের কর্ত্তাদের করুণার উপর। এখানে একজন রাজ্যপাল আছেন, কিন্তু দেখা যাইতেছে তিনিও স্বাধীন মত ব্যক্ত করিতে ভয় পাইতেছেন। বিধানসভার উদ্বোধনের সময় রাজ্যপালের ভাষণ যুক্তফ্রন্টের সরকারের প্রশংসাবাণীতে ভরপূর। অত্যন্ত মৃদুভাবে রাজ্যপাল প্রশাসনিক বিষয়ে সামান্য সমালোচনা কিছু করিয়াছেন, কিন্তু ইহাকে সমালোচনা বলিয়া কাতর অনোরোধই বলা ঠিক। (একটি প্রখ্যাত ইংরেজি দৈনিকে রাজ্যপালের আলোচ্য ভাষণকে

"Rather a Raga Bag" বলা হইয়াছে ঠিকই)। অবশ্য ফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের রচিত 'রাজ্যপালের' ভাষণে আমরা বেশী কিছু আশা করি না। রাজ্যপালও বুদ্ধিমান, তিনি মনে রাখিয়াছেন প্রাক্তন রাজ্যপাল শ্রী ধরমবীরের কি অবস্থা হয়—নিজের কর্ত্তব্যে অবিচল থাকিতে চেষ্টা করার জন্য! অনেক ভাবিয়া, বিশেষ করিয়া নিজ ভবিষ্যত, রাজ্যপাল পশ্চিম বঙ্গ রূপ **'State of Slaves'**এ "অন্তত পাঁচ বছর থাকিতে মনস্থির করিলেন"।

কিন্তু পশ্চিম বঙ্গবাসীরা কি করিবে আত্মরক্ষার জন্য? সি পি এম গুণ্ডাবাজীর কাছেই কি চির নতি স্বীকার করিয়া থাকিবে এ রাজের সকলেই? আমরা বিশ্বাস করি, পশ্চিম বঙ্গে তথা বাঙ্গালী যুবসমাজের এখনো এমন অবনতি হয় নাই যে তাহারা অত্যাচার, অনাচার, প্রশাসনিক ব্যভিচার, মানুষের নিরাপত্তার অভাব, পুলিশকে বেকার করিয়া রাখা প্রভৃতি সহ্য করিতে পারিবে না আর বেশী দিন। ৫০,০০০ ডাণ্ডাধারী রেড-গার্ড বাহিনীকে ঠাণ্ডা করিতে সময় লাগিবে দু-মিনিটেরও কম। সি পি এম বীরবাহিনীর প্রকৃত শক্তি জ্যোতি বসুর আস্ফালন, পরম সভ্যজনোচিত কথাবার্ত্তা এবং স্বেচ্ছাচারী আচরণ, রাজ্যপুলিশ দপ্তর হাত বদল হইলেই দেখা যাইবে সি পি এম বাহিনীর বিষদাঁত ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

আর বিলম্ব না করিয়া এবার এমন পন্থা অবলম্বন করা দরকার যাহাতে অবিলম্বে সি পি এম রাজ্যপুলিশ সাহায্য বঞ্চিত নির্বীর্য্য এবং কোনঠাসা হয়। বাংলা এবং বাঙ্গালীকে ভদ্রভাবে বাঁচিতে হইলে, দ্বিতীয় কোন পথ নাই বর্ত্তমানে।
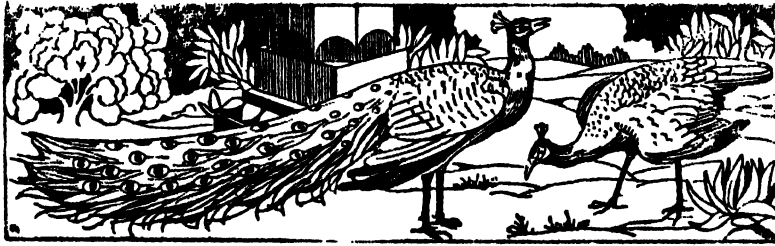
একই মানুষ

(গল্প)

নীহার রঞ্জন সেনগুপ্ত

উনিশশ' সাতচল্লিশ সালে স্বাধীনতা লাভের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই নতুন উদ্বাস্তু উপনিবেশের পত্তন।

দৈর্ঘে আড়াই মাইল আর প্রস্থে দেড়মাইল।··· পনেরো বছরে যার লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে দশহাজারের কাছাকাছি।

বাস্তুহারা উৎখাতী মানুষ। সমস্যা এদের কম নয়!

সরকার নাজেহাল।

ফ্রি-জমি, খয়রাতি সাহায্য, ক্যাশ ডোল্ ইত্যাদি দিয়ে-দিয়ে প্রতিবছর সরকারী তহবিল বিধিবরাদ্দের শূন্যের অংকে নেমে আসে। তা বাদে আছে নানা অভাব-অভিযোগের পালা।

এবারের সমস্যাটা কিছু কঠিন। খাদ্য সমস্যা।

এখানে আগে খোলা-বাজারেই চাল বিক্রি হোতো। আটা-গম পূর্ব্ববঙ্গীয়রা তেমন খায় না, অভ্যাস নেই। তবু কোন দোকানদার গম মজুত রাখতো, যদি ভবিষ্যতে কারো প্রয়োজনে লাগে। আর চিনি-গুড়-তেলের জন্যে বিশেষ কারো মথাঘামানোর দরকার হয় না, কারণ জলের মতই বাজারে সহজলভ্য।

তবু টনক নড়্লো জনসাধারণের, যখন চালের দর হু-হু করে বৃদ্ধিপেয়ে চল্লিশ টাকায় উঠে গেল; পোকা-লাগা গমও কোথা দিয়ে পাচার হ'য়ে গেল আঠাশ-ত্রিশ টাকা মণ দরে। তারপর চিনি-গুড় তেল-ও যেন হঠাৎ ক্রয়ের আওতার বাইরে চলে গেল! একদিন তেল হ'য়ে গেল দুষ্প্রাপ্য॥

নানা ধরনের মিটিঙ হ'তে লাগ্লো।

ফলতঃ সরকারকে রেশনিঙ-প্রথা আটঘাট বেঁধে চালু করতে হোলো।

এ' বৃহৎ উদ্বাস্তু-উপনিবেশেও কমকরে আটদশটি সরকারমান্য রেশনিঙ দোকান চালু হ'য়ে গেল। চাল, গম আর চিনির।···

ইতিমধ্যে আমাদের সংসারে এক বিপদ দেখা গেল।

পূর্ব থেকে কিছু বলা প্রয়োজন।

মাত্র মাসখানেক আমি এখানে এসেছি। আমি এবং আমার স্ত্রী। এসেছি মানে, আসতে বাধ্য হ'য়েছি।

কোথায় সুদূর কাশ্মীরে 'হজরত বাল' নিয়ে গোলমাল হোলো, আর তার প্রতিক্রিয়ার ফলভোগ করতে হোলো দু'হাজার মাইলদূরের এই বাংলায়।

অমানুষিক সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ড।

ভীতসন্ত্রস্ত সংখ্যালঘুসম্প্রদায় যে-যার পথে পালালো।···

আমরাও পালালুম।

পেছনে পড়ে রইলো পূর্বপুরুষের বাস্তভিটা,···জোত-জমি, বাগান পুকুর,···অবিচ্ছেদ্য মায়ার বন্ধন আর কয়েকফোঁটা চোখের জল···

অবর্ণনীয় পথের কষ্ট সহ্য আর শ্রান্তক্লান্ত অবস্থায় এসে দাঁড়ালুম সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত উদ্বাস্তু-উপনিবেশে—যেখানে আগে থেকেই আমার দুটি ছেলে নিজেদের সংসার গুছিয়ে নিয়ে বসেছিল।

ওরা পাকিস্থানে থাকতে চায়নি, মোহ-ও ছিল না,—আর কাজ-ও ওরা জুটিয়ে নিয়েছিল কোলকাতায়। সরকারী-জমি আর অর্থ সাহায্য পেয়ে ওরা দু'ভাই আগেই উদ্বাস্তু উপনিবেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে।

কিন্তু আমি পারিনি।

পূর্বপুরুষের ভিটে-মাটির গৌরব আর মোহ-সংস্কার নিয়ে স্বামী-স্ত্রীতে পড়ে রইলুম আমার পঞ্চাশবছর জীবনের বাস্তুভূমিতে।...

কোলকাতা থেকে ছেলেরা অবশ্য অনেক অনুনয়, অনুরোধ করেছে চলে আসতে, কিন্তু আমাদের টলাতে পারেনি।...

কিন্তু সেই আসাই আসতে হলো একদিন,—রাজনৈতিক কুচক্রীর মারে।
আর এসেও সেই মারই খেতে হোলো,—যাকে বলা চলে ভাত-কাপড়ের মার।...

তারপর যে-বিপদ ঘটলো!

সামনে প্রথম নাতির অন্নপ্রাশন।

বড় ছেলের ইচ্ছা কিছু ঘটাপটা হয়। নিমন্ত্রণ-ও করলো বেশ কয়েকজনকে।

মানে, কমকরেও শতখানেক ত বটে! লুচি মাছ-মাংসের ব্যবস্থা!

কিন্তু রেশনিঙে গম যা' মেলে, নিজেদেরি পনেরো দিন চলে না। তার উপর এত লোকের খাদ্যব্যবস্থা।

পরামর্শ চললো।

শেষে ঠিক হোলা, ওয়ার্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে সমস্ত বিষয় লিখে জানিয়ে যদি কিছু করা যায়। কারণ, এ'সব ব্যাপারে প্রেসিডেন্টের হাত থাকে নাকি যথেষ্ট।

আমার সই দিয়ে চিঠি আমিই লিখলাম।

বড় ছেলে কমলেশ গিয়ে প্রেসিডেন্টের হাতে দিয়ে এলো।

ধরে রাখলাম, এ'হবে না। শুনেছি প্রেসিডেন্ট লোকটি নাকি কড়া।
কমলেশ ঘুরেও এলো একবার ডায়মণ্ডহারবার। যদি চালের কিছু সুরাহা হয়। কিন্তু ফিরে আসতে হোলো মুখ অন্ধকার ক'রে।...আরো কয়েক যায়গায় খোঁজ নিলে কমলেশ। কিন্তু কাকস্য...

প্রেসিডেন্টের কাছ থেকেও কোন জবাব নেই—

এখন মাথায় হাত দিয়ে বসার দাখিল।

তবে কি বাতিল করে দেবে অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা?

সেদিন খেয়ে-দেয়ে শুতে-শুতে রাত বাজলো সাড়ে এগারোটা।

প্রত্যাসন্ন ব্যাপারের আলোচনা ও দুশ্চিন্তায় সকলের মন ভারাক্রান্ত।

উদ্বাস্তু-উপনিবেশের বুকে নেমে এসেছে নিস্তব্ধ রাত্রির ঘন সুষুপ্তি।

আর্তনাদের মত দু'একটি কুকুরের ডাক স্তব্ধতাকে বিদীর্ণ করে দিচ্ছে।

সহসা বাইরের দরজার কড়া বেজে উঠলো ঘন ঘন।

বিরক্ত করতে এতরাতে কে আবার?

ঘর থেকে কমলেশই সাড়া দিয়ে বললো: কে?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এলো:-আজ্ঞে আমি শ্রীধর। একবার বাইরে আসুন।

কমলেশ দ্রুত বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে গেল, বুঝলাম।

কয়েকমুহূর্ত পর শ্রীধরের গলা শুনতে পেলাম আবার: ছোটবাবু এক চিঠি দিয়েছেন আপনাকে। আর...বললেন, কাল একবার দেখা করতে আসবেন এখানে। আর অপনার নাকি কি ব্যাপার আছে বাড়ীতে ...তাই জিনিষ পাঠিয়ে দিলেন। ওই ধরুন গে—

পরক্ষণেই একটি পতনশীল বস্তুর ভারী শব্দ পেলাম।

কমলেশের জবাব পেলাম না।

কিন্তু কি জিনিষ পাঠালেন ছোটবাবু, তাই দেখতে উঠতে হোলো আমাকে।

হ্যাঁ একবস্তা গম। একবস্তা গমই পাঠিয়েছেন ছোটবাবু। ছোটবাবু মানে সমিতির সেক্রেটারী।

সেক্রেটারীর নাম কান্তিলাল ঘোষ।

নাম শুনে প্রথম খুব চমকে উঠেছিলাম। খু পরিচিত নাম। কিন্তু কোথায় শুনেছি, কিছুই মনে করতে পারলুম না।

পরদিন বিকালের দিকে কিছু ব্যস্ত ছিলাম বাজারের ফর্দলেখার কাজে।

বাইরের বারান্দায় বসে কাজ হচ্ছে, পাশে আমা স্ত্রী বসে সাহায্য করছেন। কমলেশ দাঁড়িয়ে আ সামনে।

এমন সময় একজন মধ্যবয়সী গোলগাল চেহারার ভদ্রলোক, 'কমলেশবাবু আছেন নাকি ?

বলে সোজা আমাদের বারান্দায় উঠে এলো।

যুগপৎ সকলে তাকালুম।

আর দেখেই চিনতে পারলুম। কারণ, যারা আমার জীবনে একবার আসে, তাদের ভুলতে সহজে পারিনে।

কমলেশ সানন্দে বলে উঠলো : এই যে আসুন কান্তিলালদা, কি সৌভাগ্য...

সৌভাগ্যের কথা বলে আর লজ্জা দিয়োনা ভাই, বলেই একবার লজ্জিতভাবে আমার দিকে তাকাল। তারপর সোজা আমার পায়ে প্রণাম করে বললো : মাফ করবেন কাকাবাবু এতদিন এসেছেন, আপনার সঙ্গে দেখা করতেপারিনি —

গিন্নী উঠে ভিতরে চলে গেল।

কমলেশ একটা জলচৌকি এগিয়ে দিয়ে বললো : বসুন কান্তিলালদা। আপনাকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেব—! আমি ত সবআশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম।

কান্তিলাল শুধু সহাস্যে বললো : আন্দাজে তোমাদের ভুল ছিল ভাই।...তা যাকগে, বাচ্চাটাকে একবার আনত ভাই, দেখে যাই।

: তা আনছি। কিন্তু দেখেই যেতে পাবেন না,— বলতে বলতে কমলেশ উঠে গেল।

সে উঠে যেতে আমি একটু কেশে জিজ্ঞেসে করলুম : কান্তিলাল এদিকে কবে এসেছ তাহলে ?

: তা' আজ্ঞে, পাকিস্থান হবার পরেই। ঐবছরই জেল থেকে খালাস পেলুম কিনা !—বলে কান্তিলাল একমুহূর্ত চুপ করে রইলো, তারপর বললে গম্ভীরভাবে : আপনার ক্ষমতার তুলনা নেই কাকাবাবু। আপনি অসাধ্য-সাধন করেছেন। তাইত অল্পের উপরেই গেল।

: ভগবানও প্রসন্ন ছিলেন তখন তোমার উপর ; দু'দুটো মারাত্মক 'কেসে' তিনবছর কিছুই নয়, বলে আমি হাসলুম

: আজ্ঞে অনেক খরচও হ'য়ে গেল তা'তে—অন্তত হাজার দশেক,—অনিচ্ছাসত্বে বললো কান্তিলাল।

এ'সময় খোকাকে কোলে নিয়ে এলো কমলেশ। সুতরাং একথা আর বলা হোলো না যে, বৃন্দাবন সাহার জুটমিলের সুপারভাইজার-কাম-ক্যাসিয়ার হ'য়ে তুমি যে পরিমাণ টাকা তহবিল-তছরূপ করেছ কান্তিলাল, তা'তে হাজার দশেক কিছুই নয়। বাদীপক্ষের নালিশ ছিল প্রায় লাখটাকার মত। বিবাদীপক্ষের উকিল হয়ে এই নালিশকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে কম বেগ পেতে হয়নি আমাকে। কান্তিলালের পার্টনার ছিল একজন। তাকেও গ্রেপ্তার করা হ'য়েছিল। তার উকিল ছিল আরেকজন। এই উকিলের একটা ভুল সওয়ালের জন্যে মোকদ্দমার মোড় ঘুরে গেল। সবদোষ এসে পড়লো এই পার্টনারের ঘাড়ে। সাতবছরের সশ্রম কারাদণ্ড হ'য়ে গেল তার। কান্তিলালেরও হল—বছর তিনেকের মত।

খোকা আসতে তাকে একটু আদর করলে কান্তিলাল।

তারপর এক কাণ্ড করলো। ছোট একটা চিক্‌চিকে সোনার হার বের করে খোকার গলায় পরিয়ে দিলে।

একেবারে অপ্রত্যাশিত।

হাঁ-হাঁ করে উঠলো কমলেশ।

কান্তিলাল একটু হাসলো। শেষে বললো : আমরা ত সমাজের বাইরের লোক নই, কমলেশবাবু এসব করতে হয়। তা বাদে—আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বললে আবার কান্তিলাল : তা বাদে খোকাটি যে আমার উকিলবাবুর একমাত্র পৌত্র।... আচ্ছা, আমি এখন উঠি তাহলে—

বৌমা এক প্লেট খাবার নিয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল,—কমলেশ ছুটে গিয়ে নিয়ে এসে কান্তিলালের হাতে ধরিয়ে দিল।

কান্তিলাল একমুহূর্ত খাবারের থালার দিকে তাকিয়ে থেকে বললে : সবই ভাল জিনিষ। কিন্তু আমি ত খেতে পারবো না কমলেশবাবু, আজ আমার শনিবারের উপোষ কিনা ! রাতে ফলটল কিছু খাই—

মনক্ষুণ্ণতার ছায়া পড়লো কমলেশের মুখে। কি আর বলে? শেষে বললো, বেশ, তাহলে বলুন কাল সময়মত একবার আসবেন?

কান্তিলাল খাবারের থালা নামিয়ে রাখলো। তারপর দাঁড়িয়ে উঠে কি ভেবে বললে: কথা দিতে পারছি না, কমলেশবাবু। সময় করে যদি উঠতে পারি নিশ্চয়ই আসবো। আমার পা ছুঁয়ে আবার প্রণাম করে অপেক্ষা করলো না কান্তিলাল—সোজা উঠানে নেমে গেল।···

না, কান্তিলাল আর আসেনি।

শুনলাম সে ভীষণ কাজের মানুষ। গুড়ের আড়ত ছাড়াও বাজারের মধ্যে সবচেয়ে সেরা তার স্টেসনারী দোকান। বড় যে-কোন সহরের দোকানের সঙ্গে সে পাল্লা দেয়। আপ-টু-ডেট স্টক। একটা কাটা কাপড়ের দোকান আর আটা-ভাঙ্গা কলও আছে। তাবাদে সেক্রেটারী। কত কাজ তার।

তবু ক্ষুণ্ণই হ'য়েছিল কমলেশ। তার ধারণা, ইচ্ছা করলেই আসতে পারতো কান্তিলাল।

কিন্তু আমি ভাবছিলাম, শেষপর্যন্ত কান্তিলাল চুরির টাকাটা বেমালুম পাচার করে ফেলে আখেরে বেশ গুছিয়ে নিতে পেরেছে এখানে।

আশ্চর্য!

আরো আশ্চর্য যে, ওয়ার্ড সমিতির সেক্রেটারী হ'য়েও এখানে আবার সে বাহালতবিয়তে চৌর্যবৃত্তি করে চলেছে কান্তিলাল,—যেখানে সরকারী আইন সহজে বাঁধতে পরেবে না তাকে।

পুরাণ ও আয়ুর্বেদে সর্পদংশন চিকিৎসার মূল্যায়

অবনীভূষণ ঘোষ

পৃথিবীর বুকে মানুষের পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গেই বোধহয় সাপ সম্বন্ধে তার আগ্রহ। স্বভাবতঃই সাপের চেয়ে সর্পাঘাত নিয়ে—সাপে কাটার চিকিৎসা নিয়েই মানুষ বেশী বিব্রত হয়ে পড়েছিল। আত্মরক্ষার্থেই ত জ্ঞানের আরম্ভ।

সর্প-দংশন চিকিৎসার তিনটি দিক উল্লেখ্য: ওষুধ প্রয়োগে রক্তে প্রবিষ্ট বিষকে নিষ্ক্রিয় করার চিকিৎসা, রক্তমোক্ষণের সঙ্গে যথাসম্ভব বিষ বের ক'রে নেওয়ার চিকিৎসা, প্রবিষ্ট বিষজনিত দৈহিক অসুস্থতার চিকিৎসা। রক্তে প্রবিষ্ট বিষকে নিষ্ক্রিয় করতে হলে নিরোধক ওষুধকে সরাসরি রক্তের সঙ্গে মেশা দরকার; মুখ দিয়ে গৃহীত কোন ওষুধ এ-ব্যাপারে কার্যকর না হওয়ার সম্ভাবনা; কারণ মুখ দিয়ে গিয়ে সে ওষুধ রক্তে মেশার আগেই সাপের বিষ তার কার্য সাধন করবে। প্রাচীন আয়ুর্বেদে অবশ্য রক্তের সঙ্গে মিশ্রিত বিষকে নিষ্ক্রিয় করার উদ্দেশে মুখ দিয়ে খাওয়ার বহু ওষুধের কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া তাদের উপায় বা কি ছিল? রক্তে প্রবিষ্ট বিষ-নিরোধক ওষুধ সরাসরি রক্তে প্রবিষ্ট করার পন্থা—ইনজেকশন প্রথা এই তো সেদিন চালু হয়েছে। তবে কোন কোন ওষুধ ক্ষতস্থানে প্রলেপ দেওয়ারও কথা আয়ুর্বেদকার বলেছেন—ক্ষতস্থান দগ্ধ ক'রে দেয়ারও কথা বলেছেন! বর্তম

যুগেও ইনজেকশন আবিষ্কারের আগে ক্ষতস্থানে কোন কোন ওষুধ লাগিয়ে সাপের বিষ নষ্টকরার প্রয়াস হ'ত। এখানে অবশ্য বলা আবশ্যক, আয়ুর্বেদোক্ত বহু গাছ-গাছড়া নিয়ে বীক্ষণাগারে পরীক্ষা করা হয়েছে, তাদের সাপের বিষ-নিরোধক ক্ষমতা নেই বলে প্রতিপন্ন হয়েছে।

রক্তের সঙ্গে বিষ বের ক'রে নেওয়ার চিকিৎসায় আয়ুর্বেদকার খুবই সচেতন। রক্তের সঙ্গে সাপের বিষ দেহের যে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, আয়ুর্বেদকারের সে ধারণা ছিল। সুশ্রুত বলছেন: "সাপে দংশন করলে সেই বিষ প্রহৃত স্থান থেকে সারা দেহে ব্যেপে শেষে স্বভাবতঃই অংসদ্বয়ে গিয়ে অবস্থান করে'। চরকের মতে অবশ্য সাপ দংশন করলে বিষ মৃতব্যক্তির দংশস্থানে অবস্থান করে। যাহোক, তাগাবন্ধন এবং রক্তমোক্ষণের (চুষে বা ক্ষতস্থান কেটে) কথা আয়ুর্বেদকার বলেছেন। বস্তুতঃ এছাড়া প্রাচীনকালে সাপের বিষের আর কোন কার্যকর চিকিৎসাই ছিল না। আয়ুর্বেদকারও বলেছেন: 'রক্তমোক্ষণই সর্প-দংশনের উৎকৃষ্ট চিকিৎসা'। সর্পদষ্ট রোগীকে বমিকারক ওষুধ খাইয়ে বমন করিয়ে দেহে প্রবিষ্ট বিষ বের ক'রে নেওয়ার নির্দেশও আয়ুর্বেদকার দিয়েছেন। মুখ দিয়ে গৃহীত কোন কোন বিষ থেকে সাপের বিষের পার্থক্যের অজ্ঞতাই এতে সূচিত হচ্ছে।

রক্তমোক্ষণ প্রসঙ্গে আয়ুর্বেদকার নির্ধারিত একটি প্রক্রিয়ার উল্লেখ করব যা কার্যকর না হলেও বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারার ইঙ্গিত করে। সম্প্রতি সর্পদষ্ট রোগীর দেহস্থ বিষরক্ত বের ক'রে নিয়ে সফলতার সঙ্গে তার দেহে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবেশ করানর যে পন্থা অবলম্বিত হয়েছে, এই প্রক্রিয়ার যেন তারই আভাস পাই।

রোগীকে যখন আর কোনক্রমে বাঁচান সম্ভব হচ্ছেনা, আয়ুর্বেদকার তখন নির্দেশ দিয়েছেন: 'তীক্ষ্ণ শস্ত্র দিয়ে রোগীর মাথায় কাকপদাকার ক্ষত ক'রে সরক্ত মাংস ক্ষেপণ করবে'। সাপবেদেরা সর্পক্ষত স্থানে মুরগী বা পায়রা বসিয়ে বিষরক্ত টেনে নেওয়ার ভ্রান্ত প্রয়াস করে। আয়ুর্বেদোক্ত ক্ষতস্থানে সরক্ত মাংস স্থাপনের সঙ্গে অনেকে সাপবেদের এই প্রক্রিয়ার সমতুল্য করেন। আমার বুদ্ধিতে এ ঠিক নয়। মাথায় ক্ষত ক'রে টাটকা রক্তমিশ্রিত মাংস স্থাপন করার মধ্যে বিষরক্ত বের ক'রে দেহে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবেশ করানর চিন্তাই লুকিয়েছিল ব'লে মনে হয়।

সব বিষধর সাপেই দংশন করলে একইরূপ বিষলক্ষণ প্রকাশ পায় না। বিভিন্ন ধরনের সাপের দংশনের বিষ-লক্ষণ বিভিন্ন। প্রাচীন আয়ুর্বেদকারও তা লক্ষ্য করেছিলেন। একথা ভাবলে চমৎকৃত হতে হয়। তাঁদের মতে বিষধর সাপ তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত: দর্বীকর (গোখরো কেউটে আদি চক্রধর প্রজাতির সমতুল্য), মণ্ডলী (চন্দ্রবোড়া-আদি বোড়াগণের সমতুল্য) ও রাজিমৎ (কালাচ শাঁখামুটি-আদি করেতগণ, প্রবালগণ ও সামুদ্র সাপের সমতুল্য)। তাঁরা এই তিন ধরনের সাপের 'বিষ-লক্ষণের পরিচয়ও দিয়েছেন— যদিও এ বর্ণনা আয়ুর্বেদের ত্রিদোষ-সূত্র দ্বারা দুষ্ট। প্রাচীন আয়ুর্বেদকারের মতে দর্বীকর, মণ্ডলী রাজিমৎ সাপের বিষ যথাক্রমে বাত, পিত্ত ও কফকে প্রকুপিত করে।

সুশ্রুত বলেছেন: 'দর্বীকরের বিষ শীঘ্রই প্রাণনাশ করে।' মণ্ডলীর বিষ প্রতিক্রিয়ার তুলনায় আয়ুর্বেদকারের এ কথা যথার্থ।

রক্তে বিষ মিশে যাওয়ায় যেসব দৈহিক অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়, আয়ুর্বেদকার তার যে চিকিৎসার কথা বলেছেন, এবারে তা নিয়ে আলোচনা করছি। বোঝার সুবিধার জন্যে বিভিন্ন বিষধর সাপের দংশনজনিত কয়েকটি লক্ষণ বলা দরকার। গোখরো কেউটে-আদি চক্রধরের বিষ প্রধানতঃ নার্ভের উপর কাজ করে, ঘাড়ের পেশী বিকল হয়ে পড়ায় মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে, চোখের পাতা বুজে আসে, শ্বাসগ্রহণে কষ্ট হয়, মৃত্যুর পূর্ব অবধি জ্ঞান থাকে। চন্দ্রবোড়াআদি বোড়ার বিষ প্রধানতঃ রক্তের উপর কাজ করে, শেষপর্যন্ত রোগী জ্ঞান হারায়। এসব লক্ষণ আয়ুর্বেদকারের চোখ এড়ায়

নি ; তাঁদের বুদ্ধিমত ওষুধেরও (যদিও অকার্যকর) ব্যবস্থা দিয়েছেন। রোগীর 'নেত্রারিকা' ঘটলে চোখে তীক্ষ্ণ অঞ্জন এবং মস্তকের গুরুতা দেখা দিলে নাকে তীক্ষ্ণ নস্য দেওয়ার কথা বলেছেন। অঞ্জনে চোখে আগত বিষ নষ্ট হয়ে যাবে ; নস্যদানে মাথায় আগত বিষ শ্লেষ্মার সঙ্গে বেরিয়ে আসবে। বস্তুতঃ অঞ্জন ও নস্যের সাহায্যে রোগীর সাড়া জাগিয়ে রাখা অথবা সাড়া আনার প্রয়াসই করা হ'ত ব'লে মনে হয়। এই একই কারণে রোগীর পাশে অগদ-প্রলিপ্ত দুন্দুভি বাজাতেও বলা হয়েছে।

আয়ুর্বেদকার সর্পবিষের সাতটি বেগের কল্পনা করেছেন। বেগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিষ লক্ষণও প্রকট হতে থাকে। প্রাচীন আয়ুর্বেদকারের মতে মানব-দেহ রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র—এই সপ্ত ধাতু দিয়ে তৈরী। বিষের সাতটি বেগের কল্পনা মোটামুটিভাবে এই ধারণার উপরই গ'ড়ে উঠেছে।

মন্ত্রশক্তির উপর ভ্রান্ত নির্ভরতা আয়ুর্বেদকারকেও প্রভাবিত করেছে : 'তেজোময় সত্যব্রহ্মতপোময় মন্ত্র সকল দিয়ে বিষ যেমন শীঘ্র নিবারিত হয়, প্রযুক্ত ওষুধ সকল দিয়ে সেরকম হয় না।' মন্ত্রশক্তি সর্বোচ্চ—এরূপ উল্লেখ থাকলেও সমগ্রভাবে বিচার করলে সর্প-দংশন চিকিৎসায় আয়ুর্বেদকার মন্ত্রকে মোটেই গুরুত্ব দেননি। অগ্নিপুরাণে মন্ত্রের দ্বারা সর্প দংশনের চিকিৎসার উপর খুবই জোর দেওয়া হয়েছে। গরুড়পুরাণে এই গুরুত্ব আরও অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। গরুড়পুরাণে আভিচারিক ক্রিয়াকলাপও ব্যাপকভাবে স্থান পেয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত দিই। গরুড়পুরাণকার বলেছেন 'ভালুকের দাঁত দিয়ে গরুড়ের প্রতিমূর্তি গ'ড়ে ধারণ করলে সারা জীবন তাকে আর সাপে দংশন করতে পারে না।' আয়ুর্বেদেও এমন কোন কোন তীব্র ক্ষমতাসম্পন্ন ওষুধের কথা বলা হয়েছে যা কোনস্থানে থাকলে সেখানে সাপ প্রবেশ করতে পারে না। ওষুধবিশেষ গায়ে মেখে নির্ভয়ে সাপ ধরতে পারা যায় ব'লেও চরক মত প্রকাশ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না, সাপকে বশীভূত করার বা তাড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ব'লে প্রচলিত ঈশেরমূল আদি কয়েকটি মূল নিয়ে পরীক্ষা ক'রে দেখেছি, কোন বিষধর সাপ তাদের গন্ধে বা সংস্পর্শে বশীভূত হয়নি অথবা পালিয়েও যায়নি।

আয়ুর্বেদকার বলছেন 'সদ্যোজীবন-নাশক সাপ দংশন করলে সে ব্যক্তি তখনই মাটিতে ঢুলে পড়ে, অঙ্গসব শিথিল হয় এবং সংজ্ঞাশূন্য হয়ে নিদ্রাগত হয়।' এ ধারণা বিভ্রান্তকর। সর্প-দংশনের সঙ্গে সঙ্গে কোন ব্যক্তি মাটিতে ঢুলে পড়লে ধ'রে নেওয়া যেতে পারে অত্যধিক ভয়বশতঃ তার ঐ অবস্থা হয়েছে বিষজনিত নয়।

মানুষ তো বটে—পাখি, ছাগল, ভেড়া, গরু, মোষ, ঘোড়া, হাতি, উটকেও সাপে দংশন করলে তার চিকিৎসার কথা আয়ুর্বেদকার বলেছেন। জন্তু-জানোয়ার সম্বন্ধেও প্রাচীন আয়ুর্বেদকার যে কিরূপ সচেতন ছিলেন, তা লক্ষণীয়।

বস্তুতঃ বর্তমান ইনজেকশন-প্রথা চালু হওয়ার আগে প্রকৃত সর্প-দংশনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিষধর সাপের দংশনে দেহে মারাত্মক পরিমাণের বিষ ঢুকেছে সেক্ষেত্রে বন্ধন ও রক্তমোক্ষণ ছাড়া আর কোন কার্যকর চিকিৎসা-পন্থা ছিল না। আয়ুর্বেদকার এই পন্থা জানতেন এবং সেভাবে ব্যবস্থা দিয়েছেন। আর যেসব ওষুধ ও প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে তার কোনটা যদি বা কার্যকর মনে করা হয়ে থাকে তা সেক্ষেত্রেই হয়েছে যেক্ষেত্রে রোগীকে আদৌ সাপে দংশন করেনি কিন্তু সে ভেবেছে তাকে সাপে দংশন করেছে অথবা তাকে বিষহীন সাপে দংশন করেছে অথবা বিষধর সাপে দংশন করলেও দেহে মারাত্মক পরিমাণের বিষ বা আদৌ বিষ ঢোকেনি। শুধু ভয়ে আতঙ্কে দেহে এমনসব লক্ষণ প্রকাশ পেতে পারে যা দেহে প্রবিষ্ট বিষজনিত লক্ষণের মত প্রতীয়মান হয়। বিস্ময় ও আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয়, প্রাচীন আয়ুর্বেদকারের চোখেও এ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা ধরা পড়েছিল। এ অবস্থাকে সুশ্রুত 'সর্পাঙ্গাভিহত' বলেছেন; চরক আখ্যা দিয়েছেন 'শঙ্কাবিষ'।

চরক বলছেন: 'গাঢ় অন্ধকারে কোন প্রাণী—এমন কি বিষহীন প্রাণী দংশন করলেও বিষশঙ্কা উপস্থিত হয় এবং সেই বিষের বেগে জ্বর, বমি, মূর্চ্ছা, দাহ, গ্লানি, মোহ বা অতিসারও জন্মে। একে শঙ্কাবিষ বলা হয়। এই অবস্থায় চিকিৎসার্থে চরক দুর্বলতা-প্রশমক কোন কোন দ্রব্য সেবন এবং জল প্রেক্ষণের কথা বলেছেন। কিন্তু বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন রোগীকে আশ্বাসজনক ও হর্ষজনক বাক্য কথনের উপর। প্রায় দু' হাজার বছর পরে আজকের চিকিৎসকও এরূপক্ষেত্রে দ্বিধাহীনচিত্তে অনুরূপ নির্দেশ দেবেন।

বিষধর সাপে দংশন করলেই যে দেহে মৃত্যুকারক বিষ ঢোকে না, এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটিও আয়ুর্বেদকার লক্ষ্য করেছিলেন। বিষধর সাপের দংশনকে তাঁরা তিন ভাগে ভাগ করেছেন: সর্পিত, রদিত ও অবিষ। মৃত্যুকারক বা প্রায় সেই পরিমাণ বিষা দেহে ঢুকলে সর্পিত, অল্প পরিমাণ বিষ ঢুকলে রদিত এবং বিষ আদৌ ঢুকতে না পারলে বা খুব সামান্য বিষ ঢুকলে অবিষ দংশন বলা হয়েছে। এই তিনপ্রকার দংশনের ক্ষতস্থানের স্থানীয় লক্ষণও তাঁরা উল্লেখ করেছেন।

আয়ুর্বেদকারের সর্পিত, রদিত, অবিষ ও সর্পাঙ্গাভিহতের মত পুরাণকারও চারপ্রকার সর্প-দংশনের কথা বলেছেন: দষ্টবদ্ধ, খণ্ডিত, অদংশ ও অবতপ্ত। 'অগ্নিপুরাণকার অভিমত প্রকাশ করেছেন: 'সবেগে দংশন সবিষ, এমন কি সাপ এরূপ দংশন করে নিজে নির্বিষ হয়। ...এক দুই বা বহু দংশন চিহ্ন দেখা যায়। রাত্রিকালে একপদ বা কূর্মাকৃতি দংশন মৃত্যু-প্রেরিত জানবে'।

আয়ুর্বেদকার বলছেন: 'নকুলাকুলিত সাপ, বাচ্চা সাপ, জলবিপ্রহত সাপ, কৃশ সাপ, বুড়ো সাপ, মাত্র খোলস ছেড়েছে এমন সাপ ও ভীত সাপ অল্পবিষ হয়ে থাকে'। এই উক্তিতে একভাবে বা অন্যভাবে সত্য যে লুকিয়ে আছে, তা বোধ হয় বলা বাহুল্য।

বিষধর সাপ ঠিকমত দংশন করলে তখনকার কালে অনেকক্ষেত্রে সে ব্যক্তিকে কোন চিকিৎসাতেই যে বাঁচান যেত না, আয়ুর্বেদকার প্রকারান্তরে তা স্বীকার করে গেছেন। আয়ুর্বেদকার বলছেন: 'অশ্বত্থ গাছের তলায় দেবতার জায়গায়, শ্মশানে, উইঢিপির কাছে, সন্ধ্যায়, চৌরাস্তায়, ভরণী ও মঘা নক্ষত্রে এবং মর্মস্থানে সাপ কোন ব্যক্তিকে দংশন করলে তাকে ত্যাগ করবে'। রোগীর লক্ষণ দেখেও সর্পদষ্ট ব্যক্তিকে ত্যাগ করতে বলা হয়েছে। সুশ্রুত বলেছেন: 'সর্পদষ্ট ব্যক্তির দেহে শস্ত্রাঘাত করলে যদি রক্ত বের না হয়, লতা দিয়ে আঘাত করলে যদি গায়ে দাগ না পড়ে, ঠাণ্ডা জলের পরিষেক করলে যদি রোমাঞ্চ না হয়, তবে সর্পাহত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ করবে। যে সর্পদষ্ট ব্যক্তির জিভ সাদা রঙের হয়, টানলে চুল যদি উপড়ে আসে, নাক ভেঙে পড়ে, ঘাড় ঝুলে পড়ে, চোয়াল বন্ধ হয়ে যায়, তাকে পরিত্যাগ করবে'। চরক বলছেন, 'ওষ্ঠের নীলিমা, দাঁতের শিথিলতা, কেশ আকর্ষণে কেশ পতন, শৈত্য প্রয়োগেও রোমাঞ্চ না হওয়া, আঘাতেও গায়ে দাগ না পড়া, অস্ত্রাদির আঘাতেও ক্ষতস্থান থেকে রক্ত বের না হওয়া ইত্যাদি লক্ষণ দেখা দিলে বিষাদিত ব্যক্তির মরণ নিশ্চিত।

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ স্মরণে

শ্রীকালীপদ ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধাভরে তব নামে দিয়েঅর্ঘ্য রাজি
নত শিরে তোমারে প্রণাম করি আজি
দীনবন্ধু, হে বন্ধু এণ্ডরুজ! ধরণীতে
ঈশ্বর-মহিমাধন্য প্রেমস্পর্শ দিতে
এসেছিলে স্বর্গ হতে; এশিয়া যাঁহার
প্রথম পরশধন্য, জ্ঞান-বর্তিকার
উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ধ্রুব—সে যীশুখৃষ্টের
শুভ্র ভাবমূর্তি লয়ে।—তাই বৃটেনের
আভিজাত্য, অহঙ্কার, বর্ণবিদ্বেষের
ছিল না বিকৃতরূপ মর্মমাঝে তব।
উদার, সরল চিত্ত, সৌম্য, অভিনব
উজ্জ্বল মূরতি সদা শান্ত ক্ষমাময়;
বিংশ শতাব্দীর বুকে বিপুল বিস্ময়,
নবাগত দেবদূত! ভারত জননী
তোমারে বরিয়া তাই লইল অমনি
পুণ্য স্পর্শ, ধান্য দূর্বা দিয়ে। তুমি তাঁরে
আজীবন প্রণাম করেছ বারে বারে
স্বদেশমাতৃকা সম। জালিওয়ানা বাগে
ভারত রঞ্জিল যবে ক্ষতরক্ত-রাগে
বৃটিশের কলঙ্কিত আগ্নেয়াস্ত্র-মুখে;
কী গভীর বেদনায়, কী দারুণ দুখে
ব্যাকুল দেখেছি তোমা! খৃষ্টানের হয়ে
একা সে কলঙ্কভার নিজ শিরে লয়ে
ফিরিয়াছ দ্বারে দ্বারে ক্ষমা প্রার্থনায়—
যেন সে তোমারি ব্যথা, তোমারি সে দায়
অন্যায়ের প্রতিবাদ উদ্ধত বৃটিশ
অন্তহীন ধরণীর উন্মত্ত পৃথ্বীশ
বুঝিল না সে মহিমা। অবহেলাভরে
বন্ধু, তব মৃত্যুহীন মরণের পরে
স্বজাতি-সমাধি পার্শ্বে নাহি দিল ঠাঁই।
আজি তার জয়ধ্বজা, রাজ-ছত্র নাই
নভশ্চুম্বী, বিশ্বব্যাপী; উদ্ধত গরিমা
স্বদেহের শুভ্রতার কল্পিত মহিমা
শ্বেত কৃষ্ণ বর্ণ ভেদে। কেহ নাহি স্মরে
মসীলিপ্ত সেই স্মৃতি। কিন্তু শ্রদ্ধাভরে
উদার, মানবপ্রেমী, নির্লিপ্ত-নিষ্কাম
দরিদ্র-দয়িতরূপে বন্ধু, তব নাম
স্মরিছে ভারতবাসী কৃতজ্ঞ অন্তরে—
জন্মের মুহূর্ত হতে শতবর্ষপরে
সাজাইয়া ভক্তি-অর্ঘ্য। আমি জোড় হাতে
প্রণাম জানাই মোর তাঁহাদের সাথে।

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ : শতাব্দী প্রণাম

শান্তশীল দাশ

প্রতীচ্যের বুক হতে চলে এলে প্রতীচীর বুকে,
অনাবিল প্রেম নিয়ে, সেই প্রেম বলিষ্ঠ সুন্দর;
অনেক আঘাত দিয়ে, যে-বেদনা সৃষ্টি করেছিল
তোমার স্বদেশবাসী—প্রায়শ্চিত্ত করে গেলে তার।
ওই জীবনের পানে চেয়ে কী বিস্ময় জাগে মনে!
জ্ঞানালোকে উদ্‌ভাসিত, ত্যাগপূত, প্রসন্ন উদার;
নিপীড়িত মানুষের বেদনায় কত না কাতর,
সেবাস্নিগ্ধ দুটি কর নিরলস সে ব্যথা মোচনে।
কর্মযজ্ঞে আত্মলীন, শুভব্রত জীবনসাধনা,
তুলে নিলে কী সহজে এদেশের দীনসেবা ভার;
আর সেই সেবাকার্যে সদারত দিবসে নিশীথে,
সন্ন্যাসের আবরনে জীবহিতে দীক্ষিতে অন্তর।
তুমি যে ভারতবন্ধু, প্রতীচীর একান্ত আপন,
তারও চেয়ে বড়ো তুমি, তুমি বন্ধু দীন দুর্গতের;
তাই তো সার্থকনাম 'দীনবন্ধু' দিল প্রিয়জনে,
এমন দীনের বন্ধু চোখে কই পড়েনা তো আর।
শতাব্দীপূর্তিতে আজ কত জন জানায় প্রণতি;
ও শুভ জীবনখানি চিরদীপ্ত ভারত-অন্তরে;
সবার প্রণতি সাথে শ্রদ্ধানত অন্তরে আমার
প্রণামের অর্ঘ্যখানি রেখে ধন্য হই ও চরণে।

মরণ তোমারে নমস্কার

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

আমরা ইংরাজিতে পড়িয়াছি cruel hands of death. কিন্তু উপনিষদে দেখি যমরাজ নচিকেতাকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন, আরও অনেক বর প্রদান করিয়াছিলেন। আমরা তর্পণ করিবার সময় "যমায় ধর্মরাজায়" বলিয়া তিনবার জলাঞ্জলি প্রদান করি, প্রত্যহ ত্রিসন্ধ্যায় "ওঁ নমো মৃত্যবে" বলিয়া তিনবার জল উৎসর্গ করি।

এই কবিতাতে মৃত্যুর করুণাময় ভাব দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে।

(১)

মরণ তোমারে নমস্কার!
যারে লহ তার দোষ দাও মুছাইয়া
অপরূপ মহিমায় দাও জড়াইয়া
অতিপ্রিয় কর—সবাকার।

(২)

তুমি যাহাদের প্রাণ হর—
অনন্ত করুণাময় জ্ঞানময় হরি
তাঁহার আদেশ যাহা তাহা হৃদে ধরি
সেইমত তুমি কর্ম কর।

(৩)

আমরা অজ্ঞান অতিশয়,
ঈশ্বর আদেশ কিবা জানিতে না পাই,
যাদের না দেখি মোরা ভাবি তারা নাই
মূর্খ মোরা পাই শোক ভয়।

(৪)

ইহ পরলোক দুই দেশ
স্বর্ণসূত্র দিয়া তুমি কর হে বন্ধন
"করিবে মৃতের তরে শ্রদ্ধা ও তর্পণ"
জানাইয়া দাও এ আদেশ।

(৫)

মোরা কেহ হেথা চিরকাল
না থাকিব, বুঝাইয়া দাও সর্বজনে'
"ছাড়ি পাপ পুণ্যকর্ম কর সর্বক্ষণে"
দাও শিক্ষা তুমি হে দয়াল।

(৬)

এ জগৎ মাত্র নহে সার—
এ জগৎ হোতে শ্রেষ্ঠ আছে বহু লোক
পুণ্যবান সেথা থাকি করে সুখ ভোগ
তুমি গুরু, এ শিক্ষা তোমার।

(৭)

মোরা হেথা সুখ আশা করি
তুমি আসি শিক্ষা দাও—"দুঃখময় ধরা,
অতীত পাপের ফলে দুঃখ পাই মোরা,
সুখ শুধু পাইলে শ্রীহরি"।

(৮)

সকলের দর্প চূর্ণ কর
তুমি যবে কাছে আস—রাজা মহারাজ
ভূমিতে লুটায়ে পড়ে ছাড়ি রাজসাজ
দর্প হরি মঙ্গল বিতর।

(৯)

ঘোররূপ দেখিয়া তোমার
পাপ করিবার স্পৃহা দূরে চলি যায়
ক্ষয় কর বহু পাপ মৃত্যু যন্ত্রণায়
এইভাবে কর উপকার।

(১০)

শোক মাঝে নাহি শান্তি যার
হাহাকার করি শেষে ডাকে ভগবানে
ভগবান কৃপা দান করেন সে জনে
ইহাও ত কল্পনা তোমার,
মরণ তোমারে নমস্কার।

প্রাচীন ভারতের করনীতি

ডঃ অনিলচন্দ্র বসু

মহাকবি কালিদাস তাঁর রঘুবংশমহাকাব্যে বলেছেন, সূর্য যেমন নিদাঘে পৃথিবী থেকে রসগ্রহণ করে বর্ষাকালে সহস্রগুণ বর্ষনের দ্বারা ধরণীর অশেষ কল্যাণসাধন করেন, রাজাও ঠিক তেমনি প্রজাদের নিকট থেকে কর গ্রহণ করে সেই সংগৃহীত করের সাহায্যে প্রজাদের সর্বাঙ্গীন উন্নতিবিধানে যত্নবান হতেন। "প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ প্রজানাং চ হিতে হিতম"—প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার হিতেই রাজার হিত। তাই প্রজাদের সুখ সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য রাজ-কোষাগারে ধনাগমের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে যে,উৎপন্নশস্যের এক ষষ্ঠাংশ, আমদানী ও রপ্তানি শুল্ক, অর্থদণ্ড এবং অরিগণের নিকট থেকে বাজেয়াপ্ত অর্থে রাজকোষাগার পূর্ণ করা হত। সুতরাং রাজকোষাগার পূর্তি তথা প্রজাদের মংগলবিধানের জন্য তাদের উপর করধার্য করা রাজার পক্ষে ছিল অপরিহার্য।

প্রজাদের নিকট থেকে প্রাপ্য করকে রাজার পারিশ্রমিক বা বেতন হিসেবে বিবেচনা করা হত, যেহেতু রাজা প্রজাদের সর্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ, তাদের বৈষয়িক উন্নতি ও নৈতিক উৎকর্ষবিধানের গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করতেন, সেই হেতু রাজাকে প্রদেয় কর হল তাঁর পারিশ্রমিক। নারদস্মৃতির অষ্টাদশ অধ্যায়ে এর উল্লেখ রয়েছে। কৌটিল্য রচিত অর্থশাস্ত্রেও বলা হয়েছে যে, অরাজক রাজ্যে মাৎস্যন্যায়ের দ্বারা সন্ত্রস্ত ও অভিভূত হয়ে প্রজারা বিবস্বতের পুত্র মনুকে রাজপদে বরণ করল এবং উৎপন্নশস্যের এক ষষ্ঠাংশ, পণ্যদ্রব্য ও হিরণ্যের দশমাংশ রাজাকে দেয় কর হিসেবে ধার্য করল। এই করের দ্বারা পুষ্ট ও রক্ষিত হয়ে রাজা প্রজাদের "যোগ" অর্থাৎ অর্থাগম ও "ক্ষেম" অর্থাৎ মংগল বিধানের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। শুক্রনীতিসারেও বলাহয়েছে—

"স্বভাগবৃত্ত্যা দাস্যত্বে প্রজানাং চ নৃপঃ কৃতঃ।
ব্রহ্মণা স্বামীরূপস্তু পালনার্থং হি সর্বদা"।

স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা রাজাকে, স্বরূপে প্রভু হলেও, কার্যে প্রজার দাস হিসাবে নিযুক্ত করলেন। রাজা নিয়ত প্রজাপালনের বিনিময়ে প্রজাদের নিকট থেকে কররূপে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে করগ্রহণ বিষয়ে রাজা ও প্রজার মধ্যে একটা পারস্পরিক "সংবিৎ" বা চুক্তি ছিল। রাজা প্রাজাদের নিজ নিজ অধিকার ধর্মতঃ রক্ষার প্রতি-শ্রুতিতে যেমন আবদ্ধ, প্রজারাও তেমনি রাজাকে সমাজস্থিতি রক্ষক হিসাবে তাদের ধান্যষড়ভাগাদি কর ও অপরাধীর দোষের জন্য বিহিত অর্থদণ্ড দিতে অঙ্গীকারবদ্ধ।

"পরস্পরং হি সংরক্ষা রাজ্ঞা রাষ্ট্রেণ চাপদি।
নিত্যমেব হি কর্ত্তব্যা এষ এব সনাতনঃ।।

কর যখন প্রশাসনের বিনিময়ে রাজপ্রাপ্যপারিশ্রমিক বা বেতন হিসাবে বিবেচিত হ'ল, রাজা যদি তাঁর কর্ত্তব্যে ত্রুটি করতেন বা ব্যর্থ হতেন, তখন প্রজারা স্বভাবতই ক্ষতির পরিমাণ অনুযায়ী কর ফিরে পাবার দাবী করতে পারত রাজাও তা অর্থে ফিরিয়ে না দিয়ে ত্রুটি অনুসারে কর মকুব করে দিতেন। অর্থশাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, কর্ত্তব্যপালনে অনুৎসুক বা ব্যর্থ রাজার রাজ্য ছেড়ে

প্রজারা শক্ররাজার প্রতি তাদের আনুগত্য-প্রকাশের ভীতিও প্রদর্শন করত কখনো কখনো। মহাভারতের শান্তি পর্বে উল্লেখ আছে যে, সে রাজা নাপিততুল্য, যে বনে গিয়ে সন্ন্যাসী হতে চায়। নাপিত তার প্রভুর সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ করেছে। তাকে বর্জন করে অন্য নাপিত নিযুক্ত করাই বিধেয়। এটাই হলো করপ্রদান বিষয়ে পারস্পরিক চুক্তিভঙ্গের স্বাভাবিক পরিণতি।

রাজ্যে প্রজাদের উপর করধার্য করার সময় রাজাকে কয়েকটি মূলনীতি মেনে চলতে হত। প্রথম—লোভের আতিশয্যবশতঃ অতিরিক্ত কর ধার্য করে রাজা প্রজাদের মূল উচ্ছেদ করতেন না। আবার অত্যধিক স্নেহ ও অনুকম্পাবশতঃ কাউকে করপ্রদান থেকে অব্যাহতি দিয়ে রাজা নিজেকেও নির্মূল করতেন না।

দ্বিতীয়—প্রজাদের উপর সাধারণতঃ মৃদু কর ধার্য করা হত; যাতে প্রজাদের দিতে উদ্বেগ পেতে না হয়, এবং রাজকোষাগারও রিক্ত না থাকে। এই বিষয়ে মহাভারত এবং মনুসংহিতায় একই দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হয়েছে। আচার্য মনু বলেছেন—যাতে প্রজাগণের মূলধনের ক্ষতি না হয়, সেইভাবে জোঁকের রক্তপান, গোবৎসের দুগ্ধপান এবং ভ্রমরের মধুপানের ন্যায় প্রজাগণের নিকট থেকে অল্পে অল্পে বার্ষিক কর-গ্রহণ বিধেয়। তৃতীয়—যাতে রাজা স্বয়ং এবং প্রজাগণ প্রত্যেকে আপন আপন কার্যের ফললাভ করতে পারেন সেইরূপ বিশেষ বিবেচনা করে রাজা কর ধার্য করতেন।

"যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্তা চ কর্মণাম।
তথা বেক্ষ্য নৃপো রাজ্যে কল্পয়েৎ সততং করান্"।

চতুর্থ—প্রজাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ও চাঞ্চল্যের আশঙ্কা করে রাজা কখনো হঠাৎ বর্ধিত হারে প্রজাদের উপর কর ধার্য করতেন না। রাজ্যের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে ক্রমেক্রমে রাজা করের পরিমাণ বৃদ্ধি করতেন।

"অল্পেন অল্পেন দেয়েন বর্ধমানং প্রদাপয়েৎ।
ততোভূয়স্ততো ভূয়ঃ ক্রমবৃদ্ধিং সমাচরেৎ"।

উল্লিখিত কয়েকটি মূলনীতি ছাড়াও কোন্ দ্রব্যের উপর কিভাবে কর-ধার্য করা হবে সেজন্যেও কতকগুলো বিশেষ নীতি ছিল। প্রথম—উৎপন্নদ্রব্যের কর ধার্য করার সময় উৎপন্ন-দ্রব্য, এবং শ্রমের পরিমাণ বিবেচনা না করে কর ধার্য করা হত না। কর ধার্য করার সময় মনে রাখা হত যে কোন লাভের আশা না করে কেউ কখনো ব্যবসায়ে লিপ্ত হয় না—"ফলং কর্ম চ নির্হেতু ন কশ্চিৎ সম্প্রবর্ত্ততে"। সুতরাং ব্যবসায়ীর কতটুকু লাভ হবে এবং রাজাই বা কতটুকু পেতে পারেন—এসব সম্যক্ বিবেচনা করে উৎপন্ন-দ্রব্যের উপর করধার্য করা হত। দ্বিতীয়—আমদানীপণ্যের উপর শুল্ক নির্দ্ধারণের প্রাক্কালে আমদানীদ্রব্যের ক্ষেত্র, বিক্রয় ও ক্রয়মূল্য, আনয়নকালে আহারাদির খরচ, তস্করাদি থেকে রক্ষণা-বেক্ষণের ব্যয় এবং ব্যবসায়ের লভ্যাংশ, এসব বিবেচনা করে আমদানীপণ্যের উপর শুল্ক ধার্য করার বিধি ছিল। তৃতীয়—স্বরাজ্যের ক্ষতিকারক কোন দ্রব্য এবং বিলাসদ্রব্যের উপর অধিক কর ধার্য করে ব্যবসায়ীকে নিরুৎসাহ ও নিরস্ত করার কথাও অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত হয়েছে। কিন্তু প্রয়োজনবোধে যেসব ধান্য-বীজাদিদ্রব্য অত্যন্ত উপকারক এবং যা স্বরাষ্ট্রে দুর্লভ তা বিনাশুল্কে আমদানী করার অনুমতি দেওয়া হত :

"রাষ্ট্রপীড়াকরং ভাণ্ডমুচ্ছিন্দ্যাদফলং চ যৎ।
মহোপকারমুচ্ছুল্কং কুর্য্যাদ্ বীজং চ দুর্লভম্॥

আচার্য মনু তৎকালে কোন দ্রব্যের উপর কি পরিমাণ কর ধার্য করা হত তার একটা তালিকা দিয়েছেন। এ তালিকা থেকে জানা যায় যে, স্বর্ণ, রৌপ্য, পশু এবং রত্নাদির ব্যবসায় থেকে লভ্যাংশের পঞ্চাশ ভাগ এবং ভূমির উর্বরতা ও কৃষিব্যয়ের তারতম্য অনুসারে ধান্যাদির ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশ ভাগ রাজার প্রাপ্য ছিল। বৃক্ষ, মাংস, ঘৃত, মধু, ওষধি, গন্ধদ্রব্য, বৃক্ষ থেকে প্রস্তুত নির্যাস, ফল, মূল, পুষ্প—এসব দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়লব্ধ অর্থের এক ষষ্ঠাংশ রাজা কর হিসেবে গ্রহণ করতেন। এমন কি পত্র, শাক, তৃণ, বংশনির্মিত

দ্রব্য, চর্ম্ম ও মৃন্ময়দ্রব্য এবং সকল প্রকার প্রস্তরনির্মিত-দ্রব্যেরও এক ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসায়ের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে এরূপ সাধারণ ব্যক্তিও রাজাকে বার্ষিক যৎসামান্য কর দিত।

"যৎ কিঞ্চিদপি বর্ষস্য দাপয়েৎ করসংজ্ঞিতম্।
ব্যবহারেণ জীবন্তং রাজা রাষ্ট্রে পৃথগ্‌জনম্" ।।

সূপকার, কর্মকার, এবং কায়ক্লেশে জীবিকা-নির্বাহকারী মজুর ইত্যাদি রাজাকে অর্থে কর দিতনা বটে, কিন্তু রাজা প্রতিমাসে একদিন এদের দিয়ে কাজ করিয়ে নিতেন। এটাই হল এদের প্রদেয় কর। প্রাচীন ভারতে 'শ্রোত্রিয়' অর্থাৎ বেদজ্ঞ-ব্রাহ্মণগণই ছিলেন শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। এঁরা যে কেবল করপ্রদান থেকে অব্যাহতি পেতেন তা নয়, রাজা তাঁদের আত্মজ পুত্রের ন্যায় সর্ববিষয়ে রক্ষা করতেন—'সংরক্ষেৎ সততঞ্চৈনং পিতা পুত্রা-মিবৌরসম্'।

কৌটিল্য বলেন যে, রাজকোষে অর্থদৈন্য দেখা দিলে রাজা প্রজাবিশেষের নিকট থেকে অসদুপায়ে এমন কি বলপ্রয়োগেও অত্যধিক অর্থ সংগ্রহ করতে পারতেন। তা ছাড়া, দুষ্ট, ও অধার্মিক ব্যবসায়ী, কৃষক ও পশুপালকগণের নিকট থেকেও রাজা অধিক অর্থ আদায় করতে পারতেন, তবে তা কেবল একবারের জন্য—'সকৃদেব ন দ্বিঃ প্রযোজ্যঃ'। বৃক্ষ থেকে পক্কফল সংগ্রহ করাই বিধেয়, অপক্কফল নয়। তেমনি দোষে পরিপক্ক দুষ্টব্যক্তির ধন সংগ্রহ করা উচিত, নির্দোষ ব্যক্তি থেকে নয়,—'পক্বং পক্কমিবারামাৎ ফলং রাজ্যাদবাপ্নুয়াৎ'। এর অন্যথা করা হলে প্রজাদের মধ্যে কোপ উৎপন্ন হতে পারে এবং সেই কোপে রাজার সর্বনাশেরও সম্ভাবনা রয়েছে,—"আত্মচ্ছেদভয়দামং বর্জয়েৎ কোপকারকম্"। (আকাশবাণীতে প্রচারিত)

স্যর নীলরতন সরকার

প্রফেসর হেমচন্দ্র গুহ

আপনারা যে স্যার নীলরতন সরকার মশায়ের একখানা প্রতিকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়কে উপহার দিতে এসেছেন তাতে আমরা খুবই কৃতজ্ঞ। তাঁর স্মৃতি আমাদের কাছে পবিত্র জিনিষ। তাঁর প্রতিকৃতি আমরা গৌরবের সঙ্গে স্থাপন করব। যেসব মনীষী ও কর্ম্মবীরের চেষ্টায় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম প্রধান হলেন নীলরতন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব কিনা এ আলোচনা করার জন্য ১৯০৫ সালের ষোল নভেম্বর যে সভা ডাকা হয়েছিল, সেই সভাতে তিনি আর আশুতোষ চৌধুরী মশায় Provisional Education Committee "র যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন।

দুসপ্তাহ সময় নিয়ে ২রা ডিসেম্বর তাঁরা রিপোর্ট তৈরী করে পেশ করেন, কি করে জাতীয় আদর্শ ও লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে তোলা যায়। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই জাতীয় শিক্ষা পরিষদের Constitution তৈরী হয়। ১৯০৬ সালের ১১ মার্চ যখন National Council Education কে Registered Society রূপে স্থাপন করা হয়, তখন যে আটজন সেই application সই করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন।

জন্মলগ্নে জাতীয় পরিষদ বাংলা দেশের সকল মনীষীর আশীর্বাদ পেয়েছিল—অন্য সাতজন যাঁরা সই করেছিলেন তাঁরা হলেন, রাসবিহারী ঘোষ, আব্দুল রসুল, আশুতোষ চৌধুরী, দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী, শ্রীঅরবিন্দ, সতীশচন্দ্র মুখার্জি, আর হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁদের পেছনে ছিলেন তিন দানবীর, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়-চৌধুরী, ও সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী। যাঁরা অধ্যাপনা করতে আসতেন তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, স্যার গুরুদাস, আনন্দ কুমারস্বামী এঁরা এবং আরও অনেকে ছিলেন।

১৯১০, ১১।১২ সালে স্যার নীলরতন যুগ্মসম্পাদকদের একজন। ১৯২৫ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি একজন সহ-সভাপতি। ১৯৩০ থেকে ৪০ সাল পর্যন্ত তিনি রেক্টর। আমি যখন ১৯১১ সালে ছাত্র হয়ে ঢুকি, বা পরে ১৯২৭ সালে অধ্যাপক হয়ে আসি, তখন দেখেছি স্যর নীলরতন জাতীয় শিক্ষাপরিষদের একজন ধারক। প্রতিষ্ঠানের তখন সুদিন নয়। স্যর নীলরতন তখন সারা ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ ডাক্তার—তাঁর সময়ের মূল্য অনেক। কিন্তু, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের জন্য সময় ও পরিশ্রম দিতে তাঁর কোন আপত্তি ছিলনা। তাঁদের কাছে এ প্রতিষ্ঠান মানসকন্যার মতন আদরের ছিল। এখন যাঁরা অধ্যাপক আছেন, তাঁদের মধ্যে আমি বয়োজ্যেষ্ঠ। আমি স্যর নীলরতনকে সক্রিয়ভাবে পরিষদের কাজ করতে দেখেছি। আমার চেয়ে যাঁরা প্রাচীন ছিলেন, তাঁদের কাছে শুনেছি যে পরিষদের প্রথম আমলে যখন আয় ছিল অতি অল্প, স্যর নীলরতন দৈনিক একবার খোঁজ নিয়ে যেতেন কত টাকা দরকার, আর নীরবে সে টাকা দিয়ে যেতেন। তাঁর প্রকৃতিই ছিল সেরকম—তিনি নামপ্রচার বা আড়ম্বর চাইতেন না, চাইতেন কাজ।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ যাঁরা স্থাপন করেছিলেন তাঁরা চাইতেন যে স্বদেশী শিল্প গড়ে উঠুক। স্যর নীলরতন নিজে এই কাজে পথ দেখাতে এগিয়ে আসেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ন্যাশনেল সোপ ফেক্টরি আর National Tannery তিনি অনেক আর্থিক ক্ষতি সহ্য করেও চালু রেখেছিলেন যাতে স্বদেশী শিল্প দাঁড়াতে পারে। National Tannery আজ বড় প্রতিষ্ঠান। কিন্তু স্যর

নীলরতন যদি প্রথম আমলের ঝড়-ঝাপটার দায় সব নিজের উপর নিয়ে একে চালিয়ে না যেতেন তবে এ দাঁড়াতে পারত না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর গভীর যোগ ছিল। তিনি তাঁর Vice Chancellor এর পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। Bengal Legislative Council-এও তিনি সদস্য ছিলেন।

চিকিৎসক নীলরতনের নাম একটা magic এর মত ছিল। তিনি চিকিৎসা করবেন শুনলেই রোগীর অর্ধেক কষ্ট আরাম হয়ে যেত। এত বড় মানুষ, কত তাঁর কাজ। কিন্তু রোগীর পাশে বসে ধৈর্য ধরে তার কষ্টের কথা শুনে তাকে মিষ্টি ব্যবহারে ভুলিয়ে যাওয়াটা তিনি কর্ত্তব্যের মধ্যে মনে করতেন। রোগী বা তার পরিবারের লোকজন কোন দিন কেউ তাঁর কাছে কোন অপ্রিয় কথা শোনেনি। অতি ভদ্রভাবে সহৃদয়তার সঙ্গে তিনি সকলের সঙ্গে ব্যবহার করতেন। সম্মান ও খ্যাতি যত রকমের সম্ভব তা তিনি পেয়েছিলেন, এবং যোগ্য পাত্র বলেই পেয়েছিলেন। কিন্তু সহজ সরল সহৃদয় ব্যবহার থেকে বিচ্যুত হতে কেউ তাঁকে দেখেনি।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যেসব মহামানব দুঃখিনী বাংলামায়ের কোল উজ্জ্বল করে জন্ম নিয়েছিলেন স্যর নীলরতন তাঁদের মধ্যে একজন। একই বছরে কয়েকমাস আগে পরে রবীন্দ্রনাথ, প্রফুল্লচন্দ্র আর নীলরতনের জন্ম। তাঁদের জন্মের দু তিন বছর পরেই এলেন বিবেকানন্দ, আশুতোষ এবং আরও কত মহামানব। মনে যখন অন্ধকার আসে, এঁদের কথা ভাবি। এই সব মহামানবও ত আমাদের মধ্যে ছিলেন, অন্ধকারে দীপ জ্বালালেন, তাঁদের বাণী, আদর্শ, কর্ম সব রেখে গেলেন। যত দীনই হই, এই সান্ত্বনা আর গর্ব আমাদের থাকবে যে এই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতারা ছিলেন অতি মহান সব ব্যক্তি। আজ তাঁদের উদ্দেশ্যে আর বিশেষ করে স্যর নীলরতনের উদ্দেশ্যে আমাদের প্রণতি জানাই।

তাঁর সন্তানেরা আমাদের যে এই মূল্যবান ধন দিয়ে গেলেন তার জন্য আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর হেমচন্দ্র গুহ স্যর নীলরতন সরকারের একটি প্রতিকৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গ্রহণকালীন অনুষ্ঠানে উপরোক্তভাবে স্যার নীলরতনের পরিবারস্থ ব্যক্তিদিগকে ধন্যবাদ জানাইয়াছিলেন। সঃ প্রঃ

তীর্থ পথে

(ভ্রমণ কাহিনী)

প্রতিভা মুখোপাধ্যায়

মনে মনে তো কত ইচ্ছাই থাকে, কোনটি মনের অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়, কোনটি আগ্রহের আতিশয্যে উদ্বেল হয়ে ওঠে। সবই কি আর সফল হয়?

বঙ্কিম খবর পাঠাল 'দিদি যাবেন কি? কেদারনাথ বদ্রীনারায়ণ যাব ভাবছি'। কথাটি শুনে মনের আবেগ চাপতে পারছি না, যাকে পাই তাকেই বলি, আবার ভয় হয়, বাবা কেদারের দয়া হলে তো যেতে পারব।

বঙ্কিম অত্যন্ত উদ্‌যোগী এবং সুব্যবস্থাপক। কেদার-বদ্রীর পাণ্ডাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সব গুছিয়ে দিন স্থির করে ফেলল। যাত্রী হয়ে যাব আমরা সাতজন। বঙ্কিম, অর্পণা, গোপাল, শঙ্খ, বোন্ 'বুড়ি' দেশকর্মী চন্দ্রবাবু ও আমি। বড়কর্ত্তা ভ্রমণ-বিলাসী, কিন্তু কয়েকটি জরুরী কাজে আটকে গেলেন। মনে মনে নিঃসঙ্গতা অনুভব করতে লাগলাম। আনন্দ সকলে মিলে উপভোগ করতে পারলেই যেন সম্পূর্ণ হয়।

কোন্ সুদূরের দেবলোকে কেদারধাম বদ্রীনারায়ণ, সেখানে কি আমরা পৌঁছুতে পারব? মনের আগ্রহের সঙ্গে সর্বদাই এই জিজ্ঞাসা। অপর্ণা প্রায়ই অসুস্থ থাকে, কিন্তু এই অসাধ্য সাধনের জন্য খুব উৎসাহী। তাকে লক্ষ্য করেই আমাদের উৎসাহ বেড়ে গেল। এ হেন সময় খবরের কাগজ, রেডিয়ো মারফৎ খবর আসতে লাগলো গলন্ত বরফের ধস্ নেমে মন্দির বাদে সমস্ত বদরিকাশ্রম জনপদ, রাস্তাঘাট ধ্বংশ হয়ে গেছে, যাত্রী চলাচল বন্ধ এ খবরে আত্মীয়-স্বজন বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে যাবার বিরুদ্ধে আপত্তি আসতে লাগল বহুরকম।

আমাদের মনে কিন্তু ভয়ের চেয়ে উৎসাহই বেশী বোধ করতে লাগলাম। সবাইকে বললাম আমরা হেঁটে যেতে যেতে সব ঠিক হয়ে যাবে। মনে যখন এসেছে, বাবা যখন ডেকেছেন তখন সংকল্পে বিরত হওয়া উচিত নয়। কঠিন সঙ্কল্পে বহুবাধা সর্বদাই আসে।

এই মনে করে ১৩৭২ সালের ১৮ শে বৈশাখ (১১ই মে) সন্ধ্যায় ডুন এক্সপ্রেসে রওনা হলাম। সেদিন সমস্তদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, বাতাস চলতে লাগল। যাত্রী এবং সাহায্যকারীরা সকলেই ভিজতে ভিজতে হাওড়ায় পৌঁছুলাম। দীপু বলল, "মা, তোমাদের যাত্রা শুভ বলেই মনে হচ্ছে, পথের সমস্ত আবর্জনা ধুয়ে পথ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আবার এ যে কঠিন যাত্রা, তারও একটু সংকেত বোধহয়"।

রাত ৮-১৫ মিনিটে ডুন এক্সপ্রেস আরো অনেকের সঙ্গে আমাদেরও বক্ষে নিয়ে সুদূরের পথে ছুটল।

মনের যে এক অব্যক্ত আবেগ। বাল্যের আনন্দ, কৈশোরের উচ্ছ্বাস, যৌবনের উচ্ছলতা—যেহ মনের গতির সঙ্গে সঙ্গে পট পরিবর্তন হয়, এবং প্রকাশের ভঙ্গীও বদলায়। কৈশোরে যখন বাবার সঙ্গে প্রথম চট্টগ্রাম গেলাম, রাত্রিশেষে পাহাড়তলী ষ্টেশনে বাবা

ডেকে ঘুম ভাঙিয়ে বললেন, "দেখ কি সুন্দর পাহাড়"। ম্লান জ্যোৎস্নালোকে চন্দ্রনাথ পর্ব্বতের শৃঙ্গরাজি কি অপূর্ব্ব দেখলাম; সে স্বপ্নময় দৃশ্যের তুলনা হয় না। প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের সঙ্গে সেই প্রথম পরিচয়। চট্টগ্রামে সাগর, সমতল ও পর্ব্বত, এ-তিনের সমাবেশ।

জীবনে কৈশোর অবধিই মনের স্নিগ্ধ স্বচ্ছ সরলতার ভিত্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। যৌবনের সঙ্গে সঙ্গেই মনের উদ্বেলভাব এসে স্নিগ্ধতাকে মোহময় করে তোলে। সেই সন্ধিক্ষণে চট্টগ্রামে প্রকৃতির মোহে যেন নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম।

সেই বিস্ময় ও আনন্দের রেশ যেন আজও মনের গভীরে খুঁজলে পাই। জীবনের কত পট পরিবর্ত্তন হয়েছে। আজ প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে সুদূর দুর্গম পর্ব্বতারোহণ গাম্ভীর্যপূর্ণ ধর্মভাবে বিভোর। গাড়ীতে বসে সমস্তরাত্রি জীবনের পাতা উলটিয়ে যেতে লাগলাম। কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, দ্বারকা থেকে পূর্ব্বসীমানা পর্য্যন্ত বিভিন্ন যাত্রায় বিভিন্ন অনুভূতি মনকে কতরকমে আলোড়িত করেছে আজকের আশা-আকাঙ্খার রূপ কি ভিন্ন? খুঁজে দেখি, সেই অনাবিল আনন্দ-ধারা মনের গভীরে আজো বর্ত্তমান।

বৃপ্তি হঠাৎ বলে উঠল "সত্যি দিদি আমরা তাহলে কেদার বদরী যাচ্ছি!" কি আনন্দ!

অপর্ণা বলে 'দাঁড়াও, আগে পৌঁছে নিই" গোপাল গাড়ীর ভিতর খুঁজে দেখতে লাগল, কোন যাত্রী কোথায় যাবে। নিজেদের যাত্রার কথা প্রচার করাও বোধহয় তার উদ্দেশ্য। শম্ভু বলল, "কাকু, তুমি কিন্তু নিজেদের প্রচারের উদ্দেশ্য নিয়েই ঘুরে বেড়াচ্ছ, এটা ভাল নয়।" গোপাল বলে "তুমি থাম! বাজে কথার চেয়ে সত্যি-প্রচারে দোষ কি? সকলের মনেই চাপা উত্তেজনা। বঙ্কিম ঘুমের ভান করে শুয়ে ছিল, খানিকবাদে বলে, "দিদি ঘুমান নাই?" তার মানে, সকলের অবস্থাই সমান। প্রায় ৭০ বৎসরের চন্দ্রদাকে বললাম, "দাদা, আপনার গাড়ীতে বসে বাইরের দৃশ্য দেখতেই ভাল লাগে, না, গাড়ীর দোলায় ঘুমোতে ভাল লাগে?" দাদা বললেন 'জানো দিদি, যখন যে সুবিধা পাই, সেটাই ভাল মনে হয়। যখন শোবার যায়গা পাওয়া যায় না, তখই বসেই আনন্দ, এটাই জীবনে অভ্যাস হয়ে গেছে "

১৩ই মে সকালবেলা হরিদ্বার ষ্টেশনে নামলাম পূর্ব্ব-পরিচিত হরিদ্বার, তবু যেন চির নূতন, চির পবিত্র। বাইরের আড়ম্বর অনেক বেড়েছে। সেই নির্জ্জন তপোবন-ভাব আর নাই। কিন্তু তবু জানি, হরিচরণ দর্শন-যাত্রার এই তো সিংহদ্বার। ভোলাগিরির ধর্মশালায় স্থান পেলাম। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান-মানসে গিয়ে দেখি, ভীষণ ভীড়, জলে নামবার যায়গা পাওয়াই ভার। কতজনের কত বাসনা! কেহ দুঃখের আগুনে দগ্ধ হয়ে মা গঙ্গার শীতল জলে মনের জ্বালা জুড়াতে এসেছে। কেহ বা নিরবচ্ছিন্ন শান্তির পরিবেশে থেকে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ গঙ্গার সঙ্গে লড়াই করে নিজেকে একটু উত্তেজিত করতে এসেছে। কেহবা উদ্দেশ্যবিহীন, স্ত্রীপুত্র নিয়ে রেল-পাসের সদ্ব্যবহারে এসেছে। পুণ্যার্থীর তো অভাবই নেই। কলনাদিনী গঙ্গা সকলের সঙ্গে সমান তালে গান গেয়ে উল্লাসে ছুটে চলেছে।

১৪ই মে হৃষীকেশে গেলাম, সকাল বেলায়ই কালী কমলীওয়ালার ধর্মশালায় আশ্রয় পেলাম। কালী কমলীওয়ালার নাম ছেলেবেলা থেকে কত তীর্থযাত্রীর মুখে শুনেছি। ঐ নামের আসল তাৎপর্য বুঝি নাই প্রথমবার হৃষীকেশে গঙ্গার ধারে এক শান্ত শুদ্ধ স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় হয়। তাঁরই মুখে সে যুগের তীর্থের ভীষণ তার গল্প শুনি। তীর্থের নেশা এবং দুর্গমকে জয় করবার প্রচেষ্টা ভারতবাসীর চিরকালের বৈশিষ্ট্য। যখন পথে বিশ্রাম বা রাত্রিযাপনের আশ্রয় একমাত্র বৃক্ষতল ছিল আহার্য সঙ্গে যেটুকু নেওয়া যেত, তার বাইরে কোথা কিছু ছিল না, কাজেই অর্ধেকের বেশী যাত্রীর যা ঐখানেই শেষ হ'ত।

তখন কয়েক শত বৎসর পূর্বে বাংলা দেশের গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর মনে কি জানি কি মমতার

জেগেছিল, তিনি নির্জ্জন পর্বত-কন্দরে বসে ভগবৎ-চিন্তা না করে, প্রত্যেক গৃহস্বামীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা ক'রে সেই ভিক্ষালব্ধ অর্থ তীর্থপথের ভীষণতা দূর করবার মানসে মাঝে মাঝে ধর্মশালা নির্মাণ করে দেন।
"জীবে প্রেম করে যেই জন।

"সেইজন সেবিছে ঈশ্বর"—এই ব্রত গ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন দুর্গমস্থানে বহু ধর্মশালার ব্যবস্থা করেন। সেই দয়ালু সন্ন্যাসীর নাম কেউ জানতো না। তাঁর অঙ্গে একখানি কালো কম্বল মাত্র ছিল, সেই সূত্রে কালী কমলীওয়ালা অর্থাৎ কালো কম্বলওয়ালা তাঁর নাম হয়। এই সৎকর্মে শেষে সাথীও অনেক যোগ দেন। এখন তাঁর ১০৮ম প্রতিনিধির ব্যবস্থায় এই ধর্মশালাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের কাজ চলছে। কোথাও বেশ সুরম্য অট্টালিকাও আছে, কোথাও মাটির বা কাঠের দ্বিতল বড় বড় বাড়ী। প্রায় যায়গায়ই শতাধিক লোকের রাত্রি-যাপনের যায়গা আছে। এমনি মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের কৃপায় এখন কঠিন কেদার-যাত্রাও অনেক সুগম হয়েছে। প্রণাম জানাই তাঁদের উদ্দেশ্যে।

১৫ই মে ভোর পাঁচটার বাসযোগে হৃষীকেশ থেকে বহুকাঙ্খিত কেদারখণ্ডের দিকে যাত্রা করলাম। আমাদের সঙ্গে দুজন কুলি প্রতাপ সিং আর প্রেমচাঁদ এবং একজন ছড়িওয়ালা চলল। বাসের সংক্ষিপ্ত নির্দিষ্ট যায়গাটিতে বসে মনকেও যেন গুটিয়ে শুধু একটি নির্দিষ্ট আকাঙ্খার পথে নিয়োজিত করতে পারলাম। বিধাতা প্রত্যেক মানুষকেই সুসংবদ্ধ গতিপথ নির্দেশ করে দিয়েছেন, যার অন্যথায় প্রতিপদে বিপদের সম্মুখীন হতে হয়। এই সীমিত পথটি বোধহয় তারই ইঙ্গিত। বাস-চালককেও সদা জাগ্রত মন নিয়ে হুঁসিয়ারীর সঙ্গে যাত্রীদের এগিয়ে দিতে হয়। একটু চালে ভুল হলে আর রক্ষা নাই। এই সংকীর্ণ পথের একদিকে গগন-চুম্বী হিমালয়ের শৃঙ্গমালা, অন্যদিকে স্রোতস্বিনী ভাগীরথী, মন্দাকিনী, কল-কল কুলুকুলু ধ্বনিতে পথিকের মনকে উদ্বুদ্ধ ক'রে চলে। ভাগীরথীর আরাধনায় তুষ্ট হয়ে হিমালয়-কন্যা গঙ্গা ব্রহ্মার কমণ্ডলু থেকে নির্গত হ'য়ে সপ্তধারায় প্রবাহিত হ'য়ে ভারতবর্ষকে ধন্য করেছেন। তবে কোন মহাতপাঃ ঋষি স্রোতস্বিনীর ধারা অনুসরণ করে তীর্থের পথরেখা প্রস্তুত করে গেছেন। সেই পথে চলতে চলতে শরীর মন স্নিগ্ধ হয়ে গেল। ঐ যেন পূর্ণানন্দ লাভ হল। সুদূর কেদারনাথের সান্নিধ্য যেন তখনই থেকেই অনুভব করছিলাম। পথে দেখলাম পঞ্চ প্রয়াগ। প্রথমেই দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী অলকা-নন্দার সঙ্গম। একদিকে ভাগীরথী গঙ্গোত্রী থেকে নেমে এসেছেন, অন্যদিকে বদরিকাশ্রম থেকে প্রবলবেগে অলকনন্দা।

অলকনন্দার সেকি রুদ্র তাণ্ডব! সে যেন উত্তাল স্রোতের প্রলয়। অলকনন্দা যেন সুদূর সমুদ্রের আহ্বান শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উন্মাদের অট্টহাসি হাসতে হাসতে ছুটেছে। পথের যত বাধা সমস্ত চূর্ণ বিচূর্ণ করে প্রলয়ঙ্করী মূর্তিতে ভাগীরথীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভাগীরথীও স্রোতস্বিনী, কিন্তু সুসংযত, ধৈর্যের সঙ্গে অলকনন্দার উচ্ছলতাকে স্নেহের মাধুর্যে মিলিয়ে আপনার বক্ষপেতে নিয়েছেন। দুজনারই একই উদ্দেশ্যে যাত্রা। একজন যেন সারাপ্রাণ ঢেলে দিয়ে জগৎজনের সুখ-দুঃখে সুর মিলিয়ে নিজেকে বিলিয়ে দেবার আনন্দে তড়িৎ গতিতে চলেছেন, অপরজন কিছু জানতে শুনতে চায়না, শুধু নিজের-বেগে প্রিয়-অভিসারে যেতে চায়। এই যে দুইয়ের মিলন ক্ষেত্র। বহুদূর থেকে তার গর্জন শোনা যায়। কাছে গিয়ে দেখলে সম্বিত হারিয়ে ফেলতে হয়। কি যে ভাঙাগড়ার খেলা। আগে মনে করেছিলাম, দেবপ্রয়াগে স্নান করে দেহ-মনকে শুচি করে এগোবো, কিন্তু অলকনন্দার গতিবেগ অ'ত তীব্র। দুই স্রোতস্বিনীর মিলনক্ষেত্রে এক প্রচণ্ড আবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। বিশাল বিশাল পাথর নিমেষে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। সেই অশ্রান্ত ঘূর্ণাবর্তের দিকে তাকিয়ে পার্থিব জগৎকে ভুলে গেলাম।

বুড়ি বলল, স্নানের আর আশা নেই। হাতে ক'রে জল তুলে মাথায় দিই, তাতেই হাতখানা রক্ষা পেলে হয়। তাই সবাই, ঘটি করে জল তুলে মাথায় দিলাম।

অবগাহন স্নানের তৃপ্তি পেলাম না। প্রকৃতির লীলা দেখে নিজেদের কত অসহায় মনে হল। বাসের সময় হয়ে গেল, বেশী কাব্য করার সময় নাই। বাসের দিকে ছুটলাম। এখানে টিহিরি গাড়োয়াল রাজ্য। সঙ্গমের ঘাট গাড়োয়াল রাজ্যের ভিতর; বাসরাস্তা অপর পারে, মাঝখানে মস্তবড় পুল সংযোগ রক্ষা করে আছে। ব্রিটিশ সরকার গাড়োয়ালদের বশে আনতে পারেনি, শাস্তি-স্বরূপ পারাপারের বিশেষ সুব্যবস্থাও করেনি। স্বাধীন ভারতে এদিকে রাস্তাঘাটের অনেক উন্নতি হয়েছে। বাসে যেতে যেতে পথে শ্রীনগর, কীর্তিনগর অগস্ত্য মুনি প্রভৃতি অনেক জনপদ পড়ল। বিশেষ বিশেষ প্রায় সব জায়গাতেই বাস কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়ায়। আর প্রায় সব বাসযাত্রীই নেমে কেহ আহার্য. কেহ পানীয় খোঁজে, কেহবা একটু পদচারণা করে শরীরের জড়তা নষ্ট করে নেয়।

গোপালও বাস থেকে ছুটে গিয়ে খুঁজে আনে সেখানকার যা কিছু বিশেষ জিনিষ পাওয়া যায়। বাস চলারও একটি সুষ্ঠু নিয়ম আছে। এক সঙ্গে প্রায় খান চল্লিশেক বাস লরী ট্রাক প্রভৃতি চলতে আরম্ভ করে, প্রথমখানিতে একটি লাল নিশান উড়িয়ে চলে, আর শেষ খানিতে সবুজ নিশান। প্রথমে এর তাৎপর্য বুঝি নাই। পরে দেখলাম, আপ এবং ডাউন গাড়ীর ক্রসিং-এর জন্য এই ব্যবস্থা। কোন এক চওড়া ষ্টেশনে আপগাড়ী সব দাঁড়াবে, ডাউন গাড়ীকে নেমে যাবার পথ ছেড়ে দিতে হবে। নামবার যান বাহিনীর শেষ গাড়ীটি সবুজ নিশান উড়িয়ে বেরিয়ে গেলে উঠতি গাড়ীর চলার পালা। সংকীর্ণ পথে যথেষ্ট সতর্কতার দরকার হয়। অগস্ত্যমুনিতে অনেক বেলগাছ দেখলাম। খুবই ইচ্ছা হল, কয়েকটি তাজা বেলপাতা নিয়ে গিয়ে বাবা কেদারনাথের মাথায় দেব। কিন্তু বাসযাত্রীরা সকলেই নিরুৎসাহ করে বলল, এপাতাতো শুকিয়েই যাবে। মনটা একটু খুঁত খুঁত করল। ভাবলাম, উপরের দিকে আর যদি পাই, নিশ্চয়ই নিয়ে নেব। যখন যেখানে যাত্রা থামিয়েছি সর্বত্রই খুঁজে দেখেছি, টাটকা বেলপাতা পাই কিনা। বিকেলে রুদ্র প্রয়াগে বাস থামল। এখানে অলকনন্দা মন্দাকিনীর মিলনক্ষেত্র। এখানেও অলকনন্দার সেই প্রলয়ঙ্করি মূর্তিই দেখলাম। মন্দাকিনী স্নিগ্ধ শান্ত। অলকনন্দা মন্দাকিনীকে টেনে নিয়ে দেবপ্রয়াগে ভাগীরথীর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। পাহাড়ের গা কেটে বাস-রাস্তা। একদিকে কেদারের রাস্তা, আর একদিকে বদ্রীনাথের রাস্তা। রুদ্র এবং নারায়ণের রাস্তার মিলনক্ষেত্র—তাই বুঝি রুদ্রপ্রয়াগ নাম। স্রোতস্বিনী বরাবরই সঙ্গে চলেছে, কখনো ডাইনে কখনো বাঁয়ে। দুর্ভেদ্য হিমালয়কে ভেদ করে চলায় বিপদ পদে পদে।

মানুষ যদি এই অসাধ্য সাধন না করত, তবে প্রকৃতির ঐ সৌন্দর্যের ডালি তো অনাবিষ্কৃত থেকে যেতো। কঠিন পাথরও যে কত রসিক, ওখানে না গেলে বুঝা যায় না। পাথরের ভিতর থেকে কত বড় বড় বট অশ্বথ গাছ উঠেছে, যাত্রীরা দলে দলে তার ছায়ায় বিশ্রাম করে রাত্রি-যাপন করে নিশ্চিন্তে। রুদ্র-প্রয়াগ বেশ বড় যায়গা।

বিকেল পাঁচটায় বাস থেকে কুণ্ড চটিতে নামলাম। মন্দাকিনীর উপরের পুল পার হয়ে আশ্রয়স্থল খুঁজতে বঙ্কিম ছড়িদারকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে গেল। এখান থেকেই মন্দাকিনীর সঙ্গ পেলাম কেদারনাথ পর্যন্ত। দেব-স্থানের নদী মন্দাকিনী সকলকে পথ দেখিয়ে দেবলোকের দিকে নিয়ে যায়। সারাদিনের বাস যাত্রায় ক্লান্তি নিয়ে শ্লথ গতিতে এগিয়ে গিয়ে বঙ্কিমকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় রে চটি"? চটি সম্বন্ধে একটা প্রবল কৌতুহল ছিল, না জানি সে কি রকম হবে। বঙ্কিম উদাসভাবে বলল, 'হ্যাঁ, যান ছড়িদার দেখাবে'। তার ঔদাসীন্যে একটু যেন হতাশ হয়ে গেলাম। গিয়ে যা দেখলাম তা অপূর্বই বটে। হাত দশেক লম্বা, হাত ছয়েক চওড়া একখানি নীচু মাটির ঘরের মত। তিন দিকে বাঁকারি কি ছিটের ফাঁকা বেড়া, উপরে পাহাড়ী কোন এক পাতার চাল। সামনের দিক অনাবৃত। মেঝেতে স্যাঁতস্যেঁতে মাটির উপর দুখানা চাটাই পাতা,—বোধহয় সৃষ্টির প্রথম থেকেই ওখানে পাতা আছে। সে ঘরের একদিকে একটি উনুন জলছে, পাশেই

চায়ের সরঞ্জাম। মুদিখানার মালমশলাও আছে, আর দুটি খচ্চর বাঁধা আছে। তারই গায়ে আমাদের বিছানা বিছিয়ে ফেলল গোপাল। একখানি চালার নীচে চায়ের দোকান মুদিখানা ও জ্বালানী কাঠের দোকান। মালবাহী প্রাণীদুটিও আছে। ওর মাঝখানটি যে শুধু আমাদের সাতজনের একটি পরিবারের জন্ম যোগাড় হয়েছে এজন্ম ছড়িদার গর্বিত। চটিওয়ালাও এই দাক্ষিণ্যের জন্ম আত্মপ্রসাদ লাভ করল। গঞ্জিকার ধোঁয়ায় এবং খচ্চরের গন্ধে স্থানটির মাধুর্য আরো বেড়ে গেছে।

তীর্থের প্রথম সোপানে পা দিলাম এবং অমায়িকভাবে পাশ করে গেলাম। শুধু রাত্রে মোমবাতির আলোতে বসে আলুসিদ্ধ ভাতের সঙ্গে গঞ্জিকার ধুম গলাধঃকরণ করতে গিয়ে অপর্ণা আর বুড়ি শিউরে উঠেছিল। চন্দ্রদার এক হুঙ্কারে সবাই চুপ করে গেল। তখন আলোচনার বিষয় হলো, কোন পাহাড়ী সাপ অথবা আর কেউ এসে না সঙ্গদান করে। হাসতে হাসতে কখন যেন সবাই ঘুমিয়ে পড়েছি। মন্দাকিনীর স্নিগ্ধ কলতানে ঘুম ভেঙ্গে গেল, স্বাচ্ছন্দ্যবোধ হল।

মানুষ সব সময়েই অবস্থার দাস। যত অসুবিধাই হোক না কেন, ঐ পরিবেশ বলেই চটির মহিমা আছে। ওখানে দোতলা ঝকঝকে বাড়ীতে থাকতে দিলে হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গে আরোহণের একাগ্রতা ও পবিত্রতা যেন মনে জাগত না। স্থান কাল এক না হলে মাধুর্য খোলে না। সঞ্জীবচন্দ্র লিখেছেন "বন্যেরা বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।" যেখানে যেমন। অত্যন্ত ভাল লাগল যে, সর্বত্র জলের এবং নিত্যপ্রয়োজনের ব্যবস্থা বেশ ভাল। যাত্রীদের সুবিধার্থে সরকার বেশ যত্নবান্। ভোর চারটার সময় উঠে হাতমুখ ধুতে গিয়ে প্রথম মন্দাকিনীর জল স্পর্শ করতে পেয়ে মনটা যেন তাজা হয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, "স্বর্গের নদী মন্দাকিনী।" সে যে আমাদের নাগালের ভিতর এসে গেছে, তাতে হাত দিতে পেরেছি, এ এক অপূর্ব শিহরণ। যা কল্পনায় ছিল, সে যে বাস্তবে এসেছে, এ যেন সহজে বিশ্বাস হতে চায় না। মনের আনন্দ নিয়ে প্রথম তীর্থপর্যটন শুরু হল। গুপ্তকাশীতে গিয়ে পৌঁছুলাম বেলা প্রায় ৯টা নাগাদ। রাস্তা বেশ চড়াই। প্রথম যাত্রায় দুমাইল চড়াইতেই অনেক কষ্ট ও সময় লেগে গেল। আনন্দও বেশ হচ্ছিল। কে আগে চলতে পারে, এ নিয়ে চেষ্টা এবং হাসি পরিহাস চলছিল। আমরা আগে বেরিয়ে হাঁটা শুরু করেছি, কিন্তু গোপাল আর শম্ভু পরে মালপত্র গুছিয়ে কুলি নিয়ে রওনা হয়ে আমাদের অনেক আগে এগিয়ে গেছে। চন্দ্রদা সকলের শেষে আমাদের রক্ষক হয়ে চলতেন। গুপ্তকাশীতে কালীকমলীওয়ালার ধর্মশালায় একখানা আলাদা ঘর পাওয়া গেল। ধর্মশালার ঘর রীতিমত ভাল। জানালা-দরজা ওয়ালা ভাল ঘর। স্নানের জন্ম প্রচুর জলের ব্যবস্থা আছে। গুপ্তকাশীতে অনেক দেবদেবীর মন্দির আছে। মন্দিরের সংলগ্ন জলাশয়ে স্নান করে শুকনো নারকোলের ভিতর কিছু গুপ্তদান দিয়ে মন্ত্রাদি পাঠ করে বেশ তৃপ্তি পাওয়া গেল। খাওয়াদাওয়া সেরে যায়গাটি ঘুরে দেখতে গেলাম। উঁচু নীচু অসমতল যায়গা, তবে ছোট খাট একটি শহর বটে। সবরকম জিনিষই কিছু কিছু পাওয়া যায়। বিকেলে উঁচু একটি টিলার উপরে বসে দুদিকের যাত্রীদের আসা-যাওয়া দেখতে দেখতে যাত্রার জন্ম মন অধীর হয়ে উঠতে লাগল। সন্ধ্যে পর্যন্ত বসে বসে যাত্রী চলাচল দেখলাম। যাঁরা তাড়াতাড়ি চলতে চান, দুবেলাই হাঁটেন, তাঁরা বিকেলে রওনা হয়ে গেলেন। আমার মনটাও যেন তাঁদের সঙ্গে এগিয়ে গেল। আমরা বিকেলে হাঁটবনা বলেই প্রোগ্রাম করা ছিল। বঙ্কিম বলেছে যে, যাত্রাটি উপভোগ করতে করতে যাওয়াতেই আনন্দ। তাড়াহুড়া করলে ক্লান্তি এসে আনন্দ নষ্ট করে দেয়। আমরা ভোর ৪টা থেকে বেলা ১০।১১ টা পর্যন্তই হাঁটতাম, রোদ উঠে গেলে আর বেশী হাঁটতাম না। গুপ্তকাশী মন্দাকিনীর এপারে আমরা আছি। ওপারে উখী মঠ, মধ্যমহেশ্বর, যেদিকে তাকাই শুধু বরফচূড়া, সর্বত্রই যেন তুষারের ধবলগিরির শৃঙ্গ,

ধ্যান-মগ্ন ধূর্জটি।” পাণ্ডাজীদের প্রতিনিধি দু'তিনজন এসে তাঁদের এক্তিয়ারের যজমান কিনা যাচাই করে নিলেন। তাঁরা খুব ভদ্র ও বিনীত ব্যবহার করলেন। আমাদের মনে উৎসাহ দেবার জন্যই বোধহয় ঘুরে ঘুরে দেখালেন, ঐ তো বদ্রীনাথের বরফঢাকা চূড়া, ঐ যে কেদার তুষার শৃঙ্গ ওপারে উখীমঠে কেদারনাথের ভোগ-মূর্তির পূজা হয় ছয় মাস। সবই যেন নাগালের মধ্যে পেয়ে গেছি, মনে এমনি একটা স্বস্তির ভাব এল। মনটা যে ছুটে চলে যেতে চায়। দু একজন যাত্রী আবার ভয়ও দেখালেন। অপরিসীম কষ্ট, দম আটকে আসে, শীতে অসাড় হয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। সবই শুনে যেন আনন্দ পাই। তাড়াতাড়ি এসবের সম্মুখীন হবার দুর্নিবার আকাঙ্খা জাগে। কতক্ষণে রাত্রি ভোর হবে চলতে পারব। ফিরতি যাত্রী যাদের পাই তাদের ধরে জিজ্ঞাসা করি। একই যাত্রার ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার কথা শুনি। ছেলেবেলা গল্প শুনতাম, যে যেমন মন নিয়ে যায় বিগ্রহকে সে সেইরূপ দেখে। কে একজন পুরীধামে জগন্নাথ-দর্শনে গিয়ে বাড়ীতে ফেলে-আসা যত্নের লাউমাচাটিকেই দেখল। এদের মুখে নানা কথা শুনে সেই গল্পটিই মনে পড়ল। ধর্মশালার রক্ষক চৌকিদার এবং চটিওয়ালারা খুব উৎসাহ দিয়ে বলল, 'কঠিন কেদার বদরি বিশাল কি জয়' বলে এগিয়ে যাও, দেখবে বাবা নিজেই হাত ধরে টেনে তুলে নিয়ে যাবেন। শুনে যেন শরীরে রোমাঞ্চ জাগে। শেষ রাত তিনটে থেকেই পল্লীটি সজাগ হয়ে ওঠে। বিছানা বাঁধা, হাতমুখ ধোয়া চা পানের চেষ্টা, সকলেই ব্যস্ত। সকলের এগোবার তাড়া। কেহ যাচ্ছেন, কেহ ফিরছেন, ফিরতি পথের যাত্রীরা যেন চলতি পথের যাত্রীদের প্রতি কৃপাচক্ষে চান। আমরা চলতি পথের যাত্রীরা সসংকোচে ওদের উপদেশ, নির্দেশ শুনি। গুপ্তকাশী থেকে রওনা হয়ে কিছুদূর গিয়েই দারুণ উৎরাই। নেমেই যাচ্ছি। বুড়ি বলে “ও দিদি, কেদারশৃঙ্গে উঠব তো নামছি কেন?” চন্দ্রদা বললেন, ‘কষ্ট না করেই কেষ্ট চাও দিদি, উঠবে নামবে, আবার উঠবে, আবার নামবে, এইকরেই তো জীবনের ভেলা তীরে পৌঁছায়। অনেক পর্বত লঙ্ঘন করে তো ইপ্সিত স্থানে পৌঁছাতে হবে। অনেকটা পথ নেমে এলে বিয়ঙ চটিতে পৌঁছলাম। সেখানে একটু বিশ্রাম করে সঙ্গে আনা রুটি তরকারী আর চটির চা যোগে প্রাতরাশ শেষ করে উঠে পড়লাম। চটি থেকে বেরিয়েই একটি স্বল্প পরিসর নদী পার হলাম। চড়াই আরম্ভ হল, উঠছি তো উঠছিই। মাঝে মাঝে একটু দাঁড়িয়ে দম নিতে হয়। আশ্চর্য লাগে যে সামান্য আধ মিনিটেই ক্লান্তি দূর হয়। আবার নুতন উদ্যম, নুতন শক্তি পাই। নীচে ফেলে-আসা চটির দিকে তাকিয়ে মমতা হয়। অজানা পথে চলার একটা উন্মাদনা আছে। জানিনা সামনে কি আছে, কিন্তু কি যেন দেখব এই আশা নিয়ে বেশ এগোনো যায়। বেশ কিছু চড়াই-উৎরাই করে মৈখণ্ডায় পৌঁছান গেল বেলা প্রায় ১০টার কাছাকাছি। অপর্ণা একটু অসুস্থবোধ করতে ওখানেই বিশ্রাম, স্নান আহার সেরে নেওয়া গেল। ছড়িদারই রান্নাবান্না করে এবং রামভক্তের মত হাতজোড় করে খাবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। বুড়ি তার নাম দিয়েছে হনুমান সিং। কুলিরাও আমাদের সঙ্গেই খাওয়াদাওয়া করে। মৈখণ্ডায় নাকি মা দুর্গা মহিষাসুরকে বধ করেছিলেন।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ বর্ণিত দেবীচণ্ডীর অসুর নিধনে যে মহাযুদ্ধ হয়েছিল তাতে মহিষাসুরের সঙ্গের যুদ্ধই বোধহয় চরম হয়েছিল। সেই যুদ্ধের প্রতীক নিয়েই আমরা শক্তির আরাধনা করি। যুদ্ধান্তে দেবী বিশ্রামের জন্য একটি দোলনায় বসেছিলেন, পাহাড়ী ভাষায় সে ‘ঝুলা’টি এখনও ঝুলছে। মস্ত দুটি কাঠের খুঁটিতে শিকল দিয়ে ঝোলান একটি দোলনা। আমরাও একটু করে দোল খেলাম, যদিও অসুর বধ করিনি। শক্তির অংশ বলে গৌরব প্রাপ্য আছে।

ছোট্ট একটি মন্দির, তাতে সোনারুপার পাতের উপর মায়ের আবক্ষ মূর্তি। মন্দিরটি খুবই ছোট, পূজারীও অতি দরিদ্র, কিন্তু পূজার উপকরণ বেশ জমকালো। রূপার বড় পুষ্পপাত্র, কোশাকুশি, দীপদান ইত্যাদি দেখে আনন্দ লাগল যে এত দারিদ্র্যের ভিতর থেকেও এরা এই মূল্যবান্ পূজার উপকরণ রক্ষা করে এসেছে।

স্নান সেরে পূজা দিলাম। পূজারীকে কিছু দক্ষিণা দিতেই সে খুব বিনীত ও সংকুচিতভাবে হাত জোড় করে কিছু প্রার্থনা করল। একটু ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম কি তার প্রার্থণা। সে যা চাইল তাতে বিস্মিত হলাম। অনেক সংকোচের সঙ্গে সে এক পোয়া চাল চাইল, মায়ের ভোগ চড়াবে বলে। এদের সরলতা এবং উদারতায় নিজেদেরকে লজ্জিত মনে হলো। আমাদের দেশে দেবস্থানে গেলে ভক্তি পূজা সব মাথায় উঠে যায়, পাণ্ডা পূজারী ও ভিখিরীদের হাত থেকে আত্মরক্ষার্থে। তাদের চাওয়ার শেষ নেই। মৈখণ্ডার পূজারীকে কিছু চাল ও ফিরবার পথে বঙ্কিম কাটাচটি থেকে কিনে এনে একখানা কাপড় দেওয়ায় তার মুখে যে আনন্দজ্যোতি দেখলাম, সেই যেন দেবদর্শন হলো। বিশেষ কোন যাত্রী ওখানে থামে না, এক মাইল দূরে কাটা চটিতেই গিয়ে সকলে বিশ্রাম করে। আমরা মৈখণ্ডায় স্নান-আহার সেরে বিকেলে কাটা চটিতে গিয়ে রাত্রের আশ্রয় নিলাম। দোতলায় একখানা ঘর বাথরুম সহ পাওয়া গেল। অপর্ণা বেশ অসুস্থ হয়ে পড়ল। গোপালের ডিস্‌পেনসারি সঙ্গেই আছে। তারই সদব্যবহারে সকালে ওকে কিছুটা সুস্থ করে দিল। কেদারনাথের পথে, 'কাটা' নাম হলেও এইটিই সবচেয়ে আস্ত ও সমৃদ্ধ চটি। দোকানপাট আছে। সবরকম জিনিষই পাওয়া যায়। চাষিদের কাছ থেকে বাঁধাকপি কিনতে গেলাম। কুণ্ডুস্পেশালের দুদিকের বহুযাত্রীর সঙ্গে দেখা হল। ভয় ভরসা অনেক পেলাম। সবথেকে আশ্চর্য্য লাগল, হিমালয়ের অভয়বাণী যেন সর্ব্বদা অন্তরে অনুভব করি। ভয় তো লাগেই না বরং সব কিছুতেই যেন আনন্দ পাই। আনন্দ স্রোতে ভেসে এগিয়ে চলি। সকালে অপর্ণাকে একটি ঘোড়ায় পিঠে বসিয়ে আমরা চলা সুরু করলাম, এ চলা যেন প্রিয়জনের জরুরী আহ্বান। কাটাচটি থেকে কিছুটা এগিয়ে খানিকটা উৎরাই, পথটি বড়ই বিপদসঙ্কুল। নুতন রাস্তা তৈরীর আয়োজনে পুরানো পাকদণ্ডীও নষ্ট হয়েছে, নুতন রাস্তাও তৈরী হয় নাই। ঝুর ঝুরে বালি মাটি তার সঙ্গে আলগা পাথর, যেখানে পা দিই ঝুর ঝুর করে খসে যায়। পাথরে পা দিলে তা গড়িয়ে পড়ে। কোনমতে লাঠিতে ভর রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে চলি। চন্দ্রদা সকলের পিছন থেকে সবাইকে সাবধান করে চলেন। মনের আবেগে এগিয়ে চলি, মাঝে মাঝে ভয় হয় "কঠিন কেদার" দুর্গম পথ, এই বোধহয় পরীক্ষা শুরু। ভক্তের ভগবান আমাদের ভয় দূর করবার জন্যই বোধহয় এমন এক দৃশ্য সামনে এনে দেখালেন, যে ভয় ভাবনা সবই মন থেকে বহুদূরে সরে গেল। আমরা আবার উঠছি সেই দুর্গম পথ ধরে; দেখি গুন গুন করে গান করতে করতে একটি পঁচিশ-ছাব্বিশ বৎসরের মেয়ে, কোলে একটি মাস ছয়েকের বাচ্চা নিয়ে অবলীলাক্রমে নেমে আসছে। তার পিছনে প্রায় সত্তর-বাহাত্তর বৎসরের এক বৃদ্ধা লাঠি ধরে ওর সঙ্গে সঙ্গেই নেমে আসছে। থমকে দাঁড়িয়ে ওকে জিজ্ঞাসা করি কোথা থেকে আসছে সে। মেয়েটি একগাল হেসে বলল, "বাবা ডেকেছিলেন, দেখে এলাম। অবাক হয়ে বলি, "কেদারনাথ মন্দিরে গিয়েছিলে"? সে বলল, "হ্যাঁ গাঁয়ের কয়েকজন বাবার দর্শনে গেল দেখে মায়ের মন খুব খারাপ হয়ে গেল। বয়েস হয়েছে, সঙ্গী নেই, পয়সারও অভাব। মায়ের (শাশুড়ীর) কাতর মুখের দিকে চেয়ে মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। স্বামীকে বললাম, যাও না মাকে নিয়ে কতলোক যাচ্ছে। বুড়োমানুষের শেষইচ্ছা পূরণ করতে হয় ছেলের। তিনি বললেন, আমার সময়ও নেই, অর্থও নেই। ইচ্ছে থাকলে, মনের জোর থাকলে সবই সম্ভব। অভিমান বশেই শাশুড়ীকে বললাম "মা, যাবে আমার সঙ্গে? আমি নিয়ে যাব। কতলোক যাচ্ছে। তাদের পিছনে পিছনে হেঁটে চলে যাব। বাবার দয়া থাকলে ঠিক পৌঁছে যাব"। কথা হলো বাচ্চাকে নিয়ে, চলে এলাম ওকে নিয়েই। বাবা ঠিক টেনে নিয়ে গেলেন। যাব বললেই বাবা হাত ধরে টেনে তুলে নেন, আবার দর্শন হলেই ঘাড় ধরে নামিয়ে দেন। বরফের ঠাণ্ডায় গরীবের থাকার উপায় থাকেনা"। উত্তরপ্রদেশের

মেয়েটি এ কয়টি কথা বলে তৃপ্তির হাসি হেসে চলে গেল। দুপুরে রামপুর চটিতে গিয়ে বিশ্রামের ব্যবস্থা হ'লো। 'কাটা' বাদে আর সব জায়গায়ই কালী কমলীওয়ালার ধর্মশালা আছে। জলের প্রচুর ব্যবস্থা। দৈনন্দিন জীবনের যা অপরিহার্য, সব ব্যবস্থাই আছে। এ সবের খোঁজখবরের জন্য চন্দ্রদা প্রস্তুত। কোথায় পোষ্টঅফিস আছে, কোথায় স্নানের ভাল বাথরুম আছে। কোন দুষ্প্রাপ্য জিনিষ আবিষ্কার করতে তিনি ওস্তাদ, সবই তিনি খুঁজে বার করেন। জীবন-রঙ্গভূমির এ এক দৃশ্য। কতক আসছে, কতক যাচ্ছে, স্থায়ী কেহ নয়। বৎসরের পাঁচমাস এসব জায়গায় প্রাণ-চাঞ্চল্য জাগে। যাত্রী আসবে যাবে, সেজন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করবার ব্যবস্থা, বীজাণুনাশক ঔষধ ছড়ান, জলের ব্যবস্থা ইত্যাদিতে ধর্মশালার চৌকিদার, চটিওয়ালারা সকলেই ব্যস্ত থাকে। বাকী ক'মাস নির্জীব নিস্তব্ধ হয়ে থাকে এসব অঞ্চল।

উত্তরখণ্ডের এসব দিকে বসতিও বিরল। দূরে দূরে দু'চার ঘর বসতি নিয়েই গ্রাম। কৃষিজিবীই বেশীর ভাগ। কঠিন পাথরে ফসল ফলান কম বাহাদুরী নয়। এরা অল্পে তুষ্ট। কিন্তু কর্তব্যে নিষ্ঠা এদের মহৎগুণ। "এরা ছোট ঘরে বড় মন লয়ে থাকে"। ছেলেরা কুলির কাজ করে অনেকে। মেয়েরাই ক্ষেতের কাজ করে বেশী। যার যত জমি আছে, তার সেই অনুসারে ত্রিযুগীনারায়ণের মন্দিরের কাছাকাছি গ্রাম দেখে স্ত্রী গ্রহণ করতে হয়। বেড়াতে গেলাম। ওখানে বেশ কয়েক ঘর বসতি দেখলাম। এক জায়গায় দেখি, জমিতে কাজ করছে তিন চারটি মেয়ে, একজন বয়স্ক গৃহিণী, বাকী কম বয়সী বেশ সুন্দরী মেয়েরা। বয়স্কা মহিলাকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, ওরা সব একই স্বামীর গৃহিণী। একখানা করে জমি কেনে, আর একজন করে স্ত্রী ঘরে আনে। না হলে জমির কাজ চালানো অসুবিধা। এটাতে ওদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই খুব সম্মান। পাথরে শস্য জন্মান বড়ই শ্রমসাধ্য। অল্পে তুষ্ট প্রাণে ওরা সুখী জীবন যাপন করে। রাস্তায় বাচ্চা মেয়েরা সুই-তাগা (সূতা) চেয়ে নেয়, তার তাৎপর্য্য বুঝলাম ওখানে গিয়ে, একটি কাপড় বা জামার আপন কলেবর সবই চাপা পড়ে গেছে, নানা বর্ণের তালির নীচে, সুই সূতা দিয়ে ওরা যতদূর সম্ভব সেলাই করে চালিয়ে যায়। বেশ লাগে নানা অঞ্চলের জীবনযাত্রা দেখতে, জানতে।

ত্রিযুগীনারায়ণ তিনযুগের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। হরপার্বতীর বিবাহ-বেদীতে ফুলজল দিলাম। বিবাহের যজ্ঞাগ্নি এখনো জলছে দেখাল পূজারী, তাতে সকলেরই কাঠ দিয়ে আহুতি দিতে হয়। আমরাও দিলাম। স্থানমাহাত্ম্য এমন, ওখানে দাঁড়িয়ে মনে হল যেন সত্যি কোন পবিত্র বিবাহমণ্ডপে এসেছি। অনুচ্চ পাহাড় ঘেরা এই সুন্দর প্রাঙ্গণে হয়ত কত যুগ আগে এই পবিত্র অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিম্বা কোন ধ্যানযোগী, হিমালয়-কন্যা পার্বতীর শিবের সঙ্গে মিলনের নির্জন এই গিরিকন্দরটি কল্পনা করেছিলেন। আনন্দদায়ক পরিবেশ।

ত্রিযুগীনারায়ণ কেদারের রাস্তা থেকে কিছুটা ভিন্ন পথ। সেখান থেকে নেমে এসে গৌরীকুণ্ডের রাস্তা। বেলা দশটার সময় গৌরীকুণ্ডে পৌঁছান গেল। থাকবার ঘর ভাল পেলাম না। কিন্তু বাহির দৃশ্যে মন ভরে গেল।

ডাইনে মন্দাকিনী উপল খণ্ডে বাধা পেয়ে পেয়ে সরোষে সগর্জ্জনে বেগে বয়ে চলেছে, সে এক মন-মাতান দৃশ্য। বিরাট বিরাট পাথর তার পথ রোধ করেছে, সে বাধা অতিক্রম করবার সেকি ক্ষুব্ধ প্রয়াস। সেই বরফগলা ঠাণ্ডা প্রবাহিনীর পাশেই বড় একটি উষ্ণ-কুণ্ড। সে জল ফুটন্ত গরম। একই যায়গায় পাঁচগজের ভিতর ভিতর এই দুই বিপরীত আবির্ভাব, প্রকৃতির একি লীলা। ঐ উষ্ণ প্রস্রবণের বোধহয় ওখানে একান্ত দরকার ছিল। কেদারনাথের সিংহদ্বারে স্নান করে শুচিশুদ্ধ হয়ে নিতে ঠাণ্ডার দেশের গরম জল বড়ই কাম্য ছিল। সত্যি আমরা মন্দাকিনীর ঠাণ্ডাজলের

সঙ্গে গৌরীকুণ্ডের ফুটন্ত জল মিশিয়ে আনন্দে প্রচুর স্নান করে নিলাম।

একুশ তারিখ ভোরে বেশ স্বচ্ছন্দমনে রামওয়ারার দিকে রওনা হলাম। মনে এখন খানিকটা ভরসা এসেছে, প্রায় পৌঁছে গেছি, আর মাত্র ৭ মাইল। অবশ্য পাহাড়ী পথে মাইলের মাপ শক্তির এবং পথের অবস্থার উপর নির্ভর করে। আমাদের মন খুসিতে ভরা। ডানদিকে স্রোতস্বিনী মন্দাকিনী, বাঁয়ে নির্জ্জন নিবিড় বনের ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর সমতল স্থান। সেদিকে তাকিয়ে মনে হলো এই সেই "তপোবন"। যেখানে ধ্যানমগ্ন মুনিগণ ভগবৎ দর্শন করতেন ঐসব জায়গায় গেলে সকলের মনেই কিছুনা কিছু আধ্যাত্মিকভাব জাগে। কয়েকজন সঙ্গী বললেন, তারা ঘোড়ায় চড়ে গিয়ে সেদিনই কেদারে পৌঁছুবেন। আমাদের প্ল্যান ঐ দিন রামওয়ারাতে রাত কাটিয়ে সকালে কেদারে পৌঁছব।

ভগবান পাকা জহরী, মাল যাচাই করে নেন। গৌরীকুণ্ড থেকে রামওয়ারা পৌঁছুতে সেই চরম পরীক্ষা দিতে হয়।

(ক্রমশঃ)

স্বাধীনতার অধিকার রক্ষা

পরাধীনতা খুবই লজ্জা ও অপমানকর অবস্থা। অপরের আজ্ঞাবহ হইয়া জাতীয়ভাবে জীবন নির্ব্বাহ করা এমনই একটা সমবেত ও সমষ্টিগত দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধ পরিস্থিতি যাহার তুলনায় ব্যক্তিগত দাসত্ব ততটা ঘৃণ্য ও মনুষ্যত্ব বিনাশক মনে হয় না। এক ব্যক্তি কোন সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে মানব মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, শত শত ব্যক্তি সেইভাবে মহামারীর প্রকোপে শয্যাশায়ী হইলে জনসাধারণের মনে তাহার ভয়াবহতা সহস্রগুণ প্রকট হইয়া দেখা দেয়। এক ব্যক্তির হাস্য অথবা আর্ত্তনাদ অপরের মনে যে ভাব জাগ্রত করে সহস্র ব্যক্তির হাস্য কিম্বা ক্রন্দন সেই তুলনায় সহস্রাধিকগুণের অধিক প্রবল মনোভাব জাগাইয়া তুলিতে পারে। সংখ্যাধিক্য গণিতের অঙ্কের অনুপাতে মানসিক প্রতিক্রিয়ার জোর বাড়ায়না; তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক শক্তিতে সে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হইতে দেখা যায়। সুতরাং এক ব্যক্তি অপরের কথায় উঠিলে বসিলে যে দাসভাব প্রতিভাত হয়; লক্ষব্যক্তির পরাধীনতা তাহা হইতে লক্ষগুণের অধিক লজ্জা ও অপমানের বিষয় বলিয়া প্রমাণ হইবে।

অল্পসংখ্যক লোকের আজ্ঞাপালন করিয়া যদি বহু সংখ্যক মানুষ নিজ ইচ্ছা ভুলিয়া হুকুমের দাস হইয়া থাকে, তাহা জাতীয়ভাবে পরাধীন হওয়া অপেক্ষা শ্রেয় হইলেও স্বাধীনতার আদর্শের বিপরীত অবস্থা এবং সেইরূপ ব্যবস্থার কোন বিশেষ কার্য্যকরী প্রয়োজন অথবা মূল্য না থাকিলে তাহার অবসান সদাই বাঞ্ছনীয়। সামরিক অথবা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেখা যায় একের কথায় বহুলোক কাজ করিতেছে, কাজের সুব্যবস্থার জন্য। সেসকল ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মতামত ভালমন্দ বিচার প্রভৃতির কোন কথা উঠে না। এবং সেই সকল ক্ষেত্রে সংযত ও সংহতভাবে কাজ চালাইবার উদ্দেশ্যে বহুব্যক্তি একের কথায় উঠে বসে। অপরাপর ক্ষেত্রে নীতিরীতি ও পদ্ধতির আলোচনায় সদা সর্ব্বদাই ব্যক্তিগত মতামত প্রকাশের সুযোগ ও সুবিধা থাকা স্বাধীন অবস্থার পরিচায়ক। যে দেশে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা নাই, সে দেশেও যদি মতামত প্রকাশ করিলে মানুষকে নির্য্যাতন ভোগ করিতে হয়, তাহা হইলে সে দেশে যথার্থ স্বাধীনতার অভাব আছে বলিতে হইবে। ব্যক্তিগত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের ক্ষেত্রেও মানুষকে যদি সামাজিক মঙ্গল বা সমাজবিরুদ্ধতা বিচার না করিয়া পরের নির্দেশ মানিয়া চলিতে বাধ্য করা হয়, তাহা হইলেও স্বাধীনতার আদর্শ খর্ব করা হয়। জাতীয় পরাধীনতা থাকিলে কোন জাতির সকল মানুষকে অন্য কোন জাতির আদেশ পালন করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু জাতীয় পরাধীনতা না থাকিলেই কোন জাতির পূর্ণ স্বাধীনতা আছে একথা প্রমাণ হয় না। কারণ বিদেশীর দাসত্ব না করিয়াও কোন জাতির স্বাধীনতা আংশিক বা পূর্ণভাবে লোপ পাইতে পারে। এইরূপ ঘটিবার কারণ নানা প্রকার হইতে পারে। যথা; কোন নিজ দেশবাসী স্বৈরাচারী একছত্র অধিপতির প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লইলে অথবা লইতে বাধ্য হইলে জাতি বিশেষের স্বাধীনতা সুরক্ষিত থাকা সম্ভব হয় না। একজনের প্রভুত্ব না হইয়া ঐ প্রকার প্রভুত্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীরও হইতে পারে। ঐরূপ গোষ্ঠী সামরিক বাহিনীর অন্তর্গত হইতে পারে অথবা রাষ্ট্রীয় দলগতও হইতে পারে। আধুনিক যুগে বহুদেশে কোন কোন রাষ্ট্রীয়দলের আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ দলগুলির মধ্যেও দেখা যায়

কোন নেতা অথবা নেতাদিগের ক্ষুদ্র গণ্ডি প্রবল পরাক্রমে সমগ্র জাতির উপর প্রভুত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা আইনতঃ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিলেও নেতৃত্ব অথবা রাষ্ট্রীয়দলের প্রভুত্বের চাপে একটা বিরাট জনবহুল মহাজাতির মধ্যে সেই স্বাধীনতার প্রকাশ কোথাও কোথাও কিছু মাত্রও দেখিতে পাওয়া যায় না। বলা যাইতে পারে যে অপর দেশের অধীনতার তুলনায় নিজ দেশের লোকের দাসত্ব করা ততটা অসম্মানজনক নহে। কিন্তু মানবসমাজে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে বিদেশীর প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অপেক্ষা স্বজাতির প্রভুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধই অধিক ঘটিয়াছে। সুতরাং যদি কোথাও কখন দেখা যায় যে স্বজাতীয় ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী ছলে বলে কৌশলে দেশবাসীর উপর একাধিপত্য স্থাপন চেষ্টা করিতেছে তাহা হইলে সকল স্বাধীনতার উপাসকের কর্ত্তব্য হইবে তৎক্ষণাৎ সেই চেষ্টা বিফল করিবার চেষ্টা করা। নিজ জাতির নিজ দেশের উৎপীড়কের উৎপীড়ন সহ্য করিবার বিশেষ কোন নীতি অনুগত কারণ নাই। অত্যাচারী স্বজাতীয় হইলেও অত্যাচার মানিয়া লইবার কোন ঔচিত্য জন্মলাভ করে না। শোষণ নিজ জাতির লোকে যদি করে তাহা হইলে সেই শোষণ স্বরূপ পরিবর্ত্তন করিয়া সেবায় বা সাহায্যে পর্য্যবসিত হয় না। তাহা হইলে স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী মানুষমাত্রেরই সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত যে কোন পথ দিয়া কখন তাহার স্বাধীনতার উপর আক্রমণ পরিচালিত হইতে পারে। নিজ জাতির বা নিজ দেশীয় ব্যক্তি অথবা রাষ্ট্রীয়দলের হস্তে যদি মানুষের মানবতার অধিকার সমূহ নিষ্পেষিত হইয়া নষ্ট হইয়া যায় অথবা নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা ঘটে, তাহা হইলে মানুষকে অচিরাৎ সাবধান হইতে হইবে এবং সংগ্রামও করিতে হইবে যাহাতে ঐরূপ কিছু না হইতে পারে।

আমাদের দেশের মানুষ স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার অধিকার সমূহ রক্ষা করিতে অন্যান্য দেশের সহিত তুলনায় ততটা সজাগ, সতর্ক ও তৎপর নহে। পরের হাতে নিজের অধিকার তুলিয়া দেওয়া এদেশে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে এবং নিজের অধিকার নিজের হাতে রাখার যে একটা আত্মসম্মান রক্ষার দিক আছে তাহাও অধিকাংশ মানুষ গভীরভাবে অনুভব করিতে সক্ষম নহেন। এই অবস্থায় ভারতের রাষ্ট্রীয় দলগুলি নানা উপায়ে দেশবাসীর রাষ্ট্রাধিকার বেদখল করিয়া তাহাদিগকে শোষণ করিয়া নিজেদের স্বার্থরক্ষাতেই ব্যস্ত থাকে; সর্ব্বসাধারণের সেবা, উন্নতি, সুযোগ, সুবিধা প্রভৃতি লইয়া রাষ্ট্রীয়দলগুলি বিশেষ মাথা ঘামান প্রয়োজন মনে করে না। "উন্নততর" রাষ্ট্রীয় আদর্শের মূল্য হিসাবে তাঁহারা যাহা চাহেন তাহাকে ঠিক দক্ষিণা বলা চলে না। রাজস্ব, খাজানা বা মাশুল বলিলেও মিথ্যা বলা হয় না। কিন্তু টাকায় মূল্য আদায় করিয়াই আদায় শেষ হয় না। মানুষের স্বাধীনতার অধিকার অবধি যখন রাষ্ট্রীয়দল নিজ করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করে তখন দলকে দমন করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়ে। সেইরূপ অবস্থাও প্রায়ই সৃষ্ট হইতে দেখা যায় ও সেই সময় দেশবাসীর মঙ্গলের কথা রাষ্ট্র-নেতাগণ বিচার না করিয়া দলের স্বার্থতেই পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিয়া রাষ্ট্রীয় কর্ত্তব্য সম্পূর্ণ করেন। ভারতের বিগত কুড়ি-বাইশ বৎসরের ইতিহাস চর্চ্চা করিলে দেখা যায় যে ভারতবাসীগণ পূর্ব্বের তুলনায় ক্রমে ক্রমে অধিক হইতে অধিকতর হারে রাজস্ব দিতে বাধ্য হইয়া তাহার পরিবর্তে ক্রমবর্দ্ধনশীল ভাবে উন্নতির শাসনব্যবস্থা উপভোগ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। চুরী, ডাকাইতি, নরহত্যা, নারীনির্য্যাতন প্রভৃতি ক্রমে ক্রমে বাড়িয়াই চলিয়াছে। বেকার সমস্যা প্রকটতর হইতেছে। শিক্ষা, চিকিৎসা, শান্তিরক্ষা ক্রমে অবনতির দিকেই গড়াইয়া চলিয়াছে। নিয়মকানুনের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্রীয়দলের ও আমলাগোষ্ঠীর শক্তিবৃদ্ধি হইতেছে; কিন্তু তাহাতে জনসাধারণের কোনও লাভ হইতেছে না। ভাড়া বাড়িলেও রেলগাড়ীর যাতায়াত অধিক করিয়া সময়রক্ষা করিতেছে কেহ বলিবে না। পোষ্টঅফিস, টেলিগ্রাফ দফতর ও টেলিফোন ক্রমশঃ এত খারাপ হইতেছে যে দেশবাসী ঐ সকল বিভাগের

অক্ষমতার ফলে সভ্যজগতের অতি সাধারণ ও সর্ব্বত্র প্রচলিত সুখ-সুবিধার অনেকাংশই ভারতে উপভোগ করিতে পারেন না। সর্ব্বাপেক্ষা অন্যায় হইল লোক বুঝিয়া সুযোগের সৃষ্টি ব্যবস্থা। সুযোগ সুবিধা সকলের সমান থাকিবে ইহাই হইল স্বাধীনতার একটা প্রধান লক্ষণ। যে দেশে সকল সুযোগ সুবিধার ভাগবাট পক্ষপাত দোষদুষ্ট এবং কে কাহাকে পৃষ্ঠপোষক পাইলে কি করাইয়া লইতে পারে, ইহাই কার্য্যক্ষেত্রের সফলতার প্রধান মন্ত্র, সেদেশে স্বাধীনতা আছে বলা চলে না। ভারতের স্বাধীনতার যুগে সুযোগ সুবিধাপ্রাপ্তি কাহারও জন্য নিছক ন্যায়ের পথ বাহিয়া চলে নাই। কে কাহাকে দিয়া বলাইয়া কহাইয়া কি করাইয়া লইতে পারে, তাহার উপরেই প্রাপ্তির সম্ভাবনা নির্ভর করিয়াছে। লাইসেন্স, পারমিট বিতরণ কার্য্যে রাষ্ট্রীয় দলের দলপতিদিগের প্রভাব বিশেষ করিয়া কার্য্যকরী প্রমাণ হইয়াছে এবং সকলেই যে মানুষকে শুধু আত্মীয়তা ও ভালবাসার খাতিরে সাহায্য করিয়াছেন এরূপ চিন্তা করিবার কোন কারণ দেখা যায় না। প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই দেনাপাওনার কথা উঠিয়াছে। বাস, ট্যাক্সী, আবগারী অনুমতি, সিনেমাগৃহ, বিদেশী বাণিজ্য, ব্যবসায়ে সরকারী সাহায্য, মালপত্র সরবরাহ বহন অথবা বিক্রয় ব্যবস্থা—সকল বিষয়েই সুপারিশ রীতির প্রাধান্য লক্ষিত হইয়াছে ও রাষ্ট্রীয় দলপতিদিগের নিকট জোড়হস্তে উপস্থিত হইয়া ও উপুড় হস্ত করিয়া কার্য্য সিদ্ধি করাই স্বাধীন ভারতের কর্মজীবনের সাফল্য-নীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঐ দলপতিদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিলে মানুষের নানা অসুবিধার সৃষ্টি হইয়া থাকে। দোকানদারের মালবিক্রয় হয় না, কারখানায় শ্রমিক-আন্দোলন আরম্ভ হয়, পাঠ্যপুস্তক আর পাঠ্য থাকেনা, সংবাদপত্রে সরকারী বিজ্ঞাপন বন্ধ হয়, আয়কর বিভাগ প্রবল হস্তে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে আরম্ভ করিয়া অবাঞ্ছিতজনের জীবন কর্মবহুল করিয়া তোলে—আরও কত কিছু হয় তাহার ফিরিস্তি দীর্ঘ হইয়া পড়ে। মোট কথা হইল রাষ্ট্রীয় দলপতিদিগের প্রাধান্য মানিয়া ও তাঁহাদিগের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সকলকে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে এইপ্রকার অবস্থাকে স্বাধীনতা বলা চলে কি না। রাষ্ট্রীয়দলের দাসত্বের মূল রহিয়াছে ঐ সকল দলের নেতাদিগের দেশবাসীর উপর প্রভুত্বের দুরাকাঙ্খা। দেশবাসীর মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তিই অল্পশিক্ষিত নিরক্ষর ভীরু ও দরিদ্র। সেই কারণে তাহাদিগের যে রাষ্ট্রীয় অধিকার তাহা অন্যায় উপায়ে নিজ করায়ত্ত করা রাষ্ট্রীয়দলের নেতাদিগের পক্ষে সহজ হয়। স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে সজাগ যাঁহারা তাঁহাদিগের মধ্যেও অনেকে দুর্নীতির পথ ছাড়িয়া দল পাকাইয়া দেশবাসীকে শোষণ করিতে নারাজ নহেন। সুতরাং ভারতের মানুষের ভোটের অধিকার থাকিলেও তাহা ব্যবহারে তাহারা পূর্ণরূপে সক্ষম নহে। কঠোর হস্তে সকলকে ন্যায়ের পথে প্রতিষ্ঠিত রাখিবার চেষ্টাও শুধু অল্প কয়েকজন ভারত-বাসীকে করিতে দেখা যায়। ভারতে স্বাধীনতার আদর্শ আজ তাই ক্ষুণ্ণ ও তাহার বিশেষ কোন মূল্য সাধারণের নিকট নাই।

সমালোচক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সচ্চিদানন্দ চক্রবর্তী

ঠাকুরপরিবারস্থ রবীন্দ্র অনুগামী সাহিত্য-স্রষ্টাদের মধ্যে বলেন্দ্রনাথের নাম সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ। স্বল্পায়ুতা তাঁহার সাহিত্যিক কৃতিকে পরিপূর্ণ আকারে বিকশিত হইবার সুযোগ হইতে বঞ্চিত করিলেও তাঁহার জীবন-দেবতার প্রসাদলাভে বিরোধীতা করে নাই, যাহার ফলে বলেন্দ্রনাথের সৃষ্টিকর্ম্ম বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে চিরায়ুতা লাভ করিয়াছে। বাল্যকাল উত্তীর্ণ হইয়া বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার স্বাভাবিক সাহিত্যানুরাগ প্রবল আকার ধারণ করে। মাত্র পঞ্চদশ বৎসর বয়সে জ্ঞানদানন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকায় তাঁহার প্রথম রচনা আত্মপ্রকাশ করে। সংস্কৃত কলেজ ও হেয়ার স্কুল হইতে শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর পিতৃব্য রবীন্দ্রনাথের উৎসাহ ও উদ্দীপনায় তাঁহার জীবনধারা নূতনখাতে প্রবাহিত হইতে থাকে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের নিবিড় সাহচর্য্যে তাঁহার সহজাত সাহিত্যানুরাগ প্রবল আকার ধারণ করে এবং একনিষ্ঠ সাধকের ন্যায় তিনি অনন্যমনে সাহিত্য রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। ক্রমে ভারতী, সাহিত্য প্রভৃতি তৎকালীন খ্যাতনামা পত্রিকাগুলিতে তাঁহার রচনা প্রকাশিত হইতে থাকে। কাব্য এবং প্রবন্ধ উভয়বিধ রচনায় তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় লাভ করিয়া সে যুগের রসিকসমাজ পরিতৃপ্ত হন এবং অপেক্ষাকৃত অপরিণত রচয়িতার লেখনী হইতে নিখুঁত রচনার নিদর্শন পাইয়া অকৃপণ-ভাবে প্রশংসায় উন্মুখ হইয়া উঠেন।

বলেন্দ্রনাথের ঊনত্রিশ বৎসর (১৮৭০-৯৯) আয়ুষ্কালের মধ্যে মোট চতুর্দ্দশ বৎসর সাহিত্যরচনায় অতিবাহিত হয়। তাঁহার জীবদ্দশায় মাত্র তিনটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐগুলির নাম যথাক্রমে—'চিত্রকাব্য' নিবন্ধ (১৮৯৪), 'মাধবিকা' (কাব্য-১৮৯৬), 'শ্রাবণী' (কাব্য-১৮৯৭)। তাঁহার পরলোক গমনের আট বছর পরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর ভূমিকা ও ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী সম্বলিত স্বর্গীয় বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হয়।

বলেন্দ্রনাথের কবিতা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবমুক্ত না হইলেও উহাতে কবির গভীর রসসৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার প্রবন্ধ স্বকীয়তার বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই কর্ম্মে বলেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের সর্ব্বগ্রাসী সাহিত্যসাম্রাজ্যের প্রতিপত্তি হইতে আপনাকে দূরত্বের ভূমিতে স্বপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে সক্ষম হইয়াছেন। বস্তুতঃ রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্রপ্রবন্ধ' হইতে বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধ রচনার যে নবতম ধারার প্রবর্ত্তন লক্ষ্য করা যায় বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলিতে সেই ধারার সার্থক পরিণতি ঘটিয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয়না। ঠাকুরপরিবারের ঐতিহ্যবাহী ব্যক্তিপুরুষ হিসেবে সঙ্গীত রচনায়ও তাঁহার দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'ব্রহ্মসঙ্গীত' পুস্তকে সন্নিবিষ্ট তাঁহার রচিত দুইটি গান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বলেন্দ্রনাথের প্রবন্ধগুলি বিষয়বৈচিত্রে নানামুখী

চিন্তার ছাপ বহন করিতেছে। তাহাতে ভারতীয় ইতিহাসের যুগযুগাগত ঐতিহ্য সংস্কার এবং সাহিত্য-সাধনার মূলগত সত্যটি অনুস্যূত রহিয়াছে। সেইকারণে বুদ্ধিমান পাঠক যদি তাঁহার কয়েকটি মাত্র প্রবন্ধ বাছিয়া লইয়া অভিনিবেশসহ পাঠ করেন তাহা হইলে বলেন্দ্র নাথের রচনার অন্তর্নিহিত গুণাবলী উপলব্ধি করিতে বিলম্ব হইবেনা। তাঁহার প্রবন্ধে পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, চারুকলা, সংস্কৃতকাব্য, বৈষ্ণবসাহিত্য, সামাজিক-অনুশাসন বা বিধিনিষেধ সবকিছুরই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ আলোচনায় স্থান পাইয়াছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা বলেন্দ্রনাথের সকল শ্রেণীর রচনার বিষয় উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র তাহার একটি দিক্‌দর্শন করিব।' অর্থাৎ সাহিত্যের নিত্যনূতন রসসৃষ্টিতে নয়, পূর্ব্বসূরীর সৃষ্ট-সাহিত্যের রসবিচারে বা আধুনিক মনন ও বিশ্লেষণের মাপকাঠিতে ঐগুলির একটি বিজ্ঞানসম্মত মূল্যায়ণ কর্ম্মে বলেন্দ্রনাথ কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন বা কি পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বক্ষ্যমান আলোচনায় সেই বিষয়েই কিছু উল্লেখ করিব। বলাবাহুল্য বক্তব্যকে পরিস্ফুট করিতে যেমন দৃষ্টান্তের আশ্রয় গ্রহণ করা অপরিহার্য্য তেমনি দৃষ্টান্তকে সর্ব্বজনবোধ্য করিতে উদ্ধৃতির সহায়তাও অনিবার্য্য। এই কারণে আলোচ্য প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের রচনা হইতে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিগুলি নির্ব্বাচন করিয়া যথাযথভাবে পরিবেশন করা প্রয়োজন।

সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের ভাণ্ডারে কালিদাসের অবদান আদৌ নগণ্য নয়। বহু শতাব্দী অন্তেও তাঁহার কাব্যের আবেদন রসিকচিত্তে বিন্দুমাত্র অবসিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া একালের বাংলাসাহিত্যের সকল বিদগ্ধ সমালোচকগণ কালিদাসের কাব্যের বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী হইতে উহার মূল্যায়ণ করিয়াছেন। পাশ্চাত্যের পণ্ডিতসমাজ যথা ম্যাক্‌সমুলার, গ্যেটে প্রভৃতিও কালিদাসের কাব্যের সমাদরে অগ্রণী হইয়াছেন। বলেন্দ্রনাথও তাঁহার নিজস্ব রসবোধ ও কবিদৃষ্টির সাহায্যে কালিদাসের বিভিন্ন রচনাবলী—কাব্য ও নাটক একের পর এক পাঠ করিয়া তাঁহার অন্তরের প্রতিক্রিয়াগুলিকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। যেসকল প্রবন্ধের মাধ্যমে বলেন্দ্রনাথ কালিদাসের কাব্যের রসবিচার করিয়াছেন, সেগুলির নাম—কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা, 'মেঘদূত', 'দুষ্মন্ত', 'ঋতুসংহার', 'মালবিকাগ্নিমিত্র' ইত্যাদি।

বলেন্দ্রনাথের মতে—"হৃদয়াবেগ অপেক্ষা চিত্র-সৌন্দর্য্যই কালিদাসের কাব্যে সমধিক অভিব্যক্ত। কালিদাসের প্রকাণ্ড চিত্রশালায় রূপসীর পর রূপসীর চিত্র সুবিন্যস্ত এবং সমগ্র প্রকৃতি অনুকূলপ্রেমে ও সৌন্দর্য্যে অভিব্যক্ত। আমাদের চক্ষের সম্মুখে কেবল একটি চিত্রার্পিত মায়ারাজ্য রূপ-যৌবন সমাচ্ছন্ন এবং রমণীয়"। কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা যেসকল কাব্যে অধিকতর উজ্জ্বল তন্মধ্যে 'মেঘদূত' সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বলেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন: "মেঘদূত পৃথিবীর সাহিত্যে অদ্বিতীয় কেবল চিত্র-পরম্পরায়। কুবেরানুচরের দীর্ঘপথ, বর্ষাবিরহ এবং অভিসারের মায়া-রচনা। প্রতি বিরহিনীর দুঃখ বর্ণনায় যক্ষ আপন প্রেয়সীর বিরহবিধুর মূর্তি আঁকিয়া বাঁচে, প্রবাসীর কথায় মেঘের নিকট আপন হৃদয় খুলিয়া দেখায়। অলকার প্রমোদ-বিলাস বর্ণনা করে—প্রতিযোগিতায় তাহার বিরহ যেন সমধিক ফুটিয়া উঠে। কেবলই চিত্র ছবির পর ছবি"। কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' কাব্যও এই ধারার ব্যতিক্রম নয়। ইহাতেও চিত্রপরম্পরা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বলেন্দ্রনাথ অতি সংক্ষেপে ঐ চিত্রগুলির যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা এই—"প্রথমে হিমালয়ে বালিকা গৌরী। দ্বিতীয়ত: শিবের তপোবনে যুবতী গৌরী। তৃতীয়ত: গৌরীর তপোবনে বৃদ্ধশিব। চতুর্থত: শিবের বিবাহ"। কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী-প্রতিভা 'শকুন্তলা' নাটকে চরমরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ নাটক সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের উক্তি অনুধাবনযোগ্য: "শকুন্তলা নাটকের বিশেষত্ব এই যে, তাহার প্রতি ক্ষুদ্র ঘটনা এবং কথাবার্তা পর্য্যন্ত যেন তুলি দিয়ে আঁকা যায়

চিত্রকর যেমন রূপসীকে নানা অবস্থার মধ্যে ফেলিয়া এবং নানা ভঙ্গিতে আঁকিয়া তাঁহার সৌন্দর্য ফুটাইয়া তুলেন, কালিদাস সেইরূপ বিচিত্র দৃশ্য এবং বিভিন্ন ভাব ও ভঙ্গীতে যতরকমে সম্ভব শকুন্তলার সৌন্দর্য উদ্ঘাটন করিয়া দেখাইয়াছেন"।

খণ্ডচিত্র রচনায়ও যে কালিদাস সিদ্ধহস্ত ছিলেন সেবিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। এই বিষয়ে বলেন্দ্রনাথের কয়েকটি মন্তব্য স্মরণীয়: "সমস্ত রঘুবংশ যেন ইক্ষ্বাকুবংশের একটি দীর্ঘ প্রাচীন রাজপথ। কবি রথে চড়িয়া বর্ণনা করিতে করিতে চলিয়াছেন। দিলীপের প্রথম চিত্র রথযাত্রা। রঘুর দিগ্বিজয়ও এইভাবের; দেশ হইতে দেশান্তরে, দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে গমন। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বরসভাতেও কবির প্রতিভা দুই পার্শ্বের শ্রেণীবদ্ধ রাজগণকে অবলম্বন করিয়া এক একটি দৃশ্যকে পরে পরে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে।......মেঘদূতকাব্য মেঘচ্ছায়াস্নিগ্ধ দুই পার্শ্বের ছবি তুলিতে তুলিতে ভ্রমণ। ঋতুসংহার সম্বন্ধেও একথা খাটে। অমনতর নিতান্তই বর্ণনাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল।...... বিক্রমোর্ব্বশী যদিও নাটক, কিন্তু কবি নাট্যরীতি পরিহার করিয়া নায়ককে অরণ্যে অরণ্যে বিলাপপূর্ব্বক ভ্রমণ করাইয়াছেন। কখনও পাখী, কখনও মেঘ, কখনও লতা কখনও পর্বতের প্রতি খণ্ড খণ্ড উচ্ছ্বাস"।

কালিদাসের চিত্রকল্পের বিপরীত-ধর্ম্মা শক্তির অধিকারী ছিলেন মহাকবি ভবভূতি। ভবভূতির রচনা পণ্ডিতসমাজ ব্যতিরেকে সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তির নিকট দুরূহ ও দুর্ব্বোধ্য বলিয়া আজও অনাদৃত রহিয়া আছে। ভবভূতির 'উত্তরচরিত' কালিদাসের 'রঘুবংশের' তুলনায় স্বচ্ছ জনপ্রিয়তার অধিকারী। কিন্তু বলেন্দ্রনাথ সংস্কৃতসাহিত্যের রসসাগরে অবগাহন করিয়া কেবল ক্ষান্ত হন নাই তিনি উহার গভীরে ডুব দিয়াছেন। ফলে ঐ সকল কাব ভাণ্ডার হইতে মণিরত্ন আহরণ করিয়া রসিকসমাজে পরিবেশন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কালিদাসের কাব্য ও ভবভূতির কাব্যকে পাশাপাশি রাখিয়া তিনি বিচার করিয়াছেন। উভয়ের তুলনামূলক রসবিচার করিয়া ঐ সাহিত্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ নিরূপণ করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার নিকট কালিদাসের কাব্যজগৎ হইতে ভবভূতির কাব্যজগৎ কেবলমাত্র পৃথক নয় অভিনবও বটে। তিনি বলিয়াছেন: "এখানেও সৌন্দর্য্যের পর সৌন্দর্য্য সুবিন্যস্ত, এবং মানবহৃদয় বহিঃপ্রকৃতির সহিত নানা অদৃশ্যসূত্রে গ্রথিত হইয়া আপনাকে নানাভাবে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছে। কিন্তু কালিদাসের চিত্রশালায় মন যেরূপ ভ্রমরবৎ চিত্র হইতে চিত্রান্তরে, সৌন্দর্য্য হইতে সৌন্দর্য্যান্তরে, উপমা হইতে উপমান্তরে নীত হয় এবং লালফুল হইতে কেবল মধুর সৌন্দর্য টুকু সঞ্চয় করিতে করিতে অগ্রসর হইতে থাকে, ভবভূতির দৃশ্যকাব্যে মনে সেরূপ হিল্লোলে সঞ্চারিত হয় না—চক্ষের সম্মুখে ঘন নিবিড় অরণ্যানীর নীরন্ধ্র নিচুলনীলিম একটি গম্ভীর দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত হয় এবং দূরদিগন্তপটে মুদ্রিত মেঘমালাবৎ নীল শৈলশ্রেণী, গদগদভাষিণী নদী গোদাবরী, নিরন্তর ধ্বনিত নিবিড় নির্জ্জনতা সমস্ত মিলিয়া সেই নিবিড়তা আরও নিবিড়তর করিয়া তুলে; একটি সমগ্র সংহত দৃশ্য গাম্ভীর্য্যে মন অভিভূত হইয়া পড়ে"।

কালিদাস এবং ভবভূতির কবিকর্ম্মের বিচারকালে ঐ দুই কবির প্রতিভাকে তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করিয়া বলেন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন: "ভবভূতি যেখানে একটি মাত্র মেঘমন্দ্র সমাসে বিন্ধ্যপর্বতের অন্ধকার অরণ্য সম্মুখে মূর্ত্তিমান করিয়া তুলেন, কালিদাস সেখানে প্রত্যেক লতার এবং ফুলের স্বতন্ত্র আস্বাদটুকু ছাড়িতে পারেননা"। অন্যত্র তিনি ইহাও বলিয়াছেন, "কালিদাস যেখানে ফুলটি, মালাটি, মদরাগ ও চুম্বনবিলাস এবং তদানুসঙ্গিক সুন্দর জ্যোৎস্না, মধুরমলয় ও উদ্ভিন্নযৌবনা প্রকৃতি দিয়া খণ্ড খণ্ড সৌন্দর্য্য উদ্রেকে প্রিয়জনকে স্মরণ করাইয়াছেন ভবভূতি সেখানে অন্তরের অন্তরে ডুবিয়া মানবহৃদয়ের গভীর বেদনা অনুভব করেন এবং সেই বেদনার মধ্য হইতে প্রিয়জনকে

যেন মন্থন করিয়া তুলেন"। 'উত্তরচরিত' কাব্যের কবি প্রিয়জনের বিরহের বেদনাকে একটি সকরুণ রসে অভিষিক্ত করিয়া উপহার দিয়াছেন। বলেন্দ্রনাথ তাহাই উল্লেখ করিয়া এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন: "নাটকের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যেন কোন, প্রিয়াকুল করুণহৃদয়ে আপন গোপন মর্ম্মস্থলে প্রিয়জনকে বিদ্ধ করিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া আপনাকে তাহাতে ক্ষীণ করিতেছে এবং সেই নিবিড় মর্ম্মনিপীড়িত বেদনা কোথাও দেহ অবলম্বনে কোথাও হৃদয় অবলম্বনে, কোথাও চিত্রাবলম্বনে, কোথাও বা ছায়া অবলম্বনে অন্তরে বাহিরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে"।

কালিদাসের 'মেঘদূত' প্রেম ও বিরহের অপরূপ কাব্য। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অনবদ্য কবিকল্পনায় এই মেঘদূতের প্রাঞ্জল ব্যাখ্যান করিয়াছেন, নব নব কাব্য-সৃষ্টির মাধ্যমে বহুলোকের বিভিন্ন রুদ্ধ দুয়ার উন্মোচিত করিয়াছেন, সঙ্গীতের মাধুরীতে সুরের মূর্চ্ছনায়, ছন্দের ভঙ্গিমায় 'নবমেঘদূত' সৃষ্টি করিয়াছেন এবং কালিদাসের কাব্যকে নূতনতর মূর্ত্তিতে রসিকসমক্ষে উপস্থাপিত করিয়াছেন। বলেন্দ্রনাথও তাঁহার নিবিড় অনুভূতি ও গভীর রসবুদ্ধির সাহায্যে এই কাব্যকে পাঠ করিয়া বলিয়াছেন: "মেঘদূত গীতিকাব্য—কালিদাস ইহাতে বর্ষাকালের বিরহের প্রভাব দেখাইয়াছেন। বাহ্যজগৎ অন্তরের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করে, ইহা দেখানই তাঁহার উদ্দেশ্য। যক্ষের মুখ দিয়া তিনি মেঘকে যেকথা বলাইয়াছেন, তাহার ছত্রে ছত্রে বিরহ জলজল করিতেছে। ভাবের ঠিক রাগিণী ধরিতে পারিয়াছেন বলিয়াই তাঁহার কাব্যের এত গৌরব।"

মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত এই কাব্যের অন্যান্য গুণাবলী উল্লেখ করিয়া বলেন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন 'মেঘদূতে ছন্দের কেমন একটি গম্ভীর সৌন্দর্য্য দেখা যায়। বর্ণনার সঙ্গে ছন্দের একটা বেশ মিল খাইয়াছে। ছন্দের সঙ্গে' ভাবের সঙ্গে' কথার সঙ্গে এইরূপ প্রাণে প্রাণে মিলন হইয়াছে বলিয়াই মেঘদূত এক উচ্চঅঙ্গের কাব্য। তাহাতে অনুপ্রাস আছে, কিন্তু অনুপ্রাসবাহুল্যে কাব্যের প্রধান সৌন্দর্য্য ভাবের কোথায়ও হানি হয় নাই।"

ঋতুসংহার কালিদাসের প্রথম রচনা। রবীন্দ্রনাথের নটরাজ ঋতুরঙ্গশালা প্রতিভাবান কবির অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের রচনা। তাই তাহাতে যেমন নিখুঁত কল্পনা ও ভাবের প্রকাশ ঘটিয়াছে কালিদাসের 'ঋতুসংহার' কাব্যে কবি-প্রতিভার সেই সার্থক পরিচয় লাভ করা যায় না সত্য তথাপি সহজ ভাবকে যথাযোগ্য সরল ভাষায় পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। বলেন্দ্রনাথের মতে "ঋতুসংহারে কালিদাস মধুপের মত ছয় ঋতুর অন্তরে বসিয়া কেবলি আদিরসে মধুপান করিয়াছেন। বাহিরের জনকোলাহল জীবনমরণ, সুখ দুঃখ তাহার হৃদয় স্পর্শ করে নাই।" কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথের আলোচনাটি নাতিদীর্ঘ অথচ যুক্তিগ্রাহ্য। বলেন্দ্রনাথ মনে করেন "কালিদাসের রচনার অনেকগুলি গুণই মালবিকাগ্নিমিত্রে দেখা যায়; যথা সর্ব্বপ্রকার আড়ম্বরের অভাব, বলিবার সহজ ধরণ' মধ্যে মধ্যে সুবিধা পাইলেই কালিদাসের প্রকৃতিপ্রেমও ব্যক্ত হইয়াছে।"

কালিদাসের 'অভিজ্ঞানশকুন্তলা' সংস্কৃতসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাটক হিসাবে সমাদৃত হইয়াছে। যুগে যুগে বহু মনীষী পণ্ডিত এই নাটকের বিচার-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মল্লিনাথ, গজেন্দ্রগদাকর প্রভৃতি সংস্কৃত-সাহিত্যের টীকা ও ভাষ্যকারগণ ইহার ভিতরকার জটিলতাকে সরলান্বিত করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন। ঐ নাটকের কাহিনী, আঙ্গিক, পরিকল্পনা, প্রকরণ প্রভৃতি যেমন অতুলনীয় তেমনি ইহার ঘটনাসংস্থান, চরিত্রসৃষ্টি দৃশ্যসজ্জা সব কিছুই অননুকরণীয়। এই নাটকের প্রধান চরিত্র রাজা দুষ্মন্ত ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র। বলেন্দ্রনাথ এই চরিত্রের আলোচনা প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে স্মরণীয়—"দুষ্মন্তের চরিত্র সর্ব্বথা নায়কোপযোগী। সাহিত্য দর্পনে ধীরোদাত্ত নায়কের যেসকল গুণের উল্লেখ দেখা যায় তাহা দুষ্মন্তে অনেকটা মিলে বোধ করি। আত্মশ্লাঘা তাঁহার অভ্যাস নহে, হর্ষ বা শোকে তিনি একেবারে অভিভূত হইয়া পড়েন না। বিময়ে

তাঁহার গর্ব্ব প্রচ্ছন্ন, অঙ্গীকার প্রতিপালন তাঁহার ধর্ম্ম।…দুষ্মন্ত রীতিমত পুরুষ চরিত্র। তাঁহার হৃদয় আছে, কিন্তু সে হৃদয়ের সহিত মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। হৃদয় তাঁহার বুদ্ধির হাত ধরিয়াই চলে। দুষ্মন্তকে পুরুষ করিয়া কালিদাস তাঁহার চরিত্রগত সংলগ্নতা বজায় রাখিয়াছেন।"

সংস্কৃতসাহিত্যের আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটিকা 'রত্নাবলী'। শ্রীহর্ষ রচিত এই নাটিকা আলঙ্কারিকদের মতে দোষবিমুক্ত রূপকর্ম। সংস্কৃতি রীতি অনুযায়ী ইহা মিলনান্ত হইলেও ইহাতে বিরহের সুর খুবই স্পষ্ট। এই বিষয়ে বলেন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য "রত্নাবলী নাটকে বাসবদত্তার চরিত্রেই তেজস্বিতা প্রকাশ পাইয়াছে। রত্নাবলীর প্রণয়ব্যাপার আলোচনা করিলেই জুলিয়েটের সহিত তাহার ভাবের কতকটা সাদৃশ্য অনুভব হয়। গলায় লতা বাঁধিয়া রত্নাবলী একবার মরিতেও গিয়াছিল বটে। তবে সংস্কৃত নাটক নাকি মিলনান্ত না হইলেই নয় তাই এ দুর্ঘটনা আর ঘটিবার সুযোগ হইলনা। কিন্তু সেজন্য যে রত্নাবলী ট্র্যাজেডী নয় এমন বলা চলেনা। পরিচারিকাবৎসলা বাসবদত্তা স্বামীর মঙ্গলোদ্দেশে রত্নাবলীকে যখন তাঁহার উত্তমার্দ্ধ করিয়া দিলেন, তখনই রত্নাবলীর ট্র্যাজেডী অভিনীত হইল।"

'মৃচ্ছকটিক' নাটিকা সংস্কৃতসাহিত্যের একটি রমণীয় সৃষ্টি। ইহার অভিনবত্ব পাঠকসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছিল। আধুনিক উপন্যাসসাহিত্যের বিষয়-বস্তুর ন্যায় ইহার কাহিনী ও চরিত্ররূপায়ণ সর্ব্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় হইয়াছিল। বলেন্দ্রনাথ এক নিঃশ্বাসে এই নাটক সম্বন্ধে যাহা ব্যক্ত করিয়াছেন তাহার কিয়দংশ এই: "মৃচ্ছকটিক প্রাচীন উজ্জয়িনীর একখানি উজ্জ্বল সমাজ চিত্র। ইহাতে তপোবন নাই, ঋষ্যাশ্রম নাই, মানবহৃদয়ের চতুষ্পার্শে বহিঃপ্রকৃতি অত্যন্ত নিবিড় হইয়া আসে নাই; কেবল উজ্জয়িনীর রাজশ্যালক সার্থবাহ, গণিকাকন্যা, ধর্ম্মাধিকরণ, বিলাসভবন ও বৌদ্ধ-বিহার দিয়া তদানীন্তন সমাজের কতকগুলি সুন্দর চিত্র রচিত হইয়াছে এবং একটি প্রণয় কাহিনী সূত্রে এই সমস্ত চিত্রগুলি পরে পরে যথাশোভনরূপে গ্রথিত হইয়া মধ্য-যুগের সংস্কৃতসভ্যতার একটি অখণ্ড আদর্শ গঠিত করিয়া তুলিয়াছে।"…

সংস্কৃতসাহিত্য ব্যতীত বলেন্দ্রনাথ বাংলাভাষায় আদি কবিগণের এবং বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের কাব্যরসবিচারে যথেষ্ট পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার রসপিপাসুমন বাংলাকাব্যের বিভিন্ন কবিদের কাব্যকর্ম্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধিগত করিয়া উহার মূল্যায়নে ব্রতী হইয়াছেন। বাংলার আদি কবি বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস রুচিবান পাঠকের নিকট আজিও সমাদৃত। দুই কবির বিষয়বস্তু এক হইলেও জীবনবোধ ভিন্নরূপ। রাধাকৃষ্ণের মিলনবিরহ, পূর্ব্বরাগে, অনুরাগ, মান-অভিমান প্রভৃতি দুই কবিরই রচনার আলোচ্যবস্তু। কিন্তু ভাবের দিক দিয়া বিচার করিলে দুইয়ের দৃষ্টি-ভঙ্গির দুস্তর ব্যবধান। রাধার রূপবর্ণনায় বিদ্যাপতি যে আঙ্গিক ও শব্দসম্পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, চণ্ডীদাস তাহা সম্পূর্ণ রূপে পরিহার করিয়া নূতন পথে পদক্ষেপ করিয়াছেন। বলেন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়: "শুধু ভাবের কথা কেন, বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডিদাসের ভাষার ও বিস্তর প্রভেদ। বিদ্যাপতি হিন্দীর ধারে ধারে ফিরিয়াছেন; চণ্ডীদাস বাঙালী, তাঁহার লেখায় হিন্দী বড় একটা জোর করিয়া উঠিতে পারে নাই।…বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাসকে প্রেমের কবি বলা যাইতে পারে। প্রেমের সুরে চণ্ডীদাস যেমন গাহিতে পারিয়াছেন, বিদ্যাপতি তেমন পারেন নাই। সুখের প্রতি তাঁর একমাত্র টান নহে। একটা উচ্চভাবের প্রতি যাঁহার লক্ষ্য আছে—প্রেম আর মোহ যে সম্পূর্ণ বিভিন্ন পদার্থ তাহা তিনি জানেন।…

বিদ্যাপতির কবিতায় অনেক কথা বলিয়া একটি ভাব প্রকাশ হইয়াছে, চণ্ডীদাস ভাবটুকু ছুঁইয়া গেছেন মাত্র।…বিদ্যাপতির রাধিকা, চণ্ডীদাসের রাধিকা দুইজনেই শ্যামের রূপে মুগ্ধ, দুইজনেই বংশীধরের বাঁশীর-সুরে আকুল, কিন্তু চণ্ডীদাসের রাধার কথায় এই

আকুলতা যেমন ব্যক্ত হইয়াছে, বিদ্যাপতির রাধার তেমন হয় নাই।”

সবশেষে বলেন্দ্রনাথের এই মন্তব্য বৈষ্ণব সাহিত্য-রসিক পাঠকগণের বিশেষভাবে স্মরণীয়: ‘বিদ্যাপতির কবিতা দেখিলে তাঁহাকে পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়। বাস্তবিক তাঁহার লেখায় সংস্কৃতসাহিত্যের ছায়া দেখা যায়। তাঁহার উপরে জয়দেবের বিশেষ প্রভাব। চণ্ডীদাসের ছন্দ প্রায়ই কিছু ছুটন্ত; বিদ্যাপতি কিছু ধীর। কিন্তু লেখা দেখিয়া চণ্ডীদাসকে যেমন সহজে চেনা যায়, বিদ্যাপতিকে তেমন সহজে ধরা যায় না।”

জয়দেবের কবিতা বাঙালী পাঠকদের চিরকালের আদরের বস্তু। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয় সরকার হরপ্রসাদ-শাস্ত্রী প্রমুখ কাব্যবিচারকগণ এই কবির ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু হৃদয়াবেগ যাঁহাদের স্বল্প সেই সকল বুদ্ধিজীবী সমালোচকগণের নিকট জয়দেবের কবিতা অধিক সমাদর লাভে সমর্থ হয় নাই। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীর জয়দেব শীর্ষক আলোচনাটি উল্লেখ করা যায়। বলেন্দ্রনাথও লেখক হিসাবে হৃদয়াবেগ পুর্ণ হওয়া সত্ত্বেও সমালোচক হিসেবে বুদ্ধিজীবি সম্প্রদায়ভুক্ত। সেই কারণে জয়দেবের কাব্যের মূল্যায়নে তিনি অনুকূল মত প্রকাশ না করিয়া কিছুটা প্রতিকূল দৃষ্টিভঙ্গির নমুনা দেখাইয়াছেন।

বলেন্দ্রনাথ মনে করিতেন যে কবি জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দ কাব্যে “খণ্ড খণ্ড সম্ভোগে প্রেমকে বিক্ষিপ্ত-ভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন; অন্তরের অসীমতার দ্বারে ধূলিস্তূপ উচ্চ করিয়া দ্বাররোধ করিয়াছেন, সেধূলি পুষ্পরেণুর সুগন্ধ হইতে পারে, স্বর্ণরেণুর ন্যায় সুন্দর হইতে পারে, তথাপি তাহা উচ্চতর সৌন্দর্য্যরাজ্যের পথে বাধাস্বরূপ।” তিনি ইহাও বলিয়াছেন: “জয়দেবের কবিতা ক্রমাগত কর্ণে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তিজনক শব্দবর্ষণ করিয়া যায়, কিন্তু কল্পনা পটে কোনও চিত্র অঙ্কিত করেনা।”

প্রমথচোধুরীও তাঁহার জয়দেব শীর্ষক প্রবন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছেন “গীতগোবিন্দে আসল ধরিতে গেলে প্রেমের কথা নাই, কেবলমাত্র কামের বিষয়ই আলোচিত হইয়াছে। হৃদয়ের সহিত জয়দেবের সম্পর্ক নাই, শরীর লইয়াই তাঁহার কারবার।

বাংলাসাহিত্যে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের কবি-খ্যাতি অমরত্বে সুপ্রতিষ্ঠিত। বস্তুতঃ আজিও আমাদের দেশে রামায়ণ বা মহাভারতের কথা ও প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইলে বাল্মীকি বা ব্যাসদেবের নাম না করিয়া কৃত্তিবাস ও কাশীরামদাসের নামই উচ্চারিত হইয়া থাকে। এই অভ্যাসের প্রধান কারণ বাঙালীর চিন্তাধারায় এই দুই কবির অনুবাদকর্ম মূল মহাকাব্য অপেক্ষা অধিকতর সমাদরে গ্রথিত হইয়াছে। বলেন্দ্রনাথও বিশ্বাস করিতেন: “বাংলাদেশে কৃত্তিবাসের রামায়ণের কথা যে জানেনা তাহার জাতি ঠাহরাইয়া উঠিতে পণ্ডিতেরা পর্য্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়েন। রামায়ণ না জানিলে বাঙ্গালীত্বের অসম্পূর্ণতা রহিয়া যায়।

কৃত্তিবাসের রামায়ণ বাঙালীজাতির ভাবধারা ও সংস্কৃতির উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছিল। মূল রামায়ণ হইতে ইহার ব্যবধান বহুলাংশে সুস্পষ্ট। এই বিষয়টি বুঝাইতে বলেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: “কৃত্তিবাসের রামায়ণে যেসকল সৌন্দর্য্য বর্ণনা আছে, তাহা অবিকল বাল্মীকির অনুরূপ নহে। উভয়ের আরম্ভ এক নহে। কৃত্তিবাসের রত্নাকর ব্যাপার প্রাচীন ঋষিকবির গ্রন্থে নাই। অন্যান্য পুরাণের সাহায্যে কৃত্তিবাস আরও অনেক ঘটনা অম্লানবদনে রামায়ণের মধ্যে খুঁজিয়াছেন।...লক্ষ্মণ সীতাকে গণ্ডী বেড়িয়া রাখিয়া যান, মূল রামায়ণে বোধ করি একথা নাই। বাল্মীকি কপিপুঙ্গবকে ছদ্মবেশে রাবণের মৃত্যুবাণ হরণ করিতে দেখেন নাই। রামচন্দ্রের দুর্গোৎসব আদি কবির অজ্ঞাত। এই সকলই কৃত্তিবাসের রচনা।”

মূল মহাভারত যেমন মূল রামায়ণের পরে রচিত হইয়াছিল কাশীরামদাসের মহাভারত ও সেইরূপ কৃত্তিবাসের রামায়ণের পর প্রণীত হইয়াছিল। রামায়ণের

অনেক চরিত্রের সাদৃশ্য মহাভারতে লক্ষিত হয়। বলেন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যায়: "অর্জ্জুনের সহিত লক্ষ্মণের চরিত্রের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। দুইজনেরই প্রগাঢ় ভ্রাতৃপ্রেম, দুইজনেরই বীরত্ব দুইজনেরই জীবনেই প্রায় এক কারণে বনবাস। রাম ও যুধিষ্ঠিরের মধ্যেও সামান্য সাদৃশ্য অনুভব হয়। তবে লক্ষ্মণ অর্জ্জুনের মতন নয়। বিভীষণ ও বিদুর কতক একরকম। দুর্যোধন ও রাবণে তেমন সাদৃশ্য নেই। দুর্যোধন অপেক্ষা রাবণ লোক ভাল। রামায়ণে আর যাই থাকুক মহাভারতের একটি চরিত্র অভাব আছে—ভীষ্মদেব ভীষ্মকে মহাভারত বই আর কোথায়ও দেখা যায় না। ভীষ্ম মহাভারতে সম্পূর্ণ নিজস্ব।

বাংলাকাব্যের আদিপর্ব্ব সঙ্গীতধর্ম্মী রচনায় সমৃদ্ধ। বৈষ্ণবপদকর্ত্তাদের সুললিত সুমধুর ছন্দ বাঙালীর কর্ণে সঙ্গীতের সুর ঢালিয়া দিয়াছে। পরবর্ত্তীকালেও সাধক-ভক্তদের অবদান সেই ধারাকে পুষ্ট করিয়াছে। সাধক রামপ্রসাদ বাংলাসাহিত্যে আর একটি উল্লেখ-যোগ্য নাম। তাঁহার গান গীত হয়না এমন কোন গ্রাম বা শহর বাংলাদেশে আছে কিনা সন্দেহ। রামপ্রসাদ যে সুরের স্রষ্টা তাহা তাঁহার সঙ্গীতকে অমরত্ব প্রদান করিয়াছে। এই কবির গান সম্বন্ধে আলোচনাকালে বলেন্দ্রনাথ বলিয়াছেন: "রামপ্রসাদ গান রচনা করিতেন মায়ের পূজার জন্য। ফুলচন্দন নৈবেদ্যর মত সঙ্গীতই তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ ছিল।...রামপ্রসাদ সেনের প্রধান গুণ এই যে তাঁহার রচনায় কাপট্য নাই। ভাব বন্ধক দিয়া, হৃদয় বিক্রয় করিয়া, সঙ্গীতের মধ্যে আভিধানিক জ্ঞান এবং দুরূহে গুণখ্যাত অনভিজ্ঞতা প্রকাশে করিবার চেষ্টা রামপ্রসাদে দেখা যায়না। ধ্রুপদখেয়াল টপ্পায় তাঁহার কিছুই যায় আসেনা—ভাব তাঁহার সুর গড়িয়া লয়।...রামপ্রসাদের গানে আর একটি বিশেষ দ্রষ্টব্য বিষয় তাহার ছন্দ। রামপ্রসাদের গান বৈঠকে গাহিবার মত নহে। দশবিশজনে মিলিয়া গাহিবার গানও নহে। তাহাতে সে গানের প্রভাব অনুভব করা যায় না।"

অর্থাৎ একান্তে বসিয়া ভক্তিনম্রহৃদয়ে এই গানের সাধনাই ইহাকে উপভোগ করিবার শ্রেষ্ঠ উপায়।

মঙ্গলকাব্যের যুগে যে সকল কবি খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী অন্যতম। মুকুন্দরাম তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বিদ্যাপতি বা চণ্ডীদাসের ন্যায় সুগভীর ভাব প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইলেও আগাগোড়া ধর্ম্মের একটি সুর ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের মতে "জমকালো মূর্তি আঁকিবার তাঁহার যতটা চেষ্টা ছিল, গম্ভীর প্রশান্ত হৃদয় গঠন করিবার তেমন ঝোঁক ছিলনা। কালকেতু উপাখ্যান-খণ্ডেই কি, আর ধনপতি সদাগর কথায়ই বা কি—তাঁহার একটি চরিত্রও গম্ভীর হয় নাই। স্বয়ং চণ্ডীই গম্ভীর নহেন।...খুল্লনাকে কবি সীতাসাবিত্রীর মত করিবার কতকটা প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে খুল্লনার কুলবধূ ভাবটি রক্ষিত হইয়াছে স্বীকার্য্য। লহনারও সেভাব আছে।"

উপসংহারে বলেন্দ্রনাথ এই মন্তব্য করিয়াছেন: "ভাবের চরিত্র কবিকঙ্কনে নাই। 'সংসারের দৈনন্দিন খুঁটিনাটির মধ্যেই মুকুন্দরামের অবস্থিতি।"

মুকুন্দরামের অনুসরণে পরবর্ত্তীকালে একাধিক কবি মঙ্গলকাব্য রচনা করেন। তন্মধ্যে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দদাস নামে দুই কবির একত্রে রচিত মনসার ভাসান সুপরিচিত। ইঁহাদের সম্বন্ধে বলেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন: "মনসার ভাসান রচয়িতারা স্থানে স্থানে মুকুন্দরামকে অনুকরণ করিয়াছেন—শুধু ভাবে নহে, ভাষায় পর্য্যন্ত কবিকঙ্কনের সহিত অনেক ঐক্য দেখা যায়।...তাঁহারা যে উপাখ্যান লিখিয়াছেন তাহাতে কবিত্বরস বা ঘটনাবৈচিত্র্য বড় নাই, কেবল দুই চারিটা বাঁধা উপমা এবং অলৌকিক ঘটনায় যতদূর হয়।"

রামপ্রসাদের ভক্তিসঙ্গীত সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি প্রথম জীবনে বিদ্যাসুন্দর নামে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ঐ কাব্যে সেযুগের সামাজিক চিত্র সুপরিস্ফুট। বাংলাসাহিত্যের সেই মধ্যবর্ত্তীযুগে সমাজব্যবস্থার সেসব ত্রুটি-বিচ্যুতি ছিল,

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে ও পারিবারিক আচরণে তার বৈষম্য ছিল যে কুশ্রীতাহীনতা বা দুর্নীতিপরায়ণতা প্রশ্রয় পাইয়াছিল কবি তাহাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যাসুন্দররচয়িতাকে অনেকে অশ্লীলগ্রন্থ এই অপবাদ দিয়া তিরস্কার করিয়াছিলেন। ইহা ব্যতীত ভারতচন্দ্রের কাব্য বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান পাঠ করিয়া অনেকে এই ধারণাও করিয়াছিলেন যে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর অশ্লীলতার পর্য্যায়ভুক্ত। বলেন্দ্রনাথ কোনও প্রকার পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন না করিয়া স্বাধীন বিচারবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এই কাব্য অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাই এই উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি "রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের বিখ্যাত বিদ্যাসুন্দরেরই মত আদিরসের কাব্য; তাহাতে চঞ্চলচিত্ততা আছে, রূপতৃষ্ণা আছে, হীরামালিনী আছে, গুপ্ত প্রণয় আছে—সে প্রণয়ও সম্পূর্ণ রূপজ, সুড়ঙ্গ, সাথী, চোর, কোটাল, কিছুই বাদ যায় নাই, যদি কিছু বাদ গিয়া থাকে ত তাহা ভারতচন্দ্রেও বাদ গিয়াছে—তাহা ধর্ম্ম, আধ্যাত্মিকতা। ভাবের গভীরতা, সুগভীর সৌন্দর্য্যজ্ঞান প্রেমের মহান উচ্চআদর্শ, এ সকল রামপ্রসাদের গ্রন্থে নাই। নানাভাষার কথায়, বিবিধছন্দে, বিস্তর অনুপ্রাস দিয়া তিনি বিদ্যাসুন্দরের আখ্যায়িকা রচনা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্রাপেক্ষা তাঁহার ভাষা স্থানে স্থানে দুরূহ হইয়াছে মাত্র।···রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে চরিত্র-বিকাশ অপেক্ষা অনুপ্রাসের দিকে বেশী নজর দেওয়া হইয়াছে। ইহা একখানি ফরমায়েসী কাব্য। বিদ্যাসুন্দরের প্রেমকাহিনীতে কবির হৃদয় স্বতঃ-উদ্দীপিত হয় নাই।"

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের কিন্তু বাংলাসাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছে। তিনি কেবলমাত্র বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যান রচয়িতারূপেই পরিচিত হন। 'প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের কবিকুলের মধ্যে তিনি শেষ খ্যাতিমান পুরুষ এবং আধুনিক কালের অন্যতম স্রষ্টা। বাংলাসাহিত্যের মহাকবি মধুসূদন হইতে প্রথম চৌধুরী পর্য্যন্ত বিদগ্ধ সাহিত্যস্রষ্টাগণ অনেকেই ভারতচন্দ্রের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনার চাতুর্য্যে, বুদ্ধিনিষ্ঠার পরিহাসরসিকতায় অতুলনীয় বস্তু। বলেন্দ্রনাথের মতে "ভারতচন্দ্রের ছন্দের পারিপাট্য, পরিহাসরসিকতা, গল্প সাজাইবার ক্ষমতা এই সকলে সহজেই মন আকৃষ্ট হয়। এমনকি সাজসজ্জার প্রভাবে সময় সময় দোষগুলিকে সৌন্দর্য্য হইতে পৃথক করা দায় হইয়া উঠে। কথার কারিগরিতে তিনি অদ্বিতীয়। প্রকৃতির অন্তরে ডুবিয়া তাহার আনন্দ উপভোগ করিবার কবি ভারতচন্দ্র নহেন। তিনি ঘরকন্নার বর্ণনা করিতে পারেন, প্রাণ অপেক্ষা দেহকেই বুঝেন ভাল। মুকুন্দরামকে দারিদ্র্যের কবি বলিলে ভারতচন্দ্রকে বড়মানুষীর কবি বলা যায়। ভারতচন্দ্রের সুরে বিলাসের মন্দিরের ছায়া—তিনি যাহাই বর্ণনা করুন নাকেন তাঁহার প্রাণ ধরা পড়িবে।··· ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রামপ্রসাদ সেনের অপেক্ষা সরস। তাঁহার ভাষা সহজ, ভাব স্পষ্ট, গল্পেরও কারিগরি আছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতচন্দ্র ছিলেন স্বভাবকবি। কৃত্রিমতার প্রতি তাঁহার আদৌ প্রবণতা না থাকায় তিনি যথাযথ বাস্তব চিত্র অঙ্কনেই অধিক তৎপর ছিলেন। বলেন্দ্রনাথ তাহা লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছেন: "ভারতচন্দ্র যে পরিমাণে রঙ্গরসপ্রিয় তেমন কবি নহেন। রঙ্গরসের সুবিধা পাইলে ভারতের গাম্ভীর্য্য সৌন্দর্য্য বড় মনে থাকেনা। স্বাভাবিক মুখশ্রী স্বভাবগাম্ভীর্য্য এসকল অপেক্ষা বাকল, ভাঙ ধতুরার দিকে তাঁহার সহজে নজর পড়ে।"

'প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য' নামক প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে তৎকালীন যুগে আদিরসাত্মক কাব্য রচিত হইলেও এবং আপাতদৃষ্টিতে তাহা অশ্লীল বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাহার অবলম্বন ছিল ধর্ম্মবোধ। বস্তুতঃ প্রাচীন সাহিত্যের প্রধান চরিত্র যেমন রাধা, যশোদা, ইত্যাদি যে সকল কাহিনীর মাধ্যমে অঙ্কিত হইয়াছেন সেই কল্পনার মূলে প্রে[illegible] এবং ধর্ম্ম দুই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। বলেন্দ্রনাথ

দৃঢ়তার সঙ্গে স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন : "সীতা-সাবিত্রীর কাহিনী এদেশে স্ত্রী জাতির চরিত্র উন্নত আদর্শে গঠন করিয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ধর্মের সহিত, উৎসবের সহিত একীভূত হইয়া রাধিকার মত সাধারণ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে কোনও চরিত্রই পারে নাই।...... রমণীর প্রেম আমরা মাতৃভাবে, পত্নীভাবে, কন্যাভাবে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিয়াছি, কিন্তু কেবল রমণীভাব বড় দেখি নাই। রাধার চরিত্রে এই ভাব কতকটা ফুটিবার অবকাশ পাইয়াছে।"

যশোদা চরিত্রের বিশ্লেষণে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উচ্চারণ করিয়াছেন : "রাধার চরিত্রের মত যশোদা-চরিত্র জটিল নহে। যশোদা আমাদের দেশের স্নেহময়ী জননীর চিত্র। বৈষ্ণবসাহিত্যে ঈশ্বরপ্রেমের মানবীকরণ হইয়াছে, যশোদায় বাৎসল্যরসের অনুশীলন। ...যশোদা কন্যাও বটে, সহধর্মিনীও বটে, কিন্তু ফুটিয়াছেন মাতৃরূপে।...যশোদার অন্তর নির্বিবাদী, অসূয়াশূন্য, স্নেহগঠিত। কোমলতা তাঁহার প্রকৃতি, স্নেহ তাঁহার প্রাণ"।

'বাঙ্গলাসাহিত্যের দেবতা' বলেন্দ্রনাথের একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য কেবলমাত্র ধর্মাশ্রয়ী নয়, উহাতে দেবচরিত্রের ক্রিয়াগুলিও লক্ষণীয়। বস্তুতঃ দেবতা যেখানে মানুষের সহিত একাত্ম হইয়া গিয়াছেন সেখানে তাঁহাদের মাহাত্ম্য অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের একটি সরস উক্তি প্রণিধানযোগ্য : "বঙ্গসাহিত্যে শুধু চণ্ডী আর অন্নদা নহেন, যে কয়টি দেবতা আছেন এক একটি চণ্ডী। অষ্টপ্রহর কেবল আপন আপন পূজা গণিয়া কাটান— কে মানিল না মানিল; কে ভক্তি করে, কে করেনা, কে করে, কে নারাজ। চালকলা নৈবেদ্য আর গোটা দুই প্রণাম পাইবার লোভে ইঁহারা করিতে পারেননা হেন কাজ নাই। ...সংস্কৃতসাহিত্যের বড় বড় সম্ভ্রান্ত দেবগণ যেমন ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাংলাদেশে আসিয়া পদমর্য্যাদা একেবারে হারাইয়াছেন,'।

বলেন্দ্রনাথের 'শিব' শীর্ষক প্রবন্ধটি লেখকের সুগভীর মননের পরিচায়ক। ভারতের দুই ধর্ম— শৈবধর্ম ও বৈষ্ণবধর্মের মধ্যে বাঙ্গালী জাতি বৈষ্ণবধর্মেই অধিকতর আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার ফলে শিব চরিত্রের দৃঢ়তা, বীর্য্যবত্তা, পৌরুষ প্রভৃতি আমাদের সাময়িকভাবে নাড়া দিলেও চিরগ্রাহ্যবস্তু বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। বলেন্দ্রনাথের ভাষায়—"শিবকে আমরা মানবভাবে দেখিয়াই তাঁহার মহত্ব উপভোগ করি।...আমাদের প্রতিষ্ঠানে বৈষ্ণবধর্ম ভিন্ন আর কাহারও বড় প্রভাব দেখা যায় না। সেইজন্য বাংলার একমাত্র গৌরবের সাহিত্য বৈষ্ণবসাহিত্য। শৈবসাহিত্য আমাদের আদপেই নাই এবং শাক্তসাহিত্য যাহা আছে, তেমন উচ্চদরের নহে।"

বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমালোচনা শক্তির পরিচয় প্রদান করার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধ হইতে প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হইল। বলাবাহুল্য এইগুলি ব্যতীত তাঁহার বিভিন্নধর্মী বহু আলোচনা আছে যাহা তাঁহার গ্রন্থাবলীতে একত্রিত হইয়াছে। তাঁহার সাহিত্যের আলোচনামূলক অন্যান্য প্রবন্ধের মধ্যে বসন্তের কবিতা, স্মৃতি ও কবিতা আষাঢ়ে গল্প কবিও সেন্টিমেণ্টাল রচনা হিসাবে তথ্যপূর্ণ না হইলেও বক্তব্যের স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল। বাংলা গদ্যসাহিত্যের বর্তমান-কাল বহু গুণী শিল্পী ও মনীষির দানে সুসমৃদ্ধ হইয়াছে সত্য কিন্তু যে যুগে বলেন্দ্রনাথ গদ্যসাহিত্যের সৃষ্টিকর্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন সেই সময় বলিষ্ঠ গদ্যরীতির রচনাকার খুবই অল্প ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেব মুখোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রামেন্দ্রসুন্দর ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় দিকপাল পুরুষগণ যে যুগে গদ্য-সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন সেই সময় বলেন্দ্রনাথও তাঁহাদের অনুগমন করিয়া নূতন পন্থার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু কবিসমালোচক প্রিয়নাথ বলেন্দ্রনাথের পরলোক গমনের পর তাঁহার সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল 'গদ্যের সকল পর্দাই তাঁহার ক্ষমতার অধীন ছিল—গদ্যে এমন কোন

রহস্য বা ভঙ্গী নাই যাহা তাঁহার লেখনীর আয়ত্ত ছিলনা। এই সকল প্রবন্ধে তরুণ লেখকের রস-গ্রাহীতা শক্তি দেখিলে আশ্চর্য হইতে হয়- ততোধিক আশ্চর্য হইতে হয় ভাবোচ্ছল ভাষার কলাকুশল সংযম দেখিলে। শব্দ চয়নে বলেন্দ্রনাথের অদ্ভুত ক্ষমতা-এক এক একটি চিত্র এমন পূর্ণপ্রাণ পূর্ণঅবয়ব কথা বাংলাগদ্যে কোথাও দেখি নাই। অতঃপর প্রিয়নাথ সেন বলেন্দ্রনাথের সমালোচনা শক্তির বৈশিষ্ট্য কোথায় তাহা বুঝাইতে বলিয়াছেনঃ "প্রতিভার আর একটি মনোহর এবং প্রকৃতিলক্ষণ বলেন্দ্রনাথে বিদ্যমান—নির্ভীকতা। সমালোচনা বা মৌলিক রচনায় যখন যাহা তিনি অন্তরে অনুভব করিয়াছেন, সৌন্দর্য্যে পূর্ণ বিকাশের জন্য যাহা আবশ্যক বিবেচনা করিয়াছেন, বিনা সংশয় সঙ্কোচে তিনি তাহা প্রকাশ করিয়াছেন! এ নির্ভীকতা ক্ষমতার পরিচায়ক এবং প্রথম শ্রেণীর কলাপ্রধানের স্বভাবগত ধর্ম্ম" [প্রদীপ-১৩০৬, আশ্বিন-কার্ত্তিক]।

বলেন্দ্রনাথের রচনা রামেন্দ্রসুন্দরের ন্যায় অসামান্য পণ্ডিত ও বৈজ্ঞানিককে কিরূপ মুগ্ধ করিয়াছিল তাহা বুঝিতে তাঁহার আদি গ্রন্থাবলীর ভূমিকাটি পাঠ করা প্রয়োজন। সেই মূল্যবান ভূমিকার কিয়দংশ এই "বলেন্দ্রনাথের কোনও রচনা সুপাঠ্য বা ক্লেশে পাঠ্য নহে।...এই রচনাভঙ্গীই আমাকে প্রথমে আকর্ষণ করিয়াছিল, এমন সযত্নে গাঁথা শব্দের মালা তাহার পূর্ব্বে আমি দেখিলেই।...(বলেন্দ্রনাথ) ঐশ্বর্য্যের দীপ্তি অপেক্ষা সৌষ্ঠবের শ্রীছাঁদ দিবার চেষ্টা করিতেন, তাহার জন্য যে সুরুচির, যে সামঞ্জস্যবুদ্ধির, যে সংযমের প্রয়োজন ছিল তাহা প্রচুর পরিমাণে আয়ত্ত করিয়াছিলেন সমালোচকের পথ যে বৈজ্ঞানিকের পথ হইতে বহুদূরে বা বিভিন্ন মুখে তাহা মনে করিবার কারণ নাই।... বৃদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গুরুগম্ভীর উপদেশে নব্য বঙ্গ কর্ণপাত করা উচিত মনে করে নাই, মনীষী রবীন্দ্রনাথ যে মঙ্গলশঙ্খ মুহুর্মুহুর্ধ্বনিত করিয়া পথপ্রাপ্ত স্বদেশীকে আপনঘরের লক্ষ্মীমন্দিরের কল্যাণপীঠের অভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আবেদন করিতেছেন অধিকদিনের কথা নহে সে শঙ্খঘোষও তখনও শুনা যায় নাই। কাজেই বাঙালীর গৃহস্থালীতে সামাজিক প্রথার ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্ম্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে, যাহা শিব আছে তাহা সহসা আবিষ্কৃত করিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

সাময়িকী

হিন্দী চলচ্চিত্র

কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েকটি সিনেমাগৃহের উপর একটা আক্রমণ বোমা ও অগ্নি লাগাইয়া করা হইয়াছিল। আক্রমণকারীগণ কাহারা তাহা কেহ বলিতে পারে না; কারণ আক্রমণের রীতি আজকালকার পথে-ঘাটে সদা অনুষ্ঠিত ধ্বংশলীলার প্রচলিত ধরণেরই ছিল এবং সেই কারণে সকলে "নকশাল" প্রভৃতি কথা ব্যবহার করিয়া ঐ আক্রমণ সম্বন্ধে জনমত কি তাহা ব্যক্ত করিয়া দিয়াছেন। সত্যই কি কারণে ও কাহারা ঐ ভাবে সিনেমাগৃহে অগ্নি-সংযোগ বোমা নিক্ষেপ ইত্যাদি করিল তাহা অজানাই থাকিয়া যাইল। শুনা যাইল, "প্রেম পুজারি" নামক চিত্রে চীন-বিরুদ্ধ কোন কিছু থাকাতে চীনভক্ত লোকেরা ঐ আক্রমণ করিয়াছে। আরও শুনা যাইল হিন্দী-চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করিবার জন্যই ধ্বংশকার্য্য করা হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে হিন্দীচিত্র আজকাল অল্পবয়স্ক ব্যক্তিদিগকে কুশিক্ষা দিয়া থাকে ও সেই কারণে ঐ সকল চিত্র দেখান না হইলেই দেশের পক্ষে মঙ্গল। হিন্দী-চিত্রে নাকি যেসকল দৃশ্য দেখান হয় তাহাতে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অসম্মানকর ব্যবহার সকলকে শেখান হয়। আমরা হিন্দীচিত্র কখনও দেখি নাই, সুতরাং এই অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদিগের কোনও প্রকৃষ্ট জ্ঞান নাই। কিন্তু শুনা যায় যে হিন্দী-চিত্রতে নাচগান দাপাদাপির আধিক্যই প্রধানতঃ লক্ষিত হয়। আমরা পূর্ব্বে যেসকল নিন্দনীয় ধরণ-ধারণের কথা আমেরিকান চিত্রের সম্বন্ধে শুনিতাম, এখন সেই জাতীয় অপবাদ হিন্দীচিত্র সম্বন্ধেই শুনা যায়।

সে যাহাই হউক, চীনের নিন্দাবাদ কিংবা অশোভন ও উদ্দাম ব্যবহারের দৃশ্য প্রদর্শন কোন কিছুর জন্যই বোমা নিক্ষেপ ও সিনেমাগৃহে অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির সমর্থন করা যাইতে পারে না। এবং বাংলার পুলিশও নিষ্ক্রিয়ভাবে ঐ জাতীয় অরাজকতা দেখিয়া চুপ করিয়া থাকিলে তাহাও বিশেষভাবে নিন্দনীয় হইবে। চিত্র-প্রদর্শন সর্বদাই স্থানীয় বিচারকসভার অনুমতি ব্যতীত যথেচ্ছাভাবে হইতে পারে না। ঐ বিচার-ব্যবস্থা এখনও প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে বলিয়াই আমরা জানি। হিন্দীচিত্র যদি সভ্যতা, শ্লীলতা ও উচ্চ আদর্শ-বিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে তাহা দেখাইবার আদেশ যাঁহারা দিয়া থাকেন তাঁহারা নিজেদের কর্ত্তব্যসাধনে পূর্ণ যত্নবান আছেন বলা চলে না। সরকারীভাবে তাহা হইলে বিচারব্যবস্থা আরও উত্তম করিবার চেষ্টা হওয়া আবশ্যক। যাহারা সিনেমাগৃহের উপর মারাত্মক আক্রমণ করিয়া থাকে তাহাদের কার্য্য অতি অবশ্যই গর্হিত ও সমাজবিরুদ্ধতা দোষদুষ্ট। ঐ জাতীয় স্বৈরাচার নিবারণ, দেশ-শাসকদিগের কর্তব্য। সিনেমা প্রদর্শন করিয়া যাঁহারা অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহাদিগেরও মনে রাখা আবশ্যক যে অর্থোপার্জ্জন হইলেই তাঁহাদিগের সমাজের প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হইয়া যায় না। সেই কর্তব্য যথাযথভাবে করিলে যদি উপার্জ্জন কিছু কমও হয় তাহা হইলেও তাঁহাদের সামাজিক কর্ত্তব্য ভুলিয়া থাকিলে চলিবে না।

অজয় মুখোপাধ্যায়ের মন্ত্রীত্ব সমস্যা

যুক্তফ্রণ্ট গঠনের আরম্ভ হইতেই শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্ব যেভাবে অপর মন্ত্রীগণের মানিয়া চলা উচিত ছিল, কোন কোন মন্ত্রী তাহা করেন নাই ও সেইজন্য যুক্তফ্রন্টের রাষ্ট্রনীতি কার্য্যতঃ কোন বিশেষ আকার ধারণে সক্ষম হয় নাই। যে-সকল মন্ত্রী নিজ ইচ্ছায় অথবা নিজদলের নির্দেশে

যুক্তফ্রন্টের স্বরূপ গঠন সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় ছিলেন ও যাঁহাদের কর্ম্মপদ্ধতির বিশেষত্ব হেতু যুক্তফ্রন্ট "পলিসি" বিষয়ে যে ঠিক কি তাহা কেহ বুঝিতে সক্ষম হয় নাই; তাঁহাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রকটভাবে নিজেদের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পথের পথিক ছিলেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি-বসু ও তাঁহার রাষ্ট্রীয় দল—কম্যুনিষ্ট মার্কসিষ্টগণ। ইঁহাদিগের মতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীত্ব ভাগাভাগি করিয়া লইয়া বাংলার শাসনব্যবস্থাও দলগুলির ইচ্ছা অনুসারে চতুর্দ্দশ রকমের করিবার অধিকার অর্জ্জন করিয়াছেন। অর্থাৎ পুলিশমন্ত্রী যদি কম্যুনিষ্ট-মার্কসিষ্ট হ'ন তাহা হইলে বাংলার পুলিশও ঐ রাষ্ট্রমতের যাহাই অর্থ হউক সেই অর্থ অবলম্বন করিয়াই চলিবে। শিক্ষা, শ্রমিক-সম্বন্ধ নির্ণয়ন পদ্ধতি প্রভৃতিও ঐভাবে বিভিন্ন আদর্শের অর্থ বুঝিয়া চলিবে। সেই অর্থগুলিকে যদি যুক্তফ্রন্টের সংযুক্ত অবস্থার কার্য্যকরী মতবাদের অর্থ বলিয়া ধরা হয় তাহা হইলে যুক্তফ্রন্টগঠনের অথবা তাহার ৩২ দফা কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারণের কোন নির্দিষ্ট অর্থ থাকিতে পারিবেনা। নানান মুনির নানা মত মানিয়া চলিতে হইলে অনেক সময়ই ভিন্ন ভিন্ন শাসন-দফতরের মতামতে পরস্পর বিরুদ্ধতা লক্ষিত হইতে থাকিবে এবং কোনও ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রমতের দিক বিচার কোন নির্দিষ্ট মূল আদর্শ ধরিয়া করা সম্ভব হইবে না।

বস্তুতঃ যুক্তফ্রন্টের শাসনকার্য্যে যে দেশবাসীর কোন বিশেষ লাভ হয় নাই তাহার একটা বড় কারণ চৌদ্দ রকমের রাষ্ট্রমতের সংঘাত সহ্য করিয়া শাসনপদ্ধতির দিক ও গতি ঠিক রাখার বিভ্রাট। যেখানে মতবাদ বিশেষভাবে পরস্পরবিরোধী সেইস্থলে মিলিতভাবে কোন কাজ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়ে। কিন্তু কোন জোরাল কারণ থাকিলে মানুষ মতদ্বৈধ থাকিলেও মিলিত হইয়া চলিতে সক্ষম হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে যুক্তফ্রন্ট গঠিত হইয়াছিল কংগ্রেস বিরুদ্ধতার উপরে। কংগ্রেস নির্বাচনে পরাজিত হইয়া যাইতেই সকল দলের নিজ নিজ রাষ্ট্রীয় অভিপ্রায় প্রবলভাবে জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং কোন কোন দলের রাষ্ট্রধ্বংস করিবার ইচ্ছাও ব্যক্ত হইতে আরম্ভ করিল। সুতরাং সরল পথে চলা আবশ্যক হইলেও সম্ভব হইল না। নানা-প্রকার ফন্দি-ফিকির দেখা দিতে লাগিল এবং ঐ সকল কারণে নিজেদের মধ্যে মিলন রক্ষা ক্রমশঃ অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল।

ব্যাপারটা এই অবস্থাতেও হয়ত কোনমতে টিকিয়া থাকিতে পারিত কিন্তু কোন কোন দলের নেতাদিগের অপরাপর দলের প্রতি আক্রোশ হিংসার পথে চলিতে আরম্ভ করায় যুক্তফ্রন্টের মুখরক্ষা আর সম্ভব রহিল না। সর্বত্র মারামারি কাটাকাটি আরম্ভ হওয়াতে জন-সাধারণের আর যুক্তফ্রন্টের উপর আস্থা রাখা সম্ভব রহিলনা। অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় কয়েকদিন উপবাস করিয়া গান্ধীবাদ অনুসারে সত্যাগ্রহ করিলেন; কিন্তু তাহাও কার্য্যকরী হইল না। বোমাবর্ষণ, নরহত্যা প্রভৃতি সমানভাবেই চলিতে লাগিল। অজয়কুমার মুখোপাধ্যায় অতঃপর যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গিয়া দিবার কথা আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার মতে তিনি বাংলার বর্ত্তমান অরাজক অবস্থার দায়িত্ব বহন করিতে আর প্রস্তুত নহেন এবং যুক্তফ্রন্ট না থাকিলেই দেশের মঙ্গল।

গণ-আদালত

গ্রামে গ্রামে নাকি গণ আদালত বসান হইবে ও হইতেছে। এই আদালতের একটি বিবরণ বীরভূমের ময়ূরাক্ষী সাপ্তাহিকে ঐ জেলার লাভপুর হাইস্কুলের অবসরপ্রাপ্ত সহকারী প্রধান শিক্ষক শ্রীভোলানাথ পণ্ডিত প্রকাশিত করিয়াছেন। উহার কিছু কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:

লাভপুর থানার মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ম্ম তৎপরতা:—এ এলাকায় ধান কাটার মহা তাণ্ডব শেষ হওয়ার পর আরম্ভ হয়েছে মধ্যবিত্ত নির্য্যাতন পর্ব। তারা গণ-আদালত স্থাপনের নামে গ্রামের হণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা সেজে বসে আছেন। ২-২-৭০ তারিখে বৈকালে তারা এলেন আমাদের গ্রামে। কালীতলার আটচালায় হইল তাদের গণ আদালত। আটচালার চারিধার লাল

পতাকাধারী লাল রুমালের পাগড়ী মাথায়, লাঠি, পাটটাঙ্গী, বর্শা তীর ধনুক প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত বাহিনী। বিচারকের আসন অলঙ্কৃত করলেন লাভপুরের জনৈক এস মুখার্জী, স্বর্ণকার, নিমড়া নিবাসী গড়াই। ফরিয়াদী তাদেরই শিক্ষাপ্রাপ্ত গ্রামের কতিপয় হরিজন। Advocate হলেন বহুবার রাজদণ্ডে দণ্ডিত গ্রামের কমরেড, কুখ্যাত মাতাল মণ্ডল, তার পুত্র। গ্রামের কমিউনিষ্ট পার্টির বুদ্ধিদাতা অধিনায়ক হলেন Advocate General ইনি লাভপুর যাদবলাল হাইস্কুলের জনৈক কেরানী। আসামী আমার পুত্র শ্রীপ্রমোদ কুমার ওরফে মাকু পণ্ডিত। অপরাধ ২০।৩০ বৎসর হতে তিনি এই সব লোকের কাছে ১২ ০,০০ বারশত টাকা জরিমানা আদায় করেছেন। ইনক্লাব জিন্দাবাদ ধ্বনিসহ বিচার আরম্ভ হলো। প্রথম ফরিয়াদী অনাথ বায়েন বললে, আমার বয়স ৪০ বৎসর, আমি যখন বাচ্চা ছিলাম, তখন পণ্ডিত মশায় আমার বাবার কাছে একটা আমগাছ নিয়েছিল Advocate General প্রশ্ন করলেন গাছটির মূল্য কত? সে উত্তর দিল—৮০, আশি টাকা, অমনি বিচারক গড়াই লিখল, এই টাকার দায়ী মাকু পণ্ডিত। বায়েন বললে—আমি আমার মাকে মেরেছিলাম ৩৪ বৎসর আগে, মাথা ফেটে গিয়েছিল, পুলিশ এসে আমাকে ধরে, আমি পণ্ডিত মশায়কে টাকা দিয়ে খালাস হই। Advocate প্রশ্ন করেন কত টাকা দিয়েছিলে, উত্তর এলো ১০০ এক শত টাকা। অমনি বিচারক লিখলেন—এই টাকা মাকু পণ্ডিতের কাছে আদায় হবে। এলো জনৈক সদাই বায়েন, বললে, ২১৩ বৎসর আগে আমার হয় ক্ষয় রোগ, পণ্ডিত মশায় হাজার বারশত টাকা দিয়ে বাঁচান পরে আমি জমি বেচে পণ্ডিত মশায়কে টাকা দিই, মোটা অঙ্ক বলে প্রশ্ন করেন Advocate General কত টাকা দিয়েছিল, উত্তর হয় দুহাজার টাকা, এবার আবার ১০০০ এক হাজার টাকা মাকু পণ্ডিতের দেনার অঙ্কে লেখা পড়ল। এইরূপ ভাবে মাকু পণ্ডিতের কাছে আদালতের পাওনা দাঁড়ায় ১২০০,০০ বারশত টাকা, হুকুম হলো—৮।২।৭০ বৈকালে মাকু পণ্ডিতকে এই টাকা আদায় দিতে হবে, বিচারকরা বললেন গণ আদালতে বিবাদী কোন জেরা করতে পারবে না, কোন কাগজপত্র দেখাতে পাবেনা—বিবাদীর কোন defence নাই। বাদীর বাক্যই বেদ বাক্য। এই ব্যক্তিগণ, এই সমাজ বিরোধীরা এতদিন ধানকাটা পর্ব্বে বেশ দুপয়সা রোজগার করেছে, এখন এই মিথ্যা জবানবন্দী দ্বারা যদি কিছু রোজগার হয়।

তাদের মনে সন্দেহ জাগে সহজে এ টাকা আদায় হবে না। তাই ৮।২।৭০ তারিখ তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গ্রামে এসে উপস্থিত। চারিদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে আজ আমার বাড়ী লুঠ হবে। ঐ দিন নিকটবর্ত্তী কাপশুন্দী গামে মধ্যবিত্তদের "হামেলা নিরোধ সংস্থায়" মিটিং চলিতেছিল তাদের কাছে এ সংবাদ পৌঁছিলে প্রায় চার পাঁচ শত লোক আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত হন ও আমাকে বিপন্মুক্ত করেন। সেই অবধি নিত্যই তাদের গালিগালাজ শুনছি, তারা প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছে আমাদের বাড়ী লুট করবে, আমাদিগে ঘেরাও করবে। তারা গুণ্ডা প্রকৃতির সমাজবিরোধী লোক। এ সবই তাদের দ্বারা সম্ভব। আমি নিতান্ত বিপন্ন ও সদাই শঙ্কাযুক্ত—কখন কি হয় এই ভাবি। আমি নিরাপত্তার জন্য জেলা কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি।

চোখ ফুটিতেছে

বাংলার জনসাধারণ আশা করিয়াছিলেন নূতন পন্থায় রাষ্ট্র পরিচালনা হইবে এবং তাহার ফলে দেশের লোকের সুখ-সুবিধা নানাভাবে বর্দ্ধনশীল হইবে। কিন্তু যাহারা রাষ্ট্রীয় নির্ব্বাচনে দাঁড়াইয়াছিলেন ও নানা প্রকার লোভ দেখাইয়া ভোটগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে দেশবাসীর বিশেষ কোন লাভের ব্যবস্থা করিতে অবতীর্ণ হইলেন না। নিজ নিজ স্বার্থে অথবা দলের লোকের সুবিধাই দেখিতে লাগিলেন, ফলে সর্ব্বত্র অন্যায়ভাবে ধান কাটিয়া লওয়া, লুটপাট, মারপিট ঘেরাও ও অন্যান্য অত্যাচার বাড়িয়াই চলিতে লাগিল। দেশবাসী অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। বিভিন্ন দলগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও প্রকট ও হিংস্রভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। ইহার ফলে যে সকল খণ্ডযুদ্ধ অনুষ্ঠিত

হইয়াছে তাহাতে বহু লোকের প্রাণ ও অঙ্গহানী হইয়াছে। অর্থাৎ নূতন প্রথায় রাষ্ট্র পরিচালনার ফলে দেশে চূড়ান্তভাবে শান্তি নষ্ট হইতেছে এবং মানুষের আত্মমর্য্যাদা অথবা ধন সম্পত্তিরক্ষা অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছে। এখন সকলে রাষ্ট্রীয় দলগুলির নিন্দাবাদ সুরু করিয়াছেন। কিন্তু তাহা করিলেই কি দেশবাসীর নিজেদের দোষ কাটিয়া যাইবে? তাঁহারা যখন জানিয়া শুনিয়া এমন সকল লোককে ভোট দিয়া রাজাসনে বসাইয়াছেন যাহারা আইন ভঙ্গ ও অপরাধ করিতে কোনও দ্বিধাবোধ করেনা, তখন দেশের বর্ত্তমান অবস্থার জন্য দেশবাসী নিজেরাই পূর্ণমাত্রায় দায়ী। এই ভোট দিবার মধ্যে নির্বুদ্ধিতা ও ভীরুতা দুই দোষই ছিল। ভয় পাইয়া গুণ্ডা প্রকৃতির লোকেদের কথায় যাঁহারা উঠেন বসেন অথবা জাতীয় সভ্যতা, কৃষ্টি ও ঐতিহ্য বিরুদ্ধতার সহায়তা করিতে যাহাদিগের লজ্জা হয়না, সেই সকল ব্যক্তির যখন নিজেদের কর্মফলে দুর্দশা হয় তখন কাহারও তাঁহাদিগের প্রতি সহানুভূতি হইতে পারে না। তাঁহারা যদি অতঃপর স্থিরবুদ্ধিতে বিচার করিয়া ভোট দিতে শিখেন এবং যাহার তাহার হস্তে রাজশক্তি তুলিয়া না দিয়া দেশের ও দশের ভবিষ্যতের কথা মনে রাখেন তাহা হইলে হয়ত তাঁহারা এই দুর্দ্দশা কাটাইয়া উঠিতে সক্ষম হইতে পারেন। সাক্ষাৎভাবে ও গায়ের জোরে ব্যক্তিগত কিংবা সামাজিক ন্যায় অন্যায় স্থির করিয়া লওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইলে সভ্যজগতে তাহাকে অরাজকতাই বলা হয়। আইন আদালত থাকার কোন অর্থই হয় না যদি মানুষ দল জুটাইয়া পরের ধান কাটিয়া লইতে অথবা অপরের জমি দখল করিতে পারে। কাহাকেও ঘরে বন্ধ করিয়া ক্ষুধার খাদ্য ও পিপাসার জল পাইতে না দিয়া জোর করিয়া দাবী মানিতে বাধ্য করিলে তাহাও আইন বা ন্যায়সঙ্গত হইতে পারেনা। অরাজকতাকে রাষ্ট্রিয় পন্থার গৌরব-দান কখনও সভ্য জগতে চলিতে পারেনা। এই সকল কথা কখনও যে দেশবাসীকে আলোচনা করিয়া বুঝাইতে হইবে, ইহাও আমরা কল্পনা করিতে পারিতাম না। কিন্তু সময়দোষে বহু অন্যায়ই প্রশ্রয় পাইতেছে ও তাহার প্রতিকার না হইলে দেশের সর্ব্বনাশ হইবে।

যে সকল রাষ্ট্রীয় দলগুলিকে সংযুক্তভাবে রাষ্ট্রশাসন কার্য্যের ভার দেওয়া হইয়াছে সেই দলের সভ্যগণ রাজ্যশাসন কার্য্যে কোন সাহায্য না করিয়া পরস্পরের উপর বোমাবর্ষণ ও অপর উপায়ে পরস্পরকে আক্রমণ করিয়া দিন কাটাইতেছেন। উদ্দেশ্য কি তাহা সাধারণ মানুষে বুঝিতে পারিতেছে না; কেহ পারিতেছে কি না তাহাও বলা যায় না। মতদ্বৈধ আছে বলিয়া শুনা যায় কিন্তু সে মতদ্বৈধের সহিত দেশবাসীর জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের বিশেষ কোন সম্বন্ধ নাই। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদি সকলেরই প্রয়োজন, আর প্রয়োজন উপার্জ্জনের ব্যবস্থা ও সুবিধার। যাহাদের কিছু আছে তাহারা খাজনা, মাশুল, রাজকর দিয়া শাসনকার্য্য চালান সম্ভব করেন। এই সকল কথার ভিতরে উচ্চাঙ্গের কোনও দার্শনিক তত্ত্ব অথবা দুর্ব্বোধ্য আদর্শ নাই। সবই সহজ সরল সাধারণ কথা। ইহা লইয়া মাথা কাটাকাটি কিম্বা গলা কাটাকাটির বিশেষ প্রয়োজন হয় না। সুতরাং কলহ বিবাদ ঘটিলে বুঝিতে হইবে যে তাহার সহিত শাসনকার্য্যের কোন গভীর যোগ নাই; ঝগড়াটা একান্তই দলাদলির ফল ও তাহার জন্য দেশবাসীর মাথা ঘামাইয়া বিশেষ কোন লাভ হইবার সম্ভাবনা থাকিবেনা। কোথাও কোথাও কাহার জমি বা ফসল লইয়া মারপিট হইতে পারে কিন্তু দেশের সর্ব্বত্র যে শান্তি ভঙ্গ হইতেছে তাহার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির ভাগবাটের কথা অল্পক্ষেত্রেই উঠিতেছে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি না থাকা যাহাদের মত তাহারাও অনেক ক্ষেত্রে জমি দখল করিবার জন্য দাঙ্গা করিতেছে। সমষ্টিবাদ, সমাজবাদ, ব্যক্তির অধিকার, বেতন বা মজুরীর হার সকলের সমান হইবে না কর্মকৌশল ও উৎপাদন মূল্য হিসাব করিয়া কম বেশী হইবে; ইত্যাদি বহু কথাই আলোচিত হয়। কিন্তু কোন কথাই কার্য্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত নিয়মাদিতে প্রতিফলিত হইতে দেখা যায় না। ঝগড়া বিবাদ প্রায় সর্ব্বক্ষেত্রেই শুধু "মোহকা লড়াই"।

দেশ বিদেশের কথা

শান্তিরক্ষার জন্য সামরিক ব্যবস্থা

আজকাল প্রায়ই শুনা যাইতেছে যে পশ্চিম বাংলায় যদি রাষ্ট্রপতি শাসন ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে সর্বত্র প্রবল বিক্ষোভ ও রক্তারক্তি আরম্ভ হইবে। কোন কোন রাষ্ট্রীয় দলের লোকেদের হস্তে বহু আগ্নেয় অস্ত্র আসিয়াছে ও তাহারা সেই অস্ত্র ব্যবহার করিতে দ্বিধা করিবে না। কেন্দ্রীয় সরকার এই জন্য না কি পশ্চিম বাংলায় বহু সৈন্য পাঠাইয়াছেন ও সেই সৈন্যদল নানা স্থানে ছাউনি করিয়া হুকুমের অপেক্ষায় মোতায়েন রহিয়াছে। এই সকল খবর নূতন করিয়া প্রায়ই প্রচার করা হয়। কখন কখন কিছু কিছু সৈন্য রাজপথ দিয়া যাতায়াত করিয়া নিজেদের উপস্থিতি জাহির করিয়া থাকে। কিন্তু আমরা দেখিতেছি যে গত বৎসর ডিসেম্বর মাসেও সামরিক শক্তি ব্যবহারের কথা ভাল করিয়াই বলা হইয়াছিল। কিন্তু তখন তাহার উদ্দেশ্য ছিল ক্রীকেট খেলায় গোলমাল যাহাতে না হয় তাহার ব্যবস্থা করা এখন হইয়াছে ইউনাইটেড ফ্রন্ট গভর্ণমেণ্ট ভাজিয়া যাইলে যাহাতে বিক্ষুব্ধ রাষ্ট্রীয় কর্ম্মীগণ সর্ব্বত্র মারপিট করিয়া শান্তিভঙ্গ করিতে না পারে তাহার আয়োজন করিবার জন্য। সামরিক ব্যবস্থা করিবার কোন প্রয়োজন না হইতে পারে এবং না হইলেই উত্তম। কিন্তু যদি প্রয়োজন হয় তাহা হইলে যথা সম্ভব শীঘ্র সাহায্য পাইলে সকলের পক্ষে মঙ্গল।

পশ্চিম বাংলায় হিংস্র পরিস্থিতি

২রা ডিসেম্বর কলিকাতার নিকটস্থ একটা জমিদখল করিতে গিয়া তিনজন লোক জখম হয়। পরে একজন মারা যায়।

৩রা ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে একজন জোতদারের সহায়ককে তীর মারিয়া হত্যা করা হয়।

৪ঠা ডিসেম্বর কলিকাতায় বড় বাজারে পুলিশের গুলিতে তিনজন লোক প্রাণ হারায়। একটি বিরাট জনতা ঐসময় রাস্তা বন্ধ করিয়া ও গাড়ী জালাইয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছিল।

৫ই ডিসেম্বর শিলিগুড়িতে দালে করিয়া নামক একজন আর এস পি কর্ম্মী আহত অবস্থায় হাসপাতালে অবস্থান কালে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

১৯৬৯ খৃঃঅব্দে বাংলাদেশে রাষ্ট্রীয় খুনের সংখ্যা ভারতের সকল প্রদেশের তুলনায় অধিক হইয়াছিল। সংখ্যা ছিল ১০১ টি। ৬ তারিখ ডিসেম্বর কলিকাতায় মহাত্মা গান্ধী রোডে বাসের উপর ইষ্টক নিক্ষেপ করায় তিনজন আরোহী আহত হ'ন ও ৭ই ডিসেম্বর বীরভূম জেলায় কোন জোতদারকে আক্রমণ করিলে তাহার গুলিতে ছয়জন আক্রমণকারী আহত হয়। ৯ তারিখ ডিসেম্বর ফসল কাটা লইয়া বিবাদে এক ব্যক্তি প্রাণ হারায় ও ১০ তারিখ ডিসেম্বরে বসিরহাট অঞ্চলে ১১ জন লোক মারা যায় ও শতাধিক ব্যক্তি আহত হয়। বিবাদের বিষয় জোর করিয়া ধান কাটিয়া লওয়া। এই ঘটনার পরে বহু লোকের বন্দুক পুলিশ কাড়িয়া লয়। কোচবিহার অঞ্চলে ১০ই ডিসেম্বর এক জন হত ও পাঁচজন আহত হইয়াছিল। ঐ তারিখেই ২৪ পরগণার এক গ্রামে ফসল কাটার বিবাদে ১২ জন আহত হয়। ঐ তারিখেই প্রায় ১৫০০ লোক হাতিয়ার লইয়া জোর করিয়া ফসল লুঠ ও গরু বাছুর কাড়িয়া লওয়ার নিযুক্ত হয়। ঐ সকল লোক শুনা যায় কম্যুনিষ্ট মার্কসিষ্ট দলের লোক। ঐ সময়ে বর্দ্ধমান জেলায় ও অপরাপর স্থলে শত শত লুঠেড়াগণ দল বাঁধিয়া লুঠের কার্য্যে লাগিয়া যায় ও লুঠপাট করে। ১১ই ডিসেম্বর কোচবিহারে একজন কম্যুনিষ্ট হত ও তিনজন আহত হয়। তাহারাও লুঠে প্রবৃত্ত ছিল।

১২ই ১৩ই ডিসেম্বর কয়েকস্থলে ফসল লুঠ হয় ও পুলিশ নিষ্ক্রিয় ভাবে তাহা দেখিয়া চলিয়া যায়। এই সকল ঘটনা তাহার উপরওয়ালাদিগকে জানানও প্রয়োজন মনে করে না। জলপাইগুড়িতে ৫০০ শত আর এস পির লোক তীর ধনুক বল্লম ইত্যাদি লইয়া ৭৫ বিঘা জমির ধান কাটিয়া লয়। ১৩ই ডিসেম্বর আসানশোলে সাতজন ডাকাইত স্থানীয় লোকেদের হস্তে নিহত হয়। ইহারা শ্রমিকদিগের বেতনের টাকা লুঠ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। ১৪ তারিখ ডিসেম্বর রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানের উপর একটা আক্রমণ হয়। কারণ একজন রোগীর মৃত্যু। এই ঘটনায় সেবা প্রতিষ্ঠানের ১২ জন লোক আহত হয়। ১৫ই ডিসেম্বর কৃষ্ণনগরে একজন কমিউনিষ্ট নিহত হয় ও মাথাভাঙ্গায় কয়েকজন আহত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই ফসল লুঠ করিবার জন্যই লড়াই আরম্ভ হয়। ক্যানিং এ ১৬ই ডিসেম্বর সি পি আই, সি পি এম, বাংলা কংগ্রেসদলের লোকেদের মধ্যে বন্দুক চালাইয়া একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়। ইহাতে ২২ জন আহত হয়। কৃষ্ণনগরে আর একটি ঘটনায় ১৭ই তারিখ ডিসেম্বর এক ব্যক্তি নিহত হয়। এই ঘটনায় ২০০ শত লুঠেড়া ফসল লুঠ করিতে যায়। ১৮ই ডিসেম্বর একজন শ্রমিক ইউনিয়নের কর্মী অপরদলের লোকেদের আক্রমণে প্রাণ হারায়। আর একজন আহত হয়। ১৯, ২০ তারিখ ডিসেম্বর ছয় জায়গায় ফসল লুঠ হয় ও বহুলোক আহত হয়। ঐ সময়ে শ্রমিক আন্দোলনের নামেও কয়েকটি দাঙ্গা হয়। ২১ তারিখ ডিসেম্বর আরও বহুস্থলে ফসল লুঠ হয়। ঐ সময়ে রাস্তা কাটিয়া দিয়া কয়লা খাদ অঞ্চলে যানবাহন চলাচল নিবারণ করা হয়।

২১শে ডিসেম্বর বর্দ্ধমান হইতে কুড়ি মাইল দূরে প্রায় ৫০০০ লোক এক স্থানে জোর করিয়া ধান কাটিয়া লয়। ঐ দিনই ফরওয়ার্ড ব্লকের কোন নেতার জমির ফসল ৫০০ শত কম্যুনিষ্ট দলের লোক যাইয়া লুঠ করিয়া লয়। ঐ সময় (২২ তারিখে) ২৪ পরগণার চণ্ডালখালি গ্রামে ১৫ জন ব্যক্তি (একজন স্ত্রীলোক) গুরুতরভাবে আহত হয়। বিবাদ সি পি আই ও সি পি এম এর ভিতরে। বসিরহাটে তিন মাসে ১০ জন লোক খুন ও ১৫০ জন জখম হয়। এই খবর বসুমতীতে প্রকাশিত হয়। ২৩ তারিখ ডিসেম্বরে জলপাইগুড়িতে এক ব্যক্তি গুরুতরভাবে আহত হয় এবং ২৪ তারিখে কলিকাতার নারকেলডাঙ্গা অঞ্চলে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাসের গোলা নিক্ষেপ করিয়া দাঙ্গায় নিযুক্ত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়।

২৪শে ডিসেম্বর দুবরাজপুরে ও বর্দ্ধমানে ফসল কাটা লইয়া দাঙ্গা হাঙ্গামাতে দুই ব্যক্তি নিহত ও আট ব্যক্তি আহত হয়। ঐ দিনই মেদিনীপুরে দুইজন যুবক ডাঃ অমূল্য পাত্রের উপর গুলি চালায়। ২৫ তারিখ ডিসেম্বর বসিরহাটে বহু লোক গুলির আঘাতে আহত হয়। ইহার মূলে ছিল পাঁচশত কম্যুনিষ্ট (মার্কসিষ্ট) ফসল লুঠ করিতে যাওয়াতে বিরুদ্ধদলের সহিত সংঘাত। কলিকাতায় ট্যাংরা অঞ্চলে সি পি এম এর লুঠেড়াগণ এস ইউ সির দুইটি দোকান লুঠ করে বলিয়া শুনা যায়। ২৭ তারিখে জগদ্দলে একজন সি পি এম কর্মী গুলিতে নিহত হয় ও ২৮ তারিখে আরও দুইজন উক্ত দলভুক্ত নিহত ও পনের জন আহত হয়। ২৯ তারিখে কোন কোন শ্রমিক সংগঠন দাঙ্গা করিয়া বহু লোকের জখমের কারণ হয়। ৩০ ও ৩১ তারিখে লাল পোষাক পরিহিত লোকেরা মেদিনীপুরে নানা স্থলে লুঠপাট করে এবং শ্রীরামপুরে একজন মারা যায়। হাওড়া অঞ্চলে পুলিশ কাঁদুনে গ্যাস ব্যবহার করে।

উপরোক্ত এক মাসের মধ্যের ঘটনাবলী হইতে বুঝা যায় যে বাংলা দেশের অবস্থা অত্যন্তই অরাজক। সহরে যাহাই হোক গ্রামের অবস্থা অতি শোচনীয়। ইহার কারণ ১৪ পার্টির মিলিত যুক্তফ্রণ্টের রাজ্য শাসন কার্য্যে যথেচ্ছাচার ও দেশবাসীর সুবিধার কথা ভুলিয়া শুধু নিজ নিজ পার্টির মতলব হাসিল চেষ্টা। বাংলার জনসাধারণ এই সকল কারণে মহ অশান্তির মধ্যে দিন কাটাইতে বাধ্য হইতেছেন।

———

করিমগঞ্জে স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতিপূজা

করিমগঞ্জ (আসাম) হইতে প্রকাশিত যুগশক্তি সাপ্তাহিকে প্রকাশিত হইয়াছে :

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী করিমগঞ্জ শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন প্রাঙ্গণে কাছাড়ের ডেপুটি কমিশনার শ্রী কে এল রাও আই এ এসের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনসভায় স্বামী বিবেকানন্দের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রদের দ্বারা মঙ্গলাচরণের পর শ্রীজীবিতেশ দত্ত উদ্বোধন সঙ্গীত পরিবেশন করেন। এরপর রবীন্দ্রসদন গার্লস কলেজের অধ্যাপিকা শ্রীমতী অরুণা দেবী তাহার হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় বলেন যে ভারতের নব জাগরণে স্বামীজির অবদান অপরিমেয়। তিনি বলেন যে দেশের অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে স্বামীজির সাবধান বাণী ভারতের পুনর্গঠনের পথপ্রদর্শক।

প্রাক্তন এম এল এ, শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাস বলেন, আমরা সমাজতন্ত্রের কথা বলি কিন্তু স্বামীজি ছিলেন প্রকৃত সমাজতন্ত্রী। দরিদ্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন গণদেবতার মুক্তির জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতা দান বর্ত্তমান ভারতের একমাত্র উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

করিমগঞ্জ কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক শ্রীশৈলেন্দ্র শেখর দত্ত বলেন, স্বামীজির প্রধান শিক্ষা পুরুষকার। 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত' এই ছিল স্বামীজির বাণী।

সভাপতির ভাষণে ডেপুটী কমিশনার শ্রী কে এল রাও বলেন, স্বামী বিবেকানন্দ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়াছেন। দারিদ্র্য এখনও রহিয়াছে সত্য কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর সরকার তাহা দূরীকরণের জন্য অনেক কিছু করিয়াছেন। মানুষের জাগরণের ফলে সন্তোষ কমিয়া গিয়াছে। মানুষ আরো চায়। এজন্য যুবকদের মধ্যে চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি বলেন, শিল্পোন্নয়নের ফলে দেশের মানুষের বৈষয়িক ক্ষুধা বাড়িয়া গিয়াছে—স্বামীজির বাণী ও আদর্শবাদ গ্রহণ করার জন্য তিনি সকলের কাছে আবেদন জানান। তিনি বলেন, আজকাল আদর্শের প্রতি গুরুজনের প্রতি মানুষের শ্রদ্ধার অবনতি ঘটিয়াছে। স্বামীজির আদর্শবাদ যেন মানুষকে উর্দ্ধপথে চালিত করে এই কামনা করিয়া তিনি তাঁহার ভাষণ শেষ করেন।

কেন্দ্রীয় বাজেটের নীতি

যুগজ্যোতি সাপ্তাহিক বলিয়াছেন :

ইন্দিরা গান্ধীর সমাজতান্ত্রিক বাজেটের চেহারা দেখিয়া জনগণের চক্ষু স্থির হইয়া গিয়াছে। তিনি তাঁহার ভাষণে দরিদ্রদের জন্য বহু অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছেন এবং ধনী দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করাই যে সমাজ-তন্ত্রবাদের লক্ষ্য তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বলিয়াছেন। কিন্তু কার্য্যকালে তাঁহাকে সেই প্রতিক্রিয়াশীল মোরারজী দেশাইর অনুসরণ করিতেই দেখা গিয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী বাজেটের সহিত নীতিগতভাবে বর্ত্তমান বাজেটের কোনই পার্থক্য নাই। তবে লোকের চক্ষে ধাঁধা দিবার জন্য সুকৌশলে একটু রং পালিশ দেওয়া হইয়াছে।

দরিদ্র ও নিম্ন মধ্যবর্ত্তীদের সর্বাধিক দুর্গতির কারণ তাহাদের উপার্জ্জনের তুলনায় দ্রব্য মূল্যের অস্বাভাবিক

—

বৃদ্ধি। ইহা দূর করিতে না পারিলে তাহাদের কোনরূপ সহায়তাই করা যাইবে না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একাধিক কারণ বর্ত্তমান। উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করার দরুণ দ্রব্যমূল্য গত ২০ বৎসর যাবত ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমানে ইহা সঙ্কটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিয়াছে! ইন্দিরার বাজেটে কোন উৎপাদন শুল্ক হ্রাস করা হয় নাই, বরং চা, চিনি, সিগারেট প্রভৃতি কতকগুলি নিত্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যের উপর উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাহা ছাড়াও সোডা, কষ্টিক সোডা, কৃত্রিম রবার প্রভৃতির উপর যে উৎপাদন শুল্ক ধার্য্য করা হইয়াছে পরোক্ষভাবে তাহার ফলে সাবানের দাম, ধোপার খরচা, জুতার দাম প্রভৃতিও বৃদ্ধি পাইবে। পেটরলের উপর শুল্ক বৃদ্ধি করিবার ফলে বাস ও ট্যাক্সির ভাড়াও বৃদ্ধি পাইবে। তাহা ছাড়া ইতিপূর্ব্বে রেল বাজেটে যাত্রী ভাড়া ও মালের উপর ভাড়া বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহার ফলে সাধারণ ভাবে কৃষিজাত ও শিল্পজাত উভয় শ্রেণীর পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটিবে এবং মানুষের যাতায়াতের খরচও বাড়িয়া যাইবে।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অপর একটি কারণ মুদ্রাস্ফীতি। স্বাধীনতা লাভের পর হইতেই অবিবেচনাসম্ভূত পরিকল্পনার রূপায়ণের জন্য বাজেটে ঘাটতি দেখা দিতেছে এবং তাহা আংশিকভাবে মিটাইবার জন্য অতিরিক্ত নোট ছাপাইয়া মুদ্রাস্ফীতি ঘটান হইতেছে। ইন্দিরা গান্ধীর বর্ত্তমান বাজেটে ঘাটতি ২২৫ কোটি টাকাও ঐ ভাবে নোট ছাপাইয়া মিটান হইবে বলিয়া বলা হইয়াছে। সেই মুদ্রাস্ফীতি, সেই উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি সবই যদি করা হইল তাহা হইলে মোরারজী দেশাইর সহিত ইন্দিরা গান্ধীর তফাৎ কি তাহা লোকে বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছে না।

প্রত্যক্ষ করের ক্ষেত্রে ইন্দিরা গান্ধী একটি কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। আয়কর ছাড়ের সীমা বৃদ্ধি করিয়া তিনি বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতে কয়জন লোকের প্রকৃত সুবিধা মিলিয়াছে? প্রথমতঃ ভারতে ৭০।৮০ শতাংশ লোক কৃষি আয়ের উপর নির্ভরশীল এবং তাহাদের ক্ষেত্রে আয়করের কোন প্রশ্নই উঠে না! অকৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত ব্যক্তিদের ৬০।৭০ শতাংশের আয় বার্ষিক চার হাজার টাকার নীচে। তাই এই ছাড়ের সীমাবৃদ্ধি তাহাদের অবস্থার কোন তারতম্য ঘটাইবেনা। বার্ষিক পাঁচ হাজার হইতে চল্লিশ হাজার টাকা উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিদের এখন হইতে পূর্ব্বের তুলনায় বছরে এগার টাকা কর কম দিতে হইবে। অবশ্য অবিবাহিত ব্যক্তিদের বিবাহিত ব্যক্তিদের সমপর্য্যায়ে লইয়া আসায় তাহাদের শেষোক্তদের অপেক্ষা বার্ষিক যে ১২৭ টাকা অতিরিক্ত কর দিতে হইত তাহা হইতে তাহারা রেহাই পাইয়া যাইতেছে। মোটের উপর মাসে ৪১৬ টাকা হইতে ৩৩৩১ টাকা উপার্জ্জনকারী ব্যক্তিরা পূর্ব্বের তুলনায় বিবাহিত হইলে মাসে এক টাকারও কম এবং অবিবাহিত হইলে মাসে ১১.৪০ পয়সা কর রেহাই পাইতেছে। ইহার সহিত নূতন উৎপাদন শিল্প ও রেলের মাশুল বৃদ্ধির ফলে দ্রব্যমূল্য যাহা বৃদ্ধি পাইবে তাহার তুলনা করিলেই ইন্দিরা গান্ধী যে দরিদ্রের কতবড় বন্ধু তাহা সম্যক ভাবে উপলব্ধি করা যাইবে।

ধনীদের উপর করবৃদ্ধির ব্যাপারে যে পথ তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতেও তাঁহার সুবুদ্ধির পরিচয় প্রকাশ পায় নাই। যে পরিমাণ আয়কর ইহার পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিল তাহাতেই মানুষের অধিক উপার্জ্জনের প্রবৃত্তি ক্রমশই লোপ পাইতেছিল। উপার্জ্জনের উপর ৯০।৯৫ শতাংশ কর দিতে হইলে লোকে হয় ঐ কর ফাঁকি দেয় না হইলে ঐ কার্য্য করিবার কোন প্রেরণাই খুঁজিয়া পায় না। তাই বর্ত্তমান বৃদ্ধির ফলে অধিক অর্থ কর হিসাবে কেন্দ্রীয় সরকার পাইবেন কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রহিয়াছে। সম্পত্তির উপর কর বৃদ্ধি করা হইয়াছে এবং শহরের ভূসম্পত্তির উপর লেভি ধার্য্য করা হইয়াছে। লেভির যে হার ধার্য্য করা হইয়াছে তাহাতে "মাল্টিস্টোরিড" বিল্ডিং নির্ম্মাণের প্রেরণায় আঘাতপ্রাপ্ত করিবে। অথচ বর্ত্তমানে শহরাঞ্চলে বাসগৃহের দুর্ভিক্ষ দূর করিবার পক্ষে

ইহাই ছিল সর্বোৎকৃষ্ট উপায়। এইধরণের বড় বড় বাড়ী নির্মাণের ফলে শহরাঞ্চলে বাড়ীভাড়া নিম্নাভিমুখী হইতেছিল এবং ইন্দিরা গান্ধীর বাজেট ইহার পথে বাধা সৃষ্টি করিবে।

কেন্দ্রীয় বাজেট

যুগবাণী সাপ্তাহিকে কেন্দ্রীয় বাজেট সমন্ধে নিম্নলিখিত মতামত প্রকাশিত হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় যে কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করিয়াছেন তাহা মোটামুটি ভাল বাজেট। খুব বলিষ্ঠ নীতি এই বাজেট অনুসৃত হয় নাই, কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী যথেষ্ট কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় দিতে পারিয়াছেন। মোরারজী দেশাই যে ধরণের বাজেট পেশ করিতেন, কিংবা কর ধার্যের প্রস্তাবে টি টি কৃষ্ণমাচারী যেরকম হাত সাফাইয়ের কাজ দেখাইতেন এই বাজেট সে তুলনায় অনেক পরিচ্ছন্ন। বাজেটের রাজনৈতিক ফলাফল ইন্দিরার পক্ষে শুভ হইবে, কেন্দ্রীয় সরকারের স্থায়িত্ব বাড়িবে। মোরারজী এতদিনে ইন্দিরার কাছে সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়াছেন। কারণ তাঁর বাজেটে অধিকাংশ লোক চটিয়া যাইত, বহু লোকের সর্বনাশ হইত; তাঁর বাজেটের ধাক্কায় সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে গরীব, মধ্যবিত্ত ও কোন কোন শ্রেণীর ব্যবসায়ীরাও। পক্ষান্তরে ইন্দিরার বাজেটে চা, চিনি, কেরোসিন, সিগারেটের উপর কর বসায় দরিদ্র লোকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে বটে, কিন্তু তারা সর্বনাশের সম্মুখীন হইবে না। বরং আয়কর ছাড়ের সীমা পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত বাড়ানোয় নিম্ন আয়বিশিষ্ট চাকরিজীবী শ্রেণী উপকৃত হইয়াছে, অবিবাহিত থাকাও আমাদের দেশে আর দণ্ডনীয় রহিল না। নব কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে যেসব অর্থনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহার প্রতিফলন বর্তমান বাজেটে কিছু পরিমাণে ঘটিয়াছে। ফলে নব কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা কট্টর সমাজতন্ত্রী, অর্থাৎ চন্দ্রশেখর, মোহন ধাড়িয়া, অর্জুন অরোরা প্রভৃতি ব্যক্তিরাও খুশি হইয়াছেন; সি পি আই পি এস পি, ডি এম কে প্রভৃতি ইন্দিরা গান্ধীর সহযোগী দলগুলিও সন্তুষ্ট হইয়াছে। সবচেয়ে বেশী খুশি হইয়াছে ভারতের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী শ্রেণী। ইন্দিরা গান্ধীর বাজেট আর যাই থাকুক কমিউনিজমের নামগন্ধও নাই। বার্ষিক চল্লিশ হাজার টাকার বেশী আয় যাদের তাদের উপর আয়করের পরিমাণ বাড়ানো হইয়াছে, কিন্তু উহা দ্বারা কোম্পানীর মালিকরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে না। আয়কর ফাঁকি দিবার নানা উপায় তাদের জানা আছে। মোরারজী দেশাই তাই ঠিকই বলিয়াছেন যে কালো টাকা বাড়িয়া যাইবে;—কিন্তু ঐ কালো টাকা শিল্প ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগের পথ ইন্দিরা বন্ধ করেন নাই, বরং তিনি. সেই উপায় করিয়া দিতে চান বলিয়া মনে হয়। কয়েক দিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার এই মর্মে একটি আইন করিয়াছেন যে কোন শিল্প বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সাত হাজার টাকার বেশী কাহাকেও মাসিক বেতন দিতে পারিবেন না। কাজেই চাকরিজীবীর পক্ষে মাসিক বেতনের উচ্চ সীমা সাত হাজার টাকা—বর্তমান বাজেটে সরকার উহা হইতে প্রায় চার হাজার টাকা আয়কর রূপে লইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বেতন বৈষম্য কমাইবার দিকে ইহা অগ্রগতির লক্ষণ। তার আগেই বলিয়াছি যে যেসব ব্যক্তি চাকরিজীবী নয়, অথচ চল্লিশ হাজার টাকার উপর যাদের বার্ষিক আয় তারা আয়কর ফাঁকি দিবে। সেই ফাঁকি দেওয়া টাকা তারা যদি পুনরায় শিল্প ও ব্যবসায়ে বিনিয়োগ করার সুযোগ পায় তবে একদিকে মঙ্গল, কারণ মূলধন গঠনের পক্ষে উহা সহায়ক হইবে।

ইন্দিরা তাঁর বাজেটে সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণ করেন নাই, মনোপলি কারবারীদের উপর পর্যন্ত তিনি কোন বাধানিষেধ আরোপ করেন নাই। এ কারণেই বলিয়াছি তাঁর বাজেটে বলিষ্ঠতা নাই। শোনা গিয়াছিল যে গ্রামাঞ্চলের ধনীদের উপর প্রচুর কর বসানো হইবে, কিন্তু বাজেটে তেমন কোন প্রস্তাব নাই। বরং গ্রামাঞ্চলের লোকেদের জন্য ডিবেঞ্চার ছাড়া হইবে, বেশী সুদে তারা যাতে সঞ্চয় করিতে পারে তাহাতে উৎসাহ দেওয়া হইবে। সরকারের হাতে ইহার ফলে

টাকাও আসিবে, গ্রামের ধনীরা সন্তুষ্টও থাকিবে। আগামী নির্ব্বাচনে ইন্দিরার দলের ইহাতে খুবই সুবিধা হইবে। রাজনৈতিক চালটি তিনি ভালই দিয়াছেন এবং অন্ততঃ অশোক মেহতার মুখে ঝামা ঘষিয়া দিয়াছেন।

বলিষ্ঠভাবে সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুসরণে প্রয়াস না থাকিলেও ইন্দিরার বাজেট বক্তৃতাটি প্রশংসাযোগ্য হইয়াছে। আদি কংগ্রেসের নেতাদের চেয়ে তিনি দেশের বাস্তব পরিস্থিতি অনেক ভাল বোঝেন। তাঁর বক্তৃতায় কোন একগুঁয়েমিভাব নাই, কিন্তু বেশ কয়েকটা কাজের কথা আছে। বাজেট প্রণয়নে তিনি কোন নীতি অনুসরণ করিয়াছেন তাহা বিবৃত করিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন যে উৎপাদিকা শক্তিগুলির বিকাশ তথা উৎপাদন বৃদ্ধি ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি না হইলে দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্থায়িত্ব বজায় থাকে না। আবার উৎপাদন ও জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধির মূলে আছে দেশের জনগণ—তাদের কল্যাণ সাধিত না হইলে উন্নতির সব চেষ্টাই পণ্ড হইবে। কাজেই এমন একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রবর্তন করিতে হইবে যাহাতে সমাজের দুর্বল ও দরিদ্র অংশ লাভবান হয় অথচ উৎপাদন ও ধনবৃদ্ধির পথও খোলা থাকে। অর্থনৈতিক বিকাশ ও উন্নয়ন এবং সামজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠা এই দুটি দিকে একসঙ্গে লক্ষ্য না রাখিলে দেশের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইবে, বন্ধ্যা ও অচল অবস্থা সৃষ্টি হইবে। ইহা আমরা পরিহার করিতে চাই।

শ্যামাপ্রসাদ—ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব—শ্রীবীরেশ মজুমদার প্রণীত। প্রকাশক জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড্। কলিকাতা—১৩। মূল্য ৫·০০ টাকা পৃষ্ঠা ১৩১।

বাংলা তথা ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সুসন্তান, শিক্ষাবিদ এবং রাষ্ট্রীয় নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী। জন্ম ১৯০১ সনে। গান্ধী আন্দোলনের আরম্ভ সময়ে তিনি ছিলেন কলেজের ছাত্র—ইহাতে যোগ দেন নাই। মাত্র তেত্রিশ বৎসর বয়সে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং দশ বৎসর উহার সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৭ সনে বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্র হইতে স্বতন্ত্রপ্রার্থীরূপে আইন পরিষদে নির্ব্বাচিত হন। তিনি ফজলুলহক্ মন্ত্রীসভায় যোগদান করিয়াছিলেন কিন্তু মেদিনীপুরে সরকারী অত্যাচারের প্রতিকার করিতে অসমর্থ হইয়া প্রতিবাদে ১৯৪৩ সনে মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করেন। এই সময় তিনি হিন্দু মহাসভার নেতা হিসাবে যে সংগঠন কাজ করেন তাহা খুবই প্রশংসনীয়।

১৯৪৭, ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে তিনি স্বাধীন ভারতের প্রথম মন্ত্রীসভায় শিল্পমন্ত্রীরূপে যোগদান করেন। তাঁহার চেষ্টায় ইনডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া গঠিত হয়। চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ্ কারখানা, ব্যাঙ্গালোরের হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফ্ট্ কারখানার পরিকল্পনা ও গঠন সম্পূর্ণরূপে তিনিই করিয়াছিলেন। তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান মন্ত্রীসভার কাশ্মীর, হায়দরাবাদ ও পূর্ব্ব পাকিস্থান সম্পর্কে নীতি-নির্দ্ধারণ।

পূর্ব্ব পাকিস্থানের হিন্দুদের উপরে নির্মম অত্যাচার হইতে থাকে এবং ইহার প্রতিকারের জন্য নেহরু লিয়াকত চুক্তি হয়। কিন্তু ইহাতে অবস্থার উন্নতি দেখা গেল না। শ্যামাপ্রসাদ মন্ত্রীসভায় থাকিয়াও ইহার কোন প্রতি-বিধান করিতে অক্ষম হন। ১৯৪৩ সনে তিনি একবার মন্ত্রীপদ ত্যাগ করিয়াছিলেন। এবারে ১৯৫০, ৮ই এপ্রিল তিনি আবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীত্বের পদে ইস্তফা দিলেন। তিনি কখনও অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করিতে জানিতেন না। তিনি ছিলেন স্পষ্টবক্তা এবং লোকসভার বিরোধী-সদস্য হিসাবে তাঁহার অবদান স্মরণীয় হইয়া আছে।

১৯৫২ সনে তিনি লোকসভার সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন।

কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী শেখ আবদুল্লা সম্বন্ধে শ্যামাপ্রসাদ যে সন্দেহ করিয়াছিলেন পরবর্ত্তীকালে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আবদুল্লার সহিত ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব থাকা সত্বেও তাঁহার পদচ্যুতিতে সম্মতি ও তাঁহার অন্তরীণের ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল।

কাশ্মীরের অবস্থা বড়ই উদ্বেগজনক হওয়ায় শ্যামা-প্রসাদ নিজে সেখানে যাওয়া সংকল্প করিলেন। কিন্তু জম্মু প্রবেশের মুখেই তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ইহা যে ভারত সরকার ও কাশ্মীর সরকারের চক্রান্তের ফল গ্রন্থকার তাহা বিশ্বাস করিবার পক্ষে কতকগুলি অকাট্য কারণ দেখাইতে সমর্থ হইয়াছেন।

মহাপ্রাণ শ্যামাপ্রসাদ ২৩শে জুন ১৯৫৩ শ্রীনগর হাসপাতালে অন্তরীণ অবস্থায় প্রাণ ত্যাগ করেন।

জনসংঘের প্রতিষ্ঠা শ্যামাপ্রসাদের অন্যতম কীর্ত্তি।

আচার্য্য রমেশচন্দ্র মজুমদার পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া লেখককে সম্মানিত করিয়াছেন।

বাংলার সুসন্তান সর্ব্বভারতীয় নেতা শ্যামাপ্রসাদের জীবনীর বহুল প্রচার কামনা করি।

শ্রীঅনাথবন্ধু দত্ত

মহাজীবনের পুণ্যালোকে: কানাইলাল দত্ত, দাসগুপ্ত প্রকাশন, ৩ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য ৫ টাকা।

এই গ্রন্থে গান্ধীজীর কর্মজীবনের কয়েকটি অধ্যায় সন্নিবেশিত হইয়াছে। যে-অধ্যায়গুলি তাঁহার জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। প্রবন্ধের অধিকাংশই পূর্বে প্রবাসীতে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখকের প্রতি দৃষ্টি তখন হইতেই পড়িয়াছে। ইহার পূর্বে গান্ধী-সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু এরূপ তথ্যবহুল যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণ আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। কোনো উচ্ছ্বাস নাই, দেবত্ব আরোপ করিবার প্রয়াস নাই—শুধু আছে তাঁহার মহাজীবনের ক্রমবিকাশের ধারা ও অলোকসামান্য চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

গান্ধীজী চেষ্টা করিয়া তাঁহার চরিত্র গঠন করিয়া-ছিলেন। প্রত্যেক মানুষই তাহা পারে—একথা তিনি নিজেও বলিয়াছেন। চেষ্টা দ্বারা এই মানুষই দেবতা হইতে পারে, ইহা তাঁহার জীবনেই প্রত্যক্ষ করিলাম। এই সাধনার বলেই তিনি জগদ্বরেণ্য। অপূর্ব তাঁহার সাধনা। প্রতিটি কর্মই তাঁহার সাধনা। গান্ধী-চরিত্রকে বুঝিতে হইলে এইদিক দিয়াই বুঝিতে হইবে।

সত্য ও অহিংসাই ছিল গান্ধী-জীবনের একমাত্র অবলম্বন। "সত্য যাহা তাহা চিরকল্যাণময়। সে কাহাকেও আঘাত করে না। নিরাময় করাই তাহার কর্ম তাহার ধর্ম। সংঘাতের মধ্যে তাই সত্য নাই। আছে কিছু ক্ষমতালুব্ধ লোভাতুর মানুষের অপকৌশল। সেই সামান্য-সংখ্যক ভ্রান্ত মানুষের কর্মকৃতির জন্য সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ অসহায়ভাবে মার খাইতেছে।"

গান্ধীজীর জীবন-কথার মধ্যে আছে ছাত্র-জীবন ও শিক্ষক-জীবন। এই অধ্যায় দুটিও অভিনব বৈশিষ্ট্য পূর্ণ। ঘটনার আলোকে জীবন-বিকাশের আলোচনা।

যেসব ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে মহাত্মার কর্ম-পথের পরিবর্তন হয় তাহারই বিশদ আলোচনা লইয়া সূর্যোদয় অধ্যায়টি রচিত হইয়াছে। এই ঘাত-প্রতিঘাতে পরিবর্তিত জীবনই হইল গান্ধীজীর।

এইখানে রতনমণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কথা পুনরুল্লেখ করিব; তিনি লিখিয়াছেন: "সাধারণ মানুষের পক্ষে সত্য কি, হিতকর কোন্‌টা তাহা নিরূপণ করা সর্বদা সহজ হয় না। সেজন্য আমরা প্রাজ্ঞ মানুষের দিব্য জ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া থাকি। ভক্তি ও বিশ্বাস হইতে নির্ভরতা বাড়ে। ভক্তির উৎস কিন্তু ভালবাসায়। আবার ভালবাসা যেখানে নাই সেখানে বিশ্বাসও নাই। অতএব সবকিছুর মূল হইল ভালবাসা, বা প্রেম। মানুষ নিজেকেই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। ভালবাসা যেখানে অকৃত্রিম সেখানে নিজেকে উৎসর্গ করিয়া মানুষ ভালবাসার পাত্রকে রক্ষা করে। মা নিজের জীবন দিয়াও সন্তানকে যে রক্ষা করেন সেও এই ভালবাসার জোরেই। সন্তানের প্রতি মায়ের যে ভালবাসা, সাধারণ মানুষের নিজের প্রতি যে ভালবাসা তাহাই সাধনার দ্বারা চরাচরের স্থাবর জঙ্গমে ব্যাপ্ত হয়। ইহাই ছিল গান্ধীজির সাধনা; তাঁহার সর্ব-কর্মের নিয়ন্ত্রণ-শক্তি।"

এই সাধনার কথাই আমরা সকল প্রবন্ধে দেখিতে পাই। গান্ধী-চরিত্রের এই মূল্যবান দিগ্‌দর্শন গ্রন্থখানিকে অমর করিয়া রাখিবে। যথার্থ গান্ধী-অনুরাগী না হইলে, তাঁহাকে এভাবে চিত্রিত করা যায় না। লেখকের শ্রম সার্থক হইয়াছে। ভাষা সুন্দর, কোথাও আড়ষ্টতা নাই—অবান্তর কথাও নাই। লেখকের এই সংযম লেখককে বড় করিয়া দিয়াছে। গান্ধী-কথার এই অপূর্ব নিদর্শন বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে চিহ্নিত হইয়া রহিল।

শ্রীযুক্তা পুষ্পদেবী সরস্বতী শ্রুতিভারতী সাহিত্য-জগতে সুপরিচিতা। তাঁর এগারোখানি উপনিষদ কাব্যানুবাদ চারিখণ্ডে সুন্দর প্রচ্ছদপটে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। প্রথম ঈশ কেন কঠোপনিষদ যাহা ইউনিভার্সিটি হইতে লীলা পুরস্কার অর্জন করিয়াছে, তাহা একত্রে "উপনিষদ নির্মাল্য" নামে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর তাঁহার কাব্যানুবাদ প্রশ্ন মুণ্ডক মাণ্ডুক্য ও তৈত্তিরীয়ো ও ঐতেরীয়োপনিষদ একত্রে পাঁচখানি বই "উপনিষদ নৈবেদ্য" নামে প্রকাশিত হয়। মূল্য মাত্র ২ টাকা। কারণ ইতিমধ্যে বইগুলি পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক লোকশিক্ষার জন্য মনোনীত হইয়া ২০০০ টাকা অর্থ সাহায্য পাওয়ায় মূল্য সুলভ করা সম্ভব হইয়াছে। এরপর তাঁহার শ্বেতাশ্বতর ও ছান্দোগ্য উপনিষদ কাব্যানুবাদ "উপনিষদ অর্ঘ্য" নামে মাত্র ৩ মূল্যে সুন্দর প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত হয়। এই বইখানিতে তিনি ভট্টপল্লী নিবাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর নিকট হইতে সরস্বতী উপাধি পান। এরপর তাঁর বৃহদারণ্যক উপনিষদ কাব্যানুবাদ "উপনিষদ অঞ্জলি" নামে অপূর্ব্ব প্রচ্ছদপটসহ প্রকাশিত হয় মূল্য মাত্র ৩ টাকা। তারপর সম্পূর্ণ গীতাখানি শব্দার্থ কবিতায় অনুবাদ ও কবিতায় ব্যাখ্যা সহ অমৃতগীতা নামে প্রকাশিত হয় মাত্র ৫ টাকা মূল্যে। এবার ডাঃ গৌরী শাস্ত্রী ও ডাঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী তাঁকে শ্রুতিভারতী উপাধি দেন। বিশ্ব বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ সুকুমার সেন এই বইগুলি সম্বন্ধে বলেন যে "শাস্ত্রের কৌটায় আঁটা সংস্কৃতের কুলুপ দেওয়া যে অধ্যাত্মচিন্তা প্রায় অনেকেরই নাগালের বাইরে ছিল, তাহা কৌটা খুলিয়া সময়োপযোগী করিয়া ধরিয়া দিয়া পুষ্পদেবী একটি মহৎ কাজ করিয়াছেন। গীতার কথা সহজ ভাষায় বলিয়া তিনি অপূর্ব্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। প্রাপ্তি-স্থান, মহেশ লাইব্রেরী ২১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট। কলিকাতা—১২, কলেজ স্কোয়ার।

রাজ-সন্দর্শনে

(প্রাচীন চিত্র হইতে)

:: রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ::
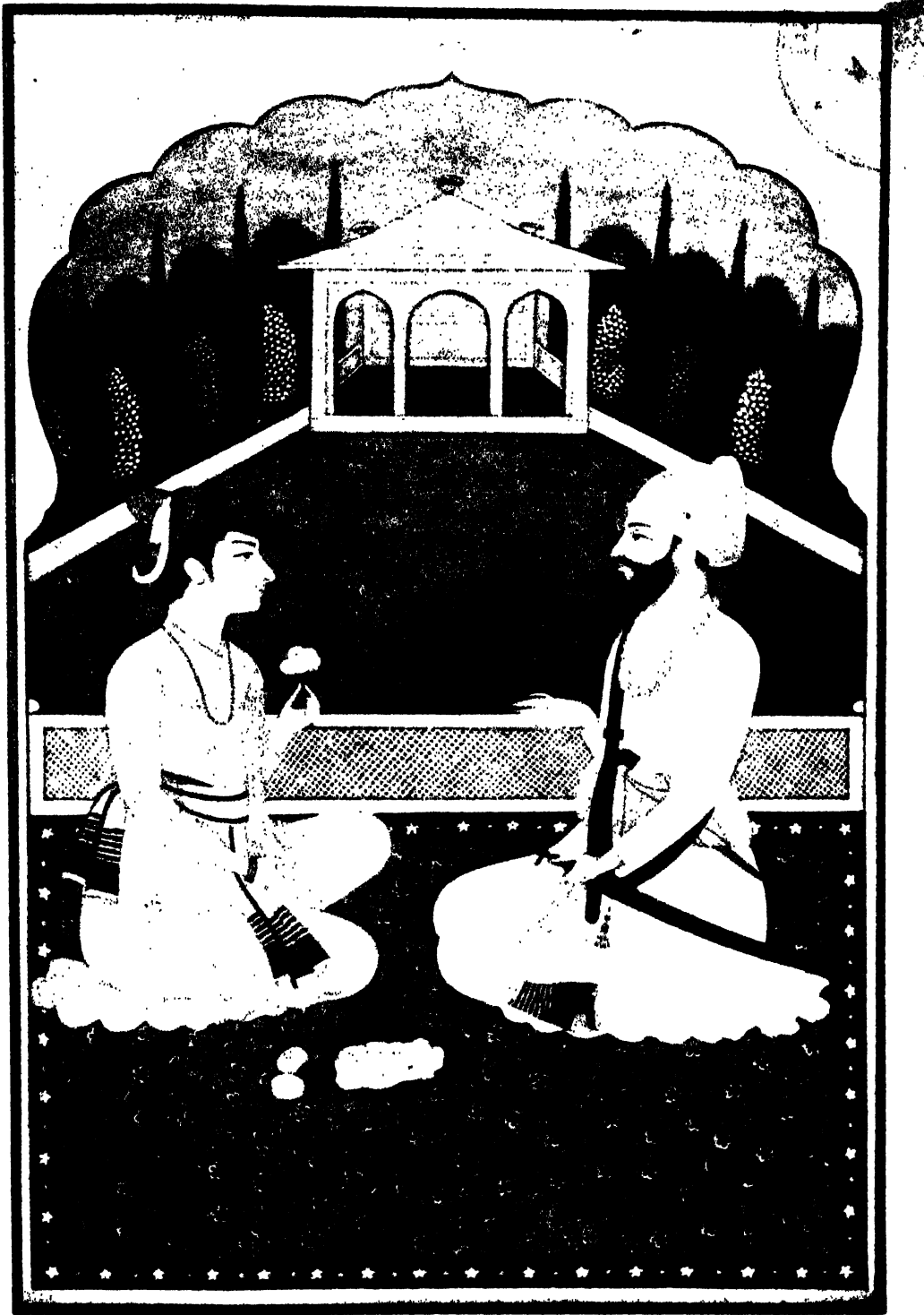
"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"
"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৬৯শ ভাগ
দ্বিতীয় খণ্ড

চৈত্র, ১৩৭৬

৬ষ্ঠ সংখ্যা

বিবিধ প্রসঙ্গ

পশ্চিম বাংলায় অরাজকতা।

রাষ্ট্রপতির শাসন আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অরাজকতার অবসান এখনও হইতেছে না। প্রায়ই শুনা যাইতেছে কেহ কাহাকেও মতদ্বৈধের জন্য হত্যা করিয়াছে অথবা স্কুল কলেজ দোকানপাট আক্রমণ করিয়া মারপিট ভাঙ্গাচোরা অগ্নিসংযোগ প্রভৃতি করা হইয়াছে। অর্থাৎ পূর্ব্বে পশ্চিম বাংলার পুলিশ যেরূপ অনাসক্ত ভাবে আইন অমান্যকর কার্য্যকলাপ দেখিয়াও নিষ্ক্রিয় থাকিত এখনও প্রায় সেইরূপ অবস্থাই থাকিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি? একটা কারণ হইতে পারে যে এই দেশে কোথাও কোন সময়েই পুলিশ উপযুক্তভাবে শান্তি-রক্ষা করিত না। চোর, ডাকাইত, লুঠেড়াদিগের সহিত অন্তরঙ্গভাব রক্ষা করিয়া চলিলে পুলিশের বহু লোকের সুবিধা হইত ও সেইজন্য পুলিশ কখনই কঠিন হস্তে অপরাধীদিগকে দমন করে নাই। একটা চির প্রচলিত প্রথা দাঁড়াইয়াছে যে অপরাধ শুধু ততটুকুই দমন করা আবশ্যক যাহা না করিলে পুলিশের বড় সাহেবদিগের বদনাম হইতে পারে ও উচ্চস্থানে তাঁহাদিগের সমালোচনা আরম্ভ হইবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। এখন উচ্চস্থানে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় দরবারে পশ্চিম বাংলার অরাজকতা একটা স্বতঃসিদ্ধ ও অভ্রান্ত সংস্থাপনা বলিয়া গ্রাহ্য হইয়া রহিয়াছে; সুতরাং পশ্চিম বাংলায় কিছু কিছু অরাজকতা না থাকিলে দিল্লীর "পলিসি"র একনিষ্ঠতা খর্ব্ব হইয়া যাইতে পারে। এই কারণে এই প্রদেশে কিছু কিছু হতাহত ব্যক্তি, পোড়ান ট্রাম-বাস ও স্কুল-কলেজের আসবাব প্রভৃতি দেখা যাইলে তাহা কিছু অস্বাভাবিক নহে বলিয়াই ধার্য্য হইয়া থাকে। ইতিপূর্ব্বে এই অবস্থার জন্য দায়ী ছিলেন পুলিশ মন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। এখন তিনি নাই সুতরাং তাঁহার স্থান অধিকার করিয়াছে মাওবাদী "নকসাল" নামধারী যুবকগণ। যাহাতে কেহ না ভাবে যে ঐ সকল অপরিণত বয়স্ক ব্যক্তিরা কংগ্রেসের বা অপর কোন দলের অনুগত কর্ম্মী সেই জন্য তাহারা সর্ব্বত্র নিজেদের পরিচিতি সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করিতে অন্যথা করে না। কিন্তু যাঁহারা সকল ক্ষেত্রেই সকল রাষ্ট্রীয় কার্য্যকলাপ সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করেন তাঁহারা বলেন যে এই সকল অরাজক-কার্য্যে সর্ব্বক্ষেত্রে একই দলের লোকেরা রহিয়াছে চিন্তা করিবার কোন ন্যায়সঙ্গত কারণ নাই। অনেক স্থলে পুরাণ পার্টিগত ঝগড়া এখনও চালিত রহিয়াছে, কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত শত্রুতার জন্য খুনখারাপি চলিতেছে, কখনও হয়ত মাওবাদী অথবা মার্কসবাদীগণ এই সকল

আইনভঙ্গের জন্য দায়ী এবং কোন কোন স্থলে পেশাদার গুণ্ডা দিয়া হাল্লাহাঙ্গামা করান হইতেছে। শেষোক্ত বায়না করা অরাজকতা কে করাইতেছে তাহা লইয়া অনুমানের অনন্ত প্রান্তরে দিক্‌ভ্রান্তভাবে বিচরণ করিয়া কোন লাভ হইতে পারে না। ধরা যাইতে পারে তাহারাই করাইতেছে যাহারা চায় বাংলা দেশে অরাজকতা চলিতে থাকিলে তাহাদিগের সুবিধা। তবে একথা বলা যায় যে ঐ সকল ফন্দিবাজদিগের যাঁহারা না বুঝিয়া সহায়তা করিতেছেন তাঁহারা কোন ভাবেই নিজেদের বা পশ্চিম বাংলার কোন সুবিধার সৃষ্টি করিতেছেন না। একটা কথা শুধু বলা প্রয়োজন যে এই সকল কার্য্য বিশুদ্ধ বঙ্গদেশীয় প্রেরণার অভিব্যক্তি নহে। মার্কসবাদ, মাওবাদ, কংগ্রেসী ফন্দি, সি আই এর প্ররোচনা প্রভৃতি কোন কিছুই বাংলা ও বাঙালীর স্বার্থ, উন্নতি ও প্রগতির দিক হইতে নিঃসন্দেহে মানিয়া লওয়া যাইতে পারে না। সকল বাঙালীর একটা জন্মগত অধিকার আছে বাংলা কোন পথে চলিবে তাহা স্থির করিবার। শুধু যাহারা রিভলভার ও বোমা হস্তে মতবাদ ব্যক্ত করে তাহাদের কথাতেই বাঙালী চলিবে একথা কখনও গ্রাহ্য হইতে পারে না। যাহারা মার্কসবাদী, গান্ধীবাদী বা স্বাধীনমতবাদে বিশ্বাসী সকলেরই কথা বলিবার ও পথ নির্দ্ধারণ করিয়া লইবার অধিকার থাকা আবশ্যক। সকলকে ভয় দেখাইয়া বশ্যতা স্বীকার করাইবার আগ্রহ কখন আদর্শবাদ বলিয়া চলিতে পারে না। লোভ দেখাইয়া, টাকা দিয়া কিম্বা অন্য কোনভাবে যাঁহারা অবাঙালী ও বিদেশীদিগের মতলব হাসিল করিতে আত্মনিয়োগ করে, তাহারা দেশ, জাতি ও বিশ্বমানবতার বিরুদ্ধাচারী। শঠতা, হঠকারিতা, দেশদ্রোহিতা ও নিজ জাতির সম্বন্ধে বিশ্বাসঘাতকতা কখন উচ্চাঙ্গের আদর্শবাদে পরিণত হইতে পারে না। যেসকল মহানেতা পৃথিবীতে যুগে যুগে প্রগতির পতাকা সম্মুখে উড়াইয়া মানবজাতিকে বিপ্লব, আত্মত্যাগ ও পরোপকারের পথে চালিত করিয়া মানবসভ্যতাকে নূতন আদর্শের অনুপ্রাণনায় জাগ্রত করিয়া তুলিয়াছেন; তাঁহারা কখন কোনরূপ ক্ষুদ্রতা অবলম্বনে চলিতে চাহেন নাই বা কাহাকেও সেইরূপ কার্য্য করিতেও বলেন নাই। ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম যাহারা করে তাহাদিগকে লোকে পাপীই বলে, ধার্ম্মিক কেহ বলে না। আদর্শবাদের নামেও সেইরূপ আদর্শহীনতা প্রকাশিত হইতে পারে; কিন্তু শেষ অবধি সকল কার্য্যেরই স্বরূপ লোকচক্ষে পরিষ্কারভাবে দেখা দিয়া থাকে।

মানবসভ্যতায় নানা প্রকার অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার ও মনুষ্যত্ব বিরুদ্ধতা কোন কোন সময়ে প্রকট হইয়া প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে। মানুষই আবার সেই সকল দুর্নীতি অপসৃত করিয়া ন্যায়ের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। অপরদিকে মানুষ সকল সময়েই কোন কোন কাজ অন্যায় বলিয়া স্বীকার করিয়াছে ও সেই সকল কাজ করিলে যে করে তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছে। অর্থাৎ ভাল মন্দ বিচারের একটা এমন দিক চিরকালই আছে যেখানে কোন মতবিরোধ হয় না। কতকগুলি কার্য্য চিরকালই সর্ব্বসম্মতভাবে ভাল কাজ ও কতকগুলি তেমনি মন্দ কাজ। ইহার কোন পরিবর্ত্তন গায়ের জোরে, অর্থ বলে, সংখ্যাগরিষ্ঠতা অথবা ধর্ম্ম বা আদর্শের দোহাই দিয়া কখন হয় নাই, এখনও হইবে না।

রুশিয়া কর্ত্তৃক পাকিস্থানকে অস্ত্র সরবরাহ

তাসখন্দ ব্যবস্থা করিবার সময় হইতেই অনেকটা বুঝা গিয়াছিল যে রুশিয়ার ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে সখ্যস্থাপন আগ্রহের কূটনৈতিক অভিসন্ধিটা কি? পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহ না চালাইয়া যদি ঐ দুই দেশ শান্তিতে নিজ নিজ উন্নতি চেষ্টাতেই মগ্ন থাকিত তাহা হইলে রুশিয়ার কি সুবিধা হইত? কিন্তু যদি উভয় দেশ শান্তির অভিনয় করিতে থাকিয়া যুদ্ধের প্রস্তুতিতে গভীরভাবে আত্মনিয়োগ করিত এবং যদি ঐ প্রস্তুতির জন্য উভয় দেশই ক্রমাগত রুশিয়ার দরজায় ধরণা দিতে বাধ্য হইত তাহা হইলে দুই দেশের উপরেই রুশিয়ার প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধিলাভ করিত এবং অনতিবিলম্বে ও অদূর ভবিষ্যতে এই দেশ দুইটি রুশিয়া যাহা বলিত তাহাই করিতে বাধ্য হইত। কম্যুনিষ্ট

রাজচক্রবর্ত্তী মস্কোর পার্টির অনেক মতলবই ভারত ও পাকিস্থানের অকাতরে রুশিয়ার আদেশপালন ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ পূর্ব্বে একটা ভয় ছিল যে ভারত ও পাকিস্থান আমেরিকার নিকট আর্থিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া আমেরিকাকে এশিয়ায় কয়েকটা সামরিক আস্তানা গঠন করিতে সাহায্য করিবে ও তাহার ফলে যদি কখন রুশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে যুদ্ধ লাগিয়া যায় তাহা হইলে পাকিস্থানের ভিতর দিয়া আমেরিকা রুশিয়াকে আক্রমণ করিতে সুবিধা পাইবে। ভারত বহু রসদ ও যুদ্ধের জন্য আবশ্যকীয় মাল মশলা সরবরাহ করিয়া আমেরিকার যুদ্ধচালনা সহজ করিবে। ইহা ব্যতীত যদি অবস্থার ফেরে ভারত ও পাকিস্থান আমেরিকার সহিত হাত মিলাইয়া যুদ্ধের জন্যও সৈন্য ইত্যাদি সরবরাহ করিতে আরম্ভ করে তাহা হইলে আমেরিকার খুবই সুবিধা ও রুশিয়ার বিশেষ অসুবিধা হইবে।

এই সকল চিন্তা যখন রুশিয়ার (ও আমেরিকার) ম : জাগ্রত হইতেছিল তখনও চীনের সহিত রুশিয়ার সদ্ভাবে কোনও ফাট ধরে নাই। রুশিয়া তখন ভাবিত যে কম্যুনিষ্ট জগৎ তাহারই প্রভুত্বে চলিবে ও আমেরিকার সহিত সংঘর্ষণে রুশিয়ার প্রধান সহায়ক হইবে চীন। কিন্তু পরে অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া চীন রুশিয়ার সহায়ক না হইয়া শত্রু হইবে বলিয়াই মনে হইতে লাগিল এবং ইহাও দেখা যাইল যে ভারত ও চীনের মধ্যে বন্ধুত্ব আর থাকিবে না এবং চীন পাকিস্থানের সহিত সখ্যস্থাপনে বিশেষ উৎসাহ এবং সক্ষমতা দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছে। পরিস্থিতি তাহা হইলে এমন হইল যে পাকিস্থান ও ভারতের উপর প্রভাব বিস্তার না করিলে রুশিয়ার আর রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা থাকে না। এই কারণে রুশিয়া নানা উপায়ে পাকিস্থান ও ভারতকে মস্কোর দরবারে যাতায়াত করাইতে সচেষ্ট হইল। পাকিস্থান ১৯৬৫র যুদ্ধে ভারতের নিকট পরাজিত হইয়া যেকোন উপায়ে অস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য রুশিয়া, আমেরিকা, জার্ম্মানী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল। চীন তাহাকে বহু অস্ত্র দিবার ব্যবস্থা করিল। ইহার পরিবর্ত্তে পাকিস্থান চীনকে কাশ্মীরের চোরাই জমির উপর দিয়া রাস্তা নির্ম্মাণ করিতে দিল। রুশিয়ার সহিত কি ব্যবস্থা হইয়াছে তাহা আমরা জানিনা তবে রুশিয়া যেভাবে পাকিস্থানকে বহু সংখ্যক ট্যাঙ্ক সরবরাহ করিয়াছে তাহাতে মনে হয় পাকিস্থান রুশিয়াকে বড় রকমের সামরিক সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। আমেরিকা অবশ্য এখন রুশিয়া অথবা চীনের সহিত যুদ্ধ করিবে বলিয়া ব্যবস্থা করিতেছে না। ভিতরে ভিতরে আমেরিকা চীনের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনেরই চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে মনে হয় আমেরিকা রুশিয়াকেই লক্ষ্য করিয়া সকল সামরিক ব্যবস্থা করিতেছে। রুশিয়াও পাকিস্থানকে নিজের দলে টানিবার চেষ্টায় না করিতে পারে এমন কাজ নাই। সুতরাং এখন যে পাকিস্থান রুশিয়া, চীন ও আমেরিকার সাহায্যে সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করিয়া চলিয়াছে তাহার ফল কি হইবে তাহা ঐ তিনটি দেশই উত্তমরূপে জানে। পাকিস্থানের একমাত্র উদ্দেশ্য ভারতের নিকট হইতে গায়ের জোরে কাশ্মীর ছিনাইয়া লওয়া। পাকিস্থান, আজ হউক কাল হউক কোন সময় আবার সেই চেষ্টা করিবেই। ফলে যদি পাকিস্থান পুনঃ পরাজিত হয় তাহা হইলে ভারতকে আমেরিকা ইউ এন এর শান্তির বার্ত্তা ও রুশিয়া তাসখন্দের ভারত-পাকিস্থান সৌহার্দ্যের সঙ্গীত শুনাইতে আরম্ভ করিবে এবং পাকিস্থান পরাজিত হইয়াও যাহাতে সুস্থভাবে বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক আসরে বিভীষণের ভূমিকায় চির-অবতীর্ণ থাকিতে পারে জগতের সামরিক মহাজাতি-গুলি সেই চেষ্টাই করিতে থাকিবে। কারণ রাজ-নীতিতে পেশাদার বিশ্বাসঘাতকদিগের একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে এবং সেই কারণে যে সকল জাতির কোন নীতির বালাই নাই তাহাদের সমাদর করিতে অনেকেই প্রস্তুত থাকে। সমাদর যাহারা করে তাহারাও সুনীতি কুনীতির পার্থক্য বিচারে সময় নষ্ট করেন না। সুবিধা কিসে তাহাই শুধু দেখিয়া থাকেন। রুশিয়া ও আমেরিকার যে দুই অথবা চার নৌকায় পদ-

স্থাপন করিয়া চলাফেরা করার অভ্যাস তাহাও ঐ উচ্চাঙ্গের রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর নিদর্শন।

কলিকাতায় চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ

কলিকাতার রাজপথে যেভাবে যানবাহন পদচারী ও সর্বজনিক গরু বাছুর কুকুর বিড়াল চলন্ত অথবা নিশ্চল অবস্থায় উপস্থিত থাকিতে দেখা যায় তাহাতে মনে হয় রাজপথের ব্যবহার যথেচ্ছা করাই এই সহরের রীতি; কোন নিয়মকানুন এ সম্বন্ধে নাই অথবা থাকিলেও তাহা কেহ জানেও না মানেও না। তবু মধ্যে মধ্যে যাহারা মোটর গাড়ীর সৌভাগ্যবান মালিক তাহারা পুলিশের নিকট হইতে নিয়মভঙ্গের নালিশের "নোটিশ" পাইয়া বুঝিতে পারে এই সহরের পুলিশ একান্ত ঘুমন্ত নহে তাহারা কখন কখন দেখিয়া ফেলে কে ভুল জায়গায় গাড়ী রাখিয়া দোকানে প্রবেশ করিয়াছে অথবা লাল আলো না দেখিয়া রাস্তা পার হইয়া নিয়মরক্ষা করে নাই। কিন্তু রাস্তার মোড়ে মোড়ে খালি রিকশা ভিড় করিয়া রাস্তা বন্ধ করিয়া রাখিলে; কিম্বা একাভিমুখে গমনের নির্দেশ অগ্রাহ্য করিয়া শতশত সাইকেল, রিকশা ও ঠেলাগাড়ী চলিতে থাকিলে পুলিশ তাহাদের দেখিতে পায় না অথবা দেখিতে চায় না। কারণ নিয়ম আয়করের মতই শুধু পয়সাওয়ালা নাগরিকের জন্য; রিকশা, ঠেলা বা সাইকেল টানে ঠেলে বা চড়ে যাহারা তাহারা নিয়মের বাহিরে। কে বলিয়াছে দারিদ্র্য দোষম! পুলিশের নিকট দরিদ্র রিকশা ও ঠেলাওয়ালা কিম্বা যাহারা ধুলা ও মক্ষিকা-আচ্ছাদিত কাটা ফল বিক্রয় করিয়া সহরে টাইফয়েড ও কলেরা ছড়াইতে সাহায্য করে সেই খুনচেওয়ালারা সকল আইন ভাঙ্গিলেও আদালতের নাগালের বাহিরে স্বাধীনভাবে যথেচ্ছাচারে শোভমান থাকার অধিকারী। কেহ কেহ বলে পুলিশও দরিদ্র ও তাহারা অপর দরিদ্রদিগকে সাহায্য করে বলিয়া সেই সকল দরিদ্র ব্যবসায়ীরাও পুলিশকে সাহায্যদান করিয়া থাকে। গরিবে গরিবে মাসতুত ভাই বা ঐরূপ কোন মিলিতভাবে অপরাধীগণ একসূত্রে বাঁধা। প্রাইভেট গাড়ীর মালিক বা চালকগণ পুলিশের সহিত কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপনে সক্ষম নহে; কিন্তু ট্যাক্সীচালকগণ সেই ঘনিষ্ঠতা সৃজন করিতে পারে বলিয়া দেখা যায়। সেইজন্য ট্যাকসীগুলি ভাড়াটিয়া খুঁজিয়া অতি মন্থরগতিতে বিচরণ করিয়া অপর সকল গাড়ীর গতিতে বাধা দেয় এবং ভাড়াটিয়া পাইলে তীব্রবেগে গাড়ী ছুটাইয়া যাত্রীর ও পথচারীর জীবন বিপন্ন করে। পুলিশ কিন্তু তাহাদিগকে কিছু বলে না; কারণ তাহারাও গরীব, পুলিশও গরীব। খুনচেওয়ালা এবং ফুটপাথে মাল ঢালিয়া বিক্রয় করে যাহারা তাহারা জনসাধারণের বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করিলেও পুলিশ তাহাদিগকে কিছু বলেনা। শুনা যায় রাজ্যপাল নাকি ইহাদিগকে একবার তাড়াইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা তাহার কোন লক্ষণ কোথাও দেখি নাই। অতিসম্প্রতি বেন্‌টিং ষ্ট্রীট ও লালবাজারের মোড়ে যেখানে পুলিশের ভিড়ে মানুষ পথ চলিতে পারে না, দেখিলাম একজন খুনচেওয়ালা রাস্তার মধ্যে স্থলে, প্রায় ট্রামলাইনের উপর, খুঁচে বসাইয়া কাটা ফল বেচিতেছে। তাহার ব্যবসার সুবিধার জন্য গাড়ী চলা বন্ধ। আমরা একজন পুলিশ-প্রহরীকে বলিলাম ঐ খুনচেওয়ালাকে রাস্তা ছাড়িয়া ফুটপাথে উঠিয়া যাইতে বল। পুলিশ হাত পা ছুঁড়িয়া বলিল, হমার ডুটি নহি হায় উসকো হটানেকা। আমরা বলিলাম তুমি তাহলে এখানে আছ কেন? সে ঐ কথার উত্তর না দিয়া বলিল যেইসা রাজ ঐসা কাম। দার্শনিক তত্ত্ব হিসাবে কথাটা মূল্যবান হইলেও পুলিশের পক্ষে রাজ সম্বন্ধে কটাক্ষ করা সংযমন নিয়মন ইত্যাদির রীতি বিরুদ্ধ। গাত্র কণ্ডুয়মান খুনচেওয়ালা অধৌত হস্তে কাটা ফল বিক্রয় করিয়া চলিল ও পুলিশের মহারথীও অনুরূপ মুদ্রা অবলম্বনে নিজের সামাজিক-রীতি সংরক্ষণে নিবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। আমরা দেখিলাম রাজ্যশাসন পদ্ধতি সংস্কার চেষ্টা না করিয়া নিজ কার্য্যে গমনই শ্রেয় কারণ আমাদের প্রাইভেট গাড়ীর প্রতিরক্ষা সহজ নহে। একজন রাজকর্মচারীকে

অপরাধে আদালতে হাজির হইলে কোনই লাভ হইবে না। তাই ভাবিলাম he who from battle runs away, lives to fight another day অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন বীরত্বব্যঞ্জক না হইলেও ভবিষ্যতে আবার যুদ্ধ করিবার সুবিধাদায়ক বলিয়া সর্ব্বত্র স্বীকৃত হইয়া থাকে।

অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন যে কলিকাতায় কোন রাজপথেই যাহারা পায়ে হাঁটিয়া চলে তাহাদের রাস্তা পার হইবার কোন নিরাপদ ব্যবস্থা নাই। এমন কি চৌরঙ্গীতেও রাস্তা পার হওয়া একটা কঠিন সমস্যা। পৃথিবীর অপর সকল দেশেই রাস্তা পার হইবার স্থান ও সময় আলো দিয়া দেখান হয়। কলিকাতায় কেন হয় না; তাহা কি কেহ বলিতে পারেন? উত্তর হয়ত হইবে যে কলিকাতায় কোন কিছুই কোন কারণে হয় না। সবই যথেচ্ছভাবে ঘটিয়া থাকে। যথা রাস্তা মেরামত, রাস্তার নামকরণ, রাস্তা খনন, বাস ট্রাম চলাচল, দোকানপাট খোলা না খোলা, দুগ্ধ সরবরাহ বা সরবরাহ বন্ধ, বিদ্যুৎ গ্যাস ও জলের ব্যবস্থা, স্কুল কলেজে যাওয়া না যাওয়া, ডাক্তার ঔষধ পাওয়া না পাওয়া—আরও কতকিছু; সবই কাহারও না কাহার ইচ্ছার উপর চলিতেছে। নিয়মের অধীণ কিছুই নহে। এমন কি মরিতে হইলেও নানান গোলযোগ। অ্যাম্বুলেনস দুষ্প্রাপ্য, হাসপাতালে স্থান নাই মৃত্যুর পরেও ক্রিমেটোরিয়ামের পর্ব্ব এক চরম ভাগ্যপরীক্ষার ব্যাপার। সকল কার্য্যেই বাধা ও বিপত্তি। কাপড় ধুইতে পাঠাইলে ধোপার দোকান দুমাসের জন্য বন্ধ! হরতাল হইয়াছে। টেলিফোন করিলে পাঁচবার পাঁচজন রাজস্থানী মহিলার সহিত কথা বলিতে বাধ্য হইয়া ভুলিয়াই যাইতে হয় যে কেন কাহাকে টেলিফোন করিতে চাহিয়াছিলাম। রেডিও চালাইলে সুর লইয়া ছিনিমিনি খেলা, খেলা দেখিতে যাইলে ইষ্টক ও বোমা-বৃষ্টি, ট্রেনে উঠিলে ১৫১ বার চেন টানিয়া ট্রেনের যাওয়া বন্ধ। কলিকাতার অভাগাদের সাগর শুখাইয়া মরুভূমি হইয়া গিয়াছে। তাহাকে সরস করিয়া তোলা অসম্ভব।

গৃহ নির্ম্মাণ

ভারতবর্ষে মানুষের বাসস্থানের সংখ্যা ও যেগুলি আছে সেইগুলির অবস্থা বিচার করিলে দেখা যায় যে বাসস্থান নির্মাণ একটা অতি বৃহৎ অর্থনৈতিক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান সহজ নহে এবং সমাধানের পথে বহু বাধাবিঘ্ন আছে যাহার অপসারণ প্রায় অসম্ভব বলিলেই চলে। সব শহরে যত বাসস্থান প্রয়োজন তাহা অপেক্ষা এককোটী উনিশ লক্ষ বাসগৃহ কম আছে এবং গ্রামে এই অভাবের পরিমাণ সাতকোটী আঠার লক্ষ। শুনা যায় যে অভাব দূর ত হইতেছেই না পরন্তু উহা বাৎসরিক কুড়ি লক্ষ হিসাবে বাড়িয়া চলিয়াছে। জাতীয় বা প্রাদেশিক দায়িত্ব স্বীকার করিয়া লইলেই গৃহনির্মাণ হইয়া যায় না। তাহার জন্য প্রয়োজন অর্থের এবং অর্থের ব্যবস্থা হইলে ইট, চুণ-বালি সিমেন্ট, সুরকি, পাথরকুচি, কাঠ অথবা অপর দরজা জানালা নির্মাণের কাঁচামাল, ষ্টিল, জলের ও ড্রেনের পাইপ এবং শৌচস্নানাগারের প্রয়োজনীয় বস্তু ইত্যাদি। ইহার উপরে রহিয়াছে কর্ম্মীর সরবরাহ ও তাহাদিগকে চালাইবার ও নিয়মানুযায়ীভাবে কাজ করিতে শিখাইবার তত্ত্বাবধায়ক ইঞ্জিনিয়ার ও কর্ম্মচারী।

একটা গৃহের আকার যদি (বারান্দা, শৌচ-স্নানাগার রন্ধনকক্ষ প্রভৃতির অংশ ধরিয়া) একশত পঞ্চাশ বর্গফুট হয় তাহা হইলে ধরা যাইতে পারে যে গৃহপিছু জমির মূল্য ব্যতীতই প্রায় দুই হাজার টাকা ব্যয় হওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইলে এককোটী গৃহ নির্মাণ করিতে হইলে দুই হাজার কোটি টাকার প্রয়োজন হয়। এই টাকা সরকারীভাবে সংগ্রহ করিয়া গৃহনির্মাণ করিতে হইলে ধার করিয়া টাকার ব্যবস্থা করিতে হয়। দশ বৎসর যদি ঐভাবে বাৎসরিক পঞ্চাশ লক্ষ গৃহ নির্মাণ করা হয় তাহা হইলে দশ হাজার কোটি টাকা ঋণ গ্রহণ করিতে হইবে যাহার বাৎসরিক সুদ হইবে, আনুসঙ্গিক খরচ ইত্যাদি লইয়া, আনুমানিক ৮০০ শত কোটি টাকা। এই সুদের টাকা ও গৃহ-মেরামত প্রভৃতির ব্যয় ভাড়ার টাকায় আদায় করিতে হইলে

(গৃহ)পিছু যাহা ভাড়া দাঁড়াইবে তাহা কি কেহ দিতে (রা)জি হইবে? দুই হাজার টাকা মূল্যের গৃহপিছু মেরামত (ইত্য)াদির খরচ বাৎসরিক ত্রিশ-চল্লিশ টাকা দাঁড়ায় (অ)র্থাৎ পাঁচকোটি গৃহের জন্য লাগিবে বাৎসরিক প্রায় (১৫)০—২০০ কোটী টাকা। সুদ ইত্যাদি লইয়া মোট (বা)ৎসরিক ব্যয় হইবে ১০০০ হাজার কোটী টাকা (অ)র্থাৎ গৃহপিছু ২০০ শত টাকা। মাসিক ভাড়া তাহা (হই)লে অন্ততঃ দাঁড়ায় ১৬।১৭ টাকা। গৃহ বলিতে (বু)ঝায় একটি কক্ষ ও তাহার সহিত আংশিকভাবে (রন্ধ)ন, স্নান প্রভৃতির স্থান। ইহার জন্য যদি মোটামুটি (মা)সিক ষোল সতের টাকা ভাড়া লাগে তাহা হইলে (শহ)রে ২০।২২ টাকা ধরিলে গ্রামের দর হয়ত ১০।১২ (টা)কা হইবে।

একটি গৃহে যদি দুই তিনজন মানুষ (বালক বালিকা (শি)শু ধরিয়া) বাস করে তাহা হইলে ধরা যাইতে (পা)রে যে তাহাদিগের বার্ষিক আয় মোটামুটি ৭।৮ শত (টা)কা। ইহা হইতে কি তাহারা ১০০।১১০ টাকা (ঘ)র ভাড়া দিবে? অথবা তাহারা খড়ের ছাউনির (নী)চে বাস করাই প্রাণধারণের পক্ষে সহজ উপায় মনে (ক)রিবে? কারণ যেখানে রোজগারের শতকরা ৮০।৯০ (টা)কা খাদ্যের জন্য মানুষ ব্যয় করিতে বাধ্য হয় সেখানে (খা)দ্য ক্রয় করিয়া যে শতকরা ১০।১৫ টাকা বাঁচে তাহা (ম)হ ঘরভাড়া দিতে পারে না। বস্ত্র, ঔষধ, সামাজিক (প্র)য়োজন ইত্যাদি অনেক বড় কথা। সুতরাং গৃহ (নি)র্মাণ রাষ্ট্রীয়ভাবে করিবার আবশ্যক কতটা আছে (তা)হা বাস্তব দৃষ্টিতে দেখিয়া স্থির করা উচিত। নয়ত (শু)ধু ঋণের বোঝাই বাড়িবে; নির্মিত গৃহ কেহ ভাড়া (দি)য়া লইতে প্রস্তুত হইবে না।

খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধের তুলনায় উন্নততর আদর্শে নির্মিত (গৃ)হের প্রয়োজন ততটা মরা বাঁচার হিসাবের কথা নহে। (ভা)রতবর্ষের বহুস্থলে শুধু ছাউনির তলায় থাকা যায় এবং (অ)নেকস্থলে স্বাস্থ্যের উন্নতিই হয়; ঘুপচি বদ্ধ হাওয়ায় বাস (ক)রিবার তুলনায়। ভারতের মানুষের জন্য গৃহনির্মাণ (অ)পেক্ষা বহু অধিক প্রয়োজনীয় কথা হইল উপযুক্ত (পু)ষ্টিকর খাদ্যের, স্বাস্থ্যকর বস্ত্র পরিধানের, সাবানের, ঔষধের, চিকিৎসার, শিক্ষার ব্যবস্থার ও জীবনযাত্রা প্রণালীর ধরণধারণ উন্নততর করিবার। গৃহনির্মাণ ব্যক্তিগতভাবে যাহা হয় তাহাই যথেষ্ট। শুধু কারখানার ও দফতরের কর্মীদিগের জন্য সরকারী ব্যবস্থা আবশ্যক হইতে পারে। ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় আরও অনেক গৃহ নির্মাণ সম্ভব হইত যদি সেইজাতীয় গৃহনির্মাণে রাষ্ট্রীয় সহায়তা দেওয়া হইত। কোন সাহায্য ত করা হয়ই না বরঞ্চ আয়কর বিভাগ, ভাড়া লেনদেন আদালত, দেওয়ানী আদালতের নিয়মকানুন, জবর দখলদার ও অনধিকার প্রবেশকারীকে অপসারণ করার নিয়মকানুন ইত্যাদির জন্য কেহ আজকাল গৃহ-নির্মাণ করিতে চাহেন না। তাহার উপর আছে মজুরীবৃদ্ধি, মালমশলার মূল্য বৃদ্ধি ও মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্সবৃদ্ধি। পুরাতন ভাড়াটিয়াগণ দেখা যায় শহরে পুরাতন হারে যে ভাড়া দিয়া থাকেন তাহা অনেক স্থলে ন্যায্য ভাড়ার এক চতুর্থাংশ হইতেও কম। কলিকাতায় বহু একতালা, দুতালা পুরাতন বাড়ী আছে যাহা ভাঙ্গিয়া ছয় সাত কি দশতালা বাড়ী করিলে শহরের বাসস্থানের অভাব লাঘব হয়। কিন্তু পুরাতন ভাড়াটিয়াগণ ন্যায্য ভাড়াও দিতে চাহেন না এবং উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিয়া উঠিয়া যাইতেও চাহেন না। ফলে শহর কোথাও কোথাও ঐতিহাসিক দ্রষ্টব্য হিসাবেই একভাবে থাকিয়া গিয়াছে। যেসকল ঠিকা ভাড়াটিয়া বস্তি নির্মাণ করিয়া বহুস্থলে দুর্গন্ধ খাটাল ইত্যাদি স্থাপন করিয়া শহরের উন্নতিতে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন তাহাদের সম্বন্ধেও কিছু করা হয় না। আইন করিয়া ক্ষতিপূরণ ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত করিয়া শহরের উন্নতির ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক না করিলে কোন শহরের উন্নতি হইতে পারে না।

কৃষ্ণকায়—শ্বেতকায় বিবাদ

দাসত্ব প্রথার সহিত প্রথমে শ্বেতকায় কৃষ্ণকায় পার্থক্যের কোন সম্বন্ধ ছিল না। প্রাচীন ভারতে গ্রীসে ও অন্যান্য দেশে যুদ্ধে পরাজিত জাতির লোকেদের দাসত্ব শৃঙ্খলাবদ্ধ করার রীতি ছিল এবং যাহারা দাস

হইয়া বিজয়ী জাতির লোকেদের সেবা করিতে বাধ্য হইত তাহারা বহু স্থলেই বর্ণে বিজয়ীর সমকক্ষই হইত। পোপ গ্রেগরির নিকটে কয়েকটি ইংলণ্ড হইতে লইয়া আসা অ্যাঙ্গল্ জাতীয় বালককে উপস্থিত করাতে তিনি তাহাদিগের রূপে মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন ইহারা অ্যাঙ্গল্ নহে, ইহারা এঞ্জেল (দেবদূত বা দেবশিশু)। ইতিহাসে বহু রাজপুত্রের ও অভিজাতদিগের কথা শুনা যায় যাঁহারা যুদ্ধের ফলে বহুকাল দাসভাবে থাকিয়া পরে মূল্য দিয়া স্বাধীনতা ফিরাইয়া পাইয়াছিলেন। মধ্যযুগ অবধি এইভাবে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু যখন আমেরিকা আবিষ্কৃত হইয়া তদ্দেশে শ্বেতকায়গণ প্রভুত্ব বিস্তার করে তাহার পরে আরম্ভ হয় বৃহৎভাবে চাষবাস করার ব্যবস্থা। তুলা, আখ, গম, গরু ভেড়া ঘোড়া প্রভৃতি দূর দূর দেশ হইতে ইয়োরোপে সরবরাহ করা হইত ও সেই সকল বস্তুর উৎপাদন কার্য্যের জন্য যাহারা শ্রমিক নিযুক্ত হইত তাহাদের মধ্যে ক্রমে ক্রমে ক্রীতদাসদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল। আফ্রিকা হইতে আরব দাস ব্যবসায়ীগণ ইয়োরোপীয়দিগকে দাস সরবরাহ করিত ও এই ব্যবসার জন্য আরবগণ আফ্রিকার গ্রামের পর গ্রাম হইতে শত শত নরনারীকে বন্দি করিয়া আমেরিকা ও অপরাপর দেশে চালান করিত। এই সকল দাসদিগের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার হইত তাহা লইয়া বহু ধর্ম্মাত্মাব্যক্তি আন্দোলন আরম্ভ করেন ও পরে দাসপ্রথা উঠাইয়া দেওয়া হয় (আমেরিকার আভ্যন্তরীণ যুদ্ধের পরে এব্রাহাম লিংকন দাসপ্রথা উঠাইয়া দেন। ইয়োরোপে ইহার পূর্ব্বেই গ্র্যানভিল শার্প, টমাস ক্লার্কসন ও উইলবারফোর্স কৃত আন্দোলনের ফলে বৃটিশ সাম্রাজ্য হইতে দাস প্রথা উঠিয়া যায়। ইহাতে যে একটা বিরাট দাস-ব্যবসায় গড়িয়া উঠিয়াছিল ও যাহার ফলে দাস বলিতে কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদিগকেই বুঝাইত, তাহার অবসান ঘটে। অন্ততঃ আইনের চক্ষে। কিন্তু দাসত্বের সম্বন্ধে যে একটা সামাজিক ঘৃণার ভাব তাহা শ্বেতকায়দিগের চক্ষে সর্ব্বত্র থাকিয়া যাইল। কৃষ্ণকায় হইলে যেন মানুষ অনুন্নতশ্রেণীর লোক ইহাই শ্বেতকায়গণ বিশ্বাস করিতে থাকিল। ক্রমে ক্রমে যে সকল জাতির লোকেরা দাস কখনও ছিল না তাহাদিগকেও বর্ণের জন্য নিম্ন শ্রেণীর বলিয়া গণ্য করা হইতে আরম্ভ হইল। ইংরেজদের ভারতীয় 'নেটিভ" দিগের সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি এই মনোভাবের পরিচায়ক। আমেরিকার নিগ্রো সমস্যা, দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার শ্বেতকায়প্রাধান্য ও বর্ত্তমান বৃটেনের ভারতীয়বিরুদ্ধতা ঐ বর্ণবিদ্বেষ হইতেই জন্মলাভ করিয়াছে।

বর্ত্তমান অবস্থায় যখন পৃথিবীর বহু রাষ্ট্রই কৃষ্ণকায় মানবের স্বাধীন নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হইতেছে; কৃষ্ণকায়জগতে একটা নব জাগরণ হইয়াছে। শ্বেতকায়দিগের প্রাধান্য, অহমিকার অভিব্যক্তি এবং কৃষ্ণকায় রাষ্ট্রগুলির ভিতর শত্রুতা ও সংঘর্ষণ সৃজন চেষ্টা ইত্যাদির উত্তরে একটা কৃষ্ণকায়শক্তির সংহত ও সম্মিলিত বর্দ্ধন প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। ইহার সহিত একমত না হইলে কোন কোন কৃষ্ণকায় রাষ্ট্রে বিপ্লবের আয়োজনও হইতেছে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া মনে হয় যে বর্ণবিদ্বেষজাত কারণে ভবিষ্যতে শ্বেত ও কৃষ্ণকায় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কখন কখন যুদ্ধ লাগিয়াও যাইতে পারে। এই সম্ভাবনা দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়াতেই প্রবলভাবে রহিয়াছে এবং আফ্রিকার কৃষ্ণকায়শাসিত রাষ্ট্রগুলির শক্তিবৃদ্ধি হইলে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইবে। যদি না অপর কোন উপায়ে শ্বেত-প্রভুদের অন্তরে সুবুদ্ধি জাগ্রত করা সম্ভব হয়।

কর্ম্মে সাফল্যের কথা

ব্যক্তিগত অথবা জাতীয় অবনতি, অভাব ও উৎপীড়িত অবস্থার প্রতিকার চেষ্টা নানাভাবে হইয়া থাকে। সেই সকল চেষ্টার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সাফল্যদান করে ব্যক্তিগত বা সমবেতভাবে নিজের বা নিজেদের উন্নতিচেষ্টা, বাস্তবক্ষেত্রে লাভের আয়াস ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার প্রয়াস। নিরক্ষর যে তাহার নিজের চেষ্টা না থাকিলে শত বিদ্যালয় ও সহস্র শিক্ষকও তাহাকে জ্ঞানদান করিতে পারিবে না। বাংলার ইতিহাসে বহু মহামানব জন্মিয়াছেন যাঁহারা

নিদারুণ দারিদ্র্যের মধ্যে থাকিয়াও বিদ্যা ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অসীম যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই যুগে যুগে দেখা গিয়াছে দরিদ্র-পরিবারের সন্তানগণ নিজচেষ্টায় শিক্ষায়, জ্ঞানে, কৃষ্টিতে ও কর্মে সমাজে উচ্চস্থান অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছেন। যাঁহারা বিরাট বিরাট শিক্ষা, চিকিৎসা, শিল্প অথবা অর্থনৈতিক কর্ম্ম প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই বিশেষ কোন অর্থসংস্থান ছিল না ও নানা বাধাবিপত্তি ও অভাবের সহিত কঠোর সংগ্রাম করিয়াই তাঁহারা নিজ নিজ আদর্শ অনুসরণে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কর্মীজগতে যাঁহারা চিত্রকলায়, ভাস্কর্যে, স্থাপত্যে, সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, নাট্যে, বিজ্ঞানে, যন্ত্রকৌশলে, দুর্গম দেশ আবিষ্কারে, যুদ্ধে, বিপ্লবে, ধর্ম্মপ্রচারে বা অন্য যে কোন বিষয়ে কর্মে সাফল্যের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন; তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশেরই প্রধান সহায় ছিল নিজ চেষ্টা, নিজ অন্তরের প্রেরণা ও নিজস্ব প্রতিভা।

সমবেতভাবেও বৃহৎ কার্য্যে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে ও হইতে পারে; কিন্তু সেখানেও বহু ব্যক্তির কর্ম্মশক্তি সংযত ও সংহতভাবে মূর্ত্ত হইয়া ব্যক্ত হয়। শুধু লোকের ভীড় হইলেই কাজ হইয়া যায় না। আর একটা কথা আছে যে ভাগের মা গঙ্গা পায় না। অর্থাৎ যে কার্য্যের অনেক কর্মী, মালিক অথবা শরিক সে কার্য্য কেহই নিজের বলিয়া মনে করেনা। অবহেলাই সেই সকল ক্ষেত্রে প্রধানতঃ দেখা যায় এবং সকলেই চেষ্টা করে যাহাতে ঐ কার্য্যে বিনা পরিশ্রমে কিছু কিছু লাভ করা যায়। সমবেত চেষ্টাতে অধিক লোক জড়িত থাকিলে কাজ সহজ হয় না। এই জন্য বর্ত্তমান জগতে যৌথ কারবারের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহাতে আর্থিক অংশীদার যাহারা তাহারা তত্ত্বাবধান কার্য্য বেতনভোগী লোক দিয়া করায়, নিজেরা শুধু সভা করিয়া কার্যভার অপরকে অর্পণ করে। আর একভাবে সমবেত কর্ম্ম-প্রচেষ্টার আয়োজন করা হয় তাহা হইল রাষ্ট্রীয় ভাবে সমষ্টিগতভাবে ব্যবসায় ও উৎপাদনী প্রতিষ্ঠান গঠন করা। এই জাতীয় প্রচেষ্টা আজকাল সোসিয়া-লিষ্ট ব্যবস্থা বলিয়া পরিচিত এবং যে সকল দেশ কম্যুনিষ্ট সে সকল দেশে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানই সমষ্টিগত। যে সকল দেশ কম্যুনিষ্ট নহে সে সকল দেশেও সরকারী প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়া থাকে। যথা রেলওয়ে, ডাক-তার-বেতার, টেলিফোন, বাস-ট্রাম প্রভৃতি বহু কার্য্য অনেক দেশেই রাষ্ট্রীয়ভাবেই করা হয়। আমেরিকায় কিন্তু রেলওয়ে, টেলিফোন ইত্যাদি ব্যক্তিগত ব্যবস্থাতেও চলে। ভারতবর্ষে বহু প্রতিষ্ঠান এখন রাষ্ট্রীয় অধিকারে চালিত হইতেছে। জাহাজ নির্মাণ, হাওয়াই জাহাজ চালনা, ষ্টীল, প্রভৃতি অনেক ব্যবসায় ভারতে এখন রাষ্ট্রীয় অধিকারে চলিতেছে। তাহার পরিচালনার অক্ষমতা দেখিয়া মনে হয় সমষ্টিগত কার্য্য ঠিকভাবে চলে না।

কাজ যে কোন্ চলিলে তাহা লাভজনক হইবে তাহার বিচার না করিয়াও একটা কথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে শুধু লোক জড় করিয়া জটলা করিলে বিশেষ কোন উৎপাদনী শক্তির গঠন অথবা নিয়ন্ত্রণ হয় না। কারণ যাহারা জটলাতে অংশ গ্রহণ করে তাহাদের বাস্তব কর্ম্মক্ষেত্রে শিক্ষা, জ্ঞান, কর্ম্মকৌশল, কর্মের আগ্রহ প্রভৃতি কোনদিক দিয়াই কোন বিশেষ ক্ষমতা বা মূল্য নাই। যথা মিছিলে যাহারা চলে দেখি তাহারা বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, বালক, বালিকা, শিশু ও সাধারণ অকেজো মানুষ বলিয়াই লক্ষিত হয়। ইহারা সমর্থন করিলে কোন কিছু উত্তমরূপে চলিবে, অথবা সমর্থন না করিলে কাজ চলিবে না এমন অবস্থা এখনও হয় নাই। এই সকল লোক জড় করার উদ্দেশ্য জনশক্তি নেতাদিগের কথায় ব্যক্ত হয় অথবা হয়না, ইহাই প্রমাণ করা। কিন্তু জনশক্তির মধ্যেও ব্যক্তিগত গুণাগুণের ওজন দেখিতে হইবে। ব্যক্তির ক্ষমতা কর্ম্মকৌশল ও সামাজিক পরিস্থিতি না দেখিয়া যেমন তেমন করিয়া বহু লোক ডাকিয়া হৈ হল্লা করিলেই তাহাতে কোন ফল হয় না। শুধু জন সাধারণের অসুবিধা ও উৎপাদনী কার্য্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়।

ডেল কার্ণেগি ও ভারতীয় দৃষ্টি

ভাস্বর ভট্টাচার্য

ডেল কার্ণেগি একটি বিশ্ব-বিশ্রুত নাম। পারিবারিক ও ব্যবহারিক জীবন সম্পর্কীয় এঁর ব্যবস্থিত নীতিগুলি আজ বিশ্বের জনমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত। সামাজিক জীব মানুষ। সমাজে বাঁচতে গেলে বিভিন্ন মানুষের সংগে তার সংযোগ সুরক্ষার এক স্বকীয় দিক এবং পারস্পরিক (reciprocal) সহমর্মিতা বজায় রেখে চলার একটি সুষ্ঠু-পথ ও পদ্ধতি আবিষ্কারের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। বন্ধুত্ব-লাভ, গণসংযোগ ও পারিবারিক জীবন কিরূপে সুন্দরতর পদ্ধতির মাধ্যমে হৃদ্য ও রম্য হয়ে উঠতে পারে সে সম্পর্কে কার্ণেগি-নির্দেশিত নীতিগুলির মধ্যে এক অমোঘ সত্য নিহিত আছে। এমনকি একক পরিসরে যাঁর জীবনায়ক, তিনিও এই লক্ষণের সীমাতিক্রান্ত—একথাও জোর ক'রে বলা চলেনা।

প্রায় অর্দ্ধশত ভাষায় অনূদিত হ'য়ে শতশত মানুষের যে নীতিগুলি সামগ্রিক হিতসাধন ক'রে চলেছে, তা এক হেতুগর্ভ ও অনাবিল বলেই ধরে নিতে হবে। আধ্যাত্মিক তথা ভারতীয় দৃষ্টির আলোকে এই নীতি-গুলির এক মৌল-বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। কার্ণেগি-নির্দেশিত অধিকাংশ নীতিনিচয় সে ভারতীয় তথা জগতের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উপপত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত, তা আজ শুধু বিকল্পনা নয়। চিন্তাশীল পাঠক-মাত্রই আশাকরি এ বিষয় মতৈক্য পোষণ করবেন।

সৌহার্দ্য পরস্পরের মধ্যে বজায় রেখে, একে অপরের প্রয়োজন, প্রণোদন (Propencity) ও স্বার্থের দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে কি করে একটি পরিচ্ছন্ন ও প্রাণবন্ত জীবন যাপন করা সম্ভব; তদ্বিষয়ে এই মনীষীর অবদান অনস্বীকার্য। সবচেয়ে বড় কথা, কোন একটি প্রয়োজন ও তজ্জাতীয় কর্মের উদ্ভব—বিকাশ—পরিণতি সম্পর্কে এমনতরো দূরাবগাহী দৃষ্টি এবং তন্নিমিত্ত যে কর্মের একটি সুষ্ঠু 'প্রাক্ প্রস্তুতি'র (pre-arrangement for initiation) প্রয়োজন সবচেয়ে বড় দরকার—সে বিষয়ে এই ব্যবহারবিজ্ঞানীর পূর্বে আর এমন ব্যাপক, বিস্তৃত ও সহজতর নির্দিষ্টতার মধ্য দিয়ে প্রকাশে অন্যেরা বোধ করি প্রয়াসী হননি।

অপেক্ষাধীন কোন নীতি যখন প্রয়োগযোগ্য (Demonstrative) পর্যায়ে উন্নীত হয়, বুঝতে হবে তা হেতু-গর্ভ। ভাবাবেগ ও উপপত্তি (Emotion versus reason) নিয়ে মানুষের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, তা থেকে অনাবিল সত্যকে 'লক্ষ্যবেধ' করার (Heart of the problem) যে সহজ ও ত্বরান্বিত পথ এবং পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন—সেজন্যে এই মনীষীর কাছে জগজ্জনে সম্প্রতি প্রকাশ করবেই। কর্ণেগির এই নীতি কোন সোচ্চার-ভারাক্রান্ত প্রতিবেদন (Report) নয়, বরঞ্চ পূর্বাচার্যদের এক বিনয়নম্র অনুসৃতি। সেখানে কোন ক্লেদাক্ত অহম্পূর্বিকা বা ego-centnic eruption নেই, বরঞ্চ আছে আত্মোপলব্ধির শ্বেত চন্দনের স্নিগ্ধ অভিব্যক্তি। তাঁর আন্তরিক সৌজন্য ও ঐকান্তিক উপচিকীর্ষা যেন তাঁর প্রতিটি রচনায় প্রাচীন আচার্যদের মতো বলে ওঠে: 'নহি কিঞ্চিদপূর্বমত্র বাচ্যং ন চ সংগ্রন্থন কৌশলং সমাপ্তি...অথ মৎসমধাতুরেব পশ্যোদপরোহপ্যেনমতো-হপি সার্থকোঽয়ম্'।

কিছু কিছু লোক আছেন (যাঁরা প্রতিটি দেশেই ছিলেন ও আছেন) যাঁরা এই নীতিগুলির মূল উদ্দেশ্য তলিয়ে না বুঝে কিংবা আচরণলব্ধ অভিজ্ঞতা ব্যতি-রেকেই কখনো কখনো কিছু অপরিপক মন্তব্য করে থাকেন। এই ব্যবহার-বিজ্ঞানী যে আচরণ-বিজ্ঞানের প্রবর্তনা করেছেন, তার যে অনেকাংশ এই ভারতেই হাজার হাজার বছর পূর্ব হতে উপলব্ধ-সত্য বলে প্রমিত হয়েছে—এটি তাঁরা খুঁটিয়ে দেখেন নি। কেউ কেউ আবার এটিকে কেবল কাজ হাসিল করার সুযোগ্য হাতিয়ার, কিংবা এক সক্রিয় মাধ্যম হিসাবেই পরিগণিত করতে চান। আবার কেউবা, এটিকে কতকগুলি চাতুর্যপূর্ণ কার্যক্রম কিংবা a bag of tricks হিসাবে গণ্য করতে চান। কিন্তু তাঁদের বক্তব্য যে

কত ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ তা কার্নেগির অনুসৃত নীতিগুলি খুঁটিয়ে দেখলে এবং সর্বোপরি তাঁর বিবক্ষণটুকুর সংগে সম্যক্ পরিচয় ঘটলে—আশাকরি প্রমাণিত হবে। এইরূপ অপব্যাখ্যার সম্ভাব্যতার জন্যে কার্নেগিও এক জায়গায় দু:খের সংগে বলতে বাধ্য হয়েছেন :

Another word of warning. I know from experience that some men,…will try to use the same Psychology mechanically. They will try to boost the other mans ego, not through genuine, real appreciation, but through flattery and insinceeity. And their technique won't work. Remember, we all crave appreciation and recognition, and will do almost anything to get it. But nobody wants insincerity. Nobody wants flattery. Let me report : the principles taught in this book will work only when they come from the heart. I am not advocating a bag of tricks. I am talking about a new way of life.

মহাভারত বলেছেন : 'সর্বসত্ত্বেষু সৌহৃদম্। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস বলেছেন : **Cultivate the genius of friendship—worship it!** এই **genius of friendship**কে **cultivate** করার জন্যেই কার্নেগির আজীবন সাধনা ও গবেষণা। কী করে বন্ধুত্ব অর্জন করতে হয় এবং সেইটি কিভাবে এক সুন্দরতর সম্পর্কের উপর ব্যবস্থিত থাকে এবং তার প্রকৃতি ও পদ্ধতিই বা কিরূপ—সেই সম্বন্ধীয় চর্যাগুলিই হ'ল কার্নেগির মূল নীতি।

উপমা দিয়ে দেখানো যেতে পারে, (দোহাই, উপমা ও উদাহরণ কেউ এক করবেন না। মনে থাকে যেন, উপমা ও উদাহরণ এক নয়। দুইটি ভিন্ন পৃথক ও বিপরীতধর্মী। অনেকে এটিকে না বুঝে অযথা গোল করেন)। কোন একজনের কাছে কোন একটি কাজের জন্যে এসে, মূল কাজের কথাটিই ভুলে গিয়ে (লক্ষ্যস্থির এবং ঈপ্সিত বস্তুটির প্রাপ্তির প্রয়োজন ও গভীরতা না বোঝার জন্যে) কেউ যদি অকারণ (কিংবা তার যথেষ্ট কারণ থাকলেও) তুমুল তর্ক কিংবা দ্বন্দ্বযুক্তি সুরু করেন তবে তার ফল কি হয় অথবা হ'তে পারে : ১) তিনি লোকটির বিরক্তি ও বিদ্বেষ কুড়ান। কিংবা অসন্তুষ্টি ও সন্দেহের এক বিকর্ষণধর্মী আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন। ২) অসহযোগিতা পান ও সাহচর্যলাভে বঞ্চিত হন। ৩) নিজে ও নিজের পরিপার্শ্বকে উত্তপ্ত করে তোলেন এবং সেই উত্তাপে নিজে এবং অপরে ক্লেদাক্ত হয়ে ওঠেন। ৪) নিজের আকাংখিত বস্তুটি পাওয়া বিলম্বিত হয় কিংবা আদৌ পাননা। ৫) নিজের ও অপরের মানসিক শান্তি ও সৌজন্য বিঘ্নিত হয়—এবং প্রলম্বিতভাবে দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলতে থাকে। ৬) কাজটি অর্ধ-সমাপ্ত থাকে। ৭) একজন নতুন বন্ধু পাওয়ার স্থলে তিনি প্রায়শ: একটি শত্রু আমদানি করেন। ৮) সুযোগ সুবিধা এবং তার মাধ্যমের ত্বরান্বিত সম্ভাবনাগুলো হারান। ৯) নিজের সময় শক্তি ও সামর্থ্যের অপচয় করেন। ১০) পরিশেষে নিজের সময়ও কার্যকাল হারিয়ে নিজের নির্দিষ্ট ব্যাপৃতিগুলি (engagements) নিজেই বিপর্যস্ত করে তোলেন। এহেন একটা ত্রুটির জন্যে ব্যবহারিক জীবনে [আধ্যাত্মিক জীবনেও ঘটে] যে কি পরিমাণ অসুবিধা ও সুযোগ আমরা টেনে আনি এবং ওই একটি দোষ যে কতগুলি দোষ প্রসব ক'রে কাজের গতিকে ব্যাহত করে এবং জীবনকে বিষময় করে তোলে—সেটি ব্যবহারবিজ্ঞানের দৃষ্টি ছাড়া বোঝা দুরূহ। মহাভারত সেইজন্যেই বলেছেন : 'ন প্রত্যক্ষং পরোক্ষং বা দূষণং ব্যাহরেৎ কচিৎ' অর্থাৎ প্রত্যক্ষে কিংবা পরোক্ষে কাহারও দোষ বলিবে না। ধর্মপদম-এ বুদ্ধদেবও ওই একই কথা বলেন : 'মা বোচ ফরুসং……।

মনুসংহিতাও ওই একই কথার পুনরাবৃত্তি করেন :… 'মা ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। আর সেই জন্যে কার্নেগি এই মহামণীষীদের বিবক্ষাটি আরো স্পষ্ট ও বিস্তৃতভাবে বললেন : **As a result of it all, I have come to the conclusion that there is only one way under high heaven to got the best of an argument—and that is to avoid it.**

মনে পড়ে প্রাগ্‌যৌবনে ছাত্রাবস্থায় পড়েছিলাম : **Life is an art and must be cultivated as an art.**

সুতরাং মানুষের সংগে ব্যবহারকে একটা আর্টের মতোই গুরুত্ব দিতে হবে এবং সেই কলায় পারদর্শী হ'তে গেলে কতকগুলি নির্দিষ্টতর চর্চা ও চর্যার উপর নির্ভর করতেই হবে। আর্টের অংগহানি যেমন সৌন্দর্যবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দূষণীয়, সেরূপ ব্যবহারবিজ্ঞানের নীতিনিচয়ও ব্যাহত হ'লে—তাও এক ভিন্নতররূপে সামনে খাড়া হ'য়ে উঠতে পারে; [যেটা বক্তা কখনও চাননি কিংবা ভেবেও উঠতে পারেননি)। এবিষয়ে **Casson** একটা সুন্দর কথা বলেছেন, **Words are like chemicals. Theyoften cause explosions. Harsh words have broken up homes and partnerships. They have led to violence. They have started wars.** 'কথা যেন একটা বিস্ফোরক, আর তা প্রায়শই বিস্ফোরণ ঘটিয়ে থাকে। কটু কথা কত সংসার ভেঙেছে আর কত দাম্পত্যজীবনই না বিপর্যস্ত করেছে। এই কটুক্তি কত সর্বনাশের দিকে মানুষকে ঠেলেছে কিংবা কত যুদ্ধবিগ্রহই না বাধিয়েছে। সুতরাং মানুষের সংগে ব্যবহারের যে সক্রিয় দুটি মাধ্যম 'বাক্যপ্রয়োগ' ও 'ব্যবহার'—সেই দুটিকেই নিয়মন ও নিয়ন্ত্রণের দ্বারাই তা ঘটাতে হবে। কার্নেগির নির্দেশিত নীতিগুলি এতদ্বিষয়ে মানুষের এক পরম সহায়ক এবং তার দ্বারা আমরা আমাদের প্রয়োজন মোটামুটি মিটিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারবো।

বস্তুতঃ কার্নেগির ব্যবস্থিত নীতিগুলি মানসিক [কর্মের প্রাকৃপ্রস্তুতি সম্পর্কীয়], ব্যবহারিক ও পারিবারিক পর্যায়ে ছড়িয়ে থাকলেও আমরা উপস্থিত দৈনন্দিন জীবনের কয়েকটি ব্যবহারিক নীতিগুলি নিয়েই আলোচনা করবো। তিনি বলেন:

১) অপরের প্রয়োজন এবং তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিকোণের দিকে নজর রাখুন।

২) অপরকে (নিজের চেয়ে) বেশি কথা বলতে দিন এবং সেটি আন্তরিকতার সংগে শুনুন।

৩) মুখের হাসি (সৌমনস্য) বজায় রাখুন।

৪) অপরকে মর্যাদা এবং গুরুত্ব দিন।

৫) তর্ক এড়িয়ে চলুন।

৬) মানুষের ত্রুটি পরোক্ষভাবে দেখান (যদি একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে)

৭) অপরের সামান্যতম উন্নতি কিংবা সাফল্যে আন্তরিক প্রশংসা করুন।

এখন উপযুক্ত নিয়মগুলো একটু পর্যালোচনা করা যাক্!

অপরের প্রয়োজন ও তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিকোণের দিকে নজর রাখুন।

অপরের প্রয়োজনের দিকে সজাগ ও সর্তক দৃষ্টি রেখে কথা বললে ও ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করলে, তিনিও পাল্টাভাবে আপনার বক্তব্যকে সহানুভূতির সংগেই গ্রহণ করবেন এবং প্রত্যাশিত ভদ্র ব্যবহারটুকুও ফেরৎ দিবেন। কিন্তু তার প্রয়োজন ও চাহিদাটুকু এড়িয়ে গিয়ে নিজের কথা ও কাহিনী সোচ্চারে রটনা করলে তার কোন ফলই কার্যাকর হবেনা বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কারণ মানুষ 'নিজের এবং 'নিজস্ব' সম্পর্কেই পৃথিবীর যে কোন বিষয়ের চেয়ে বেশি আগ্রহশীল। এবিষয়ের মূল কথা হ'ল; আপনি নিজে কি চান, সেটি বড় কথা নয়। বড় কথা হ'ল, অপরের চাহিদাটা কি সেইটিই নৈর্ব্যক্তিকভাবে (**Impersonally**) নিরূপণ করা।

এবিষয়ের আরেকটা কথা, আমাদের চিন্তা ও কর্মের ওপর আমরা এক 'অবোধ মমত্ব' পোষণ করে থাকি! যেটি অপরকে বুঝতে আমাদের অন্যতম প্রধান অন্তরায় হয়েই দাঁড়ায়। এই **emotion** এর মাদকতা থেকে আমাদের ব্যবহার ও বাক্যালাপকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেই হবে। নচেৎ অপরের দৃষ্টিকোন, সেন্টিমেন্ট কিংবা মানসশৈলী (**Idiosyncrasy**) বোঝার অন্যতর পথ নেই!

অপরকে (নিজের চেয়ে) বেশি কথা বলতে দিন এবং সেটি আন্তরিকতার সংগে শুনুন

ডোরথি ডিকস একটা ছোট্ট কথায় জনপ্রিয় হবার সুন্দর ও ত্বরান্বিত একটি পথনির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: জনপ্রিয় হ'তে গেলে জিহ্বার চেয়ে কানকে বেশি কাজে লাগান অর্থাৎ কথা বলার চেয়ে অপরের কথা বলাটা বেশি শুনুন। হক্ কথা। আমাদের এই ভীষণতর মুখব্যাদন থেকে মিনিটে প্রায় আড়াইশত নিষ্ঠীবনবৃষ্টি যতদিন না বন্ধ হবে—ততদিন অপরের

কথা বলার সুযোগ আমরা কোনদিনই করে দিতে পারবোনা। মহাভারতও এই কথা বলেন :... 'মৌনেন বহুভাষ্যঞ্চ...অর্থাৎ বহুভাষিতাকে মৌনীর দ্বারা নিবারণ করবে।

আরেক কথা বন্ধুত্বলাভের মূল কথাই হ'ল নিজেকে মিতবাক্ রেখে অপরের বক্তব্য গভীর আন্তরিকতা ও অভিনিবেশ নিয়ে শোনা! দেখবেন! যাচাই করে নেবেন! এই একটি মাত্র আচরণের দ্বারা আপনি বক্তার কত ঘনিষ্ঠ ও অন্তরতম সুহৃদরূপে পরিগণিত হ'তে পারবেন। এর মূল কারণ কি? এর মূল কারণ হ'ল: মানুষমাত্রই চায় তার নিজেকে প্রকাশ করতে এবং সেটি এক অকপট, নির্ভরযোগ্য মানুষের কাছেই সে তার অন্তরতম ইতি কথাটি মেলে ধরতে চায়। যেখানে সে সমালোচিত হবেনা কিংবা কোন ভ্রূকুটি কুটিলতার কষ্টিপাথরে তাকে কেউ যাচাই করবেনা। অথবা তার মনোলালিত ভাব ও ভাবনা কিংবা আশা-আকাংখাগুলোকে কেউ বিপর্যস্ত ক'রে ডিসেকসন-টেবিলে ফেলে চিরে চিরে বিদ্রূপ বা কটাক্ষ করবেনা। সে চায় এক নিরুদ্বেগ আশ্রয়—নিরুপদ্রব পরিসর—সম্মতি-স্নিগ্ধ সহমর্মিতা। মানুষের এ এক আদিম আকুতি, এক প্রাগৈতিহাসিক এষণা। সুতরাং অপরের কথা গভীর মনোযোগ নিয়েই শুনুন এবং প্রার্থনার সুরে ঈশ্বরকে ডেকে বলুন: **Oh God please keep my big mouth shut!**

মুখের হাসি (সৌমনস্য) বজায় রাখুন।

মুখের হাসি বজায় রাখার এই অর্থ নয় যে, কাউকে দেখা মাত্র আকর্ণবিস্তৃত দন্ত-কৌমুদী বিকশিত ক'রে খ্যাঁক খ্যাঁক করে গুচ্ছের হাসতেই হবে। সাবধান! এটি একটি মারাত্মক অপব্যাখ্যেয় অভিব্যক্তি। যার দ্বারা অপরে আপনাকে এই একটিমাত্র কারণের জন্য ভুল বুঝে (**mistenrpretation**) বসতে পারে। উপরন্তু অপর পক্ষ এর দ্বারা নিজেকে অপমানিত বোধ করতে পারেন কিংবা তাঁকে কটাক্ষ বা বিদ্রূপজাতীয় ভেবে নিতেও পারেন। কিংবা অপরপক্ষ লোকটিকে এ ধরণের উৎকট হাসির জন্যে হাস্যাস্পদ ভেবে গুরুত্বহীন এক অর্বাচীনও ঠাওরাতে পারেন। সেজন্যে হাসি সম্পর্কীয় প্রয়োগনৈপুণ্য অর্জন করতে গেলে হাসির তারতম্য ও তদ্বিষয়ক প্রয়োগ-পদ্ধতিই রপ্ত করতে হবে সর্বপ্রথম। এবিষয় আমার কোনসময়ে এক বাস্তব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছিলো। আমারই এক সহকর্মী (তিনি পেশায় **Salesman** ছিলেন), তিনি কোথা থেকে শুনেছিলেন জানিনা, যে খদ্দের বা ক্রেতা দেখলেই নাকি হাসতে হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি এইটুকুই মাত্র অবগত ছিলেন। কিন্তু তার মাত্রা ও প্রয়োগপদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর সম্যক জ্ঞান ছিলনা। ফলে যা অনিবার্যরূপে ঘটার—তাই ঘটলো। কর্মক্ষেত্রে এ ধরনের সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি সুরু করলেন এক উদ্ভট হাসির হামলা। যে যে দোকানে তিনি ভিজিট করতে গিয়েছিলেন, সব জায়গাতেই এই একই দাওয়াই দেওয়া সুরু করলেন—এক যান্ত্রিক-অনুকরণে। ফল হ'ল বিপরীত! তাঁর **Sale-Target** পূর্ণ হ'লনা। এক নিম্নমানের সেলসম্যান হিসাবে তিনি প্রগলভতারই স্বাক্ষর রেখে এলেন প্রায় সব দোকানদারের কাছেই। এই অসাফল্যের মূল কারণ কি? এর উত্তর অত্যন্ত স্পষ্ট ও সংক্ষিপ্ত। তিনি হাসির প্রয়োগসম্পর্কীয় পটুতা অর্জনে অক্ষম হয়েছেন। উপরন্তু তাঁর গন্ধময় হাসি ও যান্ত্রিক-অভিব্যক্তির জন্য ক্রেতারা অধিকাংশই অস্বস্তির মধ্যে পড়েছেন কিংবা অপমানিত বোধ করেছেন। সেলসম্যানটি অপরকে হাসাতে গিয়ে নিজেকেই হাস্যাস্পদ করে ফিরে এসেছেন।

যাক্, মোদ্দা কথা হ'ল, হাসি মানে উচ্ছলতা, চপলতা, কিংবা প্রগলভতা নয়। বরঞ্চ তার বিপরীত। অর্থাৎ চোখেমুখে এক পরিতৃপ্তি বা সন্তুষ্টির আমেজ ফুটিয়ে তোলা, কিংবা 'তোমায় দেখে আমি খুব তৃপ্তি পেয়েছি অথবা তোমার উপস্থিতি আমাকে খুব খুশী করেছে"—এইরকম একটা মনোভাব আচরণ, ব্যবহার ও

হোল : যা বিরক্তির ঠিক বিপরীত। দার্শনিক ভাষায় যাকে বলা হয় 'সৌমনস্য সাধন' অর্থাৎ দুর্মনাভাবের ঠিক উল্টো। কিছুদিন অভ্যাস করলে এটিকে আর তেমন আয়াসসাধ্য বলে মনে হবেনা। এই তিক্ত ও বিরক্তিপূর্ণ পৃথিবীতে যে এক ফালি হাসি-র মূল্য কত —তা যে কোন ব্যাজার মুখ গুলোর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেই বুঝতে পারবেন আসুন, এবার থেকে একটা চাপা হাসি যেন আপনাকে চেপে বসে—সেদিকে চকিত থাকুন।

অপরকে মর্যাদা ও গুরুত্ব দিন

অপরকে মর্যাদা দিলে তিনিও সে পাল্টাভাবে আপনার প্রতি মর্যাদাশীল ও সম্ভ্রমবোধ পোষণ করবেন—এটুকু আমরা অনেকেই ভুলে যাই কিংবা তলিয়ে দেখিনে। ফলে হয় কি? অপরপক্ষকে ছোট ভাবা ও হীন প্রতিপন্ন করার জন্য তার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে এবং সেও দ্বিগুণভাবে (কোন কোন সময় চতুর্গুণরূপে) সেটিকে ফিরিয়ে দেয় অত্যন্ত নির্মমভাবে। ফলে, পরিবেশ ও বাতাবরণটি হয়ে ওঠে এক কদর্য ও তিক্ত। মানুষকে কটূক্তি করা, ছোট করে কথা বলা, নিজের চেয়ে হীন প্রতিপন্ন করা ও করানো, অস্বস্তিকর লজ্জার মধ্যে ফেলা, শ্লেষ ও টিটকারি ক'রে অবজ্ঞা ও হেয়তা প্রদর্শন, নিজের ও অপরের সামনে এক-হাত নেওয়া, এইগুলি অসুস্থ মনস্তত্ত্বের লক্ষণ।

বুদ্ধিমানেরা সযত্নে এইগুলি এড়িয়ে চলেন এবং নিজের স্বার্থের ও অপরপক্ষের মঙ্গলের জন্যই তাকে যথোচিত সম্মাননার দ্বারাই তার সন্তুষ্টিসাধনপূর্বক নিজের লক্ষিত উদ্দেশ্যের পথটি অযাচিতভাবে নিজেই পিচ্ছিল ও ক্লেদাক্ত করেন না।

তর্ক এড়িয়ে চলুন

তর্কের প্রকৃতার্থ হোল : পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যথার্থ সত্যকে উদ্ঘাটনের প্রয়াস। সেখানে অপরের ব্যক্তিসত্তা কিংবা আমিত্বকে জখম করার কোন চাপা লোভ থাকেনা কিংবা অপরের প্রতি হেয়তা প্রদর্শনেরও কোন কলুষিত অভিপ্রায় থাকে না উভয়ের মনোজগতে। যুক্তির সারবত্তা ঘটনা ও বাস্তবের পরিপ্রেক্ষিতে সত্য-নিষ্কর্ষসম্পাদনই সে জায়গায় মুখ্য অভিপ্রায়। অন্য যা কিছু, সেটুকু অসংলগ্ন ও অকথ্য।

আজকের কর্মব্যস্ত মানুষের তর্কের পূর্বপক্ষ ও উত্তরপক্ষ নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কচকচি করার প্রচুর অবকাশ নেই। আর কাজের লোকেরা তা করেনও না। বরঞ্চ সংক্ষিপ্ত, অকপট [unambiguous] ও ঋজু বাক্যের মাধ্যমে তাঁরা অপরের বক্তব্য ও তদীয় কারণের গভীরে পৌঁছাবার চেষ্টা করেন। তাতে সময় ও সামর্থের অপচয় ঘটে অতি অল্প। ব্যবহারবিজ্ঞান সম্পর্কে যাঁর সামান্যতম জ্ঞান আছে তিনি জানেন, তর্কের দ্বারা আমরা প্রায়শ: কেবল তিক্ততাই কুড়িয়ে থাকি। ফলাফলের চেয়ে হলাহল উঠে, কিংবা সুফলের চেয়ে কুফলই কুড়াই এক ঝুড়ি। সুতরাং তর্ক ও শ্লেষাত্মক [carping] কথাবার্তা এড়িয়ে, অপরের বক্তব্যটি ধীরস্থিরভাবে শুনে এবং বক্তার দৃষ্টিকোনটি সম্যগভাবে উপলব্ধির পর—তজ্জাতীয় পথ ও পদ্ধতি অবলম্বনই যুক্তিযুক্ত চিত্তের লক্ষণ। একটা কথা আমাদের বারে বারে এবং বিশেষ করে মনে রাখা দরকার স্বকীয় ভাবাবেগ ও ভালোলাগা সে জায়গায় গৌণ—অপরের চাওয়া ও চাহিদাকেই মর্যাদা দিতে হবে সেই জায়গায় [অপরের সংগে বাক্যালাপ ও আলোচনার সময়] সর্বপ্রথম।

আরেকটা কথা, কখন কখন কোনরূপ বাদ-পরীক্ষা কিংবা কোন থিওরী ইত্যাদি অথবা কোন আইন প্রণয়ন, experiment প্রভৃতির জন্যও তর্কাদির প্রয়োজন হতে পারে, এবং সেটি হওয়াও স্বাভাবিক। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সেখানে কেউ কেউ অসুস্থতা প্রকাশ করে—সকলের অস্বস্তির সৃষ্টি করবেন। সেখানে তর্কটি উপলক্ষ—লক্ষ্য হ'ল সত্য নিরূপণ। কিন্তু আমাদের-ব্যবহারিক জীবনে লেন-দেন, পাওনা-গণ্ডা ও দৈনন্দিন ব্যাপারে তর্ক যতই এড়িয়ে যাওয়া যায়—ততই মঙ্গল।

মানুষের ত্রুটি পরোক্ষভাবে দেখান

প্রাজ্ঞজনেরা বলেন: বাক্যেরও নাকি একটা

গ্ল্যামার [Glamour] আছে। আর সেই বাক্যের চারুতা ও গৌরিমা নষ্ট করে কটু বা পরুষবাক্য [Acrimoniousness]। সুতরাং এবিষয়ে মনুর সেই প্রসিদ্ধ উক্তিটি আমাদের স্মরণ করা উচিত: মা ক্রয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্। অর্থাৎ মানুষকে অপ্রিয় [যা তুমি নিজে পছন্দ করনা] সত্য কথাও বোলোনা।

অপ্রিয় বলার ঝোঁক বা প্রবণতা চরিত্রের একটি মারাত্মক অবগুণ। এর দ্বারা বক্তা নিজে যত আত্মপ্রসাদই লাভ করুন না কেন, অপরের চক্ষে তিনি অনাকাংখিত (Disturbing element) ও বিরক্তিকর হয়ে উঠবেনই। এখন দেখা যাক, মানুষ অপ্রিয় কথা বলে কেন? ১) প্রয়োজনে [তা স্বার্থে ও পরার্থে উভয়বিধই হ'তে পারে]। ২] ব্যক্তিগত স্বার্থে ও গোষ্ঠীগত স্বার্থে। ৩] আত্মশ্লাঘায় ৪] অসূয়া, মাৎসর্য, ও পৈশুন্যাদি প্রণোদিত হ'য়ে। ৫] রিপুর তাড়নায়। ৬)স্পষ্টবক্তারূপে নিজেকে প্রতিপন্ন করার দুর্নিবার লোভে। ৭] অপরকে হীন প্রতিপন্ন করার এক পশূচিত আগ্রহে। ৮] পূর্ববিদ্বেষ বা পূর্ববৈরী হ'তে। ৯] সামাজিক, পরিপার্শ্বসম্ভূত, ঐতিহ্যবাহী, সাংস্কৃতিক চেতনার পরিপন্থী কিংবা নিজের মনোলালিত চিন্তানিচয়ের বিপরীতধর্মী কোন ভাব ও ভাবনা সহ্য করার অসমর্থতার জন্যে [যা প্রায়শঃ সমালোচক ও Intellectuals দের ঘটে থাকে]। ১০] সূক্তিপ্রয়োগ অথবা প্রতিবাক্য ব্যবহারের (Art of euphemisation) অসমর্থতার জন্যে।

উপযুক্ত কারণগুলি ছাড়াও আরো কিছু অন্যতম কারণ আছে যার জন্যে মানুষ দুরুক্তিতে বাধ্য হয়। অবশ্য তার সংখ্যা খুবই পরিমিত। যাইহোক, আমাদের বিবক্ষিত বিষয় হোল মানুষকে যদি তার ত্রুটি দেখানো একান্তই প্রয়োজন হয়ে পড়ে তবে তা যেন সরাসরি আক্রমণাত্মক না হয়ে একটু পরোক্ষ ও ভদ্রোচিত উপায়ে বলা হয়। মানুষকে তার ত্রুটির কথা মুখের ওপর ক্যাট ক্যাট করে শুনিয়ে দিলে কী হয়? ব্যবহারবিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন—ফল হয় উল্টো। হয় দোষী তার দোষ স্বীকার করে না কিংবা করলেও [নিরুপায় হ'য়ে] তিরস্কার বা ভর্ৎসনার জন্য তার মনটি বিদ্রোহী বা আরো কঠোর অথবা একগুঁয়ে হয়ে ওঠে। এবিষয় কার্নেগিও সুন্দর কথা বলেছেন criticism is dangerous because it wounds a man's pricious pride hurts his sense of importance and arouses his resentment. সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে দোষ অপনোদনের বা ক্ষালনের রাস্তা ওইটি নয়। তাকে সহানুভূতি ও আন্তরিকতার সংগে বোঝাতে হবে এমনতর দোষগুলি তারই স্বার্থে তার ত্যাগ করা উচিত। নয়তো ওইগুলি তার ব্যবহারিক-জগতে তাকে পদে পদে বিপদে ফেলার কিংবা ঐগুলি তার সুষ্ঠু জীবনায়নের কিংবা অগ্রসর হবার পথে প্রধান ও প্রথমতম অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। তাকে আরো বলতে হবে, ওইগুলি অপনোদিত না হ'লে সেগুলি তার চারিত্রিক সৌন্দর্য্যের পথে বিঘ্নস্বরূপ হয়ে উঠবে—আর নিজেকে ও নিজস্ব বাতাবরণকে ক্লেদাক্ত করে তুলবে। সুতরাং কাউকে যদি একান্তই সুন্দর করার অভিপ্রায়ে ত্রুটি দর্শানোর আত্যন্তিক প্রয়োজন বোধ করেন, তবে মিষ্টি কথা দিয়েই পরোক্ষভাবে দেখানোর চেষ্টা করুণ। মনে রাখতে হবে, রোগীকে বাঁচিয়ে রেখেই রোগকে তাড়াতে হবে—রোগীকে হত্যা ক'রে রোগ সারানোর কোন বাহাদুরী নেই। আসুন, আমরা একটু সহানুভূতি ও সহমর্মিতা নিয়েই মানুষের মানবিকবৃত্তিগুলি নাড়াচাড়া করি। মনে থাকে যেন: When dealing with people, let us remember we are not dealing with creatures of logic. We are dealing with creatures of emotion, creatures bristling with prejudices and motivated by pride and vanity.

(ক্রমশঃ)

রাগ সঙ্গীতে বাঙ্গালী

দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়

(চৌধুরী যাদবেন্দ্রনন্দন দাস মহাপাত্র (১৮৬৪-১৯৩০)

মেদিনীপুর জেলার পঞ্চেৎগড় ভূম্যধিকারী পরিবারের সন্তান যাদবেন্দ্রনন্দন বাংলার একজন বিস্মৃত সঙ্গীতগুণী ছিলেন। কিন্তু কলকাতার সঙ্গীতসমাজ থেকে দূরে অবস্থান করার ফলে তিনি যথোচিত সুপরিচিত হননি সঙ্গীতজগতে। যন্ত্রসঙ্গীতে সেকালের বাংলার একজন কৃতী শিল্পী তিনি ছিলেন। উপরন্তু পঞ্চেৎগড় অঞ্চলে রাগসঙ্গীত চর্চার একটি কেন্দ্র স্থাপন করে সেখানে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রসারে সহায়ক হয়েছিলেন। তাঁর নিষ্ঠাবান সঙ্গীতজীবনের দৃষ্টান্তে ও প্রভাবে উচ্চশ্রেণীর সাঙ্গীতিক পরিবেশ গড়ে উঠেছিল পঞ্চেৎগড়ে।

বাংলাদেশে মুষ্টিমেয় যে কজন সঙ্গীতজ্ঞ সুরবাহার যন্ত্রের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন, যাদবেন্দ্রনন্দন তাঁদের অন্যতম। বাংলায় সুরবাহার বাদন উনিশ শতকের শেষ পাদক থেকেই আরম্ভ হয়েছিল এবং প্রথম যুগের বাঙ্গালী সুরবাহারবাদকদের মধ্যেও একজন গুণী রূপে তাঁর নাম স্মরণীয়। তাঁর সমকালীন বাংলার সুরবাহার-শিল্পীদের মধ্যে গোবরডাঙার জ্ঞানদাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সমবয়সী ছিলেন। জ্ঞানদাপ্রসন্ন অবশ্য মহম্মদ খাঁর শিষ্য এবং যাদবেন্দ্রনন্দন রামপুর ঘরানাদার উজীরখাঁর সম্প্রদায়ভুক্ত।

ইতোপূর্বে অমৃতলাল দত্ত ওরফে হাবু দত্তের সঙ্গীতজীবনের অধ্যায়ে বলা হয়েছিল যে, মহাগুণী উজীর খাঁর শিষ্যত্বলাভ করাই সঙ্গীতবিষয়ে কৃতিত্বের একটি পরিচায়ক স্বরূপ। কারণ সুযোগ্য ভিন্ন অপর কাউকেই উজির খাঁ তালিম দেননি। বাঙ্গালীদের মধ্যে তাঁর শিক্ষালাভের দুর্লভ সুযোগ পান মাত্র চারজন: হাবুদত্ত, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, যাদবেন্দ্রনন্দন এবং আলাউদ্দিন খাঁ।

তাঁদের মধ্যে হাবু দত্তের প্রসঙ্গে একথাও উল্লেখ করা হয় যে, কলকাতায় তাঁর সমকালে উজীর খাঁর নিকটে যাদবেন্দ্রনন্দনও সুরবাহার যন্ত্রে শিক্ষালাভ করেন। শুধু তাই নয়, উজীর খাঁ যখন রামপুর নবাবের আহ্বানে কলকাতা থেকে রামপুরে ফিরে যান তখন সঙ্গে নিয়েছিলেন হাবু দত্ত ও যাদবেন্দ্রনন্দনকে। হাবু দত্তের মতন যাদবেন্দ্রনন্দনও উজীর খাঁর প্রিয় শিষ্য ছিলেন। রামপুরে এক বছর অবস্থান করে খাঁ সাহেবের নিকট আরো ভালভাবে শিক্ষা পেয়েছিলেন যাদবেন্দ্রনন্দন। তিনি নিজে শৌখীন অর্থাৎ অপেশাদার হলেও যেমন ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও নিরলস পরিশ্রমে সঙ্গীতবিদ্যা অর্জন করেছিলেন, তেমনি অকৃপণ ও অবিকৃতভাবে শিক্ষার্থীদের সেই বিদ্যা দানও করে গেছেন।

পঞ্চেৎগড়ের যে প্রাচীন চৌধুরী বংশে যাদবেন্দ্রনাথের জন্ম, সঙ্গীতচর্চার জন্যে সে-পরিবার অনেকদিন থেকেই খ্যাতিমান ছিল। তাঁর জন্মের অন্তত একশ বছর আগেও সঙ্গীতচর্চার নজির পাওয়া যায় এই বংশে। পাঁচেটগড়ে রাগসঙ্গীতের চর্চা ও পরিবেশ এই পরিবারেই সীমাবদ্ধ ছিল। সেই পারিবারিক সঙ্গীত-ঐতিহ্যকে বৃহত্তর সঙ্গীতক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত করেন, নিজ বংশের বাইরে পাঁচেটগড়ে সঙ্গীতচর্চার ধারাকে বিস্তৃত করেন যাদবেন্দ্রনন্দন।

পঞ্চেৎগড়ে চৌধুরী উপাধিক দাস মহাপাত্র পরিবারে ১৮৬৪ খৃঃ জানুয়ারী মাসে যাদবেন্দ্রনন্দনের জন্ম হয়। উত্তরাধিকারসূত্রে তিনি অন্তরে যে সঙ্গীত-প্রীতি লাভ করেছিলেন তা অল্প বয়স থেকেই প্রকাশ পায় তাঁর জীবনে। বাল্যকালেই তিনি গৃহে উচ্চশ্রেণীর সাঙ্গীতিক পরিবেশে বর্ধিত হয়েছিলেন। ধনাধ্যক্ষ বহু ভট্ট কিছু-

কাল এখানে সঙ্গীতশিক্ষকরূপে অবস্থান করেছিলেন যাদবেন্দ্রনন্দনের কিশোর বয়সে।

পরে কলকাতায় ছাত্রজীবনে তাঁর সঙ্গীতচর্চা অগ্রসর হবার আরো সুযোগ পায়। কলকাতায় তিনি কলেজে বিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে বি,এ, ডিগ্রি লাভ করেন (তখনও বি, এস, সির, প্রচলন হয়নি) ১৮৮৮ খৃঃ।

সেই ছাত্রাবস্থায় তিনি মৃদঙ্গাচার্য মুরারিমোহন গুপ্তের কাছে পাখোয়াজ বাদন শিক্ষা করেছিলেন। তার পর ছাত্রজীবনের শেষে প্রথম সুরের যন্ত্র শিক্ষালাভ করেন তৎকালীন বাংলার অন্যতম সঙ্গীত-প্রতিভা বামাচরণ ভট্টাচার্যের কাছে। সুরবাহারবাদক মহম্মদ খাঁ, তানসেনের পুত্রবংশীয় মহাগুণী বাসৎ খাঁ, স্বনামধন্য সেতার সুরবাহারশিল্পী সাজ্জাদ মহম্মদ, ধ্রুপদী যদু ভট্ট এবং আরো কয়েকজন গুণী শিল্পীর নিকটে বিভিন্ন সময়ে শিক্ষা-প্রাপ্ত বামাচরণ ভট্টাচার্য বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ কলাবত ছিলেন। সম্পূর্ণভাবে তাঁর শিক্ষায় গঠিত হয়ে পুত্র জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পরে সঙ্গীতজগতে সুপরিচিত হন কৃতী সেতার সুরবাহারবাদকরূপে।

বামাচরণ ভট্টাচার্যের কাছে শিক্ষা করবার সময় যাদবেন্দ্রনন্দন রামপুরের গুণী উজীর খাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। পখোয়াজী ছোটে খাঁর মধ্যস্থতায় তিনি সুরবাহার যন্ত্রে শিক্ষালাভের সুযোগ পান উজীর খাঁর কাছে। তখন উজীর খাঁ মধ্য কলকাতায় চাঁদনি অঞ্চলে মুন্সীজী নামে তাঁর এক পৃষ্ঠপোষকের গৃহে অবস্থান করতেন। সঙ্গীতগুণে খাঁ সাহেবের প্রিয় শিষ্য হয়েছিলেন যাদবেন্দ্রনন্দন।

সেসময় যাদবেন্দ্রনন্দন উজীর খাঁর কাছে একাদিক্রমে প্রায় ছ' বছর তালিম পান সুরবাহারে। তারপর উজীর খাঁ রামপুর নবাবের ঐকান্তিক আগ্রহে স্থায়ীভাবে রামপুর দরবারে অবস্থান করতে চলে যান। রামপুরে যাবার সময় তাঁর দুই প্রিয় শিষ্য যাদবেন্দ্রনন্দন ও হাবু দত্তকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন উজীর খাঁ। হাবু দত্তের সঙ্গে যাদবেন্দ্রনন্দনের পরিচয় উজীর খাঁর কাছে শিক্ষা করবার আগে থেকেই হয়েছিল। গয়ার বিখ্যাত ওস্তাদ এস্রাজ-বাদক ও খেয়ালগায়ক কানাইলাল ঢেঁড়ির কাছে আগে শিক্ষার্থী ছিলেন হাবুদত্ত এবং যাদবেন্দ্রের ভ্রাতা দেবেন্দ্রনন্দন। সেই সূত্রে হাবু দত্তের সঙ্গে যাদবেন্দ্রের প্রথম পরিচয় হয়। পরে এই পরিচয় আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছিল যখন তাঁরা দুই জনে সতীর্থ হন উজীর খাঁর শিক্ষাধীনে।

উজীর খাঁর সঙ্গে যাদবেন্দ্র রামপুরে গেলেন আরো সঙ্গীতশিক্ষা করবার জন্যে। হাবু দত্ত গিয়েছিলেন উজীর খাঁর নিকটে শিক্ষালাভ করা ভিন্নও নবাবের ঐকতানবাদন সংগঠন করবার কাজ নিয়ে। তখনই হাবুদত্ত কলকাতায় লব্ধপ্রতিষ্ঠ ক্ল্যারিওনেট বাদক এবং রামপুর নবাব তাঁর গুণপনার কথা শুনে নিজস্ব ব্যাণ্ড-পার্টির অধ্যক্ষরূপে তাঁকে রামপুরে নিযুক্ত করেছিলেন।

উজীর খাঁর এই দুই শিষ্য ওস্তাদের সঙ্গে রামপুর যাবার পর সেখানে একসঙ্গে বাস করেছিলেন। সে সময় প্রথম একমাস তাঁরা ছিলেন নবাবের অতিথিশালায়। তার পর যাদবেন্দ্রনন্দন উজীর খাঁর বাড়ির পাশেই একটি বাড়ি ভাড়া করে বাসের জন্যে চলে আসেন। তখনো তাঁর সঙ্গে থাকতেন হাবু দত্ত। যাদবেন্দ্রনন্দন তখন যে ঐকান্তিক সঙ্গীতসাধনা করতেন তা দত্ত মহাশয়কে মুগ্ধ করেছিল। তিনি যাদবেন্দ্রের চেয়ে বছর ছয়েকের বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। রামপুরে থাকার সময় তিনি যাদবেন্দ্রকে সঙ্গীতচর্চায় অন্তরের সঙ্গে উৎসাহ দিতেন এবং কলকাতায় তাঁর সঙ্গীত-প্রতিভাকে পরিচিত করে দেবার সঙ্কল্পও ছিল হাবু দত্তের মনে। কিন্তু পরবর্তীকালে ঘটনাচক্রে তাঁদের জীবনে আর যোগাযোগ ছিলনা। কারণ যাদবেন্দ্রনন্দনকে বৈষয়িক কাযের জন্যে প্রধানত বাস করতে হয় পঞ্চেৎগড়ে।

যাদবেন্দ্র রামপুরে একাগ্রচিত্তে সঙ্গীতচর্চায় আত্ম-নিয়োগ করেন এবং উজীর খাঁর কাছে তাঁর তালিমও ভালভাবেই চলছিল। কিন্তু এইভাবে একবছর অতি-বাহিত হবার পর তাঁকে বাধ্য হয়ে পঞ্চেৎগড়ে ফিরে আসতে হয় বৈষয়িক দায়িত্ব পালন করার জন্যে।

রামপুরে থাকবার সময় অন্যান্য ওস্তাদদের সঙ্গে নেসার আলির সঙ্গেও তাঁর বিশেষ পরিচয় হয়েছিল। নেসার আলী ছিলেন কাশ্মীরের দরবারী শিল্পী এবং উজীরের-পিতা আমীর খাঁর শিষ্য।

পঞ্চেৎগড়ে প্রত্যাগমন করে যাদবেন্দ্র শুধুমাত্র জমিদারী পরিচালনায় কালাতিপাত করেন নি। সঙ্গীতচর্চাকে বরাবরই অব্যাহত রেখেছিলেন নিজের জীবনে। নিজে চর্চার সঙ্গে উপরন্তু তিনি পাঁচেটগড়ে বহিরাগত সঙ্গীতশিক্ষার্থীদের জন্যেও স্বয়ং বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করলেন। তাঁর এই শুভ প্রচেষ্টার ফলে রাগ-সঙ্গীতচর্চার একটি কেন্দ্রে পরিণত হল পাঁচেটগড়। শুধু শিক্ষার্থী নয়, নানা গুণীকেও তিনি এখানে আমন্ত্রণ করে আনেন। যাদবেন্দ্রনন্দন পাঁচেটগড়ে একটি রীতিমত সঙ্গীতবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁর পরবর্তীকালেও তাঁর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের পরিচালনায় সেটি সক্রিয় ছিল জমিদারিপ্রথা বিলোপের পূর্বপর্যন্ত।

যাদবেন্দ্রের পুত্র অনাদিনন্দন পিতার সঙ্গীতগুণের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন. পিতার নিকটে তিনি শিক্ষা করেন সেতার ও সুরবাহার এবং বিখ্যাত কলাবত (নবাব ওয়াজিদ আলীর দরবারি গায়ক এবং স্বনামধন্য তাজ খাঁর আত্মীয়)তসদ্দুক হোসেনের কাছে তালিম নেন খেয়াল গানে। তসদ্দুক হোসেন পাঁচেটগড়ে সঙ্গীত-শিক্ষকরূপে বেশ কিছুকাল নিযুক্ত ছিলেন যাদবেন্দ্রনন্দনের অন্যান্য শিষ্যদের মধ্যে পুলিনবিহারী অগস্তী, দুই ভ্রাতুষ্পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনন্দন ও সত্যেন্দ্রনন্দনের নাম উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় ও বহিরাগত আরো অনেক সঙ্গীতশিক্ষার্থীকেই তিনি নির্বিশেষে শিক্ষা দেন।

পঞ্চেৎগড়েই ২৯, ডিসেম্বর ১৯৩০, যাদবেন্দ্রনন্দন পরলোকগত হন।

অমরনাথ ভট্টাচার্য (১৮৮৪–১৯৬৯ খৃঃ)

বর্তমান শতকের একজন নেতৃস্থানীয় ধ্রুপদগুণী ছিলেন অমরনাথ ভট্টাচার্য। গুণবী কণ্ঠসম্পদের অধিকারী ভট্টাচার্য মহাশয় সংগীতের আসরে গণনীয় ব্যক্তিত্ব-স্বরূপে বিরাজ করতেন। তাঁর ৮৫ বর্ষব্যাপী সুদীর্ঘ জীবনের অন্তিম পর্ব পর্যন্ত অব্যাহত ছিল সঙ্গীতচর্চা। অশীতি বর্ষ পার হয়ে যাবার পরেও তিনি নানা আসরে ধ্রুপদ পরিবেশন করেছেন। কলকাতা বেতারকেন্দ্রেও তিনি গান গেয়েছেন অতি বৃদ্ধ বয়সে। প্রাচীন ধারার যে ধ্রুপদ সঙ্গীতের আদর্শের সঙ্গে তিনি প্রথম জীবনে পরিচিত হয়েছিলেন, আচার্য অঘোরনাথ চক্রবর্তী, বিশ্বনাথ রাও প্রমুখ গুণীদের শিক্ষাধীনে নিজে যা ঐকান্তিক প্রযত্নে অনুশীলন করেছিলেন, জীবনের শেষ পর্যন্ত তার মান তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করে যান। কখনো তা ক্ষুণ্ণ হতে দেননি জনপ্রিয়তার সুলভ পথে। ধ্রুপদ গানের উপযোগী উদাত্ত সঙ্গীতকণ্ঠও তাঁর ছিল। সঙ্গীতে যেমন জীবনশক্তির পরিচয় যেন দেখালেই পাওয়া যেত বিশেষভাবে।

পরিণত বয়সে ভট্টাচার্য মহাশয় বাংলায় সঙ্গীত-জগতে অন্যতম নেতৃস্থানীয়রূপে সম্মানিত ছিলেন এবং দেশের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গুণীরূপে তিনি স্বীকৃতিলাভ করেছিলেন। শান্তিনিকেতন বিশ্বভারতী কর্তৃক ১৯৫৮ সালে তিন মাসের জন্যে 'অতিথি অধ্যাপক' নিযুক্ত হওয়া কাশীর 'ভারতধর্ম মহামণ্ডল' কর্তৃক 'সঙ্গীতরত্ন' উপাধিলাভ, সঙ্গীত সম্মেলনে সংবর্ধনালাভ ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তবে সাধারণভাবে একথা সত্য যে, অন্য অনেক বাঙালী গুণী মতন তিনিও যথোচিত সম্মান পাননি। তাঁর মধ্য বয়স থেকেই আমাদের সঙ্গীতজগতে ধ্রুপদের সমাদর নিতান্তই হ্রাস পেয়ে যায়, তাঁদের তুল্য গুণী উপযুক্ত মর্যাদালাভ না করবার তাও একটি প্রধান কারণ। ধ্রুপদ সঙ্গীত সম্বন্ধে অনীহার ফলে তাঁর সঙ্গীতবিদ্যার উত্তরাধিকারীও বিশেষ কেউ নেই। পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে ধ্রুপদ-শিক্ষা ও চর্চার শিক্ষার্থীদের আগ্রহেরও অভাব। সেজন্যে ছাত্রছাত্রীও তাঁর তেমন ছিলনা। তবে বোদ্ধা সঙ্গীত-সমাজে তিনি সম্মানের পাত্র ছিলেন। কিন্তু এসব বিষয়ে তাঁকে সমুৎসুক দেখা যেত না আদৌ। যথার্থ শিল্পীমন নিয়ে তিনি আত্মসমাহিত থাকতেন। সর্ব অবস্থাতেই সন্তুষ্টচিত্তে আপন সঙ্গীতচর্চায় স্বাধর্ম অবিকৃত রেখে

চলতেন তিনি। প্রাচীনধারায় সঙ্গীতসাধনার আদর্শ বর্তমান কালেও তাঁর জীবনে মূর্ত হয়েছিল।......

বাংলার বাইরেও নানা সর্বভারতীয় সঙ্গীতসম্মেলনে ধ্রুপদগান গেয়ে সুনাম অর্জন করেছিলেন তিনি। তার মধ্যে বারাণসীতে দুবার নিখিল ভারত সঙ্গীতসম্মেলনে তাঁর যোগদান উল্লেখনীয়। তাছাড়া, কলকাতায় ভূপেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ পরিচালিত নিখিল বঙ্গ সঙ্গীতসম্মেলন যত বছর অনুষ্ঠিত হয়, তিনি প্রতি বাৎসরিক অধিবেশনেই ধ্রুপদ গেয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন প্রধানত অঘোরনাথ চক্রবর্তী এবং বিশ্বনাথ রাওএর শিষ্য। তবে কিশোর বয়সে পিতা কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্যের নিকটেও কিছু গান শিখেছিলেন। কালিপ্রসন্নও ছিলেন একজন ধ্রুপদ গায়ক এবং রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গীতগুরু, বিষ্ণুপুর ঘরাণার ধ্রুপদের অন্যতম ধারক ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর এক সঙ্গীতশিষ্য। শৌরীন্দ্রমোহনের পৃষ্ঠপোষকতায় ক্ষেত্রমোহন যখন কলকাতায় অবস্থান এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতবিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন, তখন ক্ষেত্রমোহনের কাছে কালীপ্রসন্ন ধ্রুপদ শিক্ষা করেছিলেন। সঙ্গীতাচার্য অঘোরনাথ ছিলেন কালীপ্রসন্নের মাতুলপুত্র এবং শেষোক্তজন অপেক্ষা বয়োকনিষ্ঠ। অঘোরনাথ ও কালীপ্রসন্নের আদিনিবাসও একই স্থানে। ২৪ পরগণার দাক্ষিণাত্য বৈদিক সমাজের কেন্দ্র ও বাসাঞ্চল রাজপুর, হরিনাভি ইত্যাদি গ্রাম নিয়ে গঠিত এলাকা।

সেখানে হরিনাভি গ্রামে ১৮৮৪ খৃঃ অমরনাথ ভট্টাচার্যের জন্ম হয়। বাড়ীতে সঙ্গীতের পরিবেশ ছিল কারণ তাঁর পিতা কালীপ্রসন্ন স্বয়ং ছিলেন গায়ক। পিতার শিক্ষাধীনেই তাঁর রীতিমত সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ হয়েছিল। এ বিষয়ে অমরনাথ উত্তরজীবনে বিস্তৃতভাবে উল্লেখ করেছেন, 'বাবা কলকাতাতেই বেশীর ভাগ থাকতেন। আমিও কলকাতার বৌবাজার অঞ্চলে থেকে ইস্কুলে লেখাপড়া করি।... আমার বাবা স্বর্গত কালীপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, ধ্রুপদ গান গাইতেন। তিনি বিষ্ণুপুরী চালের গান গাইতেন এইজন্যে যে তাঁর সঙ্গীতশিক্ষা হয়েছিল ক্ষেত্রমোহন গোস্বামীর কাছে। রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর যে সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন, ক্ষেত্রমোহন ছিলেন তাঁর অধ্যক্ষ। সেখানে ক্ষেত্রমোহন নিজেও ধ্রুপদ গান শেখাতেন। আমার বাবা সেখানে অনেকদিন গোস্বামী মশায়ের কাছে গান শিখেছিলেন। সেজন্যেই বাবার গানকে বিষ্ণুপুরী গান বলেছি। মনে পড়ে, ছেলেবেলা থেকে বাবার কাছে 'বিষ্ণুপুরীচালের গান' 'বিষ্ণুপুর ঘরাণার গান' এইসব কথা শুনতুম।... ক্ষেত্রমোহন বাবুর কাছে শিখেছিলেন বলেই যে বাবা বিষ্ণুপুর ঘরাণার গান গাইতেন—একথা অবশ্য আমি বড় হয়ে বুঝতে পেরেছি। ...বিষ্ণুপুর ঘরাণার গান বাবার মুখে খুব ছেলেবেলা থেকে শুনেছি। তারপর যখন বড় হলুম, বাবা আমাকে গান শেখাতে গান আরম্ভ করলেন। তাঁর কাছেই আমার ধ্রুপদ গানে হাতে খড়ি।...দু'বছর আমার শুধু গলা সাধিয়েছিলেন তিনি। এমনিভাবে দস্তুরমতন সার্গম সাধবার পর তবে তিনি আমার গান দিয়েছিলেন। বাবা আমায় যে গানগুলি শিখিয়েছিলেন তা সবই বিষ্ণুপুর ঘরাণার।...তারপর আমার যখন ২০।২১ বছর বয়স, তখন আমার ধ্রুপদ চর্চার নতুন পালা আরম্ভ হল। তখনকার কালের বিখ্যাত গায়ক শ্রীঅঘোরনাথ চক্রবর্তীর কাছে আমি সেই সময় থেকে গান শিখতে আরম্ভ করলুম।...তিনি আমাদের আত্মীয় ছিলেন...বাবার চেয়ে তিনি বয়সে ছোট ছিলেন এবং বাবাকে মান্য করতেন। বাবাই তাঁকে বলেন, আমাকে গান শেখাতে।'(১)

অঘোরনাথের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করবার সময়েই অমরনাথ একদিন পিতার সঙ্গে শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের কাছে গিয়েছিলেন। শৌরীন্দ্রমোহনকে গানও শুনিয়েছিলেন অমরনাথ। শৌরীন্দ্রমোহন তাঁকে ভূপালি গাইতে ফরমায়েস করেছিলেন। অমরনাথ সেইমতন গেয়েছিলেন চৌতালে ধ্রুপদ ও ধামার।

অঘোরনাথের কাছে সঙ্গীতশিক্ষা আরম্ভ করে অমরনাথ সেসময় একাদিক্রমে বছর তিনেক শিখেছিলেন। পরবর্তী জীবনে আবার তাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগ হত যখন অঘোরনাথ কাশীবাসী হয়েছিলেন। তখন অমরনাথ

তাঁর কাছে যেতেন প্রতি বছর দু-তিন বার। অঘোরনাথের কাছে এইভাবে তিনি ভালই শিক্ষা করেছিলেন। অঘোরনাথ তাঁকে স্নেহ করে বিদ্যাদান করতেন। আশীর্বাদও করতেন—'পরে বড় গাইয়ে হবি।' শেষ বয়সে এক এক সময় চক্রবর্তী মশায় দুঃখ প্রকাশ করে বলতেন, 'ঘরের এত জিনিষ তোকে দিতে পারলুম না।' (অর্থাৎ যত দেবার ইচ্ছা ছিল, বাইরে থাকার জন্যে সব দিতে পারতেন না)।

অমরনাথও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিসূত্রে অনেক সময় নানা জায়গায় স্থানান্তরিত হতেন। তারই মধ্যে অঘোরনাথের কাছে মাঝে মাঝে যেতেন শিক্ষার্থী হয়ে।

অঘোরনাথের কাছে প্রথম পর্যায়ের শিক্ষা লাভ করবার পরে অমরনাথ ধ্রুপদ ধামার শেখেন ওস্তাদ বিশ্বনাথ রাওয়ের কাছে। বিশ্বনাথ রাও তখন অন্যতম শ্রেষ্ঠ কলাবত এবং বাংলার বেশ কয়েকজন কৃতী সঙ্গীতশিল্পী তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। বিশ্বনাথ রাওয়ের শিষ্যবর্গের মধ্যে অন্যতম বিশিষ্ট ছিলেন অমরনাথ।...

চাকুরীজীবনে উত্তর ভারতের নানাস্থানে বাসের পর অবশেষে তিনি নাগপুর থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বিভিন্ন জায়গায় অবস্থানকালেও তিনি সঙ্গীতচর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন এবং স্থানীয় সঙ্গীতকেন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ থাকত। এইভাবে অনেক আসরেও সঙ্গীতানুষ্ঠান করেন তিনি।

অবসর গ্রহণ করবার পর তিনি দীর্ঘকাল কলকাতায় বাস করেছিলেন। জীবনের প্রায় অন্তিম পর্ব পর্যন্ত কলকাতার নানা সম্মেলনে, বেতারকেন্দ্রে ও অন্যান্য সঙ্গীতাসরে ধ্রুপদ গেয়েছেন তিনি। এই সময়ে এণ্টালির সেকেণ্ড্ অনরাইট লেনে দীর্ঘদিন বাস করবার পর তিনি হরিনাভি গ্রামের বাড়িতে শেষে বাস করতে থাকেন। সেখানেই তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অবসান ঘটে।

প্রতিভা দেবী (১৮৬৫-১৯২২)

উনিশ শতকের বাংলাদেশে সম্ভ্রান্ত পরিবারের মহিলাদের মধ্যে সঙ্গীতচর্চা বিশেষ পদ্ধতিগত রাগসঙ্গীতের অনুশীলন একপ্রকার অসম্ভব ছিল। তারও কয়েক শ' বছর আগে থেকেই এই অবস্থা চলেছিল। মুসলমান শাসন পত্তন হবার সময় থেকে শতাব্দের পর শতাব্দ যাবৎ ভদ্র পরিবারের অন্তঃপুরে যে সঙ্গীত শুরু হয়ে যায়, তার জের চলে উনিশ শতক পর্যন্ত। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধেও ভদ্রমহিলাদের রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষা ও চর্চা সুদুর্লভ ছিল। বাংলাদেশ তথা ভারতের নব জাগরণের প্রতীক জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি এ বিষয়ে বিশিষ্ট ব্যতিক্রম। সেকালে জোড়াসাঁকো ঠাকুর-পরিবারের বাইরে ভদ্রমহিলার সার্থক সঙ্গীতসাধনার একটি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় গান-রচয়িত্রী ও গায়িকা করুণাময়ী দেবীকে। তিনি মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোণা নিবাসী বিখ্যাত গায়ক, সঙ্গীত-রচয়িতা ও 'মূল সঙ্গীতাদর্শ' গ্রন্থ প্রণেতা রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্নী। রমাপতির সঙ্গে ঠাকুর-পরিবারের যোগাযোগ ছিল এবং তিনি একসময় জোড়াসাঁকোয় তাঁদের গৃহে সঙ্গীতগুরুরূপে বাসও করেছিলেন। সঙ্গীতজ্ঞা ও কবিগুণসম্পন্না করুণাময়ী ছিলেন প্রতিভা দেবীর পূর্ববর্তিনী। ১৮৯২ খ্রী: করুণাময়ী যখন পরিণত বয়সে পরলোকগতা হন, প্রতিভা দেবীর বয়স তখন ২৭ বছর।

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা প্রতিভা দেবী। রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতাদের মধ্যে হেমেন্দ্রনাথ রাগসঙ্গীত বিষয়ে কণ্ঠসঙ্গীতে রীতিমত সাধনা করেছিলেন। বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ সঙ্গীতাচার্যদের শিক্ষাধীনে নিষ্ঠার সঙ্গে পদ্ধতিগত সঙ্গীতের চর্চা করেছিলেন হেমেন্দ্রনাথ। শুধু তাই নয়, তিনি পত্নী এবং কন্যাদেরও রীতিমত সঙ্গীতশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। ঠাকুর-পরিবারের কন্যাদের মধ্যে সঙ্গীতবিষয়ে সর্বাপেক্ষা পারদর্শিনী হন প্রতিভা দেবী। তাঁর পরেই উল্লেখনীয় হলেন ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী।

পিতার উৎসাহে প্রতিভা দেবী শিশু বয়স থেকেই সঙ্গীতশিক্ষা নিয়মিতভাবে আরম্ভ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সঙ্গীতগুরু বিষ্ণুচন্দ্র চক্রবর্তী ছিলেন প্রতিভার প্রধান সঙ্গীতশিক্ষক। সেইসঙ্গে সেতারাদি

তাঁর যন্ত্রসঙ্গীত শিক্ষার জন্যে অন্য কলাবতও নিযুক্ত ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির সেই সুবর্ণযুগের পারিবারিক পরিবেশে শৈশব থেকেই তাঁর সঙ্গীতপ্রতিভার স্ফুরণ হয়েছিল। গান ও যন্ত্রসঙ্গীত দুই শিখতে আরম্ভ করেন তিনি।

নিতান্ত বালিকা বয়সেই তাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠান করবার কথা জানা যায় জোড়াসাঁকো ভবনে 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা'র অধিবেশনে। এই সাংস্কৃতিক সভা ১৮৭৪ খৃঃ ঠাকুরবাড়িতে প্রথম স্থাপিত হয়। সেই বছরের অনুষ্ঠানে 'ঠাকুর-পরিবারের ছোট ছোট কয়েকটি বালক-বালিকা চৌতাল প্রভৃতি তালে তান লয় বিশুদ্ধ সঙ্গীত করিয়া সভাস্থবর্গকে' মুগ্ধ করার কথা প্রকাশ। তাদের মধ্যে প্রতিভাও ছিলেন মনে হয়, কারণ 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা'র আর একটি অধিবেশনের বিবরণে দেখা যায়,—'হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অষ্টম বর্ষীয়া কন্যা ও তদপেক্ষা অল্পবয়স্ক আর একটি বালক উভয়ে মিলিয়া সেতার বাজাইলেন।...পরে এই দুটি শিশু ৩৪টি হিন্দী গান গাইলেন। সে গান হারমোনিয়ম, বেহালা ও তবলার সঙ্গে সঙ্গত হইয়াছিল। তাহার পর প্রসিদ্ধ গায়ক বিষ্ণুবাবুর একটী গানে বালকটি তবলা-সঙ্গত করিল। পরে আর ৪।৫টি গানের সঙ্গে প্রতিভা তবলা-সঙ্গত করিলেন।'

এখানে একই অনুষ্ঠানে তাঁর হিন্দী গান গাওয়া, সেতারবাদন এবং তবলা-সঙ্গতের কথা জানা গেল। তিন প্রকার সঙ্গীতক্রিয়াই বিশেষ তবলাবাদন যে সেই বয়সে বিশিষ্ট প্রতিভার পরিচায়ক, একথা বলা বাহুল্য।

উত্তর জীবনে প্রতিভা দেবী নিজে তাঁর বাল্যকালের সঙ্গীতচর্চার প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন,—'যখন আমার বয়স ছয়-সাত বৎসর...শৌরীন্দ্র ও যতীন্দ্রমোহন (পাথুরিয়াঘাটা ঠাকুর-পরিবারের রাজভ্রাতৃদ্বয়—বর্তমান লেখক) উভয়েই আমাদের বাড়িতে আসিতেন। তখনকার কালে মেয়েদের গান-বাজনা করিবার প্রথা ছিলনা। আমার পিতাই কেবল তাহা মানেন নাই। আমাকে উৎসাহিত করিতেন, শিখাইতেন। রাজা বাহাদুররা আমার পিতাকে এদিকে উৎসাহ দিতেন। সেদিনে বিষ্ণু চক্রবর্তী বাড়ির গায়ক। তাঁহার নিকট ছোট খেয়াল শিখিতাম। রামপ্রসাদ মিশ্র সেতার-শিক্ষক। বাড়িতে তখন বিদ্বজ্জন সমাগম হইত। শৌরীন্দ্রমোহন ইত্যাদি আসিতেন। সেসময় আমি ও ভ্রাতা হিতেন্দ্র উভয়েই সকলের সামনে গাইতে বাধ্য হইতাম।'

'বিদ্বজ্জন সমাগম' প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, এই সভারই আর এক অধিবেশনে (শনিবার, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৮৮১) রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় সুর-নাটিকা 'বাল্মিকী প্রতিভা' অভিনীত হয়। সে অভিনয়ে (বাল্মিকীর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ) প্রতিভা দেবী যে 'সরস্বতী-রূপে অবতীর্ণ হন, 'বাল্মিকী প্রতিভা' নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়া গিয়াছে।' ('জীবনস্মৃতি'তে রবীন্দ্রনাথের উক্তি)।

এমনিভাবে রীতিমত শিক্ষার এবং পারিবারিক পরিবেশে অল্প বয়সেই প্রতিভা দেবীর জীবনে সঙ্গীতের আসন পাতা হয়েছিল। তারপর থেকে তিনি সঙ্গীতের সেবা করে গেছেন নানাভাবে, আজীবন।

১৮৮৬ খৃঃ প্রমথ চৌধুরীর অগ্রজ আশুতোষ চৌধুরীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহোত্তর জীবনেও তিনি সঙ্গীতচর্চা থেকে বিরত হননি। বরং পরিণত বয়সে স্বামীর সহযোগিতায় সঙ্গীত-সেবিকা হয়েছিলেন অভিনব পন্থায়। সঙ্গীতশিক্ষাদানের জন্যে উচ্চশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও পরিচালনা করে, সঙ্গীতবিষয়ক মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা ও প্রকাশ করে তিনি সমকালীন শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে সঙ্গীত সম্পর্কে এক নতুন প্রেরণার সঞ্চার করেছিলেন।

ইউরোপীয় সঙ্গীতের চর্চাও করেছিলেন প্রতিভা দেবী। প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের 'আত্মকথা' বইখানি থেকে প্রতিভা দেবীর পিয়ানোতে বীটোভেনের Moonlight Sonata বাজাবার কথা জানা যায়।

প্রতিভা দেবী রাগসঙ্গীত-চর্চায় প্রসারের জন্যে যা করেছিলেন সেজন্যে তাঁর নাম স্মরণীয় থাকবে। এ সম্পর্কে

তাঁর শ্রেষ্ঠ সাংগঠনিক কাজ হল 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' নামক উচ্চ-শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান স্থাপন। বর্তমান শতকের প্রথম দিকে কলকাতার সম্ভ্রান্ত সমাজে সঙ্গীতানুশীলনের শ্রীবৃদ্ধিতে 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বিখ্যাত গুণীদের দ্বারা কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের বিভিন্ন বিভাগে নিয়মিত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে, সঙ্গীত-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে তিনি সাঙ্গীতিক উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিলেন এই সংস্থার মাধ্যমে। 'সঙ্গীত সঙ্ঘে'র শিক্ষকমণ্ডলীতে ছিলেন কৌকব খাঁ, (ও তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে তাঁর অগ্রজ) করামতুল্লা খাঁ, লছমীপ্রসাদ মিশ্র, দক্ষিণাচরণ সেন, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সেকালের প্রসিদ্ধ কলাবন্ত। এখানকার এক বছরের প্রতিযোগিতায় সফল পরীক্ষার্থীরূপে তরুণ গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে'র নাম পাওয়া যায়, যিনি পরবর্তীকালে স্বনামধন্য গায়ক হয়েছিলেন। 'সঙ্গীত সঙ্ঘে'র প্রতিষ্ঠা হয় ১৯১১ খৃষ্টাব্দে।

প্রতিভা দেবীর সঙ্গীতবিষয়ক আর একটি কার্যধারা হল, 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা' মাসিকপত্রের সম্পাদনা। সঙ্গীত সঙ্ঘের মুখপত্র স্বরূপ এই সঙ্গীতবিষয়ক মাসিক পত্রিকাটি প্রতিভা দেবী প্রকাশ করতে আরম্ভ করেন। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী এবিষয়ে তাঁর সহযোগিণী হন পত্রিকার সম্পাদিকারূপে। শুধু সঙ্গীত সেবায় উৎসর্গীকৃত মাসিক পত্র পরিচালনা করা এদেশে কঠিন কাজ ছিল এবং তার দৃষ্টান্তও বেশি দেখা যায়নি। ১৮৭২খৃঃ বাংলায় প্রথম সঙ্গীতবিষয়ক মাসিকপত্র প্রকাশিত হয় 'সঙ্গীত সমালোচনী'। চারটি সংখ্যা প্রকাশের পরই তা বন্ধ হয়ে যায়। তারপর উনিশ শতকের শেষে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় বছরখানেক প্রকাশ পায় 'বীণাবাদিনী' সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক। তারপর 'আলাপিনী' নামে আর একখানি এমনি মাসিক-পত্রও সাময়িকভাবে চলেছিল। বর্তমান শতকের প্রথম দিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় 'সঙ্গীত-প্রকাশিকা' মাসিক পত্রিকাটিই শুধু অনেকদিন স্থায়ী হয় প্রায় দশ বছর প্রকাশিত হয়ে। এই অবস্থায় প্রতিভা দেবী ১৯১২ থেকে প্রথম প্রকাশ করে 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা'কে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত দশ বছর সঙ্গীতের সেবায় নিযুক্ত রেখেছিলেন, একথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখবার যোগ্য। তাঁর মৃত্যুর পরও স্যার আশুতোষ চৌধুরী 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা'র অস্তিত্ব কিছুকাল বজায় রাখেন। প্রতিভা দেবীর জীবনের শেষ পর্যায়ে তাঁর সঙ্গীতবিষয়ক কর্মধারা 'সঙ্গীত সঙ্ঘ' এবং 'আনন্দ সঙ্গীত পত্রিকা'কে কেন্দ্র করেই রূপায়িত হয়েছিল।

গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী (১৮৮৫-১৯৪৮)

বর্তমান শতকের দ্বিতীয় পাদকে বাংলার সঙ্গীতক্ষেত্রে গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী একজন আচার্যস্থানীয়রূপে গণ্য ছিলেন। রাগসঙ্গীতের বিভিন্ন ধারা এবং নানা ঘরাণা রীতির চর্চা ও সাধনায় গঠিত হয়েছিল তাঁর সঙ্গীত-জীবন। ভারতীয় সঙ্গীতের বহু বৈচিত্রের মধ্যে তিনি পরম সুখে অবগাহন করেছিলেন এবং বিশিষ্ট অনুশীলনের ফলে তাঁর জীবনে সঙ্গীতচর্চায় এক সুন্দর সমন্বয় দেখা গিয়েছিল। রাগসঙ্গীতের নানা রীতি প্রকৃতিতে তিনি বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন তন্নিষ্ঠ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে; তাঁর বিভিন্নমুখী সঙ্গীতশিক্ষার ধারাতেও এক অভিনব সমীকরণ লক্ষণীয় ছিল। বিচিত্র তাঁর সঙ্গীতশিক্ষার প্রসঙ্গ।

প্রথম জীবনে তিনি সঙ্গীতগুরুরূপে লাভ করেছিলেন আচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীকে। তাঁর কাছে একাদিক্রমে ১০ বছরেরও বেশি শিক্ষার ফলে গিরিজাশঙ্করের সঙ্গীতজীবনের ভিত্তি রীতিমত গঠিত হয়। রাধিকা-প্রসাদের শিক্ষাধীনে তিনি প্রধানত ধ্রুপদ, ধামার এবং কিছু খেয়ালেরও চর্চা করেছিলেন পদ্ধতিগতভাবে।

রামপুর ঘরাণার বিখ্যাত গুণী ছম্মন সাহেবের কাছে গিরিজাশঙ্করের শিক্ষাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রামপুরের স্বনামধন্য উজীর খাঁর দৃষ্টান্তেও তিনি শিক্ষালাভের সুযোগ পান। তানসেনের পুত্রবংশীয় কলাবত মহম্মদ আলি খাঁর নিকটেও তিনি ধ্রুপদ ও ধামারের শিক্ষা কিছু পেয়েছিলেন।

দিল্লীর বিখ্যাত খেয়াল গায়ক মজঃফর খাঁর কাছেও কয়েক মাস খেয়ালের তালিম লাভ করেন গিরিজাশঙ্কর। মজঃফর খাঁ গমক ও ছুনিতান সমন্বিত তাঁদের ঘরাণাদার খেয়াল পদ্ধতির শিক্ষা তাঁকে দিয়েছিলেন।

ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছেও খেয়াল সংগ্রহ করেছিলেন তিনি।

শ্যামলাল ক্ষেত্রীর কাছেও খেয়াল ও ঠুংরির সম্বন্ধে নানাভাবে তিনি ঋণী ছিলেন।

তা ছাড়া, ছোটে মুন্নে খাঁ এবং আরো কয়েকজন পশ্চিমা গুণীর কাছ থেকেও গিরিজাশঙ্কর লাভবান হয়েছিলেন।

ঠুংরিরীতির আদর্শ তিনি লাভ করেছিলেন ঠুংরির রাজা গণপৎ রাওয়ের কাছে। লচাও ঠুংরির প্রবর্তক, ভাইয়া সাহেব নামে সঙ্গীতজগতে সুপরিচিত গণপৎ রাওয়ের শিষ্যরূপে গিরিজাশঙ্কর ঠুংরিতে শিক্ষা ও সিদ্ধি-লাভ করেছিলেন। স্বনামপ্রসিদ্ধ মৌজুদ্দিন খাঁর সাক্ষাৎ দৃষ্টান্তেও ঠুংরি গানে প্রেরণা পেয়েছিলেন তিনি।

এমনি বহুমুখী সঙ্গীতসম্পদ লাভে গিরিজাশঙ্করের সঙ্গীতভাণ্ডার পূর্ণ হয়েছিল। ধ্রুপদ ধামার খেয়াল ও ঠুংরি অঙ্গে দীর্ঘদিনের অনুশীলনে কৃতবিদ্য হয়েছিলেন তিনি। বিভিন্ন রীতিতে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী হবার পর পরিণত বয়সে তিনি শুধু খেয়াল ও ঠুংরি, বিশেষ ঠুংরির ধারায় বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। শিষ্যদের সঙ্গীত-শিক্ষা দিতেন খেয়াল ও ঠুংরি দুই পদ্ধতিতেই। কিন্তু নিজে আসরে বেশির ভাগই পরিবেশন করতেন গণপৎ রাওয়ের প্রবর্তন করা রীতির সূক্ষ্ম কারুকর্মময়, গভীর হৃদয়াবেদনে পূর্ণ মনোমুগ্ধকর ঠুংরি। বাংলাদেশের সঙ্গীতসমাজে ঠুংরি গানের শিল্পাচার্যরূপেই তিনি সমধিক অভিনন্দিত হয়েছিলেন।

সঙ্গীত শিক্ষাদানের মাধ্যমে রাগসঙ্গীতের প্রসারে বাংলায় তাঁর স্মরণীয় ভূমিকা ছিল। পরবর্তী যুগের বাংলার বহু বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পীকে তিনি উপযুক্তভাবে গঠিত করে প্রতিষ্ঠিত করে দেন সঙ্গীতক্ষেত্রে। এত কৃতী শিষ্যগঠনের গৌরবলাভ সাম্প্রতিককালে অপর কোন সঙ্গীতগুণীর পক্ষে বিশেষ দেখা যায়নি।

পরিণত বয়সে গিরিজাশঙ্করের আদর্শ সঙ্গীতাচার্যরূপে সম্মানিত ছিলেন বাংলাদেশে। আধুনিক কালের বাংলায় রাগসঙ্গীত চর্চার শ্রীবৃদ্ধি ও বিস্তারে তাঁর স্থান কোথায় ছিল তা তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর পরিচয়ে জানা যায়। একান্ত-ভাবে তাঁর শিক্ষাধীনে যাঁদের সঙ্গীতজীবন গঠিত হয় কিংবা যাঁরা নাতিদীর্ঘকাল তাঁর কাছে শিক্ষার্থীরূপে ছিলেন, তাঁদের নিয়ে গড়ে ওঠে তাঁর ব্যাপক শিষ্য-সম্প্রদায়। সেই বিরাট শিষ্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেন—জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, তারাপদ চক্রবর্তী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, রথীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, যামিনীনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সুখেন্দু গোস্বামী, চিন্ময় লাহিড়ী, সুনীল বসু, শৈলেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এ. কানন, সুধীরলাল চক্রবর্তী, গীতা দাস, আরতি দাস, ইলা দত্ত, উমা দে প্রভৃতি। এই তালিকা থেকে ধারণা করা যায় যে, গিরিজাশঙ্কর যেমন শিল্পী তেমনি আচার্যরূপেও কত বড় ছিলেন। বিশেষ করে কলাকুশলী ঠুংরি গানের চর্চায় নিজের দৃষ্টান্তে ও শিষ্যদের মাধ্যমে বাংলাদেশে এক স্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি।...

বহরমপুরে একটি ছোটখাট জমিদার বংশে তাঁর জন্ম হয় ১৮৮৫ খৃঃ। পিতা ভবানীকিশোর চক্রবর্তীর ওকালতীর পেশাও ছিল। কিন্তু গিরিজাশঙ্করের শিল্পী-মন প্রকাশ পায় বালক বয়স থেকেই। বাল্যকাল থেকেই তাঁর চিত্রশিল্পে অনুরাগ ও পটুত্ব দেখা যায়। প্রথম যৌবনে গভর্ণমেণ্ট আর্টস্কুলে প্রবেশ করে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন চিত্রবিদ্যার অনুশীলনে। জলরঙ ও তেলরঙের চিত্ররচনায় বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন কিন্তু পরে সঙ্গীতসাধনায় একান্তভাবে আত্মনিয়োগ করায় বন্ধ করতে হয় অঙ্কনবিদ্যার চর্চা।

সঙ্গীতে আসক্তি ও নৈপুণ্যও তাঁর কৈশোর থেকে প্রকাশ পেয়েছিল। একই সঙ্গে চলেছিল তাঁর চিত্রশিল্প ও সঙ্গীতচর্চা। পরে একটিকে ত্যাগ করেছিলেন।

মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কাশিমবাজারে একটি উচ্চশ্রেণীর সঙ্গীতবিদ্যালয় স্থাপন করেন সঙ্গীতাচার্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর অধ্যক্ষতায়। অতি তরুণ

বয়সে গিরিজাশঙ্কর সেখানে রাধিকাপ্রসাদের শিক্ষাধীনে নিয়মিত সঙ্গীতচর্চা আরম্ভ করেছিলেন। অন্যূন ১০ বছর তাঁর কাছে পদ্ধতিগতভাবে ধ্রুপদাঙ্গ সঙ্গীত এবং কিছু খেয়াল শিখেছিলেন গিরিজাশঙ্কর।

রাধিকাপ্রসাদের কাছে শিক্ষাপর্বের শেষ দিকে তিনি কলকাতাতেও অবস্থান করতেন। এই সময় তিনি শ্যামলাল ক্ষেত্রীর সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে বাস করেন তাঁর ১০১, হ্যারিসন রোডের বাসাবাড়ীতে। শ্যামলাল ক্ষেত্রী ছিলেন কলাবত গণবৎ রাওয়ের প্রিয় শিষ্য এবং গণপৎ রাওয়ের সঙ্গীতের এক প্রধান ভাণ্ডারী। শ্যামলাল গায়ক ছিলেন না বটে, কিন্তু হারমোনিয়ম বাদকরূপে এবং রাগবিদ্যায় যথার্থ সঙ্গীতপ্রবীণ ছিলেন। তাঁর ১০১, হ্যারিসন রোডের দোতলায় সঙ্গীতসভাটি বহু ভারতবিখ্যাত গুণীর অনুষ্ঠানের জন্যে একটি চিহ্নিত কেন্দ্র ছিল সঙ্গীতসমাজে। এখানে শ্যামলাল ক্ষেত্রী ও অপরাপর কলাবতদের সান্নিধ্যে গিরিজাশঙ্কর সঙ্গীতানুশীলনে বহুলভাবে লাভবান হন। তাঁর বহুদিনের সঙ্গীতসাধনার স্থল ছিল ক্ষেত্রীজীর এই ডেরা। এখানে শুধু শ্যামলালজীর কাছেই রাগবিদ্যা তিনি লাভ করেননি। ওস্তাদ গণপৎ রাওকেও ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলেন এখানে। অতি নিকটে থেকে গণপৎ রাওয়ের গান ও হারমোনিয়মবাদন থেকে তিনি শিক্ষার্থীরূপে বহু সঞ্চয় করেছিলেন। এখানেই ঠুংরি-শিল্পী এবং গণপৎ শিষ্য মৌজুদ্দিন খাঁর গানও বহুদিন শোনেন ও প্রেরণা পান ঠুংরিগানের চর্চায়। তা ভিন্ন গহরজান, মালকাজান, কৈয়াজ খাঁ প্রভৃতি আরো নানা গুণীর সঙ্গীতবিদ্যার সঙ্গে এখানে গিরিজাশঙ্করের পরিচয় ঘটে।

সম্ভবত শ্যামলাল ক্ষেত্রী ও গণপৎ রাওয়ের যোগাযোগেই তিনি রামপুরের সঙ্গীত-দরবারে যাবার সুযোগ পান। কারণ গণপৎ রাওয়ের সঙ্গে বিশেষ হৃদ্যতা ছিল রামপুর নবাবের জ্ঞাতিভ্রাতা ও সঙ্গীতগুণী ছম্মন সাহেবের। গণপৎ রাও মাঝে মাঝে রামপুরে অবস্থান করতেও যেতেন। রামপুরে গিরিজাশঙ্কর ছম্মন সাহেব, উজীর খাঁ, প্রমুখ ভারতপ্রসিদ্ধ কলাবতদের সঙ্গীতানুষ্ঠান বহুদিন শোনবার সুযোগ পান ঘনিষ্ঠভাবে অন্তরঙ্গ পরিবেশে। মহম্মদ আলী খাঁকেও তিনি কিছুদিনের জন্যে রামপুরেই পেয়েছিলেন। এইভাবে রামপুরে সঙ্গীতশিক্ষা ও সঞ্চয়ে বিশেষ উপকৃত হয়েছিলেন গিরিজাশঙ্কর।

রামপুরের পর তিনি দিল্লীতে আরো সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিখ্যাত খেয়ালগুণী মজঃফর খাঁর কাছে খেয়াল শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। তাছাড়াও উত্তরভারতের অন্যান্য সঙ্গীতকেন্দ্রে গিরিজাশঙ্কর গিয়েছিলেন সঙ্গীত সংগ্রহ ও অভিজ্ঞতালাভের দুর্বার আগ্রহে।...

উত্তরজীবনে অধিকাংশকাল তিনি সঙ্গীতের শিল্পী ও আচার্যরূপে কলকাতায় সঙ্গীতসমাজে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে অবস্থান করেন।

৬৩ বছর বয়সে তাঁর ঐকান্তিক সঙ্গীত-জীবনের অবসান হয় বহরমপুরের পৈত্রিক আবাসে।

---

(১) বিষ্ণুপুর ঘরাণা পৃঃ ১২৭—১২৯ – দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়।

বর্ষশেষ

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

একেলা ক'রে আমায়
পলে পলে, দিনে দিনে
শেখাবে না কি তোমায়
চিরসাথী, নিতে চিনে?
দাস ক'রে পায়ে তব
রা'খবে না কি কৃপায়,
ফুটাতে কুঁড়িরে নব
ফুলের মুরছনায়?
চিরদিন আমি প্রভু
কী চেয়েছি — তুমি জানো,
কেন গো নিঠুর, তবু
এ-মায়া-আড়াল আনো
মিছে কাজে ভুলে থাকি
তোমায় — এই কি চাও?
আমারে তৃষিত রাখি'
তুমি কোন্ সুখ পাও?
শুনেছি তোমায় চায়
একান্ত বরণে যে,
তুমি কাছে টানো তায়
বাঁশিসুরে উঠে বেজে।
শুনেছি শুনেছি আমি
অন্তরে যে সে বাঁশি
জানো অন্তরযামী!
তাই তো আমি উদাসী।

আমার ধুলার ক্রন্দন
তোমার তারার তালে
সাধায়ে কি ওই বন্ধন
কাটিতে চাও নিরালে?
সে-আভাস আমি পাই
চকিত চমকে কভু,
তার পরে দেখি — নাই
কোথা স'রে গেছ প্রভু!

এ কেমন প্রেমরীতি
কাছে টেনে ঠেলো দূরে?
এসো হে প্রাণ-অতিথি,
অলো ক'রে প্রাণপুরে।

লুকোচুরি খেলা একি? —
হারাই কি ফিরে পেতে?
আমারে বিধুর দেখি'
দেবে কবে কাছে যেতে!

দোললীলা কাণ্ডার
অনেক হয়েছে খেলা,
রাঙায়ে রঙে তোমার
নিভায়ো না দীপমেলা।

একে একে ঝ'রে যায়
কামনা বাসনা যত
এসো, করো করুণায়
সকল শরণ-ব্রত।

শ্রীঅরবিন্দের জীবন-দর্শন

গৌতম সেন

১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট মর্ত-কায়ায় যাঁকে দেখি, ১৯৫০ সালের ৫ই ডিসেম্বর তাঁরই মহাপরিনির্বাণ। এই আবির্ভাব ও তিরোভাবের মাঝখানে ১৮৭২-৭৯ সাতবছর বাল্য ও কৈশোরের যুগ, ১৮৭৯-৯৩ এই চোদ্দবছর বিলাতে প্রবাস বা শিক্ষার যুগ, ১৮৯৩-১৯০৬ বরোদাবাস বা আন্তর প্রস্তুতির যুগ, ১৯০৬-১৯১০ এই চার বছর কলিকাতাবাস ও কর্মযোগীর যুগ আর ১৯১০-৫০ এই চল্লিশ বছর আত্ম-সমাহিতির যুগ। এই সীমার মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছেন মানুষ ও স্বাদেশিক অরবিন্দ, কবি ও দার্শনিক অরবিন্দ, সাধক ও যোগী অরবিন্দ।

শ্রদ্ধেয় রাজনারায়ণ বসু ছিলেন সেকালের প্রগতি-পরায়ণ বাঙালীসমাজের একজন সুযোগ্য নেতা। বাংলায় তখন পশ্চিমের সংস্কৃতির মাধ্যমে শিক্ষা ও দীক্ষার ঢেউ জোরে ধাক্কা দিচ্ছে—জোয়ারে ডুবু ডুবু নবীন বাংলার মন বিলাতের দিকে চেয়ে আছে আলোর জন্যে—নিবাতনিষ্কম্প একটি দীপশিখার জন্যে তার চিত্ত আকুল। এই প্রবল আলোড়নের তপ্ত কটাহে ভেসে যাচ্ছে শুধু ডিরোজিয়ো-রিচার্ডসনের ছাত্রেরাই নয়, অনেকদিনের অনেক কিছু সমাজবিন্যাসের রীতি নীতি। এই সমুদ্র-মন্থনের ধারকরা নাম দেওয়া হয়েছে 'রেনেসাঁস' বা নবজাগৃতির যুগ। এই যুগেরই একটি মানুষ ডঃ কৃষ্ণধন ঘোষ—রাজনারায়ণের জামাতা। তাঁরই তৃতীয় পুত্র শ্রীঅরবিন্দ। নিজের ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণরূপে সাহেব করে তুলবেন এই ছিল তাঁর আশা, তাঁর স্বপ্ন, তাঁর আকাঙ্খা।

—

প্রায় আশীবছর আগে তখনকার দিনের ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের এই মধ্যমণি ছেলেদের নিয়ে সমুদ্রে পাড়ি দিলেন—তাদের বিলেতে শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে উচ্চশিক্ষিত করিয়ে নিয়ে আসবেন এই ইচ্ছা। ভারতে তখন সেইযুগের রেশ চলছে, যখন মনে হতো পশ্চিমের জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-ইতিহাস-রাষ্ট্রবোধের চেতনাই শুধু একমাত্র কাম্য নয়, বিধিনির্দিষ্ট পথও বুঝি। সত্যিই সেযুগে বাপেরা স্বপ্ন দেখতেন, ছেলেরা আই-সি-এস হবে, মায়েরা কল্পনা করতেন, ছেলে আমার কুবেরের ঐশ্বর্য্য নিয়ে আসবে। ডঃ কৃষ্ণধন ঘোষেরও কামনা ছিল, 'অরো' বা শ্রীঅরবিন্দ হবেন একটা 'জাঁদরেল-গোছের আই. সি. এস অফিসার। বাঙালী-সমাজ, বাঙালী-চিন্তাধারা, ভারতীয় হাবভাব থেকে তাঁকে বিচ্যুত করে দার্জিলিং-এ 'কনভেণ্টে' পড়িয়ে সাতবছর বয়সে তাঁকে তিনি বিলেতে রেখে এলেন। কিন্তু চোদ্দবছর পরে যে-মানুষটা আই, সি, এস না হয়ে ফিরে এলো, বম্বের এপোলো বন্দরে দেশের মাটিতে পা দিয়ে সে কি দেখলো, না, একটা ভূমাময়ী অচঞ্চলা ভারতবর্ষের ছবি, ভোগভূমির নয়। তার মন আনন্দে ভরে উঠলো, শান্ত স্তব্ধ সমাহিত হলো। একে কি বলবো? অন্য পরিবেশে মানুষ হয়ে যাঁর বাংলা না জানার কথা, যিনি নিজে ইংরেজি ছাড়া কিছু লিখতেন না—তিনি কেমন করে লিখলেন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের কথা, মধুসূদনের কাহিনী। তখনি শ্রীঅরবিন্দের কম্বুকণ্ঠে শুনি—Let Bengal be true to her own soul.

শ্রীঅরবিন্দ ভারতে ফিরে এলেন ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বরোদায় চাকরি নিয়ে। তখন তিনি তরুণ যুবক—তিনি নিজেই বলেছেন যে, ভারতের মাটিতে পা দিয়েই তাঁর মনে এক অদ্ভুত ভাবান্তর উপস্থিত হয়: এক ভূমাময়ী অচঞ্চলা যেন দিগন্তরে অঞ্চল বিস্তার করে

দাঁড়িয়ে আছেন। এর সূচনা আমরা দেখতে পাই, ইংলণ্ডে থাকাকালে চোদ্দবছর বয়সেই। অনেকেই জানেন না যে, শ্রীঅরবিন্দ শুধু মহাযোগী নন, স্বদেশপ্রেমিক নন, বড় কবিও। অবশ্য তিনি লিখতেন ইংরেজীতে এবং সে ইংরেজীর ভাষা গ্রীক-লাতিন ভাবের সমবায়ে ক্লাসিক্যাল গুরুগম্ভীর ভাষা। তাঁর কবি-জীবনের সূত্রপাত বাল্যকালেই। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে সেণ্টপল্‌স বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণী সভায় ওয়ার্ডসওয়ার্থের To the Cuckoo আবৃত্তি করে এসে তিনি সেই রাত্রেই নিজে এক কবিতা লিখলেন—যার প্রথম চরণ হলো: "Sounds of the awakening World" পৃথিবী জাগছে, ঘুম ভাঙছে, তারই পদধ্বনি কিশোর কবি শুনছেন কোকিলের ডাকে। সেইদিন থেকে আরম্ভ ক'রে তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন পর্যন্ত তিনি একটানা কবিতা লিখে চললেন। তাঁর ভাবে ভাষায় ঝংকারে বর্ণ-বৈচিত্র্যে উপমায় শুধু যে তথ্য ও তত্ত্বেরই সমাবেশ দেখি তা নয়, একটা আন্তর অনুভূতির স্পর্শ পাই। কোকিলের ডাকে যে বালক-কবি জেগেছিল, সারা জীবনের সাধনার পর সেই চিরতরুণ কবিই অমের আশার বাণী শুনিয়ে গেলেন, সাধকের অসংশায়িত কণ্ঠে 'And in her bosom nursed a greater dawn.'

বরোদাবাসের চোদ্দ বৎসর তাঁর কাছে বাণী-সাধনার যুগ—তিনি পড়ছেন, তিনি বুঝছেন—বেদবেদান্ত তন্ত্র, উপনিষদ্ গীতা, পুরাণ, ইংরেজি, সংস্কৃত, বাংলা, ফরাসী, গ্রীক লাতিন। তিনি লিখে চলেছেন কাব্য নাটক, প্রবন্ধ—অন্তরে ধ্যানের নির্দেশ পাচ্ছেন।

১৯০৬ সালে শ্রীঅরবিন্দ কলকাতায় ফিরলেন—জাতীয় শিক্ষা-পরিষদের প্রিন্সিপ্যাল হয়ে। সারাদেশ বেয়ে এক ঝোড়ো হাওয়া বয়ে চলেছে বাংলাকে খণ্ডিত করা নিয়ে। 'বাংলার মাটি, বাংলার জল ধন্য হোক, পুণ্য হোক' কবি সেই গান গাইছেন। রাজনীতিকরা জোর গলায় মিটিং করছেন, বয়কট করছেন। চতুর্দিকে এক নতুন উন্মাদনা, এক জনজাগরণ। পূর্বে বিশাল বরিশালে গুলিশবাহী পুলিশের অত্যাচারে বাংলার মন সন্ত্রস্ত। এমনি দিনে এলেন শ্রীঅরবিন্দ বাংলায় ফিরে—এতো আসা নয়, এ হলো অবির্ভাব। চারবছর তিনি কলকাতায় ছিলেন। 'সন্ধ্যা' 'বন্দেমাতরম' 'যুগান্তর' 'কর্মযোগী' নিয়ে—সাদাসিদে সাধারণ মানুষ, আঠারো ঘণ্টা ক'রে দিনে খেটে যিনি ক্লান্ত নন, সারাদিন লিখেও যিনি অবসন্ন নন, যিনি লোককে কথার ভোজবাজীতে শুধু চমকিয়ে দেননি, তিনি নিজেই ছিলেন কর্মযোগীর এক বিরাট প্রতীক।

শ্রীঅরবিন্দ যৌবনে অত্যন্ত কঠিন সমালোচক ছিলেন। তীব্র ভাষায়, তীব্র চিন্তার প্রকাশ পেতো সেই লেখায়। এর কারণ কাউকে 'নস্যাৎ' করবার ভাব নয়—এ হচ্ছে একটা আদর্শের প্রতি উৎকট অনুরাগ এবং সে-আদর্শ দেশমাতার প্রতি অনুরাগ, বিজাতীয়তার পরিহার। পাশ্চাত্যের অনুকরণে সমাজসেবার আদর্শ, কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদনের নীতি, তাঁর উগ্রমনকে নমনীয় করেনি। বরং এই সময়ে ইন্দুপ্রকাশে প্রকাশিত New Lamps for the old, প্রবন্ধগুলিতে তিনি এই মনোভাবকে দৈন্যপীড়িত, আদর্শবর্জিত বলে তীব্র কশাঘাত করেছেন। মনে রাখতে হবে তখন তাঁর কবি-কল্পনায় খেলছে এক বিরাট ত্রাণকর্তা, যে দেবতাকেও স্বাধীন করতে পারে, যে মানুষকে তুলে ধরতে পারে উর্দ্ধে, আরো উর্দ্ধে, সব দিক দিয়ে—Till her dim soul awakes into the light, তাই বঙ্কিমের বন্দেমাতরম তাঁর কাছে দেবতার আশীর্বাদের মতই প্রতিভাত হয়েছিল। বঙ্কিমের বহুমুখী প্রতিভাকে বিশ্লেষণ করে তিনি নব্য-বাংলার গূঢ়তম রূপটিকে আবিষ্কার করতে চাইলেন, শিল্পীর চোখ দিয়ে বঙ্কিম ও মধুসূদনকে তিনি নূতন ক'রে দেখলেন। একজন আনলেন গদ্যের নূতন রীতি, আর একজন দিলেন পদ্যে নূতন ছন্দ।

অরবিন্দ-কাব্যের বেশ কিছুভাগ গীতি-কবিতা ও খণ্ড-কবিতা হলেও, তারা মহাকাব্যের ঘনীভূত রূপের আভাস দেয়। ঠিক লিরিক নয়। তার ভাবে ভাষায় ঝংকারে বর্ণ-বৈচিত্র্যে, উপমায়, গভীরতম রহস্য, তত্ত্ব ও তথ্য একটা আন্তর অনুভূতির রূপ আনে।

তাঁর কাব্যের যতটুকু প্রকাশ বাইরে, তার চেয়েও গভীরতা ভিতরে। তাঁর জীবনের সম্বন্ধেও যেকথা বলা যায়, তাঁর কাব্য সম্বন্ধেও সেকথা প্রযোজ্য। আর একটি বিশেষ কথা, অরবিন্দ-কাব্য জুড়ে বসে আছে তাঁর প্রচ্ছন্ন যোগীরূপ। তাই তাঁর কবি-জীবনের আবির্ভাব মধ্যাহ্ন গগনের সূর্যের মতো। সেই যে তিনি লিখেছিলেন—Sounds of the awakening world. সেই কথাই সারাজীবনের সাধনার পর সেই অমের আশাই সাধকের অসংশয়িত কণ্ঠে তিনি ঘোষণা করে গেলেন। আলো, শুধু আলো নয়, বৃহত্তর জীবন—বৃহত্তর ঊষা, বৃহত্তম পরিণতি এই শুধু লক্ষ্য। কবি হচ্ছেন তিনি, যিনি দেখেন। তাঁর কাব্যে ছায়া পড়ে এই বাইরের আর ভিতরের জগতের। সাধারণতঃ কবির দৃষ্টি জৈব. স্তরেই আবদ্ধ থাকে যা তিনি পেয়েছেন অবচেতনার-উত্তরাধিকারসূত্রে, রক্তের কৌলিন্যে, সংস্কারের বীজে, সুপ্ত কামনার এষণায়। তারই সঙ্গে আছে বাহ্য-চেতনা যা আমরা দেখছি, শুনছি, স্পর্শ করছি—তার পরেও আছে বুদ্ধি-চেতনা যা আমরা আমাদের বুদ্ধি-বিদ্যার বিচার-বিশ্লেষণ করে গ্রহণ করছি। এইখানেই সাধারণতঃ প্রকাশের সীমা শেষ। কিন্তু তার পরের চেতনা—তা যে নামই দিই না কেন, তারই উপলব্ধি হলো বিশ্বচেতনার সঙ্গে যুক্ত, বোধিচেতনায়। তাকেই বলা যেতে পারে ঊর্দ্ধতর মানস, ভাস্বর মানস, অধিমানস, অতিমানস। সেই বিভিন্ন মানস-তরঙ্গতলেই বাণীর সঙ্গীত শতদল নেচে ওঠে, জেগে ওঠে। সেই সার্বভৌমিক চেতনাই অধিকারীভেদে বিভিন্ন স্তর থেকে কবির আপন মন কাজ করে চলেছে। মূলে সুর ও বীজ এক, প্রভেদ শুধু বিস্তারে, পারম্পর্যে, মূল্যবোধে, সূক্ষ্ম ও গভীরতর প্রকাশে, নব নব ব্যঞ্জনার রূপায়ণে। যা ছিল আত্মকেন্দ্রিক, তাই বিচারবোধের রূপায়ণে হয় মূল্য-কেন্দ্রিক। সেইজন্য বিভিন্ন মানসিক স্তর থেকে লেখা কাব্যেরও প্রকাশ বিভিন্ন। তার রূপ, তার ব্যাপ্তি, তার বিস্তার, তার ঐশ্বর্য্য, তার বর্ণসজ্জার বিভিন্ন। তাই কাব্য শুধু ছবি নয়, প্রকাশ নয়, মনোবিকলন নয়, [illegible] অসমাপ্ত নয়, খণ্ডের ছন্দ।

শ্রীঅরবিন্দ কাব্য-বিচারে এই কথাটা বিশেষ ক'রে মনে রাখা উচিত।

শ্রীঅরবিন্দও মাটির কবি, কিন্তু সে মাটি তপস্যার আগুনে পুড়ে সোনা হয়ে গেছে। মাটিতে যে-জীবনের আরম্ভ, আকাশে তার সমাপ্তি। বৈরাগ্য সাধনেই মুক্তি এই শেষ কথা নয়। তাঁদের কবি-জীবনের প্রথমে তাই এই মাটি, আলো, বাতাস, মানুষের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচয় পাই এবং পরের জীবনের সাধনাতেও এই মুক্ত রূপটিও দেখি। তাই সম্পূর্ণ বিচারে কবি-শ্রীঅরবিন্দকে যোগী-শ্রীঅরবিন্দ থেকে পৃথক করে দেখা সুষ্ঠু ও সঙ্গত নয়। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও সেই কথা, তাঁর কবিকে মানসসুন্দরী বা জীবনদেবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা যায় না। এই অদৃশ্য সাধনার-আরম্ভ কৈশোর থেকেই। অল্প বয়সেই তাঁদের জীবনে এসেছিল এক গভীর পরিবর্তন। তা ছাড়া, সাধারণ ভাবেও আমরা সাহিত্য-সৃষ্টিকে সাধনা বলতে পারি। সাহিত্যিক যখন ভিতরের তাগিদে বাক্যের মাধ্যমে রসসৃষ্টি করেন তখন তিনি কারুশিল্পী নন, তখন তাঁর আঙ্গিক রচনাশৈলী এসব গৌণ, তখন তিনি মানসস্রষ্টা, শুধু রূপকার নন। সাধনা বলি কাকে, না, যা মানুষকে নব নব সৃষ্টির প্রেরণা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যসাধক নিজেকে আবিষ্কার করেন, খণ্ড জীবনের মধ্যে তিনি অখণ্ডের পরিচয় দিতে চেষ্টিত হন—আসল কবির কাছে তার কাব্য শুধু নিজেকে, সমাজকে, জীবনধারাকে, চিন্তার বিশিষ্ট ভঙ্গিতে প্রকাশ করাই সব নয়—সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আত্ম-আবিষ্কার এবং সেই আনন্দ উপভোগ অখণ্ড আমাদেরই সহোদর হতে বাধ্য, কারণ সেখানে বুর্জোয়া কবিই হোন, আর অতীন্দ্রিয়বাদী মরমী কবিই হোন, সবাই নিজের নিজের স্তর থেকে যে সৃষ্টি করলেন তারই লীলারস আস্বাদনে একান্তভাবে মগ্ন। জীবন মানেই সৃষ্টি, সৃষ্টি মানেই নিজেকে ফিরে পাওয়া।

একটা গভীর আবেগ না এলে, মানুষ তার চিহ্নিত সীমানা ছেড়ে যেতে পারে না, সেইজন্যে তাঁর কাছে ত্যাগ বা ভোগ দুই-ই এক। হওয়াই হচ্ছে আসল।

শ্রীঅরবিন্দ ও রবীন্দ্র কাব্য ও সাধনারও মূলে এই কথা। সমস্ত সৃষ্ট-জীবের মধ্যেই এই শক্তির মধ্য থেকে বেরিয়ে এসে নূতন রূপ নেবার যে প্রাকৃতিক রহস্য তাকেই বৈজ্ঞানিক আর দার্শনিক নাম দিলেন ক্রমাভিব্যক্তি বা ইভলিউশন—এই যে বিস্তার, এই যে বিক্ষেপ, প্রকৃতির মধ্যে এই যে চিরন্তন আলোড়ন, একে খণ্ড খণ্ড করে দেখাই আমাদের স্বভাব।

এই তিলে তিলে নূতন হওয়াই রূপান্তরিত প্রেম-সাধনার তাৎপর্য। রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীব্র ব্যাকুলতা যতদিন না সত্তাকে রূপান্তরিত করে ততদিনই বিরহ। তাই শ্রীঅরবিন্দ কাব্যে প্রথম যুগে প্রেমের কবিতাকে কৈশোরের শ্যামল রসে বেগ আর আবেগের মধ্যে যেভাবেদেখি, যে রূপান্তরের বীজ তার সুপ্ত মধ্যে দেখি, পরিণত বয়সে সাবিত্রীতে তারই পূর্ণ পরিণতি পাই।

সাবিত্রীতে সেই কথাই তিনি বলছেন, দেহ মোর মুক্ত হবে আত্মার সমান--মৃত্যু আর তার অজ্ঞানকে অতিক্রম ক'রে।

শেষে যখন সেই অতিক্রম হলো, তখন পরম দিব্য বললেন, All that thou art, shall to my hands belong—তুমি যাহা, সবই আমার—

তুমি আমার অমিয়সুধার পাত্র, আমার তরবার, আমার বীণা। তুমি হবে A Channel for my timeless force. কাল-সীমার অচিহ্নিত যে শক্তি তারই ধারক সত্যবান আর সাবিত্রী, 'A dual power of God in an ignorant world'. যিনি নিজেকে দুই-এ ভাগ করেছিলেন তারই বিকাশ—

স্বর্গকে জন্ম নিতে হবে বারে বারে মাটি মায়ের কোলে—প্রেম হচ্ছে তারই দুয়ার। মহী-স্বরূপেই অলজ্ঘবীর্য। তাই যমের সঙ্গে তর্কের পর সাবিত্রীর যখন যোগধ্যান ভাঙলো, তখন তিনি পৃথিবীতেই ফিরে পেলেন সত্যবানকে—

কোথা থেকে তুমি আমায় ফিরিয়ে নিয়ে এলে সাবিত্রী, প্রেমের শিকলে বেঁধে সূর্য-করোজ্জল ধরিত্রীতে আমি কি ঘুমিয়েছিলাম, মনে হচ্ছে দূরে বহুদূরে, অনন্তের পথে আমি চলেছিলাম—সেই মহাশূন্যের মাঝে তুমি পিছনে পিছনে চলেছো আমার।

সাবিত্রী বললে, আমাদের বিচ্ছেদই স্বপ্ন—আমরা বিচ্ছিন্ন হতে পারি না, মৃত্যুর রাত্রিকে পিছনে ফেলে এসেছি আমরা—রূপান্তরিত হয়েছি।

অরবিন্দ-কাব্যের শেষ কথা, শেষ পরিণতি সাবিত্রীতে। সব পথ এসে মিশে গেছে শেষে ঐ কাব্য-মহাসাগরে। এতে আমরা শুধু কাব্য, ছন্দ, ভাষার বিন্যাস, রূপায়ণের, চিত্র-কল্পনার প্রাচুর্য, চিন্তার প্রখরতা, অসীমবিস্তার, ভাবের গাম্ভীর্যই পাই না, এখানে দর্শন, কাব্য, সাধনার ত্রিকাল ত্রিকারে এসে মিশেছে অনন্তের রাজ্যে, অনির্বাণের পথে, অচিন্তনীয়ের সুরে। মানুষের প্রেম,তার অনন্তজ্যোতির যাত্রাপথে যে নিত্য সাধনা,তার অনাদ্যন্ত অধ্যাত্মজীবন, তার যে অগ্নিময় ঊর্ধ্বগতি; যে সীমাহীন কাল Time space continuous এর ঊর্ধ্বে প্রবাহিত, সেই মহাকালের কোলে মহাকালীর যে লীলা চলছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীঅরবিন্দের শ্রেষ্ঠ কাব্য সাবিত্রী।

আলোর সাধনা আর অমৃতের সাধনা এক হয়ে গেল ঋষি-কবিদের অনুভূতিতে। সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জুড়ে চলেছে মৃত্যুতামসীর তাণ্ডব-লীলা। ছিন্নমস্তা বগলা হবেন, অমলা কমলা। মৃত্যু মানেই খণ্ডতা, অপূর্ণতা — সেইজন্য প্রথম প্রশ্নই হচ্ছে, সেই মহান মৃত্যুর সাথে মুখোমুখি দাঁড়াবে কে বজ্রের আলোতে? কে হবে মহামৃত্যুঞ্জয়ের উপাসক, যে শবকে ফিরিয়ে এনে শিবে পরিণত করবে।

ভাগ্যবিধাতার লিপিকে অগ্রাহ্য ক'রে দুর্ভাগ্যের সামনে দাঁড়াতে পারে কোন্ শক্তিমতী?

মৃত্যুই অমৃতত্বকে আনয়ন করে, 'মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ।' মৃত্যুই চলে, মৃত্যুই চালায়, সঞ্চরমান কালের ক্লান্তি দূর করে। মৃত্যু প্রাণেরই একটি ভঙ্গিমা। প্রাণের অন্নময় ভূমি থেকে যে বিদায় নিয়েছে তাকে যমের অর্থাৎ কালের নিয়ম-চক্র থেকে পুনরায় ফিরিয়ে এনে বিজ্ঞানময় আনন্দময় ভূমিতে প্রতিষ্ঠা করবার যে সাধনা সেই হচ্ছে সাবিত্রীর তপস্যা। মৃত্যু, কামনা আর সংবাত

এই যে ত্রয়ী, এই হচ্ছে দিব্যপ্রাণের ছদ্মবেশ—একে উন্মোচন করার প্রয়াসই সাবিত্রীর সাধনা।

মহাকালের যাত্রাপথে একাকী দাঁড়িয়ে সত্যবান-মৃত্যুর বিধানের জোয়াল ঘাড়ে করেও তিনি অমরাবতীর তীর্থযাত্রী। সারাবিশ্বের দুঃখের ও আনন্দের কাছে এই প্রেম ধরা দিয়েছে অর্থাৎ মানুষী-প্রেম হচ্ছে দুঃখ ও আনন্দের ঘনীভূতরূপ। এই দ্বৈতকে এক ক'রে অদ্বৈতের যে সাধনা, খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের যে অনুভূতি তারি সার্থকতা সাবিত্রী সত্যবানের কাহিনীতে।

সেই বন্য প্রান্তরের পরিবেশে সাবিত্রী দেখলেন সত্যবানকে, সত্যবান দেখলেন সাবিত্রীকে—তার চিরসাথী, তার সঙ্গী, তার আত্মাকে দাবী করছে যে সত্যবান। তাঁর অন্তস্তলের গভীর হতে কলস্বনা এক আকৃতি, এক অভিব্যক্তি জেগে উঠলো।

আত্মা চিনে নিলে আত্মাকে।

বেঁচে থাকা মানেই ভালবাসা। ভালবাসা অনন্তেরই সন্ধান দেয়—যে দিব্যশক্তি রূপান্তর করতে পারে, সত্তাকে বদলে দিতে পারে। সত্যিকার ভালবাসলেই জীবনের ধারা বদলে যায়। জীবনে নূতন সূর্যের উদয় হয়, নূতন যুগ আসে, নূতন সৃষ্টি, নূতন দৃষ্টি।

সত্যবান দেখলেন, সাবিত্রীর মধ্যে তার নিজের মত এক উদার বিভূতি—নিজের অনন্ত যেন সান্ত মূর্তি নিয়েছে তার মধ্যে। সাবিত্রীর জীবন যেন সত্যবানের পৃথিবী, যার ওপর দিয়ে তাঁর ত্রিধা পদ রেখে তিনি বিচক্রমণ করবেন। সাবিত্রীর তনু তাঁরই আনন্দের অনুভূতির ক্ষেত্র।

ভালবাসার শেষ কথা এইখানে—তুমি নেই, আমি নেই, আবার তুমিও আছ আমিও আছি দুই মিলিয়ে এক অখণ্ড অনুভূতি।

তুমি আর আমি মাঝে নাই কেহ
কোন বাধা নেই ভুবনে।

সাবিত্রী ফিরলেন অশ্বপতির প্রাসাদে। অশ্বপতি নিজে রাজযোগের সাধক তিনি জেনেছেন মহারাত্রির তিনি মহাশূন্যে লোকে লোকান্তরে, চিন্তার স্তরে স্তরে ঘুরেছেন, তিনি উত্থান-পতনকে দেখেছেন, জেনেছেন জীব ও শিবের মধ্যে ভেদাভেদ নেই। সাধনার প্রথম স্তর, মর্ত-সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের দিকে যাত্রা, দ্বিতীয় স্তরে ঊর্ধ্বারোহণ, তৃতীয় স্তরে মহাশক্তির অবতরণ, চতুর্থস্তরে সেই শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ ক'রে সমস্ত সত্তাকে রূপান্তরিত করা। সাবিত্রীই হচ্ছেন সেই অবতরণের প্রতীক যমের অর্থাৎ নিয়মের নিগড় যে ভাঙবে।

স্বর্গের উদয়াচল থেকে মূর্তিমতী উষসী নেমে এই পৃথিবীতে বেড়াবেন। নারদের মুখ দিয়ে কবি শ্রীঅরবিন্দ নিত্য সত্যেরই আভাস দেননি, অপূর্ব কাব্যও রচনা করেছেন।

মৃত্যু মানেই খণ্ডতা, মৃত্যু মানেই দ্বৈতকে স্বীকার। তাই সত্যবানের মৃত্যুর পর সাবিত্রী যমকে বললেন,

মৃত্যুদেব, আমি তোমাকে স্বীকার করি না। খোলো খোলো দ্বার, তোলো তোমার যবনিকা।

মৃত্যু হাসে—বলে, কিসের শক্তিতে তুমি বিশ্ববিধাতার চিরন্তন বিধানকে উল্টে দিতে চাও নারী!

সাবিত্রী বলে, My God is love, Swiftly suffers all প্রেমের ঠাকুরই আমার দেবতা। আমি সব দুঃখ ভোগ করছি। আমি রমণী আমি সেবিকা, আমি দাসী, আমি নির্যাতিতা, আবার আমি গরবিনী রাণী, আদরিনী সবকিছু দুঃখের মধ্যে আমিই জাগরী, আমিই ক্রন্দসী। নতুন ক'রে এই বিশ্বকে আমি গড়ে তুলবো।

যমরাজ হেসে বলে, বাতুল, I death am—there is no other God. আমার মধ্যেই তোমার বিকাশ, তোমার প্রকাশ, সেখানে সাবিত্রী নেই, সত্যবান নেই—সেই পরম নেতিত্বময় একের মধ্যে প্রেম নেই, ভালবাসা নেই, অমৃতত্ব নেই, তিনি চরম একাকী অনন্ত—আমি তারই প্রতীক।

সাবিত্রী বললে, প্রভু, তুমি ভুল করেছো, সেই নেতির মধ্যেই আছে ইতি Everlasting yes, মাতৃশক্তি সেখানেই বিকশিত। আমরা এসেছি সেই অসীম

করবার মতো মন ও মানস নিয়ে। মানুষকে বললে চলবে না আমি পারছি না, আমি পাব না, আমার জয় হবে না, আমি পৌঁছবো না সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্যে।

মানুষ যখন প্রার্থনা করে আমি মানুষ, আমাকে মানুষই থাকতে দাও তখন সে ভাবে, অতি মানুষী-কল্পনার দরকার কি। তখন সে শুধু একটি কথা ভুলে যায়, ঐ কাদা-মাটির মাঝেই তিনি আছেন—দাঁড়িয়ে আছেন তিনি গানের ওপারে নয়, এপারেই—এইখানেই আমার নন্দলালা, আমার প্রিয়, প্রিয়তর, প্রিয়তম—আমার সব—আমার পূর্ণ, আমার জীর্ণ—তাঁরই চরণচিহ্ন সব জায়গায়, তিনি এই মর্তের আবরণের মধ্যে, এই মৃত্তিকার মধ্যে এই কামকামনা লোভ লালসার মধ্যে—তারই মধ্যে লুকিয়ে আছেন তিনি, ভাগবত-বীজ সেখানেও সুপ্ত। তাকেই জানতে হবে, তাকেই জাগাতে হবে, গণ্ডিকে বাড়িয়ে দিতে হবে, কাম-কামনাকে দূরে ফেলে নয়, আপ্তকাম হয়ে, সত্যকাম হয়ে 'নবা অরে পুত্রস্য প্রীতিকামায় পুত্র প্রিয়ো ভবতি—সেই আত্মনের প্রীতির জন্য।

মাটিতে আরম্ভ সেই জীবনের, সেই জগতের, আকাশের পরমে তার শেষ 'দ্যাবাপৃথিবী আবিবেশ।' রূপান্তরিত ক'রে নাও, পরিশোধন ক'রে নাও।

সেই বিরাট প্রেমের জীবনে, পরম নামের সঙ্গে যুক্ত হতে পারলেই সেই তো পূর্ণযোগ। তখনি বলতে পারবো, প্রভু, তুমি হেরে গেলে।

এই যে প্রেম, এই যে ভালবাসা, এই যে শাশ্বতী মিলন, একে শুধু বদলে নেওয়া কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছায় স্বরূপ ক'রে নেওয়া—আমার নিজের সুখের জন্যে, দেহের ভোগের জন্যে নয়, জগদ্ধিতায় আমাদের এই যুক্ত-জীবন যুক্ত-বেণীর জন্যে।

প্রেমই হচ্ছে স্বর্গ ও পৃথিবীর সেতু, দিব্যের বাহন। সেই এক ও অনাদির কাছে মানুষের ছাড়পত্র।

যম তখনও বলে চলেছেন তুমি কি মনে করো, ঐ সত্যবানই একমাত্র মানবতার প্রতীক? কালে তুমি সত্যবানকে ভুলে যাবে। তুমি ফিরে যাও, নতুন সৃষ্টিতে মন দাও, পুত্রবতী হও কিন্তু দিব্যের সাযুজ্য চেও না, কারণ তুমি তা নও, তা পাবে না, পারবে না।

সাবিত্রী অটল, অচল, দৃঢ়। বললে, আমরা কেউ একাকী নই, আমরা সব সময়েই মিলিত—সে মিলন অনন্ত, অসীম রসলীন। তারমধ্যে মৃত্যুর অধিকার নেই, খণ্ডের বোধ নেই, নিয়তির নির্দেশ নেই।

সাবিত্রী প্রেমের সেই ঊর্ধ্বতম সুদূরতম রাজ্যে উঠে এই কথাই যমরাজকে বললেন, ঊর্ধ্বাভিমুখী যে মানুষের মন, এই যে পৃথিবী, তপ্ত ক্লান্ত, আতুর পৃথিবী তারই আমি প্রতিনিধি—আমি ফিরে চাই আমার স্বাধীনতা, সকল মুক্তিকামী মানুষের জন্যে। ফিরিয়ে দাও সত্যবানকে এ—বাণী অমোঘ বাণী।

যুধিষ্ঠিরের যষ্টি

সন্তোষকুমার ঘোষ

সেদিন সন্ধ্যায় 'কমলাকান্তের দপ্তরখানা' বেশ নিবিষ্টমনেই পড়তে শুরু করেছিলাম। আরাম-কেদারায় গা এলিয়ে দেওয়া ছিল বলেই কিনা জানি না—পড়তে পড়তে কখন একটু তন্দ্রারভাব এসেছিল। নেত্র নিমীলিত হতেই হঠাৎ বিচিত্র এক ধরণের হাসির আওয়াজ কানে এল। রঙ্গ-ব্যঙ্গের আমেজ মেশান হাসি। হাসির আওয়াজ উদারা থেকে ক্রমশঃ তারায় চড়তে লাগলো। ব্যাপার কি? বিস্ময়ে চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম! দেখলাম—অন্য কেউ নন। হাসছেন—খোদ কমলাকান্ত চক্রবর্তী-মশাই। প্রসন্ন গয়লানীর দাওয়ায় বসে হাসছেন উনি। হাতে দেখলাম—এক গাছা সেকেলে লাঠি রয়েছে। উঠানের একদিকে প্রসন্ন একমনে গাই দুইছে। তার দুধের কেঁড়ে ছাপিয়ে মৃদুমধুর দোহনধ্বনি উঠছে। তাজ্জব ব্যাপার বই কি! বিস্ময়ে হতবাক হয়ে হাঁ-করে চেয়ে রইলাম।

দুধ দুইতে দুইতে একফাঁকে প্রসন্ন দাওয়ার দিকে চেয়ে বললে—এতদিন কোন্ চুলোয় ছিল গো ঠাকুর? তোমায় আফিং আর দুধ যোগাচ্ছিল কে?

চক্রবর্তী মশায়ের চোত্ত খেউড়িকরা মুখ খানিতে আবার হসির তরঙ্গ উঠল। কোন রকম ভূমিকা না পেড়েই বললেন—সে এক ইতিহাস—বুঝলে প্রসন্ন। দেশের হালচাল দেখে মনে ভরপুর বৈরাগ্য জমেছিল—জানই তো? কাকেও না জানিয়ে তাই মহাপ্রস্থানের পথে বেরিয়ে পড়েছিলুম। বললে বিশ্বাস যাবে না—পাণ্ডুপাণ্ডবদের পায়ের জুতো—দ্রৌপদী-ঠাকরুণের হাতের সোনা দিয়ে বাঁধানো নোয়া—পথের ওপর এখনো পড়ে আছে। স্বচক্ষে সবকিছু দেখে এলুম।

প্রসন্ন মুচকে হেসে বললে—মরণ তোমার! নেশার ঘোরে কি দেখতে কী দেখেছ ঠাকুর—তার কি ঠিক আছে কিছু।

চক্রবর্তী মশাই বেশ রসাবিষ্ট হয়ে বললেন—ভুল বুঝোনা প্রসন্ন। নেশার ঘোরেই আমি সবকিছু স্পষ্ট দেখি। বিশ্বাস করো—আর একটু হলেই সশরীরে স্বর্গের সিংদরজাও পেরিয়ে যেতুম।

প্রসন্ন বিস্ময়ঘন দৃষ্টি তুলে বললে—বলো কি গো ঠাকুর।

চক্রবর্তী মশাই বললেন—হ্যাঁ, এতদিনে কল্পবৃক্ষের তলায় বসে আফিঙের তাল নিয়ে দিব্যি বড় বড় বড়ি পাকাতুম। আর দুধের জন্যে একটা কামধেনুও জুটে যেতো নিশ্চয়ই। কারও নথ-নাড়া কি মুখ-ঝামটা সইতে হতো না আর। তোফাসে দিন কেটে যেতো। কিন্তু ধর্মরাজ যম বাগড়া দিলেন।

প্রসন্ন হেসে ফেললে। সকৌতুকে বললে—তা যমমুখপোড়া বাগড়া দেবার কে শুনি? স্বর্গটা তো আর তার খাস তালুক নয়।

চক্রবর্তী মশাই বললেন—তা বললে কি হয়। আমি জলজ্যান্ত মানুষটা স্বর্গে সেঁধুবো, একটা বিপর্যয় কাণ্ড হবে তো? তাই পথ আগলে দাঁড়ালেন। দেখলুম, মহা ধড়িবাজ উনি। ভাগাবার মতলবে সোজাসুজি বললেন—বরং বৃণু।—কী বর চাও বলো?

আমি ইতস্ততঃ করছি দেখে উনি মৃদু হেসে আবার বললেন—কুবেরের ভাঁড়ার—সসাগরা মেদিনীর অধিপতির পদ—তামাম দুনিয়ার ডিক্টেটারশিপ—

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডজুড়ে একচেটে ব্যবসা—বলো, কী তোমার কাম্য বৎস ?

বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রসন্ন বললে—বলো কি গো ঠাকুর। তা কী চাইলে গো তুমি ?

চক্রবর্তীমশাই তাচ্ছিল্যব্যঞ্জক স্বর ফুটিয়ে বললেন—আরে ধ্যুৎ! ওসব ভাঁওতায় ভোলবার মত মানুষই কি না আমি। এক আধদিন নয়—পুরো তিন যুগ ধরে আফিঙের নেশা করে আসছি আমি। আমাকেও কি না ডবল করে নেশাধরাতে চান উনি! মানে, ক্যাপিট্যালিষ্ট নয়ত ইমপিরিয়্যালিষ্ট বানাতে চান। ওসবও একধরনের নেশা—বুঝলে প্রসন্ন? কথাগুলো বলেই হঠাৎ আপনমনে একটু হেসে উঠে আবার বলতে লাগলেন—আর বাবা, মাল চিনি তো! ছেলেমানুষটি পেয়ে নচিকেতাকেও ঠিক এই ভাবেই ভাগাতে চেয়েছিলেন। আফিংখোর বটে—কিন্তু এও বড় শক্ত ঠাই—হেঁ-হেঁ-হেঁ।

প্রসন্ন অল্প একটু বেঁকে উঠে বললে—তোমার আগডম বাগডম বকা রাখো ঠাকুর। কী বর চাইলে সোজাসুজি তাই বলো না ছাই।

চক্রবর্তীমশাই খেঁকিয়ে উঠে বললেন—খেলে কচু। মেয়েজাতের স্বভাবধর্ম যাবে কোথায়! গাছে না উঠতেই এক কাঁদি—হ'লে ভাল হয়। আরে বাবা, এক গল্প ইতিহাস। শুনতে গেলে একটু ধৈর্য ধরতে হবে বই কি। তা নয়—যত সব—।

আপনমনে গজগজ করতে লাগলেন উনি। স্বমেজাজে ফিরতে বেশ খানিকটা দেরি হল।

প্রসন্ন তাক বুঝে আবার বললে—তা যম মুখপোড়া শেষ পর্যন্ত খালি হাতেই ভাগিয়ে দিলে নাকি ঠাকুর?

চক্রবর্তী মশায়ের ঠোঁটের কিনারায় মৃদুহাসির তরঙ্গ উঠলো আবার। বললেন—আরে, খালি হাতে ভাগায় কার সাধ্যি। ক'লুম কি জানো? আমার আফিঙের স্টক তখন প্রায় 'বাড়ন্ত' হয়ে এসেছিল। যাই হ'ক—শেষ বড়িটিকে খুঁট থেকে বার করে চট ক'রে গলাধঃকরণ করে নিয়েই ধর্মরাজকে বললুম—কেন রসিকতা করছেন ভগবান? আপনি যা কিছু দিতে চাইছেন—সবই তো দেখছি ভুমার ব্যাপার। কোনটাই এ গরীব ব্রাহ্মণের ধাতে সইবেনা। দোহাই আপনার। দয়া করে ওসব ভুমার লোভ দেখাবেন না। আমার ধ্যান-জ্ঞান-জপ-তপ সবই স্বদেশকে নিয়ে। স্বদেশ ছাড়া আর কিছুই বুঝি না আমি। আমার স্বদেশটি খাঁটি স্বর্গ হয়ে উঠুক—এই আমার একমাত্র কাম্য।

প্রসন্ন সঙ্গে সঙ্গে নথ ঝামটা দিয়ে বলে উঠলো—'দেশ-দেশ' করে হাসলে মরা চিরকেলে বাতিক তোমার। তা ভালই হয়েছে—সাধ মিটেছে তো ঠাকুর?

চক্রবর্তী মশাই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বললেন—কচু! এক কথায় 'তথাস্তু' বলবেন—ধর্মরাজ সেই মালই কি না! মাথা নেড়ে কী বললেন জানো? বললেন——তা হয় না বৎস। দ্বিতীয় স্বর্গ-বানাতে গেলে—আবার আর এক প্রস্থ নন্দন কানন, কল্পবৃক্ষ, বৈজয়ন্ত-প্যালেস ইত্যাদি চাই। আর এক সেট মেনকা-রম্ভা-ঘৃতাচীরও দরকার হবে। সে মহা হাঙ্গামার ব্যাপার। তাছাড়া—বয়েসের মহিমায় পিতামহ প্রজাপতির ইদানীং ভীমরতির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। মগজেও ঘুণ ধরেছে। ক্লাসিকগোছের কিছু সৃষ্টি করবার মত হিম্মৎ-সামর্থ্য নেই আর তাঁর। না, এ একেবারে অসম্ভব। দ্বিতীয় স্বর্গের আশা ছেড়ে দিয়ে তুমি অন্য কোন বর চাও বৎস।

প্রসন্ন উৎকর্ণ হয়ে উঠলো। চক্রবর্তীমশাই বলতে লাগলেন—বুঝলাম, কিছু নয়। পরীক্ষা করছেন উনি। আমিও ছাড়বার পাত্র নই—বুঝলে প্রসন্ন? চাহিদার একটু হেরফের করে বললুম—আমার স্বদেশটিকে দ্বিতীয় স্বর্গ করে তোলা যদি একান্তই অসম্ভব হয়—তা হ'লে এই করুন ভগবান—আমার দেশবাসীরা যেন বিলকুল দেবতা হয়ে ওঠে।

প্রসন্ন সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে বললে—আমরা যে যেখানে আছি—গয়লা, নাপতে, মুচি, ডোম—সবাই দেবতা হয়ে যাবো! বলো কি গো ঠাকুর!

চক্রবর্তীমশাই আবার খেঁকিয়ে উঠে বললেন—খেলে কচু! কথায় বাধে অমন বাগড়া দাও কেন

বলতো? সবটা শোনো না ছাই আগে। মন্তব্য যা করবার পরে কোরো।

আপন মনে আবার খানিকক্ষণ গজগজ করলেন উনি। প্রসন্ন কিন্তু দমবার পাত্রী নয়। একটু পরেই তাক বুঝে বললে—তা যমমুখপোড়া তোমায় ওই বরই দিয়েছে তো?

চক্রবর্তীমশাই তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বললেন—কচু! ধর্মরাজ কি কম ঝানু! ঠিক আমাশয়ের রুগীর মত মুখ চোখের ভাব করে বললেন—তাও অসম্ভব বৎস। দেবতা হওয়া—মানে অমৃতের অধিকারী হওয়া। তোমার দেশের পঞ্চাশ কোটি আন্দাজ লোককে অমৃত খাওয়াতে গেলে—নতুন করে আবার সমুদ্রমন্থনের ব্যবস্থা করতে হয়। মাই গড্! সে আরও হাঙ্গামার ব্যাপার। তাছাড়া আমরা আসল দেবতারা তা হ'লে মাইনরিটি হয়ে যাবো। সেও কম ফেসাদের ব্যাপার নয়! না—না তুমি অন্য কোন বর চাও বৎস।

প্রসন্ন যেন সম্মোহিত হয়ে শুনছিল। তার কেঁড়ে ছাপিয়ে দুধ গড়িয়ে পড়বার উপক্রম হ'ল। সেদিকে লক্ষ্যই নেই। চক্রবর্তীমশাই বলতে লাগলেন—বার বার নেতিবাচক উক্তি শুনে মন-মেজাজে পুরোপুরি আগুন ধরে গিয়েছিল—বুঝলে প্রসন্ন? কিন্তু আমার কাজ হাসিল করা নিয়ে বিষয়। কি আর ক'রি। আবেগের উচ্ছ্বাসকে দেহভাণ্ডের মধ্যে কোন রকমে দেবে রেখে একটু হালকাগোছের চাহিদা পেশ করলুম। ভক্তিভরে বললুম কিছু না পারেন আসমুদ্রহিমাচল তামাম দেশটাকে তা হ'লে খাঁটি মহামানবে ভরিয়ে দিন। তাতেও কাজ হবে প্রভু।

ধর্মরাজ তা শুনে একেবারে রসরাজের মত হেসে উঠে গা জল করে ছেড়ে দিলেন। বললেন তুমি তো দেখছি গোঁড়া স্বদেশভক্ত হে। ছিনে জোঁকও তোমার কাছে হার মানে। তোমার বুদ্ধিরও তারিফ করি বৎস। কিন্তু যা চাইছ তা যে মাস-প্রোডাকশনের ব্যাপার। হাজার বছর ধরে বিশ্বসংসার চুঁড়লে বড় জোর একটি কি দুটি মহামানব গড়বার মত খাঁটি উপাদান মেলে। ইচ্ছে করলেই চট করে পাইকিরী হারে মহামানব বানানো যায় কি? না না বৎস ওসব ক্লাসিক্যাল বায়না ছেড়ে হালকা গোছের কিছু চাও বৎস।

প্রসন্ন কোল থেকে দুধের কেঁড়ে নামিয়ে রেখে বললে, বরাতে নেইকো ঘি, ঠকঠকালে হবে কি।

চক্রবর্তীমশাই খেঁকিয়ে উঠে সঙ্গে সঙ্গে বললেন মাইরি আর কি! আমিও ছাড়বার পাত্র কিনা! যেমন বুনো ওল উনি আমিও তেমনি বাঘা তেঁতুল। আমারও নেশাখোরের গোঁ। শেষটায় করলুম কি জানো প্রসন্ন? ঝপ করে স্বর্গের সিংদরজার সামনেই পদ্মাসন করে বসে পড়লুম। সঙ্গে সঙ্গে গোঁভরে বললুম ভগবন্, হাজার বছরই লাগুক আর লক্ষ বছরই লাগুক আমার মনস্কাম সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত আমি আর জলগ্রহণ করবো না। ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং ত্বগস্থিমাংসঞ্চ প্রলয়ং যাতু।

প্রসন্ন আবার হেসে ফেলে বললে, তুমি কম ঘিটলে নও তো ঠাকুর! তা এরপর যমমুখপোড়া কি করলে গো?

চক্রবর্তীমশাই হেসে উত্তমাঙ্গ দুলিয়ে দুলিয়ে বললেন, ওই অনশন সত্যাগ্রহের ঠেলাতেই কল ফললো বুঝলে প্রসন্ন। ধর্মরাজ করলেন কি জানো? সিংদরজার একপাশে বেওয়ারিশ একগাছা লাঠি পড়েছিল। ধুলো মাটি অর্থাৎ স্বর্গীয় রজঃ ইত্যাদির প্রলেপ পড়ে পড়ে লাঠিখানা প্রায় ফসিলের সামিলই হয়ে গিয়েছিল। ঝট করে ধর্মরাজ সেই লাঠিখানিকে কুড়িয়ে নিয়ে আমার সামনে তুলে ধরলেন। মৃদু হেসে বরদভঙ্গীতে বললেন, ধরো বৎস, ভক্তিভরে হাত পাতো দেখি। এতেই তোমার মনস্কাম সিদ্ধ হবে।

হাত না বাড়িয়ে ভ্যাবাকান্তের মত ক্যাল ক্যাল করে তাকিয়ে রইলুম ওঁর দিকে। ভাবলুম কিছু নয়, লাঠিখানাকে হাতে গছিয়ে দিয়ে ভাগাতে চান উনি। ফাঁকি দেবার এ বিচিত্র স্বর্গীয় ব্যবস্থাই বটে!

আমার ইতস্ততঃ ভাব দেখে ধর্মরাজ মৃদু হেসে বললেন, সন্দিগ্ধচিত্ত হ'লে কিন্তু ঠকবে বৎস। এটিকে সাধারণ লাঠি বলে ভেবো না। সত্যাচারের দণ্ড এটি। যুধিষ্ঠির বাবাজী শুধু এই লাঠিখানিকে অবলম্বন করেই

দুর্গম পথ পেরিয়ে সশরীরে স্বর্গে এসেছিল। স্বর্গে ঢোকবার আগে মর্ত্যের এই মহা সম্পদটিকে সিংহদ্বারের সামনে ফেলে রেখে গেছে। খাঁটিমানুষ ছাড়া এর দিব্য-দ্যুতি কারও নজরে ঠেকবে না। ভক্তিভরে দণ্ডটিকে বাগিয়ে ধরতে পারলে দুদিনেই তোমার স্বদেশের চেহারা পালটে যাবে।

চকিতের মধ্যে মনটা কেমন যেন তরল হয়ে গেল প্রসন্ন। ভক্তিভরে লাঠিখানাকে বাগিয়ে ধরে খানিকটা কৃতার্থ হওয়া ভাব দেখালুম। একছিটে বনেদী হাসি হেসে ধর্মরাজ সামনে থেকে সরে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে ঝনাৎ করে স্বর্গের সিংহদ্বারও বন্ধ হয়ে গেল।

প্রসন্ন নথ নেড়ে মুখ ঝামটা দিয়ে বললে, পোড়া কপাল। তবে আর আফিংখোর বলেছে কেন! এত বর থাকতে—শেষকালে কিনা ধুলোমাটি মাখানো সেকেলে লাঠিখানাকে হাত পেতে নিলে! তুমি কি গো ঠাকুর?

চক্রবর্তীমশাই খেঁকিয়ে উঠে বললেন, নেব না কেন শুনি? তুমি ভেবো গয়লার মেয়ে। তিন পো জলে এক পো দুধ মিশিয়ে তাকে খাঁটি বলে চালানই তোমার পেশা। তুমি এ লাঠির মহিমা বুঝবে কি শুনি?

প্রসন্ন দুধের কেঁড়ে নিয়ে দাওয়ায় উঠতে উঠতে বললে, তা নিয়েছ বেশ করেছ। তোমার চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হবে ওতে। এখন লাঠি ধুয়ে ধুয়ে জল খাও আর "স্বদেশ স্বদেশ' করে হামলে মরো।

চক্রবর্তীমশাই লাঠিখানা নিয়ে উঠে পড়তে যাচ্ছিলেন। প্রসন্ন হঠাৎ যেন একটু রসোচ্ছল হয়ে বললে কিন্তু লাঠিখানাকে হাতে দেবার সময় যম মুখ পোড়া তোমার ছুঁয়ে ফেলে নিতো ঠাকুর! তুমি আর তা হলে সে মানুষ নেই! নিশ্চয়ই খাঁটি ভূত হয়ে ফিরে এসেছ।

চক্রবর্তীমশাই ঝেঁজে উঠে বললেন, মাইরি আর কি! আমি ব্রাহ্মণসন্তান। গলায় তিনদণ্ডীর পৈতে রয়েছে। ধর্মরাজের সাধ্যি কি ছুঁয়ে আমাকে ভূত বানিয়ে দেন!

প্রসন্ন হাসতে হাসতে বললে, ভূত না হয়ে থাকো ঠাকুর—দিব্যি ভূতুড়ে মতিগতি হয়েছে দেখছি তোমার। না হলে—পেয়েছো তো ছাই ঘুণধরা আর হাতাপড়া একখানা সেকেলে লাঠি। অমন জিনিষ বনে-বাদাড়ে বাঁশঝাড়ে গণ্ডাগণ্ডা মেলে। তাই পেয়েই খুশিতে ডগমগ করছো।

এবার চক্রবর্তীমশাইয়ের বিরক্তিব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর শোনা গেল। বললেন, যে সে লাঠি ভেবে এটাকে 'দূর ছাই' করো না প্রসন্ন। ভাল হবে না বলে দিচ্ছি। সত্য-যুগের দণ্ড এটি। খাঁটি মহাভারতীয় সম্পদ। ব'লে লাঠিখানাকে তুলে একবার মাথায় ঠেকিয়ে আবার বললেন—এর দিব্য-দ্যুতি এখন ধুলোমাটিতে চাপা পড়ে আছে। দেশের লোক এর যথাযোগ্য মর্যাদা দিলে দেখবে এর জ্যোতিচ্ছটা ফুটে বেরুবে। আমার স্বদেশও দুদিনে স্বর্গ হয়ে উঠবে।

প্রসন্ন মুচকে হেসে বললে তাই না হয় হ'ল। কিন্তু তুমি তো আফিংখোর মানুষ। মৌতাত করতে করতেই তো দিনরাত কাবার হয়ে যায়। ও লাঠি নিয়ে তুমি কি করবে শুনি?

চক্রবর্তীমশাই হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। খানিক পরে বললেন—তাই তো মহাভাবনায় পড়েছি প্রসন্ন। লাঠিখানাকে কার হাতে তুলে দিই বলো দেখি? ভেবেছিলুম—দেশের জনগণমন অধিনায়ক যিনি—তাঁর হাতেই লাঠিখানাকে দিয়ে কৃতার্থ হবো। হরে রাম! তামাম দেশ ঘুরে ঘুরে তাঁর টিকিটি দেখতে পেলুম না। শুনলুম—তিনি নাকি এখন টুকরো টুকরো হয়ে বিশগণ্ডা দলের মধ্যে ভিড়ে গেছেন। ভাবলুম—দূর ছাই! দেশের দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা যাঁরা এখন—তাঁদের হাতেই না হয় লাঠিখানা তুলে দিই।—তাতেও কাজ হবে। বিধাতার দল বেশ ভক্তিভরেই লাঠিখানাকে হাতপেতে নিলেন। কিছুক্ষণের জন্যে নেড়ে চেড়ে দেখে কী বললেন জানো? বললেন—এ তো মশাই ফসিলেরই সামিল। মান্ধাতার যুগে এর ব্যবহার চলতো বটে—এ যুগে কিন্তু এলাঠি অচল। বলেন তো—এটাকে আমরা যাদুঘরে পাঠিয়ে দিতে পারি। শো-কেসের মধ্যে তুলে রাখবার মত জিনিষ এটি। লাঠিটাকে যাদুঘরে পাঠিয়ে দিতে চায় শুনেই মেজাজে যেন আগুন ধরে গেল প্রসন্ন। 'দ্যুৎ তোর'—বলে লাঠিখানাকে

:কেরত নিয়ে আবার পথে পা বাড়ালুম। চলতে চলতে হঠাৎ খেয়াল হ'ল—আরে, দেশের তরুণ-জোয়ানরাই :তো দেশের আশা ভরসা। লাঠিখানাকে না হয় তাদের হাতেই তুলে দেবো। কিন্তু আফসোসের কথা কি জানো প্রসন্ন? দেশের সেই মেরুদণ্ডওলা তরুণদেরও পাত্তা মিললো না। কোথাও দেখলুম—তামাম দেশ বালখিল্যের দলে ভরে গেছে। চোঙাপ্যাণ্ট আর হাওয়াই-সার্টপরা বালখিল্যরা পথে-ঘাটে মস্তানি করে বেড়াচ্ছে আর ভুতুড়ে নাচ নাচছে। শুনলুম—স্বাধীনতা পাওয়ার পর থেকেই দেশের আবহাওয়া একেবারে ডিগবাজি খেয়ে গেছে সেই সঙ্গে তরুণ জোয়ানরাও নাকি বিলকুল বালখিল্যের আকার পেয়েছে। এ লাঠি এখন কাদের হাতে দিই বলো দেখি।

কথাগুলো বলতে বলতে চক্রবর্তীমশাই বেশ খানিকটা চিন্তাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বলে উঠলেন—হায়, এ জলতরঙ্গ রোধিবে কে! হরে মুরারে!

আমি নেপথ্যের মানুষ। দর্শক এবং শ্রোতা। স্থাণুর মত স্থির হয়ে প্রসন্ন-কমলাকান্তকথা উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলাম। কিন্তু চক্রবর্তীমশায়ের চিন্তান্বিতভাব দেখে আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না। সেই মুহূর্তেই চক্রবর্তীমশাইয়ের সামনে এগিয়ে গিয়ে হাত পেতে নিতান্ত আগ্রহভরে বললাম—আমি আপনার স্বদেশেরই সন্তান। সনাতন ভারতের প্রতিভূ। মহাভারতীয় ওই সম্পদটির ধারক আর বাহক হতে চাই আমি। দণ্ডটিকে আমার হাতেই দিন চক্রবর্তীমশাই।

চক্রবর্তীমশাই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে আমার আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ করলেন। জলদগম্ভীর কণ্ঠে বললেন—এই মহাদণ্ডের ধারক আর বাহক হতে চাও তুমি? কিন্তু তোমার পণ কি?

মন্ত্রচালিতের মত বললাম—পণ আমার জীবনসর্ব্বস্ব। চক্রবর্তীমশাই গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—জীবন তুচ্ছ; সকলেই ত্যাগ করতে পারে।

বিস্ময়বিহ্বল কণ্ঠে বললাম—কিন্তু আমার আর কি আছে? আর কি দিতে পারি!

চক্রবর্তীমশাই হঠাৎ আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন। বললেন—ভক্তি! ভক্তি!

প্রসন্ন মাঝ থেকে ফোড়ন দিলে। সেও প্রায় সমানপাল্লায় চেঁচিয়ে উঠে বললে--নেশাখোরের মরণ! অমন করে চিল্লে মরছো কেন? কে তোমার ওই লাঠি পাবার জন্যে 'হা পিত্যেশ' হয়ে বসে আছে শুনি?

আবার সেই হাসি। হাসির আওয়াজ উদারা থেকে ক্রমশঃ তারায় চড়তে লাগলো। শব্দের দাপটেই সম্ভবতঃ আমার তন্দ্রার ঘোরটাও কেটে গেল। চর্মচক্ষু উন্মোচন করলাম। হরি! হরি! কোথায় বা প্রসন্ন গয়লানীর দাওয়া—আর কোথায় বা কমলাকান্ত চক্রবর্তী মশায়ের হাসি! বাড়ীর পাশেই বাঁশবন। দেখি হুয়া—কা—হুয়া রব তুলে শিয়ালের দল সেখানে কোরাসে চেঁচাচ্ছে।

সমষ্টি ও ব্যক্তিজীবন

সমর বসু

[শ্রীঅরবিন্দের "The Ideal of Human Unity" গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় অবলম্বনে।]

...The true law of our development and the entire object of our social existence can only become clear to us when we have discovered not only like modern science, what man has been in his past physical and vital evolution, but his future mental and spiritual destiny and his place in the cycles of Nature. Sri Aurobindo.

ব্যষ্টিবাদ (Individualism) এবং গোষ্ঠীবাদের collectivism তত্ত্বকে অবলম্বন করে আমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুইটি মতবাদ গড়ে উঠেছে। কেউ ব্যষ্টিকে প্রাধান্য দেন, কেউ বা গোষ্ঠীকে। কেউ চান রাষ্ট্রের সর্ব্বগ্রাসী কর্তৃত্বের সাহায্যে রাষ্ট্রের চরম উৎকর্ষ ও উন্নতিসাধন করতে। কেউ আবার চান ব্যষ্টির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। যার সাহায্যে ব্যক্তি আপনার উৎকর্ষ সাধন করে পরিপূর্ণতা অর্জন করিতে সক্ষম হবে। আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে এই যে-বিরোধ এর উৎস কোথায়? কেন এই বিরোধ?

এই বিরোধের গূঢ় রহস্য প্রকৃতির (Nature) চিরন্তন কর্মপদ্ধতির মধ্যেই নিহিত। প্রকৃতির এই কর্মধারার গতিপ্রকৃতিকে সম্যকভাবে অনুধাবন না করিতে পারলে চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে এই পারস্পরিক বিরোধের রহস্যটিকেও উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হবে না।

প্রকৃতির কর্মধারার মূল লক্ষ্য হ'ল সমন্বয়সাধন। কিন্তু এই সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে তাকেও বিরোধের পথে চলতে হয় কিছুকাল। সমন্বয়ের দুইটি দিগকে প্রকৃতি যখন সম্মিলনের ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হয় তখন সে ঐ দুইটি দিকের মধ্যে তারতম্য রক্ষা করার জন্ত এক বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করে। কখনও সে একটির দি কখনও বা অপরটির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এবং পরিশে উভয়দিকেরই মাত্রাধিক্য সংশোধনের চেষ্টা কর প্রকৃতি যখন এইভাবে কাজ করে চলে তখন আপা বিচারে মনে হয় সমন্বয়ের ঐ দুইটি দিক বুঝি পরস্প বিরোধী। Thesis এর সঙ্গে antithesis এর সংঘর্ষ synthesis মধ্যে সম্মিলিত হবার জন্তে। বাইরের দ্বন্দ্ব-সংঘাত তা'চিরকালের নয় বলেই, তা সত্য ন সত্য হল সমন্বয় বা harmony, সুতরাং আমাদের অস্তিত্বের যা সমস্যা তা সংঘর্ষের নয়, সে-সম সমন্বয়ের।...All problems of existence are ess tially Problems of harmony—Sri Aurobind Life Devine. এই দ্বন্দ্ববাদের উপর ভিত্তি ক পশ্চিমের মনীষীরা যে-জড়বাদী দর্শন গড়ে তুলেছেন সাহায্যে মানুষের বাইরের জীবনের (Surfa life) সমস্যার সাময়িক সমাধান সম্ভব হলেও, যেহেতু দর্শন মানুষের অন্তপ্রর্কৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন সক্ষম নয় হেতু সে-দর্শনের প্রয়োগে ব্যষ্টি কিংবা গোষ্ঠী জী সামুহিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

সমন্বয়ের দুইটি দিক পারস্পরিক সংঘর্ষের আবর্তিত হতে হতে এমন একটি অবস্থায় এসে যখন তারা চায় বিরোধের সমাপ্তি। কিন্তু T এর প্রবক্তা যারা তাদের যেমন, ঠিক তেমনি anti এর ধ্বজাধারীদেরও আছে একটা অহমিকা এবং সেই হেতু সম্মিলনের প্রয়োজন যখন দেখ তখন আত্মসংরক্ষণের দিকে উভয়েরই প্রবল ঝোঁ গোপন থাকেনা। তারা উভয়েই চায় স মধ্যে তাদের ভাবনাগুলোর বেশী অংশটি যেন ব'লে স্বীকৃতি পায়। সাধ্যমত শক্তির অনুপাতে

উভয়েই চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা। এইভাবেই পারস্পরিক সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন সমাজভাবনা সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

যদিও এই অগ্রগতি মনে হয় আপনা থেকেই সম্মিলনের উদ্দেশে ধেয়ে চলেছে তবুও অনেক সময় পারস্পরিক সমঝোতার মধ্যে এই অগ্রগতির পরিসমাপ্তি ঘটে না। সে-ক্ষেত্রে একে অপরকে গ্রাস করে। প্রকৃতপক্ষে এই আত্মসাৎ একে অপরকে করে না। প্রত্যেকে প্রত্যেককে আত্মসাৎ করে যাতে উভয়েই উভয়ের মধ্যে জীবনধারণ করে অপরের অপরত্বটুকু সম্পূর্ণ আহরণ করতে পারে। নিজের নিজত্বটুকু হারিয়ে কিংবা নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে। এই হল পূর্ণ 'একত্বে'র চরম আদর্শ; এবং প্রেমের পরম লক্ষ্য। দ্বন্দ্ববাদের পথ বেয়ে দুটি পরস্পরবিরোধী দাবী এই লক্ষ্যেই পৌঁছবার জন্যে প্রয়াসী হয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কেননা ঐ পথ এই লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছোয়নি। দ্বন্দ্ববাদের মধ্যে দুটি পরস্পর-বিরোধী দাবী মিলে মিশে Identity হারিয়ে এক হয়ে যেতে পারে না, তাই তাদের মধ্যে একটা আপোস মীমাংসা হতে পারে, গড়ে তোলা যেতে পারে একটি আপাত মিতালী, কিন্তু স্থায়ী সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। তবুও দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্য দিয়েই দুটি দাবী পরস্পরকে বুঝতে সাহায্য করে এবং পরিণামে প্রকৃত একত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তোলে।

ব্যক্তিবাদ ও গোষ্ঠীবাদের মধ্যে যে বিরোধ, সেখানেও প্রকৃতির এই চিরন্তন লীলা ক্রিয়াশীল। ব্যক্তির গোষ্ঠীগত পরিচয় হল রাষ্ট্র। সুতরাং বিরোধ রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের। রাষ্ট্রগত আদর্শের (State idea) সঙ্গে মানবীয় আদর্শের (human idea) রাষ্ট্র যত বৃহৎ কিংবা ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট হোক না কেন, একটা জীবন্ত যন্ত্রছাড়া আর কিছু নয়, অপর দিকে মানুষ হল ক্রমস্ফুটমান জ্যোতির্ময় পুরুষ—বর্ধিষ্ণু ভগবান। গোষ্ঠীবদ্ধ যে-ব্যক্তি সমষ্টিকে আজকে রাষ্ট্র বলা হয়, অতীতে তার নাম ছিল অন্য। তখন তাকে বলা হত পরিবার। তারপর এল কুল, বংশ—এখন হয়েছে Nation অথবা State, আগামী কাল কিংবা পরশু সমগ্র মানব-জাতির মধ্যেই মিলবে তার পরিচিতি। তবুও ব্যক্তিমানুষ ও সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে, অর্থাৎ আত্ম-মুক্তিকামী পুরুষ [ব্যক্তি] এবং সর্বগ্রাসী গোষ্ঠীর মধ্যে এই দ্বন্দ্বের সমস্যাটি সবসময় থেকেই যাবে।

প্রসঙ্গত: উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানবজাতির সমস্যার স্বরূপ ও তার সমাধান নির্দ্ধারণের জন্য মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় তার নাম সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী (Socialistic angle of vision। বুদ্ধিবাদী মানুষের মতে এই দৃষ্টিভঙ্গী যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সেই হেতু গ্রহনীয়; কিন্তু এ-ছাড়া যে আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী আছে যার সাহায্যে মানবপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন সম্ভব, সেই ভাববাদী [Idealistic] বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। কেননা মানুষ কেবলমাত্র দেহ ও প্রাণের অধিকারী নয়, পরন্তু সে মনোময়, ভবিষ্যতে সে হবে অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন পুরুষ। সুতরাং ভবিষ্যতের পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান মানুষকে বিচার করতে হবে। জড়জীবনের রহস্য সন্ধানে যে-বিজ্ঞান পারঙ্গম তার সাহায্যে যদি মানব জীবন ও অধ্যাত্মজীবনের রহস্য নিরূপণ সম্ভব না হ তাহলে মানুষের সমস্যার বিশ্লেষণে সেই বিজ্ঞানকে প্রয়োগ করা কি যুক্তিসম্মত ?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমাজ-সংগঠন নিয়ে যাঁ চিন্তা করেন তাঁরা ভাববাদী তত্ত্বকে কোনও স্বীকৃ দেন না, মূল্য দেওয়া তো দূরের কথা। মানবজা ক্রমবিকাশের গতি-প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করতে শ্রীঅরবিন্দ ঐ দুটি দৃষ্টিভঙ্গীরই সাহায্য নিয়েছেন, পরিণামে দেখিয়েছেন কোন পথ অবলম্বন করলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

সমাজ বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের কাছ থেকে জেনেছি মানুষ তার জীবনের আদিপর্ব থেকেই গো হয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিল। সেই কাছে ব্যক্তি-মানুষ ছিল সেবকের মত। গোষ্ঠী রাখা, গোষ্ঠীর সেবায় আত্মনিয়োগ করাই ছিল

সমষ্টি ও ব্যক্তিজীবন

সমর বসু

[শ্রীঅরবিন্দের "The Ideal of Human Unity" গ্রন্থের তৃতীয় অধ্যায় অবলম্বনে।]

···The true law of our development and the entire object of our social existence can only become clear to us when we have discovered not only like modern science, what man has been in his past physical and vital evolution, but his future mental and spiritual destiny and his plaze in the cycles of Nature. Sri Aurobindo.

ব্যষ্টিবাদ (Individualism) এবং গোষ্ঠীবাদের collectivism তত্ত্বকে অবলম্বন করে আমাদের মধ্যে পরস্পর বিরোধী দুইটি মতবাদ গড়ে উঠেছে। কেউ ব্যষ্টিকে প্রাধান্য দেন, কেউ বা গোষ্ঠীকে। কেউ চান রাষ্ট্রের সর্ব্বগ্রাসী কর্তৃত্বের সাহায্যে রাষ্ট্রের চরম উৎকর্ষ ও উন্নতিসাধন করতে। কেউ আবার চান ব্যষ্টির পরিপূর্ণ স্বাধীনতা। যার সাহায্যে ব্যক্তি আপনার উৎকর্ষ সাধন করে পরিপূর্ণতা অর্জন করিতে সক্ষম হবে। আমাদের চিন্তার ক্ষেত্রে এই যে-বিরোধ এর উৎস কোথায়? কেন এই বিরোধ?

এই বিরোধের গূঢ় রহস্য প্রকৃতির (Nature) চিরন্তন কর্মপদ্ধতির মধ্যেই নিহিত। প্রকৃতির এই কর্মধারার গতিপ্রকৃতিকে সম্যকভাবে অনুধাবন না করিতে পারলে চিন্তার ক্ষেত্রে মানুষের মধ্যে এই পারস্পরিক বিরোধের রহস্যটিকেও উদ্ঘাটন করা সম্ভব হবে না।

প্রকৃতির কর্মধারার মূল লক্ষ্য হ'ল সমন্বয়সাধন। কিন্তু এই সমন্বয় ঘটাতে গিয়ে তাকেও বিরোধের পথে চলতে হয় কিছুকাল। সমন্বয়ের দুইটি দিগকে প্রকৃতি যখন সম্মিলনের ক্ষেত্রে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হয় তখন সে ঐ দুইটি দিকের মধ্যে তারতম্য রক্ষা করার জন্ত এক বিচিত্র কৌশল অবলম্বন করে। কখনও সে একটির দিকে কখনও বা অপরটির দিকে ঝুঁকে পড়ে। এবং পরিশেষে উভয়দিকেরই মাত্রাধিক্য সংশোধনের চেষ্টা করে। প্রকৃতি যখন এইভাবে কাজ করে চলে তখন আপাতবিচারে মনে হয় সমন্বয়ের ঐ দুইটি দিক বুঝি পরস্পরবিরোধী। Thesis এর সঙ্গে antithesis এর সংঘর্ষ শুধু synthesis মধ্যে সম্মিলিত হবার জন্যে। বাইরের যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত তা' চিরকালের নয় বলেই, তা সত্য নয়। সত্য হল সমন্বয় বা harmony, সুতরাং আমাদের এই অস্তিত্বের যা সমস্যা তা সংঘর্ষের নয়, সে-সমস্যা সমন্বয়ের।...All problems of existence are essentially Problems of harmony—Sri Aurobindo—Life Devine. এই দ্বন্দ্ববাদের উপর ভিত্তি ক'রে পশ্চিমের মনীষীরা যে-জড়বাদী দর্শন গড়ে তুলেছেন তার সাহায্যে মানুষের বাইরের জীবনের (Surface life) সমস্যার সাময়িক সমাধান সম্ভব হলেও, যেহেতু সে-দর্শন মানুষের অন্তর্প্রকৃতির রহস্য উদ্ঘাটন সক্ষম নয় সেই হেতু সে-দর্শনের প্রয়োগে ব্যষ্টি কিংবা গোষ্ঠী জীবনের সামূহিক সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়।

সমন্বয়ের দুইটি দিক পারস্পরিক সংঘর্ষের মধ্যে আবর্তিত হতে হতে এমন একটি অবস্থায় এসে পড়ে যখন তারা চায় বিরোধের সমাপ্তি। কিন্তু Thesis-এর প্রবক্তা যারা তাদের যেমন, ঠিক তেমনি anti thesis এর ধ্বজাধারীদেরও আছে একটা অহমিকাবোধ। এবং সেই হেতু সম্মিলনের প্রয়োজন যখন দেখা দেয় তখন আত্মসংরক্ষণের দিকে উভয়েরই প্রবল ঝোঁক আর গোপন থাকেনা। তারা উভয়েই চায় সম্মিলনের মধ্যে তাদের ভাবনাগুলোর বেশী অংশটি যেন কার্যকর ব'লে স্বীকৃতি পায়। সাধ্যমত শক্তির অনুপাতে তারা

উভয়েই চায় আত্মপ্রতিষ্ঠা। এইভাবেই পারস্পরিক সংঘর্ষের ভেতর দিয়ে বিভিন্ন সমাজভাবনা সমন্বয় ও সামঞ্জস্যের দিকে এগিয়ে চলেছে।

যদিও এই অগ্রগতি মনে হয় আপনা থেকেই সম্মিলনের উদ্দেশে ধেয়ে চলেছে তবুও অনেক সময় পারস্পরিক সমঝোতার মধ্যে এই অগ্রগতির পরিসমাপ্তি ঘটে না। সে-ক্ষেত্রে একে অপরকে গ্রাস করে। প্রকৃতপক্ষে এই আত্মসাৎ একে অপরকে করে না। প্রত্যেকে প্রত্যেককে আত্মসাৎ করে যাতে উভয়েই উভয়ের মধ্যে জীবনধারণ করে অপরের অপরত্বটুকু সম্পূর্ণ আহরণ করতে পারে। নিজের নিজত্বটুকু হারিয়ে কিংবা নিঃশেষে বিলিয়ে দিয়ে। এই হল পূর্ণ 'একত্বে'র চরম আদর্শ; এবং প্রেমের পরম লক্ষ্য। দ্বন্দ্ববাদের পথ বেয়ে দুটি পরস্পরবিরোধী দাবী এই লক্ষ্যেই পৌঁছবার জন্যে প্রয়াসী হয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়। কিন্তু তা সম্ভব নয়, কেননা ঐ পথ এই লক্ষ্যে গিয়ে পৌঁছোয়নি। দ্বন্দ্ববাদের মধ্যে দুটি পরস্পর-বিরোধী দাবী মিলে মিশে Identity হারিয়ে এক হয়ে যেতে পারে না, তাই তাদের মধ্যে একটা আপোস মীমাংসা হতে পারে, গড়ে তোলা যেতে পারে একটি আপাত মিতালী, কিন্তু স্থায়ী সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব নয়। তবুও দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্য দিয়েই দুটি দাবী পরস্পরকে বুঝতে সাহায্য করে এবং পরিণামে প্রকৃত একত্বের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করে তোলে।

ব্যক্তিবাদ ও গোষ্ঠীবাদের মধ্যে যে বিরোধ, সেখানেও প্রকৃতির এই চিরন্তন লীলা ক্রিয়াশীল। ব্যক্তির গোষ্ঠীগত পরিচয় হল রাষ্ট্র। সুতরাং বিরোধ রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্যক্তি মানুষের। রাষ্ট্রগত আদর্শের (State idea) সঙ্গে মানবীয় আদর্শের (human idea) রাষ্ট্র যত বৃহৎ কিংবা ক্ষুদ্র আয়তনবিশিষ্ট হোক না কেন, একটা জীবন্ত যন্ত্রছাড়া আর কিছু নয়, অপর দিকে মানুষ হল ক্রমস্ফুটমান জ্যোতির্ময় পুরুষ—বর্ধিষ্ণু ভগবান। গোষ্ঠীবদ্ধ যে-ব্যক্তি সমষ্টিকে আজকে রাষ্ট্র বলা হয়, অতীতে তার নাম ছিল গোষ্ঠী। তখন তাকে বলা হত Nation অথবা State, আগামী কাল কিংবা পরশু সমগ্র মানব-জাতির মধ্যেই মিলবে তার পরিচিতি। তবুও ব্যক্তিমানুষ ও সমগ্র মনুষ্যজাতির মধ্যে, অর্থাৎ আত্ম-মুক্তিকামী পুরুষ [ব্যক্তি] এবং সর্বগ্রাসী গোষ্ঠীর মধ্যে এই দ্বন্দ্বের সমস্যাটি সবসময় থেকেই যাবে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মানবজাতির সমস্যার স্বরূপ ও তার সমাধান নির্দ্ধারণের জন্য মানব-সভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাসকে যে দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হয় তার নাম সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী (Socialistic angle of vision। বুদ্ধিবাদী মানুষের মতে এই দৃষ্টিভঙ্গী যেহেতু আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সেই হেতু গ্রহণীয়; কিন্তু এ-ছাড়া যে আর একটি দৃষ্টিভঙ্গী আছে যার সাহায্যে মানবপ্রকৃতির রহস্য উদ্‌ঘাটন সম্ভব, সেই ভাববাদী [Idealistic] বিচার বিশ্লেষণের প্রয়োজনও অনস্বীকার্য। কেননা মানুষ কেবলমাত্র দেহ ও প্রাণের অধিকারী নয়, পরন্তু সে মনোময়, ভবিষ্যতে সে হবে অধ্যাত্মচেতনাসম্পন্ন পুরুষ। সুতরাং ভবিষ্যতের পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখেই বর্তমান মানুষকে বিচার করতে হবে। জড়জীবনের রহস্য সন্ধানে যে-বিজ্ঞান পারঙ্গম তার সাহায্যে যদি মানব-জীবন ও অধ্যাত্মজীবনের রহস্য নিরূপণ সম্ভব না হয়, তাহলে মানুষের সমস্যার বিশ্লেষণে সেই বিজ্ঞানকেই প্রয়োগ করা কি যুক্তিসম্মত?

কিন্তু দুঃখের বিষয়, সমাজ-সংগঠন নিয়ে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁরা ভাববাদী তত্ত্বকে কোনও স্বীকৃতিই দেন না, মূল্য দেওয়া তো দূরের কথা। মানবজাতির ক্রমবিকাশের গতি-প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ ঐ দুটি দৃষ্টিভঙ্গীরই সাহায্য নিয়েছেন, এবং পরিণামে দেখিয়েছেন কোন পথ অবলম্বন করলে প্রকৃত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়।

সমাজ বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের কাছ থেকে আমরা জেনেছি মানুষ তার জীবনের আদিপর্ব থেকেই গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে সুরু করেছিল। সেই গোষ্ঠীর কাছে ব্যক্তি-মানুষ ছিল সেবকের মত। গোষ্ঠীকে খুশী

কাজ। গোষ্ঠী ছাড়া তার নিজের যে একটা স্বতন্ত্র সত্তা আছে এ বোধও তখন তার ছিলনা। তারপর ধীরে ধীরে ক্রমবিকশিত চৈতন্যময় মনের একটা পরিণাম হিসাবে তার মধ্যে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটতে লাগল। আদিতে মানুষ ছিল দলবদ্ধ জীব। বাঁচবার তাগিদেই তাকে দলবদ্ধ হয়ে থাকতে হত। বেঁচে থাকাটাই হল জীবমাত্রেরই প্রাথমিক প্রয়োজন। ব্যক্তিকে সেই কারণেই গোষ্ঠীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হত। গোষ্ঠী ছাড়া বাঁচবার কথা সে ভাবতেই পারতনা। গোষ্ঠীকে আশ্রয় করে ব্যক্তির এই যে বেঁচে থাকার প্রয়াস,—এর থেকে এ কথাও স্বীকার করতে হয় যে, ব্যক্তিই হল গোষ্ঠীর সামর্থ ও নিরাপত্তার যন্ত্র। কেননা, ব্যক্তি জানত নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে গোষ্ঠীকে অবশ্যই বাঁচিয়ে রাখতে হবে,—সুতরাং গোষ্ঠীকে একটি নিরাপদ আশ্রয়ে প্রতিষ্ঠিত করা এবং তাকে রক্ষা করার দিকে ব্যক্তির ছিল সদা সতর্ক দৃষ্টি। এইভাবে ব্যক্তির সাহায্যেই গোষ্ঠীজীবন একদিকে যেমন হয়ে উঠেছিল কর্মবহুল তেমনি তার সংরক্ষণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় হওয়ায় তার পক্ষে আত্মপ্রতিষ্ঠ হওয়া সম্ভব হয়েছিল। গোষ্ঠীর সর্বময় কর্তৃত্ব ব্যক্তিজীবনকে এইভাবে প্রভাবিত করেছিল। তাই গোষ্ঠীছাড়া ব্যক্তির পক্ষে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে এককভাবে বাঁচবার কোনও উপায় ছিল না।

সমাজতান্ত্রিক বিচার-বিশ্লেষণের সাহায্যে সমাজ-বিজ্ঞান ও ইতিহাস পরিবেশিত উপরোক্ত তথ্যগুলিকে পরীক্ষা করে যদি দেখা যায়, তাহলে অনায়াসেই বুঝতে পারা যাবে যে অবস্থা ও পরিবেশের প্রভাব থেকেই প্রকৃতির গতিধারা প্রয়োজনবোধে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর জীবনকে এইভাবে গড়ে তুলেছিল। প্রকৃতির গতিধারার এই তাৎপর্যটুকুকে স্মরণে রেখে আমরা যদি জড়জগতের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাব যে, সেখানে একরূপত্ব (Uniformity) হল গোষ্ঠীর পরিচয় (in matter Uniformity is the sign of group) প্রাণ ও মনের উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ একটু একটু করে সম্ভব হয়েছে। অতএব, যদি আমরা ধরে নিই যে জড় থেকেই ক্রমবিবর্তনের ধারায় যে-মন উন্মীলিত হয়েছে সে-মন জড়ের মধ্যেই নিগূঢ় ছিল, তাহলে আমরা অনায়াসেই মেনে নিতে পারি যে, মানুষ তার অভিযাত্রার আদিকালে জড়জীবনের অনুসরণে একরূপত্বকে কাম্য বলে মনে করেছিল, তাই গোষ্ঠীর মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্ন অস্তিত্বকে সে স্বীকার করতে পারেনি; পরবর্তীকালে, মনশ্চেতনার ক্রমোন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে ব্যক্তিচেতনা জাগরিত হতে লাগল তখনই সে চাইল বৈচিত্র্যপূর্ণ স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করতে। সুতরাং ক্রমবিবর্তনের ধারায় মানুষের সত্তার মধ্যে যে চেতনাগত পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল তাকেই বলা হয় অবস্থা ও পরিবেশের প্রভাব-জনিত পরিবর্তন। এ-পরিবর্তন, ঐতিহাসিক যুগেও যেমন প্রাগৈতিহাসিক যুগেও ঠিক তেমনি সংঘটিত হয়েছিল একই গতিধারার প্রভাবে। ক্রমপরিবর্তন-ধারার এই ভাববাদী ব্যাখ্যাটি যে যথেষ্ট যুক্তিপূর্ণ সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কোথায় ?

সমাজবিজ্ঞানীরা আরও বলেন,—মানবজাতির অতীত ঐতিহ্য থেকে আমরা জানতে পারি যে, সামাজিক বিধিব্যবস্থা প্রবর্তন করার আগে মানুষকে এমন ব্যবস্থার মধ্যে সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত করতে হয়েছে, যে-ব্যবস্থাকে বলা যেতে পারে স্বাধীন এবং অসামাজিক। সে সময় মানুষ ছিল প্রায় স্বেচ্ছাচারী।

যদিও মানবজাতির সেই অতীত ঐতিহ্যকে অবহেলা করা কিংবা কল্পিত কাহিনী বলে তাকে উপেক্ষা করা যুক্তি সঙ্গত নয়, নিরাপদও নয়, তবুও একথা বলা যেতে পারে যে, আধুনিক সমাজ-বিজ্ঞানীদের এই অভিমত যদি সত্য হয়, তা হ'লে বলা ভাল, মানুষের সেই স্বেচ্ছাচারিতার যুগ শুধু যে অসামাজিক ছিল তা নয়, সে ব্যবস্থা ছিল সমাজবিরোধী। মানুষ তখন বিচ্ছিন্ন পশুর জীবন-যাপন করত (শিকারের লোভে শিকারী পশুরা যেমন করে থাকে) ক্রমোন্নতির ধারা বেয়ে তার মধ্যে তখনও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস করার প্রেরণাও জাগেনি। মানুষের সেই অবস্থাকে বিজ্ঞানীরা যেভাবেই ব্যক্ত করুক না কেন, ঐতিহ্য সেইযুগকেই মানবেতিহাসের স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করেছে। এবং ঐতিহ্যের দেওয়া এই

অস্তিত্ব অসার্থক নয়। কেননা সে সময় মানুষ, সমাজ-শাসনমুক্ত স্বাধীন স্বচ্ছন্দ মানুষ হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। কোনও প্রতিষ্ঠানের তৈরী আইনের দ্বারা ব্যাহত হয়নি। সে-গতি ছিল সহজাত প্রবেগের প্রভাবে নিয়ত সাবলীল। স্বতঃ-বিকশিত জ্ঞানের আলোকে জীবনের সারধর্মকে তারা নিরূপণ করত। সেই জীবনযাপনে তারা যেমন প্রতিবেশীর প্রতি কখনও শত্রুভাবাপন্ন হয়ে ওঠেনি, ঠিক তেমনি গোষ্ঠীর কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে আপনার স্বচ্ছন্দ ও সহজ গতিকে ব্যাহত হতে দেয়নি।

এখন প্রশ্ন এই যে, সেই সুদূর অতীতে ঐভাবে জীবনযাপন করার প্রেরণা মানুষ পেল কোথা থেকে?

এই প্রসঙ্গে যে তত্ত্বটিকে অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হয় তা হ'ল জাতিগত স্মৃতির (Race memory) তত্ত্ব। মানুষের সেই স্মৃতির মণিকোঠায় এমনই একটি ভাববাদীতা বা আদর্শবাদীতা সংরক্ষিত ছিল যা তাকে সমাজ-শাসনহীন অথচ সম্পূর্ণ সামাজিক জীবনযাপন করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল।

বিজ্ঞানীরা যে যুগকে বলেছে অসামাজিক বা সমাজবিরোধী শৃঙ্খলাহীন সেই আরণ্যক অস্তিত্বের মধ্যে সভ্যতার সেই আদিযুগে মানুষ দেখেছিল তার জাতিগত স্মৃতির মধ্যে বিধৃত রয়েছে—স্বচ্ছন্দ, শৃঙ্খলমুক্ত এবং সুখী সাহচর্যের এক পরম আদর্শ।

অথবা এমনও হতে পারে যে, সভ্যতার যে-গতিপথ অবলম্বন করে আমরা এগিয়ে চলেছি সে-পথ সরলরেখায় চলেনি, চলেছে যুগচক্রের আবর্তিত পথে। এমনও হতে পারে সেই যুগচক্রের কোনও পর্বে অন্ততঃ আংশিক-ভাবে মানুষ এমন জীবনযাপন করতে সমর্থ হয়েছিল যে-জীবনে ছিল প্রেম, ছিল আলো। সত্য সত্তা, সত্যচিন্তা ও সত্যকর্মের আন্তরধর্মে যে-জীবন ছিল নিয়ন্ত্রিত। যে জীবন গঠিত হয়েছিল এক দার্শনিক নৈরাজ্যের সমুন্নত স্বপ্ন অনুসারে। রাজা, প্রজাপরিষদ কিংবা পুলিশী পীড়নের সাহায্যে বাধ্য করা একতার মধ্যে সে-জীবন গড়ে ওঠেনি। তাই স্বেচ্ছাচারী শাসন-প্রবর্তিত অত্যাচার, উৎপীড়ন আর কুৎসিত স্বার্থপরতা থেকে সে-জীবন ছিল মুক্ত।

সভ্যতার আদিযুগে যে-অবস্থার মধ্যে আমরা বসবাস করেছি তা হল স্বেচ্ছাধীন সহজ সাবলীল জীবনের বন্ধনহীন সম্মেলন। তা যেমন গড়ে উঠেছিল পশুর সহজাত প্রবৃত্তির (Instinct) স্বতঃস্ফূর্তিতে, তেমনি পরিণামে আমরা আলোকময় বোধির স্বতঃস্ফূর্ত জ্ঞানের সাহায্যে গড়ে তুলব আর এক স্বেচ্ছাধীন বন্ধনহীন জীবনের সহজ সম্মেলন। পশুজীবনের সঙ্ঘবদ্ধতাকে দেবসঙ্ঘে রূপান্তরিত করাই হল আমাদের নিয়তি। হতে পারে আমাদের উন্নতির গতি সর্পিল, কিন্তু সেই গতিপথ বেয়েই আমাদের ঊর্দ্ধায়ণকে সম্ভব ক'রে তুলতে হবে। যে স্বতঃস্ফূর্ত একরূপত্বের সামঞ্জস্যের মধ্যে 'প্রকৃতি' প্রতিফলিত, তার থেকে আমাদের উত্তীর্ণ হতে হবে এক আত্মসমাহিত ঐক্যের মধ্যে যেখানে প্রতিফলিত 'পরমপুরুষ'।

ইতিহাস ও সমাজ-বিজ্ঞান অবশ্য এসব কথা বলেনা। এসব কথা বলার শক্তিও তাদের নাই, অধিকারও না। তারা বলে—কমবেশী সুশৃঙ্খলিত গোষ্ঠীর মধ্যে আবদ্ধ ব্যষ্টি হিসাবেই মানুষকে দেখতে হবে। ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে মানবজাতির সভ্যতার ক্রমবিকাশকে যেভাবেই ব্যাখ্যাত করা যাকনা কেন সমাজবিজ্ঞানীরা মনে করেন সে ব্যাখ্যার মধ্যে তেমন কোনও যুক্তি নেই। তাঁরা বলেন,—ব্যষ্টি হল গোষ্ঠীর অংশমাত্র এবং সে গোষ্ঠীও মোটামুটি দুইভাগে (Types) বিভক্ত। একটি অংশ দাবী করে, ব্যক্তির সমগ্র সত্তার বিনিময়েও রাষ্ট্রবাদকে গড়ে তুলতে হবে। এই মতের প্রবক্তা হল, প্রাচীন স্পার্টা এবং আধুনিক জার্মানী।* অপর অংশটির মনোভাব কিন্তু অন্য ধরনের। বলা যেতে পারে প্রথম মতের প্রায় বিপরীত। তারা বলে, রাষ্ট্রের প্রাধান্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করে নয়। কেননা, ব্যক্তিই রাষ্ট্রকে গড়ে তোলে। সুতরাং রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যদি ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় তাহলে দেখতে হবে তার স্বাধীনতা, মর্যাদা এবং শক্তির বিকাশ যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। প্রাচীন এথেন্স এবং আধুনিক ফরাসীর অভিমত হল এই।

এ-ছাড়া আছে আর একটা মতবাদ—যার প্রবক্তা হল আধুনিক ইংল্যাণ্ড। ইংল্যাণ্ড বলে রাষ্ট্রের কর্তব্য হল,- ব্যক্তির স্বাভাবিক বিকাশ সম্ভব করে তোলা। এবং ব্যক্তি যাতে স্বাধীনভাবে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জন করতে-পারে তার ব্যবস্থা করা,—কেননা ব্যক্তির শক্তির স্ফুরণের উপরই রাষ্ট্রের প্রসার এবং স্থায়িত্ব নির্ভরশীল। ইংল্যাণ্ডের চিন্তা-চেতনার এই আদর্শ একটা মূল্যবান দৃষ্টান্তস্বরূপ হয়ে রয়েছে। এই আদর্শের শক্তি-ই তাকে একটা সুগঠিত জাতিতে পরিণত করেছে। প্রকৃতির কর্মধারার সঙ্গে তার চিন্তাধারা সুসমঞ্জস হওয়ায় ইংল্যাণ্ড লাভ করেছে ভগবানের প্রসাদ যার সাহায্যে সে-গড়ে তুলতে পেরেছে স্বাধীন সমৃদ্ধ বীর্যবান এবং অপরাজেয় গোষ্ঠীশক্তি। লাভ ক'রেছে বিস্তৃত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পরম-সৌভাগ্য। কোনও সময়েই এই মহান আদর্শের অনুসরণ থেকে ইংল্যাণ্ড পশ্চাদপদ হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এই আদর্শের ঐকান্তিক অনুসরণের ফলে তার মধ্যে গড়ে উঠেছিল এক তীব্র আহমিকাবোধ।

মানুষের অজ্ঞানতার ফলই হল এই। সীমাবদ্ধ ধারণার প্রতি মানুষ অজ্ঞানতাবশতঃ মাত্রাধিক প্রাধান্য দেয়। এবং সেই ধারণাকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করতে প্রয়াসী হয়। ইংল্যাণ্ডের মানুষও সেই পথই অনুসরণ করেছে—ফলে তার ঐশ্বর্যপূর্ণ পরম প্রকাশ সম্ভব হল না। কঠোর শাসনে সুসংবদ্ধ অন্যান্য অনেক রাষ্ট্রে যে-সব সুফল লাভ করেছে ইংল্যাণ্ডের পক্ষে-তাও আয়ত্ত করা সম্ভব হয়নি এবং তারও কারণ হল ঐ অজ্ঞানতা। অদূর-ভবিষ্যতে ইংল্যাণ্ডের ঐ রাষ্ট্রবাদ (State Idea) যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে তার লক্ষণও দেখা দিয়েছে। তার এই রাষ্ট্রীয়-আদর্শ ইতোমধ্যেই তার সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি আঘাত হানতে সুরু করেছে। ফলে এই মহৎ প্রয়াসের ক্রান্তিকাল সমুপস্থিত।

রাষ্ট্রের আপন স্বার্থের জন্যে ব্যক্তিকে দমন করতে হবে এই দাবীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট-যে-তত্ত্ব,-তাতে রাষ্ট্রের বাহ্যিক রূপ (অর্থাৎ সংগঠন ব্যবস্থা ইত্যাদি) কেমন হবে সে-প্রসঙ্গ অবান্তর। অতএব ঐ দাবীর তত্ত্বটি যদি বিশদভাবে-বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে আমরা দেখতে পাই যে, একদা একচ্ছত্র সম্রাটেরা প্রজাদের উপর যে অত্যাচার করত ব্যক্তির প্রতি, গোষ্ঠীর অত্যাচার সেই একই প্রবণতার ভিন্ন-রূপ। মানুষের আশ্চর্য প্রকৃতিগত বিধান অনুসারে ঐ একই প্রবণতা পরে আবার অন্যরূপ গ্রহণ করে। তখন গোষ্ঠীর মধ্যে চলে পারস্পরিক বিরোধ উৎপীড়ন আর অবদমন। ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে তখন প্রত্যেকেই নির্দ্বিধায় ঘোষণা করে আমিই রাজা। অর্থাৎ আমিই রাষ্ট্র। এ ঘোষণা কিন্তু সম্পূর্ণ মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েও একটা পরম সত্যকে প্রকাশ করে। সত্যটি হল এই যে, ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা, ক্রিয়াকর্ম মর্য্যাদা, সামর্থ্য হরণ করার প্রয়াসের মধ্যে রাষ্ট্রের যে বৈশিষ্ট্য, রাষ্ট্রের ব্যষ্টিগত প্রকাশ হিসাবে ব্যক্তির মধ্যেও সেই প্রবণতা সদা জাগ্রত। তাই তার ঐ সদম্ভ ঘোষণা।

ঐ ঘোষণার মধ্যে রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে ধারণা ব্যক্ত হয়েছে তার মধ্যেই নিগূঢ় হয়ে আছে ঐ মিথ্যার অংশটি।

রাষ্ট্র গঠন ক'রে ব্যক্তি; অথচ ব্যক্তির চেয়ে রাষ্ট্রকে বেশী মর্য্যাদা দেওয়া হয়। বলা হয় রাষ্ট্রই শ্রেষ্ঠতর। ব্যক্তির উপর নিষ্ঠুর উৎপীড়নের ন্যায্য অধিকার রাষ্ট্রের আছে এ-কথাও স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়। এবং জোর গলায় বলা হয় যে, এই বিধি-বিধানের উপরই নির্ভর করে মানুষের সমস্ত আশা-ভরসা।...এই ধারণার সমস্তটাই মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত।

অথচ দেখা যাচ্ছে যে দীর্ঘকালের বিরতির পর এই রাষ্ট্রবাদই সাম্প্রতিককালে পুনরায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চলেছে। মানুষের চিন্তা-ধারণা এবং কর্মপ্রবণতা এরই প্রভাবে আচ্ছন্ন।

বর্তমানে এই রাষ্ট্রবাদ মানুষের সামনে দুটি উদ্দেশ্যকে উপস্থাপিত করে নিজে প্রতিষ্ঠিত হতে চাইছে। সেই উদ্দেশ্যের একটি হল জাতির বহির্বিষয়ক স্বার্থরক্ষা।

অপরটি হ'ল জাতির নৈতিক জীবন গড়ে তোলা। এই দুটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রাষ্ট্রবাদ দাবী করছে যে ব্যক্তিগত 'অহং'কে গোষ্ঠীর স্বার্থে বলি দিতে হবে। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রবাদ আরও বলছে যে, ব্যক্তিকে সবসময়ই ভাবতে হবে যে গোষ্ঠীর স্বার্থেই তার বেঁচে থাকা। উচ্চকণ্ঠে সে [রাষ্ট্রবাদ] এ-কথাও প্রচার করছে যে, সুসংগঠিত রাষ্ট্রের কর্মদক্ষতার উপরই মানুষের সামগ্রিক উন্নতি ও কল্যাণ নির্ভরশীল। সর্বাঙ্গ-পরিপূর্ণ [perfect] রাষ্ট্র গঠন করতে গেলে রাষ্ট্রকর্তৃক ব্যক্তির ও সমাজের আর্থিক অবস্থা এবং জীবনযাত্রার অন্যান্য ব্যবস্থার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। ব্যক্তির বুদ্ধি-বৃত্তি, তার কর্মনৈপুণ্য, তার চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা, সে নিজে যা এবং তার যা কিছু আছে সবই থাকবে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন। এবং এইভাবেই প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজ-তন্ত্র।

বর্তমানে এই ধারণার দিকেই মানবজাতি এগিয়ে চলেছে দ্রুতগতিতে। রাষ্ট্রবাদ এক প্রচণ্ড শক্তিশালী যন্ত্র-দৈত্যের মত দুর্বার গতিতে ধেয়ে চলেছে সব কিছু গ্রাস করতে। যা কিছু এই মতবাদের বিরোধী কিংবা মানুষের যে-প্রেরণা দাবী করে স্বাধিকার, সে-সবই তার ঘূর্ণায়মান চাকার তলায় সে গুঁড়িয়ে দিতে চায়।

এত দুর্বার শক্তির আধার হ'লেও, কিংবা এর অগ্র-গতিবেগ এত তীব্র হওয়া সত্ত্বেও, যে-দুটি মতবাদকে আশ্রয় করে এই রাষ্ট্রবাদ গড়ে উঠেছে তার মধ্যেও ভরপুর হয়ে আছে সত্য-মিথ্যার জটিল সংমিশ্রণ। আমাদের সমগ্র দাবী-দাওয়ার বৈশিষ্ট্যই হল এই।

সুতরাং এখন প্রয়োজন হল এমন এক সন্ধানী ও নিরপেক্ষ বিচারশক্তি যা কথার জালে অভিভূত হবে না, প্রবঞ্চিত হবে না। সেই বিচারশক্তির সাহায্যে প্রকৃতির গভীর এবং জটিল সত্যকে আবিষ্কার করতে হবে। এবং সেই সত্যই হবে আমাদের আলো, হবে নূতন পথের দিশারী।

---

* শ্রীঅরবিন্দের 'The Ideal of Human Unity' গ্রন্থটি প্রকাশিত ১৯১৯ সালে। এই গ্রন্থে যে-সমস্ত প্রবন্ধ গ্রথিত হয়েছে সে-সবই ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের জুলাই মাস পর্যন্ত আর্য্যপত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সুতরাং আধুনিক জার্মানী আধুনিক ইংল্যাণ্ড বলতে প্রথম মহাযুদ্ধকালীন অবস্থাকে বুঝতে হবে।

বেদের দেবতা পর্জ্জন্য

শ্রীভূপেন্দ্র বাচস্পতি

পর্জ্জন্য দেব সম্বন্ধে ঋগ্বেদে মাত্র তিনটি পূর্ণ সূক্ত আছে (৫।৮৩, ৭।১০১, এবং ৭।১০২)। তাহা ছাড়া মুণ্ডক সূক্তটি (৭।১০৩) ও বস্তুত: পর্জ্জন্যদেবের উদ্দেশেই নিবেদিত। ঋগ্বেদে আরও অন্তত: ৪০টি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মন্ত্রে পর্জ্জন্যদেব স্তুত হইয়াছেন। অথর্ব্ব বেদে ২টি পূর্ণ সূক্ত এবং প্রায় কুড়িটি ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত মন্ত্রে তাঁহার স্তুতি করা হইয়াছে। যজুর্ব্বেদেও তাঁহার সম্পর্কে ২০।২১ মন্ত্র পাওয়া যায়। তথাপি সূক্ত ও মন্ত্র সংখ্যার স্বল্পতার জন্য তাঁহাকে সাধারণ স্তরের দেবতা মনে হইতে পারে। কিন্তু মহিমার দিক হইতে তিনি কোনক্রমেই উপেক্ষণীয় নহেন।

তিনি বৃষ্টিপ্রদ মেঘের দেবতা। সলিলপূর্ণ মেঘই তাঁহার বাহন। তিনি মধুর উদক উৎপাদক (মধুদোঘম্ ৭।১০১।১)। তিনি ওষধিগণের গর্ভ উৎপাদন করেন (রেতো দধাতি ওষধীষু গর্ভম্। ৫।৮৩।১)। তিনি ওষধী ও জলের বর্দ্ধন কারী (যঃ বর্দ্ধনঃ ওষধীনাম্ যঃ অপাম্। ৭।১০১।২)। তিনি সমস্ত জগতের ঈশ্বর (বিশ্বস্য জগতঃ ঈশে। (৭।১০১।২)। তিনি নিজের ইচ্ছানুসারে নিজের দেহ গঠন করেন (যথা বশং তন্বং চক্র এষঃ। (৭।১০১।৩)। তাঁহাতেই সমস্ত ভুবন অবস্থিত (যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ। ৭।১০১।৪)। স্থাবর ও জঙ্গমের আত্মা তাঁহাতেই বাস করে (তস্মিন্ আত্মা জগতঃ তস্থুশ্চ। ৭।১০১।৬)। তিন প্রকারের মেঘ তাঁহার চারিদিকে মধুবৎ জল বর্ষণ করে (ত্রয়ঃ কোসাসঃ উপসেচনাসঃ মধ্বঃ। ৭।১০১।৪)। তিনি বৃষভের ন্যায় বহুবিধ ওষধিগণের মধ্যে তেজ আধান করেন (সঃ রেতোধাঃ বৃষভঃ শশ্বতীনাম্। ৭।১০১।৬)। তিনি জলবর্ষক ও ক্ষিপ্রদানকারী (বৃষভঃ জীরদানুঃ। ৫।৮৩।১) তিনি যখন অন্তরীক্ষকে মেঘমালায় আবৃত করেন (যৎ পর্জ্জন্যঃ কৃনুতে বর্ষ্যং নভঃ) তখন দূরাগত সিংহগর্জ্জনের ন্যায় তাঁহার নিনাদ শুনিতে পাওয়া যায় (দূরাৎ সিংহস্য স্তনয়া উদীরতে। (৫।৮৩।৩)

ঋষিগণ বিবিধ মন্ত্রে উপাসকগণকে পর্জ্জন্যদেবের স্তুতি করিতে বলিতেছেন। যথা

> অচ্ছা বদ তবসং গোভিরাভিঃ
> স্তুহি পর্জ্জন্যং নমসা বিবাস। ৫।৮৩।১

(হে উপাসক! তুমি শক্তিমান পর্জ্জন্যদেবের অভিমুখী হইয়া এই সকল স্তুতিবাক্য দ্বারা প্রার্থনা কর এবং হবিলক্ষণ অন্নদ্বারা তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে পরিচর্য্যা কর)।

> পর্জ্জন্যায় প্রগায়ত দিবস্পুত্রায় মীড়হুষে।
> স নঃ যবলমিচ্ছতু॥ ৭।১০২।১

(অন্তরীক্ষের পুত্র সেচন-সমর্থ পর্জ্জন্যদেবের উদ্দেশে উত্তম স্তুতিবাক্য উচ্চারণ কর। তিনি আমাদের হবিলক্ষণ অন্ন গ্রহণে ইচ্ছা করুন)।

> তিস্রো বাচঃ প্র বদ জ্যোতিরগ্রা
> যা এতদ্দ্হ্রে মধুদোঘ মূধঃ॥ ৭।১০১।১

[যিনি এই মধুবৎ জলের উৎপাদক, সেই পর্জ্জন্য-দেবের উদ্দেশে অগ্রভাগে জ্যোতিঃবিশিষ্ট (অর্থাৎ প্রণব যুক্ত) তিন প্রকারের বাক্য (অর্থাৎ ঋক-যজু-সামাত্মিকা স্তুতি) উত্তমরূপে উচ্চারণ কর]।

> প্র সুষ্টুতি স্তনয়ন্তম্ রুবন্তম্
> ইড়পতিম্ জরিতঃ নূনম্ অশ্যাঃ।
> য অব্দিমান্ উদনিমান্ ইয়র্ত্তি
> প্র বিদ্যুতা রোদসী উক্ষমানঃ॥ ৫।৪২।১৪

[হে উপাসক! তোমার শোভন স্তুতি সেই

শব্দায়মান্. গর্জ্জনকারী ইলপতি পর্জ্জন্যের নিকট নিশ্চিত-ভাবে উপস্থিত হউক (সায়ণাচর্য্যে ইলপতি বা ইড়পতি শব্দের অর্থ করিয়াছেন—অন্নের উৎপাদক) যিনি মেঘসকলের ধারণকর্ত্তা এবং যিনি বারি বর্ষণ করিয়া এবং আকাশ ও পৃথিবীকে বিদ্যুত দ্বারা উদ্ভাসিত করিয়া গমন করেন।]

প্র ক্রন্দন্নু নভন্যস্য বেতু। ৭।৪২।১

(পর্জ্জন্যদেব আমাদের স্তোত্র বিশেষরূপে ইচ্ছা করুন)।

বিবিধ মন্ত্রে পর্জ্জন্য দেবের নিকট বিবিধ প্রকার প্রার্থনা করা হইয়াছে। যথা "শং নঃ পর্জ্জন্যো ভবতু প্রজাভ্যঃ (৭।৩৫।১০) পর্জ্জন্য আমাদের সন্ততিবর্গের সুখপ্রদ হউন। "পর্জ্জন্যো নঃ ওষধীভির্ময়ভু (৬।৫২।৬) পর্জ্জন্য দেব ওষধীগণের দ্বারা আমাদের প্রতি সুখপ্রদ হউন। "নিকামে নিকামে নঃ পর্জ্জন্যো বর্ষতু" যজুর্ব্বেদ ২২।২২ ৬) আমাদের যখন যখন ইচ্ছা হইবে—অর্থাৎ প্রয়োজনমত পর্জ্জন্যদেব যেন বারি বর্ষণ করেন। "পর্জ্জন্যদেব ধন দান করিলে, সেই ধন আমাদের নিকট আগমন করুক (৭।৩৭। ৮)। "হে পর্জ্জন্যদেব! তাহাদিগকে সুখে রাখ" (১০।১৬৯।২)।

পর্জ্জন্য মহাশক্তিধর; তাই ইন্দ্রের সম্পর্কে বলা হইয়াছে "ইন্দ্র বৃষ্টিমান্ পর্জ্জন্যের ন্যায় শক্তিতে মহান্ (মহাঁ ইন্দ্রো য ওজসা পর্জ্জন্যো বৃষ্টিমান্ ইব—৮।৬।১)। ইন্দ্র ও পর্জ্জন্য যুক্তভাবেও স্তুত হইয়াছেন—"হে ইন্দ্র ও পর্জ্জন্য! তোমরা আমাদের বিরোধী শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে বিনাশ কর" (অস্মাকং শত্রূণ্ পরি শূর বিশ্বতঃ দর্ম্মা দর্ষীষ্ট ১।১৩৩।৬)।

পর্জ্জন্য ও বায়ুদেবতা পরস্পরের সহায়ক। "যতক্ষণ পর্জ্জন্য জল বর্ষণ করিতে করিতে পৃথিবীর দিকে অভিগমন করেন ততক্ষণ বাত (বায়ুদেব) উত্তমরূপে বহিতে থাকেন" (প্র বাতা বান্তি যৎ পর্জ্জন্যঃ রেতসা অবতি। ৫।৮৩।৪)। এই জন্যই উভয়ে যুক্তভাবেও স্তুত হইয়াছেন। "পর্জ্জন্যাবাতা পিপ্যতামিষম্ নঃ"। (পর্জ্জন্য ও বায়ু আমাদের অন্ন বর্দ্ধন করুন—৬।৫০।১২)। পুনরায় প্রার্থনা করা হইয়াছে "পর্জ্জনাবাতা বৃষভা পৃথিব্যাঃ পুরীষানি জিন্বতম্ অপ্যানি" (হে পর্জ্জন্য ও বাত! তোমরা অন্তরীক্ষ হইতে ক্ষরিত জল পৃথিবীতে প্রেরণ কর ৬।৪৯।৬।

কখনও বা অগ্নি ও পর্জ্জন্য যুক্তভাবে স্তুত হইয়াছেন। যথা "অগ্নিপর্জ্জন্যৌ অবতম্ ধিং মে অস্মিন্ হবে সুহবা সুস্তুতিম্ নঃ" (হে অগ্নি ও পর্জ্জন্য! তোমরা মদীয় যজ্ঞও রক্ষা কর। তোমরা সুহব অর্থাৎ অনায়াসে আহ্বান-যোগ্য। অতএব এই যজ্ঞে আমাদের এই শোভন স্তুতি শ্রবণ কর। ৬।৫২।১৬।

বিশ্বকোষ ধৃত শাঙ্কর ভাষ্যে দেখা যায় বিষ্ণু সম্পর্কে বলা হইয়াছে "তিনি পর্জ্জন্যের ন্যায় অধ্যাত্মকাদি তাপত্রয় উপশম্ করেন। (পর্জ্জন্যবৎ অধ্যাত্মকাদি তাপ-ত্রয়ং সাময়তি)। তারপর পর্জ্জন্য শব্দের অর্থ বলিয়াছেন—যিনি সকল কাম্য পদার্থ বর্ষণ করেন তিনিই পর্জ্জন্য। (সর্ব্বান্ কামান্ অভিবর্ষতীতি পর্জ্জন্য :)। আভিধানিকগণ বলেন "পর্ষতি সিঞ্চতি বৃষ্টিং দদাতীতি" (পর্জ্জন্য বারি সিঞ্চন করেন, বৃষ্টি প্রদান করেন)। সায়নাচার্য্য বলেন "পর্জ্জন্যশব্দো যাস্কেন বহুধা নিরুক্তঃ" [যাস্ক পার্জ্জন্য শব্দের বহুবিধ অর্থ করিয়াছেন]। অথর্ব্ব-বেদের ২য় সূক্তের প্রথম মন্ত্রের ভাষ্যে সায়নাচার্য্য সংক্ষেপে বলিয়াছেন "তর্পায়িতা চাসৌ জন্যশ্চেতি পর্জ্জন্যঃ। জনেভ্যো হিতঃ জন্যঃ। কালে কালে প্রবর্ষণেন তর্পায়িতা সন্ জনানাং হিতকারী ভবতীত্যর্থঃ।" [তিনি তৃপ্ত করেন এবং হিতসাধন করেন। জন্য—জনগণের হিত। সময় সময় প্রচুর বর্ষণ দ্বারা তৃপ্ত করিয়া জনগণের হিতসাধন করেন।

অথর্ব্ব বেদের তৃতীয় সূক্তের প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে বীরপুরুষের পিতৃতুল্য ও বহু সামর্থ্যযুক্ত পর্জ্জন্যকে আমরা জানি [বিদ্মা শরস্য পিতরং পর্জ্জন্যং শতবৃষ্ণ্যম্]। ২য় সূক্তের প্রথম মন্ত্রে বলা হইয়াছে তিনি বহুপ্রকারে পোষণ-কারী [ভূরিধায়সং]। তৃতীয় সূক্তের ৫টি মন্ত্রের শেষভাগে আছে "পৃথিব্যাং তে নিষেচনং বহিষ্টে অস্তু" [পৃথিবীতে তোমার জলসিঞ্চন প্রচুর হোক]।

ঋগ্বেদের ৭।১০২।১ মন্ত্রে পর্জ্জন্যকে অন্তরীক্ষের পুত্র [দিবস্পুত্রায়] বলা হইয়াছে। সায়নাচার্য্য ভাষ্যে

বলিয়াছেন "তত্রহি পর্জ্জন্য প্রাদুর্ভবতি" [অন্তরীক্ষেই পর্জ্জন্য প্রাদুর্ভূত হয়েন)। অথর্ব্ব বেদে পৃথিবীকে তাঁহার মাতা বলা হইয়াছে। "বিদ্ম উস্ অস্য মাতরম পৃথিবীং ভূরিবর্পসম [তাঁহার মাতা বহু-পদার্থ-সমৃদ্ধা পৃথিবীকেও আমরা জানি]। ঋগ্বেদের ৭.১০১।৩ মন্ত্রে বলা হইয়াছে "তিনি মাতা পৃথিবী এবং পিতা দ্যুলোক [অন্তরীক্ষ] হইতে জল গ্রহণ করেন।" সুতরাং বেদের মতে অন্তরীক্ষই তাঁহার পিতা এবং পৃথিবীই তাঁহার মাতা। কিন্তু মহাভারতের ১।৬৫।৪৪ শ্লোকে তাহাকে কশ্যপের পুত্র বলা হইয়াছে। কশ্যপের বহুপত্নীর মধ্যে একজনের নাম 'মুনি'। এই মুনিই পর্জ্জন্যের মাতা। হরিবংশে দ্বাদশ আদিত্যের দুইটি তালিকা পাওয়া যায়। তাহার একটিতে পর্জ্জন্যকে আদিত্য মধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

জলদাতা ও শস্যাদির উৎপাদক বলিয়া পর্জ্জন্যদেব বৈদিকযুগে অতিশয় জনপ্রিয় দেবতা ছিলেন। রামায়ণের যুগেও তাঁহার জনপ্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল। আদিকবি বাল্মীকির রামায়ণে পর্জ্জন্যদেবের জনপ্রিয়তার কথা পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। রাজা দশরথ স্বয়ং জনপ্রিয় ছিলেন; তথাপি তিনি রামচন্দ্র সম্বন্ধে বলিতেছেন "মত্তঃ প্রিয়তরো লোকে পর্জ্জন্য ইব বৃষ্টিমান। অযোধ্যা কাণ্ড ১।৩৮। (রামচন্দ্র বৃষ্টিপ্রদ পর্জ্জন্যের ন্যায় লোকসমাজে আমাপেক্ষা প্রিয়তর)। পুনরায় বলিয়াছেন "ঘর্ম্মাভিতপ্তাঃ পর্জ্জন্যং হ্লাদয়ন্তমিব প্রজাঃ (গ্রীষ্মসন্তপ্ত জীবকুলকে পর্জ্জন্য যেরূপ আনন্দ দান করেন, রামচন্দ্র প্রজাকুলকে সেইরূপ আনন্দদান করেন। অযোধ্যাকাণ্ড, ৩।২৯)। আবার বলা হইয়াছে—রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের ঘোষণা শুনিয়া অযোধ্যার রাজসভায় সমাগত নরপতিগণ "বর্ষণরত পর্জ্জন্যকে দর্শন করিয়া ময়ূরগণ যেরূপ কেকাধ্বনি দ্বারা অভিনন্দিত করে, সেইরূপ উল্লাসধ্বনি করিলেন" (বৃষ্টিমন্তং মহামেঘং নর্দ্দন্ত ইব বর্হিনঃ। অযোধ্যা কাণ্ড ২য় সর্গ)।

প্রাচীন কবিগণের মধ্যে রাজার সহিত পর্জ্জন্যের তুলনা সুপ্রচলিত ছিল। যথা "পর্জ্জন্য ইব ভূতানাম আধারঃ পৃথিবী পতি" (রাজা পর্জ্জন্যের ন্যায় প্রাণিগণের আশ্রয়স্থল)।

পৌরাণিক যুগে তাঁহার জনপ্রিয়তার উল্লেখ খুব বেশী না থাকিলেও, অনাবৃষ্টি ও তাহার ফলে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলেই পর্জ্জন্যের প্রীতির জন্য যজ্ঞ করা হইত এবং যজ্ঞের পরে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইত, এইরূপ প্রচুর দৃষ্টান্ত রহিয়াছে। গীতাতেও একটি শ্লোকে পর্জ্জন্যের উল্লেখ আছে। ভগবান বলিতেছেন—

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্ন সম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ॥ ৩।১৪

(অন্ন হইতে প্রাণিগণের দেহ উৎপন্ন হয়; পর্জ্জন্য হইতে অন্ন উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ হইতে পর্জ্জন্য হয় এবং বেদবিহিত কর্ম্মদ্বারা যজ্ঞ সম্পাদিত হয়।)

"ফাল্গুনী"তে জীবনের জয়ধ্বনি

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

ফাল্গুনী নাট্যকাব্যের গোড়াতেই দেখছি মহারাজ রাজসভায় ঢুকছেন ভারাক্রান্ত মন নিয়ে। গত রজনীতে তাঁর গলায় মল্লিকার মালা পরিবার সময় মহিষী চমকে উঠেছিলেন রাজার কানের কাছে দুটো পাকা চুল দেখে। রাণীর মুখে চুল পাকার দুঃসংবাদ শোনার পর থেকেই রাজার মন খুব খারাপ। সাদা চুল দুটো তাঁর কানের কাছে বাজাচ্ছে সভা ভাঙবার ঘণ্টা। জীবনের আলোকিত সভাকক্ষ থেকে মৃত্যুর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাবার সময় নিকটবর্তী, চুল পাকৃতে সুরু হওয়ার এই তো অর্থ। কোনো ভাষা-মেখেই এই কঠিন সত্য ঢাকা পড়বার নয়।

মৃত্যুকে মানুষ চিরদিন ভয় করে এসেছে। জীবন যেন সূর্য্যকরোজ্জ্বল দিন। মৃত্যু যেন শশীতারাহীন তামসী রাত্রি। সেই রাত্রির মধ্যে আমি নিঃশেষে ফুরিয়ে গেলাম, ব্যক্তিসত্তার এই চরম অবলুপ্তির কথা ভেবে মানুষ শঙ্কিত হয়েছে। মৃত্যুভয় মানে এমন কিছুর ভয় যার পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছি নেপথ্যের অন্ধকারে অথচ যাকে চোখে দেখতে পাচ্ছিনে ঘরে ঘরে, দিনেরাতে মৃত্যু নিঃশব্দে চালিয়ে যাচ্ছে তার আক্রমণ। সেই নিষ্ঠুর আক্রমণের চিহ্নে চিহ্নিত নয় পৃথিবীর কোন্ পরিবার? গৃহে গৃহে জীবনের দীপগুলি নিবে যাচ্ছে— কিন্তু হানাদারের হদিস্ নেই কোন। মৃত্যুর অন্ধকারের মধ্যে একটা অন্তহীন নৈঃশব্দ। সেই নীরবতার সামনে দিশেহারা মানুষ মনের মধ্যে অনুভব করেছে একটা দারুণ অস্বস্তি। রাত্রের নিস্তব্ধতার মধ্যে শিশুরা যখন ভয় পায় তারা মন থেকে ভয় তাড়ানোর জন্য জোরে জোরে কথা বলে, নয়তো চীৎকার সুরু করে। ক্রমবিকাশের পথে আগুয়ান মানুষ মৃত্যুভয়ের সামনে ধর্মের মধ্যে খুঁজেছে তার চিরদিনের আশ্রয়।

ভারতবর্ষের এক ঋষি তনয় একদা মৃত্যুর বধির যবনিকার সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন যেমন করে ফাল্গুনী নাট্যকাব্যের গোড়াতেই মহারাজা মৃত্যুভয়ের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। সেই ঋষিপুত্র নচিকেতার তরুণমনে একটা মোক্ষমপ্রশ্ন জেগেছিল। প্রশ্নটি ছিলো: মৃত্যুর মধ্যে মানুষ কি নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়, অথবা মৃত্যুর পরেও মানুষ থাকে। নচিকেতা প্রশ্ন রেখেছিলেন যমের সম্মুখে। যম যদি অনুগ্রহ ক'রে তাঁর সংশয়ের উপরে সত্যের আলোকপাত করেন। যুবককে তাঁর এই অনুসন্ধিৎসা পরিত্যাগ করিবার জন্য যম বহু অনুনয়-বিনয় করেছিলেন। কিন্তু তিনি সফলকাম হতে পারেননি। মানুষের মধ্যে কতকগুলি ইচ্ছা আছে, প্রবণতা আছে যারা ললাটে বহন করছে অনন্তের স্বাক্ষর। স্বর্গের নন্দনকাননের ছায়াতেও মানুষের কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসবে, "হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোনখানে।" যম কতরকমের সুখের প্রলোভন দেখিয়ে ঋষিতনয়কে নিবৃত্ত করতে চেয়েছিলেন মৃত্যুর রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটিত করবার প্রয়োজন থেকে। কিন্তু সবই তো ফুরিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর মধ্যে। জীবন-যৌবন-ধন মান-পুত্র-পৌত্র সবই তো ভেসে যায় কালের খরস্রোতে। তাই ঐহিক সমস্ত কিছুর অনিত্যত্ব চিন্তা ক'রে নচিকেতা কোন-কিছুতেই প্রলুব্ধ হননি এবং মৃত্যুর ছায়ায় দাঁড়িয়ে অনন্তের দিকে তাঁর বাহুদুটি বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। ইংরেজ মনীষী এলিস (Havelock Ellis) ভারি সুন্দর একটা সংজ্ঞা দিয়েছেন ধর্মের। **Religion is the Streching forth of our hands toward the illimitable.**

সেই যে ভয়ঙ্কর কিছু-একটা যাকে চোখে দেখা যায়না কিন্তু যার আনাগোনা অণুক্ষণ অনুভব করা যায় শোকার্ত-

দের দীর্ঘশ্বাসের আর ক্রন্দনধ্বনিতে—সেই অদৃশ্যের আক্রমণই তো অতর্কিতে এসেছে মহারাজার যৌবনের উপরে! সেই অ-দেখা হানাদারের কাছাকাছি ঘোরাঘুরি দুঃসংবাদই তো বহন ক'রে এনেছে মহারাজার কানের কাছে ঐ দুটো পাকাচুল! মৃত্যুর মধ্যে আমি নিঃশেষে বিলুপ্ত হ'য়ে যাবো, এই ভয়ে মহারাজা যদি বিচলিত হ'য়ে থাকেন, তাতে বিস্মিত হবার কিছুই নেই। মৃত্যুর ছায়ায় ভয়ার্ত মহারাজা কবিশেখরকে অনুরোধ জানিয়েছেন এমন কোন রচনা শোনাবার জন্য যা তাঁর অবসাদকে দূর করে দেবে, তাঁর প্রাণটাকে জাগিয়ে রাখবে। জীবনের কলরবমুখর সরাইখানার মজলিস ছেড়ে অন্ধকারের মধ্য একা একা চলে যাওয়ার কথা ভেবে দুর্বলতা এসেছে তাঁর মনে।

কবিশেখর মহারাজার অনুরোধ শিরোধার্য্য ক'রে একটী নাটক শোনাতে প্রস্তুত হ'লেন। এই নাটকের এক একটী অঙ্কের দরজা খোলা হয়েছে গানের চাবি দিয়ে। গানের অদ্ভুত বিষয়টা হোলো শীতের বস্ত্রহরণ। ঋতুর নাট্যে বৎসরে বৎসরে শীতবুড়োটার ছদ্মবেশ খসিয়ে তার বসন্তরূপ প্রকাশ করা হয়। শীতের ছদ্মবেশ খসিয়ে তার এই বসন্তরূপকে প্রকাশ করার কথাই নাটকে গানের পর গানে ব্যক্ত হয়েছে। নাটকের বাকীটাতে প্রাণের কথা। যৌবনের দল একটা বুড়োর পিছনে ছুটে চলেছে। তাকে ধরবে বলে পণ। এই বুড়ো ধরার অভিযানের কাহিনীতে কবিশেখর রূপককে আশ্রয় করে প্রাণের কথা ব্যক্ত করেছেন। 'ফাল্গুনী' নাটকে এই অপরাজেয় গানেরই জয়জয়কার!

মহারাজা কবিশেখরকে কৌতূহলের বশে জিজ্ঞাসা করলেন, "তবে তোমার রচনাটা বলছে কি?" কবিশেখরের উত্তরের মধ্যে পাওয়া গেল 'ফাল্গুনী' নাট্যকাব্যের যেটি মর্ম্মবাণী। নাটকের মধ্যে মন্দ্রিত হচ্ছে, "আমি-আছির জয়, জয় এই আনন্দময় আমি-আছির জয়।"

'ফাল্গুনী' নাটকে বুড়োধরার চমকপ্রদনাট্যলীলায় যিনি সর্দ্দারের ভূমিকা নিয়েছেন তিনি আমাদের কেবলই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। "আমি কিছুরই নিষ্পত্তি করিনে। সঙ্কট থেকে সঙ্কটে নিয়ে চলি—ঐ আমার সর্দ্দারি।" এই কয়েকটি কথার ভিতরে সর্দ্দার নিজের পরিচয়কে ব্যক্ত করেছেন।

সর্দ্দার যৌবনের দলকে একটা নূতন খেলার মধ্যে ঠেলে দিয়েছেন। বুড়ো ধরার খেলার মধ্যে কে সেইবুড়ো? সেই মান্ধাতার আমলের বুড়োটা যে 'অগস্ত্যের মতো পৃথিবীর যৌবনসমুদ্র শুষে খেতে যায়, নরমুণ্ড যার গলায়, শ্মশানে যার বাস।' জগতের সেই বিরাট বুড়োটা 'যে ভয়ঙ্কর, যে অন্ধকারের মতো' উপড়ে আনার কাছে তারই হাত পাকা। নিড়ুনি তার প্রধান অস্ত্র। এই বুড়োই তো মৃত্যু।

বিপুল উৎসাহ নিয়ে যৌবনের দল বুড়ো ধরার অভিযানে বেরিয়ে পড়তে যখন উদ্যত সর্দ্দার বললেন, এ কাজ তোরা কখনো পারবিনে। সর্দ্দারের সঙ্গে বাজি রেখে যৌবনের দল চন্দ্রহাসের নেতৃত্বে সুরু করলো তাদের 'মৃত্যুজয়ের দুঃসাহসিক অভিযান। চন্দ্রহাস সর্দ্দারকে 'কথা দিলো, দোলপূর্ণিমার দিনে বুড়োকে দোলার উপর দোলাতে দোলাতে সে সর্দ্দারের কাছে হাজির ক'রে দেবে। তখন বাজির সর্ত্ত অনুসারে সর্দ্দারের সর্দ্দারি কেড়ে নেওয়া হবে।

সর্দ্দারের বিশ্বাসের সঙ্গে চন্দ্রহাসের বিশ্বাসের ফারাক আকাশ-পাতাল। সর্দ্দার বুড়োর অস্তিত্বে বিশ্বাসই করেন না। মৃত্যু ব'লে কোথাও কিছু নেই। সুতরাং যৌবনের দল বুড়োটাকে ধ'রে আনবে কেমন করে? চন্দ্রহাস এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গোরা কেউ বুড়োটাকে দেখেনি, কেবল তার সম্পর্কে শুনেছে। পণ্ডিতজি তাদের বলেছে, 'সেই বুড়োটাই তো সব চেয়ে বেশি ক'রে আছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পাঁজরের ভিতরে তার বাসা।' পণ্ডিতেরা শাস্ত্রজ্ঞ। পুঁথির বুলি কখনো মিথ্যা হতে পারে? সর্দ্দার যে বলছে বুড়োর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না সে এ তো পুঁথির উল্টো কথা। বুড়োকে ধরে তারা আনবেই আনবে এবং সর্দ্দারের বিশ্বাস যে ভুয়ো তা হাতে হাতে প্রমাণ ক'রে দেবে।

সর্দ্দারের সঙ্গে বাজি রেখে সুরু হোলো দলবল নিয়ে

চন্দ্রহাসের বুড়ো ধরার অভিযান। কোন্ গুহার মধ্যে সে থাকে তলিয়ে! কেউ বলে সে সাদা মড়ার মাথার খুলির মতো, কেউ বলে সে কালো মড়ার চোখের কোটরের মতো! বুড়োটা যেমনই হোক যেখানেই থাক তাকে ধ'রে তারা আনবেই।

চলেছে যৌবনের দল চন্দ্রহাসকে দলপতি ক'রে তাকেই ধরতে যে আদ্যিকালের ভয়ঙ্কর বুড়ো। রাস্তার সবাই বলেছে সে ভয়ঙ্কর। বলেছে,'সেএকটা মুণ্ডু, একটা হাঁ, যৌবনের চাঁদকে গিলে খাবার জন্যই তার একমাত্র লোভ। কিন্তু চলতে চলতে চন্দ্রহাস ডুব মারলো কোথায়? অন্ধবাউল খবর দিলো চন্দ্রহাস গেছে তাকেই জয় ক'রে আনতে যাকে সবাই ভয় করে। চন্দ্রহাস ব'লে গেছে, 'বুড়োকে যদি ধরে না আনতে পারি তবে আমার কিসের যৌবন?

যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে। বসন্তের হাওয়ায় তারি ঢেউকে অনুভব ক'রেছে চন্দ্রহাস। চন্দ্রহাসের কাছে খবর এসেছে মানুষের লড়াই শেষ হয় নি। এভারেষ্টের চ্যালেঞ্জ এসেছে মানুষের কাছে। মানুষ বলেছে,এভারেষ্ট যত দুর্জয় হোক না কেন সেখানে আমি একদিন না একদিন পৌঁছাবোই। কত অভিযাত্রীর মৃত্যু হয়েছে, কত অভিযান সাফল্যমণ্ডিত হয় নি। কিন্তু শেষপর্য্যন্ত এভারেষ্টের গর্ব্ব চূর্ণ করে মানুষ সেখানে পৌঁছেছে। মেরুযাত্রীর মতো মৃত্যুর রহস্যদ্বার উদ্ঘাটন করবার জন্য মানুষও বেরিয়ে পড়েছে দুর্গমের অভিসারে। তার মৃত্যু-জয়ের এই মহা অভিযান কি সাফল্যে মুকুটিত হয় নি? সে জেনেছে তাঁকেই, যিনি আঁধারের পারে জ্যোতির্ম্ময় পরম পুরুষ। জেনে মৃত্যুকে সে জয় করেছে। যাকে মৃত্যু বলছি সে তো সত্তার অবলুপ্তি নয়, লোক থেকে শুধু লোকান্তরে গমন। শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় মৃত্যু একটা Departure মাত্র। মৃত্যুর রহস্য জানবোই। এই রহস্য জানতে গিয়ে যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করতে হয় তাতেও প্রস্তুত,-নচিকেতার এই জিজ্ঞাসু মনোভাবের মধ্যে কি আমরা দেখতে পাইনে যাকে এমার্সন বলেছেন, Military attitude of the Soul? মৃত্যুজয়ের যে বজ্রকঠোর সংকল্প, যে ক্ষাত্রভাব, যে নিঃশঙ্ক জিগীষা নচিকেতার মহাজিজ্ঞাসার' মধ্যে লক্ষ্য করবার বিষয় চন্দ্রহাসের বুড়োধরার প্রয়াসের মধ্যেও মানবাত্মার সেই একই শৌর্য্যের গরিমাময় প্রকাশ।

এর পরেই যৌবনের দলের মধ্যে চন্দ্রহাসের বহুবাঞ্ছিত আকস্মিক প্রত্যাগমন! তার অভিযান ব্যর্থ হয়নি। বুড়োকে সে ধরেছে। কিন্তু তাকে তো যৌবনের দল দেখতে পাচ্ছেনা। ইতিমধ্যে অন্ধ বাউলকে জিজ্ঞাসা করতেই জানা গেল বাউল সেই বুড়োকে দেখেছে এবং সেই বুড়োই তো বেরিয়ে এলো গুহা থেকে। কিন্তু ও তো বুড়ো নয়, ওবে সর্দ্দার! বুড়ো কোথায়? তবে চন্দ্রহাস কাকে ধরেছে? এইবার বিস্ময়ে অভিভূত সকলের সংশয়জাল ছিন্ন ক'রে সর্দ্দার বলে উঠলেন, "কোথাও তো নেই"। বুড়ো 'একটা স্বপ্ন'। চন্দ্রহাস তখন সর্দ্দারকে বললো, 'তবে তুমিই চিরকালের?' হাঁ, সর্দ্দারই শাশ্বত, নিত্য, সনাতন। সর্দ্দার ব'ললো, 'হাঁ আর আমরাই চিরকালের?' প্রশ্ন করলো চন্দ্রহাস। সর্দ্দার আবার জবাব দিলে, 'হাঁ'।

সর্দ্দার তো আর কেউ নন। সর্দ্দার সেই পরমসত্তা যিনি আছেন, ছিলেন এবং চিরকাল ধরেই থাকবেন। পরিবর্তনের খরস্রোতে জীবন-যৌবন-ধন-মান সবই যখন ভেসে যাচ্ছে তখন তিনি সেই অবিনাশী পরম বস্তু যিনি দাঁড়িয়ে আছেন সমস্ত পরিবর্তনকে অতিক্রম ক'রে, যা-কিছু ক্ষণিক, যা কিছু চপল তাদের পশ্চাতে, যা কিছু অনিত্য তাদের মধ্যেও। তিনি সেই অনন্ত প্রাণ যা

> "চুপে চুপে বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে
> লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
> বিকাশে পল্লবে পুষ্পে, বরষে বরষে
> বিশ্বব্যাপী জন্মমৃত্যু-সমুদ্র-দোলায়
> দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার-ভাটায়"।
>
> (নৈবেদ্য)

হাঁ, সর্দ্দার চিরকালের। "God is, was, and ever shall be." মৃত্যুর রহস্য জানবার জন্য চন্দ্রহাস যৌবনের দলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে প্রাণের সদর রাস্তায়। ঘরের কোণে থলিখানি আঁকড়ে বসে'

থাকতে পারলো না তারা। এ দুর্জ্জয় প্রেরণা তাদের মধ্যে এলো কোথা থেকে? চলতে চলতে তাদের মনে এসেছে অবিশ্বাস। 'সকালবেলাকার আলো কানে কানে বললে, সাবাস, এগিয়ে চলো—বিকেলবেলাকার আলো তাই নিয়ে ঠাট্টা করেছে'। এতবার তারা পণ করেছে, 'আমরা রাত্রি বেলাকার পাথরের মতো ঠাণ্ডা হয়ে বসে থাকবো'। কৈ, শেষপর্যন্ত তারা তো বসে থাকতে পারলোনা।

দুর্ব্বার এ প্রেরণা সর্দারের কাছ থেকেই শুধু আসতে পারে—মানুষের কাছ থেকে নয়। "Prayer of Columbus" কবিতাটিতে মার্কিন কবি এই ঐশী প্রেরণার দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত ক'রেই বলেছেন:

> "I am sure they really came from Thee,
> The urge, the ardour, the unconquerable wile,
> The potent felt, interior command, stronger than words,
> The message from the Heavens whispering to me even in sleep,
> These sped me on."

"আমি নিঃসংশয়ে জানি তারা এসেছিলো তোমারই কাছ থেকে,

ঐ প্রেরণা, ঐ উৎসাহ, ঐ অপরাজেয় সংকল্প,

ঐ মর্ম্মের গভীরে অনুভব করা অমোঘ নির্দেশ যার শক্তি বাক্যের তুলনায় কত ম্লান,

ঐ অস্ফুট দৈববাণী যা ঘুমের মধ্যেও এসেছে আমার কানে,

ওরাই তো আমাকে সম্মুখ থেকে সম্মুখের পানে চালিয়ে নিয়ে গিয়েছিল!"

"কলম্বসের প্রার্থনা" কবিতার এই ছত্রগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নিশ্চয়ই আমরা আরও স্পষ্ট ক'রে উপলব্ধি করতে পারবো কেন কবিশেখর সর্দারের পরিচয় দিতে গিয়ে মহারাজাকে নাটকের সূচনাতেই বলেছেন: "সে আমাদের কেবলই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।"

ব্রাউনিং-এর Paracelsus কবিতায় ঐ একই অমোঘ ঐশী প্রেরণায় অকুণ্ঠ স্বীকৃতি! জীবনের নাট্য-লীলায় একই 'restless irresistible force'-এর খেলাকে লক্ষ্য ক'রে প্যারাসেল্‌সাস্ বলছে:

> Is it for human will
> To institute such impulses? Still move.
> To disregard their promptings?

"মানবীয় ইচ্ছায়—। এই ধরণের প্রেরণাগুলিকে কি জন্ম দেওয়া সম্ভব? তাদের নির্দেশকে অমান্য করা কি কঠিনতর নয়?

ভিতর থেকে একটা উদ্দীপনা এবং দুর্ব্বার আবেগ মর্ম্মের গভীরে অনুভব করলে তবেই মানুষের জীবন অজানার ডাকে কলম্বাসের মতো সাড়া দিতে পারে। অমুক কাজ করলে আমি পুরস্কার পাবো, না করলে দণ্ডিত হবো—এই দণ্ড-পুরস্কারের লোভ আর ভয়ের বিবেচনা মানুষের আচরণগুলিকে অল্পই নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। মানুষের moral education-এ logical reasoning এর ভূমিকা মুখ্য নয়, গৌণ—এইতো মনস্তত্ত্ববিদ ম্যাকডুগালের কথা। বুকের মধ্যে ব'সে সর্দার যেখানে আমাদের জীবনতরীকে চালান সেখানেই শুধু আমরা বলতে পারি:

> "আমরা যাবো যেখানে কোনো
> যায়নি নেয়ে সাহস করি,
> ডুবি যদি তো ডুবিনা কেন,
> ডুবুক সবি, ডুবুক তরী। (হুইট্‌ম্যান্)

এ ন্যায়শাস্ত্রে পণ্ডিতের সতর্ক হিসাব-বুদ্ধির কথা নয়, এ হচ্ছে যুগে যুগে সত্যের জন্য মরিয়া হতে পেরেছে যারা সেই দুঃসাহসী পথিকৃতদের কথা।

বাউলকে চন্দ্রহাস মৃত্যুঞ্জয়ের অভিযানের প্রাক্কালে বলেছিলো, "যুগে যুগে মানুষ লড়াই করেছে। বসন্তের হাওয়ায় সেই সংগ্রামের খবর।' কথাটা আর একটু পরিষ্কার ক'রে বাউল বলেছে: "যারা অমর বসন্তের কচি পাতায় তারাই খবর পাঠিয়েছে। দিগদিগন্তে তারা রটাচ্ছে "আমরা পথের বিচার করিনি, আমরা পাথেয়ের হিসাব রাখিনি—আমরা ছুটে এসেছি, আমরা ফুটে বেরিয়েছি। আমরা যদি ভাবতে বসতাম তা হোলে বসন্তের দশা কী হোত?"

এ হোলো তাদেরই কথা যারা যুগে যুগে সংগ্রাম করেছে পৃথিবীর দুঃখতপ্ত প্রাণীদের আর্তনাদের জন্য, অজানাকে জানবার অদম্য পিপাসায় বেরিয়ে পড়েছে পথহীন কূলশূন্য সাগরের বুকে। সতর্কবুদ্ধির খেলা তাদের অভিযানের মধ্যে অল্পই আছে। যা বেশী করে আছে তা হ'চ্ছে জুয়ারির পাগলামি, Gambler's recklessness, সব পাওয়ার জন্য সব-হারানোর একটা divine insanity, নচিকেতা নিজের সুখসুবিধার দিকটাকে একান্ত বড়ো ক'রে দেখলে, যা প্রেয় তার আকর্ষণের দ্বারা চালিত হ'লে মৃত্যুর রহস্য জানবার জন্য রাজমুকুটের লোভ ত্যাগ করতে পারতেন ?

কিন্তু সর্দারই কি শুধু চিরকালের ? ঈশ্বরই কি শুধু নিত্য ? চন্দ্রহাস এবং যৌবনের দলও কি চিরকালের নয় ? জীবনের প্রান্তে এসে মানুষ তো শূন্যতায় বিলীন হ'য়ে যাচ্ছেনা। ঈশ্বর যেমন চিরকালের, মানুষও তেমনি চিরকালের। 'ফাল্গুনী' নাট্যকাব্যের মধ্যে ঘোষিত হয়েছে বিজয়ী প্রাণের এই জয়ধ্বনি। অন্ধবাউলের গানের মধ্যে চিরপ্রাণের জয়ধ্বনি। 'ফাল্গুনী'র মধ্যে "প্রাণ বলে উঠেছে, সুখে দুঃখে, কাজে বিশ্রামে, জন্মে মৃত্যুতে, জয় পরাজয়ে, লোকে লোকান্তরে জয় এই আমি আছির জয়, জয়, এই আনন্দময় আমি-আছির জয়।" মানুষের আত্মার এই জয় যাত্রাকে কে রুখবে ?" তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে, নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।"

"যাত্রী আমি ওরে
চলতে পথে গান গাহি' প্রাণ ভ'রে।
দেহ-দুর্গে খুলবে সকল দ্বার,
ছিন্ন হবে শিকল বাসনায়,
ভালোমন্দ কাটিয়ে হবো পার

চলতে রবো লোকে লোকান্তরে। (গীতাঞ্জলি)

মানুষের আত্মা চিরস্বয়ম্বরা বধূ, পরমাত্মাকে আস্বাদন করবার জন্য কত জন্মমৃত্যুর খেয়াতরী বেয়ে লোক হ'তে লোকান্তরের পানে চলেছে। বুড়োটা নেই কোথাও, মৃত্যু একটা স্বপ্ন। 'ফাল্গুনী' নাট্যকাব্যের মূল সুরটী 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের দুটী ছত্রে পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে এবং এই দুটী ছত্র হোলো :

'কোথা লোক, কোথা রাজা, কোথা ভয় কার।
তুমি নিত্য আছ, আমি নিত্য সে তোমার॥"

জীবনের বর্ডার-লাইনে এসে। এপারের যাত্রাপথ যেখানে ফুরিয়ে গেলো সেখানে দিনের আলোর এই জগৎটা হারিয়ে গেলো কি পরপারের ঐ নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যে ? সেই অন্ধকারের বুকের মধ্যে কি আলোর চিহ্নমাত্র নেই ? সেই অন্ধকারের মধ্যে নিষ্প্রাণ আমি কি একটা শূন্য ? একটা প্রকাণ্ড না ?"

ফাল্গুনীর অন্ধবাউল বলছে "সূর্য্য যখন ডুবে গেল তখন দেখি অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। সেই অবধি অন্ধকারকে আমার আর ভয় নেই।"

তুমি সর্বাশ্রয় একি শূন্য কথা
ভয় শুধু তোমা পরে বিশ্বাসহীনতা
হে রাজন ! (নৈবেদ্য]

এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য আলোর জগৎটাকে একান্ত সত্য বলে জানার মোহ থেকে মুক্তিই হোলো আসল মুক্তি। যাকে অন্ধকার বলে মনে করছি তারও বুকের মধ্যে আলো।

একদিন এই ভারতের তপোবনচ্ছায়ায় ঋষি অন্ধবাউলের মতোই দেখেছিলেন অন্ধকারের বুকের মধ্যে আলো। আর বলেছিলেন, জীবনের মধ্যে যে অসীম প্রাণ-সমুদ্রের তরঙ্গলীলা—মৃত্যুর অন্ধকার বলছি যাকে সেই অন্ধকারের মধ্যেও সেই একই প্রাণ-সিন্ধুর তরঙ্গ-দোলা। ফাল্গুনীর বোঝাপড়ার গানের মধ্যে আছে :

"মরণ মাঝে অমৃতকে জেনেছ ?
জেনেছি"।

এমনি ক'রে মরণমাঝে অমৃতকে যাঁরা জেনেছেন তাঁরা ক্ষয়ক্ষতির ভাবনা থেকে চিরকালের জন্য মুক্তি পেয়েছেন। 'ফাল্গুনী' নাটক শেষ হয়েছে গান দিয়ে এবং গানটা হোলো উৎসবের গান। এই উৎসবের গান গেয়েছে সবাই মিলে। সমবেতকণ্ঠের সঙ্গীতে বেজে উঠেছে এই মাভৈঃ মন্ত্র,

"অকূল প্রাণের সাগরতীরে
ভয় কীরে তোর ক্ষয়-ক্ষতিরে !"

যেখানে আমরা চলি সেখানে আমরা বাঁচি। রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে জীবনের জয়ধ্বনি। 'ফাল্গুনী'তে প্রাণের স্তবগান।

আমি তো মৃত্যুর গুপ্ত প্রেমে
রবোনা ঘরের কোণে থেমে।
আমি চিরযৌবনেরে পরাইব মালা
হাতে মোর তারি তো বরণডালা।(বলাকা)

'ফাল্গুনী'তেকবি চির যৌবনকে মালা পরিয়েছেন। চন্দ্রহাস এই চিরযৌবনের প্রতীক। সে কবি বাউলের চেলা। সে বৈরাগী। সে পথিক। সে কেবলি চলে। নামের মোহ নেই তার। আরাম সে চায় না। শান্তিতে সে প্রলুব্ধ নয়। সঙ্কট থেকে সঙ্কটের মধ্যে সে চলেছে মৃত্যুর রহস্য ভেদ করতে। 'ফাল্গুনী' নাটকের আগাগোড়া চলমান যৌবনের দৃপ্ত পদধ্বনিতে মুখর। যাত্রার আনন্দ গান ধ্বনিত হচ্ছে বলাকা কাব্যের প্রত্যেকটি কবিতায়। 'ফাল্গুনী' নাটকেও চন্দ্রহাস এবং যৌবনের দল চরৈবেতি মন্ত্রে দীক্ষা নিয়ে পথকেই বরণ করেছে। তাদের দৃষ্টি সম্মুখের পানে। তারা কলস্বাসের সগোত্র 'বলাকা' কাব্যে যে চলার অমৃত গান আমাদের প্রাণকে এবং কানকে মুগ্ধ করে যে,

"চলার অমৃত গানে
নবীন যৌবন
বিকশিয়া ওঠে প্রতিক্ষণ"

সেই চলার একই অমৃতগানের দিব্যসুর ধ্বনিত হচ্ছে ফাল্গুনী নাট্যকাব্যের অঙ্কের পর অঙ্কে, গানের পর গানে, কবিবাউলের চেলাদের কথোপকথনে। ফাল্গুনীতে বসন্তের হাওয়া বইছে ঠিকই কিন্তু সেই হাওয়া লড়ায়ের ঢেউ। যৌবনের দল পুঁথির উল্টো কথা বলে। তারা ভালোমানুষ নয়। 'ফাল্গুনী'তে জিগীষু আত্মার মৃত্যুজয়ের অভিযানের প্রেরণায়।

প্রায়শ্চিত্ত

প্রিয়দাস পাঠক

১

সেকালের কথা। তখনও বহুবিবাহ আইন করিয়া বন্ধ করা হয় নাই। বাল্য বিবাহও অবাধে প্রচলিত ছিল। প্রাণ সেবাদাসের পিতামাতা পুত্রের নামকরণ করিবার পর হইতেই তাহার জীবন সঙ্গিনী সন্ধানে আত্মনিয়োগ করিলেন। সেবাদাস-পরিবার এই সময়ের আরও বহু পূর্ব্বেই বাংলা দেশে আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। প্রথমতঃ উদ্দেশ্য ছিল মজুরী করিয়া খাওয়া। কিন্তু পরে ক্ষুদ্র দোকানপাট করিয়া কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হওয়ায় বাংলা দেশেই একটি রেল পথের নিকটবর্ত্তী গ্রামে জমিজমা ক্রয় করিয়া পাকাপাকি বসবাসের আয়োজন করিয়া লইয়া পরিবারস্থ লোকেরা নিজ দেশের সহিত সকল সংশ্রব ত্যাগ করিয়া বাংলা দেশের বাসিন্দা হইয়া যায়। তাহাদিগের স্বজাতি আরও কোন কোন পরিবারও ঐভাবে বাংলা দেশে বসবাস আরম্ভ করে। আচার-ব্যবহারে কিছু কিছু নিজত্ব রক্ষা করিয়া চলিলেও এই সকল বাংলা প্রবাসী পরিবার এক প্রকার বাঙ্গালীই হইয়া গিয়াছিল। ইহারা বিবাহাদি নিজেদের মধ্যেই করিত; বাহির দেশের বধূ ও জামাতা আনয়ন প্রয়োজন মনে করিত না।

প্রাণ সাড়ে তিন বৎসর বয়সে প্রথম পাণিগ্রহণ করিল এক সপ্তদশ বৎসর বয়স্কা তরুণীর। বাসর-ঘরে বধূকে দেখিয়া বিকট আর্ত্তনাদ সহকারে মাতৃক্রোড়ে গমন চেষ্টা করাতে মাতা তাহাকে সবল হস্তে পত্নীর দিকে ঠেলিয়া দিলেন। প্রাণ চিৎকারের মাত্রা চতুর্গুণ করিয়া অর্দ্ধাঙ্গিনীর হস্তে আঁচড় লাগাইয়া দেওয়ায় তরুণী প্রবলভাবে তাহাকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিল। প্রাণের পিতামহী তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া মুখে নাড়ু ভরিয়া দিয়া তাহার ক্রন্দন থামাইলেন। পত্নী চমৎকারিণী স্বামীর এই ব্যবহারে তাহার প্রতি বিবাহিত-জীবনের সেই প্রথম দিনের শাসন ইচ্ছা পরবর্ত্তী জীবনে বরাবর অন্তরে সদাজাগ্রত রাখিয়া চলিত। সুবিধা পাইলে প্রবলভাবে প্রাণের চলাফেরা নিয়ন্ত্রিত করিয়া অথবা তাহার অঙ্গে শাসনের তীব্র স্পর্শ লাগাইয়া পতিব্রত্য পালনে যত্নবতী হইত। এইভাবে বিবাহিত-জীবনের আনন্দ বিহ্বল দিনগুলি কাটিয়া যাইতে লাগিল এবং প্রাণ ক্রমে ক্রমে হাম, জলবসন্ত দাঁত পড়া দাঁত ওঠা, কান-পাকা ও চোখ-ওঠা ইত্যাদি কায়িক পূর্ণতা প্রাপ্তির পথের বাধাবিঘ্ন পার হইয়া সাত বৎসর বয়সে দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিল। চমৎকারিণীর সপত্নীর বয়স চার বৎসর, মস্তক দীর্ঘ কেশ লাভ আগ্রহে সদ্য মুণ্ডিত, স্বভাব অকারণ ক্রন্দনকাতর চাল চলনে ব্যবহারে স্ত্রী সুলভ লজ্জাশীলতার ও বাক্য সম্বরণ ক্ষমতাও চেষ্টার অভাব লক্ষিত হইলেও তাহার পিতৃকুলের ঐশ্বর্য্যের জন্য ঐ সকল কথা লইয়া শ্বশুর-কুলে কেহ কোনপ্রকার ক্ষোভ প্রকাশ করিল না। সাত বৎসর হইতে না হইতে দুই বার বিবাহ করার কারণ ছিল প্রাণের স্বজাতির ভিতর কৌলিন্য। ঐ কুলমর্য্যাদা শুনা যায় এতই অধিক ছিল যে বাদসাহী ঢং এ প্রাণ ইচ্ছা করিলে বহু পরিবার হইতেই পত্নী আনিতে সক্ষম হইত। শুধু উহার পিতা দরদস্তর করিয়া ও সুবিধা বুঝিয়া চলিতেন বলিয়াই বিবাহ করাটা তেমন বিস্তৃত হইতে পারে নাই। বিলাসিনীকে দেখিয়া পূর্ণযৌবনা চমৎকারিণী হাসিয়া বলিল, "এত দিনে বরের উপযুক্ত বউ এল। এক সঙ্গে চান

করিয়ে দিলে মেহন্নত কম হবে। আর ঝগড়া মারামারি ত চলতেই থাকবে। কে কার খেলনা নিল আর হারিয়ে ফেলল তার হিসাব রাখতেই মাথা খারাপ হয়ে যাবে। আমারও যেমন পোড়াকপাল খোকা বর আর খুকী সতীন, আর আমি নিজে ত বুড়ি হয়ে মরতে চলেছি। পাড়ার মেয়েরা বলে, "না না, তোমার আবার কি বয়েস হয়েছে? আর কুল রক্ষার বিয়ে ওতো ওরকম হয়েই থাকে। আইবুড়ো থেকে যাওয়ার থেকে এই বা কি খারাপ?" চমৎকারিণীর ঐ জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী না হ'লেও ব'লত, "যার যেমন কপাল। বিয়ে হয়েও ত অনেকে এক দিনেই বিধবা হয়ে যায়। এও একরকম তাই।" অন্যেরা বলিত, "বালাই, ষাট, ছিঃ ছিঃ অমন কথা মুখে আনতে নেই।" চমৎকারিণী "গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিলাসিনীকে একটা ভাল রকম চিমটি কাটিয়া কাঁদাইয়া দিল। বিলাসিনীর বিকট চিৎকারে তাহার বাপের বাড়ীর পরিচারিকা দৌড়াইয়া আসিল "কি হয়েছে বিলু কি হয়েছে?" চমৎকারিণী বারান্দায় পিপীলিকা বধের অভিনয় করিতে ব্যস্ত। যেন পিপীলিকার কামড়েই বিলাসিনী কাঁদিয়া উঠিয়াছে। সন্দেহ করিল ঠিক কি হইয়াছে কিন্তু সাহস করিয়া কিছু বসিল না। কিন্তু যখন প্রাণ নব বধূকে ধাকা দিয়া ফেলিয়া দিল তখন সে আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না" ওমা ওমা কি ঘেন্না, ছোট-লোকের মত ইস্তিরীর গায়ে হাত তোল? দাঁড়াও দিকি শাউড়ী ঠাকরুণরে কয়ে আসি।" প্রাণ ভয়ে বলিল" না না বলিস নি। আর ধাকা দোব না।" বিলাসিনী আর একবার চিৎকার করিয়া উঠিল এবং প্রাণের মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি হইয়াছে। প্রাণ বলিল "পড়ে গিয়েছে"। তাহার মাতা বলিলেন "তুই দেখতে পারিস না? তোর বোউ।" প্রাণ বলিল' হুঁ, বউ না ছাই।

তখন সর্বত্র ইংরেজী পড়া আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ইংরেজী পড়িলে উচ্চরাজকার্য্যে নিযুক্ত হওয়া যায়। সুতরাং ইংরেজী পড়ার প্রচলন দ্রুত বর্দ্ধনশীল হইল। একজন ভারতীয় খৃষ্টান যুবক প্রাণকে পড়াইতে আসিত। প্রাণ এ বি সি ও ওয়ান টু থ্রির অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করিয়া হায়রান হইয়া উঠিল। ওয়ান টু থ্রি অর্থে এক দুই তিন কিন্তু এ বি সির অর্থ কি? মাষ্টারমশাই এই অর্থহীনতার অর্থ বুঝাইতে না পারায় এবং স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণ প্রভৃতি বাক্য উচ্চারণ করিয়া জটিলতা আরও অধিক জটিল করিয়া তোলায় ইংরেজী শিক্ষার সহজ অগ্রগমনে বাধা পড়িতে লাগিল। প্রাণ প্রাণপনে কোন অর্থ না বুঝিয়া এ বি সি বলিয়া যাইতে থাকিত। তাহার একই কথা বারম্বার পুনরাবৃত্তির ফলে চমৎকারিণীরও ইংরেজীশিক্ষা হইতে লাগিল। দুই তিন মাস ধরিয়া ঐ পাঠ চলিতে থাকিল ও তাহাতে ডি ই এফ ও ফোর ফাইভ সিক্স অবধি প্রায় আরব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু শিক্ষার গতি সরল সহজভাবে চলন্ত থাকে কি করিয়া? চমৎকারিণী প্রবল হস্তে স্বামীর উচ্চপদে প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করিতে গিয়া একটা তুমুল কোলাহলের সৃষ্টি করিয়া সকলের জীবন দুর্বিসহ করিয়া তুলিল। 'ওরে হতভাগা ছেলে, বলি লেখাপড়া না করে শুধু একটার পর একটা বিয়ে করেই দিন কাটাবি না কি? পড় বলছি, নয়ত ঠোক্কর দিয়ে মাথায় ডি ই এফ ঢুকিয়ে দেব।' পত্নীর জোরাল হাতের পরিচয় প্রাণ শিশুকাল হইতেই পাইয়া আসিয়াছে, তাই সে ভয়ে পড়া মুখস্থ করিতে বসিয়া যাইত। ফোর ফাইভ সিক্স; ডি ই এফ শব্দে প্রগতিশীল বঙ্গ প্রবাসী পরিবারের গৃহ মুখর হইয়া উঠিত। প্রাণের পিতা পুত্রের জজিয়তি ক্রমে নিকটে আসিতেছে দেখিয়া আর একটা পাকাদেখা সম্পন্ন করিয়া লইলেন। প্রাণ একদিন সাজগোজ করিয়া আর একটি শিশু-পত্নীর পাণিপীড়ন করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তন করিল। দ্বিতীয়া পত্নী বিলাসিনী ও তৃতীয়া উল্লাসিনী পতিগৃহে অধিকদিন থাকে নাই। কারণ তাহাদের লালনপালনের ভার নিজ নিজ পিতামাতার উপরেই ন্যস্ত ছিল। শ্বশুরালয়ে গমনাগমন শুধু সামাজিক প্রথা-

অনুযায়ী ভাবেই কখন সখন হইত। চমৎকারিণী শ্বশ্রূমাতার প্রিয় পুত্রবধূ ও গৃহের বড় বৌ বলিয়া তাহার পদমর্যাদা গৃহকর্ত্রীর সমান সমান ছিল। প্রাণ মাতা অপেক্ষা পত্নীকেই ভয় পাইত অধিক কেননা পত্নী প্রয়োজন হইলেই তাড়না অস্ত্রে বালকপতির অন্তরে কর্ত্তব্যবোধ ও উচ্চাকাঙ্খা জাগ্রত করিবার ব্যবস্থা করিত। পিতামাতাকে ইহাতে কোন আপত্তি করিতে দেখা যাইত না; কারণ একমাত্র পুত্রের শাসনভার অপরে লইলে তাহাদিগের জীবন অপেক্ষাকৃত সুখময় থাকিত। স্বামীর বয়স নয় বৎসর ও স্ত্রী তেইশ হইলে বিষয়টা ঠিক শোভন হয় না একথা সকলেই স্বীকার করিবে; কিন্তু অরক্ষণীয়া কন্যাকে উপযুক্ত পাত্রে অর্পণ করিবার গুরুত্ব বয়স কম বেশী দিয়া বিচার করা হয় না, করা হয় মূল্য দিবার ক্ষমতা দিয়া। চমৎকারিণীকে উপযুক্ত বয়সের পাত্রের সহিত বিবাহ দিতে হইলে তাহার পিতার অন্ততঃ আরও দশহাজার টাকা অধিক ব্যয় হইত। সে অর্থ কোথা হইতে আসিত, আর সর্ব্বস্ব দিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহ দিলে যে অপর দুই কন্যার বিবাহ তখনও হয় নাই, তাহাদের কি ব্যবস্থা হইত? এই সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গিয়াছিল সাড়ে তিন বৎসরের উপযুক্ত পাত্র প্রাণের সহিত চমৎকারিণীর বিবাহ তিন হাজার টাকা যৌতুকে সম্পন্ন করিয়া। প্রথমা কন্যা ছোটঘরে পড়িলে অপর দুই কন্যার বিবাহ প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইত। ঐ বিবাহ বয়সের পার্থক্যে যতই অন্যায় ও অশোভন মনে হউক না কেন, অর্থনীতির দিক সংরক্ষিত রাখিয়া সামাজিক রীতি রক্ষা অপর কোন উপায়ে হইত না। চমৎকারিণী বালক-স্বামীকে গড়িয়া পিটিয়া মানুষ করিতে করিতে সামাজিক রীতিনীতি প্রবর্ত্তকদিগের মুখাগ্নি করিতে থাকিলেও এ কথা সুস্থির যে তাহার সমাজে সে যদি অবিবাহিতা থাকিত তাহা হইলে তাহার কোন মর্য্যাদা থাকিত না; এবং যদি কোন বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইত তাহা হইলে সেই 'ঘাটের মড়া' পরলোক গমন করিলে বিধবা অবস্থায়ও তাহার জীবন দুর্বিসহ হইত। এই যাহা হইয়াছে তাহাতে বৈধব্যের সম্ভাবনা বিশেষ নাই এবং সংসারের বড় বউ হিসাবে তাহার প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা অটুট।

"পোড়া কপালে ছেলে, বছর ঘুরে গেল এখনও এল, এম, এন, ও পি করছিস, আর সেভেন্টিনের পরে এইট্টিন না বলে যা খুসী তাই বলছিস, দোব ঘা কতক পিঠে? আমার জেড অবধি শেখা হয়ে গেল আর টোয়েন্টি পার হতে চলল আর তুই বেটা ছেলে তোর মাথায় আছে খালি ডাণ্ডাগুলি আর কাঁচা আম। পড় ঠিক করে, নয়ত ভাল করে ওষুধ দিয়ে দেব!"

'পড়ছি ত। মনে থাকেনা ত' কি করব'।

'মনে থাকেনা?' (কর্ণ মর্দনান্তে) 'এখন মনে থাকছে'?

'উঃ, মা! হ্যাঁ মনে থাকছে। আর টানিসনি'।

মাতা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'চেঁচাচ্ছিস কেন, হতভাগা'?

'বড়বৌ মারছে দেখনা'।

'কখন আবার মারলাম? লজ্জা করেনা মিথ্যে কথা বলতে? পড়তে বলছি তা আবার মিথ্যে নালিশ?'

মাতা বলিলেন, 'মন দিয়ে লেখাপড়া কর' বলিয়া নিজকার্যে গমন করিলেন। চমৎকারিণী তখন প্রাণকে সবল হস্তে ধরিয়া বলিল, 'এবার কি হবে'?

'মারিসনি, মারিসনি। পড়ছি ঠিক করে। উঃ কানদুটো জ্বালা করছে'।

'ঠিক করে পড়। নয়ত জ্বালা কাকে বলে বুঝিয়ে দেব।'

বড়বৌ-কে সকলেই ভয় করিয়া চলে। কারণ সে শাশুড়ীর দক্ষিণ হস্তের মতই সকল কার্য্যে প্রধান সহায়ক। চাকর বাকর ক্ষেত-খামারের লোকজন, গোয়ালা, জেলে, আর যে কেউ গৃহ-কর্ম্মের সহিত সংযুক্ত সকলেই বড়বৌকে মানিয়া চলে। গুরুজনদিগের সম্মুখে মৃদুকণ্ঠে কথা বলিলেও বড়বৌ-এর একটা জোরাল গলাও ছিল। মনোভাব ব্যক্ত করিবার উপযুক্ত

ভাষাজ্ঞান অর্থাৎ যাকে বলে কথার বাঁধুনি তাহাও ছিল বেশ। সেই কারণে তাহাকে খুশী রাখিয়া চলাই সহজপথ বলিয়া সকলে বুঝিত। দেওয়ার হাতও বড়বৌয়েরই, সেইজন্য তাহার পদমর্যাদা আরও সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। পাড়ার ছেলেরাও প্রাণের সহিত কোন ঝগড়াবিবাদ হইলে তাহা লইয়া চমৎকারিণীর নিকটেই উপস্থিত হইত, কারণ চমৎকারিণীর স্থান 'ও বাড়ীর বড়বৌ' হিসাবে তাহাদিগের নিকট অতি উচ্চেই ছিল। চড়ুইভাতির মালমশলা সংগ্রহে বড়বৌয়ের ঔদার্য্য সর্বজনস্বীকৃত ছিল। সুতরাং বালকদিগের উপরে যে তাহার প্রভাব থাকিবে সে কথা বলাই বাহুল্য। প্রাণও দেখিত যে স্থানীয় সামাজিক পরিস্থিতিতে তাহার অপেক্ষা বড় বউই অধিক প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম; সুতরাং তাহার বড়বৌ-ভীতি ও ভক্তি বয়সের সহিত বাড়িয়া চলিতে লাগিল। তাহার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করিতে হইলে পাড়ার ছেলেরা বড় বউয়ের নিকটেই আসিয়া উপস্থিত হইত। প্রাণের কোন দোষ দেখিলে চমৎকারিণী কঠিন হস্তে তাহাকে দমন করিতে দ্বিধা করিত না। পিতামাতাও পুত্রের শাসনভার বহন করিতে হয় না দেখিয়া নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিতেন।

এইভাবে আরও দুই তিন বৎসর কাটিয়া যাইল ও ঐ সময়ের মধ্যে প্রাণের ইংরেজি শিক্ষা কিছুটা অগ্রসর হইয়া সে অল্প অল্প ইংরেজি কথা বলিতেও শিখিয়া লইল। চমৎকারিণী পর্দার আড়ালে বসিয়া সকল কথা শুনিত। মাষ্টার চলিয়া যাইলে পতির পুস্তক, লেখার খাতা প্রভৃতি দেখিয়া, পড়িয়া এবং অন্য একটা খাতায় লেখা মক্স করিয়া সে নিজেও ইংরেজি অনেকটা শিখিয়া লইল ব্যাপার দেখিয়া পিতামাতার গৃহের বধূর উপর নির্ভর আরও বাড়িয়া চলিল। সেই কারণে যখন প্রাণের দশ বৎসর বয়স এবং তাহার একটা বিশেষ অর্থকরী বিবাহের সম্বন্ধ আসিল তখন পিতা বলিলেন বড় বৌ এর মত জানা প্রয়োজন হইবে। মাতা গিয়া কথাটা বড় বৌ এর নিকট বলিতে বড় বৌ বলিল, "কত টাকা দেবে?" টাকার পরিমাণ শুনিয়া বড় বৌ বলিল, "খোর পোষ, ওষুধ-পথ্যি দেওয়া থোয়া, দাই চাকর বদ্যি হাকিম হিসেব করলে ঐ টাকায় কোন লাভ থাকে না। শুধু শুধু বাড়ীতে লোক বাড়িয়ে কোনও লাভ হয় না। বিলাসিনী আর উল্লাসিনী এখানে থাকে না বলেই আপনারা বোঝেন না যে মানুষ বাড়লে খরচ কত হয়। মাতা বলিলেন, "তা যা বলেছ মা, আমরা বেশ আছি গুছিয়ে গাছিয়ে। শুধু ওরই টাকার নাম শুনলে আর মাথা ঠিক থাকে না।" পিতা বিষয়টির ভিতরের অর্থনীতির কথা শুনিয়া অনেক হিসেব করিয়া অবশেষে বলিলেন "বড় বৌ ঠিকই বলেছে। ও টাকা প্রথমে ঘরে এলেও শেষ পর্যান্ত বেরিয়েই যাবে। আচ্ছা, থাক, আর বিয়ের কথা। লেখাপড়া করতে তা ছাড়া হয়ত কলকাতা যেতে হবে। সেখানে বড় বৌ যদি সঙ্গে থাকে তাহলে এখানে তোমার একলার হাতে অত সামাল দেওয়া হয়ে উঠবে না।।"

বড় বৌ প্রাণকে আড়ালে এক সময় সজোরে ঝাঁকড়ানি দিয়ে বল্লে, "তোর আর একটা বিয়ে দিচ্ছিল, শুনেছিস!"

প্রাণ জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বিয়ে কেন দিচ্ছিল?"

"সেই কথাইত আমিও শুধোই। তোর আবার বিয়ে দিতে গেল কেন?"

"আর তুইত আমাকে খালি মারিস। বউরা কখনও মারে বরদের?"

"হ্যাঁ, তেমন বর হ'লে মারে বইকি। তোকে না মারলেত তুই মুখ্যু হতিস। মেরেত একটু ইংরিজি শিখেছিস।"

"তা ঠিক। কিন্তু বৌরা ঘোমটা দিয়ে গয়না পরে চুপ ক'রেবসে থাকে।"

"ওমা! অনেক কথা শিখেছিস যে! তা তুই রোজগার করে আমায় গয়না কাপড় কিনে দিস, তখন আমিও ঘোমটা দিয়ে চুপ করে থাকব এখন।"

"হেঃ ও কথা বল্লেই হ'ল। বাবা অবধি তোর

কথা শুনে চলে।" এই প্রকার প্রেমালাপের পরে প্রাণ গ্রামের পথে ভ্রমণে বহির্গত হইল। ছেলেরা বলিল "এত দেরি করে এলি যে?" প্রাণ বলিল "এত সহজে কি আর ছুটি পাওয়া যায়। মা, বাবা, বড়বৌ, মাষ্টার সবাই মিলে পেয়েছে আমায় হুকুম চালাতে। বড় হ'লে দেখে নেব কে কাকে কত হুকুম দেয়!"

"হঁ্যা তুই আবার দেখে নিবি! এর পর তোকে কলকাতায় ইস্কুলে পাঠিয়ে দেবে; সেখানে আবার ওদের কথায় উঠবি 'বসবি।"

"কেন? কলকাতায় কি কেউ নিজের ইচ্ছেয় চলতে পারে না!"

"উঁহু, কেউ না। শুধু খাতায় লিখে দেয় কোন সময় কি করতে হবে আর সেই রকম করতে হয়।"

"না করলে কি হয়?"

"না করবে কি করে? অত টাকা খরচ করে কলকাতায় গিয়ে কি ডাণ্ডাগুলি খেলবি না কি? আর বাড়ীর লোকেরা তোকে যা খুসী তাই করতে দেবে যেন?"

প্রাণ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া কলিকাতা গমনের কোন সার্থকতা উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইল না। খেলাধুলার পরে গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা কলকাতায় যাব নাকি?" মা বললেন, ও সব কথা আমি জানিনা বাবা। ও তোমার বাবা জানবে, আর জানবে বড়বৌ। আমি কলকাতা যাবও না আর সেখানের খবরও রাখিনা।" পিতা অন্তত কিছু জানেন সুতরাং মাকে বলিল, "বাবাকে জিগেস করে নিয়ে আমায় বোলো। কলকাতা গেলে কবে যাব, সঙ্গে কে যাবে; এই সব খবর আর কি।" মা বলেন "ও সব কথা জেনে তোর কি হবে? তুই যদি পড়তে যাস ত সেখানে গিয়ে পড়বি। তিনচার বছর পড়বি আর পরে বড় কাজ করবি।"

"হেঃ কাজ করব। আমায় কে কাজ দেবে?"

"এখন না দিলে পরে ঠিক দেবে। ভাল করে ইংরিজি শিখে নিলে পরে।"

২

কলিকাতা যাইবার ব্যবস্থার মধ্যে বড় কথা ছিল শিক্ষার উন্নতি। কিছুটা অন্তত এমন করিয়া লওয়া যাহাতে কলিকাতার স্কুলে পাঠ করা সম্ভব হয়, এই ব্যবস্থা করিতে করিতে প্রাণ দ্বাদশ-বৎসরে পদার্পণ করিল। ইংরেজি অনেকটা রপ্ত হইল। হস্তাক্ষর, অঙ্ক ও অন্যান্য বিষয় কতকটা আয়ত্ত করা হইল। চমৎকারিণী দেখিয়া শুনিয়া অনেক কিছু শিখিয়া লইল। তাহাকেও কলিকাতায় যাইতে হইবে। বালক-পতির রক্ষণাবেক্ষণের ভার তাহার উপর। প্রাণের পিতা অল্পদিনের জন্য কলিকাতা যাইবেন কিন্তু পরে এক সম্বন্ধে খুল্লতাত ও বড়বৌই সকল দিক সামলাইবে বলিয়াই স্থির হইল। কলিকাতায় একটা দুতালা বাড়ীতে দুইখানা ঘর, রান্নাঘর, স্নানাগার ভাড়া করা হইল। ঐ বাড়ীতে জানাশোনা লোকেদের বাস। তাহাদের ছেলেরা যে স্কুলে পাঠ করিত প্রাণকেও সেই স্কুলেই ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। প্রাণের কলিকাতা প্রবাসের সাজ-সরঞ্জাম গোছান আরম্ভ হইল। কেহ বলিল "ঐ সব কাপড় চোপড় কলকাতায় কেউ পরে না।" কেহ বলিল "কলকাতার লোক কাচের বাসনে খায়, থালা ঘটি সেখানে চলে না।" কিন্তু ঐ সকল ওজর-আপত্তি না শুনিয়া চমৎকারিণী নিজের বাসনকোসন গুছাইয়া লইল। প্রাণের বস্ত্রাদিও যাহা যাহা ছিল লওয়া হইল। তারপর দিনক্ষণ দেখিয়া একদিন সকলে কলিকাতা যাত্রা করিল। প্রাণের পিতামাতা, প্রাণ ও চমৎকারিণীর সহিত চলিলেন নিকট আত্মীয় খুল্লতাত। একজন ভৃত্য ও একজন পরিচারিকাও চলিল। বিলাসিনী ও উল্লাসিনী পিত্রালয় হইতে একবার পতিগৃহে আসিয়া ঘুরিয়া যাইল। বিলাসিনীর বয়স এই সময় নয় বৎসর ও উল্লাসিনীর ছয়। তাহাদিগকে দেখিয়া প্রাণ মুখ বিকৃতি ব্যতীত অপর কোন প্রণয় জাগরণের লক্ষণ দেখাইল না। চমৎকারিণী উহাদিগকে দেখিয়া সহাস্যমুখে অভ্যর্থনা করিল ও বলিল, "কলকাতা যাবি?" সমস্বরে উত্তর হইল "ও বাবা না। ওখানে

অনেক ছেলেধরা আছে।" চমৎকারিণী বলিল, "তোদের কেউ ধরবে না। চল, চিড়িয়াখানা দেখবি।" ইহাতে কোন ফল হইল না। উল্লাসিনি বলিল, "থলিতে ভরে নেবে।" বিলাসিনী মুচকি হাসিয়া বলিল, "এখন যাব না। পরে আবার আসব তখন যাব।" চমৎকারিণী উহাদের দুই চুবড়ি পেতলের খেলার বাসন দিয়া বলিল, 'রান্না করতে শিখে নে, তারপরে কলকাতায় গিয়ে ঘরকন্না দেখবি। আমি তখন কাশীবাসী হ'ব।" প্রাণ মুখ বিকৃত করিয়া বলিল, "ওইগুলো আবার রান্না করবে! শুধু খেতেই জানে।" চমৎকারিণী বলিল, "তুই নিজে রাঁধতে জানিস, যে কথা কইছিস?" প্রাণ বলিল "আমি পুরুষ মানুষ, আমি কেন রান্না করব?"

"হ্যাঁ, তুই মস্ত পুরুষ মানুষ! তোকে দেখলেই সকলে ভয়ে ইঁদুরের গর্তে লুকোয়।"

"একবার বড় হই তখন দেখিয়ে দেব তামাসা।"

"এখন তামাসা না দেখিয়ে লেখাপড়া ঠিক করে শেষ করলেই আমরা সকলে তোমার পায়ের ধুল নেব। আর লেখাপড়া যদি না কর তাহলে কতবড় পুরুষ মানুষ তা ভাল করে বুঝিয়ে দেব।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমায় বলতে হবে না..."

"না হলেই তোমার পক্ষে ভাল। আমরা সব তোমার সেবা করব আর তুমি কুঁড়েমি আর বাঁদরামি করে সব কিছু পণ্ড করবে তা হলে চলবে না। আমাদের যদি খাটুনিই সার হয় আর তুমি যেমন মুখ্যু তেমনি মুখ্যুই থেকে যাও, তাহলে তোমারও কপালেও চড়টা চাপড়টা এসে যাবে।"

"আরে, না না! আমি ঠিক পড়ব, চড় চাপড় মারতে হবে না।"

"তা না হলেই ভাল।"

কলকাতায় পৌছে ঘোড়ার গাড়ীতে বাসায় যেতে ঘণ্টাখানেক সময় লাগল। গাড়ীর ভিতরে পাঁচজন ও ছাদে মালপত্রসমেত দুই তিনজন ইহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশ্বগুলির গতিবেগ, প্রায় মানুষের হাঁটিয়া চলার মতই হইতেছিল। অবশ্য প্রথম কলিকাতা দর্শনের উত্তেজনায় সেই কথাটি কেহ বিশেষ মনে রাখে নাই। সে সময়ে কলিকাতায় মোটর গাড়ী, বাস, লরি ত ছিলই না; রিকশাও তখন কলিকাতায় আসে নাই। ট্রাম ছিল, কিন্তু ঘোড়ায় টানা। বিজলি-বাতি ছিল না বলিলেই চলে. গ্যাসের আলো কোথাও কোথাও জ্বলিতে দেখা যাইত। "দেখ, দেখ ঘোড়ায় রেল গাড়ী টেনে নিয়ে চলেছে! শুনিয়া পিতা বলিলেন, "ও রেল গাড়ী নয় ওর নাম ট্রামগাড়ী।" পথে এক এক স্থলে পাঁচ ছয়খানা ঘোড়ার গাড়ী একত্র চলিতেছে, দেখিয়া সকলের মনেই আতঙ্ক হইল যে ধাক্কা লাগিয়া যাইবে, কিন্তু ধাক্কা না লাগিয়া যে যাহার পথে চলিয়া যাওয়ায় সকলে কলিকাতার ঘোড়ার গাড়ী চালকদিগের অসামান্য যান চালন ক্ষমতার প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল দিনের আলো থাকিতে অসংখ্য কারবাইডের গ্যাসবাতি জ্বালাইয়া, কাগজের ফুলবাগান, উর্দ্দিপরিহিত ব্যাণ্ডবাদ্য বাদক প্রভৃতি পরিবৃত অশ্বারোহী বিবাহের বর চলিয়াছে দেখিয়া চমৎকারিণী বলিল, "ওমা, ঘোর দুপুরে বর চলেছে ঘোড়ায় চড়ে, এ আবার কি!" পিতা বলিলেন, "ওরা মুসলমান, ওদের বিয়ে হয় দিনের বেলায়।" মাতা বলিলেন, "কতই দেখলাম, মানুষের রকম-সকম!" আরও কিছু দূর যাইলে পরে দেখা গেল একটা সুসজ্জিত কৃষ্ণবর্ণ কাষ্ঠ ও কাচের শবাধার বহনের গাড়ী। উহা টানিয়া চলিতেছে বৃহদাকার এক জোড়া কালো ঘোড়া। শবাধারের উপর ফুলের মালার স্তূপ। প্রাণ বলিয়া উঠিল, "দেখ দেখ বড় বাক্সে কি নিয়ে চলেছে!" পিতা বলিলেন "ও গোরস্থানে মরা মানুষ নিয়ে যাচ্ছে, কবর দেবার জন্যে। ওরা খৃষ্টান। "চমৎকারিণী বলিল," পেছনে পেছনে দশ বারটা গাড়ীতে ওরা সব কে?" পিতা বলিলেন, "ওরা সব আত্মীয়-কুটুম্ব বন্ধু-বান্ধব, সঙ্গে চলেছে গোর দেবার জন্যে। যেমন হিন্দুরাও যায় শ্মশানঘাটে।"

শেষ অবধি মদন মিত্র লেনের ভাড়াটে বাড়ীতে গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল; জিনিষপত্র নামান হইল।

মেয়েরা ভিতরে চলিয়া যাইল, গাড়োয়ান নির্দ্ধারিত ভাড়া অপেক্ষা আট আনা অধিক চাহিয়া ও পরে দুইআনা অতিরিক্ত আদায় করিয়া লইয়া অন্তর্হিত হইল। দুতালায় একটা ঘরে প্রাণ, তাহার পিতা ও খুল্লতাত রহিলেন ও অপর কক্ষে রহিলেন মাতা ও চমৎকারিণী। নিকটস্থ শিমলার বাজার হইতে জলখাবার আনা হইল। তাহারা সঙ্গে করিয়া রন্ধনের অপরাপর উপকরণ লইয়া আসিয়াছিল। উনান ধরাইয়া রন্ধনের ব্যবস্থা হইল। সকলে এক এক করিয়া স্নান করিয়া লইল। বাড়ীর অপর বাসিন্দাদিগের মধ্যে কোন কোন ভদ্রলোক ও মহিলা এই দিকে আসিয়া খবরাখবর লইয়া যাইলেন খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে সাহায্য করিতে চাহিলেন, কিন্তু ব্যবস্থা সব হইয়া গিয়াছে দেখিয়া নিজ নিজ কার্য্যে গমন করিলেন।

পরদিন হইতে প্রথম কর্ত্তব্য হইল ছেলেকে স্কুলে ভর্ত্তি করা। ঐ বাড়ীর অপর বাসিন্দাদিগের ছেলেরা যে স্কুলে পাঠ করিত সেই স্কুলেই প্রাণকে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে তাহাকে অল্প অল্প পরীক্ষাদি করিয়া তৎকালীন ফোর্থ ক্লাসে ভর্ত্তি করিয়া লওয়া হইল। ইতিহাস ভূগোল প্রভৃতিতে সে কাঁচা, অঙ্কে ও ইংরেজীতে চলনসই ইত্যাদি মন্তব্য করিয়া তাহার জন্য একজন গৃহ-শিক্ষক রাখিবার প্রয়োজনীয়তা তাহার পিতাকে জানান হইল। তিনি বলিলেন, সে ব্যবস্থা করা হইবে। স্কুলের পড়ুয়ারা কি প্রকার বেশ-ভূষা করে, পুস্তকাদি তাহাদের কি রাখা আবশ্যক এবং জলযোগের ব্যবস্থা লইয়াও আলোচনা হইল।

গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ঐ অপর ভদ্রলোকের সহিত আলোচনা সূত্রে প্রাণের পিতা বলিয়া ফেলিয়াছিলেন যে তিনি পুত্রের তিনবার বিবাহ দিয়াছেন। ঐ ভদ্রলোক চক্ষু কপালে তুলিয়া বলিলেন "কি সর্ব্বনাশ করেছেন কি! ও কথা চেপে যেতে হবে। ও সব আমরা যারা বাংলা দেশে থাকি আমাদের সমাজে আর চলে না। এখন হল এদেশে কেশব সেন, বিবেকানন্দ, বিদ্যাসাগরের যুগ। সবাই শুধু শুনছে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, এসব মহাপাপ। সমাজসংস্কার চাই। স্ত্রীশিক্ষা চাই। বাল্যবিধবাদের বিয়ে দিতে হবে। ও সব কথা চেপে যেতে হবে। তা নইলে ঐ ছেলের পরকাল ঝরঝরে, বুঝেছেন কি না? প্রাণের পিতা বিশেষ কিছু না বুঝিলেও একথা বুঝিলেন যে কলিকাতায় দ্বাদশ বৎসরের পুত্রের তিনটি পত্নী থাকিলে নানা প্রকার অসুবিধার সম্ভাবনা। তিনি একবার বলিলেন, "আমাদের পরিবারে ওরকম ত সব সময়েই হয়। আমারও ত চারবার বিয়ে হয়েছিল; যদিও এখন তারা কেউ বেঁচে নেই, আছে খালি খোকার মা।" বন্ধু বলিলেন,। আরে মশাই, আপনি ত খালি গায়ে খালি পায়ে সমাজে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এখন কলকাতায় ঐ রকম করে বেড়ালে আপনাকে ভদ্র-লোকই বলবে না কেউ। জুতো, জামা, ছাতা, লাঠি, হাতপাখা না থাকলে কেউ বসতে বলবে না; বুঝলেন? তেমনি সব কথায় নূতন নূতন নিয়মকানুন হচ্ছে। বুঝলেন কি না? আগে ত বিধবা হ'লে সহমরণ হ'ত। এখন কাউকে সহমরণ করতে দিলে জেলে ভরে দেবে। আগে লেখাপড়া না, জানলে কোন অসুবিধা হ'ত না। এখন নিরক্ষর লোককে মানুষ বলেই ধরে না। ছেলেকে কলকাতায় এনেছেন কেন? লেখাপড়া শিখে, চাকুরে হবে, নামডাক হবে বলেই না? তাহলে ছেলের পিছনে যদি দেড় গণ্ডা ইস্তিরী সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ত তার কোথাও জায়গা হবে না। চেপে যান, চেপে যান। এ বেহার নয়, বাংলা মুল্লুক আর আমরাও বাঙ্গালী হয়ে গিয়েছি।" পিতা সকলকে বুঝাইয়া দিলেন যে কলিকাতায় চাকুরে মহলে আর অধিক বিবাহের রেওয়াজ নাই। কোন বালকের একটাও বিবাহ আজকাল হয় না। ইত্যাদি ইত্যাদি। মাতা বলিলেন, "ওমা সে কি গো? বিয়ে হবে না ত কি সবাই সন্নেসী হবে না কি?"

"আরে না না! সন্নেসী হবার দরকার নেই। বিয়ে হবে শুধু একটা; আর ষোল আঠার বয়স হ'লে পরে।" "তাহলে খোকার কি হবে! ওর বউদের কি

জলে ভাসিয়ে দেবে নাকি ?" "সে সব সময় বুঝে শুছিয়ে গাছিয়ে মানিয়ে নিতে হবে। এখন বড়বৌকে সবাই বড়বৌ বলেই জানবে। খোকারই যে বড়ভাই নেই তাই বা কলকাতায় কে জানে ?" "ওমা! আর বড়বৌকে কেউ যদি জিগেস করে তার সোয়ামী কোথায়, কি করে, ত সেই বা কি বলবে ?"

"সে তোমার ভাবতে হবে না। বড়বৌ তার নিজের কথা নিজেই ঠিক করে নেবে। আর খোকাকেও সেই বুঝিয়ে দেবে, কি করে কার কার সঙ্গে কি কথা বলতে হবে।

চমৎকারিণী অতি সহজেই বুঝিয়া লইল যে অবস্থাটা কিরূপ দাঁড়াইয়াছে। সে নিজেকে দ্বাদশ বৎসরের বালকের পত্নী বলিয়া পরিচয় দিতে বিশেষ ব্যস্ত ছিল না। স্বামী কে, কোথায় আছে, সেসব কথার উত্তরে মুখ টিপিয়া হাসা ও লাহোর কানপরে চাকুরীর উল্লেখ সে সহজেই করিতে শিখিয়া লইল। প্রাণকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিল, "দেখ, কলকাতার ইস্কুলের ছেলেদের কম বয়সে বিয়ে টিয়ে হয় না। কখনও বলবি না তোর বিয়ে হয়েছে কি তিনটে বউ আছে। শুনলে মাষ্টাররা ঘাড় ধরে ইস্কুল থেকে বের করে দেবে বুঝলি ? আমি হলাম এ বাড়ীর বড়বৌ আর তুই হ'লি ছোট ছেলে।"

"অ্যাঁ ? আমি তো..."

"চুপ করে শোন কি বলছি। নইলে, কান টেনে আরও লম্বা করে দেব।" "আচ্ছা, আচ্ছা, শুনছি; মারিস নি! তুই বড়বৌ আর আমি বাপমায়ের ছোট ছেলে।" ব্যবস্থা হইয়া গে'ল ও তাহাতে কোন বিঘ্ন উপস্থিত হইল না। প্রাণ বইখাতা লইয়া নিয়মিত স্কুলে যাইতে লাগিল। অন্য ছেলেদের সঙ্গে হাতাহাতি করিতে শিখিল। ফুটবল নামক বায়ুস্ফীত চামড়ার গোলকে পদাঘাত করিয়া খেলিতে শিখিল। অর্থাৎ কলকাতিয়া ধরন ধারণ আয়ত্ত করিয়া লইতে তাহার বিশেষ বিলম্ব হইল না।

তাহার পিতামাতা কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া গঙ্গাস্নান কালীঘাট চিড়িয়াখানা সারিয়া লইয়া অবশেষে গ্রামে ফিরিয়া গেলেন। বড় বৌ এখন গৃহকর্ত্রী হইলেন ও খুড়োমশাই বাজার দোকান স্কুলের মাহিনা দেওয়া প্রভৃতির বিলিব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। সে সময়ের জীবনযাত্রা ছিল এখনকার তুলনায় সহজ সরল এবং চিত্তবিনোদনের আয়োজন ছিল অল্পই। রঙ্গমঞ্চের অভিনয় সারা রাত্রি ধরিয়া চলিয়াও শেষ হইত না। শীতকালে গড়ের মাঠে তাঁবু খাটাইয়া সারকাস হইত। তাহাতে বাঘ সিংহের খেলা দেখাইত ইয়োরোপীয় নরনারীগণ। গান বাজনা কীর্ত্তন প্রভৃতির আসর বসিলে দুই এক দিনে শেষ হইত না। সহরে আলো ছিল অল্পই এবং সোরগোল করিবার লোক আরই কম। বিবাহের বা পূজার জন্য জলুস বাহির হইত, অপর উপলক্ষ্য ছিল না বলিলেই চলে। মানুষের দিন কাটিয়া যাইত প্রাত্যহিক কাজে কর্ম্মে। অল্প রাত্রি হইলেই ঘরে ঘরে আলো নিভিয়া যাইত; আর অতি ভোর বেলায়ই পথঘাট জনবহুল হইয়া উঠিত।

বড় বৌ কখন কখন ভাবিত যে বালক স্বামীর সহিত তাহার সম্বন্ধ জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর সহিত কনিষ্ঠ ভ্রাতার সম্বন্ধেরই মত। তাহাকে শাসন করিয়া, লোভ দেখাইয়া, বুঝাইয়া সুঝাইয়া কর্ত্তব্যের পথে চালাইয়া লইয়া যাওয়াই এখন চমৎকারিণীর জীবনের প্রধান কার্য্য। পতি পরম গুরু না হইয়া অনুগত শিষ্যের স্থান দখল করিয়া বসিয়াছে। দিনের মধ্যে কতবার যে তাহার নিকটে আসিয়া "বড় বৌ, বড় বৌ" বলিয়া নানা প্রকার আবদার অভিযোগ করা ও পরামর্শ গ্রহণ হইত তাহার হিসাব রাখা সম্ভব নহে। চমৎকারিণীরও এক প্রকার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল সর্ব্বক্ষণ তাহার নানা প্রশ্নের জবাব ও রকমারি দাবির প্রশ্রয় দেওয়ার। সে যদি কোন দিন বারে বারে আসিয়া বড় বৌ বড় বৌ না করিত তাহা হইলে চমৎকারিণীর মনে হইত যেন কি একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিস সেদিন পাওয়া হইল না। প্রত্যহ তাহার লেখাপড়ার সকল অঙ্গের খবর লওয়া আর একটা অতি আবশ্যক কার্য্য ছিল। বাড়ীর পড়া হাতের লেখা অঙ্ককষা ইত্যাদি যথাযথ-

ভাবে হইতেছে কিনা তাহা দেখিতে গিয়া তাহার নিজের বেশ কিছু বিদ্যা অর্জ্জন হইয়া যাইত। এখন অবধি প্রাণ যাহা কিছু পড়িয়াছে চমৎকারিণীও সেই সবই পাঠ করিতে ও লিখিতে পারিত। অঙ্কও মোটামুটি শিখিয়াছিল। বড় বৌ এর বুদ্ধির প্রশংসায় প্রাণ শতমুখ। বড় বৌ তাহার প্রশংসা শুনিলে বলিত, "তোর কাছেই ত শিখছি।

"আমি আবার কবে শেখালাম? তোর নিজের কাছেই শিখেছিস; তাইত বলি খুব বুদ্ধি না থাকলে কি আর কেউ নিজেই নিজেকে লেখাপড়া শিখিয়ে নিতে পারে?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, আমার বুদ্ধি দেখে ত আর তোকে চাকরী দেবে না?

তুই মাষ্টাররা যা শেখায় শিখে নিয়ে ভাল পাশ করে বড় চাকরী জোগাড় করে নে; তাহলেই আমরা খুসীও হব আর তোর রোজগারে ভাল থাকব খাব।"

"কেন বাবা ত সকলকে খাওয়ায় পরায়; আমার তা হ'লে খাওয়াতে হবে কেন কাউকে?"

"আরে বাবা ত বুড়ো মানুষ। বুড়ো হলে মানুষ আর কাউকে খাওয়ায় না, ছেলেরাই বড় হয়ে রোজগার করে আর সকলকে খাওয়ায়। আর তোমার বেশী বক্তৃতা দিতে হবে না। যা বলছি ঠিক করে তাই কর, তা নইলে ওষুধ দিতে হবে।"

"ও বাবা! স্পিকটি নট! আচ্ছা, চুপ করলাম।"

৩

বছর ঘুরিয়া গেল। চতুর্থ শ্রেণী হইতে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে উঠিল। এখন সে নিজেকে মহা মাতব্বর বলিয়া মনে করে। চমৎকারিণী প্রাণের পুস্তক খাতা ইত্যাদি দেখিয়া আলাদা খাতায় লেখা অভ্যাস করিয়া শিক্ষায় সমানতালে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। পাশের বাড়ীর একটি বালিকা, সে একটি নূতন স্থাপিত মেয়েদের স্কুলে পড়িতে যায়। সে হয়ত পরীক্ষা দিয়া পাশও করিবে। শুনিয়া অবধি চমৎকারিণীর মনে খুবই ইচ্ছা হইয়াছে যে সেও ভাল করিয়া পড়িবে। প্রাণের পিতা একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। চমৎকারিণী তাঁহাকে বলিল, "বাবা, জানেন আজকাল কলকাতায় মেয়েদের ইস্কুল হয়েছে। তারাও পরীক্ষা পাশ করবে এর পর।"

"হ্যাঁ মা তা শুনেছি। কেন তুমি ইস্কুলে যেতে চাও নাকি?"

"ওমা, তাও কি হয়? আমি স্কুলের মেয়েদের চেয়ে কত বড়। ইস্কুলে যাব কি করে? তা ছাড়া ঘরকন্নার কাজ সারাক্ষণই লেগে আছে। না, আমি বলছিলাম যদি একজন মেয়ে-মাষ্টার পাওয়া যায় তাহলে বাড়িতেই ভাল করে পড়তে পারি। আমি ত ওর বইটই সব পড়তে পারি। অঙ্কও কষতে পারি। ইংরেজী বাংলা হাতের লেখাও লিখতে পারি।"

"ও তাই নাকি? আচ্ছা তুমি ত দেখছি খুব কাজের মেয়ে। বেশ, বেশ, তা দেখনা মেয়ে-মাষ্টার যদি পাও ত তুমিও পড়তে পার।"

খোঁজ খবর করিয়া অবশেষে একজন শিক্ষিকাকে নিযুক্ত করা হইল। তিনি প্রত্যহ আসিয়া চমৎকারিণীর লেখাপড়ার যথাযথ ব্যবস্থা ও উন্নতি যাহাতে হয় তাহা করিবেন স্থির হইল। মহিলা নিজে ইংরেজী বাংলা, গণিত প্রভৃতি উত্তমরূপেই জানিতেন ও শিক্ষা কার্য্যেও তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি চমৎকারিণীকে দেখিয়া প্রথমেই বলিলেন, "ও আপনি পড়বেন? আমি ভেবেছিলাম কোন ছোট বয়সের মেয়েকে পড়াতে হবে। তা বেশ, আপনি পড়তে চান, খুবই ভাল কথা। এমন কিছু বেশী বয়স নয়, খুব তাড়াতাড়ি উন্নতি হবে বলেই মনে হচ্ছে।"

চমৎকারিণী তাঁহাকে বুঝাইল যে তাহার স্বামী দূর-দেশে কাজ করেন ও তাহার যথেষ্ট অবসর আছে বলিয়া সে পাঠ করিতে ইচ্ছুক। লেখাপড়া সে কিছু-কিছু জানে। কিন্তু এখন এমনভাবে সব বিষয় শিক্ষা করিতে ইচ্ছুক যাহাতে পরে সে পরীক্ষা দিয়া পাশ করিতে পারে। শিক্ষয়িত্রী হাসিয়া বলিলেন "কেন

চাকরী করবার ইচ্ছে হয়েছে নাকি?" চমৎকারিণী বলিল, "তা আজকাল তা মেয়েরা করতেও পারে আর আমার ছেলেপিলে নেই, চাকরী করার পথ খোলাই আছে।" শিক্ষয়িত্রী তাহার বুদ্ধির প্রশংসা করিয়াই বলিলেন, "হ্যাঁ, মেয়েরা সব সময় পরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে দিন কাটাবে সে ব্যবস্থা বেশী দিন চলতে পারে না। কারণ মেয়েরা একটু চেষ্টা করলেই নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে। অনেকেই আর অপরের গলগ্রহ হয়ে থাকতে চায় না। কেননা ঐভাবে থাকার একটা আত্মসম্মান রক্ষার দিকও আছে। অনেক পরিবারে মেয়েদের দাসী বলে মনে করা হয়। বিশেষ করে বিধবাদের।

চমৎকারিণী বলিল, "না, আমাদের বাড়ীতে সে সব ধরনধারণ নেই। কাজকর্ম্ম করতে হয় বই কি। কিন্তু কেউ জোর গলায় কথা বলে না বাড়ীর মেয়েদের সঙ্গে।"

"সেটা খুবই সৌভাগ্যের কথা। অনেক বাড়ীতেই সেরকম অবস্থা দেখা যায় না।"

একদিন বৈকালে প্রাণ মহা উত্তেজিত হইয়া আসিয়া বলিল "আজকাল আর ইংরেজদের ভয় করে চল্লে আমাদের ভালো হবে না।"

"কেনরে, ইংরেজ ত রাজা। রাজাকে ভয় না করে চল্লে যে গারদে ভরে দেবে।"

"হাঁ তা দেবে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ভয় পেলে চলবে না। মাথা উঁচু করে চলতে হবে। ভয় পাওয়া খুব অপমানের কথা।"

'হ্যাঁ কিন্তু ভয় না পাওয়াও ত' গোঁয়ার্তুমীর কথা। আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যায়। আগুনকে ভয় না করে তাতে হাত দিলে খুব বুদ্ধির কাজ হয়না'।

'ইংরেজ ত মানুষ, আগুন নয়। তাছাড়া আগুনও তো নিভিয়ে দেওয়া যায় জল ঢেলে কিংবা ফুঁ দিয়ে'।

'আচ্ছা, তোমায় ইংরেজকে নিভিয়ে দিতে হবে না। স্বামী বিবেকানন্দকে বলে দিও ইংরেজকে সায়েস্তা করতে'।

চমৎকারিণী নিজের শিক্ষয়িত্রীকে প্রশ্ন করিল, স্বামী বিবেকানন্দ কে?

তিনি বলিলেন, 'স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমে ছিলেন রামমোহন শিষ্য কেশবচন্দ্র সেনের সহকর্ম্মী ও পরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য। রাজা রামমোহন রায় প্রথমে আমাদের সমাজের নানান দোষ, অন্যায়, অবিচার আর কুসংস্কার ভেঙ্গে ভারতের সভ্যতাকে তার হারান-গৌরব ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করেন। ভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম বিলাতে গিয়ে ভারতীয় দর্শন আর জ্ঞানের কথা বিদেশীদের কাছে প্রচার করেন। সমাজসংস্কার চেষ্টা তাঁর প্রধান উদ্দীপণা ছিল। মেয়েদের শিক্ষা, তাদের মনুষ্যত্বের দাবি, যেসব উৎপীড়ন তাদের উপর অবাধে করা হ'ত, সবের বিরুদ্ধে রামমোহন রায় প্রথমে প্রবল আন্দোলন করেন। পরে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আর অন্য অনেকে সেই কাজে লেগে যান। স্ত্রী শিক্ষার কথাটা ওঠে স্ত্রীলোকদের মনুষ্যত্বের অধিকার দেবার চেষ্টা করার ফলে। রামমোহন রায় ১৮২০ খৃঃ অব্দের আগের থেকেই সহমরণ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। ঐ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েদের নানান দাবির কথা আলোচিত হতে থাকে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ সব কিছুই। নারীনিগ্রহ, স্ত্রী-শিশুদের হত্যা করা আরও যা কিছু সে যুগে হ'ত তার বিরুদ্ধে, তীব্র প্রতিবাদ করতে গিয়েই মেয়েদের সব অধিকারের কথা উঁচু গলায় বলা আরম্ভ হয়। সবচেয়ে প্রথমে স্ত্রীলোকদের সামাজিক দুর্নীতির হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন রামমোহন রায়। ভারতবর্ষের সব মেয়েদের সেইজন্যে তাঁর কাছে একটা অতিবড় আর অ-শোধ্য ঋণ চিরকাল থেকে যাবে। রামমোহনের আদর্শই বিবেকানন্দকে সমাজসংস্কারের কাজে টেনে আনে। তিনি সারা ভারতবর্ষ আর পৃথিবীর নানা দেশে গিয়ে ভারতের ধর্ম্ম প্রচার করে খুব খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর বক্তৃতা শুনে ইওরোপ আমেরিকার হাজার হাজার লোক ভারতের শাস্ত্রগত বিদ্যা আরও ভালো করে বুঝবার চেষ্টা করেছেন, অনেকে এ দেশে এসেছেন

আর ভারতবর্ষেরও অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত হয়ে তাঁদের আশ্রমে প্রবেশ করেছেন।

চমৎকারিণী প্রশ্ন করিল, তিনি কি ইংরেজদিগকে ভালো মনে করেন না?

উত্তর হইল, তিনি সকল জাতির মানুষকেই ভালো মনে করেন। শুধু চাহেন কেহ কাহাকেও ভয় করিয়া চলিবে না। মানুষের একটা জন্মগত স্বাধীনতার অধিকার আছে। সে অধিকার কিছুতেই নষ্ট হয় না। মনের ও আত্মার পূর্ণতম বিকাশ—সেই অধিকারের উপরেই নির্ভর করে। মানুষের নিজের স্বাধীনতাও তেমনি তার মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

চমৎকারিণী বুঝিল স্বামী বিবেকানন্দ অসামান্য গুণবান মহাপুরুষ। তিনি ভারতের সকল মানুষকে নির্ভয়ে উন্নতির পথে চলিতে শিখাইতেছেন। তাঁর বাণী—দেহ, মন ও আত্মার মুক্তির মহামন্ত্র। মানুষের নিজের চরিত্র, কর্মক্ষমতা, আদর্শবোধ ও উন্নতির আগ্রহ এবং সেই সঙ্গে তাহার জাতীয়তার জ্ঞান যাহাতে গঠিত রূপ ধারণ করে, এই সকল কথা লইয়াই স্বামী বিবেকানন্দের প্রচার।

শিক্ষয়িত্রীকে চমৎকারিণী জিজ্ঞাসা করিল, 'আচ্ছা তিনি একজন পুরুষের তিন চারজন স্ত্রী থাকলে তার সম্বন্ধে কি বলেন? আর ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া কি উচিত মনে করেন'?

'ঐ সব কথা নিয়ে কোন আলোচনা তিনি করেছেন বলে শুনিনি। তবে তাঁর মতামত যে রকম তাতে তিনি বহুবিবাহ বাল্যবিবাহ বিধবানিগ্রহ ইত্যাদি যত রকম সামাজিক কুসংস্কার আর দুর্নীতি আছে সবই দূর করা প্রয়োজন মনে করেন'।

'কিন্তু যাদের ঐ রকম বিয়ে হয়ে গেছে তাদের ত আর কিছু উপায় থাকে না। তারা তখন নিজের আর সমাজের ভালোর জন্যে কি করতে পারে'?

'কেন পারবে না? হাত পা ভেঙ্গে গেলেও মানুষ চেষ্টা আর অভ্যাস করে অনেক কাজ করতে পারে। অন্ধ লোকেও পড়তে শেখে উঁচু উঁচু অক্ষরে হাত বুলিয়ে। ভীষ্মদেব শরশয্যায় শুয়েও সামাজিক কল্যাণের নীতি বুঝিয়ে গিয়েছেন। মানুষ যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তার নিজের আর অন্যের উন্নতির চেষ্টা সে সব সময়েই করতে পারে'।

চমৎকারিণী বুঝিল, সকলের কল্যাণসাধন চেষ্টা একটা বড় রকমের ধর্মের কথা, আর সে কাজ মানুষ সকল অবস্থাতেই করিতে সক্ষম থাকে।

সেবার গ্রীষ্মের ছুটিতে গ্রামে ফিরিয়া গিয়া সে খুব চেষ্টা করিল যাহাতে বিলাসিনী ও উল্লাসিনী লেখাপড়া করে। তাহাদের পিতামাতা ঐ বিষয়ে আপত্তি করায় চমৎকারিণী তাঁহাদিগকে বুঝাইল যে স্বামী যখন উচ্চশিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টায় নিযুক্ত সে ক্ষেত্রে পত্নীদিগকেও চেষ্টা করিতে হইবে যাহাতে স্বামীর সহিত এক দৃষ্টিভঙ্গী রক্ষা করিয়া জীবন কাটাইতে পারে। উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির স্ত্রী যদি নিরক্ষর অবস্থায় পড়িয়া থাকে তাহা হইলে তাহার পক্ষে স্বামীর অনুগমন কোন মতেই সম্ভব হইতে পারে না। বিলাসিনী ও উল্লাসিনী তাহার বক্তৃতার ফলে নিজ নিজ পিত্রালয়ে গ্রামের পণ্ডিতদিগের নিকট অক্ষর-পরিচয় করিবার চেষ্টায় নিযুক্ত হইল। প্রাণ শুনিয়া মন্তব্য করিল, "এবারে সবাই বুঝি চাকরী করবে?"

তাহাকে এক ধমক দিয়া চমৎকারিণী বলিল, "তুমি যে রকম মহা বিদ্যাদিগ্‌গজ হয়ে উঠছ তাতে আমাদের চাকরী না করলে চলবে কি করে? খবরদার! বেশী কথা বলবে না। আমি যা ঠিক করব তাই হবে; বুঝেছ?"

প্রাণ তাহার উগ্র মূর্ত্তি দেখিয়া ভীতকণ্ঠে বলিল, "আরে না না, পড়তে চায় ত পড়ুক না। আমার তাতে কি?"

"তোমার কিছু না হলেই ভালো। তুমি নিজের লেখাপড়া কর আর অন্যরাও নিজের নিজের ইচ্ছামত পড়তে শিখুক। স্বামী বিবেকানন্দ কি বলেছেন যে

মেয়েরা লেখাপড়া শিখলে ছ্যাবলামি করে কথা বলতে হবে?"

"না, না. তিনি বলেছেন সব মানুষ সমান আর সকলের সমান অধিকার।"

"তা হলে চুপ করে থেকো। তুমি যেমন বাপের পয়সায় ইস্কুলে যাও আমরাও তেমনি অন্যের খরচায় লেখাপড়া শিখে নিজেদের আর অন্যের ভালো করতে চেষ্টা করবো।"

সকলের লেখাপড়াই চলিতে লাগিল। শুধু চমৎকারিণী কলিকাতার আবহাওয়ায় সামাজিক আদর্শের দিক দিয়া স্ত্রী শিক্ষার ও স্ত্রী স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা লইয়া অধিক সজাগ হইয়া উঠিল। তাহার লেখাপড়াও অধিক অগ্রসর হইতে লাগিল। কোন কোন বিষয়ে প্রাণ এখন তাহার নিকট সাহায্য লইতে আসিত। শিক্ষয়িত্রী মহাশয়া নারী-প্রগতির কথা লইয়া যাঁহারা আন্দোলন করিতেন সেই সকল সমাজ-সংস্কারকদিগের সহিত কিছু কিছু সংযোগ রাখিয়া চলিতেন। এই সকল ব্যক্তির মধ্যে নানা মতের লোকদিগকে দেখা যাইত। ব্রাহ্ম সমাজের, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুসরণকারীদিগের,বিবেকানন্দ-রামকৃষ্ণ আশ্রমের এবং অপরাপর দলের বহু ব্যক্তিই এই সময় স্ত্রী-শিক্ষা,'স্ত্রী-স্বাধীনতা, বাল্যবিবাহ নিবারণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলন লইয়া প্রবল তর্কবিতর্কের সৃজন করিতেছিলেন। এই সকল বিষয় লইয়া সভাসমিতিও চলিতেছিল। ইহার একটা সভায় শিক্ষয়িত্রীর সহিত চমৎকারিণীও একবার গিয়া উপস্থিত হইল। তখন বাংলার রাষ্ট্রাকাশে বহু উজ্জ্বল নক্ষত্র বিদ্যমান ছিল। এই সকল মহা প্রতিভাশালী ব্যক্তিদিগের মধ্যে কেহ কেহ ঐ সভায় বক্তৃতা দিয়াছিলেন। চমৎকারিণী খনা, লীলাবতী, মৈত্রেয়ী, গার্গীর কথা শুনিয়া মুগ্ধ অন্তরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছিল। প্রাণকে পরে সে শুনাইল যে প্রাচীন ভারতে নারীদের স্থান কত উচ্চে ছিল ও তাঁহারা বিদ্যায়, বুদ্ধিতে জ্ঞানে ও প্রেরণায় কত অসাধারণ ছিলেন। প্রাণ বলিল, "তাহলে এখন আর সে রকম নেই কেন?"

"পুরুষ জাতের অত্যাচারে আর অন্যায় ব্যবহারে।"

"তাহলে কি করবে মেয়েরা? লড়াই করবে?"

"লড়াই কেন করতে যাবে? জোর করে লেখাপড়া করবে। ভাল ভাল যারা আছে পুরুষদের মধ্যে তারা সাহায্য করবে মেয়েদের আবার জ্ঞান বুদ্ধিতে বড় হতে।"

"আচ্ছা, আমিও তাহলে সাহায্য করব।"

চমৎকারিণী তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, "তুমি খুব ভালো ছেলে। তোমার নাম হবে দেশের কাজে।"

প্রাণ ইহাতে খুবই খুসী হইয়া খেলিতে চলিয়া গেল। তাহার পরোপকার ইচ্ছা ব্যক্ত হইয়া যেন আরোও জোরাল হইয়া উঠিল।

কলিকাতায় নারীপ্রগতি সবল হইয়া উঠিতেছিল। উচ্চজাতীয়দিগের কৌলীন্যের খাতিরে যেমন করিয়া হউক বিবাহ দিবার রেওয়াজ লোক চক্ষে মহা অন্যায় ও বর্ব্বর সামাজিক প্রথা বলিয়া প্রমাণ হইতে আরম্ভ হইল। জন্মের পূর্ব্ব হইতেই বাকদান কিম্বা বিধবা অবস্থাতেই জন্মগ্রহণ প্রভৃতি ঘটিলে সমাজে নিন্দাবাদ হইতে লাগিল। নারী হইয়া জন্মলাভ করিলে তাহা যেন পূর্ব্বজন্মের মহাপাপের ফল এই ধারণাই লোকের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। স্ত্রী শিশুদিগকে জলে ডুবাইয়া মারা যদিও আইন করিয়া বন্ধ করা হইয়াছিল, তাহা হইলেও অযত্ন অবহেলা ও অবাঞ্ছিত অবস্থার জন্য বহু শিশুর প্রাণ যাইত। এই নিগ্রহ নির্য্যাতন ও অসম্মানের হাত হইতে নারীজাতিকে উদ্ধার করিতে বহু সমাজসংস্কারক অগ্রসর হইলেন এবং নানাভাবে উৎপীড়িতা নারীদিগকে নিজ কর্ম্মের দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিয়া লইতে সাহায্য করিবার জন্য বহু প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইল। অসহায়া, অবগুণ্ঠিতা, লজ্জাশীলা নারীদিগকে অতঃপর নিজ শক্তিতে সকল অসম্মান ও অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া জগতে, নিজেদের স্থান উন্নত হইতে উন্নততর করিয়া লইতে হইবে; এই আদর্শে জীবন গঠন করিবার জন্য শিক্ষিতা

রমণীদিগের মধ্যে একটা নূতন জাগরণের আরম্ভ হইল। বামাবোধিনী সভা, বামাহিতৈষিণী সভা, আর্য্যনারী-সমাজ ও বঙ্গমহিলা-সমাজ প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা এই নব জাগরণের উন্মেষ জ্ঞাপন করে।

এই সময়ে যে সকল মহিলাদিগের নাম নারীপ্রগতি-সূত্রে সকলের মুখেই শুনা যাইত তাঁহারা ছিলেন চন্দ্রমুখী বসু, কাদম্বিনী বসু, কামিনী সেন, অবলা দাস ও কুমুদিনী খাস্তগির। ইঁহারা বি. এ, পাশ করিয়া প্রমাণ করেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে পুরুষদিগের তুলনায় স্ত্রীলোকগণ কোন অংশে অক্ষম ন হেন। কাদম্বিনী বসু (বিবাহের পরে গাঙ্গুলী) ভারতের প্রথম মহিলা চিকিৎসকের সম্মান অর্জ্জন করেন। শিক্ষয়িত্রীর নিকট এইসকল অসামান্য প্রতিভাবতী নারীদিগের কথা শুনিয়া চমৎকারিণী গভীর আবেগের সহিত বলিত, তাহলে ত আমরাও ডাক্তার, উকিল সব কিছু হ'তে পারি। খালি যে হাঁড়ি ঠেলতেই হবে এমন কথা ত আর তাহলে থাকে না।" শিক্ষয়িত্রী বলিতেন," ঠিক কথাইত। সব কাজই মেয়েরা করতে পারে; শুধু করতে দেওয়া হয় না বলেই করে না। চমৎকারিণী প্রতিবাসিনী দুই একটি বালিকাকে অক্ষর-পরিচয় করাইতে আরম্ভ করিল, তাহার মনে এই কথাই বড় করিয়া দেখা দিল যে শুধু নিজের শিক্ষা হইলেই নারীজাতির প্রতি কর্ত্তব্য শেষ হয় না। নিজের ক্ষমতায় যত দূর সম্ভব নারীদিগের অজ্ঞানতা নিবারণ করিতে হইবে। সে অন্তত যদি দুইচার জন মেয়েকেও পড়িতে শিখাইতে পারে তাহা হইলে নিজের কর্ত্তব্য কিছুটা সম্পূর্ণ হইবে।

প্রাণ বলিল, "বড়বৌ, তুমি যে মাষ্টারী আরম্ভ করলে, ওরা কি তোমায় মাইনে দেবে?" চমৎকারিণী বলিল, "তুমিত অনেক কাজ আমাকে দিয়ে করিয়ে নাও; আমায় কি মাইনে দাও।?" "না, কিন্তু তুমি ত আমাদের বাড়ীর লোক; ওরা ত তা নয়, তবে ওদের জন্যে কাজ করবার তোমার কি দরকার?" "যদি দেখি কারুর কোন মহা অনিষ্ট হচ্ছে আর আমি একটু চেষ্টা করলেই অনিষ্টটা হয় না; তাহলে কি আমি দেখতে যাব যে সে আমার বাড়ীর লোক কি না? কেউ জলে ডুবে যাচ্ছে দেখলে তাকে যেমন করে হোক বাঁচানই আমার কর্ত্তব্য। কেউ অনাহারে মরে যাচ্ছে, কি কারুর গায়ে আগুন ধরে যাচ্ছে দেখলে বাঁচানটাই আসল কথা। সে কে আর কোন বাড়ীর লোক তা দেখবার দরকার হয় না।"

"কিন্তু ওরা ত সে রকম কোন বিপদে পড়েনি। খালি লিখতে পড়তে জানে না।"

"লিখতে পড়তে না জানাটা যে কত বড় দুর্ভাগ্য আর বিপদের কথা তা তুমি যদি না বুঝতে পেরে থাক তাহলে বলতে হবে তোমার লেখাপড়া করাটা পণ্ডশ্রম হচ্ছে। অন্ধকে যদি চোখ দেওয়া যায়, আর মূর্খকে যদি পড়তে শেখান যায় তাহলে দুজনেরই সমান লাভ হয়। না খেতে পেলে যেমন শরীরটা শুখিয়ে যায়। বিদ্যে না থাকলে তেমনি মানুষের মনটা শুখিয়ে একটা সামান্য জীবের মনের মত ছোট হয়ে যায়। বিদ্বানের মন আকাশে, বাতাসে, পৃথিবীর আর ব্রহ্মাণ্ডের দূর দুরান্তরে ছড়িয়ে এত বড় হয়ে বিছিয়ে থাকে যে তার বাইরে আর কোন কিছুই থাকে না। এখন বুঝেছ যে শুধু পয়সা পাওয়া দিয়েই কোন জিনিষের ভিতরের কর্ত্তব্যের দিকটা বুঝে নেওয়া যায় না?"

প্রাণ এই সব কথার আলোচনা করিতে সমর্থ ছিল না। সে কথা না বাড়াইয়া পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিয়া আত্ম রক্ষা করিল। অন্য সকলে যদি লেখাপড়া করে তাহাতে আপত্তি করিবার কিছু না থাকিলেও গায়ে পড়িয়া পরের দায় পোহান তাহার মতে বিশেষ বুদ্ধির পরিচায়ক নহে। নিজের কাজই মানুষ শেষ করিয়া উঠিতে পারে না তা পরের উপকার করিবে কখন? বড়বৌ অবশ্য সব কিছুই সকলের চেয়ে বেশী আর নিভুর্লভাবে করিতে পারে। বাবার চেয়ে জোর গলায় হুকুম চালাইতে পারে, মায়ের চেয়ে ভালো রাঁধিতে পারে; মাষ্টারদের চেয়ে সহজে পড়া বুঝাইয়া দিতে পারে আর মনটা খুসী থাকিলে সকলের চেয়ে ভাল গল্প বলিতে পারে। বড় বৌয়ের এর মত মানুষ বড় একটা দেখা

যায় না। একটু যা প্রাণকে কড়া শাসনে রাখিতে চায়। পান থেকে চুন খসিবার জোটি নেই। ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল রাখিয়া চলিতে হইবে। উঠিবার সময়, স্নানের খাইবার স্কুলে যাইবার সময়, খেলিবার সময় পড়া করিবার সময়, শুইবার সময়—কোন নড়চড় হইতে পারিবে না। কি খাইবে কতটা খাইবে কি পরিবে, চুল কাটা নখ কাটা—সব কিছু বাঁধাবাঁধির মধ্যে। এক দিক দিয়া ভালই, কোন ভাবনা চিন্তা থাকে না। আর এক দিয়া গা ঢিলা দিয়া চলিবার কোন সুবিধা নাই। আজকাল কি দশ বছর পরে যখন যা কিছু করিতে হইবে বড় বৌ সব পুরোপুরি ছকিয়া রাখিয়াছে।

(৪)

মানুষের মনের গতি এক এক ধরনের হয়। কেউ ঢিমে তালে চলে কেউবা চলে দুনে চৌদুনে। কারুর তাল রক্ষার দিকে ততটা নজর থাকে না, আবার কারুর সবকিছু নিখুঁত না হইলে মনে শান্তি হয় না। কাজে কর্মে মোটামুটি যাহা প্রয়োজন তাহা হইলেই অনেকে তৃপ্ত হইয়া থাকেন আবার অনেকের গভীর বিশ্লেষণে সব কিছুর চুলচেরা বিচার না করিলে চলে না। যাঁহারা কার্য্যে সক্ষম তাঁহারা সচরাচর আন্দাজে পথে আবছা-দৃষ্টিতে পারিপার্শ্বিক দেখিয়া চলেন না। পরিষ্কার ভাবে দেখিয়া ওজন করিয়া শতকরা একশ ভাগ ঠিক বুঝিয়া নিয়া তাঁরা পথ চলেন। শতকরা একশ দফা কাজের ফিরিস্তি হাতে গুণিয়া এক এক করিয়া সারিয়া নিয়া তবে তাঁরা বলেন "এবার ঠিক হয়েছে।"

চমৎকারিণী মনের চালচলনে সক্ষমতার সব নিয়মই মানিয়া চলে। সকাল হইতে সন্ধ্যা দিনের পর দিন মাসের পর মাস বছরের পর বছর তার কি করিতে হইবে সব হিসাব করা আছে। সেইজন্তে তার কাজে কোথাও কিছু বাদ পড়ে না, ভুলও হয় না। কোন কাজের ভার লইলে সে আগে নিজে বুঝিয়া লয় কেন সে কাজ তাহাকে করিতে হইবে। অকারণে কোন কাজের বোঝা সে উঠাইতে যায় না কোন একটা উদ্দেশ্য একটা স্থির নিশ্চয় লক্ষ্য সামনে রাখিয়া সে চলে। জীবনের ক্ষেত্রে মূল্য বিচার করিয়া দেখিয়া লইতে হয় কতটা পরিশ্রম কতটা কষ্ট স্বীকার করিয়া কোন কাজটা করিয়া লওয়া লাভ জনক। প্রাণ যদি লেখাপড়া করিয়া বড় হয় ভাল রোজগার করে তাহাতে পরিবারের ভবিষ্যত উজ্জল হইয়া উঠিবে। সেই জন্য প্রাণের লেখপড়া এমনই একটা বিষয় যে তার সফলতার জন্য কোন পরিশ্রম আর কষ্ট স্বীকারই বেশী নয় বলিয়া মানিতে হইবে।

কিন্তু এখন মনের ক্ষেত্র যেন আরও বিস্তৃত হইয়া এমন নূতন নূতন ভাব ও কর্ম্মকে নিকটের করিয়া তুলিতেছে যেগুলির পূর্ব্বে বিশেষ কোন উপস্থিতি বা মূল্যই ছিল না। যথা এই স্ত্রী স্বাধীনতা, নারী জাতির কল্যাণ ও শিক্ষার কথা। স্ত্রী জাতিটাই যেন এত দিন একটা ঘোর অন্ধকার কারাগারে আবদ্ধ ছিল। আজ তাদের মুক্তির দিন সামনে আসিয়া পড়িয়াছে। যুগ যুগান্তরের অন্যায় অত্যাচার ও নিষ্পেষণ আজ ন্যায় ও সুবিচারের প্রবল হাওয়ায় অপসৃত হইতেছে। কিন্তু এই মুক্তির জন্য নারীদিগকেও সংগ্রাম ও পরিশ্রম করিতে হইবে। অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে। শিক্ষালাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে। মানব-সমাজে মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইতে হইবে। নিজেদের কর্ম্মশক্তির দ্বারা নিজেদের ভরণপোষণ করিবার ক্ষমতা আহরণ করিতে হইবে।

চমৎকারিণী এখন দশবারটি নারীর শিক্ষার ভার লইয়াছে। নিজের পাঠ, প্রাণের পাঠে সাহায্য, গৃহকর্ম প্রভৃতি করিয়াও সে প্রত্যহ প্রায় দুইঘন্টা ঐ স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষাদান করিত। তাহার উৎসাহ দেখিয়া তাহার শিক্ষয়িত্রী বলিতেন, "তোমার মত মেয়ে দেশে যদি আরও কয়েক হাজার থাকত তা হলে মেয়ে জাতের আর কোন দুঃখ থাকত না।"

চমৎকারিণী সহাস্যমুখে বলিত, "আমারই ত আরও অনেক কাজ করা উচিত, তা করছি কোথায়?

"যা করছ, তাই বা করে কে? মেয়েদের স্কুলত হাতে

শোনা যায়। দেশের শতকরা নব্বইজন মেয়ে ত কোন স্কুলের দশ মাইলের মধ্যে থাকেই না ত পড়বে কি করে? তারপরে আছে খরচের কথা। ছেলে পড়াবার খরচই দিতে চায় না বেশীর ভাগ লোকে ত মেয়েদের পড়া ত কোথায় থাকে তা কেউ জানে না।"

"আজকাল-ত অনেকেই পড়াশুনা করাচ্ছে মেয়েদের।"

"তার থেকে অনেক বেশী লোকে মেয়েদের লেখা-পড়া করায় না।" কলিকাতায় মেয়েদের সান্ধ্য শিক্ষার জন্য অনেক সভা সমিতি গঠিত হইয়াছিল ও স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন প্রবল হইয়া উঠিতেছিল। শিক্ষালাভ করিলে স্ত্রীলোকগণ বিধবা হয় প্রভৃতি মিথ্যা আর লোকে জোর গলায় বলিত না। ইংরেজ সরকার নারী-শিক্ষার ব্যবস্থা করাতে কোন কোন সনাতনপন্থীদিগেরও চেষ্টা আরম্ভ হইল যাহাতে ভারতীয় আদর্শে স্ত্রীশিক্ষার আয়োজন হয়। কিন্তু জাতীয় উন্নতির দিক দিয়া ইংরেজী শিক্ষার প্রয়োজনই দেশবাসী অধিক উপলব্ধি করিতে লাগিলেন ও পুরুষদিগের শিক্ষায় যেরূপ স্ত্রীশিক্ষায়ও সেইরূপই শিক্ষার আদর্শে পাশ্চাত্যের প্রভাব বিস্তৃত-ভাবে স্বীকৃত হইতে লাগিল। ইংরেজী শিক্ষার মূল্য এতই অধিক ধার্য্য হইতে লাগিল যে ইংরেজী ধরন-ধারণ আদব-কায়দাও প্রসার পাইতে সুরু করিল। যাঁহারা উচ্চ রাজকর্মচারীদের পদে অধিষ্ঠিত হইতেন তাঁহাদের গৃহের স্ত্রীলোকগণ পর্দা-দরবারে যাইতে হইলে অনেক সময় ইংরেজ মহিলাদিগের অনুকরণে "গাউন" পরিতেও আপত্তি করিতেন না। ইঁহাদিগকে অনেকে "কান্ত্রিবিবি" (country ladies) বলিয়া অভিহিত করিতেন। সৌভাগ্যক্রমে ভারতীয় মহিলাদিগের মধ্যে সাহেবিয়ানা পোষাকে বিশেষ অগ্রসর হইল না। পুরুষের সাহেবিয়ানা বিশেষ করিয়া ইংরেজের মত পরিধেয় ব্যবহারে গিয়া পড়িয়াছিল। ইহার কারণ ছিল পুরুষের ইংরেজ প্রাধান্যে পরিচালিত আফিস দফতরে যাইবার আবশ্যকতা। যখন ভারতীয়েরা উচ্চরাজকর্মে নিযুক্ত হইতেন তখন তাঁহাদিগকে একপ্রকার বাধ্যতা মূলকভাবেই "সুট বুট" পরিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে ঘোরাফেরা করিতে হইত। কিন্তু নারীদিগকে সেইভাবে অফিস দফতরে যাইতে হইত না ও তাঁহাদিগের পক্ষে "কান্ত্রি-বিবি" সাজিবার প্রয়োজন তত প্রবল ছিল না। ভারতীয়া নারীদিগের মধ্যে যাঁহারা উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন তাঁহারা বস্ত্রপরিধান রীতি অল্পবিস্তর অদলবদল করিয়া এমন একটা ধরন সৃজনে সক্ষম হইলেন যে বিদেশীয়গণ ঐ শাড়ী পড়িবার "ষ্টাইল" দেখিয়া মানিয়া লইতে বাধ্য হইলেন যে তাহা ইয়োরোপের গাউন অপেক্ষা অনেকাংশে সুশোভন। ইহা ব্যতীত কৃষ্টির ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষা করিতেও ইয়োরোপীয় জ্ঞানীশ্রেষ্ঠগণ সদা প্রস্তুত ছিলেন। শিল্পকলা, দর্শন, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতিতে প্রাচ্যের প্রতিভার মর্য্যাদা স্বীকার করিলে কেহ আর বলিতে সাহস পাইত না যে আধুনিকতার বিরুদ্ধাচরণ করা হইতেছে। নিজ দেশের ভাব, ধর্ম্ম, নীতির আদর্শ ও ঐতিহ্য রক্ষার নাম করিয়া শিক্ষার প্রসারে বাধা দেওয়ার কোন কারণ এই সময় প্রকট হইয়া উঠে নাই এবং স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রীশিক্ষার জন্য যাঁহারা কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন তাঁহারা বিশেষভাবে সাধারণের শ্রদ্ধা আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন।

চমৎকারিণী নিজের পাঠ নিজগৃহেই করিয়া লইত; কিন্তু ছাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু এক বন্ধুর গৃহে ছাত্রীদিগকে পড়াইতে যাইত। এই গৃহ ক্রমে ক্রমে একটি বিরাট নারী শিক্ষার কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। যে সকল শিল্প-কৌশল আয়ত্ত করিলে নারীদিগের জীবনযাত্রার কার্য্যে সাহায্য হয় সেই বিষয়গুলিরও শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা এই কেন্দ্রে হইল। রন্ধন, সীবন-শিক্ষা দেওয়া হইত, আর হইত পোষাক পরিচ্ছদ ও গার্হস্থ্য কর্ম্মের ব্যবস্থা ও হিসাব প্রভৃতি। চমৎকারিণীকে তাহার সহকর্ম্মিণীগণ বলিতেন, "আপনি দুই তিনটে পাশ করে ফেল্লেই আপনার শিক্ষয়িত্রীর কাজে খুবই উন্নতি হবে।" চমৎকারিণী বলিত, "বাড়ীর কাজ করে আর পড়ার সময় পাই কখন যে পরীক্ষা পাশ করব?"

ঐ বিষয়ের আলোচনা সূত্রে একবার যখন প্রাণের পিতা মাতা কলিকাতায় আসিলেন, তখন কেহ কেহ প্রাণের মাতাকে বলিলেন যে তাঁহার "বড়বৌ" দুই তিন মাস সময় পাইলে অনায়াসেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন। মাতা শুনিয়া বলিলেন, "ওমা তাই না কি ? বড়বৌ এত লেখাপড়া করে ফেলেছে ? তা আমায় বল্লেইত আমি দুমাস কলিকাতায় এসে ঘরকন্না সামলাতে পারি।" ইহার কিছুদিন পরে চমৎকারিণীদের নারীশিক্ষা কেন্দ্র পরিদর্শন করিতে দুই-তিন জন মহিলা ও ভদ্রলোক আসিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে একজন ভদ্রমহিলা এম, এ, পাশ ছিলেন, ভদ্রলোক-দিগের মধ্যে ছিলেন একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। ছাত্রী ও শিক্ষয়িত্রীদিগের সহিত বাক্যালাপ করিয়া ইঁহারা বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। চমৎকারিণীকে ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করিলেন যে তিনি কোন স্কুলে পড়িয়াছেন। চমৎকারিণী বলিল, "গ্রামের বাড়ীতে একটি ছেলেকে মাষ্টার পড়াতেন আমি শুনে শুনে আর তার খাতাপত্র দেখে লিখতে পড়তে শিখে নি। পরে সেই ছেলেটি কলকাতায় পড়তে এলে পরে এখানে তার বইখাতা দেখে পড়া আরম্ভ করি, আর পরে আমার জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রী রেখে দেওয়া হয়।"

"মানে আপনি কখনও স্কুলে যাননি ? সব প্রায় নিজে নিজে শিখেছেন ?"

ভদ্রলোক বলিলেন "আশ্চর্য্য, খুবই আশ্চর্য্য ! আপনার উচিত পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে কলেজে পড়তে যাওয়া।"

চমৎকারিণী বলিল, "আমরা ত গ্রামের লোক। আমাদের সমাজে মেয়েদের পড়ান কখন হ'ত না। আমার শ্বশুর আমি পড়তে চাইতে পড়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এটা তাঁর খুবই সৎসাহসের কথা ; কেননা সমাজে যা চলেনা তা করলে সকলে নিন্দা আর সমালোচনা করে।"

"আপনি কি নারীশিক্ষার কাজে পুরাপুরি আত্মনিয়োগ করতে চান, না সুবিধামত যতটা পারেন তাই করতে চেষ্টা করছেন ?"

"সে কথার উত্তর আমি শুধু নিজের ইচ্ছামত দিতে পারি না। আমি যে বাড়ীর বউ তারাও দাবী করতে পারেন যে আমি বাড়ীর মুরুব্বিদের কথা মতই চলব। আমার নিজের ইচ্ছের উপর চলা ত সম্ভব নয়।"

"হ্যাঁ বিবাহিতা মেয়েদের পক্ষে গৃহস্থালির কাজ ছেড়ে দিয়ে সমাজসেবা করা চলে না। ছেলেপিলে প্রতিপালন প্রধান কাজ। আপনার বোধহয় ঐ জাতীয় কর্ত্তব্য আছে অন্ততঃ কিছু কিছু।"

"না আমার কোন সন্তান নেই। তবে বাড়ীর কাজ আছে যথেষ্ট।"

সকলে চমৎকারিণীর সমাজসেবার আগ্রহ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাহাকে প্রশ্ন করিলেন, তাহার মনের গতি এই দিকে কেমন করিয়া চালিত হইল। সে সরলভাবে উত্তর দিল, "গ্রামের মেয়েদের মনে হয় কেউ মানুষ মনে করে না। সামাজিক নিয়মের ফলে পাঁচজন মেয়ের একজন মানুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। কখন কখন বউদের বয়স একবৎসর থেকে ষাট বৎসর অবধি হয়, বরের বয়সও হয় দুই তিন বৎসর থেকে নব্বই অবধি। টাকা নেওয়া দেওয়ার ধাক্কায় ঘরে ঘরে কান্নাকাটি লেগে যায়। বিধবা হলে মনে হয় যে পৃথিবীর সব দোষ যেন ঐ অভাগিনীরই। আগে আগে শুনেছি বিধবাদের পুড়িয়ে মারা হ'ত, এখন তা হয় না কিন্তু তাদের যে অত্যাচার অবিচার আর অন্যায়ের মধ্যে থাকতে হয়, তার চেয়ে পুড়ে মরা ভাল হয়। দেখে আমার মনে হল যে, মেয়েদের লেখাপড়া না করালে তাদের ভিতর সেই আত্মসম্মানবোধ কখনও হবে না যা না হ'লে তারা কখনও অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চাইবে না। আমি সেই জন্যে পড়তে আরম্ভ করলাম, আরো অনেক মেয়েদের পড়তে বল্লাম। কলকাতায় এসেও দেখছি লেখাপড়া না শিখলে কেউ মানুষ হয় না, মানুষের কোন অধিকার চায়ওনা, পায়ওনা।"

ভদ্রলোক বল্লেন, "বাঃ বাঃ বেশ বলেছেন ! একেবারে ঠিক কথা ! আপনি মেয়েদের অপমানের কথা যেমন মনে প্রাণে বুঝেছেন অপরে তা অমন করে বুঝতে

পারে না। অপমান আর অবিচারবোধ মনের কথা। শিক্ষাছাড়া মনের সে পরিণত অবস্থাই হয় না যখন বোধশক্তি চিরজাগ্রত হয়ে থাকে আর মানুষকে তার মনুষ্যত্বের অধিকার ক্ষণিকের জন্যেও ভুলতে দেয় না।"

চমৎকারিণী সেদিন বাড়ী ফিরিয়া আসিয়া ভাবিতে বসিল যে তাহার ভবিষ্যৎ কোন পথে তাহাকে লইয়া যাইবে। তাহার বয়স ত প্রায় ত্রিশ হইতে চলিয়াছে। পতি এখনও বালক। দুইটি বালিকা সপত্নী বর্তমান ও তাহাদিগের মধ্যে কোনও একজন ঐ বালকের বয়স অনুপাতে তাহার পত্নী হইবার যোগ্যা হইতে পারে। চমৎকারিণী নিজে ঐ বালকের অভিভাবিকা রূপে এখনও আরো দশ বৎসর কাটাইয়া দিতে পারে; কিন্তু তৎপরে কি হইবে? যাহাকে গড়িয়া-পিটিয়া মানুষ করিতেছে তাহাকে কোন সময়েই ভক্তি শ্রদ্ধার পাত্র বিবেচনা করা সম্ভব হইবেনা বলাবাহুল্য।

প্রাণ বাড়ী ফিরিলে তাহাকে ডাকিয়া চমৎকারিণী বলিল," দেখ আমি ভাবছি বাবার বাড়ী চলে যাব। তোমার এখানে এসে মা থাকবেন। আমি এর পর আর তোমাদের সঙ্গে থাকব না।"

"কেন কি হয়েছে? আমি ঠিক লেখাপড়া করছি। তোমার তা হলে রাগ হয়ে গেল কেন? না, না, যেতে হবে না যা বলবে আমি তাই করব। মা এলে চলবে না। মা কি আমার হোমওয়ার্ক করে দেবে, না কি করে দেবে?"

"তা নয়, তা নয়, রাগটাগ করিনি। তুমি নিজের মত লেখাপড়া করে বড় হও। আর আমি নিজের মত যা জোটে তাই করে দিন কাটাই। তাতে তোমার কি অসুবিধে হবে?"

"না, না, সে হয় না। আমি লেখাপড়া করে রোজগার করে সব টাকা ত তোমাকেই এনে দেব। তোমার কাজ করতে হবে কেন?"

"আহা তোমার টাকা ত তোমার বউ বিলাসিনী, উল্লাসিনী খরচ করবে। তা ছাড়া বাবা মা আছেন। আর আমি ত চাকরী জোগাড় করে নিয়ে নিজের খরচ নিজেই চালিয়ে নেব।"

"হ্যাঁ, বিলাসিনী উল্লাসিনী! ওরা আবার আমার কে? আমি ওদের দেখতেও চাই না। ও সব চাকরী জোগাড়টোগাড় করলে হবে না। তুমি যদি চলে যাও ত আমিও লেখা পড়া ছেড়ে দিয়ে বাড়ী থেকে পালিয়ে যাব।"

চমৎকারিণী বলিল, "ভাল বিপদ! তুমি লেখাপড়া শিখে মানুষ হও; পরিবার প্রতিপালন কর; আমার সঙ্গে তার কি?" "তার কি মানে? তাহলে আমাকে বছরের পর বছর'পড় পড়'করে পড়াবার কি দরকার ছিল? তোমার কিছু নয় ত আমাকে এতকাল জোরজুলুম করে পড়ালে কেন? কাজ করতে হয় ত তুমিও কাজ কর আমিও করি। চলেটলে যেতে পারবেনা।"

চমৎকারিণী বুঝিল বিষয়টা যত সহজ মনে করা যাইতে পারে তাহা ঠিক নহে। প্রণয় বা অনুরাগের জাগরণ না হইলেও ভালবাসার আকর্ষণী শক্তি অনুরূপ ধারণ করিয়া মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে পারে ও সে সম্বন্ধ কাটাইয়া উঠা তেমনিই কঠিন হইতে পারে যাহা নরনারীর প্রেমের ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। ছেলেটা যে তাহার প্রতি একটা প্রগাঢ় বন্ধুত্বভাব পোষণ করে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। পূর্বে চমৎকরিণী যখন তাহাকে প্রহারও করিয়াছে তখন সে তাহা হৃষ্টচিত্তেই মানিয়া লইয়াছে। তাহার নিজেরও মনে ঐ বালকের সেবাযত্ন করিতে বা তাহাকে শাসন করিয়া কর্তব্যের পথে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে কোন বিতৃষ্ণার ভাব জাগ্রত হয় না। সে মনোভাবের সহিত পতিভক্তি অথবা পত্নীপ্রেমের কোন দূরের সম্পর্কও না থাকিলে তাহা যে কোন বীত-রাগ কিম্বা নিস্পৃহ ভাব নহে সে কথা মানিতেই হইবে। কিন্তু ঐ মানসিক অবস্থা কি চিরস্থায়ী হইতে পারে? বালক যখন ছাব্বিশ বৎসরের যুবক হইবে তখন কি কোন চল্লিশ বৎসর বয়স্কা নারী তাহার পরিচর্য্যা করিয়া দিন

কাটাইতে হইলে জীবনে কোন পূর্ণতা অনুভবে সক্ষম হইবে? যুবকও স্বভাবতই কোন অল্পবয়স্কা রমণীর সঙ্গ কামনা করিবে এবং এই ক্ষেত্রে তাহার অপর দুই পত্নীর বয়স তাহা অপেক্ষা তিন ও ছয় বৎসর কম, সুতরাং সে বিলাসিনী উল্লাসিনীর দ্বারাই আকৃষ্ট হইবে এবং প্রৌঢ়া চমৎকারিণীকে মাতৃ-স্থানীয়া মনে করিয়া সম্ভ্রম দেখাইবে মাত্র। অর্থাৎ যুবক পতি ও প্রৌঢ়া পত্নীর মধ্যে কোন পাতিব্রত্য অথবা পত্নীপ্রেমের সম্বন্ধ গড়িয়া উঠিতে পারে না। সপত্নী পরিবেষ্টিত যুবক স্বামীর পরিচর্য্যা করিয়া জীবন যাপন করা মনের দিক হইতে মহা সুখকর হইবে না বুঝিয়াই চমৎকারিণী চাহিতেছিল সমাজের কার্য্যে আত্ম-নিয়োগ করিতে। কিন্তু দেখিল বর্ত্তমানে তাহা করা সম্ভব হইবে না। কিন্তু আরও ৭।৮ বৎসর গত হইলে অবস্থান্তরে তাহা ব্যতীত অন্য উপায়ে জীবন পথে প্রতিষ্ঠা সম্ভব হইবে না।

৫

কয়েক বৎসর গত হইয়াছে। চমৎকারিনী ইতিমধ্যে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গৃহে পাঠ করিয়া বি, এ, অবধি পাশ করিয়া ফেলিয়াছে। সে এখন বেতনভোগী শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত। প্রাণও ভাল করিয়াই পাশ করিয়া এখন সরকারী চাকুরীর জন্য পরীক্ষা প্রতিযোগীতার জন্য প্রস্তুত হইতেছে। সক্ষম হইলে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইবে সকলে আশা করেন। সে এখনও স্বভাবে বালকের মতই আছে। বিলাসিনী ও উল্লাসিনী একবার কলিকাতায় আসিলে প্রাণ বড়বৌকে জিজ্ঞাসা করিল উঁহারা কি বড়বৌ-এর ভগিনী, না কে? বড়বৌ যখন তাহাকে বুঝাইল যে উঁহারা তাহারই পত্নী, সে তখন অবিশ্বাসের হাসি হাসিয়া বলিল, "তোমার মাথা খারাপ, আমার বৌ-টৌ ওরা কিছু নয়। একজন ছেলের নাকি অতগুলো বৌ হয়! উঁহাদিগের সম্বন্ধে তাহার আর কোন কৌতুহল লক্ষিত হইল না। তাহারা কলিকাতা দেখিয়া নিজ নিজ পিত্রালয়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। প্রাণ লেখাপড়া ও ফুটবল খেলা লইয়া নিজ সময় অতিবাহিত করিত। দেশনেতাগণ কোন স্থানে বক্তৃতাদি দান করিলে সে তাহার সঙ্গী কয়েকজন যুবকের সহিত সর্ব্বদাই সেই সকল বক্তৃতা শুনিতে যাইত। গৃহে ফিরিয়া আসিয়া চমৎকারিণীকে কে কি বলিলেন ও তাহার তাৎপর্য্য কি তাহা উত্তমরূপে ব্যাখ্যা করিত ও কখন কখন কোন কথা লইয়া তর্কের সুচনা হইত। চমৎকারিণী বলিত নিজের প্রাত্যহিক কর্ত্তব্যপালন সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় কার্য্য। যে তাহা করে না সে উচ্চ আদর্শের আড়ালে গা ঢাকা দিয়া নিজ কর্ত্তব্যে যে অবহেলা করিতেছে সে কথা লোককে বুঝিতে দিতে চায় না। পরিধেয় বস্ত্র যে প্রত্যহ ধৌত ও পরিষ্কার রাখে না তাহার মুখে চরিত্রের শুভ্রতা ও আত্মার পবিত্রতার কথা শুনিবার কোন প্রয়োজন হয় না। যে নিজের বৃদ্ধা মাতার অথবা পরিবারের নারী ও শিশু-দিগের রক্ষণাবেক্ষণ করে না তাহার দেশসেবার আস্ফালনের কোন অধিকার থাকে না। অক্ষর-পরিচয় না থাকিলে বিদ্যার উন্নততর শাখায় যেমন যাওয়ার কথা উঠেনা; মানবজীবনের ভিতর যে সকল মূল কর্ত্তব্য সেগুলি না করিয়া তেমনি উন্নততর কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া সম্ভব হইলেও অধিক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে তাহা শুধু মুখের কথাতেই থাকিয়া যায়। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্য্যে যাহারা অবহেলা করে, বৃহৎ কার্য্যও তাহারা করিতে অক্ষম। সুতরাং বড় বড় কথা বলিতে না শিখিয়া জীবনের গাঁথুনি শক্ত ও উপযুক্তভাবে গঠিত রাখিতে শিখাই মানুষের প্রথম কর্ত্তব্য।

প্রাণ বলিত, "হ্যাঁ, সে কথা ঠিক বড়বৌ; কিন্তু ঘরোয়া কাজে ডুবে থাকলে মানুষের নজর বড় হতে পারে না।"

"কিন্তু নজর বড় হতে গিয়ে যদি কেউ না খেয়ে মরে থাকে, কিম্বা পরিবারের লোকেরা চিকিৎসা না হয়ে

ঢুকতে থাকে তা হলেই বা চলে কি করে? সুদূর আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র দেখতে দেখতে চাষের কথা ভুলে গেলে ত চলবে না। ব্রহ্মবিদ্যা লাভের কথা ভালই; কিন্তু খাওয়া-পরা, মাথার উপর ছাদ, তারও প্রয়োজন কম নয়। সাধারণলোকের কাছে তার মূল্যই বেশী। পণ্ডিত প্রতিভাবান আর নেতা যাঁরা, তাঁরা সংখ্যায় খুবই কম। তাঁদের দিয়ে সকলের কথা বিচার করা যেতে পারে না।" "সমাজ সংস্কার ত দরকার।" "খুব দরকার; কিন্তু সেই সঙ্গে সমাজ-রক্ষাও না করে চলতে পারলে, কিসের সংস্কার হবে?"

"তুমিই ত বল, সমাজের রীতি-নীতি খারাপ। সেসব বদলাতে হবে। আবার তুমিই বলছ সমাজরক্ষা করতে হবে।"

"হ্যাঁ কুরীতি-দুর্নীতি ভেঙ্গে দিতে হবে। কিন্তু সমাজটাকে ত আর ভাঙ্গলে চলবে না। সমাজের গোড়া পত্তন ঠিক রাখতে হলে ন্যায়, সুবিচার, অধিকার, অনধিকার বিচার করে চলতে হ'বে। ভুল বা অন্যায় কথা লেখা হয়েছে বলে বর্ণমালা আর ব্যাকরণ উপড়ে ফেলে দিতে হবে বললে ত চলবে না। দাবি, দায়িত্ব, দেনা, পাওনা, উচিত, অনুচিত সবই হিসেব করে বিচার করতে হ'বে। রীতি-নীতি শুধরান মানে উচ্ছৃঙ্খলতা আর অরাজকতা নয়।"

"তা হলে কি বৃটিশ শাসন মেনে চলতে হ'বে?"

"না, তা নয়। কিন্তু বৃটিশকে বাদ দিয়ে নিজের শাসনে নিজেকে থাকতে হ'বে। শাসন মানতেই হ'বে; শুধু পরের শাসন না হয়ে তা হবে নিজের শাসন। আত্ম সংযম, আত্মদমন কথাগুলি কি শোননি কখন? নীতি অন্যে ঘাড় ধরে মানাবে সেটা ভাল কথা নয়; কিন্তু নীতি নিজের থেকে বুঝে বিচার করে ঠিক করতে হ'বে। নীতি থাকবে না, এমন হতে পারে না।" চমৎকারিণী প্রাণকে বুঝাইয়া বলিত যে তাহার নিজের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য হইল যাহারা তাহার উপর নির্ভর করে তাহাদের মঙ্গল চেষ্টা ও সেবা। তৎপরে আসিবে সমাজ জাতি ও বিশ্বমানবের মঙ্গলের কথা।" "Charity begins at home; কথাটা ইংরেজী হলেও মহা সত্য। পরোপকারের ধাকায় যদি নিজের পরিবারের মানুষ কষ্ট পায় তাহ'লে তখন দেখতে হ'বে যে পরোপকারের পরিমাণ কতটা; আর এত বেশী কিনা যাতে বাড়ীর লোকের কষ্টের দোষটা খারিজ হয়ে যায়।" "যেমন তোমার মতলব আমাদের যার তার হাতে তুলে দিয়ে নিজে নারীমঙ্গল করতে লেগে যাবে। আমি বলি তুমি আমাদের মঙ্গল করতে থাক।"

"কেন? তোমরা কি আমার উপর নির্ভর কর? তোমাদের এখন ভরণ-পোষণ করেন বাবা; পরে করবে তুমি। আমি ত যা খুশী করতে পারি।" "উঁহু, তুমিই হলে এ বাড়ীর কর্ত্রী। তোমার কথায় সবাই ওঠে বসে। তুমি সরে পড়লে সকলের ভীষণ কষ্ট হবে।"

"না না, তোমার খুবই সুবিধে হবে। ফাঁকি দিয়ে, ফুটবল খেলে বেড়াতে পারবে।" "স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ফুটবল খেলার ভিতর দিয়ে মানুষের খুব উন্নতি হয়। ফুটবল খেলার নিন্দে করার কোন কারণ নেই।"

"তিনি কত বড় বড় কথা বলেছেন সেসব কথা কি মনে পড়ে কিছু কিছু না শুধু ঐ ফুটবল খেলার কথাটাই মনে গেঁথে আছে?"

প্রাণ তর্কে কখন সুবিধা করিতে পারিত না; কিন্তু তর্কে অগ্রসর হইতেও তাহার বিন্দুমাত্র বিলম্ব হইত না। চমৎকারিণী তাহাকে তর্কে নামাইয়া তাহার বিফল প্রয়াস দেখিয়া আনন্দ উপভোগ করিত। প্রাণও চমৎকারিণীর নিকট পরাজয়ে কোন কষ্ট অনুভব করিত না।

চমৎকারিণীর শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য ভালই লাগিত। সে একপ্রকার স্থির করিয়াই লইয়াছিল যে প্রাণ কার্য্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া বসিলে সে দূরের অন্য কোন শহরে কাজ লইয়া চলিয়া যাইবে। তাহা হইলে অল্প বয়স্কা সপত্নী ও তরুণ স্বামীর সান্নিধ্যের পীড়াদায়ক অবস্থায় তাহাকে থাকিতে হইবে না এবং প্রাণও অল্পে অল্পে ঐ

দুই বালিকার কোন এক জনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া সংসার করিতে সক্ষম হইবে। কিন্তু প্রাণের মনের গতি তাহাকে ঐ দুই বালিকার প্রতি কোনও প্রকারেই কোন আকর্ষণের দিকে যাইতে দিতনা। উহারা অজানা অচেনা ও কি রকম যেন অসহ্য স্বভাবা। বড়বৌ উহাদিগের তুলনায় কত বুদ্ধিমতী, কর্মকৌশলা ও আদর্শনিষ্ঠায় চির জাগ্রত। উহাদের সহিত সে কেন থাকিবে? পিতার উচিত উহাদিগকে ধন সম্পত্তি লিখিয়া দিয়া পুত্রকে দায়িত্ব মুক্ত করিয়া দেওয়া। বড়বৌকে সে বলিল, তুমি যে বল ঐ দুইজন আমার বউ আর আমার সঙ্গে এসে ওরা থাকবে, ও সব হবে না। ওরা দেশে নিজের মত থাকুক বাবাকে বুঝিয়ে দিও। নইলে আমি দেশ ছেড়ে পালিয়ে যাব।'

"তা তুমি ওদের বিয়ে করেছ ওরা তোমার সঙ্গেই থাকবে। আর আমি কেন বাবাকে বলতে যাব। তুমি বল গিয়ে। আমার কিসের দায়?" "না না বড়বৌ। আমাদের সঙ্গে ওদের থাকা চলবে না। ওরা যেন কি রকম।"

"আমি ত চলে যাব অন্য জায়গায় কাজ নিয়ে। তখন ওরাই তোমার ঘর সংসার চালাবে। তুমিও দুদিন পরে ওরা কি রকম সে কথা আর মনেও রাখবে না"

"সেও কি হয় নাকি? দুজন স্ত্রী থাকলে আমার ভদ্রসমাজে জায়গা হবে না। ওসব চলবে না। যেমন করে পার ওদের ব্যবস্থা করে সরিয়ে দেও।" "তাহলে তোমার ঘরকন্না সামলাবে কে? আমি বেশীদিন এখানে থাকব না।"

"তুমি থাকলেই ত পার। কলকাতায় কাজ কি করতে কোন বাধা আছে? কাজত করছই এখন। আর আমি ত তুমি যা বল সব কথাই শুনে চলি। ত তোমার না থাকবার কারণটাই বা কি?"

"সে তুমি বুঝবে না। আর ডেপুটি হলে তোমার কলকাতার বাইরে যেতে হতে পারে তখন তোমার সঙ্গে কে যাবে?"

"যেই যাক আর যাই হোক তোমার ঐ বি আর উ চলবে না। ওরা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে।"

চমৎকারিণীর বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে একজন মহিলাই শুধু জানিতেন যে তাহার একজন বয়ঃকনিষ্ঠ বালকের সহিত বিবাহ দেওয়া হইয়াছে ও তাহার পক্ষে ঐ বালকের প্রতি কোন পতিভক্তি বা প্রেমের ভাব পোষণ করা অসম্ভব ও অস্বাভাবিক। ঐ ভদ্রমহিলা নিজেও ছিলেন শিশু-বিধবা। তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল শিশু অবস্থায় একজন প্রৌঢ় রুগ্ন ব্যক্তির সহিত। সে ব্যক্তি বিবাহের কয়েকমাস পরেই পরলোক গমন করে। তাঁহাকে তখন শিশু অবস্থায় বৈধব্য "ধর্ম্ম" পালন করিতে শিখান আরম্ভ হয়। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া কাশী চলিয়া যান ও সেইখানে তাঁহাকে লেখাপড়া শিখাইয়া স্বাবলম্বনক্ষম করিয়া তোলেন ভদ্রমহিলা নিজের উপার্জ্জনে নিজের ও বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ করিবার ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। তিনি বেশ লিখিতেও পারিতেন। চমৎকারিণীর জীবন কাহিনী শুনিয়া তিনি বলিতেন," আপনার পতির অবস্থা ত দেখছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত একটা নূতন কবিতার অপ্সরার উল্টা অবস্থা। কবি লিখেছেন উর্ব্বশী সম্বন্ধে নহ মাতা, 'নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী হে নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী।'

আর আপনার স্বামী হয়েছেন, 'নহ পিতা, নহ পুত্র নহ পতি, সুন্দর তরুণ, ধ্বনিহীন সুর সকরুণ"

"না ধ্বনিহীন একেবারেই নয়। কথাও বলে চিৎকারও করে, শুধু আর যা বলেছেন সেগুলো ওর সম্বন্ধে পুরাপুরিই খাটে। আমি যদি নন্দনবাসিনী উর্ব্বশী হ'তাম, তাহলে কোন সমস্যা থাকত না। কিন্তু এক সঙ্গে ঘোমটা ঢাকা লজ্জাশীলা কুলবধূ আর বেত হাতে হেডমাষ্টার দুটো ভূমিকায় অভিনয় করতে হ'লে সেটা সহজ কাজ হয় না।"

"কিন্তু অনেক বাড়ীর লজ্জাশীলা বধূরা ঘোমটাও দেয় বেতও চালায়। তাদের ত কোন অসুবিধা হয় না।"

"হয় না তার কারণ বাইরের থেকে দেখলে ব্যাপারটা অস্বাভাবিক দেখায় না। যার যা 'পার্ট' তার সেই রকম চেহারা। ঘটোৎকচের পার্ট যদি একটা চারফুট দুই ইঞ্চি লম্বা মেয়েকে দেওয়া হয় আর অন্ত যোদ্ধারা যদি ছ ফুট পুরুষ হয়, তাহলে সবকিছু বেমানান হয়ে দাঁড়ায়।"

"পার্ট বদলে দিতে হবে আর কি।"

"হ্যাঁ কিন্তু সত্যিকারের যাত্রা হ'লে তা করা যেত। এ যে আবার যাত্রাও নয়, অথচ রঙ্গমঞ্চের পরিস্থিতিতে বাস্তবের সামঞ্জস্য রক্ষার সমস্যা।" "জটিল! বড়ই জটিল! কিন্তু আমরা যারা ইতিহাসের একটা সময়ে পূর্ব্ব যুগের মানুষদের সামাজিক অব্যবস্থা কিম্বা বদ অভ্যাসের ধাক্কা খেয়ে অকারণে আর বিনা দোষে বিপর্য্যস্ত হচ্ছি; আমাদের সে অবস্থায় কি করা কর্ত্তব্য? চুপ করে সব সহ্য করে নেব, না বলব, আমরা ওসব মানি না, আমাদের জীবনের উপর মৃত পূর্ব্বপুরুষরা যেমন ইচ্ছে অন্যায় বোঝা চাপিয়ে দেবার নিয়ম করে দেবেন ও আমরা তার জন্তে ভুগে মরব, এ কোন সমাজনীতি নয়। আমাদের জীবন আমাদের, আর আমরাই নিজের জীবন নিয়ে কি করব তা ঠিক করতে চাইব, আর ঠিক করব।"

"কিন্তু ঐ ছেলেটা, ও ত কোন দোষ করেনি। ওর বাবা আর আমার বাবা পূর্ব্বপুরুষদের গড়া নিয়ম মেনে ওর আর আমার বিরুদ্ধে একটা মহাঅপরাধ করেছেন। আমি যদি ঐ বালক পতিকে ছেড়ে দিয়ে নিজের ব্যবস্থা করেনি তাতে পিতাদের কোন শাস্তি হবে না; পূর্ব্ব-পুরুষরা ত শাস্তির নাগালের বাইরে। মার খাবে ঐ ছেলেটা। আমি ত ওর পত্নী নই, অবৈতনিক 'গভর্নেস'। আমি চলে গেলে ওর জীবনে একটা এমন নাড়া পড়বে যে ও তা সামলে উঠতে বিশেষ কষ্ট পাবে। তাছাড়া ওর হাতে আরও দুইজন ওর থেকে কম বয়সের স্ত্রী আছে। তারাই বা কি করবে বা কোথায় যাবে?"

"আর বলবেন না। বলবেন না! যারা ভাবে ব্যক্তির অধিকার সমাজের অধিকারের চেয়ে জোরাল তারা জানে না যে ব্যক্তি কেমন করে সমাজের শেকলে হাত পা বাঁধা হয়ে আছে; আর যারা ভাবে সমাজকে তারা আরও জোরাল করে ব্যক্তির উপর পুরপুরি রাজত্ব করতে বসিয়ে দেবে তারাও বোঝে না যে ইতিহাস সমাজকে কত যুগ যুগান্তর থেকে প্রবল রাজ অধিকারে ব্যক্তির বুকের উপর সওয়ার করে বসিয়ে রেখে দিয়েছে। ব্যক্তির পক্ষে সমাজের প্রভুত্ব অস্বীকার করে চলা অসম্ভব। জন্মের থেকে মৃত্যু পর্য্যন্ত মানুষ সমাজের রীতি নীতি নিয়ম পদ্ধতি ভাল মন্দ উঁচু নিচু স্বদেশ বিদেশ বিচার ইত্যাদির ধাক্কায় নিজের নিজত্ব ভুলে 'পাছে লোকে কিছু বলে' সেই ভাবনাতেই ডুবে থাকে। আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে আমাদের সমাজ কত পুরাণ জঞ্জাল বয়ে চলেছে। কিন্তু কোনও না কোন কিছু সব সমাজেই আছে আর থাকবে, যাতে মানুষের জীবন কষ্ট-কর হয়ে ওঠে আর উঠতে থাকবে। ইয়োরোপে বহুবিবাহ নেই, বিধবা বিবাহ হয়, বাল্য বিবাহ নেই; কিন্তু সেখানের সমাজ অন্ত বহুরীতি চালিয়ে রেখেছে যাতে মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়।"

"হ্যাঁ তাত শুনেছি। বিয়ে আজ হয়ত কাল নাকচ হয়ে যায়। তারপর বুড়ো মা বাপকে তারা নিজেদের কাছে রাখেনা। কারুর সম্বন্ধে পরিবারের কোন দায়ীত্ব পরিবারের লোকেরা মানে না। হাসপাতালে, অনাথ আশ্রয়ে আর সরকারী ব্যবস্থাতেই সব চলে। বহুলোক বিয়ে না করেই জীবন কাটিয়ে দেয়। যেমন, আমাদের দেশে শুধু কথার বিয়ে হয়, কাজে মানুষগুলো অবিবাহিতই থেকে যায়; ওদের দেশে বিয়ের অভিনয়টা ওরা আর করে না। আমাদের দেশে বিয়ে একবার হলে আর একবার সেটা ভেঙ্গে গড়া চলে না; মেয়েদের পক্ষে। পুরুষ যা খুশী করতে পারে। স্ত্রীকে ত্যাগ করা কি আর পাঁচটা বিয়ে করা, সবই পুরুষের পক্ষে চলে।" "হ্যাঁ, কিন্তু মেয়েরা লোকলজ্জার ভয় বেশী করে কিনা সেই জন্তে তাদের এত কষ্ট। তা

নইলে তারা ধর্ম্ম বদলে আর আইন আদালত করে হয়ত কিছু করে নিতে পারত।"

"কিন্তু যেখানে বিবাহিত পুরুষের আর স্ত্রীর কারুরই কোন দোষ নেই, দুজনেই সমাজের রীতির দোষে খেলার বিয়েতে জড়িয়ে পড়েছে, সেখানে কি করতে পারে কে? ধর্ম্ম বদলাবার ইচ্ছে না থাকতে পারে। আর ধর্ম্ম বদলে কোন মুসলমানকে বিয়ে করতে ইচ্ছে না হতে পারে। তাহলে কি করা যায়?"

"বিশেষ কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। বিয়ে হয়নি বলে ধরে নিয়ে জীবন যাতে সুখের আর কাজের হয় তাই দেখতে হয়। অর্থাৎ আমরা যা করছি, যেভাবে আছি সেইভাবেই চলতে থাকতে হবে বলেই আমার বিশ্বাস।"

* * * * * * * * * * * * * * *

অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের যে যোগ তাহা গভীর, ঘনিষ্ঠ ও অচ্ছেদ্য। শরীরের মধ্যে যেমন বংশানুক্রমিতা রক্তের কণায় কণায়, শিরা উপশিরায়, অস্থিতে পেশিতে ও স্নায়ুর অন্তরতম অংশে একান্তভাবে সংযুক্ত থাকে ও হাজার বৎসরের ক্রমবিকাশ পুরাতনের সম্বন্ধ কাটাইয়া উঠিতে পারে না, মনের ক্ষেত্রে তেমনি মানব-ইতিহাসের যত হারান প্রতিক্রিয়া সবই ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া আত্মগোপন করিয়া লুকাইয়া থাকে। উত্তেজনা যদি যথেষ্ট প্রবল হয় তাহা হইলে সুপ্ত যাহা তাহাও জাগিয়া উঠে। মানব-ইতিহাসেরও পূর্ব্বের অপরাপর জীবের অনুভূতির চিহ্নও গোপনে মানবমনে গ্রথিত থাকিয়া যায়। সেই সকল ভাবধারাও ভিন্ন ভিন্ন আকার অবলম্বনে মানবমনকে লক্ষ বৎসর পরেও সাড়া দিতে সক্ষম হয়। স্বপ্নে ও চিন্তার আবছা ধোঁয়াটে প্রতিকৃতির ভিতরে জৈব ক্রমবিকাশের পূর্ব কাহিনী অস্ফুট ভাষায় আংশিকভাবে কথিত থাকে। তাহার অর্থবোধ করিতে হইলে বিশ্লেষণ ও বিচার অতি গভীর হওয়া আবশ্যক হয়। কিন্তু মানবসমাজ গঠিত হইবার পরের কথা যাহা তাহা প্রায় পূর্ণরূপেই নিজ আকার বজায় রাখিয়া বর্ত্তমানের জীবনধারায় প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সামাজিক রীতি-নীতি ও ব্যবহারগত অভ্যাসাদি মোটামুটি নিজত্ব রক্ষা করিয়াই চলে। যদিও সমাজসংস্কারের ফলে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন সর্ব্বদাই ঘটিতে থাকে। স্বরূপ পরিবর্ত্তন পূর্ণতালাভ করিতে দীর্ঘকাল লাগিয়া যায়। সেই কারণে বহু বিবাহ রীতি উঠিয়া যাইতে কয়েক শত বৎসর লাগিলেও তাহা কোথাও কোথাও বর্ত্তমান থাকিয়া যাইতেছে।

যেসকল সমাজে রমণীরা বহু ভর্তৃকা সেসকল স্থলেও পরিবর্ত্তনে সময় লাগিতেছে। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে সমাজসংস্কার আদর্শ ক্ষেত্রে গৃহীত হইয়া থাকিলেও কার্য্যতঃ সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই। অবরোধ প্রথা তখনও প্রবল ছিল, স্ত্রী-শিক্ষা শুধুমাত্র আরম্ভ হইয়াছে, বহু বিবাহ অল্প শিক্ষিত সমাজে পূর্ব্বের মতই প্রচলিত ছিল এবং স্ত্রী-স্বাধীনতার কোন জোয়াল পরিচয় প্রাপ্তি আরম্ভ হয় নাই। চমৎকারিণী নিজ জীবনের ধারা কোন পথে চলিবে তাহা একপ্রকার স্থির করিয়া লইয়াছিল। শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিবে এবং প্রাণ সাবালক হইলে পরে চমৎকারিণী কোন নারীদের শিক্ষাকেন্দ্রে যাইয়া বাস করিবে এইরূপই তাহার ইচ্ছা ছিল। যতদিন প্রাণ অভিভাবক না থাকিলে অসুবিধায় পড়িবে ততদিন চমৎকারিণী তাহাকে দেখিবে। পরে যদি প্রাণ ইচ্ছা করে ত তাহার অপর দুই পত্নীর সহিত আবশ্যকঅনুযায়ী সম্বন্ধ রক্ষা করিতে পারিবে। সে কি করিবে তাহার সম্বন্ধে চমৎকারিণী কোন নির্দ্দেশ দিবে না বা তাহাকে কোনভাবে মনস্থির করিতে সাহায্য করিবে না।

এই সকল আলোচনা সে দুই একবার করিয়া থাকিলেও প্রাণ কিছুটা পরিণত বয়স্ক হইবার পরে আর কোন সময়েই করিত না। প্রাণ যদি "ঐ দুটো" বলিয়া প্রসঙ্গের উত্থাপনা চেষ্টা করিত তাহা হইলে চমৎকারিণী বলিত তোমার তা নিয়ে এখন মাথা ঘামাতে হবে না। নিজের লেখাপড়া শেষ কর। চাকরী-বাকরী কর, তারপর বুঝেসুঝে নিজের ব্যবস্থা

আর ওদের ব্যবস্থাও ভদ্রতার সব নিয়ম বাঁচিয়ে ঠিক ভাবে করে নিও। আমি তখন তোমার সামলাতে থাকবও না, আর তুমি তখন নিজের পায়ে নিজে দাঁড়িয়ে পথ চলতে শিখে নেবে। শুধু মনে রেখ আমরা সকলেই সমাজের কুরীতি আর দুর্নীতির ফলভোগ করছি। ঐ দুটি মেয়েও সেইভাবেই একটা খুবই খারাপ অবস্থায় পড়েছে। তাদের সম্বন্ধে তুমি সবদিক দিয়ে ভাল মন্দ বিচার করে 'চলবে। আমি দূরে থাকলেও যদি শুনি যে তুমি শুধু নিজের সুবিধার দিকে নজর রেখে ওদের কোন অসম্মান বা দুঃখের কারণ ঘটিয়েছ তাহলে আমার বড়ই দুঃখ হবে আর আমি জানব যে তোমার শিক্ষার জন্যে এতদিন যে আমি খেটেছি তা বিফল হয়েছে!

প্রাণ বলিল "ওদের যাতে কোন ক্ষতি না হয় তা ত আমাদের দেখতেই হবে। আমি ত শুধু বলেছি যে আমি ওদের সঙ্গে থাকতে চাই না। তোমরা বল ওরা আমার বৌ। আমি বলি ওসব কিছু না ওরা নিজের মত থাকুক আমিও নিজের মত থাকব। বাবা যদি ওদের সঙ্গে আমার বিয়ে দিয়ে থাকেন ত তার দায়িত্ব বাবার, আমার নয়। আর তুমি যে বলছ, তুমি চলে যাবে, সে কথার মানেটা বুঝলাম না। তোমার যাবার দরকারটা কি?"

"সে তুমি বুঝবে না। আর তুমি যতদিন ছোট আছ ততদিন ত আমি রয়েছি তোমার কাছে। যখন তোমার আর আমাকে দরকার হবে না তখনই ত আমি চলে যাব, তার আগে নয়।"

"তোমাকে আমার আর দরকার হবে না কখন? আমার ত মনে হচ্ছে যে সেদিন আসবেই না, সে যতদিন পরেই হোক না কেন। তুমি যদি আমায় ছেড়ে চলে যাও ত আমিও সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে যেখানে ইচ্ছে চলে যাব। চাকরী টাকরী তোলা থাকবে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, পাগলামী করতে হবে না। বড় হলেই দেখবে আমার কথা শুনতে আর ভাল লাগছে না। কত বন্ধু জুটে যাবে। কত নূতন নূতন সখ গজিয়ে উঠবে। বড় বৌ তখন কোন কাজে লাগবে?"

"আমার ত মনে হচ্ছে, আমি বড় হয়ে গেলে তোমারই নূতন নূতন বন্ধু আর সখ এসে পড়বে। তুমিই আর তখন পুরান দিনগুলিকে মনে রাখবে না, নূতনের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বে। আমি যেমন আছি তেমনিই থাকব।"

"বেশ কথা, তুমি বড় হও, তখন দেখা যাবে।"

* * * *

প্রাণ সেবাদাস যখন চব্বিশ বৎসর বয়সে সরকারী প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটির পথে গিয়া দাঁড়াইল, তখন সকলে বলিল যে প্রাণ জাতিতে বাঙালী না হইলেও কার্য্যত সকল দিক দিয়াই এই দেশেরই সন্তান। সে যে পরীক্ষায় এত উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে ইহা একটা অতি বড় আনন্দের কথা। এই পরিবারের উন্নত জীবনধারার কথা আলোচনা করিয়া একটি পত্রিকায় লিখিত হয় যে এই পরিবারের একজন পুত্রবধূ ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ও তিনি এখন বি, এ, পাশ করিয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। চমৎকারিণীর পক্ষে এই খ্যাতি অগ্রাহ্য করিয়া আত্মগোপন করা সহজ হইল না। তাহার নিকট স্ত্রী-শিক্ষা ও সমাজসংস্কার ক্ষেত্রের কোন কোন মহারথী যাতায়াত আরম্ভ করিলেন ও নানা কার্য্যে তাহার সাহায্য প্রাপ্তির জন্ম আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। চমৎকারিণী একপ্রকার বাধ্য হইয়াই দুই এক জায়গায় গমনাগমন করিতে লাগিল, কিন্তু এই সকল কার্য্যে সে ঘনিষ্ঠভাবে লিপ্ত হইতে সক্ষম হইল না। ইহার কারণ ছিল তাহার গৃহকর্ম্ম ও নিজের শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য। দুইদিক সামলাইয়া দেশসেবা করা তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না।

প্রাণের পিতা প্রাণের অপর দুই পত্নীর সম্বন্ধে যে-

প্রকার ব্যবস্থা করিলেন তাহাতে নিজ নিজ জীবনযাত্রা পদ্ধতি স্থির প্রায়ে তাহারা নিজেরা করিয়া লইয়া সুবিধা ও ইচ্ছা অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া রহিল। প্রাণের পিতামাতা বলিতেন তাঁহারা সপরিবারে সমাজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। সংসার একটা শিক্ষা ও সংস্কৃতির আশ্রম হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামাজিক রীতিনীতির মধ্যে যদি মিথ্যা অভিনয়ের অংশ ক্রমে ক্রমে বৃহদাকার রূপ ধারণ করিয়া সত্যকে দৃষ্টির অন্তরালে বিলুপ্ত করিয়া দেয়, তাহা হইলে সত্য আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় এত কঠোর হইয়া দাঁড়ায় যে তাহার সংঘাতে জীবন নিজের সহজ সরল সরস ভাব একেবারে হারাইয়া ফেলে। জীবনের মাধুর্য্য জন্মলাভ করে সত্যের নানা অলঙ্কার হইতে। সেসকল অলঙ্কার প্রকৃতিজাত না হইয়া যদি মিথ্যার সাহায্যে গঠিত হয়, তাহা হইলে কোনও না কোন সময়ে তাহা সত্যের কঠিন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া খসিয়া পড়ে। নিরলঙ্কার সত্য তখন মানবজীবনকে শুধু মিথ্যা পরিহার করিতেই শিক্ষা দেয়। সমাজসংস্কৃতির সেই পর্য্যায় সর্ব্বদাই অতি নির্ম্মমভাবে সকল সৌন্দর্য্যবোধ ও রস-অনুভূতি বর্জ্জন করিয়া বাস্তবের সত্যতা বিচারে ও সকল বিষয়ের সত্যানুসন্ধানে নিবিষ্ট হয়। শুদ্ধ, সত্য নিষ্পাপ ও নির্দ্দোষ সমাজ গঠনের যে দৃষ্টিভঙ্গী তাহা মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধের মাধুর্য্য রক্ষা করিতে প্রায়ই সক্ষম হয় না। পবিত্রতার সীমাহীন বারিধির জল-স্রোতে ভাসমান মানুষের জীবন কাটিয়া যায় কিন্তু লক্ষ্য-স্থলে পৌঁছিয়া শুদ্ধতার পূর্ণ উপলব্ধি আর হয় না।

আবৃত

(গল্প)
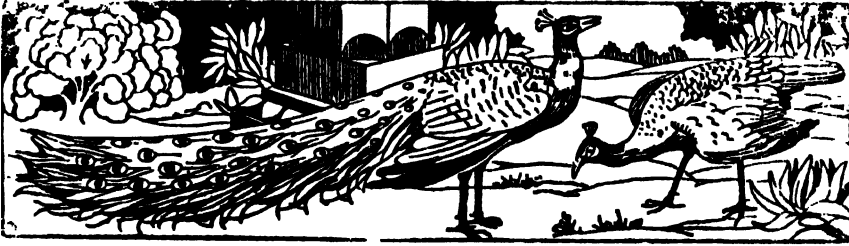
অর্ধেন্দু চক্রবর্তী

ইলেক্ট্রিক ট্রেনের গতি বেড়েছে। ইদানীং গাড়ি লেট হয়না। শেয়ালদা থেকে ট্রিপল-হর্ণ দিয়ে ছাড়লে কল্যাণী লোকালটা বায়ুবেগে এসে দাঁড়ায় দমদম জংশনে। ঠিক দশটা একচল্লিশেই। তাই আমার মতো শহরতলীর স্কুল মাষ্টারেরও গতি বেড়েছে বিজ্ঞানের দয়ায়।

পনেরো মিনিট অতিরিক্ত হাতে নিয়ে বেরোই এখন। ওই মিনিটগুলো 'যদি'র জন্যে। যদি পথে লেট হয়। যদি কল্যাণী লোকালটা আমায় ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে যায় চোখের ওপর। সদাব্যস্ত দমদম জংশন। আপ-ডাউন বনগাঁ-কল্যাণী-রাণাঘাট-লালগোলার গাড়ীর সদম্ভ হাঁকপাঁক। দু'টো ওভারব্রিজ চার-চারটে প্ল্যাটফরম্। সব সময়েই জমজমাট। আজকাল আবার মাইক্রোফোন বসেছে। বিরামহীন ঘোষণা: 'আপ হাবরা তিন নম্বর···ডাউন নৈহাটি দু'নম্বর......

লাইন ধরে সোজা হাঁটি ষ্টেশনে। বানপুর লোকালটা ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে যায়। ইলেক্ট্রিক ট্রেনের ছোঁয়া পায়নি বানপুর এখনো। দাঁড়াতুম আগে দুর্ঘটনা ঘটলে। আর পাঁচজনের মত ভীড় করতুম কৌতূহলী হয়ে। কেউ কাটা পড়লে রুমাল চাপা দিতুম নাকে। চাপা দীর্ঘনিশ্বাসও বেরোত কোন সময়। মনে মনে হিসেব কসতুম ক'টুকরো হ'য়েছে। রক্তপাতের পরিমাণ কি। রক্ত আদৌ পড়েছে কিনা। হাত পা কাটা মানুষটা বাঁচবে কিনা। বাঁচলে কেমন কষ্ট হবে।

আজকাল আর দাঁড়াইনা। কোন হতভাগা কাটা পড়লে বা আত্মঘাতি হয়ে চলতি পথেই বড়জোর সমবেদনাসূচক 'ইস্' শব্দটা মুখ দিয়ে বের করি। হয়তো কোন বাস্তববাদী মন্তব্য করি: 'এই দুর্দ্দিনে লোকটা বাঁচলো'। সত্যিই বাঁচলো কি মরলো, ভারতের একান্ন কোটির একজন কমলো না বাড়লো সে হিসেব আমি করিনা। এর জন্যে আমার কোন দোষ নেই। দার্শনিকরাই তো বলছেন, পৃথিবীতে এমন দিন আসছে যেদিন চোখের ওপর কেউ মরলে মানুষ ফিরে তাকাবেনা। কিন্তু ভীড়ের শহর কলকাতা। আমি না দাঁড়ালেও আর পাঁচজন দাঁড়ায়। সমবেদনা জানায়, মন্তব্য করে।

আজও এক জটলা। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের কাছে। হাতে আমার অতিরিক্ত বাজেটের পনেরো মিনিট। ব্যয় করতে হিসেব কসি। পাশ কাটাতে যাই। থেমে পড়ি। একটু নতুন ধরনের জমায়েৎ। ছোক্রা-ছুক্রি থেকে বৃদ্ধ-বৃদ্ধার ভীড়। মাঝখানে দাঁড়িয়ে এক মধ্যবয়স্কা। হাত ছুড়তে ছুঁড়তে চেঁচিয়ে চলেছে। রেললাইনে কয়লা কুড়োয় যারা, তাদেরই কেউ হয়তো।

'ভদ্দরলোক…ভদ্দরলোক এ্যার। ভদ্দরলোক গায় লেখা থাকেনা'।

দাঁড়ালুম। ছনিয়ার ভদ্রলোকদের প্রতি বক্তার বিষোদ্গারের কারণ জানতে। ট্রেনে-কাটা মৃতদেহ কোথাও চোখে পড়েনা। নাকে রুমাল অনেকের। একপ্রকার থমথমে পরিবেশ।

'ব্যাপার কি'? পাশের একজনকে জিজ্ঞেস করি।

'ব্যাপার আর কি! ওই দেখুননা'।

পাশের ঝোপটার দিকে আঙুল বাড়ালো বক্তা। একটা হিমস্রোত নামলো আমার মাথা থেকে পায়ের বুড়ো আঙুলের ডগা পর্যন্ত। ঝোপটার সুরুতেই সাদা কাপড়ের পুঁটলিটা পড়ে। যাকে কেন্দ্র করে এই জটলা। কয়লা কুড়োনোয়ালির বিষোদ্গার। আমার পনেরো মিনিটের বেশ খানিকটা ব্যয়।

হুঁঃ……যেমনি হয়েছে দেশ তেমনি হয়েছে সমাজ। ইচ্ছে হয় চাবকে ঠিক করে দিই। এক প্রৌঢ়ের মন্তব্য।

একটু অন্যমনস্ক হয়েছিলুম। আবার তাকাই পুঁটলিটার দিকে। বাচ্চাটার সুন্দর ফুটফুটে পা দুটো মাত্র পুঁটলির বাইরে। বাকিটুকু কাপড়ে বাঁধা, শক্ত করে।

'পালতে লারবি ত পিরীত ক্যানে! মন লয় ঝাঁটা মারি মুখে'। মধ্যবয়স্কার কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হয় চারপাশে।

'মইর‍্যা গেছে বাবা'? এক বৃদ্ধার প্রশ্ন।

'না মরে এখনো বেঁচে থাকবে দিদিমা'? পাশের এক ছোকরা বলে, 'মাঘের এই কন্‌কনে শীতে আমরা জোয়ানরাই বাঁচিনা। আর ওতো'—

'বাবা গো। পাষণ্ড…পাষণ্ড। কালে কালে কতই দেখমু'।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বৃদ্ধার প্রস্থান।

আবার আমার চোখ যায় পুঁটলিটার দিকে। নিস্প্রাণ পা-দুটো। অথচ এখনো অবিকৃত, ফুটফুটে। বিধাতার সৃষ্টি মানুষের নিষ্ঠুর পশুশক্তি নিঃশেষে প্রাণটুকু নিংড়ে নিয়েছে। যুগে যুগেই তো সৃষ্ট সৌন্দর্যের ওপর বিধাতারই দেওয়া পাশব-শক্তির এমন অত্যাচার। সুন্দর মরে। অনেক ভেবেছি। আজও আবার ভাবনার তারে টান পড়লো। সুন্দর কেন মরবে? সে কি বাঁচতে পারেনা?

পরিষ্কার আকাশ। মাঘের মিঠে রোদ ঝলমল করছে। ঝোপে একজোড়া টোনাটুনি বসেছে। কি বলাবলি করছে ওরাই জানে। রূপালী রোদে বাচ্চাটার পাদুটো টকটক্ করছে। চুমো খাবার মতই। নিস্প্রাণ হলেও ক্ষতি কি? সুন্দর সব সময়ই সুন্দর। সে নাকি বাঁচতেই মরে।

কোত্থেকে ফেলে গেলো? ভীড়ের মধ্যে একজনের জিজ্ঞাসা।

উত্তর দিলো আগের সেই ছোকরা, 'কোত্থেকে ফেলবে আবার? বেশী দূর থেকে আসতে হয়না দাদা। আশপাশে ফেলবার লোকের অভাব নেই। সামনেই ত গরমেণ্ট কোয়ার্টার, নতুন সব লোক এসেছে। ওখান থেকেই কেউ কেলেছে হয়তো। দোতালা-তেতালায় যদি ভদ্দরলোক হতো'।

অনেকে সায় দিল ছোকরার কথায়। ভালো ক'রে তাকাই ছোকরার দিকে। কালো চোঙা-প্যাণ্ট পরা। ময়লা আধছেঁড়া জ্যাকেট। ছুঁচোলো জুতো। হাতে বিড়ি। হয়তো বস্তিবাসী। দোতালা-তেতলায় থাকতে না পারার দুর্ভাগ্যকেই ক্ষোভের তীর করে ছুঁড়ে মেরেছে।

'পাশেই বেদেপাড়া। ওখান থেকেও ফেলে যেতে পারে'। আরেকজনের মন্তব্য।

ভীড়ের মধ্যে থেকে বেশ ঝাঁঝালো কণ্ঠে প্রতিবাদ একজনের, 'বাজে বকছেন কেন দাদা। বেদেপাড়া অত নোংরা নয়'।

চিনলুম প্রতিবাদী ছোকরাকে। নাম ওর মধুসূদন। সারাদিন ওকে চায়ের দোকানে দেখা যায়। চা-বিড়ি-

পান-সিগরেট চলে অনবরত। শিস দেয় আধুনিকাদের দেখে। রাজনীতির আলোচনাও করে মাঝে মাঝে। বেদেপাড়ার মিথ্যে অপবাদে মধুসূদনই একমাত্র প্রতিবাদী।

'আর বলবেন না মশায়' স্ফীতদেহ এক প্রৌঢ়ের মন্তব্য, 'যেমন হয়েছে আজকালের ছেলেগুলো তেমনি হ'য়েছে মেয়েগুলো। আরে মশায় আমাদের মনীষীরা সব কি একেবারেই মূর্খ ছিলেন? ঠিক এইজন্যেই তারা স্ত্রী স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন। এখন বোঝ। স্ত্রী-স্বাধীনতার নমুনা তো এই'।

সবার সমীহ-দৃষ্টি বক্তার দিকে। হয়তো মনে মনে প্রশংসা করে বক্তার বহুদর্শিতার। ওপাশের ওই মেয়েটিও তাকায় এবার। বয়স কুড়ি বাইশ। এতক্ষণ নীরবে মন্তব্য শুনছিল সবার। মুখ তোলেনি। শুনতে পাচ্ছিল না এমন ভাব। বক্তার মুখে মনের ঝাল মেটানোর তৃপ্তি।

'সরে যান দাদারা। গাড়ি আসছে।'

চমক ভাঙ্গে আমার। সাঁ সাঁ করে কল্যাণী লোকালটা বেরিয়ে গেল। আমার উদ্বৃত্ত বাজেটের পনেরো মিনিট আমায় ফাঁকি দিল। টোনাটুনি চলে গেছে। একটা ক্ষুদে কাঠবিড়ালি মাথা বাড়িয়ে ঝোপের মধ্যে আবার অদৃশ্য হ'ল।

পা বাড়াই ষ্টেশনের দিকে। পরের গাড়ি ধরতে। ষ্টেশনে আসি শ্লথ পদক্ষেপে। পরের গাড়ি কৃষ্ণনগর লোকাল। সাড়ে এগারোটায়। বেশ খানিকটা দেরী। প্ল্যাটফরম বেশ ফাঁকা। জংশনের ব্যস্ততার সাময়িক বিরতি। ক্লান্তির ক্ষণিক অপনোদন। কুলিদের মুহূর্তের ঝিমুনি। মাইক্রোফোনের ঘোষণায় স্বল্পকালীন ছেদ। ফেরিওলার ইতঃস্তত পদক্ষেপ। নির্জনে রেলিং ধরে দাঁড়াই। সিগরেট ধরাই। নিচে সদাব্যস্ত দমদম রোড। অগুনতি মানুষ গাড়ি-রিকশর চলতি মিছিল। এদিকে ষ্টেশন রোড। লাইনের গা ঘেঁষে। কয়েক শো দোকান দু'পাশে। বিকিকিনির প্রাণকেন্দ্র। পরিচিত দৃশ্যের মাঝে শিশুর পা'দুটোকে খুঁজে বেড়াই।

'একটু শুনবেন··?'

ফিরে তাকাই। একটু বিস্ময়ের পালা আমার। সেই মেয়েটি। জটলার মধ্যে প্রৌঢ়ের কড়া মন্তব্যে মুখ তুলেছিল। আমাকে বলছেন?'

'আপনাকেই।' একটু কি যেন ভাবে মেয়েটা। তারপর বলে, 'আচ্ছা, মরা বাচ্চাটাকে দেখে সবাই মন্তব্য করছিল। কিন্তু আপনি তো কোন মন্তব্য করলেন না!'

ভালো করে তাকাই ওর দিকে। পরিচয়ের কোন চিহ্ন নেই। আশ্বস্ত হই। মুখে ওর অস্বাভাবিক দৃঢ়তা!

'অজানা বিষয়ে কিছু বলাটাই কি ঠিক হতো?'

'অজানাকে জানতে ইচ্ছে করেনা?'

শক্ত হাতে রেলিং চেপে ধরে প্রশ্ন করলো মেয়েটি। শরীর ওর কাঁপছে। বাড়িঘরের মাথার ওপর দিয়ে নারকেল গাছের বাঁকে দূরের নীল আকাশের দিকে তাকায়। আমার উত্তরের প্রতীক্ষা করে। আমিও আকাশের গায়ে খুঁজে বেড়াই মরা বাচ্চাটার ইতিহাস।

'করে বৈ কি। কিন্তু······'

'বলে কে তাইনা? আমি···আমি বলবো।'

একটু থামে মেয়েটি। নিজের সংগে ক্ষণিক যুদ্ধ করে। তারপর বলে, 'আপনি অপরিচিত বলেই আমার সুবিধে। আপনাকেই আসল ব্যাপারটা জানিয়ে দিয়ে যাবো।'

একটা অসম্ভব কিছুর প্রত্যাশা করি। সিগারেটটা চোখের সামনে ধরে থাকি। ধীরে ধীরে ধোঁয়া উঠছে সুন্দর রেখা এঁকে। সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ওই অপরিচিতার মধ্যেও ধোঁয়া জমেছে। অনুভব করতে পারছি। ভয়ংকর বেগে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বাইরের সব কিছুকে দুমড়ে মুচড়ে ধ্বংস করতে চাইছে।

রানুদিকে বিয়ে করতে গৌতমদা কিছুতেই রাজি হয়নি। রানুদি গৌতমদাকে বলেছিল, ওর বাপ বলে তোমাকে পরিচয় দিতে হবেনা। ওর কোন

দায়িত্বও তোমাকে নিতে হবেনা। কিন্তু রানুদির প্রায়শ্চিত্ত গৌতমদা শেষে এভাবে····· '

আবার থামলো মেয়েটি। একটু দম নেয়।

'এখন সুইসাইডের হাত থেকে রানুদিকে বাঁচানোই হবে মুশ্‌কিল। জানেন···এই পুরুষ জাতটার সংগে পশুর কোন তফাৎ নেই।'

হঠাৎ কোথায় গোলমাল হয়ে যায় আমার। সিগারেটটা আঙ্গুলে ধরে থাকি। পুড়ে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ক্ষীণ ধোঁয়া উঠছে। আঙ্গুলে ছ্যাঁকা লাগছে। ছাড়তে ভুলে যাই। ধোঁয়ার মাঝে এমটা শ্যামবর্ণ মুখ ভেসে ওঠে। চোখে গভীর বিশ্বাসের চাহনি। অনেক দিন আগের। এখনো আবছা হয়নি। শ্রীপর্ণা নামটা আজও খুব পরিচিত লাগছে। শ্রীপর্ণা ভালোবেসেছিল উৎপলকে। শ্রীপর্ণার সেই টুকরো চিঠিটা আজও বোধহয় আলমারীর কোনে পড়ে আছে। ইচ্ছে করেই ছিঁড়িনি সেদিন। শ্রীপর্ণা লিখেছিল, 'তোমার স্বীকৃতি পেলাম না বলে আমি মরবোনা উৎপল। কারণ মরতে আমার ভীষণ ভয়। আমি বাঁচতে চাই আর পৃথিবীটাকে দেখতে চাই।"

আগুনের ছ্যাঁকায় চমক ভাঙ্গে। ছেড়ে দিই সিগারেটের টুকরোটা। প্ল্যাটফরমে পড়লো ওটা। পা দিয়ে চেপে ধরি। নিবে যায় আগুনটুকু, ঠিক যেভাবে নিবেছিল সেদিন শ্রীপর্ণার প্রত্যাশাটুকু। এই শীতেও কপালে ঘাম বেরিয়েছে। সামনে তাকাই। মেয়েটা নেই। আমার অন্যমনস্কতার সুযোগে কখন গা ঢাকা দিয়েছে। নতুন ওভারব্রিজের নিচে এসে দাঁড়াই তাড়াতাড়ি। ডাউনে কোন ট্রেন এসেছে। ওভারব্রিজে পিঁপড়ের জাঙ্গালের মতো যাত্রী। ওই ভীড়েই হয়তো মেয়েটা নিজেকে আবৃত করেছে। ফ্যাল্‌ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকি ব্রিজ দিয়ে নেমে-আসা যাত্রীদের দিকে।

কৃষ্ণনগর লোকাল তখন ষ্টেশনে ঢুকছে।

উপন্যাস

যত আঁধার তত আলো

শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১০

হরেন চাটুর্য্যের ছেলে হ'য়েছে। ছগন পালিয়েছে। ছগনের বৌ আত্মহত্যা করেছে। হরেন মাষ্টারের বৌ হাসপাতালে একটি ছেলে প্রসব ক'রেছে।

জগন্নাথ হেসে বলেন মনোদিদির নতুন চাকরী জুটলো একটা। কিন্তু বুড়োকে যেন একেবারে ভুলে থাকিসনে ভাই।

মনোরমা হাসিমুখে জবাব দিল, তোমাকে যদিবা ভুলতে পারি কিন্তু নিজেকে ভুলবো কেমন ক'রে দাদু। আমার নিজের জন্তেও তোমাকে মনে রাখতে হবে।

জগন্নাথ খুবখানিক হেসে নিয়ে বললেন, মুখের মত জবাব দিয়েছিস। কিন্তু কথাটা কি এমনি মনে এসেছে ভাই।

মনোরমা প্রশ্নভরা দৃষ্টিতে তাকাল।

জগন্নাথ বললেন, আমার তামুক দিতেও আজ ভুলে গেছো দিদি।

মনোরমা গম্ভীরভাবে জবাব দিল, দাদু ভাই তোমার চশমা বদলাও।

জগন্নাথ নিঃশব্দে গড়গড়ার নলটা তুলে নিয়ে পরম তৃপ্তির সঙ্গে টানতে সুরু ক'রলেন।

মনোরমা বলল, তামুক পেয়ে আমার নতুন কাজের হদিস দিতে ভুলে যেও না কিন্তু।

মুখ থেকে নলটা নামিয়ে জগন্নাথ জবাব দিলেন, ঐ দেখো এতক্ষণ ধরে শুধু নিজের কথাই বলেছি অথচ আসল কথাটাই বলা হয়নি। আমাদের হরেন মাষ্টারের ছেলে হ'য়েছে যে—

তাঁকে বাধা দিয়ে মনোরমা বলল, তার সঙ্গে আমার চাকরী প্রাপ্তির সম্বন্ধ কি দাদু?

জগন্নাথ ইতিমধ্যে নলটি মুখে তুলেছিলেন। গোটা দুই লম্বা টান দিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে তুড়ি দিয়ে ব'ললেন চাটুয্যের বৌ দিনকয়েক হাসপাতালে থাকবে যে ভাই। তাই ব'লছিলাম।

হেসে মনোরমা বলল, কিছুই এখনও বলোনি দাদু।

জগন্নাথ বললেন, নৌকা ওদের বালিতে আটকেছে। বৌটা যদ্দিন হাসপাতালে আছে সে কদিন না হয় হোটেলে খেয়ে কাটাবে কিন্তু ফিরে এলে তখন?

মনোরমা গম্ভীর হয়ে ব'লল, চাকরী আর ক'রবো না ঠিক ক'রেছি দাদু। ওটা বরং আর কোন দীন দরিদ্রকে দিয়ে দিতে বলো। এই বাজারবাড়ীতে কি আর কোন লোক নেই? না যত দায় আর দায়িত্ব একলা তোমার!

সহসা মাত্রাধিক গম্ভীরকণ্ঠে জগন্নাথ ব'ললেন, থাকবে না কেন মোনোদিদি কিন্তু প্রায় সকলেরই গোত্র পরিবর্ত্তন হ'য়ে গেছে। কারুর কথা কেউ ভাবতে চায় না।

মনোরমা রাগ করে জবাব দিল, গোত্র পরিবর্ত্তন হলেও মানুষ মানুষই থাকে দাদু।

জগন্নাথ বললেন, থাকাই উচিত দিদি কিন্তু ঐ যে তোমাকে বল'লাম আমাদের দেখা, আমাদের বোঝার সঙ্গে আজকাল আর খাপ খায় না। পাশাপাশি বাস ক'রেও একজনার খবর আর একজনা রাখতে চায় না। একঘরে যমে মানুষে টানাটানি আর এক ঘরে নাচ-গানের মজলিস এতো আকছার দেখতে পাচ্ছি ভাই।

এত কথার পরেও মনোরমা উষ্ণকণ্ঠে জবাব দিল, তাই বলে এ বাড়ীর তামাম বোঝা তোমার একলার কাঁধে তুলে নিতে হবে? নিজের বইবার শক্তির কথাটাও একবার ভাববে না।

জগন্নাথ পুনরায় গড়গড়াটি তুলে নিয়ে মৃদুহাস্তে বললেন, মনোদিদির মেজাজটা আজ ভাল নেই বলেই, এতবড় অভিযোগ দিতে পারলেন। আজ না হয় একটা নতুন চাকরীর সন্ধান দিয়ে আমি অন্যায় করেছি, কিন্তু আচার্য্য গিন্নীর অসুখের সময়, সরকারগিন্নীর মা আর হরিহরের ছেলেটা মারা যেতে কে সবার আগে সেখানে ছুটে গিয়েছিল? রবি সাহার মেয়ের টাইফয়েড হ'তে কে আমার সংসারকে ভাসিয়ে দিয়ে সেখানে গিয়ে চাকরী জুটিয়ে নিয়েছিল মনোদিদি?

জগন্নাথের কথা বলার ধরনে মনোরমা হেসে ফেলল। বলল, সেও তোমার জন্ম দাদু। তুমি দুঃখ পাবে জেনেই এত বড় বোঝা আমাকে বইতে হ'য়েছিল।

জগন্নাথের কণ্ঠস্বর সহসা বদলে গেল। তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, মানুষের বোঝা মনুষই ব'য়ে থাকে দিদি।

মনোরমা গম্ভীর হ'য়ে বলল, বইয়ে পড়েছি। এক সময় হয়তো বইতো কিন্তু আজকাল আর চোখে পড়ে না।

জগন্নাথ স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে বললেন, নিজেকে এমন ক'রে ঠকাসনে দিদি।

মনোরমা তেমনি গম্ভীরভাবে বলল, মনোরমা নিজেকে ঠকালেও তোমাকে কোনদিন ঠকায় নি দাদু।

জগন্নাথ মাথা নেড়ে বললেন, ঠকা-জেতার কথা কোনদিন মনে হয়নি ভাই। মন কাঁদে তাই চুপ করে থাকতে পারি না।

একটু হেসে মনোরমা বলে, দাদু তুমি ধরা পড়ে গেছো।

জগন্নাথ কথাটা স্বীকার ক'রে নিলেন।

মনোরমা হেসে বলল, তাহলে আর ঝগড়া নেই। কিন্তু একটা কথা আমি বুঝি না দাদু যে, আমাদের আশে-পাশে যারা ঘুরে বেড়ায় তাদের কি চামড়ার চোখ নয়? খোঁচা দিয়ে দেখিয়ে দিলেও কি কিছু চোখে পড়ে না!

জগন্নাথ বলেন, পড়ে দিদি কিন্তু চতুর্দ্দিকের সহস্র রকমের অভাব আর অনটন স্বাভাবিক বৃত্তিকে পঙ্গু করে ফেলেছে। নিজেকে বাঁচাতে গিয়ে এত বেশী বিব্রত থাকতে হয় যে—

থাম দাদু—মনোরমা রাগ ক'রে ব'লল, অভাব কখনও স্বভাবকে পালটাতে পারে না। আসলে মানুষ আজ যান্ত্রিক হ'য়ে উঠেছে। মায়া মমতা সহানুভূতি এগুলো মুছে যাচ্ছে মন থেকে।

জগন্নাথ গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, পুরোপুরি না হ'লেও তোমার কথা আংশিক সত্য ব'লে স্বীকার করি। যদিও আমার ম'নের সায় পাই না দিদি। মন আমার সবসময় আশার বাণী শোনায়।

মনোরমা বলল, যুক্তি তর্ক থাক দাদু কিন্তু যদি জিজ্ঞেস করি তোমার মত কজনা লোক আজকের দিনে চোখে পড়ে? এক কথায় বলা চলে প'ড়েনা। কিন্তু আমাদের হরেন চাটুর্য্যে, ক্ষিতিশ বিশ্বাস, হরিহর কিংবা ছগনলাল হাজার হাজার তুমি তোমার আশে-পাশে দেখতে পাবে। অথচ মজার কথা যে এরাও এঁদের কাজের সপক্ষে যেসব যুক্তি দেখায় তুমি তাকে অস্বীকার ক'রতে পারবে না।

জগন্নাথ মাথা নেড়ে বলেন, স্বীকার করতে দ্বিধা করছি ভাই। তুমি বলো দেখি মনোরমা কোন্ যুক্তিতে ক্ষিতিশ তার দাদার অতবড় দুঃসময় তার ওখান থেকে চলে এসেছিল···কোন যুক্তিতে হরেন তার সামান্ত আয়ের

উপর নির্ভর ক'রে একটা পোয়াতী ছেলেমানুষ বৌকে নিয়ে এই বাজার বাড়ীতে চলে এলো……

মনোরমা বলল, সহজ যুক্তিতে দাদু ভাই। ক্ষিতিশ বিয়ে থা করেনি। অকারণে তার দাদার অভাব অনটনের অংশীদার হতে ভয় পেয়েছে আর হরেন চাটুর্য্যে সহ্য ক'রতে পারেননি তাঁর দাদার স্বচ্ছলতাকে।

জগন্নাথ ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, একজন পালিয়ে এসেছে আত্মস্বার্থের জন্য আর একজন নিছক ঈর্ষার জ্বালায়। একে তুমি যুক্তি বলতে চাও মনোদিদি?

মনোরমা সহসা খিল খিল ক'রে হেসে উঠল।

জগন্নাথ একটু নড়ে চড়ে বসে হাতের নলটি একপাশে রেখে মুখ তুলে ব'ললেন, এটা আবার তোমার কোনরূপ মনোরমা দেবী?

মনোরমা হাসিমুখে জবাব দিল, জগন্নাথ চৌধুরীর নাতনী মনোরমার এইটিই আসল রূপ। কিন্তু ব'লছিলাম কি এইসব সুযুক্তি আর কুযুক্তির কাসুন্দি ঘেঁটে আমাদের যখন কোন লাভ নেই তখন পরের ব্যাপারে মাথা ঘামান এবার ছাড় দাদু।

জগন্নাথ মৃদুকণ্ঠে বলেন, তুই আজ এমন ক্ষেপে গেছিস কেন ভাই?

মনোরমা গম্ভীর হ'য়ে ব'লল, তোমার উল্টোপাল্টা কথা আমাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে।

জগন্নাথ ছেলেমানুষের মত বললেন, কিন্তু দিদি দোষে-গুণেই মানুষ। হরেন চাটুর্য্যে, ক্ষিতিশ বিশ্বাস, ছগন কিংবা হরিহর সে যুগেও ছিল দিদি।

মনোরমা শান্তকণ্ঠে বলল, মানুষকে তুমি ভালোবাসো তাই তাদের দোষ-ত্রুটি দেখাতে গিয়েও আর একটা মহৎ সম্ভাবনার চিন্তা মনে উঁকি দেয়। তাই একই সঙ্গে সপক্ষেও বলো বিপক্ষেও বলো।

জগন্নাথ বলেন, হঠাৎ একথা কেন দিদি ভাই?

মনোরমা ব'লল, হঠাৎ নয় দাদু—তোমার কথায় বার্তায় আর ব্যবহারে একথা ধরা পড়ে যায়। কিন্তু আমি হলাম এ যুগের মানুষ তাই হয়তো তোমার মত করে ভাবতে পারি না। রাগও হয় দুঃখও পাই। রমাপতিবাবুর ছেলেটা পরীক্ষা দিতে পারবে না ফি-এর টাকার অভাবে। খবর পেয়ে তুমি এগিয়ে গেলে। টাকা দিয়ে তাদের উপকার ক'রলে কিন্তু তোমার রমাপতি বাবুই বলে বেড়ালেন জগন্নাথ চৌধুরীকে মোচড় দিয়ে খুব বোকা বানিয়েছেন।

জগন্নাথ হেসে উঠলেন। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন, এই জন্যে তোর এতো রাগ? কিন্তু রমাপতির মত বুদ্ধিমানরা সবসময়ই একথা ব'লবে তাই ত'তে জগন্নাথের মত নির্বোধগুলো কোনদিন ঠকে না দিদি।

মনোরমার চোখ দুটো ছল ছল ক'রে উঠল। সে গম্ভীরকণ্ঠে বলল. একথা তুমি ঠিক বলেছো দাদু। ওরা যে ঠকেছে তা যদি বুঝবেই তাহলে আজও ওদের অস্তিত্ব থাকতো না……

মনোরমা অন্যমনস্কভাবে ঘর ছেড়ে চলে গেল।

১১

জগন্নাথের সঙ্গে যুক্তি আর তর্কের যত লড়াই করুক না কেন…শেষ পর্য্যন্ত মনোরমা হরেন চাটুর্য্যের সংসারের দায়িত্ব স্বেচ্ছায় নিজের মাথায় তুলে নিল।

জগন্নাথ অলক্ষ্যে মুখ টিপে একটুখানি হেসে নিয়ে গম্ভীরকণ্ঠে মনোরমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে ব'লতে থাকেন, আমার মত বোকা দেখছি দুনিয়ায় আরও আছে। মনোরমা চলে যেতে গিয়েও ফিরে দাঁড়িয়ে মুখিয়ে উঠল, কথাটা তোমার মনে করিয়ে না দিলেও চলতো দাদু।

জগন্নাথ নিরিহ কণ্ঠে জবাব দিলেন, নিজেকেই শোনাচ্ছিলাম মনোদিদি। সংসারে আমিই একলা বোকা নই দেখে আশ্বস্ত হলাম।

মনোরমা হেসে ফেলে বলল, শুধু আশ্বস্ত হ'য়েছো আর খুশী হওনি?

জগন্নাথ বলেন, আমারও ঐ একই প্রশ্ন দিদি।

মনোরমা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে বলল, তোমার হরেন চাটুর্য্যেকে নিন্দে করতে হয় দাদু। কোন আক্কেলে বৌটাকে

তিনটে দিন যেতে না যেতেই হাসপাতাল থেকে নিয়ে এলেন। বৌটির কি এখন নড়া চড়া ক'রবার অবস্থা? তার উপর কে দেখে ঐ একরত্তি ছেলেটাকে—

জগন্নাথ দুঃখ ক'রে বললেন, তার জন্যে একা হরেন মাস্টার দায়ি নয় দিদি। হাসপাতালেও নাকি বেড নেই। কিন্তু প্রসুতির "কিউ" লেগেই আছে। তারাও প্রসব করিয়ে দায়িত্ব শেষ ক'রতে চান। অপরাধ যে কার আর সমাধানের পথ যে কোনটা এইটেই এক মস্ত সমস্যা। বিশেষ করে গরীব আর মধ্যবিত্তের দুরবস্থা আজ চরমে উঠেছে তারা ঘরে বাইরে সর্ব্বত্র আশ্রয়-চ্যুত।

মনোরমা বলল, এ অবস্থার জন্য দায়ি তুমি কাকে ক'রতে চাও দাদু? যারা শুধু কথা বলে—কাজ করতে চায় না তারা নিজেরা নয়কি? যাদের দোষ ত্রুটির কথা নিয়ে আমরা আলোচনা করি তারাও আমাদেরই একজন। আমরা নিজেরাই আজ নিজেদের কাছে বিশ্বাস ভাঙছি তাই এতবড় নৈতিক অধঃপতন সমাজ-জীবনে দেখা দিয়েছে।

জগন্নাথ আপন মনে বলে উঠলেন, কতবড় অধঃপত হলে তবে মানুষ মানুষের জীবন নিয়ে জুয়া খেলতে পারে ভাই। তুই ঠিক বলেছিস দিদি, এ লজ্জা তোর এ লজ্জা আমার। কিন্তু এসব কথা এখন থাক্ ভাই। এ চিন্তাও মনকে ছোট করে ফেলে।

মনোরমা বলল, থাক বললেই কি চিন্তার হাত থেকে রেহাই পাবে দাদু?

জগন্নাথ হতাসকণ্ঠে বল্লেন, সেই খানেইতো বড়ন বিপদ লুকিয়ে আছে। শেষ পর্য্যন্ত সংখ্যাধিক্যের চাপে সংখ্যাল্প একেবারে না মুছে যায়।

একটু থেমে তিনি পুনরায় বল্লেন, রোজই একবার করে মনে হয় যেদিনটা গেল সেইটেই বুঝি ভাল গেল। আর হয়তো—.

তাঁকে থামিয়ে দিয়ে মনোরমা বলল. তোমার এতো দুর্ভাবনা কার জন্ত দাদু? জগন্নাথ রাগ করলেন। দুঃখিতভাবে বললেন, আমার নিজের জন্ত নয় মনোদিদি। আমার দিন যে ফুরিয়ে এসেছে সেতো প্রতিদিনই টের পাচ্ছি। কথাটা তা নয়। চলতে ফিরতে দিনরাত হুছোট খাচ্ছি বলেই—

মনোরমা তাঁকে কথাটা শেষ ক'রতে না দিয়ে পুনরায় বলল, যুগ পালটাচ্ছে আর মানুষ বদলাবে না এ তুমি আশা করো কোন যুক্তিতে দাদু। তুমি আমি এগিয়ে মাথা ঘামালে কোন লাভই হবে না। মাথা খুঁড়ে মরলেও হবে না। তোমার হাসপাতালের একশ্রেণীর ডাক্তারেরও হবে না কিংবা তথাকথিত সেবিকাদের মনেও সেবাধর্ম্মের মূল কথাটি প্রবেশ ক'রবে না।

একটু থেমে মনোরমা পুনরায় বলল, আওয়াজ তুলে আর ভয় দেখিয়ে তো কাজ করান যায় না দাদুভাই যদি না কাজের হৃদয়ের যোগ থাকে।

জগন্নাথ মৃদু কণ্ঠে বললেন, প্রতিবাদ প্রতিকার নয় একথা ঠিক দিদি, তবুও এর প্রয়োজন আছে নইলে প্রতি-বিধানের সবগুলি রাস্তাই একদিন বন্ধ হ'য়ে যাবে। অবশ্য একথা ঠিক যে তুমি আমি এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে শুধু নিজেদেরই দুঃখ বাড়াচ্ছি।

মনোরমার মুখে অর্থপূর্ন হাসি, সে বলল, তবুও দেখ এই বাজে কাজ আর বাজে চিন্তাগুলোকে আমরা ত্যাগ করতে পারছিনে।

জগন্নাথ শান্ত হেসে বললেন, হয়তো বাজে নয় বলেই ত্যাগ ক'রতে পারছিনা। মনোরমা মাথা নেড়ে জবাব দিল, একশোবার বাজে দাদু। মনোরমার সঙ্গে তর্ক করে কার কতখানি উপকার তুমি ক'রতে পারবে—

স্নিগ্ধ কণ্ঠে জগন্নাথ বললেন, তাতো জানি না ভাই। কোন দিন হিসেব করে দেখিনি। কিন্তু একটা কথা আমি বিশ্বাস করি যে পৃথিবীতে কোনকিছুই একবারে ব্যর্থ হয় না। আমার চিন্তা ভাবনাও নয় মনোদিদির সেবা-ধর্ম্মও না।

তুমি বড্ড বাজে বকো দাদু—মনোরমা বলল, আমাদের ত' ভারী প্রয়োজন। জগন্নাথ বললেন, প্রয়োজন কথাটাই বড় গোলমেলে দিদিভাই। ঐ একটা কথার

মধ্যে দুনিয়ার ভাল মন্দ, চাওয়া পাওয়া, দেওয়া নেওয়া সব কিছুই নির্ভর করে।

মনোরমা লঘু কণ্ঠে বলল, যেমন প্রয়োজনই জগন্নাথ চৌধুরীকে এই বাজারবাড়ীর একপ্রান্তে পড়ে থাকতে বাধ্য করেছে—মনোরমা যখন তখন এর ওর তার সংসারের ভার বয়ে বেড়াচ্ছে, মলয় দিন রাত দরজা বন্ধ করে সাহিত্য-সাধনা ক'রে চলেছে এ সবই যার যার নিজের প্রয়োজনে।

জগন্নাথ জবাব দিলেন, হক কথা বলেছিস মনোদিদি। প্রয়োজনই মানুষকে দিয়ে কাজ করায় ভাই। মানুষ ভেদে তার রূপ আলাদা হয় এইটুকুই যা তফাৎ। আচ্ছা ভাই ঐ হরেন মাষ্টারের অশক্ত বৌটাকে আর দুধের শিশুটাকে অভুক্ত রেখে তুই কি নিশ্চিন্তে—

তুমি থাম দাদু। মনোরমা ঝাঁঝিয়ে উঠল, বেশ নিশ্চিন্তে দাদু আর নাতনি তাদের প্রয়োজন মেটাতে পারতো। কিন্তু যত গোলমাল সবসময় তুমিই পাকিয়ে তোলো।

জগন্নাথ বলেন, ওরে দিদি ওগুলো যে তোর আমার প্রয়োজনের প্রধান অঙ্গ ভাই। মনোরমা জবাব দিল, ছাই অঙ্গ—পাড়াগাঁয়ের বুড়ি ঠানদিদের মত ঘরে ঘরে তুমি মাথা গলাবে আর ঝুড়ি ঝুড়ি দুঃখের সংবাদ বয়ে নিয়ে আসবে। তার পরেই এটা করো সেটা করো। করেছো তো অনেক দাদু, কিন্তু তাতে লাভ করেছো কতটুকু। এতো দিনের এতো চেষ্টায় একটা লোককেও তোমার পাশে এসে দাঁড়াতে দেখেছো? সকলেই এমন একটা ভাব দেখায় যেন দায় আমাদেরই। এতে বুঝি মন খুব ভরে ওঠে?

জগন্নাথ কিছু বলবার জন্য মুখ তুলেছিলেন। মনোরমা মুখ ক'রে উঠলো, না দাদু তোমার ওসব মানবতার দোহাই অনেক শুনেছি ওতে আমার অন্তত মন ভরে না। আমি সামান্য মানুষ। নিন্দে সুখ্যাতি দুটোরই আমি সমান মূল্য দিই। দান কথাটার সঙ্গে সঙ্গেই প্রতিদানের কথাটাই আমার সবার আগে মনে আসে। তুমি কি কোনদিন বুঝবে না যে সকলেই তোমার দুর্ব্বলতার সুযোগ নিতে চায়...সকলেই বোকা ঠকাচ্ছে···

হরেন মাষ্টারের আহ্বানে সহসা তাকে থামতে হল। এবং পরক্ষণেই নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলল; কথায় কথায় একদম ভুলে গিয়েছিলাম দাদু, ছি ছি বাচ্চাটার যে খাওয়ার সময় হ'য়ে গেছে আমার মনেই ছিল না।

জগন্নাথের চোখে মুখে এক ঝলক হাসি দেখা দিল। সে হাসির এক ফালি মনোরমার ঠোঁটেও খেলে গেল। মনোরমা দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মনোরমা চলে যেতেই হঠাৎ তিনি কেমন যেন আনমনা হ'য়ে পড়লেন। একটি গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস তাঁর বুক ভেদ করে বার হ'য়ে এল। মাঝে মাঝে তিনি নিজেরই উপর বিদ্রোহী হ'য়ে ওঠেন। হৃদয় বলে এ অন্যায়। এই মেয়েটিকে নিয়ে তিনি যে খেলায় মেতে আছেন তার পিছনে যুক্তি থাকলেও তা হৃদয়হীন যুক্তি। অথচ তিনি থামতে পারছেন না। কোথা থেকে একটা মর্ম্মান্তিক ভয় এসে তার কণ্ঠ রোধ করে ধরে। মনোরমা যখন ঘুমিয়ে থাকে জগন্নাথ তখন কাতর দৃষ্টিতে ওর মুখের পানে চেয়ে থাকেন। নিজেকে তিনি সহস্ররকমে প্রশ্ন করেন। নিজের কাজের কৈফিয়ৎ চান নিজেরই কাছে, মনোরমার প্রতি অপরিসীম স্নেহ জগন্নাথকে এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে টেনে আনে। মনোরমার অস্তিত্বকে সকল প্রশ্নের উর্দ্ধে সরিয়ে রাখতে গিয়ে নিজের মনের একটা দিককে পাথরের দেয়ালের আড়ালে সরিয়ে রেখেছেন। তাই মনের যে দিকটা কৈফিয়ৎ চায় তাকে তিনি চোখ রাঙিয়ে থামিয়ে দিতে তৎপর হন। মনোরমার জন্যই এর প্রয়োজন। ভগবান জানেন এই একান্তপ্রয়োজনীয় কাজটি করতে গিয়ে জগন্নাথ নিজের অন্তরাত্মাকে কি ভাবে ক্ষত-বিক্ষত ক'রে চলেছেন। কিন্তু এ খবর কেউ রাখে না। জগন্নাথ কাউকে জানতে দিতেও চান না। যে সত্য আজ বিশ বছরের উপর একটা প্রকাণ্ড বোঝা হ'য়ে তার বুকের উপর চেপে আছে তা যদি একটি বারের জন্যও প্রকাশ ক'রতে পারতেন তাহলে হয়ত অনুক্ষণ মনে প্রাণে এমন

করে ছটফট্ ক'রতে হত না। অন্তত একটি মুহূর্তের জন্যও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারতেন—কিছুটা হাল্কা হত এই দুর্বিসহ বোঝা। কিন্তু তাঁর দৃষ্টি দিয়ে ত' কেউ দেখবে না।—তার মন নিয়ে কেউ অনুভবও ক'রবে না। অথচ ফুলের মত নরম আর সুন্দর একটি জীবন একটু-খানি দরদ আর একটুখানি স্নেহের অভাবে হয়ত চির-দিনের জন্য অতলে তলিয়ে যাবে।

জগন্নাথ মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেননি! প্রকৃতির স্বভাবধর্মকে তিনি সমাজ-শৃঙ্খলার উর্দ্ধে স্থান দিয়ে ব'সলেন। সেইজন্যই তাঁর ভাগ্য তাকে এই বাজার-বাড়ীর দুখানি ঘরের মধ্যে টেনে নিয়ে এল। এখানে কেউ তাকে কোনদিন প্রশ্ন করেনি। ক'রবার অবকাশ পায়নি কেউ।

বহুদিন ধরে জগন্নাথের অন্তরাত্মা গুমরে গুমরে কেঁদেছে এই বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে এসে। তারপর ধীরে ধীরে সবই সয়ে গেছে। আজ আর কোন খেদ নেই। বরং এর চেয়ে ভাল কিছু ভাবতেও তিনি ভয় পান।

মনোরমা তাঁর মনের সর্ব্বত্র ছেয়ে আছে আজ। ওকে বাদ দিয়ে জগন্নাথের জীবনটা আজ শূন্য হ'য়ে যাবে—নিরর্থক হ'য়ে যাবে। কিন্তু মনোরমার আগামী দিনের পথ কোনটা এই চিন্তাই আজ কয়েকদিন ধরে তাকে অনুক্ষণ পীড়া দিচ্ছে। কোন একটি সহজ সুন্দর পথই তাঁর চোখে পড়ছে না।

নিঃশব্দ চিন্তায় বহুক্ষণ কেটে গেছে। বাধা পড়ল। দ্রুত পদে ফিরে এসেছে মনোরমা। ও হাঁপাচ্ছিল।

জগন্নাথ ওর মুখের পানে খানিক স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে একটু অবাক হ'য়ে জিজ্ঞেস ক'রলেন, অমন করে হাঁপাচ্ছ কেন দিদি ভাই। মনে হ'চ্ছে ছুটে এসেছো!?

জগন্নাথের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েই মনোরমা পাশের ঘরে চলে গেল। তার দ্রুতপদে চলে আসা থেকে নিঃশব্দে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ধরনটি জগন্নাথকে একই সঙ্গে বিস্মিত ও চিন্তিত করে তুলল।

তাই খানিক বাদে মনোরমা তামাক নিয়ে পুনরায় দেখা দিতেই জগন্নাথ ব'ললেন, তামুকটা দুদণ্ড পরে দিলেও চলতো মনোদিদি।

মনোরমা যথাসম্ভব স্বাভাবিক কণ্ঠেই বলল, দুদণ্ড আগে দিয়ে যদি অন্যায় ক'রে থাকি তাহ'লে না হয় ফিরিয়েই নিয়ে যাচ্ছি।

জগন্নাথ অনুসন্ধানি দৃষ্টিতে খানিক তার মুখের পানে চেয়ে থেকে পুনরায় প্রশ্ন ক'রলেন, আমাকে কিছু লুকোবার চেষ্টা করিসনে দিদি। তোর কি হ'য়েছে আমায় বল ভাই।

মনোরমা উষ্ণ কণ্ঠে বলল, কিছু হ'লেও তুমি কি কোন প্রতিকার ক'রতে পারবে দাদু? বড়জোর একটা প্রতিবাদ করে কর্ত্তব্য শেষ ক'রে দেবে।

জগন্নাথ আহত কণ্ঠে জবাব দিলেন, তুই কি তোর দাদুকে অপমান ক'রতে চাস দিদি?

মনোরমার দুচোখ সহসা অশ্রুভারে টল টল ক'রে উঠল। কোন প্রকার জবাব তার মুখে যোগাল না।

জগন্নাথ সহসা সোজা হ'য়ে উঠে পরুষকণ্ঠে বললেন, মনে হ'চ্ছে আমার দিদিকে কেউ অন্যায়ভাবে অপমান ক'রেছে···তোর দাদু বুড়ো হ'লেও আজও বেঁচে আছে মনোরমা—

উত্তেজনায় তিনি ঠক ঠক ক'রে কাঁপছিলেন।

খানিক চুপ করে থেকে একসময় মনোরমা ব'লল, তোমার হরেন মাষ্টার দাদু। রোগা বৌটা অচেতন হ'য়ে ঘুমোচ্ছে। ছেলেটাকে খাইয়ে দাইয়ে রান্নাঘরে বসে খানিক সাগু জাল দিচ্ছিলাম বৌটির জন্যে—হরেন মাষ্টারের অসম্মানজনক ব্যবহারের জবাব আমি দিতে পারতাম দাদু কিন্তু···

কিন্তু···জগন্নাথ গর্জ্জন করে উঠলেন, কোন প্রতিবাদ না করে তুমি ছুটে পালিয়ে এলে মনোরমা! কিন্তু আমি ওকে ক্ষমা ক'রবো না। এর প্রতিকার ক'রতে হ'বে আমাকে। জগন্নাথ উঠে দাঁড়িয়ে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে যেতেই মনোরমা তাকে বাধা দিল, বলল, এখন থাক দাদু। প্রতিকার আমিই ক'রবো। ঘরে একটা রোগা বৌ—তাছাড়া যেকথা আমাকে বলেছে তাতো

আর ফিরবে না। মিথ্যে এই সময় রোগা বৌটির শান্তি নষ্ট করো না দাছভাই।

জগন্নাথ সবিস্ময়ে বলল, তুই সত্যি ব'লছিস দিদি? এই কথা ভেবেই কি এতবড় অসম্মান মুখ বুজে সয়ে এসেছিস ভাই। কিন্তু তোর চোখের ঐ জল…

মনোরমা একটু হাসবার চেষ্টা করে বলল, বেশ বললে দাছ। অপমানের বুঝি জ্বালা নেই? কিন্তু বৌটি তো কোন অন্যায় করেনি।

জগন্নাথ অভিভূতের ন্যায় মনোরমার মুখের পানে চেয়ে আছেন। মুখে তার উপযুক্ত কথা যোগাচ্ছে না। তাঁর সেই নির্ব্বাক মুখের পানে দৃষ্টি পড়তেই ম্লান হেসে মনোরমা বলল, রাগের মাথায় চলে এসেও একবার আমার মনে হয়েছে একের অপরাধে বোধ হয় আর এক জনকে শাস্তি দেওয়া হ'লো। কিন্তু…কিন্তু তোমার আবার কি হ'লো দাছ! তোমার চোখ ছল ছল ক'রছে কেন? আমি কোন অন্যায় কথা ব'লেছি কি?

জগন্নাথের সজল চোখছটিতে এক অপূর্ব্ব স্বর্গীয় হাসি ফুটে উঠলো। তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে মনোরমাকে একান্তে টেনে নিয়ে বার বার মাথা নেড়ে বলতে লাগলেন, না ভাই অন্যায় কথা কেন বলতে যাবি ভাই। আমি ভাবছিলাম বিধাতাপুরুষের কথা—যিনি মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করেন—আর এই নিয়ন্ত্রণের নাম ক'রে কত হৃদয়হীন কাজ করে থাকেন। জানিস দিদিভাই সময় সময় বুকটা আমার কেটে যেতে চায়।

জগন্নাথ উত্তেজনায় কাঁপছিলেন।

মনোরমা স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলল, এসব তুমি কি ব'লছো দাছ?

জগন্নাথের কণ্ঠে হতাশার সুর। তিনি উদাস কণ্ঠে জবাব দিলেন, ব'লতে আর পারছি কোথায়। তাহ'লে…জগন্নাথ সহসা চমকে উঠলেন। চলতে চলতে হঠাৎ যেন কোন কঠিন পাথরে হোঁচোট খেয়ে বেদনায় বিবর্ণ হ'য়ে গেছেন।

মনোরমা খানিক তাঁর বেদনাকাতর মুখের পানে চেয়ে থেকে অনুযোগ দেবার ভঙ্গিতে বলল, যেকথা প্রকাশ করতে না পারায় মধ্যে এত ব্যথা তা গোপন করে রাখবার এমন সযত্ন প্রয়াস সত্যিই আমার কাছে বড় অদ্ভুত লাগে দাছ।

জগন্নাথ ইতিমধ্যেই নিজেকে সামলে নিয়েছেন কিন্তু কণ্ঠস্বরে আর্দ্রতা ছিল। তিনি মৃদু কণ্ঠে বললেন, সংসার বড় আজব যায়গা দিদি তার চেয়েও আজব বস্তু মানুষের মন।

মনোরমা ক্ষুব্ধকণ্ঠে বলল, সেতো দেখতেই পাচ্ছি, আর আমার অভিযোগও সেইখানেই দাছ।

জগন্নাথ ক্লান্ত হেসে বললেন, তোর এই অভিযোগ হয়তো অকারণ নয়। তবুও বলি ভাই তোর দাছর এই বিশেষ ধরণের আচরণের বিচার করতে বসে যেন অবিচার করিসনে তাহলে দুঃখ রাখবার আর ঠাঁই থাকবে না দিদি।

মনোরমা মিষ্টি করে একটু হেসে বলল, মনোরমা হয়তো ভুল করতে পারে কিন্তু এতবড় ভুল সে করবে না দাছ। সে তার দাছকে কিছুটা জানে বলেই বিশ্বাস রাখে কিন্তু কথাটা তা নয়। আমার অভিযোগ তোমার দুঃখের ভাগ দাও না বলে। হয়তো…থাকগে ওসব কথা। বারে বারে একই প্রশ্ন তুলে তোমার দুঃখকে জাগিয়ে তুলে আর কি হবে।

জগন্নাথ অন্যমনস্কভাবে বললেন, সেই ভাল দিদি ভাই। যেকথা কোনদিন কাউকে বলতে পারিনি—কোনদিন বলতে পারবো কিনা তাও জানি না তা নিয়ে মিথ্যা আলোচনা করে সত্যিই কোন লাভ নেই। তার চেয়ে দিদি তুই আমার ক'লকেটা পালটে দিয়ে যা।

বাজারবাড়ীর ঘরে ঘরে পুনরায় একটা উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। বহুদিন শান্ত ছিল এখানকার বাসিন্দারা। ছগনের বৌর মৃত্যুর পরে এমন মুখরোচক ঘটনা আর ঘটেনি। এবারের ঘটনা কেন্দ্র ব্রজসিনহার সংহার।

কবিতা হঠাৎ বেঁকে দাঁড়িয়েছে। এভাবে দিনের পর দিন দারওয়াগীর কাছ থেকে টাকা নিতে সে আর রাজি নয়। বর্ত্তমান জীবনকে সে আর মেনে

নিতে পারছেনা। সে সংসার চায়। নিজের সজাগ অনুভূতি দিয়ে প্রতিদিনের সুখ দুঃখকে উপভোগ ক'রতে চায়।

মায়া বলে কিন্তু দিদি আমাদের দেহে যে দাগী আসামীর ছাপ মারা হ'য়ে গেছে।

কবিতা ক্লিষ্ট হেসে বলল, সে কথা নতুন ক'রে মনে করিয়ে দিতে হবে না মায়া। রাজনৈতিক দাবাখেলার ঘুটি হিসাবে একদিন ব্যবহৃত হ'য়েছি বলেই আর কোনদিন সে ঘুটিতে খেলা হতে পারে না এ আমি বিশ্বাস করি না। এই প্রশ্নের একটা মীমাংসাই আমি ক'রতে চাই।

ব্রজসিনহা এদের আলোচনা উৎকর্ণ হ'য়ে শুনছিলেন সহসা হাঁপানি ভুলে তিনি হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তাই ব'লে জাতধর্ম খোয়াতে হবে—

কবিতা শান্তকণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল তুমি কার জাতের কথা বলছো বাবা? আমাদের? জাত নেই বলেই তো পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। মিথ্যে তুমি রাগ ক'রো না। যাদের নিয়ে তোমার জাত তারা তো কেউ সংস্কার কাটিয়ে এগিয়ে আসতে পারেনি। তুমি নিজেই কি এগিয়ে যেতে পেরেছো?

ব্রজ সিনহা গর্জ্জন ক'রে উঠলেন, তুই ব'লতে চাস কি?

কবিতা ভাবলেশহীন কণ্ঠে জবাব দিল, তুমি তোমার পুত্রবধূকেও গ্রহণ ক'রতে পারনি এই কথাটাই বলছি বাবা। আহা তার সত্যিই কোন অপরাধ ছিলনা।

ব্রজ সিনহা কুঁকড়ে গেলেন।

জবাব দিল মায়া, সংস্কার কাটিয়ে ওঠা কি এতই সহজ দিদি?

কবিতা স্নিগ্ধ হেসে জবাব দিল, সহজ এমন কথা আমি একবারও বলিনি। বরং কাজটা অত্যন্ত কঠিন ব'লেই আমি মনে করি মায়া? সেই জন্যেই যারা এগিয়ে আসতে পারেনি তাদের গালমন্দ না করে এবিষয়ে আসতে যে লোক দ্বিধা করেনি তাঁরই আশ্রয়ে ঘর বাঁধবার আয়োজন ক'রেছি।

মায়া বলল, সে ঘরের ভিত মজবুত তো দিদি?

কবিতা শান্ত কণ্ঠে জবাব দিল, ভিতটা ত' চোখে পড়ে না মায়া। তবে যতটুকু দেখেছি আর পরীক্ষা ক'রে বুঝেছি তাতে মজবুত বলেই মনে হ'য়েছে। তাছাড়া দাগী আসামীর আবার অত বাছাবাছি করবার সময় কোথায়! আশ্রয় যে পেলাম এইটাই তো আমার পরম সৌভাগ্য।

ব্রজ সিনহা পুনরায় আর্ত্তনাদ ক'রে উঠলেন, এতদিন বুঝি তুমি রাস্তায় বাস ক'রছিলে নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে। শেষ পর্যন্ত তুমি আমার জাতধর্ম খোয়াতে চাও—

কবিতা তেমনি শান্তকণ্ঠেই জবাব দিল, জাত তুমি অনেকদিনই খুইয়েছো আর ধর্মকে দিয়েছো বিসর্জন। নইলে তোমার মেয়ের সঙ্গে পুত্রবধূকেও গ্রহণ ক'রতে দ্বিধা ক'রতে না বাবা। তুমিও পারলে না তার স্বামীরত্নও পারল না অথচ—

ব্রজ সিনহা চিৎকার করে উঠলেন, খেন্তি—

কবিতা থামতে পারেনা ব'লতে থাকে, অথচ সে বেচার কোন অপরাধ ছিল না। না বাবা, ধর্ম্মের কথা আমাদের না তোলাই ভাল। যে ধর্ম তাকে অধর্ম্মের পথে ঠেলে দিল তাই নিয়ে বড়াই করা আমাদের সাজে না।

ব্রজ সিনহা নেতিয়ে পড়লেন, তার মানে তুমি ঐ সারওয়াগীকেই বিয়ে ক'রবে?

কবিতা দৃঢ় কণ্ঠে বলল, ঠিক তাই। তোমার জন্য আমার জন্য করতে আর মায়ার জন্য আমাকে এ কাজ করতেই হবে। নিজের ছেলের মুখের ঐ অশ্লীল আর অপমানকর কথাগুলো শোনার পরও কি তোমার চৈতন্য হবে না?

কথার মাঝে মৃদু কণ্ঠে মায়া বলল, একজন মাতালের ছুটো মুখের কথার খুববেশী মূল্য দিচ্ছ নাকি দিদি?

কবিতা সহজ কণ্ঠেই জবাব দিল, কথা সব সময়ই কথা মায়া। যখন যে অবস্থায় যার মুখথেকে বার হ'য়ে আসুক না কেন। নইলে তার কথায় বাবাও অমন করে ধৈর্য্যহারা হ'য়ে ছুটে আসতেন না, আমরাও তার মুখ

বন্ধ ক'রবার জন্ত ব্যস্ত হতাম না। আর শুধুই কি দাদা…আমাদের বর্ত্তমান জীবনযাত্রাকে ভাল চোখে দেখে এমন একটি লোককেও আমরা দেখতে পাব মায়া? আমি এই নিত্য তিরিশদিনের অপমানের হাত থেকে বাঁচতে চাই।

ব্রজ সিনহার কাশিটা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি পুনরায় শয্যায় আশ্রয় নিলেন।

মায়া মৃদু কণ্ঠে বলল, যাকে আশ্রয় ক'রে তুমি দাঁড়াতে চাইছো দুদিন বাদে সেই সারওয়াগী সাহেবই যদি তোমাকে ঠেলে দেন?

কবিতা একটুখানি হেসে ব'লল, তোমার এ আশঙ্কা খুবই সঙ্গত মায়া। কিন্তু এ সব ভবিষ্যতের কথা। এ নিয়ে আগে থেকে চিন্তা ক'রতে গিয়ে আমি বর্ত্তমানকে উপেক্ষা ক'রতে নারাজ। তাছাড়া ঠেলে ফেলে দিতে আমরা যদি পেরে থাকি সারওয়াগী সাহেবও না হয় পারবেন।

একটু থেমে কবিতা পুনরায় ব'লল, সবচেয়ে বড় কথা মায়া, যাদের আমরা আপন জন মনে করি তারা কি আজ পর্যন্ত আমাদের ভবিষৎ জীবনের নিশ্চয়তা দিতে এগিয়ে এসেছেন? বরং কবে কোথায় একটা দুর্ঘটনায় আছাড় খেয়ে দেহের খানিকটা ছড়ে গেছে তাকেই খুঁচিয়ে রক্তাক্ত ক'রে তুলেছিলেন আমাদের আত্মীয় পরিজন বন্ধু বান্ধবের দল। এর চেয়ে মর্মান্তিক অপমান আর কি আছে মায়া।

মায়া নীরবে শুনছিল। কোন জবাব দিল না।

কবিতা একটু হাসবার চেষ্টা করে পুনরায় বলল তোরা হয়তো ভাবছিস নিছক ভাবাবেগের বশে আমি এই সিদ্ধান্ত ক'রেছি। কিন্তু তা নয়। দিনের পর দিন রাতের পর রাত আমি নিজের সঙ্গে যুক্তির লড়াই ক'রেছি। তুই মেয়ে—তোর তো বুঝতে এতো দেরী হবার কথা নয় মায়া। যেভাবে আমাদের দিন চলছিল এভাবে বেশীদিন চলতে পারে না।

মায়া বলল, কেন চলতে পারে না দিদি?

কবিতা শান্তকণ্ঠে বলল, তুই বড় ছেলেমানুষ। তুই কি সত্যিই বিশ্বাস করিস যে, তোর দিদিকে অতগুলো টাকা শুধু গান শুনবার জন্তই দিয়ে যান সারওয়াগী সাহেব? এটা কি আমাদের প্রাপ্য।

মায়া মৃদু কণ্ঠে বলল, কিন্তু দিচ্ছেন এ কথাতো ঠিক—আর আমরা প্রাপ্য জেনেই তা নিচ্ছি?

বাধা দিয়ে কবিতা বলল, এর চেয়ে বড় মিথ্যা আর কি হ'তে পারে মায়া আমার তা জানা নেই। আমাদের নেই ব'লেই নিতে হচ্ছে কিন্তু মিথ্যার কারবার বেশীদিন চলে না বলেই আমি একটা সত্য সম্বন্ধ গড়ে তুলতে যাচ্ছি। সবদিক বাঁচানর এর চেয়ে সম্মানজনক পথ আমার চোখে আর পড়েনি। সোজা কথায় স্বীকার করছি যে আমি ভয় পেয়েছি—নিজেকে বড় অসহায় মনে ক'রছি।

মায়া ব'লল, ভয় পেয়েছো ব'লেই কি সারওয়াগী সাহেবকে আঁকড়ে ধরেছো?

কবিতা জবাব দিল, তাই মায়া—আর তিনি আমায় অভয় দিয়েছেন। জীবন বাঁচাতে গিয়ে যে মূলধন খোয়াতে হ'য়েছিল সেটা উনি ফিরিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। মর্য্যাদা দিয়ে অমর্য্যাদার গ্লানি যে লোক মুছিয়ে দিতে এগিয়ে এসেছেন তাকে ফিরিয়ে দেবার শক্তি আমার নেই মায়া।

মায়া নীরবে নতমুখে বসে আছে।

কবিতা বলে চলল, আমার মনের সায় না থাকলে যেন আর বেশী দূর না এগোই এ অনুরোধও তিনি ক'রেছেন। এর পরেও কি পিছন ফিরে চলে যাওয়া সম্ভব মায়া?

মায়া এতক্ষণে কথা ব'লল, যে প্রশ্নের তুমি মীমাংসা ক'রে ফেলেছ তা নিয়ে কথা বলা মিথ্যা। তবুও আমার ভয় হয়।

কবিতা বলল, আর একটু সহজ করে বল মায়া।

মায়া ব'লল, তোমার এই সিদ্ধান্ত কি শুধু ভয় পাওয়ার জন্ত? তোমার মনের খবর আমার জানা নেই দিদি—তবু মনে হয় যে কেবলমাত্র ভয় যদি তোমাকে—

কবিতা তাকে বাধা দিয়ে বলল, শুধু ভয় নয় মায়া

সেই সঙ্গে আছে কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা…
শুধুই কি কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা…

বাজারবাড়ীর ঘরে ঘরে এই কথা নিশ্চয়ই জমাট আলোচনা চলেছে। অনেকদিন ধরে এমন মুখরোচক আলোচনার সুযোগ তারা পায়নি।

মাষ্টারগৃহিণী শঙ্কিত অবস্থায় ক্ষীণকণ্ঠে স্বামীকে জিজ্ঞেস ক'রল, কথাটা তাহলে সত্যি! বাইজি মেয়েটা শেষ পর্য্যন্ত—

হরেন মাষ্টার মেয়েদের চরিত্র সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে বলল, এ যে হবে তা আমি জানতাম। একবার যদি চরিত্রে দাগ পড়ে—কথাটা অসমাপ্ত থেকে যায় নবজাতকের চীৎকারে।

আচার্য্যগৃহিণী ব'লছিলেন আচার্য্য মশাইকে, আমি খুব খুশী হ'য়েছি। মেয়েটার সাহস আছে। জোর করে ধর্ম্ম নাশ ক'রলে আবার ধর্ম্ম নাশ করা যায় নাকি? তবুও দেখ কি সব নোংরা কথা।

আচার্য্যমশাই অন্যমনস্কভাবে বললেন, নোংরা লোকগুলোই নোংরা কথা বলে। ওতে গায়ে ফোসকা পড়ে না।

আচার্য্যগৃহিণী ঝঙ্কার দিয়ে উঠলেন, তোমার মত গণ্ডারের চামড়া যাদের গায় তাদের হয়তো পড়ে না।

যোগেন আচার্য্য বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, হঠাৎ অমন করে চটে উঠলে কেন বলতো রাধারাণী? আমি কোন অন্যায় কথা বলেছি কি? নিন্দে করা যাদের স্বভাব তারা সবসময় নিন্দেই ক'রবে। ভাল ক'রলেও ক'রবে, মন্দ করলেও ক'রবে। কিন্তু সেজন্য কোন কাজই আটকে থাকে না। ওরা চীৎকার করতে থাকুক আর কবিতা তার অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করুক। চীৎকার আপনি থেমে যাবে।

রাধারাণী সহসা গম্ভীর হ'য়ে ব'ললেন, তার মানে এ বিয়েতে তোমারও মনের সায় আছে?

যোগেন আচার্য্য প্রফুল্ল কণ্ঠে জবাব দিলেন, থাকাই উচিত রাধারাণী। কথাটা আমি সেই থেকেই ভাবছি। এই সারওয়াগীর মত একদল ছেলে আরও বহু শতাব্দি আগে কেন জন্মাল না। তাহ'লে হয়তো আমাদের দেশের সহস্র সহস্র মেয়েকে বাধ্য হ'য়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ ক'রতে হ'তো না।

একটা জবাব দেবার জন্যই রাধারাণী মুখ তুলেছিলেন সহসা জগন্নাথ চৌধুরীর আকস্মিক আবির্ভাবে তিনি দ্রুত ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

জগন্নাথ আচার্য্য মশাইর ছেঁড়া কথার সূত্র ধরেই সুরু ক'রলেন, আমাদের কবিতা সিংহের কথা হচ্ছিল বোধ হয় আচার্য্য মশাই।

যোগেন আচার্য্য অকারণে উচ্চ হেসে জবাব দিলেন, ঠিকই ধরেছেন চৌধুরী মশাই। বাজারবাড়ীর ঘরে ঘরেই আজ এক কথা। কবিতা সিংহ আর সারওয়াগী।

জগন্নাথ শান্ত হেসে বললেন, ওরা দেখছি রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে পড়েছে। শুনেছেন বোধহয় ওদের বিয়ের ব্যাপার নিয়ে এই বাজারবাড়ীতে একটা মিটিং বসবে? আপনাকে খবর পাঠায়নি?

যোগেন আচার্য্য আর একদফা হেসে জবাব দিলেন, পাঠিয়েছে বৈকি কিন্তু আমার মশাই যাবার সময় হবে না।

জগন্নাথ কৃত্রিম শঙ্কিত কণ্ঠে জবাব দিলেন, আপনার সাহসতো কম নয় মশাই। এর পরে ওরা যে আপনাকে একঘরে ক'রবে।

যোগেন আচার্য্য বলেন, গিন্নীকে ঠিক এই কথাই বলেছিলাম। তাঁর মতে তাহলে নাকি শাপে বর হবে। না চৌধুরী মশাই, আমি একঘরে হ'তে রাজী আছি কিন্তু ঘরছাড়া হ'লে বাঁচবো না।

নিজের রসিকতায় আর একদফা তিনি হা হা করে হেসে উঠলেন।

জগন্নাথ হাসিমুখে বলেন, অর্থাৎ?

হাসিমুখে যোগেন আচার্য্য জবাব দিলেন, এরা পেছনে লাগলে তবেই নাকি আমি নড়তে চড়তে বাধ্য হবো। এখানে আর তিনি থাকতে রাজী নন। সংসার ধর্ম্ম ক'রবার উপযুক্ত স্থান নাকি এটা নয়।

কিন্তু যাই কোথা ব'লতে পারেন চৌধুরী মশাই। এই বাজারবাড়ীতে থাকবার সুবিধে যে কতো তা আমার চেয়ে বেশী তো তিনি জানেন না।

একটু থেমে আচার্য্য মশাই পুনরায় ব'লতে থাকেন, আমি জানি আমার রোজগারের সীমা যে দিকে তাকাই শুধু নেই আর নেই। তিনি বলেন এতো নেই, নেইর মধ্যে থাকতে নেই, ওতে মন ছোট হয়ে যায়। কিন্তু আমি বুঝি এদেরই মধ্যে আমার যথার্থ স্থান। আমাকেও তারা বুঝবে তাদেরও আমি বুঝবো। এখানে থাকার অনেক সুবিধে মশাই।

জগন্নাথ এতক্ষণ নিঃশব্দে শুনছিলেন। এবারে মুখ খুললেন, আপনি কোন ধরনের সুবিধের কথা বলছেন আচার্য্য মশাই।

যোগেন আচার্য্য পুনরায় হা হা ক'রে হেসে উঠলেন, কথাটা যখন উঠ্‌লোই তখন খুলে বলি।

যোগেন আচার্য্য পুনরায় হাসতে গিয়ে কেমন যেন কঁকিয়ে উঠলেন।

জগন্নাথ বিস্মিত হ'য়ে বললেন, হ'লো কি আপনার?

যোগেন আচার্য্য মাত্রাধিক গম্ভীর হ'য়ে বললেন, হাসিটা ঠিক এলো না। গলায় আটকে গেল। হাঁ যা ব'লছিলাম শুনুন। নামেই আমি এক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। মাইনের অঙ্কটা বলতে চাই না ওতে শিক্ষার সম্ভ্রম রক্ষা হবে না—

বাধা দিয়ে জগন্নাথ ব'ললেন, তার সঙ্গে এই বাজার-বাড়ীর সম্পর্ক কি?

যোগেন আচার্য্য বলেন, কথাটা শেষ ক'রতে না দিলে বুঝবেন কেমন ক'রে? প্রথম কথা হ'লো এখানে বাড়ী ভাড়াটা কম। তার চেয়েবড় কথা হ'লো মাছওয়ালা, তরকারীওয়ালা শ্রেণীর মানুষগুলো। আজও ওরা তেমন বুদ্ধিমান হ'য়ে উঠতে পারেনি। ওরা দুঃখ বোঝে। ঠেকলে বাকী দেয়। অকারণে অবিশ্বাস করে না।

জগন্নাথ আলোচনার ধারাটা অন্য পথে ফিরিয়ে নেবার জন্যই কতকটা পরিহাসের ভঙ্গীতে ব'ললেন, তাহ'লে শেষপর্য্যন্ত মিটিংএ যাচ্ছেন—

যোগেন আচার্য্য সহসা আকাশ থেকে পড়ে ব'ললেন, এমন কথা তো একবারও আপনাকে বলিনি মশাই। বরং আমার অক্ষমতার কথাই আপনাকে জানিয়েছি।

জগন্নাথ তেমনি পরিহাস-তরল কণ্ঠে পুনরায় বললেন, একটু আগেই ক্ষমতা আর অক্ষমতার দোহাই দিচ্ছিলেন কিনা—

যোগেন আচার্য্য হাসিমুখে জবাব দিলেন, ওটা দোহাই কিন্তু না যাওয়াটা আমার স্থির সিদ্ধান্ত চৌধুরী মশাই। কিন্তু আপনি কি ঠিক করেছেন?

জগন্নাথ মৃদু হেসে বললেন, ওর আর ঠিক করবার কি আছে। যেতেই হবে। ওদের বক্তব্যটাও শোনা হবে। দরকার হ'লে দুটো ভাল মন্দ বলবার সুযোগও পাওয়া যাবে।

যোগেন আচার্য্য বলেন, সকলে মিলে অকারণে বড় বেশী হৈ চৈ ক'রছে চৌধুরীমশাই।

জগন্নাথ জবাব দিলেন, হৈ চৈ কারণের চেয়ে অকারণেই সব সময় বেশী হয় কিন্তু ওর মধ্যে তীব্র উত্তেজক বস্তু আছে বলেই মানুষকে সহজে টানতে পারে।

কথা কটি শেষ ক'রেই তিনি বাইরের পথে পা বাড়ালেন।

যোগেন আচার্য্য বললেন, এরই মধ্যে যাবেন?

জগন্নাথ মাথা নেড়ে জানালেন, যাবই যখন— তখন একটু আগে যাওয়াই ভাল।

জগন্নাথ চলে গেলেন।

যোগেন আচার্য্য একখানি বই টেনে নিয়ে তার মধ্যে ডুবে গেলেন। এমন কতক্ষণ ছিলেন তিনি নিজেই জানেন না, সহসা জগন্নাথের পুনরাবির্ভাবে তিনি মুখ তুলে তাকালেন। বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, এরই মধ্যে আপনাদের সভা ভঙ্গ হ'লো?

জগন্নাথ জবাব দিলেন, আরম্ভই হ'লো না তার আবার শেষ—

যোগেন আচার্য্য বললেন, ঠিক বুঝলাম না।

জগন্নাথ হাসিমুখে বললেন, আরম্ভের আগেই একটি প্রস্তাব ক'রে বসলাম তাতেই সব ভেস্তে গেল। একে একে সবাই সরে পড়লো। তার পরেও কি খালি আসরে দাঁড়িয়ে হাত পা ছুঁড়তে বলেন।

যোগেন আচার্য্য প্রশ্নভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে থাকেন। কথা বলেন না।

জগন্নাথ হাসিমুখে বলেন, এসব বুদ্ধি প্রবন্ধকারের মাথায় আসবে না আচাযি মশাই। চাণক্যের কৌটিল্যের প্রয়োজন হয়। ক্ষিতিশ ভায়াকে ডেকে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি যদি আমায় সাহায্য করো তাহ'লে এখুনি আমি এ বিয়ে রদ ক'রে দিতে পারি। ক্ষিতিশ বুক ফুলিয়ে এগিয়ে এলো।

যোগেন আচার্য্যর কণ্ঠ থেকে আপন অজ্ঞাতে বার হয় মাত্র একটি কথা, তারপর?

জগন্নাথ বললেন, যে আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে এসেছিল তার চেয়ে ঢের বেশী হতাশ হ'য়ে ফিরে যেতে হ'লো।

একটু থেমে তিনি পুনরায় বললেন, কবিতাকে বিয়ে করতে অনুরোধ জানালাম। ক্ষিতিশ জ্বলে উঠে বলল, ও মেয়ে শুচিতা হারিয়েছে তা জানেন? বললাম, জানি কিন্তু তার জন্য তুমি আমি দায়ি। কবিতা নয়।

ক্ষিতিশ যুক্তি মানতে রাজী নয়। রাগ করে জবাব দিলে' কে দায়ি সেটা বড় কথা নয়।

বললাম, তাহ'লে বড় কথাটা কি বুঝিয়ে বলো। তোমরা তাকে বর্জন ক'রবার আগে গ্রহণ ক'রবার প্রস্তাব করে দেখছো? তা যদি না ক'রতে পার তাহ'লে তার মত ক'রেই সে বেঁচে থাক। যাকে কিছু দিতে পারবে না তার কাছ থেকে কিছু প্রত্যাশা করাও অন্যায়।

এরপরে আর জমল না। একে একে সকলে নিঃশব্দে চলে গেল।

যোগেন আচার্য্য অবাক হ'য়ে বললেন, আপনি বলেন কি! একবারে বিনা প্রতিবাদে চলে গেল। আপনার ভাগ্য ভাল একথা স্বীকার ক'রতেই হবে চৌধুরী মশাই।

জগন্নাথ বলেন, এর মধ্যে আমার ভাগ্য আবার কোথায় দেখলেন।

যোগেন আচার্য্য হা হা করে হেসে উঠলেন, ভাগ্য ব'লে ভাগ্য, এতবড় অনাচারকে প্রশ্রয় দিয়েও আপনি অক্ষত দেহে ফিরে এসেছেন।

জগন্নাথও হেসে উঠলেন, কথাটা বেশ ভাল বলেছেন আচার্য্য মশাই। স্বভাবদোষে একদিন হয়তো মারধোরই খেতে হবে।

যোগেনকে আর কোন প্রকার কথা বলার সুযোগ না দিয়েই জগন্নাথ প্রস্থান ক'রলেন।

ক্রমশঃ

আমাদের নিজের কথা

অশোক চট্টোপাধ্যায়

পরগুণগ্রাহিতা মানবচরিত্রের একটি অতি প্রয়োজনীয় অঙ্গ। অপরের চাল, চলন, রীতি, নীতি কৃষ্টি ভাল-মন্দ বিচার; এক কথায় অপরের সভ্যতার বিশেষত্ব বুঝিবার আগ্রহ মানুষকে ক্রমে ক্রমে উন্নততর আদর্শের দিকে আকর্ষণ করে ও মানুষের যদি নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট বোধ থাকে ও দোষগুণ বিচার করিয়া চরিত্রগত বিষয়ের পার্থক্য নির্দ্ধারণ শক্তি ক্রিয়াশীল হয়, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার সহিত পরিচয়ে মানুষের আত্মোন্নতির পথ সুগম হয়। কিন্তু অন্ধভাবে পরের অনুকরণ করিবার ইচ্ছা উন্নতির ক্ষেত্রে অন্তরায় বলিয়াই ধরা হয়; কারণ সেই প্রবৃত্তি তখনই জাগ্রত হইতে দেখা যায়, যখন মানুষ সচেতনভাবে না হইলেও অর্দ্ধ-চেতনার কেন্দ্রে অন্তরে অন্তরে নিজেকে অপরের তুলনায় অনুন্নত মনে করে। নিজেকে ছোট মনে করা কখন কোন মানুষের পক্ষে উন্নতির ও অগ্রগমনের পথের পাথেয় বলিয়া বিচার্য্য হইতে পারে না। এবং যাহারা নিজেদের জীবনযাত্রার পন্থা নির্ণয়নে শুধু অপরে কি করিতেছে, বলিতেছে অথবা কোন আদর্শ অবলম্বনে চলিতে চাহিতেছে এই কথা লইয়াই ব্যস্ত থাকে, তাহাদের জীবনধারা অতি শীঘ্রই শুখাইয়া যাইতে আরম্ভ করে এবং অনতিবিলম্বেই তাহাদের মানবতা নিরস, নিস্তেজ ও নিশ্চল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাহাদিগকে জাতিগতভাবে এমন একটা খর্ব্ব-গুণ অবস্থায় আনিয়া ফেলে যেখানে তাহাদিগের অন্তরে প্রগতির অর্থ হইয়া দাঁড়ায় মানসিক পরদাসত্ব। পর-নির্ভরশীলতা ও পরমুখাপেক্ষী মনোভাব মানুষকে উন্নত জাগ্রতভাবে অগ্রগমনে সাহায্য করে না। শুধু নিজস্ব প্রেরণাই ক্রমবিকশিত হইয়া মানুষকে জীবনের নূতন ও উন্নততর স্তরে লইয়া যাইতে পারে। অনুকরণলব্ধ মনোভাব অপরের অনুভূতির প্রতিচ্ছায়া মাত্র।

কিন্তু যেসকল মানুষ ব্যক্তিগত ও সামাজিকভাবে নিজেদের মধ্যে কোন নিজস্ব প্রগতি ও উন্নতির প্রেরণা উপলব্ধি করেনা ও যাহারা সভ্যতার ক্ষেত্রে অগ্রগতির প্রতিভায় নিজেদের নিঃসম্বল মনে করে; তাহাদের পক্ষে অপরের অনুকরণ ব্যতীত অন্য পন্থা থাকে না বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। যথা কোন আদি-বাসী জাতি বর্ত্তমান সভ্যতার সংঘাতে মনে করিতে পারে যে তাহাদিগকে উন্নত ও আধুনিক হইতে হইবে। তখন তাহারা নিজেদের কৃষ্টি ও জীবনধারার মধ্যে কোন দিক নির্দ্দেশ দেখিতে না পাইয়া অপর জাতির সভ্যতার ভিতর পথ ও লক্ষ্য সন্ধান করিতে বাধ্য হয়। এই প্রকার ঐতিহ্যগত দারিদ্র্য ও দেউলিয়া অবস্থা অপেক্ষাকৃত সভ্যজাতির মধ্যেও দেখা যাইতে পারে। বাধ্যতামূলক অনুকরণ নির্ভরতা সেই জন্য শুধু আদিম জাতিগুলির মধ্যেই লক্ষিত হয় না। যদি কোন জাতি কোনও মহাজাতির নৈকট্যহেতু সেই মহাজাতির প্রভাবে বহুকাল প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহা হইলে প্রবলতর সভ্যতার সান্নিধ্যের জন্য অসমর্থ জাতি বৃহত্তর শক্তিমান গোষ্ঠীর আচার ব্যবহার রীতি নীতি প্রভৃতি স্বভাবতই অনুকরণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া যায়। চীনসভ্যতার প্রভাব কোরিয়া ভিয়েৎনাম প্রভৃতি দেশে বিস্তৃত হইতে পারে। অথবা ভারতের প্রভাব সিংহলে অথবা ব্রহ্মদেশে জীবন্তরূপ ধারণ করিতে পারে। যে সকল প্রাচীন সভ্যতা আজ প্রায় লুপ্ত হইয়া বিস্মৃতির অতলে চলিয়া গিয়াছে সেইসকল সভ্যতার কেন্দ্রে নূতন কোন

সভ্যতা জীবন্ত হইয়া উঠিতে পারে। যেমন মিশরের পুরাতন কৃষ্টি ও সভ্যতা আজ আর জীবন্ত নাই এবং ঐ অতি প্রাচীন ও মহান সভ্যতা বর্ত্তমানে আরব-সভ্যতাকে নিজ স্থলে গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে দিয়াছে। গ্রীসের পুরাতন হেলেনিক সভ্যতার এখন আর কোন অস্তিত্ব নাই। তৎস্থলে যাহা আছে তাহা তুর্কী ও রেনেসাঁসজাত ইয়োরোপীয় সভ্যতার মিশাল সভ্যতা। ইয়োরোপীয় সভ্যতা ও কৃষ্টি যখন রেনেসাঁসের ফলে নবজন্ম লাভ করে তখন তাহা নানা কেন্দ্রে নানাভাবে শক্তি আহরণ করিয়া প্রবল হইয়া উঠে। ইহার মধ্যে স্পেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া ও ইংলণ্ডের নাম করা যাইতে পারে কিন্তু মূলতঃ ঐ সকল ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যে-সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল সেগুলির মধ্যে সারবস্তু একই ছিল। বর্ত্তমান রুশিয়া, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশেও কৃষ্টি ও সভ্যতা ঐ ইয়োরোপীয় ছাঁচেই রচিত গঠিত হইয়া উঠিয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন যে অর্থনৈতিক বিলি-ব্যবস্থা ভিন্নরূপ ধারণ করার ফলে হয়ত "লৌহ পরদার" আড়ালে একটা নূতন ধরনের সভ্যতার প্রেরণা বিকশিত হইয়া উঠিতেছে যাহা পরে ইয়োরোপীয় সভ্যতার অপর একটা সংস্করণ হইয়া বাড়িয়া উঠিবে। কিন্তু কার্য্যতঃ সেইরূপ কোন পরিণতি লক্ষিত হইতেছে না। ইয়োরোপের কল্পনা, প্রেরণা, চিন্তা সভ্যতা ও কৃষ্টির গতি বা ধারা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পার্থক্যের ফলে এমন কোন পরিবর্ত্তনের সৃষ্টি করিতেছে না যাহাতে ভবিষ্যতে দুইটি মূলত বিভিন্ন সভ্যতা জন্মলাভ করিবে মনে হইতে পারে।

পৃথিবীতে তাহা হইলে দেখা যাইতেছে কয়েকটি বিরাট ও শক্তিশালী সভ্যতা ও কৃষ্টির কেন্দ্র আছে ও সেইগুলির নিকটবর্ত্তী ক্ষুদ্রায়তন ও অল্পশক্তিমান অনেক দেশ প্রবলের সান্নিধ্যজনিত প্রভাবের ফলে ঐ বৃহৎ বৃহৎ সভ্যতার কেন্দ্রগুলির অনুকরণে নিজ নিজ সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে। আরও কিছু কিছু অনুন্নত ও অপরিণত জাতি আছে যাহারা নিজেদের ঐতিহ্যে কোন প্রেরণার উৎস না থাকায় অপর কোন প্রবল ও শক্তিমান জাতির অনুকরণে জাতীয় চিন্তা ও কর্ম্মের ধারা নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে।

পৃথিবীতে মাত্র দুইটি কৃষ্টি ও সভ্যতার কেন্দ্র আছে যেখানে প্রায় ৫০০০ পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া একই কৃষ্টির ঐতিহ্য জীবন্তভাবে বহমান রহিয়াছে। এই দুইটি দেশ হইল চীন ও ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষে আজও যে-সকল মন্ত্র উচ্চারিত হইতেছে তাহার কোন কোনটি চার হাজার বৎসরেরও অধিক দিন পূর্ব্বে পূজার জন্য ব্যবহৃত হইত। ভারতীয় ধর্ম্ম, দর্শন, ভাষা, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, চিত্রকলা, নৃত্য, অভিনয়, সঙ্গীত, সাহিত্য, খাদ্য, বস্ত্র, আভরণ এবং অর্থনীতির শাখা প্রশাখার প্রায় সকল গুলিরই আরম্ভ ও ক্রমবিকাশ এমন একটানাভাবে চলিয়া আসিয়াছে যে তাহা জগতের একটা মহা আশ্চর্য্যের বিষয়। চীনদেশের সভ্যতা ও কৃষ্টির অনুশীলন করিলেও দেখা যায় যে সেখানেও সব কিছু ঐরূপ একটানাভাবে চলিয়া আসিয়াছে। ভারত ও চীনের চিন্তা, প্রেরণা ও প্রতিভার অভিব্যক্তি পরস্পর-বিরোধী না হইলেও এবং কোথাও কোথাও দুই জাতির মধ্যে কৃষ্টিগত লেনদেন থাকিলেও দুইটি সভ্যতা পৃথক ও নিজ নিজ বিশেষত্বে গৌরবান্বিত! চীনের রাষ্ট্রিয় ও অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের ফলে চীনদেশের মানুষের অন্তরের প্রেরণা ও প্রতিভার প্রকাশ পরিবর্ত্তীত হইয়াছে কিনা সে কথা এখনও কেহ বলিতে সক্ষম হইবে না। কারণ মানবপ্রাণই হইল সকল প্রেরণার উৎস। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে সে-প্রেরণা কি ভাবে সক্রিয় হইয়া উঠে তাহা মানবজীবনের গতি ও ধারার উপরে নির্ভর করে। আদর্শ কিন্তু মানুষের ইচ্ছার অধীন ও ইচ্ছা সবল হস্তে প্রাণের আবেগের বিপরীত দিকে কর্ম্মকে চালিত করিতে পারে এবং সেই কর্ম্মের সার্থকতা প্রমাণ করিবার জন্য ইচ্ছানুরূপভাবে, আদর্শ গড়িয়া লইতে পারে। ইচ্ছা জীবনের ধারাকে উল্টাস্রোতে বহাইতেও পারে, অল্প সময়ের জন্য; কিন্তু জীবনের স্বাভাবিক গতি অনতি-বিলম্বেই সেই গায়ের জোরের ব্যবস্থাকে ঘুরাইয়া দেয়।

কষ্টকল্পিত ও ইচ্ছাকৃত ব্যবস্থা ও কর্ম্ম যদি জীবনের ধারা ও গতির বিপরীত হয়, তাহা হইলে সেইরূপ অন্তরের প্রেরণাবর্জ্জিত ও কঠোর হস্তে প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিগত কর্ম্মধারা অধিককাল চলিতে পারে না। সুতরাং চীন দেশের কৃষ্টি-বিপ্লব চীনের মানুষের অন্তরের প্রেরণা প্রসূত কিনা তাহা শীঘ্রই প্রমাণ হইয়া যাইবে।

প্রমাণ চীনদেশে যাহাই হউক একথা মানিতেই হইবে যে ভারতের মানুষ চীনের প্রাচীন সভ্যতা ও কৃষ্টির প্রভাবে অথবা তাহার নবলব্ধ আদর্শের আকর্ষণে নিজ ঐতিহ্য ও প্রাণের প্রেরণা অগ্রাহ্য করিয়া চীনপন্থী হইয়া চলিতে সক্ষম হইবে না। কারণ, চীনের পাঁচ হাজার বৎসর ধরিয়া যে জীবনধারা একটানাভাবে বহিয়া চলিয়া একটা একান্ত নিজস্বরূপ গড়িয়া তুলিতে সক্ষম হইয়াছে তাহার সহিত ভারতের অন্তরের প্রেরণার পার্থক্য প্রকটভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। চীনের প্রতিভা ও প্রেরণার সহিত ভারতের অন্তরের সৃজন আবেগ কখন একত্র তাল রাখিয়া চলিতে সক্ষম হইতে পারেনা। অল্প কিছুদিনে মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি রাষ্ট্রে ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় জোরালভাবে প্রতিফলিত হইয়া থাকিলেও চীনের ভিতরের যে জীবনধারা তাহা নিজের বহু সহস্র বৎসরের পরিচিত পথ ছাড়িয়া নূতন পথে চলিতে পারিবে না। চীনদেশে খৃঃ পূঃ ২৮০০ অব্দে সেজবংশীয় রাজাদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া হ'সিয়া, চাও, চি'ন, হান, টাঙ্গ, মিং, সুং, মাঞ্চু প্রভৃতি বিভিন্ন রাজবংশের আশ্রয়ে যে সভ্যতা বিকশিত হইয়া জীবন্ত-শক্তিতে চালিত রহিয়াছে; তাহা কম্যুনিজম এর প্রবল বিক্ষোভে কিছুকাল নূতন আদর্শের উপলব্ধি চেষ্টায় মত্ত থাকিতে পারে। কিন্তু চীনের মানুষের যে অন্তরের বাস্তব অভিব্যক্তির প্রেরণা তাহা কখনও স্থায়ীভাবে রুশীয়া কিংবা জার্মান জীবন-দর্শন অবলম্বনে চলিতে সক্ষম হইবে না।

শেষ মাঞ্চু সম্রাজ্ঞী ৎসে হ্'সি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিবার পর হইতেই চীনদেশে নূতন নূতন বিপ্লববাদের উদ্ভব হইতে দেখা গিয়াছে। সুন য়াৎ সেন সাম্রাজ্যবাদের স্থলে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে নানা প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন সেনাপতিদিগের শক্তি প্রবলভাবে দৃষ্ট হয়। চিয়াং-কাই-শেক কিছুকাল চীনে প্রভুত্ব করেন ও বর্ত্তমানে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে জাপান যুদ্ধে পরাস্ত হইলে পর চীন অ্যাংলো-আমেরিকান দলের অংশীদার হিসাবে জাপানের আত্মসমর্পণে বিজয়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। ইহার পরে চীনের সেনাপতিগণ আবার নিজেদের আভ্যন্তরীণ কলহ ও যুদ্ধ চালাইতে থাকেন ও ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে চিয়াং-কাই শেকের দল চীন ত্যাগ করিয়া ফরমোজাতে চলিয়া যাওয়ার পর চীনের পিপল্স্ রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রথমে চীনের সহিত রুশিয়ার সম্বন্ধ খুবই আন্তরিক ছিল। চীন নিজের সামরিক শক্তিবৃদ্ধি ও কারখানা গঠন কার্য্যে রুশের সাহায্য লইতে কোন কুণ্ঠা প্রকাশ করে নাই। রুশিয়াও সাহায্যদানে কার্পণ্য করে নাই। কিন্তু পরে এই বন্ধুত্বভাব আর সুরক্ষিত থাকে নাই। এখন চীনের সহিত রুশিয়ার সদ্ভাব আর নাই বরঞ্চ মতদ্বৈধই প্রবল হইতে প্রবলতর আকারে ব্যক্ত হইতেছে। চীনে প্রাচীন সভ্যতা এখন কোন পথে যাইতেছে তাহা আমরা জানিনা। টাওইজ্ম্, কনফুসিয়ানিজ্ম্ মেনসিয়াস ও বুদ্ধ এখন কোথায় কে বলিবে? কিন্তু মানবেতিহাস চর্চ্চা করিলে, একথা পরিষ্কার বুঝা যায় যে সহস্র সহস্র বৎসরের চিন্তা, অনুভূতি, ও আবেগ হঠাৎ হাওয়ায় মিলাইয়া যায় না। জীবনের ক্ষেত্র হইতে অতীতকে কেহ পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিয়া দিতে পারে না।

ভারতের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ভারত-সভ্যতার বহু ধারা ও বহু শাখা প্রশাখা আছে। ভারতের আদিম অধিবাসী যাহারা তাহাদের ভাষা, রীতি, নীতি, প্রভৃতি যাহারা পরে আসিয়াছিল তাহাদিগের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে অপর প্রকারের বলা যাইতে পারে। আদিবাসীগণ অবশ্য দ্রাবিড়, আর্য্য ও মঙ্গোলীয় জাতির ব্যক্তিদিগের সহিত কাছাকাছি বাস করিতে একান্ত নারাজ নহে ও ভারতবর্ষে

নানা জাতির একত্র বাসও একটা চির প্রচলিত রীতি হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সামাজিক রীতি, নীতি, ভাষা, আচার ব্যবহারের বৈচিত্র ভারতে যেরূপ দেখা যায় ও ভারতীয়গণ যেভাবে সেই পার্থক্যের মধ্যেই একজাতীয়তা সৃজন করিতে সক্ষম হইয়াছে, সেইরূপ পৃথিবীর অপর কোন দেশে দেখা যায় না। বহু ভাষাভাষী ভারতীয় মহাজাতির মূলত একই সভ্যতা ও কৃষ্টি পৃথিবীর সভ্যতার একটা আশ্চর্য্য নিদর্শন। নানা ধর্ম, নানা সম্প্রদায়, নানান আদর্শ, কিন্তু সবই যেন মিলিতভাবে কোন একটা উন্নততম আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দিকে ভারতের সব মানুষকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে। ইহার অন্তরের গভীরতার কোন তুলনা হয় না। ইয়োরোপে বহু ভাষাভাষী ভিন্ন ভিন্ন জাতি আছে এবং সেইসকল জাতির যে সভ্যতা তাহাকে আমরা ইয়োরোপীয় সভ্যতা নামে অভিহিত করি। কিন্তু ঐ সকল জাতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা বলিলেও তাহাদের একই ধর্ম্ম, একই ধরনের খাদ্য,বস্ত্র,বাসস্থান ও সামাজিক রীতি নীতি। ভারতের বহু ভাষার উপরে রহিয়াছে নানা প্রকারের খাদ্য বেশ-ভূষা জীবনযাত্রা পদ্ধতি ও নিবাসস্থল। কেহ নিরামিশ খায় কেহ সম্পূর্ণ মাংসভুক, কেহ মদ্যপান না করিলে দিন কাটাইতে পারে না, কেহ বা মাদকদ্রব্য স্পর্শ করে না; কাহারও পরিধানে পায়জামা কুর্ত্তা, কাহারও ধুতি চাদর, কাহারও বা শুধু কৌপীন ও নগ্ন দেহ। কোন কোন জাতির উত্তরাধিকার পদ্ধতি মাতৃকুল ধরিয়া চলে, অন্যদের চলে পিতা হইতে পুত্রে। কেহ থাকে তাঁবুতে কেহবা বৃহৎ অট্টালিকায়। কোথাও কন্যা যৌতুক দানে পতিলাভ করে এবং কোথাও বা কন্যার পিতাকেই বহু অর্থ দিয়া পত্নী পাইতে হয়।

স্থাপত্য ভাস্কর্য্য প্রভৃতি দেখিলে বোঝা যায় বৈচিত্রের আশ্রয়ে একই প্রেরণা কেমন করিয়া ব্যক্ত হইতে পারে। শিল্পরীতিতে পল্লব, চোলা, চালুক্য, পাণ্ড্য, রাষ্ট্রকুট, হয়শালা প্রভৃতির যেমন বিচিত্র অভিব্যক্তি; শিল্পশাস্ত্রের ভিতরের অর্থবিচারে তেমনি সে বৈচিত্রে একই রস উপলব্ধি ব্যক্ত করিতেছে দেখা যায়। গ্রীস বা পারস্যের প্রেরণা ভারতীয় মনের স্পর্শে নবকলেবর প্রাপ্ত হইয়া একান্তভাবেই ভারতীয় কৃষ্টির নিজস্ব সৃষ্টির আকার ধারণ করে। এই যে সকলকে নিজের করিয়া লওয়া ইহাই ভারতীয় সভ্যতার বিশেষত্ব। আদিম-অনার্য্য, দ্রাবিড়, মঙ্গোলীয়, আর্য্য, হুন, শক, তাতার— সকলেই ভারতীয় হইয়া এই মহাজাতিকে গঠন করিয়াছে। মহাবল্লিপুরম তাঞ্জোর, শ্রীরঙ্গম, মাদুরা, খাজুরাহ কোনার্ক, ভুবনেশ্বর, দিলওয়ারা, তাজমহল, লালকেল্লা; সবই ভারতীয় স্থাপত্য। ঋগ্বেদ হইতে আরম্ভ করিয়া অপরাপর বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, উপাখ্যান প্রভৃতির ভিতর দিয়া ভারতের দার্শনিক প্রচেষ্টা দুইতিন সহস্র বৎসর ধরিয়া ব্যক্ত হইয়াছে। সহজ সরল ভক্তির দৃষ্টিতে প্রকৃতির সকল তেজবীর্য্য শক্তির প্রকাশের সহিত সম্বন্ধস্থাপনই প্রথম পূজার প্রচেষ্টা। বায়ু, অগ্নি, বজ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, সমুদ্রের ও আকাশের জল-স্রোত মানুষকে অভিভূত করিয়া আকর্ষণ করে ও মানুষ তখন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ঐ সকল মহা বলশালী দৈব প্রকাশের স্তবে নিযুক্ত হইত। ক্রমে ক্রমে সকল সত্তার অর্থ, উদ্দেশ্য ও আধ্যাত্মিক মূল্যবিচার লইয়া তর্কবিতর্কের সৃষ্টি হইয়া দার্শনিক তথ্যানুসন্ধান বিস্তৃত আকার গ্রহণ করিল। ভারতীয় চিন্তার প্রসার ইহার ভিতরে যে পূর্ণতা লাভ করিয়াছিল তাহার তুলনা সমসাময়িক দার্শনিক আলোচনায় অন্য দেশে কোথাও পাওয়া যায় না। বাস্তব জীবনের কথা ভারতীয়গণ ধর্ম্ম ও দর্শনের আবেগে ভুলিয়া থাকিতেন না। দণ্ডনীতি, রাজনীতি, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতির ভিতরে ভারতীয়দিগের মনের গতির অন্য দিকটিও প্রকাশ হইত। কত প্রকার ধনরত্ন আছে; ধান্য কয় প্রকার কিম্বা গোপালন কেমন করিয়া লাভজনক হয়; সহর নির্ম্মাণের শ্রেষ্ঠ পরিকল্পনা কি ইত্যাদি কত কথাই যথাযথ আলোচনা করিয়া পূর্ব্বকালের ভারতীয়গণ পরিষ্কার ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিতেন। ইহাতে প্রমাণ হয়

যে বাস্তবের বিচার ও অনুশীলনেও ভারতীয় জ্ঞানীগণ উচ্চস্তরের অনুসন্ধিৎসু ছিলেন।

সুর তান তাল ছন্দ মুদ্রা অভিনয় প্রভৃতির নিখুঁত উদ্ভাবনা ভারতীয় সঙ্গীত নাট্য ও নৃত্যকলাকে পৃথিবীতে এক অদ্বিতীয় স্থান অধিকার করিতে সক্ষম করিয়াছিল। বর্ত্তমানকালে পৃথিবীর রসিকসমাজে ভারতীয় সঙ্গীত ও নৃত্য বিশেষভাবে আদৃত হইতেছে। ইহার কারণ এখন ভারতীয় কৃষ্টি সম্বন্ধে পৃথিবীর মানুষ অনেকাংশে সজাগ হইয়া উঠিতেছে এবং না শুনিয়া ও না বুঝিয়া নিন্দা করার রেওয়াজ কমের দিকে যাইতেছে। ভারতীয় চিত্রকলার খ্যাতি বহুকাল হইতেই সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। অজন্তার গুহাগাত্রে অঙ্কিত চিত্রমালারতুলনা পৃথিবীতে নাই। আরও কোথও কোথাও ঐ জাতীয় চিত্র অঙ্কিত আছে। হস্তলিখিত পুস্তকের ভিতরে অঙ্কিত চিত্র ভারতীয় শিল্পীর অতি আশ্চর্য্য কলা-কৌশল ও নিপুণতার নিদর্শন। মোগলযুগে ভারতীয় প্রেরণার সহিত পারস্যদেশের চিত্রাঙ্কনপদ্ধতির সমন্বয়ের ফলে বহু অপরূপ চিত্র অঙ্কিত হয়। ভারতীয় চিত্রকলার প্রভাব ভারতের বাহিরে পৌছিয়া অন্য অন্য দেশের চিত্রাঙ্কনের উন্নতিসাধনে সাহায্য করে। এই প্রভাব চীনদেশের চিত্রকলাতেও লক্ষিত হয়। অলঙ্কার আভরন পোষাক পরিচ্ছদ অস্ত্রশাস্ত্র যানবাহন প্রভৃতি রচনা ও নির্ম্মাণে ভারতীয়দিগের কৌশল বিশেষ ভাবে গঠিত ছিল। মুদ্রা প্রস্তুতেও ভারতীয়গণ সিদ্ধহস্ত ছিল।

ভাষার গঠনক্ষেত্রে ভারতীয় বৈয়াকরণিকদিগের বুদ্ধিমত্তার তুলনা হয় না। পাণিনী তাঁহার ব্যাকরণ সম্ভবত খৃঃপূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে রচনা করিয়াছিলেন। চার হাজার ব্যাকরণের নিয়মসম্বলিত এই পুস্তক পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞান প্রচেষ্টার নিদর্শন। ইহাতে ২০০০ দুইহাজার শব্দমূল বিশ্লেষণ করিয়া দেখান আছে। এই ব্যকরণ সংস্কৃত ভাষাকে এমন করিয়া সুগঠিত করিয়া দেয় যে তাহাকে ভাষার পূর্ণবিকাশের চূড়ান্ত বলা যাইতে পারে। সংস্কৃত নাটক, কাব্য প্রভৃতির অতঃপর যে উন্নতি হয় তাহা সম্ভব হইয়াছিল ভাষাকে সুগঠিত শৃঙ্খলতার উন্নততম আদর্শে সুরক্ষিত করিয়া দেওয়াতে। সংস্কৃতসাহিত্য বিশ্ববাসীকে জাতীয় সভ্যতা ও কৃষ্টির সর্ব্বভারতীয় প্রসারের পরিচয় দিয়া আসিয়াছে। শুধু সংস্কৃত নহে তৎসঙ্গে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষার গঠিতরূপ ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে সভ্যতার প্রসার সকল স্তরের ও শ্রেণীর মানুষের মধ্যেই গিয়া পৌছিয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন ভাষার যে উন্নতি এখনও সর্ব্বত্র দেখা যায় তাহার মূলে রহিয়াছে সংস্কৃত ও প্রাকৃত সাহিত্যের প্রেরণা। ভারতীয় সকল ভাষার মধ্যে যে এক পরিবার অন্তর্গত ভাব ও সাদৃশ্য দেখা যায় তাহা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার সহিত ভারতের ভাষা সমূহের পূর্ব্বকালের সম্বন্ধসম্ভূত। এই এক পরিবার ভুক্তভাব শুধু ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দৃষ্টিভঙ্গী ও রসবিচারের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে নাই; জীবনের নানাদিকে ইহার প্রকাশ দেখা যায় ও সেই অবস্থাও এক মূল সভ্যতা হইতে উৎপন্ন হওয়ার ফল। যুগে যুগে ভারতের গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সর্ব্বভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে এই মহাদেশকে দেখিয়াছেন ও তাঁহারা কুমারিকা হইতে কাশ্মীর ও কচ্ছ হইতে কামরূপ অবধি বিচার ও প্রচার উদ্দেশ্যে ঘুরিয়া ফিরিয়াছেন। বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে তাঁহারা ব্রহ্ম, শ্যাম তিব্বত ও সিংহলকেও ভারত সভ্যতা প্রচারের ক্ষেত্র বলিয়া বিবেচনা করিতেন। ভারতের বাহিরে যে একটা বৃহত্তর ভারত আছে একথা সকলেই জানিতেন ও ভারতীয় শিক্ষকদিগকে চীন, জাপান কিংবা পারস্য ও যবদ্বীপেও জ্ঞানবিতরণ করিতে দেখা যাইত। ভারতের চিন্তার ধারা ২০০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বেও চীনের সভ্যতার সহিত সম্পর্কে আসিয়াছিল—ক্যাশপিয়ান সাগরের তীরে। বর্ত্তমান-কালেও ফিখটে হেগেল, এমার্সন, কার্লাইল, থোরো ও হুইটম্যান ভারতীয় প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। যোগ ও বেদান্ত মানবসভ্যতাকে যুগে যুগে পুষ্টিদান করিয়াছে ও করিতেছে।

ব্রহ্মাণ্ড ও ভূতত্ত্ব; জ্যোতির্বিজ্ঞান কাল ও সময় নির্ণয়ন; গণিত, পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন; মানবদেহ ও চিকিৎসাবিজ্ঞান; ন্যায় ও দর্শন; সকল বিদ্যা ও বিজ্ঞান ক্ষেত্রেই ভারতীয় পণ্ডিতদিগের অবদান ব্যাপক ও মহামূল্যবান। ভারতীয় মানবের নিজেকে চিন্তা ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে অসহায় ও নিঃসম্বল বিচার করিবার কোন প্রয়োজন বা অর্থ হয় না। যাহারা এই মহাজাতির বহু পুরাতন কৃষ্টি ও সভ্যতার সহিত অপরিচিত অথবা সে বিষয়ে কিছু জানিলেও তাহার প্রকৃত অর্থ বা মূল্য-বিচারে অক্ষম, তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বিদেশী রাষ্ট্র ও অর্থনীতি; ভাষা সুর ও নৃত্য অথবা পোষাক ও চাল চলন অনুকরণ করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। কিন্তু ভারতের সভ্যতা ও কৃষ্টির যে বিরাট ক্ষেত্র তাহার ভিতরে মনের বা জীবনযাত্রার খোরাক অনায়াসেই পাওয়া যায় এবং অযথা পরের অনুকরণ করিয়া অথবা পরের কথা পুনরুদ্গার করিয়া নিজের ঐতিহ্য, প্রেরণা বা প্রতিভার দাবি অস্বীকার করিতে যাওয়া মানসিক ক্ষুদ্রতার পরিচায়ক। ভারত কখনও অপর সভ্যতা বা কৃষ্টির মূল্য বিচারে ক্ষুদ্রতা দেখায় নাই। যুগে যুগে ভারতবাসীগণ অপরের সভ্যতা ও কৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সম্ভার সংগ্রহ করিয়া নিজের মনের ভাণ্ডারে তাহা সাজাইয়া লইয়াছে। অনেক ক্ষেত্রেই সেই নিজের করিয়া লওয়ার ফলে বিদেশের প্রেরণা এত ঘনিষ্ঠভাবে ভারতীয়রূপ ধারণ করিয়া লইয়াছে যে তাহার বিদেশীভাব আর প্রায় থাকেই নাই। গ্রীক-ভাস্কর্য্য যেভাবে ভারতীয়রূপ গ্রহণ করিয়াছিল তাহা রসিকসমাজের একটা মহা বিস্ময়ের বস্তু। ইহা সম্ভব হইয়াছে ভারতীয় কৃষ্টি ও সভ্যতার স্বভাবে সামঞ্জস্য ও সমন্বয়সৃজনশক্তি সবলভাবে আছে বলিয়া। কিন্তু সেই গ্রহণকার্য্য কখনও ভারতীয় সভ্যতাকে মানসিক দাসত্বের অসম্মানে কলঙ্কিত করে নাই। আজ আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির বহুবৎসর পরে যেভাবে নিজেদের ঐতিহ্য, প্রেরণা ও প্রতিভাকে খর্ব্ব করিয়া রাষ্ট্রে, অর্থনৈতিক চিন্তায়, কৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন শাখায় নিজেদের অন্তরের দারিদ্র্য প্রকটভাবে ব্যক্ত করিতেছি, তাহাতে মনে হইতেছে যেন এই ভারতীয় মহাজাতির নিজস্ব কৃষ্টি-মহাত্ম্য ও চিন্তার গভীরতা কোনওদিন ছিল না। আদিম জনগণের যেমন অপরের অনুকরণ ব্যতীত অন্য পন্থা থাকে না আমাদের অবস্থা কি সেইরূপ হইয়াছে ও আমরা কি সেইজন্যই আমাদের ৫০০০ হাজার বৎসরের ঐতিহ্য এক পার্শ্বে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া বর্ত্তমানে মনের ক্ষেত্রে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বনে অবতীর্ণ হইয়াছি।

তীর্থ পথে

(ভ্রমণ কাহিনী)

প্রতিভা মুখোপাধ্যায়

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পরিষ্কার ঝকঝকে প্রভাতে গৌরীকুণ্ডের উষ্ণ প্রস্রবণে স্নান করে রওনা হলাম, কিন্তু রামওয়ারার কাছাকাছি এসে কি দুর্যোগ। শিলাবৃষ্টি, ঠাণ্ডা ঝড়ো-ওয়া, এগোবার সাধ্য কি। মাথায় গোল মার্বেলের মত শিলা পড়ছে, সঙ্গে জলধারা, গায়ে মাথায় ঠাণ্ডা যেন ছুরি দিয়ে কেটে কেটে বিঁধিয়ে দিচ্ছে। পায়ের তলায় গড়ান পাথর, কাদা; পাহাড় থেকে গড়িয়ে জলস্রোত নামছে। পা রাখা যায় না। এক পা এগোতে পাঁচ পা পিছিয়ে যাচ্ছি। চন্দ্রদা বৃদ্ধ মানুষ, তাঁর নিজেকে সামলানই দায়, সে অবস্থাতেও সর্বদা সবাইকে সতর্ক করে কখন হাত ধরে কখন ছাতা ধরে এগিয়ে নিয়ে যান। পথে যে অমায়িকভাবে সাহায্য করে সেই তো প্রকৃত বন্ধু। বুড়ি একবার চিৎকার করে উঠছে, আর পারি না বাপু। আবার খিল্ খিল্ করে হাসতে হাসতে এক পাথর থেকে আর এক পাথরে লাফিয়ে যাচ্ছে। সে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। কোন মতে সবাই ভিজে সপসপে হয়ে রামওয়ারা চটিতে ঢুকে দোকানীর উনুনে হাত পা সেঁকে একটু চাঙ্গা হয়ে, থাকবার ঘর খুঁজতে গেল গোপাল। দু-তিন দফা ভিজেকাপড় শুকোতে আমরা লেগে গেলাম। অত কষ্টের পরে সেদিন খেতে বসে সবাই উৎফুল্ল। ওখানে দোকানে 'ব্যাসন' পেয়ে ডালের সঙ্গে 'ব্যাসন' দিয়ে আলু ভাজার ব্যবস্থা হয়েছে। কয়েক-দিন পরে একটু নূতনের স্বাদে সবাই মুগ্ধ। দিনরাত কিছু কিছু বৃষ্টি পড়েই চলছিল। ও যায়গাটিতে ঐ নাকি চিরাচরিত আবহাওয়া। ভোরে আমাদের বেরোবার সময় পরিষ্কার আকাশ, সুন্দর আবহাওয়া রামওয়ারা থেকে কিছুটা চড়াই উঠে সেকি সুন্দর দৃশ্য। সে পরিবেশ জীবনে অক্ষয় হয়ে জেগে থাকবে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় বলতে হয় "আহা কি দেখিলাম জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিব না। প্রকৃতির শোভা চারিদিকেই বিস্তৃত। আমরা নদীমাতৃক সমতলের মানুষ। ফলে জলের কত শোভা দেখেছি, কিন্তু এমন তুষার-স্নিগ্ধ শোভা যা বর্ণনা করতে পারি না কিন্তু হৃদয়ভরে অনুভব করলাম। তুষার-প্রান্তরের উপর দিয়ে চলেছি, পাশে মন্দাকিনীর কুলুকুলু ধ্বনি শোন যাচ্ছে, দৃষ্টিপথে বরফ ছাড়া কিছুই দেখা যায় না দুদিকে উত্তুঙ্গ শৃঙ্গরাজি তুষারাবৃত। মনে মনে কবি বিজয়চন্দ্র মজুমদারের বর্ণিত লাইন দুটি আবৃত্তি না করে পারলাম না।

> "জলে শৈলে সূর্যকিরণ বিম্ব
> দলিত ছিন্ন কুজ্ঝটি,
> যেন তুষারে ধবল গিরির শৃঙ্গ
> ধেয়ানমগ্ন ধুর্জটি।"

কত যুগ ধরে এই চিন্ময় মূর্তিতে 'ধেয়ান মগ্ন ধুর্জটি' যোগাসনে বসে আছেন। ঐ তুষার সমুদ্রে সূর্যকিরণে

রূপালী ছটা দেবভূমিকে উজ্জ্বলতর করে রেখেছে। কিছুদূর গিয়ে ছড়িদার বলল, "মাইজী ঐ যে কেদারনাথের মন্দির-চূড়া" বল "জয় বাবা কেদারনাথ।" চারদিক্ বরফে ঢাকা, পর্বত শিখরের মাঝখানটিতে কি অপূর্ব্ব মনোহর দৃশ্য দেখলাম। মন্দির চূড়া তখনও বরফে ঢাকা, তাতে প্রভাত-সূর্যের আলোয় সে এক স্বগায় জ্যোতির্ময় শোভা। মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনি পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে কানে বাজতে লাগল। দূরত্বটুকু সহ্য হচ্ছিল না। ছুটে গিয়ে আরাধ্য দর্শনের জন্য মন পাগল হয়ে গেল। কেদারনাথের কোলে পৌঁছুতে বেলা প্রায় দশটা বেজে গেল। ঠাণ্ডায় হাত পা অবশ হয়ে গেছে, কিন্তু মনটি দিব্যজ্যোতির তাপে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। পাণ্ডাদের ঘরে পৌঁছে তাদের ব্যবস্থামত শিকড়ির আগুনে হাত পা সেঁকে শরীরকে মজবুত করতে কিছু সময় গেল। ঐ ঠাণ্ডায় স্নানের কোন কথাই ওঠে না। গরম জলে হাত মুখ ধুয়ে পুজো দিতে যাবার উদ্যোগ করলাম। পাণ্ডা মহাদেব-প্রসাদ পুজা উপকরণ এনে দিলেন। তাতে আছে ছোলার ডাল, নকুলদানা, মিশ্রি, কিসমিস, আখরোট আর শুকনো বেলপাতা শুকনো ব্রহ্মকমলের পাপড়ি। যে দেশে যে ব্যবস্থা। শুকনো যায়গা, সবই শুকনো উপকরণ। আমরা যে যা সঙ্গে নিয়েছিলাম, থালায় সাজিয়ে মন্দিরের দিকে চললাম। মন্দিরের কাছেই গিয়ে দেখি, একজন একখানা থালায় পাঁচটি কাঁচা কচি টাটকা বেলপাতা ও কয়েকটি নীল ফুল নিয়ে আমাদের চলার পথেই বসে আছে। একি! এ যে টাটকা বেলপাতা! আনন্দে, বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলাম। তিনটি বেলপাতা। কিছু ফুল নিয়ে নিলাম। কেদার নাথের মাথায় সত্যি টাটকা বেলপাতা দিতে পারলাম। সমস্ত রাস্তা যে স্বপ্ন দেখেছি। কেদারনাথের সামনে গিয়ে এমন অপার্থিব আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলাম। বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। এমন অপার আনন্দ, এমন অনুভূতি বুঝি জীবনে আর আসে নাই। দেবলোকে কি আর কিছু আছে? দিব্য-জ্যোতিতে নিজেযেন হারিয়ে গেলাম। পাণ্ডা ঠাকুরের মন্ত্রোচ্চারণে সম্বিৎ ফিরে এলো। মন্ত্র পড়ে, ফুল বেলপাতা ঘী চন্দন বাবার মাথায় দিয়ে, পুজোপাঠ প্রদক্ষিণ করে বেরিয়ে আসতে মন চাইছিল না। শঙ্করাচার্য্য কৃত শিবস্তোত্র পাঠ করতে করতে সমস্ত শরীর মন শিউরে উঠেছিল। অন্তর্যামী ভগবান কি খুব দূরে? কেমন করে অনায়াসে দুর্গম গিরি অতিক্রম করে একান্ত বাঞ্ছিতস্থানে পৌঁছুলাম। কে যে ঐ সুদূর পর্বতচূড়ায় কয়েকটি সদ্য প্রস্ফুটিত বিল্বপত্র এনে হাতে তুলে দিলেন? মন্দির থেকে বেরিয়ে যেদিকে তাকাই শুধুই বরফ। পায়ের তলায়, মাথার উপরে, বরফের পৃথিবী, বরফ সমুদ্র। ঠাণ্ডারও তুলনা হয়না, সমস্ত জগৎ সংসার ভুলে গিয়ে এক চিন্ময় রূপে ডুবে গেলাম। কবির উক্তি মনে এলো—"একই অঙ্গে এত রূপ!"

কুণ্ডচটি থেকে কেদারনাথ পর্যন্ত এই বত্রিশমাইল পথের ভিতর কত মনোহর দৃশ্য। কত মসৃণ স্নিগ্ধশোভা আবার কত ভীষণ দুর্গম পথ দেখলাম। নদী নির্ঝরিণী, ফুল ফলের শোভা, শুকনো পাথর, মাটীর রুক্ষভাব চোখে পড়ল। জায়গায় জায়গায় এত বিভিন্ন রংয়ের ফুলের শোভা। কোন শিল্পী থরে বিথরে সাজিয়ে রেখেছেন এই পুষ্পসজ্জা? বরফসমুদ্রমন্থন করে বাসস্থানে এসে লেপ কম্বল জড়িয়ে শরীরের স্বাভাবিক স্পন্দন ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করা গেল। অপর্ণা দুর্বল মানুষ, অত ঠাণ্ডা সহ্য করতে না পেরে অসুস্থ হয়ে পড়ল। শ্রদ্ধেয় উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও ঐদিন কেদারে পৌঁছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হল, তিনি উৎসাহ দিলেন অনেক, তিনি প্রতি বছরই ওখানে যান। হিমালয়ের আর্ষকণ ওঁকে ঘরছাড়া করে। কবি কেন যান নি জিজ্ঞেস করলেন, ওযে কবিতারই উৎস স্থান।

বিকেলে মন্দিরের পিছনে শঙ্করাচার্য্যের সমাধিক্ষেত্র দেখতে গেলাম। করোগেট টিনের একটি আচ্ছাদনের ভিতর কোন্ সুদূরের অধিবাসী শায়িত। ত্রিবাংকুর

রাজ্যে তাঁর জন্মভূমি, বত্রিশ বৎসরের জীবনে সমস্ত ভারতভূমি পদব্রজে প্রদক্ষিণ করেন। ভারতের শৈবধর্ম্মের প্রতীকরূপ চারিটি মঠ নির্মাণ করে গেছেন। দক্ষিণে মহীশূর রাজ্যের কাহরগ্রামে 'শৃঙ্গেরী মঠ', উত্তরে বদরিকাশ্রমে যোশীমঠে 'জ্যোতিলিঙ্গ', পশ্চিমে দ্বারকায় 'সারদা মঠ', পূর্ব্বে পুরুষোত্তমে 'গোবর্দ্ধন মঠ' স্থাপন করে অখণ্ড ভারতের ধর্ম্মবন্ধনী সৃজন করে রেখেছেন। ঐ স্বল্পায়ু ধর্মবীরের ভারতজয় কি কোন বীরত্বের সঙ্গে তুলনীয়? সব কাজ শেষ করে শিবের এই ধ্যানমগ্ন প্রশান্ত ভূমিতলে চির বিশ্রাম নিয়েছেন।

মন্দিরসংলগ্ন একটি গুহামন্দিরে একজন সাধক আছেন জেনে আমরা সবাই সেই গুহায় প্রবেশ করলাম, গুহা হলেও বেশ প্রশস্ত, আরো কয়েকজন যাত্রীও ঢুকে বসে ছিলেন। একটি অগ্নিকুণ্ডের সামনে নগ্নগায়ে হাসিমুখে স্বামীজি বসে আছেন। সবাইকে সাদর আহ্বান জানাচ্ছেন। তাঁর জীবন ধারণের আসবাবের মধ্যে দেখলাম একখানি কম্বল ও একটি কেৎলী। জিজ্ঞেস করে জানলাম, উনি সব সময়েই ওখানেই থাকেন। মন্দির আর গুহাই তাঁর পৃথিবী। চা ও শুকনো ফল তাঁর জীবন রক্ষা করে তাই ওঁর নাম 'ফলাহারী বাবা'। পরিপুষ্ট সুন্দর চেহারাটি, গায়ের রং কিছুই বুঝা যায় না, ধুনির আগুনের তাপে তামাটে এবং ছাই মাটিতে সর্বশরীর আবৃত। অমায়িক হাসি এবং সকলের সঙ্গেই মিষ্টালাপ করেন, আমরা কে কোথা থেকে এসেছি, কোথায় যাব সব জিজ্ঞাসা করলেন। উৎসাহ দিলেন প্রচুর। প্রণামী দিতে চাইলে হেসে ফেরত দিলেন, বললেন কোন দরকার নেই। গুহা থেকে বেরিয়ে এসে ভাবলাম, এই ঠাণ্ডায় যখন সমস্ত পর্ব্বত বরফে ঢাকা পড়ে যায়, পাণ্ডারাও তাদের পাততাড়ি গুটিয়ে নিয়ে ছয়মাসের জন্য নীচে নেমে যায়, কোনখানে কোন প্রাণের স্পন্দন থাকেনা, শুধু ঐ একটিমাত্র মানব কিসের টানে কেমন করে ওখানে থাকেন? যে আপার্থিব সুখের টানে ওখানে থাকেন, না জানি সে কত মধুর।

"যদি ডাকার মতন পারিতাম ডাকতে"!—বাঞ্ছিতের মুখ চেয়ে দিন কেটে যায় ওঁর। সন্ধ্যায় সন্ধ্যারতি দেখতে মন্দিরদ্বারে করজোড়ে দাঁড়িয়ে গেলাম সবাই। কেদারনাথ তো কোন বিগ্রহ মূর্ত্তি নন, একখানি প্রস্তর-খণ্ড মাত্র। তাঁকে আলোকমালা চন্দনাদিতে এমন সুচারুরূপে সাজিয়ে দিয়েছেন পূজারীরা, দেখে যেন আশ মেটে না। যাত্রী যাঁরা আসেন, অধিকাংশই সকালে এসে পূজা দিয়ে দর্শন করে নেমে চলে যান। রাত্রে বেশী ভীড় ছিল না, আমরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে প্রাণভরে দর্শন করে নিলাম। সত্যি বাবা মোহন-মূর্ত্তীতেই দেখা দিলেন।

সেই বাইশে মে প্রচুর তুষারপাত হ'লো ওখানে। সকালে উঠে চন্দ্রদা ডাকছেন, দিদি, উঠে দেখ, আমরা বরফচাপা পড়ে গেছি। দেখি সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য, ঘর দরজা মন্দির সব বরফে ঢাকা পড়ে গেছে, সূর্য্যদেবও তাঁর প্রথম ছটা ছড়িয়ে দিয়েছেন তার উপরে, সে এক আনন্দলোকের সৃষ্টি করেছে। এ শোভা কল্পনার বাইরে ছিল। প্রাণভরে দেখছি আর শীতে কাঁপছি। পূজারী, পাণ্ডা সবাই বললেন, আপনাদের ভাগ্য ভাল, এমন দৃশ্য বহুদিন দেখেনি কেউ। তেইশে মে একটু বেলায় পূজা অঞ্জলি দিয়ে বিদায় নেবার পালা। ফিরে যেতে মন চায় না। এই অল্প সময়ের মধ্যেই কেদারনাথের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠতা হয়ে গেছে, যেন অতি প্রিয়জনের বিচ্ছেদ ব্যথা বাজতে লাগল প্রাণে। পাণ্ডাজি যখন বিদায় দিতে এলেন, সকলেরই চোখে জল এসে গেল। ফিরবার পথে দু পা হাঁটি, আর ফিরে ফিরে তাকাই। আবার চলা। গৌরীকুণ্ড রামপুর, ফাটাচটি, মৈখণ্ডা হয়ে গুপ্ত কাশীতে পৌঁছলাম তৃতীয় দিনে। ওখানে উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আবার দেখা হল, তিনি মধ্যমহেশ্বরে যাবেন বললেন।

হিমালয়ের ডাক নিশির ডাকের মত মানুষকে ঘরে থাকতে দেয় না। চুম্বকের টানে টেনে আনে নিত্য নূতন পথের সন্ধানে। তিনি সেই টানে নিজেকে সঁপে

দিয়ে প্রতি বছরই নূতন নূতন আবিষ্কারের পথে পা বাড়ান। তাঁকে দেখে, তাঁর কাছে সব শুনে আমার মনও অস্থির হয়ে ওঠে। কিন্তু আমরা যে সংসারচক্রে বাঁধা। উনি মুক্ত পুরুষ। নিজের মনকে সংযত করে ওঁকে প্রণাম জানাই। গুপ্তকাশীতে বাঙ্গালী মেয়ে-পাইলট দূর্বা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হল, আলাপ হলো, ওঁরা থাকবার জায়গা পাচ্ছিলেন না ; গোপাল একখানা ঘর যোগাড় করে দিল। বেশ ধীর স্থির স্বাস্থ্যবতী, বুদ্ধিমতী মহিলা, সঙ্গে আরো দু-টি মেয়ে দু-টি ছেলে ছিল, বেশ আলাপী ওরা সকলেই। বদরীর পথে একসঙ্গেই গেলাম, পথে বিশ্রামের সময় গান, গল্পে বেশ জমাট আসর বসত মাঝে মাঝে। পরের দিন কুণ্ডচটিতে এক দুঃস্বপ্ন-রাত্রি কাটিয়ে বদরিকাশ্রমের দিকের বাসে বসলাম।

ছেলেবেলায় জলধর সেনের 'হিমালয়' নামক বইখানা পড়ে বদরীনারায়ণের পথের দৃশ্য, মন্দির সব চোখে ভাসত, ভাবতাম ওখানে তো আমাদের মত লোকের যাওয়া সম্ভব নয়। সে তো স্বর্গীয় পথ, অলকনন্দা বসুধারা পেরিয়ে পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানের পথে গিয়েছিলেন। সে সাধারণ মানুষের পথ নয়। বসে বসে সেই বদরিকাশ্রমের দিকে এগোচ্ছি, আর ভাবছি, অভিষ্টসিদ্ধি হবে তা হলে। পিসিমার মুখে গল্প শুনেছিলাম, বাবা বদরীনারায়ণের মাহাত্ম্য। এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বদরীনাথের দর্শন-অভিলাষে শীর্ণ শরীর নিয়ে মনের আবেগে রওনা হয়ে গেলেন। কত দুর্গম পথ, আহার বাসস্থানের কোনই ব্যবস্থা নাই। একেবারেই প্রকৃতির সঙ্গে মিলে মিশে চলা। সঙ্গী সাথী সকলেই তাদের গতিবেগে এগিয়ে গেছে। তাঁর মন্থর-গতির সাথী কেউ নেই। তবু তাঁর চলার বিরাম নেই। নারায়ণ-দর্শনে যাবেনই, চলতে চলতে যে লগ্ন বয়ে গেল। তিনি যখন গিয়ে দেবধামে পৌঁছুলেন, দেখলেন, সেদিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, মন্দির বন্ধ করে পুজারীরা নীচে নেমে যাচ্ছেন ছয় মাসের জন্য। এ-ছয়মাস মন্দির বরফাবৃত থাকবে। আবার ফের বৈশাখী অক্ষয় তৃতীয়ার দিন মন্দিরদ্বার খোলা হবে। ভক্ত হতাশ হয়ে প্রশ্ন করলেন।

"বাবা, কি আমায় দর্শন দেবে না ? আমি যে অনেক কষ্ট করে তোমার দ্বারে পৌঁছলাম। আমাকে দেখা দাও।" বলে বৃদ্ধ বসে পড়ে কাঁদতে লাগলেন। তখন মন্দিরের সামনে অলকনন্দার অপরপারে এক গুহার ভিতর থেকে এক সন্ন্যাসী বার হয়ে বৃদ্ধকে হাত ধরে গুহার ভিতরে নিয়ে বসালেন। বৃদ্ধতো কেঁদেই খুন।

সন্ন্যাসী সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "বিশ্রাম করো' তিনি তো ভক্তের ভগবান, নিশ্চয় তোমার দর্শন হবে।" সন্ন্যাসী ভক্তকে খাইয়েদাইয়ে তার ক্লান্তি দূর করালেন। পরে বললেন "এস, আমরা একটু খেলা করি," বলে মাটিতে ঘরকেটে খেলতে বসলেন। খেলায় তন্ময় হয়ে জাগতিক সুখ দুঃখ ভুলে আনন্দ-সাগরে ডুবে গেলেন ভক্ত। দিনক্ষণ-সময় কিছুরই জ্ঞান রইলো না। হঠাৎ বাইরে জনকোলাহল, ঘণ্টাধ্বনি শুনে গুহার বাইর এসে দেখেন, মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত, পূজারী পাণ্ডা সকলেই পূজার যোগাড়ে ব্যস্ত। সেই বৃদ্ধ ভক্তই প্রথমে মন্দিরে প্রবেশ করলেন, এবং ছয় মাসের জলন্ত প্রদীপের আলোতে নারায়ণমূর্তি দর্শন করে তৃপ্ত হলেন। দর্শন তো তাঁর গুহাতেই হয়েছিল, কিন্তু আকাঙ্খিত মূর্তি পেলেন মন্দিরে। বৃদ্ধকে দেখে পাণ্ডা ঠাকুরেরা তো অবাক হয়ে তাঁরই পদস্পর্শ করে ধন্য হলেন। বললেন, নারায়ণ যাঁকে ছয়মাস কোলে স্থান দিয়েছেন, তাঁকে দর্শন করে আমরাও ধন্য। তাঁকে সবাই প্রশ্ন করে, কেমন করে তিনি ঐ জনশূন্য, বরফাবৃত গুহা-কন্দরে এতদিন কাটালেন। তিনি বললেন, আমিতো সন্ন্যাসীর সঙ্গে অল্প সময় কাটালাম, তার পরেই তোমাদের সঙ্গে দেখা হল। শুনে আনন্দে আমাদের শরীরও রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। সত্যি ভক্তের সঙ্গে ভগবান থাকেন। এই আকাঙ্খাই মানুষকে শক্তি ও সাহস যোগায়।

সমস্তদিন বাসযাত্রার পরে সন্ধ্যেবেলা কর্ণপ্রয়াগে

এসে রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা হলো। এক হোটেলে কিছু অখাদ্য ভাত ও তরকারী গলাধঃকরণ করে একটি কাঠের ভাঙ্গা দোতলা ঘরে রাত্রিবাস। ভোরে বাসযোগে আবার রওনা। দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, সব যায়গায়ই অল্পসময় বাস দাঁড়াল। রুদ্রপ্রয়াগে নেমে অলকনন্দা মন্দাকিনীর সঙ্গমে স্নানের ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সময় কম, তাই হাতে করে জল তুলে মাথায় দিয়েই ছুটে যাই বাসের সন্ধানে। এখনো যে সামনে স্বপ্ন -"বিশাল বদ্রী।" গন্তব্যস্থানে পৌঁছবার তাড়া সবাইকার। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে বাসের ব্রেক নষ্ট হয়ে গেল, চালক বেশ বিপন্নবোধ করতে লাগলেন, তবে মুখে সকলকে ভরসা দিয়ে আস্তে আস্তে বাস চালিয়ে যেতে লাগলেন। পিছনের সব গাড়ীকে আগে যেতে দিয়ে আমাদের গাড়ী সবুজ নিশান-বাহী হয়ে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যেতে লাগল। এপথের কর্ণধারদের নিপুণতার বাহাদুরী দিতে হয়। বেলা এগারটা নাগাদ যোশীমঠে পৌঁছলাম। বিড়লা ধর্ম্মশালায় স্থান পাওয়া গেল।

উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপাল বিশ্বনাথ দাস বদরী-নারায়ণের পথে যোশীমঠে বিড়লা ধর্ম্মশালায় অবস্থান করার ফলে অনেক মিলিটারী সমাবেশ হল, ফলে আমরা একটু কোনঠাসা হয়ে গেলাম। অবিশ্যি ঘরে আমরা কম সময়েই থাকি। যোশীমঠ একটি অসমতল বিরাট শহর। ঠাণ্ডায় কয়েকমাস বদরীনারায়ণের ভোগমূর্তির পূজা হয় এখানে। মন্দিরে একখানি সিন্দুরলিপ্ত প্রস্তর-খণ্ডের মধ্যে কোন মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় না। তবু মন্দিরের মাধুর্য, মন্দিরের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ আছে। অসংখ্য যাত্রীর ভীড়। শঙ্করাচার্য্য স্থাপিত জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করে এলাম। শহর থেকে বেশ উপরে মন্দির, ভজনস্থানটিও বেশ রুচিসম্পন্নভাবে সাজানো-গোছান, রাত কাটিয়ে ভোরে বিষ্ণুপ্রয়াগের হাঁটাপথ আরম্ভ হল। দুর্গম পথের যেসব বর্ণনা শুনেছি, এবারে তার সঙ্গে সম্মুখ-পরিচয় হল। উৎরাই পথ, কিন্তু এমন আলগা পাথর আর মাটির রাস্তা, প্রতি মুহূর্তেই পা হড়কাবার সুযোগ। কোনমতে লাঠি ধরে পা টিপে টিপে দুইমাইল রাস্তা যেতে তিন ঘণ্টা সময় লাগল।

পা বাড়াতে যে এত সংশয় হয়, এবারে সে প্রমাণ পাওয়া গেল। লাঠিখানার বন্ধুত্বের পরিচয়ও বিশেষ-ভাবে সেদিন পেলাম। লাঠিকে অবলম্বন করেই হাঁটি-হাঁটি পা পা করে কোন মতে বিষ্ণুপ্রয়াগে পৌঁছলাম। যোশীমঠ থেকে বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্য্যন্ত শুধুই নীচে নেমে গেলাম। এবারেও বুড়ির খেদ-উক্তি, এত যে নামাচ্ছ বাবা, আবার তো সুদে আসলে তুলে নেবে। চন্দ্রদার উৎসাহবাক্য : উচুঁতে উঠতে গেলে কিছুতো নামতেই হবে। বিষ্ণুগঙ্গা আর অলকনন্দার মিলনক্ষেত্র বিষ্ণু-প্রয়াগ। সিঁড়ি বেয়ে বেশ কিছুটা নেমে গিয়ে গঙ্গাস্পর্শ করে এলাম সবাই। ছোট নূতন দুটি মন্দির, একটি গঙ্গাদেবীর একটি বিষ্ণুর।

একটু বিশ্রাম করেই চলা আরম্ভ হলো, সামনে পাণ্ডুকেশ্বরের পূর্বে আর থামবার মত চটি নাই। কাজেই এবেলা বেশ কিছু পথ চলতে হবে। সকালবেলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় হাঁটতে ভালই লাগে। দু-পাশে নব-নারায়ণে দুই পর্ব্বত। গগনচুম্বী শৃঙ্গরাজী, মাঝখান দিয়ে স্রোতস্বিনী অলকনন্দা চলেছে। আমরা একবার অলকনন্দার ডান দিক দিয়ে যাই, আবার ছোট পুল পেরিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে চলি। চন্দ্রদা বললেন, "দিদি, যে পর্ব্বতছায়ায় চলেছি, কবে কোন্ যুগে বিষ্ণুর দুই অংশ নরঋষি এবং নারায়ণঋষি—ঐ পর্বতশীর্ষে ধ্যানে বসেছিলেন। তাঁদের ধর্মরাজ পত্নী 'মূর্তি'র গর্ভে জন্ম। ধার্মিক দুই ভ্রাতা এক মতে এক পথেই চলতেন। বদরিকাশ্রমের পথে ঐ গিরিশৃঙ্গে কঠিন তপস্যায় দেবতাদেরও ভীত করেছিলেন। এঁরাই দ্বাপরযুগে কৃষ্ণার্জ্জুনরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়ে কুরুকলঙ্ক দূর করেন, এবং ধর্মরাজ্য স্থাপন করে বিষ্ণুদেহেই বিলীন হয়ে যান। এই পরম দৃশ্য দেখতে দেখতে পথ চলি, আর ভাবি, কে সেই মহাজ্ঞানী মহাজন এই দুর্গম অসংখ্য গিরিশ্রেণী পার হয়ে গিয়ে এমন মনোরম স্থানে শিবমন্দির, বিষ্ণুমন্দির স্থাপন করে গেছেন। আজ সভ্যতার আলোতে তো পথ অনেক সুগম হয়েছে। কিন্তু কত যুগ আগে কোন্ শিল্পী সুগঠিত মন্দির, মন্দির-প্রাঙ্গণ তৈরী করে রেখে গেছেন। এর আশেপাশে

প্রত্যহ কত প্রাকৃতিক ভাঙ্গা-গড়া ধ্বংসলীলা চলে, কিন্তু দেবমন্দির ঠিক মাঝখানে আপন মহিমায় অক্ষত দাঁড়িয়ে আছে। এযুগের মানুষ তাদের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সেই স্নিগ্ধ নির্জনতাকে ব্যস্ত করে তুলেছে। ছায়াঘেরা সরু পাকদণ্ডির পাশে পাশে যে বিশ্রামের জন্য ছোট ছোট চটি ছিল, যেখানে ক্লান্ত পথিক দুমিনিট বসে বিশ্রাম করে নিত, দোকানীরা ছিল চলার পথে বন্ধু বিশেষ। আজ যন্ত্রযুগে মানুষ পাহাড় ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিচ্ছে। প্রকৃতির সবুজ আঁচলের পরিবর্তে এখন শুষ্ক ধূসর ছিন্ন পতাকা উড়েছে। প্রখর তাপ তীর্থযাত্রীদের তৃষিত করে তোলে। কেদারনাথের সমস্ত পথ, এবং বদরী-নারায়ণের পথে বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্যন্ত অসংখ্য ঝর্ণাধারার ঝরঝরানি গান শুনতে শুনতে এসেছি।

এখানে যেন সবই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। চওড়াপথ, পাথর কুচি তার বালি মাটিতে ভরা, মুক্ত ঝর্ণাধারাদের রাস্তার তলায় চেপে দেওয়া হয়েছে। তাদের গানের আওয়াজ আজ কান্নার গোঙ্গানী শব্দে প্রকাশ পাচ্ছে। সুন্দরকে চেপে দিয়ে আমরা এখন যন্ত্রের পূজারী। যাত্রীরা বাসে চেপে বদ্রীনাথের মন্দির পর্যান্ত যাবে, কাজেই চায়ের বা বিশ্রামের জন্য কয়েকখানা নড়বড়ে টুল বেঞ্চির প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

যোশীমঠ থেকে প্রায় দশমাইল অবিশ্রাম হেঁটে পাণ্ডুকেশ্বরে পৌঁছুলাম। পাণ্ডুকেশ্বরে মহাভারতের পাণ্ডুরাজা দেহত্যাগ করেছিলেন একথা শুনে এসেছি। ক্লান্তদেহে কম্বলিওয়ালার ধর্মশালার দোতলা ঘরে পৌঁছেই সবাই প্রায় শুয়ে পড়েছি। একটু বাদেই নীচে যেন কান্নার শব্দ শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি উঠে দেখতে যাচ্ছি, শঙ্খ বললে, যাচ্ছ কেন পিসিমা? ও বোধহয় এদেশী গানের আওয়াজ, পাগাড়ী দেশতো? সবই একটু অন্য রকম। ভাবলাম, এ দেবভূমিতে কাঁদবে কে? তবু উঠে গিয়ে দেখি, নীচে এক ভদ্রলোককে ডাণ্ডি করে নিয়ে এসেছে, সঙ্গে তাঁর স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে আসছেন। সঙ্গে দুজন সিপাই। তাদের জিজ্ঞেস করে জানলাম, ভদ্রলোক রাস্তার উপরেই হার্টফেল করেছেন। রাজপুতানার অধিবাসী ওরা। সঙ্গে দেশওয়ালীভাই বোন যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সব এগিয়ে গিয়েছেন। এঁরা স্বামী স্ত্রী একা পড়ে গিয়েছিলেন। এখন স্বামী আরো বহুদূরে এগিয়ে গেলেন, স্ত্রী সম্পূর্ণ একা এবং বিপন্ন। আমরাও যেন নিজেদের বিপন্ন বোধ করলাম। সবাই নেমে গেলাম নীচে, কৌতুহলে নয় চিন্তার বশবর্ত্তী হয়েই। মৃত ভদ্রলোকের জন্য তো কিছু করবার নাই। ভদ্রমহিলাকে কি সাহায্য করে তাঁকে এ সমূহ বিপদ থেকে উদ্ধার করা যায়? ওখানকার ডাক্তার, পোষ্টমাষ্টার এবং মুদিদোকানদার একাধারে সব—একভদ্রলোক অমায়িকভাবে এগিয়ে এলেন সব ব্যবস্থা করতে। বঙ্কিম, গোপাল, শঙ্খ, আমাদের ছড়িদার সবাই মিলে মৃতের সৎকার করল। ভদ্রলোক পুণ্যবান বদ্রীধামে সদ্‌গতি লাভ করে বৈকুণ্ঠে গেলেন। কিন্তু বিপন্ন ভদ্রমহিলার উপায়? ওঁদের দলের লোকেরা এতদূর এসে নারায়ণ-দর্শন না করে ফিরতে রাজি ন'ন বোঝা গেল। আমরা যেন আত্মীয় ব্যথায় ব্যথিত হয়ে পড়লাম। সমস্তদিন রান্না খাওয়া হলো না। সন্ধ্যার পরে কিছু মুখে দিয়ে সকল যাত্রীমিলে স্থির করা হলো, যে করেই হোক সদ্য বিধবাকে দেশের দিকে রওনা করে দিয়ে তবে আমরা এগোবো। শেষে ওঁদের দলের এক মহিলা তাঁর ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা বিসর্জ্জন দিয়ে ওঁকে নিয়ে দেশের দিকে রওনা হয়ে গেলেন।

বঙ্কিম এবং পোষ্টমাষ্টার মহাশয় অর্থের ব্যবস্থা করে দিলেন। শুনলাম, প্রতিবৎসরই দু'চারজন বদ্রীনারায়ণের যাত্রী পাণ্ডুরাজার সঙ্গী হয়ে ওখানে থেকে যান। ভারক্রান্ত মন নিয়ে পরেরদিন ভোরে হনুমান চটির দিকে যাত্রা করলাম।

দুপুরে হনুমান চটিতে পৌঁছে খাওয়াদাওয়া সেরে অপর্ণা বলল, এত কাছে এসে আর যেন তর সইছে না, চলুন, বিকেলেই নারায়নধামে পৌঁছাই। হনুমান চটি থেকে সাতমাইল নারায়ণধাম।

বেলা দুটোতে রওনা হয়ে গেলাম! এ রাস্তাটুকু সবই চড়াই। পাকদণ্ডি দিয়ে গেলে অনেক তাড়াতাড়ি ও সহজ হয় কিন্তু গাড়ীর রাস্তা তৈরী করতে গিয়ে পাকদণ্ডি ভেঙ্গেচুরে দুর্গম হয়েছে। গাড়ীর রাস্তা ধরে ঘুরপাক খেতে খেতে যতই এগোই, রাস্তা আর ফুরায় না। পীপাসার জল পাওয়া যায় না। রাস্তার দৈর্ঘ্য বুঝা যায় না। কখনও পাহাড়ের উপর দিকে উঠছি, কখনও নিচে নেমে যাচ্ছি। নাগালের কাছের রাস্তাটুকু আর ফুরায় না। সেটিই বেশী দুর্গম মনে হয়। একটা প্রবাদবাক্য আছে, "তালগাছের আড়াই হাত।" যে কোন শীর্ষে পৌঁছুতেই কিছু কষ্ট, কিছু হতাশার ভিতর দিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে এগোলেই মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। এবারেও ছড়িদার বলে উঠল, "মাইজী ঐ দেখা যায় বদ্রীনারায়ণের মন্দিরচূড়া, বল, "বদ্রীবিশাল কি জয়।"

তাকিয়ে দেখি চারিদিকে পর্ব্বত-বেষ্টনীর মাঝখানে নারায়ণ মন্দির চূড়ায় অস্তগামী সূর্যদেব যেন জলন্ত সোনা ঢেলে দিয়েছেন। সে এক মনোহারী রূপ। সেই অপরূপ মহিমার টানে ছুটে এগিয়ে যেতে লাগলাম। পথের ক্লান্তি যেন অনেকটা জুড়িয়ে গেল আশার আলো দেখে। আমরা যাচ্ছি পাশ দিয়ে, একখানি মিলিটারী জীপগাড়ী মন্দগতিতে এগিয়ে চলছিল। এপথে তো শতশত মিলিটারী গাড়ীর সাক্ষাৎ মিলল। এও তাদেরই একখানা। দেখি ঐ গাড়ীখানা থেকে একটি যুবক নেমে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে অতি বিনীত সুরে জিজ্ঞেস করল "আপনারা কি কলকাতা থেকে এসেছেন? বলেই আমার পায়ে হাতদিয়ে প্রণাম করে ফেলল। অমি তো হকচকিয়ে গেলাম; কে? পরিচিত, কি আত্মীয় কেউ? মিলিটারি পোষাকে চিনতে পারছি না। তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে কাছে টেনে এনে আদরের সুরেই নাম জিজ্ঞেস করলাম। ছেলেটির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বলল, কলকাতা থেকে প্রায় দুবছর হলো মিলিটারীতে যোগ দিয়ে চলে এসেছি। বাড়ীতে প্রৌঢ়া মা আছেন, অনেকটা নাকি আমার মত দেখতে। ভাই বোন আছে। আমাদের বাঙ্গালী বলে চিনে ঘরে ফেলে-আসা মা, বোনকে মনে পড়ে গেল। বহুদিন কর্মজগতে লিপ্ত আছে, কাজের ফাঁকে ফাঁকে মায়ের মুখ ভেসে উঠে, তখন প্রাণ আকুল হয়ে যায় সেই স্নেহনীড়ের জন্য, স্বদেশের মাতৃমূর্তি খুঁজে বেড়ায় চারিদিকে। আমাদের দেশবাসী দেখে ছুটে এসেছে মায়ের বার্তা পাবে বলে। কাছে টেনে একটু আদর, দুটি কথা ছাড়া আর কিছুই কি দিতে পারলাম তাকে। জানিনা সে তৃপ্তি পেল কিনা। দেরি হয়ে গেলে শাস্তি পেতে হবে বলে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ছেলেটি। আমার মনকে গলিয়ে দিয়ে গেল সেই অজানা পরম শ্রদ্ধায়,

> "ভায়ের মায়ের এত স্নেহ,
> কোথায় গেলে পাবে কেহ
> ও মা তোমার চরণ দুটি
> বক্ষে আমার ধরি"—

কবির ঐ ঝঙ্কার বাঙ্গালী সন্তানের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ধ্বনিত হয়ে আসছে চিরকাল।

বেশ প্রফুল্ল মন নিয়ে সন্ধ্যার একটু আগেই বদ্রীধামে পৌঁছে গেলাম। পূজারী মহাদেবপ্রসাদের ভাই ঘর ঠিক করে রেখেছিলেন। পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম এবং জলযোগের ব্যবস্থা করে দিলেন। ভারতীয় ঐতিহ্যকে এঁরা মাথায় করে রেখেছেন পেশার বাইরেও এঁদের মমতার স্পর্শ আছে, অনুভব করলাম। হাত মুখ ধুয়ে কাপড় বদলে মন্দিরে আরতি দেখতে গেলাম। বিশাল প্রদীপ, তাতে এক'শ শিখা জ্বালিয়ে তা দিয়ে নারায়ণের আরতি হবে বলে চারপাঁচজন প্রদীপ জ্বালাতে লেগে গেছেন। মস্তবড় ঘণ্টা বাজাচ্ছেন একজন। সে ঘণ্টা-ধ্বনি মন্দির ছাড়িয়েও পর্বত-কন্দরে কন্দরে অনুরণিত হয়ে যেন দৈববাণী বহন করে বাজতে লাগল। জানিনা এই দেবভূমি ছাড়া আর কি স্বর্গ বলে কিছু আছে? এই পবিত্র মহিমাময় স্থান আর কয়টি আছে জগতে? মন-প্রাণ ভরে গেল দর্শনে। তবে এখানে দেবতা স্পর্শের

বাইরে। বেশ দূরত্ব রেখে শুধু দর্শন করতে হয়, তাও অল্লক্ষণ। ভীড়ের চাপে দাঁড়াতে দেয় না। অপূর্ণ আকাঙ্খা নিয়েই সরে আসতে হয়।

পরের দিন সকালে মন্দিরের পাদদেশেই উষ্ণকুণ্ডতে স্নান করে তৃপ্ত হয়ে দান কর্মাদি সেরে পূজোপচার নিয়ে পূজা দিতে গেলাম। এখানেও দরজায় নারায়ণের প্রিয় তুলসীমালা প্রচুর পেলাম। দর্শনেই আনন্দে প্রাণ ভরে গেল, তখন আর পরশনের কথা মনেই এলোনা। নারায়ণের স্নান হলো। তারপর তাঁকে বেশভূষায়, মালা চন্দনে অপরূপ সাজে সাজিয়ে দিলেন পূজারীরা সাত-আটজন। কি ব্যস্ত তাঁরা। ঘণ্টাখানেক ধরে সাজিয়েও যেন তৃপ্তি হয় না, আবার একটি মালা, আর একটু চন্দন, এমনি করে প্রিয়তমকে সাজিয়ে পূজারীরা পূজা-আরতি করলেন। আমাদের দেয় পূজা তাদের হাত দিয়েই পাঠিয়ে দিতে হলো ? একবারে বেশী সময় দাঁড়িয়ে দেখতে দেয় না বলে আমরা বারে বারে ঢুকে দেখে নিলাম। আকাঙ্ক্ষার তো শেষ নাই। কথিত আছে এই বদ্রীনারায়ণের মূর্তিখানি শঙ্করাচার্য সমুদ্রগর্ভ হতে তুলে এনে গাড়োয়াল রাজের এই ছোট গ্রামখানিতে স্থাপিত করেন। গ্রামের নামানুসারেই বিগ্রহের নাম বদ্রীনারায়ণ হয়। বিগ্রহ কালো পাথরের, চারি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মধারী বিষ্ণুমূর্ত্তি। নারায়ণের ধ্যানে সে রূপ নাই।

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ
কেয়ুর বান কনক কুণ্ডল বান্
কিরীটিহারী হিরন্ময় বপুঃ
ধৃত শঙ্খ চক্র :

কোথায় সমুদ্র আর কোথায় হিমালয়শৃঙ্গরাজির মাঝে এই উপত্যকায় স্থাপন করলেন নারায়ণের মন্দির। পাশেই লক্ষীর মন্দির। ছোট্ট প্রতিমাখানি ভারি সুন্দর। প্রাঙ্গণখানিও প্রশস্ত। একদিকে ভজন-কীর্তন হচ্ছে। একদিকে পূজান্তে যেসব উপকরণ জড় হয়েছে, আট-দশজন লোক বসে তাই বিভিন্ন স্তরে বাছাই করে রাখছেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন।

দেবস্থানের কি বিচিত্র মহিমা! ঐ বরফস্তুপের তলে একটি তপ্তকুণ্ড কেমন করে কোথা থেকে এল ? ঐটিও একটি আশীর্ব্বাদের ধারা। দেবতার স্নেহের পরশ যেন সর্ব্বত্র ছড়ান। কোন কিছুরই অসুবিধা নাই। কিছুর আকাঙ্খা মনে জাগলেই কি করে যেন পুরণ হয়ে যায়। মন্দিরের পাদদেশেই তপ্তকুণ্ড, তারপরে স্রোতস্বিনী অলকনন্দা বেগে বয়ে চলেছে। নদীর উপরে দুইটি কাঠের বেশ শক্ত পুল। ওপারে সেই গুহাটি দেখলাম, যেখানে নারায়ণ ভক্তকে বুকে টেনে নিয়েছিলেন। বেশ বড়ই গুহাটি। এখনও একজন সাধক সেখানে আছেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের দেখা হল না। পাহাড়ের বেশখানিক উপরে মৌনীবাবার আশ্রমে গেলাম. যাবার পথটি বেশ উপভোগ্য। পাথরে পা ফেলে ফেলে উপরে উঠবার চেষ্টা করছি, কিন্তু কি বীর বাতাস! ঠেলে দু-ধাপ নামিয়ে দিচ্ছে। গায়ের চাদর কোমরে জড়িয়ে. লাঠি হাতে করে আমরাও শেষে বীরসাজে সেজে কোনমতে আশ্রমে পৌছলাম। ওখানে সাধুবাবা অনেক চলা আছেন, বাবার কথা তাঁদের মুখেই শুনলাম। বঙ্কিম বাবার ধুনির আগুন রক্ষা করার জন্য কিছু কাঠ কিনে দিয়ে এল।

নদীর ওপারে ভারতের সীমান্ত রক্ষার জন্য মিলিটারীর বেশ বড় রকম একটি ঘাঁটি হয়েছে। পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় টহল দিয়ে বেড়ায় সীমান্ত-রক্ষীদল। দেখে আঁতকে উঠি আমরা। আমরা দু-দিনের জন্য এসেই বরফের ঠাণ্ডায় শীতে কাতর হয়ে ফিরবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠি। আর এরা আমাদের রক্ষার জন্য অহর্নিশ এই বরফ-রাজ্যে টহল দিয়ে বেড়াচ্ছে। মনে মনে এদের শ্রদ্ধা জানাই। বদরীনাথ উপত্যকাটি খুব ছোট নয়। যদিও মিলিটারীরাই অনেকখানি অধিকার করে নিয়েছে। আমরা যাবার কয়েকদিন আগেই বরফের বিশাল ঢল নেমে সমস্ত

জায়গাটিকে ভেঙেচুরে দিয়েছে। কিছু কিছু দোকান এবং পাণ্ডাদের বাড়ী তখনও সমাধিস্থ। আমাদের ঘরেরও অর্দ্ধেক বিরাট একটি বরফচাঁইয়ের নীচে চাপা পড়ে আছে দেখলাম। কেবল মন্দিরটি নিরাপদে রক্ষা পেয়েছে প্রকৃতির কোপ থেকে। ব্রহ্মকপালে বঙ্কিম বাবা, মা. পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদানাদি করল। কথিত আছে, ব্রহ্মকপালে পিণ্ডদান করলে আত্মা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়। অলকনন্দার পারে স্থানটি বড়ই উপযুক্ত। তিনদিন তিনরাত্রি বদ্রীনাথে বাস করে দেব-সান্নিধ্যের পরম তৃপ্তি নিয়ে ঘরে ফেরার আয়োজন চলল।

২রা জুন বদ্রীনাথ থেকে রওনা হয়ে এলাম। হরিদ্বারে দিন পাঁচেক থাকলাম। যাবার সময় তো হরিদ্বারে থাকা হয় নাই। ব্রহ্মদর্শনে যাবার এই যে সিংহদ্বার, এর মোহ কাটিয়ে যাওয়া কি সহজ?

নমঃ শিবায় শান্তায় জটাধরায় কারণ হেতবায় নমঃ ॥

আনন্দের অশ্রুজল

ডঃ রবীন্দ্রনাথ ভট্ট

১৯৫৬ সাল... ''বার্লিন অলিম্পিক।

তখন চলেছে মহিলা-বিভাগের সন্তরণ প্রতিযোগিতা। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে মেয়েদের ২০০ মিটার 'বাটার ফ্লাই' প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয়ে গেল।

প্রতিযোগিতা-শেষে এবার আরম্ভ হল পুরস্কার বিতরণ উৎসব—বিজয়িনী যুক্তরাষ্ট্র দুহিতা স্বর্ণপদক গ্রহণের জন্য বিজয়মঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন। মুখরিত হয়ে উঠল ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ তার জাতীয় সঙ্গীতে। বায়ু হিল্লোলে আন্দোলিত হতে লাগল তার জাতীয়পতাকা। বিজয়িনী আর তার দেশকে অভিনন্দন জানাতে বিশ্বসমাগত প্রতিনিধিগণ নীরবে দণ্ডায়মান হলেন।

সহসা দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়—"একি! মেয়েটি কাঁদছে কেন"? দেখা গেল শ্রাবণ-ধারার ন্যায় অশ্রুজলে প্লাবিত হয়ে যাচ্ছে তার গণ্ডদ্বয়। কিন্তু কেন? সাধনা তো আজ তার সার্থকতা লাভ করেছে। আজ যে তার আনন্দের দিন। হ্যাঁ সত্যই আজ তার আনন্দের দিন। কিন্তু নিরাশ অন্তরে আশাতিরিক্ত কিছু পাওয়া সম্ভব হলে মানুষের পুলকিত মন আনন্দসীমার বাঁধন হারিয়ে ফেলে এবং করুণাময়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা হৃদয়কে তার মথিত করে নয়নে এনে দেয় তখন আনন্দের এই অশ্রুজল। শেলীম্যানের (Shellymann) চোখেও বোধহয় এই আনন্দাশ্রুই দেখা গিয়েছিল।

এই প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হওয়ার মাত্র দুই দিন পূর্ব্বে অলিম্পিক ক্যাম্পের সান্ধ্যভোজের

আসরে কয়েকজন প্রতিযোগীকে পরস্পর আলাপরত থাকতে দেখা গেল। এই সময় তাঁরা সকলেই একে একে সঙ্গীদের নিকট উদ্ঘাটিত করে দিচ্ছিলেন স্বীয় জীবনের সাফল্যের ইতিহাস। অতঃপর এল শেলীম্যানের পালা। কুন্ঠিত কণ্ঠে শুরু করলেন তিনি জীবনের এক করুণ ইতিহাস—

শেলীম্যান তখন নিতান্তই শিশু। ভয়ঙ্কর পোলিও-মাইলাইটিস (Poliomyelitis) রোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। যথাযোগ্য চিকিৎসার পর রোগমুক্তি হল বটে কিন্তু দুরন্ত ব্যাধি হাত দুটিকে তার অক্ষম করে রেখে গেল। সামান্য হস্ত সঞ্চালনই তার কাছে তখন পরম বেদনাদায়ক। এই অবস্থায় চিকিৎসকের পরামর্শে তাকে সাঁতার শিখতে পাঠান হল। নিয়মিত অঙ্গ-চালনে যদি বাহু দুটিতে কিছু শক্তি ফিরে পাওয়া যায়।

হায়! বালিকা যেখানে সামান্য হাত দুটিকে তুলিতে অক্ষম, সেখানে কেমন করে সমর্থ হবে সে জলে সাঁতার দিতে? চলল তার আশা নিরাশার দ্বন্দ্ব। অসাধারণ ধৈর্য্য আর কষ্টের মধ্যে তার বিরামহীন প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে সে। অতঃপর এল সাফল্যের পালা। বালিকা জলে ভাসতে সক্ষম হয়। কিন্তু এইখানেই শেষ না করে সে নবীন উদ্যমে জলে অগ্রসর হওয়া শুরু করে।

একগজ, দু গজ করে দূরত্ব ক্রমশঃ দীর্ঘতর হয়ে বালিকা একদিন জলাশয় অতিক্রম করতে সক্ষম হল। সাফল্যের আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠল তার মন। হৃদয়ে তার সঞ্জীবিত হল দুর্ভাগ্যকে জয় করার এক দুরন্ত বাসনা। বালিকার দৃঢ় সংকল্প দুর্ভাগ্যকে জানাল তার উদাত্ত আহ্বান। দৃঢ় সঙ্কল্প আর দুর্ভাগ্যের প্রতিযোগিতায় দুর্ভাগ্যকে পিছনে ফেলে দৃঢ় সঙ্কল্পই বালিকাকে সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যায়।

তারপর শেলীম্যান প্রতিযোগিতার আসরে কোন এক অক্ষম প্রতিযোগী নয়। এই নাম এখন সাম্ভাব্য কৃতি প্রতিযোগীদের তালিকায় সবার উপরে থাকে—আর তা প্রমাণিতও হয় প্রতিটি প্রতিযোগিতায়।

অবশেষে এসেছে আজ জীবনের সেই চিরবাঞ্ছিত দিন। যে দিনটি সকল খেলোয়াড়ের সকল সময়ের স্বপ্ন-স্বরূপ। জীবনের প্রারম্ভে বালিকা এ দিনটির কথা কল্পনাতেও আনতে সাহস পায়নি। পারবে সে কি আজ সফল হতে জীবনের এই চরম ক্ষণটিতে।

হ্যাঁ, সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল বৈকি তার সাধনা। দুইদিন পর বিশ্বজনকে স্তম্ভিত করে অলিম্পিকে বিজয়িনীর স্বর্ণপদক লাভ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন তিনি। কৃতিত্বের সর্ব্বোচ্চ আসনে আরোহণ করতে কোনই ত্রুটি হয়নি তাঁর।

সেইজন্যই বোধহয় শেলীম্যানের চোখে দেখা গিয়েছিল চিরানন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ আনন্দের ঐ অশ্রুজল।

বাঙ্গলা ও বাঙ্গালীর কথা

হেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

পশ্চিম বাঙ্গলার ভাগ্যনিয়ন্তা—

গত কিছুকাল হইতে বাঙ্গলার সর্ব্বশক্তিমান কম্যু-এম নেতা 'কোসিগিন' শ্রীজ্যোতি বসুর কথাবার্ত্তায় এই ধারণাই সকলের হইবে যে তিনি এবং তাঁহার দলই (সি পি এম) এ রাজ্যের সকল প্রকার শাসন এবং প্রশাসন ব্যাপারে যাহা স্থির করিবেন, তাহাই হইবে চরম ও সর্ব্বশেষ কথা এবং বাঙ্গলার আবালবৃদ্ধবনিতা ধনী দরিদ্র সকলকেই তাহা দ্বিরুক্তি না করিয়া অবনত মস্তকে মানিয়া লইতে হইবে। সি পি এমের নেতৃত্ব যাহারা স্বীকার করিবে না, সি পি এম-এর ডিমক্রেসীর আলখাল্লা-পরিহিত-চরম ডিক্টেটারী মতবাদে যাহারা আপত্তি করিবে, তাহাদের গলায় লাল ন্যাকড়া-বাঁধা সি পি এম জনমার বাহিনীর হাতে সর্ব্বপ্রকার নিগ্রহ ভোগ করিবার জন্য সদা প্রস্তুত থাকিতে হইবে, ইহাতে কাহারও কোন আপত্তি, এমন কি তথাকথিত যুক্তফ্রণ্টের অন্য কোন শরিকদলের কোন সামান্য আপত্তিও সি পি এম নেতৃত্ব সহ্য করিবে না!

পশ্চিম বাঙ্গলার বর্ত্তমানে সি পি এম নীতি এবং কার্য্যক্রম দেখিয়া আমাদের মনে পড়িতেছে ১৯৩৬ সালে স্পেনের কথা। এই সময় স্পেনে কমিউনিষ্ট তৎপরতা ক্রমবৃদ্ধির মুখে এবং এই দেশের কমিউনিষ্ট পার্টি দেশব্যাপী অরাজকতা সৃষ্টি করিয়া দেশকে পুরাপুরি কমউনিষ্ট রাষ্ট্রে পরিণত করিতে প্রয়াস পাইতে থাকে। এ বিষয়ে একজন বিশ্ববিখ্যাত লেখক এবং রাজনীতিবিদের বক্তব্যের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা অবান্তর হইবে না। ইংলণ্ডের গত যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী বিশ্ববিখ্যাত নেতা চার্চিল বলিয়াছেন :

It is part of the Communist doctrine and drill-book, laid down by Lenin himself, that communists should aid all movements towards the Left and help into office weak Constitutional, Radical or Socialist Governments. These they should undermine, and from their falling hands snatch absolute power and found the Marxist State. In fact, a perfect reproduction of the Kerensky period in Russia was taking place in Spain...

এই অবস্থার সহিত অদ্যকার পশ্চিম বঙ্গ তথা কেন্দ্র সরকারের বর্ত্তমান অবস্থার কোন সাদৃশ্য আছে কি না পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারেন। স্পেনে কমিউনিষ্ট তৎপরতা বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে

Many of the ordinary guarantees of Civilised Society had already been liquidated by the Communist perversion of the decayed Parliamentary Government. Murders began on both sides, and the Communist pestilence had reached a point where it could take political opponents in the streets or from their beds and kill them. Already a large number of these assassination had taken place in and around Mardrid

উপরে বর্ণিত স্পেনের রাজনৈতিক অবস্থার সহিত বর্ত্তমান পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা হুবহু মিলিয়া যাইতেছে কিনা বিচার করিয়া দেখা যাইতে পারে। স্পেনের কমিউনিষ্ট বিদ্রোহীদের সহিত তৎকালীন সরকারী শক্তির সংগ্রামে ঐ দেশের দুর্ব্বল সরকারী প্রশাসন ব্যবস্থা প্রায় লুপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে

In the collapse of Civilized Government the Communist sect obtained control and in accordance with their drill, Bitfter civil war now began. Wholesale cold-blooded massacres of the political opponents and the well to do, were performed by the communists who had seized power. Those were REPAID WITH INTEREST by the forces under Franco...

স্পেনের ইহার পরের ইতিহাস অনেকেরই হয়ত জানা আছে। বর্ত্তমানে আমাদের প্রশ্ন এইযে পশ্চিম বঙ্গে কমিউনিষ্ট, বিশেষ করিয়া সি পি এম তৎপরতা এবং অপ-প্রয়াস দেশকে কোথায়, কোন পরিণতির দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে তাহা দেশবাসীর অবিলম্বে ভাবিয়া দেখা এবং প্রতিরোধ ব্যবস্থাও গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর্ব্বশ্রীজ্যোতি বসু, প্রমোদ দাসগুপ্ত, সুন্দরাইয়া প্রভৃতি কথায় কথায় ভারতীয় সংবিধানের দোহাই দিয়া 'গনতন্ত্র ধ্বংস হইল বলিয়া চিৎকার করেন এবং সেই সঙ্গে সংবিধান তথা গণতন্ত্র রক্ষা করিবার পবিত্র প্রতিজ্ঞাও লইতেছেন। সি পি এম নেতারা ভারতীয় সংবিধানকে মৌখিক স্বীকৃতি দেন, কারণ এই সংবিধান স্বীকার না করিয়া তাহা ধ্বংস করিবেন কি করিয়া? এই বিজাতীয় আদর্শে এবং ভারত-বিদ্বেষী নীতিতে অনুপ্রাণিত দেশদ্রোহীরা ত বহুবার ভারতীয় সংবিধানকে গোল্লায় দিয়া পবিত্র কমিউনিজম্ প্রতিষ্ঠা করিবার ইচ্ছা ঘোষণা করিয়াছে কেরল-সিংহ নামবুদ্রিপাদ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন যে কেন্দ্র সরকারে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দল ভারতীয় সংবিধানকে ধ্বংস করিয়া কম্যুমন্ত্রপূত এক নূতন সংবিধান রচনা করিবেন। এই নব-সংবিধানে দেশের সর্ব্বাত্মিক প্রশাসন ক্ষমতা ন্যস্ত হইবে, বর্ত্তমানে পীড়িত এবং বঞ্চিত শ্রমিক সমাজের উপর! অর্থাৎ-সেই কয়জন কম্যুনেতার উপর যাহারা বিবিধ প্রকার রসাল স্তোকবাক্যে শ্রমিকদের প্ররোচিত করিয়া দেশের ডিক্‌টেটাররূপে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিবেন সকল ক্ষমতার একছত্র অধিকারী হইয়া!

রাশিয়া, চীন তথা অন্য সবকয়টি কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি দিলেই যে কেহ দেখিতে এবং বুঝিতে পারিবেন ঐ সকল স্বর্গ-রাজ্যে সাধারণ মানুষের প্রকৃত অবস্থা কি এবং তাহারা কতটুকু স্বাধীনতার অধিকারী। যে-শ্রমিক স্বার্থ এবং কল্যাণের কথা প্রচার করিয়া পশ্চিমবঙ্গে তথা ভারতের অন্যত্র কম্যুট্রেড ইউনিয়ন নেতারা শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট এবং অন্যবিধ হিংসাত্মক ক্রিয়া কর্ম্মে প্ররোচিত করেন অহরহ, খাস কম্যু রাষ্ট্রগুলিতে সেই শ্রমিকদের কতটুকু ব্যক্তি স্বাধীনতা আছে? কিছুই নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে কি?

সি পি এমের মতলব কি সে-বিষয় অধিক কিছু বলার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এ বিষয় সংসদ সদস্য সি পি এম নেতা শ্রীঅমর গুহের সহিত আমারা একমত। শ্রীগুহ বলেন:

"মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া পশ্চিম বঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সি পি এমের উপর নির্ভরশীল, সি পি এম সেই সুযোগ নিচ্ছে।"

শ্রীগুহ আরো বলিয়াছেন যে-"পশ্চিম বঙ্গের ভূমি ও ভূমি-রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঁঙার ও সি পি এম জেনারেল সেক্রেটারী শ্রীপ্রমোদ দাসগুপ্ত পাঁচ (?) লক্ষ লোকের এক জনসভায় ঘোষণা করেন-ট্রেড্ ইউনিয়ানের স্বেচ্ছাসেবকদের ভিয়েৎনামে এন্ এল এফের মত শীঘ্রই বিপ্লবী সেনাবাহিনীর দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে!"—একথা অনেকেই জানেন এবং দেখিতেছেন যে পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চলে সি পি এম স্বতন্ত্র প্রশাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছে, 'গন-আদালতের কীর্ত্তির কথাও আজ আর পশ্চিম বঙ্গবাসীর অজানা নহে।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অজয়বাবু পশ্চিমবঙ্গের বর্ত্তমান অবস্থা এবং সাধারণ মানুষের দুর্দ্দশার কথা বারবার প্রকাশ্যে এমন কি বিধান সভাতে সহজ সরল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। রাজ্যের বর্ত্তমান "বর্ব্বর এবং অসভ্য"

সরকার (Rogue-) রোগ মুক্ত করিয়া আবার সুস্থ সুন্দর স্বাভাবিক এবং সভ্য সরকারে রূপান্তরিত করা অজয়বাবুর সাধ্যাতীত নয় বলিয়া মনে করি। মনস্থির করিয়া তিনি দৃঢ় হস্তে রাজ্যের প্রশাসনরজ্জু গ্রহণ করিতে কেন ভয় পাইতেছেন জানি না। সাধারণ মানুষের সহ্যের একটা সীমা আছে-এই সীমা কোথায় কবে এবং হঠাৎ কেমন ভাবে ভাঙ্গিয়া যাইবে কেহ বলিতে পারে না। একবার জনসহ্যের সীমা ভাঙ্গিলে যে মহা প্লাবন আসিবে, তাহাতে সি পি এম তথা জ্যোতি বসুর দল নিস্তার পাইবে না। জ্যোতিবাবু হয়ত সময় বুঝিয়া পিকিং প্রয়াণ করিবেন।

রিপ ভ্যান উইন্‌কিল্

আমাদের পরম সৌভাগ্য এবং সুভাষচন্দ্রের পিতৃপুণ্যের ফলে শ্রীজ্যোতি বসুর মাত্র ত্রিংশ বছর সুখনিদ্রার পর হঠাৎ নিদ্রা ভঙ্গ হইয়াছে! গত যুদ্ধের সময় জ্যোতি বসুর অনুচরদের কলিকাতার পথে ঘাটে ট্রামেবাসে বড় বড় কলকারখানার ময়দানে, ক্যানটিনে সুভাষচন্দ্রের শ্রাদ্ধ ব্যবস্থা 'ক প্রবল এবং ব্যাপকভাবে কমিউনিষ্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়া করে, তাহা অদ্যকার সকল যুবকদের হয়ত জানা নাই, বর্তমান বাঙ্গালী যুবসমাজের অনেকেরই হয়ত ১৯৪৩ সালে জন্ম হয় নাই, যাহাদের হইয়াছিল তাহারা সেই সময় নেহাত কোলের শিশু। সে-দিনের কম্যু দল জাতীয় স্বার্থ, দেশের চিরন্তন অমর আদর্শের কথা এবং নিজেদের পিতৃপুরুষদের পুণ্যস্মৃতি বিস্মৃত হইয়া বিদেশী, বিজাতীয়, তথাকথিত মহাপুরুষদের পিতার আসনে বসাইয়া জাতীয় ঠাকুরদের 'কুকুর' বলিতে লজ্জাবোধ করে নাই এবং সেই জন্যই তাহারা—সর্বস্ব-ত্যাগী জাতির কল্যাণে, স্বার্থে নিবেদিতপ্রাণ বীর সুভাষ চন্দ্রকে জাতিদ্রোহী, কুইস্‌লিং এবং অন্যপ্রকার বহুবিধ বিশেষণে বিভূষিত করিতে বিন্দুমাত্র লজ্জাবোধ করে নাই। এই কম্যুদলের নেতাদের মধ্যে শ্রীযুত জ্যোতিবসু, মহাত্মা ডাঙ্গে এবং অদ্যকার সুপরিচিত কুখ্যাত বহু 'জনদরদী' বিদেশ-প্রেমীরাও ছিলেন! আজ হঠাৎ কি কারণে জ্যোতি বসু মহাশয়ের সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে মতের পরিবর্তন হইল এখনই বলা সম্ভব নহে, তবে এমত পরিবর্তন যে মতলবী তাহা অবশ্যই বলা যায়। একথা আমরা নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে কম্যুদের, বিশেষ করিয়া সি পি এম দল ভুক্ত প্রভুদের প্রতিটি কথা, প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, প্রতিটি চাল, সবই তাহাদের কুমতলব এবং জাতি ও দেশের ক্ষতিকর উদ্দেশ্যসাধনের কারণেই হইয়া থাকে।

আমরা ভূতের মুখে রামনাম ইতিপূর্বে অনেক শুনিয়াছি, বর্তমান ক্ষেত্রে আবার একবার শ্রবণ করিয়া ধন্য হইলাম! মানুষের পক্ষে ভূতের মনের কথা বুঝা অসম্ভব, আজ যে-ভূত হঠাৎ দায়ে পড়িয়া রাম নাম করিতেছে, আগামী কাল সেই ভূতই আবার রামকে 'মরা মরা বলিবে না কে বলিতে পারে? ভূত যদি মনে করিয়া থাকে যে মানুষ তাহার মুখে রাম নাম শ্রবণ করিয়া, তাহাকে একান্ত আপনজন বলিয়া গ্রহণ করিবে তাহাকে বিশ্বাস করিবে পূর্ণভাবে এবং খোলামনে তাহা হইলে ভূত ভুল করিতেছে! ভূত যেমন মানুষের কাছে ভূত ছাড়া আর কিছুই নহে, 'কম্যু'রাও তেমনি আমাদের কাছে 'কম্যু'ছাড়া আর কিছুই নহে এবং এই কম্যুদের নিকট হইতে দেশ এবং জাতি কল্যাণকর কিছুই আশা করিতে পারে না। এ-আশা যদি কেহ কণামাত্রও মনে পোষণ করে তবে, শেষতক ভূতই তাহার ঘাড় মটকাইবে সময় মত, একথা মনে রাখা দরকার!

শ্রীজ্যোতি-বসু তথা অন্য কম্যুরা একদা-ঘৃণিত কুইসলিং' সুভাষচন্দ্রকে আজ হঠাৎ কেন পুনর্বাসন দান করিলেন, বুঝা কঠিন নহে। দেশের এবং মানুষের মনের গতি যে-ভাবে পরিবর্তিত হইতেছে, তাহাতে কম্যুদের অবস্থা অচিরে এক ভয়াবহ সমস্যার সম্মুখীন হইতে বাধ্য। জ্যোতি বসুর মত পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু পার্টির ব্রেজনেভ প্রমোদ দাসগুপ্তের শ্রীমুখ হইতে সুভাষ সম্পর্কে নূতন কোন কথা এখনও শুনা যায় নাই। প্রমোদবাবু যদি জ্যোতি বসুকে

সমর্থন না করেন, তাহা হইলে জ্যোতি বসু কি পাটি হইতে বিতাড়িত হইবেন? এ বিষয় নূতন আরো কিছু শুনিবার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

বিচিত্র এই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য!

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপমুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে গত কিছুকাল হইতে যে প্রকার সদ্ভাব এবং যে ভদ্র ভাষায় পত্র বিনিময় হইতেছে, তাহাকে এককথায় অপূর্ব্ব অভিনব ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না! রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রীকে ধমক দিয়া বলিতেছেন—"সাবধান! বেশী বাড়াবাড়ি করিবেন না। সীমা ছাড়াইয়া গেলে আপনাকে যথোচিত ফল ভোগ করিতে হইবে! অন্যদিকে মুখ্য-মন্ত্রী বলিতেছেন কোন মন্ত্রীর বেয়াদবী এবং বেয়াড়াপনা তিনি সহ্য করিবেন না। প্রশাসন ব্যবস্থা সুষ্ঠুভাবে চালু রাখিবার জন্য প্রয়োজনমত তিনি তাঁহার মন্ত্রীমণ্ডলীর যে-কোন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন! —এখন পর্যন্ত (১৪-২-৭০) আমরা পশ্চিমবঙ্গে মন্ত্রীমণ্ডলীতে যাত্রার দলের গদাযুদ্ধই দেখিতেছি সমস্ত ব্যাপারটিকে একটা প্রহসন বলিয়া লোকে মনে করিতেছে। একদিকে এই প্রহসন, অন্যদিকে রাজ্যের জনজীবন আজ অসহনীয় অবস্থায় জর্জ্জরিত হইতেছে। কলিকাতা এবং পশ্চিম বঙ্গের অন্যত্র প্রত্যহ দু-চারিটা খুন, দশ পনেরটা জখম, গোটা বিশেক ডাকাতি, শ'খানেক চুরি চামারি, ঘেরাও, ধর্মঘট এবং ধর্ম্মঘটের হুমকী - স্থানে স্থানে বিভিন্ন দলের সমর্থকদের মধ্যে রেগুলার ষ্ট্রীটফাইটিং (বিশেষ করিয়া কলিকাতার বিশেষ দু-চারটি অঞ্চলে) - সব রকম অনাচার অত্যাচার, প্রশাসনিক ব্যভিচার বেপরোয়া ভাবে অনুষ্ঠিত হইতেছে।

রাজ্যের অবস্থা দেখিয়া শাসকদলগুলির এক অংশ বলিতে বাধ্য হইয়াছে - পশ্চিম বঙ্গ বর্ব্বর, অসভ্য সরকারের হাতে পড়িয়াছে। আর এক অংশ বলিতেছেন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ঠিকই আছে, প্রশাসনেও কোন গলদ নাই অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে বর্ত্তমানে যাহা প্রত্যহ ঘটিতেছে, তাহা একমাত্র সভ্য এবং অ-বর্ব্বর সরকার থাকিলেই ঘটিতে পারে।

মুখ্য মন্ত্রীর হুমকীর জবাবে ব্রেজনেভ প্রমোদ দাস গুপ্ত বলেন যে "পশ্চিম বঙ্গ তোঘলকি মুলুক নয় যার যা খুশি তাই করা যাবে!" ঠিক কথা! মঘের মুলুককে হঠাৎ তোঘলকি মুলুকে পরিণত করা চলিবে না! এ-রাজ্যে একমাত্র সি পি এম অর্থাৎ ঐ পার্টির সর্ব্বাধিনায়করা যখন যাহা খুশি করিতে পারিবেন - কারণ তাহাদের সদস্য (বিধান সভায়) সংখ্যা (২৮০র মধ্যে) ৮৩ জন! অর্থাৎ এই ৮৩ জন সি পি এম সদস্যই আসলে সমগ্র বাঙ্গলা এবং বাঙ্গালীর প্রতিনিধি, অন্য শরিকদলগুলিকে নেহাত দয়া করিয়া স্থান দেওয়া হইয়াছে বিধান সভায়!

জ্যোতি বসু তথা সি পি এম এর মতে মন্ত্রীমণ্ডলীর সকলসদস্যের সমান অধিকার এবং নামে মুখ্যমন্ত্রী হইলেও আসলে তিনি অন্যান্য মন্ত্রীদের সমান কোন, বিশেষ অধিকারী তিনি নহেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী মনে করেন - প্রয়োজন হইলে তিনি তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে অবশ্যই পারেন।

মন্ত্রীমণ্ডলীকে একটি ফুটবল টিমের সহিত তুলনা করা যইতে পারে। এই টিমে একজন ক্যাপ্টেন নির্ব্বাচিত হয়েন, তিনি কোন খেলোয়াড় কোথায় অর্থাৎ কি পোজিসনে' খেলিবেন তাহা ঠিক করিয়া দেন কিন্তু টিমের অন্যান্য প্লেয়াররা যদি হঠাৎ ঠিক করে মাঠে সব খেলোয়াড়ের সমান অধিকার এবং যে যার নিজের ইচ্ছামত স্থানে খেলিতে পারে —তবে অবস্থাটা কি হয় ভাবিয়া দেখুন! ১১ জন খেলোয়াড়ই গোলরক্ষক কিংবা সেণ্টার হাফ্ ব্যাক অথবা সেণ্টার ফরোয়ার্ড - হইতে চাহিলে তাহাদের ঠেকাইবে কে? খেলাটা কেমন জমিবে কল্পনা করুন।

আসলে সি পি এম গোষ্ঠির মন্ত্রীদের মধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে তাঁহার ন্যায্য এবং সাংবিধানিক ক্ষমতা এবং অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবার প্রবল প্রয়াস দেখা যাইতেছে! এ-বিষয়ে শ্রীজ্যোতি বসু ও তাঁহার পার্টির ব্রেজনেভ প্রমোদ দাসগুপ্তই—প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বারবার বলিতেছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁহার বিশেষ ক্ষমতার বলে মন্ত্রীদের

দপ্তর অদল বদল করার পূর্ণ অধিকার আছে। তাহাই যদি হয়, তবে কেন তিনি অবিলম্বে রাজ্যের পুলিশ দপ্তর জ্যোতিবাবুর হাত হইতে লইয়া অন্য কোন বিচক্ষণ এবং ন্যায়পরায়ণ মন্ত্রীর হাতে দিতেছেন না? পশ্চিম বঙ্গের পুলিশ আজ বাস্তবে সি পি এম এর দলীয় বাহিনী ছাড়া আর কিছুই নহে। পুলিশ মন্ত্রী জ্যোতিবসুর সর্বপ্রকার আদেশ নির্দেশ মতই পুলিসকে চলিতে বাধ্য করা হইয়াছে। সাধারণজনের নিরাপত্তা এবং রাজ্যের শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার প্রধান দায়িত্ব পুলিসের কিন্তু আজ বাস্তবে কি দেখা যাইতেছে? সর্বপ্রকার অনাচার, হামলাবাজী, গুণ্ডামী এবং বেপরোয়া জনতার রাজপথে প্রকাশ্য লড়াই ঘটিতে দেখিয়াও কর্তার হুকুমে পুলিসকে হাতগুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হইতেছে! অবস্থা আজ এমনই হইয়াছে যে জনতার হাতে পুলিসই মার খাইতেছে, জনতা পুলিসকে তাহাদের আস্তানায় আক্রমণ করিয়া বেদম ঠেঙ্গাইতেছে, আত্মরক্ষার জন্য পুলিস আজ প্রাণভয়ে অন্ধকারে আত্মগোপন করিতেছে। পৃথিবীতে পুলিসের এমন প্রচণ্ড বিক্রম অন্য কোথাও আর দেখা যাইবে না। পুলিস মন্ত্রী এবং তাহার আজ্ঞাবাহী পুলিসের গুণের কথা আজ সর্ব্ববিদিত, এ-বিষয়ে আর বেশী বলিবার প্রয়োজন নাই।

বর্তমান অবস্থায় অজয়বাবুর প্রতি বাঙ্গলার উৎপীড়িত জনগণের একমাত্র কাতর নিবেদন এই মাত্র যে- হে মুখ্যমন্ত্রী! আপনার বিশেষ অধিকারের (মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে) কথা বার বার ভীমকণ্ঠে ঘোষণা না করিয়া, আত্মবিশ্বাস (যদি থাকে) লইয়া পুলিস মন্ত্রীকে এখনই পদচ্যুত করুন এবং তাঁহার হাজারো প্রকার অবৈধ কার্য্য এবং অনাচারের অপরাধে তাহাকে বিশেষ আদালতে কাঠগড়ায় দাঁড় করান।

এই একটি মাত্র 'অ্যাকশনের' দ্বারাই অজয়বাবু তাঁহার অধিকার ও ন্যায়সঙ্গত ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হইবেন। কিন্তু হায়! আমাদের এ-আশা পূর্ণ হইবে না এবং বাঙ্গালার দুঃখ দুর্দ্দশারও কোন প্রতিকার শীঘ্র হইবে বলিয়া মনে হয় না। সন্দেহ হইতেছে মুখ্য মন্ত্রী তাঁহার উপমুখ্যমন্ত্রীকে মনে মনে ভয় করেন।

পশ্চিম বঙ্গে রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্য্যয়

"যুগজ্যোতি সাপ্তাহিকের সম্পাদকীয় মন্তব্যে বাংলার বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতির যে বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা আংশিকভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল.

পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট শাসনের সর্ব্বাপেক্ষা অনিষ্টকারী অবদান হইতেছে জনগণের মনোবল চূর্ণ করিয়া ফেলা। কংগ্রেসের দুর্নীতিমুলক শাসন ও শোষণের প্রতিক্রিয়ার যে আমূল পরিবর্ত্তন ঘটাইবার দৃঢ় সঙ্কল্প জনমনে দানা বাঁধিয়া উঠিতেছিল, বামপন্থীদের তেরমাসের যথেচ্ছাচার তাহার বিলুপ্তি ঘটাইয়াছে। কংগ্রেসের অবিচার স্বজন পোষণ ও দুর্নীতিমুলক শাসন ব্যবস্থার স্মৃতির উপর এই কয় মাসের বিভীষিকাময় অভিজ্ঞতা বিস্মৃতির যবনিকা টানিয়া দিয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের অবিচার, অসম ব্যবহারও পশ্চিমবঙ্গকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করিয়া অনগ্রসর রাজ্যে পরিণত করিবার সুকৌশলী পরিকল্পনা জনমনে বিদ্রোহের সঞ্চার করিয়াছিল এবং সংগ্রামী মনোভাব ক্রমশঃই দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল। যুক্তফ্রন্ট কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সর্ব্বাত্মক সংগ্রামে নেতৃত্ব দিবার প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় বিপুলভাবে জনসমর্থন লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহাদের শাসন ব্যবস্থার ফলে যে কেন্দ্রীয় সরকারকে জনগণ শত্রু বলিয়া চিহ্নিত করিয়াছিল তাহাকেই শেষ পর্য্যন্ত যুক্তফ্রন্টি কুশাসন হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র আশাভরসার স্থল বলিয়া তাহারা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আজ সাময়িকভাবে পশ্চিমবঙ্গে জনগণের রাজনৈতিক চৈতন্য পুনরায় জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা তাহাদের অভাব অভিযোগের কথা ভুলিয়াছে, তাহাদের ন্যায্য মৌলিক দাবীগুলি মূক হইয়া গিয়াছে, নুতন শোষণহীন সমাজ গঠনের আশা আকাঙ্খা অন্তর্হিত হইয়াছে। আজ তাহাদের একমাত্র প্রার্থনা—"শান্তি দাও, স্বস্তি দাও, মানুষের মত না হউক অন্তত: পশুর মতও নির্বিঘ্নে বাঁচিয়া থাকিবার অধিকারটুকু ফিরাইয়া দাও।" ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রসর রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ এবং রাজনৈতিক আদর্শবাদীর চিন্তার ধারক ও বাহক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সমগ্র ভারতের পথপ্রদর্শক বাঙালী জাতির পক্ষে এযে কতবড় মর্ম্মান্তিক সর্ব্বনাশকর ঘটনা তাহা চিন্তা করিয়া শিহরিয়া উঠিতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের এই শোচনীয় অধঃপতন ঘটাইবার সর্ব্বাধিক দায়িত্ব মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দলের। ক্ষমতার প্রতিষ্ঠিত যুক্তফ্রন্টের দলগুলির মধ্যে অবিসংবাদীভাবে সর্ব্ববৃহৎ দল হইবার সুযোগ লাভ করিয়া তাহারা ক্ষমতার নেশায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। যে দলগুলির সহায়তায় শক্তিশালী কংগ্রেস দলকে বিপর্য্যস্ত করা সম্ভব হইয়াছিল, তাহারা সেই দলগুলিকেই অবিলম্বে শক্তিহীন করিয়া পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ক্ষেত্র হইতে তাহাদের বিতাড়িত করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল। যে জনগণের সমর্থনে তাহারা ক্ষমতা লাভ করিয়াছিল তাহাদের নিষ্করুণভাবে নিষ্পেষিত করিয়া তাহাদের রাজনৈতিক বিচার বুদ্ধি ও চৈতন্য হরণ করিয়া তাহাদের দাসে পরিণত করিতে উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিয়াছিল। সমাজের নিম্নস্তরের অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের উচ্ছৃংখলতা ও সন্ত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করিয়া স্বীয় ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির সুযোগ দিয়া তাহাদের পাশবিক শক্তির সাহায্যে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে মার্ক্সবাদী কম্যুনিষ্ট দলের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা তাহারা গ্রহণ করিয়াছিল। লুণ্ঠনকারী নারীধর্ষণকারী নরখাদক রাক্ষস প্রবৃত্তির সমাজবিরোধীদের অনাচার ও অপরাধকে শ্রেণীসংগ্রাম নামে অভিহিত করিয়া তাহারা আদর্শবাদী তরুণদের বিভ্রান্ত করিয়া, তাহাদের সাহায্যে স্বীয় ক্ষমতা

কায়েমী করিবার স্বপ্ন দেখিতেছিল। কিন্তু মদগর্ব্বে অন্ধ হইয়া নিজের শক্তিকে অত্যুচ্চ কল্পনা করিয়া আজ তাহারা নিজেদেরই ধ্বংস ডাকিয়া আনিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী আজ জনজীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তা রক্ষায় সমর্থ শক্তিশালী শাসন ব্যবস্থা চায়। তাহার জন্য সুদীর্ঘকাল কেন্দ্রীয় শাসনে থাকিতে অথবা সামরিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে তাহাদের আপত্তি নাই। এই শোচনীয় মানসিক বিকার মানুষকে জরাগ্রস্ত করিয়াছে ও সে তাহার মৌলিক অধিকার পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে। বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্রনীতিবিদের বাণী। "Good Government is never a substitute for self Government (কল্যাণকর শাসনব্যবস্থা কখনই স্বায়ত্ব শাসনের বিকল্প হইতে পারে না।")ভারতের জনগণকে উদ্বুদ্ধ করিয়া ছিল আজ আর তাহা আমাদের অন্তর স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। বরং ১৯০৮ সালের ৯ই অক্টোবর গান্ধীজী মাদ্রাজ গভর্ণরকে যাহা লিখিয়াছিলেন —"কে ভারত শাসন করিতেছে তাহা লইয়া আমি মাথা ঘামাইনা, ভারত কিভাবে শাসিত হইতেছে তাহাই একমাত্র বিষয়" এবং যাহা ভারতে বিশেষ করিয়া বঙ্গদেশে রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন ব্যক্তিদের অন্তরে বিক্ষোভের ঝড় তুলিয়াছিল, তাহাই আজ পশ্চিমবঙ্গবাসীর নিকট সত্য বলিয়া প্রতিভাত হইতেছে। ইহার ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে অরাজকতা আদর্শহীনতা ও জড়ত্বের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা পশ্চিমবঙ্গকে ভাগ্যান্বেষী সুযোগ-সন্ধানী স্বার্থলোলুপ ব্যক্তিদের শিকারক্ষেত্রে পরিণত করিবে এবং পশ্চিমবঙ্গের জনগণ পুনরায় আনন্দের সহিত লৌহশৃঙ্খল কণ্ঠে ধারণ করিবে।

যুক্তফ্রণ্টের রাজশক্তির অবসান

'ময়ূরাক্ষী" পত্রিকা উক্ত বিষয়ে বলিতেছেন

অবশেষে যুক্তফ্রণ্টের অবসান ঘটলো এবং রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম হল পশ্চিমবাংলায়। এর জন্য দায়ি কে? দায়ি সব দলগুলিই, বিশেষ করে সি-পি-এম। ১৪ পার্টির যুক্তফ্রণ্ট হয়েছিল—৩২ দফা কর্ম্মসূচি রূপায়নের জন্য, যৌথদায়িত্বে সরকার চালানর জন্য। কিন্তু কাজে দেখা গিয়েছে যে এলেকায় যে পার্টির সমর্থক বেশী সেখানে তারা মনে ক'রেছে আমার পার্টিই সরকার। সেখানে যা খুশী তাই করেছে, যেন পৈত্রিক সম্পত্তি। ক্ষমতার বিকৃত ও অন্ধ মনোভাবের ফলে শ্রেণী সংগ্রামের নামে সুরু হল সন্ত্রাস। তীর ধনুক বল্লম লাল ঝাণ্ডাসহ গ্রামীন গরীবদের সাঁওতাল বাগ্দী ডোম প্রভৃতি সমাজের নীচুতলার লোকদের সমাবেশ গুলিতে এমন ভাব দেখাল, যেন গরীবের রাজ কায়েম হয়েছে। তাই তাদের উত্তেজিত করে গ্রামের ধনীদের ভয় দেখাল আমাদের পার্টিকে সমর্থন কর, আমাদের মোটা টাকা চাঁদা দাও, নইলে এই গরীবদের, তোমাদের পিছনে লাগিয়ে দেব। আমার পার্টিই একমাত্র তোমাদের রক্ষাকর্ত্তা, অন্য পার্টিগুলি কিছু নয়। কোন কোন জায়গায় এক এক দল জোতদারদের সাহায্য নিয়েও অন্য দলগুলিকে উৎখাত করার চেষ্টা করেছে। রাজ্যে সি-পি এম বড় দল, প্রধান দপ্তর ছিল ঐ পার্টির হাতে, সেগুলির পূর্ণ সদ্ব্যবহার তারা করেছে। অন্য দলগুলিও কম যায় না যে পার্টির যে দপ্তর ছিল তার পূর্ণ সুযোগে নিজ পার্টি বাড়িয়েছে যখন দেখা গেল সি-পি-এম এর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছি না। ওরা খুব বেড়ে যাচ্ছে। প্রধান প্রধান দপ্তর ওদের হাতে থাকায় দুযোগ সন্ধানী লোকগুলি ওদের দিকেই ভিড়ছে। শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে অন্য দলের ট্রেডইউনিয়নগুলি গায়ের জোরে দখল করছে তখন মনে পড়লো স্বরাষ্ট্রদপ্তর এদের হাতে রাখা চলবে না। তাই ষড়যন্ত্র চললো যুক্তফ্রণ্ট ভাঙতে হবে—নইলে সি পি এম এর গহ্বরে ঢুকতে হবে।

সি-প-এম বড় দল হিসাবে দায়িত্ব পালন করেনি। বাংলাকংগ্রেসকে নিয়ে ফ্রণ্ট করবো আর বাংলা কংগ্রেসের ঘাড়ে বন্দুক রেখে শ্রেণী-সংগ্রাম করবো এ কিধরনের অযৌক্তিক ব্যবহার। মার্কসিষ্ট দলগুলি যাদের ভোটে গদিতে গিয়েছেন সেইসব মধ্যবিত্ত চাষী বুদ্ধিজীবি প্রভৃতিদের স্বার্থ কেন বাংলা কংগ্রেস দেখবে না। মন্ত্রীত্বের লোভে বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলাব অথচ লেলিনবাদের সন্ত্রাস সৃষ্টি করবো, এ চলতে পারে না।

ভূমি সংস্কারের নামে জবরদস্তি জমি দখল করে নিজ পার্টির অনুগতদের জমি দেব এইটাই কি যুক্তফ্রন্টের নীতি ছিল? তাই শ্রেণী সংগ্রামের নামে চলেছিল সরিকী সংঘর্ষ যার ফলে বিভিন্ন পার্টির বহু সর্বহারার জীবন গেল।

যুক্তফ্রন্ট সরকার কোন ভাল কাজ করেনি একথা ঠিক নয়। জনস্বার্থের অনুকূলে অনেক কাজে তারা হাত দিয়েছিল। সাধারণ মানুষের মনে আশা আকাঙ্ক্ষা জাগিয়েছিল কিন্তু সেগুলি আর বিধান সভাতে তারা উপস্থিত করতে পারল না জনসাধারণ যুক্তফ্রন্টকে ক্রুট মেজরিটি দিয়েছিল কিন্তু এত জনসমর্থন থাকা সত্ত্বেও আত্মকলহে ফ্রন্ট ভেঙে গেল। এর প্রায়শ্চিত্ত সব দলকেই করতে হবে। যে জনগণের কথা বিপ্লবী দলগুলি বা বাংলা কংগ্রেস সবাই বলে সেই জনগণের কাছে আজ দলবাজী ধরা পড়েছে। নীচু তলার লোকদের জাগরণ এসেছে,উপস্থিত দিশেহারা তবে অচিরে তারা বুঝবে কারা বেইমানী করল। সেদিন কোন দলই ক্ষমা পাবে না। বাংলা দেশে যুক্তফ্রন্ট ছাড়া গত্যন্তর নাই। সে যে যুক্তফ্রন্ট হোক। গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী বা মার্কসবাদী অপর একটি ফ্রন্ট গড়ে উঠবে। তবে একথা ঠিক বর্ত্তমান অবস্থায় কেবল সর্বহারাদের নিয়ে বা কেবল তাদের সমর্থনে কোন সরকার টিকবেনা। সন্ত্রাস সৃষ্টি করে আইনানুগ সরকার চলে না—সংগ্রাম চলতে পারে। ক্ষেত মজুর, মধ্যবিত্ত ছোট ব্যবসায়ী এমনকি ছোট শিল্পপতিদের নিয়েই সরকার গড়তে হবে। তবেই প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদী পুঁজিপতিদের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করা যাবে।

সুভাষবাদের নামে

শ্রীদিলীপকুমার চক্রবর্ত্তী 'যুগবাণী'তে প্রকাশিত সুভাষবাদের নামে শীর্ষক প্রবন্ধে বলিতেছেন:

ভারত আত্মার মূর্ত-প্রতীক স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন 'চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। আপোষে বিখণ্ডিত দেশের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সময় হতেই ভারত চলেছে স্বামীজী ও তাঁর উত্তরসূরী নেতাজী নির্দ্দেশিত পথের বিপরীত মার্গে। 'স্বরাজের পথে' দীর্ঘ তেইশ বছর পরিক্রমা করার পরেও সমস্যাসমূহের সুসমাধানের কিনারা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দেশের নেতৃবর্গ নিজেদের অযোগ্যতায়ই সৃষ্ট ঘটনার পাকচক্রে পড়ে সম্পূর্ণ দিশেহারা। সত্যাশ্রয়ী আদর্শবাদ আজ ভূলুণ্ঠিত, আর এরই মাঝে দেশজোড়া চলেছে চরম সুবিধাবাদের বিষবাষ্পের খেলা। নিপীড়িত, সঙ্কিত ও অজ্ঞানের অন্ধকারে অন্ধ দেশের জনতার সঙ্গে চলেছে অবিরাম লুকোচুরি খেলা, চালকের চালাকির প্রতিযোগিতা। ফলে আড়ালে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে প্রবঞ্চনার পাহাড়—বিস্ফোরণের বুঝি আর দেরী নেই।

অবস্থার এ পটভূমিকায় সবার আগে ও সবচেয়ে বেশী করে মনে পড়ে ভারত-পথিক সর্বত্যাগী বিবেকানন্দ শিষ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথা। স্বাধীনতাবিহীন সমাজবাদের কল্পনা স্বপ্নে-সৌধ গড়ার সমতুল। সুভাষচন্দ্রের ধ্যান-ধারণায় তাই সেকালে সর্বাধিক অগ্রাধিকার পেয়েছিল দেশমাতৃকার বন্ধন-শৃঙ্খল ভাঙায় 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'র বজ্র-কঠোর শপথ এবং তদনুযায়ী পরবর্তী কার্যকলাপের দ্বারা তিনি শুধু ভারতের ইতিহাসেই নহে সমগ্র পৃথিবীর মুক্তি সংগ্রামের অধ্যায়ে শাশ্বতকালের এক চিরভাস্বর পথিকৃৎ হয়ে থাকবেন —'নেতাজী নামকরণে অলঙ্কৃত হওয়ার ইহাই তাৎপর্য। কর্ম্মযোগী এই বিরাট পুরুষের জীবন-কাহিনী কি শুধু এটুকুতেই সীমাবদ্ধ? কর্ম্মক্ষেত্রে সমকালীনদের মধ্যে বয়োকনিষ্ঠ হয়েও তাঁহার দৃষ্টি ছিল দূরপ্রসারী, দূরদর্শিতা ছিল সার্থক জ্যোতিষীর নির্ভুল গণনার সমতুল।

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির করাল গ্রাস মুক্ত হয়ে স্বাধীন ভারত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কোন পথে অগ্রসর হয়ে সর্বস্তরের দেশবাসীর উন্নতি সাধন করবে সে নিশানারও যথার্থ নির্দ্দেশনামা সুভাষচন্দ্রের কার্যাবলীতে সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট। তাঁহার জীবনাদর্শের সার্বিক প্রতিফলন স্বরূপেই সুভাষবাদের পত্তন ঘটেছে পরবর্তীকালে নেতাজী অনুসারীদের গবেষণালব্ধ বিষয়বস্তু হিসেবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য 'ভাবের ঘরে চুরি' শুরু হয়ে গিয়েছে। তথাকথিত নেতাজী প্রেমে উন্মত্ত কতিপয় সুযোগসন্ধানী সম্প্রতি প্রকাশ্যে

চরম সুবিধাবাদের আশ্রয় অবলম্বন করে চালাকির পথ ধরেছেন নেতাজীরই নামে। জড়বাদী সর্বস্ব মার্কসবাদের অপর নাম ভারতীয় তর্জমায় সুভাষবাদ বলে পঃ বাংলার ফরওয়ার্ডব্লকের কিছু ব্যক্তি সোচ্চার ধ্বনি তুলেছে। (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য নেতাজী জন্মাবধি অধ্যাত্ম শক্তিতে বলীয়ান ও বিশ্বাসী।) ইহা যেন অমাবস্যা রাত্রিকে পূর্ণ চন্দ্রিমা রজনী বলে চালানোর মত আর কী! খবরে প্রকাশ, নেতৃপদে আসীন, তদুপরি রাজ্যমন্ত্রী ও বিধানমণ্ডলীর এম এল এ ও এম পি ও জনাকয়েক সদস্য তকমা আঁটা সুভাষপ্রেমিক সুভাষবাদের এ বিকৃত ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ কর্মী সাধারণসহ খাঁটি সুভাষবাদী নেতৃমহলে। নিজস্বার্থের খাতিরে বা অন্তরে প্রকৃত মার্কসবাদী এহেন কৃত্রিম সুভাষবাদীদের ধৃষ্টতা ও শঠতার মুখোস খুলে দেওয়া প্রকৃত সুভাষপ্রেমিক তথা দেশপ্রেমিকদের অন্যতম পবিত্র কর্তব্য।

দেশ বিদেশের কথা

দক্ষিণ আফ্রিকায় মসজিদ ভাঙ্গা

আপার্টাইড কথাটা আজকাল ইংরেজি ভাষায় বহু ব্যবহৃত সর্ব্বজনবোধ্য হইয়া প্রচলিত হইয়াছে। কথাটা আসলে দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়রদিগের কথিত ওলন্দাজ ভাষার কথা ও উহার অর্থ বিভেদ ও পার্থক্যরক্ষা করিয়া জীবনযাত্রা পদ্ধতি নির্দ্ধারণ ব্যবস্থা। অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায় ঔপনিবেশিকদিগের যে বর্ণবিদ্বেষ ও যাহার জন্য তাহারা দক্ষিণ আফ্রিকাতে সর্ব্বত্র বর্ণগত পার্থক্যকে রাষ্ট্রনীতিতে একটা বিশেষ স্থান দিয়াছে, সেই দৃষ্টিভঙ্গীর ও তজ্জাত বর্ণবিভেদ রক্ষণব্যবস্থার নিয়মকানুন প্রণয়নের কার্য্যকে আপার্টাইড ব্যবস্থা বলা হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় কৃষ্ণকায় ব্যক্তির শ্বেতকায়ের সহিত এক এলাকায় বাস করা, এক যান-বাহন ব্যবহারে গমনাগমন, একস্থানে আহারাদি করা, এক পাঠশালায় বা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ প্রভৃতি বহু কিছুই আইনবিরুদ্ধ কার্য্য। আফ্রিকান, ভারতীয় বা এশিয়ার লোক, মিশ্রজাতির লোক ইহারা একেবারেই অপাঙক্তেয় ও ইহারা শ্বেতকায় ব্যক্তির সহিত কোনভাবেই সমান অধিকার পাইবে না, ইহাই দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রনীতি। সকল সহরে শ্বেতকায়দিগের বাসের ব্যবস্থা পৃথকস্থানে ও সেইদিকে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা শোভমান। কৃষ্ণকায়গণ অপর দিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে বাস করে। যে সকল জাতি শক্তিমান তাহাদিগের জন্য ব্যবস্থা অন্য প্রকার। যথা চীনা ও জাপানীগণকে 'অনাহারি' শ্বেতকায় বলিয়া ধরা হয় ও তাহারা অপেক্ষাকৃতভাবে কৃষ্ণকায়দিগের তুলনায় সম্মানার্হ।

বর্ত্তমানে যে সকল এলাকায় কৃষ্ণকায়গণ থাকিতে পারেনা সেই সকল স্থানে যে মন্দির মসজিদ আছে দক্ষিণ

আফ্রিকার শাসকদিগের হুকুমে সেইগুলি ভাঙিয়া দিতে হইবে স্থির হইয়াছে। জমির ও ইমারতের মূল্য দেওয়া হইবে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার মুসলমানগণ এই হুকুমে বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ ও বিচলিত। তাহারা মসজিদ ভাঙাতে কোন মতেই সায় দিতে প্রস্তুত নহে। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারও কোন মতেই কালা আদমির নৈকট্য সহ্য করিতে রাজি নহেন। সুতরাং মসজিদ ভাঙ্গা হইবেই মনে হয়। ঐ রাষ্ট্রে যত মসজিদ আছে তাহার অর্দ্ধেকের অধিক মসজিদই শ্বেতকায় এলাকায় প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং বিষয়টা সহজ ও সরল নহে। প্রায় চল্লিশটি মসজিদ ভাঙ্গা হইলে একটা পৃথিবীব্যাপী বিক্ষোভের সূচনা হইবে। ইহাতে পাকিস্থান দক্ষিণ আফ্রিকার উপর যুদ্ধ ঘোষণা করিবে কি না আমরা তাহা জানিনা। তবে এখন অবধি তাহার কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই। পাকিস্থান অবশ্য বিষয়টির বিচার করিতে প্রথমে নানা কথা ভাবিয়া দেখিবে। চীন কি বলে? তাহারা কি কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্টের পার্থক্য লইয়া আপার্টাইড জাতীয় বিলি ব্যবস্থা করে? রুশিয়াতে নমাজ পড়ে যাহারা তাহারা কি নাস্তিক মার্কসবাদীর সহিত একাসনে বসিতে পায়—বাস্তব ও আন্তরিক উভয়ভাবে? আমেরিকাতে আপার্টাইড আছে কি না এবং থাকিলে পাকিস্থান তাহার বিরুদ্ধে কি কিছু বলিতে সাহস পাইয়াছে। পাকিস্থান নিজে 'কাফের' দিগের বিরুদ্ধে কি করিয়াছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। সুতরাং যদি পাকিস্থান কোন প্রবল আন্দোলন না করে তাহা হইলে বিশ্ব মুসলমান সমাজের পক্ষ হইতে বিক্ষোভটার অভিব্যক্তি উপযুক্তরূপে ব্যাপক হইবেনা।

ভারতবর্ষের মুসলমানদিগের তরফ হইতে যদি কিছু বলা হয় তাহাতে কি ফল হইবে আমরা জানিনা। কারণ দক্ষিণ আফ্রিকায় যে কয়েক লক্ষ ভারতবাসী (পাকিস্থানবাসীও) আছেন তাঁহাদের অবস্থা কিছুমাত্র মানবতাসঙ্গত নহে। ভারত সরকার তাহাদের মনুষ্যত্বের দাবি লইয়া কিইবা করিতে পারিয়াছেন? ভারতের দ্বারা তাহা হইলে এই বিষয়ে কিছু হইতে পারিবে না বলিয়াই মনে হয়। ইউ, এ, আর প্রভৃতি আরব জাতি কিছু করিবেন কি? তাহা ব্যতীত চীনের, রুশিয়ার, মলয় ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলমান আছেন। তাঁহারাই বা কি করিবেন? বিষয়টি লইয়া ইউ, এন কিছু করিতে পারিবেন বলিয়া কোন আশা নাই। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতকায়দিগের দেহের চর্ম্মের রং লইয়া যে অহমিকা তাহা কোথায় গিয়া শেষ হইবে তাহার বিচার আমাদের অনুমানের বাহিরে।

বাংলার অর্থনীতি ও রাজনীতি

বাংলার রাষ্ট্রনৈতিক অশান্তির মূলে রহিয়াছে বাঙালীর রোজগারের অভাব ও দারিদ্র্য। এই বিষয়ে "যুগজ্যোতি" সাপ্তাহিক যাহা বলিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে বাংলার অবস্থা বিচার করা সহজ হইবে।

শাসন পরিচালনার শীর্ষে গান্ধীবাদী অজয় মুখোপাধ্যায় বা মার্কসবাদী জ্যোতি বসুই থাকুন অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাবাহী রাজ্যপালের দ্বারাই তাহা পরিচালিত হউক—যতক্ষণ পর্যন্ত না পশ্চিমবঙ্গের অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের মোকাবিলা করা যাইতেছে ততক্ষণ পর্যন্ত তাহা জনগণের দুর্গতি দূর করিতে পারিবে না। পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ক্ষেত্রের অশান্তি অনিশ্চয়তা ও হতাশা রাজনীতিক্ষেত্রেও তাহার ছাপ ফেলিয়াছে ইহা সত্য। কিন্তু রাজনীতিক্ষেত্রের অশান্তি অনিশ্চয়তা ও হতাশা সঙ্কটকে তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। অর্থনৈতিক দুর্গতি দূর করিতে হইলে শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি ও তাহার প্রসার নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু রাজনৈতিক আবহাওয়া অশান্ত ও অনিশ্চিত থাকিলে ইহার কোনটাই সম্ভব নয়। পশ্চিমবঙ্গে শ্রমিকদের অসন্তোষ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতেছে এবং শ্রমিকনেতারা রাজনীতি ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তাহাদের দাবীও ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইয়া চলিয়াছে। ফলে শ্রমিক মালিক সম্পর্কও ক্রমশঃই তিক্ততর হইয়া উঠিতেছে। পরিস্থিতি যে কোথায়

আসিয়া দাঁড়াইয়াছে নিম্নের তুলনামূলক হিসাব হইতেই তাহা সুস্পষ্ট বোঝা যাইবে।

সাল	বন্ধ কারখানার সংখ্যা (Stoppage)	সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের সংখ্য (Workers involved)	মানুষ—দিন নষ্ট (Man days lost)
১৯৫২	১৩৯	৯৫,১৬৬	৫,৪৪,১৪৯
১৯৫৭	২২৭	১,০৬,৪৭১	৯,৯৮,৮২০
১৯৬১	২৭৯	১,৪৮,৯২০	২০,৫১,০১২
১৯৬৭	৪৩৮	১,৬৫,১০২	৫০,১৫,৮৫২
১৯৬৮	৪১৭	২,৬৩,৪৫০	৬৭,২২,৫৪৮
১৯৬৯	৭১০	৬,৪৫,১৮৭	৮৫,৪৯,২০৩

যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইবার পরই যে শ্রমিক মালিক বিরোধ অসঙ্গত ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে উপরোক্ত হিসাব তাহা নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত করিতেছে। শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষা করিবার ও মালিকদের শোষণ হইতে তাহাদের রক্ষা করিবার প্রয়োজনীয়তা কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু তাহাদের অবস্থার উন্নতি করিবার প্রচেষ্টার রূপ যদি এই হয় ও জাতিকে যদি এইমূল্যে তাহা ক্রয় করিতে হয় এবং তাহার ফলে রাজ্যের অর্থনৈতিক কাঠামো যদি ভাঙ্গিয়া পড়ে ও গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা অচল হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে সে ব্যবস্থাকে আর যাহাই বলা হউক কোনরূপেই সুব্যবস্থা বলা চলে না।

সাময়িকী

কাম্বোডিয়াতে কি হইতেছে?

কাম্বোডিয়াতে ঠিক কি যে হইতেছে তাহা বলা কঠিন। ঐ দেশের যিনি রাজাসনে বসিয়াছিলেন তিনি অপর হস্তে শাসনভার ও সামরিক ক্ষমতাদি ন্যস্ত করিয়া বা করিতে বাধ্য হইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার হাত হইতে জোর করিয়া রাজশক্তি কেহ যে কাড়িয়া লইয়াছে তাহাও ঠিক বুঝা যায় নাই। কারণ তিনি শক্তিরক্ষার জন্য কোন চেষ্টা করেন নাই বলিয়াই মনে হইয়াছে। এখন যাঁহারা কাম্বোডিয়ার মালিক তাঁহারাও যে মহাশক্তিশালী তাহা মনে হইতেছে না; কারণ শুনা যাইতেছে যে ভিয়েৎকং সৈন্যগণ কাম্বোডিয়া দখল করিবার জন্য ঐ দেশে অনুপ্রবেশ করিয়াছে। কোন কোন স্থান দখলও করিয়াছে। আমেরিকান আকাশ বাহিনী কাম্বোডিয়ার সামরিক নেতাদের সহায়তায় কোথাও কোথাও ভিয়েৎকংএর উপর বোমা বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহাতে মনে হয় কাম্বোডিয়ার রাজশক্তি হাতবদল হওয়ার মূলে আমেরিকার চক্রান্ত রহিয়াছে ও এখন যদি কম্যুনিষ্টগণ ঐ দেশের উপর হামলা করে তাহা হইলে ঐখানে পুনর্ব্বার প্রবলভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে। কারণ আমেরিকানদিগের আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনীতি হিসাবে দক্ষিণ পূর্ব্ব এশিয়ার কম্যুনিষ্ট প্রভাব যতটা বৃদ্ধিলাভ করিতে পারে তাহার অধিক কিছু আমেরিকানরা হইতে দিতে পারে না। সুতরাং ভিয়েৎকংএর বিপ্লবনীতি প্রসারিত হইতে চাহিলে তাহাদের আমেরিকান শক্তির সহিত সংঘর্ষণ অনিবার্য্য।

বর্ত্তমানের রাষ্ট্রনৈতিক পরিস্থিতিতে ঠিক বোঝা যায় না যে কে কাহার শত্রু অথবা মিত্র। আমেরিকানগণ ভিতরে ভিতরে চীনের সহিত মিলিত হইয়া রুশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালাইতেছে বলিয়া অনেকে মনে করেন। চীন কিন্তু ভিয়েৎকংএর সাহায্যে সদা তৎপর। ভিয়েৎকং ইতিপূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখন দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ততটা সক্রিয় নহে ইহা কি চীনের নির্দ্দেশে আমেরিকার বোমা বর্ষণের সহিত ওজন ঠিক রাখিয়া চলার নিদর্শন? আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রীয় কূটনীতি দুর্ব্বোধ্য ও দুরূহ বিষয়। ইহার ভিতরের পাকচক্র অতি জটিল। সকলেই মূলতঃ নিজ নিজ সুবিধা খুঁজিতেছে; কেহ কাহাকেও বিশ্বাস করে না; সকল কথাই মিথ্যা ও সকল বন্ধুত্ব ও শত্রুতাও অভিনয়ের ব্যাপার। এ অবস্থায় আমরা কি করিয়া বলিতে পারি যে কাম্বোডিয়াতে কি হইতেছে? অপরিণত বয়স্ক ছেলেমেয়েরা বিশ্বাস করে যে পৃথিবী দেশগুলি ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের পৃথক পৃথক আসর; কিন্তু বস্তুতঃ মতবাদ অপেক্ষা মতলবই অধিক জোরাল শক্তি বলিয়া মনে হয়।

মেঘালয়

নাগাল্যাণ্ড গঠিত হইবার পরে অনেকে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন যে আসাম প্রদেশটা আর নিজ গৌরব রক্ষা করিয়া চলিতে পারিল না। কথাটার তাৎপর্য্য ঠিকই হইয়াছিল; কারণ দেশ বা প্রদেশ যাহাই হউক তাহার অঙ্গচ্ছেদ হইলে পূর্ব্বমাহাত্ম্য রক্ষিত হওয়া কঠিন হয়। নাগাল্যাণ্ড গঠিত হইবার পরে আসামের প্রতিষ্ঠাতে একটা প্রবল নাড়া পড়িয়াছিল। ইহার জন্য দায়ী ছিলেন আসামের জননেতাগণ। তাঁহাদিগের নিজেদের ক্ষুদ্র গণ্ডির স্বার্থসিদ্ধির আগ্রহ এত প্রবল ছিল যে তাঁহারা আসামের অপরাপর বাসিন্দাদিগের অধিকার বা উন্নতির কথা লইয়া কিছুমাত্র পরিশ্রম করিতেন না। অনেক ক্ষেত্রেই আসামের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকেরা আসামের নেতাদিগের নিদারুণ স্বার্থপরতা দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে সকল শ্রদ্ধা হারাইয়া বসিয়াছিলেন। আসামের বাঙ্গালীবাসিন্দাগণ বিশেষভাবে উৎপীড়িত হইয়াও অন্যায় অবিচারের ধাক্কা খাইয়া আসাম সম্বন্ধে কোন ভালবাসা পোষণ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। আদিবাসী পার্ব্বত্য জাতিগুলিও আসাম সম্বন্ধে কোন শ্রদ্ধা ভালবাসা বোধ করিত না ও তাহার মূলেও ছিল আসামের নেতাদিগের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর লোকেদের প্রতি অবিচার। তাঁহাদের উপযুক্ত মূল্যদার হইয়াছে আসামের মুসলমানগণ। ইহারা পাকিস্তানের সহিত ষড়যন্ত্রে বহু পাকিস্থানিকে গোপনে আসামে লইয়া আসিয়া ভারতীয় বলিয়া চালাইয়া আসামের জনশক্তি মুসলমানপ্রধান বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আসামের হিন্দুদিগের মধ্যে বাঙ্গালীগণ আসামের নেতাদিগের অত্যাচারে জর্জ্জরিত ও তাঁহারা আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বাংলায় সংযুক্ত হইতে চাহেন। বর্ত্তমানে মেঘালয় ভিন্ন প্রদেশ হইয়া গিয়া আসাম আরই ক্ষুদ্রায়তন হইয়া পড়িল। বাঙ্গালীপ্রধান জেলাগুলি আসাম হইতে কাটিয়া বাংলায় যুক্ত করিলে আসামের যাহা বাকি থাকিবে তাহা মুসলমানপ্রধান হইয়া যাইতে সময় লাগিবে না। তখন আসামের কি হইবে তাহা কে বলিতে পারে? মেঘালয় গঠন আসামের ভবিষ্যত অন্ধকার করিয়াছে।

আসামের উদাহরণ হইতে ভারতের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় নেতাদিগের আর একটা শিক্ষালাভ হওয়া উচিত। ইহা হইল ব্যক্তিগত ও ক্ষুদ্রগণ্ডিগত স্বার্থের টানে বৃহত্তর জাতীয় কর্ত্তব্য ভুলিয়া যাওয়ার সর্ব্বনাশা পরিণাম উপলব্ধি। আমাদিগের দেশে বহু দেশনেতা আছেন যাঁহাদিগের ঐ বৃহত্তর কর্ত্তব্যবোধের একান্ত অভাব দেখা যায়। ইঁহারা সংখ্যালঘু দেশবাসীদিগকে রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে নিজেদের শাসনে আনিয়া পরে তাহাদিগকে কোনভাবে ন্যায্য অধিকারাদি উপভোগ করিতে দেন না। এই পরিস্থিতিতে ভারতের প্রদেশগুলি ক্রমে ক্রমে আরও খণ্ড বিখণ্ড হইয়া দেশের স্বাভাবিক অতি প্রয়োজনীয় সংগঠিত সুদৃঢ়ভাব নষ্ট করিয়া দিতেছে। বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশ বহুল "ফেডারেল" রাষ্ট্র কখন প্রদেশগুলিকে স্বায়ত্তশাসন অধিকার যথাযথভাবে দিতে পারেনা।

ফলে কেন্দ্রের শাসন প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে ও দেশবাসীর অবস্থা কোন সাম্রাজ্যের প্রজাদিগের মতই হইয়া দাঁড়ায়। কেন্দ্রেও যদি দলাদলি চলে তাহা হইলে রাষ্ট্র দুর্বল হইয়া পড়ে ও শেষ অবধি তাহার নিজ স্বাধীনতা রক্ষাও অসম্ভব হইয়া দাঁড়ায়।

রাষ্ট্রপতির শাসন

বাংলা দেশের সংবাদ পত্রে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের সমর্থনেই বেশীর ভাগ পত্রিকাতে মত প্রকাশ করা হইয়াছে। কিন্তু কোন কোন পত্রিকা রাজ্যপাল শ্রী ধাওয়ানের সমালোচনায় মুখর দেখা যাইতেছে। কারণ ঠিক কি তাহার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।" যুগবাণী' সাপ্তাহিকে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠকদিগের নিকট কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া যাইতেছে।

রাইটার্স বিল্ডিংসে প্রথমদিন রাজত্ব করিতে ঢুকিয়াই রাজ্যপাল শ্রী ধাওয়ান বেলা দেড়টায় সমস্ত সরকারী অফিস ছুটি দিয়া দেন। পশ্চিমবঙ্গে সরকারের সেক্রেটারিয়েটকে তিনি পাঠশালারূপে মনে করেন, না জমিদারি বলিয়া মনে করেন জানিনা; কিন্তু তাঁর ঐ একটি কাজেই বোঝা গিয়াছিল যে তিনি আমীরী করিতে চান, কাজ করিতে নয়। রাইটার্স বিল্ডিংসে রাজ্যপাল প্রথমবার বৈদেশিক অতিথিকে অভ্যর্থনা করিতে যাইয়াই মদ পরিবেশন করিয়াছেন—বাংলা সরকারের সমস্ত ঐতিহ্যের বিরোধী এই ঘটনাতে আরও প্রমাণ হইয়াছে যে রাজ্যপাল ধরিয়া লইয়াছেন, সেক্রেটারিয়েট তাঁর খেয়াল-খুশি চারিতার্থ করার স্থান। ইনি নাকি আবার একজন কমিউনিষ্ট। প্রথম যেদিন বঙ্গদেশে রাজ্যপাল রূপে পদার্পণ করার উদ্দেশে তিনি হাওড়া স্টেশনে একটি বিশেষ ও বিলাসবহুল ট্রেনের কামরা হইতে নামিয়াছিলেন সেদিন প্লাটফর্মে তাঁর জন্য লাল কার্পেট পাতিয়া সম্বর্ধনা জানাইতে হইয়াছিল—যা ইতিপূর্বে আর কোন রাজ্যপালকেই জানানো হয় নাই। তিনি যখন প্রথমবার দার্জিলিঙ যান সেখানে তাঁর লটবহর বহনের জন্য একখানি আস্ত আলাদা ট্রেন দিতে হইয়াছিল,—খরচটা সরকারী তহবিল হইতেই আদায় করা হইয়াছে। বস্তিবাসীদের দুঃখে ইনি নাকি ফুপাইয়া কাঁদেন, রাজভবনের আর্দ্দালীরা লিফট ব্যবহারের সুযোগ এতদিন পায় নাই জানিয়া মর্মাহত হন, এবং বাঙ্গালী জাতির দুর্ভাগ্যের কথা বর্ণনা করিতে বসিয়া তিনি মূর্চ্ছা যান। লোকটার আসল রূপটি কী তা জানিনা, তবে স্তালিনের মেয়ে এই ব্যক্তিকে বুকনিওয়ালা বলিয়া লিখিয়াছেন। ইনি ভারত সোভিয়েত বন্ধুত্ব সমিতির সভাপতি থাকায় স্বেতলানাকে এঁর সংস্পর্শে আসিতে হইয়াছিল।

এই লোককে দিয়া যে পশ্চিমবঙ্গের সরকার পরিচালনা করা যাইবেনা কেন্দ্রীয় সরকার তাহা বুঝিয়াছেন। ইন্দিরা এঁকে রাজ্যপাল করিয়া আনিয়াছিলেন মুখ্যত জ্যোতি বসুকে সন্তুষ্ট করিতে। ধর্মবীরের কারণে কেন্দ্রবিরোধী যে উত্তেজনা ও উত্তাপ বাংলায় সৃষ্টি হইয়াছিল তা প্রশমিত করা ও পার্লামেন্টে কমিউনিষ্টদের সমর্থনলাভ এই দুই উদ্দেশ্যে ইন্দিরা ধাওয়ানকে রাজ্যপাল করিয়া পাঠান। আজ পরিস্থিতি আমূল পরিবর্তিত হওয়ায় ইন্দিরার মনোভাব পাল্টাইয়াছে। তিনি জানেন কমিউনিষ্টদের ডান বাম দুয়েরই সন্তোষ বিধান করার দরকারও তাঁর নাই, কারণ তারাই এখন তাঁর পায়ে পিপা ভর্তি তেল ঢালিতেছে। পার্লামেন্টে যেদিন সোস্যালিষ্ট নেতা ফার্ণাণ্ডেজ, মধু লিমায়ে প্রভৃতির উপর পুলিশী আক্রমণের প্রতিবাদে তুমুল ঝড় বহিয়াছিল সেদিন দুই কমিউনিষ্ট পার্টিই ভোটের সময় সদস্যদের অনুপস্থিত রাখিয়া ইন্দিরা সরকারকে বাঁচাইয়া দিয়াছে। কেরলে ও পশ্চিমবঙ্গে মার্ক্সবাদী কমিউনিষ্টদের জন্য যে কড়া চাবুকের বন্দোবস্ত কেন্দ্রীয় সরকার করিয়াছেন তারপরও জ্যোতি বসু ও তাঁর সাথীবৃন্দ যথাস্থানে লেহন কর্মের যে নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন তাতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বুঝিতে বাকি নাই যে জীববিশেষের সঙ্গে এদের পার্থক্য নাই; এদের খাতির করার তাই দরকারও নাই। তাই শ্রীযুক্ত ধাওয়ানের মতো একজন দুমুখো লোককে পশ্চিমবঙ্গে রাখার প্রয়োজন আছে বলিয়াও কেন্দ্রীয় সরকার আর মনে করেন না। বিশেষত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবন এঁর সম্পর্কে সন্দিগ্ধ; প্রধানমন্ত্রীর নতুন বন্ধু পি এস পির নাথ পাই ও সুরেন দ্বিবেদী সরাসরি এই ব্যক্তিকে অপসারণ করার পরামর্শ প্রধানমন্ত্রীকে দিয়াছেন।

'প্রবাসী' মাসিক সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকার ও অন্যান্য বিশেষ বিবরণ প্রতি বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ তারিখের পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশিতব্য :

(ফরম নং ৪)

(রুল নং ৮ দ্রষ্টব্য)

১। প্রকাশিত হওয়ার স্থান –	কলিকাতা (পশ্চিমবঙ্গ)
২। কিভাবে প্রকাশিত হয় –	প্রতি মাসে একবার
৩। মুদ্রাকরের নাম –	শ্রী শমীন্দ্র নাথ সরকার
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	৭৭।২।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
৪। প্রকাশকের নাম	ঐ
জাতি	ঐ
ঠিকানা	ঐ
৫। সম্পাদকের নাম	শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়
জাতি	ভারতীয়
ঠিকানা	৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬
৬। (ক) পত্রিকার স্বত্বাধিকারীর নাম ঠিকানা এবং (খ) সর্বমোট মূলধনের শতকরা এক টাকার অধিক অংশের অধিকারী-দের নাম-ঠিকানা –	১। শ্রীমতী অরুন্ধতী চট্টোপাধ্যায় ১ উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ২ শ্রীমতী রমা চট্টোপাধ্যায় ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ৩। শ্রীমতী সুনন্দা দাস ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ৪। শ্রীমতী ইশিতা দত্ত ১, উড ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৬ ৫। শ্রীমতী নন্দিতা সেন ১, উড ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ৬ শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬ ৭। শ্রীমতী কমলা চট্টোপাধ্যায় ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬ ৮। শ্রীমতী রত্না চট্টোপাধ্যায় ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬ ৯। শ্রীমতী অলকানন্দা মিত্র ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬ ১০। শ্রীমতী লক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায় ৩এ, এলবার্ট রোড, কলিকাতা-১৬

আমি, প্রবাসী মাসিক সংবাদপত্রের প্রকাশক, এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে, উপরি-লিখিত সব বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য।

তারিখ—

প্রকাশকের সহি—বাঃ শ্রীশমীন্দ্রনাথ সরকার